স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বলছে। মথুর বাবু থ হয়ে রইলেন। আমলারা যারা ছিল তারা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ক'দিন পরে হাজির হল এসে গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দেশে। বৈষ্ণবচরণ কর্তাভজা, গৌরীকান্ত তান্ত্রিক। মহা শক্তিশালী তান্ত্রিক। প্রতি দুর্গাপূজায় স্ত্রীকে ভগবতীজ্ঞানে আরাধনা করত। যজ্ঞ করার রীতি ছিল অলৌকিক। যজ্ঞের কাঠ মাটিতে সাজাত না, বাঁ হাতের তালুর উপর সাজাত। বাঁ হাত প্রসারিত, করতলের উপর কাঠ সাজিয়ে রাখছে—দু'-চারখানা নয়—সম্পূর্ণ এক মণ কাঠ—আর তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে ডান হাতে। যতক্ষণ অনুষ্ঠান না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হাতের উপর জ্বলছে সেই কাঠ। নিজের চোখে একদিন তা দেখেছিলেন ঠাকুর।

সেই গৌরীকান্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। তার সঙ্গে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখের সামনে। সবাই বলে এও তার তন্ত্রবল।

তর্কসভায় যখন সে ঢোকে তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কোনো স্তোত্রের বিশেষ একটা অংশই আবৃত্তি করে হয়তো, কিন্তু কণ্ঠস্বরে গগন-বিদার বজ্রের কাঠিন্য। আওয়াজ শুনে ছাদ-দেওয়াল ফেটে পড়বে মনে হয়, ভয়ে হৃৎকম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কেউ-কেউ বলে অমনি চীৎকার করেই না কি সে নিজের মধ্যে তার আশ্চর্য্য শক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে। সে যে একজন অসীম শক্তিধর ঐ চীৎকারই তার অভিজ্ঞান!

কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে যথারীতি হুঙ্কার ছাড়ল গৌরীকান্ত।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে বসেছিল গদাধর। চীৎকার শুনে চমকে উঠল। কোথাকার কোন পণ্ডিত এসেছে, কি তার শক্তি-সাধনা, কিছুরই সে খবর রাখে না। কিন্তু কি স্তোত্রাংশ বলেছে চীৎকার করে তা ঠিক ধরতে পেরেছে; তার অন্তরে যে বসে আছে সেই বলে দিলে গোপনে। বললে, তুইও ঐ ভাঙা লাইনটা আবৃত্তি কর। কিন্তু খবরদার, ও যতটা জোরে চেঁচিয়েছে, তার চেয়ে আরো জোরে চেঁচানো চাই।

তাই সই। গদাধর চীৎকার করে উ[illegible] প্রবলতর, পরুষতর কণ্ঠে। মনে হল যেন ডাক[illegible] পড়েছে।

যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। লাঠি হা[illegible] ছুটে এল দারোয়ানরা। কি ব্যাপার? ডাক[illegible] কোথায়?

ডাকাত-টাকাত কিছু নয়। গৌরী পণ্ডিতে[র] সঙ্গে পাগলা-পুরোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—ক[ার] গলার কত জোর! সবাই অবাক মানল। পাগ[লা] পুরোতের গলা এত দরাজ! এমন সাংঘাতিক!

হার মানল গৌরীকান্ত। মুখ গম্ভীর করে ঢু[কে] এসে মন্দিরে। এক ডাকে এত নাজেহাল হ[বে] স্বপ্নেও ভাবেনি। কে এ কালীর বরপুত্র!

তর্কে অজেয় ছিল গৌরী। দেখল তারো চে[য়ে] আশ্চর্যতর শক্তি আছে। তার যা শক্তি তা তা[কে] তর্কেই আবদ্ধ করে রেখেছে, তর্কাতীতকে দেখ[তে] দেয়নি। সে শুধু রৌদ্রই পেয়েছে, রুদ্রকে পায়নি। কিন্তু কে এ অলোকসম্ভব, যে একটি ধ্বনিতেই সম[স্ত] কোলাহল স্তব্ধ করে দেয়! একটি উক্তিতেই শা[ন্ত] করে দেয় সমস্ত জিজ্ঞাসা?

গদাধরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর[ল] গৌরীকান্ত।

এততেও মথুর বাবু তুষ্ট হলেন না। তিনি আরো পণ্ডিত ডাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শাস্ত্র মিলিয়ে বিচার হোক। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দিরে বিচারসভা। সে-সভায় ঢোকবার আগে গদাধর মন্দিরে ঢুকল কালী-প্রণাম করতে। কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ বৈষ্ণবচরণ তার পায়ে পড়ল। অমনি ভাবসমাধি হল গদাধরের। বৈষ্ণবচরণের অন্তরে বইতে লাগল দিব্যানন্দের প্রবাহ। মুখে-মুখে সে তক্ষুণি এক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করে ফেললে। সে স্তোত্রে শুধু গদাধরের স্তুতি।

'বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে তর্ক করতে এসেছি আমি।' সমবেত পণ্ডিতদের উদ্দেশ করে বললে গৌরী[কান্ত]। 'আপনারা এসেছেন সে বাগযুদ্ধ দেখতে। [illegible] কে জেতে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু সে যুদ্ধ[ের] দরকার নেই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণু-চর[ণ] পেয়েছে—তাকে পরাস্ত করা মানুষের [illegible] ছাড়া তর্ক করার আছে কি। শাস্ত্র [illegible] আমরা দুজনে, গদাধর ভগবানের [illegible]

ওরা বলে কি! গদাধর বালকের মত অবাক মানল। কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ঈশ্বরের স্বভাবই তো বালকের মত। ছোট ছেলে যেমন খেলাঘর করে, একবার গড়ে একবার ভাঙে, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ছোট ছেলে যেমন কোনো গুণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি তিন গুণের অতীত।

তাই ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেশ, তাদের সঙ্গে থাকো। তা হলেই তাদের স্বভাব আরোপ হবে। ওদের কথাই চিন্তা করো। তা হলেই সত্তা পাবে ওদের। তদাকারিত হবে।

ঈশ্বর কেমনতরো? না, যেন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। কত লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। অনেকে চাচ্ছে তার কাছে রত্ন। কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলছে, না, দেব না। আবার যে হয়তো চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু ছুটে যেচে সেধে তাকে দিয়ে ফেলছে।

ভৈরবীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তার কথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মথুরের বুক ফুলে উঠল দশ হাত। তিনি যাকে গুরু বলে শিরে ধরেছেন সে গুরুর গুরু, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ—নিত্য সত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অবতার।

অবতার বলে সবাই মেনে নিলেও গদাধর ক্ষান্ত হবার নয়। লোকের কথায় তার সান্ত্বনা কোথায়? সে চায়, নিজের অনুভব, নিজের উজ্জীবন। বোধ থেকে বোধির আস্বাদ। নতুন সাধনায় তাই সে আত্মনিয়োগ করলে। কঠিনতর তপস্যায়। বিধিগত ব্রহ্মচর্যায়। তারই নাম তান্ত্রিক সাধনা। আর সে সাধনায় তার গুরু হল ভৈরবী যোগেশ্বরী।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরকে ধরতে চেয়েছে। নিজের চেষ্টায় মানে শুধু অন্তরের ব্যাকুলতায়। দেখা যাক পরের সাহায্যে কত দূর যেতে পারি। পরের সাহায্যে মানে গুরুর নির্দেশে। সেই গুরু যোগেশ্বরী। একজন কি না স্ত্রীলোক। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর। [illegible] কি না এক নারী তাঁর গুরু!

[illegible] মানে নারীর মধ্যে যে কামিনী যে তামসী [illegible]রবে। যে যোগিনী, যে মহিমময়ী মাতৃ-[illegible]ই গ্রহণ করবে। অভিনন্দন করবে।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুই ছাখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা বলে ডাকে॥"

জনক রাজার আরেক নাম বিদেহ, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহবুদ্ধি নেই। সেই জনক রাজার সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করে রইলেন। ভৈরবী বললে, 'তোমার এখনো স্ত্রীলোক দেখে ভয়! তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদ থাকে না।'

আমাদের গদাধর সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্ত্রীলোক মাত্রই তার মা'র প্রতিমা।

তা ছাড়া কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর পক্ষে নয়। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কেমনতরো জানো? যেমন আচার-তেঁতুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার-তেঁতুল সামনে আনতে নেই।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে, সংসারীদের পক্ষে নয়।" বললেন ঠাকুর, "আপনারা যদ্দূর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করো। সেখানে ওরা যেন কেউ না থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দু-একটি ছেলেপুলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয়-সুখে মন না যায়, ছেলেপুলে আর না হয়।"

গিরিশ ঘোষ বললে, 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্যে প্রার্থনা করো। ঈশ্বরই খাঁটি আর সব ভেজাল, অসার—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে, ভালো জল এক দিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। তাই হবে বিদ্যার সংসার।'

আর অবিদ্যার সংসারে দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি! পুরুষগুলোকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনিতে পেয়েছে। ওরে, হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল? আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই সে তেজ নেই সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনি হারুকে পেয়েছে। পেতনি যদি বলে, যাও তো একবার, হারু অমনি উঠে দাঁড়ায়। আবার যদি বলে, 'বোসো তো', অমনি বসে পড়ে।

তবু ঠাকুর বিয়ে করলেন।

'আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হল বল্ দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—তার আবার স্ত্রী কেন?'

নিজেই আবার উত্তর দিলেন ঠাকুর: 'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিয়ে তার মধ্যে একটা। শুক-দেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্যে। ঐ দশ রকম সংস্কার হলেই তবে আচার্য হওয়া যায়। সব ঘর ঘুরে এলেই তবে ঘুঁটি চিকে ওঠে।'

বিয়ে করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামি-স্ত্রী ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী। রতির পৃথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্তিমতী বিরতিকে—অতৃপ্তির জগতে সন্তোষময়ীকে। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অর্পণ করলেন নারীকে।

'এখানকার যা কিছু করা সব তোদের জন্যে।' ঠাকুর বললেন ভক্তদের: 'ওরে আমি ষোল টাং করলে তবে তোরা যদি এক টাং করিস—'

ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিবৃত্তি, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু সংযম। ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নির্বাসনা, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু অস্পৃহা।

'বাতাস করো তো মা, শরীর জ্বলে গেল।' অস্থির হয়ে বললেন একদিন শ্রীমা: 'গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারু বা পঁচিশটে ছেলে-মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি। ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

[ক্রমশঃ।

"তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর এক জন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়-শূন্য, মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র—প্রবন্ধ-সমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—এক জন পড়িবে,—আর এক জন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

"আমাদের কার্য্য—কায করিয়া মরা—" 'কেন' প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ।"

পুরুহুত

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

দেশ—বক্ষু-উপত্যকা (তাজিকিস্তান)
জাতি—হিন্দী—ইরাণী ভাষা ; কাল ২৫০০ খৃঃ-পূঃ।

বক্ষুর ঘর্ঘর ধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। তার দক্ষিণ তীরস্থ পাহাড় ওই ধারার কাছ থেকেই শুরু, কিন্তু বাঁ দিকটা বেশী ঢালু হওয়ায় উপত্যকা বিস্তৃত বলে-মনে হচ্ছিল। দূর থেকে ঘন-সবুজ উত্তুংগ দেবদারু গাছের কৃষ্ণতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু কাছে এলে নীচু অত্যধিক লম্বা এবং উপরিভাগ ছোট হয়ে যাওয়া ডালগুলির সঙ্গম-স্থল যেন সূচালু চূড়ার মত দেখা যাচ্ছিল। তার নীচে নানা রকমের বনস্পতি ও অন্যান্য গাছও ছিল। গ্রীষ্মের শেষ, তখনও বর্ষা শুরু হয়নি। এ মাসেই উত্তর-ভারতের সমতল ভূমিতে মানুষ গরমে বেশ ক্লান্তিতে বাস করে, কিন্তু এ সাত হাজার ফিট উঁচু পার্বত্য উপত্যকায় যেন গ্রীষ্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বক্ষুর বাম তীর বেয়ে একটি তরুণ যাচ্ছিল। তার শরীরে পশমের কঞ্চুক এবং তার ওপর কয়েক ভাঁজ জড়ান বেল্ট। নীচে পশমের পাজামা, পায়ে অনেকগুলি ফিতার তৈরী স্যাণ্ডেল। সে মাথার টুপী খুলে নিজের পিঠের ওপর রাখল। তার পিঠের ওপর ছড়ান লম্বা চুলগুলি দমকা হাওয়ায় এলেমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তরুণের কোমরস্থিত চামড়ার বেল্টের সঙ্গে একটি তামার খড়্গ লম্বমান এবং পিঠের ওপর পাতলা গাছের ছালের একটি ব্যাগ। তার মধ্যে তরুণ অনেক জিনিস-পত্র, খোলা ধনুক, তীর-ভর্তি তর্কশটি রেখেছিল। তার হাতে একগাছা লাঠি ছিল। সে ওই লাঠির ওপর ব্যাগটি রেখে মাঝে-মাঝে বিশ্রাম করছিল। সামনের চড়াই আরও কঠিন। তার আগে আগে ছ'টা মোটা-মোটা ভেড়া চলছিল। সেগুলির পিঠের ওপর ছাতুতে ভরা ঘোড়ার লোমের তৈরী বড় বড় বস্তা ছিল। তরুণের পিছু-পিছু বড় বড় লোমওয়ালা একটি লাল কুকুর যাচ্ছিল। কলহংসের মাধুর্যময় গম্ভীর স্বরে পর্বত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তরুণ তাতে প্রভাবান্বিত হয়ে শিষ দিতে দিতে এগিয়ে চলছিল।

টিলার ওপর থেকে একটি সরু রূপালী ধারার মত ঝরণা প্রবাহিত হচ্ছিল। স্রোতের গতি নির্দিষ্ট করবার জন্য কে যেন টিলার কিনারা থেকে একটি কাঠে নল লাগিয়ে দিয়েছে। ভেড়াগুলি হাঁপিয়ে পড়ে নীচে জল পান করছিল। তরুণ দেখতে পেল, পাশেই ছড়ান আঙুরের বড় লতাগুলি ছোট আঙুরগুচ্ছকে জড়িয়ে আছে। সে পুঁটলীটি মাটিতে রেখে অঙ্গুর ছিড়ে খেতে লাগল। আঙুর কাঁচা থাকায় টক লাগছিল। পাকতে তখনও এক মাস দেরি, কিন্তু তরুণ পথিকের ভাল লাগল না এই কাঁচা আঙুরগুলি। তাই সে একটি একটি করে আস্তে আস্তে মুখে দিচ্ছিল। বোধ হয় সে খুব পিপাসার্ত ছিল, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে ঠাণ্ডা জল পান করা ক্ষতিকর বলে সে দেরি করছিল।

ভেড়াগুলি জল পান করার পর চারি দিকে চরে কাঁচা ঘাস খাচ্ছিল। লম্বা লোমওয়ালা কুকুরটা অত্যধিক গরম অনুভব করছিল কিংবা ভেড়াগুলির অনুসরণ করল না। সে ঝরণার নীচে জলের মধ্যে গিয়ে বসল। তার পেটটা হাপরের মত ফুলে ও চুপসে যাচ্ছিল এবং তার লম্বা লাল জিহ্বা খোলা মুখের ভেতর হ'তে বেরিয়ে লক্‌লক্ করছিল। তরুণ ঝরণার নীচে হাঁ ক'রে স্রোতের জল এক শ্বাসে পান ক'রে তৃষ্ণার উপশম করল। হাতে ক'রে জল নিয়ে চুলের গোড়া ভিজাল এবং মুখ ধুয়ে ফেলল। তার অরুণ গৌরকান্তি গোল এবং লাল টুকটুকে ঠোঁট ঢাকবার জন্য পিঙ্গল লোম উঠবার তখনও প্রারম্ভিক অবস্থা। ভেড়াগুলিকে একমনে চরতে দেখে তরুণ পুঁটলীর পাশে যখন বসল, তখন কুকুরটা কান ভেঙ্গে তার দিকে তাকাতে লাগল। কুকুরটার চোখের ইঙ্গিতে তার মনোভাব বুঝতে পেরে সে পুঁটলিটার এক দিকে হাত দিয়ে শুকনো ভেড়ার পায়ের এক টুকরো মাংস কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলান তামার ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে কিছুটা নিজে খেল এবং কিছুটা কুকুরটাকে দিল। এমনি সময় কাঠের ঘটার খনখনি শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। তরুণ কিছু দূরে কতকটা আত্মগোপন করে ঝোপের আড়াল থেকে একটি গাধাকে আসতে দেখল। পুনরায় আর একটিকে এবং তার পেছনে তার মত পোষাক-পরা একটি ষোড়শী বালাকে আসতে দেখল। মেয়েটির পিঠের উপর একটি পুঁটুলী ছিল। তরুণ মুখ দিয়ে শিষ দিতে লাগল। যখনই সে কিছু ভাবত তখনই তার মুখে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই শিষ বেজে উঠত। ষোড়শীর কানে শিষের শব্দ এক বার পৌঁছল এবং সে এক বার সেদিকে তাকিয়েও ছিল, কিন্তু তরুণের শরীর ছিল লতা-পাতায় ঢাকা। যদিও তরুণ পঞ্চাশ হাত দূর থেকে দেখছিল, তবুও ষোড়শীর মুখের একটি হাল্কা সুন্দর ছাপ তার হৃদয়ের ওপর পড়ল। তরুণী কোন্ দিকে যায় তা জানবার জন্য সে উৎসুক ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল। এ ধারে বক্ষুর ওপর দিকে যে কোন গ্রাম নেই তা তরুণ জানত। কাজেই ষোড়শীও যে পথচারিণী, তা সে বুঝতে পারল।

অপরিচিতা সুন্দরী ষোড়শীর চেহারা দেখে ঝবরা (কুকুরটির নাম) চিৎকার করতে লাগল। "চুপ ঝবরা" বলতেই কুকুরটা চুপ ক'রে বসে পড়ল। ষোড়শীর গাধাটা জল পান করতে লাগল আর ষোড়শী তার পুঁটলিটা নীচে রাখার জন্য যখন নামাতে যাচ্ছিল, তরুণ তখন তার বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করল। ষোড়শী একটু মুচকি হেসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বলল, "বড় গরম।"

"গরম নয়, খাড়াই পথে চললে এ রকম মনে হয়। একটু বিশ্রাম নিলেই ঘাম চলে যাবে।"

"এখনকার দিনগুলি চমৎকার।"

"আপাততঃ দশ-পনের দিন বর্ষা হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।"

"বর্ষাকে আমার বড় ভয়। নালা এবং পিচ্ছলতার জন্য রাস্তা-ঘাট বড্ড খারাপ হয়ে যায়।"

"গাধা নিয়ে চলা আরও মুস্কিল।"

"ঘরে ভেড়া ছিল না, তাই আমি গাধাটাকেই সঙ্গে এনেছি। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাবে বন্ধু ?"

"ডাঁড়ে যাব। আজকাল আমার গরু, ঘোড়া ও ভেড়া সবই সেখানে আছে।"

"আমিও সেখানে যাচ্ছি ছাতু, দানা, ফল এবং লবণ পৌঁছিয়ে দিতে।"

"তোমার পশুগুলি দেখা-শুনা করে কে ?"

"আমার ঠাকুর্দা, ভাই এবং বোনেরা।"

"ঠাকুর্দা! তিনি নিশ্চয়ই খুব বৃদ্ধ?"

"অত্যন্ত বৃদ্ধ। এতো বৃদ্ধ লোক আর কোথাও [illegible] পাওয়া যায় না।"

"তাহলে তিনি দেখা-শুনা করেন কেমন করে?"

"এখনও তিনি খুব শক্ত আছেন। তাঁর চুল এবং গোঁফ যদিও সাদা কিন্তু তার দাঁতগুলি নতুন, দেখলে তাকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বলে মনে হয়।"

"তাহলে তাঁকে ঘরে রাখা উচিত।"

"তিনি রাজী হন না। আমার জন্মের পূর্ব থেকেই গ্রামে যান না।"

"গ্রামে যান না!"

"হ্যাঁ, যেতে চান না। গ্রামকে তিনি ঘৃণা করেন।" তিনি বলেন যে, মানুষ এক জায়গায় আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি গ্রামে যান না কেন, তা বলতে হলে অনেক পুরানো কথা বলতে হয়। আচ্ছা বন্ধু, তোমার নাম কি?"

"পুরুহুত মাদ্রী-পুত্র পৌরব।"

"তোমার নাম কি বোন?"

"রোচনা মাদ্রী।"

"তাহলে তুমি আমার মা-কুলের বোন! তুমি কি ওপরের মদ্র না নীচের?"

"ওপরের মদ্র।"

"বক্ষুর বাম তীরে পুরুদের যে গ্রাম নীচের সমতল ভূমিতে গিয়ে মিলেছে, তার নীচের অংশ কিন্তু আগে মদ্রদের হাতে ছিল এবং দক্ষিণ তীরের ওপরকার মদ্রের নীচের অংশ পরশুদের হাতে ছিল। ভূমি ও জন-সংখ্যার দিক দিয়ে পুরু মদ্রদের থেকে কম ছিল না। পুরুদের নীচের মদ্রদের নীচু মদ্র বলা হ'ত। রোচনা মদ্রের ওপর-ওয়ালা ছিল।"—পুরুহুতের মামার গ্রামও মদ্রের ওপরকার অংশে অবস্থিত ছিল।

এ কথা শোনার পরে দু'জনেই আরও আত্মীয়তা অনুভব করতে লাগল।

পুরুহুত আবার কথা বলতে শুরু ক'রে বলল—"রোচনা! আমি কিন্তু আজ 'ডাঁড়ে' পৌঁছতে পারব না। তুমি একলা আসার সাহস কি করে করলে?"

"হ্যাঁ, আমি জানতাম যে, রাতে চিতাবাঘের হাত থেকে বাঁচা বড় মুস্কিল, কিন্তু ঠাকুর্দার জন্য খাবার নিয়ে আসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, পুরুহুত! ঠাকুর্দা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আজকাল ডাঁড়ে অনেক লোকই যায়। তাই আমি মনে করেছিলাম যে, রাস্তায় তাদের কারু না কারু সঙ্গে অবশ্যি দেখা হবে। আর আগুন জ্বালিয়ে নিলেই কাজ চলবে বলে ভেবেছিলাম।"

"রাস্তায় চলবার সময় আগুন জ্বালান সম্ভব ছিল না। রোচনা, তোমার নিকট অরণী আছে?"

"হ্যাঁ।"

"অরণী থাকলেও তা ঘসে আগুন জ্বালান সহজ কাজ ছিল না। সে যাক্ গিয়ে, আমার কাছে একটি পবিত্র অরণী আছে, যা আমাদের ঘরে পিতামহের সময় হ'তে চলে আসছে। এ অরণীটির প্রকট অগ্নি দিয়ে অনেক দেবপূজা হয়েছে। অগ্নি দেবতার মন্ত্র আমার মুখে আছে তাই এ তাড়াতাড়ি প্রজ্বলিত হয়।"

"পুরুহুত, এখন আমরা দু'জন। এখন আর চিতাবাঘ আমাদের কাছে আসতে সাহসী হবে না।"

"আর আমার কুকুরটাও সঙ্গে আছে, রোচনা!"

"ঝবরা!"

"হ্যাঁ, এই লাল শ্বক (সগ—কুকুর)।"

"ঝবরা—ঝবরা" ডাকতেই ঝবরা উঠে দাঁড়াল এবং প্রভুর হাত চাটতে লাগল।

রোচনাও "ঝবরা ঝবরা" বলে ডাকল। ঝবরা এসে তার পা শুঁকতে লাগল। রোচনা তার পিঠে হাত বুলাতে লাগল, ঝবরা তখন লেজ দুলিয়ে তার পায়ের ওপর বসে পড়ল।

পুরুহুত বলল—"ঝবরা খুব বুদ্ধিমান কুকুর, রোচনা!"

"আর শক্তিশালীও বটে।"

"হ্যাঁ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ কাঁরুকে ভয় করে না।"

ততক্ষণে ভেড়া ও গাধা দু'টো প্রচুর ঘাস খেয়েছে, আর ক্লান্তিও দূর হয়েছিল, তাই তরুণ পথিক দু'জন আবার চলতে আরম্ভ করল। ঝবরা তাদের পিছু-পিছু চললো। যদিও তাদের হাঁটা-পথ আঁকা-বাঁকা ছিল না, তবুও চড়াই খুব ছিল বেশী। তার জন্য তারা খালি পায় ধীরে ধীরে এগুতে পারছিল। পুরুহুত মাঝে-মাঝে মাটি থেকে লাল ষ্ট্রবেরি ফল ছিঁড়ে খাচ্ছিল এবং রোচনাকে দিচ্ছিল। তখনও ভাল ভাল ফল পাকার সময় ছিল না বলে পুরুহুত অনুযোগ করছিল। সন্ধ্যা অবধি এ রকম কথা-বার্তা বলতে বলতে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। সূর্য যখন অস্তমিতপ্রায় তখন তারা ঘন ঝোপের নীচু থেকে কুল-কুল করে প্রবাহিত একটি ঝরণা দেখতে পেল। তার পাশেই কিছুটা খোলা জায়গায় কিছু আধ পোড়া কাঠ, ছাই এবং ঘোড়ার বিষ্ঠা তারা দেখল। পুরুহুত নুয়ে ছাইগুলিকে পরিষ্কার ক'রে দেখল যে, তাতে তখনও আগুন আছে। সে খুব খুশী হয়ে বললো, "রোচনা! রাত কাটাবার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা সামনে আর পাওয়া যাবে না। পাশেই জল, প্রচুর ঘাস ও শুকনো কাঠ পড়ে আছে। এ ছাড়াও আজ সকালে এখান থেকে যে-সব পথিক চলে গেছে, তারা ছাই চাপা দিয়ে আগুনও রেখে গেছে।"

"হ্যাঁ, পুরুহুত! এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না; আজকের মত এখানেই থাকা যাক! সামনের ঝরণা পর্য্যন্ত পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

পুরুহুত তাড়াতাড়ি বসে নিজের পুঁটলীটি মাটির ওপরকার পাথরের ওপর রাখল এবং রোচনার পুঁটলীটি নামাল। দু'জনে মিলে গাধার পিঠের বোঝা নামাল এবং ওর কাঠী খুলে দিল। গাধাটা দু'-তিন বার ঘুরে ঘাস খেতে চলে গেল। ভেড়ার পিঠের বোঝা নামাতে কিছুটা দেরি হল, কারণ ভেড়াগুলিকে জোর ক'রে ধরে আনতে হয়েছিল। রোচনা মশক নিয়ে ঝরণার জল ভরতে গেল। পুরুহুত পাতা, ছোট ছোট কাঠ দিয়ে আগুন ধরাল এবং তাতে বড় কাঠ দিয়ে প্রচণ্ড আগুন তৈরী করল। যখন রোচনা [illegible] ফিরল, পুরুহুত তখন তামার হাঁড়ি সামনে রেখে একটি [illegible] ভাগের এক ভাগ ছুরি দিয়ে কাটতে ছিল। রোচনাকে

"কাল সন্ধ্যা নাগাত আমি ওপরে পৌঁছে যাব, রোচনা! তোমার গোষ্ঠ গ্রাম অনেক দূর নয় তো?"

"ভাঁড়ে আমি যেখানে যাই সেখান থেকে তিন ক্রোশ পূবে।"

"আর আমার ছ'ক্রোশ পূবে। তাহলে রোচনা, তোমার বাবার গোষ্ঠ গ্রাম আমার রাস্তার পাশেই পড়বে।"

"তাহলে বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। আমি তাই ভাবছিলাম যে, বাবার সঙ্গে তোমার কি ক'রে দেখা হ'তে পারে।"

"এক দিনই তো আর বাকী আছে, এর জন্ত এক-চতুর্থাংশ পায়ের মাংসই যথেষ্ট। এ 'বেহদের' (বন্ধ্যা গরুর) পিছু দিককার পায়ের মাংস, রোচনা!

"আমার নিকট ষাঁড়ের আধা পরিমাণ মাংস আছে, আজকাল মাংস বেশী দিন হলে পরে দুর্গন্ধ হয়ে যায়।"

"লবণ দিয়ে মেখে রাখলে কি রকম থাকে?

বেশ ভালই থাকে। আর আমার নিকট ছাতু আছে, পুরুহুত! মাংস এবং কিছুটা ছাতু মিলিয়ে নিলে ভাল সুপ তৈরী হ'বে আর শোবার সময় সুপ তৈরী পাওয়া যাবে।"

"আমি একা নয় রোচনা! সুপ তৈরী কর না, প্রচুর সময় লাগবে কিন্তু ততক্ষণ আমি পশুগুলিকে বেঁধে রাখি এবং তোমার সঙ্গে কথা বলতে থাকি।"

"পুরুহুত! বাবা আমার হাতে তৈরী সুপ অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং তামার এই হাঁড়ীটি।"

"হ্যাঁ, তামা খুব দুর্মূল্য, রোচনা! এই তামার হাঁড়ীটির পেছনে এক ঘোড়ার দাম খরচ হয়েছে, কিন্তু রাস্তায় এ ভাল থাকে।"

"পুরুহুত, তাহলে তোমার ঘরে প্রচুর পশু আছে কেমন?"

"তাছাড়া ধানও প্রচুর আছে, রোচনা। এ জন্মই একটি ঘোড়ার দামের সমান দামী এই তামার হাঁড়ি আমি কিনতে পেরেছি। আচ্ছা, এই নাও আমি মাংস কেটে দিচ্ছি। তুমি জল ও লবণ দিয়ে মাংস আগুনের ওপর চড়িয়ে দাও এবং আমি আরও কাঠ দিয়ে আগুন তৈরী করছি। আর কিছু ঘাস কেটে গাধা ও ঘোড়ার মাঝখানকার গামলাটায় দাও। তুমি জান না, বাছুরের মাংস যে রকম আমাদের কাছে খুব প্রিয়, চিতাবাঘের কাছেও গাধার মাংস সেই রকম প্রিয়। ঝবরা! তুইও ততক্ষণ এ চাটুতে থাক।"—একটি হাড়ের সঙ্গে কোন জায়গাতে কিছুটা মাংস ছিল, সে তা ঝবরার সামনে ছুঁড়ে দিল। ঝবরা লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাড়টাকে পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে তা ভাঙতে চেষ্টা শুরু করল।

পুরুহুত ওপরের কঞ্চুক এবং বেল্টটি অপসারিত করল। হাতহীন জামার নীচে প্রশস্ত বুক এবং বলিষ্ঠ বাহুগুলি যেন এই বিশ বছরের তরুণের শরীরে কতটা শক্তি আছে, তার পরিচয় দিচ্ছিল। কাজ করবার সময় পুরুহুতের প্রতিটি লোম পুলকিত হচ্ছিল। পুঁটলী থেকে কাস্তে বের করল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ঘাস কাটল। গাধাটাকে কানে ধরে নিয়ে এসে খোঁটা গেড়ে তার সঙ্গে বাঁধল এবং সামনে ঘাস ঢেলে দিল। ভেড়াকেও ওই ভাবে ঘাস দিল। কাজ শেষ করে পুরুহুতও আগুনের কাছে গিয়ে বসল। রোচনা [illegible] থেকে সিদ্ধ মাংসের টুকরোগুলোকে বের করে চামড়ার ওপর [illegible]। পুরুহুত পুঁটলী থেকে এক খণ্ড চামড়া বের ক'রে [illegible] দিল এবং কাঠের একটি সুন্দর পেয়ালা বের ক'রে বাইরে রাখার সময় একটি বাঁশীও পুঁটলীর ভেতর থেকে বাইরে মাটি[illegible] পড়ল। মনে হ'ল যেন কোন কোমল শিশু মাটিতে পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বাঁশীটাকে উঠিয়ে কাপড় দিয়ে পুঁছল এবং চু[illegible] করে ওটাকে পুঁটলীর ভেতর রেখে দিল। রোচনা দেখছিল, মাঝখানে বলে উঠল—"পুরুহুত! তুমি বাঁশী বাজাতে জান?"

"এই বাঁশী আমার অত্যন্ত প্রিয়, রোচনা! জেনে রেখ, বাঁশীর মধ্যে আমার প্রাণ নিহিত আছে।"

"আমাকে বাঁশী শুনাও পুরুহুত।"

"এখন কিংবা খাওয়ার পরে?"

"এখন একটু শুনাও।"

"আচ্ছা—" পুরুহুত বাঁশীটি ঠোঁটে লাগিয়ে যখন আটটি আ[illegible] তার ছিদ্রের ওপর সঞ্চালন করতে সুরু করল, তখন বিশাল গা[illegible] ছায়া থেকে নেমে আসা সন্ধ্যার দিগন্ত-প্রসারী স্তব্ধতার প্র[illegible] ধ্বনিকারী সে মধুর শব্দ চার দিকে যেন তার মায়াজাল বি[illegible] করল। রোচনা তার সত্তাকে ভুলে তন্ময় হ'য়ে তা শুনছি[illegible] পুরুহুত কোন উর্বশীর বিয়োগে ব্যাকুল পুরুরবার ব্যাথায় ভরা তার বাঁশীতে বাজাচ্ছিল। গান বন্ধ হ'লে পর রোচনার মনে [illegible] যে, তাকে হঠাৎ যেন স্বর্গ থেকে ধরে এনে একা ধরিত্রীর ওপর দেওয়া হয়েছে। সে আনন্দাশ্রু—ভরা চোখে বলল—"পুরু[illegible] তোমার বাঁশীর গান খুব মধুর—অত্যন্ত মধুর। আমি এ[illegible] বাঁশী আর কখন শুনিনি। কতই না প্রিয় এ লয়।"

"অন্য লোকও এ কথা বলে, রোচনা। কিন্তু আমি এর [illegible] বুঝতে পারি না। বাঁশীটা ঠোঁটে লাগতেই আমি সব কিছু [illegible] যাই। যদি এ বাঁশী আমার কাছে থাকে তবে দুনিয়াতে আর কিছুই চাই না।"

"আচ্ছা, এসো পুরুহুত। এর পর মাংস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"আর তুমি রোচনা? মা আসবার সময় আমাকে এ দ্রাক্ষ[illegible] দিয়েছিলেন। তার অল্পই এখন আছে কিন্তু মাংসের সঙ্গে ভালই লাগবে।"

"সুরা তোমার প্রিয় পুরু?"

"প্রিয় বলা যায় না, রোচনা! প্রিয় জিনিসে কখন আসে না, কিন্তু আমি তো চোখে সামান্য লালচে ভাব দেখা আর এক ঢোকও পান করতে পারি না।"

তিন ভাগের এক ভাগ মাংস কুকুরটাকে দিল। দু'[illegible] খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে দেরি হল। চার দিক ঘন অন্ধকা[illegible] হয়ে গেল। মোটা কাঠগুলি দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছিল। তা[illegible] আলোতে তার আশে-পাশের কিছুটা জায়গা ছাড়া আর কিছুই যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, কতগুলি শব্দ শোনা যাচ্ছিল,—তা পোক[illegible] অন্য কোন ক্ষুদ্র জন্তুর শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। কথা-বার্তা [illegible] মাঝে বাঁশী তান চলছিল। অবশেষে ছাতু দিয়ে সুপ তৈরী দু'জনই নিজ নিজ পেয়ালা হ'তে গরম গরম সুপ পান [illegible] রাত অনেক হওয়ায় শোবার প্রস্তাব হ'ল। রোচনা বিছানা তৈরী ক'রে নিজের কাপড় ছাড়তে লাগল। পুরুহুত আরও কাঠ সাজিয়ে দিল। পশুগুলির সামনে ঘাস [illegible] তার পর বনের দেবতাদের প্রার্থনা করে কাপড় বদলিয়ে শুয়ে [illegible]

পরের দিন ভোরে উঠে তারা দু'জনই অনুভব করছিল [illegible]

রাতেই তারা যেন সহোদর হয়ে গেছে। রোচনা উঠবার পরে পুরুহুত আর নিজকে সামলাতে না পেরে বললো—"আমার হৃদয় তোমার মুখচুম্বন করতে চায়, রোচনা স্বসর (বোন)!"

"আর আমারও তাই ইচ্ছা হয় পুরু! এ পৃথিবীতে আমরা ভাই-বোন পেয়েছি।"

পুরুহুত রোচনার এলোমেলো চুলগুলিকে সামলিয়ে পিঠের ওপর রাখতে রাখতে তার দু'গালেতে চুমু খেল। দু'জনকার মুখই প্রসন্ন এবং চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। মুখ ধুয়ে তাঁরা সামান্য কিছুটা ছাতু ও শুকনো মাংস খেয়ে পশুগুলির পিঠে বোঝা চাপিয়ে রওনা হ'ল। দু'-তিন জায়গায় মাঝে মাঝে তারা বসল কিন্তু কথা-বার্তায় সময় এত তাড়াতাড়ি কেটে গেল যে, তাদের মনেই ছিল না যে, কখন ডাঁড়ে পৌছবে আর কখনই বা মদ্রবাবার নিকট যাবে।

২

এ ডাঁড়ের পাশে মদ্রদের একটি ছোট রকম গ্রাম গড়ে উঠেছিল। তার প্রত্যেকটি ঘর তাঁবু কিংবা তৃণের তৈরী ছিল। যেখানে নীচের দিক ঢালু কিংবা খাড়া পাহাড়ী ভূমির ওপর দেবদারুর ঘন নিবিড় জঙ্গলের পর জঙ্গলই দেখতে পাওয়া যেত, সেখানে এ ডাঁড়ের ওপর গাছের কোন নাম-গন্ধ ছিল না। জমি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার ওপর সবুজ ঘাসের মোটা গালিচা বিছান ছিল। এ সবুজ মাঠের কোথাও ভেড়া, কোথাও গরু এবং কোথাও বা ঘোড়া চরছিল এবং মাঝে-মাঝে কোথাও ছোট ছোট বাছুর খেলা করছিল। এ জায়গা দেখেই মদ্রবাবা বলত, "মানুষকে এক জায়গায় বেঁধে রাখবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।" এ মাসেই মদ্র বাবার তাঁবু এখানে। যখন ঘাস কমে যাবে তখন অন্যত্র চলে যাবে। দুধ, দই, মাখন এবং মাংস এখানে প্রচুর। তাঁবুর ভিতরটা এ সব জিনিসেই ভর্তি। প্রতি পনর-বিশ দিন পরে গ্রাম থেকে লোক আসে এবং এখান থেকে মাখন কিংবা মাংস নিয়ে যায়। শীতকালে এ ডাঁড়ে বরফ পাত হয়। বাবা চলে যাওয়ার পরেও তারা এখানে থাকে কিন্তু পশু বরফ খেয়ে তো আর থাকতে পারে না। তাই আঁকা-বাঁকা পথে তারা অল্প নীচে জঙ্গল প্রদেশে চলে আসে এবং পশুগুলি নীচের গ্রামে চলে যায়। বাবার কাছে গ্রামে যাওয়ার নাম করলে মারতে তাড়া করেন।

তখনও দিন ছিল, যখন দু' পথিক বাবার তাঁবুতে গিয়ে পৌছলে। তার পর জিনিস-পত্র নামিয়ে রেখে বাবা হাসতে হাসতে ঘোটকীর দুধের কাঠের সুরাপাত্র (কুমিস) এবং পেয়ালা সামনে রাখলেন। তার পর তিন-চার পেয়ালা পান করতেই রাস্তা চলার সমস্ত ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল। সন্ধ্যায় বাছুর এবং ঘোড়াগুলিকে নিয়ে রোচনার ভাই, বোন ও গ্রামের অন্য তরুণ রাখালরাও এসে পড়ল। এদিকে রোচনা বাবার কাছে পুরুহুতের বাঁশীর গুণ ব্যাখা করছিল। বাবা যেমনি মজাদার জীব, তাতে পুরুহুতকে কি আর ছাড়ে, তার ওপর সে এবং গোষ্ঠীর সমস্ত লোক তরুণের বাঁশী অত্যন্ত পছন্দ করত। রাতে যখন নাচ হ'ল তখন পুরুহুত সেখানে নিজের কেরামতি দেখাল।

ভোরের বেলা পুরুহুত চলে যাওয়ার প্রস্তাব করল, কিন্তু বাবা এতো তাড়াতাড়ি কেন যেতে দেবেন? মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাবা তার নিজের কথা শুরু করলেন এবং তখন পুঁটলীর পাশে তামার পাতীল দেখে বাবা বললেন—"এ তামা এবং ক্ষেত দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যে দিন হতে এ সব জিনিস বক্ষুর তীরে এসেছে সে দিন থেকে চার দিকে পাপ, অধর্ম বেড়ে গিয়েছে, দেবতাও অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে মারামারি কাটাকাটির মাত্রাও বেড়ে গিয়েছে।"

"তবে কি পূর্বে এ সব জিনিস ছিল না বাবা?"—পুরুহুত প্রশ্ন করল।

"না বৎস! এ সব জিনিস আমার ছোটবেলা অল্প অল্প এসেছিল। আমার ঠাকুরদা তো এর নাম পর্যন্ত শোনেনি। তখন পাথর, হাড়, শিং এবং কাঠ দিয়েই সমস্ত হাতিয়ার হ'ত।"

"তা হ'লে কাঠ কেমন ক'রে কাটত বাবা?"

"কাটত পাথরের কুড়ুল দিয়ে।"

"তাতে তো প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হ'ত আর বোধ হয় এতো ভাল কাটাও হ'ত না?"

"এতো তাড়াতাড়িতে সব কাজই পণ্ড ক'রে দিয়েছে। এখন দু'মাসের খাবার এবং আর্ধেক জীবন পর্যন্ত চড়বার উপযোগী একটা ঘোড়া দিয়ে একখানা তামার কুড়ুল নিচ্ছ আর জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে উজাড় করছ কিংবা গ্রামের পর গ্রাম নষ্ট ক'রে দিচ্ছ। কিন্তু গ্রাম গাছের ন্যায় রিক্তহস্ত নয়, তার কাছেও ও-রকম ধারাল কুড়ুল আছে। এ তামার কুড়ুল যুদ্ধকে আরও নিষ্ঠুরতর ক'রে দিয়েছে। এর আঘাতে বিষ উৎপন্ন হয়। আগে ধনুকের ফলক পাথর দিয়ে তৈরী হ'ত—তা এতো বেশী ধারাল ছিল না যে তা ঠিক কিন্তু নিপুণ হাতে তা বেশী কার্যকরী হ'ত। এখন তামার ফলক দিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুও বাঘ শিকার করতে চায়।"

"বাবা! আমি তোমার একটি কথার সঙ্গে একমত,—মানুষকে এক জায়গায় বন্ধ ক'রে রাখবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।"

"হ্যাঁ বৎস! প্রথম দিনকার পায়খানার ওপর যদি প্রতিদিন পায়খানা করতে হয় তবে তা কি খুব খারাপ মনে হয় না? এখন আমার তাঁবুর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। পশু এখানকার ঘাস যখন খেয়ে ফেলবে, আমরা তখন এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব। সেখানে থাকবে প্রচুর নতুন সবুজ তৃণ, সেখানকার মাটি, জল, এবং বাতাস হবে বেশী শুদ্ধ।"

"হ্যাঁ, বাবা! আমিও ও-রকম জায়গা পছন্দ করি। ও-রকম জায়গায়ই আমার বাঁশীর সুরলী আওয়াজ বেশী হয়।"

"ঠিক বলছ বৎস! আগে আমি এ তাঁবুগুলিকেই গ্রাম বলতাম এবং এ তাঁবুগুলি একই জায়গায় এক বছর তো দূরের কথা দু'-তিন মাসও থাকত না। কিন্তু আজকালকার গ্রাম পুত্র-পৌত্র শত পুরুষের জন্য তৈরী হয়। পাথর, কাঠ, মাটি দ্বারা প্রাচীর নির্মিত হয়, ওর মধ্যে বাতাস কি ক'রে প্রবেশ করবে? এখন বলবার জন্য আগুন ও বায়ুকে দেবতা বলা হয় কিন্তু এখন তার জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন সম্মান নেই। তার জন্য আজকাল কত নতুন নতুন রোগ হচ্ছে। হে বন্ধু! হে ন্যায় সত্য! হে অগ্নি! তুমি যে মানুষের ওপর এ রাগ করছ তা ঠিকই করছ।"

"কিন্তু বাবা! তামার এ কুড়ুল, খড়্গ, ও শল্য [illegible]

ক'রে আমরা কি করে বেঁচে থাকব ? এ সব পরিত্যাগ করলে শত্রু তো আমাদের এক দিনেই খেয়ে ফেলবে !"

"আমি তা স্বীকার করি বৎস ! ছ'বছরের খাবার অর্ধ জীবন পর্যন্ত চড়বার উপযোগী ঘোড়া খুশীতে বেচে দিয়ে মানুষ তামার খড়্গ কেনেনি। নীচের মদ্ররা এবং পশু'রা বক্ষু মাতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছে। বক্ষু নদী কত দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয় আমি তা জানি না, কেউ তা জানে না। যে সব লোক মিথ্যা কথা বলে তারা বলে, পৃথিবীতে যে অসীম জলরাশি আছে তা সেখানে গিয়েই পড়ে। হ্যাঁ, তাই মনে হয় যে, মদ্র এবং পশু'দের ভূমি শেষ হলেই বক্ষু নদী পাহাড় ছেড়ে মাঠ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর পূর্বে বর্ণিত মিথ্যাবাদী দেব-শত্রুদেরই সে ভূমি। লোকে বলে তথায় বড় বড় পাওয়ালা পাহাড়ের মত জন্তু বাস করে। ওগুলিকে কি বলে বৎস ? এখন আমার স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।"

"উট্র বলে, বাবা ! কিন্তু ওগুলি পাহাড়ের মত বড় হয় না। এক দিন এক জন অচলমান মদ্র উটের বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। সে বলছিল ওটা ছয় মাসের বাচ্চা। সেটা আমার ঘোড়ার সমান ছিল।"

"হ্যাঁ, বৎস ! যে বিদেশ ঘুরে আসে সে বেশী মিথ্যা বলতে শেখে। বল ত—কি বলে ?"

"উট।"

"হ্যাঁ, শুনি যে, উটের গলা না কি এতো লম্বা হয় যে, উট বক্ষু নদীর এপার দাঁড়িয়ে অপর পারের ঘাস খেতে পারে। এও মিথ্যা কেমন, বৎস ?"

"হ্যাঁ, বাবা ! ওই উটের বাচ্চাটার হয়ত গলাটা নিশ্চয়ই কিছুটা বড় ছিল কিন্তু ঘাস খাওয়াটা একেবারেই মিথ্যা।"

"এ সব মিথ্যাবাদী মদ্র এবং পশু'রা অয়ঃ কুঠার (লোহার কুড়ুল) অয়র খড়্গ, রোগ চার দিকে প্রচার করেছে। পশু'রা এ অস্ত্রগুলি নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল। এ হল পিতার সময়কার কথা। তখন আমাদের লোক দু'-দু'টা ঘোড়ার বিনিময়ে একখানা লোহার কুড়ুল নীচের মদ্রদের নিকট থেকে কিনেছিল।"

"লোহার কুড়ুলের কাছে পাথরের কুড়ুল কোন কাজেই আসত না, কেমন বাবা ?"

"হ্যাঁ, বৎস ! তার জন্যই বাধ্য হ'য়ে তামার হাতিয়ার নিতে হ'ল—আর যখন নীচের মদ্ররা পুরুদের ওপর আক্রমণ করত, তখন তোমাদের লোক-জন আমাদের মদ্রদের নিকট থেকে তামার হাতিয়ার কিনত। উত্তর মদ্র এবং পুরুদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি, বৎস ! কিন্তু পশু' এবং নীচের মদ্ররা সর্বদাই দস্যুতা ক'রে এসেছে। সর্বদাই পুরানো ধর্ম ছেড়ে নতুনের কথা বলে এসেছে। আর তার জন্যই আমাদের লোকরা নিজ প্রাণ বাঁচাবার জন্য ও-রকম করতে বাধ্য হয়েছে। যত দিন পর্যন্ত মদ্র এবং পশু'রা তামার হাতিয়ার পরিত্যাগ না করত, তত দিন পর্যন্ত আমরা ওপর-ওয়ালারাও তাদের ছেড়ে দেওয়াকে আত্মহত্যার সামিল মনে করতাম। কিন্তু তামার এতো বেশী প্রসার যে খারাপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, বৎস ! এ পাপের প্রসার এ দু'টা জনই (গোষ্ঠী) করছে। এদের কখনও দেবতার আশীর্বাদ জুটবে না। ঘোর অন্ধকারীরা পাতালে গিয়েছে, এরাও নিশ্চয়ই পাতালে যাবে। তাদেরই দেখাদেখি তাদেরই

জন্যে আমাদের এ মাটি ও পাথরের গ্রামের পত্তন হ'ল। আ[illegible] এ প্রকার তাঁবুওয়ালা গ্রাম—যেগুলি আজ এখানে কাল ওখা[illegible] বক্ষুর কাছে ছিল। কিন্তু এ মদ্ররা এবং এ পশু'রা ওই প্রথা [illegible] দিয়েছে। কাকে দেখে ধরিত্রী মায়ের বুক বিদীর্ণ করে [illegible] পাপ এরা করেছে, যা কেউ কখনও করেনি। ধরিত্রীকে মা[illegible] হয়, বৎস ?"

"হ্যাঁ, বাবা ! ধরিত্রীকে মা বলা হয়, দেবী বলা হয়—তার[illegible] করা হয়।"

"আর এ পাপীরা কি না ধরিত্রী মায়ের বুক নিজের[illegible] বিদীর্ণ করেছে এবং আরও যে কি করেছে, তা আমার মনে [illegible] না, আমার স্মৃতিশক্তি অকেজো হয়ে গেছে, বৎস !"

"কৃষি, চাষ বাস।"

"হ্যাঁ, কৃষি প্রচলন করেছে। গম, ধান বুনেছে, যা[illegible] বুনেছে তা আজ পর্যন্ত কখন শোনা যায়নি। আমাদের[illegible] পুরুষরাও কখন ধরিত্রী দেবীর বক্ষ বিদীর্ণ করেননি, দেবীর অ[illegible] করেননি। ধরিত্রী মাতা আমাদের পশুদের জন্য ঘাস [illegible] তার জঙ্গলে নানা প্রকার মিষ্টি ফল ছিল, আমরা খেয়ে[illegible] করতে পারতাম না। কিন্তু মদ্রদের পাপে এবং তাদের দে[illegible] আমাদের লোকের কৃত পাপের নিমিত্ত ওই অফুরন্ত ঘ[illegible] কোথায় গেল ? এখন আর আগের মত সে মোটা গা[illegible] কোথায়—যার একটির মাংসেই সমস্ত মদ্র-পরিবারের খাওয়া হ'ত। এখন আর সে গরু, সে ঘোড়া এবং ভেড়াও নেই। হরিণ এবং ভল্লুকও আর এখন সে রকম বড় হয় না। আর ততো দিন বাঁচে না। এ সবই ধরিত্রী দেবীর অভি[illegible] জন্যই, বৎস ! তা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

"বাবা ! আপনার বয়স কত ?"

"একশ' বছরের ওপর বৎস ! তখন আমাদের গ্রামে দশটি তাঁবু ছিল আর এখন তো মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী খানি ঘর। যখন ক্ষেত ছিল না, তখন আমরা যেখানে যেখানে থাকতাম, সেটাই ছিল আমাদের গ্রাম। তার[illegible] ক্ষেত হ'ল তখন আবার ফসল রক্ষা করা প্রয়োজ[illegible] পড়ল, অন্যথায় পশু-পাখী পাছে তা খেয়ে ফেলে। [illegible] যেন মানুষকে বন্দী ক'রে ফেলল। কিন্তু বৎস ! মানু[illegible] জায়গায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। যা[illegible] পর্যন্ত মানুষের জন্য তৈরী করেননি, তাও এ মদ্র এবং পশু' করে দেখাল।"

"কিন্তু বাবা ! আমরা ইচ্ছা করলে কি আর এ চাষ-বা[illegible] দিতে পারি ?—এখন আমাদের আহার্যের অর্ধেকই নি[illegible] চালের ওপর।"

"হ্যাঁ, তা আমি স্বীকার করি বৎস ! কিন্তু চাল [illegible] পূর্বপুরুষগণ খেত না। এখান হ'তে পঁচিশ ক্রোশ দক্ষি[illegible] বন আছে। সেখানে আপনা থেকেই শস্য রোপিত হয়[illegible] হ'তেই শস্য উৎপন্ন হয় এবং আপনা থেকেই তা ঝরে পড়[illegible] তা খেলে দুধ বেশী দেয়, ঘোড়া তা খেয়ে বলিষ্ঠ হয়। প্র[illegible] আমাদের পশু সেখানে চরতে যায়। ধরিত্রী মাতা ধান[illegible] খাবার জন্য সৃষ্টি করেননি—বনের এ গমগুলির দানা

আমাদের জমির গমের চেয়ে ছোট। ধরিত্রী দেবী ওগুলি পশুর খাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমার ভয় হচ্ছে যে, কোথাও আবার বনের শস্য নষ্ট না হয়। বৎস! আমাদের খাবার জন্য এ সব গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল আছে। বনে ভালুক, হরিণ, শূকর, কত রকমের শিকার এবং দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার ফল আছে। এ সবই ধরিত্রী মাতা আমাদের সানন্দে দেবেন। কিন্তু মদ্ররাই খারাপ, এরা পশু'দের পুরানো নিয়ম ভেঙ্গে নতুন নিয়ম তৈরী করেছে, যার জন্য দেবতার অভিশাপ মানুষের ওপর এসে পড়েছে। এখন বৎস! জানি না, বক্ষু-তীরবাসীদের ভাগ্যে কত বিপদ আছে। আমি তো পঁচিশ বছর হ'ল 'ডাঁড' ছেড়ে দিয়েছি, গ্রামে তার পর আর কখনও যাইনি। শীতের সময় অল্প নীচে একটি কুটীরে চলে যাই। গ্রামে কি আর যাব? এখন তো সমস্ত লোকই প্রাচীন মানুষের নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে-চুরে ফেলার পক্ষপাতী। প্রাচীন মানুষের মুখ-নিঃসৃত বাণী আমিও এতো দিন পর্যন্ত প্রচার ক'রে এসেছি। এখনও যাঁরা সে সব কথা শিখতে চায় তারা আমার নিকটে আসে। কিন্তু সে সব কথা না মানার লোকের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, মদ্র ও পশু'দের জমি দিয়েও না কি পেট ভরছে না। এখন তারা বক্ষু-বাসীদের আহার্য ও পরিধান বহন ক'রে কোথায় দিয়ে আসছে এবং তার পরিবর্ত্তে এই দেখ একটি ঘোড়া দিয়ে কেনা একটি হাঁড়ি। অনাহারে মরতে শুরু করলে কি এ হাঁড়িতে পেট ভরবে? এখন তুমি দেখবে যে, পুরুদের পেটে অন্ন ও পরনে কাপড় নেই, কিন্তু তার জায়গায় দেখতে পাবে ওই হাঁড়িগুলি।"

"বাবা! এ ছাড়াও একটি কথা শুনছি যে নীচের মদ্র-স্ত্রীগণ না কি কানে ও গলায় হলদে এবং সাদা রঙের অলঙ্কার পরতে শুরু করছে। শুধু মাত্র এক কানের অলঙ্কারের দামই না কি একটি ঘোড়ার মূল্যের সমান। বাবা! ওকে তামা বলে না, সোনা বলে আর সাদা রঙের জিনিসকে রূপো বলে।"

"এ পাপিষ্ঠ লোকগুলোকে কেউ মেরে ফেলে না কেন? ওরা সমস্ত বক্ষু-জনমণ্ডলীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন ক'রে তবে ছাড়বে। আমাদের খাবার ও পরবার যা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাও ওরা ছেড়ে দেবে না। আমাদের মেয়েরাও ওদের দেখাদেখি দু'টো ঘোড়ার সমান মূল্যের অলঙ্কার পরবে। হে কৃপাময় অগ্নিদেবতা! আমাকে আর এ মানুষের মাঝে অধিক দিন রেখ না। পিতৃপুরুষদের যেখানে আশ্রয় দিয়েছ আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।"

"আর একটি বড় অপরাধ বাবা! মদ্র এবং পশু'রা কোত্থেকে যেন মানুষ ধরে নিয়ে এসেছে—তাদের দিয়ে তামার খড়্গ, তামার কুড়ুল তৈরী করাচ্ছে। তাঁরা খুব চতুর শিল্পী। কিন্তু মদ্র, পশু'রা তাঁদের পশুর মত যখন ইচ্ছে রাখে এবং যখন ইচ্ছে করে বেচে দেয়। কৃষি-কাজ, কম্বল বুনোনোর কাজ এবং আরও অন্যান্য কাজ ওই শুক্ল বন্দী লোকগুলি দিয়ে করায়—ওদের তারা দাস বলে।" মানুষ কেনা-বেচা! আমি তো খাবার ও পরবার জিনিষও বেচা অপরাধ বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এ আদেশ কখনও ছিল না যে, মদ্ররা কলহে এতো নীচে নেমে যাক্। যখন আঙুল পচতে শুরু করে তখন তার ওষুধ হ'ল আঙুল কেটে ফেলা, কারণ তা না হলে সমস্ত শরীর পচে যাবে। এ মদ্র-পশু'দের বক্ষু-তীরে থাকতে দেওয়া পাপ, বৎস! আমি আর এ-সব দেখবার জন্য বেশী দিন থাকব না।"

মদ্র বাবার গল্প অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হ'ত কিন্তু পুরুহূত এও জানতো যে, যে-সব অস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে তা পরিত্যাগ ক'রে মানুষ পশু-শত্রুর মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না।

তৃতীয় দিন যখন সে বিদায় নিচ্ছিল তখন বুড়ো তার কপালে ও ভ্রূতে চুমু খেল এবং আশীর্বাদ করলো। রোচনা তাকে পৌঁছিয়ে দিতে অনেক দূর পর্যন্ত গেল এবং পরস্পর বিদায় নেবার কালে একে অন্যের গাল অশ্রুজলে ভিজিয়ে ফেলল।

৩

পঁচিশ বছর পরে মদ্র বাবার কথাই সত্য হ'ল—নীচের মদ্র এবং পশু'রা দিনের পর দিন ওপরকার পুরু ও মদ্রদের দাবিয়ে এসেছে। যেখানে ওই জনগুলির কাপড়, কম্বল প্রস্তুত করবার স্বতন্ত্র স্ত্রী ও পুরুষ থাকত, তাদের খাওয়া-পরার খরচ বেশী পড়ত। যার জন্য তাদের হাতের প্রস্তুত দ্রব্য ভাল হওয়া সত্ত্বেও বেশী খরচা পড়ত। আর নীচের মদ্র এবং পশু'দের নিকটও দাস ছিল, কিন্তু তাদের প্রস্তুত দ্রব্য ততো ভাল না হলেও খরচ কম পড়ত। যদি কখনও সেখানে ব্যবসায়ী এ-সব জিনিষ বিদেশে উট কিংবা ঘোড়ায় ক'রে নিয়ে যেত তাহলে তা প্রচুর বিক্রী হ'ত। ওপরকার জনেরও এখন তামার জিনিস অধিক পরিমাণে প্রয়োজন ছিল—এক দিকে তো ওগুলি প্রতি বছর কিছু-না-কিছু সস্তা হ'য়ে যাচ্ছিল, অন্য দিকে আবার মাটি ও কাঠের জিনিসের চেয়ে ওগুলি স্থায়ী হ'ত। যেখানে পঁচিশ বছর পূর্ব্বে তামার পাতিল কোন-না-কোন ঘরে দেখা যেত, আর এখন সেখানে দু'-একটি ঘরেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। সোনা-রূপোরও প্রচলন বেড়েছে। ও-সব কারণের জন্যই এ-সব জনগুলির খাদ্য, কম্বল, চামড়া, ঘোড়া কিংবা গরু বিক্রী করতে হ'ত, যার জন্য তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। ওপরকার জনের কিছু লোক সোজাসুজি ব্যবসায় করতে চেষ্টা করল, কারণ তাদের মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে, তাদের নীচুকার প্রতিবাসীরা ঠকাচ্ছে। কিন্তু বক্ষুর নিম্ন দিকে যাবার পথ ওদের জন্মভূমির ভেতর দিয়ে ছিল। তাই মদ্ররা পথ খুলে দিতে অস্বীকার করল। এ নিয়ে অনেক বারই ছোট-খাটো ঝগড়া হয়েছে। উত্তরের মদ্র এবং পুরুরা বিদেশে যাবার জন্য কত বার ভিন্ন রাস্তা তৈরী করতে চেয়েছিল কিন্তু কার্যতঃ তা আর সফল হয়নি।

নীচুকার ও ওপরকার জনগুলির মধ্যে এ ঝগড়ার বিশেষ একটি কারণ হ'ল যে, নীচুকার জনগুলি নিজেদের ভেতর পরস্পর মিল বজায় রাখতে পারত না। কিন্তু ওপরস্থিত জনগুলি পরস্পর মিলে-মিশে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করতে পারত। পুরু এ-সব [illegible] নিজের বীরত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিজেদের জন[illegible] প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ল। পুরু জনও তিরিশ বছরের [illegible] নিজেদের মহাপিতার পদে নির্বাচিত ক'রে নিয়েছিল [illegible]

পুরুহূত স্পষ্ট দেখল যে, যদি মদ্রদের ব্যবসায়ের [illegible] অপরাধের কোন প্রতিকার করা না যায়, তাহ[illegible] আর কোন আশা নেই। তামার প্রচলন কমা[illegible]

তার ...ন বেড়েই চলল ; শুধু যে অস্ত্র, থালা-বাসন এবং অলঙ্কারের জন্যই বেড়ে যাচ্ছে তা নয়। মানুষ আগে যেখানে কোন কিছু বিনিময় করবার জন্য অনেক মণ মাংস কিংবা কম্বল নিত এখন সে স্থানে তারা তামার তরবারি কিংবা ছুরি নিতে বেশী পছন্দ করে। পুরুহুত নিজেদের জনের সভাতে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কারণস্বরূপ নীচুকার জনের ব্যবসায়ীদের অন্যায় বর্ণনা করল। সকলেই একমত হ'ল যে, পথের কাঁটা মদ্রদের সরাতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তারাই মদ্রদের হাতের কাঠ-পুতুল হ'য়ে পড়বে। সম্ভবত সামনে এমন দিন আসছে যখন কি না তাদের মদ্রদের দাস হয়ে বাস করতে হবে। পুরু ও উত্তর-মদ্রদের মহাপিতার যুক্ত সভায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল। দু'টি জনই পরস্পর মিলিত ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য পুরুহুতকে নিজেদের সম্মিলিত সেনাপতির পদে নির্বাচিত করল এবং তাকে ইন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করল। এ ভাবে পুরুহুত প্রথম ইন্দ্র হ'ল। পুরুহুত বিশেষ উৎসাহের সাথে সৈন্য তৈরী শুরু করল। ইন্দ্র উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পরেই পুরুহুত অস্ত্র নির্মাণের জন্য দু'জন লোহকার দাসকে নিয়োগ করল। উপরকার জনগুলি তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত, তাই তাদের সাহায্যে সে তাম্রশিল্পের কাজে দক্ষতা অর্জন করতে কৃতকার্য হ'ল। এ ভাবে মদ্র ও পুরুদের মধ্যে অনেক শিল্পী গড়ে উঠলো। নিজেদের তাম্র-শিল্পী দাসকে ফেরত দেবার দাবী শুধু মুখেই করল না—অস্ত্রের সাহায্য নিতেও উদ্যত হল। নীচুকার জনগুলির বেশে-বুদ্ধির জন্য কখনও কখনও যুদ্ধ করবার সাহস তাদের মধ্যে এসে যেত। যুদ্ধে জিততে না পেরে তারা তামা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিল কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে, এতে তাদেরই ব্যবসায় নষ্ট হ'য়ে যাবে। মদ্র ও পুরুগণ পূর্বেকার কেনা হাঁড়ি কিংবা অন্য বাসন থেকে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী ক'রে এক-পুরুষ পর্য্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার মত অবস্থায় ছিল।

শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র এবং উত্তর জনই মদ্র,—পণ্ডদের মেরে ফেলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। পুরুহুত নিজেও কর্মকারের কাজ শিখে নিয়েছিল। তার উপদেশ অনুযায়ী খড়্গ, ভল্ল ও ধনুকের শরের কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল। সে শক্তিশালী চতুর যোদ্ধার আঘাতের হাত থেকে বক্ষ রক্ষা করবার জন্য প্রচুর তামার বক্ষত্রাণ নির্মাণ করল।

ইন্দ্র প্রথমে শুধু মাত্র একটি শত্রুদলকে সায়েস্তা করা ঠিক করল এবং তার জন্য সে পণ্ডদের বেছে নিল। শীতকালে পণ্ড'রা অধিক সংখ্যায় বিদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য চলে যেত, তাই ইন্দ্র এ সময়কেই সব চেয়ে সুযোগ মনে করল। সে উত্তর-মদ্র এবং পুরু যোদ্ধাদের যুদ্ধ-কৌশল শিখাল। যদিও পণ্ড এবং মদ্রদের শত্রুতা বহু কাল থেকে চলে এসেছিল কিন্তু তাই বলে তারা কি ক'রে জানবে যে, হঠাৎ গুপ্তঘাতকের মত শত্রু তাদের ওপর এমনি ভাবে আক্রমণ করবে আর সে আক্রমণের ফলে বক্ষু উপত্যকা থেকে তাদের নাম পর্যন্ত চিরদিনের জন্য লুপ্ত হ'য়ে যাবে? ইন্দ্র নিজে অধিনায়কত্বে বাছাই-করা মদ্র ও পুরু যোদ্ধাদের সঙ্গে ক'রে আক্রমণ করল। যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝতে আর দেরি হ'ল না এবং বুঝতে পেরেই পণ্ড'রা জীবন পণ ক'রে অসীম বীরত্বের সঙ্গে ... করল। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তারা সমস্ত পণ্ড গ্রামগুলি একত্র করতে পারল না। ইন্দ্রের সৈন্যরা পণ্ডদের একটির পর একটি গ্রাম দখল ক'রে হাজার হাজার পণ্ডদের বিনাশ করল—কাউকে তারা বন্দী করল না। অন্য দিকে নীচের মদ্ররা যখন বিপদে পড়েছে বুঝতে পারল তখন আর কিছু করবার অবকাশ তাদের ... না। শেষের দিকে যখন কয়েকটি গ্রাম মাত্র বাকী তখন পু... সেখানে অসংখ্য যোদ্ধা রেখে ইন্দ্র নিজেই কুরুদের দেশের ... ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীচুকার মদ্ররা তাদের প্রতি-আক্রমণ ... কিন্তু তাদেরও পণ্ডদের মত একই দশা হল। নীচুকার এবং পণ্ড—জনগুলির যে-সব মেয়ে, পুরুষ, বালক-বা... তরুণ-তরুণী এবং বৃদ্ধ তাদের হাতে বন্দী হ'ল তাদেরও তারা ... রাখল না, স্ত্রীলোকদের তারা তাদের নিজেদের স্ত্রীলোকের সামিল ক'রে নিল। বন্দী ক্রীতদাসের মধ্যে যারা নিজেদের ফিরে যেতে চাইল তারা তাদের ফিরিয়ে দিল। নীচুকার মদ্র ... পণ্ডদের কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ বাঁচিয়ে কোনক্রমে বক্ষু উপ... ছেড়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেল। তাদেরই বংশধররা পরে পণ্ড (পার্থিয়ান) এবং মদ্র (মিডিয়ন) নামে প্রসিদ্ধ ... তাদের পূর্বপুরুষদের ওপর ইন্দ্রের নেতৃত্বে যে অত্যাচার হয়েছিল, তা ভুলতে পারল না। এ জন্যই ইরাণীরা ইন্দ্রকে তাদের স... বড় শত্রু মনে করে। সমস্ত বক্ষু উপত্যকা উত্তর-মদ্র এবং ... অধিকারে এলো, তারা দুটি 'জন' আপোষে নিজেদের মধ্যে বক্ষু তীর এবং বাঁ তীর ভাগ করে নিল।

বক্ষুবাসীরা নতুন নিয়ম-পদ্ধতি হটিয়ে দিয়ে পুরানো রীতি আবার চালু করাবার জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু তারা তামা ছে... পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারল না। তামার জ... পাহাড়ী উপত্যকা ছাড়া তাদের বিদেশে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থা... প্রয়োজন ছিল।

হ্যাঁ, দাসত্বকে তাঁরা কখনও স্বীকার করেনি এব... বাইরের লোকদের বক্ষু উপত্যকায় স্থায়িভাবে বসবাস অধিকার ছেড়ে দিত না। শতাব্দীর পর যখন মানুষ ভুলতে শুরু করল কিংবা সে (ইন্দ্র) দেবতার মধ্যে গ... তখন বংশ এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের সকলের ভর... করতে বক্ষু আর সক্ষম হ'ল না। তাই তার অনেক সন্তান ... দিকে চলে যেতে বাধ্য হল। তখন হ'তে একটি 'জন' অ... 'জন' থেকে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করত। মহাপিতার প্রাধা... পরেও তাঁকে সমস্ত জনগুলির ওপর নির্ভর করতে হত বক্ষু-তীরের শেষ যুদ্ধে কয়েকটি জন এক জন সেনাপ... ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছিল।*

অনুবাদ—সুধীর দাস ও মহাদেবপ্রসা...

---

* আজ হ'তে একশ' পুরুষ পূর্বে আর্যভাষাভাষী এ... কাহিনী। তখনও কৃষি এবং তামার প্রচলন আরম্ভ হয়নি

সূর্য্যমুখী —সুব্রত রা

পুষ্পাহরণ —শিশির চৌধুরী

জ
ল
যা
ন

—এস, ব্রহ্ম

সন্ধানী —সুবোধ পাল
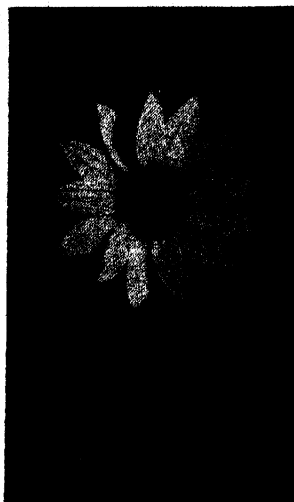
পাহারা —পূরবী ঘোষ
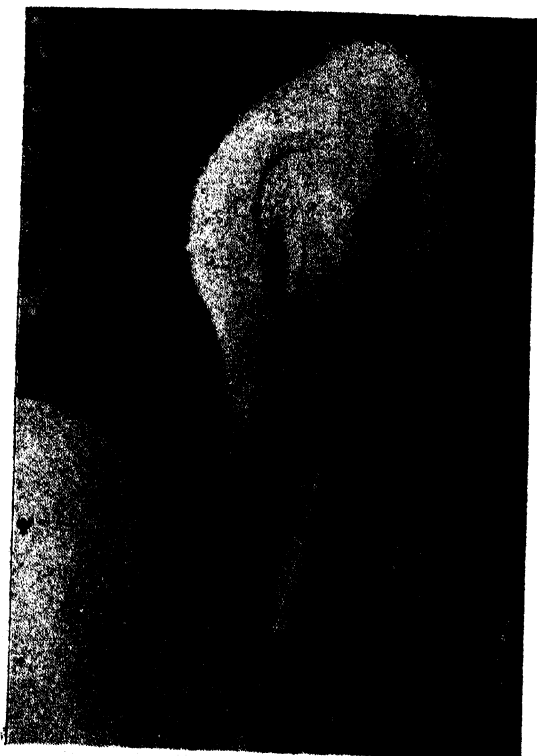
বকাসুর —হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্য

—সত্যব্রত রায়
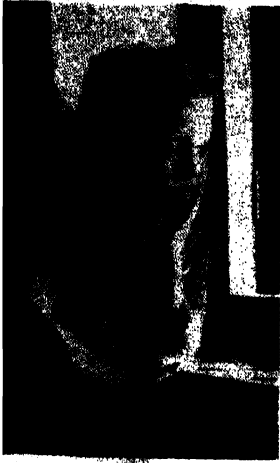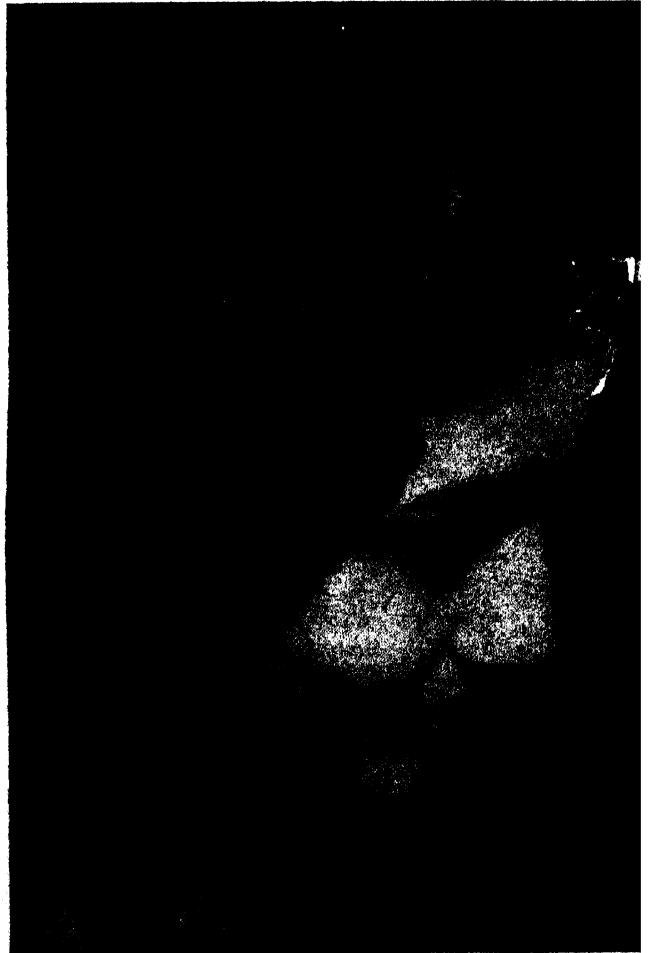
—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

এবার আলোর আভাষ।

দুঃসহ অন্ধকারের পর যেন এক ঝলক আগুনের বিকিরণ। আগুনের মত রঙ; মুখে যেন সৌম্যের প্রশান্তি। উজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত। গলায় বস্ত্রাঞ্চল, করজোড়ে বসে আছেন নীরবে, কখনও বা যুক্তকর কপালে স্পর্শ করছেন। তাঁর সম্মুখে চওড়া লাল পাড়ের পট্টবস্ত্র-পরিহিতা পরম রূপবতী কে এক জন সধবা রমণী। তিনি পাঠরতা। হাতে তাঁর বটতলার লক্ষ্মীর পাঁচালী। নাতি-উচ্চ সুরে পড়ছেন তিনি। একটা গ্রাম্য সুরের ক্ষীণ তরঙ্গ বইছে যেন সেখানে। পাঠিকার পৃষ্ঠদেশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ আলুলায়িত কেশ। দুই হাতে গালার লাল বালা। আর গোছা-গোছা গিনি সোনার চুড়ি। প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে। কুমুদিনী শুনছেন আর তিনি পড়ছেন।

এক দিকে একটা পিলসুজের সুউচ্চ শিরে ঘৃতের প্রদীপ। তার সতেজ শিখা।

এক ঝলক আলো। স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম, আলোকদাত্রী। জননী।° ঐ তো ব'সে রয়েছেন প্রদীপের পাশে। মুখে তাঁর আলো-করা স্বর্গীয় দ্যুতি। আয়ত আঁখিযুগল যেন ভক্তিভরে আচ্ছন্ন। ছেলেকে আসতে দেখেই পাঠিকাকে বললেন ধীর কণ্ঠে,—এইখানে বৌ আজ বিরতি হোক্। আবার আগামী কাল সন্ধ্যায় এসো।

পাঠিকা মৃদু হাসির সঙ্গে পাঠে বিরত হলেন। পার্শ্বস্থ মসীপাত্র হ'তে জরির কলম তুলে অন্তকার পাঠ-শেষে চিহ্নিত করলেন। পাঁচালী রেখে ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। কুমুদিনী তাঁর চিবুক ক'রে বললেন,—রাজরাণী হও মা! সীঁথির সিঁদূর অক্ষয় হোক্।

কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকে দেখলো সবিস্ময়ে। কে এই নারী! এমন বিচিত্র বেশ, এমন অপূর্ব রূপ! প্রণাম সেরে উঠতেই পাঠিকা এক বার অপাঙ্গে তাকালেন। কৃষ্ণকিশোরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। শেষে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু। লুকানো চাপা-হাসি।

কুমুদিনী সে-হাসির শব্দ শুনতে পেলেন না। সে শুধু দেখলো। পদ্মলোচনা এই নারীর ওষ্ঠাধরে হাসির খেলা। আর মিশি-দেওয়া দাঁত কয়েকটি। এক সারি মুক্তা যেন। হাসির শেষে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলেন না। গুণ্ঠনের দীর্ঘতা ঈষৎ বর্দ্ধিত ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। হাতের চুড়ির গোছা শুধু অবাধ্যের মত বাজলো যখন-তখন রিনিঝিনি আওয়াজে। মহিলার পদদ্বয়ে কালচে-লাল আলতার প্রলেপ। মহিলা অদৃশ্য হলেন দরজার বাইরে। আরও অনেক দরজার বাইরে তাঁকে যেতে হবে। গতি দ্রুত হ'ল তাঁর।

কুমুদিনী বললেন,—এসো, এখানে বসবে এসো।

পাঠরতা মহিলার ছেড়ে-যাওয়া শূন্য আসন। পশমের নক্সা তোলা। কিন্তু সব আগে যে বেশ-বদলের প্রয়োজন। মৃতের পরিবারের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। কুমুদিনী জানলে কি আর স্থির থাকবেন! শুনলে?

সে বললে,—বেরিয়েছিলাম, রাস্তায় কাপড়-জামা। ছেড়ে আসছি আমি।

কুমুদিনী ক্ষীণ হাসলেন। ছেলের শুদ্ধাচারের মাত্রা-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। তবুও মন তাঁর অনেক দিন থেকে যেন ভাবতে শুরু হয়েছে। যে দিন থেকে পড়ায় দেখেছেন ছেলের বীতরাগ, যেদিন থেকে ছেলে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করেছে। যেদিন কৃষ্ণকিশোর তাঁর উপস্থিতিতে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিয়েছে নিজের গুরুকে। ঐ পণ্ডিত মশাইকে। কুমুদিনী যেন ছেলের হাল ধরতে পারছেন না। চিনতে পারছেন না ওর চোখের কোন রঙ; ছেলের চোখে কিসের স্বপ্ন বুঝতে পারছেন না। ছেলের গতিবিধি যেন ধরতে পারছেন না।

এ বংশে এ কোন্ কুলাঙ্গারের জন্ম হ'ল।

কেমন ছেলের জন্ম দিলাম! কত সময়ে আনমনে এই একটি কথাই চিন্তা করেন কুমুদিনী। তাঁর মাতৃত্বের লজ্জানুভব করেন। পরিবারের অন্যান্য দেখা ও না-দেখা মানুষগুলিকে দেখতে পান চোখের সামনে। বিত্তায় জাহাজ সব, টুলো পণ্ডিতের শিক্ষাধারায় আপ্লুত।

ঐ যে জানলার বাইরে দেখা যায় দূরে, ঐ বড় বাড়ীর এখনও তো তাঁরা জীবন্ত। এক এক জন কৃতী সন্তান

সুখোজ্জ্বলকারী বংশ-গৌরব। বড় বাড়ীর শুধু ঐ বড়বাবু ব্যতীত আর আর সকলের সামাজিক পরিচয় এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজ সগর্ব্বে ঘোষণা করে। বাঙলার হিন্দু জমিদারগণ এই বংশের প্রতি আশা পোষণ করেন। শুধু ঐ বড়বাবু ব্যতীত আর আর সকলের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল। আর আর সকলের এক জনও ব'সে থাকেন না। কেউ গবেষণা করেন, কেউ অধ্যাপনা করেন, কেউ ব্যবসায়, আবার কেউ বা কেবল মাত্র নগদ নারায়ণের বিনিময়ে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী কারবার করেন। শুধু ঐ বড়বাবু, তিনি ব'সে ব'সে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছেন। তাও যদি বাড়ীতে স্থিতি হয়ে অলস দিনগুলো অতিবাহিত হত। সময়ে-অসময়ে গৃহের বাহিরে যাতায়াত করেন বড়বাবু। কিন্তু আর আর সকলের চোখ নেই সেদিকে! তাঁরা কাজের মানুষ, আপন কাজেই বিব্রত। কোথা দিয়ে যে দিন যায় তা তাঁরা জানতে পারেন না।

ছেলে যদি কুলাঙ্গার হয়!

তার আগে যেন মৃত্যু হয় কুমুদিনীর। নিজেদের, একেবারে নিজের শ্বশুরকুলের, স্বামী আর দেওরের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সেই বংশের নাম যদি অস্তাচলে ডুবে যায়। আর সেই গ্রহ নয়, উপগ্রহটি কি না তাঁরই সন্তান। চারি দিকে চোখ মেলে কূল-কিনারা যেন দেখতে পান না।

পাঠিকাকে বিদায় নিতে দেখেই দু'জন চাকরাণী দরজার বাইরে এসে অপেক্ষা করছে। কালো রঙের চেহারা, রঙ-বাহার কাপড় পরেছে। গায়ে রূপোর ভারী-ভারী গয়না। মাথার চুল আলুথালু, পিঠের ওপর খোঁপা দু'টো অবহেলায় ঝ'লে পড়েছে। খোঁপায় টাটকা চাঁপা। হাতে ফুলের সাজি। বাতাসে সুবাস। চাকরাণী নয়, মালিনী।

এরা ভূমিদানের প্রজা। বসবাস করে এষ্টেটের জমিতে। স্বামীরা এঁদের বাগান পরিচর্য্যা করে। গাছ-গাছড়ার তদারক করে। পুকুর থেকে জল ব'য়ে এনে বাগানের কৃত্রিম নালা পূর্ণ করে। মাটি কুপোয়। কলম কাটে। আর নাট-মন্দিরের ত্রিসন্ধ্যা পূজার নিমিত্তে ফুল তুলে সাজি ভরে দেয়। ঘরের মেয়েরা সেই সাজি খাস্ মা-ঠাকরুণের ঘরে পৌঁছে দেয়। কুমুদিনী সেই ফুলের বোঝা একটি একটি দেখে নেন স্বহস্তে। ফুলের রাশিতে যদি নষ্ট ফুলের সন্ধান পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ পরিহার করেন সেই পুষ্প। বার-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন ফুলদানি সাজাতে।

মালীরা মা-ঠাকরুণের জন্তে অনেক কৌশলে পূর্ণ করে ফুলের সাজি। থরে-থরে সাজায় ফুল। একেক স্তরে রাখে একেক জাতের।

মা-ঠাকরুণের পরিশ্রম হবে তাই আর মিশ্রিত করে না ফুলের প্রাচুর্য্য। ফুল আর বিল্বপত্র। দূর্ব্বা আর তুলসী।

প্রদীপের কম্পমান শিখায় হঠাৎ সচকিত হন কুমুদিনী। গুণ্ঠনে মুখাবৃত করেন। মনে করেন কেউ বুঝি আসে। কার যেন ছায়া। মিথ্যা অভ্যাস। কেউ আসে না। কারও ছায়া নয়। প্রদীপের শিখা বাতাসে কেঁপে উঠেছে। দরজার বাইরে অপেক্ষমান দু'জন মালিনী। টাটকা ফুলের গন্ধ পেয়েছেন কুমুদিনী। বুঝতে পেরেছেন ফুলের সাজি এসেছে। মালিনীরা এসেছে। কুমুদিনী উঠে চললেন নৈবেদ্যর ঘরে। সেখানে ব'সে তিনি ফুল বেছে দেবেন। সূতার কাপড় ছেড়ে পরবেন তসর-বস্ত্র। মালিনীদের দে—আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মালিনীরা হাসতে-হাসতে পিছু নেয় তাঁর। খানি দেখতে পান নিজের ছেলেকে। প্রায়ান্ধকার দালাে আকাশ পানে যেন তাকিয়ে আছে কৃষ্ণকিশোর। এক দেখছে কে জানে! আকাশের এক প্রান্তে ষষ্ঠী-কাচে কালি চাঁদ। নিস্তেজ আর পাণ্ডুর। আর কয়েকটা তা আছে এখানে-সেখানে। দপ-দপ করছে। কুমুদিনী শুনতে পায়নি সে। একেবারে চোখাচোখি হতেই যে হয় কৃষ্ণকিশোর।

একটু বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করেন কুমুদিনী,—পোষ গেলে না? এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন?

সত্যিই এমন অকারণে এখানে কেন। এ বাড়ীর এত জায়গা থাকতে অন্দরের এই দালানে? পোষা নিজের ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই স্থানটুকু। কেউ কোথাও নেই। দালানের সামনে মাটিতে পাশাপাশি কয়েকটা পেঁপে গাছ। পাতাগুলো মেলে রয়েছে। ডালের ভিড়ের ফাঁক থেকে দেখতে পা চন্দ্রালোক। মেঘের আস্তরণে লুকিয়ে আছে চাঁদ। ষষ্ঠী-কা

এখানে এসে আশ্রয় নেওয়ার একমাত্র কারণ নিজের ঘরে গিয়ে বসলেও রেহাই নেই। অনন্তরাম হাজির হবে। বলবে এটা-সেটা কথা। কোন রকমে অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তাই দেখতে গিয়ে ভঙ্গ করবে শান্তি। কৃষ্ণকিশোর তখন লজ্জায় বলতে পারবে না চলে যাও এখান থেকে। স্নেহের আতিশয্যে অনন্তরাম চায় না যে! ঠিক ছায়ার মত থাকে সঙ্গে-সঙ্গে।

মার' কথার যে কি উত্তর দেবে সেই কথাই ভাবতে কুমুদিনী আবার বলেন,—কি, হয়েছে কি? একাটি এখা

কৃষ্ণকিশোর কোন কথা খুঁজে পায় না। কি তার বিস্তারিত বিবরণ মনে পড়ে। এক অচিন্ত অপ্রত্যাশিত এক দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটে একটা মেয়ে, যাকে মাত্র কয়েক দিন সে দেখেছে, ত মৃত্যু হ'ল। একেবারে না ব'লে চলে গেল?

এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে পড়েও কি কেউ বাঁ সর্ব্বনেশে অসুখ—ম্যালেরিয়া, ভয়ঙ্কর রকমের ম্যালেরি গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত করতে চায়, উ চায় এই স্বল্পায়ু বাঙালী জাতিকে। কিন্তু এ রোগে এ ব্যাধির নেই কোন চিকিৎসা? ক্ষণেকের জন্তে মনটা করে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে। কানের কাছে কতকগুে থেকে ভন-ভন করছে। সে বললে,—না, কিছু হয়নি।

উত্তর শুনে মনে মনে বিরক্ত হলেন কুমুদিনী। আবার কি কথার ছিরি! তবে কেন এখানে? অন্ধকারে? একটু যেন রহস্যের সন্ধান পান কুমুদিনী। বিস্ময়ের ঘোর। বলেন,—তার চেয়ে যাও না, বই বসতে যাও না। সময় কি এমনি ক'রে নষ্ট করে।

কে জানে। কিছু জানবে না, কিছু শিখবে না, এ বাড়ীর মান নষ্ট করবে?

কুমুদিনীর কথা যখন শেষ হ'ল সে তখন সেখানে আর নেই। মা'র কথা শুরু হতেই বুঝেছে এ কথার জের কোথায় গিয়ে থামবে। বুঝেই সরে গেছে সেখান থেকে। দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়েছে। নিজের ঘরের দিকে। কথা শুনতে গররাজী নয় সে কিন্তু কুমুদিনীর পিছনে যে আরও দু'জন রয়েছে। মালিনীরা দু'জন। তাদের উপস্থিতিতে কুমুদিনী ব'লে যাবেন আর সে শুনে যাবে? তার চেয়ে অপমান কি হ'তে পারে আর? সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যায় সে।

টম কোথা থেকে এক লাফে এসে পায়ে-পায়ে জড়ায়। তার গলার ঘণ্টি শব্দায়িত হয়। সিক্ত জিহ্বা বহির্গত হয় সানন্দে।

নৈবেদ্যর ঘরে আছেন ব্রাহ্মণ-কন্যা কয়েক জন। বয়োবৃদ্ধা বিধবা জনা কয়েক। পরিধান, আহার এবং বাসস্থানের খুঁটি পেয়ে মন্দিরের সেবা করেন এই নিঃসহায়ের দল। নৈবেদ্য নির্মাণ করেন, পূজার উপচার মাজা-ঘষা করেন, প্রদীপের সলতে পাকান আর মালা গাঁথেন।

কুমুদিনী ফুলের রাশির একটি-একটি ফুল পরীক্ষা ক'রে দেন আর তাঁরা চোখে চশমা এঁটে মালা গাঁথতে শুরু করেন। গঙ্গাজলের কলসীর পাশে ব'সে ব'সে। নৈবেদ্যর ঘরে ফল, চাল, মিষ্টান্ন, তৈজস-পত্র আর গঙ্গাজল থাকে। সারি সারি মাটির বড় বড় কলসী, শুধু গঙ্গোদক।

সেবিকাদের এক জন মালিনীদের কাছে যায়। মালিনীরা ফুলের সাজি নামিয়ে রাখে ভূমিতে। সেবিকা গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে সেই সাজি এনে আছাড় ক'রে দেয় নাট-মন্দিরের সাজিতে। কাঁচা বাঁশের সাজি থেকে পেতলের সাজিতে এসে স্থান পায় ফুলদল। তার পর অনেক পরে যাবে দেবতার কণ্ঠে, স্থান পাবে চরণে। সচন্দন হবে তখন।

কুমুদিনী ঘরে এলেই একখানা নির্দ্দিষ্ট আসন পেতে দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ। তিনি সেই আসনে বসেন। গঙ্গাজলে হস্তক্ষালন করেন। তার পর একটি-একটি ফুল—

মালীরাও জানে মা-ঠাকরুণ স্বয়ং ফুল সাজাবেন পুষ্পপাত্রে। মালার জন্য ফুল বেছে দেবেন। বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা সাজিয়ে দেবেন। তারা তাই থরে-থরে সাজিয়ে দিয়েছে একেক জাতের ফুল। কুমুদিনী ফুলের রাশি পাশে নিয়ে বসেন। আর তামার থালা—পুষ্পপাত্র! এক দিকে সেবিকাদের এক জন চন্দন ঘষছে আপন মনে। শ্বেত চন্দনের পাত্র উপচে পড়ছে। এখন রক্ত চন্দনের কাঠ শিলায় ঘষা হচ্ছে। সেবিকার মন পড়ে আছে তার নিজের মেয়ের কাছে। মেয়ে হাটবসন্তপুরে শ্বশুরবাড়ীতে আছে। স্বামী আবার কুলীন, আজ এখানে কাল সেখানে খেয়ে ঘুমিয়ে দিন গুজরাণ করে। মেয়েটাকে মা কি পেটে খেতে দেয় না, রাতে ঘুমোতে দেয় না, অন্ধকার ঘরের ভেতর দিবারাত্রি রেখে দেয়। সেবিকার কাছে চিঠি আসে কালে-ভদ্রে। মেয়ে তার কোন লুকানো মানুষকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মা'র নামে পাঠায়, তার এক ছত্র হয়তো, "ইহা অপেক্ষা তোমরা যদি আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে তাহা হয়তো সহ্য করিতে পারিতাম। আমি যে কি কষ্টে দিন কাটাইতেছি এই পত্রে তাহা জানাইতে পারিব না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দেখিতে পাইলে আমাকে পোড়া কাঠ দিয়া পুড়াইয়া মারিবে। এ জীবনে যদি কোন দিন পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখনই জানাইব।"

সেবিকা চিঠি পড়তে পারেন না। অক্ষর চিনেন না। কৃষ্ণকিশোরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় সে-চিঠি। সেবিকার চোখে এখন হাটবসন্তপুর, মনে মেয়ের মুখ। কিরণশশীর।

থরে থরে ফুল। রাতের আকাশের অসংখ্য তারার মত; ভোরের শিশির-বিন্দুর মত; সূর্য্যের প্রথম চুমায় যারা পল্লবিত হয় সকল চোখের অলক্ষ্যে—সেই ফুলের স্তবক একেক স্তরে। জবা আর কামিনী; চাঁপা আর মালতী; গন্ধরাজ আর অপরাজিতা; যুঁই, বেল, টগর, মাধবী, অশোক, কন্দে আর গোলাপ। বিল্বপত্র। এক দিকে তুলসী। নৈবেদ্যের ঘরে সৌরভের ছড়াছড়ি। চাঁপা আর গন্ধরাজের উগ্র গন্ধ। যুঁই আর বেলের সুমিষ্ট আমেজ। গোলাপের মধুগন্ধ।

ফুলের সঙ্গে ফল। নৈবেদ্যর ঘরে সর্ব্বক্ষণ ফুল আর ফলের গন্ধ। আম কাঁটাল কলা, আরও কত কি। ইঁদুরের ভয়ে শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। কুমুদিনী ফুল বাছতে শুরু করেন।

ফুলের গাছ অনেক দিনের। এ-বাড়ীর ঐ লাগাও বাগান-যত দিন হয়েছে তত দিনের। কৃষ্ণচরণের ফুল-বাগানের সখ নয়, নেশা ছিল। কলকাতার মত বুনো শহরে সেকালে গোলাপ বাগান করেছিলেন এখানে। লাল ভেলভেটের গালচে পেতে দিত কে যেন। কত রাজা-রাজড়া সাহেব-সুবো দেখতে আসতো সেই ফুলবন। দেখে তাঁদের সব চক্ষু সার্থক হয়ে যেতো। এখন যে চাঁপা আর গন্ধরাজ সাজি ভ'রে দিয়ে গেল মালিনী, সে-সব গাছ রোপণ করেন কৃষ্ণচরণ। স্বহস্তে।

বাগানের পাঁচিল-ঘেরা নারকেল গাছের সারি। কলদাতা ব্রাহ্মণ একেকটি। বৃক্ষ-নারায়ণ। সেওড়াফুলির হাট থেকে কৃষ্ণচরণ আনিয়েছিলেন শ্রীফলের মূল। আজ সেই গাছের পঙ্‌ক্তি আকাশে মাথা তুলেছে। আজ সে গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের ঝিলিমিলি। তাদের কাণ্ডে গণনা করা যায় বাৎসরিক চিহ্ন। বয়স হ'ল প্রচুর, প্রায় পঞ্চাশোর্দ্ধে!

ফুলের চাষ করতেন কৃষ্ণচরণ। যে সময়ের যা। গ্রীষ্মে যুঁই, বেল, মালতী আর শীতে মৌসুমী। লণ্ডনের কোন বীজ-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মৌসুমীর বীজ আনাতেন। বর্ষায় রজনীগন্ধা আর শীতে বাগানের এক পাশে গাঁদার বন তৈরী করতেন। বাসন্তী রঙের মেলা বসতো যেন।

বাগান সম্বন্ধে কৃষ্ণচরণ এত ওয়াকিবহাল থাকতেন যে, কোন গাছের একটি ফুল কেউ আহরণ করলে রসাতল করতেন। দোষীকে চ্যুতবৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বলতেন,—'এখন এই রক্তপাত বন্ধ কর'।

দোষী হতেন হয়তো কনিষ্ঠ সহোদর। সক্রোধে

কৃষ্ণকান্ত।—অপরাধ মার্জনা হোক। লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

সত্যিই গাছের একটি ছিন্ন শাখা থেকে জলীয় পদার্থ নির্গত হ'তে থাকতো। কৃষ্ণকান্ত হয়তো রজনীগন্ধার একটি বৃন্তচ্ছেদ করতেন।

পড়াশুনা, আর লেখাপড়া!

কান যেন ঝালাপালা হয়ে গেল এই একটা কথার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে। পৃথিবীতে কি ঐ একটি বিষয় ব্যতীত আর কোন-কিছুর কোন মূল্য নেই? পঠন-পাঠন ছাড়া নেই অন্য কোন প্রসঙ্গ? কমলার মতই ঠিক বাগ্‌দেবীর চাঞ্চল্য। ক্ষণেকের অবহেলায় রুষ্টা সরস্বতী চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। তাঁকে ত্যাগ ক'রে অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হ'লে মাৎসর্য্যের আতিশয্যে তিনি তখন দুষ্টা সরস্বতীর রূপ ধারণ করেন। পরে, শত চেষ্টাতেও আর তাঁকে ফেরানো যায় না। চোরা যেমন ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না, তেমনি ঠিক অমনোযোগী ছাত্রের কানেও বাণী বন্দনার মন্ত্র শুনিয়ে কি ফল!

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, মা যদি জানতেন আজকের দুর্ঘটনা—শুনতেন লিলিয়ানের মৃত্যু-সংবাদ! একটু পরে ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঘা পড়তে শুরু হ'তেই তাড়াতাড়ি সে পোষাক বদলাতে লেগে যায়। সময় নষ্ট না ক'রে এখনই যেতে হবে পড়ার ঘরে। বসতে হবে পড়তে। আজ পড়বে ততক্ষণ যতক্ষণ মা অন্দর থেকে খেতে না ডাকেন। কুমুদিনী, কুমু, বৌমা, মা-ঠাকরুণ, কৃষ্ণকিশোরের মা,—তিনি হয়তো অনেক অনেক ভাল, তাঁর হয়তো দোষ নেই কিছু,—কিন্তু মা'র যদি বিবেচনা থাকতো খানিক,—আর কোন অভিযোগ থাকতো না কৃষ্ণকিশোরের। কুমুদিনীর সব আছে, নেই যেন শুধু ঐ একটি সংগুণ—যার নাম বিচার-বিবেচনা। মা যদি জানতেন যে আজ কি দেখলে সে চোখের সামনে, দেখলে কার শব-শোভাযাত্রা;—তা হ'লে হয়তো অন্য দিনের মত না পড়ার জন্য অভিযোগ করতেন না।

কিন্তু ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় বাজলো যে অনেক। আটটা।

অন্য দিন এ সময়ে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে এই শয়ন-ঘরে এতক্ষণ। অনন্তরাম এসে বললে,—মা বলে পাঠিয়েছেন খেতে যেতে।

কথাটা শুনেই বিরক্ত। বলে,—মা একসঙ্গে কত কথা বলেন? বললেন তো পড়তে যেতে।

অনন্তরাম ঘরের এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে বললে,—আহা, রাগ কাচ্ছস কেনে! মা কি জানেন যে, আজ পাখী উড়ে গেছে।

ঠিক কথা বলে অনন্তরাম। সেও এই কথাই ভাবছে, মা কি কিছু জানেন? জানলে কি আর রক্ষা থাকবে, তাই তো তাঁকে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি কৃষ্ণকিশোর। অরুণের সম্পর্কটা পুরাপুরি লুকিয়ে আছে এ-বাড়ীর চোখে।

তারা বিধর্ম্মী। ম্লেচ্ছ। লিলিয়ানরা খৃষ্টান। বিজাতীয় ঐ অরুণেরা।

অথচ তারা যে সাহেব তাও নয়। তারা ইঙ্গ ভারতীয়। দো-আঁসলা।

—বইখানা কি বই রে? ঘরের একটা দেয়ালে পালঙ্কের ঝাড়ন-কাটি ঘষতে ঘষতে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে অ

—কোন্ বইখানা? কৃষ্ণকিশোর চুলে চিরুণী চালা শুধোয়।

—ঐ যে ইংরেজী কেতাবখানা। বিছানার সেদিন—ধূলো ঝাড়ে। ফিরে তাকায় না।

—ফার্ষ্ট বুক। অনেকক্ষণ পরে উত্তর পাওয়া যায়। প্রথম ভাগ।

অনন্তরাম নাক সিঁটকে বললে,—অ। ম্লেচ্ছ ভাষা?

অনন্তরাম জানে না তাই। ইংরেজ জাতটার প্রতি তার যেমন স্বপনেও ঘৃণা, ইংরেজী ভাষাটার প্রতিও ঘৃণা পোষণ করে। যশোরে থাকা কালীন খাস-ইংরে সে দেখেছে। বোধ হয় সংখ্যাতীত। সেই তখনই দেখবার সাধ জন্মের মত মিটে গেছে অনন্তরামের। নিঃসহায় মানুষগুলোর পিঠে চাবুক আর বুটের নির্দ্দ দেখতে দেখতে শরীর তার কত বার রোমাঞ্চিত হয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে বুকের ভেতরটা। প্রহারের জ্বালা করছে মাটিতে লুটিয়ে। ইংরেজ সাহেব আর ফিরে ত মদের বোতল খুলতে খুলতে তাচ্ছিল্যে অট্টহাসি হেসেছে বস্তা-বন্দী টাকার থলি পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। সেখা চালান হয়ে গেছে জাহাজে। জাহাজ গিয়ে ভিড়ে ইংলণ্ডের বন্দরে। কাঁচা রূপোর চিকিমিকিতে আবার এক পাল হাসির তুফান বয়েছে। মদের রঙীন বুদ্‌বুদ তুষার-বরণ আকাশে।

অন[ন্ত]রাম জানে না, ইংরেজী ভাষাটার ঠিক কোন দো প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি দিন, প্রতি যুগে সে শুধরেছে মহ স্বকীয় শোধন-প্রক্রিয়ায়। মসীজীবিদের দেওয়া ইংরেজীর কলেবর যে প্রায়-নিরক্ষর অনন্তরামের চোখে ধরা পড়বার কেঁদে-ককিয়ে না হয় বাঙলা দু'-চার ছত্র অনন্তরাম পড়তে ইংরেজীর সে কি জানবে! সে কি জানে ইংরেজী ভাষা সেবায় ধন্য! যীশুর মুখ-নিঃসৃত বাণী-সঙ্কলনের পর কথা-সা যুগে কে এলো আর কে গেলো তার খবরাখবর জানবা মানুষ কি ঐ অনন্তরাম!

হঠাৎ যেন চোখে পড়েছে অনন্তরামের।

ঘরের আলো জ্বালতে দেখতে পেয়েছে অনন্তরাম। আসবাব-পত্রে ধূলো জমেছে। দেখতে পেয়েই সেই ধূলা অপ কাজে লেগে গেছে। দেরাজ সাফ হতেই নজরে পড়ে ছত্রীগুলো। কত কালের ময়লা সেখানে। খানসামাদের করে অনন্তরাম। মনে মনে। মা এ-ঘরে বড় একটা আসে তাই আর খানসামাদের হুঁস নেই যে, মাঝে মাঝে ঝাড়া করে। এ কাজ অনন্তরামের নয়। তবুও দেখে যেন আ থাকতে পারে না সে। একটা ছত্রীর কাছাকাছি গিয়ে সে ত আজ হাত দিলে চট ক'রে আর শেষ হবার নয়। মনে খানসামাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে হঠাৎ বললে অনন্তরাম,—তা তোর এমন ম্লেচ্ছ ভাষার দিকে ঝোঁক কেন? শিখবি না কি?

উত্তরদাতা অনেকক্ষণ সেস্থান ত্যাগ করেছে।

অনন্তরামের কথাগুলি অরণ্যে রোদনের মত শোনায়। কেউ শোনে না, সে শুধু ব'লে যায়। কথার শেষে উত্তরের প্রতীক্ষা করে। কারও কোন রকম টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত না শুনতে পেয়ে ফিরে তাকায় পেছন পানে। দেখে কেউ সেখানে নেই। সে একা।

কৃষ্ণকিশোর তখন পড়ার ঘরে চলে গেছে। বসেছে কালি-কলম আর বই পত্র খুলে।

সদরের লোকেরা তা দেখে একটু বিস্মিত হয়েছে। এমন অসময়ে এ আবার কি খেয়াল হ'ল হুজুরের। বিছানায় না গিয়ে পড়ার টেবিলে! অবাধ আরাম ছেড়ে লেখাপড়ার কষ্ট-স্বীকার! একটির পর একটি বই খোলে আর বন্ধ ক'রে রেখে দেয়। মন বসে না যেন কোন একটায়। পড়ার কথা কত সময়ে তার মনকে তোলপাড় করেছে। কিছু না-জানা আর কিছু না-শেখার লজ্জাও সে মন থেকে অনুভব করেছে। কিন্তু বই খুলে কি পড়বে তা যেন আর খুঁজে পায় না। জ্ঞানসঞ্চয়ের বাসনা তার উগ্র। কিন্তু জানবে কেমনে? কে দেবে জানিয়ে? শেখাবে কে?

মনোযোগী ছাত্রের মতই পড়তে সে পারে, পারে না শুধু পাঠশালার শিক্ষা-ধারায় নিজেকে মানিয়ে নিতে। শিরোমণি পণ্ডিতের হিংসা-লোলুপ দৃষ্টি দেখেছে সে বহু দিন। লক্ষ্য করেছে আন্তরিকতার একান্ত অভাব যেন তাঁর শিক্ষা-প্রণালীতে। কাঞ্চন বিনিময়ের সম্পর্কে সব-কিছুর মূল্য যাচাই করেন। ঔদার্য্যের ধার ধারেন না কোন দিন।

বিনোদা এসে ডাক দেয়। বলে,—মা যে খাবার নিয়ে ব'সে আছেন। খানিক থামে বিনোদা। কথা বলে চিবিয়ে-চিবিয়ে,—মা বলছিলেন লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে ম্যানেজার বাবুর কাছে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখা-শুনো করলেও কত কাজ হয়। একেবারে আকাট মুখ্যু হয়ে থাকলে—

ঠিক তীরের মত গায়ে যেন বেধে। বিনোদা তো কথা বলে না, বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে। • বিরস সুরে।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল এখন।

কালো পোষাকের লোকজনেরা কোথায় চললো লিলিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে! কোন্ সমাধি-ক্ষেত্রে স্থান পাবে লিলিয়ানের নশ্বর দেহ! কেন, পার্ক ষ্ট্রীটের ওল্ড বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে। এখন রাত্রি? তাতে কি, পৃথিবীর কণা মাত্র ভূমিতে আলো দেখানোর মত আলোর অভাব হবে কলকাতার মত শহরে! সমাধি-ক্ষেত্রের এক জায়গায় নয়, সারি সারি কবরের দুই শূন্যস্থান তখন জোরালো লণ্ঠনের আলোয় ঝলসে উঠেছে। লিলিয়ান আর তার এক জন সহযাত্রিণীর শবাধার খুঁড়তে শুরু করেছে ডোমেরা। লিলিয়ান আর এক জন অশীতিপর ধনী বৃদ্ধা। •

পুরোহিত মন্ত্র পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। আর অরুণেন্দ্র তখন লণ্ঠনের দীপ্তিতে যতগুলি কবর দেখা যায় তাদের বুকের আক্ষরিক পরিচয় সংগ্রহ করছে। কত হরেক রকমের কবর, শিল্পিত শ্বেত-শুভ্র পাষাণের বেদী। কত মর্ম্মাহত মানুষের শেষ আকুতি। সেই সঙ্গে সন আর তারিখ! নাম আর ধাম।

অনেক পরে খেয়াল হয়, বিনোদার কথার সুরে কেমন যেন অসহ্য বিদ্রূপ বিনোদার কথাগুলো যেন অতি বেশী নির্ম্মম। নেহাৎ জন্মের পর থেকে দেখছে তাই, বৌঠানের বাপের বাড়ীর দেশের লোক, কুমুদিনীর সঙ্গে না কি এসেছে এ-বাড়ীতে, কৃষ্ণকিশোর খুব বেশী তাই কিছু আর মনে করে না। বিনোদার কথা সে হেসেই উড়িয়ে দেয়। খেয়াল হতেই বললে,—আচ্ছা তাই হবে ম্যানেজার বাবুর কাছে জমিদারীর কাজ দেখব, মাকে তুমি বল গে যাও।

তার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য।' কথা শুনে বিনোদাও একটু যেন অবাক হয়। কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন লক্ষ্য করে বাক্যবাণে কাতর ছেলেটির মুখে। তার পর চলে আসে অন্দরে। যায় বলতে বলতে,—কি হল আবার ছেলের! গোঁসা হয়েছে বুঝি?

কৃষ্ণকিশোর তখন সত্যিই বই খুলে পড়তে চেষ্টা করে। পড়তে পারে না। বিনা ব্যাকরণে ভাষা শিক্ষা হয় কখনও? যার অক্ষর পরিচয় নেই সে কখনও পড়তে পারে একটানা গল্প? শেষের দিকের পাতা থেকে প্রথম দিকের প্রথম পাতা ওলটায়, অক্ষর চিনতে চেষ্টা করে। A, B, C—

কি ভাবতে ভাবতে কখন সেই বইখানাই খুলেছে। ফার্ষ্ট বুক। ছবি দেখে পড়তে ইচ্ছা হয়েছে, পড়তে পারেনি। তখন মনে পড়েছে, পড়তে হলে প্রথমে অক্ষর চিনতে হয়। তখন সেই পাতায় মন উড়ে গেছে। চেনা-শুনার পর পড়া-শুনা। পরিচয়ের পরেই পাঠ।

তাও বুঝি আর ভাল লাগলো না বেশীক্ষণ।

রইলো প'ড়ে কোদালী, বনে চলিল বনমালী। ম্যানেজার বাবুর খোঁজ প'ড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ। তলব কর ম্যানেজার বাবুকে 'ওরে কে আছিস' বলতেই এক জন খানসামা এসে হাজির হয় বাইরের দালানের এক পাশে ব'সে সে নাট-মন্দিরের ধুচুনী লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করছিল। রামনামের আসরে জ্বলেছে, কুলঃ পড়েছে।

—ম্যানেজার বাবুকে ডাকো। কৃষ্ণকিশোর বলে বিনম্র সুরে তার পর কি মনে হয় উঠে পড়ে কেদারা থেকে। নিজেই যায় ম্যানেজার বাবুর কাছে।

কাছারীতে পৃথক্ একখানি ঘর আছে ম্যানেজার বাবুর সেখানেই তিনি অবস্থান করেন। কাজের সময়ে কাছারীতে আসেন ছুটি পেলে চলে যান দেশে। স্বগৃহে। ম্যানেজার বাবুর নিবা মেদিনীপুরে। কাঁথির কাছাকাছি •

—আমাকে জমিদারীর কাজ শিখিয়ে দিন। তাঁর ঘরের দরজা গিয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর।

ম্যানেজার বাবু তখন সারা দিন পরিশ্রমের পর সবে মাত্র একখানি পকেট-সাইজ গীতা খুলে এক-আধটা শব্দ পড়েছেন কি পড়েননি। হুজুরকে এ অবস্থায় একেবারে তাঁর নিজের ঘরের সমুখে দেখতে পেয়ে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি তার পর তাঁর চোখ কখনও ভুল দেখতে পারে না এই প্রগাঢ় বিশ্বাসে তিনি বলেই ফেলেন—কে, হুজুর অনুমান করি আপনি এমন সময়ে কেন? কি বললেন ঠিক ঠাওরাতে পারলাম না। আর একবার বলুন হুজুর!

—মা বলেছেন আমাকে জমিদারীর কাজ শিখিয়ে দিতে। কৃষ্ণকিশোর যেন মুখস্থ ব'লে যায়।

—সেকি হুজুর! সে কি আপনার এক কথায় শেখবার? অনেক জটিল, অনেক ঝামেলা, অনেক হেফাজৎ, অনেক গোলমেলে ব্যাপার যে হুজুর! তা যখন তিনি স্বয়ং হুকুম করেছেন তখন নিশ্চয়ই সে কথা পালন করব। ম্যানেজার বাবু কথা বলতে বলতে ভেবে কূল-কিনারা খুঁজে পান না যেন। এমন অসময়ে কেন যে এই হুকুম হ'ল তাই ভাবতে থাকেন। বলেন,—শেখানো কি আর যায় হুজুর, শিখে নিতে হয়। কাজ দেখতে-দেখতেই শিখবেন। বেশ। খুব ভাল কথা। আমি যদ্দূর পারি চেষ্টা করব।

—আজ, এখন থেকে শিখব আমি। আপনি কাছারীতে আসুন। কৃষ্ণকিশোরের কথায় মিনতির সুর। কাতর প্রার্থনার মত শোনায় যেন তার কথা।

ম্যানেজার বাবু আর কিছু বলতে পারেন না। বলেন,— তা বেশ কথা হুজুর। চলুন।

আমলা-তন্ত্র তখন ঘুমের ঘোরে ঢুলতে শুরু করেছিল। খাতাপত্র তুলে ফেলতে উদ্যোগী হচ্ছিল। তা আর হ'ল না। হুজুর বিনা শব্দে অসময়ে কাছারী পরিদর্শনে এসেছেন। আমলা-তন্ত্র নানা রকম কল্পনা করতে থাকে। কেউ বলে, কোন মৌজার নায়েব না কি তছরুপের দায়ে ধরা পড়েছে। সদর থেকে খবর এসেছে। হুজুরের কানে খবর পৌঁছতেই তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। নানা জনে নানা কথা কইছে।

কাছারী-ঘরে ঢুকতেই একটা বেতের কেদারা নিয়ে আসে এক জন পাইক। কৃষ্ণকিশোর বসে না কেদারায়। আমলাদের তক্তাপোষের এক পাশে বসে। ম্যানেজার বাবুও এসে বসেন। অত্যাগ্র আমলারা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে যে-যার জায়গা থেকে।

কয়েক মুহূর্ত্ত মুদিত চক্ষে কি যেন চিন্তা করেন ম্যানেজার বাবু। তার পর বলেন,—হুজুর, জমিদার দুই প্রকারের। যথা, বাদশাহী আর নন্‌-বাদশাহী। এই দু' জমিদারের কথা বলতে বলতেই তো হুজুর আজকের রাতটা কেটে যাবে। কা'কে বাদশাহী জমিদারী বলে আর কা'কে নন্‌-বাদশাহী বলে শুধু তাই আজকে জেনে রাখুন হুজুর। তার পর ধীরে-সুস্থে হবে'খন। আজ যে রাত হয়েছে অনেক।

—তা হোক। বলুন আপনি। অটল, নির্দ্দয়ের মতই বলে কৃষ্ণকিশোর।

ম্যানেজার বাবু বলেন,—হ্যাঁ, আমি তো বলতে শুরু করেছি। কিন্তু আপনার কষ্ট হবে না এমন বেটাইমে! ব'সে ব'সে মশার কামড় খাবেন?

মশা! চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। কোথায় মশা। যে মশা লিলিয়ানের শরীরে ব্যাধির বিষ ঢেলেছে, কোথায় সেই মশা! সে বললে,—আচ্ছা, কা'কে বলে তাই আজকে বলুন।

ম্যানেজার বাবু বোঝেন যে, বালকের খেয়াল হয়েছে যখন তখন —— সহজেই হবে। বলেন,—এটা হুজুর এখন ব্রিটিশ-আমল তা অনুমান করি নিশ্চয়ই জানেন? এ[...] নবাবী আমল। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হারিয়ে আ[...] লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াটসন বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হ[...] জাফর আলিকে নামে মাত্র মসনদে বসালেও ইংরে[...] আসলে কলকাঠি নাড়তে লাগলো। সেই নবাবের [...] যে-সব জমি নিষ্কর দেওয়া হয়, ঐ সমস্ত জমিকে বাদশা[...] বলতো।

জমিদার দুই প্রকার বলতেই নিজেদের সম্বন্ধে উগ্র কে[...] কৃষ্ণকিশোরের। তারা নিজেরা কোন্ দলে পড়বে, [...] চায়। বলে,—আমরা কি ম্যানেজার বাবু? নন্‌-বাদশা[...]

অনুশোচনার সুরে বললেন ম্যানেজার বাবু,—[...] বলছেন হুজুর! আপনারা যে বাদশাহী হুজুর! ন[...] দ্দৌলারও আগে থেকে আপনাদের এই জমিদারী। আ[...] তস্য তস্য পিতা সর্ব্বপ্রথম এই জমিদারী হাতে নেন। হুগলীর একটুখানি ছিল এই জমিদারীর সীমানা। অতঃ[...] পিতা বিহারের তালুক নীলামে কিনে ফেললেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে পেয়েছে অনন্তরা[...] পড়ার টেবিলে খুঁজেছে। দেখতে না পেয়ে খানসামা[...] করতেই সন্ধান পেয়েছে কাছারীতে। সেখানে তাকে [...] গভীর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে যেন। চোখে [...] বলেছে অনন্তরাম,—মা আর কত রাত পর্য্যন্ত ব'সে থাক[...] করলেন?

বড় বিশ্রী লাগে অনন্তরামের কথা। নিজেকে মনে [...] কুমুদিনীর কাছে। অকারণে। কৃষ্ণকিশোর বললে,— আর ব'সে থাকতে হবে না। মা ব'লে পাঠিয়েছেন ম্যা[...] কাছে জমিদারীর কাজ শিখতে। তাই শিখছি এখন।

—দিনমানে বুঝি শেখা যায় না? এই অসময়ে? শুধোয়।—মা বলেছেন এই রাত দুপুরে জমিদারীর কাজ [...]

বেশী কথা বলতে যেন ইচ্ছা হয় না আর।

রিপন ষ্ট্রীট থেকে ফিরে চেয়েছিল নির্জ্জনতা, তা[...] অভিযোগ, বিদ্রূপ, গঞ্জনা আর জন-সমাগম। মন [...] আসে যেন অবজ্ঞা এই পরিস্থিতির প্রতি। ম্যানেজার [...] বলতে শুরু করেন,—আগের দিনে হুজুর জমিদারীর জন্যে কেবল মাত্র রাজস্ব বা রেভিনিউ দিতে হতো। প[...] গভর্ণমেণ্ট যখন চলাচলের সুখ-সুবিধার দরুণ বড় বড় [...] করতে লাগলেন, আদালত, অফিস আর সরকারী কর্ম্মচ[...] বাড়ী তৈরী করতে লাগলেন, সেই সময় থেকে রাজস্বের [...] যাকে বলে আপনার হুজুর রোড-সেস্, আর পূর্ত্তকর ওয়ার্কস্-সেস্ ধার্য্য করলেন।

শুধু কৃষ্ণকিশোর নয়, আমলাদেরও কেউ কেউ দাঁড়িয়েছে সেখানে। ম্যানেজার বাবু যেন ছোট-খাটো [...] করছেন আর সকলে মনোযোগ সহকারে শুনছে তাঁর বক্ত[...]

কাছারীর দেওয়ালে জগদ্ধাত্রী, দশভুজা, শ্মশান-[...] গন্ধেশ্বরীর রঙীন ছবি। পদ্মাসনা কমলা আর সুদর্শন চক্র আর একটা দরজার মাথায় ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভি[...]

[১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের এক জন মূল্যবান জহুরী। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাঙলা সাহিত্য, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন। বাঙলা দেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় এই সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন সংখ্যাতীত। জীবনের শেষভাগে তিনি এক বিরাট কার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামক শব্দ কোষের সম্পাদনা করেন। দুঃখের বিষয়, এই সম্পাদনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি স্বর্গত হন।

অমূল্যচরণকে লেখা তদানীন্তন ও বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীদের এই পত্রগুলিতে রয়েছে ঘরোয়া কথায় কাঁকে-কাঁকে পত্রলেখকদের অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয়। অমূল্যচরণ স্বয়ং ছিলেন এক জন "চলন্ত বিশ্বকোষ"—যাঁর পত্রোত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিখিলনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাশ এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জন অজ্ঞতার অন্ধকার মোচন করতেন। এই পত্রগুলি অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি।—স]

---

৪৪ নীলখেত রোড, রমনা
মার্চ্চ, ১১, ১৯২২

াণবরেষু,

অমূল্য বাবু তোমার চিঠি পাইয়াছি তোমার ব্যাইএর চিঠিও াছি। কিন্তু কাজ হইয়া যাওয়ার পর। যা হক, যেদিন পাই সেইদিনই মেয়েদের জন্য বই হওয়ার কথা ছিল "হিমালয়" ়য়া দিয়াছি, বিক্রী হইবে কি না জানি না। এখানে ঢাকা নভার্সিটিতে ম্যাট্রিকুলেশন নাই। এখানে বি-এর নীচে নাই। রও বাঙ্গালা বই অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল। বোর্ড আছে ান্স্ এল-এর ব্যবস্থা করা হয় সে বোর্ডেও আমি আছি। রও বই হইয়া গিয়াছিল। যা পেরেছি এবার করিয়াছি স্বরে দেখা যাইবে।

তুমি ইতিহাস শাখার কর্ত্তা হইয়াছ ভালই হইয়াছে। খুব একটা পেপার পড়িও। মেদিনীপুরের ব্যাপার পড়িলাম কিন্তু রকম ধরপাকড়, জানি না কি হয়। এখন সভা করাই দায়। ত্য পরিষদের খবর পাই না কেবল মীটিং-এর নোটিশ পাই। ার নাথপন্থের কাগজ পড়িলাম। খুব পড়িয়াছ, সংগ্রহ করিয়াছ লাম। কিন্তু মোদ্দাটা কি হইল উহাদের গোড়া কোথায়? ঠিক হল না। সেইটা ঠিক করিয়া মেদিনীপুরের অভিভাষণ ও। তুমি লিখিয়াছ পরিষদের বিস্তারিত বিবরণ দু'-এক র মধ্যে লিখিব। কই তা ত আজও পেলাম না। আরও দিন তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার কাছে যে চাদা চাহিয়াছ দিব।

২৩ আগামেথি রোড
জুন ২৮, ১৯২১

কল্যাণবরেষু,

অমূল্য বাবু, আপনার প্রেরিত পুস্তক এইমাত্র পাইলাম। ধন্যবাদ। হিরণ্য বাবু এখানে আসিয়াছেন তাঁহার সহিত প্রায়ই দেখা হয়। সাহিত্য পরিষদের নোটিশগুলিও পাই। আমার শিবের প্রবন্ধ কি আপনার কাছে আছে সেটা একটু ভাষা সম্বন্ধে রিভাইস করিতে হইবে। প্রুফেও করা যাইতে পারে। আর আমার নাটকের প্রবন্ধ কোথায় জানেন? সেটা কি নলিনী লইয়া গিয়াছে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া জানবেন ত। আমি এখানে আসিয়া অবধি সবই নিজ হাতে করিতেছি। ডিক্টেট্ আর করি না। এ জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। এখনও নিজের বাড়ী যাই নাই সেটা আরও নির্জ্জন "নগরের প্রান্তভাগে নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কড়িয়া"। ৭।৮ দিনের মধ্যেই সেখানে যাব। এখানে এখনও ইউনিভার্সিটি খুলে নাই। আমি ক্লাশগুছি দিতেছি আর লাইব্রেরী দেখিতেছি।

ঢাকা বেশ জায়গা হে। খাবার জিনিষ ভালই পাওয়া যায়, দর কিন্তু বিশেষ কম নয়। কলিকাতা থেকে অনেক ঠাণ্ডা। শীতে যদি এমনি ঠাণ্ডা হয় তবেই ত গেছি। খগেন্দ্র বাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আমি এখানে থাকিলেও সেইখানেই আছি। আগামী সপ্তাহে শুক্র ও শনি দুই দিনের জন্য কলিকাতা যাইব। যদি সময় পাই দেখা করিব।

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
ডিসেম্বর ২৫, ১৯২৫

কল্যাণবরেষু,

অমূল্য বাবু ত আমার সেদিনের পত্রের জবাব দিলেন না। আসিলেনও না। তাই তোমায় আজ আবার মনে করাইয়া দিতেছি। কাল ২টার পর আমি যাইব। আপনি যেন থাকেন। অমূল্য বাবুকে থাকিতে বলিবেন। সব কর্ম্মচারীদেরও থাকিতে বলিবেন। সাহেব ২½ টার সময় আসিবেন। তাঁহাকে যেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে না হয়।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা,
জানুয়ারী ১, ১৯২৬

কল্যাণবরেষু,

কাল ৭টা ৭½টার সময় আসিলে বড়ই ভাল হয় কারণ আমি কাল নিশ্চয়ই থাকিব। পরশু খুব সন্দেহ।

আয়নাটোলার জন্য একটা সভা করিতেই হইবে। যত সত্বর হয় ততই ভাল। সে বিষয়ে একটু বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে।

ভিক্ষায় কবে বাহির হইবে? আর গত মিটিংগুলিতে যে সব শাখা-সমিতি সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কি সব আহ্বান করা হইয়াছে। না হয়ত শীঘ্র কর। পরিষৎ একটু জীবন্ত হউক। এখন যেন মরিয়াই আছে।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৮, পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট
১৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮

অমূল্য বাবু,

বিশেষ আবশ্যক—একবার যে প্রকারেই হউক ও যত সত্বর হউক আজ বা কাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমাকে বাড়ীতে পাইবেন। প্রাতেও ৮টার মধ্যে পাইবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
২০শে অক্টোবর, ১৯১৮

সবিনয় নিবেদন,

প্রত্যুত্তরে বিজয়ার যথোচিত সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। কন্যাটিকে লইয়া এখনও ভুগিতেছি। জ্বরের ১৭ দিন যাইতেছে। বড়ই মনের উদ্বেগে আছি। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন হিতপ্রার্থী।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫।৬।২০

প্রীতিভাজনেষু,

কয়েক দিন সংবাদ পাই নাই। উদয়নের কত দূর কি হইল? নৃসিংহ পুরাণ হইতে নোটটি অবশ্য অবশ্য চাই। আমি গ্রন্থাদি কিছু যেন পাই। আমরা বৃহস্পতিবার বরোদা যাইব। তথাকার ঠিকানায় পত্র দিবেন। ইথোরা পোঃ; ভায়া সীতারামপুর, ই, আই, আর, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

ইথোরা পোঃ, ভায়া সীতারামপুর
১৪।২।২২

সুহৃদ্বরেষু,

কলিকাতায় গিয়াছিলাম। দেখা করিতে গিয়া জানিলাম আপনি স্নান করিতে উঠিয়াছেন। সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, তখন আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহার পর যাইবার সময় পাই নাই। আশা করি, আজকাল সুস্থ আছেন। আমার কাজের কিছু করিতে পারিলেন কি? পত্রোত্তর দানে সুখী করিবেন। এখানকার উপস্থিত মঙ্গল।

নিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

ইথোরা পোঃ
২২।১২।২১

সুহৃদ্বরেষু,

মঙ্গলবার হইতে আশায় আশায় থাকিয়া নিরাশ হইয়া পত্রখানি লিখিতেছি। আমার কাজগুলির কি কিছুই করিবেন না। প্রথমে নবদ্বীপ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ১৯০৮ পৃঃ ২৮৫তে কিছু আছে কি না অথবা ১৯০৫ খৃঃ অব্দের জার্ণালে তাহাই লেখা আছে কি না, তাহা দেখিয়া লিখিয়া জানাইবেন ১৯০৫ সালে যাহা আছে তাহা পাঠাইতে হইবে না, তাহা আ[নিয়াছি] আনিয়াছি। ১৯০৮ সালে যদি কিছু থাকে তবে তাহা পাঠাইবেন। অন্যান্য বিষয়গুলিরও উত্তর সত্বর দিবেন। কে[মন] আছেন লিখিবেন, শরীর সুস্থ হইল কি না জানাইবেন। এখানক[ার] উপস্থিত মঙ্গল। পত্রখানির উত্তর অবশ্য অবশ্য দিবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীনিখিলনাথ রায়

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

ইথোরা
২১।৫।২১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, ৪ দিন পরে খুলনা হইতে আসি[য়া] আমার পত্রের উত্তর দিবেন। তাহার পর অনেক ৪ দিন

উত্তর চাই। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দশকুমারচরিতের ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে শুহন দেশ ও দামলিপ্তি সম্বন্ধে যে প্রকৃত পাঠ আছে সেইটুকু লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। আর যিনি অনুগ্রহ করিয়া পবনদূতটি নকল করিয়া দিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন। অথবা আপনার নিকট তাঁহার প্রণামি বা পারিশ্রমিক পাঠাইতে হইবে কি না তাহাও লিখিবেন। এখানে খুবই গরম পড়িতেছিল, কাল খুব ঝড় ও সামান্ত বৃষ্টি হইয়া কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে। আশা করি কুশলে আছেন।

ভবদীয়

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

ইথোরা

১।১।২১

সুহৃদ্বরেষু,

কয়েক দিন আর সংবাদাদি পাই নাই। আমার জিজ্ঞাস্যগুলির কি করিলেন? আমি আগামী বুধবার কলিকাতা যাইতেছি। সোম অথবা মঙ্গলবার প্রাতে আপনার নিকট উপস্থিত হইব। সেই বার জিজ্ঞাস্যগুলির উত্তর যেন অবশ্য অবশ্য পাই। বিশেষতঃ [illegible]র্দ্দল সিংহের সংবাদটা পাওয়াই চাই জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। এখানকার উপস্থিত মঙ্গল। সাক্ষাতে আর আর বিস্তারিত বলিব ও শুনিব।

ভবদীয়

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বিজ্ঞান কলেজ

কলিকাতা ২৮।১২।৩০ ইং

২-৩০ অপরাহ্ণ।

কল্যাণবরেষু,

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল-পঞ্চবিংশতি আমার এই ধারণা [illegible], হিন্দিমূলক গ্রন্থের অনুবাদ—মূল সংস্কৃতের নহে। তোমার ত [illegible]স্ত নখদর্পণে। এক লাইন লিখিয়া তোমার মতামত জানাইবে। অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চপুষ্প এই মাত্র পাইলাম। অতি সুন্দর ও [illegible]না তথ্যপূর্ণ। ক্ষুদিরাম বাবুর নিকট আমিও logic [illegible]ড়িয়াছিলাম।

শুভার্থী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল

১।৬।১৯২৮

[illegible]ক্তিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার কথামত আপনার জন্ত দু'দিন অপেক্ষা করেছি। [illegible]পনার মূল্যবান সময়ের উপর জুলুম না করিয়া আমি প্রস্তাব [illegible]রি, আপনি নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাবেন:

১। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক Nurse ছিল কি না?

২। যদি ছিল, তাহাদের কি নাম ও duty ছিল?

৩। তাহারা কি পুরুষ রোগীর শুশ্রূষা করিত?

৪। তাহাদের কি কোন বিশেষ পোষাক ছিল?

৫। কোন সেবিকা-বিশেষের যদি কোন বিশেষ বিবরণ থাকে তাহাও দয়া করে জানাবেন।

বিনীত

শ্রীসুন্দরীমোহন দাশ।

আগড়পাড়া, পোঃ কামারহাটা

২৪ পরগণা, ১৪।৩।৩৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে সেদিন যে যুবক চিত্রশিল্পীর কথা বলিয়াছিলাম আজ তাহাকে (শ্রীমান কৃষ্ণধন রায় দেবশর্ম্মণঃ) আপনার নিকট পাঠাইতেছি। আপনি বহুবার পানিহাটির মহোৎসব স্থল ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী দেখিয়া থাকিবেন। এই চিত্রশিল্পী সেই পানিহাটিতে শ্রীচৈতন্তদেবের বটতলার চিত্র আঁকিয়াছেন। চিত্রখানি দেখিলে স্মৃতির সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে পারিবেন। এইরূপ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চিত্রও দেখিবেন। এই চিত্রশিল্পী আমার বিশিষ্ট বন্ধুর পুত্র। আপনার কৃপায় যদি ইনি সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে চিত্রাঙ্কনের অর্ডার পান, তাহা হইলে উৎসাহ পাইয়া কাজে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

এই সঙ্গে আমার বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী তৃতীয় ভাগ পাঠাইলাম। গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার শরীর পুরাতন ডায়াবিটিসের উপর ভীষণ কার্ব্বাংক্লে ভাঙ্গিয়া পড়িবার কালে ও শয্যাগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই পুস্তক বাহির করায় প্রুফের ভুল বহু স্থানে দৃষ্ট হইবে। এইগুলি পাঠকের নিশ্চয়ই চক্ষুর পীড়াদায়ক। তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন।

আপনার "সরস্বতী" গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে পরম আনন্দ ও শিক্ষা পাইতেছি। তজ্জন্ত আমার আন্তরিক ধন্তবাদ গ্রহণ করুন। একাধারে দার্শনিক, তান্ত্রিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় এবং কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বের সমাবেশে গ্রন্থখানি প্রকৃতই উপাদেয় হইয়াছে। অন্ত খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম। বাণীর বহুবিধ অজ্ঞাতসম্পন্ন দুষ্প্রাপ্য কল্পনা মূর্ত্তি সকলের সুলভ করিয়া দিয়া আপনি সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। আপনার গ্রন্থ সরস্বতী আজ আপনার দেবী সরস্বতীর সেবক এবং আপনার উপাধিকে সার্থক করিল।

আশা করি ভাল আছেন। নমস্কার নিবেদন ইতি—

ভবদীয় গুণমুগ্ধ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সম্বলপুর

২৪শে আগষ্ট, ১৯১৫

সসম্মানে নিবেদন,

আমি এখন এই ল্যান্‌সডাউন রোডে ৩৩।১ বাড়ী[illegible] করিতেছি। আপনাদের অনুগ্রহ-প্রেরিত মর্ম্মবাণী পত্রি[illegible] ঠিকানা হইতে ফিরিয়া আসিতেছে এবং আমি সর্বদা[illegible]

সম্ভবতঃ আমি পত্রিকায় কিছু লিখিব মনে করিয়া উহা প্রেরিত হইয়াছে। আমি এখন সম্পূর্ণ অন্ধ হইলেও সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকি। কিন্তু ঠিক কিরূপ শ্রেণীর রচনা আপনাদের উপযোগী হইবে জানি না। অমূল্য বাবু যদি আপনার কাছে কখনও আসেন, তবে তাঁহাকে আমার ঠিকানাটি দিলে, অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত দেখা করিতে পারেন, কারণ তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই সদয়। তাঁহার সহিত দেখা হইলে এ বিষয়ে কথা হইতে পারে। যে প্রকার পরিচয়ে পত্র লিখিবার রীতি আছে, তাহা না থাকিলেও আপনাকে পত্র লিখিলাম।

ভবদীয়
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৩, মহেন্দ্র বোস লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা, ২৩।১।২৭

স্নেহাস্পদেষু,

ভায়া, পুস্তকখানি পাঠাইলাম। দয়া করিয়া পড়িবেন এবং আপনার অভিমত জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। বহু দিন দেখা নাই, কিন্তু তথাপি মনে করিতে পারিতেছি না, আপনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অতিশয় অসুস্থ, নহিলে স্বয়ং পুস্তকখানি আপনার হাতে দিতাম। "শকুন্তলার নাট্যকলা" আমি একটু নূতন ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইংরাজী নাট্যকলার রীতি অনুসারে শকুন্তলার এবং সংস্কৃত নাট্যসূত্র অনুসারে মহাকবি সেক্সপীয়ার, ইবসেন্, অস্কার ওয়াইল্ড্, প্রণীত কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করিয়াছি। আপনার একটু অভিমত পাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

তারিখ ও ঠিকানা নাই

স্নেহাস্পদেষু,

শনিবার আপনার আসিবার কথা ছিল। না আসায় আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছি। শরীর কি অসুস্থ হয়েছে? উত্তর দিয়ে চিন্তা দূর করবেন। আপনি আমার প্রদত্ত যে ভার দয়া করে গ্রহণ করেছেন, তার কি হল? যাই হউক, সে সম্বন্ধে আপনাকে একটু খাটতে হবে। এখন আর আমার বন্ধু-বান্ধব কাউকে খুঁজে পাইনি। সব প্রস্থান করেছে। তার পর এক দিন দেখা দিয়ে আমাকে যে কি করে গেছেন, তা ব্যক্ত করা যায় না। আশা করি, শরীরের জন্য কোন প্রতিবন্ধক হবে না। ভালই আছেন।

শুভার্থী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

ওরিয়েণ্টাল ম্যাডিক্যাল হল
ভট্টবাজার, পূর্ণিয়া
১।৬।৩০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রিয় বিদ্যাভূষণ মশাই, গত ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে যেতে হয়, ফেব্রুয়ারীতে এখানে ফিরি। ফিরে পর্য্যন্ত শরীর-মন স্বচ্ছন্দ না থাকায় কোনো কর্ত্তব্যেই মন দিতে পারিনি। তার উপর দেশের মাথা নানা কারণে বিক্ষিপ্ত। তার ধাক্কা সব মাথাতেই পৌঁচুচ্ছে, কোনো কাজেই চিত্ত একাগ্র হয় না। সুবিধার মধ্যে সময়ে অসময়ে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অপেক্ষা না রেখে) দুর্গা নামটা আপনিই বেরয়। তাতে পরকালের কাজ হয় কি না জানি না,—এখন ইহকাল সামলালেই যে বাঁচি। তরণীসেনের কাটা মুণ্ড "রাম"নাম উচ্চারণ করেছিল—নিশ্চয়ই অজ্ঞানে। আমাদের গোটা মুণ্ডুর দুর্গানাম উচ্চারণ কি কোনো ফল দেবে না? দুর্গা বলে ঝলে পড়ার একটা উপদেশও শুনতে পাই, তবে, সেটায় রুচি নেই। যাক্ এই অবস্থা। একটু-আধটু পড়ি, আজ বৈশাখ সংখ্যা পঞ্চপুষ্পখানি শেষ করে, হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় ভারি সন্দেহে প'ড়ে গিয়েছি। সমালোচনার্থ "কোষ্ঠীর ফলাফল" নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে পৌঁছয়নি দেখছি। নচেৎ সে সম্বন্ধে কিছু দেখতেই পেতুম। মনে আছে, নাগপুরে যাবার আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের মার্ফৎ—পঞ্চপুষ্পের জন্য এক কাপি পাঠাবার ব্যবস্থা করে যাবার ইচ্ছা ছিল। কারণ ও-জাতের বইয়ের সমালোচনার ভার নিশ্চয় তাঁর উপরেই দেবেন।

মনের অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল—শ্রদ্ধেয় ললিত বাবুকে হারিয়ে। অভিভাষণ পর্য্যন্ত শেষ করতে পারিনি। বই পাঠাবার ইচ্ছাটা তাই বোধ হয় মনেই রয়ে গিয়েছিল বা লয় পেয়েছিল।

তারির সাজা আমার জন্যে তোলা ছিল,—লজ্জা ও অপরাধ দুই অনুভব করছি। সমালোচনার জন্যই ত কেবল বই পাঠানো নয়, আপনাদের মত সুধী ক্ষেত্রে না পাঠানোটাই যে অপরাধ। এখন ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। এই রেজেষ্টী করে পাঠাচ্ছি। আপনারা অনুগ্রহ করে এবং কষ্ট স্বীকার করে সবটুকু পড়লেই আমার লেখা সার্থক হবে। যতীন্দ্র বাবু ছুটিতে এখন কোথায় আছেন জানি না। তাঁকে আমার যোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বলবেন—আমি অপরাধ স্বীকার করছি।

এই জন্যেই সাহিত্য-সংশ্রবে থাকতে গেলে কলকেতাই প্রশস্ত স্থান। যেখানে সুবিধা, সুযোগ সবই পাওয়া যায়, সব পথ খোলা। প্রবাসীর সাহিত্য-সংশ্রব বিড়ম্বনা। না থাকার সামিল।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার নমস্কার নিন।

ভবদীয়
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওরিয়েণ্ট মেডিকেল হল
ভট্টবাজার, পূর্ণিয়া
১৫।৪।২৯

শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়,

ক্ষমা করিবেন—কার্য্যান্তরে ছিলাম। আপনার সম্পাদিত ও প্রেরিত পঞ্চপুষ্প দেখিয়া সত্যই মনে হইল প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা আর কাহাকে বলে। লেখায়, আকারে, সৌষ্ঠবে, কোন পত্রিকা অপেক্ষা হীন নহে। তবে সব জিনিষেরই ভাগ্য আছে এবং তাহাই মূল। প্রার্থনা করি, পঞ্চপুষ্প তাহাতে যেন হীন না হয়। ভাগ্যদোষে আমরা অনেক ভাল জিনিষ হারাইয়াছি।

দেখা হইলে বলিতেন—এখানে কিছু হবে না, এটা বাণীমন্দির। আপনি পায়ে পায়ে হাসপাতাল দেখুন—ওই ঐ দিকে। বয়স ও

স্বাস্থ্য আমার দুই প্রতিকূল। . বলিতে লজ্জা হয়—আমায় আর কিছু আসে না। এটা সত্য কথা। তবে সত্য বলিতে নিজেই অভদ্রতার অপরাধ অনুভব করিতেছি। সৌভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত কাহারও অরুচি থাকে না। আপনি লেখা চাহিয়াছেন, ইহাও আমার সৌভাগ্যের কথা। আমি সুবিধা মত নিশ্চয়ই লিখিব। তবে দিন-ক্ষণের গণ্ডির মধ্যে পড়িবার সামর্থ নাই। আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে হইবে।

ভবদীয়

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃ—যতীন্দ্র বাবুর পত্রও পাইয়াছি। দিন দুই মধ্যেই তাহাকে পত্র লিখিব।

ভট্টোবাজার, পূর্ণিয়া
বিজয়াস্তে, ১৩০৭

শ্রদ্ধেয় প্রিয়বর,

যতীন্দ্র বাবুর মার্ফৎ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ পূর্ব্বেই পাঠিয়েছি। আজ আবার শুভ কামনা জানাবার সুযোগ পেলুম,—সুস্থ শরীর ও মনে দেশের সাহিত্য সমুজ্জ্বল করুন।

সাধু সাক্ষাতে শুধু হাতে যেতে নেই। তাই ওই কবিতাটি নিয়ে যাওয়া। ওটা যে ছাপতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। মর্য্যাদা নষ্ট না হয়তো দেবেন।

আমার শরীর আর সম্পূর্ণ ভালো থাকবার আশা করি না। একটু ভালো আছি। আপনারা ভালো থেকে দেশের কাজ করুন—এই প্রার্থনা করি। আমাদের ভাষা আজো······জিনিষ প্রকাশের সামর্থ্য অর্জ্জন করেনি। একটা জঙ্গল কি বাগানের খুঁটিনাটি প্রকাশ করতেও পারে না। বর্ণনা জিনিষটার চাল উঠে গেলেও সামর্থ্যের সরঞ্জাম থাকা তো চাই। রকম রকম বিষয়ে হাত না দিলে ভাষা আর এগুবে কি করে। লোকের লেখবার ইচ্ছা থাকলেও কাটতির পথ পরিসর নয় বলেই বোধ হয় কেউ চেষ্টা পান না। হতাশ হতে হয়। লেখকদের সাহায্যকল্পে সাহিত্যানুরাগী ধনিকদের সংঘবদ্ধ সমিতি থাকা দরকার নয় কি? নচেৎ সাহিত্যে যে কেবল গল্পের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে। প্রকাশ-শক্তি সীমাবদ্ধ থাকবে। আপনারা ভেবে দেখবেন। পোষ্টকার্ডের মধ্যে কথাটা পরিষ্কার করে বলা হল না।

আপনার

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
৩রা মার্চ্চ, ১৯২১

সবিনয় নিবেদন,

পত্রবাহক আমার ছাত্র—শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায়—গত বৎসর বাংলায় এম্-এ পাশ করেছেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঢাকা ইউনিভারসিটিতে কিছু কাজের জন্য আবেদন করতে চান। আমি স্যার আশুতোষের ইউনিভারসিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে আমার গুরুজীর বিরাগ-ভাজন হয়েছি, আমি এঁকে পরিচয় করাতে নিয়ে গেলে কুফল ফলবে। তাই এঁকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, আপনি যদি এঁকে শাস্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ভারটি নেন, তা হলে অনুগৃহীত হব। আপনাকে একটু বিব্রত করছি, ক্ষমা করবেন জানি বোলেই।

ভবদীয়

৪৪ নীলক্ষেত রোড, রমনা, ঢাকা,
১৬ পৌষ, ১৩৩১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি গোরক্ষবিজয়ের যে ব্যাখ্যা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত এবং বিস্মিতও হয়েছি। কলকাতা থেকে কবি গিরিজাকুমার বসু সস্ত্রীক আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তাই ব্যস্ত থাকায় প্রাপ্তি স্বীকার করতে বিলম্ব হল। আজ তাঁরা গেলেন।

১। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ নামক গ্রন্থাংশের ভণিতায় দু'জায়গায় আছে—

কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তনু ভগবানে।
(বঙ্গবাসী সংস্করণ গ্রন্থাবলী ৩৩ পৃষ্ঠা)

ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তনু ভগবানে।
(একেবারে গ্রন্থ সমাপ্তিতে)

১। প্রথম স্থানে পরীক্ষিত এবং তনু একসঙ্গে ও দ্বিতীয় স্থানে দুটি শব্দ পৃথক্ পৃথক্ আছে।

২। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব মোটামুটি ৫।৭ পংক্তিতে কি জানালে উপকৃত হব।

৩। জন্মাদ্যস্য যতঃ—সূত্রের অর্থ সংক্ষেপে কি?

ভবদীয় সশ্রদ্ধার্পিত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহরি

ঢাকা হল, রমনা
ঢাকা, ১৫।৬।২১

বন্ধুবরেষু,

কালই আপনার কথা মনে হচ্ছিল। কালই আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম এবং আপনার পারিবারিক সংবাদে দুঃখিত হলাম। আপনার কাছে আমি চির ঋণে আবদ্ধ। আপনার আদে[illegible] আমি পালন করবো। কিন্তু কবে করতে পারবো জানি না। সম্প্রতি আমার শরীর ও মন অত্যন্ত অসুস্থ ও অকেজো হয়ে আছে লেখবার ইচ্ছা ও আগ্রহ হয় না। যদি মনকে রাজি করাতে পারি জুলাই মাসে গল্প লেখবার চেষ্টা করবো। জুন মাসের বাকী ক[illegible] দিন আমি একটু পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছি। শনিবারের চি[illegible] দেখেন? এখনও কি আমার লেখার কোনো মূল্য আছে সুশীল বাবু (দে) এবং মোহিত বাবু (মজুমদার) আমার সহকর্মী তাঁরা আমার প্রতিষ্ঠা সহ্য করতে পারছেন না। রামানন্দ বাবু পুত্রকন্যা ও কর্ম্মচারীরাও আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। ১৫ বৎসর প্রবাসীর জন্য প্রাণপাতকর সেবার ঋণ শোধ তাঁরা করছেন। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন। জলধর বাবুর মতন সজ্জনকে যারা অপদস্থ করতে চায়, তাদের ভগবান ক্ষমা করুন।

ভবদীয়

চারু বন্দ্যো[illegible]

ঢাকা হল, রমনা
ঢাকা, ২৪।১১।২৮

বন্ধুবর,

আপনার পত্র পেয়ে সুখীও হলাম, দুঃখিতও হলাম। আপনার ন্যায় সাধু পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভগবান যে কেন এমন কঠিন পরীক্ষা করছেন জানি না। ভক্তের চিত্তের কালিমা দূর করবার জন্যই বোধ হয় এই অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা। আপনার বন্ধুত্ব লাভ আমার পরম ভাগ্য। আমি নিতান্ত সামান্য অকিঞ্চন, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কবিকঙ্কণ সম্পাদনের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারতাম না। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার মঙ্গল। মধ্যে মধ্যে আপনার সংবাদ পেলে সুখী হব।

ভবদীয়
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমনা, ঢাকা
১২।৩।২৬

বন্ধুবরেষু,

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমাদের মঙ্গল। আবার জিজ্ঞাসু হয়ে শরণাপন্ন হচ্ছি। জিজ্ঞাসা এই—শতপথব্রাহ্মণ ৩।২।১।২৩-২৪ পাঠটি কি? এখানে বই নেই যে দেখি। তার মধ্যে যে "হেলবো হেলবঃ" শব্দ আছে তার সঙ্গে হুলুধ্বনির কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কি? ছান্দোগ্য উপনিষদে উলুলবঃ আছে আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। এখন শতপথব্রাহ্মণের ঐ শব্দের তাৎপর্য্য জানতে চাই।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা বুদ্ধদেবকে তথাগত বলে কেনো। কিসে কে কোন্ উপলক্ষে তাঁকে তথাগত বলেছেন? এই জিজ্ঞাসা দুটির মীমাংসা জানালে উপকৃত ও সুখী হবো।

ভবদীয়
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমনা, ঢাকা
২২।৩।২৭

বন্ধুবরেষু,

বহু কাল সংবাদ পাইনি। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পাই না। Official চিঠি লিখেও কোনো প্রতিকার হয়নি। তাই পরিষৎ-সম্পাদক যখন নিরুত্তর তখন বন্ধু অমূল্য বাবুকে একটু তদারক ও তাগাদা করতে অনুরোধ করছি। ১৩৩২ প্রথম সংখ্যার পর আর কিছুই পাইনি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ্য, অথচ বইগুলি ছাপবার চাড় পরিষদের নেই। কিছু ব্যবস্থা হয় না?

আমাকে এক খণ্ড করে ঐ তিনখানি বই সংগ্রহ করে দিতে পারেন? যদি একেবারে আমার হয়ে যাবে এ রকম ভাবে নাও দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ মাণিক গাঙ্গুলির বইখানি যদি মাস খানেকের জন্যে ধারে পাঠাতে পারেন তো উপকৃত হই। আমার [illegible]

মাণিক গাঙ্গুলি গণেশকে বৈমাতুর বলেছেন এবং শিব বৃকাসুরকে হরিভক্ত করেছিলেন। এমন কথা তো কখনো শুনিনি? আপনার জ্ঞানভাণ্ডারে এর কোনো সন্ধান আছে?

ভবদীয়
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমনা, ঢাকা
কোজাগর পূর্ণিমা, ১৩৩২

বন্ধুবর,

বিজয়ার প্রীতি আলিঙ্গনে হৃদয় তৃপ্তিতে পূর্ণ হলো, আপনিও আমার সাদর আলিঙ্গন অনুভব করবেন। বন্ধুত্বের বন্ধনে গরিব ধনীর ব্যবধান থাকে না, আমি ত ধনীও নই যে গরিব বন্ধুকে ভুলে যাবার আশঙ্কা থাকবে। আপনাকে ভুললে যে আমি অমানুষ কৃতঘ্ন প্রতিপন্ন হয়ে যাবো। সাহিত্য পরিষদের গোলমালে আপনার কথা অনেক বারই মনে হয়েছিল। আপনি ব্যস্ত থাকেন বলে অকারণে চিঠি দিয়ে বিব্রত করিনি।

আমার কবিকঙ্কণ চণ্ডী কি পেয়েছেন? কলিকাতা ইউনিভার্সিটি আমার বন্ধুদের উপহার দেবার ভার নিয়েছেন।

সাহিত্য পরিষদের অপ্রাপ্য পুস্তকগুলি কি আর ছাপা হবে না? বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। আশা করি কুশলে আছেন। আমার মঙ্গল।

ভবদীয়
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমনা, ঢাকা,
২১, ৪, ২৭

সুহৃদ্বরেষু,

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে—

১। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাক্যটি কোন্ শাস্ত্রে আছে? কার উক্তি?

২। "তেজীয়সাং ন দোষায়" বাক্যটি ভাগবতের কোন্ স্কন্ধে আছে?

৩। "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ" এই উক্তি কোন্ শাস্ত্রের বা কার?

৪। শান্তিনিকেতন উপাসনার মন্ত্র—"ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি মা মা হিংসীঃ।" এই মন্ত্রটি কোন্ উপনিষদের? Jacob's Concordanceএ পেলাম না।

৫। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।

—মন্ত্রটি কোন্ উপনিষদের?

অনুগ্রহ করে শীঘ্র উত্তর দিলে সুখী ও উপকৃত হবো।

ভবদীয়
[illegible]

৩ সুকিয়াস্ রো
৩০ মে, ১৯২৫

সবিনয় নিবেদন,

এই সঙ্গে "চতুর্ভাণী"খানি পাঠাইলাম। আশা করি সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আপনার দেখা হইয়া যাইবে।

কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, জয়দেবের পদ্মাবতী মন্দিরের দেবদাসী ও লক্ষ্মণসেনের সভায় নর্ত্তকী ছিলেন, পদ্মাবতীর নৃত্যকালে জয়দেব ছাড়া আর কেহও মৃদঙ্গে তানলয় অনুসারে সঙ্গত করিতে পারিত না। তাই জয়দেব হইতেছেন "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী", এই উক্তি কোথাও আপনি দেখিয়াছেন কি? এবং ইহার মূলে কোনো প্রাচীন প্রবাদ বা পুস্তক আছে? আপনার সুবিধামত এই সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিয়া যদি আমায় দেন, বড়ই ভাল হয়। নিবেদন ইতি।

বশংবদ
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গয়াধাম
৭।১১।১৯২৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অমূল্য বাবু, আপনার পত্র ও তৎসঙ্গে প্রেরিত পরিচয় পত্রগুলি যথাসময়েই হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে দেরী হইয়া গিয়াছে বলিয়া মার্জ্জনা চাহি। বিশেষ খেদের বিষয় ও আমার দুর্ভাগ্য যে, এবার বোধ হয় বৃন্দাবনে অবস্থান ঘটিয়া উঠিল না। পুত্রের অসুখ ও তৎপরে বাতজ্বরে নিজে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় ৮টি দিন এখানে নষ্ট হইল। আমার অন্য অন্য স্থানের কার্য্যক্রম উলট পালট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় এবার বৃন্দাবন দর্শনের সঙ্কল্প বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলাম। ভবিষ্যতে আশা রহিল, ভালো করিয়া দেখিব।

আপনিও আমার বিজয়ার প্রীতি-নমস্কার ও আলিঙ্গন জানিবেন। ইতি বশংবদ

ভবদীয়
শ্রীসুনীতিকুমার।

আপনি কি জানেন?

(কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথম ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়?)

শ্রীবিমানকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংখ্যা	দেশ	রাজধানী	কোন্ বৎসর ডাক-টিকিট প্রথম আরম্ভ
১	গ্রেট ব্রিটেন	লণ্ডন	১৮৪০
২	ব্রাজিল	রিও-ডি-জেনিরো	১৮৪৩
৩	ইউ-এস-এ	ওয়াশিংটন	১৮৪৫
৪	ফ্রান্স	প্যারিস	১৮৪৯
	বেলজিয়ম	ব্রুসেলস্	১৮৪৯
৫	স্পেন	মাড্রিড	১৮৫০
৬	ক্যানাডা	অটোয়া	১৮৫১
৭	হল্যাণ্ড	হেগ	১৮৫২
৮	ভারতবর্ষ	দিল্লী	১৮৫২
৯	সুইডেন	ষ্টকহলম	১৮৫৫
১০	নরওয়ে	অসলো	১৮৫৫
১১	রাশিয়া	মস্কো	১৮৫৭
১২	পেরু	লিমা	১৮৫৭
১৩	সিলোন	কলম্বো	১৮৫৭
১৪	রুমানিয়া	বুখারেষ্ট	১৮৫৮
১৫	গ্রীস	এথেনস্	১৮৬১
১৬	ইতালি	রোম	১৮৬২
১৭	তুরস্ক	এংগোরা	১৮৬৩
১৮	পারস্য	তেহারাণ	১৮৭০
১৯	জাপান	টোকিও	১৮৭১
২০	হাংরী	বুডাপেষ্ট	১৮৭১
২১	জার্ম্মাণি	বার্লিন	১৮৭২
২২	চীন		১৮৭৮
২৩	বুলগেরিয়া	সোফিয়া	১৮৭৯
২৪	অষ্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	১৯০২
২৫	যুগোশ্লোভিয়া	বেলগ্রেড	১৯১৮
২৬	আইরিস ফ্রি ষ্টেট	ডবলিন	১৯২২

তাসের দেশে রবীন্দ্রনাথ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তাসের দেশ রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটিকা। নাটিকার নায়ক রাজপুত্র সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। রাজপুত্র বেরিয়ে পড়তে চায় সোনার খাঁচা থেকে। তার প্রাণে এসেছে মহাকাশের আহ্বান। বুড়ো দৈত্যের দুর্গে বন্দিনী হ'য়ে আছে নবীনা। সেই নবীনাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুত্র ব্যাকুল। অকূলে তরী ভাসিয়ে রাজপুত্র একাকী দিল অজানার বুকে ঝাঁপ। রাজকুমারের ভাঙা তরী ভিড়লো তাসের দেশে। সেখানে বার্দ্ধক্যের জগদ্দল পাথরের চাপে যৌবন নিষ্পেষিত। রাজপুত্র দেখে, দেশের মানুষগুলো বেঁচেও নেই, মরেও নেই। তাদের মন বলে কোন বালাই নেই। কিন্তু রাজপুত্র পুরুষসিংহ। নৈরাশ্য তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেলো না। তাসের দেশের লোকেরা যতই মনমরা হোক, তাদের ঢাকা-পড়া যৌবন এক দিন উদ্‌ঘাটিত হবেই—এ বিষয়ে রাজপুত্র নিঃসংশয়। তাসের দেশে নিয়মের আধিপত্য। সেখানে বিধি-নিষেধের বেড়াজালের পর বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। তাসের দেশের লোকদের চাল আছে চলন নেই। চলতে তারা জানে না। তারা প্রাচীনের ভক্ত, অতীতের অনুরাগী। তাদের চোখ দু'টো সামনে নয়, পিছনে। আধুনিককে তাদের সন্দেহ। সমুদ্রপারের দূত রাজপুত্র নিয়মের রাজত্বে আনলেন ঝড়ের বাণী, যেখানে ছিলো কবরের নির্জীব শান্তি সেখানে আনলেন উৎপাত, অশান্তি। ঝড়ের ঝাপটা লেগে তাসের দেশে নিয়ম গেল উড়ে। তাসের দেশের পুরুষরা চাইলো রাজপুত্রের নির্বাসন। মেয়েরা দিলো বাধা। রাজপুত্রের মুখে ঝড়ের বাণী শুনে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। যে নিয়মের বেড়াজালে তাদের জীবন ছিল অবরুদ্ধ, সেই বেড়া ভেঙে মেয়েরা বেরিয়ে এলো মুক্তির মধ্যে। শান্তি ছিলো যাদের একমাত্র লক্ষ্য তারা আরামের পরিবর্তে। চাইলো জীবনের প্রাচুর্য্য। রাজা নিরুপায় হয়ে হার মানলেন। বুড়ো দৈত্যের দুর্গে বন্দিনী নবীনা পেলো মুক্তি। তাসের দেশ হোলো আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ—যেখানে মানুষগুলোর মন বলে কোন বালাই নেই অর্থাৎ যেখানকার লোকেরা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখে না, নিজেদের কান দিয়ে শোনে না, নিজেদের মন দিয়ে ভাবে না। তাসের দেশের লোকেরা জীবন্মৃত। তারা ছায়া, তারা প্রতিধ্বনি। ছক্কা বলছে, "ব্রহ্মা হয়রাণ হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন [illegible] হাই থেকে যাদের

উদ্ভব তাদের কাছ থেকে কোন রকমের উদ্যম আশা করা মূঢ়তা। তাসের দেশের লোকেরা অলস, শান্তিপ্রিয়। তারা চলতে চায় না, আরাম চায়। তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হোলো জড়তা। নিয়মকে মানতে তারা অভ্যস্ত। তাদের মূলমন্ত্র হোলো, 'চলো নিয়ম মতে।' বাঁধা-ধরা রাস্তায় পুরাতন চালে চলেছে তাসের দেশের লোকেরা। তাদের কোন পরিবর্ত্তন নেই। শুয়ে শুয়ে তারা কাল কাটায়। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড়ো মহাপাপ হোলো তার জড়তা। তাসের দেশের লোকেরা এগোতে চায় না। তারা inert uncreative mass. রাজপুত্র যখন তাসের দেশের লোকদের বললো সামনের দিকে এগোবার কথা, চলবার কথা, তখন ছক্কা বলে বসলো অম্লানমুখে, 'চলা! চলবে কেন তুমি? চলবে নিয়ম।' পাঞ্জা বলছে রাজপুত্রকে, 'এই নাও ভুঁই-কুমড়োর ডাল একটা করে—বোসো ঈশান কোণে মুখ করে—খবরদার, বায়ু-কোণে মুখ ফিরিও না।' যাদের মন বলে কোন বালাই নেই, পুরুত-পাণ্ডা-তাগা-তাবিজের আধিপত্য আবহমান কাল ধরে যারা মানতে অভ্যস্ত, এমন কথা বলা তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক। অবশ্য এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন, Mimesis is a generic feature of all social life.* সকল কালের সকল দেশের সাধারণ লোক অনুকরণ-প্রিয়। আদিম সমাজে, সুসভ্য সমাজে সর্ব্বত্র অনুকরণপ্রিয়তাই জনসাধারণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দিলীপ রায় আর শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণ থেকে রবি ঠাকুরের এবং গান্ধীজীর পর্য্যন্ত অনুকরণ—অনুকরণ নেই কোথায়? গানে, অভিনয়ে, কবিতায়, চিত্রে—অনুকরণেরই ছড়াছড়ি সর্ব্বত্র। সুতরাং জনসাধারণ অনুকরণপ্রিয় ব'লে নাসিকা কুঞ্চিত করবার নেই কিছু। কথাটা হচ্ছে—অনুকরণ চলবে কার? অনুকরণের প্রবাহ চলবে কোন্ দিকে? সামনের দিকে না পিছনের দিকে? শ্যাওলা-ঢাকা আদিম সমাজগুলিতে দেখা যায়, জনসাধারণ অনুকরণ করছে বাপ-পিতামহের আচরণের। তাদের মনকে শাসন করছে মৃত পূর্ব্বপুরুষেরা। পরলোকগত পিতামহ-প্রপিতামহ সমাজের জীবিত প্রবীণপাকাদের পিছনে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে প্রেরণা আর তরুণ-তরুণীরা প্রবীণদের নির্দ্দেশে নতশিরে চলেছে আজন্ম-পরিচিত বাঁধা-ধরা রাস্তায়। নিয়মের বাইরে যেতে তাদের মন কেঁপে ওঠে ভয়ে। যে সকল সমাজে জনসাধারণের দৃষ্টি এই ভাবে পিছনে নিবদ্ধ, তাদের মনের উপরে চেপে আছে অতীতের জগদ্দল পাথর, তাদের অস্তিত্ব কবলিত নিয়মের রাহু গ্রাসে সেখানে আচারের রাজত্ব এবং সমাজ নিশ্চল। সেখানে শাস্ত্রের কারাগারে জ্ঞান হত, আচারের মরু-বালুরাশিতে বিচারের স্রোতঃপথ অবরুদ্ধ, পুঁথির অনুশাসনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে সমাজ যেখানে প্রগতিশীল সেখানে জনসাধারণের কর্ম্মধারায় ও চিন্তাধারায় উপরে সেই সব অতিমানুষের বিরাট প্রভাব যাঁরা মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ। এই রকমের প্রগতিশীল সমাজে নিরর্থকের আবর্জ্জনা ঠেলে ফেলে, নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে আরামের মোহকে জয় করে জনসাধারণ চলেছে নবজীবনের অভিসারে সত্য-শিব সুন্দরের কণ্ঠে বরণ-মাল্য দুলিয়ে দিতে।

সমাজ স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে না। জনসাধারণ আপনা থেকে চলতে চায় না। তাদের নিশ্চল পায়ে

---

* Arnold J. Toynbee—A Study of History.

নাচের চাঞ্চল্য আনবার জন্য দরকার হয় অরফিউসের বাঁশরির। অরফিউস্ বাঁশি বাজায় আর তার সুরে-সুরে জনতার রক্ত লাগে দোলা। তাদের জড়তার নাগপাশ যায় খুলে। দুর্গম পথে তাদের অভিযান হয় সুরু। জনতাকে নাচানোর জন্য অরফিউস চাই। ইতিহাসে বাঁশি হাতে এই অরফিউসেরা যখন আসে তখন সুরু হয় গণরাজের প্রলয় নাচ। লেনিন, গান্ধী, লিঙ্কন এঁরা হলেন ইতিহাসের অরফিউস। আরবের মরুভূমিতে প্রাণবন্যা আনবার জন্য দরকার হয় মহম্মদের।

তাসের দেশের ছক্কা-পঞ্জাদের জড়তা ঘুচিয়ে তাদের জীবনকে রূপান্তরিত করবার জন্য প্রয়োজন ছিল এক জন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষসিংহের, যে তার স্বপ্নকে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারবে জনসাধারণের হৃদয়ে। এই creative personality হোলো রাজপুত্র—যে কণ্ঠে নিয়ে এলো ঝড়ের বাণী তাসের দেশে। রাজপুত্র অনাসক্ত, তাই দুঃসাহসী। লক্ষ্মীর পাকা আশ্রয় ছেড়ে যেতে রাজপুত্রের মনে কোন কুণ্ঠা এলো না। কুণ্ঠা এলে রাজপুত্র অজানা সাগর-বক্ষে পাড়ি দিতে পারতো না বুড়ো দৈত্যের দুর্গে বন্দিনী হ'য়েছিলো যে নবীনা তাকে উদ্ধার করতো। দুনিয়ায় সাহস আছে কেবল লক্ষ্মীছাড়াদের। ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ যে মানুষ সে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবে কেমন ক'রে? নিজের মধ্যে ত্যাগ এবং শৌর্য্য যদি না থাকে অন্যের কাছ থেকে ত্যাগ এবং শৌর্য্য দাবী করবার জোর আসবে কোথা থেকে? নাট্যকার তাই রাজপুত্রকে তৈরী করেছেন প্রেমিক, পাগল, অনাসক্ত পুরুষ ক'রে। রাজপুত্র দুঃসাহসী, বে-পরোয়া।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইব না আর কভু।

রাজপুত্র কূলহীন সমুদ্র-বক্ষে ডুবতে রাজী আছে। কিন্তু তাকে বেরুতেই হবে সাগর-পারের নবীনাকে উদ্ধার করবার জন্য। দেশের যৌবন ঢাকা পড়ে আছে মৃত অতীতের আবর্জ্জনার তলায়। ঢাকা খুললেই বেরিয়ে পড়বে তার নূতন রূপ। সেই আবরণ উন্মোচনের দুঃসাধ্য কাজে রাজপুত্র হলেন ব্রতী। নূতন যৌবনের দূত রাজপুত্র তাসের দেশে গান ধরলেন—

আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।

গান শুনে ছক্কা-পঞ্জা পরস্পর মুখ চেয়ে বললে, 'এ চলবে না, এ চলবে না।' অগাধ জলে অনিশ্চিতের বুকে ঝাঁপ দেবার কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ শোনায়নি তাদের কানে। পুরুষানুক্রমে তারা শুনে এসেছে বুড়োদের মুখে:

চলো নিয়ম মতে।
দূরে তাকিও না কো,
ঘাড় বাঁকিয়ো না কো,
চলো সমান পথে।

তাস-মহাসভার জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে,

ইস্কাবন, চিঁড়েতন, হরতন
অতি সনাতন ছন্দে কর্ত্তেছে নর্ত্তন।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে, কেউ বা একটু নাহি নড়ে—
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্ত্তন।

এর মধ্যে চলার কথা কোথায় নেই। আছে তাসের দেশে জড়তার পরিচয়।

কিন্তু যৌবনের লক্ষণ চলায়। ভুঁয়ে শুয়ে কালকর্ত্তন বার্দ্ধক্যে চিহ্ন। প্রগতির পথে আরামের মতো শত্রু নেই। তাসে দেশের মানুষেরা আরাম চায়, সুখ চায়, শান্তি চায়। দুঃখকে তাদে ভয়, বিপদকে এড়িয়ে চলতে চায় তারা, মরণকে তারা অনাত্মী করে রেখেছে, সংগ্রাম কথাটা তাদের অভিধানে কোথাও নেই অথচ নব-জীবনের প্লাবন আসে মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে। বীজ ম যায় মাটির অন্ধকারে। সেই মৃত্যু থেকে যে জীবন আসে তার পরিচয় মাঠে-মাঠে শ্যাম-শস্য-হিল্লোলে। সভ্যতার ইতিহাস আলোচ করলে দেখা যায়, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের সভ্যতাকে তারা দিয়েছে এগিয়ে লক্ষ্মীর বরমাল্য তারাই পরেছে গলায়। কোন ন কোন রকমের সংগ্রাম আমাদের সুখের পক্ষে অপরিহার্য্য। কেবল সংগ্রামের পথেই আমাদের শক্তিকে আমরা অটুট রাখতে পারি— এ হচ্ছে প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সংগ্রাম যেখানে শে হয়েছে সেখানে দেখা দিয়েছে অবনতি। আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি—এও তো একটা বিরাট রকমের সংঘর্ষের ফলে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের সান্নিধ্যে এলো এক ভবঘুরে তারা। তার আকর্ষণে সূর্য্যের বুকে জাগলো জোয়ার পর্ব্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে উঠলো একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ। তারা সূর্য্যের যত কাছে আসতে লাগলো ঢেউ ততই উঁচু থেকে আর উঁচু হয়ে উঠলো। তার পর সেই তরঙ্গের পাহাড়টা গেলো চূর্ণ-বিচূ হয়ে। তার টুকরোগুলো গেল দিখিদিকে ছড়িয়ে—ঢেউয়ের মাথ ভাঙলে জলকণাগুলো যেমন ছিটকিয়ে যায় চারি ধারে। সূর্য্যে ভাঙা টুকরোগুলো সেই থেকে আজও শূন্যে শূন্যে ঘুরছে। এ টুকরোগুলোই হচ্ছে আকাশের ছোট-বড়ো সব গ্রহ আর এই গ্রহদে মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী হোলো একটি। সংঘর্ষ ছাড়া সৃ কোথায়?

তাসের দেশের লোকেরা সংগ্রামকে এড়িয়ে সব চেয়ে ক্ষ করেছে নিজেদেরই। রাজপুত্র তাসের দেশে এসে সদাগরকে বলছে— 'দেখলে না, এখানকার মানুষগুলো বেঁচেও নেই মরেও নেই।' এ জীবন্মৃতদের ঘা মেরে বাঁচানোর জন্যই রাজপুত্র তাদের কানে দিলে ঝড়ের বাণী আর সে বাণী হোলো, "বেড়ার নিয়ম ভাঙলে পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে। নইলে এগোব কী করে?" কি চলব না—এই পণ করেছে যারা, কোন রকমের পরিবর্ত্তনকে মানব ন —এই যাদের প্রতিজ্ঞা, তারা 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উদ্গাতাকে স্বভাবতঃ মনে করবে সমাজের শত্রু, মনে করবে উৎপাত এসেছে তাদে জ্বালাতে। ইহুদীরা খৃষ্টকে মনে করেছিলো মূর্ত্তিমান উৎপাত— তাই মাথায় তাঁর কাঁটার মুকুট পরিয়ে তারা তাঁকে ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে মেরেছিল। গ্রীসের লোকেরা সক্রেটিশকে উৎপাত মনে

"াকে বিষ পরিবেশন করেছিল। নিয়মকে যারা চিরদিন মানতে অভ্যস্ত তারা যখন নিয়মের বেড়া ভেঙে অগাধ জলে ঝাঁপ দেবার আহ্বান শুনলো রাজপুত্রের মুখে, তখন তাসের দেশের লোকেরা বিষম বিচলিত হয়ে উঠলো। রাজপুত্র পবিত্র তাসভূমির কুষ্টিকে জাহান্নমে পাঠাতে বসেছে—এই কলরব উঠলো দিকে দিকে। রাজা ডেকে পাঠালেন তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদককে। সম্পাদক এসে রাজাকে পরামর্শ দিলো, 'বাধ্যতামূলক আইন চাই। স্বদেশের কুষ্টিতে বিদেশের কুষ্টি যেন লাঙল না চালায়।' পঞ্জা রাজপুত্রের নির্বাসন দাবী ক'রে রাজাকে বললে, 'রাজা সাহেব নির্বাসন, ওকে নির্বাসন।'

কিন্তু রাজপুত্রের ঝড়ের বাণী স্পর্শ করেছে তাসদ্বীপের রাণীর মনকে। সকলে যখন চীৎকার করছে—'কুষ্টি, কুষ্টি, তাসদ্বীপের কুষ্টি। বাঁচাও সেই কুষ্টি' তখন বিপ্লবী রাজপুত্রের বাণী জয় ক'রে ফেলেছে মেয়েদের মানসিক জড়তাকে। সেই বাণী মধ্যে যে সত্য ছিল তাকে গ্রহণ করেছে বিবিসুন্দরী আর টেক্কাকুমারী, হরতনী আর চিঁড়েতনী। সম্পাদক যখন বলছে জারি করো বাধ্যতামূলক আইন, তখন টেক্কাকুমারীর কণ্ঠে শোনা যায় 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' শেষ কালে রাজপুত্রের ঝড়ের বাণীরই জয় হোলো। ঝড়ের রাজত্বে সুরু হোলো প্রাণের অভিযান। চিঁড়েতনীর কণ্ঠে শোনা গেল, 'পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে।' রুইতনের কণ্ঠে শুনি, 'ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।' শান্তিপ্রিয় তাসের দেশে পঞ্জা শেষ কালে বলছে, 'শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি।' হরতনী বলে দহলা পণ্ডিতকে, 'অনেক দিন তোমরা ভুলিয়েছ আমাদের পণ্ডিত, আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে গেছে আমাদের দেহ-মন, আর ভুলিও না।'

তাসের দেশের ভিতর দিয়ে কবি আমাদের যে মন্ত্র দিয়েছেন তার নাম অশান্তি মন্ত্র। হরতনী বলেছে, 'মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।' জাতি হিসাবে অর্থহীন আচারের বেড়াজালের মধ্যে মৃত অতীতের জগদ্দল পাথরের নীচে আমরা তো জীবন্মৃত হ'য়েছিলুম। চিঁড়েতনীর কণ্ঠে কবি আমাদের ডাক দিয়ে বলেছেন 'আজ আর একবার উঠে দাঁড়াও। ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডী, ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্থকের আবর্জ্জনা।' কবি দেখেছিলেন, আরামপ্রিয়তাই আমাদের প্রগতির পথে প্রচণ্ডতম অন্তরায়। আমরা শান্তি চেয়েছি, জীবনকে কামনা করিনি। আমরা অতীতের প্রভুত্বকে মেনেছি, সমাজের প্রবীণ পাকাদের কথা শুনেছি, নিয়মকে কুর্ণিশ দিয়েছি। নিয়ম মানার সুবিধা যে অনেক। তাতে আশ-পাশের লোকেরা, সমাজের মাতব্বরেরা চটে না। নিয়মের বাইরে যাবার একটু চেষ্টা করলেই যে ওরা দোষ ধরে। বলে অশুচি। লোকনিন্দায় আমাদের শান্তি নষ্ট করে। তাই শান্তি নষ্ট হবার ভয়ে আমাদের ইচ্ছেকে আমরা চেপে রাখি, যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাকে অনুসরণ করি নে, যে আচারকে অর্থহীন বলে মনে করি তার যূপকাষ্ঠে ঘাড় পেতে দিই, যে নিয়মকে জাতির প্রগতির পথে অন্তরায় বলে জানি তাকে মাথার ক'রে নাচি, মৃত অতীতের শবকে বুক আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্ত মনে পড়ে থাকি। তাই তো তাসের দেশে কবির অভিযান শান্তির বিরুদ্ধে, আরামের বিরুদ্ধে। তাসের দেশের নর-নারীরা শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের কাছে নিয়েছে ইচ্ছে মন্ত্র। জীবনে নিজেদের ইচ্ছেকে মর্য্যাদা না দিয়ে পূর্ব্বপুরুষের হাত থেকে পাওয়া নিয়মকে মর্য্যাদা দিয়ে আসছি ব'লেই আমাদের এই তাসের দেশের লোকেরা আজও মৃতের সামিল হয়ে আছি। পরের ইচ্ছা অনুসারে আমার তোমার জীবন চলবে কেন? এ পৃথিবীতে বিধাতা প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে তৈরী করেছেন। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কি কোনই অর্থ নেই? কোনই মূল্য নেই? যদি মূল্যই না থাকবে তবে প্রত্যেককে এমন অনুপম ক'রে তৈরী করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের মর্য্যাদা আছে, সুষমা আছে, মূল্য আছে। যদি বলি আমার জীবনের কোন মূল্য নেই, ঈশ্বরের বিশেষ কোন বাণী নিয়ে আমি পৃথিবীতে আসিনি, তবে তার দ্বারা আমাদের স্রষ্টাকেই আমরা অপমান করি। এই জন্যই ব্রাউনিংয়ের, সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চেষ্টারটন বলেছেন: The crimes of the devil who thinks himself of unmeasurable value are nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value. আমরা যখন নিজের ইচ্ছাকে চেপে রেখে দশের ইচ্ছায় জীবন পরিচালিত হতে দিই তখন তার দ্বারা আমরা নিজেকে অপমানিত এবং সেই হেতু স্রষ্টার বিরুদ্ধে অপরাধ করি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন নিজের স্বাতন্ত্র্যকে মর্য্যাদা দান করতে। যত মূল্য সে কি শুধু নিয়মেরই? আমার-তোমার জীবনের কি কোন মূল্য নেই? রাষ্ট্রের আইনই হোক অথবা সমাজের অনুশাসন হোক সকলের সার্থকতা তো তোমার-আমার আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করায়। আমার তোমার ইচ্ছার অথবা রুচির কোন মূল্যই যদি না থাকলো, আইনই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়ালো, নিয়মই যদি সর্ব্বজয়ী হোলো, তবে ঈশ্বরের তোমাকে-আমাকে সৃষ্টি করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে পরম আদরে তৈরী করেছেন, God made man in his own image. রবীন্দ্রনাথ সমাজকে মূল্য দিয়েছেন কিন্তু ব্যক্তির আনন্দকে নিয়মের কাছে বলি দেননি। পলাতকার বাপ যখন দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে গেল, বিধবা কন্যা মঞ্জুলিকা তার প্রণয়ী পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে পালিয়ে গেল ফরাক্কাবাদে। মঞ্জুলিকা কবির আশীর্ব্বাদ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবি তাসের দেশের ভিতর দিয়ে তাঁর দেশবাসীকে ইচ্ছা-মন্ত্রই দান করেছেন। সমাজপতিদের ইচ্ছার কাছে, রাষ্ট্রপতিদের ইচ্ছার কাছে, নিয়মের কাছে, আইনের কাছে আমাদের ইচ্ছাকে আমরা বলি দেবো না, আমরা যা সত্য বলে, ন্যায় বলে বিশ্বাস করি তার অনুসরণ করবো, আত্মপ্রকাশের পথে যা প্রতিকূল তাকে কখনই মানবো না, নিজের ব্যক্তিত্বকে অন্যের দ্বারা নিষ্পেষিত হ'তে দেবো না—এই কথাই তাসের দেশে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। আত্মপ্রকাশের পথে রবীন্দ্রনাথ কোন বন্ধনকেই স্বীকার করেননি। বড়ো সমাজ নয়, বড়ো শাস্ত্র নয়, বড়ো রাষ্ট্র নয়। বড়ো তুমি, বড়ো আমি, বড়ো সবাই। যা তোমাকে, আমাকে, সবাইকে বিকশিত হতে বাধা দেয় তার কোন মূল্য নেই—তাসের দেশে এই ঝড়ের বাণীই কি রবীন্দ্রনাথ বহন ক'রে আনেননি?

মাইকেল আরজিবাসেভ

পনেরো

পরের দিন সন্ধ্যার সময় নোভিকফ, স্যানিনদের বাড়ী গেল। লীডা তখন বাগানে ছিল। স্যানিন নোভিকফ,কে নিয়ে লীডার কাছে গেল।

লীডার অন্তরে বাহিরে এক প্রবল পরিবর্তন এসেছে। আগেকার প্রগল্‌ভতা আর নেই, তার জায়গায় এসেছে ম্লান এক পরিবেশ। এক এক সময়ে ও বিস্মিত হয়ে ভাবতো স্যানিনের কথা। কী আশ্চর্য্য মানুষ! লীডা জানতো স্যানিনের কাছে পাপ-পুণ্যের বাছাই বিচার ছিল না। স্যানিন যখন লীডার দিকে তাকাতো,—সে চাউনিতে থাকতো না কোনো অপাপবিদ্ধ ভাই-বোনের সম্পর্ক-সম্মিত কোনো নির্দ্দেশ,—সে চাউনি শুধু থাকে স্ফুটযৌবনা স্ত্রীলোকের প্রতি অনাত্মীয় পুরুষের। তবু, একমাত্র স্যানিনের কাছেই ও অকপটে নিজের জীবনের পরম সংকট ও বিপদের আলোচনা করতে পারতো। সামাজিক কোনো সমস্যাই স্যানিনের কাছে সমস্যা নয়। লীডার অধঃপতন হয়েছে?—কি এসে-গেলো তাতে। বিপদে পড়েছিল?—সে তো ওর নিজের ইচ্ছাতেই! লোকের চোখে ও হেয় হয়ে থাকবে?—কি এসে যায় তাতে! ওর সামনে রয়েছে জীবনের প্রসারিত রাজপথ—আলোকরোজ্জ্বল বিরাট পৃথিবী! মা'র মনে দুঃখ হবে?—তা' ও কি করবে!···মহাজীবনের পথে, দৈববশে, জন্মের সম্বন্ধে, ওরা একত্র এসে পড়েছে,—মা, বাপ, মেয়ে, ভাই, বোন,···সেই জন্যেই তো আর পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার দেওয়া চলে না!'

অদ্ভুত এক একটি কল্পনা এক এক সময় লীডাকে পেয়ে বসতো।—যদি স্যানিন ওর নিজের ভাই না হোত্ত!···

পর-মুহূর্ত্তেই নিজের এই অসংযত কল্পনাকে সংহৃত ক'রে নিয়ে নিজের ওপর নিজে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত। ভাবতো, 'ছিঃ, কী বিশ্রী আমার মন!'

নোভিকফ,-এর কথা মনে পড়তেই ও বড় সংকুচিত হয়ে পড়ত। ওর কাছে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হোত। ক্ষমাপ্রার্থিনী ছাড়া নিজেকে ও নোভিকফ,-এর সামনে অন্য কোনো রূপে ভাবতে পারতো না।

•

স্যানিন নোভিকফ,কে ধ'রে নিয়ে এসে লীডার সামনে দাঁড় করালো। বললো, "এই যে, নিয়ে এসেছি। ওর কি সব কথা আছে বলবে।···বোসো তোমরা খানিকটা, আমি চায়ের বন্দোবস্ত করি গে।"

ও চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধ'রে ওরা চুপ ক'রে মুখোমুখী বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর নোভিকফ, অতি মৃদু স্বরে আরম্ভ করলো, "লিডিয়া পেট্রোভ্‌না—"

ওর কথার সুরে লীডা মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যিই, খুব ভালো লোক না হলে এ রকম ক'রে বলতে পারে!

"আমি সব শুনেছি লিডিয়া পেট্রোভ্‌না."—বললো নোভিকফ,—"কিন্তু তাতে আমার ভালোবাসার তারতম্য ঘটেনি। হয়তো এক দিন আপনিও আমাকে ভালোবাসতে পারবেন।···বলুন,···বলুন, আপনাকে আমার স্ত্রীরূপে পাবার সৌভাগ্য আমার হবে কি?"

লীডা চুপ করে শুনছিল! কোনো উত্তর তা'র মুখে জোগাল না।

"আমরা দু'জনেই অসুখী," বললো নোভিকফ। "হয়তো দু'জনে একত্রে জীবনকে সহজ করেই তুলতে পারব।"

কৃতজ্ঞতায় লীডার চোখ ছলছলিয়ে এলো। অশ্রুভারাক্রান্ত সুন্দর এক জোড়া চোখ তুলে নোভিকফের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "সম্ভবতঃ পারব।"

ওর চোখ ছাপিয়ে এই কথা ক'টিই যেন ফুটে উঠছিল—'ভগবান জানেন, আমি তোমার স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখব, চিরকাল তোমায় ভালোবাসব, শ্রদ্ধা করব।'

নোভিকফ, ওর চোখের ভাষা বুঝল। হাঁটু গেড়ে বসে লীডার একখানা হাত মুখের কাছে তুলে, অধীর ভাবে চুমোয়-চুমোয় ভিজিয়ে দিল।

ষোলো

অফিসারদের ক্লাব-ঘরে এক দল বুদ্ধিজীবি যুবক আলোচনায় আবহাওয়া সরগরম করে তুলছিল।

ফন্ ডীজ বলছিল, "মোটের উপর, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদ এক চিরস্থায়ী অবদান। সম্পূর্ণ এবং বোধায়ত্ত নীতি-অনুশাসনের দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদ মানুষের নৈতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়েছে।"

ইউরাই বলল, "তা' বটে; কিন্তু, মানুষের পাশবিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ সংঘাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত অন্যান্য ধর্ম্মমতের ন্যায়ই ব্যর্থ হয়েছে।"

ফন্ ডীজ চটে গিয়ে বলল, "কি করে বললেন যে, আপনার সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়েছে?—"

বক্তব্যের ওপর জোর দিয়েই ইউরাই বলল, "খৃষ্টীয় মতবাদের কোনো ভবিষ্যৎই নেই। উন্নতির শ্রেষ্ঠ সময়েও যখন এই মতবাদ মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে জয়ী হতে পারেনি, বরঞ্চ কতগুলি নির্লজ্জ ভণ্ডের হাতে ব্যবহৃত হতে পেরেছে, তখন এক দৈবানুগ্রহ ছাড়া আর কি উপায়ে যে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে তা' আমার বোধগম্য নয়। ইতিহাস অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।"

ফন্ ডীজ প্রশ্ন করলো, "আপনি কি বলতে চান যে, খৃষ্টীয় মতবাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে?"

"হাঁ, আমি তাই মনে করি। মুশা, বুদ্ধ বা গ্রীসের দেব-দেবীরা যেমন আজকে মৃত, খৃষ্টও তাই। এইটাই স্বাভাবিক। বিবর্ত্তন-বাদের এ একটা অধ্যায় মাত্র। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?—আচ্ছা আপনিই বলুন, আপনি খৃষ্টের অনুশাসনগুলিতে ঐশ্বরিক কোনো —?"

"না, তা পাই না বটে—"

"তা' হ'লে কি ক'রে আপনি বলতে চান যে একটা মানুষ চিরন্তন কালের উপযোগী ক'রে কতগুলি অনুশাসন সৃষ্টি ক'রে যেতে পারে?"—ইউরাই বলল।

"তা' যাই বলুন,"—ফন্ ডীজ বলল, "এই খৃষ্টীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই চিরকালের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠ্‌বে—পুরোনো গাছের বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর বেরোয়।"

"আমি সে কথা বলছি না—" একটু অস্বস্তি নিয়েই ইউরাই জবাব দিল। "আমি বলি যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদের দিন ফুরিয়েছে, কবর খুঁচিয়ে একে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করা বৃথা।"

"আপনি কি বলতে চান যে, সমাজ-প্রবাহের মূল ধারা হিসাবে খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদ কোনো প্রভাবই বিস্তার করেনি?"—ফন্ ডীজ বলল।

"তা' আমি অস্বীকার করি না বটে—" ইউরাই আমতা-আমতা করে জবাব দিল।

"কিন্তু আমি অস্বীকার করি।"—শ্যানিন বলে উঠ্‌ল। এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, ওদের আলোচনা শুনছিল মাত্র। ফন্ ডীজ ও ইউরাই-এর যুক্তি বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে শ্যানিনের আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ চাপা কণ্ঠস্বর আলোচনার পরিবেশকে যেন নূতন রূপ দিল।

বিরক্ত হয়েই ফন্ ডীজ জিজ্ঞাসা করল, "কেন জানতে পারি কি?"

শান্ত ভাবে শ্যানিন উত্তর দিল, "কারণ, আমি অস্বীকার করি।"

"আহা, কেন অস্বীকার করেন তা'র কারণ দেখাবেন তো!"—ফন্ ডীজ বলল।

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রমাণিত করবার জন্য আমার মাথাব্যথা কেন? কি দরকার!" শ্যানিন বলল। "এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা,—একে আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেবার সামান্য আগ্রহও আমার নেই। আর, তা'ছাড়া, সে চেষ্টাও নিরর্থক।"

ইউরাই সতর্ক ভাবে ফোড়ন কাট্‌ল, "অর্থাৎ, আপনার মতানুসারে চলতে গেলে পৃথিবীর যত সাহিত্য, যত লেখা,—সব পুড়িয়ে ফেলতে হয়—"

"না, না, তা' কেন?—" শ্যানিন বলল। "সাহিত্য হচ্ছে এক মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার। সত্যিকার সাহিত্য,—যা' আমার আলোচ্য বিষয়,—অর্থাৎ যা' কি না কতগুলি হামবড়াই রচনা নয়—যার ভেতর দিয়ে তা'রা নিজেদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমান বলে সাব্যস্ত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই লেখেনি,—আমি সেই শাশ্বত সাহিত্যের কথা বলছি।—সত্যিকার সাহিত্য জীবনে এনে দেয় রূপ, মানুষের অস্তিত্বের গোড়ায় করে প্রাণের স্ফুরণ, যুগ থেকে যুগান্তরে, বংশ থেকে বংশান্তরে এর অবদান বয়ে চলে। সাহিত্যকে ধ্বংস করা মানে, জীবন থেকে সমস্ত রূপ রস রঙ নিঃশেষ ক'রে দেওয়া।"

ফন্ ডীজ উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল। বলল, "বেশ শোনা যাক, বলুন না—"

শ্যানিন মৃদু হেসে বলে চলল।

"আমি এমন কিছু আশ্চর্য্য জটিল কথা বলিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, খৃষ্টীয় মতবাদ মানুষের জীবনে বাজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। মানব-সভ্যতার ইতি

আমরা দেখতে পাই—যে সময়ে অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সমাজের পরগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল জনসাধারণ, সেই সময় দেখা দিল খৃষ্টীয় ধর্ম্মবাদ,—নম্র, নিরহঙ্কার, প্রচুর আশ্বাস-বাণী নিয়ে। বিপ্লবকে এই মতবাদ করল নিন্দিত, জনসাধারণের সামনে তুলে ধরল এক অতীন্দ্রিয় স্বপ্নরাজ্যের ছবি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ শিক্ষা ছিল অপ্রতিরোধের। মানুষের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিকে করে দিল ধূলিসাৎ। কু-শাসন ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জনসাধারণ যে ইন্ধন সঞ্চয় করছিল নিজেদের অন্তরে,—শান্তির ললিত বাণীর সিঞ্চনে সে আয়োজন গেল ব্যর্থ হয়ে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে এ ধ্বংস করেছে; বর্ত্তমান থেকে মানুষের দৃষ্টি এবং কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে সরিয়ে নিয়েছে এক অবাস্তব ভবিষ্যতের অমরাজ্যের দিকে। ফলে, মানব-সভ্যতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, আত্মবোধ। রইল শুধু এক প্রশ্নহীন বিচারহীন অন্ধ কর্ম্মানুরাগ। খৃষ্টীয় মতবাদ পৃথিবীতে খেলা ভূমিকাই অভিনয় করেছে এবং খৃষ্ট—"

বাধা দিয়ে ইউরাই বল্‌ল, "খৃষ্টীয় ধর্ম্মবোধের অভ্যুত্থান না হলে যে কী বীভৎস রক্তক্ষয় হোত সে-যুগে, ভেবে দেখেছেন?—"

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে স্যানিন জবাব দিল, "প্রথমতঃ খৃষ্টীয় মতবাদের আবরণ গায়ে দিয়ে দলে দলে লোক মৃত্যুবরণ করল; তার পর খৃষ্টীয় মতবাদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে অজস্র মানুষকে যুদ্ধে, কারাগারে, আগুনে পুড়িয়ে মারা হোল। আর আজও দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবে যত রক্তক্ষয় সম্ভবপর নয়,—তার চেয়েও বেশি পরিমাণ রক্তক্ষয় হচ্ছে এই মতবাদের সংরক্ষণ ও প্রসারের দোহাই দিয়ে। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, মানুষের উন্নতি—অস্বীকৃতি বিপ্লব এবং রক্তক্ষয় ছাড়া কোনো দিন হয়নি, অথচ মানুষ—মনুষ্যত্ব, দয়া, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি,—এইগুলিকেই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি বলে মেনে নেওয়ার ন্যাকামী করেছে। এই নিরামিষ, আত্মপ্রত্যয়হীন ক্লীব অস্তিত্বের তুলনায় এক সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লবও ঢের ভালো।"

বক্তব্য বিষয়ের অপেক্ষা বক্তার ব্যক্তিত্বই ইউরাই-এর মনে আঘাত করছিল বেশি। ও বল্‌ল, "আচ্ছা, আপনি এমন করে কথা বলেন কেন বলুন তো? মনে হয়, যেন আপনার শ্রোতাদের আপনি নিতান্ত শিশু বলে মনে ভেবে কথা ক'ন—"

"এই আমার স্বাভাবিক ভঙ্গি—"

"আপনার এই আত্মবিশ্বাসের কারণ কি বলুন তো—" ইউরাই প্রশ্ন করল।

"সম্ভবতঃ—" স্যানিন বল্‌ল, "আপনাদের থেকে আমার বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা বেশি বলে আমি মনে করি, সেই জন্যে—"

"দেখুন—" ইউরাই রেগে গেল।

"রাগ করবেন না।" স্যানিন ওকে বুঝিয়ে বল্‌ল। সবারই নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলে মনে করবার অধিকার আছে,—করেও তাই!"

ওর কথায় এমন একটি সহজ ঔদার্য্যের সুর মেশানো ছিল যে, তার পর আর রাগ করা চলে না। তবু ইউরাই বল্‌ল, "তা হ'লেও ও রকম মুখের ওপর আমার মতামত প্রকাশ করতাম না।"

"ঐ তো আপনাদের দুর্ব্বলতা। আমি যা ভাবি, তা বলি; আপনারা তা করেন না। আমরা সবাই যদি আরো একটু সরল হতাম, তা' হ'লে সবার পক্ষেই ভালো হোত।"—স্যানিন বল্‌ল।

ওখান থেকে ফন্ ডীজ ওদের ধ'রে নিয়ে গেল শহরতলীর একটা বাড়ীতে! বল্‌ল, একটি আলোচনী বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হবে সেখানে। কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া, সীনা এবং ডুবোভাও সেখানে উপস্থিত ছিল। আলোচনা তর্ক ও বক্তৃতার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার উদ্দেশ্যেই বৈঠকের অধিবেশন হবে, গোশিন্‌কো নামে একটি ছাত্র উদ্বোধনী বক্তৃতায় সে কথা প্রকাশ করল।

স্যানিন ওকে শুনিয়েই বল্‌ল, "সে কথা তো জান্‌তাম না। শুনেছিলাম, এখানে এলে বীয়ার খাওয়া যাবে, আমি তো সেই জন্তেই এসেছি।"

বক্তা অসন্তুষ্ট চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বক্তৃতা সুরু করল।

হঠাৎ বাইরে কুকুর ডেকে উঠল। ডুবোভা বল্‌ল, "কে যেন আস্‌ছে।"

গোশিনকো বলল, "হয়তো পুলিশ—"

ডুবোভা বল্‌ল, "সত্যিই যদি পুলিশ হয়,—আশা করি, আপনার ভাবান্তর ঘটবে না।"

ওর উজ্জ্বল চোখ এবং ঢেউ-খেলানো চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে স্যানিন মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

ঘরে এসে ঢুকল নোভিকফ্।

গোশিন্‌কো বল্‌ছিল, "বন্ধুগণ, আমরা সকলেই চাই আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও জীবন সম্বন্ধে ধারণার পরিসর বাড়াতে। সেই জন্য চাই আত্মানুশীলন। আর তা' সম্ভবপর হবে যদি আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে একটি উপযুক্ত তালিকানুযায়ী পড়া-শুনা করি এবং পরস্পারের মধ্যে মতের বিনিময় করি। আমাদের এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই।"

শাফ্‌রফ্ চশমার মোটা কাচ পরিষ্কার ক'রে দাঁড়ালো। বল্‌ল "তা'হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—আমরা কি পড়ব? আমরা প্রস্তাব এই যে, আমাদের প্রোগ্রাম দু' অংশে বিভক্ত হোক্। এক অংশ থাকুক প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের সম্পর্কিত পুস্তকাবলী,—এই যেমন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বই; আর দ্বিতীয় অংশে থাকুক বর্ত্তমান কালের সম্পর্কিত রচনা।"

ডুবোভা বলে উঠল, "যদি এই ভাবে বলতে থাকেন তা হ'লে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ব।"—ওর চোখে দুষ্টুমীর হাসি উপচে পড়ছিল।

শাফ্‌রফ্ বল্‌লে, "সবাই যাতে বুঝতে পারে, আমি সেই রকম বল্‌ছি।···আমি একটি পাঠ্য-তালিকা আপনাদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের মতামতের জন্য।···ডারুইন্-এর বই-এর সঙ্গে সঙ্গে 'অরিজিন্ অফ দি ফ্যামিলি' এবং টলষ্টয়,···[illegible] ইবসেন্, হাম্‌সুন্,···"

বাধা দিয়ে সীনা বলে উঠল, "ও আমরা পড়েছি।"

ইউরাই বলল, "শাক্‌রফ, ভুলে যাচ্ছে যে এটা সাণ্ডে স্কুল নয়।··· াহা, কী তালিকা! টলষ্টয় এবং হামসুন্···"

তুমুল তর্কের ঝড় উঠল। কে এক জন বলল, "কনফুসিয়াস, স্পেন্সর্,—"

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র টিপ্পনি কেটে বলল, "ধর্মসঙ্গীত বাদ দেবেন । যেন।"

স্তানিন এই তর্কে মোটেই যোগ দিচ্ছিল না। বীয়ার ও দিগারেট নিয়ে সে বেশ জমে গিয়েছিল। ইউরাইকে ফিশ-ফিশ ক'রে বলল, "আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, বই-পুঁথি থেকে জীবনের কোনো সুসংহত ধারণা পাওয়া যায়?"

"নিশ্চয়ই।"

"ভুল ধারণা আপনার। তাই যদি হোত, তা হ'লে একটি নির্দ্দিষ্ট তালিকানুযায়ী পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সমগ্র মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করা যেত। সাহিত্যই বলুন আর মানুষের আলোচনা বা চিন্তার কথাই বলুন,—ও তো মানুষের সমগ্র প্রকাশ নয়। জীবন থেকেই জীবনবেদ রচনা সম্ভবপর। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তাঁ'র নিজস্ব জীবনের দর্শন তৈরী হতে থাকে। বক্তৃতা বা আলোচনার দ্বারা তা গড়ে ওঠে না। আপনারা যেমন চাইছেন, জীবন সম্পর্কে একটা দ্বিধাহীন নির্দ্দিষ্ট ধারণা তৈরী ক'রে নিতে,—তা' অসম্ভব।"

রাগ করে ইউরাই প্রশ্ন করল, "অসম্ভব কেন শুনি?"

"যদি একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবন-দর্শন তৈরী করা হয়, তা হলে মানুষের চিন্তার সাবলীলতা হয়ে উঠবে প্রতিহত। আসলে, চিন্তার উৎসই যাবে শুকিয়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন বাণী প্রকাশ ক'রে চলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন; অজস্র মুহূর্ত্তের প্রবাহ-কলতান কান পেতে শুনুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। তবেই তো সহজ হয়ে উঠবে জীবনের দর্শন নিরূপণ করা।··· আলোচনা ক'রে লাভ কি? নিজের খুশী মতো চিন্তা করুন। আমি শুধু একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই: বাইবেল থেকে মার্কস্ অবধি তো আপনারা শ' কয়েক বই পড়ে ফেলেছেন, —তবু কেন পারেননি কোনো জীবন-দর্শন নির্দ্দিষ্ট করতে?"

"কি ক'রে জানলেন যে পারিনি?"

"বেশ, তাই যদি পেরে থাকেন, তাহলে নতুন ক'রে আবার একটা নির্দ্ধারণ করবার এ প্রয়াস কেন?"

সীনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তানিনের কথা শুনছিল।

স্তানিন বলল, "তা হ'লে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, আপনারা যা পাওয়ার চেষ্টা করছেন তা আপনারা চান না। আজকের এই সভায় এসে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনারা প্রত্যেকেই চাইছেন আপনাদের নিজস্ব মত ও ধারণা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে, আর এ ভয়টাও আছে—পাছে অন্যের মতের প্রভাবে নিজে পড়ে যান। সত্যিই, এটা বিরক্তিকর!"

"এক সেকেণ্ড! আমায় কিছু বলতে দিন।"—গোশিন্‌কো বলল।

"দরকার নেই।" স্তানিন বলল। "আমার মনে হয়, জীবন সম্বন্ধে আপনার একটি সম্যক্ ধারণা আছে। আর আপনি পাহাড়-পাহাড় বই পড়ে ফেলেছেন। আপনাকে দেখেই তা বোঝা যায়। কিন্তু আপনার কথায় সায় না দিলে আপনি অত্যন্ত চটে যান—" ইউরাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "ইউরাই নিকোলাইভেভিচ্, আমি কতগুলো শ্রুতিকটু কথা বলেছি বলে আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনার মুখে-চোখেই মতান্তরের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।'

"মতান্তর?"

"হাঁ, আপনি বেশ বুঝতে পারছেন, আমার সঙ্গে আপনার মতান্তর ঘটছে।" স্তানিন বলল, "কিন্তু দেখুন, এই সব ছেলেমানুষী নিয়ে মন-কষাকষি কোনো কাজের নয়। জীবন বড় ছোট!"

ডুবোভা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "হায়, হায়! জন্মাবার আগেই আমাদের ক্লাবের মৃত্যু ঘটলো গো!"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

সেকালের একটি ছড়া

অজ্ঞাত

খোকোন বড় শান্ত ছেলে বুক-জুড়ান ধন,
বাংলা দেশের গল্প বলি চুপ্‌টি ক'রে শোন।

চব্বিশটি জেলা* ছিল এই বাংলা দেশে;
পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন তা কর্জ্জন লাট এসে।
পশ্চিমে দশ রইল মিশে বেহার উড়িষ্যাতে;
পূবের চৌদ্দ জেলা গেল আসাম প্রদেশেতে।
বাঙালী সব পৃথক্ হ'ল, বাংলা হ'ল ভাগ;
এ দুর্দ্দিনে জাগ্‌ল প্রাণে স্বদেশ-অনুরাগ।

কাতর হ'য়ে বলে সবাই লাট সাহেবের কাছে;
ভাগ ক'রো না বাংলা, কর আর যা মনে আছে।
বাঙালীদের ন্যায্য কথা সকল গেল ভেসে;
প্রচার হ'ল লাট সাহেবের হুকুম সর্ব্বদেশে।
তের শত বার সালের তিরিশে আশ্বিনে;
বাংলা বিভাগ হ'ল খোকা এইটি রেখো মনে।

---

* ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং মালদহ।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও হুকবালাহাপ আন্দোলন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আমরা যদি হুকবালাহাপ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর যখন জাপানী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন হুকরা জাপানীদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। কারণ তখন তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কচ্ছেন। অথচ জেনারেল ম্যাকআর্থার যখন লুজনে অবতরণ করলেন তখন তিনি হুক নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য আদেশ জারী করলেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং হুকদের সম্বন্ধ তিক্ততায় ভরপূর হয়ে উঠল। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, ম্যাক্আর্থারের আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যে পরিণত হতে পারেনি ; কারণ গ্রামাঞ্চলে হুকরা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাছাড়া হুকরা নিজেদের সঙ্ঘকে খুব শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এঁরা মার্কিণ-বিরোধী জনমত গঠন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। হুকরা আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পরেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু এমন একটা শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল যেটা সম্পূর্ণ ভাবে মার্কিণ-প্রভাবান্বিত। ফলে রোক্সাস্ সরকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে হুকরা লুজনে নিজেদের একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু তাই নয়। এঁরা ধনতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করবার জন্য জোর প্রচার-কার্য্য চালাতে লাগলেন। চাষীদের হাতে জমির অধিকার এবং শ্রমিকের হাতে শিল্পের অধিকার ছেড়ে দেবার জন্য হুকরা দাবী জানালেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রাপ্ত সংবাদগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়, রোক্সাস সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে হুকরা কেন্দ্রীয় লুজনে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে রোক্সাস্-এর মৃত্যুর পর কুইরিণো যখন প্রেসিডেণ্ট হলেন, তখন তিনি এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কুইরিণো বুঝতে পারলেন যে, হুকদের শক্তি নষ্ট করা অসম্ভব। তাই তিনি প্রথমে এঁদের সহযোগিতা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। লুজনের চাষীদের ন্যায্য অভিযোগ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তিনি ম্যানিলায় হুক-নেতা লুই তারুককে আমন্ত্রণ করলেন এবং এই মর্ম্মে একটা ঘোষণা প্রকাশ করলেন যে, হুক বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হবে। হুক-নেতা তারুক কুইরিণোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত কুইরিণোর প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করতে পারলেন না। ফলে কুইরিণো সরকারের বিরুদ্ধে জোর বিদ্রোহ সুরু হল। বিগত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যে সভাপতি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে নির্ব্বাচনে হুকরা কুইরিণোর প্রতিদ্বন্দ্বী জোসে লরেলকে সমর্থন করেছিলেন। যদিও লরেল শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়েছেন তথাপি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কুইরিণোর বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী জনমত গঠিত হয়েছে। অবশ্য সমস্ত কুইরিণোবিরোধী ব্যক্তি হুকদের সমর্থক নন্, তবে সরকারী দুর্নীতি এবং অক্ষমতার ফলে দেশের মধ্যে হুকদের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটা সংবাদ প্রচার করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক সুদক্ষ জাপানী এবং চীনা কম্যুনিষ্ট কেন্দ্রীয় লুজনে এসেছেন। শোনা যায়, কেন্দ্রীয় লুজনে হুকরা যে বিদ্রোহ সুরু করেছেন, সে বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচনা করবার ভার এঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার। সে-জিনিষটি হচ্ছে,—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহই হুকবালাহাপ আন্দোলন নামে পরিচিত। বিগত ১৯৪২ সালে এই আন্দোলন কেন্দ্রীয় লুজনে প্রথম সুরু হয়। স্পেনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই কেন্দ্রীয় লুজনের চাষীরাই তিন শত বৎসরের স্পেনীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে আধিপত্য পর্য্যন্ত এরা স্বীকার করে নিতে রাজী হননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান যখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন, তখন কেন্দ্রীয় লুজনের চাষীরাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালাবার জন্য একটা সঙ্ঘ তৈরী করেছিলেন ! সে সঙ্ঘটিকে বলা হ'ত "জাপ-বিরোধী গণ-ফৌজ"। সাধারণ ভাষায় এই সঙ্ঘ হুকবালাহাপ এবং এর সভ্য এবং সমর্থকরা হুক নামে পরিচিত।

রয়টারের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, উত্তর-কোরীয়দের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য লুজনে হুকরা মার্কিণ-প্রভাবান্বিত কুইরিণো সরকারের বিরুদ্ধে জোর বিদ্রোহ সুরু করেছেন। এই বিদ্রোহ দু'দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলাতে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে, সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়তঃ, হুকরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছেন, যার ফলে কোরিয়া এবং ফরমোজায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলো গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য হবেন। আমরা যদি ফরমোজা সম্বন্ধে অনুসৃত সাম্প্রতিক মার্কিণ-নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহ'লে একটা জিনিষ বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সে জিনিষটি হচ্ছে, মার্কিণ সরকার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কম্যুনিজমকে চীনা কম্যুনিজম্ থেকে পৃথক্ করে রাখতে চাইছেন। মার্কিণ সরকার আশঙ্কা কচ্ছেন, যদি ফরমোজার উপর চীনা কম্যুনিষ্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের হুক এবং চীনের কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। ফলে মার্কিণ-প্রভাবান্বিত ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত মে মাসে ফিলিপাইন সাধারণ সামরিক পরিষদ উপকূলগুলোতে জোর টহল দেবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। চীনা কম্যুনিষ্টরা যা'তে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করতে না পারেন, সে জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। এখনও পর্য্যন্ত ফিলিপাইন সরকারের স্থল, নৌ, এবং বিমানবাহিনী উপকূলগুলোর উপর কড়া নজর রেখেছেন। পশ্চিমের কম্যুনিষ্ট-বিরোধী পর্য্যবেক্ষকরা বলেন, যদি কুইরিণো সরকার হুকবালাহাপ আন্দোলন দমন করতে না পারেন, তাহলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের অন্যতম [illegible]

ঘাঁটিতে পরিণত হবে। আমরা যদি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করি তাহ'লে দেখতে পাব, সেখানে বহু চীনা রয়েছেন। এদের অনেককে কুইরিণো সরকার কম্যুনিষ্ট বলে সন্দেহ কচ্ছেন। মনে হয়, যে-সব চীনা কুইরিণো সরকারের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতে পাচ্ছেন না, সে-সব চীনাকে কম্যুনিষ্ট বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, অথচ যে-সব চীনা কুইরিণো সরকারের নীতি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন কচ্ছেন, সে-সব চীনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

হুকবালাহাপ আন্দোলনের স্তরগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলে দেখা যাবে, যখন এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয়, তখন এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের জন্য অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করা। কিন্তু ক্রমশঃ এই আন্দোলন একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট ফ্রন্টে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে হুকরা দু'টো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছেন। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে—কুইরিণো সরকারকে একেবারে বানচাল করা। দ্বিতীয়তঃ, হুকরা কম্যুনিষ্ট চীনের আদর্শ অনুযায়ী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর মুখপত্র 'রেড ষ্টার' পত্রিকার নাম আমরা সবাই শুনেছি। বিগত এপ্রিল মাসে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের হুক-গরিলাদের সেই পত্রিকায় "গণমুক্তি বাহিনী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত পত্রিকার বিশ্বাস, এই "গণমুক্তি বাহিনী"র পিছনে জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে, এবং এই বাহিনী স্থানীয় সামন্ততন্ত্র এবং মার্কিণ ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম সুরু করেছেন, সে-সংগ্রাম ক্রমশঃ জয়যুক্ত হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, লুজন হচ্ছে হুকদের প্রধান কর্ম্মস্থল। এখানে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সে-প্রশ্নটি হচ্ছে,—লুজনে কেন হুকরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা যদি লুজনের অবস্থা আলোচনা করি, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। সেখানে সহর এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান, সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারে জনসাধারণ জর্জ্জরিত। জোর করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। শুধু তাই নয়। যে-সব লোককে সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনী সন্দেহের চোখে দেখেন, সে-সব লোককে গুলী করে মেরে ফেলা হয়। এ ছাড়া জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, জমিদার, এবং ধনী ব্যবসায়ীরা সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় গরীব এবং অসহায় জনসাধারণের কাছ থেকে নানা প্রকার সুবিধা আদায় করে থাকেন। মোট কথা হ'ল, লুজনের শাসন-ব্যবস্থা হচ্ছে একেবারে নিকৃষ্টতম। কুইরিণো সরকারও এখানকার শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেননি। ফলে অত্যাচারিত জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করা হুকদের পক্ষে অনেকটা সুবিধাজনক হয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে লুজন হ'ল বৃহত্তম দ্বীপ। সুতরাং যেহেতু কেন্দ্রীয় লুজনকে হুকরা একটা শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেছেন, সেহেতু আজ এঁরা লুজনের যে-কোন স্থানে সরকারী বাহিনীকে বিব্রত করতে সমর্থ। অবশ্য যে-এলাকায় হুকদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে, সে-এলাকা সীমাবদ্ধ। তবু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কেন্দ্রীয় লুজনে কম্যুনিষ্ট প্রভাব কুইরিণো সরকারের পক্ষে একটা গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে রয়েছে।

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত মে মাসে যখন বাগুইওতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্মেলন ডাকবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল, তখন হুক-বিদ্রোহের তীব্রতা বিশেষ ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া বিগত আগষ্ট মাসে কুইরিণো সরকার যখন কোরীয় যুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ম্যানিলা এবং ম্যানিলার উপকণ্ঠে হুকরা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এমন কি, কোন স্থানে এঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহও সুরু করে দিয়েছিলেন। লিওা বাই হলেন হুক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। তাঁরই নির্দ্দেশে হুকদের সামরিক পরিকল্পনা তৈরী হয়ে থাকে। মোট কথা হল, বর্তমানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের হুকবালাহাপ আন্দোলন তারুক, ক্যাপাডোকা, এবং লিওা এই তিনজন নেতার মিলিত পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

একটি মুখ —নন্দলাল বসু অঙ্কিত

কালিদাসে বিজ্ঞান

শ্রীঅনন্তকুমার সাহিত্যশাস্ত্রী

আজকাল আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যাহা কিছু শিখেন বা দেখেন, তাহাই পাশ্চাত্য দেশ হইতে গৃহীত ও তাঁহাদের আবিষ্কৃত বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশ প্রাচীন কালাবধি ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই সিদ্ধান্তেই তাঁহারা উপনীত হইয়া থাকেন। মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য মাত্রেই এইরূপ সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠপোষক।

যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য। যাহা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সদাকাল প্রবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই সমুদায় জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বের সমাধানকল্পে ভারতীয় প্রাচীন তত্ত্বদর্শিগণের সিদ্ধান্ত সমূহ অসংবদ্ধ প্রলাপ-বাক্য বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

সাধারণের হৃদয়ে অনায়াসে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রণোদন তথা বাক্যের মধুরতা সম্পাদন পূর্ব্বক সাহিত্যালঙ্কারের পরিপুষ্টি সাধনার্থই সংস্কৃত শাস্ত্রে রূপকের সৃষ্টি। চন্দ্রকে হিমকরনিকর, সুধাকর, সুধাংশু, হিমাংশু, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক প্রভৃতি বলেন বলিয়াই যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ চন্দ্রের নিষ্প্রভত্বের বিষয় অজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। যাঁহাদের জ্যোতিষ গণনার পল-বিপল পর্য্যন্ত অদ্যাপি অভ্রান্তরূপে জগজ্জনের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, উক্তরূপ সামান্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ যে তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে; কারণ এই চন্দ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষীভূত অন্যতম গ্রহরূপে সুপরিচিত।

বহু দিনের বিস্তীর্ণ স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী যেমন পরিত্যক্ত হইলে সংস্কারাভাবে শৈবালমালা ও বিবিধ জলজাত লতামণ্ডলীতে সমাচ্ছন্ন এবং পঙ্করাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া মানুষের অপেয় ও দুরবগাহ হয়—তদ্রূপ অশেষ অর্থ-সম্পত্তি ও গবেষণা পরিপূর্ণ বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার-স্বরূপ সংস্কৃত শাস্ত্ররাশি আজ অনুশীলনাভাবে সাধারণের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত। শাস্ত্রকার মনীষিবৃন্দের জীবন-ব্যাপী বহুলায়াস-প্রতিপাদিত, মানবের কল্যাণকর অশেষবিধ তত্ত্বের নির্ণয়-ফল আজ গভীর তিমিরগর্ভে নিক্ষিপ্ত। ইহার সংস্কার ব্যয়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য, সুতরাং ইহা করেই বা কে? স্বার্থই বা কাহার?

এক দিন এই ভারতেই ভূতত্ত্ব, গ্রহতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ তত্ত্বেরই নির্ণয়-ফল সাধিত হইয়াছিল। সেদিন ভারত দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ব্যাকরণে, আচারে-অনুষ্ঠানে, বিচারে-অনুশীলনে সর্ব্ব বিষয়েই চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে আজ সেই ভারত পরমুখাপেক্ষী। বহুল তত্ত্বপূর্ণ ভারতীয় শাস্ত্ররাজি আজ জড়বাদের আধার, অন্ধ বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি ও কল্পনার রম্যোদ্যান বলিয়া তথা-কথিত সভ্যসমাজে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে আর কি থাকিতে পারে?

বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই—মহাকবি কালিদাসের যে কাব্যগুলিকে সাধারণতঃ উপমারূপ রসসরোবর মাত্র জ্ঞান করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই, সেই সরস কবিতাবলীর মধ্যেও যে প্রচুর সারবান্ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিষয় বিবৃত আছে, তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন; সুতরাং ঐ সমুদায় কাব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের গোচর করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা মহাকবি কালিদাসের রচিত গ্রন্থান্তর হইতে ভৌগোলিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহাকবির কুমারসম্ভব নামক মহাকাব্যে দেখিতে পাই যে, কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত তথা তারকাসুরের বধ-সাধনই ইহার প্রতি-পাদ্য বিষয়; কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার প্রথমাংশের সহিত ভৌগোলিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

ভূগোলের আধুনিক গ্রন্থকারগণ যেরূপ কোনও স্থানের বর্ণনা করিতে গেলে উহা কিরূপ, কোথায় উহা অবস্থিত, সেখানে কি কি দ্রব্য সুলভ, তথায় কোন্ কোন্ জন্তুর বাস, এবং কি কি বৃক্ষাদি জন্মে, তথাকার আবহাওয়া কিরূপ, তত্রত্য অধিবাসিগণ কিরূপ প্রকৃতির এবং তাহাদের আকার ও বর্ণই বা কিরূপ ইত্যাদি সমুদায়েরই বিস্তৃত বর্ণনা নিবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং কোন বিশেষ প্রাকৃতিক বিষয়ের জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাকবিও 'কুমারসম্ভব' রচনাকালে সুললিত ছন্দে হিমালয়ের বর্ণনার্থ যে ষোড়শটি শ্লোক প্রথমে রচনা করিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত ভৌগোলিক পদ্ধতির কোনটিরই ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। যথা—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।"

—১।১ম সর্গ

অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ। উহা ভারতের উত্তরে অবস্থিত, উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ সমুদ্রে নিমগ্ন। ইহা দ্বারা স্থির হইয়াছে হিমালয় কিরূপ পর্ব্বত, কোথায় ইহা অবস্থিত এবং সমুদ্র ইহার সীমারেখা।

'ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ।'—২। কু ১ম সর্গ।

ইহাতে মহাকবি হিমালয়ের রত্নরাজির ও মহৌষধির সুলভত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্জ্জয়লিঙ্গ হইতে বিক্রয়ার্থ আনীত নানা বর্ণের উজ্জ্বল কাচমণিসমূহ এবং অনন্তমূল, বিশল্যকরণী প্রভৃতি নানা প্রকার ঔষধি অধুনাও হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে সুলভ বলিয়া মহাকবির বর্ণিত অংশ নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে। এই ভূধর-গর্ভে হয়তো মহামূল্য মণিরত্ন নিহিত আছে, কালে তাহা আবিষ্কৃত হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ বিফল-মনোরথ হইয়াও গৌরীশৃঙ্গাভিযানের চেষ্টা যে হিমালয়স্থিত মহার্ঘ রত্ননিচয়ের অনুসন্ধানার্থ নহে, এ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; সুতরাং হিমালয়ে রত্নরাজির স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কাব্যস্থ বর্ণনাকে আরব্যোপন্যাস বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না।

'হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।'

ইহা দ্বারা মহাকবি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই পর্ব্বত সর্ব্বদা হিম দ্বারা আবৃত বলিয়াই ইহা হিমালয়। সাধারণতঃ তুষারাবৃত স্থানে উদ্ভিদাদির জন্ম দুর্লভ, কিন্তু এই হিমালয় ক্ষেত্রে সেরূপ নহে, ইহার শিখরদেশ সদাকাল হিমাচ্ছন্ন থাকিলেও ইহার অধিত্যকা প্রদেশ অশেষ প্রকার মহার্ঘ বৃক্ষনিচয়ের জন্মভূমি।

যথা—এই হিমাচলে ভূর্জ্জবৃক্ষ জন্মে, তাহার ত্বক্ লেখ্যপত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্থানে উৎপন্ন "কীচক" নামক বংশ দ্বারা উৎকৃষ্ট বেণু প্রস্তুত হয়। এইখানে সরল নামক দ্রুমরাজি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের নির্য্যাস সৌরভময়। এইস্থানে এক প্রকার ঔষধি জন্মে তাহারা নিশাকালে আপনা হইতেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ইহা দেবদারু বৃক্ষের জন্মভূমি। উক্ত উদ্ভিদ্‌রাজির স্থায়িত্বের প্রমাণস্বরূপ 'কুমারসম্ভব'এ বর্ণিত ১ম সর্গের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১৫শ শ্লোক গৃহীত হইতে পারে।

এই পর্ব্বতে হস্তী, সিংহ, ব্যজনোচিত কেশশালিনী চমরী ময়ূর প্রভৃতি প্রাণিসমূহ অবস্থান করিয়া থাকে। এতদর্থে 'কুমারসম্ভব'-এর ১ম সর্গের ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ ও ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই পর্ব্বতে ধ্যাননিরত তাপসবৃন্দ, কুপ্রবৃত্তিনিরত কিরাত জাতি, ভ্রমণপরায়ণা অপ্সরা, কামবৃত্তিপরায়ণ কিন্নর-মিথুন ও বিদ্যাধরগণের বাস। 'কুমার'এর ১ম সর্গের ৪র্থ, ৫ম, ৮ম, ১০ম ও ১৪শ শ্লোকে এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিদ্যাধর প্রভৃতি মরলোকে অদৃষ্ট বলিয়া ঈদৃশ জাতির অস্তিত্ব বর্ণনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং ভৌগোলিক বাস্তবিকতার বিপন্থীরূপে বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে বিদ্যাধরাদি স্বভাবতঃ সুন্দর ও সুগঠিত দেহধারী দেবযোনি-বিশেষ; সুতরাং মহাকবি ইহাদের বর্ণনা-স্থলে যেন দেখাইয়াছেন যে, এই শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে সুদর্শন ও গৌরবর্ণ অধিবাসীরাই বাস করে অথবা এই স্থানের নৈসর্গিক প্রভাব হেতু তত্রত্য অধিবাসীরা সৌম্যদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি বিদ্যাধরাদির অস্তিত্ব সম্ভব হয় তাহা হইলে এবংবিধ প্রকৃতির রমণীয় স্থানই তাহাদের আবাসভূমি হইবার উপযুক্ত, অন্য কুত্রাপি নহে। কবিরা কল্পনাবিলাসী হইলেও প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয়ই যে সেই কল্পনার ভিত্তিস্বরূপ তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই।

"ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।"—
১৫। কুঃ ১ম

ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত থাকায় তথায় শীতল ও জলকণাবাহী বায়ু নিরন্তর প্রবাহমান থাকে। সেই হেতু এই প্রদেশের আবহাওয়া শৈত্যময়।

কেবল কুমারসম্ভবে নহে, মহাকবির রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে যেখানেই তিনি কোন গিরি-জনপদাদির বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, বা যেখানে কোনও দেশ হইতে দেশান্তর গমনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি ভৌগোলিক তথ্য সমূহের সিদ্ধান্ত অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত'এ কান্তাবিরহী যক্ষের সন্দেশহারক মেঘকে রামগিরি হইতে অলকার পথনির্দ্দেশ স্থলে ক্রমান্বয়ে যে সমস্ত গিরি, নদী, নগর, নগরী তীর্থস্থানাদি ও তত্তৎস্থান সমূহে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদির বিবৃতি মহাকবি দান করিয়াছেন তৎসমুদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে ইদানীন্তন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত কোথাও অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় না।

তদ্রূপ রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা হইতে অযোধ্যার প্রত্যাবর্ত্তন পথে পুষ্পক বিমানারূঢ় শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা যে সমুদায় পর্ব্বত, কান্তার, জনপদ ও নদীর বর্ণনা মহাকবি করিয়াছেন, তাহাদের অস্তিত্ব নিরূপণের প্রয়াস অনাবশ্যক। বিমান চালনার পক্ষে কবি-বর্ণিত শূন্যপথটি এত প্রশস্ত যে, বর্ত্তমানে বিমান কোম্পানিরাও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অতিবাহনার্থ এই পথেই বিমান সঞ্চালন করিয়া থাকেন। সুতরাং তদানীন্তন ভারতীয়গণের ব্যোম-বিজ্ঞান তথা বায়ুমার্গের পরিস্থিতির বিষয় ইদানীন্তন ব্যোমবিদ্‌গণের ন্যায়ই অভ্রান্ত ছিল; তাহা না হইলে ব্যোমযানের গতিপথ ভিন্নরূপ লক্ষিত হইত। এই প্রসঙ্গে ছায়াপথের যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাও বিজ্ঞানমূলক।

রঘুবংশের ত্রয়োদশস্থ সমুদ্র বর্ণনাও একটি আলোচ্য বিষয়। ইহাতে যে শুধু মহাকবির অপূর্ব্ব কবিত্বের বিকাশ পাইয়াছে তাহা নহে পরন্তু সমুদ্র মধ্যে যে জলজাত ভুজঙ্গ, তিমি মৎস্য, প্রবালাদি কীট নক্র ও জলহস্তী প্রভৃতির বাস আছে, তাহাদের জীবন-বৃত্তান্তে বিশদ বর্ণনা করিয়া জন্তু-বিজ্ঞানে স্বীয় প্রজ্ঞার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার যাথার্থ্য নিরূপণার্থ রঘুর ত্রয়োদশ সর্গের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির অংশ সমালোচনা করা যাইতে পারে। যথা—

"সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্।" ১০

'সমুদ্রে অবস্থিত তিমি মৎস্যগণ তাহাদের বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া সমুদ্রে পতিত নদী-জলরাশির সহিত জলজন্তুগণকে গ্রাস করে। তিমি মৎস্যের মস্তকে একটি রন্ধ্র আছে; ঐ রন্ধ্রপথে

তিমিগণ জলরাশি মাত্র উদ্গিরণ করে ও জলজ প্রাণিগুলিকে উদরস্থ করিয়া থাকে।' ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিমির মুখাবয়ব অতি বৃহদাকার, তাহা না হইলে বহুসংখ্যক জলজন্তুকে এককালীন গ্রাস করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব ভারতীয় যাদুঘরে প্রদর্শনার্থ জীবতত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক তিমির হনুর অস্থি সংরক্ষিত হইবার বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই যে মহাকবির ইহা বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত ছিল, উপরোক্ত শ্লোকটি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তিনি তিমির মস্তকস্থিত রন্ধ্রপথের উল্লেখ ও উহার জীবনযাত্রা-প্রণালীর সবিশেষ বর্ণনা দ্বারা জান্তব জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন।

"বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।" ১২

'সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট বৃহদ্ভুজঙ্গগণ তটভূমির বায়ুসেবনার্থ (সমুদ্রমধ্য হইতে) নির্গত হইয়া থাকে। তাহাদের ফণস্থিত মণিরাজি সূর্য্যের কিরণে প্রদীপ্ত হইলে তাহাদিগকে সর্প বলিয়া বোধ জন্মিয়া থাকে।'

ইহা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয় যে, সর্প বায়ুভুক্ প্রাণী, উহা যে কেবল স্থলচর সর্পের পক্ষে প্রযোজ্য, তাহা নহে, জলচর সর্পগণও বায়ু ভক্ষণ ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং জলস্থিত সর্পগণ বায়ুভক্ষণার্থ সমুদ্রের তটদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে।

"তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্।" ১৩

'এই শঙ্খগুলি সহসা তরঙ্গবেগে তোমার (সীতার) অধরতুল্য লোহিতবর্ণ প্রবাল-সমূহে নিপতিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখ সুতীক্ষ্ণ প্রবালাঙ্কুর সমূহে মুখ বিদ্ধ হওয়াতে অতি কষ্টে সরিয়া যাইতেছে।'

ইহা হইতে এই তথ্য সংগৃহীত পারে যে, শঙ্খ প্রবাল প্রভৃতিকে দেখিলে সাধারণতঃ লোকে জড় পদার্থ বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা সামুদ্রিক সজীব পদার্থবিশেষ। ইহাদের গতিশক্তি আছে ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

"এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ।"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয়, সমুদ্র মুক্তার আকর-ভূমি এবং এই মুক্তা-দামের উৎপত্তি শুক্তি হইতে হইয়া থাকে।

রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি যে অপরূপ বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে। মহীপতি রঘু দিগ্বিজয়াভিলাষী হইয়া প্রথমে ভারতের পূর্ব্ব বিভাগস্থ প্রদেশ সমূহ জয় করিলেন। অতঃপর পূর্ব্ব সাগরের উপকূল-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সুহ্মদেশে, তথা হইতে বঙ্গদেশে, তার পর কপিশা উত্তীর্ণ হইয়া উৎকল, তথা হইতে মহেন্দ্রাদ্রি অতিক্রম করতঃ কলিঙ্গে উপনীত হইলেন। কলিঙ্গ হইতে সমুদ্রতীরপথাবলম্বনে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিত কাবেরী নদী ও মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্যদেশে; সেথান হইতে সহ্য পর্ব্বত (ঘাট পর্ব্বত) লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেরল প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই দেশে মুরলা নদী প্রবাহিত। কেরল হইতে পশ্চিম সমুদ্রতটস্থিত পাশ্চাত্য দেশে, তথা হইতে স্থলপথে পারসিক দেশে গমন করেন। অতঃপর রঘুরাজ উত্তর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক সিন্ধুতীর-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক হূন, কাম্বোজ প্রভৃতি জাতি সমূহকে পরাস্ত করিয়া হিমালয় পার্ব্বত্যপথানুসরণক্রমে কৈলাস পর্ব্বত পরে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, পরে কামরূপে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে কোশল দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের অবস্থিতির বিষয়, তথা নদ, নদী ও পর্ব্বতমালার স্থিতিস্থান নিরূপণ অনায়াসেই করিতে পারা যায়। তৎকালে রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গমনের পথ কিরূপ ছিল এবং তাহা স্থলপথ, কি জলপথ, তাহা বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। রঘুরাজের সমুদ্রতীর পথাবলম্বনে পারস্যে গমন ও পার্ব্বত্যপথাবলম্বনে কোশলে প্রত্যাবর্ত্তন প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূমার্গের বিশদ ভৌগোলিক তত্ত্ব সমাধান করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মহারাজ রঘু যে সমস্ত দেশ বিজয় করিয়াছিলেন ও তত্র অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহারের বিষয়ও মহাকবি উক্ত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্গবাসী ও পারসিকদের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।"

এতদ্দ্বারা ইহা জানা যায় যে, প্রাচীন কালাবধি বাঙ্গালার অধিবাসীরা জলযুদ্ধে পটু ছিল।

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।"—৬০।রঘু ৪র্থ।

'রাজা রঘু পারসিকদিগকে জয় করিবার জন্য পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল হইতে স্থলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন।'

এই পারসিকেরা 'যবন' জাতীয় ছিল, সেই তথ্য বুঝাইবার জন্য 'যবনীমুখপদ্মানাম্'।—৬১।রঘু ৪র্থ। ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

পারস্য ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, অশ্ব পারস্যের প্রধান সম্পদ ছিল এবং পারসিকেরা অশ্বকোবিদ্ ছিল। এতদ্... লিখিয়াছেন—

"সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।"—৬২।রঘু ৪র্থ।
"ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব।"—৬৩।রঘু ৪র্থ।

'সেই নরপতি রঘু ভল্লাস্ত্রে যবনদিগের, মধুমক্ষিকা পরিবেষ্টিত মধুচক্রের ন্যায় শ্মশ্রু পরিশোভিত (দাড়ীওয়ালা) মুণ্ডগুলি ছিন্ন করিয়া ভূমি আচ্ছন্ন করিলেন। ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, পারসিকগণ তৎকালেও শ্মশ্রু রক্ষা করিত।

"অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।"—৬৪।রঘু ৪র্থ।

'যুদ্ধক্ষেত্রে হতাবশিষ্ট পারসিকগণ মস্তক-ভূষণ উন্মোচন ক... রঘুরাজের শরণাপন্ন হইল।'

পারস্যবাসিগণ যে প্রাচীন কালাবধি শিরোভূষণ ব্য... করিত এবং ঐ শিরোভূষণ উন্মোচন পূর্ব্বক সম্মানার্হকে ... দেখাইত, ইহাই তাহার সুস্পষ্ট নির্দশন।

পারস্যের কৃষিজাতের মধ্যে দ্রাক্ষা ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। যথা—

"আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু।"—৬৫।রঘু ৪র্থ।

এতদ্ব্যতীত মহাকবি সমুদ্রের উপকূল প্রদেশে, তাল, তমাল, নারিকেল, সুপারি, এলাচ; মলয় পর্ব্বতে চন্দন; মরু প্রদেশে খর্জ্জুর এবং কাশ্মীরে জাফরাণ প্রভৃতি দ্রব্যনিচয়ের তদীয় গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ পূর্ব্বক ভারতীয় কৃষিপণ্যের এক বিচিত্র তালিকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উল্লিখিত ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাধানে যাহা মহাকবির বিভিন্ন গ্রন্থমধ্যে পরিলক্ষিত হয়, ক্রমশঃ সেইগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

"চন্দ্রঃ ক্ষয়ী······জড়াত্মা"

'চন্দ্র ক্ষয়শীল ও জড় পদার্থ।' মহাকবি কালিদাস তাঁহার রচিত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা নামক গ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত শ্লোক দ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, চন্দ্র জড় পদার্থ।

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।"—২২।রঘু ৩

'তরুণ চন্দ্রে সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হইলে উহা যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে মহারাজ দিলীপের শিশুপুত্র রঘুও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।'

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, চন্দ্র নিষ্প্রভ; সূর্য্যালোক চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হয় বলিয়াই চন্দ্র প্রদীপ্ত হয়। 'বৃদ্ধিং পুপোষ' —এই শব্দদ্বয় ব্যবহার দ্বারা শিশুর সহিত তুলনা দিবার সার্থকতা এই যে, শিশু যেমন অন্নপানাদির দ্বারা পুষ্টিলাভ করতঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চন্দ্রেরও যে পরিমাণ অংশে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় সেই পরিমাণ অংশ আলোকিত হইতে থাকে এবং এইরূপে সূর্য্যরশ্মির নিপাত হেতু ক্রমশঃ সমগ্র চন্দ্রমণ্ডল প্রদীপ্তালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চন্দ্র যে কলায় কলায় বৃদ্ধি পায়, ইহা তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

"ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।"

—৪১।১৪শ রঘু

'সাধারণ লোকেরা ভূমির ছায়াকেই চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।' অর্থাৎ ভূমির ছায়াই প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত। চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন যে শশচিহ্ন বা মৃগচিহ্ন নহে পরন্তু ভূমির ছায়া মাত্র, তাহা প্রাচীন কালাবধি সুনির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই আমাদের বোধ জন্মিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতেও চন্দ্র সূর্য্য-প্রদীপ্ত, ইহার এই কলঙ্কচিহ্ন বন্ধুর গিরিগহ্বর-মালার ছায়া মাত্র। ভূমি বিকৃত হইয়া কঠিন পাষাণে পরিণত হইলেই পর্ব্বতের সৃষ্টি হয় সুতরাং উপরোক্ত শ্লোকে 'ছায়া হি ভূমেঃ' বলাতে কোনওরূপ অসঙ্গতা দোষ জন্মে নাই।

"ধূমজ্যোতিঃসলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।"—৫।। পূঃ মেঃ।

'ধূম (smoke) জ্যোতিঃ (heat) সলিল (moist) মরুৎ (vapour) অর্থাৎ ধূম, তাপ, জল ও বায়ুর সমবায়েই মেঘের উৎপত্তি। এই মেঘ কিরূপে প্রাণীর বার্ত্তা বহন করিবে? ঔৎসুক্য বশতঃ রামগিরিতে নির্ব্বাসিত কান্তা-বিরহী সেই যক্ষ চেতন ও অচেতন পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াই মেঘকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, কেন না, কামবৃত্তির বশীভূত হইলে প্রাণিগণের চেতন ও অচেতন পদার্থগত পার্থক্যবোধ লুপ্ত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা মহাকবি কালিদাস অতি সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত কাব্যে মেঘ দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যে মেঘ সজীব পদার্থ, তাহা নহে। ইহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং পাছে সাধারণে এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ইহার যাথার্থ্য নির্ণয়ে অসমর্থ হয়, সেই অভাব দূরীকরণার্থ মেঘের উৎপত্তি কি কি বস্তুর সমবায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণনা দ্বারা স্বকীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। মেঘের উৎপত্তি বিষয়ে মহাকবি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতের সহিত ইহার মূলতঃ কোনও বৈষম্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

"আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ।"—৫।১ম কু।

'এই পর্ব্বতের (হিমালয়ের) কটিদেশ পর্য্যন্ত মেঘ সকল বিচরণ করে, তাহাতে ইহার সানুদেশে মেঘের ছায়া নিপতিত হয়। সেই স্থানে অর্থাৎ মেঘাবৃত সানুদেশে সিদ্ধমুনিগণ বিশ্রাম করিতে করিতে যখন বৃষ্টিধারায় ক্লিষ্ট হ'ন, তখন তাঁহারা মেঘমালার উপরিস্থিত রৌদ্রতপ্ত শৃঙ্গসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকেন।'

উপরোক্ত শ্লোক হইতে আমাদের মেঘের স্থিতি সম্বন্ধে এই জ্ঞান লাভ হয় যে, জলবর্ষী মেঘের অবস্থিতি বহু ঊর্দ্ধে সম্ভব নহে, সুতরাং উহা হিমালয়ের শিখর দেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে তিন হইতে ছয় মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জলবর্ষী মেঘের (Nimbus and cumilus) অবস্থিতি হইতে পারে, তদূর্দ্ধে ইহার স্থিতি সম্ভবপর নহে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি বর্ণিত শ্লোকে হিমালয়ের সানুদেশ মেঘাবৃত এবং শিখরদেশ সূর্য্যকিরণ প্রদীপ্ত বা জলবর্ষী মেঘশূন্য বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, তাহা মেঘের স্থিতি সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে আমরা পরিজ্ঞাত হই যে মেঘের সংঘর্ষণের ফলেই বিদ্যুদালোকের উৎপত্তি।

"করেণ বাতায়নলম্বিতেন
স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি! কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়ম্
উদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে।"—২১।১৩শ রঘু।

উপরোক্ত শ্লোকে পুষ্পক বিমানে বিগাহমান সীতা দেবীকে বলিতেছেন, 'হে ক্রোধশীলে! কৌতূহল বশতঃ বাতায়নে হস্ত প্রসারিত করিয়া স্পর্শ করি

বিদ্যুজ্জ্বল প্রকাশ করিত, মনে হইত জলধর যেন তোমায় অপর একটি অলঙ্কার প্রদান করিতেছে।'

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংঘর্ষণের ফলে মেঘ বিদ্যুৎপ্রকাশ করে, তাহা মহাকবির অপরিজ্ঞাত ছিল না।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥"—১৮।১ম রঘু।

'প্রজাগণের মঙ্গলবিধানার্থই মহারাজ দিলীপ তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, যেমন সহস্রগুণ উৎসৃজনার্থ সূর্য্য পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন।'

ইহার স্পষ্টার্থ এই যে, সূর্য্য রশ্মিদ্বারা যে রস আকর্ষণ করেন, তাহাই বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া ঘনীভূত হয় এবং মেঘাকার ধারণ করে। পরে সেই মেঘবারিরূপে ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া অশেষ পার্থিব কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

ইহার বিশ্লেষণার্থ মহাকবি রঘুর ত্রয়োদশে পুনরায় বলিয়াছেন,

"—গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ"—৪। ১৩শ রঘু।

'সূর্য্যের রশ্মিমালা ইহা হইতে অর্থাৎ সমুদ্র হইতে গর্ভ ধারণ করে।'

বস্তুতঃও তাই। নীরস সূর্য্যরশ্মিমালা সমুদ্রবক্ষে পতিত হইয়া যখন তদ্রস শোষণ করে, তখন তাহারা সরস বারিগর্ভ হইয়া যায়। সেই হেতু এই গর্ভধারণ ব্যাপারকে অবাস্তব রূপক বলা যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, সমুদ্র জল বাষ্পাকারে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে ঘনীভূত হয় এবং উহাই বৃষ্টিরূপে ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, ইহাকেই যথাক্রমে Theory of evaporation and condensation বলে। সেইরূপ উপরোক্ত শ্লোক দুইটি দ্বারা দেখা যায় যে, আকর্ষণ ও বর্ষণ সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতেও যে সেই তত্ত্বের যুক্তিযুক্ত সমাধান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই।

"সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি—
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য॥"—২১।৩য়, কু।

'অগ্নির সাহায্য কর' বায়ুকে এ কথা কে বলিয়া দেয়? ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বায়ু অগ্নির সহায়ক অর্থাৎ বায়ু ব্যতিরেকে অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বায়ুলেশহীন স্থানে অগ্নির উৎপত্তি কদাচ সম্ভবপর নহে।

"অতিমাত্রং ভাস্বরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।"—মালবিকা।

'অগ্নি সূর্য্যের অনুপ্রবেশ বশতঃ রাত্রিকালে অত্যধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়া থাকে।'

রাত্রিতে অগ্নির শিখা যত দীপ্তিমান্ বলিয়া পরিলক্ষিত হয় দিবাভাগে তদ্রূপ হয় না। ইহা দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, দিবাভাগে অগ্নির তেজ সূর্য্যে নিহিত হইয়া যায় এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের তেজ অগ্নিতে নিহিত হয় বলিয়া অগ্নির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে নিবন্ধের উপসংহার করিলাম।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই—প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ভূতত্ত্বাদি বিষয়ের ধারাবাহিক শিক্ষা-পুস্তক সমূহ বর্ত্তমান ছিল, উহার অনুশীলন ও গবেষণা রীতিমত অনুষ্ঠিত হইত এবং বিদ্যামোদী মাত্রেই অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিতেন। তাহা না হইলে তাঁহারা কিরূপে বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এরূপ বিশদ বিবরণ দান করিতে সমর্থ হইতেন? ভূপর্য্যটন দ্বারা ভূ-প্রকৃতির বিষয় সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া একাধিক গ্রন্থ রচনা করা কদাচ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর এক কথা এই—ইহা যে শুধু মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, পরন্তু ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা কবিগণের রচিত গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সরস কাব্যরচনা স্থলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাধানের উল্লেখ অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় কবিগণের গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও কালিদাসের গ্রন্থাবলী মধ্যে তাহার প্রাচুর্য্য বশতঃ তৎসমূহ হইতে কয়েকটি মাত্র উদ্‌ধৃত করিলাম।

প্রচ্ছদপট

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন মুদ্রিত হইল। জে, আর, সেনগুপ্ত গৃহীত।]

রজনীকান্ত সেন

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯০১ সালে রাজসাহী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে যাই। লাহীর নীচে দিয়ে চলেছে পদ্মা, বহু দূর বিস্তৃত, চিরপ্রবাহিত য় উচ্ছল, অশান্ত। প্রথম জীবনে সেই পদ্মার ডাক বড় ভাল াছিল। আর ভাল বেসেছিলাম রজনীকান্তকে। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, স্বাস্থ্য, রূপ, শ্রী ও কান্তিতে অনবদ্য। প্রফুল্লতা ছিল স্বভাবসিদ্ধ। প্রতিভাবান কবি বলে একটুও অভিমান মনে ছিল না। হাসিতে হাসাইতে অদ্বিতীয়; এমন পরিহাস-ক লোক প্রায় দেখা যায় না। পরিচয় হবার পর থেকেই আমি গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়লাম এবং তিনিও বড় অনুকূল হলেন ার প্রতি। ফলে হলো এই যে, আমি যে ক'মাস রাজসাহীতে াম, আমাদের দেখা হওয়াটা যেন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ছিল।

আমার বাসায় প্রায়ই বৈঠক বসতো। সহরের গণ্যমান্য লোক কেই আসতেন। গানে-গানে আসর উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। নী বাবু প্রায়ই নিজের রচিত গান গাইতেন। গানগুলি এমন কার যে, অল্প দিনের মধ্যে রজনী সেনের নাম ঐ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এত জনপ্রিয় সঙ্গীত বোধ হয় আর কোনও কবির না।

বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে য়েছিলাম। রাজসাহী যাবার কয়েক দিন পরে—সুরেশ বাবুর ই পরিচয়-পত্র হাতে করে এক দিন সকাল বেলা তাঁর গৃহে উপস্থিত লাম। তার পূর্বেই রজনীকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ জমে ঠছিল। পরিচয়-পত্রখানি হাতে দিতেই রজনীকান্ত বললেন, 'এ াবার কেন?'

আমি বললাম, 'একটি দরবার আছে আপনার কাছে।'

'কি?'

'আপনি আমাকে কোথাও গান গাইবার জন্য বলবেন না। ুন, আমার বয়স খুব কম, অনেক ছাত্র আমার অপেক্ষা বয়েসে ড়। তার পর আমার চেহারাও নিতান্ত ছেলে-ছোকরার মতো। ম এই অধ্যাপকের কাজ করতে এসে যদি গান গেয়ে বেড়াই, াকে নিতান্ত হাল্কা মনে করবে।'

'ওঃ, এই কথা! প্রার্থনা অগ্রাহ্য।'

এই বলে সুরেশ বাবুর চিঠিটা ফেললেন ছিঁড়ে আর অন্তঃপুরে হিলাদের ইঙ্গিত পেয়ে আমাকে ধরলেন গান গাইবার জন্যে। নেক ওজর-আপত্তি করেও অব্যাহতি পেলাম না। আমি রবি াবুর গান গাইলাম :

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন
সদা বাজে গো।

ঐ গান তিনি তার পূর্বে শোনেননি। গানটি বোধ হয় তাঁর ব ভাল লেগেছিল। একাধিক বার শুনলেন। তার পরে এক দিন ার নিজের গান শোনালেন ঐ ইমন রাগিণীতে :

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।

ল্প দিনের মধ্যে রচনা করে, খুব ভাবের সঙ্গে গানটি গাইলেন। দ্ধ হলাম। তুলনা করতে ইচ্ছা হয় না তবুও বলতে পারা যায়, বীন্দ্রনাথের কাব্য-শৈলীর মতো হয়তো রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি, কন্তু সরল প্রাণের সরল ভাষা ঐ-সুরে যে ব্যঞ্জনা লাভ করেছিল তোমারি রাগিণীতে' তা নেই। দরদী মনের সহজ বিকাশ হিসাবে গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এখনও অনেকের মুখে শোনা যায়। রজনী সেনের 'স্নেহ-বিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখি রে', 'যবে সৃজন বাসনা কণা লয়ে কৃপা-আঁখিকোণে চাহিলে হে রাজ-অধিরাজ' প্রভৃতি গানগুলি যেন প্রাণের গভীর অন্তস্তল থেকে আপনিই বেরিয়ে এসেছে। এ যেন শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে দূর্বাদলের উপর কিরণ-ঝলমল শিশিরবিন্দু।

রজনীকান্ত ছিলেন উকীল। কখন ওকালতী করতেন কে জানে? গান রচনা আর লোককে সেই গান শুনিয়ে তৃপ্তি দান করা—এই ছিল তাঁর কাজ। একটা হারমোনিয়ম দিয়ে বসিয়ে দিতে পারলেই হলো—প্রস্রবণের মতো গীতের ধারা মুক্তো-মাণিক ছড়িয়ে ছুটে চলতো। কলকাতা থেকে রাজসাহী চলেছেন—গাড়ী ছাড়বার পর থেকে গান আরম্ভ করেছেন আর দামুকদিয়া ঘাট পর্য্যন্ত সমানে গানের স্রোত বয়ে যেতো! লোককে আনন্দ দিয়ে কি এত আনন্দই তিনি পেতেন। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁর হাসির গানগুলি রচিত। এমন নির্দোষ ব্যঙ্গ-রসের সৃষ্টি তিনি করেছিলেন, যার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে বিরল। তাঁর 'কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছে বিলক্ষণ' প্রভৃতি গান দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্য—বোধ হয় পল্লীবাসীর প্রাণের সরল হাসি ফোটাতে রজনীকান্তই অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এক দিন আমার বাসায় গানের বৈঠক বসেছে সন্ধ্যা বেলা। অক্ষয় মৈত্র, শ্রীনাথ সেন (ভাষাতত্ত্বের লেখক) প্রভৃতি অনেকে জুটেছেন—মায় সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেব পর্য্যন্ত (তাঁর জন্যে পৃথক্ হুঁকো রাখতে হতো)। কলেজের অধ্যাপকরা ছিলেন কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁরা সব সময়ে এসে উঠতে পারতেন না। আমি অধ্যাপক হয়েও যে গান-বাজনার এত পক্ষপাতী, এটা তাঁরা কোনও মতে প্রশ্রয় দিতে পারতেন না! আরও আমি ছিলাম সব চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ।

রজনীকান্তের গান চলেছে, সকলেই প্রশংসায় শতমুখ। আমি একটু গম্ভীর হয়ে সমালোচনা করলাম :

'রজনী বাবুর গান অপূর্ব—অর্থাৎ যদি দম থাকে। এত যুক্ত অক্ষর ও এত দীর্ঘচ্ছন্দ যে, দম থাকলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।'

রজনী বাবু আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, ধরুন না, রজনী বাবুর

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা।
ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চল
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা শান্ত কুশল দরশা॥

আবৃত্তি করতে করতে আমি যেন দম হারিয়ে ফেললাম। সভায় হাসির রোল উঠলো।

হাসি থামলে রজনী বাবু হাত দুটো নাচিয়ে বললেন—'তবে কি আপনার মতে কবিতা হবে

'খরতর বরশর হতদশ-বদন।'

দ্বিগুণ হাস্যোচ্ছ্বাসে আমার সমালোচনা ভেসে গেল।

রাজসাহী থেকে চলে আসবার বছর আটেক পরে আবার গেলাম

রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেবার সভাপতি, রজনী বাবু তখন সর্দি-কাশীতে ভুগছেন—কিন্তু তাঁরই উদ্বোধন সঙ্গীত, তাঁরই সমাপ্তি সঙ্গীত। আমাদের জন্য সান্ধ্য সম্মেলন হলো পাবলিক হলে—সেখানেও গানের পর গান করলেন রজনী বাবুই।

এই সান্ধ্য সম্মেলনের পরে আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল। হীরালাল বাবুরা রাজসাহীর মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক। রজনী বাবুও নিমন্ত্রিত। এখানেও গান চললো—গৃহস্বামী দু'-এক বার মৃদু স্বরে জানালেন যে, খাবার দেওয়া হয়েছে। রজনী বাবু বললেন, 'দাঁড়ান, এঁকে আবার কবে পাব? একটু গান শুনিয়ে নি।'

শীত কালের রাত্রি। গান সমাপ্ত করে যখন আমরা খেতে গেলাম, তখন খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গৃহস্বামীকে আবার বিনা বাক্যব্যয়ে সমস্ত খাবার নতুন করে পরিবেশন করতে হলো।

এক দিন বর্ষা কালে দুপুরের পরে রজনীকান্ত আমার বাসায় এলেন, গায়ে ফ্লানেল, গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

বললেন, 'জ্বর হয়েছে।'

'এলেন কেন? আমাকে খবর দিলে তো আমি যেতে পারতাম?'

'শুনলাম, আপনার শরীর ভাল নেই। তাই এলাম।'

আমার বাসা তাঁর বাড়ী থেকে ১০।১২ মিনিটের পথ। এই দুপুরে রোগী মানুষ এত কষ্ট করে এসেছেন।

নূতন গান বেঁধেছেন—একটি কীর্ত্তন। সেইটি গান করে শুনিয়ে গেলেন।

গান করতে করতে কবি গলে গেলেন এবং আমিও কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষা খুঁজে পাইনি।

এমনি পাগলা ছিলেন বাংলার কান্ত কবি-রজনীকান্ত। গলাকে অসম্ভব রকমে খাটিয়ে-খাটিয়ে তিনি দুরন্ত ক্যানসার রোগ ডেকে আনলেন এবং সেই রোগেই মেডিকেল কলেজের একটি কটেজে তাঁর দেহ রাখলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গান রচনা করতে ছাড়েননি। তাঁর স্বদেশী গানগুলি, যথা—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এখনও কণ্ঠে-কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়।

কবির অমর আত্মা কোন্ দিব্য সঙ্গীত-লোকে বিচরণ করছে কে জানে? এখনও তাঁর মধুর সঙ্গীত আমার কানে ভেসে আসে।

বন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত যখন তাঁর 'কান্ত-কবি রজনীকান্ত' বইখানি রচনা করেন, তখন প্রায়ই আমার দর্জিপাড়ার বাসায় আসতেন। নলিনীরঞ্জন হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। আমার মনে হয়, নলিনীরঞ্জনের চরিতাখ্যান কান্ত-কবির স্মৃতি বহু দিন বাঁচিয়ে রাখবে।

লুই আরাগঁ

স্নেখেন্দু দত্ত

জার্ম্মাণ শাসনাধীনে অন্ধকারময় ফ্রান্সের চরম দুর্দ্দিনে সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে গড়ে ওঠে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের নাৎসী-বিরোধী প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সংগে জড়িত হয়ে উজ্জ্বল এক আলোক-রশ্মির মতই দেখা দিল এক নতুন সাহিত্য, দেশবাসীকে পথ দেখাল সেই আলোক-রশ্মি। সমগ্র ফ্রান্সের ২২ শত সাহিত্যিক, কবি এবং সাংবাদিক সংগঠিত হন এই গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে। জার্ম্মাণ শাসনাধীন ফ্রান্সে নাৎসীদের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের অমর কাহিনী আজও ফ্রান্সের সর্ব্বত্র লোকের মুখে-মুখে ফেরে। লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার গৌরব অর্জ্জন করেন ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টি আর একে সংগঠিত করে তোলেন ফ্রান্সের সব চেয়ে জনপ্রিয় কবি—জনগণের কবি লুই আরাগঁ।

অল্প বয়সেই আরাগঁ কাব্য-জগতে প্রবেশ লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যের বন্ধ্যাত্ব মোচন করে প্রকৃত শিল্পী হিসাবে তিনি গড়ে ওঠেন বেশ কিছু কাল পরে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আরাগঁ লিখতে শুরু করেন। ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির দিন তখন থেকেই শেষ হয়ে আসছে, পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থা তার সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতি নিয়ে কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আরাগঁ কিন্তু বাস্তব সম্বন্ধগুলো মেনে নিয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতার সংগে একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারলেন না, নৈরাজ্যবাদের পথ অনুসরণ করলেন তিনি, দুনিয়ার সব-কিছুর বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

কবির প্রতিভা বিকাশের মোড় ঘুরে যায় সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে। সোভিয়েট জনগণ তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন। সোভিয়েট নরনারীর অনুপ্রেরণাময় শ্রম তাঁকে মানবতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন বিশ্বাস এনে দিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হলেন তিনি। ফিরে এসে সোভিয়েট জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে আরাগঁ লিখলেন তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ "সাবাস উরাল!" তাঁর আগেকার কবিতাগুলো থেকে এগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। সরল, প্রত্যক্ষ এমন কি স্থূল এই কবিতাগুলো ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। কবি তাঁর নিজস্ব আনন্দ ও উৎসাহে তাঁর নিজের তৈরী কাঠামোকেই ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রুশ-কবি মায়াকোভস্কির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন তিনি। নৈরাজ্যবাদী কবির স্বপ্ন-প্রাসাদ চূর্ণ হল। এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এবার জগৎকে দেখতে লাগলেন যে তার ফলে তাঁর প্রত্যেকটি রচনা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। যে তরুণ কবি এক দিন (১৯২৪) চরম হতাশা ও একান্ত বিরক্তিতে লিখেছিলেন, "আমি চাই না মানুষের সংগ" তিনিই আবার গভীর বিশ্বাস নিয়ে লিখলেন, "আমি মানুষের গান গাই।"

তখন থেকেই আরাগঁ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নিজেকে সহযোগী করে তুলতে অগ্রণী হলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনে এবং আন্তরিক ভাবেই তিনি এতে আত্মনিয়োগ করলেন। ফ্রান্সের লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেও সংগঠিত করে

ত লাগলেন তিনি। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় ধানী প্যারীতে তিনি এক সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা গড়ে লেন। সাহিত্য বিষয়ক নানা সমস্যার ওপর এখানে প্রতি হেই আলোচনা ও বিতর্ক চলত। এই পাঠচক্রই ছিল শ্রমিক র অগ্রণী অংশের সংগে ফ্রান্সের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের যোগের কেন্দ্র।

এ সব করা সত্ত্বেও কবি এক-এক সময় অনুভব করতেন যে, যে াকে পরিবর্তিত করার জন্য তাঁরা এত অস্থির হয়ে উঠেছেন, জগৎকে তাঁরা তাঁদের লেখার দ্বারা একটুও বদলে দিতে ন না।

এল ১৯৩০ সাল। ফ্যাসিষ্টদের ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল দের রাজপথে। কবি পেলেন তাঁর কর্তব্যের নতুন আহ্বান। দবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন তিনি, কবির হাতে লেখনীর গ্রহণ করল এবার রাইফেল। আর শুধু আরাগঁই নন, বীর বিভিন্ন দেশ থেকে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রতিনিধি দল দিন ছুটে এসেছিলেন স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে শ গ্রহণের জন্য। তাঁদের সংগে স্পেন যুদ্ধে অংশ নিলেন আরাগঁ। ট আহত হন তিনি, শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনায় ফিরে আসতে হ্য হন।

রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার ব্যাপারে ফ্যাসিষ্টরা যে-সব ৃরতার আশ্রয় নিয়েছিল, যুদ্ধে তার পরিচয় পেয়েছিলেন আরাগঁ। ই গণতন্ত্রী স্পেনকে সাহায্যের জন্য দেশে-দেশে যে ব্যাপক অভিযান ন, তার পুরোভাগেও থাকতে পেরেছিলেন কবি। গণতান্ত্রিক টর সান্ধ্য দৈনিক "সন্ধ্যা" (Ce Soir) পত্রিকাখানা প্রতিষ্ঠা র ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন এবং এর সম্পাদকও লন তিনিই। নানা রকম রাজনৈতিক প্রচার এবং সংগঠনের জ ব্যস্ত থাকলেও আরাগঁ কিন্তু তাঁর সাহিত্য-চর্চা ভোলেননি।

কবির কাব্যের বন্ধগত্ব মোচন হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৩২ সাল ন্তও দেখা যায় যে, তিনি কবিতার প্রাণহীন বাঁধা-ধরা নিয়ম ক নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি। আরাগঁর এই রকার (১৯৩১-১৯৩২) কবিতাবলী "অত্যাচারিত অত্যাচারীতে" "কমিউনিষ্টরা ঠিকই করেছে" ইত্যাদি কবিতাতেও তাঁর নবলব্ধ াস বলিষ্ঠ ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি।

এই সময়েই আরাগঁর মনে হল যে, ধনতন্ত্রকে আক্রমণ করবার যুক্ত হাতিয়ার হচ্ছে উপন্যাস লেখা। উপন্যাস লেখাকেই তিনি তন্ত্রবাদের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত করার সহজ উপায় বলে ণ করলেন। তাই দেখি যে, ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৯ ল—এই ক'বছরে আরাগঁ আর কোন কবিতা লেখেননি। এই য়ের মধ্যে তিনি চারখানা বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন আর ই উপন্যাসগুলোতে তিনি ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাকে, তার ঃপতন ও দুর্নীতির চিত্রকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এই রখানা উপন্যাস রচনার ফলেই ঔপন্যাসিক হিসাবে আরাগঁ বিশেষ াম অর্জন করে ফেলেন। একমাত্র বালজাক ও জোলা'র চত উপন্যাসের সংগেই তাঁর এই রচনার তুলনা করা চলে।

ফ্যাসিবাদের আক্রমণ থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য খক ও বুদ্ধিজীবীদের যে আন্তর্জাতিক আন্দোলন শুরু হয়, তাতেও আরাগঁ বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫এর জুলাইতে অনুষ্ঠিত লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ব-কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৩৯ সালে মার্কিণ লেখক কংগ্রেসেও উপস্থিত থাকেন আরাগঁ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন চালাবার সময়ই তাঁর সংগে বিশ্বের সেরা লেখক ও সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ভিন্‌সেন্ট সিয়ান, পার্ল বাক্ প্রভৃতির সংগে এই সময়ই তাঁর পরিচয় ঘটে। পরবর্তী কালে এই সব লেখকদের অনেকেরই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে তাঁকে মর্মাহত হতে হয়েছিল। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এবং "গুড আর্থ" ও অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাসের রচয়িতা মিসেস পার্ল বাক্-এর মত লেখিকাও কি ভাবে প্রগতির শিবির থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন তা তিনি দেখলেন। ১৯৪৬ সালে অ-মার্কিণ তদন্ত কমিটি যখন হলিউডের ব্যাপারে "তদন্ত" চালাচ্ছিল, সেই সময় মিসেস্ পার্ল বাক্ "রেড"দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করেন। লুই আরাগঁ তখন তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেন, তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে দেন নির্মম ভাবে।

মিউনিকের চরম বিশ্বাসঘাতকতার পর ঘনিয়ে এল প্রগতিশীল দুনিয়ার মহা দুর্দিন। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গেল ভেঙ্গে, প্রজাতন্ত্রী স্পেনের পতন ঘটল আর সেই সংগেই দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা। এ সবের ফলে ইউরোপীয় এবং মার্কিণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে দেখা দিল ব্যাপক হতাশা। অনেক নাম-করা লেখক এবং সাহিত্যিকই বিপ্লবী আন্দোলন পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে আত্মসমর্পণ করলেন, প্রতিক্রিয়ার গভীর পাঁকে ডুবে গেলেন তাঁরা।

কিন্তু আরাগঁ ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন না তিনি। ফ্রান্সের পরাজয়ও তাঁকে হতাশ করতে পারল না, বরং নতুন শক্তি জোগাল তাঁকে। তাঁর কাব্য এবার চরম বিকাশ লাভ করল।

ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকেরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর জন্মভূমিকে এক দিন ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দিল বটে, কিন্তু ফরাসী জনগণ এই বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে পারল না। শুরু হল জনতার অমর প্রতিরোধ আন্দোলন। আরাগঁর লেখনী এবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করতে শুরু করল, ঘৃণ্য নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অনুপ্রাণিত করে তুলল ফ্রান্সের জনতাকে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে কিন্তু একক ছিলেন না আরাগঁ। ১৯৪১ সালেই তিনি ফ্রান্সের সমস্ত প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে গুপ্ত নাৎসী-বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। এই প্রতিরোধ বাহিনী তাঁদের মুখপত্র হিসাবে একখানা কাগজ গোপনে ছেপে বিলি করতেন। আরাগঁ নিজেই কাগজখানার সম্পাদক ছিলেন এবং এতে ছদ্মনামে তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন, তা আজও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা।

গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করার নামে নাৎসীরা তখন সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে এক বর্বরতার অভিযান। 'সন্ত্রাসবাদী', 'কমিউনিষ্ট', 'ইহুদী' ইত্যাদি অভিযোগে প্রত্যহই চলত প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড। ফ্রান্সের বিপ্লবী জনগণ সহ্য করতে পারত না এই বীভৎস অত্যাচার,

প্রায়ই খুন হত জার্মাণ অফিসারেরা। আর এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্ত প্রতিভূ হিসাবে বন্দীনিবাস থেকে এমন সব রাজনৈতিক বন্দীদের গুলী করে খুন করা হত যাঁরা ঘটনার বহু দিন আগে থেকেই বন্দী হয়ে আছেন এবং জার্মাণ অফিসারদের হত্যার সংগে কোন সম্পর্কই যাঁদের থাকতে পারে না। এমনি ভাবে হাজার শহীদ লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবন বলি দিচ্ছিলেন আর "ফরাসী সরকার" বলে যারা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিল, রাষ্ট্রের সেই তথাকথিত কর্ণধারেরা তাদের মৃত্যুর কারণ জানানো তো দূরের কথা, সেই খবরটুকুও জনসাধারণকে দিতে চাইত না। কিন্তু তবু সব খবরই তাঁরা পেতেন, ফ্যাসিষ্টরা কোন খবরই গোপন রাখতে পারত না জনসাধারণের কাছ থেকে। সবাই জানতেন, কে এই সব খবর পৌছে দিচ্ছে তাঁদের ঘরে-ঘরে। কেউ জানত না কোথায় তিনি আছেন, কিন্তু আরার্গ থাকতেন তাঁদেরই মধ্যে।

১৯৪১ সালের ২০শে অক্টোবর ব্রিটানির অন্তর্গত শাতোঁব্রিয়াঁ বন্দীনিবাস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে নান্তেস সহরে এক জার্মাণ নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য শাতোঁব্রিয়াঁ বন্দীনিবাস থেকে ২৭ জন রাজনৈতিক বন্দীকে প্রতিভূ হিসাবে নিয়ে গিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন গাই মোকে—সতের বছর বয়সের চঞ্চল আনন্দমুখর এক কিশোর! এই বর্ব্বর প্রতিশোধের বিস্তারিত খবর লুই আরার্গই প্রথম জানতে পারেন! অসীম দুঃখ আর তীব্র ঘৃণার জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি শাতোঁব্রিয়াঁর অমর শহীদদের মৃত্যু-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। নিঃসীম দুঃখে তিনি লিখলেন, "যে কাহিনী আজ লিখতে বসেছি তাতে নাম স্বাক্ষর করতে পারলে সব চেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করতাম নিজেকে। কিন্তু আজকাল দেশবাসীর দাবীর সমর্থনে একটা কথা বলতে গেলেও ফ্রান্সের মানুষ তাঁর নিজের নাম ব্যবহার করতে পারেন না।...শাতোঁব্রিয়াঁ বন্দীনিবাসে আবদ্ধ যে বন্দীদের বিবরণ থেকে সাতাশ জন অমর শহীদের মৃত্যু-কাহিনী আমি এখানে লিখছি, এ কাহিনী রচনার গৌরব তাঁদের, আমার নয়।" এই অমর কাহিনীর একটা স্বাক্ষরবিহীন অনুলিপি এক মার্কিণ বেতার প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়ে পৌছায়। ফ্রান্সের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বহু বেতার ঘোষণায় এই কাহিনীটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে, এর লেখক হচ্ছেন স্বয়ং লুই আরার্গ!

শুধু শাতোঁব্রিয়াঁর বন্দীরাই নন, এমনি হাজার হাজার বিপ্লবী মানুষকে জার্মাণ ফ্যাসিষ্টরা প্রতিভূ হিসাবে গুলী করে হত্যা করে। এমনি ভাবেই হত্যা করা হয় ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক গেব্রিয়েল পেরীকে। আবেগময়ী ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক জনপ্রিয় গাথা রচনা করলেন আরার্গ। মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি লিখলেন, কোন স্বীকারোক্তি না করার জন্যই নিষ্ঠুর ভাবে গুলী করে হত্যা করা হয় তাঁকে। "ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্ত" বীরের মৃত্যুই বরণ করে নিয়েছেন গেব্রিয়েল!

আরার্গ হচ্ছেন এক কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখক, কোন প্রলোভনই তাঁকে তাঁর মহান্ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। একবার এক জার্মাণ নাৎসী ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁর কাছে এক প্রতিনিধি এলেন। আরার্গকে তিনি তাঁর কোম্পানীর ফিল্মের জন্ত খান তিনেক গল্প লিখে দেবার অনুরোধ জানালেন। আরার্গকে অবশ্য বিশেষ কিছুই করতে হবে না, টাইপ করে তিন-চার পৃষ্ঠার মধ্যে শুধু এক-একটা গল্পের কাঠামো খাড়া করে দিতে হবে। তার পর সেটাকে ফোলান-ফাঁপান এবং সংলাপ রচনার জন্য কোম্পানীই অন্ত লোকের ব্যবস্থা করবেন। এই ধরণের এক-একটি গল্প লিখে দেওয়ার জন্ত আরার্গকে তিন লক্ষ ফ্রাঁ করে দিতে চাইলেন তিনি।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে আরার্গর অবশ্য মোটেই কষ্ট হল না। তিনি তখন একটা সান্ধ্য কাগজের সম্পাদক, আর ঠিক সেই সময়ে তাঁর কাগজে নাৎসী ফিল্মের বিরুদ্ধে সমানে প্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোম্পানীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেই তাঁকে তাঁর কাগজে ঐ কোম্পানীর বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করে দিতে হয়, কারণ গল্প কেনার নামে এই ভাবে লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ ঘুষ দিতে চাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটাই ছিল তাই। অতএব তাঁর প্রস্তাবে আরার্গ সোজাসুজি অস্বীকার জানালেন এবং নেহাৎ ভালমানুষের মত ভদ্রলোককে বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন।

আর একবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল ধনীদের অন্যতম শক্তিশালী মুখপত্র "রীডার্স ডাইজেষ্ট" থেকে তাঁর কাছে প্রাত্যহিক জীবনে সব চেয়ে মজার চরিত্র নিয়ে লেখা একটা ছোট গল্প চেয়ে পাঠান হয়। তাঁকে জানান হল যে, গল্পটির জন্ত তিনি মূল্য হিসাবে পাবেন দু'হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ ফ্রাঁ। আরার্গ দেখলেন যে, "রীডার্স ডাইজেষ্ট"-এর প্রস্তাবে রাজী হলে তাঁর পক্ষে দেশের সাধারণ মানুষের সহমর্ম্মী হওয়া মুস্কিল হবে। প্রকৃতপক্ষে এ হবে লেখকের বিবেককেই বেচে দেওয়া। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তিনি লিখেছিলেন, "টাকা জিনিযটা খুবই সুন্দর, খুবই মহৎ। টাকার জোরে লেখককে কেনা যায়, কেনা যায় মহত্ত্ব ও করুণা সম্পর্কে লেখকের ধারণাকে ...প্রাত্যহিক জীবনে সব চেয়ে যে মজার চরিত্র আমি দেখেছি তার গোঁফ কিংবা ফার কোট থাক বা না থাক—তার নাম টাকা।"

কাঞ্চনমূল্যের জন্ত আরার্গ কোন দিনও আত্মবিক্রয় করেননি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ কামান গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই ওয়াল ষ্ট্রীটের যুদ্ধবাজেরা মুনাফা শিকারের আশায় আর একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। কবি আরার্গ দু'-দুটো মহাযুদ্ধের সর্ব্বনাশা রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সমর-দানবদের যুদ্ধোন্মাদনা প্রকাশ পাবার সংগে-সংগে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দুনিয়াব্যাপী প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং মেহনতী জনগণকে, সাধারণ মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন: সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের কবল থেকে যদি তোমাদের মজুরী বাঁচাতে হয়, মহাসমরের বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে যদি তোমাদের প্রিয়জনের সুখ, শান্তি আর স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হয়, তবে এখনই এক হয়ে দাঁড়াও, শান্তির জন্ত কাজে লেগে যাও! যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জ্জে উঠুক সাহিত্যিকের লেখনী, মুখর হয়ে উঠুক শিল্পীর তুলি!

শান্তির জন্ত এই লড়াইয়েই আরার্গ আজ সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। শান্তির লড়াইয়ে নির্ভীক সৈনিক আজ আরার্গ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ট্রামে-বাসে নারী যাত্রী

শ্রীপরীরাণী সেন

যুদ্ধকালীন সর্বপ্রথম নিষ্প্রদীপের সময় ক'মাসের মধ্যে কলকাতার জন-সংখ্যা অর্ধেকের বেশী কমে গিয়েছিল। সে ভয় যখন কেটে গেল, আর যুদ্ধের আমলে পুরুষ-নারী যে দরখাস্ত করে সে-ই যখন চাকুরী পেতে সুরু করলো, পরের দু'টি বছরের মধ্যে আবার কলকাতার সেই লোকসংখ্যাই সাবেকের চেয়েও অনেক বেড়ে গেল। এ সময় থেকেই সুরু হলো কলকতায় ক্রম-বর্ধমান গতিতে লোক আমদানী। তার পর স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও বার বার দাঙ্গা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা মফঃস্বলের—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জনগণকে বন্যার স্রোতের ন্যায় ঠেলে এনে কলকাতাকে আরো ফাঁপিয়ে তুললো। গত বছর সহরের আনুমানিক লোকসংখ্যা না কি ছিল প্রায় ষাট লাখ, এবারকার দাঙ্গায় তাকে আরো অনেক বাড়িয়ে না কি আশী লাখের উপরে এনে দাঁড় করেছে।

স্বভাবতঃই সহরের যান-বাহনের উপর এসে পড়েছে অস্বাভাবিক চাপ। জনসংখ্যার অনুপাতে যান-বাহন বাড়তে পারেনি; যা বেড়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তাই দেখতে পাই, ট্রামে-বাসে কল্পনাতীত ভীড়। সকাল আটটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি ডালহাউসি স্কোয়ারের দিকে, আর বেলা সাড়ে তিনটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডালহাউসি ছেড়ে সহরের চতুর্দিকগামী ট্রাম-বাসে যে অমানুষিক ভীড় তার বর্ণনা করবার যোগ্য শক্তিমান লেখক দেশে বোধ হয় নেই! তাই বলে অন্যান্য সময়ে ভীড় যে খুব কম বা থাকেই না, তা-ও কিন্তু নয়; তবে সে ভীড়টা দেখলে মূর্চ্ছা যাওয়ার মত মনের অবস্থা হয় না—এইটুকুই যা তফাৎ। সব চেয়ে কম ভীড়ের যে সময়, সেটা হলো সকাল আটটার আগে, আর প্রথম অপরাহ্নের দু'-তিন ঘণ্টা। কিন্তু এই যে হালকা ভীড়ের সময়টুকু, এটাও কিন্তু দশ বছর আগেকার আফিস কালীন ভীড়ের তুলনায় অনেক বেশী।

এই ভীড়ের মধ্যেও সুবিধা-অসুবিধার একটা সাধারণ স্তরভেদ আছে; যেমন, ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশের ও বাসের তুলনায় ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাশের ভীড় ও অসভ্যতা কিছুটা কম। কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাশ ট্রামেও সে ভদ্রতার আবরণযুক্ত ঠেলাঠেলির সময় মহিলা বা তরুণীদে অবাধ ভ্রমণ উচিত কি না, তা ভেবে দেখবার বিষয়। বাসে ভীড় আর যে সব ধস্তাধস্তি হয়, তা যে না দেখেছে বোধ হয় তা জীবনই বৃথা—তাও আবার 'অফিস-টাইমে'! শোনা যায়, বা কণ্ডাক্টাররা আগের চেয়ে ভদ্র হয়েছে; কিন্তু তাদের বর্ত্তমা ভদ্রতার ও সুবিবেচনার নমুনা দেখলে শুধু এই প্রশ্নই মনে জা যে, এরা যখন অভদ্র ও অবিবেচক ছিল, তখন এদের ব্যবহারে রূপটা কেমন ছিল! আজকাল যাত্রীরা ওদের বর্ব্বরতার ক্ষে মাঝে-মাঝে ক্ষেপে উঠলেও অধিকাংশ স্থলে নিজেরাই ঠাণ্ডা বনে যে বাধ্য হন, ভীড়ের দাবীতে ওদের যুক্তিই সাধারণতঃ টিকে যায়

পুরুষ যারা তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু মেয়েদের বিষয় বলব আছে, ভাবারও আছে; বিশেষ করে তরুণীদের সম্পর্কে মেয়েদের মধ্যে ট্রাম-বাসে চলবার লজ্জা আর রুচির অভাব শুধু কেটে গেছে তাই নয়, কুরুচির বা অতি-আধুনিকতার ভূত অনেকের ঘাড়ে চেপেছে। গোড়ার আসল গলদ হলো সেইখানে এ কথার অকাট্য প্রমাণ প্রত্যেকে প্রতিদিন ট্রামে-বাসে দেখ পাবেন যে-কোন সময়। মেয়েদের মধ্যে ট্রামে ও বাসে বেশীর ভ চলাচল করেন কারা, আর ভীড় করেন কারা?

দেখা যায়, সাধারণতঃ চার শ্রেণীর নারী ট্রামে-বাসে ভ জমান। এক—যে সব মেয়ে অফিস, কলেজ বা চাকুরী সংক্র ব্যাপারে সহরের এদিক-ওদিক যেতে বাধ্য হন। দুই—নিম্নশ্রে মেয়েলোক। এদের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের মেয়েরা সংখ্যায় বেশী তিন—যে-সব ভদ্রমহিলারা বা তরুণীরা সহরের দ্রষ্টব্যাদি দেখ যান, আর এবাড়ী-ওবাড়ী বেড়িয়ে যাঁরা সামাজিকতা রক্ষা করে চার—মফঃস্বলের ও সহরের তীর্থযাত্রিণীরা, যারা মাঝে-মা কালীঘাটের ও দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের বা বেলুড়ে য পুণ্য সঞ্চয় করতে। এখানে বিচার্য হলো এই যে, মেয়ে ট্রাম-বাসের অসম্ভব ভীড় ঠেলে চলবার সার্থকতা ও যৌক্তিক কোথায়, কতটুকু ও কাদের ক্ষেত্রে আছে; কাদের ক্ষেত্রে নে অথবা থাকলেও তা সামান্যই আছে।

প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, তা ভীড় ঠেলে যেতেই হবে, তাই তারা সাধারণতঃ সমালোচনার

দ্বিতীয় শ্রেণীর হলো সে-সব স্ত্রীলোক, যারা ছোট-বড় প্রয়োজন মিশিয়ে, বা অনেক সময় নেহাৎ তুচ্ছ প্রয়োজনে, এমন কি, অপ্রয়োজনেও ট্রামে-বাসে ভীড় করে থাকে ; আর দেখা যায় যে, এদের মধ্যে অনেকেই হলো হিন্দুস্থানী। আবার এদের মতে যা প্রয়োজন, তা হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বলেই বিবেচিত হতে পারে না। গাড়ীর ভিতর সংখ্যাধিক্য দেখে অনেক সময় এদের উপর হঠাৎ সবার একটা রাগ চেপে যায়। বাঙালী ঝি-শ্রেণী, হিন্দুস্থানী গোয়ালিনী, ফল-বিক্রয়কারিণী, কুলী রমণী···প্রভৃতি সাধারণতঃ এই পর্য্যায়ভুক্ত ভ্রমণকারিণী। এরা আবার আত্মীয় ও বান্ধবীদের বাড়ী বেড়াতে যায় খুব বেশী, কারণ ঐটেই হলো এদের অবসরের চিত্তবিনোদন। তিনটে-ছটা পয়সা খরচ করতে এরা বেশী ডরায় না, যেহেতু এদের আয় বড়ো মন্দ নয়। মনে রাখতে হবে যে, এদের পরিবারের পুরুষ-মেয়ে সবাই রোজগার করে। বাঙলা দেশের সর্বাপেক্ষা দুঃখী হলো ভদ্রশ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাদের আভিজাত্যের শেকলে হাত-পা কিছুটা বাঁধা রেখে বাইরে চলতে হয়, আর যাদের মধ্যে স্বল্প আয়ের কেরাণীই হলো অধিকাংশ।

ঐ সব মেয়ে-ছেলেরা যখন ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশের এক-একখানি বেঞ্চ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে করে রেখে দেয়, অথচ অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ধাক্কা খেতে থাকে, সেটা তখন যাত্রী-সাধারণের পক্ষে একটু বিরক্তিকরই বটে! এরা অধিকতর ঠেলাঠেলির মধ্যে আর এক পয়সা বেশী খরচ করে সচরাচর বাসে যাতায়াত করে না। এদের ট্রামে ওঠানো ও নামানো কণ্ডাক্টরদের পক্ষে যে একটা দুরূহ ব্যাপার, এটা সবাই দেখেছেন। তার পরে এরা অনেক সময়ে যে সব পোঁটলা-পুঁটুলি নিয়ে ওঠে, তা-ও সবার পক্ষে চূড়ান্ত অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় শ্রেণী হ'লো প্রধানতঃ ভদ্রঘরের মহিলাগণ ও তরুণীগণ। এঁরা সহরে ঘোরাঘুরি করেন সাধারণতঃ সহর দেখতে, আত্মীয় ও বান্ধবীদের বাড়ী বেড়িয়ে সামাজিকতা বজায় রাখতে, বাড়ী থেকে দূরের দোকানে কিছু কেনা-কাটা করতে, আর সিনেমা-থিয়েটার······ প্রভৃতি দেখতে। বহু সময় এঁরাই শুধু চলেন না, এ ভীষণ ভীড়ের মধ্যে এঁদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও থাকে। এ শ্রেণীর ভ্রমণকারিণীদের মধ্যে অনেকেই যে ঐ সব বেড়ানো এড়াতে পারেন, তা পথ-চলা-কালে ভীড়ে আর গরমে নিপীড়িত হয়ে এদের নিজেদের মধ্যেকার অনুতপ্ত আলোচনা শুনলেই বেশ বোঝা যায় ; বস্তুতঃ এঁদের অধিকাংশের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমণ বাতিক সত্যিই অপ্রয়োজনীয়। আবার অনেকের সামান্য প্রয়োজনকে অনায়াসে অপ্রয়োজন আখ্যা দেওয়া চলে, কারণ সে সব আধা-প্রয়োজন অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা চলে। যে সব অনিবার্য কারণে কখন কখন এদের ট্রাম-বাসে বেড়াতে হয়, সে সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করে কেউ কিছু বলতে পারেন না। এঁদেরি সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, ট্রাম-বাসে নারী যাত্রীদের মধ্যে এই তৃতীয় শ্রেণীর মহিলারা, তরুণীরা ও বালক-বালিকারা, অন্যান্য যে-কোন শ্রেণীর নারী যাত্রী হতে সংখ্যায় অনেক বেশী। রাত ন'টা পর্যন্ত 'আপ ডাউন' যে-কোন ট্রামে উঠে গিয়ে বসুন, দেখবেন এই একই অদ্ভুত দৃশ্য, অর্থাৎ অন্ততঃ ··· শ্রেণীর ট্রাম নির্ঘাত

শোভা পাচ্ছেন। আর অন্ততঃ ২০।৩০।৪০ জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পরস্পরের ঠেলা খেয়ে মরছেন ;—অথচ এঁদের অধিকাংশই চাকুরী বা ব্যবসা-স্থল থেকে ক্লান্তদেহে ঘরে ফিরছেন। আবার এ সব নারী যাত্রীর যখন প্রথম শ্রেণীতে ওঠবার সুযোগ ঘটে না, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়ও গিয়ে এঁরা দিব্যি ভীড় জমিয়ে বসেন। আর যে-সব সময়ে মহিলাদের বেশী বেড়ানো বা ঘোরাঘুরি করবার সম্ভাবনা, তার মানে দিনের অন্যান্য সময়—তখন দেখবেন, ঐ ভীড় আরো অনেক বেশী। ইদানীং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু কলকাতায় এসেছেন ; এঁদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন ভাবে সহরে বাস করবার, আর যাঁরা আত্মীয়দের বাড়ীতে উঠবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের তাজ্জব সহর কলকাতা ও এর দ্রষ্টব্যাদি দেখবার সখ তো অপরিসীম! ভ্রমণকারিণীদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় হলেন এঁরা। এঁদের বিস্ময়পূর্ণ দুর্বার আগ্রহ প্রায় অনিবার্য্য, এবং প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে অনেক সময় তা অতি-প্রয়োজনের গণ্ডীতে গিয়ে পর্য্যন্ত পৌছায়।

তরুণীদের বিষয় আলাদা করে বলবার কিছু আছে, তা তাঁরা উল্লিখিত শ্রেণীগুলির প্রথমটি বাদে অন্যান্য যে-কোন শ্রেণীর তরুণীই হোন। আজকালকার ভয়াবহ ভীড়ের মধ্যে এক জন বর্ষীয়সী মহিলা আর এক জন পনের-কুড়ি বছরের তরুণীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ বিচার করতেই হবে ; তারা সহরের রাস্তাঘাটে যথেচ্ছ যাতায়াত করে, দোকান-পাটে ও এখানে-ওখানে যায়, তাতে এ-যুগে তেমন কিছু বলা চলে না। কিন্তু ট্রাম-বাসের বর্তমানের অসভ্য ভীড়ের মধ্যে তাদের গুরুতর প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া অপ্রয়োজনে বা তুচ্ছ-প্রয়োজনে যত দূর সম্ভব যাতায়াত না করাই বাঞ্ছনীয়। স্বচক্ষে বহু সময় দেখেছি, যেটুকু স্থানের মধ্যে দিয়ে একখানি সরু লাঠি গলানো যায় না, অর্থাৎ ভীড় যেখানে এমনই ভয়াবহ যে মানুষগুলো প্রায় নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্থানাভাবে, এক-একটি তরুণী পুরুষদের সেই জমাট-বাঁধা ভীড়ের মধ্য দিয়ে ঠেলাঠেলি করে দিবি উঠে বা নেমে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, তরুণীর সবটুকু সম্ভ্রম নিয়ে এদের নামা বা ওঠা ঐ রকম ভীড়ের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব হয় না—হতে পারে না! অথচ জনতার মধ্যে কাউকে এতটুকু দোষ তাতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এরূপ ঘটনা কি একটা-দু'টো, আর বিচ্ছিন্ন? তা তো নয় ; বরং প্রা[illegible] প্রতি ট্রামে ও দিবা-রাত্রির যে-কোন সময় এমন ধারা অসংখ্য ঘট[illegible] ঘটছে। সত্যিকারের কাজের গুরুতর তাগাদা যাদের রয়েছে তাদের তবু একটা যুক্তি রয়েছে, কিন্তু যাদের বেড়ানোটা সবটু[illegible] সখের বা আধা-প্রয়োজনের, তাদের স্বপক্ষে বলবার কি থাক[illegible] পারে? শুধু এই নয় ; এমন সব তরুণী আছে যারা এ-[illegible] নির্লজ্জতাকে adventure স্বরূপ মনে করতেও ইতস্ততঃ ক[illegible] না! যেখানে লজ্জায় আরক্তিম হওয়া উচিত, সেখানে তাদে[illegible] কারো-কারো মুখে দেখা যায় মৃদু হাস্যের পুলকময় দীপ্তি। হয়[illegible] দেখা যাবে, দু'টি বান্ধবী ঐ ভাবে নেমে পরস্পরের দিকে তাকি[illegible] মুচকি হেসে নির্বিকার চিত্তে পায়ে-চলা-পথে চলতে লাগলো-কোনই সংকোচ নেই, কোনই জড়তা নেই!

চতুর্থ শ্রেণীর নারী যাত্রী হলেন তাঁরা, যাঁদের এক কথায় ব[illegible] যায় তীর্থযাত্রী। এঁদের কেউ যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বর বা কালীঘাটের কা[illegible] মন্দিরে, কেউ যাচ্ছেন বেলুড়ের মন্দিরে, আবার কেউ যাচ্ছেন গঙ্গ[illegible]

ান করে অক্ষয় পুণ্য লাভ করতে। এদের পক্ষে রয়েছে ধর্মার্জনের শুদ্ধ যুক্তি। স্থির-মস্তিষ্কদের মধ্যে যত রকম উন্মাদনা দেখা যায়, ার মধ্যে ধর্মোন্মাদনা হলো সব চেয়ে গুরুতর, সময়বিশেষে িপজ্জনক। যখন আবার বৃদ্ধা নারীদের ক্ষেত্রে ওরূপটি ঘটে, অয়-সময় তা হয়ে ওঠে প্রায় মারাত্মক! সুতরাং ধর্মপথযাত্রীদের ীড়ের বাধা দেখিয়ে আটকানো সত্যিই কঠিন। এ-সব পুণ্যার্থিনীদের ধ্যে ভদ্র-মহিলারাও আছেন, সাধারণ বা নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও াছে বহু।

ধর্মার্জন ইচ্ছার প্রবলতা আর ঘটনার (অর্থাৎ দুরন্ত ভীড়ের) িষ্ঠুর চাপ—এ-দু'য়ের মধ্যে আজকাল বহুক্ষেত্রে শেষোক্তটির জয় য়, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের তীর্থ-দর্শন বাসনা আচ্ছা মত আহত তে থাকে। দুর্দান্ত জনতার সংঘর্ষের মধ্যে ওঠা-নামার সময় খন ঐ সব নারী দেখতে পায় যে, সাড়ী-জামা, সঙ্গের বিশুদ্ধ পূজা-ব্যাদি, মনের পবিত্র ভাবটুকু, আর সঙ্গের বালক-বালিকা—সব-কিছু জায় রেখে কালীমন্দিরে বা গঙ্গার ঘাটে যাওয়া অসম্ভব, তখন তাঁদের অকপট অনুতাপ-বাণী ও ট্রাম-বাসে না ওঠার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি প্রায়ই শোনা যায়। ঐ ভাবে ধর্মোপার্জন করে এঁরা যেটুকু লাভবান হলেন, ভবিষ্যতে ঐ সব প্রতিজ্ঞা মেনে চলতে পারলে অনেক বেশী ইহলৌকিক সুকৃতি তাঁরা সঞ্চয় করতে পারেন।

তীর্থ করতে হলে কখন কখন ব্যয় করে অন্য যান-বাহন দ্বারা এঁদের তা করা উচিত, সম্ভব ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটেও করা উচিত। তা ছাড়া বছরে যেখানে দু'-এক বার কালী-মন্দিরে বা গঙ্গার ঘাটে গেলে চলে, সেখানে দশ-বিশ বার করে যাওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করাটা নিঃসন্দেহে পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে। কলকাতার নিকটবর্তী চার ধারের মফঃস্বল অঞ্চল থেকে যে অসংখ্য গ্রাম্য তীর্থযাত্রিনী আসেন, তাঁদের দুর্ভোগ আরো বেশী হয় নানা অজ্ঞতা হেতু। কণ্ডাক্টরদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে শতকরা বেশ একটা অংশ হোঁচট খেয়ে আর আঘাত লেগে দেবতার আশীর্বাদের বদলে ঐ সব ক্ষয়-ক্ষতির দৈব অভিশাপ কুড়িয়ে অনুতপ্ত মনে ঘরে ফেরেন!

আর একটি কথা এই যে, পূর্বে নারীরা যেমন 'লেডিজ সীটে'র একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে থাকতো, আজকাল আর তা করা সঙ্গত হবে না। 'লেডিজ সীটের' খালি অংশে পুরুষদের ডেকে এনে বসতে বলা ও বসানো উচিত; কারণ পুরুষ মাত্রকেই অভদ্র কল্পনা করে নিলে নিজেদেরই হীন করে ফেলা হয়। 'সীট' খালি পড়ে আছে, পাশেই ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছেন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? তরুণীরা পাশে বুড়োদের ডেকে বসান আপত্তি নেই, কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে কাছাকাছি কোন যুবককে বসাতেও তাঁদের পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। কারণ দশ-বারো বছরের বালক থেকে ষাট বছরের বুড়োরা পর্যন্ত 'লেডিজ' দেখলে যখন 'সীট' ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, তখন তাঁদের প্রতি মেয়েদেরও অবশ্য একটা কর্তব্য এসে যায়; কারণ, এঁরাই তো ঘর-বাড়ীর মধ্যে আমাদের বাপ-কাকা-ভাই। রাস্তায় চলবো, ধুলো গায়ে লাগবে না, বা দুরন্ত ভীড়ের মধ্যে ঠেলে-গুঁজে নির্লজ্জের মত যাতায়াত করবো, অথচ যাত্রী-সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্যতার মধ্যে পাশের খালি 'সীটে' এক জন সহযাত্রীকে বসতে দিলে নারীর মর্যাদায় আঘাত লাগবে—এ সব অর্থহীন আভিজাত্য আজকাল সর্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ পথের ঐ ক্ষুদ্র আতিথেয়তাটুকু অতি-আধুনিকতা বা অতি-প্রগতি নয়—ওটা হলো মানুষের প্রতি মানুষের একটা সাধারণ কর্তব্য।

আরো একটা কথা এই যে, নির্দিষ্ট 'লেডিজ সীট' (যা আজকাল বেশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে) ভর্তি হয়ে গেলে যতই 'লেডিজ' উঠতে থাকেন, পুরুষরা নীরবে ততই 'সীট' খালি করে দিতে থাকেন। কেন? প্রগতি-জ্ঞান যাদের এত গভীর, সে সব বলিষ্ঠা তরুণীদের ট্রামে-বাসে উঠে ১৫-২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে অত আটকায় কেন? বয়স্কাদের কথা আলাদা, কিন্তু তরুণীদের এ পরীক্ষাটুকুর বেলায় তাঁরা হঠাৎ বয়স্কা সাজবেন কেন? এ সব স্থলেও মেয়েদের দিক থেকে পুরুষদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। বর্ষীয়সী মহিলা থেকে বালিকা পর্যন্ত সকলেরই এ চেতনাটুকু অন্তরে জাগ্রত হওয়া আবশ্যক যে, আধুনিকতা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের বাহিরকে জয় করবার দাবী—বর্তমান যুগের এ-সব কুয়াশাচ্ছন্ন বাণীকে রূপদান করবার চেষ্টা তারা আর যে দিকেই করুন, ট্রাম-বাসের অবর্ণনীয় ভীড়ের মধ্যে যেন তা না করেন—একমাত্র অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছাড়া। যেখানে সত্যিকারের প্রয়োজন, সেখানে আলোচনা ও সমালোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া আজকাল এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ট্রাম-বাসের ভেতরে ঠেলাঠেলির মধ্যে অনেকে পকেটমারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, ওঠা-নামার সময় অনেকে আহত হন। কিছু দিন আগে এক পত্রিকাতে দেখেছিলাম যে, ট্রাম-বাস থেকে নামতে বা উঠতে গিয়ে যতগুলো ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে মোটামুটি ভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেই শতকরা পঞ্চাশটার উপর সংঘটিত। তবে এ আশা মনে রেখে চলতে হবে যে, ক্রমে ক্রমে যান-বাহন বৃদ্ধি করে এবং সহরকে বিকেন্দ্রীকরণ 'প্ল্যান' ধীরে ধীরে কাজে লাগিয়ে প্রাদেশিক সরকার কলকাতার রাজপথে মানব-বন্যা-স্রোত অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সংযত করে তুলতে সক্ষম হবেন। তা যখন হবে, তখন তরুণী বা মহিলা—সর্বশ্রেণীর নারী অবাধে ও অপেক্ষাকৃত সুখ-সুবিধার মধ্যে ট্রাম-বাসে যাতায়াত করতে পারবেন।

পরভৃতিকা

অনিলা গোস্বামী

নারী আন্দোলনের প্রথম দিকে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হচ্ছিল সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকারের উপর—যেমন "পর্দা" ছিঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসার কিংবা ভোটাধিকারের উপর। বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, অধিকার নামীয় আইনের ধারাগুলিকে কার্য্যকরী করতে হলে তৎসহযোগী হিসেবে আর একটি জিনিষকে স্বীকার করে নিতে হবে—সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য। "তোমরা স্বাধীন হয়েছ আর সব দিক দিয়ে, শুধু ভাত-কাপড়ের জন্যে পরমুখাপেক্ষিতাটুকু বজায় রইল তোমাদের",—এ যদি কেউ বলেন, তাঁর জবাব তিনি পেতে পারেন এই কথায় যে, "একটি জিনিষ বাদ দিয়ে রেখে সব অধিকারের গোড়া মেরে রাখা হয়েছে।" অধিকারই বলুন, নাগরিক মর্য্যাদাই বলুন, কমজোরী বঙ্গভাষার চেয়ে ইংরেজী বাৎ-চিৎ ব্যবহার করলে শব্দের জলুষ আরও বাড়বে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, মেয়ে

নাগরিকদের নাগরিকতাই মাঠে-মারা গেছে আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের অভাবে। উনিশ শতকের মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিল "স্ত্রীজাতির পরাধীনতা" সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন—

"This is the age of freedom of individual choice. If it be true, the fact of being born a girl should not interdict a person from social positions and occupations"…পুনশ্চ "Free competition will induce women to do only those services for which they are most wanted and most fitted." (এটা হচ্ছে স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত নির্ব্বাচনের যুগ। এই যদি সত্য হয়, তবে মেয়ে হয়ে জন্মানোই সামাজিক কাজ-কর্ম, পদমর্য্যাদা লাভের বিপক্ষে কোন কারণ হতে পারে না।… স্বাধীন প্রতিযোগিতা মেয়েদের সেই সব কাজের মধ্যে নিক্ষেপ করবে যেখানে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হবে।)

মিল সাহেব মেয়েদের কাজের কথার সঙ্গে "প্রতিযোগিতা"র প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন তাঁর সমসাময়িক সামাজিক প্রতিচ্ছবি মনের সামনে রেখে। সহজ যুক্তিটা তাঁর তরফ থেকে এই যে, মেয়েদের নাগরিক মর্য্যাদা দান করলে পুরুষকে যে সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে, তা তাদের বেলায় নিষিদ্ধ হতে পারে না।—

নারী পুরুষের মতই নাগরিক;
পুরুষ নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করে,
সুতরাং নারীও তা করবার অধিকারিণী।

পুরুষের সঙ্গে অথবা নিজেদের মধ্যে মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দিলেও তাঁর মতে ভয়ের কোন কারণ নেই। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের "কাজ করবার অধিকার"কে তিনি বুঝেছেন। "কাজ পাওয়ার অধিকার" (right of employment) তাঁর বিবেচ্য হয়নি।

যে কোন কাজ করবার যোগ্যতা অর্জ্জনের চেয়ে বেশী কিছু বলা যায় না যদি সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরাজ করতে থাকে। প্রতিযোগিতায় যে জিতবে, সে পুরুষ বা নারী হতে পারে,—সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পত্র পাবে। যে হেরে যাবে, তার দায়িত্ব সমাজ নেবে না। সে বেচারাকে বেকারীর কবলে পড়তে হবে। মিল সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী এর উপরে উঠতে পারেনি। পরাধীনতার জগৎ থেকে প্রতিযোগিতার রাজ্যে পদার্পণ এক ধাপ উন্নতি সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি এর বেশী নয়। এতে কিছু লাভ না হয়ে যায় না। মেয়েরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যেখানে অন্তত নিজের অবস্থা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। তারা বুঝতে শেখে, সমাজ তাদের কাছে যে পরিমাণে যোগ্যতা দাবী করছে, সেই পরিমাণে তাদের বেকারী-মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা নিশ্চয় আর এক ধাপ এগুতে চাইবে। তারা বলবে—যোগ্যতা বিচারের সঙ্গেই সমাজের করণীয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সঙ্গত নয়। স্বামি-স্ত্রীর কথা ধরলে উভয়ের সম-নাগরিকতা স্বীকৃত হলেও শুধু স্বামী যদি চাকরী করতে পারে এবং তার স্ত্রীকে হতে হয় বেকার, তাহলে অর্থনৈতিক প্রাধান্য গিয়ে পড়বে স্বামীর হাতে, স্ত্রী শুধু কাগজে কলমে স্বামীর সমান হয়ে থাকবে। এই জাতীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্-এর চমৎকার উক্তি স্মরণ করা যায়—

"অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অন্তত স্বত্বাধিকারী শ্রেণীর মধ্যে—স্বামী জীবিকা অর্জ্জন করিতে এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয় ইহাতেই সে প্রাধান্য পাইয়াছে, এ জন্য আইনগত কোন বিশেষ অধিকার এবং সুবিধার আবশ্যক হয় নাই! পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সে এক জন বুর্জ্জোয়া, আর তাহার স্ত্রী প্রলিটেরিয়েট!"

এঙ্গেলস্ খোলাখুলি ভাবে আরও বলেছেন যে, উৎপাদন ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন বিশেষ আসতে পারে না, পরিবর্ত্তন আনতে হলে তাদের উৎপাদনের কাজে ফিরিয়ে আনতে হবে। কথাটা স্বাভাবিক যুক্তি-প্রণোদিত। পারিবারিক জীবনে যে কর্ত্তৃত্বের সাক্ষাৎ মেলে তা অর্থনৈতিক; এই চাবিকাঠি যার হাতে, স্ত্রীর উপরে তার ক্ষমতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ক্ষমতা প্রয়োগকারীকে এ জন্যে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। স্ত্রীলোকের হাতে একক ভাবে এই চাবিকাঠি থাকলে তার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াত। সুতরাং প্রকাশ্য ভাবে না থাকলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই দাসত্ব নিতান্ত সত্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায় যার উপর বুর্জ্জোয়া লেখকরা কম আক্রমণ করেননি। অর্থনৈতিক ভিত্তি এড়িয়ে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার সঙ্গে বৃক্ষের মূলদেশে নজর না দিয়ে অগ্রভাগে জল ঢালার তুলনা করা যেতে পারে।

শুধু পরিবারের গণ্ডীতেই নয়, সমাজের মধ্যেও নারীর স্বাধীন কর্ত্তব্যের মত হয় না যদি পারিবারিক অর্থনীতিতে তার কোন দায়িত্ব স্বীকৃত না হয় ও তাকে পোষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ইংরেজী ভাষার কল্যাণে তাকে প্রায় করা হয়েছে স্বামীর appendage বা পরিপূরক মাত্র। স্বামী যদি হন অর্থনৈতিক ত্রাণকর্ত্তা, তাহলে তাঁর নামের সঙ্গে "মিসেস্" যোগ করেই স্ত্রীর অস্তিত্ব বোঝানো হয়ে থাকে বিলেতী সভ্য আদব-কায়দায়। মিষ্টারের অস্তিত্বের মধ্যে মিসেস্-এর নামটি পর্য্যন্ত অন্তর্ধান করে। এর প্রভাব লক্ষিত হয়ে থাকবে এদেশীয় সমাজেও। "অমুকের বধূ" পরিচয় স্ত্রীর স্বকীয়তাকে গ্রাস করে ফেলে না কি? অপর কোন সামাজিক সংজ্ঞা তাকে দেওয়া হয় না। শুধু "অমুকের স্বামী" হিসেবে পরিচিত হওয়াকে কোন পুরুষ কিন্তু পছন্দ করবে না। এর কারণ নিহিত রয়েছে এদেশীয় পরিবারের প্রকৃতির মধ্যে, যেখানে স্বামী হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে ভর্ত্তা বা স্ত্রীর অন্নদাতা। "পতি" অর্থে প্রভু; "স্বামী" অর্থে মালিক; "ভর্ত্তা" অর্থে অর্থনৈতিক প্রভু।—সবগুলি প্রচলিত শব্দ চলতি ব্যবস্থার ভিতর থেকে আভিধানিক মর্য্যাদা লাভ করেছে। সামন্ত যুগে "পত্নী" অপেক্ষা "জায়া" অধিকতর সামাজিক প্রয়োজন রক্ষা করেছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বংশধরের জন্মদাত্রী হিসেবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে "ওয়াইফ" বা জীবনসঙ্গিনীর আবির্ভাব হয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে। কিন্তু স্বামী এখনও বিবাহের কর্ত্তা, স্ত্রী শুধু বিবাহের পাত্রী। (বীরবলী ঢঙ অনুকরণে বলা যায় পুরুষ বিবাহ করে, স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়।), আমরা সকলেই বাস করি পুরুষতন্ত্রের আওতায়, চেহারা বদলেছে বহিরঙ্গ রীতি-নীতিতে—সেকেলে চাল-চলন অনেক পরিমাণে অর্থহীন হয়ে পড়েছে কিন্তু অন্তরঙ্গ পরিবর্ত্তন চোখে পড়ছে না। অতি-আধুনিকা

...ও সেই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, যার সোজা কথা ...:—

"কার্য্যং স্ত্রীগোচরং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং তদ্বিফলং ভবেৎ"

(স্ত্রীলোকের গোচরীভূত কাজ বিফল হয়ে থাকে।)

প্রত্যেক আধুনিকা স্ত্রী সেকালের শিলা ভট্টারিকার মত ...সিদ্ধ উদ্ভট শ্লোকের বর্ণিত অভিজ্ঞতাটি লাভ করে—

শক্ত্যা যুক্তে বিদ্যমানে হি কান্তে

ন প্রাধান্যং যোষিতাং ক্বাপি দৃষ্টম্।

(স্বামী বিদ্যমান থাকতে যোষিতকুলের প্রাধান্য কোথাও দৃষ্ট ...না।)

এই গার্হস্থ্য বন্ধন-দশাটির মূলে বিরাজ করছে খাওয়া-পরা-গত ...তন অধীনতা। "ভর্ত্তা"র ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে পরভৃতিকাদের ...ত পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে।

পাকা কথা

ইন্দিরা দেবী

অমিয় আজ পণ করে এসেছে—আজ সে মালতীর কাছে পাকা কথা চাইবে। দ্বিধা আর সন্দেহের মধ্যে থাকতে সে ...র পারে না। স্পষ্ট করে জানতে চায় মালতীর মনের কথা। ...স্তবিক ঘুরেছে সে তো কম দিন নয় ?

মালতীদের বাইরের ঘরে বসে এই কথাই ভাবছিল অমিয়। ...ড়ীখানা চমৎকার! কলকাতা সহরে বড় রাস্তার ওপরে এমন ...ড়ী মাত্র খান কয়েকই আছে। রাস্তা পড়েছে বাড়ীর দক্ষিণে। ...টপাতের সামনা-সামনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের ...য়াল—ইটের নয়, কুঁদে-কাটা বেলে পাথরের। সেই পাথরের ...লি কাজের ফাঁকে মালতীদের বিস্তৃত টেনিশ-লনটি প্রত্যেক ...থচারীর চোখে পড়ে। দক্ষিণ দিকে ঐ রাস্তার পাশের দেওয়ালের ... প্রান্তে দু'টি গেট। দু'খানা মোটর তার মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি ...নায়াসে চলতে পারে। গেটের ভিতরের রাস্তাটি লাল কাঁকর ...। দু'পাশে কোণ উঁচু করা ইটের বাঁধুনী। তার পাশেই ... ফুল গাছের কেয়ারি। প্রত্যেক ঋতুতে সেখানে নতুন ফুলের ... দেয় ওরা—তার জন্য কয়েক জন মালী দিন-রাত পরিশ্রম করে। ...স-লনটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে লাল কাঁকরের রাস্তাটি দু'টি ...র মুখে থেমে গাড়ী-বারান্দার তলায় এক হয়ে গেছে।

এখন এইখানেই দাঁড়িয়ে আছে অমিয়র গাড়ীখানা। সদর ...কে সিংহদ্বার বলা চলে:—এমনি প্রকাণ্ড। দু'দিকে সশস্ত্র ...রা। দেউড়ী পার হয়ে এসে পড়ে মালতীদের দরদালান। ...লানের দু'টি প্রান্তে দুটি মোজেক-করা সিঁড়ি। একটি গিয়েছে ...দের পড়বার ঘরে—ওটা ওদের ঘরোয়া লাইব্রেরী, অন্যটি ...দের বাইরের ঘরে। এই পথেই এসেছে অমিয়।

... তো হঠাৎ আসেনি ? মালতীর সঙ্গে ওর পরিচয় বছরেরও ... এখন আর কার্ড দিয়ে পরিচয় দেবার দরকার হয় না। ...াড়ী দেখলেই দারোয়ান সেলাম জানায়, গাড়ীর দরজা ...লেয়। বেয়ারা এসে মালতীর বসবার ঘর খুলে দেয়। কিন্তু ... পেয়েই তো অমিয় খুশী হতে পাচ্ছে না, সে-যে আরো চায়। তাই আজ পণ করে এসেছে একটা হেস্তনেস্ত না হলে সে সুস্থির হতে পারছে না।

অমিয়র মনে পড়েছে, প্রথম যখন সে ছোটনাগপুরের কারবার তুলে কলকাতায় এলো, অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সে তার বন্ধু মিষ্টার দত্তের সঙ্গে গেল 'থ্রি হানড্রেড' ক্লাবে। অভিজাত সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র এটি। এইখানেই প্রথম সে মালতীকে দেখে, পরিচয়ও পায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, পিতার একমাত্র কন্যা—এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার মালতীর নিজের। কিন্তু সেই তার বড় পরিচয় নয়, তার চেয়ে বড় পরিচয় সে সুন্দরী এবং তন্বী। 'থ্রি হানড্রেড' ক্লাবের কুইন সে। অমিয় ভাবে—আশা কি তার পূর্ণ হবে ?

যত বার সে মালতীকে দেখেছে, সে বলতে গেছে তার কথা, কিন্তু সুন্দরী তন্বী মেয়ের নির্জ্জন অবসর কোথায় ? যখনই তার অবসর তখনই মৌচাকের মত ঘিরে থাকে তার স্তাবক দল। অমিয়র হিংসে হয়, একটুও আড়ালে পায় না মালতীকে।

আর মালতী ? তার কথা বলা কঠিন। সবাইকে সে প্রশ্রয় দেয়। সে যে কা'কে প্রার্থনা করে তা বলা সহজ নয়। মালতী তো সবারের। যে তাকে ডাকে সে তারই ডাকে সাড়া দেয়, তারই দিকে হাসির টুকরো ফেলে দেয়। অনুক্ষণ লেগে আছে তার চারি দিকে নানা জনের ভীড়, সে সবাইকে দেখে অথচ কাউকেই দেখতে পায় না। নির্জ্জন অবসর যার জীবনে নেই, সে আবার কারো বন্ধু হতে পারে ? ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকে এই বিশ্বাসই তার বদ্ধমূল হয়েছে, লোকে তার স্তব করবে এইটা তার প্রাপ্য। কেউ তাকে অন্তরঙ্গ ভাবে কামনা করছে, এ কথা ভাববার তার সময় নেই।

মালতী ভাবে, সবাই যেমন ভীড় করে আসে অমিয়ও তেমনিই আসে। অমিয় যে তাকে নির্জ্জনে পেতে চায়, এ কথা অমিয় যদি সেদিন ব্যারিষ্টার দে'র পার্টিতে না জানাতো তাহলে জানাই হতো না। সেও তো হলো মাস ছয়েক। মালতীর অবসরই হয় না। আজ এখানে কাল সেখানে, পার্টি, টুর্ণামেন্ট, জলসা, রেস, স্পোর্টস—কি নয়—তার উপর তার সম্পত্তি—সেও বড় কম নয়। দিনের পর দিন কাটিয়ে আজকে মালতী রাজী হয়েছে অমিয়র সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কইতে।

অমিয়র ভয় তবু যায় না। মালতীর বাড়ী লোকের আগমনের তো বিরাম নেই। এমনি আরো বহু দিন তো সে এসে ফিরে গেছে। আজ যদি তেমনি হয়, যদি এসে পড়ে লোক-জন, যদি সময় না হয় কথা বলার। দুশ্চিন্তার শেষ নেই অমিয়র। ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে অমিয় চমকে উঠে—মাত্র পাঁচ মিনিট এসেছে কি, তার তো মনে হচ্ছিল ঘণ্টা খানেক বসে আছে।

রুমাল বার করে একবার মুখটা মুছে নিলো অমিয়। একবার উঠে গেল ফ্যানের সুইচটা টিপে দিতে। হঠাৎ চোখে পড়লো নিজের জামা-কাপড়ের দিকে। মনে হলো এখন শীতকাল, পাখা খুলে বসে থাকলে লোকে কি ভাববে কিন্তু প্রতীক্ষাটা সত্যিই অসহ্য।

দরজার হাতল ঘোরাবার শব্দ হলো। অমিয় আবার একবার রুমাল বের করে মুখটা ঘষে নিল, সোজা হয়ে বসলো মাথা উঁচু করে। একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো অমিয়। দরজা ...

খুলছিল। অমিয়র মনে হলো ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। আর একটু হলে হয়তো সে তাই করতো। ঈষৎ উঠেও ছিল সে চেয়ার থেকে—কিন্তু ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে। সেখান দিয়ে দেখা গেল মালতীদের বুড়ো বেয়ারার দাড়ীটা। অমিয়র জন্ম চা নিয়ে আসছে। অমিয়র মুখে একটু হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

বেয়ারা চায়ের পেয়ালাটা রেখে বললে: মিস্ বাবা বললেন আপনার চা খাওয়া হতে-না-হতেই এসে পড়বেন।

চায়ের ট্রে সামনে নিয়ে অমিয় বসে রইল। যতক্ষণ মালতীর দেখা না পাচ্ছে অন্ত কিছু ভালো লাগছে না। মালতীর সঙ্গে নির্জ্জনে ছ'টো কথা কইবার জন্ত পুরো একটি বছর ধরে সে চেষ্টা করে আসছে। আজকে সেই লগ্ন। এখন কি আর ঐ চা'এ চুমুক দিতে তার মন চায়! কিন্তু তবু খেতে হয়—কেন না মালতী ক্ষুণ্ণ হবে। হয়তো যে কাজে সে এসেছে, চা না খাওয়ার ক্রটির জন্ত তা পণ্ড হয়ে যাবে। কত সাবধানে যে চলতে হচ্ছে তা ঈশ্বর জানেন। ধীরে ধীরে চায়ের পাত্রে চিনি মিশোতে আরম্ভ করলে অমিয়।

উচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল বাইরে। অমিয়র হাতের পেয়ালাটা কেঁপে গেল, এক বিন্দু চা চলকে পড়লো মেঝের মূল্যবান কার্পেটের উপর।

দরজা খুলে গেল! মধুর হাসি বিলিয়ে মালতী ঘরের ভিতর এলো।

—নমস্কার!

—নমস্কার।

—আশা করি, বেশী দেরী করিয়ে দিইনি?

এক চুমুকে চা-পর্ব্ব শেষ করে পেয়ালাটা ট্রের উপর রেখে অমিয় যেন ভার-মুক্ত হয়ে বসলো—বললে, না দেরী আর কি?

—ওঃ, আজ ছ' মাস ধরে কথা দিয়ে নষ্ট হচ্ছে, এবার বলুন তো কি বলতে চান।

অমিয়র কণ্ঠে আকুলতা জাগলো—'তাহ'লে অভয় দিচ্ছেন? বলি তবে?

দৃশ্যটি মনোহর! আসন্ন সন্ধ্যা! একটি নির্জ্জন ঘরে একটি সুন্দরী তন্বী মেয়ের কাছে একটি তরুণ মনের কথা প্রকাশ করবার অনুমতি চাইছে।

মালতী কি বিস্মিত হলো? বললে—বলুন না, বলুন!

—দেখুন আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেই দিন থেকে কথাটি বলবার জন্ত উৎসুক হয়ে আছি। কিন্তু কথা বলার আগে এক বার বলুন আজকে আমায় পাকা কথা দেবেন।

মালতী আবার হাসলো! সেই হাসি, যে হাসি দেখে পুরুষ চিরকাল ভুলে এসেছে।

অমিয় ভালো করে আর এক বার মুখটা মুছে নিলো—তার পর বললে,—দেখুন আমার ব্যবসায় অংশীদার হবার জন্ত আমি আপনাকে চাই।'

মালতী আবার হাসে—জীবনের ব্যবসাতে না কি?

—তাহ'লে তো ভালই হতো, কিন্তু উপস্থিত চাই আমার জীবন-

—বেশ, আপনার সলিসিটারকে বলবেন আমার সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে।

পাকা কথা হয়ে গেল।

ওহোঃ! আপনারা বুঝি ভেবেছিলেন একটা প্রেমের গ[illegible] ফেঁদেছি—না, না, নেহাৎই ব্যবসার কথা।

জাতিগঠনে নারীর দায়িত্ব

শচী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নারীর অন্তরের চিরন্ত[illegible] বাণী—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দি[illegible] অধিকার হে বিধাতা!"

সুসভ্য দেশগুলিতে নারী আজ শিক্ষায়-দীক্ষায় পুরু[illegible] অনুগামী নয়, সহগামী। স্বাধীন ভারতে নারীর [illegible] কোথায়? তার উপরে সমাজ ও জাতিগঠনের দায়িত্ব কত[illegible] অর্পিত হয়েছে? সেই দায়িত্ব বহন করার জন্ত নারী কত[illegible] যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে—ভবিষ্যতেই বা নারীকে কোন্ [illegible] চলতে হবে? দেশের নেতা ও নেত্রীদের কাছে সমগ্র জা[illegible] নারীসমাজ এই সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর চায়। আত্ম-বিচ[illegible] করে, অতীত বর্ত্তমান পর্য্যালোচনা করে এই প্রশ্নের স[illegible] উত্তর স্থির ক'রে নিতে হবে নারীসমাজকে।

প্রাচীন ভারতের মুকুরে দেখে নিতে হবে—ভারতীয় না[illegible] আদর্শ কি। সতী সাবিত্রী খনা লীলাবতী সীতা শকুন্তলা ভারতের মানস-কন্যা। চরিত্রে বীর্য্যে বিদ্যায় জ্ঞানে গরি[illegible] বধূরূপে জননীরূপে এরা ভারতীয় নারীকে যুগ-যুগ ধরে পথ দেখি[illegible] নিয়ে আসছেন। অবশ্ত সেই প্রাচীন বৈদিক পৌরাণিক সভ্য[illegible] যুগ আর নাই; তবুও যা সত্য, যা আদর্শ তা চিরদিনই আদর্শ থা[illegible] শুধু যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হয় সেই আদর্শকে বাস্তব জগতে[illegible]

একটা কথা কেউ-কেউ বলবেন যে, প্রাচীন ভারতের সমা[illegible] নারীর স্থান যে রকম ছিল, এখনকার দিনে নারীকে সে রকম [illegible] কন্যা, বধূ বা মাতা হলেই চলবে না, বাহির-বিশ্বের দরবারে [illegible] যথার্থ মর্য্যাদার আসন গ্রহণ করতে হবে। উগ্র আধুনিকপ[illegible] নারীকে অন্তঃপুরের বন্দিত্ব হতে মুক্ত করবার পণ গ্রহণ করেছে[illegible] তারই বিপরীত সুর শুনতে পেয়েছিলাম আমরা হিটলারের মেয়ে[illegible] অতি অনুশাসনে "Go back to kitchen", যিনি মেয়ে[illegible] জাতিগঠনের দায়িত্ব কেবল সুমাতা হবার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ [illegible] রেখেছিলেন।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁরা জা[illegible] যে, individual difference বলে একটা কথা আছে, যে ত[illegible] না মেনে উপায় নাই বাস্তব জীবনের পাঠশালাতে। সব মানু[illegible] এক ছাঁচে তৈরী করেননি বিধাতা-পুরুষ, কাজেই ছাগলকে [illegible] যব মাড়াতে গেলে কেবল বৃথাশ্রম হবে না, কাজেও ভণ্ডুল [illegible] পারে। মানুষের মধ্যেও কেউ কবি, কেউ চিত্রশিল্পী, কেউ গা[illegible] কেউ দেশবরেণ্য নেতা। দেশবরেণ্য নেতাকে গান গাইতে ব[illegible] [illegible] জনসভার খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে ব[illegible]

বললে শ্রোতাগণকে হতাশ হতে হবে। তেমনি সকল [..]ই কেবল সুগৃহিণী সুমাতা হতে বললে নারীজাতির শক্তির [..] হবে, আবার সকল নারীকে দেশ-সেবার কাজে নিযুক্ত করলে, [..] সভার সদস্য করে' পাঠালেও আসল কাজটি আর হয়ে উঠবে

[..]চিত্র্যের মধ্যেই বিশ্ববীণায় একটি সুর বাজে। নারীর মধ্যে [..] নিহিত আছে, তার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে উপযুক্ত শিক্ষায় [..]পযোগী পটভূমিকাতে সে লীলায়িত হয়ে উঠে জাতির জীবনকে [..] মহীয়ান্ করে তুলবে। তাই স্বাধীন ভারতের অন্যান্য [..]নার মধ্যে নারীর শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে [..]ন। The hand that rocks the craddle, rules [..] world কথাটি এক অর্থে নয়, বহু দিক দিয়েই সার্থক জাতির [..]তিহাসের বহু পাতায়। নারীর অন্তরের বাণী—

উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের 'পরে . .
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে নির্বারিত স্রোতে।

[..] বাণী প্রত্যেকেরই নিজস্ব; সেই অন্তরের বাণী, অন্তরের [..]কাঙ্ক্ষা যেন সে সার্থক করে ফুটিয়ে তুলতে পারে নিজের জীবনে, [..]তেই হবে নারীর সার্থকতা। কেউ গড়ে তুলবে ঈশ্বরচন্দ্রের [..] পুরুষসিংহ, কেউ মধুসূদনের মত বিদ্রোহী মহাকবি, কেউ [..]মীজীর মত ভক্তসাধক সেবক, কেউ বা রবীন্দ্রনাথের মত জগতপূজ্য [..]হাকবি। আবার যার আছে সেই অন্তর্দৃষ্টি সে হবে লোপামুদ্রা, [..]ত্রেয়ীর মত ব্রহ্মবাদিনী, বিজয়লক্ষ্মী, সরোজিনীর মত দেশসেবিকা, [..]াডাম কুরীর মত বৈজ্ঞানিক। জাতিগঠনে এঁদের দান কারুর [..]াইতে কম নয়। কা'কে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে তা মানুষ [..] করতে পারবে না। যে হাত শিশুকে ঘুম পাড়ায়, [..] হাতই আবার রাণী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানীর মত জমীদারী [..] ক'রে প্রজাপুঞ্জের "মা" হয়ে সন্তানের সেবা দেশের সেবা [..] পারে।

সকল পুরুষই মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ নন; তেমন সকল নারীই জোয়ান অব আর্ক, বা সুচেতা কৃপালনী, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী হতে পারে না, তাতেই দুঃখ বা লজ্জা পাবার নাই। মধ্যযুগে নারীর সামাজিক জীবনে অবহেলা অনাদরে যে-জীবন কুণ্ঠিত, বিড়ম্বিত হয়ে উঠেছিল, আধুনিক যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে পথভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু প্রখর উন্মুক্ত আলো চোখ-সওয়া হয়ে গেলে, সেই আলোতে নারী উপলব্ধি করবে যে, গৃহাঙ্গনই তার যথাস্থান। জাতির গঠনে গৃহ-নীড়কে সুখী, নিশ্চিন্ত, আরামপ্রদ ক'রে তুললে জাতির জীবন-সংগ্রামে রত পুরুষকে সে আরও শক্তিমান্ বীর্য্যবান করে তুলতে সক্ষম হবে। যে কল্যাণী নিত্য গৃহ-কাজে কাঁকন দু'টির মঙ্গল গীতে, সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়ের হাসিতে পান্থজনে গৃহের পানে ডাকে, কবির বীণায় শ্রেষ্ঠ সংগীত উৎসারিত হয় তারই উদ্দেশ্যে। চিত্রাঙ্গদার বাণীই চিরন্তন নারীর অন্তরের বাণী—

যদি পার্শ্বে রাখ .
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

নারীর সার্থক পরিচয় এইখানেই। সে দেবী নয়, বা মাটির পুতুল নয়। সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে হলে নারীর শক্তিকে অবহেলা করা চলবে না। নারীর যে শক্তি আছে, তা দিয়ে সে প্রতি গৃহে সৃজন করবে শান্তির নীড়, সুমাতা হয়ে দেশকে সুসন্তান উপহার দেবে; দেশের দুর্দ্দিনে তার সেবার মঙ্গলময় হাত সকল দুঃখ-দৈন্যকে দূর করবে, দেশের শৃঙ্খল মোচনের দুরূহ ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করে তার শক্তির আর একটি দিক দেখাতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ স্থান নাই জাতিগঠনের দায়িত্বের সময়। যখন যেমন প্রয়োজন, যার যতটুকু সাধ্য ততটুকু দান করে নিজ জীবনকে সফল করতে জানে নারী।

অনুশোচনা

শ্রীমতী রচনা মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ কখন তাকিয়ে দেখি,
পূব আকাশে যাচ্ছে দেখা,
রক্ত-লেখা,—
রাত হয়েছে ভোর।

জেগে চমকে উঠে, ভাবি, এ কি,
আজকে আমি কেন একা,
কোথা চকা;—
কোথায় মনচোর;
রাত হয়েছে ভোর।

সে ঘুমের মাঝে, কোন কাঁকে যে,
পালিয়ে গেছে অন্ধকারে,
চুপিসারে;—
ভেঙ্গে হৃদয়-ডোর।

কোথায় মনচোর;
তাই তো এখন হৃদয়-মাঝে,
দুঃখ আসে ব্যথার ঝড়ে,
আঁখিপাড়ে;—
ঝরছে আঁখি-লোর।
ভেঙ্গে হৃদয়-ডোর।

ভারত ভূমি

(অথর্ব্ববেদের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত)

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

শাশ্বত সত্য, ধর্ম্ম, বীর্য্য,
জ্ঞান, বৈরাগ্য, পুণ্য, ত্যাগ—
আমাদের এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন।
এই পৃথিবী—
যিনি এ সকলের পালয়িত্রী—
যিনি অতীতে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন—
আমাদিগকে পর্য্যাপ্ত স্থান দান করুন।
এই পৃথিবী—
যেখানে বিবাদ ও অত্যাচারমুক্ত হইয়া লোক সকল একত্র বাস করে।
একাধারে উচ্চ, গভীর ও সমতল এই পৃথিবী—
সকল প্রকার বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের উৎপাদয়িত্রী এই পৃথিবী—
পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করুন।
এই ভূমি—
যেখানে কৃষকগণ শ্রমশীল—
যিনি বিস্তীর্ণ স্থান সমূহে শস্য উৎপাদন করেন;
এবং যিনি সকল প্রকার প্রাণী ও জঙ্গমদিগকে পালন করেন।
এই পুণ্যভূমি—
যেখানে আমাদের বীর পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন—
যিনি গো, অশ্ব ও পশু-পক্ষী হেতু সম্পদশালিনী—
আমাদিগকে সম্পদ ও শৌর্য্য দান করুন;
এবং গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে
পালন করুন।

এই পৃথিবী—
যিনি পুরা কালে জলমগ্না ছিলেন—
যাঁহার সত্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত অমর আত্মা অতি উচ্চে বাস করেন,
এবং জ্ঞানিগণ যাঁহাকে মহান্ ভাবে সেবা করেন—
সেই পৃথিবী আমাদিগকে এ মহান্ রাজ্যে জ্যোতি ও শক্তি
দান করুন।
এই পৃথিবী—
যিনি চতুর্দ্দিকে প্রবহমান বারিরাশি দ্বারা অবিরাম ও দিবারাত্র
তরঙ্গায়িত—
বহু নদ-নদী-শালিনী আমাদের এই ভারত ভূমি—
সম্পদ ও ঔজ্জ্বল্য দ্বারা আমাদিগকে সম্পন্ন করুন।
হে পৃথিবি!
তোমার বিস্তীর্ণ অরণ্য সমূহ,
তোমার চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা,
আমাদের অনুকূল হউক।

হে পৃথিবি!
আমাদিগকে সে-শক্তি দাও
যে-শক্তিতে আমরা তোমার সন্তানগণ
একসাথে ও মিলিত ভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে পারি।
আমাদের এই বিস্তীর্ণ, বৃক্ষ ও ওষধিপূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমি—
যিনি শাশ্বত নিয়ম দ্বারা পুষ্ট—
যিনি আমাদের সম্পদ ও আনন্দের দাত্রী—
আমরা চিরকাল তাঁর সেবা করিব।
হে পৃথিবি!
আমাদিগকে মধুর বাক্য দান কর।
হে পুণ্যভূমি—
তুমি আমাদের মিলন ক্ষেত্র,
তুমি বিস্তীর্ণা হও।
মহান্ তোমার বেগ, স্পন্দনশীল তোমার গতি।
একমাত্র ভগবৎশক্তিই তোমাকে নির্ভুল ভাবে চালিত করিতে পারে
তোমারই মত
আমরা যেন স্বর্ণদ্যুতিতে দীপ্তিমান হই;
এবং আমরা যেন বিদ্বেষশূন্য হই।
গমন কালে অথবা উপবেশন কালে,
দণ্ডায়মান অথবা সুপ্ত অবস্থায়,
দক্ষিণ পদে অথবা বাম পদে,
আমাদের এই ধরিত্রীকে আমরা যেন আঘাত না করি।
হে পৃথিবি!
একই আবাসে
বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন আচারশীল
জাতি সমূহকে তুমি ধারণ করিতেছ।
হে স্থিরা পৃথিবি!
যেমতি কামধেনু কামনা মাত্র দুগ্ধ দান করে
তেমতি তোমার ঐশ্বর্য্যধারা আমাদিগকে দান কর।
গ্রামে কি অরণ্যে,
সজ্জে, যুদ্ধে কি সম্মেলনে,
যেখানেই থাকি না কেন তোমার মহিমা যেন কীর্ত্তন করি।
হে ভারত ভূমি!
আমরা তোমার সন্তানগণ সকল প্রকার অসুস্থতা ও ক্ষয়রোগ হইতে
যেন মুক্ত হই
আমরা যেন আয়ুষ্মান্ হই ও চিরজাগ্রত থাকি;
এবং তোমার অর্ঘ্য বহন করি।

হে জন্মভূমি!
আমাদিগকে কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত কর।
হে জ্ঞানময়ি!
আমরা উত্তরোত্তর যেন জ্ঞান লাভ করিতে পারি।
তোমার সন্তানগণকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান কর।

ছেলেবেলায় জোসেফ ষ্টালিন

সুখেন্দু দত্ত

ঘর বাইরে ছোট্ট একটা কুটির। ঘরের মেঝে সান দিয়ে বাঁধানো, পাশেই রান্নাঘর। ছোট একটা জানালা দিয়ে সামান্য কিছু আলো ঘরে ঢুকতে পায়। ঘরে আসবাবের মধ্যে আছে একটা টুল, একটা জীর্ণ চেয়ার আর ছোট একটা টেবিল। টেবিলের উপর রয়েছে জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি—হাতুড়ী আর জুতোর ফর্মা।

মুচী ভিসারিওন্ জুগাসভিলীর ঘর সেখানা। বহু দিন এক জুতো তৈরীর কারখানায় কাজ করার পর বাড়িতে বসেই জুতো সেলাইয়ের কাজ করত ভিসারিওন্ জুগাসভিলী।

দারিদ্র আর অভাবের সংগে নিবিড় ভাবে পরিচিত এই সংসারে এক দিন আগমন হল এক শিশুর। আর পরবর্ত্তী কালে এই শিশুই হয়ে উঠল বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার। তিনি ছিলেন জোসেফ ষ্টালিন।

সেটা ছিল ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর। জায়গাটা হচ্ছে রাশিয়ার টিফ্লিস প্রদেশের গোরী সহর।

ষ্টালিনের মা একাটেরিনা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন। সংসার চালাবার জন্য তাঁকেও দিন রাত বিষম খাটতে হত, রোজগারের জন্য ধোপানীর কাজ করতে হত তাঁকে। ছোট বেলা থেকেই চারি দিকে গরীব চাষী আর মজুরদের দুর্দ্দশা দেখে ষ্টালিনের মনে তাদের জন্য একটা আন্তরিক সহানুভূতি জেগে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় ষ্টালিন খুব অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির ও তেজস্বী ছিলেন। সাথীরা সবাই তাঁকে ভালবাসত। সাত বছর বয়সে ষ্টালিনের বর্ণপরিচয় হয়। বছর খানেকের মধ্যেই তিনি জর্জ্জিয়ান আর রুশ ভাষায় পড়তে শিখে ফেললেন।

নয় বছর বয়সে জোসেফ গোরী শহরে ধর্ম্মযাজকদের স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন তিনি, জ্ঞানলাভের জন্য ছিল তাঁর অদম্য স্পৃহা। স্কুলে পরীক্ষায় সব সময় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

সেই গোরী স্কুলের ছাত্র অবস্থা থেকেই ষ্টালিন মজুর আর চাষীদের সংগে মেলামেশা করতেন, সুযোগ পেলেই তাদের সংগে আলাপ জমাতেন তিনি। বসন্ত এবং শরৎ কালে ষ্টালিন ও তাঁর কয়েক জন বন্ধু প্রত্যেক রবিবার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন।

এক বার এমনি গ্রামের পথে হাঁটতে-হাঁটতে ষ্টালিন দেখলেন যে, এক দল চাষী মাঠে বিশ্রাম করছে। তাদের মধ্যে এক জন গোগ্রাসে রুটি আর শিমের তরকারী গিলছিল। ছোট্ট ষ্টালিন গিয়ে দলটার সংগে আলাপ জুড়ে দিলেন। চাষীটার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "তোমরা এত খারাপ খাবার খাও কেন? তোমরা নিজেরা চাষ কর, বীজ বোনো, ফসল কাটো, তোমাদের অবস্থা তো আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত।"

চাষীটি জবাব দিল, "আমরা নিজেরা ফসল কাটি বটে, কিন্তু পুলিশের বড় দারোগাকে একটা অংশ দিতে হয়, পাদ্রী মশাইয়েরও এক অংশ প্রাপ্য। কাজেই দেখছো, আমাদের জন্য আর বিশেষ কিছুই থাকে না।"

স্কুলের ছাত্র ষ্টালিন তখন তাদের বোঝাতে আরম্ভ করলেন যে, কেন তারা এত গরীব আর কারাই বা তাদের এই অবস্থা করে। এমন সুন্দর ভাবে তিনি তাদের সব-কিছু বুঝিয়ে দিলেন যে, চাষীরা তাঁকে আবার আসতে বলল আলোচনার জন্য!

সেই অল্প বয়সেই ষ্টালিন সুস্থ যুক্তিবাদী ও বিপ্লবী ভাবধারার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ডারউইনের লেখা পড়তে আরম্ভ করেন তিনি এবং এই সময়েই প্রথম মার্কসীয় ভাবধারার সংগেও পরিচিত হন।

এ সবের ফলে ভগবানে অবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন ষ্টালিন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি কি রকম সহজ এবং সোজাসুজি ভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন, তার একটা বর্ণনা দিচ্ছি।

এক বন্ধুর সংগে তাঁর একবার কথায়-কথায় ভগবানের কথা উঠল। বন্ধুটি তো মহা উৎসাহে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করতে সুরু করলেন তাঁর কাছে। জোসেফ ভাল মানুষটির মত চুপ-চাপ তার সব কথা শুনলেন, তার পর সংক্ষেপে শুধু বললেন, "তুমি জানো না, ওরা আমাদের বোকা বানাচ্ছে। ঈশ্বর বলে কিছু নেই।"

বন্ধুটি তো অবাক! এমন সর্বনাশা কথা সে এর আগে আর কখনও শোনেনি। বলল, "তুমি এমন কথা বলতে সাহস কর কি করে?"

ষ্টালিন তাকে বললেন, "আমি তোমাকে একটা বই পড়তে দেব। সেটা পড়লে এই বিশ্ব এবং জীব-জগত সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যাবে। ভগবানের কথা যা বলা হয় তা অত্যন্ত গাঁজাখুরী।"

বলা বাহুল্য, তিনি ডারউইনের বইয়ের কথাই বলছিলেন বন্ধুকে!

পনের বছর বয়সে জোসেফ বিশেষ কৃতিত্বের সংগে গোরী স্কুল থেকে পাস করেন এবং টিফ্লিসের ধর্ম্মযাজকদের সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন! কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার সংগে খাপ খাইয়ে চলা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। এই সেমিনারীগুলোতে জার-ব্যবস্থার উপযোগী সব রাজভক্ত কর্ম্মচারী আর ধর্ম্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল

মানুষ তৈরী করা হত। তাছাড়া ছাত্রদের ওপর গুপ্তচর-চক্রের মত নজর রাখা হত। এই অত্যাচারী নির্বোধ ধর্মযাজকীয় ব্যবস্থার আওতায় থেকে ষ্টালিনের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল, এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে চাইলেন তিনি।

গোরীর স্কুল ছাড়ার সময় থেকেই ষ্টালিনের তরুণ প্রাণে দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল, দেশসেবার দিকে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তবে তখনও তিনি স্পষ্ট ধারণা করে উঠতে পারেননি যে, কি ভাবে দেশের সেবা করা যেতে পারে।

সেমিনারীতে ভর্ত্তি হবার প্রথম বছরেই ষ্টালিন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিলেন। সে সময় তিনি ট্রান্সককেশিয়ায় রুশ মার্কস্‌বাদীদের কয়েকটি বেআইনী ছোট দলের সংগে সংশ্লিষ্ট হলেন। তাঁরা তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেন এবং বেআইনী মার্কসীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি করেন। এই সময়েই তিনি কার্ল মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থ "ক্যাপিট্যাল" পড়েছিলেন।

সেমিনারীর নিয়ম ভঙ্গ করে ষ্টালিন এই সময় গোপনে একটা লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে গেলেন। রুশ ও জর্জিয়ান ভাষায় অনেক বই পড়ে শেষ করলেন তিনি। বিশ্বের সেরা সাহিত্যগুলোর সংগেও ষ্টালিন পরিচিত হলেন। সেক্সপিয়ার আর টলষ্টয়ের লেখা তিনি পড়ে শেষ করে ফেললেন। সেই অল্প বয়সেই ষ্টালিনের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

ষোল বছর বয়সে ষ্টালিন এক মহা আশ্চর্য্য কাণ্ড সুরু করলেন, কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন তিনি এবার। তাঁর এই সব কবিতার অনেকগুলোই জর্জিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভাল লেগেছিল।

ষ্টালিনও কবিতা লিখতেন শুনে তোমরা হয়ত তাজ্জব বনে যাচ্ছ, না? এর পর শুনলে হয়ত আকাশ থেকেই পড়বে যে, তিনি গান গাইতেও খুব ভালবাসতেন এবং ছবিও আঁকতেন! আজকের ষ্টালিনের গম্ভীর মুখ আর পেল্লায় গোঁফের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখ দেখি একবার ব্যাপারখানা!

এর পর ষ্টালিন রাজনৈতিক সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করলেন। ক্রমে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে পড়াশুনা সুরু করে দিলেন তিনি। এই ভাবে মার্কস্‌ ছাড়া এঙ্গেলস্‌ ও লেনিনের রচনার সংগেও তাঁর পরিচয় হল। লেনিনের লেখা পড়ে এই সময় তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "লেনিনের সংগে আমার যেমন করে হোক দেখা করতে হবে।"

ষ্টালিনের জ্ঞান-পিপাসার যেন তার অন্ত ছিল না। এর পর পৃথিবীর জন্ম ও বয়স সম্পর্কে ভূতত্ত্বের মতবাদও তিনি অধ্যয়ন করলেন এবং সেমিনারীর ছাত্রদের মধ্যে বাইবেলোক্ত ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টির আজগুবি তথ্যকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে লাগলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়েও পড়াশুনা করলেন তিনি। ইতিহাসের দিকে তাঁর খুবই ঝোঁক ছিল। উপন্যাস পড়তেও তিনি ভালবাসতেন আর পড়েছিলেনও অনেক।

কিন্তু এ-সবের ফলে সেমিনারীর কর্তৃপক্ষের কুনজর তাঁর ওপর পড়তে দেরী হল না। তাঁরা দেখলেন যে, জোসেফ কয়েক জন ভাল ছাত্রকে পর্য্যন্ত "নষ্ট" করে ফেলছেন। তাঁর ওপর কড়া নজর রাখা হল। ফলে লুকিয়ে লাইব্রেরীর বই পড়ার সময় কয়েক বার তিনি ধরা পড়ে গেলেন। প্রত্যেক বারই তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল এবং বার দুয়েক তাঁকে অধ্যক্ষের আদেশে শাস্তির জন্যে কয়েক ঘণ্টা করে আটকও থাকতে হল। শেষ পর্য্যন্ত আর এক বার ব্যাপারটা একেবারে চরমে উঠল। ষ্টালিন এক দিন তাঁর নিজের ঘরে বসে গোপনে বই পড়ছেন, এমন সময় সেমিনারীর তত্ত্বাবধায়ক আস্তে-আস্তে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। ষ্টালিন কিন্তু তাঁকে দেখেও দেখলেন না, নিজের মনেই বই পড়ে যেতে লাগলেন। প্রায় নাবালক ছাত্রের এই ডোণ্ট কেয়ার ভাব দেখে ফাদার তো চটে লাল! বললেন, "তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে, দেখতে পাচ্ছ না?"

নির্ব্বিকার চিত্তে ষ্টালিন জবাব দিলেন, "আমি আমার সামনে একটা কাল বিন্দু ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

এর পর যা হবার তাই হল। "রাজনৈতিক ভাবে অবাঞ্ছনীয়" বলে তাঁকে সেমিনারী থেকে বিতাড়িত করা হল। কিন্তু এতে ষ্টালিনের বিশেষ কিছু এল বা গেল বলে মনে হল না। তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর। ইতিমধ্যেই তিনি পুরোপুরি ভাবে মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র আর যে ঘুণে-ধরা সমাজ-ব্যবস্থার ওপর জারতন্ত্র দাঁড়িয়েছিল, তার ওপর তাঁর ঘৃণা তখন বেড়েই চলছিল। সেমিনারী থেকে বহিষ্কৃত হবার পর এবার তিনি একান্ত ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনে। উত্তুঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে সুরু হল তাঁর রাজনৈতিক জীবন!

ধাত্রী পান্না ও সেই প্রসঙ্গে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক ধাত্রী পান্নার কথা বিশ্ব-বিশ্রুত। কারণটি যেমন অসামান্য অলৌকিক তেমনি নিষ্করুণ লোমহর্ষক। প্রভু-পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঘাতকের উন্মুক্ত কৃপাণের সামনে নিজের শিশু-সন্তানকে আপন হাতে মা হ'য়ে তুলে দেওয়াটা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভাবনীয় না হ'লেও বাস্তবে যে বড়ো সহজ নয়, তা' স্বীকার করতেই হবে। সহজ তো এতোটুকু নয়ই, বরং অমানুষিক বা দুর্মানুষিক; তথা বীভৎস পৈশাচিক: চাই কি, নৃশংস রাক্ষসিকই নিঃসংশয়রূপে বলতে হবে। কিন্তু এইখানেই রমণী-রত্ন পান্নার অবিসংবাদী মহীয়সীত্ব!

অনন্যসাধারণ এই তথাকথিত মহীয়সীত্বের গৌরবে পুত্র-হত্যার গ্লানিময় কলঙ্ক কি কিছুতেই চাপা পড়ে পান্নার? প্রভু-ভক্তির ভাবাতিশয্যে মাতৃস্নেহকে অমন নির্মম ভাবে পদদলিত করার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কুৎসিত দাস্যবৃত্তিরই চরম অভিব্যক্তি ছাড়া আর কি? বনবীরের রাজ্যলিপ্সু নিষ্ঠুর তরবারি অতি জঘন্য তা' ঠিক, কিন্তু প্রভু-ভক্তির দীন পরাকাষ্ঠাও রাক্ষসী পান্নার ততোধিক উৎকট।

দীন! উৎকট!!—তা' নয় তো কি? নিশ্চয়, একশো বার, লক্ষ বার। বুলি আদর্শবাদের সনাতনী চটকদার পোষাকে যতোই সাজুক না, প্রভুভক্তি, দাসবৃত্তি সে। ও-বৃত্তির সুরু ও শেষ আত্মবিক্রয়ের নির্লজ্জ নীচতায় আর আত্মাবমাননার কদর্য্য লাঞ্ছনায়। ধাত্রী পান্নার অন্ধ প্রভুভক্তিও এই দাসীত্বেরই নামান্তর

ছাড়া আর কিছু নয়। দাসবৃত্তি কখনও মহত্ত্বের ভিত্তি হ'তে পারে না।

দাসবৃত্তির অপর নাম শ্ব-বৃত্তি। মনিবের পুঁটুলি রক্ষার জন্তে নিজের প্রাণ দেওয়ার নির্বুদ্ধিতাকে পুঁজিবাদী আমলাতন্ত্রী প্রভুরাই আপনাদের সুবিধার জন্তে পিঠ চাপ্‌ড়ে গৌরব-টীকা দিলেও মানুষের কাছে কিছুতেই ও-গৌরব এতোটুকু কাম্য নয় বরং অশ্রদ্ধেয়। যতোই প্রভু-ভক্ত হোক না কুকুর, দেব-মন্দিরে তা'র স্থান নেই।

তা'হোলে নিজেকে নিজের যথাসর্ব্বস্বকে পরের জন্তে কি কোনো ক্রমেই দেওয়া যায় না?—যায়: তবে বিচারহীন প্রভু-ভক্তির নির্বোধ কৃতজ্ঞতায় নয়। কোনো বৃহত্তম কল্যাণে আপনার সব-কিছুই অবলীলা ক্রমে দেওয়া যায়।—সে ত্যাগ: তা'তে আছে পৌরুষ। বেতনভোগী সৈন্তদলের র:ক্ষেত্রে রক্তাক্ত অপঘাত আর মুক্তিকামী শহীদদের অমর বলিদান, এ-দু'য়ের অনেকখানি ফারাক। পুঁটুলির জন্যে কুকুরের মরা আর পুত্ররক্তানুরঞ্জিত পান্নার প্রভুভক্তি কিন্তু একই পর্য্যায়ের। ওতে ত্যাগের মহত্ত্ব নেই, আছে শুধু দাসত্বের ক্লীব বিমূঢ়তা।

স্বাধীনতা-যজ্ঞে কতো মানুষই নিজেকে আহুতি দিয়েছে, বিসর্জ্জন করেছে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। নব-জাত শিশু-কন্যাকে পরিত্যাগ ক'রে মাও-সে-তুং চালিয়েছে 'লং মার্চ'। বৃহত্তম কল্যাণের অনুপ্রেরণায় সে। কিন্তু পান্না? মাতৃত্বের অপঘাতে কেবল চেয়েছে সে প্রভু-বংশ-ধারায় রাজসিংহাসন কায়েম রাখতে, ও-আকাঙ্ক্ষার মূলে কোনো বৃহত্তম ভাবনার অনুপ্রেরণা নেই দাসত্বের বিমূঢ় উত্তেজনা ছাড়া।

এমনি বিমূঢ়তা ও মূর্খতার আর একটি চমকপ্রদ গল্প মনে পড়ে গেলো এই প্রসঙ্গে। প্রভুভক্তিরই গল্প। গল্প নয়—আদর্শ প্রভু-ভক্তির অপূর্ব উদাহরণ, বিচিত্র সত্য ঘটনা। স্কুল-পাঠ্য কেতাবের পাতায় ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ ঘটেছে। সুবোধ গোপালের মতো কতকগুলি নির্বোধ অসহায় অপোগণ্ড ছেলেদের কাছে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা'রই স্বপক্ষে ওকালতি করে' গেয়ে যাচ্ছি মাসিক বরাদ্দ গুটি-কয়েক মুদ্রাখণ্ডের বিনিময়ে। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শিশিক্ষুরা ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে; আমি ঢেলে চলেছি তাদের কানে দাসত্ব-বন্দন-সুধা:

সৈনিক, পাহারা-রত রোমীয় সৈনিক, আহা!—কী অপূর্ব ওর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর প্রভুপরায়ণতা! নড়লো না, বিচলিত হোলো না এতোটুকু! মনিবের গৃহদ্বার পাহারা দিতে দিতে অবিচল নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রাণ হারালো, স্বেচ্ছায় বরণ কোরলো বিসুবিয়সের উত্তপ্ত অতল লাভা-সমাধি! শহর খুঁড়ে কোনো বাড়ীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সেই রোমীয় দ্বারপালের প্রস্তরীভূত কঙ্কালটি অবিকৃত অবস্থায় অবিকল আবিষ্কৃত হয়েছে আজ।

বিস্ময়কর সেই রোমীয় সৈনিক নিশ্চয়। অচলতা তার হিমাচলের চেয়েও সুদৃঢ়। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই ধীরে-ধীরে ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে, প্রোথিত হোয়ে যাচ্ছে ভস্মস্তূপে। নিশ্চিত মৃত্যুর তরল অনল-প্রবাহ ছুটে আসছে; বেশ দেখা যায়। আর্ত্ত নর-নারী সকলেই প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ছুটে পালাচ্ছে। এই নিদারুণ বিপর্য্যয়েও প্রভুর জনশূন্য গৃহের দ্বারপ্রান্তে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা সত্যিই বিস্ময়কর!—বিস্ময়কর কিন্তু মূর্খতা, জড়ত্ব।

জড়ত্ব আর ক্লৈব এনে দেয় প্রভু-ভক্তি। মেরুদণ্ড যায় ওতে দুমড়ে। মতিভ্রম বা বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। নইলে ভীষ্মাদি মহারথরাও কি কখনো নীরব থাকতে পারতো সভাগৃহে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায়? এতোটুকু পৌরুষ থাকলে তখনই ঝলসে উঠতো ওদের বিচারের তরবারি।

একটি গোলাপের গল্প

বিজয়া রায়

শরৎকাল, চারি দিকে শুভ্র শেফালির গন্ধ, আকাশের রং লেগেছে যেন ধরণীর সারা অঙ্গে। গোলাপের বনেও সাড়া পড়েছে, গোলাপ-কামিনীদের উলুধ্বনি শোনা যায়—নবারুণের স্পর্শ পেয়ে জেগে ওঠে একটি ছোট্ট গোলাপ-কলিকা। নতুন প্রভাতের শুভ সমীরণ সংকেতে বলে দিয়ে যায় গোলাপের প্রাসাদে এল আজ পরশমণি।

গোলাপের বনে কানাকানি—"কে এল রে এমন করে বাসন্তী রংএর আভায় সবার মনে চমক দিয়ে?" কেউ বলে—"ও তো ফুল নয়, ও যে ফুলের রাণী।" কেউ বলে—"ওকে সূর্য্যমুখী হলে মানাত, ও পথ চেয়ে থাকে সারা দিন ওই সূর্য্যের পানে, কই আমাদের সাথে মিল কই?" কেউ হাসে, আর কেউ তাকে ভালবাসে।

আর ছোট্ট গোলাপ—সে তাকিয়ে থাকে সুদূর নীলাকাশের পানে, তাকিয়ে থাকে নব রাগরঞ্জিত সূর্য্যদেবের দিকে। লাল হয়ে ওঠে পূর্ব্বাকাশ—আনন্দের হাসি হেসে একটুখানি মাথা দুলিয়ে ফেলে। কত প্রজাপতি ছুটে আসে, মাতামাতি করে গোলাপের বনে। ও ভাবে, "ওগো সূর্য্যি ঠাকুর, এস না এমন করে প্রজাপতি হয়ে, অরুণ রঙে রাঙা আকাশের লাল-নীল পাখায়।"

শরতের রঙীন আলোতে বাতাসের মনে বুঝি রংএর নেশা লাগে। বার বার বাগানের ফুল গাছগুলিকে দোলা দিয়ে যায় চলে। সেদিনের মত বাতাসের সাথে ছুটে আসে একটি নীল প্রজাপতি। বাতাসের হাত এড়াতে সে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট নতুন গোলাপটিকে। সহসা নতুনের স্পর্শে চমকে ওঠে গোলাপ-বালা—শুধু চেয়ে থাকে, অস্ফুট স্বরে বলে, "সত্যিই এলে কি তুমি আজ? বল কোন রংএ বাঁধব তোমাকে?" দুরন্ত প্রজাপতি চকিত হয়, হেসে বলে, —"ওগো বন্ধু, ভুবনে-ভুবনে আমাদের ডাক, আমরা যে চির-চঞ্চল, আমাদের বাঁধতে পারে এমন কি কেউ আছে? ওগো বাসন্তী রংএর গোলাপ, তবু জেনো তোমার কথা কোন দিন ভুলব না। এই ক্ষণিকের পরিচয় তোমার-আমার অক্ষয় হোক।" বাতাসের সাথে আবার নীল প্রজাপতি উড়ে চলে যায়,—নীলাঞ্জন লাগে গোলাপের চোখে। নীল প্রজাপতি তখনও বুঝি দেখা যায়! দূরের বাতাসের সাথে ভেসে আসে—"বিদায় বন্ধু—আবার দেখা হবে"—। চোখে আসে জল বিদায়ের বাণীর স্পর্শে।

এমনি করেই প্রতিদিন দু'টি চোখ সেই দিকে চেয়ে থাকে। প্রতীক্ষা করে, যদি দেখা যায় সেই সুন্দর নীল প্রজাপতির দু'খানি নীল পাখা। কত প্রজাপতি আসে কাছে, কত মধুর কথা বলে তার কানে-কানে, কিন্তু হায়! কোথায় সেই নীল দু'খানা পাখা? সে ত আর আসে না। মা বলে, "ওরে মুছে ফেল চোখের

নতুনকে আবার সে আহ্বান করে। যে চলে যায় সে কি আর আসে?" প্রজাপতিরা অমনই—পাখায় রং তাদের মনের মাঝে এতটুকুও দাগ কাটে না—তাই তারা চলে যায়। "ওগো মা, তুমি কি দেখনি সেই নীল প্রজাপতিকে?"—ফুল চোখ মুছে বলে, "আমি যে দেখেছি তার নয়নের জল।" মা বলে,—"না-ই বা এল নীল প্রজাপতি, আমার বাসন্তী রংএর গোলাপ পাগল করবে কত প্রজাপতিকে। আসবে কত রং-বেরংএর প্রজাপতি।" মাথা নীচু করে মাথা নাড়িয়ে বলে—"ওগো, না না, তা হয় না, আমার যে মন মানে না।" নীরবে চোখের জল মোছে—কথা আর বলে না, চেয়ে থাকে শুধু নীলাকাশের গোধূলির পথে, সময় বুঝি চলে যায়।

চৈত্র শেষে পথ দিয়ে চলেছে এক কবি। কবির কণ্ঠে বসন্তের গান। ছোট্ট গোলাপ চোখ তুলে চায়, বলে—"ওগো কবি, এ গান কেন তুমি গাও? কেমন করে জান তুমি আমার কথা?"—ছল-ছুলিয়ে ওঠে তার চোখ দু'টি। কবি বলে, "সুন্দর ছোট্ট ফুল, আকাশের সাথে আমার মিতালি, তাই আমার কণ্ঠ ভরে ওঠে তোমাদের কলতানে—আমি যে তোমাদের কবি। ওগো বন্ধু আমার, অকালে কেন শুকিয়েছে তোমার মুখটি? বল আমায়, কি গান গেয়ে তোমার ওই ছোট্ট গোলাপী ঠোঁটে আবার ফোটাব হাসি?" "এমন করে কেউ তো বলে না আমায়!"—ফুল বলে, "ওগো কবি, কোন্ অমৃত ভাণ্ড তোমার হাতে? তোমার মাঝে অসীম আনন্দের আভা আমি দেখতে পাচ্ছি—আমি দেখেছি তোমার চোখে নতুনের আলো—আমার হৃদয় আজ কেন উত্তাল তরঙ্গের মত দুলে ওঠে কবি? তুমিও কি প্রজাপতির মত দোলা দিয়ে চলে যেতে চাও?" কবি ধরে তার ডাল—নতুনের সুর ফুটে ওঠে তার গানে, শুকনো ফুলের মাঝে লাগে বসন্তের ছোঁয়া—ছোট্ট গোলাপ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে—আনন্দে মাথা দুলিয়ে বলে—"কবি—আমার কবি, পূর্ণ তুমিই করেছ এ হৃদয় আমার—নতুনের গানে ভরেছ আমার প্রাণ—তোমার কথা এ জীবনে ভুলব না কখন।"

সেই দিন থেকে কবি হ'ল তার প্রাণ, প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধরে নতুনের গান। ফুল বলে, "কবি, আমায় নিয়ে চল তোমার সাথে। এ কাঁটা-ভরা গাছ আমার জন্য নয়। আমি চাই উন্মুক্ত আকাশ, বাতাস—আমি চাই অনন্ত ভালবাসা। তুমি জাগিয়েছ আমার প্রাণ—তুমি দিয়েছ আমায় ভালবাসা। আমায় নিয়ে চল কবি। আমি যে তোমার পথযাত্রী—আমার যাত্রাপথ তোমার পথে।" কবি হেসে বলে, "ফুল আমার—তুমি তো জান না তোমার পথ আমার পথে নয়। তুমি চেয়েছিলে কবিকে, তাই সে জাগিয়েছে তোমার প্রাণ। পথে যেতে কাঁটা অনেক, সে পথও তোমার নয়। এই কাঁটা-ভরা গাছে তুমি সুন্দর, তাই তো তোমার এত দাম।" ফুল বলে, "কবি তবে কি নিয়ে বাঁচব আমি?" কবি বলে, "তোমার-আমার মিলনের গ্রন্থি বাঁধা থাকল মনে মনে—সে বাঁধন কখনও টুটবে না।"

আবার আসে কত প্রজাপতি। গোলাপের মন ব্যথায় ভরে যায়—কেঁপে ওঠে, হায় রে ব্যর্থ হৃদয়, সত্যি বুঝি এবার বিলিয়ে দিতে হয়। উদাসী মন কেঁদে ওঠে বার বার, মাথা নীচু করে ফেলে। [illegible] চুপি চুপি তার হৃদয়ের শেষ মধুটুকু নিংড়ে নিয়ে চলে যায়। অশ্রু-সজল আঁখি শেষ বারের মত ব্যাকুল হয়ে ওঠে কবির জন্য। পারে না সে এ বেদনার ভার বইতে। দূরে বনের বাঁকা পথে তার পদধ্বনি যেন শোনা যায়। ফুল চীৎকার করে ওঠে—"কবি!" স্মিত হাস্যে কবি বলে, "মনের গ্রন্থি টন-টন করে উঠল। তোমার ব্যথার ডাক শুনতে পেলাম ফুল!" বেদনা-বিধুর চোখে ফুল বলে, "বিদায়-বেলায় সত্যি সত্যি এলে বন্ধু আমার! ওগো বন্ধু, কবি আমার।" শেষের ছোঁয়া পাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় ফুল—বুঝি ছোঁয়া লাগে তাদের হাতে।

কালবৈশাখীর মেঘ জমতে সুরু করে, এলোমেলো বাতাসের হুড়োহুড়িতে গোলাপের পাপড়িগুলি ঝরে পড়া সুরু হয়েছে তখন। কবি কাতর কণ্ঠে ডাকে—"বন্ধু!" ম্লান হাসি হেসে ক্ষণিকের জন্য গোলাপটি তাকিয়ে থাকে কবির মুখের দিকে। তার পর ঝর-ঝর করে অবশিষ্ট পাপড়িগুলি ঝরে পড়ে কবির পায়ের কাছে। কবির আঁখি হতে ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা আঁখিজল। ঝরে-পড়া পাপড়িগুলিকে তুলে নেয় সে বুকের মাঝে—সে যেন দেখতে পায় অভিমান ভরা দু'টি আঁখি।

মিষ্টিমুখ

সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

রসায়ন-বিজ্ঞানী রেমসেন এক দিন ল্যাবরেটরীর কাজ সেরে চা খেতে বসেছেন। কিন্তু এক ঢোঁক মুখে দিতেই তাঁকে ওয়াক ওয়াক করে ফেলে দিতে হ'ল। কি মিষ্টি! কি অসাধারণ মিষ্টি বাবা! যা মুখে দেন, তাই মিষ্টি! পরিবেশককে ডেকে কড়া সুরে দিয়ে জানতে চাইলেন, চা-খাবারে সে আজ কত চিনির শ্রাদ্ধ করেছে। সবিনয়ে পরিবেশক জানাল, তার কোনো কসুর নেই, চিনি সে রোজকার চেয়ে কিছু বেশি ব্যবহার করেনি, তাছাড়া রোজকার মত অন্য সবাই তো আজকেও হাসিমুখেই সব খেয়েছে, রেমসেনের খাওয়া হ'ল না। তিনি ছুটলেন ল্যাবরেটরীতে। সেদিন তিনি টলুইন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। যা ভেবেছিলেন রেমসেন কি তাই। টলুইন থেকে এমন একটি যৌগিক পদার্থ পাত্রের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে। যা মিষ্টতায় চিনিকে অনেক পিছনে ফেলেছে। স্যাকারিনের আবিষ্কার হ'ল এমনি দৈবগতিকে।

স্যাকারিন তৈরি করা হয় টলুইন থেকে, আর টলুইন পাই আমরা আলকাতরা থেকে। স্যাকারিন চিনির পাঁচশো গুণ মিষ্টি পাঁচশো কাপ চা তৈরি করতে পাঁচশো চামচ চিনির বদলে মাত্র এক চামচ স্যাকারিন ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিকের হাতে সামান্য স্যাকারিন লেগে ছিল; যা মুখে তুলছিলেন তাই অসম্ভব মিষ্টি বলে মনে হচ্ছিল তাঁর কাছে। সরবৎ, কনডেন্সড্ মিল্ক, জেলি ইত্যাদি বাজারের আরো টিনে ভর্তি সুমিষ্ট খাবার আজকাল স্যাকারিনের সাহায্যেই মিষ্টি করা হয়ে থাকে। কিন্তু চিনির মত শরীরের পক্ষে স্যাকারিনের কোন উপকারিতাই নেই। চিনি আমাদের শরীর গ্রহণ করে, কিন্তু স্যাকারিন যেমন খাই, তেমনি মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। বহুমূত্র রোগী চিনি খেয়ে হজম করতে পারে না। ডাক্তারেরা তাই তাদের চিনির বদলে খাবারের সঙ্গে স্যাকারিন খেতে উপদেশ দেন।

কিন্তু সম্প্রতি এমন কতকগুলি জিনিস বেরিয়েছে, মিষ্টতায় স্যাকারিনও যাদের কাছে নিতান্তই শিশু। এদের একটির নাম ডালসিলারটাইন। জিনিসটি চিনির দু'হাজার গুণ মিষ্টি। আর একটি হচ্ছে ইথক্সি এমাইনো নাইট্রোবেনজিন—এটি চিনির প্রায় চার হাজার গুণ মিষ্টি। কিন্তু সবার উপর টেক্কা দিয়েছে প্রপক্সি এমাইনো নাইট্রোবেনজিন। জিনিসটি চিনির চার হাজার একশো গুণের বেশী মিষ্টি। এটির আণবিক চেহারা অনেকটা 'ইথক্সি'র মতই—তৈরি করবার প্রণালীর মধ্যেও মিল আছে। তৈরি করবার মূল উপাদান কিন্তু সেই আলকাতরাই!

মিষ্টিমুখ করবার বাসনায় এ সব পরিমাণের একটু যদি বেশি খেয়ে ফেল দাও, তাহলে আর মিষ্টি লাগবে না, জিব-তালু-গলা জ্বালা করতে আরম্ভ করবে মিষ্টিতে!

শিল্পীর মহানুভবতা

সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য

রেঙ্গুনের একটি অতি সাধারণ ভাড়াটে বাড়ী। বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে থাকতেন এক জন বাঙ্গালী। ভদ্রলোকের বিয়ের বয়স অনেক দিনই হয়ে গেছে তবুও অবিবাহিত আছেন। সরকারী অফিসে কাজ করে কোন রকমে তাঁর চলে যায়। সেই বাড়ীটারই নিচের তলায় থাকত আর এক ঘর ভাড়াটে, তারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। সংসারে তারা মাত্র দু'জন। একটি আইবুড়ো আঠারো বছরের মেয়ে আর তার বুড়ো বাবা।

ভদ্রলোক প্রায়ই শুনতেন, বুড়ো নেশা করে বাড়ী ফিরে এসে মারছে তাঁর মেয়েকে। এর প্রতিবাদও তিনি করতেন মাঝে-মাঝে কিন্তু কোন ফলই হ'ত না। বুড়ো কাজ করত মিস্ত্রীর। মাইনে পেত অল্পই; কিন্তু হলে কি হয়, সব পয়সা উড়িয়ে দিত নেশায়। প্রতি সন্ধ্যায় তার ঘরে এসে আড্ডা মারত জন কয়েক নেশাখোর জুয়াড়ী। তাদের জন্য অক্লান্ত ভাবে খাটতে হ'ত মেয়েটিকে। সেও খেটে যেত মুখ বুঁজে। উপরতলায় ভদ্রলোক বাড়ী ফিরতেন রাত্রে আর শুনতেন সেই মাতালদের হৈ-হল্লা।

এক দিন রাত তখন প্রায় দশটা হবে। ভদ্রলোক বাড়ী ফিরে দেখলেন, তাঁর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তখনই তাঁর সন্দেহ হ'ল, হয়ত কোন চোর চুরি করবার মতলবে ঘরে ঢুকেছে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে! যাক, বেটাকে আচ্ছা জব্দ করবার জন্য তিনি মনে-মনে ফন্দী আটলেন, তার পর ধাক্কা দিতে লাগলেন দরজায় জোরে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল তাঁর সামনে এক অষ্টাদশী তরুণী। ভদ্রলোক কিন্তু তাকে দেখেই চমকে উঠলেন, তুমি এখানে···? মেয়েটি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, আপনি ত আমায় জানেন বাবু মশাই, বাবা নেশা-ভাঙ করে তাঁর দলের এক বুড়োর কাছ থেকে কিছু টাকা হাতিয়েছেন, তার পরে তার দাম-স্বরূপ আমাকে তার হাতে দিতে চান। আজকে সেই বুড়ো এসেছিল আমায় নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু আমি ধরা না দিয়ে এখানে লুকিয়ে ছিলাম এতক্ষণ। এখন একমাত্র আপনিই আমায় বাঁচাতে পারেন।

করুণ-হৃদয় ভদ্রলোক একটু মাথা চুলকে বললেন, তাই ত, এ যে মহা মুস্কিল! আচ্ছা আজ রাতে তুমি এ ঘরে থাক আমি অন্য জায়গায় যাই। কাল এসে তোমার যা-হয় একটা ব্যবস্থা করবই করব।

আশ্বস্ত হয়ে মেয়েটি আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন। ভদ্রলোক এসেছেন মেয়েটির বাবার কাছে। বললেন, আচ্ছা চক্কোত্তি মশাই, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবার মানে কি?

—কেন বাবা কি হয়েছে?

—হবে আবার কি, ঐ বুড়োটার কাছে টাকা খেয়ে ওর হাতে মেয়েকে দিতে চান? ও আর কত দিন বাঁচবে?

হোঃ-হোঃ করে হেসে বুড়ো বলে উঠল, ওঃ, এই কথা! তা কি করব বাবা, এই বিদেশ, বিভুঁইতে আর এর চেয়ে ভাল পাত্র বিনা পয়সায় পাব কোথা? আর বয়সের কথা বলছ? পুরুষের বয়সের আবার হিসেব আছে না কি? তবে শোন একটা গল্প···

—আঃ, থামুন, গল্প শুনতে এখানে আসিনি। আপনি তাহ'লে মেয়ের সঙ্গে ঐ বুড়োটার বিয়ে দিতে চান, কেমন ত?

—অগত্যা, তবে যদি ভাল পাত্র পাই···হ্যাঁ, এক কাজ করলে হয় না ঠাকুর? ওর বিয়ের জন্য যখন তোমার প্রাণে এত লেগেছে তাহলে তুমিই কেন ওকে নাও না ঠাকুর মশাই। আমরাও ত ব্রাহ্মণ।

—বেশ, তাই নেব। দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করেন ভদ্রলোক।

তার পর যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল তাঁদের। ভারী শান্ত-শিষ্ট এই মেয়েটি, কিন্তু বেশী দিন তাকে ভদ্রলোক এ সংসার আটকে রাখতে পারলেন না। হঠাৎ এক দিন প্লেগের আক্রমণে একটি ছেলে সমেত সে চিরকালের জন্য সরে গেল ভদ্রলোকের সামনে থেকে। ভদ্রলোক শোকে বিহ্বল হয়ে কচি ছেলের মতই কেঁদে উঠেছিলেন সেদিন হাউ-হাউ করে।

এই ভদ্রলোকই হচ্ছেন আমাদের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আর মেয়েটি হচ্ছে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্তী

কলকাতার রেড রোডের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো তোমরা—না? যারা কলকাতায় থাকো তারা শুধু শোনাই নয়,—কতো বার ঐ রাস্তার ওপর দিয়ে গেছও হয়তো। আজ তোমার যখনই খুশী হবে রেড রোডের ওপর দিয়ে যাবার, তখুনি তুমি যেতে পারবে বিনা বাধায়। কিন্তু আগে কি কখনও খুশী মতো ও-রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারতে?—না, তোমার-আমার অর্থাৎ কোনো ভারতীয়ের অধিকার ছিলো না ও-রাস্তা ব্যবহার করবার! ও-রাস্তা ছিলো একমাত্র 'রেড' অর্থাৎ 'লালমুখো'দের জন্যেই নির্দিষ্ট।—তারাই কেবল যাতায়াত করতে পারতো ও-রাস্তা দিয়ে। তাই বোধ হয় ওর নাম হয়েছে রেড রোড (Red Road)।

সে যাই হোক, এক দিন দেখা গেল, ঐ বিশেষ রাস্তার ওপর দিয়ে জুড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছেন এক ভদ্রলোক, জাতে বাঙ্গালী অর্থাৎ ভারতীয়। রাস্তার প্রহরীর চোখে পড়লো সে গাড়ী

বাঙ্গালী ভদ্রলোককে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে দেখে সে ছুটে এলো, আর গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাবার নির্দেশ দিয়ে হেঁকে উঠলো: এই—জলদি রোখো গাড়ী, জলদি রোখো; কৌন্ হ্যায়? গাড়ী থেমে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর এলো: আমি—কলকাতা হাইকোর্টের জজ—যাচ্ছি এই গাড়ীতে।

প্রহরীর তর্জন-গর্জন থেমে গেল সেই মুহূর্তে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তা দেখে সে আর কোনো কথা বলতেই সাহস করলো না;—পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। গাড়ী চললো আবার! ব্যাপার কিন্তু ওখানেই শেষ হ'য়ে গেল না!

ভদ্রলোক বাড়ী এলেন; বাড়ী এসেই টেলিফোন করলেন লাট সাহেবকে। জানতে চাইলেন, রেড রোডের ওপর দিয়ে যাতায়াত করা ভারতীয়দের নিষিদ্ধ কি না।

লর্ড কারমাইকেল সাহেব ছিলেন সে সময়ে লাট সাহেব। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তেজস্বিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো খুবই। কাজেই কি উত্তর দেবেন তাই ভেবে মুস্কিলে পড়লেন তিনি। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বললেন: You may go অর্থাৎ তুমি (আবার তোমরাও হয়) যেতে পারো। লাট সাহেবের এ উত্তরে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। 'You' তুমি বা তোমরা এই দুই অর্থেই ব্যবহার করা চলতে পারে। কাজেই ভদ্রলোক লাট সাহেবকে পরিষ্কার ক'রে বলবার জন্যে আবার অনুরোধ করলেন।

লাট সাহেবও বুঝলেন এর সঙ্গে চালাকী করা চলবে না; কারণ তিনি ভালো ভাবেই চিনতেন তাঁকে। কাজেই তিনি হুকুম দিলেন স্পষ্ট ভাবে যে, সমস্ত ভারতীয়েরও রেড রোডের ওপর দিয়ে চলাচল করবার অধিকার আছে। লাট সাহেবের সেই হুকুমে সেদিন থেকে রেড রোডের ওপর দিয়ে চলাচল করবার অধিকার পেলো প্রত্যেক ভারতীয়।

কে এই নির্ভীক পুরুষ—যাঁর জন্যে রেড রোডের ওপর দিয়ে যাতায়াত করবার অধিকার পেলো প্রত্যেক ভারতীয়? ইনি হচ্ছেন বাংলার বীর-সন্তান স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তেজস্বিতার জন্যে তিনি 'বাংলার বাঘ' আখ্যা পেয়েছিলেন তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে।

ভূগোলের গোলমাল

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

ভূগোলের গোলমালে চাপা পড়ে হিমালয়,
কাঁধে তার চেপে বসে নীলগিরি মহাশয়।
শাহারার বুকে জাগে আম্রের বৃক্ষ,
রেঙ্গুনে রেস দেয় রাশিয়ার ঋক্ষ।
পিগমীরা গান করে উত্তর মেরুতে,
পিরেনীজ উড়ে এসে জুড়ে বসে পেরুতে।

সানপুটা চলে যায় লণ্ডন নগরে,
ভল্গার জল আসে বঙ্গোপসাগরে।
সিংহল গিয়ে ঢোকে আল্পসের গর্তে,
হাওয়াই হানা দেয় চিলি সাথে লড়তে।
মিশরের 'নীল' আসে লাল চীন বক্ষে,
এস্কিমোরা মার দেয় পৃথিবীর অক্ষে।

বিন্ধ্যে মেলাম করি ঠুকে দিয়ে লম্বা,
হংকং এ ভেসে ভেসে দেখাইল রম্ভা।
'অরোরা'র জ্যোতিরেখা আরবের মরুতে,
চীনের ফসল খায় ইটালীর গরুতে।
সুদানের কাঁধে এসে নিউগিনি চাপ্‌লো,
রাশিয়ার শীত লেগে কালাহারি কাঁপ্‌লো।

চন্দ্যাও লুকায় মুখ ব্রাজিলের কাননে,
সুয়েজের জল নাচে পাম্পেরো পবনে।
তুন্দ্রার বুকে শুধু ধূ-ধূ মরু-বালি যে,
আমাজন চিন্তার বুকে জল ঢালিছে।
ফুজিয়ামা পাক্‌-বুকে তোলে মহা গর্জন,
এক সাথে ছুটে চলে গঙ্গা ও জর্ডন।
ভূগোলের মাঝে হোল কি যে মহা গোলমাল,
এ যে পড়ে ওর ঘাড়ে, একেবারে বেসামাল!

বিবেকানন্দ

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

ত্রিদিব হইতে এক দিন যেই ত্রিধারা ভারতে নামি'
মিলে' এক হয়ে বঙ্গে,
ফুলিয়া কাঁপিয়া ভীম গরজনে হইল সাগরগামী
উত্তাল বীচিভঙ্গে,
সে নহে ত্রিধারা গঙ্গা যমুনা তটিনী সরস্বতী
প্রবাহিত নানা ছন্দে,
কর্ম ভক্তি জ্ঞানের ধারা সে, তিন ধারা ভীমা গতি
মিলিত বিবেকানন্দে ।

মিলনাবেগের সেই আলোড়নে
উঠিল নিনাদ ভীম গরজনে
বাত্যাবাহিত হয়ে সেই নাদ
রণিয়া উঠিল গভীর ওঙ্কারে সপ্ত সাগর-পারে ।
স্তম্ভিত শুনি' নিখিল জগত
কাঁপিল ভারত-সন্তান যত
সুপ্তিভঙ্গে হইল চকিত,
হৃদয়তন্ত্রী মন্দ্রিত হলো সে গভীর হুঙ্কারে ।

কহিল সে ধ্বনি—"জাগো জাগো নরনারী
যে মায়াবী তা'র মায়ার পরশে রেখেছিল সবে লুপ্ত-চেতনা করি'
আমি আজি তা'র মায়া-যষ্টির পাইয়াছি সন্ধান,
জানিয়াছি কোথা রয়েছে লুকান সেই মায়াবীর প্রাণ ।
তাহার মারণ-মন্ত্র জেনেছি শোন শোন কান পাতি,
অচিরে পোহাবে ভারত-আকাশে দুখের তামস রাতি ।
'অভী' তা'র নাম
হিয়া তা'র ধাম
তোমাতেই আছে সুপ্ত
অচেতন, অবলুপ্ত ।
'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' ভৈরব রবে
সাধনায় তা'রে জাগাইতে হবে
ভারতের বীর সন্তান তোরা তোদের কিসের ভয় ?
—অমৃত সেবনে অজর অমর, নাহি লয় নাহি ক্ষয় ।

ঐ চেয়ে দেখ জননী মোদের বিরাজিছে.কিবা সাজে,
কৃপাণধারিণী বরাভয়করা
ভীমা করালিনী মনোজমোহরা,
তারি সন্তান হইয়া তোদের মনে কেন ভয় রাজে ?
ভক্তি-অর্ঘ্যে মায়ের চরণ
পূজিয়া লহ রে তাঁহার শরণ,
উদ্বোধিত কর রে হৃদয় কর্মের সাধনায়
উদ্ভাসিত হইবে বিবেক হবে জ্ঞানালোকময় ।
দৃপ্ত সে 'অভী' মন্ত্র জপিয়া
চল বীর-দাপে, উঠুক কাঁপিয়া
সেই হুঙ্কারে গগন পবন সুদূর দিগ্‌দিগন্ত ।
ওরে ওঠ্‌, ওঠ্‌, আর দেরী নয়, বিভাবরী হলো অন্ত ।"

সে দিন ভারত-তনয়া-তনয়
বিবেকানন্দের সে বাণী অভয়
শুনিয়া সুদৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে কহিল "হে বীর স্বামী !
যে মন্ত্রে করি' মৃত্যুরে জয়
আঁখি দু'টি তব বিদ্যুৎ-ময়
দাও হে দীক্ষা সে 'অভী' মন্ত্রে
ধ্বনিয়া উঠুক হৃদয়-যন্ত্রে
জ্বলিয়া উঠুক দৃপ্ত তেজের বহ্নি দিবস-যামী ।"

সেদিনের সেই মন্ত্র সাধনে জেগেছে ভারত আজি
মা ভৈঃ স্বননে শোন দিকে দিকে জয়ভেরী ওঠে বাজি' ।
বিশ্বের যত দানবের দল
—কম্পিত হিয়া পদ টলমল—
ভীতি-বিহ্বল নয়নে চহিয়া রয়েছে ভারত পানে—
কবে সেথা হতে মৃত্যুর দূত দারুণ বারতা আনে ।

হে ভারত-সন্তান
আজিও পাতিয়া কান
ভারতের স্বামী বিবেকানন্দের শোন সে দৃপ্ত বাণী
অনাহত বাজে ভারতের বুকে শিষ্যে অভয় দানি' ।

আয় আজি আয় ওরে ভক্তের দল,
ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূরিত হৃদয়ে বল্ ওরে, ওরে বল্—
"হে গুরু আমার হে ভারত-গুরু ভুলি নাই ভুলি নাই
সেদিনের মত আজিও আমরা তোমার দীক্ষা চাই ।
তব মাঝে যেই ত্রিধারা বাহিত
তাহে করি' চিত্ত পূত নিবোধিত
দাও হে তোমার অভয় মন্ত্র অতুল শক্তিময়ী
আজি দিকে দিকে দানব সমরে যেন মোরা হই জয়ী ।"
ঐ শোন শোন দ্যুলোকে ভূলোকে ধ্বনিছে বিরাট ছন্দ—
গাহিছে দেবতা-মানব মিলিয়া 'জয় হে বিবেকানন্দ' ।

রহস্যময় প্রাসাদ

বালজাক

লয়েরের প্রান্তসীমায়, ভিনডোম সহর থেকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরে একটি প্রাসাদ দেখা যায়—ধূসর রংয়ের, বহু দিনের পুরোনো, চার পাশের ঘেরানো ঘরগুলোর ওপর ত্রিভুজাকৃতি ছাদের বৈশিষ্ট্য, নির্জ্জন, পরিত্যক্ত, ভুতুড়ে বাড়ীর মত।

বাড়ীটার সামনে একটা বাগান, তারই শেষে ধীরে বয়ে যায় নদী—বাগানটা এখন আগাছার জঙ্গলে ভর্ত্তি। লয়ের থেকে উঠেছে কতগুলো উইলো গাছ, সেগুলো যেন আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে, ঢেকে দিয়েছে বাড়ীটার প্রায় অর্দ্ধেকটাই। নদীর ঢালু তীরটা ভর্ত্তি আগাছায়। গত দশ বছরের অযত্নে ফল গাছগুলোতে ফল আর ধরে না, বাড়েওনি আর—ছোট-ছোট গাছগুলো পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি করে রয়েছে, কেটে নিলে জ্বালানির কাজে লাগবে। লতানে গাছগুলো ঘন হয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বাড়ীর চারি ধারের দেয়াল। ছাঁটা ঘাসে ছাওয়া পায়-চলা পথগুলোর ওপর শ্যাওলার ঘন সবুজ আস্তরণ পড়েছে. আর সত্যি কথা বলতে—পথের কোন চিহ্নই নেই কোন দিকে। বাড়ীটার ছাদ ধ্বসে গেছে ভীষণ ভাবে, জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ, বারান্দাগুলোতে নিরাতঙ্কে বাসা বেঁধেছে সোয়ালো-দম্পতি, সিঁড়ির খাঁজে-খাঁজে ঘাসের পাতলা সবুজ রেখা, দরজায়-দরজায় ছিটকিনি আর তালাগুলো মরচে-ধরা, ক্ষয়ে যাচ্ছে। চাঁদ, সূর্য্য, শীত, গ্রীষ্ম আর বরফে মিলে যেন তাণ্ডব চালিয়েছে বাড়ীটার ওপর দিয়ে—মাঝে-মাঝে রং চটে গেছে, এখানে-সেখানে আস্তর খুলে পড়ছে। বাড়ীটার চারি দিকে একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা, সেগুলো ভাঙ্গে কেবল পাখীর কাকলী, বেড়াল আর ইঁদুরের কিচিমিচিতে। ওদেরই রাজত্ব, ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, একে অন্যকে ধরে খাচ্ছে।

বাড়ীটার যে-দিক্ দিয়ে সামনে রাস্তা, সে-দিক পানে তাকালে চোখে পড়ে একটা বন্ধ দরজা—পাড়ার ছেলেরা খেলতে এসে কুরে-কুরে কতগুলো গর্ত্ত বানিয়েছে তাতে। শুনলুম, এই দরজাটা না কি বন্ধ আছে গত দশ বছর ধরে। সিঁড়িগুলোর জোড় খুলে গেছে, ঘণ্টার তারে মরচে ধরেছে, পাইপগুলো ফাটা-ফাটা। স্বর্গ থেকে কি অভিশাপ নেমে এসেছে এখানে? জায়গাটা যেন একটা বিরাট রহস্য—সমাধানের চাবিকাঠী নেই।

আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার সহৃদয়া গৃহকর্ত্রী চুপি-চুপি যে গল্পটা শোনাচ্ছেন আমাকে, সে গল্পের শ্রোতা কেবল মাত্র আমিই নই—বহু বার বলা সে কাহিনী।

চুপ-চাপ শুনে যেতে প্রস্তুত হ'লাম আমি।

"স্যর", সুরু করলেন তিনি, "সম্রাট তখন যুদ্ধবন্দীদের এখানে পাঠিয়েছিলেন—আমার ওপর তখন ভার পড়ল একটি স্পেনদেশীয় ছেলেকে রাখবার। ছেলেটিকে সরকার থেকে ভিনডোমে পাঠান হয়েছিল ব্যক্তিগত জামিনে। ছেলেটি ছিল যেন রাজপুত্র! একটুও বাড়িয়ে বলছি না! আমার বইয়ে নাম লেখা আছে তার—ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন। স্পেনীয়দের তুলনায় অদ্ভুত সুন্দর দেখতে ছেলেটি—ওদের দেশের লোকেরা ত কুৎসিত বলেই পরিচিত। ছেলেটি লম্বায় ছিল মোটে পাঁচ ফুট কয়েক ইঞ্চি, কিন্তু চমৎকার সুঠাম গঠন; ছোট-ছোট হাত দু'খানা—কি যত্ন তার। আপনি যদি দেখতেন তা! ঘন কাল চুলের গোছা, ঝকঝকে চোখ, গায়ের রংটা একটু তামাটে গোছের—আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগত দেখতে। খেত খুব কম; কিন্তু ব্যবহারটি ছিল এমনি নম্র আর অমায়িক যে, তার সম্বন্ধে কারুরই অসন্তোষের কোন কারণ ঘটতে পেত না। আঃ! চমৎকার লাগত আমার ছেলেটিকে,—যদিও ছেলেটি নিজে দিনে গোটা চারেক কথাও বলত কি না সন্দেহ—আর ওর সঙ্গে কোন রকম আলাপ চালানও ছিল ভারী কঠিন। ধর্ম্ম-পুস্তকখানা পড়ত এমনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যেন এক জন পুরোহিত, গীর্জ্জার সব বক্তৃতাতেই যোগ দিত নিয়মিত ভাবে। কোথায় সে যেত? ম্যাডাম ডি মেরেটের উপাসনা-মন্দিরের কয়েক পা দূরে। প্রথম যেদিন গীর্জ্জায় গিয়ে ওখানে আসন নিল সে, কেউ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেনি তাতে। তাছাড়া, ছেলেটি বারেকের তরেও চোখ তুলে তাকাত না তার উপাসনা-গ্রন্থ ছেড়ে। তার পর সন্ধ্যেবেলা সে একা-একা ঘুরে বেড়াত পাহাড়ে-পাহাড়ে, পুরোনো দুর্গের ভগ্নাংশের ভেতর দিয়ে। ঘরের চাবি সে নিজের কাছেই রাখত—আমরাও অল্প কিছু দিনের পরেই তার জন্য অপেক্ষা করা ছেড়ে দিলাম। আমাদের ক্ল্য ডি কেমারনেসের একটা বাড়ীতে সে থাকত। এক দিন আমাদের আস্তাবলের লোকটা এসে বললে, ঘোড়াগুলোকে নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে সে দেখেছে আমাদের স্প্যানিয়ার্ড ছেলেটিকে স্বচ্ছন্দ গতিতে সাঁতার কেটে নদী বেয়ে চলেছে অনেক দূরে, ঠিক যেন একটি জ্যান্ত মাছ! সেদিন বাড়ী ফিরে আসতে ছেলেটাকে আমি সাবধান করে দিলুম, নদীতে শ্যাওলা আছে, আছে এক রকমের গাছ যাতে পা আটকে যায়।

"ছেলেটি কিন্তু যেন কেমন ধারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল ওকে আমরা জলে দেখে ফেলেছি জানতে পেরে। অবশেষে এক দিন, অর্থাৎ এক দিন সকালে ছেলেটিকে আর তার ঘরে পাওয়া গেল না—সে ফিরে আসেনি। সমস্ত জায়গায় তন্ন-তন্ন করে খোঁজার পরে আমাদের চোখে পড়ল টেবিলের টানায় কি লেখা কতগুলো কাগজ আর স্পেন দেশের পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা—ওখানে বলে ডাবলুন, দাম প্রায় পাঁচ হাজার ফ্রাঁ; এ ছাড়া শীলমোহর-করা একটা বাক্সে আছে প্রায় দশ হাজার ফ্রাঁ দামের হীরে। চিঠিখানায় লেখা আছে, সে যদি কোন দিন অদৃশ্য হয়ে যায় টাকাগুলো আর হীরেগুলো আমরা নিতে পারি—তার মুক্তির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে উৎসবে সে টাকা খরচ করব এই সর্ত্তে। আমার স্বামী বেঁচেছিলেন সে সময়, তিনি চারি দিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়ালেন।"

"এবার আসছে গল্পের সব চেয়ে অদ্ভুত অংশটুকু। আমার স্বামী ফিরে এলেন ছেলেটির জামা-কাপড় নিয়ে—নদীর ধারে এক টুকরো পাথরের তলায় জড় করা ছিল সেগুলো, ঐ বাড়ী থেকে সামান্য একটু দূরে। চিঠিখানা পড়ে জামা-কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেললুম আমরা প্রচার করে দিলুম তার মুক্তির কাহিনী। সকলে বিশ্বাস করল জলে ডুবেই মারা গেল ছেলেটি। আমি অবশ্য তা মানি না; আমার বরং ধারণা, ম্যাডাম ডি মেরেটের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে—রোমালির কাছে আমি শুনেছি

তার কর্ত্রী যে ক্রুসিফিক্সটিকে সব চেয়ে বেশী দাম দিতেন, তাঁর মৃতদেহের সাথে যেটিকে কবরে দেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিল আবলুশ কাঠ আর রূপোর তৈরী। মঃ ডি কিবেডিয়া—এ স্প্যানিয়ার্ড ছেলেটি প্রথমে যখন এল এখানে, তার কাছে দেখেছিলাম ঐ রকম আবলুশ আর রূপোর একটি ক্রশ: যেটাকে পরে আর তার কাছে দেখা যায়নি।"

"আপনি রোমালিকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেননি?" জিজ্ঞাসা করলুম।

"নিশ্চয় স্যর। কিন্তু কোন ফল হয়নি। মেয়েটা একেবারে চুপ। ও জানে কিছু-কিছু কিন্তু ওর মুখ দিয়ে তা বার করা একেবারেই অসম্ভব।" আরও দু'-চারটে কথাবার্ত্তা বলে গৃহকর্ত্রী আমাকে একা রেখে চলে গেলেন—কিন্তু যতটুকু বলে গেলেন সেটুকুই যথেষ্ট, নতুনতর একটা রোমান্সের গন্ধে মোগাবিষ্ট হয়ে আমার মন আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ সামনের ঐ পোড়ো বাড়ীটা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা, ওর খড়খড়ি-ভাঙা জানালাগুলো, মরচে-ধরা লোহার কলকব্জা, বন্ধ দরজা, নির্জ্জন পরিত্যক্ত ঘরগুলো—সব মিলে অস্পষ্ট একটা অনৈসর্গিক চেহারা আমার মনের সামনে ফুটে উঠল। ওই রহস্যময় বাড়ীটার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার মনটা, কোথায় ওই জট-পাকান গল্পটার সূত্র—যে নাটক শেষ হয়েছে তিনটি লোকের জীবনান্তে? আর ঐ বাড়ীটার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভেনডোমের মধ্যে রোমালিই হচ্ছে সব চেয়ে রহস্যময়ী, আমার মনে হ'ল। ওকে যতই লক্ষ্য করি ততই মনে হয়, বাইরে দেখতে গোলগাল স্বাস্থ্যবতী হাসিখুসী মেয়েটি—কিন্তু কি-যেন একটা আছে ওর মনে! ওর মনে দিবা-রাত্র খেলা করে বেড়াচ্ছে সেটা কি অনুশোচনার বীজ না আশা? ওর হাবে-ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে একটা গুপ্তকথা, ভঙ্গীটা যেন কি একটা ব্যাপারে ভয়ঙ্কর গুরুত্ব দিয়েছে ও, অহরহ সেই কথা তোলাপাড়া হচ্ছে ওর মনে—যেন নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে ও, অবিরাম কানে ভাসছে সে সন্তানের শেষ আর্ত্তনাদ। নাঃ, ঐ বাড়ীটার রহস্য ভেদ না করে ভেনডোম ছাড়া হবে না—মনে-মনে ঠিক করলুম আমি।

"রোমালি?" এক দিন সন্ধ্যের ওকে ডাকলুম আমি।

"স্যর?"

"তুমি বিয়ে করনি?"

ও চমকে উঠল একটু।

"ও, অনেক লোকই ত দেখতে পাই, কিন্তু কাকে বিয়ে করি তাই ত হচ্ছে মুস্কিল।" হেসে জবাব দিল রোমালি।

"তুমি দেখতেও সুন্দর, এমনিতেই সব দিকেই উপযুক্ত, তোমার কখনও প্রেমিকের অভাব ঘটতে পারে না। আচ্ছা রোমালি, ম্যাডাম ডি মেরেটের মৃত্যুর পর তুমি হোটেলে কাজ নিলে কেন বল ত? উনি কি তোমাকে কিছুই দিয়ে যাননি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, দিয়েছেন বই কি। কিন্তু তবুও ভেনডোমই আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল জায়গা স্যর।"

রোমালির জবাবটা এড়িয়ে যাওয়া গোছের হ'ল। আমি বুঝলুম, এই রহস্য-কাহিনীর ঠিক মাঝখানটিতে বসে আছে রোমালি—দাবার ছকের মাঝেকার চৌকো ঘরটির মত। এ মেয়েটিকে জড়িয়ে রয়েছে একটি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়।

এক দিন সকালে আমি সোজাসুজি ওকে বলে বসলুম "ম্যাডাম ডি মেরেট সম্বন্ধে কি জান বল।"

"ওঃ" রোমালি ভয়ে কেঁপে উঠল, "দয়া করে আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসা করবেন না মঁসিয়ে হোরেস।"

ওর সুন্দর মুখখানা কাল হয়ে গেল নিমেষে, ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে ম্লান একটা ব্যথার ছায়া ভেসে উঠল।

"আচ্ছা বেশ," অবশেষে সে স্বীকার করল, "যদি নিতান্তই শুনবেন আমি বলছি সে গল্প। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আমার গুপ্ত-কাহিনী প্রকাশ করবেন না কারুর কাছে।"

রোমালির কাহিনী পুরোপুরি বলতে গেলে গোটা বই হয়ে যাবে একখানা—সংক্ষেপে গল্পটা বলছি এখানে:

ম্যাডাম ডি মেরেটের ঘরটা ছিল এক তলায়। দেয়ালের গায়ে বসান ছিল চার ফুট গভীর একটা আলমারী—সেটাতে কাপড়-চোপড় থাকত তার। যে ভয়াবহ সন্ধ্যের স্মৃতি-কাহিনী বলছি আমি, তার মাস তিনেক আগে এক দিন ম্যাডাম ডি মেরেট এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, তাঁকে চুপ-চাপ তাঁর ঘরে থাকতে দিয়ে মঁসিয়ে তার জিনিষপত্র নিয়ে চলে যান দোতলার একটি ঘরে। সেই থেকে সেই ঘরেই থাকেন তিনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যে বেলা কি কারণে জানি না, সেদিন মঁসিয়ে ক্লাব থেকে ফিরে আসেন নিয়মিত সময়ের চেয়ে দু'ঘণ্টা পরে। তাঁর স্ত্রী ধরে নেন তিনি বাড়ীতেই আছেন, ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু আসলে সেদিন স্প্যানিশ আক্রমণ নিয়ে জোর তর্কাতর্কি চলেছিল; বিলিয়ার্ড খেলাটাও জমেছিল খুব, মঁসিয়ে হেরেছিলেন প্রায় চল্লিশ ফ্রাঁ, ভেনডোমের খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। গত কিছু দিন ধরেই তিনি ফিরে এসে রোমালির কাছে খবর নিতেন ম্যাডাম শুয়ে পড়েছেন কি না—সব সময়ই 'হাঁ' শুনতেন, শুনে ফুর্ত্তির সঙ্গে নিজের ঘরে উঠে যেতেন। আজ কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই তার কি খেয়াল হ'ল, ভাবলেন ম্যাডামকে বাজী হারার খবরটা দিয়ে আসি। সেদিন ডিনারের সময় দেখেছিলেন ভারী চমৎকার করে সেজেছেন ম্যাডাম ডি মেরেট। ক্লাবে যেতে-যেতে পথে মনে এক বার হ'ল সে কথা—ভাবলেন, ওর স্বাস্থ্য ফিরে আসছে আবার, একটু বিবর্ণ ভাব যা আছে, এতে ওর সৌন্দর্য্যই যেন বাড়িয়ে দিয়েছে হাজারো গুণে।

স্বামীদের মত স্বাভাবিক ভাবেই জিনিষটা তার চোখে ধরা পড়েছে বেশ একটু দেরীতেই। রোমালি সে সময় ঠাকুর আর গাড়োয়ানটাকে নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিল—তাকে আর না ডেকে মঁসিয়ে ডি মেরেট সোজা চলে গেলেন তার স্ত্রীর ঘরের দিকে, সিঁড়ির কোণে রাখা আলোটা পথ দেখাল তাঁকে। তাঁর নির্ভুল পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি জাগল বারান্দায়। স্ত্রীর ঘরের দরজার হাতল ঘোরাতে-ঘোরাতে মঁসিয়ের মনে হ'ল যেন ঘরের দেয়াল-আলমারীটার দরজা বন্ধ হবার শব্দের রেশ শুনতে পেলেন—কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলেন ম্যাডাম ডি মেরেট একা আগুনের কুণ্ডের পাশে ব'সে। স্বামী ভাবলেন রোমালি বোধ হয় আছে ওর ভিতর—তবুও কেমনতর সন্দেহের খোঁচা একটা লাগল মনে। সচকিত হয়েই রইলেন তিনি। স্ত্রীর দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন—কি জানি কি দেখলেন, মনে হ'ল

…া-খাওয়া জন্তুর মত একটা ভয় যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে তার …-চোখে।

"তুমি আজ অনেকটা দেরী করে ফিরেছ", স্ত্রী বললেন। তার স্বাভা-…ক নির্দোষ মিষ্টি গলার স্বরটাও যেন স্বামীর কানে অন্য রকম ঠেকল।

মঁসিয়ে ডি মেরেট কোন জবাব দিলেন না, কারণ সেই মুহূর্ত্তে …মালি এসে ঘরে ঢুকল। তাঁর মাথায় বাজ পড়ল যেন। ঘরের মধ্যে …চারি করতে সুরু করলেন তিনি, এ জানালা থেকে ও-জানালা—…ত দু'টি বুকের ওপর ভাঁজ-করা, যন্ত্রের মত মাপা পদক্ষেপ।

"তুমি কি কোন খারাপ সংবাদ শুনেছ অথবা শরীর খারাপ …মার?"—অত্যন্ত ভীরু ভাবে এক বার জিজ্ঞাসা করলেন ম্যাডাম, …মালি তখন তাঁকে পোষাক বদলে দিচ্ছিল।

মঁসিয়ে চুপ করে রইলেন।

"তুমি এবার চলে যেতে পার", ম্যাডাম বললেন, তার ঝির দিকে …রে, "চুলগুলো আমিই ঠিক করে নেব।"

রোমালি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, মঁসিয়ে ডি মেরেট স্ত্রীর …মনে এসে দাঁড়ালেন, নিরুত্তেজ গলায় বললেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট …রে, "ম্যাডাম তোমার দেয়াল-আলমারীটার ভিতর কেউ আছে?"

ম্যাডাম শান্ত ভাবে স্বামীর দিকে তাকালেন, সহজ-গলায় জবাব …লেন, "কই, না ত।"

মঁসিয়ে বিশ্বাস করলেন না কথাটা। স্ত্রীর চোখে চোখ …লিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের চেয়ে বেশী সরল আর নিষ্পাপ চেহারাও …কি তিনি আর কখনো দেখেছেন তার স্ত্রীর? মঁসিয়ে উঠলেন …লমারীর দরজা খুলতে। ম্যাডাম ডি মেরেট স্বামীর হাতখানা …লেন, বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তার দিকে, তার পর …লেন, যদি তুমি ওখানে কাউকে দেখতে না পাও, মনে রেখো, …মাদের সব সম্পর্কের এই শেষ!" ম্যাডামের ভঙ্গিতে এমনি …কটা আত্মসম্মানের সুর বাজল যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে মঁসিয়ের মনে ফিরে …ল স্ত্রীর প্রতি আগেকার শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের ভাব।

"না" তিনি বললেন, "জোসেফাইন, আমি ওখানে যাব না। …রণ ওখানে কেউ থাকুক বা না থাকুক, দু' ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চিত …বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। শোন, আমি জানি …মার হৃদয় কত পবিত্র, তোমার জীবন কত মহৎ, নিজের জীবন …চাবার জন্য তুমি কখনো কোন পাপ করতে পার না।"

কথা ক'টা শুনে ম্যাডাম ডি মেরেট একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে …পলকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর পানে।

"এই নাও, তোমার ক্রুশ নাও", মঁসিয়ে বলে চললেন, "ভগবানের …ম নিয়ে শপথ কর যে, ওই আলমারীর ভেতর কেউ নেই। …হলেই আমি বিশ্বাস করব ও-দরজা খুলব না।

ম্যাডাম ডি মেরেট ক্রুশটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "ভগবানের …মে শপথ করছি, ও-আলমারীর ভিতর কেউ নেই।"

"ব্যস্, ওতেই হবে।" কঠিন, শীতল গলায় বললেন মঁসিয়ে ডি …রেট।

এক মুহূর্ত্তের বিরতি। তার পর:

"এই সুন্দর খেলনাটা ত কখনো দেখিনি এর আগে!" রূপোয় …াড়া আবলুশ কাঠের ক্রুশটি পরীক্ষা করতে করতে বললেন মঁসিয়ে।

"ভুভিভিয়ারের কাছে পেয়েছি ওটা। গত বছর যখ ভেলডোমের ভিতর দিয়ে যুদ্ধবন্দীরা পার হয়ে যাচ্ছিল, এক জন স্প্যানিশ সাধুর কাছ থেকে তিনি কিনেছিলেন ওটা।"

"ও!" মঁসিয়ে ডি মেরেট ক্রুশটা দেয়ালে-ঝুলিয়ে রেখে ঘণ্টা টিপলেন। রোমালি আসতে দেরী করল না একটুও। দূরে রোমালিকে দেখতে পেয়েই মঁসিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেলেন, তার পর ইঙ্গিতে জানালার কাছে ডেকে নিয়ে ফিস্-ফিস করে বললেন—"শোন! আমি জানি গোরেনফ্লোট বিয়ে করতে চায় তোমাকে। দারিদ্র্যই কেবল বাধা। ভাল রাজমিস্ত্রী হিসেবে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তুমি তার স্ত্রী হবে—এ কথা বলেছ তুমি তাকে। বেশ! যাও ডেকে নিয়ে এস তাকে, বলো, তার জিনিষ-পত্র সঙ্গে আনতে। সাবধানে ডেকো, সে ছাড়া আর কেউ টের পায় না যেন তার বাড়ীতে। তুমি যা চাও, তার চেয়েও বেশী পাবে। আর সব চেয়ে বেশী হচ্ছে বক্-বক্ না করে এক্ষুণি যাও এখান থেকে। নইলে……"

মঁসিয়ে ভ্রূকুটি করলেন। রোমালি বেরিয়ে গেল।

সে যখন ফিরে এল, দেখতে পেল মঁসিয়ে আর ম্যাডাম অতি অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কাউন্ট সম্প্রতি তার অতিথিদের অভ্যর্থনা করার ঘরগুলোর ছাদ মেরামত করেছিলেন, তাই অনেকটা প্ল্যাষ্টার অব প্যারিস কেনা ছিল।

"স্যর, গোরেনফ্লোট এসেছে", রোমালি বললে নীচু-গলায়।

"ভিতরে নিয়ে এস", জোর-গলায় জবাব দিলেন কাউন্ট।

রাজমিস্ত্রীর দিকে নজর পড়তে ম্যাডাম ডি মেরেট ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

"গোরেনফ্লোট," তাঁর স্বামী বললেন, "আস্তাবলের সামনে থেকে ইট নিয়ে এস—এই গা-আলমারীটা বন্ধ করে ফেলতে হবে। বাড়ীতে যে প্ল্যাষ্টার আছে তা লাগিয়ে দেবে দেয়ালে।" তার পর রোমালি আর রাজমিস্ত্রীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একটু নীচু গলায় বললেন, "শোন গোরেনফ্লোট, তুমি আজ এখানেই ঘুমুবে। কিন্তু কাল তুমি একটা পাসপোর্ট পাবে—দূর বিদেশে কোথাও যাবার জন্যে। পথ-খরচের জন্য আমি তোমাকে দেব ছ'হাজার ফ্রাঁ। কোন একটা সহরে গিয়ে তুমি দশ বছর বাস করবে; সে জায়গাটা পছন্দ না হ'লে সেই দেশেরই অন্য কোন সহরে যেতে পার। আমাদের সর্ত্ত যদি ঠিক মত মেনে চল তবে আরও ছ'হাজার ফ্রাঁর একটা ইন্সিওর করে দেব তোমার নামে।" এটা হচ্ছে আজকের রাতে তুমি যা করবে, সে সম্বন্ধে একেবারে মুখ বুজে থাকার জন্য। আর তুমি রোমালি…তোমাকে আমি দশ হাজার ফ্রাঁ দেব গোরেনফ্লোটকে বিয়ে করবে এই সর্ত্তে। কিন্তু তোমাকেও এক দম চুপ করে থাকতে হবে; নইলে—যৌতুক পাবে না।"

"রোমালি," ম্যাডাম ডি মেরেট ডাকলেন, "আমার চুল ঠিক করে দাও।"

স্বামী শান্ত ভাবে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন দরজা, রাজমিস্ত্রী আর স্ত্রীকে লক্ষ্য করতে-করতে—কিন্তু মুখের ভাব সম্পূর্ণ নির্বিকার। এক বার রাজমিস্ত্রী ইট আনছিল আর তাঁর স্বামী পায়চারী করতে-করতে ঘরের আর এক কোণে …

মেঘনায়

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আঁধার পাথার পারে একাকারে নিরাশায় তীর
ভ'রে দিল, ব'রে নিল অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা গভীর,
এলো দিগন্তরে নামি' চির যামী মু'ছিয়া আলোকে,
আকাশ মৃত্তিকা বারি এক সারি মিলাইল শোকে
নির্নিমেষ শুক বেদনায়
মোর মেঘনায়।

স্বেচ্ছা নির্বাসন লেখা মুক্তিরেখা লেপিয়া ললাটে
নেচে চলে অবহেলে নিরুদ্দেশ সন্ধানের বাটে
আমার মেঘনা ওই মেঘ বহি' হৃদয়ে নিবিড়,
ম্লান দীপশিখা দোলে ; উদ্বেলিত নিরুপায় নীর
চেয়ে রহে ব্যথা নেত্রে হায়
ভরা মেঘনায়।

ঊর্মিলা গীতির মাঝে প্রীতি বাজে, তুমি সন্ন্যাসিনী,
জীর্ণ পর্ণগৃহ মোর লুপ্ত করি নদী সাগরিনী ·

বিদ্যুৎ-ঝঙ্কার ভারে হাহাকারে ভরি' মোর পথ
শিখাইলে দুঃসাহস ; প্রাণরস ছুটিল মরত
উপেক্ষিয়া দুঃখের বন্যায়
মত্ত মেঘনায়।

গলাইয়া মেঘরাশি ব্যঙ্গ হাসি' আমার জীবন
প্রবাহ ভাঙ্গিয়া যাবে ঘোর রবে করিয়া প্লাবন
দুই তীরে নব নীরে অসহায় শতেক লাঞ্ছনা ;
দুঃসহ তপের দীপ্তি নাশি' সুপ্তি অভয় ব্যঞ্জনা
জাগাইবে রবিদীপিকায়
মোর মেঘনায়।

হানো, হানো ; আরো আনো দুর্দশার বজ্রের নির্ঘোষ,
উত্তাল তরঙ্গ তব রঙ্গভরে বাজাইয়া রোষ—
রক্ত আঁখি নিক সাক্ষী রিক্ত মোর ভাগ্যের পসরা ;
বাঁচিব বাঁচিব তবু পান করি' সর্বদুঃখহরা
প্রাণগঙ্গা বারি মোহনায়
মৃত্যু-মেঘনায়।

গিয়েছিলেন—সেই এক মুহূর্তের ফাঁকে ম্যাডাম ফিস-ফিস করে বললেন তার পরিচারিকাকে, "বছরে এক হাজার ক্রাঁ, রোমালি, যদি গোরেনফ্লোটকে বলে দিতে পার নীচের দিকে কোথাও একটা ফুটো রাখতে।" তার পর জোরে বললেন, "যাও, ওকে সাহায্য কর গিয়ে।"

দেয়ালটা যখন আদ্ধেক উঠেছে কাউণ্ট এক বার একটু পেছন ফিরতেই চতুর রাজমিস্ত্রী চোখের পলকে আলমারীর কাচের এক জায়গায় ঘা মেরে দিল একটা। ম্যাদাম ডি কাউণ্ট বুঝতে পারলেন, রোমালি তার কথা জানিয়েছে গোরেনফ্লোটকে।

এক লহমার জন্যে তিন জনেরই চোখে পড়ল একটি মানুষের মুখ—ভয়-চকিত, দুর্ভাবনায় কাল হয়ে যাওয়া একখানা মুখ, কাল চুলের গোছার নীচে ঝকঝকে চোখ দু'টি অঙ্গারের মত জ্বলছে! স্বামী এদিকে মুখ ফেরাতে-ফেরাতে হতভাগিনী নারীটি সামান্য একটু ইঙ্গিত করার সময় পেলে মাত্র যার অর্থ—"আশা"!

ভোরের দিকে চারটে নাগাদ দেয়াল গাঁথা শেষ হ'ল। ম'সিয়ে ডি মেরেট স্ত্রীর ঘরেই ঘুমুলেন।

ভোর বেলা উঠে অন্যমনস্ক ভাবে একবার বললেন, "ওহো! আমাকে ত মেইরী যেতে হবে রাজমিস্ত্রী'র ছাড়পত্র আনতে। তিনি টুপীটা তুলে নিলেন, তিন পা এগোলেন দরজার দিকে, আবার কি ভেবে মন বদলালেন, ক্রশটা হাতে তুলে নিলেন।

তার স্ত্রী আনন্দে কাঁপতে লাগলেন ; "ও তুভিভিয়ারের কাছে যাচ্ছে," ভাবলেন তিনি। কাউণ্ট চলে যাওয়া মাত্র তিনি বেল টিপে রোমালিকে ডাকলেন, তার পর উত্তেজনায় অধীর কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন : "শীগ্‌গির, একটা কর্ণি। শীগ্‌গির এস কাজে লেগে যাই। গোরিনফ্লোট কি করে করেছে আমি দেখেছি। একটা বড় গর্ত করে সেটা আবার বুজিয়ে দেবার যথেষ্ট সময় পাব আমরা।"

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রোমালি একটা কর্ণি এনে দিল কর্ত্রীকে। ম্যাডাম তক্ষুণি অদম্য উৎসাহে কাজে লেগে গেলেন দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেলতে। কয়েকখানা ইট ভেঙ্গে ফেলেছেন, এবার আরও জোরে ঘা দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন—অকস্মাৎ ম্যাডামের নজরে পড়ল স্বামী তার পিছনে দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

"বিছানায় শুইয়ে দাও।" কঠিন কণ্ঠে হুকুম দিলেন কাউণ্ট। তার অনুপস্থিতিতে এমনি একটা কিছু হবে বলে তিনি আন্দাজ করেছিলেন, তাই স্ত্রীর জন্য জাল পেতেছিলেন মাত্র। তিনি নিজে না গিয়ে মেয়রকে একটা চিঠি আর তুভিভিয়ারের কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঘরটা ঠিক করে উঠ্‌তে-না-উঠতেই জহুরী এসে পৌঁছে গেল।

"তুভিভিয়র!" কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "এখান দিয়ে যখন স্প্যানিয়ার্ডরা গিয়েছিল, তখন কি তুমি তাদের কাছ থেকে ক্রশ কিনেছিলে?"

"না, স্যর।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।" স্ত্রীর দিকে বাঘের মত তাকালেন কাউণ্ট। "জিন!" চাকরকে ডাকলেন তিনি, "তুমি দেখবে যে আমার খাবার এখানে তোমার কর্ত্রীর ঘরে দেয়। তিনি অসুস্থ, সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এ ঘর ছেড়ে যেতে পারব না।"

হৃদয়হীন ভদ্রলোক সেই থেকে কুড়ি দিন বাস করলেন তাঁর স্ত্রীর ঘরে। প্রথম দিকে দেয়াল-গাঁথা-আলমারীর ভেতর থেকে যখন শব্দ উঠত আর জোসেফাইন করজোড়ে করুণা ভিক্ষা করতেন হতভাগ্য বিদেশী তরুণটির জন্য, কাউণ্ট নির্ভুল ভাবে জবাব দিতেন :

"তুমি ক্রশ হাতে নিয়ে শপথ করেছ,—ও-আলমারীর ভেতর কেউ নেই!"

অনুবাদিকা—শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল
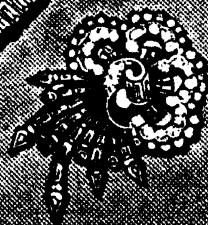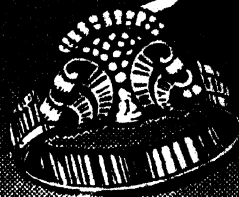
অলঙ্কারে আভিজাত্য
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪,১২৪।১, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ফোন: বি, বি, ১৭৬১
ব্রাঞ্চ- হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ
১০৩/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা
MBS

অশ্বশালা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নবাবী আমলটা ইতিহাসের পাতা খুঁজে বের করতে হয়। বিবর্ণ ঝরা পাতার মত তার জৌলুসটা এমনই নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছে। শিখা গেছে নিবে, কিন্তু প্রদীপের সলতেটা এখনও আছে।

পলাশীর কবরে তাই নবাবীর পরিসমাপ্তি ঘটলেও, নবাব-প্রাসাদের হাজার বাতায়ন-পথে আজও ভাগীরথীর গুঞ্জন ভেসে আসে। জগৎ শেঠের কুঠী ধনকুবেরের জাতটাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সব চাইতে বেশী আশ্চর্য্য মনে হয় যেটা, সেটা লালবাগের অশ্বশালা। পাথরের পাকা গাঁথুনীতে গড়া উঁচু-উঁচু দেয়ালগুলো ভারী অদ্ভুত মনে হয়। পাহাড়ের গুহার মত একটা পৌরুষ ফুটে ওঠে অত বড় বাড়িটার গায়ে।

হয়ত এর প্রয়োজন ছিল। হয়ত নবাবের সুপুষ্ট পেশী-ফোলান শত শত অশ্বকে বশ ক'রে বন্দী ক'রে রাখার জন্ত এর প্রয়োজন ছিল। হয়ত তেজীয়ান অশ্বের খুরের আঘাতে আগুনের যে ফুল্‌কী স্খলিত হ'ত, তাকে প্রশমিত করার জন্তও হয়ত প্রয়োজন হয়েছিল এমনি এক ভারী পাথরে-গড়া দুর্গ-প্রাকারের।

কিন্তু পলাশীর বহু যুগ পরে উনিশ-শ' পঞ্চাশ আসবে বলেই হয়ত এর সব চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল। তাই ঝড়ের মুখে যারা কুটোর মত ভেসে এল ভবিষ্যতের আশা নিয়ে, তাদের নির্ভয় আশ্রয় নিতে হ'ল পৌরুষ-মাখান অশ্বশালায়। ইতিহাসের সন্তান এরা, তাই বোধ হয় ইতিহাসের অতিথি হ'য়ে এল।

যেখানে নবাবের শত শত অশ্ব মুক্তি পাবার আশায় নিষ্ফল আক্রোশে খুরধ্বনিতে মুখরিত ক'রে তুলত, সেখানে আজ জেগে উঠেছে পাংশু, নিস্তেজ, ধুকধুকে প্রাণের ক্ষীণ ক্রন্দনের কোলাহল।

এরা উদ্বাস্তু।

বাস্তু ভিটের মায়া ছেড়ে, নদী-নালা শত বিপদ অতিক্রম করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্ত জলস্রোতের মত ছিটকে চ'লে এসেছে। নূতন ক'রে বাস্তু ভিটা গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এরা আশ্রয় নিয়েছে এই অশ্বশালায়।

ছোট-ছোট খুপরী শক্ত কাঠের পাটাতন দিয়ে ঘেরা। সেখানে প্রতি খুপরীতে একটি ক'রে তেজীয়ান অশ্বের স্থান সংকুলান হ'ত কোনক্রমে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে বড় একটা গোটা পরিবার কোন রকমে আব্রু বাঁচাবার জন্ত। আর ছোট হলে একাধিক পরিবার স্থান ক'রে নিয়েছে ঐটুকু খুপরীর মধ্যে। অত বড় অশ্বশালা গিজ-গিজ করে উদ্বাস্তুর ভীড়ে, তবু আশ্চর্য্য এই যে, প্রতি দিন যারা আসে তারা ফিরে যায় না। কি এক অভিনব উপায়ে যেন স্থান কুলিয়ে নেয়। বিপর্যায় মানুষকে এক ক'রে দেয়। তাই হয়ত এরা এমন মিলে-মিশে এক হ'য়ে গিয়েছে। ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীটা ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে মুছে গিয়েছে।

কিন্তু তাহ'লেও ভাগ্য ভাল পরেশের। ছোট তার সংসার—নিজে আর তার মেয়ে কামিনী। তবু গোটা একটা খুপরী তার দখলে। প্রথমে এসেই সে বেছে নিয়েছে খুপরীটা। তার পর আর কাউকে —— ঢুকতে দেয়নি সেখানে। প্রথম দু'চার জন চেষ্টা ক'রেছিল ওখানে

'এটা ভদ্রলোকের খুপরী। অন্ত জায়গায় দেখ।'

একটা মরচে-পড়া শিকল ঝুলত খুপরীর সামনে,—হয়ত কো[ন] দিন প্রয়োজন হ'ত অশ্বকে বেঁধে রাখার জন্ত। পরেশ সেটা ঝু[লিয়ে] দিয়ে গম্ভীর গলায় হাঁক দিত,—'কামিনী, আমার সিগ্রেটের বা[ক্স] আর দেশলাইটা দে ত!'

সিগ্রেট খায় যে বাবু তার সঙ্গে আর যাই হোক বিড়ি ফোঁ[কা] চলে না। কাজেই তারা ফিরে যায় অন্ত কোথাও ঠাঁই খুঁ[জে] নিতে।

শুধু সিগ্রেটই নয়। পরেশ সযত্নে তার বৈশিষ্ট্যটুকু বজা[য়] রেখে চলে,—চালে-চলনে, বেশে-কেশে ও ভাষায়। সকাল থে[কে] সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলোকে সযত্নে পরিপা[টি] ক'রে রাখে। গায়ের গেঞ্জীটা ময়লা হ'য়ে এলেও গায়েই থাকে[।] পায়ের চটিটা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও রেহাই পায় না কোন সম[য়।] একটা সিগ্রেট বার বার ধরিয়ে নেশার স্বাদ মেটায়। স্ত্রী ম[রে] গেছে বহু দিন আগে। আছে শুধু একটা রং-চটা ফোটো। [সে] আর পাঁচটা পুরোনো ক্যালেণ্ডারের ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে খু[পরীর] গাম্ভীর্য বজায় রাখে পরেশ।

অশ্বশালায় আর যারা আছে তাদের নোংরামিকে ধিক্কার [দি]য়ে কথায় কথায় শুনিয়ে দেয়,—'সাধে কি আর তোদের ছোটলো[ক] বলে। গরীব হ'লেই নোংরা হতে হবে? আরে ছ্যা-ছ্যা—'

সিগ্রেটের ধোঁয়ার সামনে বিড়ি-ফোঁকা চাষা-ভূষো[রা] অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। তবু ঝগড়া বেধে যায় এক[-এক] সময়। বিশেষ করে চান করার সময়। অত বড় বাড়িটায় এক[-]মাত্র চৌবাচ্চা। অশ্বের প্রয়োজনে জলধারা বইত আনা[চে-]কানাচে। আজ তা সবগুলিই অকেজো। ক্যাম্পের বাবুদের কা[ছে] জানালে বলে,—'দেখছি।'

কিন্তু দেখা আর হয় না। তাই দিনের পর দিন ভীড় লে[গে] আছে বড় চৌবাচ্চার কাছে। পুরুষ যারা, তারা ভাগীরথীর জ[লে] ডুব দিয়ে আসে, কিন্তু মেয়েরা অত দূর যায় না। তাই মেয়ে[দের] ভীড়টাই বেশী।

পরেশ নদীতে ডুব দিতে পারে না। কেউ বললে বলে—'শেষ কালে বুড়ো বয়সে অঘোরে প্রাণটা হারাই আর কি!' [মেয়েদের] ভীড়ও সহ্য হয় না, তাই কথা-কাটাকাটি প্রায়ই হয় অন্ত মেয়ে[দের] সঙ্গে।

সেদিন কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্ত রকম। কলতলায় ভী[ড়] তখনও কমেনি। জল-নেওয়া, বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা তখ[নও] চলছে। পরেশ কাপড়-কাচা এক টুকরো সাবান আর গামছা [হাতে] করে কলতলায় দাঁড়িয়ে মুখটা বিকৃত করে ব'লে উঠল,—'মেয়েগুলো,—সর, সর, স'রে দাঁড়া—চান করব আমি।'

অনেকেই উঠে দাঁড়াল, যেমন রোজ দাঁড়ায়, কিন্তু একটি [মেয়ে] বাসন মাজতে মাজতেই ব'লে উঠল,—'এঁ্যা,—ঘোড়াশালের [বাবু] এলেন দেখ।'

আশে-পাশে যারা ছিল তারা খিল-খিল ক'রে হেসে উ[ঠল।] পরেশ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—'কি যত-বড় মুখ নয় তত-বড় [কথা!] ছোটলোক কি আর সাধে বলে তোদের?'

ফাজিল মেয়েটা ঝাপ্‌টা দিয়ে ওঠে—'ছোটলোক ছোটলোক না বলছি। ইঃ,—বড়লোক এলেন দেখ। সেই জন্ত ——'

রাগে, অপমানে পরেশের মুখটা টকটকে হ'য়ে উঠল,—'মুখ সামলে কথা বল, মাগী।'

আশে পাশে পুরুষ যারা ছিল, তারা আর যাই হোক এত বড় অপমান হজম করতে রাজী নয়। একসঙ্গে জন পনের লোক মারমুখো হ'য়ে ছুটে এল। পরেশের মুখটা শুকিয়ে গেল এক নিমেষে। থতমত খেয়ে ব'লে উঠল,—'কি,—কি,—মারবি না কি ?'

'মারব মানে ? মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে থোব।' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

কামিনী খুপরীর এক পাশে ব'সে বাবার জন্য রান্না করছিল। গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এল,—লোকগুলোর সামনে দাড়িয়ে উৎকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল,—'আমার বাবাকে মারবেন না আপনারা!'

থমকে দাঁড়াল সবাই। মুখরা মেয়েটি ব'লে উঠল,—'আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিক তবে।'

পরেশ ব'লে উঠল,—'কি, ক্ষমা চাইব আমি! আমি—'

'বাবা!' তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয় কামিনী। ছুটে যায় মেয়েটির কাছে। হাত দু'টো ধ'রে অনুনয় ক'রে বলে—'উনি তোমার বাবার বয়সী,—ক্ষমা চাইতে হয় আমি আমার বাবার হ'য়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, ভাই!'

'কখ্খনো না,—কামিনী!'—পরেশ চেঁচিয়ে ওঠে।

কামিনী ধমক দেয়,—'বাবা!' মেয়েটিকে আবার বলে,— 'বল, ক্ষমা করলে!'

'আচ্ছা, যাও! তোমার জন্যই বেঁচে গেল,—'

কামিনী জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় পরেশকে খুপরীর দিকে। কামিনীর মুখটা শিশিরবিন্দুর মত টলমল করছিল, ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়। খুপরীর কাছে এসে কামিনী ভেঙ্গে পড়ল,—'আর যদি কখনও তুমি এদের সঙ্গে এমনি ক'রে কথা বল, সত্যি বলছি, বাবা,—গঙ্গায় ডুবে আমি মরব।'

'কেন ওই ছোটলোকগুলোকে—'

কামিনী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে,—'ছোটলোক ছোটলোক বোলো না বাবা! ওই বলতে বলতে আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি তা' ভেবে দেখেছ। তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না, এটা তোমার সোনার দেশের ভিটে নয়,—এটা আস্তাবল। শরণার্থী আমরা।'

পরেশ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল কামিনীর মুখের দিকে। শান্তশিষ্ট বিণী মেয়েটি হঠাৎ মুখরা হ'য়ে উঠল কি ক'রে! ভেবেই পেল না পরেশ।

উত্তেজনায় আবেগে হাঁপাচ্ছিল কামিনী। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ডাক দিল,—'নাও, খাবে এস, বাবা।'

'না, খাব না—যা!' অভিমানে উত্তর দিল পরেশ।

'ও-বেলা থেকে আর খেতেও হবে না। সবই ত' শেষ হ'য়েছে।'

'কামিনী, তুই বড্ড কথা ব'লতে শিখেছিস্।'

চাপা-গলায় কামিনী ব'লে ওঠে,—'চেঁচিও না, বাবা। তাতে আমাদের আসল অবস্থাটা আরও বেশী জানাজানি হয়ে যাবে।'

'হয় হবে।' ব'লে সভয়ে চার দিকে এক বার তাকিয়ে পরেশ চুপ হ'য়ে গেল।

চুপ না ক'রে উপায়ই বা কি! কামিনী আর অবস্থার কথা কতটুকু জানে। জানে সে নিজে, কেমন ক'রে সে দিন চালাচ্ছে। কিন্তু কি তার ছিল না। ছিল—ছিল—তারও দিন ছিল। ছিল তার সোনালী ধানে-ভরা গোলা,—ছিল তার কালো একটা গাই, যার নাম দিয়েছিল 'কালিন্দী', ছিল তার ক্ষেত-ভরা শস্য, ছিল তার সিন্দুক-ভরা সোনা-দানা। কিন্তু আজ? আজ তার কি-ই বা আছে। কোথা থেকে যে কি হ'য়ে গেল, কিছুই বোঝা গেল না। ভানুমতী খেলার মত ফুৎকারে সব মিলিয়ে গেল কোথায়। দু'টো চারটে জিনিষ-পত্তর, আর অল্প কিছু সোনা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল আসার সময়,—তাই দিয়ে চলেছে এত দিন। কিন্তু হাতের আংটিটা ছাড়া আর কিছুই আজ নেই যা দিয়ে সে মাথা উঁচু রাখতে পারবে। আরও দু'-চারটে দিন হয়ত সে চালিয়ে নিতে পারবে আংটি-বেচা পয়সা দিয়ে, কিন্তু তার পর? তার পর ত খেতে হবে আর সকলের মত ভিক্ষে-পাওয়া মোটা কাঁকর দেওয়া ভাত আর কলমি শাকের ঝোল? তখন?

দুপুরের রোদটা তির্য্যক ভাবে উঠোনে এসে পড়েছে। পাথরে-বাঁধা থামগুলোতে রোদের স্পর্শ লেগেছে। সেই দিকে তাকিয়ে পরেশের চোখ দু'টো জ্বালা ক'রে উঠল।

হঠাৎ পায়ের উপর একটা নরম স্পর্শ অনুভব করল পরেশ। চমকে তাকিয়ে দেখে কামিনী। পায়ে হাত রেখে মিনতি করছে,—'আর বলব না,—খাবে এস, বাবা!'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। বললে,—'চ'।'

• • • •

বহু দিন পর পরেশ আবার খুপরী ছেড়ে বাইরে বেরুল। কামিনী বুঝল। শেষ সম্বল বাবার হাতের আংটিটাও আজ স্যাকরার দোকানে বাঁধা পড়বে। ফেরৎ আর কোন দিনই আসবে না। কিন্তু তার পর? তার পরের কথাটাই ভাবল কামিনী। ভাবতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না। চার দিকে চোখ চাইলেই দেখা যায়। অনুগ্রহের দেওয়া মোটা চালের ফ্যান-মেশান ভাত আর হয়ত একটু নুন! বাবার কথাটা ভাবতে গিয়েই চোখে জল চ'লে আসে কামিনীর। কোন দিন মুখে দেওয়া ত দূরের কথা কোন লোক যে তা খেতে পারে তা-ও ত ভাবতে শেখেনি। কিন্তু ভাগ্যে যখন সেটাই সত্য রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে, তখন সেটার সঙ্গে আগে থাকতেই পরিচয় থাকা ভাল। সহ্য করাও ত শিখতে হয়।

কামিনী ধীরে-ধীরে গিয়ে মেয়েদের লাইন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন দিন দাঁড়ায়নি এখানে। প্রতিদিন এমনি ক'রেই ক্যাম্পের আপিস থেকে সবাই চাল নেয়, এটাই সে দূর থেকে দেখে এসেছে। ভিক্ষের আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু অসহ্য জ্বালা এই লাইনে দাঁড়ান, কামিনী ভেবেই পেল না এতগুলো লোক প্রতিদিন তা সহ্য করে কি ক'রে। কামিনীর মনে হ'ল, সবাই যেন তার লাইনে দাঁড়ানটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য করছে। মুখরা মেয়েটি ত ব'লেই ফেলল,—সে কি গো, বড়লোকের মেয়ে দাঁড়ায় যে!'

চাপা-হাসির গুঞ্জন উঠল। কামিনীর মনে হ'ল, তার চোখে-মুখে-কানে কে যেন হঠাৎ এক মুঠো জ্বলন্ত আগুন ফেলে দিয়ে মজা দেখছে। সহ্য করতে পারল না কামিনী! ছুটে বেরিয়ে গেল লাইন থেকে। যেন পালিয়ে বাঁচল। চাল নেওয়া হ'ল না।

কিন্তু এত দিনকার সযত্নে রক্ষিত পার্থক্যটুকু কোথায় যেন এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। উদ্বাস্তুদের মুখে-মুখে রটল কথাটা, গুঞ্জন থেকে উঠল কোলাহলে। পরেশের কানে কথাটা যেতে এতটুকু দেরী হ'ল না। আংটি-বেচা টাকায় একরাশ বাজার হাতে ক্যাম্পে ঢুকতেই টুকরো-টুকরো কথা স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল তার চার দিকে।

খুপরীতে ঢুকে বাজারটা এক পাশে নামিয়ে পরেশ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কামিনীর অবনত মুখটার দিকে।

কামিনীর বুকটা কেঁপে উঠল। কারণ চোখ তুলে না দেখলেও বেশ বুঝতে পারে কামিনী। বোমা ফাটল ব'লে। কিন্তু কামিনীও প্রস্তুত হ'য়ে রইল।

পরেশ গম্ভীর গলায় থাকল,—'কামিনী!'

কামিনী উত্তর দিল না।

অস্থির হ'য়ে পরেশ ব'লে উঠল,—'কী, কানে কথা যাচ্ছে?'

মুখ না তুলেই ধীর ভাবে কামিনী জবাব দিল,—'কি বলবে বল না,—শুনছি ত।'

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল পরেশ,—'কেন তুই লাইনে দাঁড়িয়েছিলি?'

এবার মুখ তুলে তাকাল কামিনী, চোখ দু'টো কেমন যেন জ্বলছে,—কিন্তু চাপা-গলায়ই বললে,—'দু'দিন পরে ত দাঁড়াতেই হবে, তাই অভ্যেস করছিলাম।'

পরেশ চোখ-মুখ লাল ক'রে কী যেন একটা কঠিন কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল। ক্যাম্প আপিসে ভলান্টিয়ারদের নেতা, তরুণ যুবক অসিত এসে জিগ্যেস করল,—'চাল না নিয়েই যে চ'লে এলে, কামিনী?'

বারুদ জ্বলে উঠতে দেরী হ'ল না। পরেশ ফেটে পড়ল,—'বেশ ক'রেছে। চলে যাও—যাও এখান থেকে। আবার বাড়ি বয়ে অপমান করতে এসেছ!'

অসিত থতমত খেয়ে গেল,—'সে কি?'

কামিনী তাড়াতাড়ি উঠে এসে পরেশের সামনে দাঁড়াল,—'বাবা, কি বলছ তুমি,—'

'তুই থাম, কামিনী—ঠিকই বলছি আমি। চ'লে যাও তুমি,—চাল আমার দরকার নেই—'

'বাবা!'—কঠিন কণ্ঠে ব'লে উঠল কামিনী,—'আমার চালের দরকার আছে। দিন, অসিতদা।'—ব'লে কামিনী তার আঁচলটা মেলে ধরল অসিতের সামনে।

অসিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল,—'না, থাক্ কামিনী, তোমার বাবার যখন আপত্তি,—তাছাড়া চালের যখন দরকার নেই তখন এ-চালটা আর এক জনের কাজে লাগতে পারে ত। যখন তোমার দরকার হবে চেয়ে নিও।'

অসিত চ'লে গেল। পরেশ গুম হ'য়ে ভিতরে গিয়ে ব'সে রইল। কামিনী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সোজা চ'লে গেল গঙ্গার ধারে।

• • • •

অসিতের কাছে কামিনী এক দিন গল্প শুনেছিল এই অশ্বশালা সম্বন্ধে। রূপকথার মত মনে হয়েছিল সে কাহিনী। শুনেছিল, [illegible] ক'রে শ্বেতকায় এক অশ্ব দুরন্ত গতিতে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল অশ্বশালার বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে। সে অশ্বের আরোহী ছিল অপূর্ব সুন্দর জ্যোতির্ময় পুরুষ। তার দেহে ছিল চকচকে কিংখাপের মেরজাই, পায়ে ছিল রূপোলী নাগরাই, মাথায় ছিল হীরক-খচিত শিরস্ত্রাণ, কোমরে ছিল বাঁকা তলোয়ার, চোখে ছিল বিদ্যুৎ। কে সে? কার সে অশ্ব?—কেউ ব'লতে পারেনি, কারণ সেই অশ্ব ছিল না সেখানে। কিন্তু সবাই বলে—দেখেছে তাকে তীব্র গতিতে ছুটে যেতে। মনে হ'য়েছে, হয়ত চ'লে গেছে [illegible] দেশে। ফিরতে কেউ দেখেনি, কিন্তু পরদিন প্রভাতের আলোয় দেখা গেল অশ্বশালার প্রাঙ্গণে রক্তের ছাপ আর বহু অশ্বের মৃতদেহ। সেই থেকে অনেকে না কি বিশ্বাস করে, ওখানে অশরীরী আত্মা অতৃপ্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। কার রক্ত সে চায়, কেউ জানে না।

• • • •

গল্পটা আজ বহু বার মনে হয়েছে কামিনীর। কেন, কে জানে। গঙ্গার ধারে মন্দিরের চত্বরটায় সারা দিন ব'সে কাটিয়েছে কামিনী অশান্ত হৃদয়ে অসংখ্য গঞ্জনা গুঞ্জন করছিল। পিতার আভিজাত্য আর দৈন্যের তাড়না, এ যে কত বড় বিপর্যয় কামিনীর বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

তাই ক্যাম্পে ফেরার সময় কামিনী ঢুকে পড়ল আপিস-ঘরে। অসিত একাই ছিল সে ঘরে। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, তাই কামিনী ভাবছিল, ঘরে ঢুকবে কি না। কিন্তু ওকে দেখেই অসিত ডাকল 'কামিনী, —এস, এস, কামিনী! কি ব্যাপার, সারা দিন ছিলে কোথায়?'

'মন্দিরের চত্বরে।'

'কিন্তু ব'লে যেতে ত হয়। সেই সকালে বেরিয়েছ, অথচ তোমার বাবাকে কিছু ব'লে যাওনি। তিনি অস্থির হ'য়ে তোমায় খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন।'

'তার মানে, তাঁকে খুঁজতে আবার আমায় বেরোতে হবে ত' মৃদু হেসে বলল কামিনী।

অসিত হেসে বলল,—'না, ব'লে গেছেন একটু পরেই ফিরবেন কিন্তু মুখ দেখে ত মনে হচ্ছে তোমার আজ খাওয়া হয়নি কিছু।'

'সে জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম যে আমায় যদি একটা বাড়ির কাজ যোগাড় ক'রে দেন ত ভাল হয়।'

অসিত অবাক হ'য়ে বলে,—'বাড়ির কাজ? মানে, চাকরী?'

'হ্যাঁ!'

ভবিষ্যতের আশংকায় খুবই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছ দেখছি।'

'সত্যিই তাই। জানেন ত',—

'জানি। কিন্তু তোমার বাবা কি সহ্য করবেন তোমার চাকরী করা

'করতেই হবে সহ্য। নইলে কোন্ দিন যে চোরাবালি তলিয়ে যাবেন, টেরও পাবেন না।'

কামিনী বেশ কথা বলতে পারে। অসিতের ভারী অদ্ভুত মনে এই মেয়েটিকে। সুন্দরী সে নয়, কিন্তু এমন একটা আকর্ষণ আছে মুখে যা ভাল লাগতেই হবে। তাই অসিতের কষ্ট হয় ভাবতে কামিনীকে চাকরী করতে হবে। [illegible] ত তেরশ' পঞ্চাশ দেখেছে, [illegible] উনিশ-শ' পঞ্চাশ যা নিয়ে এল, তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় [illegible] অসিত পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে, বিপর্যয় মানুষকে কত [illegible] টেনে নিয়ে যেতে পারে। টাকার প্রয়োজনে, খাদ্য-সংস্থানের প্র[illegible] [illegible]—সব পারে। [illegible]নকে বিলিয়েও দিতে পা[illegible]

তাই ধীরে-ধীরে অজিত ব'লে উঠল,—'যেদিন চোরাবালি পায়ের চে গজিয়ে উঠবে, সেদিন তোমায় ব'লে দিলাম কামিনী, সোজা লে যাবে ইষ্টিশনের কাছে আমাদের বাড়িতে আমার মা'র কাছে। াশ্রয় তুমি পাবেই। কিন্তু তার আগে অবস্থাকে মানিয়ে বার চেষ্টা কোরো, নইলে বিপর্য্যয় ঘটবেই!'

অসিত বাড়ি চ'লে গেল।

* * * *

কামিনী অনেক ভেবেছে। ভেবেছে কী ক'রে তার বাবাকে াবে যে, অবস্থাকে মেনে চলতে হবে। জীবনে আপোষ ক'রেই তে হয়। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কতটুকু যে সে আজ তার বাকে বাঁচতে শেখার পথ ব'লে দিতে পারবে। তবু পরেশকে চাতেই হবে ধ্বংসের হাত থেকে। ধ্বংস নয় ত কি? অবস্থাকে পেক্ষা ক'রে বাঁচা যায় না। উপেক্ষা করতে গেলে ঋণের বোঝাই ধু বাড়বে। পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাবে না।

সে-কথাটাই কামিনী আজ পরেশকে ব'লবে ঠিক করেছে।

অসিত ঠিকই বলেছে। কামিনীর কেন যেন মনে হয় কী যেন রিবর্ত্তন এসেছে পরেশের মানসিক পটভূমিকায়। কী যেন গোপন রতে চায় পরেশ কামিনীর কাছ থেকে। মেয়ের দিকে চোখ তুলে থা বলতে কেমন যেন একটা সংকোচ আর দ্বিধা এসে পরেশকে ড়িয়ে ধরে। তাছাড়া আরও বেশী আশ্চর্য্য মনে হয় কামিনীর যে, ুটি-বেচা টাকায় এত দিন চলছে কি করে! আগে ছোট-খাট পচয়ের জন্য কত তিরস্কারই না সহ্য করতে হয়েছে তার বাবার াছে। কিন্তু আজকাল যেন আর তা গ্রাহ্যই করে না। একটা জানা অস্বস্তিতে কেমন যেন কামিনীর মনটা ভরে ওঠে। পরেশ ত্যিই বদলে গিয়েছে। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাত কত ঠিক নেই। হঠাৎ কামিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের মোটা তুটো থামের মাঝখানে কালো একটা ছায়া। কামিনী য়ে কাঠ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল সে ছায়াটা রেশের। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্না-প্লাবিত াকাশের দিকে।

বাবার অশান্ত চিত্তের বেদনায় কামিনীর মনটা ব্যথায় ভরে ল। বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে পরেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কল,—'বাবা!'

ভীষণ চমকে উঠল পরেশ। হঠাৎ কিছু বলতে পারল না। মিনী আবার ডাকল—'শোবে চল, বাবা।'

পরেশ অনেকটা সহজ ভাবেই বলল,—'ঘুম আসছে না।'

'এত চিন্তা করলে কখনও ঘুম আসে?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে পরেশ তাকাল মেয়ের দিকে, কিছু বোঝা গেল ।

'তুই কি করে জানলি যে আমি কি চিন্তা করছি?'

'তা জানি না, কিন্তু ক'দিন থেকেই যে কি একটা ভাবছ সেটা ত কষ্ট হয় না, বাবা।'

পরেশ হঠাৎ কিছু বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে-বলল,—'কি আমার চিন্তা, জানিস কামিনী?'

'কি?'

আমার এত ভাবনা হ'ত না। বিশ্বাস কর কামিনী, আমি আজ অনেক নীচে তলিয়ে গেছি,—শুধু তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস। বল, কামিনী, আমার কথা তুই রাখবি।'

কামিনী কিছুই বুঝতে পারল না।—'তোমার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা।'

'বলছি, শোন।'

পরেশ কামিনীকে ডেকে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। ক্ষিপ্তের মত জামার পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের ক'রে কামিনীর চোখের সামনে তুলে ধ'রে বলে,—'টাকা ধার নিয়েছি আমি কিন্তু কোন দিন শোধ দিতে হবে না এ-টাকা, যদি তুই আমার কথা মত বিয়ে করতে রাজী—'

'বাবা!'—বিমূঢ়ের মত কামিনী যেন আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। 'তুমি আমায় বিক্রী ক'রে দিতে চাও, বাবা!'

'না, না—বিক্রী নয়,—যেমন বিয়ে হয়,—মানে,—বল, বল কামিনী, তোর মত আছে।'

অসহ্য বেদনায় কামিনীর মনটা মুচড়ে ওঠে। কোন রকমে বলে, —'আজ রাতটা ভাবতে দাও, বাবা।'

'বেশ, বেশ তাই হবে।'

পরেশ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে চলে যায়।

কামিনী ঘুমোতে পারে না। চোখ দু'টো জ্বালা করতে থাকে। চোরাবালিটা কখন যে হঠাৎ পায়ের নীচে এসে ঠেকেছে টেরই পায়নি যেন। আজ হঠাৎ তারই মর্ম্মান্তিক অনুভূতি!

বাইরের জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে মনে হয় কামিনীর হঠাৎ যেন অশ্বশালার শ্বেত অশ্ব আবার জেগে উঠেছে। ঠিক তেমনি যেন ছুটে চ'লে যাবে আকাশ-পথে জ্যোৎস্নালোকের দিকে। কিন্তু কোথায় সে ঘোড়সওয়ার, যার কোমরে ঝুলবে বাঁকা তলোয়ার, গায়ে কিংখাপের মেরজাই, মাথায় হীরকখচিত শিরস্ত্রাণ? কোথায় সে?

চুপি-চুপি অতি সন্তর্পণে কামিনী বেরিয়ে যায় ক্যাম্প থেকে বাইরেই একটা ছোট ছেলে ঘুমোচ্ছিল। কামিনী চেনে ওটাকে।

'এই ছোঁড়া,—এই!'—কামিনী চাপা-গলায় ডেকে তোলে ছেলেটাকে,—'এই, ওঠ না।'

ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে হকচকিয়ে যায় ছেলেটা।

'সে কি! কামিনীদি···'

'চুপ। চল আমার সঙ্গে।' কামিনী শক্ত ক'রে চেপে ধরে ছেলের হাতটা।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করে,—'কোথায়? মন্দিরের চত্বরে?'

'না। ইসটিসানে।'

ছেলেটা একবার কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'চল্ না।' অসহ্য হ'য়ে বলে কামিনী।

'বেশ, চল।' খুসী হ'য়ে বলে ছেলেটা।

ছেলেটার হাত ধ'রে কামিনী দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় লালবাগের লাল সুরকীর রাস্তা ধরে ইসটিশনের দিকে।

কাক-জ্যোৎস্নার রাত। এমনি এক রাতেই কি জেগে উঠেছিল শ্বেত অশ্ব? শত-শত অশ্বের খুর-ধ্বনি শতাব্দীর কবর ভেদ ক'রে আবার কি জেগে উঠল অশ্বশালায়?

শ্ল্যুইস্ গেট

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নামে ও রূপে এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। গ্রামের নাম জঙ্গপল্লী। কথিত আছে, এই গ্রামে এমন বন ছিল যে, দিনমানেও বাঘ বাহির হইত। পথে এত কাদা হইত যে, বর্ষাকালে দৈবাৎ রাজার হাতী আসিয়া পড়িয়া সেখানেই প্রোথিত, পরে সমাধিস্থ হইয়াছিল। গান্ধীর অহিংস সৈনিকগণ বন কাটিয়া সাফ করিয়াছে; পোড়ো বাড়ীর ভাঙ্গা ইট ও রাবিস ঢালিয়া খট্‌খটে রাস্তা বানাইয়াছে। শুনা যায়, অহিংস হইলেও নেকড়ে বিনাশে হিংসার আশ্রয় লইতে তাহারা দ্বিধা করে নাই। গ্রামের প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীলগণ ইহাতে খুশী ছিল না। কলহ-বিবাদ হইলেই তাহারা নীতি ত্যাগের কথা মহাত্মা গান্ধীর গোচর করিবার ভয় দেখাইত। গান্ধীবাদী প্রগতিপন্থীরা গ্রামের আচণ্ডাল হাড়ি-মুচি-ডোম-বাগদি-বাউরীকে কাল দিয়া আপন করিয়া লইলেও রক্ষণশীলদের হাত করিতে পারে নাই। একটা আড়াআড়ি বৈরিভাব কখনও পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত সূক্ষ্ম ধারে, কখনও বা বর্ষার বেগবতী স্রোতস্বতীর মত আবর্ত্ত তুলিয়া প্রবাহিত হইত। প্রফুল্ল অন্য কাজ প্রায় হারাগারি করিয়া আনিয়া এই কণ্টক-বন মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গল্পারম্ভ সেইখানে।

সন্ধ্যা রাত্রি পল্লীগ্রামে মধ্য-রাত্রি। বাঘ গিয়াছে কিন্তু ভয় যায় নাই। লোকে বাড়ীর বাহির হয় না। বাড়ীতে কাজ-কর্ম্মের অভাব; তাই সময় নষ্ট না করিয়া সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিছানা আশ্রয় করে। ঘুম আসিতে বিলম্ব হয় না; অচিরে নাসিকা-ধ্বনি উত্থিত হয়। বনে ঝিঁঝি ও গ্রামঘরে নাসা-গর্জ্জন সন্ধ্যা-রাত্রিকেও গভীর, গম্ভীর ও ভীষণ করিয়া তুলে। প্রফুল্ল তাহার ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া চরকায় সূতা তুলিতেছিল। অক্ষয়লাল শশব্যস্তে আসিয়া কহিল, প্রফুল্লদা', যা শুনছি, তা সত্যি? আমি কি ক'রে জানবো ভাই"—বলিয়া প্রফুল্ল নিবিষ্ট দৃষ্টিতে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক-এক করিয়া গ্রামের অনেকগুলি লোকের আগমন ঘটিল। খুব বেশী ভয় না পাইলে অথবা যম বা যমের দোসরের আহ্বান না আসিলে এ সময়ে কেহ ঘরের বাহির হয় না। আজ হইয়াছে, কারণ বড্ডই ভয় হইয়াছে।

অবিনাশ ভস্চাশ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া প্রফুল্লকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, প্রফুল্ল, ভাই, দারোগা ওয়ারেন নিয়ে আসছে কলুষ-বে! তোকে ধরতে আসছে, সত্যি?

প্রফুল্ল বলিল, হতেও পারে।

অবিনাশ বলিল, তুই কেন পালা না, ভাই।

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "পালাইতে পথ নাই। যম আছে পাছে।"

দাশরথি সরকার বলিল, প্রফুল্লদা', দারুকেশ্বরের বনে লুকিয়ে থাকলে পুলিশের বাপ-ঠাকুর্দ্দাও খুঁজে পাবে না।

তিন-চার জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তাই কেন কর না দাদা?

প্রফুল্ল বলিল, আমাদের যে পালাতে মানা আছে, ভাই। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, ধরা দোব, পালাব না; মার খাব, মারব না; অত্যাচার সহ্য করব, গায়ে হাত তুলবো না; কষ্ট করব, কষ্ট দোব না।

তাহারা বলিল, আমরা দারোগাকে ধ'রে দারুকেশ্বরের চড়ায় পুঁতে রাখব; তোমাকে গ্রেপ্তার করতে দোব না।

আমি যে তাঁর আসা-পথ চেয়ে ব'সে আছি, ভাই!—বলিয়া প্রফুল্ল তাহার চরকা, সূতা, তুলার পাঁজগুলা গুছাইয়া লইতে লাগিল।

নিরাপদ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল, দারোগা কামিনী বষ্টুমীর দোকানে ব'সে জিলিপি খাচ্ছে; সঙ্গে দু'জন কনেষ্টবল, তারা দই-চিঁড়ের ফলার মাখছে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অবিনাশ আবার প্রফুল্লকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-গদগদ স্বরে বলিলেন, প্রফুল্ল, তুই গেলে আমার শ্ল্যুইস্ গেটের কি হবে ভাই?

প্রফুল্ল বলিল, কেন দাদা, টাকা ত তুলে দিয়েছি। তুমি কাজ চালিয়ে যাও।

আর কাজ চালিয়ে যাও!

ভয় পাচ্ছ কেন দাদা! এই সেদিনও সাত হাজার টাকা এনে দিয়েছি তোমাকে; সে টাকা তোমার হাতেই রয়েছে। তা' ছাড়া পোষ কিস্তির পরে অমরের কাছে গেলেই সে আরও হাজার টাকা দেবে, তোমার সামনে বলেছে; চোর কিস্তির খাজনা দেওয়ার পর তারক মুখুজ্জের কাছ থেকেও পাঁচশ' পাবে।

অবিনাশ ছোট ছেলের মত ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, ওরে ভাই, সে সবই জানি। তোর ভরসাই ভরসা। নইলে আমার সাধ্যি ছিল, ঐ অত্তো বড় কাজে হাত দিই? আমার যা পুঁজি-পাটা, সে ত প্রথম দু'-তিন মাসেই ফুটকড়াই হ'য়ে গেছল। তার পর থেকেই তুই! যখন যা দরকার পড়েছে, যখন যত টাকা চেয়েছি, সবই তুই জুগিয়েছিস্—

প্রফুল্ল বাধা দিয়া বলিল, দোহাই দাদা, ও-কথা বল না। আমার এই হাতে-কাটা সূতোর নেংটিখানি সম্বল, আমি জোগাব কোথা থেকে? জুগিয়েছে দারুকেশ্বর মহকুমার দাতা সজ্জনেরা। এত দিন তাঁরাই দিয়েছেন, পরেও তাঁরাই দেবেন। যেমন-তেমন ক'রে বিশ-বাইশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে; দরকার হলে আর চার-পাঁচ হাজারও পাওয়া যাবে। তুমি ত বলেছ, তার বেশী লাগবে না।

অবিনাশ বলিল, না, আর বেশী লাগবে না। উত্তর দিকের বাঁধ ত প্রায় হ'য়েই গেছে; বাকী দক্ষিণ দিকটা। মনে হচ্ছে ঐ টাকাতেই হয়ে যাবে। তুইও ত পরশু সব দেখে এলি! তাই মনে হয় না?

প্রফুল্ল সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, কিন্তু, দাদা, আমরা যত যাই বলি আর যাই করি, শ্ল্যুইস্ গেট-টে সম্বন্ধে আমরা আনাড়ি বই কিছুই নয়। তোমার যা-ই দুর্জ্জয় সাহস আর অদ্ভুত মনের জোর, কোন ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শ না নিয়েই ঐ রকম একটা বৃহৎ কাজে হাত দিতে তুমি পেরেছ, আমি হ'লে কিছুতেই ভরসা করতুম না। আমাদের মত গোলা লোক সাহস ক'রে ঐ রকম একটা বিশেষ সূক্ষ্ম শিল্পকাজ করতে নেমেছে, সত্যি কথা বলতে কি, এ আমি শুনিওনি। ধন্য তুমি; আর ধন্য তোমার সাহস!

তুই শুধু আশীর্ব্বাদ করিস, প্রফুল্ল, আমি আর কিছু চাই নে। আসছে বছর থেকেই দেখবি দশখানা গ্রামের মাঠে সোনা

...বে। পাগলা পাক্কের পাগলা বান যদি ঠেকাতে পারি ...মাদের ঐ গেট দিয়ে, তাহ'লে, ভাই রে, তল্লাটের শ্রী ফিরে যাবে। ...মাম মহকুমা বলবে মহাত্মা গান্ধীর সার্থক শিষ্য প্রফুল্ল এসে ...মের উন্নতিতে হাত দিয়েছিল। শ্মশানের চেহারা ফিরিয়ে ...য়ে গেছে।

প্রফুল্ল বলিল, স্লুইস্ গেট করলে তুমি : আর লোকে নাম যশ ...বে আমার ? বা রে তোমার লোক !

বা রে, নয়, বা রে নয় ! গ্রাম জাগালে কে রে ? বন ...টে বসতি বসালে কে রে ? দশখানা গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় করলে ...ক রে ? পচা পুকুরে পদ্ম ফোটালে কে রে ? এক-হাঁটু কাদার ...থেকে পাথর-বাঁধানো রাস্তা বানালে কে ? মাতালে কে ? ...রাকে বাঁচালে কে ?' এই অবিনাশ ভশ্চাযি খেত-দেত, ...াশি বাজাত, তাঁকে নাচালে কে রে ?

হঠাৎ অনেকগুলি পদশব্দে অবিনাশের বাক্য-স্রোতে বাধা ...াইয়া থামিয়া গেল। সকলেই ভয়চকিত নিঃশব্দ ভাষায় "ঐ ...ল" বলিয়া প্রফুল্লদা'র পানে চাহিল। প্রফুল্লও এক বার মাত্র ...কিত দৃষ্টির দ্বারা গাঢ় অন্ধকারের মর্ম্মভেদের বৃথা চেষ্টা করিয়া ...াবার আগের মতই সহজ ভাব ধারণ করিল।

"সেন মশাই কই গো ?" বাহির হইতে প্রশ্ন উপিত হইল। ...ক প্রশ্ন করিল, তাহা বুঝিতে বালকেরও বিলম্ব হইল না। ঘরের ...ধ্য দিয়া এদিক দিয়া ঢুকিয়া, ওদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে ...কটা দমকা হাওয়ার যেটুকু সময় লাগে এবং যেটুকু শিহরণ ...াগে, দারোগার জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কেবল ততটুকু চাঞ্চল্যই ...খা গিয়াছিল। কারণ, এই প্রফুল্লদা'কে আরও কত বার এই ...াবে যাইতে তাহারাও দেখিয়াছে ; আবার সুস্থ দেহে তাহাদের ...ধ্যে ফিরিয়া আসিতেও দেখিয়াছে। প্রিয়জন-বিচ্ছেদের বেদনা ...ই এ কথা আমি বলিতেছি না ; তবে তদধিক ভীতিবিহ্বলতা ...াহাদের হয় নাই ; কিন্তু অবিনাশ একেবারে মড়া কান্না জুড়িয়া ...লেন। যেন পুলিশকে ধরা দিতে দিবেন না, এই ভাবে প্রফুল্লকে ...ালিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিলেন, ও ভাই প্রফুল্ল, আমার স্লুইস গেট ...ক তবে হবে না ভাই ? আমার এত আশা-ভরসা সব কি বৃথায় ...বে রে ? ওরে, আমি যে লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে পারব ...রে ! লোকে যে আমার পেছনে-পেছনে হাততালি দিয়ে ...ড়াবে রে ! বিশেষ, ঐ ওরা !

তাঁহার রকম দেখিয়া ঘরশুদ্ধ লোক এ সময়েও হাস্য সম্বরণ ...রিতে পারিতেছিল না ; কিন্তু প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিল, ...ক ছেলেমানসী করছ, অবিনাশদা' ? তোমার স্লুইস গেট কি ...ামি আমার শ্বশুরের খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি যে, তোমার পুত্রশোক ...থলে উঠছে ? টাকার ব্যবস্থা করা রইল, তুমি রইলে, তোমার ...টও রইল—স্লুইস না হবার ত কোন কারণ দেখি নে।

ঐ যে ভাই, তুই বললি ইঞ্জিনীয়ারিং জব গোলা লোকে না ...ত দেওয়াই ভাল।

সে কথা একশ' বার। আমরা ও-সবের কি জানি ? কি ...ক বুঝি ? সেই জন্যে এখনও বলছি, যদি পার এক জন ...জিনীয়ারকে এনে দেখিয়ে নিও। এ কি আমাদের নৈশ ...দ্যালয় করা, না, এঁদো পুষ্করিণী-সংস্কার, না, চরকার সূত্রযজ্ঞ—

অবিনাশ মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিলেন, ঘোড়ার ডিম বিদ্যে আছে বেটাদের। কেবল নাক সেঁটকাতেই জানে। আমাদের মনিষ্যি বলেই গণ্য করে না—তা দেখবে কি !

প্রফুল্ল বলিলেন, দারোগা সাহেবের ঘোড়া বাঁধা হয়ে গেল বোধ হয়—ঐ যে আসছেন। তার আগে তোমরা সকলে শোন ভাই, একটা কাজের ভার বুঝিয়ে দিয়ে যাই। আজই সকালে কেন্দ্র থেকে খবর এসেছে, মাদক নিবারণী ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এদিকে অন্য মাদক দ্রব্য নেই বলা যায় ; থাকবার মধ্যে তাড়ি। ভাই সব, তাড়ি বন্ধ কর। জেনো, মহাত্মার কাছে চরকা যেমন, এ'ও তেমন। কি করতে হবে-না-হবে সব আমি লিখে আমার মন-গড়া একটা কমিটি ছকে ঐ বাক্সে রেখে দিয়েছি। ভেবেছিলুম কাল বিকালে বুড়শিবতলায় ব'সে সকলে আলোচনা করব। সে সময় ত আর হোল না ভাই ; এখন সব ভার তোমাদের ওপর। দেখ, দারুকেশ্বর যেন মহাত্মার মনোদুঃখের কারণ না হয়।

কিন্তু আমি যে মনোদুঃখ না দিয়ে পারছি নে, প্রফুল্ল বাবু !—বলিয়া দারোগা বাবু ঘরে ঢুকিলেন। অন্ধকারে শ্বাপদ জন্তুর চোখ হইতে যেমন অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়, ঘরের লোকগুলার চোখগুলাও তেমনই ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কথিত আছে, এই দারুকেশ্বরে দ্বাদশ দারোগা জীবন্ত সমাধিস্থ হইয়াছে। দারোগা কেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেও এই গ্রামে ঢুকিবার পূর্ব্বে দশ পা আগাইতেন ত বিশ পা পিছু হাঁটিতেন। কোথা হইতে এক প্রফুল্ল আসিয়া আস্তানা গাড়িয়া বন-বিড়ালদের মেনি-বেরাল করিয়া দিয়াছে। নহিলে দারোগা বাবুর বিনাইয়া নানা ছাঁদে হাসিয়া-হাসিয়া মনোদুঃখ জানাইবার ফুরসৎ মিলিত না। প্রফুল্ল সহকর্ম্মি-বৃন্দের চোখের পানে চাহিয়াই বুঝিল, শিরায় বলকা ছুধের মত পুরাতন উষ্ণ রক্ত উথলাইয়া উঠিতেছে। তাড়াতাড়ি দলপতি শঙ্করলালের হাত দু'টা ধরিয়া ফেলিয়া মিনতি করিয়া কহিল, শঙ্কর ভাই, দেখ, ব্রত যেন পূর্ণ হয়। দারুক মহাত্মার যোগ্য হয় যেন।

শঙ্কর বলিতে গেল, কিন্তু দাদা—

অবিনাশ তাহার কথা সাঙ্গ হইতে দিল না। আগু বাড়িয়া, সকলের হইয়া সগর্ব্বে বলিল, তোর কোন ভাবনা নেই ভাই। তোর অবিনাশ দাদা বেঁচে থাকতে তোর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না।

শঙ্কর তবু কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল, অবিনাশ তৎপূর্ব্বেই কহিলেন, তুই কেবল এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যা প্রফুল্ল, ফিরে এসে যেন দেখতে পাস স্লুইস গেট কাজ করছে। দে, একটু বেশী ক'রে পায়ের ধুলো দে, কালই ভোরে গিয়ে বাঁধটার গায়ে মাখিয়ে দিয়ে আসব।

অবিনাশ পায়ের ধূলা লইবা মাত্র অন্য সকলেও হুমড়ি খাইয়া পড়িল। প্রফুল্ল কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকে নমস্কার, কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, কবে ফিরব, জানি নে ; ফিরব কি না তা'ও জানি নে ; কিন্তু যদি ফিরি, এসে যেন আবার এমনি ক'রেই সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি। আর যদি না ফিরি—

অবিনাশ সকলের হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছিঃ ভাই, অমঙ্গলের কথা মুখে আনে !

দারোগা বলিলেন, তবে আর দেরী কি ?

কিছু না, চলুন।

শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, দাদা, তাড়ি বন্ধের ব্যাপারটা এখন বন্ধ রাখলে ভাল হত। আপনি ফিরে এলে, তখন—

প্রফুল্ল বলিলেন, আমি যদি না-ই ফিরি? আমাকে যদি না-ই ছাড়ে কোন দিন, তাই ব'লে দেশের কাজ বন্ধ থাকবে? শঙ্কর ভাই, একটি লোকের জন্তে দেশের মঙ্গল বিলম্বিত হবে? আর আমি? তোমাদের নিয়েই ত আমি? একলা আমার দ্বারা কোন্ কাজটি হয়েছে, তুমিই বল? চিরদিন তোমরাই সব কাজ করেছ; আজও তোমাদের ওপরই কাজের ভার।

অবিনাশ বলিলেন, সব ঠিক হবে ভাই, সব ঠিক হবে। কিছু ভেব না; সব ক'রে-কম্মে নোব। আচ্ছা প্রফুল্ল, জেলে চিঠি লিখতে দেয় ত? স্লুইস্ গেটের কাজ যেমন-যেমন এগোবে, তোমাকে জানাতে পারব ত?

পারবেন!

২

তিন মাস পরে, প্রফুল্ল অবিনাশের পত্রে জানিলেন:

"বাঁধ দুইটাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে দেখিতেছে, সেই ধন্ত-ধন্ত করিতেছে। আমরা স্লুইস্ গেটের নাম "প্রফুল্ল স্লুইস্" দিব ঠিক করিয়াছি। তাড়ি বন্ধ করা গেল না। সব বেটা-বেটি তাড়ি খায়। একটা গাছেও ভাঁড় বাঁধা বন্ধ হয় নাই। আমার উপর সবাই রাগিয়াছে। গ্রামে যে কয় ঘর তোমার হুকুমে স্লুইস্ গেটের জন্ত চাঁদা দিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। আমি তাড়ি বন্ধ করিতে বলি কি না, তারই জন্ত এই শাস্তি। অমর বাবুকে তুমি একখানি চিঠি দিয়া আর তিনশ' টাকা দিতে বলিও। এই তিনশ' টাকাতেই কাজ শেষ হইবে। সামনের বর্ষাতেই স্লুইস্ জল বাহির করিয়া দিবে। তোমার নামে জয়-জয়কার পড়িবে। তুমি ফিরিয়া আসিলে তাড়িখোর বেটাদের হুঁকা নাপিত বন্ধ করিব, তবে ছাড়িব।"

চিঠি পড়িয়া প্রফুল্ল মর্ম্মাহত হইল। দারুকেশ্বরবাসী তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। এই গ্রাম হইতেই সে খাজনা বন্ধের আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিল। অকাতর, হাস্তমুখে অগণিত নর-নারী পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলী মাথায় ও বুকে ধারণ করিয়াছিল। কাতারে-কাতারে নর-নারী, বালক-বালিকা ইংরাজের জেলখানায় ভিড় করিয়াছিল। এই গ্রাম হইতেই হাতে-কাটা সূতায় মাসে-মাসে তিন হাজার টাকার তাঁতের কাপড় কলিকাতায় রপ্তানী হইত। এই গ্রামের অধিবাসীরাই স্বচেষ্টায় ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর চুলের মুঠি ধরিয়া দারুকেশ্বর নদী পার করিয়া দিয়াছিল।

প্রফুল্ল সারা রাত জাগিয়া চিন্তা করিল এবং পরদিন দুইখানা পত্র লিখিয়া ডাকে প্রেরণের জন্ত জেলর সাহেবের 'বরাবর পাঠাইয়া দিল। একখানা শঙ্করলালকে; অন্তখানা অমর মুখুজ্জেকে স্লুইস্ গেটের টাকার জন্ত। বলা বাহুল্য, একখানা ডাকে গেল; অন্তখানাও গেল বটে তবে প্রাপকের উদ্দেশে নহে। যাহারা তাড়ি বন্ধ করিতে চাহে, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করা উচিত কি? জেলার সাহেব সরকার বাহাদুর সকাশে এই প্রশ্ন নিবেদন করিলেন।

৩

পল্লীগ্রামে অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় কীর্ত্তি, অবিনাশের স্লুইস্ দিয়া হু-হু শব্দে জল বাহির হইয়া যাইতেছে, অবিনাশের আনন্দ আর অবধি নাই। এ অঞ্চলের বর্ষাও কি যেমন-তেমন? আকাশ যদি এক বার নামিলেন, বর্ষা বিদায় হইলেন, শরৎ শরৎ জাগাইয়া গত হইলেন, হেমন্ত অস্ত, শীত সমাগত, তথাপি বর্ষণ হইবার আর নাম নাই। অন্তান্ত বৎসর আষাঢ় মাস হইতে দু'-ধারের মাঠ সকল থৈ-থৈ করিতে থাকে। কৃষক না পারে কর্ষণ করিতে, না হয় সময় মত বীজ বপন। এবার শ্রাবণের শেষ অতীত হইয়াছে, কোন মাঠে জল দাঁড়ায় নাই। স্লুইস্ গেট দুরন্ত ঢল নামিয়া দারুকেশ্বর নদীকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া নাচাইয়া মাতাইয়া চলিয়াছে। অবিনাশ সকাল-সন্ধ্যা ছাতি মাথায় গেট পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং মনশ্চক্ষুতে সোনার ফসলের চিত্রখানি অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন আর কি!

বৃহস্পতি বার সন্ধ্যা রাত্রে মুষলধারে বর্ষা নামিল; শুক্র গেল, শনির শেষেও থামিবার চিহ্ন নাই। অবিনাশ দুই দিন গেট দেখিতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দিন যে কেমন করিয়া কাটিতেছে, তিনিই জানেন আর ভগবান জানেন। সন্ধ্যার পর লাঠি, ছাতি, লণ্ঠন, গামছা প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হইয়া "মা কালী" বলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দশ গুণ জোরে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঘন-ঘন করকা হানিতে লাগিল: ঝড়ও যেন আর কোথায় ছিল। অবিনাশ হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

অধিক রাত্রে নরহরি সর্দ্দার খবর আনিল, দা' ঠাকুর, বাঁ দিকের বাঁধে ফাটল ধরল যে! আর অবিনাশকে রাখা গেল না। সেই বিশ্ববিধ্বংসী বিপর্য্যয় মাথায় করিয়া অবিনাশ বাহির হইলেন। নরহরি এক কালে ডাকাতি করিত; সে-ও দা' ঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হইয়া বলিল, দা' ঠাকুর, তুমি আমার বাপের ঠাকুর। আসিবার সময় বৃষ্টি তাহার অঙ্গে হুল্ ফুটাইয়াছে, সারা গায়ে যেন বন্দুকের ছররা বিঁধিয়াছে; গায়ের ব্যথা না মরিলে আর সে বাহির হইতে পারিবে না।

স্লুইস্ গেটের আশে-পাশে যাহাদের জমি ছিল, সকালের দিকে সামান্ত ধরণ হইলে তাহারা মাঠের অবস্থা দেখিতে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উন্মাদ—পাগল হইয়া গিয়াছে। গেটের উত্তর দিকের বাঁধ প্রায় ধূলিসাৎ, দক্ষিণেরটারও মাটি ঈষৎ ধ্বসিতে সুরু হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণ সেই দিগন্ত-প্লাবিত "মহাসাগরের" মাঝখানে এক-বুক জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তারস্বরে বরুণের স্তব পাঠ করিতেছেন। নির্দ্দয় বরুণ দেবের করুণায় বঞ্চিত হইয়া গ্রামের লোকদের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া ঝুড়ি-কোদাল-সাবল আনিতে বলিতেছেন। বরুণ দেব না হয় বধির; লোকগুলাও কি তাহাই? তাহারা শুনিতে পাইতেছে; হাত নাড়িয়া কি বলিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। অবিনাশ একটি শব্দও শুনিতে পান না। কিরূপেই বা পাইবেন? সে প্রবল ও অবিরল জল-কল্লোল সবই চাপা দিতেছে। তথাপি অবিনাশের আকুলি-বিকুলির অন্ত নাই। টোকা মাথায় মনুষ্য দেখিলেই তিনি চীৎকার করিতেছেন। প্রফুল্লর নাম করিয়া,

[illegible]য়ন্না গান্ধীর নাম করিয়া, ঠাকুর-দেবতা, সোনার ফসলের দোহাই [illegible]য়া ডাকাডাকি করিতেছেন।

শ্রীমন্ত সামন্ত অতি কষ্টে অনেক দুঃখ পাইয়া, মরি-বাঁচি করিয়া [illegible]বিনাশের নিকটে আসিয়া বলিল, মোড়লদের হাটের জন্তে হাজার [illegible]া সিমেণ্ট ওদের গুদামে ভরা আছে। যদি দেয়, ফাটলের মুখে [illegible]খনও সাজাতে পারলে "গেট" তবু রক্ষে পায়। কিন্তু আপনার [illegible] যা সম্ভাব ওদের, দেবে ব'লে ত মনে হয় না।

অবিনাশ অকূলে কূল পাইয়া কহিলেন, যা শ্রীমন্ত, যা। [illegible]রের কাছে গিয়ে বল্ আর আমি তাড়ি বন্ধ করতে বলব না। [illegible]াগুলো দিক। ভিক্ষে ক'রে পারি, আমার ঘর-দোর বেচে পারি, [illegible]-ডাকাতি ক'রে যেমন ক'রে পারি, সিমেণ্টের পূরো দাম আমি [illegible]ব। লক্ষ্মী বাবা আমার, যেমন ক'রে হোক্, ওদের রাজি ক'রে [illegible]লে মিলে তোরা বস্তাগুলো বয়ে নিয়ে আয়।

শ্রীমন্ত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া অবিনাশ পৈতাগাছি আঙুলে [illegible]ড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, দাঁড়িয়ে ব্রহ্মহত্যা দেখিস্ নে, শ্রীমন্ত, [illegible]। গেট যদি যায়, জানিস্ অবিনাশ পালধিও গেল।

শ্রীমন্ত বলিল, দা' ঠাকুর, তাঁরা সিমেণ্ট দেবে না।

দেবে না? দেবে না? তবে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মহত্যা দেখ্। ঐ [illegible]খানে পাড় ভাঙ্গছে, তার নীচে পিঠ দিয়ে বসি গে, তোর সামনেই [illegible]ষ হোক্। তুই গিয়ে বলতে পারবি।

আমাকে মিথ্যে দোষী করছ দা' ঠাকুর। তাদের সঙ্গে কথা না [illegible]'য়েই কি আর আমি বলছি! তবু দেখি, আর এক বার বলি গে—[illegible]লিয়া শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। অবিনাশ চীৎকার করিয়া বলিলেন, [illegible]মন্ত রে, দেরী করিস নে বাবা, ছেলে-বুড়ো ডেকে বস্তাগুলো মাথায় [illegible]নিয়ে চলে আসিস্ ভাই!

ব্যর্থমনস্কাম শ্রীমন্ত নিতান্ত ধন্দ ভাবিয়াই সেই দুর্য্যোগ মাথায় [illegible]রিয়া ব্রাহ্মণকে খবর দিবার জন্ত পুনরায় আসিতেছিল, পথিমধ্যে [illegible]ফুল্লর সঙ্গে দেখা। প্রফুল্ল সকালে সদর জেল হইতে খালাস পাইয়া [illegible]থমেই অবিনাশের গৃহের উদ্দেশে চলিয়াছিল। শ্লুইস্ গেটের [illegible]াগ্য সম্বন্ধে ভয় বরাবরই ছিল, তাই হুগলীর সহকর্ম্মী সহযাত্রীদের [illegible]র্বকাতিশয্য অগ্রাহ্য করিয়াও বিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া দারুণ দুর্দ্দিনেও [illegible]ামে ফিরিয়াছে। শ্রীমন্ত দু'হাতে তাহার পায়ের কাদা [illegible]ইয়া মাথায় মাখিল, মুখে দিল এবং শ্লুইস্ গেটের খবরও [illegible]ল। প্রফুল্ল বলিলেন, হ্যাঁ রে, তুই বলিস কি! শঙ্কর সিমেণ্ট [illegible]লে না?

না।

আয় আমার সঙ্গে। না দিলে চলবে কেন শ্রীমন্ত! লোকসান [illegible]লে ত অবিনাশের হবে না; হবে গ্রামবাসীরই সর্ব্বনাশ। চল্ [illegible]খি?

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, আমি সেই কালেই ঠাকুরকে পই-পই ক'রে বলেছিলাম, ঠাকুর, তাড়ির দিকে নজর [illegible] না, গ্রামের লোক সব সইবে, ওটা পারবে না। দা' ঠাকুর [illegible]ন শুনলে না গরীবের কথা। গ্রামের লোক সব এক দিকে এক [illegible]ী হোল, দা' ঠাকুর একা, এক দিকে। একটা তাল গাছ কাটা করতে ত পারলেই না; মিছে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ, কথা বন্ধ, [illegible]য়া-দাওয়া বন্ধ—শত্রুতা—বিষম শত্রুতা বেধে গেল। দা' ঠাকুরও চেঁচায়, ওরাও ত্যাওড়ায়। এক দিন ত দু'দিকেই তলায় বাঁশ বেরিয়ে পড়লো। ওরা দেয় কখনও সিমেণ্ট! হুঁ।

হুঁ।

প্রফুল্লকে দেখিয়াই শঙ্কর সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিল। প্রফুল্ল বলিল, ভিক্ষা চাইতে এসেছি ভাই। তোমার সিমেণ্টের বস্তাগুলো কোথায় শঙ্করলাল?

শঙ্করলাল বলিল, হাটের গুদোমে আছে, প্রফুল্লদা'।

সেগুলো যে দিতে হবে ভাই!

শ্রীমন্ত অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতেছিল, জবাব শুনিয়া মুহূর্ত্তে হাসি স্তম্ভিত হইয়া গেল। শঙ্কর বলিল, সে ত আপনারই, দাদা।

প্রফুল্ল বলিল, আমার মাথায় দু'টো দাও; আর তোমার দল-বলকে ডাক, শ্লুইস্ গেটে সেগুলো পৌঁছে দিক্।

শঙ্কর বলিল, আপনি একটু বসুন; মা'কে বলি একটা গাইয়ের বাঁট টেনে দিক, একটু দুধ মুখে দিন, আমি এখনই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

শঙ্কর তাহার গর্ভধারিণীকে ডাকাডাকি করিয়া গাই দুইতে পাঠাইয়া, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বার বার তিন বার শঙ্খধ্বনি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সিমেণ্ট আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রফুল্লদা'; শাঁকের ফুঁ শুনে গ্রামের যুবো-বুড়ো-ছেলে সবাই এলো ব'লে; কিন্তু দাদা, ভস্মে ঘৃতাহুতি হবে। অবিনাশের ও শ্লুইস্ গেটেই হয়নি; স্বয়ং মল্লেশ্বর শিব এলেও ওকে রক্ষা করতে পারবেন না।

জানি শঙ্কর; সে কথা আমি গোড়া থেকেই অবিনাশকে বলেছি। তবু, আমাদের যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

ঐ ছেলেরা এসেছে। মা, দুধ কৈ গো—বলিয়া শঙ্কর বাড়ীর ভেতরে ঢুকিল।

৪

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখা গেল, নৌকা ভিন্ন যাইবার কোনও উপায়ই আর নাই। তল্লাটের খাল-বিল-তড়াগ-পুষ্করিণী ভাসিয়া একাকার হইয়াছে, অজস্র মাছ আসিয়াছে। সপুত্র দ্বারিক রাজবংশী বুড়ো জাল টানিয়া মাছ ধরিতেছিল, ছেলেরা সাঁতরাইয়া মাঝ-দরিয়ায় গিয়া, নৌকা সমেত দ্বারিককে ধরিয়া আনিল। পিতা-পুত্র বিষম আপত্তি, ভয়ানক বকাবকি করিতে করিতে আসিতেছিল; প্রফুল্লকে দেখিবা মাত্র মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, দ্বারিক দণ্ডবৎ হইয়া যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রফুল্ল বলিলেন, দ্বারিক, আমাদের গেটের কাছে পৌঁছে দিতে হবে যে।

দ্বারিক বলিল, নৌকো ত যাবে না, হুজুর!

যাবে না?

সাধ্যি কি হুজুর! ইন্দ্রের ঐরাবত গেলেও ভেঙ্গে-চুরে শতখান্ হয়ে যাবে। তা এ কাঠের নৌকো ত মোচার খোলা, হুজুর! সে ঘূর্ণি দেখলে মানুষ ভিমি যাবে হুজুর। ঢল নামছে না ত পাহাড় উপড়ে আছড়ে পড়ছে।

প্রফুল্ল বলিলেন কিন্তু আমাদের অবিনাশদা' যে ঐখানে আছেন, দ্বারিক! সারা দিন সারা রাত বন্দি হয়ে ব্রাহ্মণ গেট আগলাচ্ছে। আমাদের যে না গেলেই নয়।

দ্বারিক প্রথমে বিস্মিত হইল: বলিল, ওখানে মানুষ থাকতে পারে না, হুজুর। তিনি নেই, হুজুর। মানুষ থাকলে আমরা দেখতে পেতুম। পরে শ্রীমন্ত যখন বলিল, দুপুর বেলা সে নিজে দা' ঠাকুরকে গেটের কাছে দেখিয়া আসিয়াছে, তখন দ্বারিক বলিল, আপনাদের যেয়ে কাজ নেই, হুজুর। আপনারা থাকুন, আমি বুড়ো মানুষ, মরি-বাঁচি কারও ক্ষতি নেই, আমি আগে দেখে আসি; তার পর—

প্রফুল্ল বলিলেন, সেই ভাল; চল, তুমি আর আমি আগে দেখি।

দ্বারিক বলিল, আপনার যাওয়া হবে না হুজুর। ও যমের দুয়ার। ওখান থেকে মানুষ ফেরে না।

আমি ম'লে কেউ কাঁদবে না, দ্বারিক,—বলিয়া প্রফুল্ল এক লাফে নৌকায় উঠিয়া নৌকা লগি দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। চোখের পলক না ফেলিতে একটা পাক্ খাইয়া নৌকা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দ্বারিকের মুখের কথা "করলে কি হুজুর, করলে কি" মুখেই রহিয়া গেল। বৃদ্ধ দ্বারিকের বুকের ভিতরটা হায়-হায় করিতে লাগিল; সে শক্ত হাতে হাল ধরিয়া বসিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিল।

গেটের এক দিকের লোহার কাঠামো খানিকটা জলে জাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া প্রফুল্ল "অবিনাশদা" "অবিনাশদা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। আকাশের দুরন্ত বাতাস ও জলের ছুটন্ত উচ্ছ্বাস ভিন্ন সে ডাক কেহ শুনিল না; কেহ সাড়া দিল না। অবিনাশের চিহ্ন-লেশও মিলিল না। তাহার প্রাণসর্ব্বস্ব স্লুইসের সঙ্গে সেও নিরুদ্দেশ। সেই একটি মাত্র লোহার থাম্বার পানে চাহিতে চাহিতে একটি কথাই বার বার প্রফুল্লকে পীড়া দিতেছিল, সিমেণ্টের বস্তাগুলা সময় মত পাওয়া গেলে এত যত্নের, এত দুঃখের গেটটির এমন বোধনেই বিসর্জ্জন হইত না।

অবিনাশ যদি ফিরিয়া থাকে, এই ভাবিয়া তাহারা নৌকার মুখ ফিরাইল বটে; দক্ষ দ্বারিকের হাল ও প্রফুল্ল প্রাণপণ-শক্তিতে দাঁড় টানিয়াও নৌকা গ্রামের দিকে আনিতে পারিল না। শেষ বেলাটুকু নৌকা সেইখানেই ঘূর্ণি পাক খাইতে লাগিল। দ্বারিক গুণ টানিবার প্রস্তাব করিল; কিন্তু দেখা গেল, অসম্ভব। সে দুরন্ত স্রোতে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! দ্বারিক কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে অপঘাতে মারতে আনলুম, হুজুর! শুনলে গ্রামের লোক যে আমার মরা-মুখেও আগুন দেবে না, হুজুর!—বলিয়া সে ঝাঁপাইয়া নামিয়া পড়িল। প্রফুল্ল অনেক নিষেধ করিলেন, দ্বারিক শুনিল না।

চার-পাঁচ ঘণ্টা স্রোতের সহিত সংগ্রাম, ধস্তাধস্তি করিয়া নৌকা যখন গ্রাম-সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে; স্বচ্ছ মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া ত্রয়োদশীর চাঁদের ম্লান আলোক ফুটিয়াছে।

শঙ্কর তাহার দল-বল সহ ঘাটে বসিয়াছিল; ডাকিল, প্রফুল্লদা'!

ভাই!

এই যে আপনার অবিনাশদা'!

প্রফুল্ল ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলেন, অবিনাশের প্রাণহীন বিকৃত দেহ বেষ্টন করিয়া গ্রামবাসীরা বিরস মুখে বসিয়া আছে।

রাজকুমারীর জন্মদিন

শ্রীসুলতা কর

স্পেন দেশের রাজকুমারী ইনফান্তার জন্মদিন। আজ তার বারো বছর বয়স পূর্ণ হ'ল। সে জন্য রাজা আর রাজকর্ম্মচারীরা চেষ্টা করছেন যাতে এই দিনটির উৎসব সব চেয়ে সেরা হয়। আজকের দিনটিও খুব চমৎকার। চার দিক সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে।

ছোট রাজকুমারী বন্ধু-বান্ধবের দল নিয়ে বাগানের বড় বড় মূর্ত্তির চার পাশে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলছে। বছরের আর সবদিন তাকে সাধারণ লোকের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হয় না,—কিন্তু আজকের বিশেষ দিনে রাজা হুকুম দিয়েছেন যে, রাজকুমারী যাকে পছন্দ করবে তারই সঙ্গে খেলতে পাবে। মনের আনন্দে ইনফান্তা ছোট ছেলে-মেয়েদের দল নিয়ে খেলা করছে। এই সব ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী রাজকুমারী নিজে। দামী নীল সাটিনের ফ্রক সে পরেছে, তার গলায় হীরার মালা, পায়ের লাল ভেলভেটের জুতায় মুক্তা বসান। কোঁকড়ানো সোনালী চুলের গোছার মাঝখানে একটি ধবধবে সাদা গোলাপ আটকান রয়েছে। রাজকুমারীর হাতে রঙীন হালকা কাগজের একখানি সুন্দর কারুকার্য-করা পাখা।

প্রাসাদের উপরের ঘরের জানলা খুলে রাজা চেয়ে দেখছেন। রাজার মুখে দুঃখের ছায়া। রাজকুমারী জন্মাবার মাত্র ছয় মাস পরেই রাণী মারা যান। আজও তিনি সে দুঃখ ভুলতে পারেননি।

রাজা আর বেশীক্ষণ মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন না। রাণীর স্মৃতিতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে জানলার পর্দা টেনে দিলেন।

রাজকুমারী যখন হাসতে-হাসতে উপরের জানলার দিকে চাইল, তখন সে আর তার বাবাকে দেখতে পেল না। রাজকুমারীর মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল, আজকের দিনে বাবা তার পাশে থাকবেন এইটাই সে চেয়েছিল।

ইনফান্তার কাকা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে উৎসবের জায়গায় চললেন। রাজকুমারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বাবার কথা ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বারান্দা পার হয়ে চলতে লাগল, তার বন্ধু-বান্ধবের দল সার বেঁধে পাশে-পাশে চলল।

উৎসবের জায়গায় এসে চমৎকার হাতীর দাঁতের তৈরী সিংহাসনে ইনফান্তা বসল। ইনফান্তার কাকা প্রকাণ্ড রূপার সিংহাসনে বসলেন।

উৎসব আরম্ভ হল। প্রথমে হ'ল ষাঁড়ের যুদ্ধ। যদিও ষাঁড়েরা কাঠের তৈরী, তবু খুব সুন্দর খেলা হ'ল। মনে হতে লাগল ষাঁড়েরা জীবন্ত। কাঠের ঘোড়ায় চড়ে নীল পোষাক-পরা এক দল যোদ্ধা চক্চকে তরোয়াল ঘোরাতে-ঘোরাতে তেজে উঠে ষাঁড়েদের দিকে ছুটে গেল। তার পর আর এক দল লাল পোষাক-পরা যোদ্ধা লাল কাপড় হাতে নিয়ে ষাঁড়েদের দিকে ছুটে গেল। ষাঁড়েরা যোদ্ধাদের তাড়া করল, ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল।

ষাঁড়েরা অনেক ঘোড়াকে সিং দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ঘোড়সওয়াররা মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, আবার একটু পরে লাফিয়ে উঠে তরোয়াল দিয়ে ষাঁড়েদের খোঁচা দিতে লাগল। ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—"বাহবা ঘোড়সওয়ার, বাহবা ঘোড়সওয়ার! অনেকক্ষণ যুদ্ধ হবার পর ঘোড়সওয়াররা তরোয়ালের ভীষণ কোপে ষাঁড়েদের কাঠের মাথা কেটে ফেলল।

ষাঁড়ের যুদ্ধ শেষ হল। এবার ইটালিয়ান পুতুলদের নাচ ও অভিনয় আরম্ভ হল। একটি ছোট ষ্টেজে পুতুলেরা অভিনয় করতে আরম্ভ করল। খুব দুঃখের গল্প তারা অভিনয় করল। যখন তারা দুঃখের জায়গা অভিনয় করছিল তখন একটি ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, তাকে চকোলেট দিয়ে ভোলাতে হল। ইনফান্তার কাকা পর্য্যন্ত পুতুলদের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে বললেন—"কে বলবে এরা কাঠ আর মাটী দিয়ে তৈরী, পিছন থেকে দড়ি টেনে এদের নাচান আর অভিনয় করান হচ্ছে।"

এর পর এক জন নিগ্রো যাদুকর বাজী দেখাতে উঠল। লাল কাপড়ে ঢাকা একটা ঝুড়ি ষ্টেজের মাঝখানে রেখে সে বাঁশী বাজাতে লাগল। বাঁশীর শব্দ শুনে লাল কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে দু'টো বিষাক্ত সাপ ঝুড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। মাথার ফণা দুলিয়ে নাচতে লাগল। ছোট ছেলে-মেয়েরা সাপের ফণা আর চক্র দেখে ভয় পেয়ে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসল। সাপের খেলা শেষ হলে যাদুকর একটি ছোট মেয়ের হাত-পাখা চেয়ে নিল, মন্ত্র পড়ে সেটাকে সবুজ পাখী করে দিল।

সবুজ পাখী ষ্টেজের উপর উড়ে-উড়ে গান গাইতে লাগল, ছেলে-মেয়েরা আনন্দে হো-হো করে হেসে উঠল।

এর পর নোয়েস্ত্রা গীর্জ্জার ছোট ছেলেদের নাচ আরম্ভ হল। এই বিখ্যাত নাচের নাম ইনফান্তা শুনেছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখেনি। ছোট ছেলেরা জরির কাজ-করা সাদা মখমলের সেকেলে পোষাক আর অষ্ট্রীচের লম্বা পালক গোঁজা রূপার কাজ-করা অদ্ভুত তিন-কোণা টুপী পরে নাচল। নাচের তালে-তালে সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো প'ড়ে তাদের পোষাকের সাদা রং ঝক-ঝক করে উঠতে লাগল। তাদের লম্বা কালো চুল দুলে-দুলে উঠতে লাগল। সমস্ত লোক অবাক হয়ে তাদের নাচের প্রশংসা করতে লাগল।

এর পর এক দল বেদুইন ষ্টেজের উপর উঠল। পা ছড়িয়ে গোল হয়ে বসে তারা বাঁশের বাঁশী বার করে মিষ্টি ঘুমপাড়ানী সুরে বাজাতে লাগল। খানিকক্ষণ বাঁশী বাজাবার পর হঠাৎ তারা এক ভীষণ কর্কশ শব্দে চীৎকার করে উঠল। ছোট ছেলেরা ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল, ইনফান্তার কাকা লাফিয়ে তরোয়ালের খাপ ধরে দাঁড়িয়ে উঠলেন। কিন্তু ভয় পাবার কিছু ছিল না। বাঁশী ফেলে দিয়ে রণবাদ্য বাজিয়ে তখন বেদুইনরা ষ্টেজের উপর যুদ্ধের নাচ আরম্ভ করল, অদ্ভুত ভাষায় যুদ্ধের গান গাইতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তাদের নাচ-গান শেষ হল। তার পর তারা ষ্টেজ থেকে নেমে গিয়ে একটা ভালুক ও দু'টা বাঁদরছানা কাঁধে করে নিয়ে এল। বাঁদরছানারা বেদুইন ছেলেদের সঙ্গে অদ্ভুত সব সার্কাসের খেলা দেখাতে লাগল, ছোট-ছোট তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। ভালুকও নানা রকম নাচ-গান দেখাল। বেদুইনদের খেলা দেখান শেষ হল। সবাই তাদের প্রশংসা করে হাততালি দিল।

এইবার উৎসবের আসর সব চেয়ে জমে উঠল। ছোট এক বামন নাচবার জন্য ষ্টেজে উঠল। সে যখন ছোট শরীর আর প্রকাণ্ড বড় মাথা দোলাতে-দোলাতে এঁকা-বেঁকা পা ছড়িয়ে নাচতে-নাচতে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল, তখন ছোট ছেলে-মেয়েরা জোরে হেসে উঠল। বামন এই প্রথম রাজপ্রাসাদে এসেছে। দু'দিন আগে রাজ-পরিবারের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বনের ভিতর শিকার করতে গেছলেন। সেখানে এই অদ্ভুত চেহারার বামন মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছিল। রাজকুমারীর জন্মদিনে এর নাচ দেখে সবাই খুব আমোদ পাবে ভেবে তিনি বামনকে রাজপ্রাসাদে ধরে নিয়ে আসেন। বামনের বাবা ছিল এক গরীব কাঠুরে। সামান্য টাকা তার হাতে দিতেই সে খুসী হয়ে কুৎসিত ছেলেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির হাতে ছেড়ে দিল।

সে যে বামন আর দেখতে কুৎসিত, এ জ্ঞান বামনের মোটেই ছিল না। তার নাচ দেখে সবাই খুসী হয়ে হাসছে, এই ভেবে মনের আনন্দে বামন আরও জোরে নাচতে লাগল। ছেলেরা যখন হাসতে লাগল সেও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসতে লাগল। প্রত্যেক নাচের শেষে অদ্ভুত ভাবে ঘাড় নেড়ে, হাত দুলিয়ে ছেলেদের অভিবাদন করতে লাগল। ইনফান্তার রূপ দেখে বামন আর চোখ ফেরাতে পারল না। মনে-মনে ভাবতে লাগল—আমি শুধু রাজকুমারীর জন্যই নাচছি। ইনফান্তা তার কাণ্ড দেখে আরও বেশী কৌতুক করবার জন্য মাথার চুল থেকে বড় সাদা গোলাপ খুলে নিয়ে ষ্টেজের উপর তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিষ্টি হাসি হাসল।

বামন ছুটে গিয়ে গোলাপটি তুলে নিল, পরম সমাদরে গোলাপটিকে কপালে ঠেকিয়ে বুকে গুঁজল। তার পর হাঁটু গেড়ে ষ্টেজে বসে, বিকৃত শরীর অদ্ভুত ভাবে দুলিয়ে প্রকাণ্ড মাথা নাড়তে-নাড়তে ইনফান্তাকে অভিবাদন জানাতে লাগল। আনন্দে তার চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই ব্যাপার দেখে ইনফান্তা আর ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাকতে পারল না। হো-হো করে হাসতে-হাসতে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। হাসি থামলে ইনফান্তা তার কাকাকে বলল যে, বামনের নাচটা এখনি আর একবার তাকে দেখাতে হবে। ইনফান্তার পরিচারিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল যে, এখন প্রাসাদে খুব বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, অতিথিরা সবাই বসে অপেক্ষা করছেন। সুতরাং এখন আর দেরী করা উচিত নয়। কাজেই ইনফান্তাকে উঠে ভোজ-সভার দিকে যেতে হল। যাবার আগে রাজকুমারী গম্ভীর ভাবে হুকুম দিয়ে গেল যে, ভোজ শেষ হলেই বামনকে আবার নাচ দেখাতে হবে।

ছোট বামন যখন শুনল যে, রাজবাড়ীর ভোজ শেষ হলে তাকে আবার নাচতে হবে; কারণ রাজকুমারী ইনফান্তা তার নাচ দেখতে চেয়েছে, তখন আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে উঠল। ছুটে সে প্রাসাদের বাগানে গেল। বুকের সাদা গোলাপটা হাতে করে নিয়ে বার বার চুমু খেতে লাগল, বিকৃত শরীরের অদ্ভুত ভঙ্গী করে আনন্দে নাচতে লাগল, দুলতে লাগল।

বাগানের ফুলেরা তাদের থাকবার জায়গায় এমন কদাকার বামনকে ঢুকতে দেখে খুব বিরক্ত হয়ে উঠল। লাল গোলাপ ফুলেরা বলল—"আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে এ রকম কুৎসিত বামনকে

খেলতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।" লিলি ফুলেরা বলল—"ওকে আফিম ফুলের রস খাইয়ে হাজার বছরের মত ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া উচিত।" সাদা গোলাপ ফুলেরা চেঁচিয়ে উঠল—"আমার চমৎকার ফুলেদের একটা ত দেখছি ওর হাতেই রয়েছে। আজ ভোরে আমি ওই ফুলটিকে জন্মদিনের উপহার বলে ইনফান্তাকে দিয়েছি, ও নিশ্চয়ই চুরী করেছে।"

সাদা গোলাপ বামনের দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল—"চোর—চোর।"

বাগানের মাঝখানে বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুলেরা সূর্য্যের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাণ্ড দুধের মত সাদা ময়ূর তাদের পাশে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। তাকে ডেকে সূর্য্যমুখী ফুলেরা বলল—"রাজার ছেলেরা রাজার মত সুন্দর হয় আর কাঠুরের ছেলেরা ঠিক কাঠুরেদের মতই দেখতে কদাকার হয়।" "ঠিক বলেছ,—ঠিক বলেছ।"—বলে সাদা ময়ূর এমন কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে উঠল যে, সামনের ফোয়ারার লাল-নীল মাছেরা ভয় পেয়ে জলের উপর ভেসে উঠে পাথরের পরীকে জিগেস করতে লাগল—"ব্যাপার কি—ব্যাপার কি?" বাগানের পাখীরা কিন্তু বামনকে ভালবাসত। পাখীরা বলতে লাগল—"বামন দেখতে খারাপ, তাতে কি এসে গেল? অমন যে গুণবান নাইটিংগেল পাখী, সেও ত দেখতে কিছুই ভাল নয়, অথচ সে যখন রাতে গান গায়, তখন সে গানের মিষ্ট সুর কে না মুগ্ধ হয়ে শোনে? বামন আমাদের প্রিয়বন্ধু। সে আমাদের কত দয়া করে। দুর্দ্দান্ত শীতের সময় যখন গাছের সব ফল মরে যায়, মাটী লোহার মত শক্ত হয়ে ওঠে, কোথাও যখন এক কণাও খাবার পাওয়া যায় না, বুনো ভালুকেরা পর্য্যন্ত খাবারের খোঁজে ছুটাছুটি করে বেড়ায়, তখন বামনই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। প্রত্যেক দিন বনের ভিতর এসে সে তার সামান্য একখানা রুটি ছিঁড়ে টুকরা-টুকরা করে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে খায়।" পাখীরা চার পাশ ঘিরে উড়তে লাগল আর ডানা দিয়ে বামনের গাল ছুঁয়ে আদর করতে লাগল। পাখীদের ভালবাসা দেখে বামনের এত আনন্দ হল যে, সে বুক থেকে সাদা গোলাপ খুলে তাদের দেখিয়ে বলল—"দেখেছ, রাজকুমারী ইনফান্তা আমাকে কত ভালবাসে, সে এই গোলাপটি আমাকে উপহার দিয়েছে।" তাই শুনে মনের আনন্দে পাখীরা ফর-ফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ফুলেরা কিন্তু পাখীদের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু পরে ফুলেরা দেখল, ছোট বামন প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে, তাই দেখে তারা খুসী হয়ে বলতে লাগল—"এই কুৎসিত বামনটাকে চিরকাল প্রাসাদের মধ্যে বন্দী করে রাখা উচিত। আমরা যেখানে আছি সেখানে যাতে ও আর কোন দিন না পা দিতে পারে, সেটাও দেখা উচিত। ওর পিঠের কুঁজ দেখ, ভাই, ওর ব্যাঁকা পা দেখ!"—এই বলে ফুলেরা হেসে টিটকারী দিতে লাগল। বামন কিন্তু ফুলেদের হাসি-ঠাট্টা মোটেই বুঝতে পারল না। সে ক্রমাগত ইনফান্তার কথাই ভাবছিল। ভাবছিল—ইনফান্তা আমাকে কত ভালবাসে, সে জন্যই সে এত সুন্দর গোলাপ উপহার দিয়েছে। এখন থেকে আমি চিরকাল তার কাছে থাকব, কখনও তাকে ছেড়ে যাব না।

ইনফান্তাকে আমি বনের ভিতর আমাদের কুঁড়ে ঘরে নিয়ে যাব। আমার বিছানায় শুয়ে ইনফান্তা ঘুমাবে আর আমি জানলার ধারে বসে সারা রাত তাকে পাহারা দেব। বুনো জন্তুদের তাড়াব, ভালুকেরা জানলার পাশে এলে তীর ছুঁড়ে মারব! ভোর হলে জানলায় আস্তে টোকা মেরে ইনফান্তাকে জাগাব। সমস্ত দিন ধরে দু'জনে বনে খেলা করব, নাচব। আমি টকটকে লাল ফুল তুলে মালা গেঁথে ইনফান্তার গলায় পরিয়ে দেব। যখন ইনফান্তার ভাল লাগবে না, তখন মালাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি আবার আর একটা সাদা ফুলের মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে দেব। ফুলের মুকুট তৈরী করে তার মাথায় পরিয়ে দেব। এই সব ভাবতে ভাবতে বামন প্রাসাদের দিকে চলল। সমস্ত প্রাসাদটা এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হচ্ছে যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রোদ আড়াল করবার জন্য জানলাগুলিতে ভারী-ভারী পর্দ্দা ঝোলান রয়েছে। কোন রকমে যদি ভিতরে ঢোকা যায় ভাবতে ভাবতে সে চার দিকে চাইতে লাগল। দেখল একটি ছোট দরজা খোলা রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে বামন ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দেখল একটা প্রকাণ্ড সাজান ঘরের ভিতর সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মেঝেয় নানা রকমের রঙীন পাথরের নক্সা-কাটা। সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে রয়েছে। ঘরে কিন্তু ইনফান্তা নাই। ঘরের এক কোণে কালো মখমলের পর্দ্দা ঝুলছে। হয়ত ওরি পিছনে ইনফান্তা লুকিয়ে আছে, এই ভেবে বামন পর্দ্দাটা ফাঁক করে ধরল। না, এখানে ইনফান্তা নাই, তবে আর একটা আশ্চর্য্য ঝাঁকজমক-ভরা ঘর দেখা যাচ্ছে।

বিদেশী রাজদূতদের এই ঘরে বসিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। হাজার বাতির ঝাড়-লণ্ঠন ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে, পায়ের তলায় সোনার সূতার কাজ-করা দামী নরম মখমল বিছানো রয়েছে। দরজার রেশমী পর্দ্দায় রাজধানীর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আঁকা রয়েছে। ঘরের মাঝখানে মণি-মুক্তা-বসান সোনার সিংহাসন। এই সিংহাসনে বসে রাজা বিদেশী দূতদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

ছোট বামনটি কিন্তু এই সব ঐশ্বর্য্যের দিকে ফিরেও তাকাল না। সে ভাবতে লাগল—সিংহাসনের সমস্ত মণি-মুক্তার বদলেও আমি আমি আমার হাতের সাদা গোলাপের একটি পাপড়ীও কাকেও দেব না। নাচ দেখাতে যাবার আগে আমি এক বার শুধু ইনফান্তাকে দেখে যাব। আর বলে যাব যে, নাচ শেষ হলে যেন ইনফান্তা আমার সঙ্গে বনে চলে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে বামন দরজার রেশমী পর্দ্দা ঠেলে দিল। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে আর একটা ঘর দেখা গেল। বামন সে ঘরে ঢুকে পড়ল। যত ঘর সে এ পর্য্যন্ত দেখল সবগুলির মধ্যে এই ঘরটাই সব চেয়ে সুন্দর আর উজ্জ্বল। দেয়ালে সোনার জলে পাখী, ফুল, গাছ আঁকা রয়েছে। নীল পাথরের মেঝে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্রের জল ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বামন অবাক হয়ে চারি দিকে চাইতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন একলা নাই। ঘরের অনেক দূরের এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা ছোট মূর্ত্তি যেন তাকে উঁকি মেরে দেখছে। 'নিশ্চয় ইনফান্তা। বামনের বুক আনন্দে নেচে উঠল, মুখ দিয়ে অস্ফুট আনন্দের ধ্বনি বেরোল। সে ছুটে সেই দিকে গেল।

ছুটতে ছুটতে এক বার চেয়ে দেখল, মূর্ত্তিটাও ছুটতে আরম্ভ করেছে। বামন এবার তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। কোথায়

ইনফান্তা। এ যে এক ভীষণ দৈত্যের চেহারা! এমন কুৎসিত দৈত্য সে কখনও দেখেনি। শরীরের প্রত্যেকটি অংশ ব্যাঁকা-চোরা, পিঠে কুঁজ, সরু ছোট-ছোট পা, অস্বাভাবিক বেঁটে, প্রকাণ্ড মাথা, গায়ে বনমানুষের মত লোম! ঘৃণায় নাক কুঁচকে সে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটাও নাক কুঁচকে চাইল। বামন ঠাট্টা করে তাকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল, দৈত্যও হেঁট হয়ে অভিবাদন করল। সে দৈত্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, দৈত্যও ঠিক তার পা ফেলার অনুকরণ করে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সে থামতেই দৈত্যও থামল। সে হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিল, দৈত্যও সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিল। দৈত্যের হাত তার হাতে ঠেকতেই মনে হল যেন একটা ঠাণ্ডা ধাতব জিনিষে তার হাত ঠেকেছে। ভয়ে তার কপালে ঘাম বেরোল, বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে উঠল! কে এ, কি এ? বামন একটু সরে গিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগল। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষের নিখুঁত ছবি সেই জায়গায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। দরজার পাশের ঘুমন্ত সিংহের ঠিক যেন যমজ ভাই ওখানে দেখা যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানের সুন্দরী পরীর মত আর একটি সুন্দরী পরী দেখা যাচ্ছে।

এ কি প্রতিধ্বনি? এক বার বনের ভিতর সে চেঁচিয়ে ডেকেছিল। প্রতিধ্বনি তার গলার সুরের নকল করে তার প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিয়েছিল। প্রতিধ্বনি যেমন শব্দের উত্তরে শব্দ বলতে পারে, তেমনি কি সব জিনিষের ছবির বদলে ছবিও দেখাতে পারে? না, কই, এ রকম ত কিছু সে শোনেনি।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ বামনের মা-বাবার কাছে শোনা একটা কথা মনে পড়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল আয়নার কথা। তবে কি এটা আয়না?

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে সে সামনে এগিয়ে এল, বুকের থেকে সাদা গোলাপটি খুলে নিয়ে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকটাকার দৈত্যও অবিকল তার গোলাপের মত একটি গোলাপ বুক থেকে খুলে নিয়ে বিশ্রী ভঙ্গী করে চুমু খেল।

বামন ছুটে সরে গেল। চীৎকার করে কেঁদে উঠে, বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে পিছনে লুটিয়ে পড়ল। না, আর কোন ভুল নাই। এটা একটা আয়না। এর ভিতর যে কুৎসিত বীভৎস দৈত্যের চেহারা ফুটে উঠেছে সেটা হল তার নিজের চেহারা। সে দেখতে তাহলে এই রকম, পিঠে প্রকাণ্ড কুঁজ, ক্ষুদে বামন, সরু এ্যাঁকা-ব্যাঁকা পা, প্রকাণ্ড মাথা, গায়ে বনমানুষের মত লোম। সে যখন খেলা দেখাচ্ছিল তখন তার এই কুৎসিত চেহারা দেখেই ছেলে-মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। রাজকুমারী ইনফান্তা তাকে মোটেই ভালবাসেনি, শুধু তার কদর্য্য রূপ দেখে ঠাট্টা করেছে। কেন তার মা-বাবা তাকে জন্ম হতেই বনে ফেলে রেখে আসেনি, তাহলে আজ তাকে এত দুঃখ পেতে হত না। বনে সবাই তাকে ভালবাসে, সেখানে তার কুৎসিত চেহারার কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্য কোন আয়না নাই। প্রাসাদে সবায়ের চোখের সামনে ধরে এনে তাকে এমন ভাবে মর্ম্মান্তিক ঠাট্টা করার চেয়ে তার বাবা তাকে মেরে ফেলল না কেন? বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ে তার চোখ-মুখ ভেসে গেল। বুকের সাদা গোলাপ ফুলটি টেনে নিয়ে সে টুকরা-টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল। দু'হাতে মুখ ঢেকে আয়নার সামনে থেকে সে অনেক দূরে সরে গেল। আর যেন না তাকে ওই বীভৎস মুখ দেখতে হয়। অনেক দূরে সরে গিয়ে সে বুকে হাত চেপে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ঠিক এই সময় ইনফান্তা তার ছোট বন্ধুর দল নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। ঢুকে দেখল কদাকার বামন মাটীতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, থেকে-থেকে বুক চাপড়াচ্ছে, যেন ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে এমনি ভঙ্গী করছে।

তাই দেখে ইনফান্তা আর ইনফান্তার বন্ধুরা আনন্দে হো-হো করে হেসে উঠল, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। ইনফান্তা বলল—"ওর নাচ দেখে কি মজা পেয়েছি, কিন্তু এর অভিনয়টা তার চেয়েও মজার। সত্যি পুতুল নাচের চেয়েও এই বামনের নাচ আর অভিনয় দেখলে অনেক বেশী মজা পাওয়া যায়।" —এই বলে সে রঙ্গীন বাহারী হাত-পাখা নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল।

বামন কিন্তু একবারও চোখ খুলল না, ইনফান্তাকে চেয়ে দেখল না।—তার কান্নার শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল।—হঠাৎ সে জোরে শ্বাস টানল, ওঠবার চেষ্টা করল, পর-মুহূর্ত্তে মাটীতে পড়ে গেল, নিশ্বাসের শব্দ থেমে গেল। "বাঃ! চমৎকার অভিনয়!"—ইনফান্তা। হাসতে-হাসতে বলে উঠল। "কিন্তু এখন তোমাকে উঠতে হবে, আমাকে নাচ দেখাতে হবে।" ইনফান্তার বন্ধুরা বলে উঠল—"হ্যাঁ, শীঘ্র উঠে পড়।—রাজকুমারীর হুকুম। উঠে আমাদের অদ্ভুত নাচ দেখাও। মিউজিয়ামের বাঁদরদের নাচের চেয়েও তোমার নাচ মজার।"

ছোট বামন কোন উত্তর দিল না, একটুও নড়ল না। রাগে ইনফান্তার মুখ লাল হয়ে উঠল। মাটীতে জোরে পা ঠুকল। চেঁচিয়ে কাকাকে ডেকে বলল—"বামনটা আমার কথা শুনছে না। ওকে ধাক্কা মেরে তুলে দিন, আমাদের সামনে নাচতে হুকুম করুন।"

কাকা পায়ের দামী জুতা দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন বামনকে। চড়া-গলায় বললেন—"ওঠ, শীগ্‌গির নাচ। তোকে নাচতেই হবে। স্পেন দেশের রাজকুমারী ইনফান্তা তোর কুৎসিত নাচ দেখে আমোদ করবেন।"

এত চীৎকারেও বামন স্থির হয়ে পড়ে রইল, একটুও নড়ল না। "সিপাহী, এদিকে এস, চাবুক লাগাও।"—হুকুম দিয়ে ইনফান্তার কাকা চলে গেলেন। সিপাহী চাবুক হাতে ছুটে এল। কিন্তু চাবুক মারবার আগে বামনের মুখ দেখে চমকে উঠল। হেঁট হয়ে পাশে বসে তার বুকে হাত দিল। একটু পরে গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইনফান্তাকে অভিবাদন করে বলল—"রাজকুমারী, আপনার কেনা বামন আর কোন দিন নেচে আপনাকে আমোদ দেবে না।"

বিরক্ত হয়ে ইনফান্তা বলল—"কেন নাচবে না, আমার হুকুম কেন মানবে না?"

সিপাহী বলল—"কারণ, দুঃখে তার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে সে মারা গেছে।"

রাগে ভুরু কুঁচকে রাজকুমারী ইনফান্তা বলল—"এবার থেকে আমার সামনে যারা খেলা দেখাতে আসবে, তাদের কারও যেন হৃদয় না থাকে।"

এই বলে স্পেন দেশের রাজকুমারী বন্ধুর দল নিয়ে বাগানে খেলতে চলে গেল।

কদাকার বামনের দেহ মাটীতে পড়ে রইল।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের বাণী

স্বামী সিদ্ধানন্দ

ঈশ্বর

ভগবান এমন যায়গায় আছেন যেখানে মত, পথ, শাস্ত্রনিয়ম, আচার-বিধি কিছুই পৌছতে পারে না।

ভাগ্য-বল, পুণ্য-বল, ঐশ্বর্য্য-বল সবই ভগবান থেকে আসছে। ভগবানকে চাইলে সবই পাবে। যাঁরা ভগবান লাভ করেছেন তাঁরা এ সব কিছুই চান না; তাঁদের কাছে এ সব তুচ্ছ। তাঁরা সবার বড় জিনিষের স্বাদ পেয়ে বসে থাকেন। তাঁদের ছুটা-ছুটি, ছটাপুটি সমস্তই বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা নিজেতেই নিজে ডুবে যান। যাঁরা ভক্ত, ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁদের পেছনে পেছনে থাকেন।

জগৎকে জানতে যেও না। জগৎকর্ত্তাকে জানতে চেষ্টা কর। তাঁকে জানলে কিছুই অজানা থাকে না! তিনি সবই বুঝিয়ে দেন।

ভগবান আছেন এটি অন্ধ বিশ্বাসেই অনুভব করা যায়। আর চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়।

ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না কেন? আমাদের ভেতরে বহু গলদ আছে এই জন্য। যে ঠিক-ঠিক তাঁকে চায় ও তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধন করে, তার ওপর তাঁর কৃপা হয়। তিনি শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত হন। সাধন না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সাধন-ভজন, জপ তপস্যা সমস্তই চিত্তশুদ্ধির জন্য। ভগবান খাঁটি; অন্তর খাঁটি না হ'লে তিনি প্রকাশিত হন না। খাঁটি না হ'লে ভগবানের মহিমা বা ভাব বুঝবে কি করে?

ভগবানকে মানো আর না-মানো, তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না বা তিনি তাতে রুষ্ট হন না। যে মানে তার আত্মা প্রফুল্লিতে থাকে এবং জীবাত্মার ভয় দূর হয়। তিনি ছাড়া জীবকে কেউ অভয় দিতে পারেন না।

মন পবিত্র হলেই ঈশ্বর কি বস্তু তা কিছু অনুভব হয়। ঠাকুরের মতে ভগবান শুদ্ধ মনের গোচর।

ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম

কায়মনোবাক্যে যদি ব্রহ্মচারী হতে পারিস্ তবে ভগবানকে জানতে বেশী দেরী হবে না। ব্রহ্মচর্য্য মানে পূর্ণ শুদ্ধ ভাব; রিপুর উত্তেজনাকে নষ্ট করে দিয়ে মহা পবিত্র হওয়া। তাহ'লে অল্প সাধন-ভজন করলেই অনুরাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে। কিছু দিন করেই ত্যাখ, একবার পবিত্র ভাব হলে অপবিত্র ভাব সহ্য হবে না। তখন সদানন্দে বিভোর থাকবি। অপবিত্র ভাবই নরক, দুঃখ ও পাপ। ঠাকুর বলতেন;—বিষ্ঠার মধ্যে থেকে থেকে লোক পবিত্রতার মর্ম্ম কি করে বুঝবে? অপবিত্রতাই বিষ্ঠা।

সংযমী না হ'লে বুদ্ধি পরিষ্কার হয় না। সংযমের দ্বারা মন শুদ্ধ ও পবিত্র হলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। তখন অল্প সাধনেই সব বিষয় ঠিক-ঠিক বুঝা যায়। সৎচিন্তায় মন সংযত হয়। সৎকে ধরে থাকতে হয়, না হ'লে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় এবং তাঁকে জানা যায়।

আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলছি, তোমরা যদি আমার কথা শুনে চল, কল্যাণ হবে। সংসারে থেকে তোমরা যখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করছ, তোমরা ভীষ্মদেব, লক্ষ্মণ আর মহাবীরকে সামনে রেখে চলবে ও এঁদের জীবন আলোচনা করবে। তোমরা স্বামীজির জীবন তো প্রত্যক্ষই দেখলে। তাঁর জীবন ও উপদেশ হতে শিক্ষা লাভ করবে। সাবধান! যেন বৈষ্ণবদের মত মধুর ভাবের সাধনা করতে যেও না, তাহ'লেই সব ধর্ম্মভাব নষ্ট হয়ে যাবে। এ যুগে মাতৃভাব আমাদের ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁর নিজের জীবন দ্বারা দেখিয়ে গেলেন। মাতৃভাবের মত শুদ্ধ ভাব আর নাই। যাঁরা নারী মাত্রকেই মাতৃজ্ঞান করেন, তাঁরাই যথার্থ ব্রহ্মচারী। ও-সবে (মধুর ভাবে) আসল উদ্দেশ্য প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। এ জন্যই তোমাদের বলছি, ঐ সব মহাপুরুষদের পবিত্র জীবন স্মরণ করে এগিয়ে যাও। তাঁদের স্মরণ করলে হৃদয় পবিত্র ভাবে ভরে উঠবে আর ভিতরে বল (শক্তি) ও উৎসাহ পাবে। সাধন-পথে অনেক বিঘ্ন হতে তাঁরা তোমাদের বাঁচিয়ে দেবেন। তাই বলছি, যদি বাঁচতে চাও তবে ঐ সব কামিনী-কাঞ্চনত্যাগীদের জীবন দেখ আর তাঁদের উপদেশ মেনে চলতে থাক। তাতে তোমাদের নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে। আর তোমরা শুকদেব, মহারাজা সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দ এঁদের নাম নিত্য স্মরণ করবে।

যে কোনও মুহূর্ত্তে মানুষ পশুর চেয়েও হীন হয়ে যেতে পারে। মন নিয়ে নাড়া-চাড়া করলেই বুঝতে পারবে। যারা খুবই সংযমী তারাই পতন হতে বেঁচে যায়।

চরিত্রের জোর না থাকলে ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বোঝা যায় না। লোকে শাস্ত্র-পুরাণের ওপর কত গাল-মন্দ করে। সংযমী হ'লে তবে শাস্ত্রের বাক্য সত্য বলে উপলব্ধি হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন;— "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" অর্থাৎ, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন একমাত্র সংযমী-চিত্তই জাগ্রত থাকে।

সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ খুবই দরকার। সাধু কে? যিনি গুরু, ও ইষ্টের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন—তাঁদের দিকে গতি করান।

সাধন-ভজন করলে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝা যায়, তখন আর সংশয় থাকে না। দেবস্থানে ও সাধুস্থানে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করতে হয়। তাহলে অনেক কাজ হয়।

যে যেমন করে পার সাধুসঙ্গ কর। ভগবান সাক্ষাৎ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁদের দয়া হলে ঈশ্বরের কৃপা হয়।

সাধুসঙ্গে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। সাধু-দর্শনে পুণ্যলাভ ও সাধু-সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়। সাধুসঙ্গে অনেক সময় খুব পতন থেকেও বেঁচে যায়। মন খুব চঞ্চল হলে সাধুসঙ্গ করতে হয়। তাঁদের সঙ্গ করলে দেখবে মন শুদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভালবাসা জন্মে।

সাধুসঙ্গে ও তীর্থস্থানে বাস করলে কল্যাণ হয়। এ সাধন-ভজনের বিশেষ অঙ্গ। ভগবান ভেতরে-বাইরে সব জায়গা সাধনার স্থান করে রেখেছেন। যে সাধন করে সে টের পায়। সাধুসঙ্গ ধর্ম্ম-জীবনে একান্তই আবশ্যক।

সাধুর কখনও সমালোচনা করতে নেই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। তাঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখলে নিজেরই মঙ্গল। সাধু না হলে সাধু চিনতে পারে না—সে যতই বড় হোক না কেন। আর সাধু-সন্ন্যাসীদের বিচার করার সাধ্য, স্পর্দ্ধা থাকবেই বা কেন?

সৎসঙ্গের এমনি মহিমা যে, সামান্য কীটও ফুলের সঙ্গে ভগবানের চরণে গিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি সাধুসঙ্গ-গুণে মানুষ

শ্রী অরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অন্ধকার খনি-গর্ভে পদ্মরাগ মণি
কোথায় লুকায়ে ছিল,—
এলো যবে আলোর জগতে,—
মণিকার দিল তারে রূপ।
দীপ্ত তেজে পদ্মরাগ পলকে ঝলকি' ওঠে।
প্রাণে তা'র আলোর স্পন্দন—
বুকে জাগে সুন্দরের ছবি—
তার লাগি বসুধার হৃদয় চঞ্চল!
চেতনার মণি-গর্ভে ঘুমন্ত জণের মত
অকস্মাৎ বিস্ময়-চকিত
অনাবৃত সত্যাশ্রয়ী মন—
অরূপের ছোঁয়া লাগি' রূপ মাঝে জাগে আত্মহারা!
স্বপ্ন তার কি যে ছিল, কিছু মনে নাই—
শুধু এই কথা বুকে জাগিছে সদাই :
কোথা আলো, কোথা আলো,—কোথা সে আলোর দেশ,—
মুক্তির রঙীন ছবি-সমুজ্জ্বল নূতন প্রভাতে!

রুদ্ধদ্বার কক্ষ হ'তে অর্গল খুলিয়া
পলকে বাঁধন-হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে,
যেথা বায়ু লীলা ভরে খেলিয়া বেড়ায়—
মানে না কাহারো মানা,—
প্রাণবান্, একান্ত উদার—
সেথা যেন নভ-কোণে মুক্ত মন উঠিবারে চায়
দিগন্তের সীমা নিরূপণে।
অনন্ত পিপাসা তা'র
অনন্ত জিজ্ঞাসা!

জড় হতে প্রাণময়, প্রাণে মনোভূমি—
বিবর্ত্তনে রূপায়িত হ'ল গতি যার,
মনের পরিধি হ'তে অতিমানসের
দেখা মিলিবে না কভু?
অজ্ঞানতা-বিধৃত জগতে, খণ্ড জ্ঞানময়
খণ্ড চেতনার দেশে
অখণ্ডের হ'বে না সম্ভব?
হে পরম চেতনা বিলাস,
তোমার বিভূতি বিশ্বে পড়িবে না ঝরি'
শ্রাবণের ধারা সম?
সর্ব্ব দুঃখ বাধা পরিহরি'
মূর্ত্ত হ'বে না কি সেই দেবত্ব লাভের স্বপ্ন?
আনন্দের উৎস হ'তে জাগিবে না গীত-কলরোল
অনন্তের তটপ্রান্তে শাশ্বতের বিচিত্র ঝঙ্কারে?
ঊর্দ্ধের আলোকপাতে ধরণীর বুকে—
ধরণীরে নিয়ে যাবে রহস্য সন্ধানে
চেতনার অমরত্ব পথে!

কোন্ মন্ত্রে, কোন্ সাধনায়
স্বর্গরাজ্য-দ্বার যাবে খুলি'?
কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠের অনন্ত আলোকে
অঝোরে পড়িবে ঝরি'?
যে বিরাট আলোরাশি
দৃষ্টির বাহিরে রহে—
দেয় না সহসা ধরা,
যে আলো জড়ের মাঝে
সুপ্ত রয় প্রচ্ছাদিত আপন লীলায়,—
পুনঃ সে কি উঠিবে বিকশি'
মিলিবারে জ্যোতির সাগরে?

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ—
মন্ত্র তাঁর জীবন-সঙ্গীত ;—
বাণী তাঁর আশাময়ী, সুনিশ্চিত দিব্য জীবনের।

ভগবান লাভ হয়ে যায়। ভগবান লাভ মানে কি?—আনন্দ লাভ। ভগবান সচ্চিদানন্দ কি না! তাঁকে লাভ করলে দুনিয়াতে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না—সব বিষয়ের সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়। সে আনন্দ পেলে জীব ভরপুর হয়ে যায়—আর তার কাছে যে আসে সেও সেই আনন্দের স্বাদ পায়। তখন তার শোক-তাপ সমস্ত দূর হয়ে যায়। নিজের কিছু পুঁজি না থাকলে কি কেউ অপরকে কিছু দিতে পারে? নিজেই যে আনন্দের ভিখারী, সে আবার অপরকে আনন্দ দিবে কি? সাধুসঙ্গে শান্তি লাভ হবেই। তবে সাজা সাধুর কাছে গেলে কিছুই হবে না।

ধর্ম্ম

পরলোক আছে এই বিশ্বাস থেকেই ধর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত। তার পর ভগবান কি? জগৎ কি? প্রকৃত বিশ্বাসেই এক দিন এ সব বুঝা যায়।

ধর্ম্মের ক্রিয়া খুব সূক্ষ্ম। ধৈর্য্য ধরে অগ্রসর হতে হয়। গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে সাধন-ভজন করলে ধর্ম্ম প্রকাশ হয়। তখন সাধক আনন্দে ডুবে যায়—আর সংশয় আসে না।

ধর্ম্ম-জগতে সব অন্তর নিয়ে কারবার। অন্তর খাঁটি হলে তবে ভগবানের দর্শন মিলে। কত কামনা, বাসনা, কু-ভাব মনের মধ্যে কিল্‌-বিল্ করছে। সাধন-ভজন করলে এ সব ক্রমে ক্রমে সরে যায়। মনটাকে আয়নার মত স্বচ্ছ করে ফেল। ময়লা আরসিতে (আয়নায়) কি মুখ ভাল দেখা যায়? ঠাকুর বলতেন— ভাঙ্গা আরসিতে কি কাজ হয় গো? তিনি শুদ্ধ-মনের গোচর। শুদ্ধ পবিত্র অন্তর না হলে তাঁর মহিমা বুঝা যায় না।

৪। ধর্ম্মপথে কি মানুষ এমনি আসে? দায়ে পড়ে আসতে হয়। এক জন লোকের হয়ত অনেক টাকা-পয়সা আছে কিন্তু মনে শান্তি নেই। সংসারের কোন ব্যাপারেই আত্মা শান্তি পায় না। শান্তি লাভের জন্যই ধর্ম্মের শরণ নিতে হয়।

৫। ছোটবেলা হতে ছেলে-মেয়েদের মনে ধর্ম্মবোধ জাগাতে হবে। তা না হ'লে বড় হলে ধর্ম্মে সংশয় আসবে। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন ভগবানের উপর ও সত্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকে। তাহ'লে ধর্ম্মবোধ তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য হবে এবং দেশের ও দশের সত্যকার কল্যাণ সাধিত হবে। ধর্ম্মহীন লোক সত্যই পশুর সমান। ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছুতেই মানুষের ভেতরের সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব হয়

আমাদের উপেন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিছু কাল মধ্যে আমাদের দুই বন্ধুর মুক্তির ব্যবস্থা হইল। বোধ হয় বাহির হইতে আমার কোন আত্মীয়-বন্ধু গভর্ণমেণ্টকে আমাদের মুক্তিতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে না, এই কথা বুঝাইয়াছিলেন, কারণ আমরা সংসারী, সংসারের জালে জড়িত এবং অর্থাভাবে অর্থ উপার্জ্জনেই ব্যস্ত হইব এই তত্ত্বকথা দ্বারা তাঁহাদের মনে আমাদের প্রতি একটু সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। তবে সর্ত্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, যাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি। তাহার পর বন্ধু-বান্ধবদের, বিশেষ যাদুগোপালের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা সর্ত্তাধীন মুক্তি স্বীকার করিয়া ২৬ সালের মাঝামাঝি কারা হইতে মুক্ত হইয়া বাটী আসি। শত্রুর সহিত সর্ত্তের মূল্য কোন কালেই বিপ্লবীরা দেয় না!

ইহার পর আবার নূতন খেলা আরম্ভ হইল! লোম্যান সাহেবের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি এবং জীবন চট্টোপাধ্যায়—যার যক্ষা হইয়াছিল বলা হইত তাহার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাঁকুড়া মিশনারীদের সেনেটারিয়ামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করি—অবশ্য এ সবই উভয় বন্ধু পরামর্শ করিয়া করিতাম। আর ডাঃ যাদুগোপালের মত এক জন প্রতিভাবান সুচিকিৎসককে অযথা কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিবে এবং দেশের সমূহ ক্ষতি করিবে ভাবিয়া লোম্যানকে বলি, এত বড় অন্যায় করিও না—উহাকে রাঁচিতে intern করিয়া মাইক্রোসকোপ এবং মাসে ২৫০ টাকা allowance দিয়া রাখিয়া দাও, যদি মুক্তি দিতে না চাও। জানি না কি ভাবিয়া লোম্যান সাহেব শেষ পর্য্যন্ত তাহাই করিল। সেই পর্য্যন্ত ডাঃ যাদুগোপাল রাঁচিতেই বসবাস করিতেছেন এবং তথায় প্রধান চিকিৎসক। পরে পরে সকলেরই মুক্তি হইল।

ইতিমধ্যে চেরী প্রেসের ভার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আমাদেরই সহকর্ম্মী সরস্বতী লাইব্রেরীর দলের উপর। এখনও তাহারাই চালাইতেছে।

মুক্তি পাইবার পরই আরম্ভ হইল কংগ্রেস কর্ম্মীসংঘের কর্ম্ম-জীবন। আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতি এবং সুরেশচন্দ্র দাস সেক্রেটারী হইয়া কংগ্রেস কর্ম্মীসংঘ কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের বাটীতে কর্ম্ম-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন গৌরাঙ্গ প্রেসের পাশেই।

তখন Big five অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার ও তুলসীচরণ গোস্বামী—ইঁহাদেরই নাম হইয়াছিল Big five, পঞ্চ দেবতাই ইহার চলতি অর্থ, ইঁহারা স্বরাজ দলের কর্ম্মকর্ত্তা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে দেশসেবায় রত হন। ইঁহারা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ত্রিমুকুটের অধিকারিত্ব স্বীকার করিতে নারাজ হইয়া দলাদলি করিতেছিলেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীসংঘ দেশপ্রিয়র পক্ষাবলম্বন করিয়া কর্ম্মরত হইয়াছিল। উপেন এবং আমি মুক্ত হইবার কিছু কাল পরেই এই কর্ম্মীসংঘের সভ্য হইলাম এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া আমাকে সভাপতি করিল। এই সময় হইতে কংগ্রেস-কর্ম্মীসংঘের কার্য্য চলিল।

এই কর্ম্মীসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সকল বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য সাধন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে দেশের সেবা করা। উপেন কর্ম্মীসংঘের সভ্য হইতে প্রথম রাজী হয় নাই, পরে আমার জিদে রাজী হইল কিন্তু খুব বেশী সংস্পর্শ রাখিত না। কার্য্যকরী সভারও সভ্য হইয়াছিল।

কর্মীসংঘের উদ্দেশ্য ছিল যুগান্তর ও অনুশীলনের পূর্ব্বের যে ভেদ ছিল তাহা দূর করিয়া ঐক্য স্থাপন করা এবং পুরাতন বিপ্লবীদের প্রকাশ্য কার্য্যে নিযুক্ত করা! অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করিবার ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্ব ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হইয়া কার্য্য করা এবং তাহা বেশ সুশৃঙ্খলেই হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের কার্য্য-ব্যাপারে, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়।

দেশপ্রিয় তখন কর্পোরেশনের মেয়র, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ পার্টির সভাপতি পদে বরিত হইলেন—গান্ধীজির আদেশে। কাজেই তাঁহাকে হটায় কে? তথাপি তাঁহার বিরোধী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল পূর্ব্বোক্ত 'বিগ ফাইভে'র দল গঠনের প্রভাবে। দলের মধ্যে দুই জন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, মাননীয় নলিনীরঞ্জন ও মাননীয় কিরণশঙ্কর।

গান্ধীবাদীরা সকলেই দেশপ্রিয়ের পক্ষে অর্থাৎ খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত—দুই মহা কর্ম্মী ভ্রাতা, অভয়াশ্রমের ডাঃ সুরেশ বন্দ্যো, প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি কর্ম্মীবৃন্দ, হুগলী জেলার খাদি কর্ম্মিগণ, মেদিনীপুরের ও বর্দ্ধমানের খাদি কর্ম্মিগণ সকলেই দেশপ্রিয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া কর্ম্মীসংঘের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। কর্ম্মীসংঘে প্রায় সারা বাংলায় পূর্ব্বের বিপ্লবী ও খাদি কর্ম্মী সকলেই যোগদান করিয়া দেশপ্রিয়ের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময়ে আহূত হইল কৃষ্ণনগরে "প্রাদেশিক কনফারেন্স।" প্রথমে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করার প্রস্তাব হইল। উপেন নিজে স্বীকার না করিয়া দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিল। তখনও সুভাষচন্দ্র মান্দালয় কারাগারে! তাঁহার সহিত বহু কর্ম্মীও তখন সেখায়। তখন উপেন 'ফরওয়ার্ডে'র সম্পাদকীয় দলের মধ্যে একজন হইয়া কার্য্য করিতেছে। উপেনের লেখার আদর চিরকালই ছিল, মৌলিক চিন্তাতেও কম ছিল না। স্বরাজ পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'ফরওয়াড' দেশবন্ধু স্থাপিত করিয়া যান। শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভৃতি 'ফরওয়ার্ডে'র পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন। দেশপ্রাণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তাহার ভাষণে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় গালি-গালাজ করেন। উপেন পড়িয়া শাসমলকে নিন্দার কথাগুলি তুলিয়া লইতে বলা সত্ত্বেও তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বড়ই জেদী লোক ছিলেন। একবার যে বিষয়ে স্থির করিতেন তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করা দুঃসাধ্য নয়—অসাধ্য ছিল, যাহাকে চলতি কথায় বলা হইত "গণ্ডারের গোঁ" তাব ছিল।

কৃষ্ণনগরে কনফারেন্সে তাঁহার ভাষণের বিরোধিতা করিবার ভার আমার উপরই ন্যস্ত হইল; কারণ আমি তখন কর্ম্মীসংঘের সভাপতি কনফারেন্সে তুমুল তর্ক-সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কোন মতে দেশপ্রাণ তাঁর ভাষণের মধ্যে বিপ্লবীদের নিন্দার কথাগুলি তুলিয়া লইবেন না। আমরাও তাহা না তুলিয়া লইলে পড়িতে দিব না স্থির করিলাম। সে ক্ষেত্রে বন্ধু উপেন যখন দেখিল যে, আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া যায় তখন হঠাৎ আসি

আমায় ধরিয়া লইয়া বাহিরে যাইয়া বলিল, চল, আজকের মত এই-খানেই শেষ কর। এই বুদ্ধির পশ্চাতে ছিল কিরণশঙ্করের বুদ্ধি। কিরণশঙ্কর জানিত, উপেন ধরিলে আমি নিশ্চয় ক্ষান্ত হইব।

ইহা কনফারেন্সের বৈঠকের আগের সন্ধ্যার কথা। পরের দিন সকালে শরৎ বাবু ও দেশপ্রিয় সকলেই আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, যখন সভাপতি কোন মতেই স্বীকৃত নন, তখন আর জিদ করিয়া কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিয়া লাভ কি? কিন্তু আমি কোন মতেই স্বীকার করিলাম না। কোন রকম করিয়া গণ্ডগোলের মধ্য দিয়া কনফারেন্সের কাজ শেষ হইয়া গেল। ছাত্র-কনফারেন্সে সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ও কাজি নজরুলের নূতন গান "যাত্রীরা হুসিয়ার" গীত হইল। কৃষ্ণনগরে ছাত্র-সভায় এই গান প্রথম রচিত ও গীত হয়—কাজি নিজেই এই গান গায়। উপেন সে ক্ষেত্রে বক্তৃতা দেয় আমিও বক্তৃতা দেই। নমঃ নমঃ করিয়া কনফারেন্সের কাজ শেষ করিয়া বসন্ত লাহিড়ীর উদার আতিথেয়তার সম্যক্ সুযোগ লইয়া ও ধন্যবাদ দিয়া সরভাজা খাইয়া এবং লইয়া আমরা উভয়ে একত্রেই বাড়ী ফিরিলাম। তার পর আরম্ভ হইল কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল কর্ম্মীসংঘের সভ্যদের লইয়া, যাঁহারা শাসমলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে গোল বাধান, তাঁহারা প্রাদেশিক কনফারেন্সের কার্য্যকরী সভার সভ্য ছিলেন। উপেন এবং আমি উভয়েই সভ্য ছিলাম। এক দিন সভা আহূত হইয়া ভোটের দ্বারা কর্ম্মীসংঘের যতগুলি সভ্য ছিলেন, তাঁহারা কার্য্যকরী সভা-কমিটি হইতে বিতাড়িত হইলেন। সুতরাং দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। যে দেশপ্রিয় ছিলেন আমাদের নেতা হিসাবে, তিনি এ কার্য্যে পঞ্চ দেবতার পক্ষ লইয়া আমাদের বিপক্ষাচরণ করিলেন। সুতরাং আমরা আবার রিকুইজিশন সভা করিয়া "আরিক্ষ হলে" দেশপ্রিয়র বিরুদ্ধে তিরস্কার প্রস্তাব আনিলাম। ইহাতে পঞ্চ দেবতা ভারি খুসী হইয়া আমাদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাহাতে দেখা গেল, দেশপ্রিয় তিরস্কৃত হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন উপেনকে দেশপ্রিয় আমার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন। কর্ম্মীসংঘের নিরীহ সভ্যগণ বুঝিলেন যে, এমন অবস্থা হইয়াছে—যাহাতে পঞ্চ দেবতাদের জয় হয়, দেশপ্রিয়ের পরাভব হয় এবং খাদির দলেরও তৎসঙ্গে পরাভব হয়। তখন আমি ও সুরেশ দাশ, সুরেশ মজুমদার দেশপ্রিয়কে একটি সর্ত্ত দিলাম যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আমরা তুলিয়া লইতে পারি। অবশ্য পঞ্চ দেবতা এ বিষয় কিছুই জানিতেন না। যখন তিনি সেই সর্ত্ত স্বীকার করেন—তখন আমি, সভার সময়ে, সভায় দাঁড়াইয়া আমার প্রস্তাব তুলিয়া লইলাম এবং সেদিনকার সভায় কার্য্য শেষ হইল—দেশপ্রাণ সেই দিন হইতে কয়েক বৎসর আর রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কার্য্য করেন নাই—একেবারে ১৯৩০ সালে পণ্ডিত মালব্যের জাতীয় কংগ্রেস দলের আহ্বানে কেন্দ্রীয় সভার সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে যোগদান করেন। যদিও উপেন 'ফরওয়ার্ডে' তখন কাজ করে কিন্তু আমার সঙ্গে কর্ম্মীসংঘেও একত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে থাকিত। অবশ্য কর্ম্মীসংঘের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দাশ, ক্ষিতীশচন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত কর্ম্মী এবং অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এক জন বড় নেতার মতই ছিলেন। তাঁর কর্মশক্তির কাছে ব্রিটিশের শক্তি ও বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তাঁর কাঁথির ইউনিয়ন বোর্ড সংস্থাপনের সংগ্রামে কিন্তু তাঁর ঐ জিদের জন্যই তিনি একতা রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা চলিতে পারিতেন না। আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দুঃখিত ছিলাম, আবার আমরাই তাঁকে সাদরে কেন্দ্রীয় সভার সভ্য করিয়া সে দুঃখের অবসান করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ মৃত্যুর আহ্বানে আমার সে দুঃখের অবসান হইলেও তাঁর দেহত্যাগের দুঃখে দেশ অভিভূত হইয়াছিল।

কর্ম্মীসংঘের দ্বিতীয় দুরূহ কর্ম্ম হয় নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তাঁর বিজয় লাভ। তখন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া দেশপ্রিয়ের ও পঞ্চ দেবতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। খাস কংগ্রেসের অফিস বহুবাজারের বাটী তাঁহার দখলে। তিনি খাস কংগ্রেসের কাছে শির নত না করিয়া তাঁহার নিজের দলের সভ্যদের নির্বাচনের জন্য আহ্বান করিলেন এবং নিজে মেদিনীপুরের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া খাস কংগ্রেসের নির্বাচিত সভ্য কুমার নরেন্দ্রনাথ খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ একই কারণে কেহই তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশ্য মেদিনীপুর জেলার জনগণের হৃদয়ের রাজা ছিলেন তিনি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কর্ম্মীসংঘ তাঁর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল। তখন দেশপ্রিয় ও পঞ্চ দেবতা একত্রে এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব পরিচালিত করিতেছেন।

প্রথম অবস্থায় কুমার নরেন্দ্রনাথ খাঁ, বন্ধুবর উপেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তুলসীচরণ গোস্বামী এই তিন জনকে তাঁহার পক্ষে বক্তৃতা করিতে মেদিনীপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহারা দেশের লোকের ভাবগতিক দেখিয়া নাচার হইয়া ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তাঁহারা কুমার দেবেন্দ্র কর্ম্মীসংঘের আশ্রয় লন। উপেন আমায় বলে, "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই"।" মাহিষ্য জাতির ঐক্য ভাঙ্গা বড়ই কঠিন কাজ। বীরেন্দ্র তাদের মাথার মণি হৃদয়ের দেবতা। দেখ, দলবল লইয়া যাও, আমরা সে মুখো হইব না। আমি আমার কয় জন সহকর্ম্মী লইয়া গেলাম। এবং যেদিন পৌঁছিলাম সেই রাত্রি হইতে সভায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। সে বৃত্তান্ত এখানে দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহার সহিত উপেনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত দেশপ্রাণ শাসমল কুমার দেবেন্দ্রনাথ খাঁর কাছে এ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাভূত হইলেন। তার পর আর তাঁর সঙ্গে বিরোধের কারণ ঘটে নাই। উপেন সর্ব্বদাই আমাকে পরামর্শ দিত, যাহাতে প্রকাশ্য দেশসেবায় আমাদের মত দেশসেবকরা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। ১৯২৮—২৯ সালের বিধান সভায় নির্ব্বাচন তখন আরম্ভ হইবে। হঠাৎ আমায় উপেন বলিল, তুই হুগলী মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র হতে দাঁড়াবার জন্য কংগ্রেসে আবেদন কর। আমি বলিলাম, তুই কর না কেন, আমি তোর হয়ে খেটে দাঁড় করাব। কিছুতেই রাজী না হয়ে আমাকেই জোর করে আবেদন করিয়ে নিজেই দিয়ে এল। আমি এটা জোর

তেই মনে করলাম। উপেন বললে, তোকে ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হবেই। অমূল্যধন দত্ত উকিল, হুগলীর তিনি তখন পূর্বের সভ্য ছিলেন, তিনিও আবেদন করিয়াছিলেন পুনর্বার নির্বাচিত হইবার জন্য। উপেন বলিল, এই ক্ষেত্রে সুভাষ-সেনগুপ্তের দ্বন্দ্বটিকে কাজে লাগাতে হবে। সেনগুপ্ত তোর বিরুদ্ধাচরণ করলেই সুভাষ তোর পক্ষ নেবেই এবং তোর নির্বাচন হয়েই যাবে দেখিস। আমি কোন চেষ্টাই করি নাই কিন্তু উপেনের এ বিষয়ে চেষ্টা না থাকিলেও বুদ্ধিই কার্য্যকরী হইল। ঠিক সেনগুপ্ত বিরোধ করায় সুভাষ আমায় মনোনয়ন করিল। আমি নির্ব্বাচনে শেষ পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের মত অজেয় ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া নির্ব্বাচিত হইলাম, কিন্তু তাহার ছয় মাসের মধ্যে মহাত্মার বিধান সভা পরিবর্জ্জনের আদেশ হইল। এই নির্ব্বাচনের সঙ্গে উপেনের কার্য্যকরী বুদ্ধির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

ইহার পরই আসিল ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দেশপ্রিয় ব্রহ্মদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ত্তা সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রিয়ের সঙ্গে ঘোর দলাদলি। দেশপ্রিয় ব্রহ্মদেশে যাইবার পূর্ব্বেই Civil Disobedience Committee তৈরী করিয়া যান এবং শ্রীসতীশচন্দ্র দাস মহাশয় সেই কমিটির সভাপতি। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে তেমন আগ্রহ ছিল না; তাহার কারণও ছিল, কিন্তু কিছু না করিলে ভাল দেখায় না বলিয়া পরে কিছু-কিছু কার্য্য আরম্ভ করে। উপেন তখন আর এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেয় না। আমায় কিন্তু এ আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধও করে নাই বরং বলে, তোর এ আন্দোলনে যোগদান করাই ভাল। সত্যাগ্রহীদের জেলে দিলে কষ্ট দেবে না, কিন্তু যাহারা এই সময় অন্য আন্দোলন করবে তাদের খুবই কষ্ট দেবে। আমি ন্যাকামি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে আবার কি? এখনও গুপ্ত আন্দোলন দেশে আছে না কি? হাসিয়া বলিল, তোর অজানা আছে না কি? ৩০ সালেই ত সত্যাগ্রহ ও মিথ্যাগ্রহ দুই আন্দোলন একসঙ্গেই বাংলায় দেখা দেবে। তুই সত্যাগ্রহের নৌকার মাঝি হয়ে পাড়ি দে, আমি চাকরির চেষ্টায় ঘুরি। 'ফরওয়ার্ড' তখন উঠে গেছে। কর্পোরেশনে চাকরির চেষ্টা তখন চলছে।

আমরা "ডাণ্ডি-মার্চে"র দিন লবণ বিক্রয় আন্দোলন আরম্ভ করিলাম—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ আমাকেই বাংলায় সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির প্রথম ডিক্টেটর করিয়া সদলবলে যেদিন জেলে প্রেরণ করিলেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে চট্টগ্রামে—"আরমারী রেড" হইয়া গেল। সত্যাগ্রহ ও মিথ্যাগ্রহ আন্দোলন বাংলার বক্ষে ভীষণ তুফান তুলিল। এক দিকে গোলা-গুলী বোমায় যুদ্ধ চলিল, আর এক দিকে আইনভঙ্গ করিয়া আদালতের বিচার না মানিয়া কারাবরণের হিড়িক চলিল। মিথ্যাগ্রহ চলিল একটি প্রান্তে আর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিল সমগ্র দেশ ও প্রদেশ ব্যাপিয়া। আমি সদলবলে আবার সেণ্ট্রাল জেলে নীত হইলাম এবং কিছু কাল পরে দমদমের জেলে সুরক্ষিত হইয়া এক বৎসর সানন্দে কাটাইলাম। সে সব কথা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এই জেলেই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্ত্তা বন্ধুবর মিঃ জে সি মুখার্জিকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করায় তিনি আসেন এবং তাঁহাকে বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথের চাকরীর জন্য বিশেষ অনুরোধ করি। কর্পোরেশনের দলাদলি কম ছিল না। বন্ধুবর তাঁহাকে চাকরি দিবার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং প্রথমে stock verifierএর পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন। সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মিলিত চেষ্টায় তাকে "গরুর গাড়ীর দারোগার পদে (Cart License Officer) নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। "গরুর গাড়ীর দারোগা" কথাটি উপেনের নিজের দেওয়া। বন্ধুবর মিঃ মুখার্জির তাহাতে আপত্তির কোনই কারণ ছিল না। উপেন নিজেই বলিত—"আমি এখন কলিকাতার রাজা—কেন জানিস? এই গরুর গাড়ীর সর্দ্দাররা এখন আমার সব প্রজা—এরা ইচ্ছা করলে কলকাতা এক দিনেই শেষ করে দিতে পারে।" দেখেছিলাম, তার প্রতি তার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের আর সর্দ্দারদের কত শ্রদ্ধা, আর তাদের প্রতি তার কত স্নেহ। অমন অফিসার তারা কখনও দেখেনি। এমন দরদী কর্ত্তা পেলে কে না খুসী হয়!

ইহার পর হইতে কয়েক বৎসর উভয়েই বিশেষ রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করিনি। আমাদের দেখা-শুনা হলে সংসারের সুখ-দুঃখের কথাই হ'ত। ৩১ সালে যখন দমদম জেল হতে মুক্ত হই, সেই দিন খুব সমারোহে মিছিল করে আমায় আনা হয়। সেই যাত্রাকালে বন্ধু এসে আমায় আলিঙ্গন করে একই মোটরে চড়ে কলিকাতার পথে টালার পুলের কাছে নামিয়া যায়। আমার মধ্যম পুত্র দেবব্রত আমার কারাবাসের মধ্যে বাটীতে মারা যায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রতকে সঙ্গে লইয়া উপেন কারাগারের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল এবং সেই সমারোহের মধ্যে দুই বন্ধুর স্নেহালিঙ্গনের আনন্দ আজও ভুলিতে পারি নাই।

আমি দমদম জেল হইতে ফিরিবার পর কয়লার ব্যবসায় রত হই। সেই সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ খালি হয়। আমার আত্মীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি কলিকাতা রাজনৈতিকদের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং কর্পোরেশন ব্যাপারে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল) আমায় বলেন সেই পদের জন্য আবেদন করতে, আমি রাজী হই নাই। এদিকে উপেন কর্ম্মীসংঘের সভ্য সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দাস প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে এই পদের জন্য আবেদন করিতে বলে। উপেনের এমনই জিদ হইল যে, সে নিজেই আবেদন করিয়া আমার নাম সহি করিয়া পাঠাইয়া দিবে। তখন আবার দুর্গাচরণকে বলি, সে বলে যে, আমি তখন বললাম তুই রাজী হলি না—দেখি এখন কত দূর কি করতে পারি—শৈলপতিকে নিয়ে আমি জুটেছি। শেষ দিনে রাত্রে বন্ধুবর নিজে মিঃ মুখার্জির হাতে দুর্গাচরণের স্বাক্ষরিত লিখিত ও টাইপ করা আবেদনখানি দিয়া আসে। তা নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি ঘটেছিল, যা আজ বলিবার প্রয়োজন নাই। শেষ পর্য্যন্ত শৈলপতি নিযুক্ত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ চান নাই যে, আমি কর্পোরেশনে প্রবেশ করি। তাঁরা বলতেন, "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর" অর্থাৎ "একা জে সি মুখার্জির যন্ত্রণায় অস্থির আবার তার পাশে যদি অমর চাটুজ্জে"—সর্ব্বনাশ! উপেন কিন্তু এ বিষয়ে খুব চেষ্টা করে সফল হল না দেখে বলেছিল—এরা তোকে ভয় করে।

৩২ সালে যখন পণ্ডিত মদনমোহন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠন করেন, তখ

৪৩ বৎসরে
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের ইতিহাস। ১৯৪৯ সালের মতো দুর্ব্বৎসরেও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-এর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির পরিচয়—

এ যাবৎ হিন্দুস্থানের ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪৭টি বীমাপত্রে বীমাকারিগণ ভবিষ্যতের জন্য যে সংস্থান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৩ হাজার ২১৮৲ টাকা। বীমাকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে হিন্দুস্থানের মোট ১৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭১৲ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন নিরাপদ ও লাভজনক ব্যাপারে লগ্নি আছে। বীমাকারী ও তাঁহাদের ওয়ারিশগণের বীমাপত্রের যে দাবী এ বৎসর মিটানো হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৭১ লক্ষ ২ হাজার ৫০০৲ টাকা। হিন্দুস্থান যে প্রতি বৎসরই বীমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আলোচ্য বৎসরের ১৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬ হাজার ২৪৩৲ টাকার নূতন বীমার কাজেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশদ বিবরণ সহ প্রকাশিত ১৯৪৯ সালের উদ্বর্ত্তপত্রে সোসাইটির সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৪৯-এর সাফল্য

নূতন বীমা	...১৩,৩৬,০৬,২৪৩৲
মোট চলতি বীমা	...৬৯,৭৩,২৩,২১৮৲
প্রিমিয়ামের আয়	...৩,২০,০৩,৭১৫৲
বীমা তহবিল	...১৪,২০,৬১,৯৪১৲
তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ	...২,১৩,৪১,৪৭৯৲
মোট সম্পত্তি	...১৫,৬৪,২৯,৭৭১৲
দেয় ও প্রদত্ত দাবীর পরিমাণ	...৭১,০২,৫০০৲

হেড অফিস: হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

। সেই দলভুক্ত হই। কারণ জাতীয়তা-বিরোধী সাম্প্রদায়িক রায়া আমরা স্বীকার করিতে পারি নাই। উপেন দলভুক্ত হইয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে মনোনয়ন করিলে তিনি জয়ী হইলেন দ্বন্দ্বে, কিন্তু রক্তের তিনি দেহত্যাগ করিয়া দেশকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া যান। পর আমরা কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে মনোনয়ন করি, কিন্তু রি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের চাপে পরে জাতীয় দল পরিত্যাগ করেন। হঠাৎ আমার উপর নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে দাঁড়াইবার জন্য চাপ আসে। ভাবিলাম যে, আমি ভোট দিতে অধিকারী নহি, কাজেই আর উপর চাপ আসে কেন? পরে জানিলাম যে, বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র দলীয় নেতারা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, "আমি ভোটার।" তাপি আমি দাঁড়াইতে অস্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ নির্ব্বাচনে ড়াইবার মত অর্থ আমার ছিল না এবং কুমার নরেন্দ্রনাথ খাঁ ধনী, ছাড়া কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিধান সভার বিলাস উপভোগ রিবার মত মনের অবস্থাও ছিল না। কিন্তু দল শুনিল না— দায় করিয়া আমায় মনোনীত করিল। অগত্যা রাজী হইলাম। মার দেবেন্দ্রনাথ খাঁর পিতা রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁও আমার বন্ধু ছলেন এবং কুমার দেবেন্দ্রনাথ খাঁর সঙ্গেও আমার নানা ভাবে বন্ধুত্ব ল। অগত্যা তিনি আর দ্বন্দ্ব করিলেন না—আমি কেন্দ্রীয় সভার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া একেবারে ৩৫ সাল হইতে ৪৫ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজনীতি বা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। এই নির্ব্বাচনে আমার বন্ধুবর উপেনের লেখনীপ্রসূত বিরাট বিরাট বিজ্ঞপ্তি আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য বাংলা দেশে কংগ্রেস জাতীয় দলের বিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কংগ্রেসের এক জনও নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হন নাই।

আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে, রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে বন্ধুবর উপেনের সম্বন্ধ নিতান্তই ঘনিষ্ঠ ছিল। হৃষীকেশ, উপেন এবং আমি তিন 'জন' অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম—আমাদের মধ্যে যে স্নেহ-বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন হইবার নহে। হৃষীকেশ তার সন্ন্যাস লইয়া উপনিষদ লিখিতেছেন—উপেন আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি রোগশয্যায় শুইয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া দিন গণিতেছি আর ভাবিতেছি, যাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবন পণ করিয়াছিল, তাহারা এখন জীবিত থাকিয়া স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখই ভোগ করিবে, না—তাহারা আবার দেশের সেবায় নামিবার সুযোগ পাইবে? দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তাই জানেন। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও মতভেদ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদের অন্তরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নই ছিল। এ বিষয়ে যাহারা অন্তরের সন্ধান রাখিত না তাহারা ভুল বুঝিতে পারিত। অবস্থান্তরে মতান্তর হওয়া সঙ্গত—মানুষ ত ছাঁচে ঢালা জড় নয়! আমাদের উপেন এখন পার্থিব জগতে নাই সত্য, কিন্তু 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' এই তত্ত্ব স্মরণে রাখিয়া আমরা এখনও তার বন্ধুত্বের, তার কর্ম্মকুশলতার, তার বুদ্ধির গৌরবে গৌরবান্বিত রহিব। সাংবাদিক ও সাহিত্য সমাজে তার গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তার সচ্চরিত্র, তার সত্যনিষ্ঠা, তার সত্য বলিবার সৎসাহস চিরদিন দেশে স্মরণীয় থাকিবে।

সমাপ্ত

বিজয়া

শ্রীকামিনীকুমার রায়

তিন দিন মহাড়ম্বরে জগদম্বার পূজার্চ্চনা করিয়া যেদিন তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন করা হয়, আশ্বিনের শুক্লা দশমীর সেই দিনটিকে আমরা 'বিজয়া' বলি,—সেদিন আমাদের বিজয়োৎসব। পূজার কয় দিন ভরিয়া যে-ঢাক নিতান্ত নির্জ্জীব প্রাণেও বীর-রসের সঞ্চার করে, দশমী দিন সকাল হইতেই সে-ঢাকে বিসর্জ্জনের বিষাদময় সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। দ্বিপ্রহরে অবশ্য ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদের এবং পূজায় যাঁহারা কাজকর্ম্ম করিয়াছেন ও বাড়ীতে যে সকল আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের ভূরিভোজন, এবং প্রতিমা দর্শনার্থীর শেষ কল-কোলাহল চলিতে থাকে; কিন্তু তাহারই অন্তরালে পূজারী গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠে, অনেকে প্রকাশ্যেই চোখের জল ফেলেন,—'কোন্ জন্মের কোন্ পুণ্যফলে আনন্দময়ী মা আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। আজ চারি দিক অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কে জানে, আবার মহামায়ার চরণে অর্ঘ্য দিতে পারিব কি না।' কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে-ফাঁকে তাঁহাদের চিত্ত মথিত করিয়া কেবলই করুণ সুর বাজে :—

"নবমী নিশি পোহাল,
কি করি কি করি বল,
ছেড়ে যাবেন প্রাণের উমা
দেখ না বিজয়া এল।"

বিসর্জ্জনের শেষে পূজার মণ্ডপে, আটচালা-আঙ্গিনায় এক মহা শূন্যতা বিরাজ করিতে থাকে, সে শূন্যতা বড়ই পীড়াদায়ক, সে দিকে চাওয়া যায় না, মণ্ডপের দ্বার তাই প্রতিমা বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পাঁচ দিন আর তাহা খোলা হয় না। কন্যা-স্নেহাতুর জনক-জননীর চিত্তেও তখন বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হয় :-

"বল বল গিরি, কই সে গৌরী
কই গেল কই গেল মরি
না পাই হেরিতে;
আমি হাতে পেয়ে উমাশশী
জপেছিলাম এ তিন নিশি
কপাল-দোষে পড়লো খসি
না চাই জীবন ধরিতে।

• • • •

এসেছিল কাল বিজয়া বধিতে আমায়
আমি বুকে পেয়ে বুকের ধনে
আর দু'-চার দিন রাখব মনে
করিলাম বিফল
না যাইতে নবমী নিশি
নিতে এল উমাশশী
করে না বিলম্ব বেশী
এমনি সে বড় পাগল।"

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে,—যে-দিনটিতে আমরা আনন্দময়ীকে খের জলে বিদায় দিই, যে-দিনটিতে আমাদের পূজা-মণ্ডপ শূন্য য়া যায়, যে-দিনটির আকাশ-বাতাস বিদায়-বেলার বিষাদ-মাখা ভতে ভারাক্রান্ত, সে-দিনটির নাম 'বিজয়া' হইল কি করিয়া? দিন আমরা বিজয়োৎসব করি কাহার নির্দ্দেশে? এই প্রশ্ন যে মাদের মনে জাগে, তাহার একটি প্রধান কারণ হইতেছে, আমরা নপ্রভাবে ভুলিয়া গিয়াছি যে, দুর্গোৎসব এবং বিজয়োৎসব টি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান; উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা নিতান্ত গৌণ। ষ্টতঃই দেখা যায়, দুর্গাপূজা সকলে করে না, করিবার শক্তি ং পারিবারিক প্রথাও সকলের নাই। তদুপরি সাধারণ লোকের াস,—দুর্গাপূজা রাজসিক পূজা, রাজা-মহারাজারাই তাহা করিতে রেন এবং করিবার অধিকারী। অপরে স্পর্দ্ধাসহকারে এই পূজা রতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবেই এবং তজ্জন্য শাস্তিও ভুগিতে বে। তাহাদের সম্মুখে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই,—তাহার এক াসে বলিয়া যাইবে,—'দুর্গাপূজা করিয়া অমুকের নির্বংশ য়াছে,' 'অমুকের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে'—ইত্যাদি আরও কত কি? রূপ অমঙ্গল আশঙ্কায় অনেকে বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও দেবীর তিমা পূজা না করিয়া মহাষ্টমীতে কেবল 'ঘট' পূজাই করিয়া দয়াছেন পুরুষানুক্রমে—এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু াপূজা না করিলেও এবং পূজা-কেন্দ্র হইতে বহু ক্রোশ র থাকিলেও হিন্দু-সমাজের এক বিরাট অংশ মহাড়ম্বরে জয়া' অনুষ্ঠান করে,—বিজয়োৎসবে মত্ত হয়। উত্তর ভারত ং বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুরাও দুর্গাপূজা করে না, তাহারা করে রাত্রি ব্রত—আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী ন্ত নয় রাত্রিব্যাপী ব্রত; পরদিন তাহাদেরও 'দশ-রা পরব'—মোদ-উৎসবের দিন। কাজেই ইহা বলা চলে যে, দুর্গোৎসবের ঙ্গ বিজয়া-উৎসবের যে সম্পর্ক তাহা গৌণ; একটিকে বাদ দিলেও পরটির জয়যাত্রা ব্যাহত হয় না; তাই একটির পরিসমাপ্তিতে থানে বেদনাশ্রু ঝরে, অপরটির আরম্ভে সেখানে চার দিক আনন্দ-োলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, এই যে আশ্বিনের া দশমীতে আমরা বিজয়া উৎসব বা দশ-রা পরব করি, তাহা তীতের বিস্মৃতপ্রায় এক নববর্ষের প্রথম দিনেরই আনন্দোৎসব, মাদের আচার-বিচারগুলি তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। কালে শরৎ ঋতু হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইত, সে আজ প্রায় ড় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দিনে ঋতুর প্রবেশ হইত; যে যে দিন শরৎ বৎসরের প্রথম দিনরূপে ব সমারোহে পালিত হইত, আশ্বিনের শুক্লা দশমী তাহাদের তম। অনেক বৎসরের অনেক প্রথম দিন আমরা ভুলিয়া াছি, এই দশমী দিনটিকেও সেদিক দিয়া ভুলিয়াই আছি, কিন্তু দিনে যে আজও উৎসব করি, তাহা অন্য ভাবে।

বর্ত্তমানে ১লা বৈশাখ আমাদের বৎসরের প্রথম দিন। এই দিনটি য়া যেরূপ আমোদ-উৎসবে কাটাই, অন্ততঃ কাটাইতে চেষ্টা করি, য়া-দিনেও তদ্রূপ বা ততোধিক করিয়া থাকি। এই দিনটির চিত সম্বর্দ্ধনার জন্য পূর্ব্ব হইতে আমাদের আয়োজন-উদ্যোগের থাকে না। গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষপত্র—বাসন-কোশন, ধামা-কুলো, ডেস্ক-বাক্স, চৌকি-আলমারি, দা-কুড়াল-খন্তা সমস্ত ধুইয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা হয়; রান্নার পুরাতন মাটির হাঁড়ি-খুরি ফেলিয়া দিয়া নূতন বসানো হয়; ঘর-দ্বার ও উঠান-আঙ্গিনায় কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা থাকে না; রাঙ্গামাটি ও গোবর-জলে মাজ্জিত হইয়া মেজে ও পিঁড়াগুলি তক্-তক্ করিতে থাকে, তদুপরি পিটুলির জলে আবীর ও কুঙ্কুম মিশাইয়া গৃহিণীরা দেন আলপনা, সিন্দূরে মাখাইয়া রাখেন কয়েকটি টাকা, সোনা-দানা, বাক্স-পেঁটরা, আরো কত কি! বালিকারা ঘর-সংসারের সব জিনিষের গায় দেয় সিন্দূর ও চন্দনের পাঁচ-পাঁচটি করিয়া ফোঁটা, বালকেরা সাজায় গৃহ-দ্বার পত্র পুষ্পে। সর্ব্বত্র একটা অপূর্ব্ব সুন্দর শুচিতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই দিন যাহার যেমন শক্তি ভাল দ্রব্য আহার করি, নূতন বস্ত্রে, নূতন বেশভূষায় দেহকে সজ্জিত করি, মিষ্ট বচনে, মিষ্ট দ্রব্যে প্রিয়-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানাই, সকলের কুশল কামনা করি, গুরুজনদের চরণধূলা মাথায় লইয়া আশীর্ব্বাদ চাই, ছোটদের আশীর্ব্বাদ করি, শত্রু-মিত্র, উচ্চ-নীচ বিভেদ ভুলিয়া সকলকে পরম প্রীতি-রসে কোলে টানিয়া লই। এই দিন কাহাকেও কটু কথা বলিতে নাই, কাহারো অহিত কামনা করিতে নাই। এই দিন আমাদের শুভ-মিলনের দিন; জগদম্বার চরণে এই দিন আমাদের সংবৎসরের বিজয় প্রার্থনার দিন। বিজ্ঞানীদের কথা ছাড়িয়াই দিই, কিন্তু গ্রামের সরল বিশ্বাসীদের প্রায় সকলেরই এই বদ্ধমূল ধারণা যে, এই দিনটি তাহাদের যেরূপে কাটিবে, সারাটি বৎসরও তাহাদের সেই ভাবে যাইবে; বিশেষতঃ 'মা' চলিয়া যাইবার মুখে তাঁহার যে-সন্তানকে যে ভাবে থাকিতে দেখিবেন, সেই ভাবে থাকিবার জন্যই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। তাই এই দিনটিতে ভাল খাইবার, ভাল পরিবার, ভাল ভাবে থাকিবার, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবার একটা উদগ্র বাসনা ও চেষ্টা ধনি-দরিদ্র, সুখী-দুঃখী, উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

বাংলা দেশে আশ্বিনের শুক্লা দশমীতেই বিজয়োৎসব শেষ হইয়া যায় না, শ্যামাপূজার (দীপান্বিতা) পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তাহার জের চলে। উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, দোকানী-পসারী—যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনব্যাপী কাজ-কারবার চলিতেছে এবং যাঁহারা আমাদের সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, তাঁহারাও 'বিজয়া'র পর প্রথম বার নগদ কিছু টাকা-পয়সা না লইয়া মুখ খোলেন না, কি হাত উঁচু করেন না। ইহার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি করিতে হয় না, যেহেতু, চিরাচরিত প্রথা,—এই আদান-প্রদান পরস্পরের সাদর সম্ভাষণের ভিতর দিয়া হাসি-মুখেই হইয়া থাকে। গ্রাম্য প্রচলিত কথায় ইহাকে 'বাদ দশ-রার সাইৎ' বলা হয়। এক কালে মহাজন এবং জমিদারের আদায় তহশীলও এই সময়ে সব চেয়ে বেশী হইত, কারণ তাঁহাদের কর্ম্মচারী এক বার গিয়া খাতক ও প্রজার বাড়ী উপস্থিত হইলে 'বাদ দশ-রার সাইৎ' তাহাদিগকে অল্প-বিস্তর করিতেই হইত। বিজয়া-দিনে বা বিজয়ার অব্যবহিত পরে প্রথম যে টাকাটা হাতে আসে, হিন্দুদের অনেকেই তাহার কিছুটা অংশ মাথায় ঠেকাইয়া, কখনো বা সিন্দূর মাখাইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখেন, নিতান্ত না ঠেকিলে খরচ করেন না। তার পর বিজয়া-দিনে অনিবার্য্য কারণে যে সকল আত্মীয়-বান্ধব ও

পরিচিতের সঙ্গে শুভ মিলন ঘটিবার সুযোগ হইল না, পরবর্ত্তী সময়ে তাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই আমরা প্রীতি নমস্কার জানাই কিংবা আশীর্ব্বাদ করি বা আশীর্ব্বাদ চাই, আলিঙ্গন দিই, সম্ভব হইলে মিষ্টিমুখ করাই। দূরে থাকে যাহারা, সারা বৎসর ভুলিয়া থাকি যাহাদের, তাহাদেরও চিঠি লিখি, 'বিজয়া'র সাদর সম্ভাষণ জানাই, সম্পর্কানুযায়ী আশীর্ব্বাদ করি বা আশীর্ব্বাদ চাই।

'বিজয়া'র এই প্রকারের লোকাচারগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের 'বিজয়া-উৎসব' প্রকারান্তরে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় এক নববর্ষেরই উৎসব। পণ্ডিতী বিচারেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তবু একটু গোল থাকিয়া যায় 'বিজয়া' নামটি লইয়া। কেহ বলেন,—এই দিন আমাদের বিজয় প্রার্থনার দিন, নববর্ষে সকলের বিজয় হউক, শুভ হউক,—এই বিজয় কামনা হইতে আশ্বিনের শুক্লা দশমী বা এক কালের শরৎ-বৎসরের প্রথম দিন 'বিজয়া' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে,—আমরা ১লা বৈশাখ যে নববর্ষ উৎসব করি, তাহাকে তো বিজয়া বা বিজয়োৎসব বলি না। আশ্বিনের শুক্লা দশমী ছাড়া অতীতে আরও যে যে দিন শরৎ বৎসরের প্রথম দিন হইয়াছিল—(যেমন কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ, অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা) সেই সেই দিনেও তো আমরা বিজয়োৎসব করি না। তবে এই একটি দিনে 'বিজয়া' বলিয়া মহা সমারোহে উৎসব করিয়া আসিতেছি কেন? কাহার নির্দ্দেশে? এইখানেই মনে হয়, দুর্গোৎসবের সঙ্গে বিজয়োৎসবের সম্পর্ক। বাল্মীকির মত না হইলেও লোকমত এই যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র আশ্বিনের শুক্লা নবমীতে রাবণকে বধ করিয়া মহারণে বিজয় লাভ করেন এবং পরদিন দশমীতে মহাড়ম্বরে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া সীতা সহ অযোধ্যা গমন করেন। জন-চিত্ত চিরকালই মহতের অনুসরণ করে। রামরাজ্যের লোক যে তাহাদের পিতৃতুল্য আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের বিজয়োৎস[ব] আপনাদের বিজয়োৎসবরূপে চিরদিন পালন করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাতে [আপত্তি] করেন। তাঁহারা বলেন যে, শরৎ কাল কোনও দিনই যুদ্ধের [কাল] ছিল না; এই কালে রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয় নাই, হ[ইতে] পারে না। কিন্তু পণ্ডিতী মত মানিয়া লইলে নববর্ষের [প্রথম] দিনকে 'বিজয়া' বলি কি করিয়া? বিজয় কামনা হইতেই 'বিজয়া' নামের উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে ১লা বৈশাখকে '[বিজয়া'] বলি না কেন? উহাও তো আমাদের বিজয় কামনার দিন এবং দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া নববর্ষের প্রথম দিনরূপে উহা[কে পালন] করিয়া আসিতেছি! আমাদের অভিমত এই যে, যে-যুগে আশ্বিনের শুক্লা দশমী হইতে নূতন বৎসর গণনা করিত, সেই [যুগে] রামচন্দ্রের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়, এবং রামচন্দ্র নববর্ষের পূ[র্ব্বে] রাবণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বৎসরের প্রথম দিন বিজ[য়োৎসব] করিয়াছিলেন; কালক্রমে রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব এবং শরতে[র] নববর্ষোৎসব এক হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষে পার্থক্য করা কঠিন। দুইটির সম্পর্ক গৌণ হইলেও এ কথা স[ত্য যে] আশ্বিনের শুক্লা দশমীকে যে আমরা আজও ভুলিতে পারি[নাই] এবং কোনও দিন পারিবও না, তাহা 'অকাল-বোধন' এবং রা[মের] বিজয়োৎসবের উভয় প্রভাবেই; সেদিনের বিজয়া নামটি প্রভাবেরই ফল এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীরই দেওয়া। আমরা একরূপ অজানিত ভাবেই একই বিজয়া নামের যুগপৎ দুইটি উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি,—একটি র[ামের] বিজয়োৎসব অপরটি নববর্ষোৎসব। তবে ঐ যে বিজ[য়ার] বিষাদমাখা সুর, তাহা তো বাঙ্গালী সমাজের সেদিনকা[র] যেদিন তাহাকে বাধ্য হইয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে ৮।১০ [বৎসরের] কন্যাকে চোখের জলে বিবাহ দিতে হইত!

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'পল্লীবাসী' সংবাদ দিতেছেন:—পানাগড় ও বুদ্‌বুদের মধ্যবর্ত্তী যে ৫০ হাজার বিঘা জমী ১১খানি গ্রামকে উৎসাদিত করিয়া গত যুদ্ধের সময় দখল করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে শিবিরাদি সন্নিবেশে ১০ হাজার বিঘা বাদে এত দিন ৪০ হাজার বিঘা পড়িয়াছিল। ঐ জমি উৎখাত গ্রামবাসীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য আন্দোলনও হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ জমি না কি এক জন পাঞ্জাবী ঠিকেদারকে বিলি করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, খুবই অসঙ্গত কাজ হইয়াছে। জনসাধারণকে এ ভাবে উপেক্ষা করা আদৌ রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।" 'রাজনৈতিক' না হইলেও ইহা অর্থনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক নহে কি?

• • • •

'শিক্ষা ও কৃষি' পত্রে প্রকাশ:—"কয়েক বছর পূর্ব্বে জনৈক —— আমাদের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চ বেতনে সহরাঞ্চলে অন্য এক বিভাগে কার্য্য পাইয়া [চলিয়া] যান। হঠাৎ সেদিন দেখি যে তিনি আবার গ্রাম্য [বিদ্যালয়ে] ফিরিয়া আসিয়া আবার শিক্ষকতার কার্য্য অল্প বেতনেই [লইয়াছেন।] জিজ্ঞাসা করিলাম, উচ্চতর বেতন ছাড়িয়া আবার ব[ড়] শিক্ষকতা কার্য্যে কেন আসিলেন? উত্তর পেলা[ম,—উপযুক্ত] বেতন পাইতেছিলাম না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম সেখানে তো এক শত টাকা বেতন ছিল—আর এখা[নে] ৪০৲।" বলিলেন, তা ঠিক, টাকার অঙ্কের দিক দিয়া [সেখানে] হয়ত বেশীই ছিল। কিন্তু সহরাঞ্চলের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ [করিতে] গেলে এবং মানসিক আনন্দ উপভোগের জন্য বা ম[র্য্যাদা] রক্ষা করিবার জন্য যে সব কার্য্য করিতে হয় বা অর্থব্যয় তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে শিক্ষকতাই অর্থের দিক দিয়া ভাল। মানসিক আন[ন্দ]

...বা মানসিক শান্তি রক্ষার জন্ত যে কাজ ভালবাসি, তাহাই ...। এ জন্ত আর কোনো অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু ...ের সেই অপর কার্য্যের সময় প্রাপ্ত বেতনের অর্থ হইতেই সেই ...সিক আনন্দ বা শান্তি ক্রয় করিতে হইত—তৎ সত্ত্বেও এখানের ... আনন্দ পাইতাম না।"

*　*　*　*

'বীরভূমবার্ত্তার' আশা :—"বিহার গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন অতঃপর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আর কাহাকেও সরকারী চাকুরীতে ...ক্ত করা হইবে না। কেবল অনুন্নত শ্রেণীর জন্ত কিছু সংখ্যক ...রী সংরক্ষিত থাকিবে। বিহার গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্য নূতন ...নতন্ত্রের বিধানানুযায়ীই হইয়াছে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ...ত রাষ্ট্রে সকল শ্রেণীর নাগরিককে সমান সুযোগ ও সুবিধা ...রা হইবে, এই নীতি পালন করিতে গেলে কোন বিশেষ ব্যবস্থা ...চলে না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত সরকারী চাকুরী সংরক্ষণ অবশ্য ...নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু তাহাও শাসনতন্ত্রের একটি বিধানের ...অনুমোদিত। বিহার গভর্ণমেণ্ট ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, ...কারী চাকুরীর প্রার্থিগণকে এখন হইতে এই প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা ...হইবে না যে, তাহারা খাঁটি ঐ প্রদেশেরই লোক অথবা ...সাইলড অধিবাসী। বিহারে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ...'ডোমিসাইল্ড' প্রশ্নকে বহু বৎসর ধরিয়া অত্যধিক গুরুত্ব ... হইয়া আসিতেছে। ইহা বিহারী-বাঙ্গালী বিরোধের একটি ... কারণ ছিল এবং ইহা দ্বারা বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি ...র করা হইতেছিল। এই প্রথা তুলিয়া দিয়া বিহার ...ণ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই ...নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শিত ...না।"

*　*　*　*

...ীরভূম বার্ত্তায়' প্রকাশিত রামপুরহাটে জনতার দাবী :—"গত ...সেপ্টেম্বর রামপুরহাটে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র হাজরার সভাপতিত্বে ...জনসভা হয়। এবং উক্ত সভায় গণপরিষদ সদস্ত শ্রীযুত ...লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গান্ধিজী প্রদত্ত ২৩০০০৲ টাকার ...হিসাব না দেওয়ার সমালোচনা করিয়া ডাঃ ভোলানাথ ...শ্রীযুত দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রামপুরহাটের নেতৃস্থানীয় ... বক্তৃতা করেন। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব হয় ...৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রামপুরহাটে মহাত্মা গান্ধীর ...কালে বীরভূমবাসী দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ...০০৲ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল—যে টাকা গান্ধিজী ...ভূমের জনসাধারণের কল্যাণার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল—সেই ...তক ব্যয়িত না হওয়ায় বা কোনও হিসাব না পাওয়ায় ...ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে, এবং সমগ্র অর্থ প্রতিনিধিস্থানীয় ...নীর হস্তে অর্পণ করা হউক, এই দাবী উপস্থাপিত ...।"—সংবাদদাতা

*　*　*　*

...াতা" বলিতেছেন :—"ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ... একটা আশঙ্কাজনক ছায়াপাত হইয়াছে এবং কোন কোন অংশে অন্ন-বিস্তর খাদ্যাভাবও দেখা দিয়াছে। সুতরাং ভারতে খাদ্যের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। কেবল ভারতবর্ষ বলিলে ভুল হইবে, পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ, বিশেষ করিয়া এসিয়া ভূ-খণ্ডের বহু দেশে খাদ্যের পরিস্থিতি আদৌ সন্তোষজনক নহে। এইরূপ অবস্থায় সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমেরিকার কোন কোন অংশে না কি বাড়তি খাদ্য নষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে। বাড়তি খাদ্য অন্ত দেশে প্রেরণ না করিয়া নষ্ট করায় হয়ত খাদ্য-মূল্যের পড়তা ঠিক রাখা হয় কিন্তু খাদ্যের এই বিরাট অপচয়কে অমানুষিক বলিয়াই মনে হয়। ডাবলিনের সম্মেলনে আমেরিকার এই বাড়তি খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলিবার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্য নষ্ট করা হইতেছে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ জগতে নিত্যই ঘটিতেছে যে, কোন ব্যাপারেই আর বিস্ময়ের কিছু মাত্র নাই। খাদ্যকে রাজনীতির খপ্পর হইতে মুক্ত করিবার সদিচ্ছা যাহাতে বিভিন্ন দেশের হয়, তজ্জন্ত অনেকেই আবেদন-নিবেদন করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে খাদ্যও যে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া ঠকিতে হয়।"

*　*　*　*

পরিশেষে সহযোগী মন্তব্য করিতেছেন :—"সুতরাং জীবন-মরণের সমস্যা যেখানে নিহিত রহিয়াছে সেখানে অপরের সুবুদ্ধি, সুবিবেচনা ও সুবিচারের উপর নির্ভর করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা দেশ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এখন পর্য্যন্ত হই নাই। আজ তাই দিকে দিকে খাদ্যাভাবের রব উঠিয়াছে। না উঠিয়া উপায় কি? রাজনীতি, ব্যবসায়ীর দুর্নীতি এবং বহু নীতি-রীতির মধ্যে খাদ্য দ্রুত এরূপ ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে যে, সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে যথেষ্ট বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত ভাবেও খাদ্য বিষয়ে সংগ্রাহক না হইয়া যদি উৎপাদনে মন দেওয়া যায়, তবে হয়ত বাঁচিবার পথ আছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, জগৎ যে পথে চলিয়াছে তাহা বাঁচিবার পথ নয়।"

*　*　*　*

'নীহার' সত্য মন্তব্যই করিতেছেন :—"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যা—মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন ঊর্দ্ধমুখী হইতে থাকায় দেশের অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। বিহার ও পশ্চিম-বাংলার বহু স্থানে খাদ্যমূল্য লোকের ক্রয়-সামর্থ্যের বহির্ভূত হওয়ায় মৃত্যুর পথ ক্রমাগত প্রশস্ত হইতেছে। কতকগুলি স্থানে অনাহারে মৃত্যু-সংবাদও প্রকাশ পাইতেছে। এতদপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে দেশবাসীর যথাযথ খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, রোগপ্রবণতা, অপুষ্টি ও অল্পপুষ্টিজনিত নানা রোগের ভীষণতা লোককে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি, বিশেষতঃ ক্ষয়রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধির হার দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার হইতে অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কমাইবার জন্ত নিত্য-নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সেই সকল 'গয়ং গচ্ছ' নীতিই কোনরূপ কার্য্যকরী হইতেছে না দেখিয়া লোকের সেগুলির প্রতি আর যেন কোন আস্থা থাকিতেছে না।

সরকার হইতে দিনের পর দিন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে নব নব অর্ডিন্যান্স জারী করা হইতেছে, এই সমূহ সত্ত্বেও মুনাফাশিকারী মজুদকারদের শায়েস্তা করা হইতেছে কোথায়? খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য রোধের সরকারী বিধি-ব্যবস্থা ও হুমকী আদি নিষ্ফল হইতে থাকায় দেশবাসী নিরাশ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া উঠিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে আর এই সমূহ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? যাহা হউক, সম্প্রতি কঠোর হস্তে এই সমস্যা সমাধানের যে সমূহ পন্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা কি প্রকারে ও কতদূর সুফলপ্রসূ হইতে পারে, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।"

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা'র মন্তব্য:—"নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে জেলায় অনেকগুলি সর্ব্বার্থ-সাধক সমবায় সমিতি গঠিত হইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সুযোগে ইহার বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে এমন কি একই ইউনিয়নে একাধিক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতি গঠনের জন্য যতখানি উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, সমিতি রেজেষ্টারি হওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করার জন্য সেই উৎসাহের অভাব ঘটিয়াছিল। বিত্তশালী ব্যক্তিদের অর্থ উপার্জ্জনের আগ্রহ যে ইহার মধ্যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু অতোধিক আগ্রহ ছিল ন্যায্য মূল্যে বস্ত্র সংগ্রহের আগ্রহ। দুই-একটি সমিতির বস্ত্র সংগ্রহের দুর্দ্দশার সংবাদ জানিতে পারিয়া বাকী সমিতিগুলির উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মীরা অগ্রণী হইয়া এই সমস্ত সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছিল। সমিতিগুলি ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হইলে ইহার দ্বারা ইউনিয়নগুলির উন্নতিমূলক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিত ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বিশদ বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়া কেবল মাত্র প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিব যে, সরকারী প্রচার ও কার্য্যকরী নীতির মধ্যে প্রচুর ব্যবধানের ফলেই এই সমস্ত সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নিরুৎসাহিত হইয়াছে। বার বার এইরূপ ব্যর্থতা দেশবাসীকে কর্ম্মবিমুখ করার অন্যতম কারণ বলিলে অন্যায় হইবে না।"

* * * *

তাহার পর সহযোগী মন্তব্য করিয়াছেন:—"কাহার দোষে ও কোন্ কারণে এই সমস্ত সমিতি কার্য্যকরী হইতেছে না, তাহা লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রতিটি জেলায় ও মহকুমায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিয়া যাহাতে এই সমস্ত ইউনিয়ন সমিতিকে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই আজ সরকারের ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। একমাত্র ইহার সাহায্যেই সংগ্রহ, বণ্টন ও উৎপাদন প্রভৃতি সকল কাজের সাফল্য ঘটিবে এবং দেশবাসী দায়িত্বশীল হইবে। অন্যথায় প্রতিদিন দেশবাসীর মনে অসন্তোষ যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইবে বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না।"

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' যথার্থ কল্যাণকর পরামর্শ দিতেছেন:—"আসন্ন পূজার ছুটিতে কলেজের ছাত্রবৃন্দ স্ব স্ব গ্রামে ছুটি উপভোগ করিতে যাইবেন। তাঁহাদের বেশীর ভাগই গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে উৎসাহশীল। এই সমস্ত ছাত্রদের সাহায্যে প্রতিটি গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সংগ্রহ করা হইলে, পরিসংখ্যানের দিক দিয়া অশেষ উপকার হইতে পারে। গ্রামাঞ্চলের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যোৎপাদন, রোগ ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা, এমন কি প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছাত্রদের সহায়তায় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রয়োজন মত তাঁহাদের সরকার হইতে কিছু পারিশ্রমিক ব্যবস্থা করিয়া দিলেও ভাল হয়। আদম-সুমারীতে যাহা লওয়া হইবে না, তাহাই ছাত্রদের সাহায্যে প্রতিটি গ্রাম হইতে লওয়ার ব্যবস্থা করিলে ভাল হইবে। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়দের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে পারেন।"

* * * *

'ত্রিস্রোতা'য় প্রকাশ:—"মিরা বহিন্ (ইনি বিলাতের জনৈক নৌ-যুদ্ধবহরের সম্ভ্রান্ত এ্যাড্‌মিরালের কন্যা), ৩২ বৎসর বয়সে গান্ধীজির শিষ্যা হন এবং দীর্ঘ ২৩ বৎসর তাঁহার পুণ্যময় জীবন, গান্ধীজির সমগ্র বিশ্বের শান্তিময় গ্রাম প্রতিষ্ঠার আদর্শে উৎসর্গ করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশ তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী গ্রাম সৃষ্টির পরিকল্পনার জন্য ৩০০০ একর জমি ডেরাডুন জংলী মহল হইতে দান করিয়াছেন। হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল উত্তরে হৃষীকেশ হইতে ২ মাইল দূরে পুণ্যপ্রসূতা গঙ্গার দক্ষিণে তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের কোলে "পশুলোক" নাম দিয়া এই শান্তিময় সমগ্র বিশ্বের আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার সম্প্রতি মাত্র ৩৫০০০৲ বাৎসরিক খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং গান্ধী ফাণ্ড হইতে এই বৎসরের জন্য মাত্র ৫০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বর্ত্তমানে বহিন্ তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী দুইটি গ্রাম সৃষ্টি করিয়াছেন গ্রামের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই কৃষক ও কুটিরশিল্পী। মহাত্মার আদর্শ অনুযায়ী এই গ্রাম দুইটি হইবে আত্মনির্ভরশীল, স্বাস্থ্যবান ও সুখী জনতার আবাসভূমি। প্রায় ৩০টি পরিবার এই পশুলোকে স্থায়ী বাসিন্দারূপে ঘরবাড়ী বাঁধিয়াছেন। প্রত্যেক কৃষিজীবী পরিবার ১০ একর জমি এবং যাহারা ফল, তরি-তরকারী ইত্যাদি চাষাবাদ করিবেন প্রত্যেক ২ একর জমি পাইবেন। অন্য গ্রামটি মাত্র কুটির-শিল্পীদের জন্য, প্রত্যেক পরিবার ২ একর জমি পাইয়াছেন কুটিরশিল্পে প্রস্তুত জিনিষপত্রগুলি বাহিরে বিক্রী করা যাইতে পারিবে। উভয় গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা বৈদ্যুতিক শক্তি বা রেডিও ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ইটের দেওয়াল দেওয়া বাড়ী নিষিদ্ধ এবং মাটির দেওয়াল দেওয়া বাড়ীতে চিরকাল সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করিতে হইবে। যন্ত্রচালিত আধুনিক ট্রাক্টর ইত্যাদি বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ বা গরু ভিন্ন (মহিষ ছাগল) দুধের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে না। অর্থের জন্য যতটুকু নিজ পরিবারের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত তামাক, আখ এমন কি ধান পর্য্যন্ত চাষ করিয়া বিক্রয় করা সীমাবদ্ধ থাকিবে।"

"রঞ্জন"

সাতই অগাষ্ট, ১৯৪৭।

তারিখটার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। বারোই আষাঢ় বা ছাব্বিশে জুন থেকে চৌঠা অগাষ্ট পর্যন্ত দেবেশ সাময়িক ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল অপর এক ঊর্ধ্বলোকে, যেখানে নিরবধি কালকে খণ্ডিত করবার দায় ছিল না। দেবেশ আর মালতী সেই নিঃসময়ের সমুদ্রে ঘড়ির কাঁটাকে আর ক্যালেণ্ডারের পাতাকে গভীর অবহেলার সঙ্গে অবজ্ঞা করে অবগাহন করেছে প্রাণ ভরে। সেই সময়টায় কাল ব্যাপ্তি লাভ করে চিরন্তনীর মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল, আর স্থান সংকীর্ণ হয়ে শুধু সেইটুকুতে পর্যবসিত হয়েছিল যতটুকু প্রয়োজন ওদের দু'জনের পাশাপাশি বসবার জন্তে। দিন, ঘণ্টা, মিনিট ইত্যাদি কালখণ্ড তাই তাদের এত দিন লাঞ্ছিত করেনি, ঠিক তেমনি ওরা বিড়ম্বিত হয়নি দু'জনের-রচা ক্ষুদ্র বিশ্বের বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা।

সেই ক্ষুদ্র বিশ্ব থেকে বাইরে এসে দেবেশের নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হোলো। বাইরে-আনা বিমলার বিহ্বলতার সঙ্গে বাইরে-আসা দেবেশের অসহায়তার তুলনা করলে ভুল হয় না।

অন্তরে দেবেশ একা ছিল। তার সৌহার্দ্য ছিল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু সখা ছিল না কেউ। সে একোদর হয়ে অনেকের সঙ্গে থেকেছে, খেয়েছে, গল্প করেছে; কিন্তু গ্রীবাকে পৃথক্ রেখেছে সর্বদা। অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়েও, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাকে সংস্পর্শে আসতে হয়েছে বহুর সঙ্গে। রেডিয়োয় চাকরি করে অন্যথা হবার উপায় ছিল না। তাছাড়া এত দিন যে তার এত লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে তাদের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই তার চরিত্র বা রুচিগত সাদৃশ্য খুব বেশি ছিল না। তবু চেনা হয়েছে, ভাব হয়েছে, কাজ চলেছে। এমন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়েছে যিনি একটা বক্তৃতার ভার পাবার জন্তে হেন হীন কাজ নেই যা করতে অস্বীকার করবেন। দেখা হয়েছে এমন কলেজে-পড়া মহিলার সঙ্গে যিনি অভিনয়ানুষ্ঠানে দু'মিনিটের একটা পার্টের জন্তে স্বেচ্ছায় না বিতরণ করবেন এমন করুণা পুরুষের কল্পনাতীত। কাজ করতে হয়েছে এমন সাহিত্যিকের সঙ্গে যাঁর একমাত্র আলোচ্য বিষয় আগামী নীলামে সস্তায় প্রাপ্তব্য বস্তুতালিকা।

আরো দেখা হয়েছে সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে, পদাধিকারবলে যাঁদের প্রতাপ প্রবল, প্রতিপত্তি অপ্রতিহত এবং প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। বেতারে এলেই কিন্তু তাঁদের দুর্বলতম দিকটা সব চাইতে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁদের সব আছে, নেই শুধু খ্যাতি। খবরের কাগজে তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়, কিন্তু সব সময়েই নামের পরে থাকে পদ বর্ণনা—সেক্রেটারি অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রখ্যাত, পরিচিত—কিন্তু খ্যাতি ও পরিচিতি দুইই এমন বাহিরীণ কোনো পদার্থের উপর নির্ভরশীল যা তাঁদের ব্যক্তিত্বের অবিভাজ্য অংশ নয়। পরিচয় আছে, কিন্তু সে যেন শকুন্তলার পরিচয়ের মতো। আংটিটি হারিয়ে গেলে আর উপায় নেই! আসল কথাটি মিষ্টার অমুকচন্দ্র অমুক নয়, সেটা গৌণ, মুখ্য প্রশ্নটি হচ্ছে সেক্রেটারি অব্ ইত্যাদি।
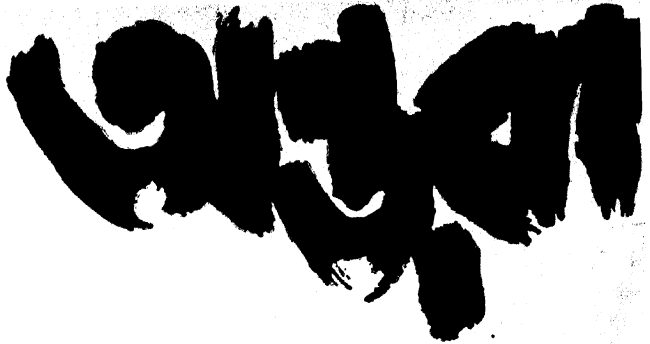
• সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই, কিন্তু কোনো না কোনো দিকে কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, এমন লোকের সম্বন্ধে তাই এঁদের অবিশ্রান্ত ঈর্ষা। দৈনিক কাগজের শারদীয়া সংখ্যায় ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করতে মিষ্টার মিত্রের তাই এমন ব্যাকুলতা, নিজের পয়সায় অপাঠ্য প্রেমের গল্প ছাপাতে মিষ্টার ঘোষের তাই এমন আকুলতা।—যদিও এক জন কোন প্রদেশের যেন ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার না কী, আর অপর জন বুঝি কোন প্রদেশের হোম সেক্রেটরি!

এদের কারো সঙ্গে দেবেশের কিছুমাত্র মিল ছিল না। না মাথার, না মনের। কই, তবু কোনো বাধাই তো অনতিক্রম্য হয়নি! কেউ সি. এস. আই., কেউ বা সি. আই. ই., দেবেশ এর কিছু নয়, কিন্তু বিনা দ্বিধায় এবং নিঃসংকোচে সে এদের সঙ্গে মিশেছে, যতটুকু কাজের জন্তে দরকার। তার বেশি যে মেশেনি তা সময়াভাবে বা অন্য কোনো কারণে, সংকোচ বা আর কিছু ছিল না তার মধ্যে। ব্যক্তিগত, বিত্তগত বহু বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও কোথায় যেন দেবেশ আর এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে আনাগোনার অবাধ একটা পথ ছিল। দেবেশের বিত্তহীনতা ও অপর পক্ষের বিত্তাহীনতা সত্ত্বেও দু'য়ের মধ্যে অসংকোচ সহযোগের পথ রুদ্ধ ছিল না।

কিন্তু আজ যখন দেবেশ মজদুর-মণ্ডলীর অনুষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে জনগণের সান্নিধ্য লাভ করবার কথা কল্পনা করল, তখন তার মন কোন অজানা ভয়ে যেন কম্পিত হোলো। মার্ক্‌স্‌-কথিত সুসমাচারের শ্রেণীযুদ্ধ ইত্যাদি উক্‌-কবোক্‌ উক্তিগুলির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ সমস্ত বিদ্বেষজাত মতবাদের উপর তার ছিল ইন্দ্রিয়গত বিতৃষ্ণা। লোকের ভালো করব লোককে মন্দ ভেবে? বহুকে বাঁচাব কয়েক জনের প্রাণনাশ করে? এ কেমন কথা? এ ছাড়া কি উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই আছে। এই নিশ্চয়তা দেবেশ মনে-প্রাণে এত দিন পোষণ করে এসেছে, এক বারও এমন কথা মানেনি যে, তার সঙ্গে তার ভৃত্যের এমন কোনো বিরোধ আছে যা ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণীগত।

ভালো লোক আছে, আছে মন্দ লোক। প্রভুদের মধ্যেও, ভৃত্যদের মধ্যেও। কিন্তু প্রভু বলেই এক জন দানব, আর ভৃত্য বলেই অপর জন দেবদূত—এমন রূপকথায় দেবেশ কোনো দিন বিশ্বাস করেনি, আজো করবে না। এ যে নব অস্পৃশ্যতাবাদ! কিন্তু তবু, কোনো বিশেষ মজদুরের সঙ্গে দেখা করবার আগেই, মজদুর-মণ্ডলীর সমষ্টিগত রূপের চিন্তায়ই, দেবেশ কিঞ্চিদধিক শংকিত হোলো।

না? দেবেশ তো সেখানে পরশ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে চ্ছে না, সে যাচ্ছে সত্যান্বেষী প্রতিবেদক হয়ে, স্বাধীন পরিদর্শক য়, তবু দেবেশের মনে ভয়ের যেন সীমা রইল না। কেবলি ন হতে থাকল যে, সে যেন এমন কোনো শক্তির সম্মুখীন ত যাচ্ছে যার সঙ্গে তার পরিচয় অল্প, বন্ধুতা অল্পতর। ক বার যেন এমন কথাও মনে এলো যে, এই অজানা শক্তির ঙ্গ কোথাও যেন থাকতে পারে কিছু বিরোধিতা। এই রোধিতা যে একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত, সে সম্বন্ধে দেবেশের সন্দেহ ল না, সে জানতো যে, এক অপরের কথা জানতে পারলেই ার হবে ভুল বোঝার, কিন্তু তবু, সব যুক্তি সব বিশ্বাস ত্ত্বও, একাকী বস্তীযাত্রা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হোলো না। বেশ যেন নিজেকে দেখল উত্তাল এক সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান নার্থিরূপে, যার সন্তরণপারদর্শিতায় তার নিজেরই মনে সন্দেহের ময় হয়েছে। ভয় বাড়ছে এই কথা ভেবে যে, ওই অদম্য তরঙ্গরাশির মুখে মানুষের সন্তরণদক্ষতা বুঝি একান্তই অকিঞ্চিৎকর।

শ্রেণীভেদে অবিশ্বাসী হয়েও দেবেশের কেবলি মনে হতে থাকল , সে যেন এমন কোনো নিরালোক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথে পা বাড়াতে চ্ছে, যেখানে এক জন অন্তত পথজ্ঞ প্রদর্শক নেওয়া প্রয়োজন। বেশ তাই টেলিফোন করল লেবার কমিশনারকে। পারস্পরিক রিচয় প্রদানের পরে দেবেশ বলল, "এত দিন ভোজ্য বিতরণ হয়েছে াক্তার রুচির বা প্রয়োজনের কোনো বিচার ব্যতিরেকেই। আজ দের একটু তদারক করতে চাই, তাই আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা রি।"

লেবার কমিশনার ছিলেন বীরেন বক্সী। দেবেশ যখন কলেজের র্ষ্ট ইয়ারে, বীরেন বক্সী সেই বারই বি-এ পাশ করে বেরুল। কিন্তু 'জনের দেখা হয়েছিল ডিবেটিং সোসাইটির কোনো একটা সভায়। ক দলের নেতা ছিল বক্সী, আর বিরোধী দলের অজ্ঞাত এক জন ক্তা ছিল দেবেশ। জুনীয়র হয়েও বক্সীর বক্তৃতার যুক্তিখণ্ডনে দেবেশ যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করেনি বলে তদানীন্তন কলেজ-মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল। ফলে দেবেশকে তর্ক-সভাপতির কাছে এইরূপ জবানি দিতে হয়েছিল যে, কাউকে অপমান করবার দুরভিসন্ধি তার ছিল না, কেন না তর্কে হেরে গিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠগণ যুক্তি-অস্ত্র পরিহার করে বয়োজ্যেষ্ঠতার মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। বলেছিলেন, ওই এক রত্তি ছেলের মুখে শুনতে হবে এমন সব ওজনদার কথা? কী লাভ তবে ওর চাইতে পাঁচ বছর আগে জন্ম নিয়ে? বিদ্যা এক কথা, বিনয় আর। আমাদের যদি বিদ্যা নাই থাকে, তাই বলে কি ওর বিনয় থাকবে না? আমরা যুক্তি দিয়ে ওকে পরাস্ত করতে পারিনি, কিন্তু, হে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়, আপনাকে শাসন দিয়ে ওকে শায়েস্তা করতেই হবে। মনসা যা হয়নি, বয়সা তা হতেই হবে।

বিতর্কের নাটক এবং দেবেশের তথাকথিত ক্ষমা প্রার্থনার প্রহসনের শেষে অপর দলের একটি মাত্র ব্যক্তি দেবেশের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি বীরেন বক্সী। এসে বলছিলেন, "দেবেশ, আই থিংক য়ু আর এ ডেন্‌জারাস ফেলো, বাট আই ওয়ান্ট য়ু টু নো দ্যাট আই ওয়াজ নট এ পার্টি টু দি মোরোনস্‌' ডেপুটেশন টু দি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আমি হারাতে জানি, হারতেও জানি।"

দেবেশ করমর্দন করে বলেছিল, "থ্যাংক্ য়ু, ওল্ড্ চ্যাপ।" তার বেশি নয়। হোক লৌকিক, ক্ষমা প্রার্থনার তিক্ত স্বাদটা তখনও তার মুখে ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে বীরেনকে সে ক্ষমা করলেও বীরেনের দলের উপর তার ছিল অপরিমেয় অশ্রদ্ধা। ব্যক্তিকে সে তখনও দল থেকে আলাদা করে ভাবতে শেখেনি।

বীরেন কিন্তু ছিল সত্যকার খেলোয়াড়। কলেজ ডিবেটের তর্ক তার কাছে ছিল খেলা। খেলায় কেউ জিতবে আর কেউ হারবে। এই তো নিয়ম। এবারে ওরা জিতেছে, পরের বারে আমরা। তাই নিয়ে হৃষ্ট হবারও যেমন কারণ নেই, রুষ্ট হবারও নয়।' তর্ক ওর কাছে ছিল বাক্‌-চাতুরী। অন্তরের কোন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তার ছিল না সামান্যতম যোগাযোগ। বীরেনের কাছে তর্ক ছিল ওকালতি, যে পক্ষের ব্রীফ, সে পাবে সে-ই তার পক্ষ, অপর পক্ষ বিপক্ষ। ম্যাট্রিক পাশের পর থেকেই বীরেন জানতো যে আই-সি, এস্, অডিট, আই- পি- এই তিনটের কোনোটাই না হলে সে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরবে। তখন এই পেশাদারী তর্কই তো হবে তার জীবিকা।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। প্রথম পরীক্ষায়ই সে সসম্মানে তৃতীয় স্থান অধিকার করে স্বর্গোদ্ভূত সেবার সেবক হয়েছিল। তার পরে শিক্ষানবীশীর সময় শিখেছিল যে তার কাজ সেবা নয়, শাসন। শিখেছিল যে ভারত তার দেশ নয়, রাজত্ব। শিখেছিল যে অপরাপর অনাইসিয়েস্ ভারতীয়গণ তার ভাই নয়, দাস। অনুশীলন অচিরেই দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

ঠিক এমনি সময়, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, এলো ভারতের স্বাধীনতার আভাস। প্যাটেল-হেণ্ডারসন চুক্তি বীরেন বক্সী ইত্যাদিকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, বীরেন ও ব্রায়ান বিভিন্ন ব্যক্তি। ঘরের ছেলে ব্রায়ান ঘরে ফিরে যাবে আশাতীত অনর্জিত ঐশ্বর্য নিয়ে। কিন্তু নিজ বাসভূমে পরবাসী বীরেনরা করবে কী?

অধিকাংশের বিবেক বলে কোনো পদার্থ অবশিষ্ট ছিল না। অভ্যস্ত দেশদ্রোহিতার পেষণে তার শেষ হয়েছিল। তাঁরা সরাসরি কোট উলটে ফেললেন, অর্থাৎ কোট ছেড়ে শেরওয়ানী ধারণ করলেন, এবং এত কালের অনস্তিত্ব দেশপ্রেমের উদ্বেল ফেনিলতা প্রচার করলেন উদ্বাহু হয়ে। চাটুভিক্ষু শক্তিপিপাসিত কংগ্রেসী কারাবিহঙ্গগণ এই শ্রেণীর কর্মচারীদের নব্য বিশ্বাসঘাতকতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করলেন পর্যাপ্তরূপে। স্বার্থপরদের স্বার্থ রইল অক্ষুণ্ণ আর কালকের শাসকের আজকের 'সার' সম্বোধনে সম্মোহিত হলেন বাগোপম নেতৃবৃন্দ। এমন পরিপাটী সামঞ্জস্য পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। সন্দেহজনক সামঞ্জস্য।

বীরেন বক্সী বুদ্ধিমান, কিন্তু বিবেকশূন্য হ'তে পারেনি তখনও। তাই সে অত তাড়াতাড়ি বদলাতে পারলে না। শাসকের ভূমিকায় সে নিজেকে সুষ্ঠু ভাবে মানিয়ে নিয়েছিল, অন্তত বাইরে থেকে কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু অবচেতন মনে সর্বদাই বর্তমান ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। তাই একান্ত স্বাতন্ত্রিক কোনো ভোজন-সভায় যথোচিত পানীয় গলাধঃকরণ করে ব্রায়ান যখন যৎকিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত স্বীয় আন্তরিক মত প্রকাশ করে বলেছে, "ড্যাম্‌ড্‌, ইফ আই নো হোয়াই দে হ্যাভন্‌ট শট দি ওল্ড ম্যান ইয়েট," বীরেন তখন পুরোপুরি সম্মতি জ্ঞাপন করতে

পারেনি। ঠিক তেমনি অনুরূপ ভোজসভায় হীরেন সেন আজ যখন ভূতপূর্ব চীফ সেক্রেটারী উডহেডকে ব্লকহেড বলে এবং ভূতপূর্ব আই, জি-কে পাজী বলে গাল দেয়, তখন বীরেন বক্সী একমতও হতে পারে না, নেহেরু-প্যাটেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়ে উঠতে পারে না। চুপ করে থাকে।

আজ তাই দেবেশের খবর পেয়ে বীরেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যাক, আবার একটু মন খুলে তর্ক করা যাবে, পাল্লা কষা যাবে যুক্তিতে যুক্তিতে। দেবেশকে সে তাই সানন্দে নিমন্ত্রণ জানাল। আপিসে নয়, সেখানে কথা হয় না। বাড়িতে নয়, সেখানে কাজের কথা হয় না। তাই দেখা হোলো নিরপেক্ষ একটি স্থানে, অজুহাত রইল মধ্যাহ্ন-ভোজন।

একটা দশ মিনিটে দেবেশ আসতেই বীরেন বলল, "তার পর গত দশ বছরের খবর কী বলো।"

গত দশ বছরে দেবেশের কৌতূহল ছিল না। সে উন্মত্ত ছিল আগামী দশ বছর নিয়ে। বীরেনের বা তার নিজের অতীত নিয়ে তার অনুসন্ধিৎসা ছিল না, অন্তত আপাততঃ, তাই সে বলল, "সে এক লজ্জাকর কাহিনী। আমি ভাবছি আগামী দশ বছরের কথা।"

"আমি যে তা ভাবছি নে তা নয়, কিন্তু বিগত দশ বৎসরের কথা বিস্মৃত হতে পারছি নে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরেন বলল, "দেশের এমন ক্ষতি নেই যা গত দশ বছরে করিনি—সে তো পরের দেশ ছিল—কিন্তু আজ যখন নিজের দেশের জন্তে নিজের কাজে বসলেম তখন দেখা গেল যে, আমাদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা যদিও অপরিসীম, ভালো করবার ক্ষমতা তেমন নেই।"

দেবেশ ভাবছিল শুধু তার নিজের কাজের কথা। অর্থাৎ রুটিন-স্বাধীন তার কর্তব্যের কথা। অর্থাৎ দেশের কথা, যে দেশ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লাভ করতে যাচ্ছে, যে দেশের নাগরিক হয়ে আর তার দাসের মতো মাথা নত করে থাকতে হবে না, যে দেশের সে আর থাকবে না শাসকপোষিত পশু, হবে গোটা একটা মানুষ।

অর্ধমনস্ক বাচন-প্রয়াসে দেবেশ বলল, "দেশ একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা। ভূগোল নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু, সেই ভৌগোলিক পরিবেশে যে মানুষ বাস করে তাকে নিয়ে যে ব্যথা তা শুধু আমার মাথায় নয়, মনেও। তাই—"

বীরেন বাধা দিয়ে বলল, "দেবেশ, খুলনার মাটি থেকে বাগেরহাটের মাটিতে যে তফাৎ তা সামান্ত। আমিও, তোমারই মতো, সেই লোকদের কথাই ভাবছি যারা সেই অভিন্ন-অভিন্ন জমিতে প্রাণধারণের প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে বিধাতাকে অভিশাপ দিচ্ছে। যুদ্ধের অব্যবস্থায় কিছু দিনের জন্তে এমন বিভাগে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম যেখানে কিছুমাত্র কাজ ছিল না, মাঝে-মাঝে বক্তৃতা করা ছাড়া, কিন্তু তার পরে এমন বিভাগে এসে পৌঁছলুম যেখানে দেশের লোকের সঙ্গে, অর্থাৎ চাষীদের সঙ্গে, নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন না করে উপায় নেই। চেষ্টা করলেম ওদেরকে আমার কথা বোঝাতে, নিজেকে ওদের কথা বোঝাতে। কিন্তু দেবেশ, কোনটাই সফল হলো না। ওরা আমাকে চিনলে না, জানলে না যে আমি শাসনযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজেকে বিবেকহীন করিনি, চেষ্টা করেছি মস্তিষ্ক হৃদয়কে সজাগ রাখতে। কিন্তু ওরা শুধু দেখলে আমার পোষাকের ধোবার ছাপকে, তাই ওরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে। নীচ সমাজে ইতিপূর্বেই

খ্যাত হয়েছিলেম, কেন না সময়ে-অসময়ে এমন কথা বলেছিলেম ানো লোকের পক্ষে দিনে দু'টি বার খাবার চাওয়া রাষ্ট্রবিরোধী নয়। কিন্তু সে মত টিকল না। অচিরেই আমাকে জানিয়ে। হোলো, আকারে বা ইঙ্গিতে, যে, খাবার চাইবারই অন্ত নাম শান্তিভঙ্গকারী সন্ত্রাসবাদিতা।"

এইবারে দেবেশ আর ধৈর্যধারণ করতে পারল না, বীরেনকে দিয়ে বলল, "আপনার জন্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু ল যদিও আমি অঙ্কে অত্যন্ত কাঁচা ছিলেম আজ গাণিতিক দর্শনে ত এইটুকু শিখেছি যে, দুই একের চাইতে বড়ো এবং তিন দু'য়ের ত্তে এবং চার তিনের চাইতে।"

এইবারে বীরেন দেবেশকে বাধা দিয়ে বলল "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠের আর চলবে না সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নেতৃত্ব া।"

"কিন্তু দেবেশ, তুমি যা বলছ তার তর্কসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই, সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতেই ন্যস্ত থাকতে হবে।"

দেবেশ বিনা দ্বিধায় বলল; "গভর্ণমেণ্ট অব দি পিপ্‌ল্ শুধু র, কর দি পিপ্‌ল্‌ও নয়, বাই দি পিপ্‌ল্‌ও।"

বীরেন কিঞ্চিৎ উত্তেজনা সহকারে যোগ করল, "ননসেন্স, তুমি যা লছ তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে এই যে, ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড ুলের বাসের ড্রাইভার হবে ঐ ইস্কুলেরই অন্ধ নাচার কোনো ব্যক্তি।"

"আপনি আমার সাধারণ যুক্তিকে বিশেষের পর্যায়ে পর্যবসিত করে ্বিদ্রূপযোগ্য রূপ দিয়েছেন, মদীয় উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপেক্ষা করে অসত্য ব্যাখ্যা আরোপ করে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন।"

"আদৌ নয়। আমি শুধু তোমার তর্কের অসম্ভাব্য কিন্তু অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতিকে তোমার চোখের সামনে মেলে ধরতে চেয়েছিলেম।"

"আপনি ভুল করছেন। আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি যে, স্বাধীনতা বা স্বরাজ শুধুমাত্র ওর, তার বা আপনার নয়; সে আমাদের সকলের। এই নিয়ে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে, যেমন আপনার আছে, কিন্তু আমি আপাততঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাবছিই নে, কেন না, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আমি অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার মাতৃ-স্বরূপা ধাত্রী বলে জ্ঞান করি।"

"একটু তফাৎ আছে। আমি বিলেতে ঠিক সেই সময়টায় উপস্থিত ছিলুম যখন ভোটক্ষেপের দৈব দুর্বিপাকে সংরক্ষণশীল দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতাশূন্য বাঙ্‌ময়তায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও ইংল্যাণ্ড মাথার ওপর দাঁড়িয়ে পদদ্বয়কে উত্তোলিত করেনি আকাশের পানে। ইংল্যাণ্ড সেদিনও অবিশ্বাস্য রকম স্থির ছিল র্মক্ষেত্রে, যেন কোথাও কিছু হয়নি, "লেবার" চেয়ার নিয়েছে? চয়ার ঠিক থাকবে, বদলাতে হবে লেবারকে। ইংল্যাণ্ড ঠিক াকবে। ইংল্যাণ্ড জানে না বিপ্লব কাকে বলে, ফরাসী ত্তেজনাকে বিলেতী আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিতে বে, বিদ্রোহকে হতে হবে বিপ্লব, বিপ্লবকে হতে হবে সংস্কার, ংস্কারকে হতে হবে পরিবর্তন, পরিবর্তনকে হতে হবে···"

"অর্থাৎ কিছুই হবে না। বিদ্রোহ তো নয়ই, বিপ্লবও নয়, ারিবর্তনও নয়, অর্থাৎ যথা পূর্বং তথা পরং।"

"সে তো হতেই পারে না, কোথাওই নয়, কেন না আমি দাঁড়িয়ে াকতে পারি, তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে পার, কিন্তু কাল শুধু নিরবধি নয়, সে নিয়তই চলমান, তোমাকে পথের পাশে ফেলে রেখে যাবে, একবারও তোমার কথা ভাববে না; আমাকে সে তার সঙ্গে নিয়ে যাবে কিন্তু সেই সহযাত্রিত্বের পুরস্কারস্বরূপ এমন পরিবর্তন আমার ঘটবে যে, আমি আর আমি থাকব না। বোধ হয় একেই বলে বিপ্লব, বোধ হয় একেই বলে পরিবর্তন, কিন্তু প্রভেদ যা তা প্রকৃতির নয়, আকৃতির; মনের নয়, গমনের; মতির নয়, গতির।"

"না বন্ধো, আজ আমরা পরাধীন, কাল আমরা স্বাধীন হবো। এ দু'য়ের মধ্যে যা প্রভেদ তা আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত।"

"আই হোপ সো, এ্যাণ্ড আই উইস আই কুড্ বি সিওর, দেবেশ তোমার সঙ্গে এই কথা আলোচনা করতেই তোমাকে ডেকেছি। তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে যাতে এইটুকু জানতে পারি যে, আমরা সত্যি স্বাধীন হয়েছি কি হইনি।"

সহজ কোনো উত্তর মিলল না। দেবেশ নিজেই ঠিক জানতো না, অপরকে বলবে কী? আসন্ন স্বাধীনতাকে সে অজ্ঞ শিশুর স্বপ্ন-সার্থকতা বলে জেনেছিল, জেনেছিল সংগ্রামের সার্থক সমাপ্তি বলে। সে স্বাধীনতা যে শেষ নয়, শুরু মাত্র, এমন সম্ভাবনার চিন্তাকে সে তার মনে স্থান দেয়নি। হঠাৎ কোথা থেকে বীরেন এসে তার পূর্ণশুভ্র বিশ্বাসে এনে দিলে সন্দেহের কালো ছায়া। ভালো লাগল না। এক বার বুঝি এ কথাও মনে হোলো যে, বীরেন আগে ছিল প্রথম চার বাহিনীর এক জন, আজ হয়েছে পঞ্চম বাহিনীর এক জন।

তা ছাড়া সে, কিছু দিনের জন্তে অন্তত, স্থির করেছিল যে, জিজ্ঞাসা স্থগিত রেখে নিজেকে নিয়োজিত করবে নির্ধারিত কর্ম-পদ্ধতিতে। অন্তহীন কর্মহীন অনুচিন্তনে তার বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তাই দেবেশ বীরেনের পুরোপুরি অ্যাকাডেমিক তর্কে আশানুরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করতে পারছিল না। শরীরের হাত দুটো, সে দু'টোকে ব্যস্ত রাখলে আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মনের হাতের সংখ্যা নেই, সেখানে স্থান আছে সংখ্যাহীন চিন্তার। তাই দেবেশ চেষ্টা করছিল শুধু কাজের কথা ভাবতে, অর্থাৎ না ভেবে কাজ করতে। তাই সে চেষ্টা করল আবার বীরেনকে তার নিজের কাজের কথায় ফিরিয়ে আনতে। বলল, "আপনার ভয়গুলি অমূলক না হলেও অসাময়িক, অর্থাৎ premature. যে স্বাধীনতা আসছে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে শুধু তারাই, যারা, অন্নদাশংকরের ভাষায়, কুশাচারকে দেশাচার বলে জ্ঞান করে।"

বীরেন বলল, "রায় আমাকে জানে। ওকেই জিজ্ঞাসা করো আমি কী পরিমাণ লাল এবং কী পরিমাণ নীল।"

"আমি লালও নই, নীলও নই। আমি সবুজ।"

"কিন্তু যে কোনো মুদ্রাকরকে জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে যে, সবুজটা প্রাইমারি কালার নয়। ওর জন্ম অন্যান্তের সংমিশ্রণে।"

"এই সংমিশ্রণের অর্থাৎ পিতৃত্বের উল্লেখই আপনার অপরিশোধ্য সংরক্ষণশীলতার নিঃসন্দেহ পরিচায়ক, কেন না সবুজকে আপনি সবুজ বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।"

"তোমার যুক্তিটা মাত্র অংশত সত্য। সবুজকে আমি সবুজ বলেই মানি, তুমি সবুজকে সাদা বলে ভুল করেছ।"

এই রকমের তর্ক-বিতর্কে দেবেশের উৎসাহ আর অবশিষ্ট ছিল না। সে তাই আবার কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করে বলল, "আপনি

যাদের হয়ে কথা বলতে চাইছেন সেই কালোদেরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে চাই, সেই জন্যেই আপনার গুড্ অফিসেস্ কামনা করেছি।"

"তোমার কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ প্রচলিত অর্থ উপেক্ষা করে বলছি, গুড অফিস বলে কোনো বস্তু নেই, অফিস মাত্রই অশুভ। বোধ হয় এই জন্যেই গান্ধীজী কংগ্রেস প্রেসিডেন্টও হন না, মন্ত্রীও হন না।"

"এই দায়িত্বশূন্য ক্ষমতাধারণের স্বাব্যতা নিয়ে আরেক দিন আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। আজ আপনাকে চাই উইগান-পথের পথপ্রদর্শকরূপে।"

জর্জ অরওয়েলের উইগান-বিহারের কাহিনী বীরেন পড়েনি, কিন্তু বইটার নাম তার শোনা ছিল। লেখকের বক্তব্যের সঙ্গেও পরোক্ষ পরিচয় ছিল। বীরেনের মনে পড়ল যে, অরওয়েল তার নিজেরই মতো ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের পুলিশ শাখার বৃন্ত ছিল। স্বেচ্ছায় বৃন্তচ্যুত হয়ে লণ্ডন-প্যারিসে নানা জায়গায় দিনমজুরের কাজ করে, বস্তীবাস করে, দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে পরে খ্যাতিমান হয়েছে, পরশাসনাপরাধের পাপ-পঙ্ক থেকে আপন বিবেককে উদ্ধার করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে আত্মঘাতনে। বীরেনের ইচ্ছা ছিল না এত শীঘ্র কাজের কথায় আসতে। তর্ক দীর্ঘ করবার জন্যেই ঈষৎ পরিহাসের সঙ্গে বলল, "অতি উত্তম কথা, কিন্তু উইগানে যাবার আগে বিচারকের উইগ না ত্যাগ করলে ওরা দরজা খোলে না। ওদের দেখা যায় না দর্শকের দূরবীক্ষণ দিয়ে। চাই অন্তরঙ্গতার অণুবীক্ষণ।"

বীরেনের উপমায় দেবেশ প্রত্যাঘাতের সুযোগ পেল, বলল, "আপনার মুস্কিলই এই যে, আপনি ওদের কীট বলে মনে করেন। আমি ওদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে জ্ঞান করি।"

"একটুও না। তুমি যদি ওদের তোমার-আমার মতো স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে করতে তাহোলে ওদের দেখতে যাবারই দরকার হোতো না, অন্তত আমার মতো পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হোতো না নিশ্চয়ই। তুমিও আমারই মতো ভালো করে জানো যে, তুমি সত্যি ওদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে জ্ঞান করো না। আমি আরো জানি যে, ওরা সত্যি পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়।"

দেবেশের নিজের মতও এ থেকে একেবারে বিভিন্ন নয়। কিন্তু তবু তার মতের এমন নির্লজ্জ নিরাভরণ প্রকাশ অন্যের মুখে শুনতে ভালো লাগল না। মনে হোলো যে ওরা সত্যি যদি পূর্ণাঙ্গ না হয়ে থাকে তাহোলে তার জন্যে অন্তত আংশিক দায়িত্ব দেবেশ এবং দেবেশের শ্রেণীর। প্রত্যক্ষ ভাবে সে কখনো কোনো দিকে ওদের ক্ষতি করেনি। আজ প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের ভালো করতে উদ্যত ও প্রয়াসী হয়েছে। তবু, তবু নিজেকে কেন যেন দোষী মনে হয়।

প্রশ্নটা এড়িয়ে বলল, "না বন্ধী, অরওয়েলের মতো ক্ষমতা পরিহার করে দারিদ্র্যদর্শনে আমার অভিরুচি নেই। দরিদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি করলে কার কী লাভ হচ্ছে? অপর পক্ষে আমি যদি আমার ক্ষমতা ধারণ করে দারিদ্র্যের দীনতা উপলব্ধি করি এবং তার পরে ক্ষমতার সুপ্রয়োগের দ্বারা দারিদ্র্যের অল্প একটুও প্রতিকার করতে পারি তা হোলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। নিজেকে ক্ষমতাতিরিক্ত করে দারিদ্র্যাবিষ্কারের কাহিনী বামপন্থী গ্রন্থমালার বর্ণনা করা নিজের বিবেককে বঞ্চিত করবার পক্ষে উপযোগী, প্রচারের জন্যেও হয়তো কার্যকরী, কিন্তু প্রতিকার হয় না তাতে—কোনো কিছুরই। উপকার হয় না কারোই।"

দেবেশের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওয়েটার তার বাঁ দিকে খাবার হাতে দাঁড়িয়েছিল। দেবেশ লক্ষ্যও করেনি। ধীরেন সুযোগ পেয়ে বলল, "তোমরা শ্রমিক-প্রেমিকরা নির্বিশেষ প্রোলিটারিয়াট নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, শ্রমিকবিশেষের ক্লেশের প্রতি তোমরা অনায়াসেই উদাসীন। তোমার পাশেই যে বেচারী দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই!"

দেবেশ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি কিছুটা খাবার তুলে নিয়ে সামনের থালায় স্থাপন করল। কিছু মুখে দেবার আগে বলল, "জানো বন্ধী, আমার একটা থীসিস আছে এই নিয়ে যে, অভিজাতদের জনের পূর্বে ভোজের এত এপারিটিফ্ নামক পানায়োজনের সমারোহ ছিল।"

"কেন বলো তো?"

"কেন না ভোজ্যের পশ্চাতে যে অবর্ণনীয় শোষণ ছিল সে সম্বন্ধে মদ্যসহযোগে কিঞ্চিৎ অচেতনার সঞ্চার না করে নিলে ভোজনোপভোগ অসম্ভব হোতো।" এই বলে দেবেশ তার হাতের ছুরি আর কাঁটাটা থালার উপর রেখে দিল। বীরেনও। দু'জনে দু'জনের দৃষ্টি এড়াল।

কিছুক্ষণ পরে অভুক্ত দু'জনে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো। কেউ আর কোনো কথা বললে না। শুধু স্থির হোলো যে, সেদিন সন্ধ্যায় জগদ্দলের একটা জায়গায় আবার দু'জনের দেখা হবে। দু'জনেরই মনের উপর রইল ওই নামধারী দু'টো পাথর। [ক্রমশঃ।
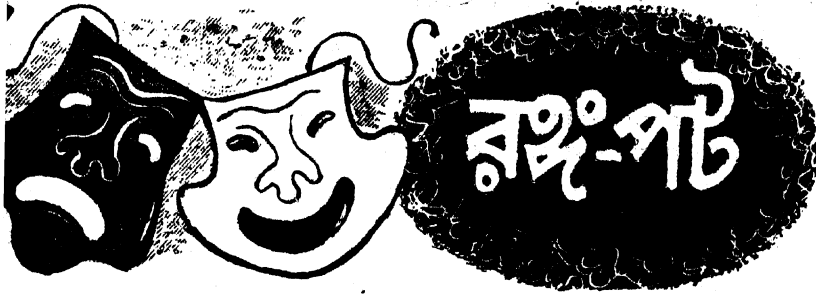
নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

প্রসাদ রায়

সাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে, এখানে তার খেই ধরার দরকার । এই বিভাগে কিছু কাল আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী রও নাতিবৃহৎ আলোচনা করেছিলুম। কিন্তু এবারে আমরা তে চাই সমগ্র নাট্যকলায় তাঁর দান আছে কি কি।

সমগ্র নাট্যকলা বলতে আমরা কি বুঝি? সঙ্গীত, নৃত্য, ভনয় তথা নাটক। এগুলির এক-একটিকে আশ্রয় ক'রেই -এক জন অমরত্ব অর্জ্জন করেছেন—কেউ হয়েছেন শ্রেষ্ঠ গায়ক, উ বা শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক, কেউ বা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং কেউ বা শ্রেষ্ঠ ্যকার। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন-আপন ক্ষেত্রসীমার রে এসে অন্য কোন বিভাগের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পাননি— বা দৃষ্টি দেবার মত বৃহত্তর প্রতিভা তাঁদের ছিলই না।

কিন্তু সেই দুর্লভ প্রতিভা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সঙ্গীত, নৃত্য, ভনয় ও নাটক—তাঁর বিস্ময়কর শক্তি প্রত্যেক বিভাগেই সৃষ্টি রছে নব-নব সৌন্দর্য্য। এবং এই বিস্ময় চরমে ওঠে আর একটা া০ ভেবে দেখলে। সাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর মত বিপুল নারাজি রেখে যেতে পারেননি আর কোন বাঙালী লেখক; র উপরে শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল তাঁর প্রভূত কর্ম্মশীলতা এবং রাজনীতি, নীতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়েও তিনি যথেষ্ট মস্তিষ্কচালনা ক'রে য়েছেন, আবার উত্তরকালে চিত্রকলা নিয়েও মেতে উঠে ছবির ছবি এঁকে গিয়েছেন। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এক জন মাত্র ~~দুর্দ্দান্ত~~ বিচিত্র শক্তি সঞ্চয় করলেন কোন্ যাদুবলে এবং সে ন্তের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখাবার জন্যে তিনি সময়ই বা পেতেন মন ক'রে?

নাট্যকলার দিকে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বাল্যকাল থেকেই। নি যখন বালক, সঙ্গীত ও নাটক রচনা করেছেন তখনই। সে টক আর পাওয়া যায় না, তরুণ বয়সেই "বাল্মীকি-প্রতিভা" না ক'রে অভিনেতারূপেও দেখা দিয়েছেন। এবং তার পর ক নাট্যকলার ক্ষেত্রে তাঁর দান এমন প্রভূত হয়ে উঠেছে বুঝতে বিলম্ব হয় না, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে নি যদি এই বিভাগ নিয়েই নিযুক্ত হয়ে থাকতেন, তাহ'লে জন অতুলনীয় নাট্যশিল্পীরূপেই অমর যশের অধিকারী ত পারতেন।

প্রথমে তাঁর সঙ্গীতের কথাই বলি।

ওস্তাদদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তুললে অনেকেরই নাসাযন্ত্র বিস্ফুরিত হয়। এবং কোন কোন ওস্তাদ অপেক্ষাকৃত উদারতার পরিচয় দিয়ে গান গাইতে রাজি হন বটে, কিন্তু তাঁদের গান শুনলেই বুঝি, ওস্তাদ হ'লেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি নন। নিজে আসরে হাজির থেকেই দেখেছি, মার্গ সঙ্গীতে অভ্যস্ত এক জন সুপরিচিত গায়কের কণ্ঠ থেকে "মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী" গানটির ঠিক সুর কিছুতেই নির্গত হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে রচিত গানগুলির কথা পরে আরো কিছু বলব, কিন্তু তিনি কি কেবল সেই শ্রেণীর গান রচনা করেছেন? যথার্থ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নিয়ম রক্ষা ক'রে গাওয়া যেতে পারে, তাঁর এমন গানের সংখ্যাও কি অগণ্য নয়? এ-সম্বন্ধে নিজে কিছু না ব'লে আমি এখানে মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্ধার করতে চাই। 'দৈনিক বসুমতী'র এবারকার শারদীয় পত্রিকায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আসল ধ্রুপদ, খ্যাল গানের অনুরূপ বাঙ্গালা গান আমাদের দেশে বিরল ছিল। এ অভাব দূর হইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে। * * * * তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ যদু ভট্ট ও বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। * * * * হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথাযথ সুর ও ছন্দ রক্ষা করিয়া কবি তাহাতে সংযোগ করিলেন তাঁর অতুলনীয় ভাব ও বাণী। তাঁহার রচিত প্রায় এক সহস্র ধর্ম্ম-সঙ্গীত তাঁহার কাব্য ও সঙ্গীত-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ও মহৎ দান। এই গানগুলিকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরই অংশ বলা যায়। এক কথায় বাঙ্গালা ভাষায় ইহা শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। * * * * উক্ত গানগুলি বহু যুগ যাবৎ বিখ্যাত ওস্তাদগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া তাহা কত ভাবে অলঙ্কৃত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। * * * * কবিগুরুর ৭০ বৎসর জন্মোৎসব সভায় আমরা তাঁহার রচিত প্রথম যুগের গান অর্থাৎ ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিয়াছিলাম এবং গানগুলি আমরা ওস্তাদী গানের ঢংএ গাহিয়াছিলাম এবং কবি সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য গানের সহিত ঐ গানগুলি শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হন।"

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের অন্য শ্রেণীর গানগুলির কথা। এ-সম্বন্ধেও রমেশ বাবু লিখেছেন: "তাঁর পরবর্ত্তী গানের বিষয়ে কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, রচনার ভাবানুযায়ী কল্পিত সুর তিনি দিয়াছেন। এ গানগুলিতে রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রসঙ্গত রূপ তিনি মানিয়া চলেন

নাই।" সত্য কথা। এ গানগুলির সুর 'রোমান্টিক' বলাও চলে" এবং এর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় ভাবেরও অভাব নেই। এ ক্ষেত্রে ভাবের এবং ক্রিয়ার গতি অনুসারেই হয় সুরের পরিবর্ত্তন, তা কোন একটি বিশেষ রাগ বা রাগিণীকে একান্ত ভাবে অবলম্বন করতে চায় না। যেখানে যে রাগ বা রাগিণীর অংশবিশেষ গানের কথার অংশবিশেষের ভাবের উপযোগী হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে ছাড়েননি। অনেক সময়ে তিনি পরস্পর-বিরোধী রাগিণীকেও পাশাপাশি ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি—ওস্তাদদের কাছে যা চরম অপরাধ। কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত এবং আধুনিক যুগধর্ম্ম সম্বন্ধেও ছিলেন অতি সচেতন, উপরন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত ও সৃজনক্ষম মস্তিষ্কের মধ্যে ছিল অপূর্ব্ব পরিকল্পনা, তাই তিনি এমন সুকৌশলে পরস্পরবিরোধী রাগ-রাগিণীকে একসঙ্গে ব্যবহার করেছেন যে, কানে বাজে না কোন অসঙ্গতিই।

কথা যেমন যাচ্ছে ভাব থেকে ভাবান্তরে, গানও তেমনি চলেছে সুর থেকে সুরান্তরে, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি। এখানে সুর বড় কি কথা বড়, সে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ কথা ও সুরকে এখানে দেওয়া হয় সমান মর্য্যাদা। মনের মত ভাব সৃষ্টি করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কেবল শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর অংশবিশেষ গ্রহণ করেননি, দরকার হ'লেই তারই সঙ্গে আবার মিশিয়ে দিয়েছেন মেঠো, বাউল, ভাটিয়ালি ও কীর্ত্তন প্রভৃতি সুরের অংশবিশেষও। তিনি বার বার পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন এবং ওখানকার সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁর অভিজ্ঞতা বড় কম ছিল না। তারও কোন কোন বিশেষত্ব রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাছ থেকে আমাদের শেখবার কিছু নেই এবং তার সংস্পর্শে এলে ভারতীয় সঙ্গীতের জাত যাবে, এমন কথাও তিনি মনে করতেন না। তিনি বলেছেন: "য়ুরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে আমাদের সঙ্গীতকে আমরা সত্যকার বড় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।" আমাদের সঙ্গীত পারসী গানের সংস্পর্শে এসেও যখন জাতে না হারিয়ে মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে, তখন কোন কোন পাশ্চাত্য বিশেষত্ব গ্রহণ করলেই বা সে জাতিচ্যুত হবে কেন? চারুকলার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই রকম লেন-দেন দরকার এবং এই রকম লেন-দেন থাকেও। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তো অনেক কিছুর জন্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাছে ঋণী। কিন্তু ঋণ গ্রহণ ক'রেও কি আমাদের সাহিত্য বাংলা দেশেরই সাহিত্য হয়নি?

রবীন্দ্রনাথ গানের ভিতরে এমন কিছু চাইতেন না, যা তার গতিকে বাধা দেয়। তাঁর উত্তরকালে রচিত গানগুলিতে তাই এমন ভাবে সুর-সংযোগ করা হয়েছে যে, ভাবের গতি কোথাও ব্যাহত হয় না। কিন্তু এ-শ্রেণীর গানে যদি কেউ ওস্তাদী কায়দায় বিস্তার ও অলঙ্কার প্রভৃতির সাহায্য নেন, তাহ'লে তার গতি অব্যাহত থাকতে পারে না কিছুতেই। তাঁর গান গাইবার সময়ে কোন ওস্তাদ যদি এ রকম স্বাধীনতা গ্রহণের চেষ্টা করতেন, কবি তাহ'লে খুসি হতেন না। এই জন্যে শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁকে উচ্চশ্রেণীর সুরকার ব'লেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু তাঁর স্বীকার বা অস্বীকারে কিছু আসে-যায় না। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গৌরব খর্ব্ব করতে; কিন্তু পারেননি। পুত্র দিলীপকুমার চাইছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করতে; কিন্তু তিনিও পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বাংলার নিজস্ব জাতীয় সম্পদ। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে বিবাদ না ক'রেই সে নিজের জন্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করতে পারে। কেবল গানের বৈঠকে নয়, সাধারণ রঙ্গালয়েও এই শ্রেণীর গানের উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা কতখানি, বারংবার পরীক্ষার পর তা প্রমাণিত হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে এ-শ্রেণীর প্রথম পরীক্ষা হয় কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" অভিনয় কালে (১৯২২ খৃঃ)। রাজা স্যর সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গীতবিশারদ দৌহিত্র স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ঐ নাটিকার গানগুলিতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিতেই। তার পর "সীতা" নাটকের গানেও তিনি ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। কেবল পদ্ধতি নয়, অনেক সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সুর প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দু'টি গানের নাম করতে পারি। "সীতা" নাটকে দু'টি গান আছে—"অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" এবং "ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে, আয় গো ধরার মেয়ে"। ঐ দু'টি গানের সুরের সঙ্গে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি গানের সুর প্রায় হুবহু মিলে যাবে—"যেদিন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা" এবং "আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও"। বিশেষজ্ঞরা জানেন, রবীন্দ্রনাথের সুর সাধারণ রঙ্গালয়ের গানে সংযুক্ত হয়ে কি অসাধারণ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গানের গতিশীল সুর সম্পূর্ণ-রূপেই রঙ্গালয়ের উপযোগী। যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হ'লে তা নাটকীয় ক্রিয়াকে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের ভাণ্ডার অফুরন্ত বললেও চলে এবং সেখানে সব রকম ভাবের উপযোগী সব রকম সুরই আছে। রঙ্গালয়ের সুরকারেরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। আমি নিজে সুরকার না হয়েও রঙ্গালয়ের, রেকর্ডের ও চলচ্চিত্রের গানে রবীন্দ্রনাথের সুর ব্যবহার করেছি এবং আমার চেষ্টা সফল হয়েছে প্রত্যেক বারেই।

আপাতত গান সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। তার পর ওঠে নাচের কথা। নাচ যে একটা বড় আর্ট, প্রত্যেক সভ্য দেশ তা জানে। আমরাও জানতুম আর মানতুম, নাচ হচ্ছে বড় আর্ট। বাংলা দেশের বাইরে কোন কালেই নাচের চলন বন্ধ হয়নি। বাংলা দেশের ভিতরেও নিম্নতর শ্রেণীর কোন কোন নাচ ছিল—যেমন বাই-নাচ ও খেমটা-নাচ প্রভৃতি, কিন্তু ও-সব নাচের শিল্পী ছিল পেশাদার পতিতারা। সুতরাং নব্য সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও-শ্রেণীর নাচ ও তার শিল্পীদের ঘৃণা করতেন। বাংলা দেশের নানা জেলায় নানা লোকনৃত্যের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু সে-সবও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করত না। আজ বাংলা দেশের ভদ্রসমাজে ছেলেরা নাচছেন, মেয়েরা নাচছেন, ছেলে-মেয়ের মায়েরা নাচছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো দিদিমারাও নাচছেন কিংবা নাচি-নাচি করছেন। কিন্তু দুই যুগ আগে এ-সব দৃশ্য নিশার স্বপ্ন ব'লে গণ্য হ'ত। স্মরণ আছে, বছর ত্রিশ আগে দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায়

বাঙালী ছেলে-মেয়েদের নাচ শেখা উচিত ব'লে প্রবন্ধ লিখে অনেকেরই কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলুম। সাতাশ বৎসর আগে "নাচঘর" পত্রিকাতেও নৃত্যকলার উপযোগিতা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে সব আলোচনাও কারুর মনকে নাড়া দেয়নি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি এদিকেও হ'ল জাগ্রত। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি নাট্যাভিনয়ে শান্তিনিকেতনের এক তরুণী নর্ত্তকীর ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দেওয়াতে সহরের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল কি বিস্ময়-চাঞ্চল্য! একাধিক রুচিবাগীশের ভ্রূ যে সঙ্কুচিত হয়নি, তাও বলতে পারি না।

কিন্তু কাব্য, কলা ও সংস্কৃতির মানসপুত্র হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের উপরে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রভাব। সব রকম আধুনিকতারই অগ্রদূত তিনি। তাঁর কাছে যা সমর্থনযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে, নব্য বাঙালীরা তা অগ্রাহ্য করতে পারলে না। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নৃত্য-বিভাগ খোলা হ'ল। বলা হ'ল: "The aim of true education is to enlarge the mind of man through culture, hence through various arts and knowledge, There was a time in our country when dancing was included among the various media through which culture expressed itself. But on account of certain reasons dancing was later banished from the high social life."

নৃত্যকলা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন হয়তো এ দেশের কেউ কেউ আরো অনেক ব্যক্তি। এবং তাকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ ব'লে মানলেও নৃত্য নিয়ে প্রকাশ্য ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার দুঃসাহস ছিল না তাঁদের। এ-রকম সাহসকে তাঁরা দুঃসাহস ভেবে হয়তো বরাবরই পিছিয়ে থাকতেন। কিন্তু যে কবি মুখে গেয়েছেন —"আগে চল্, আগে চল্ ভাই! প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে, বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই!" কার্য্যক্ষেত্রেও তিনি পিছিয়ে-পড়ার দলের ভিতরে থাকতে চাইলেন না, পরম উৎসাহে নৃত্য-বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কবির কাছ থেকে প্রেরণা ও অভয়-বাণী লাভ ক'রে নৃত্যকলাকে সাদরে বরণ করবার জন্যে এগিয়ে এল বাংলার আধুনিক বিদ্বজ্জনসমাজ। প্রথমে একজন-দু'জন নৃত্যশিল্পী, তার পর আরো বেশী, তার পর দলে-দলে। এখন তো নাচ এখানে প্রায় সার্ব্বজনীন হয়ে উঠেছে। কি উচ্চশিক্ষিত আর কি অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়েরা এখন নৃত্যশিক্ষা করা যে অন্যতম কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে, কলকাতায় পাড়ায়-পাড়ায় অসংখ্য নৃত্য-বিদ্যালয় দেখলে সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

এর মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা দেশে নৃত্যকলার নবজন্ম সম্ভবপর করেছে একমাত্র তাঁরই বহুমুখী প্রতিভা। অবশ্য এ সত্যও অস্বীকার করা চলবে না যে, তাঁর পর উদয়শঙ্করের আবির্ভাবে বাংলা নৃত্যকলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অধিকতর। এবং ভারতে ও ভারতের বাইরে উদয়শঙ্করের সম্মান ও সমাদর দেখে বাঙালী ছেলেদের মধ্যেও জেগেছে নাচ শেখবার প্রেরণা। আগেও কি দু'চারজন বাঙালীর ছেলেরা নাচত না? নাচত, কিন্তু সে সখের বা পেশাদার থিয়েটারে, ভদ্রসমাজে তারা যথার্থ ব'লে উপেক্ষিত হ'ত।

ভারতবর্ষে নানা শ্রেণীর নাচ আছে—কথক, মণিপুরী, কথাকলি ও ভারত-নাট্যম্ প্রভৃতি। কোন নাচে প্রধানতঃ পায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয় (যেমন কথক), কোন নাচে মুদ্রার সাহায্যে (যেমন কথাকলি) এবং কোন নাচে ভঙ্গির সাহায্যে (যেমন মণিপুরী) ভাবাভিব্যক্তি দেখানো হয়। শান্তিনিকেতন (বোধ হয় 'কথক' বাদে) অন্যান্য শ্রেণীর নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন শ্রেণীর দিকেই বিশেষ ভাবে ঝোঁক দেননি। কারণ তাঁর প্রতিভা সর্ব্বদাই করত নূতনকে অন্বেষণ। না পুরাতন আদর্শকে না ভুলে তিনি গ'ড়ে তুলেছেন এক যুগোপযোগী নূতন আদর্শ। এই নূতন আদর্শ রেখাপাত করে প্রধানতঃ তাদের মনের উপরে, যাদের আছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও কাব্যবোধ। এ নাচে দক্ষিণ-ভারতীয় নাচের মত দুর্ব্বোধ মুদ্রার অত্যাচার নেই, কিন্তু নাচবার সময়ে ওখানকারই মত কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। মণিপুরী নাচেও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রকাশ করে, মণিপুরের বাইরের লোক সহজে তার অর্থ বুঝতে পারে না। শান্তিনিকেতনের নৃত্য-পদ্ধতিতে কোন কোন মণিপুরী বিশেষত্ব থাকলেও ভঙ্গির উপরে তার অতি-নির্ভরতা নেই। তার ভিতরে পায়ের কাজ আছে বটে, কিন্তু কথক নাচের মত তা তবলার বোলের কাছে দাসখত লিখে দেয়নি। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের লেন-দেনের পক্ষপাতী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের নাচের মধ্যেও পাশ্চাত্য নৃত্যকলার কিছু-কিছু উপাদান আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলি দেশী নাচের ধাতের সঙ্গে এমন স্বচ্ছন্দে মিশে গিয়েছে যে, কোথাও এতটুকু অসঙ্গতির আভাস পাওয়া যায় না।

যেমন কাব্যে, যেমন চিত্রে, যেমন সঙ্গীতে, তেমনি শান্তিনিকেতনের নাচের মধ্যেও আছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিনব পরিকল্পনা। তিনি নিজে বোধ হয় নাচ শেখেননি, কিন্তু তাঁর জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনে "ফাল্গুনী" নাটকের অন্ধ বাউলের ভূমিকায় আমি তাঁকে দেখেছি নাচের ভঙ্গিমায়। নাচের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ছন্দের, রেখার এবং সুরের। রবীন্দ্রনাথ কবি, ছন্দ নিয়েই তাঁর কারবার। তিনি চিত্রকর, রেখার রস ভালোই বোঝেন। তিনি সুরকার, সুতরাং সুরের গুপ্তকথাও জানেন। তার উপরে আছে তাঁর গভীর রসবোধ। সুতরাং সহজেই তিনি করতে পেরেছেন নৃত্য-পরিকল্পনা।

তার পর কথা ওঠে অভিনয়ের। এ বিভাগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিশুকাল থেকেই। যাঁদের দ্বারা বাংলা রঙ্গালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সুধী ব্যক্তিরাও ছিলেন তাঁদের দলে। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ঠাকুরবাড়ীর দানের কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। এই প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে তিনি যে অভিনয়কলার অনুরাগী হবেন, এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। তরুণ বয়স থেকে প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত স্বরচিত বহু নাটকের বহু ভূমিকাতেই তিনি দেখা দিয়েছেন অনেক বার। তাঁর নানা অভিনয় দেখবার সুযোগও আমার হয়েছিল। তাঁর রূপসুন্দর দেহ, তাঁর অনুপম কণ্ঠ, তাঁর ছন্দসুন্দর আবৃত্তি এবং তাঁর সংযত ভাবাভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হ'ত না, এমন মানুষ বোধ হয় কেউ নেই। অতি বৃদ্ধ বয়সেও এক বার তিনি যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর লাবলীল ভাবভঙ্গি ও দেহের

তারুণ্য দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। "ডাকঘরে" ঠাকুরদা'র ভূমিকাতেও তাঁর অভিনয় আজ পর্য্যন্ত আমার স্মরণ আছে।

মঞ্চশিল্প ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল অন্য রকম। প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে দৃশ্যপটের আড়ম্বর ছিল না। সেক্সপিয়ারের যুগের কেউ দৃশ্যপট নিয়ে মাথা ঘামায়নি। দৃশ্যপটের বাহুল্য ও প্রাধান্য বেড়ে ওঠে তার অনেক পরে। য়ুরোপে-আমেরিকায় আজকাল ও-রকম বাড়াবাড়ি যথেষ্ট ক'মে এসেছে বটে, কিন্তু আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে এখনো দেখা যায় ঘন ঘন পট-পরিবর্ত্তন।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ একটি মাত্র "সেট-সিন" বা কাঠামোর উপরে স্থাপিত দৃশ্যের সাহায্যেই সমগ্র নাটকখানির অভিনয় দেখানো পছন্দ করতেন। কিন্তু তারই মধ্যে পাওয়া যেত প্রতীক, কাব্যরস, সম্ভাবনার ইঙ্গিত ও শিল্পীর তুলির নিপুণ খেলা। বহু কাল আগেই (১৩০৯ খৃষ্টাব্দে) 'বঙ্গদর্শনে'র একটি প্রবন্ধে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন: "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি মনে করি না। * * * * ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। * * * * কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজ সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।"

বাকী থাকে কেবল রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর কথা। কিন্তু 'মাসিক বসুমতী'র এই বিভাগে আগেই তো সে কথা বলা হয়েছে, অতএব আবার নতুন ক'রে না বললেও চলবে।

প্রথম যুগে বাংলা নাটক

শ্রীঅনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী

কোনও এক জন ইংরাজ মনীষী বলেছেন—'A Nation is known by its stage. বস্তুতপক্ষে জাতীয় জীবনের প্রকৃত তথ্যপূর্ণ প্রতিরূপটিকে পেতে হলে নাটকের আশ্রয় নিতে হবে। National History হিসাবে অথবা Social History হিসাবে ইতিহাসের পরই নাটকের দাবী অগ্রগণ্য ও অনস্বীকার্য্য। তাই তার কারণ নাটকের নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা প্রধানাংশে বাস্তব-প্রধান। অতীত যুগের কোনও জাতি বা সমাজের চিত্ররূপ নাটকের মধ্যে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এই objectivity বা বস্তুনিষ্ঠাই নাটকের প্রাণ, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বভাবসঙ্গত চরিত্রসৃষ্টি, প্রয়োজনীয় ঘটনাবৈচিত্র্য ও যথাযথ ঘটনা-সন্নিবেশের নৈপুণ্যই নাটককে প্রাণবন্ত করে তোলে, তার ঐতিহাসিক শুষ্কতাপরিবৃত ক্ষেত্রে নাট্যোচিত পলিমাটি সংযোগে তাকে রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে তোলে। তাই নাটক রচনার কাজে কি হতে পারতো বা হলে ভাল হত তার চেয়ে কি হয়েছে বা হচ্ছে তার দাম অনেক বেশী। সমসাময়িক নাট্যকারের প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য হচ্ছে, যা সে চোখের সামনে ঘটতে দেখছে তার থেকে নাটকোচিত সংঘাতপূর্ণ কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করে নিজস্ব প্রতিভাপ্রসূত ভাব সৃষ্টি করা আর উপযুক্ত বাক্যাবলী ও ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তির পথে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া। এই জন্যই নাটকের উপাদান হল গিয়ে জাতির জীবনধারা আর তার আলোচ্য বিষয় হল গিয়ে সমাজচেতনা ও সমাজ-পর্য্যালোচনা!

বাংলা সাহিত্যে নাটকের জন্ম ঠিক ছোট গল্পের মতই অল্প দিন আগে। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পূর্ব্বে কোনও বাংলা নাটক আদৌ রচিত হয়েছে কি না, তারও কোনও নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত যে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই পৌরাণিক কাহিনীসঞ্জাত অথবা সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ। তার মধ্যে মাঝে-মাঝে দু'-একখানিতে নাট্যকার তার স্বকীয় ভাবধারার কিছুটা স্পর্শ আরোপ করতে চাইলেও সে প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যহীনতা হেতু অনুল্লেখযোগ্য হয়েই রয়েছে। তবে এরাই বাংলা নাট্য-সাহিত্যের পথে রাস্তা তৈরী করবার কাজে প্রথম প্রস্তর স্থাপন করায় এদের প্রারম্ভিক ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে সন্দেহ নেই। শিশুর প্রথম পদক্ষেপ যতই টলায়মান হোক না কেন, তার মধ্যেই সুপ্ত থাকে অনাগত কালের একটি দামাল ছেলের ক্রীড়াচঞ্চলতার পূর্ব্বাভাষ। তাই এই সাময়িক ও স্বল্পপ্রসারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সেই দিন নিহিত ছিল আগামী কালের সার্থক মৌলিক নাট্যসৃষ্টির আভাষ। তারাচরণ শিকদারের প্রথম নাটক 'ভদ্রার্জ্জুন' বা প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক হিসাবে যত নিকৃষ্টই হোক্ না কেন, নাট্যরচনার ইতিহাসে প্রারম্ভিক প্রয়াস বলে তাদের স্মরণ করতেই হবে।

এর পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও প্রোজ্জ্বল প্রতিভার অপরিসীম দ্যুতির আধার বহন করে বাংলা নাটকের অন্ধকার ক্ষেত্র আলো করে তুললেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যদিও মাইকেলের নাটকের কাহিনী প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই গঠিত, তবুও তাঁর নাটকের ঐ ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলকে ভেদ করে আত্মবিস্তার লাভ করেছে একটা জাতির ভাবস্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল রশ্মিরেখা। এ ছাড়াও তাঁর নাটকে সর্ব্বপ্রথম আধভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর কিছু-কিছু কথ্য ভাষার প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্ত্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে এর প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। এর পরই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটকের ইতিহাসে complete realistic নাটকের আবির্ভাব এই-ই প্রথম। 'নীলদর্পণ'ে জাতীয় চেতনা ও মুক্তিপ্রয়াসী চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠ চিত্রাঙ্কন পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র প্রায় বঙ্কিম-সমসাময়িক যুগের নাট্যকার ছিলেন। প্রারম্ভিক যুগের বাংলা নাটকের ধারাটা প্রধান ভাবে ইংরাজি প্রভাব-পরিপুষ্ট আর তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাইকেলের নাটক। তবে মাইকেলের নাটকেও একটা প্রচ্ছন্ন স্বাজাত্যবোধ ছিল যেটা পরবর্ত্তী কালের নাট্য-সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে।

সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ'

২রা নভেম্বর। লণ্ডনের উপকণ্ঠে এ্যয়াট সেণ্ট লরেন্সে আইভি লতা-সমাচ্ছন্ন একটি শান্ত পল্লী আবাসে বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। সারারাত্রি জীবন আর মৃত্যু সন্ধিক্ষণে প্রকম্পিত প্রহর গুণেছে একটি নিঃসংগ প্রদীপ। আর বাইরে প্রতীক্ষা করেছেন এক দল উদ্বিগ্ন সাংবাদিক। পূর্ব দিগন্তে উষার স্নিগ্ধ ললাটে আলোর প্রথম আশীর্বাদ স্পর্শের সংগে-সংগেই বাতিটি হঠাৎ নিবে গেল। গৃহকর্ত্রী এ্যালিস ল্যাডেন ধীরপদে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে এসে ঘোষণা করলেন, "মিঃ শ' দেহত্যাগ করেছেন।"

মৃত্যুকালে শ'-এর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর।

সাত সপ্তাহ আগে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আহত অবস্থায় শ' হাসপাতালে নীত হন। তিন সপ্তাহ আগে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় তিনি স্বগৃহে ফিরে এসেছিলেন। জীবন ও মৃত্যু, কোনটি সম্পর্কেই শ'-এর মোহ ছিল না। এক বার শ' বলেছিলেন, চল্লিশ বছরের বেশি যারা বেঁচে থাকে তাঁরা নরাধম, আবার অন্ততপক্ষে চারশ' বছর বাঁচার আকাংখাও তিনি এক বার প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এবারে বোধ হয় তিনি আসন্ন-মৃত্যু পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর এক দিন তাই বোধ হয় বলেছিলেন, "এবার বাঁচলে আমি অমর হব!"

শ' অমর হয়েছেন। শ'কে নমস্কার।

সেক্সপীয়ারোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ' ১৮৫৬ সালে ২৬শে জুলাই ডাবলিন (আয়ারল্যাণ্ড) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জর্জ কার শ' ছিলেন এক জন সরকারী কর্মচারী। অবসর গ্রহণের পর তিনি পেন্সন বিক্রী করে সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু ব্যবসা ফেল পড়ায় শ'-পরিবারকে চরম আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে পড়াশুনোর পালা চুকিয়ে দিয়ে শ' ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে লণ্ডনে এসে হাজির হন। কী যে করবেন, কী যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য শ' তখনও তা স্থির করে উঠতে পারেননি। গান তাঁর ভাল লাগত, রাজনীতির আকর্ষণ ছিল আরও বেশী—কিন্তু সাহিত্যকে তিনি কোনক্রমেই আয়ত্ত করে উঠতে পারছিলেন না। যশ শ'কে আপনি এসে ধরা দেয়নি—কঠিন সাধনা করে তা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। আর তাই তিনি লিখেছিলেন, প্রতিভার নব্বই ভাগ হল পরিশ্রম আর দশ ভাগ অনুপ্রেরণা।

প্রথমে নভেল লিখে হাত মক্স করেন শ'—কিন্তু কোন প্রকাশকই শ'এর নভেল প্রকাশ করতে রাজী হল না। "বিরস নাটকে"র ভূমিকায় শ' তাঁর নভেল লেখা সম্পর্কে লিখেছেন, "অখ্যাত অবস্থায় উপন্যাস লিখে আমি সাহিত্য-জগতে আসন লাভের চেষ্টা করেছিলাম, পাঁচখানা বড় উপন্যাস লিখেও ছিলাম, কিন্তু লণ্ডন ও আমেরিকার সব চেয়ে অভিজাত প্রকাশকদের কাছ থেকে দু'-একটা উৎসাহসূচক মন্তব্য ছাড়া বরাতে আর কিছু জোটেনি; তাঁরা সকলেই একবাক্যে আমার পেছনে পুঁজি নিয়োগের ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেন।"

নাটকে শ'এর সাফল্যও কোন ঐশী প্রেরণার ফল নয়। কথার যাদুকর শ'কে এই বিদ্যাটিও আয়ত্ত করতে হয় আর কথা বলার আর্টে শ'-এর হাতেখড়ি রাজনৈতিক বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

সে সময়কার ইংল্যাণ্ড ছিল রাজনৈতিক বিপ্লববাদীদের কর্মক্ষেত্র। মার্কস-এর রচনাবলী পড়ে শ' সমাজবাদী হন—পূর্ণোদ্যমে রাজনীতি করতে নেমে পড়েন তিনি। এই সময় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি খবরের কাগজে সংগীত ও শিল্প সমালোচনার কাজ নেন। এই রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে এক দিকে তিনি যেমন কথা বলার আর্টকে আয়ত্ত করে ফেলেন, অন্য দিকে ভিক্টোরীয় যুগের হীনতা-দীনতা, কপট নিষ্ঠুরতাও তাঁর চোখে নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে। শ'র কাজ হয়ে দাঁড়াল এই সব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করা। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে তাঁর প্রথম নাটক "উইডোয়ার্স হাউসেস" সমাজের এই কপটতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়েই আবির্ভূত হল।
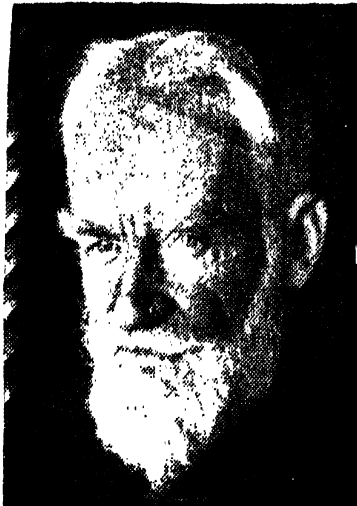
শ'র নীতি হয়ে দাঁড়াল—শ'র অপ্রিয় সত্য বল, নির্মম সমালোচনা কর—

কিন্তু বল এমন ভাবে লোকে যাতে মনে করে রসিকতা। সেন্টুরিন সংস্করণ শ'এর বইয়ের লেখক-পরিচিতি অংশে লেখা আছে, শ'এর নাটক 'Can be read for aesthetic entertainment, for up-to-date liberal education for philosophic and Eiological doctrine, even for pure fun, or for any or all of them.' কথাটা এক হিসাবে সত্য। তিক্ততম সমালোচনাকে তিনি সরস রসিকতা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন আর লোকে তা আনন্দের সংগে গ্রহণও করেছে। কিন্তু এ পদ্ধতির মুস্কিল এই যে, লোকে ভংগী দেখেই ভুলেছে, রসিকতাই উপভোগ করেছে, শুধু মজাই লুটেছে—শ'র বক্তব্য অনেক সময়ই তাদের মর্মে পৌঁছোয়নি। তাঁরা শ'য়ের ছদ্মবেশকেই শ' মনে করেছে—শ'কে ভেবেছে বিদূষক। শ' নিজে আক্ষেপ করে বলেছেনও—"লোকে বলে, আসর জমানোর জন্যে আমি একটা ভঙ্গী নিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কি জানে এ ভঙ্গী নিতে গিয়ে আমি কত দূর স্বার্থ ত্যাগ করেছি? প্রভাবশালী হবার জন্ম (ভল্‌তেয়ার ও লুথারের মত) আমি অনেক সময় দুরন্ত হয়েছি। লোকে এই পাগলামীর নাম জেনেছিল জি-বি-এস। নামটার যাদু আছে বৈ কি! শেষ পর্যন্ত আমি গেলাম তলিয়ে জি-বি-এস-এর হাতের পুতুল হয়ে।"

কথাটা এক হিসাবে সত্য হলেও এক হিসাবে মিথ্যাও। সাফল্যও শ' অর্জন করেছেন। তাঁর পঞ্চাশখানি নাটকে এ যুগের প্রচলিত নীতিবোধ, ভণ্ডামী ও কপটতাকে নগ্ন করে ধরেছেন, ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

রাজনীতিতে শ' ছিলেন সমাজবাদী। যে কক্ষে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সে ঘরের দেওয়ালে একটিই মাত্র ছবি ছিল, আর সে ছবি ষ্টালিনের। ১৯৩১ সালে শ' সোভিয়েট রুশিয়া পরিদর্শন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলেন যে, সমগ্র ইউরোপে ষ্টালিনই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। ইংল্যাণ্ডকেও সোভিয়েট প্রথা গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে তিনি একাধিক বার কমিউনিষ্ট বলে ঘোষণাও করেছেন।

কিন্তু শ' তবু কমিউনিষ্ট ছিলেন না—শ' ছিলেন বিবর্তনশীল সমাজবাদী। এক দিক থেকে তিনিই বিলাতের লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। লেবার নেতাদের আসল চেহারা যতই প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে—শ'ও লেবার পার্টি থেকে ততই দূরে সরে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত খোলাখুলিই ঘোষণা করেন, "সেলাইয়ের কল যেমন ডিম পাড়তে পারে না তেমনি হেণ্ডারসন-ক্লিনেস-গোষ্ঠীও আর আমাদের রাজনৈতিক যন্ত্র থেকে সমাজবাদ পয়দা করতে পারবে না।"

শ' ছিলেন বাস্তববাদী নাট্যকার। 'আর্টের জন্ম আর্ট' এই মতবাদকে শ' একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার ঘোষণাও করেছিলেন, কেবল মাত্র আর্টের জন্ম তিনি এক কলম লিখতেও রাজী নন।

শ'এর গ্রন্থের কোন একটি বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, শ'-এর বই না-পড়া মানে যুগের থেকে ততখানিই পিছিয়ে পড়া, যুগের থেকে শ' যতখানি এগিয়ে আছেন। কথাটা সত্য। অথচ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সে সুযোগ কোথায়? দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শ'কে পরিবেশন করবার চেষ্টা বিশেষ হয়নি। এ পর্যন্ত একখানি মাত্র গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অনুবাদকেরা শ'-এর মর্যাদা রাখতে পারেননি।

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা নভেম্বর রাত্রি সওয়া ৮টায় তাঁর ঘাটশীলাস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর। ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যার পর এক চায়ের মজলিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে হঠাৎ তিনি অসুস্থতা বোধ করেন। তাঁর বুকে ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। সমস্ত রকম চিকিৎসার পর সাময়িক ভাবে কিছুটা আরামও তিনি বোধ করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা খারাপের দিকে যায়। ১লা নভেম্বর রাত্রের প্রথম প্রহরে "পথের পাঁচালী", "অপরাজিতা" "আরণ্যকের" রচয়িতা বাঙলার সর্বজনপ্রিয় মরমী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে বাঙলার গণজীবনে যে বিপর্যয় সুরু হয়েছে, তাতে আমাদের সোনার বাঙলা মহাশ্মশানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সাম্প্রদায়িকতা, অভাব, অনটন, দেশ-ভাগাভাগি—বাঙলার সমাজ-জীবনে মহাশূন্যতা, বিরাট ভাঙন, ব্যর্থতা, হতাশা এবং নির্মম নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। মহাশ্মশানে রূপান্তরিত বাঙলার জীর্ণ কুটীরপ্রান্তে এখনও যে প্রদীপ মিট-মিট করে জ্বলছে, কিছুটা নির্মল আলোক বিকীর্ণ করছে, সে তার জাতীয় সাহিত্য। সে প্রদীপ-শিখায় অতীতের উজ্জ্বলতা নেই সত্য, তবুও সেই প্রদীপ-শিখাই আমাদের জাতির অগ্রগতির শেষ প্রেরণা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই ক্ষীণ আলোকেই আমাদের ভবিষ্যতের পথ খুঁজে নিতে হবে। বাঙলার সাহিত্যই বাঙলার গণজীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার আনতে পারে, বাঙলার জীর্ণ ক্লান্ত নর-নারীকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে, জীবন প্রতিষ্ঠার ব্রতকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু অমঙ্গল এবং অশুভ ইঙ্গিত আজ বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রকেও আচ্ছন্ন করতে চলেছে। বিভূতি বাবুর মৃত্যুতে তারই আভাস পাওয়া যায় না কি? 'বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকা তথা বাঙলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত নর-নারীর কাছে বিভূতিভূষণের সাহিত্য

প্রতিভার নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" তাঁর জীবিত কালেই ক্লাসিকের পর্যায়ে উঠে গেছে। তাঁর মৌরী ফুলের সুবাসে এবং মেঘমল্লারের উদাসী আবেশে কার হৃদয় না মুগ্ধ হয়েছে? অরণ্যকে মুখর করার সাধনা তাঁর সার্থক হয়ে ওঠেনি কি? তাঁর কিন্নর দল কি মর্ত্তবাসীর মনে কিন্নর-লোকের আভাস দেয়নি? তাঁরই হাতে-গড়া বিপিনের সংসার আর আদর্শ হিন্দু হোটেল কি বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের একান্ত অবলম্বন হয়ে ওঠেনি আজ?

এ যুগের বাঙলা সাহিত্য বিভূতিভূষণের দানে যতখানি পুষ্ট হয়েছে, তত আর কারও দ্বারা হয়েছে কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাঙলার গল্প এবং উপন্যাস-সাহিত্যে যাঁরা সৃষ্টিকারের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, বিভূতিভূষণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সাহিত্য সমালোচকের চুলচেরা বিশ্লেষণে পড়বার আগেই জনগণের কাছে গিয়ে হাজির হয়, কারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ-বেদনাই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। তাঁর সাহিত্যে মানুষ এবং প্রকৃতির অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ ১৩০৩ সালের ৩১শে ভাদ্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে। বর্ত্তমানে এই গ্রাম ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অতি সুপণ্ডিত, কিন্তু দরিদ্র। তাই বিভূতি বাবুর বাল্য ও কৈশোরও কেটেছে দারিদ্র্যের সংগে কঠোর সংগ্রাম করে।

বনগ্রাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি রিপন কলেজে এসে ভর্তি হন এবং ১১১৮ সালে সসম্মানে বি-এ পাশ করেন। পাশ করার পর তিনি কিছু দিন সোনারপুরের অন্তর্গত হরিনাভিতে স্কুল-মাষ্টারের কাজ করেন। এখানে থাকতেই তাঁর প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" প্রকাশ হয়। স্কুলের কাজ ছেড়ে তিনি খেলাৎচন্দ্র ঘোষের জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার হয়ে ভাগলপুরের কাছে দিরা-ইছমাইলপুর কাছারীতে যান। সেখানকার গভীর আরণ্য প্রকৃতির মধ্যেই তিনি জীবনের বৃহত্তম প্রেরণা লাভ করেন। "পথের পাঁচালী", "আরণ্যক" ও দেবযানে"র কল্পনা তখনই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে এবং এখানেই তিনি "পথের পাঁচালী" লিখতে সুরু করেন।

ভাগলপুরের চাকরী ছেড়ে কিছু দিন তিনি সন্ন্যাসীর মতন জীবন যাপন করে বাঙলা, বিহার এবং আসামের বন-জংগল এবং পার্বত্য এলাকায় বহু দিন আত্মগোপন করেন। ফিরে এসে আবার কলকাতার এক স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন।

তাঁর মত অমায়িক, নিরভিমান, বন্ধুবৎসল লোক অতি অল্পই দেখা যায়। অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপনই ছিল তাঁর আদর্শ। পল্লীর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাই পল্লীগ্রামেই বেশীর ভাগ সময় বাস করতেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বগ্রাম গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী দেবী এবং তিন বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। বিভূতি বাবুর মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতাও অকস্মাৎ মারা যান।

বিভূতি বাবুর সঙ্গে 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। প্রথম যৌবনে তিনি কিছু দিন 'দৈনিক বসুমতী'র বার্তা বিভাগে সহঃ-সম্পাদক ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে এসেছে পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনার তীব্রতা নিয়ে। কিন্তু জীবনকে তো আর ধরে রাখা যায় না? আকাশের প্রতি তারার আহ্বানে সাড়া তাকে দিতেই হবে। আজ তাই পরমাত্মার কাছে আমাদের একান্ত কামনা, বিভূতি বাবুর অমর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
La-bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯
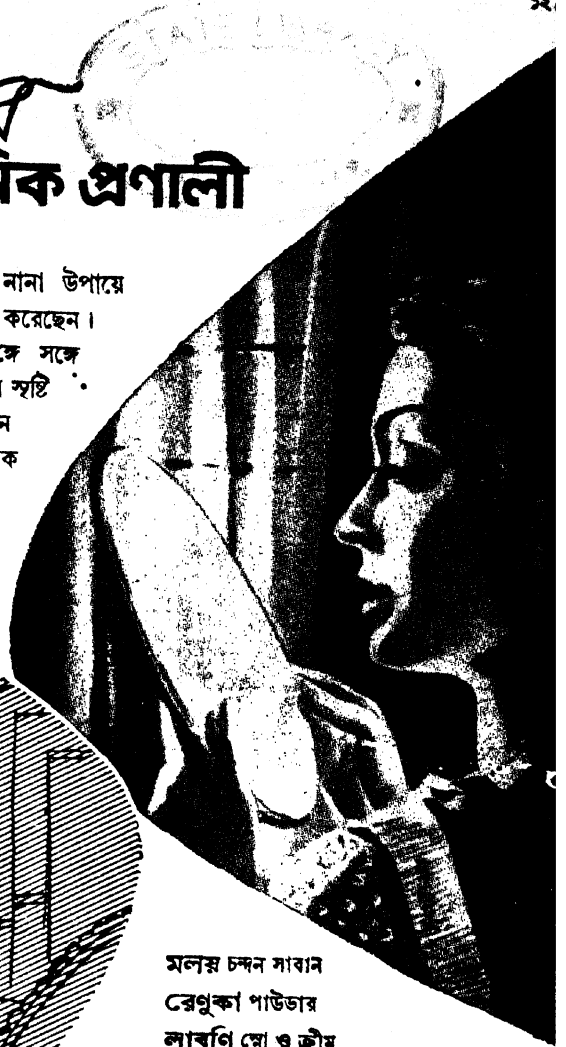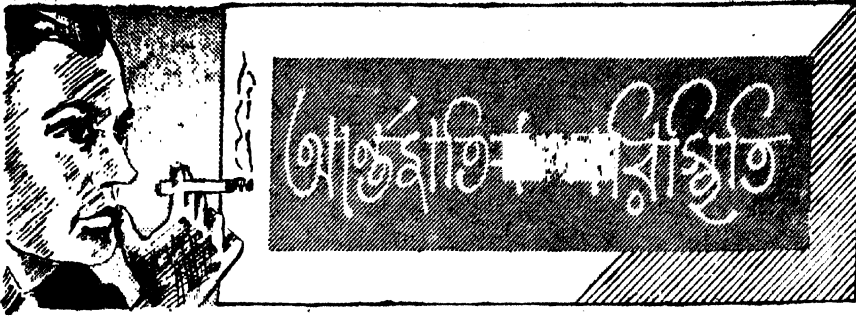
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

তিব্বত অভিযান, না গৃহযুদ্ধ? -

তিব্বত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। পিকিং হইতে প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা ২৬শে অক্টোবর (১৯৫০) তারিখে জানাইয়াছেন যে, "তিব্বতের ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীকে সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিবার এবং চীনের পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য গণবাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে' বলিয়া ২৫শে অক্টোবর তারিখে চীনা গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কবে এই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহা কিছুই জানা যায় না। চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশের নির্দ্দেশ দেওয়ার যে-সংবাদ সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদায়' প্রকাশিত হইয়াছে, সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' উক্ত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া লণ্ডনে প্রেরণ করেন। তাহাতেও কোন্ তারিখে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে অথবা কোন্ তারিখ হইতে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহা পাওয়া যায় না। পি-টি-আইয়ের প্রতিনিধি অবশ্য জানাইয়াছেন যে, চীন সরকারের ঘোষণায় এইরূপ মনে হয় যে, চীনা বাহিনী সম্ভবতঃ তিব্বতের ভিতরে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা অভিযান আরম্ভ হওয়ার তারিখ অনুমান করা সম্ভব নয়। কালিম্পং হইতে ২৯শে অক্টোবরের সংবাদে তিব্বতের রাজধানী লাসা হইতে সদ্য-আগত একজন তিব্বতী ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। খাম অঞ্চলে এবং পশ্চিম-চীনে তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসা রহিয়াছে বলিয়া তিনি নিজের নাম গোপন রাখিতেই ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) তারিখে তিনি লাসা হইতে রওনা হন এবং ঐ তারিখেই গণবাহিনী নাকচুক পথ ধরিয়া তিব্বতের ভিতরে প্রায় এক শত মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, চীনা সৈন্য অন্তর্তিব্বতে (inner Tibet) প্রবেশ করে নাই। তাঁহার এই উক্তি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারা তিব্বতকে মুক্ত করিবার কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে চীন কর্ত্তৃক তিব্বত অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১০ই অক্টোবর কালিম্পং হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে, চীনা সৈন্যরা তিব্বত আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু ২৫শে অক্টোবরের পূর্ব্বে সরকারী ভাবে এ সম্পর্কে কিছুই ঘোষণা করা হয় নাই। উল্লিখিত ব্যবসায়ীর কথায় মনে হয়, অভিযান আরম্ভ হইয়াছে সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৫০) শেষ ভাগেই। আলাপ-আলোচনা দ্বারা তিব্বত সমস্যা সমাধানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াও চীন কেন তিব্বত আক্রমণ করিল তাহা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আলাপ-আলোচনার জন্য তিব্বতী প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীর পথে পিকিং যাত্রা করিবার পর এই অভিযান আরম্ভ হইল কেন, তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। বস্তুতঃ তিব্বত যেমন রহস্য-ঘেরা দেশ, তেমনি এই তিব্বত অভিযানের স্বরূপ রহস্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। ইহা চীনের তিব্বত আক্রমণ, না তিব্বতের গৃহযুদ্ধ, এই প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ, ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিব্বতের রিজেণ্ট তাক্‌তা রিম্পোচে কুম্‌বুম্ লামাকে পাঞ্চেন লামা বা তাসি লামা বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হওয়ার পর এই বৎসরের প্রথম ভাগে একটি স্বাধীন তিব্বতী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। কুম্‌বুম্ পাঞ্চেন লামাই এই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা বা প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু কার্য্যতঃ এই গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয় ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট গেসী সেরাপ গিয়ামটাসো দ্বারা। একটি তিব্বতী গণবাহিনীও (People's Troops) গঠন করা হইয়াছে। এই গণবাহিনী গঠিত হইয়াছে তিব্বতী, খাম্বা, আমদো, গোকোলো এবং মিশ্র চীনা-তিব্বতীদিগকে লইয়া। এই বাহিনীর মোট চারিটি ডিভিসানে ৪০ হইতে ৫০ হাজার সৈন্য আছে। চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারই যে এই সৈন্যবাহিনী গঠন-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। তিব্বতী গণবাহিনীর অফিসারগণ সকলেই চীনা এবং অতি আধুনিক রাইফেল, টমিগান, সাব মেশিন গান এবং ছোট ছোট কামান দ্বারা তিব্বতী গণবাহিনীকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছে চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আমদো ও খাম্বারা পূর্ব্ব-তিব্বতের খাম্বা প্রদেশবাসী উপজাতীয় লোক এবং চীনা-তিব্বতীরা চীনা ও তিব্বতীর সংমিশ্রণ জাত। পূর্ব্বোল্লিখিত তিব্বতী ব্যবসায়ীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করে নাই, আক্রমণ চালাইয়াছে তিব্বতী গণবাহিনীর সৈন্যরা। ইহা সত্য হইলে কম্যুনিষ্ট চীনকে তিব্বত আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তবে কম্যুনিষ্ট চীন যে তিব্বতের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিব্বত স্বয়ংশাসিত অঞ্চল হইলেও তিব্বতের উপর suzerainty

বা আধিপত্য আছে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই আধিপত্য যত কম বা যত দুর্ব্বলই হউক, উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তিব্বতের গৃহযুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচনা করা আবশ্যক। কিন্তু এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইলে এই তিব্বতী গৃহযুদ্ধের স্বরূপ কি, কেন এই গৃহযুদ্ধ, তাহা যেমন আলোচনা করা আবশ্যক, তেমনি এই গৃহযুদ্ধে চীন হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করিল কেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

১৯১০ সালে তিব্বতে চীনা সামরিক অভিযানের সময় দলাই লামা ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি তিনি চীন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। কিন্তু তদানীন্তন পাঞ্চেন লামার নীতি ছিল চীন গবর্ণমেণ্টের অনুকূল। ইহা লইয়া ১৯২৪ সালে তদানীন্তন পাঞ্চেন লামা এবং দলাই লামার মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠে। ফলে তদানীন্তন পাঞ্চেন লামা পলাইয়া চীনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৯৩৫ সালে তিনি তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করেন এবং ১৯৩৭ সালে পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করেন যে, তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন নূতন পাঞ্চেন লামার সন্ধান করা হয় তখন অনুরূপ চিহ্নযুক্ত তিন জনের সন্ধান পাওয়া যায়। তিব্বত গবর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কুম্বুম্ লামা প্রাক্তন পাঞ্চেন লামার অনুগামীদের পাহারা ব্যতীত লাসায় যাইতে অস্বীকার করেন। কাজেই এই পরীক্ষা আর করা হয় নাই। বর্ত্তমান পাঞ্চেন লামার দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এক জনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর আর এক জন কুণ্ডেলিং লামা। ১৯৪৯ সালে লাসা হইতে কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের মিশন বিতাড়িত হওয়ার পর তদানীন্তন চীন গবর্ণমেণ্ট কুম্বুম্ লামাকেই পাঞ্চেন লামা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুয়োমিণ্টাং চীনের পতনের পর কম্যুনিষ্ট চীনও তাঁহাকেই পাঞ্চেন লামা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৯৪৯ সালের ২৪শে নবেম্বর মাও-সে-তুং এক বেতার বক্তৃতায় তিব্বতের মুক্তি সম্বন্ধে পাঞ্চেন লামাকে আশ্বাস প্রদান করেন। দলাই লামা এবং পাঞ্চেন লামার মধ্যে দীর্ঘদিনের রেষারেষী এই গৃহযুদ্ধের একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

তিব্বতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা খুব শান্তিপূর্ণ এ কথাও বলা যায় না। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে তিব্বতে একটা বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। দলাই লামার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অজুহাতে তদানীন্তন রিজেণ্ট জেবাংকে এপ্রিল মাসে (১৯৪৭) গ্রেফ্‌তার করা হয়। পরবর্ত্তী মাসে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করা হয় এবং পরে জেলখানায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহের আর দুই জন নেতাকে আড়াই শত বেত্রাঘাতের পর যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রিজেণ্ট জেবাংকে অন্ধ ও বন্দী করার জন্য যিনি দায়ী সেই মিঃ সেপান সাকাপা তিব্বতী মিশনের নেতারূপে প্রেরিত হন। তাঁহাকে তিব্বতী মিশনের নেতা মনোনীত করা যে সঙ্গত হয় নাই তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তিব্বতের মন্ত্রিসভা কাসাগে দক্ষিণপন্থীদের নেতা হইলেন এই মিঃ সেপান সাকাপা। বর্ত্তমান রিজেণ্ট তাঁহার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। তিনি তিব্বতের উপর চীনের suzerainty বা আধিপত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯৪৭ সালের বিদ্রোহ দমিত হইলেও বিদ্রোহের কারণ দূরীভূত হয় নাই। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে জেবাংয়ের অনুগামীরা তাঁহার স্থলবর্ত্তী রিজেণ্টকে অপসারিত করিবার জন্য সজ্ঘবদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা ছায়া ও চামডো জেলার দুর্গ অবরোধ করে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী একটি মঠের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী রিজেণ্টকে চাহেন। এই বিদ্রোহে পাঞ্চেন লামার হস্তক্ষেপ ছিল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ সময়ে তিব্বতে তীব্র গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনী গবর্ণমেণ্টের অনুগত ছিল বলিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা কঠিন হয় নাই। প্রাক্তন রিজেণ্ট জেবাংয়ের অনুগামীরা পলাইয়া চীনে আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং বর্ত্তমান রিজেণ্ট তাকাত্‌রা রিম্পোচের বিরুদ্ধে তিব্বতে যে একটা প্রবল জনমত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহাও বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় অন্যতম কারণ।

তিব্বতের গৃহযুদ্ধের আর একটি কারণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। তিব্বতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যে অত্যন্ত শক্তিশালী, ইংরাজ লেখকরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিব্বতের অধিবাসী-দিগকে মোট চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) অভিজাত সম্প্রদায়, (২) ব্যবসায়ী, (৩) কৃষক, (৪) পশুপালক। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভূম্যধিকারী। বৌদ্ধ-মঠগুলিরও প্রচুর ভূ-সম্পত্তি আছে। অভিজাত সম্প্রদায় তথা ভূম্যধিকারীরা সমাজ-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তাঁহাদের পরেই ব্যবসায়ীদের স্থান। সাধারণতঃ ইঁহারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নহেন, যদিও অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অভিজাত-বংশীয় লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। বড় বড় মঠগুলিরও বিস্তৃত ব্যবসা আছে। কাজেই শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যই যাঁহাদের পেশা তাঁহাদিগকে যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে তিব্বতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিশালী নহে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। কৃষকরা অভিজাতবংশীয়দের এবং মঠের জমি চাষ করে। অবশ্য তাহাদের নিজেদেরও ছোট-ছোট জোতজমি আছে। তিব্বতে আবাদযোগ্য জমির অভাব আছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই জমি আবাদ করিবারই লোকাভাব। কারণ, কৃষকরা জমিদারের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র যাইতে পারে না। অর্থাৎ তাহাদের অবস্থা পুরাপুরি ভূমিদাসের মত। অন্যত্র যাইতে হইলে জমিদারের অনুমতি দরকার। সাধারণতঃ এই অনুমতি পাওয়াই যায় না। অথবা অনুমতি পাইতে হইলে উহার জন্য এত প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিতে হয় যে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তাহা দেওয়া অসম্ভব। তিব্বতের জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়াই এই নিপীড়িত এবং দুঃখ-দুর্দ্দশাপূর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট রহিয়াছে। চীনে কম্যুনিষ্টদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে উহার প্রভাব দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তিব্বতে প্রবেশ করিয়া থাকিলে এবং উহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। এই গৃহযুদ্ধের তাৎপর্য্য এবং কম্যুনিষ্ট চীন কেন এই গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিল, তাহার কারণ আলোচনা করিতে হইলে তিব্বতের ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই এই আলোচনা করা আবশ্যক।

রহস্যঘেরা নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত—

রহস্য-ঘেরা নিষিদ্ধ দেশ এই তিব্বত আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী হইলেও এই দেশের সমাজ-ব্যবস্থা এবং ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। পৃথিবীর আর কোন দেশ সম্বন্ধে এত কম আর কেহ জানে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। উত্তরে সিংকিয়াং, উত্তর-পূর্ব্বে কুকুনর (নর শব্দের অর্থ হ্রদ), পূর্ব্বে চওয়ানবেন, পশ্চিমে কাশ্মীর এবং লাডাক, দক্ষিণে ভারত, নেপাল ও ভুটান—এই সীমার মধ্যে আবদ্ধ তিব্বত পৃথিবীর উচ্চতম দেশ। উহার উপত্যকাগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার হইতে ১৭৪০০ ফুট উচ্চ। শিখরগুলির উচ্চতা ১৬ হাজার হইতে ১৯ হাজার ফুট। তিব্বতের গড় উচ্চতা ১৬ হাজার ফুট। জাতি ও ভাষাগত দিক হইতে তিব্বতীদের সহিত মঙ্গোলীয়া ও ব্রহ্মদেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সুদূর অতীতে চীনের সহিত তিব্বতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে তিব্বতের স্বাধীনতার কুলজী লইয়া যে গবেষণা চলিতেছে, সে-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। এক সময়ে চীনই না কি তিব্বতের করদ রাজ্য ছিল। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে তিব্বত একটি সামরিক শক্তিশালী স্বাধীন দেশ ছিল এবং চীনের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ ৮২১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত সন্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই বৌদ্ধধর্ম্ম আসলে বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনের প্রথম মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গীজ খাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনিই তিব্বতকে প্রথম চীনের আধিপত্যের আওতায় আনয়ন করেন। তিব্বতে বর্ত্তমানে প্রচলিত পুরোহিত-রাজতন্ত্র বা দলাই লামা পদের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই। অবশ্য তৃতীয় পুরোহিত-রাজকেই সর্ব্বপ্রথম দলাই লামা পদবীতে বিভূষিত করা হয়। দলাই কথাটি মঙ্গোলীয় এবং উহার অর্থ সমুদ্র। তিব্বতের উপর চীনের কার্য্যকরী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় মাঞ্চু সম্রাটদের সময় খৃষ্টীয় ১৭২০ অব্দে। তিব্বতের উপর চীনের এই আধিপত্যের সময়ই ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম তিব্বতের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী জর্জ্জ বোগলকে ১৭৭৪ সালের তিনি লাসায় প্রেরণ করেন। কিন্তু ১৯০৪ সালের পূর্ব্বে বৃটিশারগণ তিব্বতের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্যই যে উহার কারণ, এ বিষয়ে সকলেই একমত।

তিব্বতের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ এত বেশী হইয়াছিল যে, লর্ড কার্জ্জন কর্ণেল ইয়ং-হাজব্যাণ্ডের (পরে স্যার) নেতৃত্বে লাসায় এক রাজনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। কার্য্যতঃ উহা সামরিক অভিযান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই মিশনের সহিত বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্য ছিল এবং তিব্বতীদের সহিত তাহাদের তিন-চারিটি সংঘর্ষও হইয়াছিল। দলাই লামা তখন পলাইয়া প্রথমে মঙ্গোলিয়ায় এবং পরে চীনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান তিব্বত অভিযানে চীনের যে অধিকার আছে ১৯০৪ সালের তিব্বত অভিযানে বৃটেনের তাহা অপেক্ষা অধিকতর অধিকার ছিল কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিগত উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক হইতে রাশিয়াও তিব্বতের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। তিব্বতের উপর রাশিয়া যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইয়ং হাজব্যাণ্ড অভিযানের পর তিব্বতের উপর চীন অপেক্ষা বৃটিশের প্রতিপত্তিই অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

চীন হইতে দলাই লামা তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বৃটিশের আওতায় পড়িয়া চীনের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে অবস্থা এমন হয় যে, ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীন তিব্বতে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করে। এবার দলাই লামা তাঁহার গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সদস্য লইয়া দার্জ্জিলিংয়ে চলিয়া আসেন। এই সময় স্যার চার্লস বেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর ১৯১১ সালে চীনে রাজনৈতিক বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিব্বত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিপ্লবের পর চীন যখন নিজের ঘর একটু সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইল তখন হইতেই তিব্বতের উপর পুনরায় আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯১৩-১৪ সালে সিমলাতে বৃটিশ, চীন এবং তিব্বতের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে বৃটিশের পক্ষে প্রতিনিধি ছিলেন স্যার হেনরী ম্যাকমোহান এবং তাহার সহকারী ছিলেন স্যার চার্লস বেল। এই আলোচনার ফলে যে চুক্তি হয় তাহাতে তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু চীন এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে। ১৯১৭ সালে চীন আবার তিব্বত আক্রমণ করিয়াছিল। এই অভিযান তেমন সুগঠিত ছিল না এবং তিব্বতও বাহির হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। ফলে চীনকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তিব্বতের উপর বৃটিশের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বত গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক জন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন এবং এই অনুরোধ অনুসারে স্যার চার্লস বেল আই-সি-এস (তৎকালে মিঃ) লাসায় প্রেরিত হন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে তিব্বত গবর্ণমেণ্টের নীতি গঠিত হয় এবং তিব্বত গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্তও সেই নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯১৭ সাল হইতে তিব্বতের ব্যাপারে চীনের আর কোন স্থান রহিল না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পরামর্শদাতারাই তিব্বত গবর্ণমেণ্টের নীতি নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। ইহারই নাম তিব্বতের স্বাধীনতা।

১৯৪০ সালে দলাই লামার অভিষেকের সময় বৃটিশ প্রতিনিধি-রূপে স্যার ব্যাসিল গোল্ড উপস্থিত ছিলেন। ইনি সিকিমের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল অফিসার। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তিব্বত হইতে বৃটিশ ট্রেড মিশন উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ কূটনৈতিক (diplomatic) অফিসার এখনও তিব্বতে আছেন বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধের পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহও তিব্বতের উপর পড়িয়াছে। ১৯৪৭ সালে জেনারেল ওয়েডমেয়ার চিয়াং কাইশেককে সাহায্য দানের যে পরিকল্পনা মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করেন, তাহাতে সাহায্যের পরিবর্ত্তে যে-সকল ঘাঁটি দাবী

CAUTION
SEE THAT THE INNER LID UNDER THIS IS INTACT.
LIPTON'S
FINEST DARJEELING TEA
LIPTON'S TRADE MARK
INDIAN CHIEF OFFICE
TEA SHIPPING GODOWNS & EXPORT OFFICE
LIPTON'S BUILDINGS
CALCUTTA
লিপটন
মানে
ভালো চা

করা হয়, তন্মধ্যে তিব্বতের কয়েকটি ঘাঁটিও ছিল। ১৯৪৮ সালে নানকিং গবর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা করিয়াই তিব্বত-মার্কিণ অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং তিব্বতের ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের আধিপত্য করিবার সুযোগের নামই তিব্বতের স্বাধীনতা। তিব্বতের ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের এই সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই কম্যুনিষ্ট চীনের তিব্বত সংক্রান্ত নীতি আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারত, চীন ও তিব্বত—

তিব্বত অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গত ২৬শে অক্টোবর ভারত গবর্ণমেণ্ট চীনের পররাষ্ট্র সচিবের নিকট এক পত্র দেন। এই পত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বত সমস্যা সমাধান করিতে চীন গবর্ণমেণ্টের আশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়া চীনা বাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশের নির্দ্দেশ দানে ভারত গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রে ইহাও বলা হয় যে, "পৃথিবীর বর্ত্তমান ঘটনাবলী যেরূপ তাহাতে চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক তিব্বত অভিযানের নিন্দা না করিয়া পারা যায় না এবং ভারত সরকারের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই কার্য্য চীনের স্বার্থরক্ষা অথবা শান্তি-প্রতিষ্ঠার সহায় হইবে না।" এই পত্রের উত্তরে ৩০শে অক্টোবর চীন গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তিব্বত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তিব্বতের সমস্যা একান্ত ভাবে চীনের ঘরোয়া সমস্যা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার অভিপ্রায় চীন গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু ইহাও জানাইয়াছেন যে, শান্তি আলোচনার অভিপ্রায় থাকুক আর নাই থাকুক এবং আলোচনার ফল যাহাই হউক, তিব্বতের সমস্যায় বিদেশী হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না। চীন গবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, চীন গবর্ণমেণ্ট তিব্বত কর্ত্তৃপক্ষের যে প্রতিনিধি দলকে অবিলম্বে পিকিংয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাহিরের প্রভাবে পিকিং যাত্রায় বিলম্ব করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, তিব্বতী প্রতিনিধি দল ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৫০) নয়াদিল্লীতে পৌছেন, কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে ছাড়া তাঁহারা পিকিং যাত্রায় উদ্যোগী হইতে পারেন নাই।

চীন গবর্ণমেণ্টের ৩০শে অক্টোবরের পত্রের উত্তর ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩১শে অক্টোবর প্রদান করেন। এই উত্তরে তিব্বতী প্রতিনিধি দলের পিকিং-যাত্রার বিলম্বের মূলে কোন বিদেশী প্রভাব না থাকা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সুদৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর বিদেশী প্রভাব থাকা অস্বীকার করিয়া চীনের তিব্বত অভিযানের ফলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত চীন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই পত্রের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

তিব্বত সম্পর্কে চীন যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত নেহরু গত ৩০শে অক্টোবর (১৯৫০) শ্রীনগরে বলিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনের নূতন রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক, পিকিংয়ের এই আশঙ্কা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, উহা অত্যন্ত বাস্তব।" এই আশঙ্কার ভিত্তি কি তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত চিয়াং কাইশেককেই সমর্থন করিতেছে। ইহার উপর ফরমোসা সম্পর্কে জেঃ ম্যাক্‌আর্থারের বিবৃতির ফলে আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জেঃ ম্যাক্‌আর্থারের পরিচালনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কোরিয়ায় অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করায় এই আশঙ্কা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রীযুত নেহরু মনে করেন, এইরূপ আশঙ্কার সত্যিকার কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মস্কো হইতে পুনঃ পুনঃই এ কথা বলা হইতেছে যে, তিব্বতকে কম্যুনিষ্টবিরোধী ব্লকে আনিবার জন্য অথবা তিব্বতকে প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা চেষ্টা করিতেছে। শ্রীযুত নেহরু রাশিয়ার এই অভিযোগকেও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা চীনের তিব্বত অভিযানের সিদ্ধান্ত রাশিয়ার এই অভিযোগ দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কা যে সত্য নয় তাহা চীন গবর্ণমেণ্ট কিরূপে বুঝিবেন, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে মিঃ সিপান সাকাপার নেতৃত্বে তিব্বতের এক বাণিজ্য-প্রতিনিধি দল দিল্লীতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং শ্রীযুত নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন। এই তিব্বতী প্রতিনিধি দল পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা নবেম্বর মাসে (১৯৪৮) লণ্ডনে পৌছেন এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তিব্বতের রিজেণ্ট জনৈক মার্কিণ ভ্রমণকারীর মারফৎ আমেরিকার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। পরে তিনি 'কেবল' করিয়াও সাহায্য প্রার্থনা করেন। কম্যুনিষ্ট চীন কর্ত্তৃক তিব্বতকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পর হইতে তিব্বত গবর্ণমেণ্টের উপর উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে তাহা মিঃ কে. পি. বিশ্বাস উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিব্বত হইতে বেতার যোগে পুনঃপুনঃই সৈন্য সমাবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দিবার ব্যবস্থার কথাই শুধু উল্লেখ করা হয় নাই, বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যও চাওয়া হইয়াছে। মিঃ বিশ্বাস আরও লিখিয়াছেন যে, তিব্বতের সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি এবং লাসায় একটি বেতার-ষ্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে এবং মিঃ ফক্স নামক এক জন বিশিষ্ট বিদেশীকে এই বেতার-ষ্টেশন হইতে প্রচার-কার্য্য করিতে শোনা গিয়াছে। এই ভদ্রলোকটি অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং আবার লাসায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

তিব্বতী প্রতিনিধি দল দিল্লী হইয়া ঘোরা পথে পিকিং যাত্রা করিলেন কেন, তাহাও তাৎপর্য্যপূর্ণ। কোন বিদেশী শক্তির অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহারা পিকিং যাত্রার পথে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন কি? নয়াদিল্লীতে অবস্থিত বৃটিশ ও মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের সহিত কোন আলোচনা এই প্রতিনিধি দলের হইয়াছিল কি না কে জানে? হইলেও জানিবার উপায় নাই। কাশ্মীর কমিশন তাঁহাদের সালিশের প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তানকে জানাইবার পূর্ব্বেই নয়াদিল্লীস্থিত বৃটিশ ও মার্কিণ দূতাবাসকে জানাইয়াছিলেন, এ কথা আমাদের স্বতঃই মনে পড়িতেছে। গিলগিটে ঘাঁটি স্থাপনের জন্য পাকিস্তান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া

সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। গিলগিটে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি স্থাপিত হইলেই যে আমরা জানিতে পারিব, তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে যে তিব্বত সমস্যা অন্য রূপ ধারণ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি তাহাদের বিরোধী মনোভাব গোপন রাখে নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কম্যুনিজম নিরোধ করিবার এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কম্যুনিজম নিরোধ করিবার নীতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই গ্রহণ করিয়াছে। ফরমোসা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। ফিলিপাইনে, ফরমোসায়, এবং জাপানে মার্কিণ ঘাঁটি রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় চারি শত দ্বীপে যে মার্কিণ ঘাঁটি রহিয়াছে সে-কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কোরিয়ায় মার্কিণ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে কম্যুনিষ্ট চীনের সৈন্য উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। তা ছাড়া তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আশঙ্কার কথাও শোনা যাইতেছে। এই যুদ্ধ যে কম্যুনিষ্ট ব্লকের সহিত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট চীন তাহার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। যদি সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে কাশ্মীরের ভিতর দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করা এবং তিব্বত হইতে চীন আক্রমণ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী পিকিং হইতে তিব্বত-চীন সীমান্ত রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। তিব্বত সম্পর্কে চীন যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা আমরা সমর্থন না করিতে পারি, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তার জন্য গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে তাহাও আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তিব্বতের নিকট চীন যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া বেসরকারী ভাবে জানা যায়, তাহাতে দেখা যায়, তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় তাহার নাই। কিন্তু তিব্বতের রক্ষা-ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র-নীতি এবং চলাচল-ব্যবস্থার উপর চীন কর্ত্তৃত্ব দাবী করিয়াছে। চীনের সহিত যে-সকল রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাদের ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রের সহিত তিব্বত সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না, এই দাবীও করা হইয়াছে। লাসার সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তিনটি ট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মাণের প্রস্তাবও চীন করিয়াছে। তা ছাড়া তিব্বতী আইনসভা এবং মন্ত্রিসভাকে প্রতিনিধিমূলক করিবার এবং ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার করিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব তিব্বতের জনগণের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে বলিয়াই কি মনে হয় না?

তিব্বত অভিযানের অবসান'?—

তিব্বত অভিযান সম্পর্কে যে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল অবশেষে তাহার অবসান হইল কি? পি-টি-আইয়ের কালিম্পংস্থিত সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, চীনাদের পরিচালনাধীন তিব্বতী বাহিনী লাসায় প্রবেশ করিয়াছে এবং যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ১৩ই নবেম্বর এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতী বাহিনী কোন্ তারিখে লাসায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু ১০ই নবেম্বর শুক্রবার রাত্রে পিকিং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিব্বত ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এদিকে নয়াদিল্লী হইতে ১০ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ৮ই নবেম্বর তিব্বতের দলাই লামা গবর্ণমেণ্ট চীন কর্ত্তৃক তিব্বত অভিযানের ব্যাপারে সাহায্য ও হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ঐ দিনই কালিম্পং হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, অভিযাত্রী বাহিনী লাসার ৪০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। তা ছাড়া এই মর্ম্মেও সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, তিব্বত গবর্ণমেণ্টে রদবদল হইয়াছে এবং পাঞ্চেন লামার সমর্থকগণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

তিব্বতে যদি সত্যই চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ সম্পর্কে কি করিবেন? পরস্পরবিরোধী সংবাদের কুহেলিকার আবরণে তিব্বতে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইবে কি?

নেপালে পট-পরিবর্ত্তন—

নেপালে ঘটনাবলীর হঠাৎ যে পট-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তিব্বত অভিযানের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রাসাদ-বিপ্লব হইতে যাহার আরম্ভ তাহা গণবিপ্লবে পরিণত হওয়া আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। গত ৬ই নবেম্বর (১৯৫০) নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীরবিক্রম শাহ, যুবরাজ, যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পরিবারের লোকজন সহ কাটামুণ্ডস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসার জন্য ভারতে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নেপালী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করায় তিনি ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই যুক্তি যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি নেপালের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি মহারাজা মোহন শমসেরজঙ্গ বাহাদুর রাণা কাল বিলম্ব না করিয়া নেপালাধীশের তিন বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পৌত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় ভিতরের ব্যাপার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া নেপালের মহারাজাধিরাজকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়াছেন। গত ১১ই নবেম্বর ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইটি ডাকোটা বিমানে নেপালাধীশ সপরিবারে দিল্লীতে পৌছেন। ঐ দিনই নেপালী কংগ্রেস বাহিনী নেপালের বিভিন্ন নয়টি স্থানে যুগপৎ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম দিনেই তাহারা নেপালের বৃহত্তম নগরী বীরগঞ্জ দখল করে এবং তথায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে। এই অভিযাত্রী বাহিনী ১২ই নবেম্বর সেমরা দখল করে। তাহারা নেপালের তৃতীয় বৃহত্তম সহর ও শিল্পকেন্দ্র বিরাটনগরও দখল করিয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া যখন প্রকাশিত হইবে তখন সমগ্র নেপালই নেপালী কংগ্রেসের দখলে চলিয়া যাইবে কি না, সে-সম্বন্ধে কোন অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। এখানে আমরা শুধু নেপালের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থার, পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

নেপালের আয়তন প্রায় ৫৪ হাজার বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ। নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বাংলা এবং উত্তর প্রদেশ, পূর্ব্বে সিকিম এবং পশ্চিমে কুমায়ুন। নেপাল যে অত্যন্ত প্রাচীন দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালের মহারাজাধিরাজ নে-মুনির বংশধর বলিয়া দাবী করেন। কলিযুগ আরম্ভ হইলে এই নে-মুনিই না কি নেপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নেপাল তাহার ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত মোটের উপর স্বাধীনতাই ভোগ করিয়া আসিতেছে। ১৭৯২ সাল হইতে ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত নেপাল প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উপহার সহ একটি মিশন পিকিং-এ পাঠাইত। তদানীন্তন চীন গবর্ণমেণ্ট এই উপঢৌকনকেই কর বলিয়া গণ্য করিতেন। আধুনিক নেপালের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু রাণা-বংশীয়দের একাধিপত্য আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। মহারাজাধিরাজ নামে মাত্র নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ মহারাজা বা প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালন করেন। তিনি আবার প্রধান সেনাপতিও বটেন। রাণা-বংশীয়রা পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রী হইয়া থাকেন। রাণা-বংশীয়দের এই অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপে লাভ হইল তাহার সঠিক বিবরণ কিছু জানা যায় কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে বলিয়াই মনে হয়। বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে জনৈক নেপালী জাতীয়তাবাদী নেতা নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৬ সালে নেপালের তদানীন্তন মহারাজাধিরাজের মস্তিষ্কবিকৃত হওয়ায়, তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা তিনি রাণা-পরিবারের হাতে অর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ ও নেপালের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ১৮১৬ সালে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই নেপালের রাজা মারা যান এবং তাঁহার শিশু-পুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়। শিশু রাজার রিজেণ্ট নিযুক্ত হন জেনারেল ভীমসেন থাপা। ১৮৩৯ সালে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভীমসেন ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরে তিনি হয় আত্মহত্যা করেন, না হয় তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাতাবর সিংহ নির্ব্বাসিত অবস্থা হইতে নেপালে প্রত্যাগমন করিয়া রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন এবং শত্রুদিগকেও ধ্বংস করেন। তাঁহার সাত ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জঙ্গবাহাদুর রাণা সামরিক বিভাগে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর জঙ্গবাহাদুর রাণা মাতাবর সিংহকে হত্যা করিয়া রাজ-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন এবং কোটের হত্যাকাণ্ডে সমস্ত শত্রু ধ্বংস করিয়া নেপালে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জঙ্গবাহাদুর রাণাই নেপালের প্রকৃত শাসক ছিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান পদে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতেই রাণা-বংশীয়রাই নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইয়া আসিতেছেন এবং কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রীই নেপালের প্রকৃত শাসক। সামরিক বিভাগের প্রধান পদগুলি রাণা-বংশীয়দেরই একচেটিয়া। নেপালে একটা তথাকথিত পার্লামেণ্ট আছে বটে, কিন্তু এই পার্লামেণ্ট জনগণের প্রতিনিধি নহে। সেখানে রাজগুরু এবং ভরদার বা অভিজাত-বংশীয়দেরই একাধিপত্য। ১৯৩৮ সাল হইতে নেপালের মহারাজাধিরাজ তাঁহার হৃত-ক্ষমতা পুনরায় অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অধুনা-বিলুপ্ত প্রজা-পরিষদকে প্রকাশ্য ভাবেই সমর্থন করিয়াছিলেন। নেপালের গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে বলিয়া প্রকাশ। নেপালের মহারাজাধিরাজ এবং রাণা-পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ির পরিণামেই নেপালাধিপতিকে গোপনে ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার আলোকে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, উহার মূলে রহিয়াছে নেপালের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নব অভ্যুদিত গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম।

নেপালের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস—

রাণা-পরিবারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন হইতে নেপালীদের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। কিন্তু অল্প দিনের ইতিহাসেও এই আন্দোলনকে অনেক বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে কঠোর দমন-নীতির ফলে। ১৯২৭ সালে 'প্রচণ্ড গুর্‌খা' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্তু দমন-নীতির কবলে পড়িয়া চারি বৎসরের অধিক এই প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী হয় নাই। উহার এক জন নেতা এখনও নেপালের জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। ১৯৩৫ সালে নেপালী প্রজা-পরিষদ নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম নেপালে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করে। গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠন করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করা হয়। উহার চারি জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ফাঁসী হয়। প্রজা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত তানকপ্রসাদ উপাধ্যায় কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া মৃত্যুদণ্ড এড়াইয়া যান। তিনি এখনও জেলে পচিতেছেন। প্রজা-পরিষদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার অভিযোগে নেপালাধিপতির সিংহাসনচ্যুতির আশঙ্কা পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছিল। এই অভিযোগে তাঁহার বিচার হইয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ। কেবল গণবিপ্লবের আশঙ্কায় তিনি সিংহাসনচ্যুত হন নাই।

১৯৪৬ সালে কলিকাতায় ডোমিসাইল্ড নেপালীদের এক সম্মেলন হয় এবং সম্মেলনের ফলে ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় নেপালী জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসেই এই জাতীয় কংগ্রেস বিরাটনগরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে এবং উহার সভাপতি শ্রীযুত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলা গ্রেপ্তার হন। ছয় মাস পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি কাটামুণ্ডে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া গঠনমূলক কাজ করিতে থাকেন। তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৮ সালে নেপাল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। নেপালাধিপতির দূরবর্ত্তী আত্মীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবিক্রম শাহ উহার সভাপতি হন। ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় নেপালী জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা উহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। গত এপ্রিল মাসে

(১৯৫০) নেপালী জাতীয় কংগ্রেস এবং নেপাল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস মিলিত হইয়া নেপাল কংগ্রেস গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মাতৃকা-প্রসাদ কৈরলা নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি এবং উঁহার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবিক্রম শাহ। ১৯৪৭ সালে নেপালের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মহারাজা পদম সমশেরজঙ্গ বাহাদুর নেপালের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ কাটামুণ্ড যাইয়া শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। এই শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রসম্মত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। তথাপি নিম্ন-পরিষদে রাণাদের সংখ্যাধিক্য না থাকায় এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় নাই। নেপালের মহারাজাধিরাজ না কি এই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক।

কোরিয়া যুদ্ধে নূতন জটিল পরিস্থিতি—

কোরিয়ার যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই যখন অনেকের মনে হইয়াছিল, এই বৎসর (১৯৫০) শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মার্কিণ বাহিনীকে দেশে পাঠাইতে পারিবেন বলিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থার যখন কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময় কোরিয়ার যুদ্ধে হঠাৎ এক নূতন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। গত ২৭শে অক্টোবর হইতে উত্তর-কোরিয়া বাহিনী পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রবল বাধাদান আরম্ভ করে। উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যরাও লড়াই করিতেছে বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। সুতরাং যত সহজে উত্তর-কোরিয়া দখল শেষ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তত সহজে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা তো যাইতেছেই না, অধিকন্তু কোরিয়া যুদ্ধের পরিণতি আরও সুদূরপ্রসারী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করাই ছিল কোরিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ-কোরিয়া হইতে উত্তর-কোরিয়া বাহিনীকে অপসারিত করার পরই কি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল না? কিন্তু অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করার নির্দ্দেশই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

মার্কিণ বাহিনী উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ করায় চীন গবর্ণমেণ্টের মনে যে আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এই জন্যই পিকিংস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মারফৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন গবর্ণমেণ্টকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ইয়ালু নদীর হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশন ধ্বংস করায় বা উহার ক্ষতি করার কোন অভিপ্রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই। ইয়ালু নদী উত্তর-কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত।

এই ইয়ালু নদীর হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশন হইতে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে তাহার দ্বারাই মাঞ্চুরিয়ার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ চলিয়া থাকে। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই কম্যুনিষ্ট চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। নিরাপত্তা পরিষদের বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গ্ল্যাডউইন জেব এক বিবৃতি দিয়া চীনকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, উত্তর-কোরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাই। এই আশ্বাস দিবার প্রয়োজন হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা

অতিক্রম করা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন এই আশ্বাসের কতটুকু মূল্য দিবে, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কোরিয়া সমস্যার আলোচনার জন্ত কম্যুনিষ্ট চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গত ১১ই নবেম্বর (১৯৫০) কম্যুনিষ্ট চীন এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফরমোসার সহিত একত্র করিয়া কোরিয়া সমস্যার আলোচনা করা না হইলে চীন এই আলোচনায় যোগদান করিতে রাজী নয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ফরমোসায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা কার্য্যতঃ কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয় সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর কম্যুনিষ্ট চীন আস্থা স্থাপন করিবেই বা কিরূপে ?

ওয়েক দ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া—

গত ১৫ই অক্টোবর (১৯৫০) ওয়েক দ্বীপে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারের যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে কোরিয়াই অবশ্য প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এই আলোচনা হইতে সাত দফা-সম্বলিত যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি (Pacific Doctrin) গঠিত হইয়াছে, তাহার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য এশিয়ার জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতির মূল কথা সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সাহায্য করিবার জন্ত জেনারেল ম্যাকআর্থারের অধীনে নৌবাহিনী, বিমান-বাহিনী এবং স্থলসৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি করা হইবে। তা ছাড়া কম্যুনিজম নিরোধ করিবার জন্ত এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিকে, বিশেষ করিয়া ইন্দোচীন ও ফিলিপাইনকে সামরিক অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হইবে। কিন্তু জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়ায় জয় লাভ করিবার পর হইতে সেখানে যে ভাবে শান্তি স্থাপন ও কম্যুনিজম নিরোধের কাজ চলিতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শুধু দক্ষিণ-কোরিয়াতেই নয়, উত্তর-কোরিয়ার যে-সকল অংশ জেঃ ম্যাকআর্থার দখল করিয়াছেন, সেখানেও সীঙ্গম্যান রী'র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করা তো হইয়াছেই, অধিকন্তু সীঙ্গম্যান রী'র শাসন যেরূপ কঠোর দমন-নীতি চালাইতেছে তাহাতে কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই হইবে না। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকার কোরিয়াস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা এই অত্যাচারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। কম্যুনিজম নিরোধের জন্ত পুলিশ বহু নর-নারীকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। 'টাইমসে'র উক্ত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পুলিশের প্রশ্ন করার (interrogation) অর্থ বন্দুকের কুঁদা ও বাঁশের লাঠি দ্বারা গুরুতর প্রহার করা এবং নখের ভিতর দিয়া সূচ ফুটাইয়া দেওয়া। এক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, ঐ দিন প্রাতে এক জন বন্দীর পিঠে একটি রাইফেলের কুঁদা ভাঙ্গা হইয়াছে এবং দুই জন নারী এবং একটি কোলের শিশুকেও প্রশ্ন করা হইয়াছে। [illegible] উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ঐ থানায় ছয়টি সেল্ আছে। উহাদের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট এবং প্রস্থ ৮ ফুট। এই বিশেষ সংবাদদাতা যেদিন ঐ থানায় গিয়াছিলেন, সেদিন তিনি ঐ সেলগুলিতে ২১০ জন নর-নারী এবং ৭টি শিশুকে আটক দেখিতে পান। 'ডেইলী মিরর' পত্রিকার সিউলস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট দখলের সময় তাহাদের সহিত সহযোগিতা করার অপরাধে ৬০০ লোকের ফাঁসী হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের কমিশন তদন্ত করিতেছেন। শুধু সিউলের জেলগুলিতে ৫০০০ লোক বিচারের প্রতীক্ষায় এবং ৩০০০ লোক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্ত আটক রহিয়াছে বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, প্রতিবেশীর কথায় বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া স্বীকার উক্তি আদায়ের জন্ত রাইফেলের কুঁদা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অধিকাংশ কোরিয়া দখলের পর রী-গবর্ণমেণ্ট এই ভাবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু করিয়াছেন।"

একিসন-পরিকল্পনা—

গত ৩রা নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে সপ্ত শক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ এই প্রস্তাব একিসন-পরিকল্পনা নামেই অভিহিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ৫টি অংশ। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করিতে যদি বাধা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা চলিবে। দ্বিতীয় অংশে পৃথিবীর উপদ্রুত অঞ্চল সমূহের উপর নজর রাখিবার জন্ত ১৪ জন সদস্য লইয়া একটি শান্তি-পর্য্যবেক্ষক কমিশন গঠন করা হইবে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যেক সদস্য দেশকে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ প্রস্তুত রাখিবার জন্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। চতুর্থ অংশে ঐকত্রিক নিরাপত্তার (collective security) সমস্যা সমগ্র ভাবে বিবেচনার জন্ত ১৪ জন সদস্য লইয়া একটি Collective Measures Committee বা ঐকত্রিক ব্যবস্থা কমিটি নিয়োগ করা হইবে। পঞ্চমতঃ, এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা করিতে হইবে যে, সকল দেশের মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সকল দেশের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের উপরেই কার্য্যতঃ শান্তি নির্ভর করে।

এই পরিকল্পনা যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের যুদ্ধের পথে শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেশীর ভাগ সদস্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিয়া থাকে। কাজেই শুধু ভোটের সংখ্যাধিক্যের উপর এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার বিপদও বড় কম নয়। ভারত এই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন দিকেই ভোট দেয় নাই। সোভিয়েট ব্লক উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেই গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ এই কয়েকটি দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্দ্ধেক।

নীলকুঠীর নয়না

তারানাথ রায়

তের

সহস্র পাইক, লাঠিয়াল ও গ্রামবাসী যখন রাজার বাগিচার আধ মাইল দূরে এসে পৌঁছল, তখন কালীনাথ পাঁচ জন বিশ্বস্ত সর্দ্দারের নেতৃত্বে পাঁচ দলকে বাগিচার চার দিকে আত্মগোপন করে আক্রমণের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করতে আদেশ দিলেন। উঁচু গাছে দিশারী-গুপ্তচর মোতায়েন করা হল, তারা বিভিন্ন অবস্থার ইঙ্গিত-ধ্বনি করবে।

কালীনাথ একবার চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়ান। কার্ত্তিক সর্দ্দার আদেশের অপেক্ষা করে। মুহূর্ত্তে যেন সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যায়। বলেন—কার্ত্তিক!

—কর্ত্তাবাবু!

—কৃষ্ণকিশোরের বলিতে মা প্রসন্ন হয়েছেন!

কার্ত্তিক অনুভব করে, তার কপালে সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণের রক্ত-তিলক আগুনের মত জ্বলছে। সে চুপ করে থাকে।

—বাগচী হয়ত ওদের হাতে পড়েছে।

—মনে ত হয় না কর্ত্তাবাবু।

—আমারও মনে হয় না।—কিন্তু একটা রাত কেটে যায়, ফিরল না ত! আর গোপালচাঁদ? বিলাসী?

হঠাৎ দূর থেকে শোনা যায় এক মর্ম্মভেদী ক্রন্দন! কালীনাথ উৎকর্ণ হন। নারী-কণ্ঠ। কার্ত্তিক সর্দ্দার সভয়ে তাঁর মুখের দিকে চায়।

সেই শান্ত নিশীথে অশরীরীর সেই রোদনধ্বনি অতি বড় সাহসীর হৃদ্‌স্পন্দনও যেন স্তব্ধ করে দেয় সহসা।

কালীনাথ উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। মুখ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসে—নয়না!

কার্ত্তিকও অস্ফুট প্রতিধ্বনি করে—নয়না!

নয়না যখন কাঁদে দেখাদেখি গাঁগুলো থেকে কুকুরগুলো বেরিয়ে এসে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে সে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি করে।

কালীনাথ নিশ্চল হয়ে শোনেন। শোনেন, নয়নার সঙ্গে কাঁদে যেন দশখানা গাঁয়ের বিপন্না কন্যা বধূ আর জননীরা—কাঁদে যেন পরিত্যক্ত চণ্ডীমণ্ডপগুলোয় ম্লানলক্ষ্মীরা, কাঁদে যেন বারোয়ারীতলার জলন্ত মা জগদম্বা!

সে ক্রন্দন-আলেয়া মাঠময় ছুটে-ছুটে খুঁজে বেড়ায় কা'কে, যেন অনিশ্চিত কার কাছে আবেদন করে বেড়ায় শাবক-হারা ক্রুদ্ধা বাঘিনী। সে আবেদনে গ্রামগুলোর ঘরে-ঘরে ঘুমন্ত শিশু চমকে উঠে সভয়ে মায়ের মুখের দিকে চায়, আসন্ন ভয়ে শঙ্কিতা জননীরা সন্তানদের বুকে জড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। সে ক্রন্দনতূর্য্যে বাংলার জোয়ানরা কোমরে গামছা এঁটে বেঁধে বল্লম নিয়ে এসে দাঁড়ায় গৃহদ্বারে।

নয়না এমনি করে কেঁদে বেড়াত সাঁঝ-সকালে। ডিক যখন সারা রাতের মাতলামীর পর বেহুঁস হয়ে ঘুমোত, পচা ফিরিঙ্গীটাকে [illegible] হ'ত, সে ছুটে বেরিয়ে যেত আর কোন-কোন দিন

টগবগের [illegible]

ডুকরে কাঁদত—সে কান্না ও-অঞ্চলের সকলেরই জানা। সন্ধ্যায় ডিক হয় সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খেলতে যেত, না হয় মেরীর সঙ্গে প্রেম করতে যেত, না হয় ফরাজীদের আড্ডায় ষড়যন্ত্র করতে যেত, কালা আনন্দ তার কাল বাঁদরগুলোকে পিটে পিটে বাংলো থেকে খেদিয়ে দিয়ে ভীমে সর্দ্দারকে পান-তামাক দিতে ব্যস্ত রইত; আর সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নয়না তার কাল কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ত সাত খুনের মাঠে, আর শাবক-হারা ক্রুদ্ধা ও ক্ষিপ্তা [illegible] যেমন করে কেঁদে-কেঁদে হুঙ্কার করে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি করে আলে আলে বনে-বাদাড়ে কাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াত।

এবার খুঁজে পেয়েছে নয়না—তাকে—তার ফেলে-যাওয়া সন্তানকে রায় মশায়ের কৃপায়। তাকে বুকে জড়িয়ে তার মুখে চুমু খেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে, জীবন সার্থক করেছে। গং সড়কী মেরেছে, বেশ করেছে—তার কাঁধের ক্ষতটাই ত আর বড় নয়, মনের ক্ষত যে তার চাইতেও বড়। মনের ক্ষতে গোপালচাঁদ তার ধন্বন্তরি-প্রলেপ। বাছার চাঁদমুখে ডিক ঘুসি মেরেছে—মরুক ডিক! বাছার পায়ে গুলী মেরেছে মরিয়ম! দেখে নেবে সে ডাইনিটাকে একবার। বাগচী মশাই যখন তার ভার নিয়েছে তখন সে নিশ্চিন্ত।

ফরাজীদের সন্ধান করতে কেষ্টলাল চার দিকে লোক পাঠায়। খবর পায় বিভিন্ন গ্রামের মুসলমানরা প্রস্তুত হচ্ছে। এর প্রতীকার আগে করতে হবে। বাগচী প্রতি গ্রামে ছুটে বেড়াতে থাকে। প্রতি গ্রামের জোয়ানদের তৈরী হয়ে রইতে বলে। প্রতি গ্রামের বৌ-ঝিয়ারী-শিশু—যাদের সরান সম্ভবপর হয়নি তাদের সব্বাইকে ভূতের বাড়ীতে আগেভাগে সরাতে বলে আসে। এই করতে করতে রাত হয়ে গেল অনেকটা। পথে দেখা হয় সেই মাঠে গোপাল আর বিলাসীর সঙ্গে। কৈলাসের হাতে বিলাসীর ভার দিয়ে বাগচী গোপালকে নিয়ে চলে যায়।

আহত গোপালকে রাজার বাগিচার পাশের গাঁয়ে এক বৈদ্যের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, বৃদ্ধ কবরেজ মশাইকে তার ক্ষতের দিকে দৃষ্টি দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে বাগচী বিলাসীর খোঁজে বের হয়। কৈলাস সর্দ্দার সংবাদ দেয়, জাফ্‌রা চৌকীদারকে সরিয়ে ফেলার পর, নয়না জাফ্‌রার স্ত্রীকে নিয়ে ভূতের বাড়ীতে রেখে কোথায় চলে গেছে।

কোথায় গেছে নয়না? বাগচী অনেক জায়গায় খুঁজল। পাওয়া গেল না। মনে পড়ল রায় মশাই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নিশ্চয়, কিন্তু বিলাসীর খোঁজ না পেলে তিনি ত স্থির থাকতে পারবেন না।

রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসে। বাগচী বিলাসীর খোঁজ না নিয়ে ফিরবে না।

সাত খুনের মাঠ। খবরদারী জোয়ানরা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরাঘুরি করছে। সবাই বলছে মুসলমানেরা রাজার বাগিচার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাগচী সন্তর্পণে ৪।৫ জন সাকরেদকে নিয়ে রাজার বাগিচার দিকে আত্মগোপন করে করে চলে।

কবিরাজ মশাইয়ের আটচালায় গোপালচাঁদ ছটফট করে তার মা! ফিরিঙ্গী গং তাকে ঘায়েল করেছে—তাকে কে দেখবে গোপাল ছাড়া? বুকে কেমন করে জড়িয়ে ধরেছিল, কেমন করে চুমু খেয়েছিল, কেমন করে মাথায় হাত বুলিয়ে তার গুলী

আঘাতের বেদনা একেবারে নির্ব্বিষ করে দিয়েছিল। মা না থাকলে কবরেজ কী করবে। উঠে আটচালার বারান্দায় এসে বাইরের দিকে চায়। চাঁদ উঠেছে! নক্ষত্র ফুটেছে। ক্বচিৎ দুই-একটি কাক ভুল করে কা-কা করছে। কোথায় কি ফুল ফুটেছে, তার গন্ধ ভেসে আসছে।

হাতের লাঠিখানায় ভর করে দুই-এক পা করে নামে। পা প্রলেপ দিয়ে বেঁধেছে কবরেজ, তাতে কি! হঠাৎ? ও কী—নয়না-কাঁদে?

গা তার ছম-ছম করে।

চার দিক থেকে কুকুরগুলোও কাঁদে সমস্বরে।

একটা আতঙ্কে গোপাল নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়।

একটা সওয়ারী। রাস্তার বাগিচার দিক থেকে ধীরে ধীরে কোথায় চলেছে। বাঁক ঘুরতেই সওয়ারীকে স্পষ্ট দেখা যায়। মুসলমান ত নয়। সাহেব! এমন অসময়ে? গোপাল স্বভাব-মত হাঁকে।

—কে যায়?

সাহেব কেয়ার করে না। চলতে থাকে। গোপাল হুঙ্কার করে আবার হাঁকে—কে যায়?

সওয়ারী এবার দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতের পিস্তল দেখিয়ে বলে—হট্ যাও!

স্পষ্ট দেখে টমসন! মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে! দুষমণ টমসন! পায়ের ব্যথা সে ভুলে যায়। এদিকে টমসন, ওদিকে কুকুরগুলো কাঁদে, সে ক্রন্দন ছাপিয়ে ওঠে নয়নার রুদ্র-করুণ আবেদন-ক্রন্দন!

গোপাল মুখে দু'খানি হাত দিয়ে উৎকট আওয়াজ ক'রে সহকর্ম্মীদের সঙ্কেত-ধ্বনি করে।

একে-একে সাত গাঁয়ের মাঠে নেমে পড়ে গাঁয়ের জোয়ানরা। তাড়া করে সওয়ারীকে। টমসন দু'-এক বার পিস্তল আওয়াজ ক'রে ছুটিয়ে দেয় তার ঘোড়া!

ওরাও ছোটে। মাঝে-মাঝে জোয়ানরা পাক দিয়ে দিয়ে ডাণ্ডা ছোঁড়ে। অদ্ভুত বিক্রমে গোপালচাঁদ তার পায়ের ক্ষত অগ্রাহ্য করে ছোটে টমসনের পেছনে। নয়নার ক্রন্দন-আলেয়াও ছুটে-ছুটে তার সন্তানের বুকে আগুন জ্বালিয়ে চলে।

কালীনাথও শোনেন নয়নার কান্না। আর থাকতে পারেন না। হাতিয়ারখানা মুঠের মধ্যে শক্ত করে ধরে বন থেকে শব্দ লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়েন। কানে পড়ে এক ঘোড়সোয়ার যেন ছুটে চলে যায় একটু দূর দিয়ে। দ্রুত টগবগি আওয়াজ শোনা যায়। কে যেন সোয়ারকে তাড়াও করেছে। হঠাৎ "রা-রা রা-রা হো-ও-ও!" গোপালচাঁদের গলা!

টগবগি সহসা থেমে যায়। নয়নার কান্না দূরে সরে যায়। তার কুকুরগুলোর কান্না মৃদু হয়ে আসে। কোলের শিশুরা মায়ের কোলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জননীরা তবু জেগে থাকে।

কালীনাথ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

জ্যোৎস্না উঠেছে। কালীনাথ দেখতে পান, মাঠখানায় ২০।২৫ জন রণ-পা ছুটে চলেছে। তিনিও ইঙ্গিত-ধ্বনি করেন—দলপতির ধ্বনি। নিমিষে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায় কার্ত্তিক সর্দ্দার, শিবধন সর্দ্দার, মদনা সর্দ্দার আরও কয় জন।

—কার্ত্তিক !

—ভূতের বাড়ীর দিক থেকে সোয়ার কর্ত্তা !

গোপাল তখনও আওয়াজ দিচ্ছে। কার্ত্তিক কর্ত্তার কাছে থাকে। আর সবাই ছুটে গিয়ে দেখে একটা তেজি ঘোড়া পড়ে ছটফট করছে। একটা কে যেন দূরে পড়ে। গোপাল মূর্ত্তিটার বুকে চেপে বসে। সর্দ্দাররা রণ-পা থেকে নামে।

দেখে, কেশব নগর কুঠীর ছোট টমসন! এত রাতে ছোট টমসন? গোপাল সাঙ্গাতদের দেখে ওর কণ্ঠ ছেড়ে উঠে বসে। ধলাটা বলে—দোস্ত।

দোস্ত? ওরা তবু ওকে ধরে রাখে। হাতিয়ার কেড়ে নেয়।

গোপাল উঠে দাঁড়ায়। চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে মদনা সর্দ্দারের মুখের কাছে মুখ নিয়ে সভয়ে জিজ্ঞেস করে—নয়না! সর্দ্দার, নয়না আবার কেঁদে গেল ?

মদনা বলে,—হুঁ! কেঁদে গেল অসময়ে।

—কেন?

ওরা টমসনকে ধরে নিয়ে যায় রায় মশাইয়ের কাছে। রায় মশাই সাহেবের বাঁধন খুলে দিতে বলে। জিজ্ঞেস করে—এত রাতে সাহেব ?

—আর তুমি ?

—আমিও প্রতিশোধ নিতে। আর তুমি ?

—প্রতিশোধ নিতে! তুযমণ!

গোপাল এসে টমসনের টুঁটি চেপে ধরে। কাশীনাথ বলে—ছেড়ে দে!

—ঝগড়ায় স্থান এ নয় টমসন! ও পরে দেখা যাবে। এই—চল্!

টমসন আর কাশীনাথ পাশাপাশি চলে। টমসনের পেছনে কার্ত্তিক। চার দিকে ঘিরে চলে লাঠিয়াল সর্দ্দাররা। গোপাল যায় না।

তখনও নয়না কেঁদে বেড়ায়। দূর থেকে শোনা যায়। সে ক্রন্দন দূর থেকে দূরে সরে যায়, এক-একবার কাছে এসে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত হুঙ্কার দিয়ে আবার পেছনে সরে যায়।

গোপালচাঁদ উৎকর্ণ হয়ে শোনে। টমসনকে রায় মশায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত সে হয়, কিন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়নার কান্না শোনে। ফিরে দেখে রায় মশাই এগিয়ে চলেছেন। পাশে টমসন। বাঁদরটা মাথা উঁচু করেই চলেছে। চার দিকে সর্দ্দাররা। রায় মশাই একবার পেছন ফিরে গোপালের দিকে চান। গোপাল তার লাঠিটা ভর করে দৌড়ে গিয়ে রায় মশাইকে প্রণাম করে দাঁড়ায়। সব্বাই একবার দাঁড়ায়। টমসন কটমট করে চেয়ে দেখে গোপালের বজ্র-কজ্জীর দিকে। রায় মশাই কানে-কানে বলেন গোপালকে—নয়না নয় রে, তোর মা—বিলাসী কেঁদে বেড়াচ্ছে।

শিশু গোপাল, বাঘিনীর বাচ্চা গোপাল আর্ত্তনাদ করে ওঠে। থমি পা দিয়ে লাঠিখানা জড়িয়ে ধরে, মা! মা! করতে রতে সে ছোটে—মাঠের দিকে। আর পাশের গাঁগুলোর াঙাতদের অদ্ভুত আওয়াজ করে ডাকে। আবার বিশ পঁচিশ জন ঠে নামে।

কুকুরগুলো তখন কান্না থামিয়ে ফিরে গেছে। চার দিকে খালি ঝিঁঝিঁর ধ্বনি। শেষ রাতের হাওয়া শুকনো পাতাগুলোকে বিভ্রান্ত করে যায়। ওরা এ-গাঁয়ে খোঁজে ও-গাঁয়ে খোঁজে। গ্রামগুলো ফাঁকা! দীপ পর্য্যন্ত কোথাও জ্বলছে না। এক-এক জায়গায় এক-এক জন জোয়ান লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। তারা বলে, বাগচী মশাই মেয়েদের ভূতের বাড়ীতে সরিয়ে নিয়ে গেছে, ফরাজীরা রাজার বাগিচার চার দিক ঘিরে রেখেছে।

গোপাল আর তার সাঙাতরা প্রতি গ্রাম খোঁজে। বিলাসীকে পায় না। তারা এগিয়ে চলে রাজার বাগিচার দিকে অতি সন্তর্পণে!

চৌদ্দ

বাগচীর দল যখন ফরাজী ফকীরটাকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে রাজার বাগিচার গুম-ঘরে বন্দী করবার জন্য নিয়ে যায়, ফরাজীরা সে সংবাদ পেয়েছিল। টমসনের পাইকদের কাছে প্রহার খেয়ে ডিকের ফরাজীরা ফেরবার পথে ফকীরের সন্ধান পায়নি। সকাল বেলা এক জন খবর দিল, রাজার বাগিচার খিড়কী দীঘির পারে ফকীরের আলখেল্লা সে পড়ে থাকতে দেখেছে। সন্দেহ হয়, ফকীর হয়ত হিন্দুদের হাতে পড়েছে। কথাটার ডাল-পালা হয়। চার দিকে প্রচার হয়ে যায়। তিতুর ফকীরকে উদ্ধার করবার জন্যে দলে দলে ফরাজী সমবেত হতে থাকে দিনের বেলা থেকেই।

সন্ধ্যায় বাগচী সে সংবাদ পেয়েছিল। তাকে যেতেই হবে বাগিচার গুম-ঘরে। নৈলে অঘটন ঘটবে। অতগুলো হাতিয়ার! কাঁটাবনের গোপন-পথে বাগচী এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। মনে হয় দু'এক জন সঙ্গী থাকলে ভাল হত। কিন্তু এখন ত আর উপায় নেই। অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। চোরা-পথ দিয়ে সরাসরি যখন ঘূর্ণি সিঁড়িতে পৌঁছল তখন জানে হল, এক জন কে পড়ে আছে। কোমরের হাতিয়ারটাতে হাত দিয়ে চেপে ধরে বাঁ হাতে। মুখে করে দলের ইঙ্গিত-ধ্বনি। সাড়া নাই।

কে? ফরাজী গুপ্তচর? গুপ্তচর মনে হতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগচী। স্তূপটা আর্ত্তনাদ করে ওঠে। তার ঘন-ঘন শ্বাস শোনা যায়।

চকমকিটা ঠুকতেই হ'ল। মিরজাইয়ের ভেতর থেকে চকমকিটা বের করে বাগচী ঠুকে প্যাকাটির মাথার গন্ধক জ্বালায়।

কাল বস্ত্রস্তূপের মধ্যে জ্বলে নয়নার চোখ! জ্বলে—আগুনের মত জ্বলে।

—নয়না!

ও হাঁপায়। আর তার আগুনে চোখ চেয়ে থাকে। ঠোঁট দু'টো কাঁপে।

—বিলাসী!

ওর অতি ক্লান্ত অস্ফুট ওষ্ঠ খোঁজে—গোপাল!

গায়ে হাত দেয়। পুড়ে যাচ্ছে। কাঁধে নিয়ে বাগচী পাকান সিঁড়ি বয়ে ওপরে ওঠে অন্ধকারে অতি সাবধানে।

সিঁড়ি উঠে গেছে চিলে-কোঠায়। ছাদে এনে ফেলে বিলাসীকে। একটু জল কোথায় পায়? আবার নেমে যায় তাড়াতাড়ি পেছনের পুকুর থেকে জল আনতে। ছাদ থেকে বাড়ীর অন্দর-আঙ্গিনায় আসবার জন্যে বাঁশের সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে বাগচী হাতিয়ার ঘরে পৌঁছে আবার চকমকি ঠোকে। স্তূপাকৃতি

হাতিয়ার দেখে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, এ হাতিয়ার ফরাজীদের কিছুতেই নিতে দেওয়া হবে না। বিলাসীটাই ফ্যাসাদ বাধাল দেখছি। ভাবল, একটু জল এনে আগে ওকে একটু সামাল করে আসি, তার পর ফকীরটা।

আবার প্যাকাটি জ্বালায়। নজর পড়ে দোর খোলা! এঁ্যা! থমকে দাঁড়ায়! জল আনা আর হয় না। ছুটে যায় গুম-ঘরের দিকে। এ কী! পাল্লা ভাঙ্গা! প্যাকাটি নিবে যায়। আবার জ্বালায়। দেখে—পাখী উড়ে গেছে!

মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাগচী। সর্ব্বনাশ আঁধার! দু'-এক পা করে এগিয়ে চলে হলঘরের খোলা দরজা দিয়ে। কি জন্যে, তা তার মনে নেই। আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে এগিয়ে চলে—হাতের মুঠোয় হাতিয়ার আরও দৃঢ় হয়ে যায়। নিজেই অনুভব করতে পারে প্রতিহিংসায় তার চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

ফকীর পালিয়েছে। তাইতেই ফরাজীরা বাগিচা ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু সহজে ছাড়া হবে না—প্রতিরোধ না করলে ও-অঞ্চলের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হবে।

মনে পড়ে গোপালচাঁদের চেষ্টায় আবুরি কুঠীর মালখানা থেকে গাড়ী-গাড়ী বোঝাই হাতিয়ার সংগ্রহের কথা, বিলাসী চাবী দিয়েছিল—আহত বিলাসী···

সে বিলাসী ছাদে পড়ে আছে জ্বরে বেহুঁস হয়ে। তার হুঁস ফিরিয়ে আনতেই হবে।

দৃঢ় পাদক্ষেপে বাগচী এগিয়ে চলে খিড়কী দীঘির পারে। একটা কলা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঠোঙা বানায়। জল নিয়ে যাবে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। বাগচী ক্ষিপ্রগতিতে তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ফিরে দাঁড়ায়! লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে আর এক জন। ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করে ওস্তাদ বাগচী তার হাত থেকে লাঠিগাছ কেড়ে নিয়ে দুটোকে ঘায়েল করে তাড়াতাড়ি কোমরের গামছা পুকুরে ডুবিয়ে ছুটে চলে চিলে-কোঠার গুপ্তপথে। দু'-চার জন ফরাজী তার পিছু নেয়, কিন্তু নাগাল পায় না।

তখন রীতিমত হট্টগোল পড়ে যায় রাজার বাগিচার চার দিকে। ফরাজীরা সেই বাগান-বাড়ীর দেউড়ী ভাঙ্গতে প্রাণপণ করে।

বাগচী ছাদে গিয়ে বিলাসীর মুখে গামছা নিংড়ে জল দেয়। সাগ্রহে ও খায়। একটু আরাম পায়। চোখে-মুখে জল দেয়। মাথায় ভেজা-গামছাখানা চেপে ধরে ডাকে—নয়না!

নয়না তাকায়। হাত দু'টো তুলে কপালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করে মৃদু কণ্ঠে—আমার গোপাল?

—গোপাল ভাল আছে।

ও হাসে তৃপ্তির হাসি। হেসে চোখ বোঁজে।

বাগচী একটু উঠে চিলে-কোঠার দোরটা উপর থেকে এঁটে দিয়ে আসে। আঁচল সরিয়ে বিলাসীকে হাওয়া দেয়। শোনে অগণিত ফরাজী দেউড়ীর লোহার পাল্লা ভাঙ্গতে চেষ্টা করছে, পারছে না।

চার দিকে তাদের মশালগুলো রক্তচক্ষু প্রেতের মত রাজার বাগিচার চার দিকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। প্রেতের কোলাহল ও হাতুড়ির দমাদম শব্দ বাগিচা মুখরিত করে তুলেছে।

নয়নার চোখ বুঁজে আসে হয়ত আরামে। কিন্তু বাগচী ডাকে—নয়না! ও নয়না!

নয়না চোখ মেলে চায়, বাগচীর ব্যস্ত-আতঙ্ক সুর শুনে ও কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসে।

—ফরাজীরা বাগিচা ঘিরে ফেলেছে।

নয়না উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে তেমনি করে নিনাদিত করে তার ক্রন্দন-তূর্য্য। এক বার কাঁদে—থামে আবার ক্রন্দন-প্লাবনে অঞ্চলটা যাদুময় করে তোলে।

গোপাল শোনে—ঐ আবার!

মাণিক বলে—রাজার বাগিচায়।

ওরাও তাদের ইঙ্গিতধ্বনি করে! রণ-পাগুলো ছুটে আসে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে। দূরে থেকে কাশীনাথ আর টমসনও শোনে সে ক্রন্দনের ক্ষীণ ধ্বনি—আর বীর জোয়ানদের ইঙ্গিত-তূর্য্য।

টমসনকে কাত্তিকের হেফাজতে দিয়ে কাশীনাথও সদলবলে এগিয়ে চলেন রাজার বাগিচার দিকে।

[ক্রমশঃ।

আকাশ-পাতাল

[৩২ পৃষ্ঠার পর]

রাজ-জামাতার পাশাপাশি রঙীন আলোকচিত্র। দেব-দেবতার সম পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছেন সসম্মানে। কাছারী-ঘরের তক্তাপোষের দু'পাশে কানা-তোলা দু'খানা থালার দু'টি দুর্গা-প্রদীপ জ্বলছে।

অন্দরে কুমুদিনীর কাছে এ সমাচার পৌঁছেছে।

তিনিও শুনেছেন কাছারীতে ছেলে শিক্ষানবিশী করতে ব'সেছে এখন। ম্যানেজার বাবু না কি বলছেন আর ছেলে শিখছে। খবরটা শুনেই তিনি ডাকালেন বিনোদাকে। সে তখন সবে মাত্র গালে গোটা-দুই পান পুরে, পায়ে আলতা পরতে বসেছিল। ডাক শুনেই এসেছে প্রায় ছুটতে-ছুটতে। আসতেই বলেছেন কুমুদিনী,—তুই বুঝি আর থাকতে পারলি না, ছেলেটার কানে তুলে দিয়ে এলি কথাটা!

হাতে-হাতে ধরা পড়েছে বিনোদা। মুখে আর রা কাড়ে না। তাকিয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে। কুমুদিনীর চোখে পড়ে বিনোদার পায়ে তাজা আলতা। বলেন,—ঘাটের দিকে পা, এখনও আলতা পরবার সাধও হয়! তুমি বিদেয় হয়ে যাও এ-বাড়ী থেকে। রাত কাটলেই যাবে, সকালে যেন আর দেখতে না পাই।

বিনোদা নাকে কেঁদে ফেলে যেন। বলে,—রাত নেই, দিন নেই, বাসনের কাঁড়ি মাজতে মাজতে পা দু'খানা আছে না কি! হাজা হয়েছে পায়ে, আলতা পরব না?

তার অজুহাত শুনতে চান না কুমুদিনী।

কারণ, ঐ বিনোদাকে না কি তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন। জানেন বিনোদার প্রকৃতি। নেহাৎ সহায়-সম্বলহীন, দুঃখী-তাপী, তাই আর দূর করতে পারেননি। কুমুদিনী বলেছেন,—তুমি আমার নজরছাড়া হও। এখান থেকে বিদেয় হও।

কথায় ধমকের রেশ দেখে বিনোদা আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকেনি। চলে এসেছে নাকে কাঁদতে কাঁদতে।

ঘড়ি-ঘরের চোখ এড়িয়ে সময় পালাতে পারে না। প্রতি এক ঘন্টার ব্যবধানে সে-ঘরে ঘন্টার সরব ধ্বনি আবার বাজতে শুরু হয়েছে এই মাত্র। বাজবে ন'বার। এখন ঠিক ন'এর ঘরে ছোট কাঁটা, আর বড় কাঁটা বারোটার কোলে। কাছারীর নিয়ম, ঠিক এই মুহূর্তে, ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়া হয়। কাছারীর দরজা বন্ধ হয়ে যায় রাত্রে এই নির্দ্ধারিত বিশেষ ক্ষণে।

এই দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার নিয়ত কর্ম্মসূচী পালিত হয় প্রতিদিন। প্রথম প্রভাতে উন্মুক্ত হয় আর রুদ্ধ হয় ঠিক এই মুহূর্তে, ফাঁকি-মারা গোমস্তার দল যে মধু-মুহূর্তটির জন্য সাগ্রহে চেয়ে থাকে কাছারী-ঘরের দেওয়ালের ঘড়িতে।

নিজেকে যেন লজ্জিত মনে হয় কুমুদিনীর।

এই রাতে ছেলে কাছারীতে গেছে শুনে মর্ম্মাহত হন যেন। অভিসম্পাত করেন বিনোদাকে। নিরুপায় হয়ে ছেলের আসনের সামনে ব'সে হাতপাখা চালনা করেন একা-একা। খাবারের পাতে যাতে রাতের কানামাছি বসতে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন।

ব্রাহ্মণী তখন রসুইশালার উনুনের ধারে ব'সে ব'সে গেরস্থের মোটা রুটি তৈরী করতে থাকে।

সদরের কাছারীর দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার নিয়ত কর্ম্মসূচীর ব্যতিক্রম হয় আজ। দরজা ক'টা বন্ধ হয় না। প্রদীপ নেবানো হয় না। এই বংশের প্রদীপ এই প্রথম তার স্বীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছে। দিনের আলোয় চাইলে আর কোন বাধা ছিল না, চেয়েছে রাতের আলোয়, যখন চতুর্দ্দিকে ঘন তমসাবৃত।

কিছুই নয়। শোক আর অভিমান।

লিলিয়ানের চলে যাওয়া আর কুমুদিনীর কথায় মন যেন ভারাক্রান্ত। ম্যানেজার বাবু আবার কথা বলতে শুরু করেন। বলেন,—নবাব মীরজাফর হুজুর একটা পরোয়ানা জারী করেন এই বাঙলা দেশে। সেই পরোয়ানায় তিনি প্রায় সরাসরি জানিয়ে দেন যে, এই সময় থেকে ইংরেজের হাতে সব তুলে দেওয়া হল। পরোয়ানাটি হচ্ছে :—

The purwana of the Nabab to the officials and land-holder of the granted lands ends with these quaint words—"Know then ye zamindars, Chaudharis, Talookdars, Mutsuddis, and Recayas of the chakla of Hooghly and others situated in Bengal the Celestial Paradise you are dependants of the Company and you must submit to such treatment as they give you, whether good or bad and this is my express injunction."

সেকালের হয়তো কোন পাদরীর তর্জ্জমা। যদিও নবাব জাফর আলি খাঁ খাস-উর্দ্দুতেই জারী করেছিলেন সে পরোয়ানা। ম্যানেজার বাবুর এ সব জমিদারীর বিষয় নখদর্পণে। জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর তিনি রাখেন। লেখাপড়াতেও না কি তিনি দু'টো ডিগ্রী অর্জ্জন করেছেন। আর, তা না হ'লে ইংরেজ সরকার তাঁর মত প্রার্থীকে নিযুক্ত করেন এই বকলমের এষ্টেট তদারক করতে। সরকারের পক্ষ থেকে?

ম্যানেজার বাবুর কথা যারা শুনছে তারা ইংরেজীর খৈ ফুটছে দেখে কেউ-কেউ সেই ফাঁকে কেটে পড়লো। ম্যানেজার বাবু বললেন,—হুজুর, এ পরোয়ানা বিলি হয়েছিল বাঙলা দেশের সরকারী অফিসে আর যাঁদের প্রতি এই নির্দ্দেশ তাঁদের সদর কার্য্যালয়ে। তার পর হুজুর, অর্থাৎ আপনার গিয়ে লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াটসন্ যখন শেষ বারের মত বিজয়ী হ'ল তখন আবার সব নতুন জমি বিতরণ করলে। সিরাজের কলকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মীরজাফর যে টাকা দিয়েছিলেন বাঙালীদের দাবীতে, সেই টাকা পেয়ে এবং আপনার গিয়ে কোম্পানীকে বাঙলা দখলের জন্যে যে সব বাঙালী সাহায্য করলে তাদের অনেকে রাতারাতি হুজুর সব দেওয়ান, জমিদার, মুন্সী, তালুকদার হ'য়ে গেল। তারাই হুজুর সব নব-বাদশাহী। হাল আমলের।

ম্যানেজার বাবু কথার মাঝেই থেমে যান। তাঁর ওষ্ঠে যেন সামান্য হাসির উদ্রেক হ'তে দেখা যায়। তিনি আরও বলেন,—মীরজাফরের প্রদত্ত টাকা যাতে যথা-পথে ও নিঃস্বার্থ বিতরিত হয় সেজন্যে হুজুর ইংরেজরা একটা কমিশন তৈরী করেছিল বাঙালীদের নিয়ে। তাতে হুজুর আপনার গিয়ে নবাবের কলকাতা লুণ্ঠনের সময় যে সকল বাঙালী কলকাতা ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাননি, ছিলেন, এই কলকাতাতেই ছিলেন, থেকে ইংরেজকে সহায়তা করেছিলেন তাঁরাই হুজুর দাবী করলে মোটা মোটা টাকা। সে হুজুর কোমরটুলীর গোবিন্দরাম মিত্র আর কলুটোলার শোভারাম বসাক, এঁরা দু'জনেই একেক জন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা নিয়ে নিলেন। আর হুজুর নিলেন গিয়ে রতন সরকার, শুকদেব মল্লিক, নীলমণি মিত্র, নয়নচাঁদ মল্লিক, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি আরও কয়েক জন কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালী।

ম্যানেজার বাবু খানিক থেমে আবার যেন হাসলেন। সে-হাসি উপভোগ করছেন তিনি নিজে। বললেন আবার,—এনারা ছাড়া হুজুর, আর যারা-যারা পেলে তারা সব ঐ গোবিন্দরাম আর শোভারামের আশ্রিত ও অনুগৃহীত লোকজনেরা। আর পেলে হুজুর, আপনার গিয়ে গোবিন্দরাম আর শোভারামের আশ্রিতা গণিকাগণ। যথা—রতন, ললিতা ও মতি বেওয়া। এরা সব একেক জন পেলে হুজুর প্রায় সাড়ে চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা!

প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করলেই পারতেন ম্যানেজার বাবু।

ইতিহাস বলতে গিয়ে বাঙলার কলঙ্কের ধ্বজাধারীদের লাম্পট্যের কথাটা না বললেও চলতো।

কুমুদিনী হাত-পাখা দোলাতে দোলাতে ভাবছিলেন, কাছারীর গোমস্তারা কি ভাবলো তাদের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর ব্যতিক্রমের মূল কারণ অনুসন্ধানে। কি অনুমান করলো তারা। ম্যানেজার বাবু এতক্ষণ ধ'রে কি এত মাথা-মুণ্ড শেখাচ্ছেন জমিদারীর কাজকর্ম্ম। কি মন্ত্র আওড়াচ্ছেন!

ম্যানেজার বাবু বললেন,—এই পর্য্যন্ত থাক্ হুজুর আজ। আবার কাল দিনমানে আপনার গিয়ে জমিদারীর অনেক জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

অনন্তরাম ইতিমধ্যে তিন বার ডাকতে গিয়ে থেমে গেছে। অনন্তরাম জানে আজ যেন বড় বেঠিক হয়ে গেছে ছেলেটার মতি-গতি। কথাবার্ত্তায় যেন নেই সেই খুসীভরা চাঞ্চল্য। ম্যানেজার বাবুর কথা শেষ হ'তেই অনন্তরাম বললে,—মা ডাকছেন। বলছেন যে, রাত কত হল সেদিকে খেয়াল আছে?

ঘৃর্গা-প্রদীপের শিখার চতুর্দ্দিকে কয়েকটা ফড়িং তখন লাফালাফি করছে। বনের ফড়িং, ঘরের আলো দেখে ছুটে এসেছে পাখা নাচিয়ে। পুড়তে এসেছে। শেষে আশ্রয় হবে প্রদীপের তলায় কান-তোলা ঐ থালায়।

অনন্তরাম সন্ধ্যায় রিপণ ষ্ট্রীটের ঘটনাটা দেখেছে নিজের চোখে। অথচ বোঝেনি কিছুই। অনুমান করেছে কিছু-কিছু। দেখে-শুনে যতটা বুঝেছে তাতে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস হয় না অনন্তরামের। কৃষ্ণকিশোর তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে পড়ে অনেক জ্ঞান সঞ্চয়ের পর। তবুও কৈ মুখে তার আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো না। কেন, তা শুধু ঐ অনন্তরাম জানে।

বিশ্বাসঘাতক নবাব মীরজাফরের পরোয়ানা শোনালেন ম্যানেজার বাবু। শোনালেন বাদশাহী আর নন্-বাদশাহীর পার্থক্য। শোনালেন আরও কত কি, রতন, ললিতা ও মতি বেওয়ার নাম।

অন্দরের মুখেই দেখা হল মা'র সঙ্গে।

তিনি আর থাকতে না পেরে সদরের কাছ বরাবর চলে এসেছেন। তাঁর মুখখানা যেন সঙ্কোচে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাকে দেখে কোন কথা বলে না ছেলে। নত মাথায় চলে যায় অন্দরের ভেতরে। রান্না-বাড়ীতে গিয়ে বসে নিজের আসনে। খায় কি না খায়, জলের পাত্র মুখে তুলে উঠে পড়ে আসন ছেড়ে খানিক বাদে।

কুমুদিনী এক পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিঃশব্দে দেখেন। মাতা এবং পুত্রের মধ্যে একটিও বাক্য-বিনিময় হয় না। মা ব্যথা পান মনে-মনে, ছেলে গাম্ভীর্য্য পালন করে।

কুমুদিনীও খান কি না খান। যে যার ঘরে চলে যায়। রাত ওদিকে ঘন হয় ক্রমে ক্রমে। ভোঁ-ভোঁ শব্দে মশার দাপাদাপি শুরু হয়। ধীর, মন্থর পদে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। রাত্রি গেলে আসবে দিন। রাত্রির পরেই দিন। হাসি আর কান্না, সুখ আর দুঃখের মতই রাতের শেষে দিনের হবে শুরু।

থেকে থেকে আকাশে কালপেঁচা আর শহরের আনাচে-কানাচে শিবাকুলের ঐক্যতান হচ্ছে। কয়েকটা অঞ্চলকে রাতের আসরে জাগিয়ে রেখে শহর কলকাতা যেন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে। দিক্‌চক্রবালে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে।

[ক্রমশঃ।

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর যেদিন হইতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যেদিন কর্মময় জীবনাবসানে নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিলেন, সেই সময়টুকুর কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাঁহার একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল আতুরের সেবা; আমাদের ভারতবর্ষের পূতসলিলা ভাগীরথীর একমাত্র লক্ষ্য যেমন লোকহিত। জাহ্নবী যেদিকে, যে প্রদেশে ও যে পথে প্রধাবিত হইয়াছেন, তাহাকেই স্নিগ্ধ, সরস ও উর্ব্বর শ্যামল করিয়া মানুষকে অমৃতের আস্বাদ করাইয়াছেন, কুমুদশঙ্করের বহু দিক বিস্তারিত কর্ম্মের দ্বারাও তিনি আতুর ও রোগার্ত্তদিগের অক্লান্ত সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে তাঁহার জীবনকে উৎসর্গীকৃত জীবন না বলিয়া উপায় নাই। আর্ত্ত, আতুর ছাড়া ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব বা সত্তা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

এক প্রাচীন, বিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, কালবৈগুণ্যে ধনী ও জমিদার বলিয়া পরিচিত হইবার অথবা আরামে বিলাসে জীবনাতিবাহিত করিবার সুযোগ, অবকাশ বা ইচ্ছা আদৌ তাঁহার মনে হয় নাই। বিলাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া যেদিন তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই দিনই কঠোর জীবন-সংগ্রামে তাঁহার আহ্বান আসিয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেবই তাঁহার সম্মুখে এক ব্যয়সঙ্কুল, সমস্যাবহুল ভয়ঙ্কর সংসারচিত্র উন্মোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুমুদশঙ্করের অজ্ঞাতে যে ধাতা বা বিধাতা কুমুদশঙ্করের জীবনকে লোকহিতে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। সংসার, সমাজ, ধন, জন, পরিজনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছিল শুকতারা সম আতুরের সেবা।

ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল স্কুল, হাসপাতাল, যাদবপুর যক্ষ্মা আরোগ্যশালা একটির পর একটি আসিয়া কুমুদশঙ্করকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। কুমুদশঙ্কর ডাক্তারী করেন, রোগীর গৃহে গিয়া চিকিৎসা করেন, উপার্জ্জনও যে না করেন, তা'ও নহে; কিন্তু মানুষ-কুমুদশঙ্করের প্রাণটা পড়িয়া থাকে বহু আর্ত্ত, বহু আতুর, বহু রোগকাতরসমাবিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। ক্রমে এমন দিনও আসিল যখন ঐগুলিই কুমুদশঙ্করের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন ও সাধনা হইয়া পড়িয়াছিল। কুমুদশঙ্করের দেহাবসানের সংবাদ শুনিয়া যাদবপুর হাসপাতালের কেবল বর্ত্তমান রোগী ও রোগিণীরাই নহেন, হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাবধি যাঁহারা আসিয়াছেন, চিকিৎসিত ও রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকেই পরমাত্মীয় বিয়োগের শোক ও ব্যথা অনুভব করিয়াছেন। ডাক্তার চিরদিন ডাক্তার এবং উপকার রোগীমাত্রেই স্মরণ ও স্বীকার করে—ইহা সত্য এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ডাক্তার রোগীর জীবনের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছেন এবং পরম আত্মীয়ে পরিণত হইয়াছেন, সে বড় বিরল। যাদবপুরের প্রতি প্রস্তরখণ্ডে

প্রত্যেকখানি ইষ্টকে, প্রতি ধূলিকণাটিতে আজি হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এই কথাই লিখিত থাকিবে :

"যাদবপুর ও কুমুদশঙ্কর এক ও অভিন্ন
কুমুদশঙ্কর ও যাদবপুর একাত্ম ও অবিচ্ছেদ্য।"

"সাধক কুমুদশঙ্কর এইখানে সাধনা ও সিদ্ধিলাভে জীবনযাপন করিয়াছেন।"

কুমুদশঙ্কর কাউন্সিলে রাজনীতি করিতে গিয়াছিলেন,—এই যাদবপুর ও আর্ত্তের সেবাই ছিল উদ্দেশ্য; ডাক্তার কুমুদশঙ্কর কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলারী ও অল্ডারম্যানী করিয়াছেন,—এই যাদবপুর ও রোগাতুরের সেবাই তাঁহার লক্ষ্য। ঐ এক ভিন্ন অন্য লক্ষ্য যেমন ছিল না, অন্য রাজনীতিরও তিনি ধার ধারিতেন না। স্বদেশী ও বিপ্লবী যুগের বিদ্রোহী আহতদিগের চিকিৎসা ও সেবা তিনি সঙ্গোপনেই করিতেন। কিন্তু, যত গোপনেই করুন, ইংরাজের শ্যেনদৃষ্টিকে গোপন করিতে বোধ হয় পারিতেন না। মনে আছে, একবার এক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বলিয়াছিলেন, ডক্টর রায়, রাজবিদ্রোহীদিগের চিকিৎসা করা কি রাজদ্রোহিতা নহে? কুমুদশঙ্কর রায়ের তেজঃপূর্ণ উত্তর আজও আমাদের কানে (প্রাণে) বাজিতেছে। কুমুদ বলিয়াছিলেন, রোগীর চিকিৎসা করা আমার ব্রত তোমাদের বিচারে তাহারা বিদ্রোহী হইতে পারে কিন্তু, সাহেব, আমি ত তাহাদিগকে যন্ত্রণাকাতর রোগী ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। আমি চিকিৎসা করি; রাজনীতি করি না। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না; তবে কুমুদশঙ্কর রায়কে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। স্বাধীনতা-যুদ্ধে, ইংরাজের পুলিশের বা সৈনিকের গোলা-গুলীতে যাহারা প্রাণ দিয়া অমরত্ব লাভ করিত, তাহাদের জন্য কিছু করিতে হইত না বটে কিন্তু আহতদিগের প্রধান আশা ভরসার স্থল ছিল, অস্ত্রোপচারবিশেষজ্ঞ কুমুদশঙ্কর।

জন্ম ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮১২ : অবসান ২৪শে অক্টোবর ১১৫০

বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার অধিকারী ভারত-ভাস্কর বঙ্গগৌরব বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার সোদরোপম শিষ্য প্রভাস ঘোষের যক্ষ্মাজীর্ণ দেহাস্থির উপর যাদবপুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া, হাসপাতালের সেই শৈশব কালে মাত্র চারি শয্যাযুক্ত প্রতিষ্ঠানের লালন-পালন ভার তত্ত্ব প্রিয় সুহৃদ কুমুদশঙ্করের হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে হইলে নিঃসংশয়ে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চিরজয়ী, চিরযশস্বী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের লোকবল, ধনবল বন্ধুবল চিরকালই ছিল অপ্রমেয় ও অসাধারণ। তথাপি তিনি যে শিশু প্রতিষ্ঠানটির ভার কুমুদশঙ্করকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে কি এই মনে হয় না যে, তিনি উৎসৃষ্ট-জীবন কুমুদশঙ্কর রায়ের অন্তরের তন্ত্রে তন্ত্রে নন্দিত সঙ্গীত শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই সেই হৃদয় নিরন্তর যাহা রোগীর দুঃখে কাঁদে; এই সেই মানুষ, রোগীর সেবায় অনায়াসে আত্মদান করে! বিধানচন্দ্র রায়ের দূরদৃষ্টি ও বিবেচনা যাদবপুরকে এত বড় করিয়াছে। কুমুদশঙ্কর এই সেদিনও ভগবানের নিকট আর পাঁচ বৎসর পরমায়ু কামনা করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, হাজার শয্যা করিয়া দিতে পারিব। জানি না কেন, ভগবান এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ না করিলেন! কিন্তু ডাক্তার কুমুদশঙ্করের স্বদেশবাসী যাদবপুর ও কার্সিয়ঙে কুমুদশঙ্করের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাঁহার আত্মার সন্তোষবিধান করিবেন, আমরা যেন সেই অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইতে শুনিতেছি।

কুমুদশঙ্কর মানুষটির অন্তর-বাহির এমনই কমনীয়, এমনই কোমলতা-মণ্ডিত করুণার্দ্র ছিল যে, আর্ত্তের মাত্রেই ব্যাকুল বিচলিত হইত। অধুনা মেডিক্যাল মিশন শব্দ ও সংস্থার পরিচয় প্রায়শঃ পাওয়া যায়; কিন্তু ডাক্তার কুমুদশঙ্করই বোধ করি বিহারের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পরে সর্ব্বপ্রথম মিশন গঠন ও প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বযুদ্ধে ব্রহ্মদেশের বিপর্য্যয়ের সংবাদ ডাক্তার কুমুদশঙ্করকে এমনই আকুলিত করিয়াছিল যে, তিনি স্বয়ং ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে সেবাব্রত উদ্‌যাপনে গিয়াছিলেন। অতুল যশঃ, প্রভূত সম্মান, অসামান্য খ্যাতি—এক কথায় ইহলোকে মানুষের যাহা কাম্য, কুমুদশঙ্কর সকলই ভারে ভারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই যে নিরহঙ্কার, সজ্জন, সদাব্রতী, সদাশয় ও সদাপ্রফুল্ল স্নেহময় মানুষটি, এক বিন্দু পরিবর্ত্তন এক দিনের জন্যও হয় নাই। সেই যে জীবনের প্রথম উন্মেষ দিনে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, মাটির দেহ মাটিতে যতক্ষণ না মিশাইয়াছে, কুমুদশঙ্কর রায় সেই সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিতে করিতেই চিরবিদায় লইয়াছেন। কুমুদশঙ্কর ছিলেন অতি বিরল সেই জাতীয় মনুষ্য, যাহার পরিচয় দিতে মহাকবি মধুসূদন অমর অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন :

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে;
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটী

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ২০ জন সদস্য লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই কমিটীতে দুই জন সাধারণ সম্পাদক—শ্রীকালাভেঙ্কট রাও ও শ্রীমোহনলাল গৌতম আছেন। কমিটীর একমাত্র মহিলা-সদস্য হইতেছেন জুনাগড়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব শ্রীমতী পুষ্প মেটা। শ্রীমতী মেটা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ৪ জন মহিলা-সদস্যের অন্যতমা।

কমিটীর সদস্যদের নামের পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—(১) শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন—সভাপতি (২) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—কোষাধ্যক্ষ (৩) শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু (৪) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৫) শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী (৬) শ্রীজগজীবন রাম (৭) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (৮) শ্রী এস. কে. পাতিল (৯) শ্রীকামরাজ নাদার (১০) সর্দ্দার প্রতাপসিং কৈরণ (১১) শ্রী এন. জি. রঙ্গ (১২) শ্রীঅতুল্য ঘোষ (১৩) শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মা (১৪) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু (১৫) শ্রী বি. এস. হীরে (১৬) শেঠ গোবিন্দদাস (১৭) শ্রীগোকুললাল আশাওয়া (১৮) শ্রীমতী পুষ্প মেটা (১৯) শ্রীকালাভেঙ্কট রাও ও (২০) শ্রীমোহনলাল গৌতম—সাধারণ সম্পাদক।

কংগ্রেসের এই নূতন ওয়ার্কিং কমিটীতে ছয় জন মন্ত্রী এবং তামিলনাদ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং মহাকোশল—এই আটটি প্রদেশের ৮ জন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি আছেন।

নূতন কমিটীর সদস্যদের নাম ঘোষণা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন সাংবাদিকগণকে বলেন যে, কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচনে তিনি রাজ্য-কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টদিগকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব কমিটীর সদস্যশ্রেণীভুক্ত করিবার নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, কংগ্রেসের ভিতরে বর্ত্তমানে যাঁহারা আছেন ইঁহারাই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং তাঁহারাই স্ব স্ব রাজ্যে অপর লোক অপেক্ষা কংগ্রেসের ভাবধারার সত্যিকার প্রতিভূ। তিনি আরও বলেন যে, মাঝে-মাঝে তিনি কংগ্রেস কমিটীর সভায় অন্যান্য নেতাদিগকেও আমন্ত্রণ করিতে চাহেন। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, তাঁহার প্রথম কাজই হইবে কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলা এবং কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টে সকলেই যাহাতে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে তাহা দেখা।

কংগ্রেস সভাপতি কেবল মাত্র তাঁহার মতাবলম্বীদের লইয়াই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিতে পারেন নাই, আবার তাঁহার মতের বিরোধীদেরও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের কার্য্যাবলী দেশবাসী উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্য করিবে।

কলিকাতায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভারত ইউনিয়নের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসাম পরিদর্শনান্তে ২৯শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় একটি বিশেষ বিমানযোগে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় রাষ্ট্রপতির প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের লাট-প্রাসাদ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

উদ্বাস্তু শিবিরে

৩০শে অক্টোবর সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সমভিব্যাহারে স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে কলিকাতা হইতে ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত রাণাঘাট উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে যাত্রা করেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এক বিপুল জনতা রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ধুবুলিয়ায় শরণার্থী মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন করেন। ধুবুলিয়া ক্যাম্পে শরণার্থীদিগের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত একটি মানপত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে সমবেত শরণার্থীদের উদ্দেশে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পর্কে তিনি সম্যক্ অবহিত আছেন। তিনি মনে করেন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণ এবং অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে দুঃস্থ জনগণের ন্যায় শরণার্থিগণও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি [illegible] সরকার শরণার্থীদের দুঃখ-লাঘবের জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র সম্যক্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। উদ্বাস্তুদের জন্য যতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে—আরও অনেক কিছু করিবার আছে। অবিলম্বে তাঁহাদের সকল দাবী পূরণ না হইলে তাঁহারা যেন নিরাশ হইয়া না পড়েন। তিনি উদ্বাস্তুদিগকে আরও কিছু দিন ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে উপদেশ দেন।

পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের নাগরিক অধিকারের আশ্বাস প্রদান করিয়া ডাঃ প্রসাদ বলেন যে, যাঁহারা ১৯৪৯ সালের ১৫শে জুলাইয়ের পরে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নাগরিক অধিকার দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন যে, আগামী নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কার্য্যতঃ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাসেই নির্ব্বাচন

অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ভোটার-তালিকায় এই উদ্বাস্তদের নাম সংযোগ করিতে হইলে নির্ব্বাচনে বিলম্ব হইবে। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, আগামী নির্ব্বাচনে উদ্বাস্তগণ ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত না হইলেও পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় তাঁহারা নিশ্চয়ই সে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। ডাঃ প্রসাদ উদ্বাস্তদের বর্দ্ধিত পরিমাণে চাউল এবং গমজাত খাদ্য সরবরাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

ময়দানে জনসভায়

৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তিন বৎসর হইল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আজও রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। ভারতে আজ দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট, অশিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সরকার এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

শরণার্থী সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, দিল্লী-চুক্তির পর অবস্থার উন্নতি ঘটিলেও আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। যে সকল শরণার্থী ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহ পুনর্ব্বসতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, ভারতের যে স্থানেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সরকার সেই সকল স্থানে অতি দ্রুত খাদ্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন হইলে ভারত সরকার সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি জনসাধারণকে এই জন্য বিচলিত না হইতে অনুরোধ করেন।

হাইকোর্ট বার এসোসিয়েসান কর্ত্তৃক প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। গণপরিষদের প্রত্যেক সদস্যই এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ভারতের বিচার বিভাগ যত দূর সম্ভব স্বাধীন হইবে এবং শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নহে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তাহাও তাঁহারা [illegible] ভাবে নিরূপণ করিবেন। নূতন অবস্থায় প্রথম প্রথম যতই অসুবিধা হউক না কেন, আমার সন্দেহ নাই যে, উহার ভিত্তিতে কালে এমন এক শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে, যাহার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ গর্ব্ববোধ করিতে পারিবেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের জুনিয়ার উকিল হিসাবে তাঁহার অতীত স্মৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা হাইকোর্ট, কলিকাতা নগরী এবং সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীর নিকট ঋণী। তিনি বলেন, দেশসেবার প্রেরণা তিনি এই স্থান হইতেই লাভ করেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের শুভ আগমনে সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ-দুর্দ্দশার যদি কিঞ্চিৎও উপশম হয়, তাহা হইলেই তাঁহার পশ্চিমবঙ্গে আগমন সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া দেশবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ রাখিবেন।

চিত্তরঞ্জন কারখানার নামকরণ

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১লা নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত চিত্তরঞ্জনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রস্তুত কারখানার নামকরণ করেন। কারখানার প্রবেশ-দ্বারের নিকটস্থ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট নামকরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন যে, ভারতের ইতিহাসে দেশবন্ধুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দেশবন্ধুর অন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তিনি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "দেশবন্ধুর মহৎ জীবন দেশবাসীকে প্রেরণা দিক, এই কামনা আমি করি।"

প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, শিল্পোন্নয়ন সম্ভব ও শিল্পপ্রতিষ্ঠা সার্থক করিতে হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতির যেমন প্রয়োজন আছে, কারখানার যাহারা শ্রমিক তাহাদের জন্য আধুনিক জীবনের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা তেমনই অপরিহার্য্য। কারণ, অসুস্থ দেহ ও মন লইয়া শ্রমিকের পক্ষে কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ সম্ভব নহে। চিত্তরঞ্জনের শ্রমিকদের জন্য যে সকল সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ডাঃ প্রসাদ তাহার উল্লেখ করেন এবং তিনি মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণে ইহা আদর্শ স্থল হইবে। সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বাহ্নে এই বিষয়ে চিত্তরঞ্জন কারখানার দৃষ্টান্ত স্বতঃই স্মরণে আসিবে। রেল-ইঞ্জিন সম্পর্কে ভারতের পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্যই চিত্তরঞ্জনে রেল কারখানা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহা ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার করিবে। ভারতবাসীর এই আশা যাহাতে সার্থক হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম যে প্রতিষ্ঠানে বিজড়িত হইয়াছে, তাহার গৌরব ও প্রতিষ্ঠা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি সকলেরই অবহিত থাকা উচিত।

পাক-ভারত সমস্যা

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার "যুদ্ধ না করার ঘোষণা" সম্পর্কে মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের সর্ব্বশেষ পত্রের উত্তর দিয়াছেন। উহাতে ভারত সরকারের পূর্ব্ব অভিমতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যে যুদ্ধ না করার যুক্ত ঘোষণার প্রস্তাব করিয়াছেন, শুধু তাহাতেই উভয় দেশের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকাংশে প্রশমিত হইবে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক্ষণে যে ৪টি প্রধান প্রধান বিরোধ রহিয়াছে তাহা হইতেছে—কাশ্মীর, খালের জল, উদ্বাস্তু সম্পত্তি ও টাকার বিনিময় হার সংক্রান্ত বিরোধ। ভারত সরকার না কি পাকিস্তানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উদ্বাস্তু ও খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ ৪ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। উভয় দেশ কর্ত্তৃক মনোনীত দুই জন করিয়া বিচারপতি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। বিচারপতিগণ কোন বিষয় সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত বা সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তে

সত্বর কার্য্যকরী করিলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় কৃষ্টি মিশন

ডাঃ কালিদাস নাগের নেতৃত্বে তিন জন সদস্য লইয়া গঠিত ভারতীয় কৃষ্টি মিশন বোম্বাই হইতে ১৪ই অক্টোবর সমুদ্রপথে মধ্য-প্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মিশনটি তিন মাস কাল মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থান সফর করিবেন। কলিকাতা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে গঠিত এই মিশন তেহারান, বাগদাদ, বীরুট ও কায়রোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি তেহারান বিশ্ববিদ্যালয়কে মিশন উপহার দিবেন। মিশন কায়রো সফর কালে রাজা ফারুককে একটি বীণা উপহার দিবেন। পারস্যের বিশিষ্ট কবি হাফিজ, সাদী ফারদৌসী ও ওমর খৈয়ামের সমাধি-স্থল পরিদর্শন করার ইচ্ছাও মিশনের আছে।

নেহরুর 'পণ্ডিত' উপাধি বর্জ্জন

প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর হইতে সমস্ত মন্ত্রী-দপ্তরকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অতঃপর শুধু শ্রীজওহরলাল নেহরু বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, উপাধি, জাতি, সম্প্রদায় বা জন্মগত তথাকথিত আভিজাত্যের পরিচায়ক। কিন্তু ইহা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধী, কারণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাতীয় ঐক্য এবং ব্যক্তির মর্য্যাদা বিধান পূর্ব্বক সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ়তর করাই হইতেছে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য। এই সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধন সার্থক করিবার জন্য সমস্ত নাগরিকের মধ্যে একই রকম পরিচয়-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

সুইডিস একাডেমী দার্শনিক আর্ল রাসেলকে (বার্টর্যাণ্ড রাসেল) ১৯৫০ সালের জন্য ও আমেরিকার ঔপন্যাসিক মিঃ উইলিয়াম ফকনারকে ১৯৪৯ সালের জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ উপহার দিয়াছেন। আর্ল রাসেলের বয়স ৭৮ বৎসর ও মিঃ ফকনারের বয়স ৫৩ বৎসর। গত বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে প্রতিভাবান প্রার্থীর অভাবেই যে সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ উপহার দেওয়া হয় নাই তাহা নহে। কোনও প্রার্থীই বিচারক কমিটীর যথোপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পাওয়ায় গত বৎসর ঐ বিষয়ে উপহার দান স্থগিত রাখা হয়।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

মধ্য-বয়স্ক জনৈক বৃটিশ আণবিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সিসিল এফ পাওয়েলকে পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণু পদার্থবিদ্যা ও রঞ্জনরশ্মির গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১১,১২০ পাউণ্ড।

কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অটো ডাইয়েল্‌স এবং তাঁহার প্রাক্তন সহকারী ডাঃ কার্ট অলডেককে রসায়ন বিষয়ে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক অটো ডাইয়েলসের বয়স ৭৪ বৎসর এবং ডাঃ কার্ট অলডেকের বয়স ৪৮ বৎসর। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এই পুরস্কারের অর্দ্ধ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

কৃষক-প্রজা-মজদুর দল গঠন

"পশ্চিমবঙ্গের ১০৪ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী কংগ্রেসের বাহিরে কাজ করিবার এবং "কৃষক-প্রজা-মজদুর দল" নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রাক্তন সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী আছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে আগত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ কলিকাতায় ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং ভারতে শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ—যাহা জয়পুর কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছিল তাহা আরও কার্য্যকরী ভাবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যথাক্রমে নূতন দলের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত দলের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত গৃহীত প্রস্তাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—

"তিন বৎসরের কিছু অধিক হইবে আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর জয়পুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে কংগ্রেস ক্রমশঃ উক্ত আদর্শ হইতে সরিয়া যাইতেছে। সরকার কিষাণ, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ ও কষ্ট লাঘবে, বিশেষ করিয়া অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। উপরন্তু শাসনের দুর্নীতি ও ব্যাপক চোরাকারবারের ফলে জনগণের দুঃখ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা প্রতিরোধের জন্য বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার অথবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্থায়ী কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। অপর পক্ষে লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতির জন্য কংগ্রেসে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসের বিগত নির্ব্বাচনে আইনতঃ যাঁহারা যে পদ পাইতে পারেন না, তাঁহাদেরও আপত্তিকর উপায়ের দ্বারা সেই সকল পদ দেওয়া হইয়াছে।"

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কংগ্রেস দলের বাহিরে 'কৃষক-প্রজা-মজদুর' নামে এই নূতন দল গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, যদিও উহারা কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিবেন তথাপি কংগ্রেসের প্রকৃত আদর্শ প্রচারই তাঁহাদের কার্য্য হইবে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নূতন

একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী ও মহাত্মা গান্ধীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব্বেই কেন যে কংগ্রেস ছাড়িয়া আসা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে জনসাধারণের মনে স্বতঃই নানা সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। তবে প্রকৃত কাজের দ্বারা তাঁহারা যদি তাঁহাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই দেশবাসী তাঁহাদের এই দলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্গাপূজা

এই বৎসরে ঢাকা সহর ও সহরতলীতে মোট ত্রিশটি স্থানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায়, দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ঢাকায় প্রায় দেড়শত স্থানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইত। গত বৎসরেও প্রায় ৭০টি স্থানে দুর্গাপূজা হইয়াছিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য ঢাকা পুলিশ স্বতন্ত্র ভাবে ১৮টি লাইসেন্স দিয়াছিল।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩১শে অক্টোবর রাত্রিতে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মাদ্রাজের ভেলোরে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সেক্রেটারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ডাঃ করুণশঙ্কর রায় ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ রায় ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর কোয়েম্বাটুরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসানের ওয়ার্কিং কমিটীতে যোগদানের জন্য গিয়াছিলেন। ভেলোরে তিনি এক জন মার্কিণ সার্জ্জেনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। নৈশভোজের সময় তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং কিছু পরেই মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট পুত্র ডাঃ করুণশঙ্কর রায় উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, বি; সি, এইচ, বি; বি, এস, সি ও এম, ডি ডিগ্রী গ্রহণের পর তিনি ওহিল হিল স্যানাটোরিয়ামে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালে ডাঃ রায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রাণিতত্ত্বের সহকারী অধ্যাপকের কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি দেশবন্ধু সি, আর, দাশ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও অন্যান্যের সহযোগিতায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত হাসপাতালের সেক্রেটারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে কার্য্য করিয়া যান। ডাঃ রায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত তিনি ৬ বৎসর কাল [illegible] ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কাউন্সিলর ও অল্‌ডারম্যান-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে সেবা করিয়াছেন।

তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১লা নভেম্বর রাত্রি ৮টা [illegible] মিনিটের সময় তাঁহার ঘাটশিলাস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। শনিবার রাত্রিতে একটি চা-পানের নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি বাড়ীতে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করেন এবং বুকে এক প্রকার ব্যথা অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার শরীরে অন্য কোন ব্যাধি ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী ও ৩ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

বিভূতিভূষণের আকস্মিক পরলোক গমনে বাঙ্গালার সাহিত্যরসিক মাত্রেই আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা বেদনা-কাতর হৃদয়ে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ও মনীষী জর্জ্জ বার্ণাড শ' গত ২রা নভেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রায় শতাব্দিব্যাপী এক প্রতিভা-দীপ্ত জীবনের অবসান হইল। সেক্সপীয়রের পর জর্জ্জ বার্ণাড শ'এর মত শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভা আর দেখা যায় নাই। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' সাহিত্যকে রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার রচিত নাটকগুলি শেভিয়ান সাহিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মানুষের মঙ্গলের জন্যই আর্ট, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার এই দীর্ঘ জীবনে তিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন মানুষের পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি মানুষকে শুনাইয়া গিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বই ছিল তাঁহার স্বদেশ, তাই আজ সমস্ত বিশ্ববাসী তাঁহার বিয়োগে পরম আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছে।

ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ

ভারতের প্রখ্যাতনামা মার্গ সংগীতবিদ্‌ আফতাব-ই-মৌসিকি ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ ৫ই নভেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে বরোদায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ আগ্রার এক বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার বহু খ্যাতনামা শিষ্য রহিয়াছেন। বাঙ্গালার স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীরবী চট্টোপাধ্যায় ও মহিষাদলের মহারাজা কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি বরোদার সভাগায়ক ছিলেন। ফৈয়জ খাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
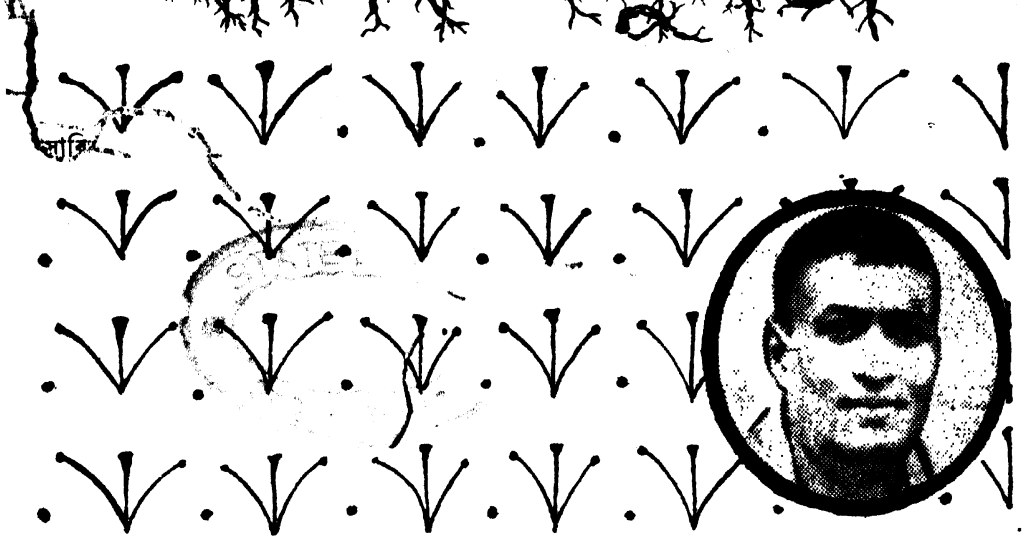
২৯শ বর্ষ, ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [২য় খণ্ড ঃ ২য় সংখ্যা

যু গ বা ণী

"Give all to the poor and follow me; Love thy enemies."
—Jesus Christ

"এ সংসারে ডরি কারে—রাজা, যার মা মহেশ্বরী।" —শ্রীরামপ্রসাদ

"বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখনও মিথ্যা হইবার নহে।"
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

"তুঝে ম্যয়নে দিল্‌কো লাগায়া, যো কুছ্ হায় সো তুঁহি হায়।"
—জাফর

"ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।" —কবীর

"ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়। ধ্যান নাই বা হ'ল, ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। তাঁকে দেখবে তা হ'লেই হবে।"
—শ্রীশ্রীমা

"The soldier has no right to murmur—but to obey. No reason—why? First learn to obey—then command."
—Vivekananda

"তোমরা ঠাকুরকে দেখনি, কিন্তু আমাদের দেখ্‌ছ, আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছ, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়; তোমরা খুবই Fortunate, জগতের কোটি কোটি নর-নারীর চেয়ে বেশী ভাগ্যবান।"
—স্বামী শিবানন্দ

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তেইশ

মা গো, বামনি বলছে তন্ত্রমতে সাধন করতে। করব?

করবি বৈ কি, সম্পূর্ণ ভাবে করবি। ইঙ্গিত করলেন জগদম্বা। বললেন, তন্ত্র-সাধনা জীবনের সর্বাঙ্গীন সাধনা। সত্তার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের ক্রম-উন্মোচন। বোধ থেকে বিকাশে চলে আসা, ভোগ ছেড়ে যোগৈশ্বর্যে। জীব-সত্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া।

শক্তিই তন্ত্রের সর্বস্ব। তন্ত্রে কোথাও কিছু তুচ্ছ নেই হেয় নেই পরিত্যাজ্য নেই। সব কিছুর থেকেই ঈশ্বরী শক্তিকে আহরণ করা, আকর্ষণ করা। আত্মশক্তিকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শক্তিকে ছুটিয়ে এনে শিবত্বে পৌঁছে দেওয়া। সমস্ত গতিকে একটি পরম ধৃতির মধ্যে শান্ত করা।

মা গো, তোকে তো আমি দেখেছি, তবে আমার আবার সাধন কি?

দরকার আছে। লাউ-কুমড়োর দেখেছিস তো, আগে ফল হয় পরে ফুল ফোটে। তেমনি তোর আগে সিদ্ধি, পরে সাধন।

তুমি যদি আমাকে অবতারই বলো, বামনিকে গিয়ে ধরল গদাধর, তবে আমার আবার সাধন কেন?

দেখি না তোমার নরদেহে তা কী অপূর্ব ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। দেহ যখন ধরেছ তখন নিয়েছ সকল বিকারের ভার। তাই দেহের পক্ষে যা সাধ্য সকল সাধন তোমাকে করতে হবে। এ জৈব দেহকে নিয়ে যেতে হবে শৈব স্থিতিতে। মৃন্ময় থেকে চিন্ময়ে। নইলে জীবোদ্ধার হবে কি করে?

পার্বতী ভগবতী হয়েও শিবের জন্যে কঠোর সাধন করেছিলেন। পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে পঞ্চতপা। শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা। অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা সূর্যের দিকে।

তেমনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হলেও, অনেক সাধন করেছিলেন রাধাযন্ত্র নিয়ে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও'। নরদেহ ধরেও কোথায় চলে আসা যায় কোন অলৌকিক তীর্থভূমিতে, তাই তুমি প্রমাণ করো। দেহী হয়েও দেহোত্তীর্ণ হবার আদর্শ তুলে ধরো। তুমি নইলে এই সব দুর্বল অবিশ্বাসী জীব কোথায় আশ্বাস পাবে? কোথায় এসে ত্রাণ খুঁজবে? রাগ-বেগ থেকে চলে আসবে বৈরাগ্য-আবেগে?

তা ছাড়া, শাস্ত্রের মর্যাদা তো রাখতে হবে ষোল আনা। সংস্কার পালনের জন্যে যেমন বিয়ে করেছ তেমনি শাস্ত্র পালনের জন্যেও তোমাকে তন্ত্রসাধন করতে হবে। তন্ত্র সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥'

তন্ত্রের তিন রকম আচার—পশু, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের জন্যে। এতে শুধু শম-দম যম-নিয়ম ধ্যান-পূজা যত সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি। কামনার থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা—এতে করে হয়তো বা সেই কামনাকেই মূল্য দেওয়া। এ পথে, যতটুকু সম্ভব, জীবভাবের সংস্কার চলে মাত্র, কিন্তু জীবভাবের লয় হয় না। অর্থাৎ জীবত্ব আরূঢ় হয় না শিবত্বে।

বীরাচার অন্য জাতের। কামনার মধ্যে বাস করে তাকে উপেক্ষা করা, উদাসীন থাকা। উল্লাসকে অনুভব করা কিন্তু তাতে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না হওয়া। মৌমাছি হয়ে পদ্মের উপর বসেও মধুপান না করা। ফল পেয়েও ফলত্যাগ করে যাওয়া। সমস্ত স্থূলাধারকে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। পশু শক্তি দ্বারা চলছে কিন্তু শক্তিকে চালাচ্ছে বীর।

বীর শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে এসে শিবভাবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। শক্তিকে রূপান্তরিত করছে শান্তিতে। স্থূলকে সূক্ষ্মে। বোধকে বিভূতিতে।

আর দিব্য? তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মমগ্ন। শক্তিতেও তিনি নেই, বিভূতিতেও তিনি নেই। তাঁর স্থিতিতেও ব্রহ্ম, প্রাপ্তিতেও ব্রহ্ম। তিনি প্রশান্ত ও নির্বিকার।

এখন কী করতে হবে?

সর্বপ্রথমে মুণ্ড সাধন করো। যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশ থেকে আগে মুণ্ডমালা সংগ্রহ করি। স্থাপন করি মুণ্ডাসন।

বাগানের উত্তর সীমায় বেল গাছ। তার নিচে বেদী তৈরি হল। সেই বেদীর নিচে তিনটি নরমুণ্ড পুঁতলে। বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সে বেদীর নিচে পঞ্চজীবের পঞ্চমুণ্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মানুষ। বামনিই সব জোগাড় করেছে ঘুরে-ঘুরে। যেটার জন্যে যে আসন দরকার তাতেই বসে তন্ত্রসাধন সুরু করলে গদাধর।

অনেক রকম পূজো, অনেক রকম জপ, অনেক রকম হোম-তর্পণ। উগ্র হতে উগ্রতর তপস্যা।

একেকটা সাধন ধরে আর দু'-তিন দিনের মধ্যেই নিরাপদে পার হয়ে যায়। শাস্ত্রে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তাই প্রত্যক্ষ করে। দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি।

এমনি করে গুনে-গুনে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখালে বামনি।

এতটুকু পদস্খলন হল না গদাধরের। কি করে হবে? মা যে তার হাত ধরে আছেন।

এক দিন রাত্রে বামনি কোত্থেকে এক স্ত্রীলোক ধরে আনল। পূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীলোক। তাকে বেদীর উপর বসালে। গদাধরকে বললে, 'বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে পূজা করো।'

স্ত্রী-মাত্রেই মাতৃজ্ঞান গদাধরের। তার ভয় কি। সে তন্ময় হয়ে পূজা করতে লাগল।

পূজা সাঙ্গ হলে ভৈরবী বললে, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে এর কোলে বোস। কোলে বসে তদ্গত হয়ে জপ করো।'

শিউরে উঠল গদাধর। রমণী দিগম্বরী।

এ কি আদেশ করছিস মা? তোর দুর্বল সন্তান আমি, আমার কি এ দুঃসাহসের শক্তি আছে?

কে বলে তুই আমার দুর্বল সন্তান? তুই আমার সব চেয়ে জোরদার ছেলে। ওখানে ও বসে কে? ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি নে? এ তো সহজ অবস্থা। এতে আবার দুঃসাহস কি।

"নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।" সত্যিই তো, মা-ই তো বসে আছেন। অমনি সমস্ত দেহ-প্রাণ অনন্ত দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর।

বামনি বললে, 'পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছ বাবা।'

আরেক দিন শবের খর্পরে মাছ রাঁধলে ভৈরবী। জগদম্বাকে তর্পণ করলে। গদাধরকে খেতে বললে মাছ। নির্ঘৃণ হয়ে খেল তাই গদাধর।

তার পরে সেদিন যা হল তা কল্পনায়ও ভয়াবহ। ভৈরবী কোত্থেকে গলিত নরমাংস জোগাড় করে আনলে। দেবী-তর্পণের শেষে গদাধরকে বললে, 'এ মাংস জিভে ঠেকাও।'

'অসম্ভব! এ আমি পারব না।' ঝটকা মারল গদাধর।

'কেন, ঘেন্নার কি! কোনো কিছুকেই ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ না, আমি খাচ্ছি।' বলেই এক টুকরো নরমাংস নিজের মুখে ফেলে চিবুতে লাগল বামনি।

'এইবার তুমি খাও।' গদাধরের মুখের সামনে ধরল আরেক টুকরো।

মা, তুই বলছিস? খাব?

দেহে-প্রাণে চণ্ডীর প্রচণ্ড উদ্দীপনা এসে গেল। 'মা' 'মা' বলতে-বলতে ভাবাবিষ্ট হল গদাধর। অমনি বামনি তার মুখের মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দিলে।

ভয় নেই লজ্জা নেই ঘৃণা নেই গদাধরের। সে ত্রিপাশমুক্ত।

শেষ তন্ত্র এখনো বাকি। এবার শিব-শক্তির লীলা-বিলাস দেখতে হবে। এই বীরাচারের শেষ সাধন।

এক চুল বিচলিত হল না গদাধর। নির্বিকল্প সমাধিতে প্রশান্ত হয়ে রইল।

সমস্ত স্ত্রীতেই সে মাতৃনিরীক্ষণ করেছে। রমণী মাত্রেই মা। মাতৃভাবেই আত্মশুদ্ধির অধিষ্ঠান।

মাতৃভাব নির্জলা একাদশী—ভোগের গন্ধ নেই এক বিন্দু। ফল-মূল খেয়েও একাদশী হয় কোথাও বা লুচি ছক্কা খেয়ে। সে সব বামাচার। বামাচারে ভোগের কথা আছে। ভোগ থাকলেই ভয়। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই তার পতন। যেন থুতু ফেলে আবার সেই থুতু খাওয়া।

'আমার নির্জলা একাদশী। সব মেয়ে আমার মূর্তিমতী মহামায়া।' বললেন ঠাকুর। 'এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। তুমি মা আমি তোমার ছেলে—এর পরে আর কথা নেই, এর বাইরে আরে সম্পর্ক নেই।

'বাবা তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।' বললে ভৈরবী।

সাধনাসম্ভূত সে কী রূপ এল গদাধরের শরীরে। সে এক জ্যোতির্ময় দেহ। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। সর্বাঙ্গে সুধাংশু-কান্তি। যেন ধবলগিরিশিরে শিব বসেছেন পদ্মাসনে।

'মা, আমার এই বাইরের রূপে কী হবে? আমাকে অন্তরের রূপ দে, যেন সকল সুরূপে-কুরূপে তোকেই কেবল দেখতে পারি।

এক দিন কালীঘরে পূজার আসনে বসে ধ্যান করছে গদাধর, কিন্তু কিছুতেই মা'র মূর্তি মনে আনতে পারছে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে—ও কে? ও তো রমণী, পতিতা, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে যে প্রায়ই স্নান করতে আসে! সে কি কথা? মা আজ পতিতার বেশে পূজা নিতে এলেন?

'ও মা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ যেমন তোর খুশি তাই হ। তেমনি হয়েই তুই পূজো নে।'

আরেক দিন থিয়েটার দেখে ফিরছেন ঠাকুর। মনোমোহিনীরা সেজে-গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। ওমা, মা, তুই এখানে এ ভাবে রয়েছিস?' বলে ঠাকুর প্রণাম করলেন ওদের।

জননী, জায়া আর জনতোষিণী—সব সেই জগদম্বার অংশ।

তুমি মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যাতে মহা বিদ্যাও আছে, আবার মহা অবিদ্যাও আছে। তেমনি বেদ-বেদান্তও তুই, খিস্তি-খেউড়ও তুই।

'মা, তুই তো [illegible] যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো ফের খিস্তি-খেউড়ে। তোর বেদ-বেদান্তের ক-খ আলাদা, আর খিস্তি-খেউড়ের ক-খ আলাদা—এ তো নয়। ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে শুচি-অশুচিতে সর্বত্র তোর আনাগোনা।'

সর্বত্র সমবুদ্ধি। সকলের জন্যে স্থান—সকলের জন্যে মান, সকলের জন্যে প্রাধান। পাপী আর তাপী, আর্ত আর পীড়িত, অধম আর অধম—কেউ তোমরা হেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। কেউ নও নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই চলে এস। সব অবস্থায়ই সন্তানের স্থান আছে মা'র কোলে। সে যদি আমাদের মা, তবে তার কাছে লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি। আর, যদি দেরি একটু আমাদের হয়েই থাকে, তাই বলে কি মা'র কখনো দেরি হয়?

ভৈরবী বললে, 'একটু কারণ খাও।'

কারণ? জগৎকারণ ঈশ্বরের অমৃতই তো খেয়ে চলেছি। এ তুচ্ছ মদিরা তার কাছে কী!

'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি।' ভৈরবী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল গদাধরের দিকে: 'কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে।'

দিব্যভাব? হাসল গদাধর।

তুমি জল না ছুঁয়ে মাছ ধরেছ। তোমার দেহ-বোধ নেই। তোমার সুষুম্নাদ্বার সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে। তুমি বালকস্বভাব হয়েছ। সর্ব বস্তুতে তোমার অদ্বৈতবুদ্ধি এসেছে। গঙ্গার জল আর নর্দমার জল তোমার কাছে সমান। তুলসী আর সজনেতে কোনো ভেদ নেই। আমাকে এবার তোমার শিষ্যা করো। আমাকে বীর থেকে দিব্যে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো রূপ থেকে অরূপে, ক্রিয়া থেকে সত্তায়, দীপ্তি থেকে তৃপ্তিতে—

তুমি যোগেশ্বরী। তুমি যোগমায়ার অংশ। তোমার আবার অপূর্ণ কি?

জানি না। কিন্তু তোমার মাঝে এখন যে শান্তি যে বিশুদ্ধি যে স্বচ্ছতা দেখছি, তা আমার অনধিগম্য। তাই মনে হয় আমি অপূর্ণ, অশক্ত। তুমি অগ্নি থেকে চলে এসেছ জ্যোতিতে, ঝড় থেকে নীলিমায়, কেন্দ্র থেকে প্রসারে। আমি তোমার শিষ্যা হব।

মি চাই ঐ শান্তি, ঐ ব্যাপ্তি, ঐ নীরবতা। ঐ ত্যচেতনা।

গদাধর হাসল। বললে, 'যে গুরু সেই আবার ষ্য। যে মা সই আবার সন্তান। যিনি ভগবান নিই আবার ভক্ত।'

ভৈরবী বসল এসে গদাধরের ছায়াতলে। তার মনে শেষ তপস্যা বাকি।

ত্রিশ

তন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হল, এবার কিছু একটা াজবাজি দেখাও। হয় পাহাড় টলাও নয় তো া নদীতে জোয়ার আনো।

কিছুই করবে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকবে, কি রে তবে বুঝব তুমি মস্ত বড় একটা সাধু হয়েছ।

'মা'র কাছে গিয়ে একটু ক্ষমতা-টমতা চাও না।' দয় পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

ক্ষমতা দিয়ে কী হবে? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পারছি কাছে, এই কি যথেষ্ট ক্ষমতা নয়?

এ পাঁচ জনে দেখতে পারছে কই? যা দেখে পাঁচ জনের তাক লেগে যায় তেমন একটা কিছু করো।

তন্ত্রবলে অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়েছে গদাধরে। তাই কি সে এবার প্রয়োগ করবে না কি? থ বানিয়ে দেবে না কি সবাইকে?

মা'র কাছে গেল তাই জিগগেস করতে। চক্ষের নিমিষে মা দেখিয়ে দিলেন ও-সব সিদ্ধাই ঘৃণ্য বর্জনা। বিষ-কলুষ। ভগবানকে পাবার পথের র্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা াও তবে মাটি হয়ে যাবে সব তপস্যাফল। দেখতে-দখতে দেউলে হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে যদি একটিও তোমার থাকে তা হলে তোমার শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু আমায় তুমি পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, আবার মায়া থেকেই অহঙ্কার। অহঙ্কার যদি থাকে তবে ভগবানের পথে এগুবে কি করে? ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হবে না—

আর কী হীনবুদ্ধির কথা! সিদ্ধাই চাই, না, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, রোগ সারিয়ে দেব। আহা, এরি জন্যে সাধন?

যে বড়লোকের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। তাকে আর এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। আর যদি চড়তে দেয়ও, কাছে বসতে দেয় না। কথা কয় না মন খুলে।

যদি সিদ্ধাই-ই নিয়ে নিলাম তবে ভগবান বলবেন, আর কেন? খুব হয়েছে। ঐ নিয়েই ধুয়ে খা। ঐ নিয়েই মজে থাক্। সেই সাবির কথা জানিস না? সবাই বলছে, সাবির এখন খুব সময়। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দু'খানা বাসন হয়েছে, তক্তপোষ বিছানা মাদুর তাকিয়া হয়েছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তার সুখ আর ধরে না। তার মানে, আগে সে গৃহস্থ বাড়ির দাসী ছিল এখন বাজারে হয়েছে। তার মানে, সামান্য জিনিসের জন্যে নিজের সর্বনাশ করেছে। যে শরীর-মন-আত্মা দিয়ে ভগবানকে লাভ করব সেই শরীর-মন-আত্মা তুচ্ছ টাকা-কড়ি তুচ্ছ লোকমান্য তুচ্ছ দেহ-সুখের জন্যে বিক্রি করে দেব?

'তবে কী চাইবে মা'র কাছে?' হৃদয় ঝটকা মারল।

'শুধু কৃপা চাইব। বলব, আমাকে ভক্তি দাও, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি।'

হ্যাঁ, প্রহ্লাদের যেমন ছিল। রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, শুধু হরিকে চায়। কিছু চাও না অথচ ভালোবাসো। এরই নাম ভক্তি। তুমি বড় লোকের বাড়ি রোজ যাও কিন্তু কিছুই চাও না, জিগগেস করলে বলো, আজ্ঞে, কিছু না, এমনি একটু শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি, এরই নাম নিষ্কাম ভক্তি। যেমন নারদের ছিল। ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে।

গদাধর মন্দিরে গিয়ে মা'র পাদপদ্মে ফুল দিলে। বললে, 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও—'

একটা নিলে আরেকটাও নিতে হবে। যদি মা জ্ঞান নেন তবে অজ্ঞানও নেবেন, পুণ্য নিলে পাপও। অনেক ছাড়া এক নেই। অন্ধকার ছাড়া আলো নেই।

অহল্যার শাপ-মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, বর চাও। অহল্যা বললেন, যদি বর দেবে তো এই বর দাও, যদি পশু হয়েও জন্মাই যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে।

আমি সিদ্ধি চাই, সিদ্ধাই চাই না। আমার এ সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না। এ সিদ্ধি খেতে হয়।

ভৈরবীর সেই দুই শিষ্য—চন্দ্র আর গিরিজা—এক দিন এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। দু'জনেই সিদ্ধাই নিয়ে ব্যস্ত। নানা রকম ক্ষমতার ভেল্‌কি-বাজি নিয়ে।

এই হচ্ছে অহঙ্কার। এক রকম মায়া। এক টুকরো মেঘের মতন। সামান্য মেঘের জন্যে সূর্যকে দেখা যায় না। তেমনি এই অহং বুদ্ধির জন্যেই হয় না ঈশ্বরদর্শন।

অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। ভার নেন না ঈশ্বর।

কাজকর্মের বাড়িতে যদি এক জন ভাঁড়ারি থাকে তবে কর্তা আর আসে না ভাঁড়ারে। যখন ভাঁড়ারি নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায় তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় আর নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

তাই, ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে ছেড়ে দাও সেই সর্বশক্তিমানের হাতে।

একবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ও কি, কোথায় যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' কিন্তু খানিক দূর গিয়েই ফিরে এলেন নারায়ণ। 'এ কি, এত শিগগির ফিরে এলে যে?' শুধোলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি ভাবে বিহ্বল হয়ে পথ চলছিল। মাঠে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল ধোপারা, ভক্তটি তাই মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে তাকে মারতে ধোপারা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।' 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ বললেন, 'দেখলাম ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইট তুলেছে। তাই আর আমি গেলাম না।'

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দাও। নিজের জন্যে কিছু রেখো না। নিজেকে দেখিয়েও ... বলবে 'তুমি'।

চন্দ্রের 'গুটিকা-সিদ্ধি' হয়েছিল। অর্থাৎ একটা গুটিকা ছিল তার। সেটি ধারণ করলেই সে অদৃশ্য বা অশরীরী হয়ে যেতে পারত। আর অদৃশ্য হয়েই যেতে পারত যেখানে খুশি, সে জায়গা যতই দুর্গম বা দুষ্প্রবেশ্য হোক। ঐ শক্তি পেয়ে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছিল চন্দ্র। ভাবলে, যখন যেখানে-খুশি যেমন-খুশি যাতায়াত করতে পারি, তখন ঐ দোতালায় সুন্দরী ঐ মেয়েটির ঘরে ঢুকলে কেমন হয়? সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মেয়ে, আছে পর্দার ঘেরাটোপে। তা থাক, আমি তো অশরীরী হয়ে তার ঘরে ঢুকব। দরজা বন্ধ থাক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকব, নয় তো বা কোনো দেয়ালের ছিদ্রপথে। সিদ্ধাইর তেজ দেখাতে গিয়ে চন্দ্র ক্রমে-ক্রমে সেই ধনীকন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ফতুর হয়ে গেল নিঃশেষে। যার জন্যে এত চোটপাট সেই সিদ্ধাইও আর রইল না।

আর গিরিজা? এক দিন শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিজা। কথা বলতে-বলতে কখন এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। পথে এসে দেখেন বিষম অন্ধকার। ঈশ্বরের কথা বলতে-বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন একটা লণ্ঠন চেয়ে আনতে পর্যন্ত মনে ছিল না। এখন যান কি করে? এক পা হাঁটেন তো হোঁচট খান, দু'পা হাঁটেন তো দিক ভুল হয়ে যায়। কি হল বলো তো—এখন করি কি?

'দাঁড়াও, আমিই আলো দেখাই।'

সিদ্ধাই হয়েছে গিরিজার। সে পিঠের থেকে আলো বের করতে পারে।

কালীবাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়াল গিরিজা। আলোর ছটা বেরুল একটা। সেই ছটায় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আলোয় আলোয় চলে এলেন ঠাকুর।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গিরিজার আর কিছু হল না। লণ্ঠনই হল, সূর্য হল না।

ভবতারিণী ঠাকুরের শরীরে ওদের সিদ্ধাই টেনে নিলেন। ওরা মোহমুক্ত হল। মন থেকে অভিমান মুছে ফেলে দীনভাবে বসল আবার যোগাসনে।

ও সকলে আছে কি? ও সব তো বদ্ধ মনকে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না। জানিস সেই এক পয়সার সিদ্ধাইর গল্প?

দু' ভাই। বড় ভাই সন্নেসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। ছোট ভাই লেখা-পড়া শিখে সংসার-ধর্ম করছে। বার বছর পর বাড়ি এসেছে সন্নেসী, ছোট ভাইর জমি-জমা চাষ-বাস কেমন কী হয়েছে তাই দেখতে। ছোট ভাই জিগগেস করলে, এত দিন যে সন্নেসী হয়ে ফিরলে তোমার কি হল ? দেখবি ? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে সন্নেসী নদীর-পাড়ে নিয়ে এল। এই ছ্যাখ। বলে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল পরপারে। খেয়ার মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে নৌকোয় করে ছোট ভাইও নদী পেরোল। বড় ভাই বললে, 'দেখলি ? কেমন হেঁটে পেরিয়ে এলুম নদী।' 'আর তুমিও তো দেখলে', বললে ছোট ভাই, 'আমিও কেমন এক পয়সা দিয়ে দিব্যি নদী পেরোলুম। বারো বছর কষ্ট করে তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই অনায়াসে, মোটে এক পয়সা খরচ করে। তা হলে তোমার ঐ সিদ্ধাইর দাম এক পয়সা।'

আরেক যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছে। কাউকে যদি বলে, মর্, অমনি মরে যায়। আর যদি বলে বাঁচ্, অমনি বেঁচে ওঠে। এক দিন দেখে এক সাধু এক মনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওহে, অনেকেই তো হরি-হরি করলে, কিন্তু পেলে কিছু ? কি আর পাব ? শুধু তাঁকেই চাই, কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। তাই করুণা ভিক্ষা করেই দিন যাচ্ছে। ও সব পণ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছু একটা পাও তার চেষ্টা দেখ। অ'চ্ছা মশাই, আপনি কী পেয়েছেন শুনি ? শুনবে আর কি। দেখ। কাছেই একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাকে বললে, মর্। হাতী মরে গেল তক্ষুনি। ফের মরা হাতীকে লক্ষ্য করে বললে, বাঁচ্। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে হাতী উঠে দাঁড়াল। দেখলে ? কি আর দেখলুম বলুন—হাতীটা একবার মলো, আবার বাঁচলো। তাতে আপনার কী এসে গেল ? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ পেলেন ?'

'শোন্, এই দিকে আয়।' ঠাকুর এক দিন চুপি-চুপি ডাকলেন নরেনকে।

নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর নির্জনে।

বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

নরেন নিস্পন্দ, নির্বাক্।

'শোন, তোকে বলি। আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আবির্ভূত আছে। কিন্তু ও আমি কোনো দিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ও-সব দিয়ে দিতে চাই—'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে আছে ? তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ধর্মপ্রচার। তোরই ও-সব দরকার। তুই ছাড়া কারু সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে। বল্, নিবি ?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন। বললে, 'ঐ সব শক্তি আমাকে ঈশ্বরলাভে সাহায্য করবে ?'

কি ভাবলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, তা করবে না।'

'তবে ও-সবে আমার দরকার নেই।' নরেনের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল অনাসক্তির দৃঢ়তা : 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরলাভ হবে না শুধু লোকমান্য হবে তা দিয়ে আমি কী করব ?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন প্রসন্ন হয়ে।

এক দিন নরেন নিজেই গিয়ে উপস্থিত হল ঠাকুরের কাছে। তার ধ্যানের ফল কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাই বুঝিয়ে বলতে। খেতে-শুতে-বসতে সব সময়েই ধ্যান করছে নরেন। কাজকর্মের সময়ের মনের কতকটা ভিতরে বসে ঈশ্বরচিন্তায় লগ্ন হয়ে আছে।

'এ আমার কী হল বলুন তো ?'

'কী হল ?' ঠাকুর প্রফুল্ল বয়ানে হাসলেন।

'ধ্যান করতে বসে আমি দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, শুনছি অনেক দূরের শব্দ। দেখছি কোন বাড়িতে বসে কে কি করছে, কে কি বলছে। উঠে-উঠে যাচ্ছি সে-সে বাড়িতে। গিয়ে দেখছি যা দেখেছি আর শুনেছি সব সত্যি। এ আবার কী নতুন খেলা !'

ঠাকুর বললেন, 'এ সব সিদ্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। ঈশ্বরলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করতে এসেছে। তুই সিদ্ধাই নিবি কেন ? তুই ভগবানকে নিবি। তুই ধ্যানসিদ্ধ হবি দিন কতক ধ্যান তুই বন্ধ করে রাখ। তার পরে দেখবি ও-সব আর আসবে না। তুই পথ পাবি—নিত্য কালের এগিয়ে যাবার পথ।'

পঁচিশ

তুমি যেমন আমার মা তেমনি আবার তুমি আমার মেয়ে। তুমি যেমন 'পিতেব পুত্রস্য' তেমনি আবার তুমি সন্তান। তোমার রসের কি আর শেষ আছে? তুমি যেমন ভক্তিতে আছ প্রেমে আছ তেমনি আছ আবার বাৎসল্যে। শীতল স্নেহরসে।

তুমি গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। তুমি গুহাহিতং, গহ্বরেষ্ঠং। আবার তুমি বুকে-জড়ানো ছোট্ট অপোগণ্ড শিশু। অবোলা দুধের ছেলে।

'আমি এক ঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে কখন ঝালে কখন অম্বলে কখনো বা ভাজায়।'

আমার নিত্য-নতুন আস্বাদন। তিনি যে রসের অপার পারাবার। রসো বৈ সঃ। তাই রামকে সেবা করবার জন্যে হনুমান সাজি। আবার তাকে স্নেহ করবার জন্যে সাজি কৌশল্যা।

ভক্তের যেমন ভগবান চাই ভগবানেরও তেমনি ভক্ত ছাড়া চলে না। ভক্ত হন রস ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। তেমনি ভগবান হন পদ্ম, ভক্ত হন অলি। ভক্ত পদ্মের মধু খান। ভগবান নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যেই দু'টি হয়েছেন। প্রভু আর দাস। মা আর ছেলে। প্রিয় আর প্রিয়া।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অনেক সব সাধু-সন্ন্যেসীর আনাগোনা বেড়েছে। পেট-বোরেগীর দল নয়, বেশ উঁচু-থাকের লোকজন। হয়তো গঙ্গাসাগরে চলেছে নয়তো পুরী—মাঝখানে ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে ডেরা করে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে গদাধরকে। সর্বতীর্থসারকে।

গদাধর কোথাও নড়ে না। সে স্থির হয়ে বসে আপন-মনে গান গায়:

'আপনাতে আপনি থেকো
যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চা'বি তাই বসে পাবি
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।'

এক দিন এক অদ্ভুত সাধু এসে হাজির। সঙ্গে জল খাবার একটা ঘটি আর একখানা পুঁথি। সেই [illegible] বিত্ত। রোজ ফুল দিয়ে তাকে পুজো করে, আর সময় নেই অসময় নেই থেকে-থেকে তাই পড়ে একমনে।

'কি আছে তোমার বইয়ে? দেখতে পারি?' গদাধর এক দিন তাকে চেপে ধরল।

দেখল সে বই। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় অক্ষরে দু'টি মাত্র শব্দ লেখা: ওঁ রাম। আর কিছু নয়, আর কোনো কথা নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু ঐ একই পুনরাবৃত্তি।

কী হবে এক গাদা বই পড়ে? আর, কথাই বা আর আছে কী?' বললে সেই বাবাজী: 'ঈশ্বরই সমস্ত বেদ-পুরাণের মূল, আর তাঁতে আর তাঁর নামেতে কোনোই তফাৎ নেই। তাঁর একটি নামেই সমস্ত শাস্ত্র ঘুমিয়ে আছে। কি হবে আর শাস্ত্র ঘেঁটে? ঐ একটি রাম-নামেই প্রাণারাম।'

এ সাধু বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আমাদের জটাধারী। গদাধরের তন্ত্রসিদ্ধ হবার পর ১২৭১ সালে চলে এসেছে ঘুরতে-ঘুরতে। সঙ্গে অষ্টধাতুর তৈরি বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহ। আদরের নাম রামলালা।

আর কিছুই ধ্যানজ্ঞান নেই জটাধারীর। অষ্ট-প্রহর তাকে নিয়েই মেতে আছে। যেখানে যাচ্ছে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া নেই। যা পায় ভিক্ষে করে তাই রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায় রামলালাকে। শুধু নিয়ম রক্ষার নিবেদন নয়। জটাধারী দস্তুরমত দেখে রামলালা খাচ্ছে, শুধু খাচ্ছে না চেয়ে নিচ্ছে, বায়না করছে। মনে-মনে স্বপ্ন দেখছে না জটাধারী, প্রসারিত চোখের উপরে দেখছে প্রত্যক্ষ। তার রামলালা মূর্তি নয়, মানুষ। বালগোপাল।

আর সারাক্ষণ বসে-বসে তাই দেখছে গদাধর।

কয়েক দিনেই, কি আশ্চর্য, তারই উপর রামলালার টান পড়ল। জটাধারীর কাছে যতক্ষণ বসে আছে ততক্ষণ রামলালা ঠিকই আছে, আপন মনে খেলাধুলো করছে। কিন্তু যেই গদাধর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অমনি রামলালা তার পিছু নেয়।

'কি রে, তুই আমার সঙ্গে চলেছিস কোথা?' ধমকে ওঠে গদাধর: তোর নিজের লোকের কাছে, জটাধারীর কাছে ফিরে যা।'

কথা কানেই তোলে না। নাচ সুরু করে

রামলালা। কখনো আগে-আগে কখনো পিছে-পিছে নাচতে-নাচতে সঙ্গে চলে।

মাথার খেয়ালে ধাঁধা দেখছে না কি গদাধর? নইলে জটাধারীর পুজা-করা চিরকেলে ঠাকুর, সে জটাধারীকে ফেলে গদাধরের সঙ্গ নেবে কেন? প্রাণে-মনে কী নিবিড় নিষ্ঠায় জটাধারী তাকে সেবা করছে। সেই জটাধারীর চেয়ে গদাধর তার বেশি আপন হল?

কিন্তু রামলালা যদি ধাঁধা হয় তবে চোখের সামনে এই গাছ-পালা বাড়ি-ঘর লোক-জন সবই ধাঁধা।

এই দেখ। দু' হাত তুলে কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে রামলালা।

উপায় নেই। সত্যি-সত্যি কোলে নিতে হয় গদাধরকে।

তার পর এক দিন হয়তো চুপচাপ কোলে বসে আছে, হঠাৎ খেয়াল ধরল, এক্ষুনি কোল থেকে নেমে যাবে। ছুটোছুটি করবে রোদ্দুরে, নয়তো ফুল তুলবে গিয়ে কাঁটা বনে, নয় তো গঙ্গায় নেমে হুটোপুটি করবে।

ছেলের সে কি দুরন্তপনা! কিছুতেই বারণ শুনবে না। ওরে যাসনি, রোদ্দুরে পায়ে ফোস্কা পড়বে, হাতে-পায়ে কাঁটা ফুটবে, সর্দি হবে ঠাণ্ডা লেগে। কে কার কথা শোনে। দূরে দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসে রামলালা, কখনো বা ঠোঁট ফুলিয়ে দিব্যি মুখ ভেঙচায়।

'তবে রে পাজি রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' দৌড়ে তার পিছু নেয় গদাধর।

জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামলালা। গদাধরও নাছোড়বান্দা। জল থেকে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। এটা-সেটা দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। বলে, ঘরের মধ্যে খেলা কর্, বাইরে কেন? তবুও যদি কথা সে না শোনে, দুষ্টুমি না থামায়, সটান চড়-চাপড় বসিয়ে দেয় গদাধর।

সুন্দর ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে জল-ভরা টলটলে চোখে চেয়ে থাকে রামলালা।

তখন আবার গদাধরের কষ্ট। তখন আবার বুকের মধ্যে মোচড় খাওয়া। তখন আবার তাকে কোলে নাও, আদর করো, মিষ্টি-মিষ্টি বুলি শোনাও।

ভাবের ঘোরে ছায়াবাজি দেখছে না গদাধর, দেখছে অবিকল রক্তে-মাংসে। তার নিজের ব্যবহারেও সেই অবিকল বাস্তবতা।

এক দিন নাইতে যাচ্ছে গদাধর, রামলালা বায়না ধরল সেও যাবে। বেশ তো চল্, দোষ কি। কিন্তু সবাইর নাওয়া শেষ হয়, ওর হয় না। কিছুতেই উঠবে না জল থেকে। যত বলো, কানও পাতে না। শেষকালে চটে গিয়ে গদাধর তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরল। বললে, নে, তোর যত খুশি জল ঘাঁট্। কিন্তু তা আর কতক্ষণ। গদাধর লক্ষ্য করল জলের মধ্যে রামলালা শিউরে উঠছে। তখন তাড়াতাড়ি হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে রামলালকে বুকে তুলে নিয়ে পারে উঠে এল গদাধর।

আরেক দিন কি আখখুটেপনা করছে রামলালা। তাকে ভোলাবার জন্যে গদাধর তাকে কটি খই খেতে দিল। দেখেনি, খইর মধ্যে ধান ছিল আটকে। এখন দেখে, খই খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে।

কষ্টে বুক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে কোলে নিয়ে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। যে মুখে লাগবে বলে ননী-সর-ক্ষীরও মা কৌশল্যা অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন সে-মুখে সে তুলে দিলে কি না ধানশুদ্ধ খই! তার এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

গদাধর আকুল হয়ে কাঁদে। তার কোলে রামলালাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই দেখে তার এই কান্নার আন্তরিকতা। শোনে তার এই কান্নার কাতরিমা।

যে দেখে যে শোনে তারই চোখে জল আসে।

রান্না হয়ে গেছে, জটাধারী খুঁজছে রামলালাকে। ওরে খাবি আয়। কোথায় রামলালা। খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখে গদাধরের ঘরে গদাধরের সঙ্গে খেলা করছে।

অভিমান হল জটাধারীর। বললে, 'বেশ ছেলে তুমি। আমি সব রেঁধে-বেড়ে রেখে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে খেলা করছ।'

সে-অভিমান বেদনায় গলে পড়ল: 'জানি না? তোমার ধরণই ঐ রকম। দয়ামায়া বলে কিছু নেই। বাবা-মাকে ছেড়ে দিব্যি বনে গেলে, বাবা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল তবু একবার তাকে দেখা দিলে না। এমনি

তুমি পাষাণ।' বলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল রামলালাকে।

কিন্তু গা-জুরি করে কত দিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? ঘুরে-ঘুরেই আবার ফিরে আসে গদাধরের কাছে। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে জটাধারীর আর যাওয়া হয় না—কি করে যায়? রামলালা যে ছাড়তে চায় না গদাধরকে। আর রামলালাকেই বা জটাধারী কি করে ছাড়ে?

প্রেমাস্পদের চেয়েও প্রেম বড়—শেষ পর্যন্ত বুঝল তাই জটাধারী। সজল চোখে এক দিন তাই দাঁড়াল এসে গদাধরের দোরগোড়ায়।

বললে, 'আমি আজ চলে যাব।'

'যাবে?' চমকে উঠল গদাধর: 'তোমার রামলালা?'

'সে এখান থেকে কিছুতেই যাবে না। তাকে তাই তোমার কাছে রেখে যাব।'

'রেখে যাবে?' খুশিতে উছলে উঠল গদাধর।

'হ্যাঁ, তাইতেই ওর আনন্দ। ও আজকে আমাকে আমার মনোমত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, বলেছে এখান থেকে ও নড়বে না এক পা। তাই একা-একা আমিই চলে যাচ্ছি। ও তোমার কাছে আছে, তোমার সঙ্গে খেলাধুলো করছে এই ভেবেই আমার সুখ। ও সুখে আছে এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা।

রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রিক্ত হাতে চলে গেল জটাধারী।

সে এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে যে প্রেমে স্বার্থবোধ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই, বেদনাও নেই। যে প্রেমে পরম পূর্ণতা। যে প্রেম সকল ভাবের বড়—মহাভাব।

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাব প্রেম। আর প্রেমও যা ঈশ্বরও তাই।

একটি ধাতব মূর্তি এই রামলালা। তাই সবাই দেখত চর্মচোখে। সবাইর কাছে সে শুষ্ক প্রতীক; গদাধরের কাছে পূর্ণ প্রাণবান। এর আগে রঘুবীরকে সে প্রভুরূপেই আরাধনা করে এসেছে, জটাধারীই তাকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিল তার বালকমূর্তি। যিনি প্রভু যিনি আরাধনীয়, তিনিই আবার শিশু, আদরনীয়। সম্পর্ক শুধু একটা সেতু। সেই সেতু ধরে চলে আসতে হবে এ পার থেকে ও-পারে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে, মূর্তি থেকে ব্যাপ্তিতে, বিশ্বময়তায়। যে বাইরের দুর্লভ নিধি তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্তরে, অন্তরের অন্দরমহলে—আর যে অন্তরের ধন তাকে দেখতে হবে বাইরে এনে, সর্ব জীবে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিতে। সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হবে বিরাট বন্ধনহীনতায়।

'মধুর ভাবসাধনের এই তো আসল তাৎপর্য্য।' বললে ভৈরবী।

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥"

রাম শুধু দশরথের ছেলে নয়, সে সমস্ত জীবদেহে প্রকাশিত। আবার অমনি প্রকাশিত হয়েও জগতের সব কিছুর থেকে সে পৃথক, মায়াহীন, নির্গুণ।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বানুভূ। তিনি যেমন ঘটে তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তাঁর বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তবু আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত।

তাঁর অসীম ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অসামান্য প্রতাপ। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সত্য পরিচয় কোথায়? তিনি সুন্দর, তিনি সরস, তিনি মধুর। তিনি আনন্দ-আকর [ক্রমশঃ

"ষোল আনা মন তাঁর জন্য দিলে, তবে তাঁকে পাবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার উপায় নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তা হ'লে আর খবর যাবে না।"
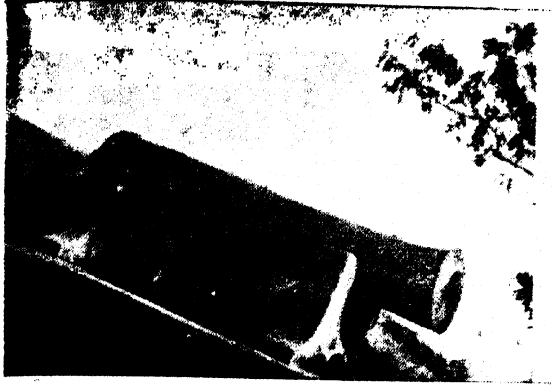
কামান —সুপ্রভা মিত্র

দোষ কার ?

আলোকচিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আর না জানিয়ে পারা যায় না। তার মানে এই নয় যে, ঐ আলোকচিত্র বিষয়টি সম্বন্ধে কোন রকম গুরুগম্ভীর রচনা আমরা ফেঁদে বসছি। আমরা শুধু মাত্র মাসিক বসুমতীতে যে আলোকচিত্র প্রতি মাসে আত্মপ্রকাশ করে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরী কথা জানিয়ে রাখতে চাই।

মনে করুন, আপনারা কয়েক জন সখের আলোকচিত্র-শিল্পী। মনে মনে আশা পোষণ করেছেন, মাসিক বসুমতীর এই বিভাগটিতে কিছু ছবি ছাপতে হবে। এবং সেই মনস্থ ক'রে আপনারা প্রত্যেকেই পরস্পরকে না জানিয়ে ছবির বিষয় খুঁজতে বেরিয়েছেন শহর কলকাতায়। ক্যামেরা যন্ত্রটি ধরুন সকলেরই হাতে আছে। কিন্তু সকলের হয়তো সমান দৃষ্টি নেই, তাই কারও

বাজার

—অনিলবরণ চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য

—জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীঅরবিন্দের আলোকচিত্র মুদ্রিত হ'ল। চিত্রটি শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভঙ্গিমা

—[illegible] রায়চৌধুরী

ছবি ওৎরায় আবার কারও বা শত চেষ্টা সত্ত্বেও ছবি হয় না। যা হয় তাকে 'কুয়াশা বললেই ভাল হয়। সে যাক্।

আপনারা হয়তো এখন পরস্পরকে না জানিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সারা কলকাতা শহর ঘুরে ছবি তুললেন! কেউ কেউ আবার রাত্রেও ছবি তুলতে পারেন। যাঁদের ক্যামেরায় অন্ধকারে ছবি তোলার ব্যবস্থা আছে তাঁরাই অবশ্য পারেন। অন্যান্যরা রৌদ্রের সাহায্যে তুলেই ক্ষান্ত থাকেন।

মনে করুন, শেষ পর্য্যন্ত আপনারা প্রত্যেকেই একেকখানিই সেই কলকাতা-দৃশ্য মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ছাপতে ডাকযোগে কিংবা বাহক মারফৎ পাঠিয়ে দিলেন বসুমতীর দপ্তরে। এবং দুঃখের কথা বলব কি, সেই সব আপনাদের প্রেরিত ছবির খাম উন্মুক্ত ক'রে আমরা দেখতে পেলাম যে, আপনারা সকলেই ঐক্যব্রত পালনের এত অধিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন যে সে-সব ছবি একখানির বেশী আমরা ব্যবহার করতে পারলাম না।

এখনও বোধ করি বুঝতে পারছেন না আপনাদের এক জন ব্যতীত আর আর সকলে কি এমন ভুল করলেন যাতে এক

—এস, ব্রহ্ম

পদ্মপত্র

চিড়িয়াখানায় —অমলেন্দু ঘোষ

—সুলেখা চৌধুরী

গঙ্গাযাত্রা ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যতীত অন্তের স্থান সঙ্কুলান হ'ল না। আমরা নিশ্চিত জানি, আপনি আপনার ছবির কোন রকম দোষ খুঁজে পাবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, দোষ হয়তো সব সময়ে আমরাও খুঁজে পাবো না।

তবুও আপনাদের আমরা দোষারোপ করব। কেন করব তাই বলছি। ধরুন, আপনাদের প্রত্যেকেই পরস্পরকে লুকিয়ে এমন জায়গায় গেলেন এবং ছবি তুললেন যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেকের খামের ভেতর দেখতে পেলাম সেই একই জায়গার দৃশ্য—যেখানে আপনারা প্রত্যেকেই গেছলেন। জায়গাটি আর কোথাও নয়—কলকাতার গড়ের মাঠের কাছাকাছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

এখন অনুমান করুন, সেই প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে যদি আমরা আপনাদের এক জনের একটি ছবি প্রকাশ করি, তাতে কি এমন কিছু অন্যায় হবে?

অবশেষে অনুরোধ, আপনারা ঐ বিষয় নির্ব্বাচনে দোষ করছেন। অসংখ্য উচ্চ জাতের ছবি পেলেও আমরা যদি ব্যবহার করতে না পারি—তাতে ক্ষতি আমাদের উভয়ের। অনুরোধ, বিষয় নির্ব্বাচনে আপনারা ঐক্য পালন না করেন।
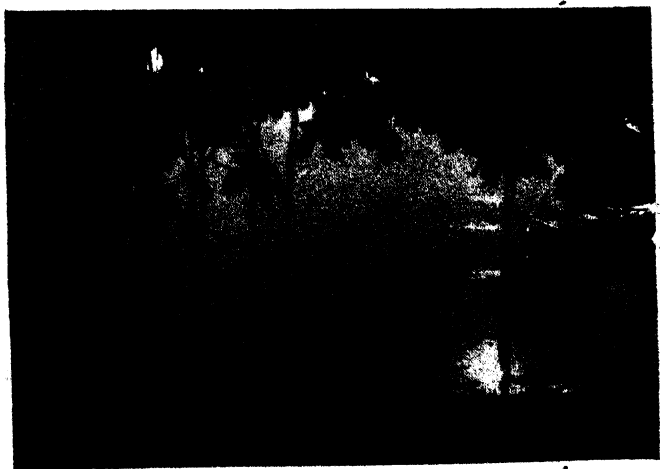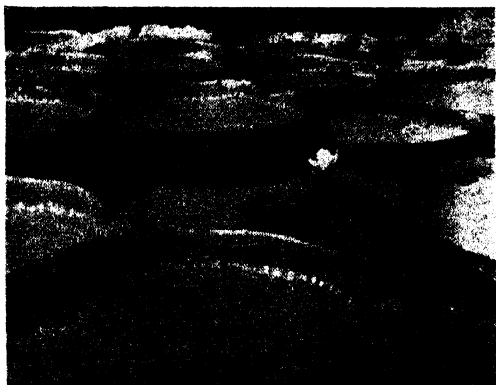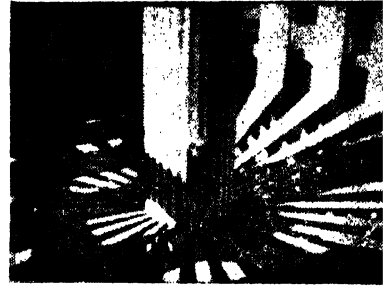
পক্ষি-শাবক —বীরবরণ চট্টোপাধ্যায়

দিল্লী মানমন্দিরে —অনিন্দ্য ম
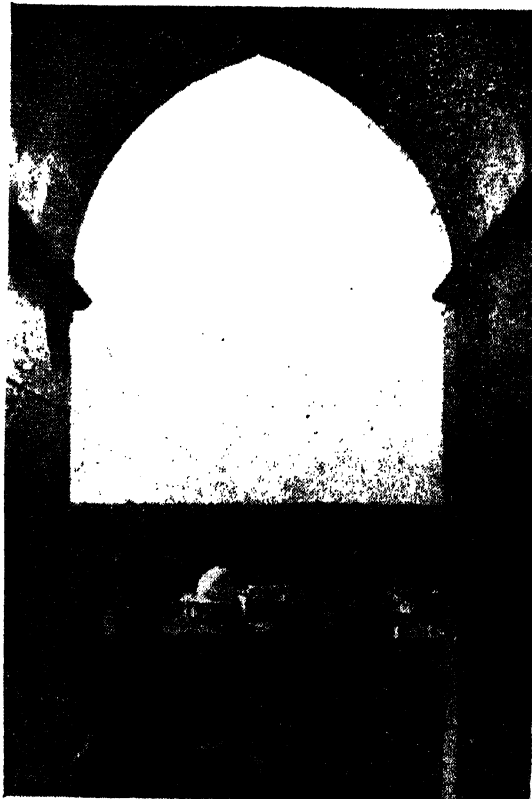
কুতুব থেকে —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই,

চৈত্র অবসান।

দিগ্‌ভ্রান্ত বাতাসের মত্ততা। শীর্ণ পাতার মর্ম্মর্ ধ্বনি। াম-না-জানা পাখীর কূজন। গাছের শাখায় শাখায় কচি কিশলয়। ই নূতনের খেলার মাঝে পুরাতনের রহি-রহি দীর্ঘশ্বাস। লাপ-উচ্ছাস। পুরাতন চলে গেল অনন্তের আহ্বানে। নিঃস্বার্থ, ারও ছলনায় সে ভোলে না। স্বর্গ আমন্ত্রণ জানায়, মৃত্যু ধাবিত রে, নরক ভয় দেখায়,—সময় কিছু করে না, শুধু সে পালায়। মুখে ধায়, পিছনে তাকায় না। গোলাপী কপোল, প্রবালের মত ঠাধর, তারার মত জ্বলন্ত চোখ—সময়ের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়ে ায়—আর সেই বেগবান জোয়ারের উত্থান-পতনে কেউ ভেসে ায়, আবার কোথাও বা জাগে নতুন চর। কারও কপালে সময়ের নঃশব্দ পদক্ষেপের চিহ্ন—বলিরেখা দেখা দেয়—কারও বা যৌবন টে উঠলো। ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের মত সময়ের চাকাও রছে! জীবন চাও? তবে সময় অপচয় ক'র না। জীবন ময়ের জাতক। দীর্ঘসূত্রিতা তার শত্রু।

পক্ষকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। চৈত্রের শেষে এসেছে শাখ।

মধ্যাহ্ন-আকাশে সেই বৈশাখের দীপ্তচক্ষু। দিগ্বিদিক্ ধূলায় দয়। সহর কলকাতা যেন বিরাট এক চিতার মত জ্বলছে! তার ত বাতাসে লেলিহান অগ্নিশিখা। বাগানের কোন্ গাছে খন থেকে ডাকছে এক নাম-না-জানা পাখী। দরজার খসখস ত বার জলসিক্ত ক'রে দিয়ে গেছে তাঁবেদার। বাড়ীতে মানুষ াছে কি না সন্দেহ হয়। কাছারীতে শুধু কাজ চলছে নীরবে। সারি- ারি চিলের পালখের কলম, আমলাদের হাতে। আঁচড় তুলছে াগজের বুকে। কাছারী-ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু টকাটক শব্দে বজে চলেছে অবিরাম।

ঘেরাটোপে-ঢাকা একখানা পাল্কী হন-হন করতে করতে ফটক পরিয়ে ভেতরে এসে সোজা অন্দরে চলে গেল। চার-ছ'গুণে আট াল্কীদারের ঘর্মাক্ত কলেবর। যন্ত্রের মত চলে পেশীগুলো নাচিয়ে।

আজ একাদশী।

কুমুদিনী গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। একাদশীর উপবাস ভঙ্গের আগে আবার যাবেন আগামী প্রত্যূষে। এখন পাল্কী থেকে নেমে খাস-মহলে চলে যাবেন। রাত্রি শেষ না হ'লে ত্যাগ করবেন না সে-ঘর। একাদশীতে রসুইশালাতে আর যান না। ঘ্রাণের দ্বারা অর্দ্ধভোজন হয়ে যাবে!

মায়ের পাল্কী আসতে দেখেছিল কৃষ্ণকিশোর। পাল্কী অন্দরে চলে যাওয়ার পর বৈঠকখানায় ঢুকলো। কুমুদিনী গঙ্গাস্নানে গেলে মন যেন আর ঠিক থাকে না। মা যদি ভেসে যায় গঙ্গার জলে, বেয়ারাদের হাত ফসকে! কুমুদিনী ভেতরে থাকেন আর ঐ বেয়ারাগুলো পাল্কী চুবিয়ে নেয় গঙ্গায়। তাও একবার নয়, অনেক বার। আর তাতেই যত আশঙ্কা। মা-হারানোর ভয়।

অনেক দিন ঐ আলোর ঝাড়ের দোল দেখা হয়নি।

দেখা যায়নি রঙের বাহার, শোনা যায়নি ঠুং-ঠাং ঐ কাচকাটির। আলো দুলিয়ে দেয়। ঝনন্-ঝনন্ শব্দ হয়। খসখস-ভেদী স্বল্প আলোয় হরেক রঙের আভা দেখা যায়। পলে-পলে রঙ বদল হচ্ছে কাটা-কাচের। ফরাসে আর এলিয়ে পড়ে না অন্য দিনের মত, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঐ আলোর পানে।

আহারাদি সেরে গালে পানের গুলি পূরে অনন্তরাম এসে হাজির হয় খসখস সরিয়ে। টানা-পাখার আওতায় বসে বলে,—ইস্, গরমটা কি দেখেছিস! গা যেন জ্বলছে। তবুও এ ঘরখানা সে-তুলনায় ঢের শীতল। বাইরে বসে কার বাপের সাধ্যি! লু দিচ্ছে যেন!

সত্যিই শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে বাইরে থেকে। শন-শন হাওয়া বইছে এলোমেলো। ধুলো উড়ছে শুকনো পাতাকে আগিয়ে নিয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অনন্তদা, বাইরে এখন ভীষণ গরম, নয়?

এ-গালের পান ও-গালে নিয়ে যায় অনন্তরাম। বলে,—ইস্, সে আর বলতে! গা যেন চড়-চড় করছে। মাটি ফেটে চৌচির। এক কোঁটা বিষ্টির নাম-গন্ধ নাই! কথা বলতে বলতে দোকতার পিক গিলে ফেলে। বলে,—কেনে, এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কি বাইরে যাওয়া হবে?

আরেক বার প্রায় থেমে যাওয়া আলোর ঝাড় দুলিয়ে দেয় সে।

ফরাসের মাঝখানে বসে প'ড়ে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে। বলে,—না, হ্যাঁ, ভাবছিলাম অরুণদের বাড়ীতে একবার যাবো, অনেক দিন কোন খবর নেই। কি ব্যাপার কে জানে!

চোখে যেন অন্ধকার দেখে অনন্তরাম। ঘরের বাইরের চড়া রৌদ্রের কড়া তেজ যেন সে অনুভব করে সর্বাঙ্গে। আর একটা ঢোঁক গিলে নেয়। বলে,—অরুণের বাড়ীতে আবার কেনে? যার জন্যে যাওয়া সে তো চলে গেছে। আমি কি আর বুঝি না কিছু? না আমার চোখ নেই, আমি অন্ধ?

বড় সোজাসুজি-কথা বলে অনন্তরাম। একেবারে যেন মনের কথাটি সে বলে দেয়। মিথ্যা কথা বলে না অনন্তরাম। যে ছিল সে তো চলেই গেছে, তবে আর কেন যাওয়া? রাধা নেই, বৃন্দাবনে গিয়ে কি হবে? সে-কথার উত্তরে কিছু আর বলে না, কৃষ্ণকিশোর। বসে থাকে কড়িকাঠে চোখ তুলে। হরেক রঙের চিকণ দেখে প্রতি মুহূর্তে। দেখা দেয় আর বিলীন হয়ে যায়।

কি কথা মনে পড়ে কে জানে, অনন্তরাম হঠাৎ হাসতে শুরু করে। অর্থপূর্ণ শব্দহীন হাসি। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতেই বলে,—সকাল থেকে আজ এমন সানাই বাজে কেনে বল্ তো?

—সানাই! সানাই আবার কোথায় বাজলো?

তার কণ্ঠস্বরে কৌতূহল। খানিক বা বিস্ময়। সানাই বেজেছে, কৈ, তার কানে পৌঁছয়নি। কাদের বাড়ীতে সানাই বাজলো। কিসের উৎসবে?

অনন্তরাম জোর ক'রে হাসি চেপে বললে,—সে কি, সানাই তো তোমার সেই ভোর থেকেই বাজতে শুরু করেছে! শোন নাই? কান নাই তো শুনবে কোত্থেকে!

সানাই বেজেছে, তাতে তার কি যায়-আসে। নাই-বা শুনলো। কিন্তু তবুও অনন্তরামের কথার সুরে যেন রহস্যের ইঙ্গিত। বললে,—বিশ্বাস না হয়তো ঘরের বাইরে যেয়ে শুন্ গে না।

পাড়া-প্রতিবেশী কার বাড়ী থেকে সত্যিই তখন সানাইয়ের করুণ রাগিণী ভেসে আসছে। প্রখর সূর্য্য মধ্যাহ্ন-আকাশে। উষ্ণ বাতাস। বিরস এই আবহাওয়ায় সুরের লহরী। কোন্ বেরসিকের আবার সানাই শুনতে সখ হল এখন,—এই কাঠফাটা রোদ্দুরে?

আর সানাই যদি বাজে তাতে তার কি? তবুও অনন্তরাম ঐ শব্দ-রাগের কি যেন একটা গোপন অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রেছে—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষ্ণকিশোরের জানা না-জানার প্রয়োজন। লিলিয়ানের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে যেন তার চোখের দৃষ্টি, আর কানের সজাগতা লোপ পেয়ে গেছে। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে এক সূক্ষ্ম তার। নিদারুণ এই শোকের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে অন্তরের অনুভূতি। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে যেমন ছত্রভঙ্গ হয় পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ, দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝায় বিচ্ছিন্ন হয় সব কিছু,—আকাশের তারা থাকে স্থির আর অচঞ্চল—লিলিয়ানের মুখখানা যেন তেমনি জেগে আছে তার মনে। লিলিয়ান শুধু মনোরাজ্য অধিকার ক'রে বসে আছে, আর কোন কিছু স্থান পায়নি।

তাই সানাইয়ের সুর কানের ভিতর দিয়া পৌঁছয়নি সেখানে। অনন্তরাম উবু হয়ে বসে পড়ে ফরাসের কাছাকাছি, ঘরের মেঝের। বলে,—কাদের বাড়ীতে দেখা হচ্ছে হয়... বোশেখে লগ্ন আছে যে গোটা তিনেক।

বে, বিয়ে, বিবাহ, উদ্বাহ-বন্ধন। অনন্তরামের কথা তার ক... যায় না। কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছে অরুণেন্দুকে। তার খ... খেয়ালী চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা। ফিরিঙ্গী আদব-কায়... অদ্ভুত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য ক'রেছে সেই প্রথম আলাপের মধু-মু... থেকে। পাঠশালায় আলাপী ছেলেদের মধ্যে এক জনকেও দে... এমনটি। ইংরেজীর নাম শুনলে ঘৃণায় জিব কেটেছে তা... উপহাস ক'রেছে কৃষ্ণকিশোরের অ্যালবার্ট ফ্যাশনের চুল দে... নিজেদের মাথায় শিখা দেখিয়ে তারা বলেছে,—আছে তোমার?

—চৈতন্য, শিখা, টিকি? বলতে-বলতে কিশোর ছেলের গড়িয়ে পড়েছে হাসতে হাসতে।

অনন্তরাম কি বলতে চায়। কেন এমন হাসে, অর্থপূর্ণ হাসি সানাই, বিয়ে, বিয়ের লগ্ন। অনন্তরাম আবার বললে,—আ... পাশে কাছাকাছি কার বে হচ্ছে। ছেলের না মেয়ের কে জানে!

কথার শেষে আবার একটু হাসলো অনন্তরাম। কি যেন বল... চাইলো, বোঝা গেল না। বৈঠকখানার দেওয়ালে ছিল একখা... বাঙলা দেওয়াল-পঞ্জিকা। বড়বাজারের কোন মসলা-ব্যবসা... বিজ্ঞপ্তি। নাম-ঠিকানা আর নিজেদের মাল-মসলার উৎকৃষ্ট... লাখ কথা।

ঐ দেওয়াল-পঞ্জিকার তারিখ দেখেই হয়তো স্মরণে আসে।

ম্যানেজার বাবু আজ দিন বারো-তেরো এখানে আর নেই... কার্য্য-ব্যপদেশে বিহারে যেতে হয়েছে তাঁকে। চণ্ডীমহল মৌজ... তহশীল থেকে পত্র পেয়েই তিনি চলে গেছেন। রাজস্ব ও সে... দেওয়ার দিন এসে গেছে। সামনেই মার্চ্চের কিস্তী। সূর্য্যাস্ত-কা... পর্য্যন্ত দাখিল করা যায়। ততঃপর আর যায় না।

প্রজা উপেক্ষিত ও আত্মগৌরবান্বিত সান্-সেট্-ল। সূর্য্যাস্ত আইন। টিপু সুলতান-বিদ্বেষী সেই চার্লস ফার্ট মারকুইস লর্ড কর্ণওয়ালিসের দান।

তৌজির রাজস্ব ফেল হ'লে আর রক্ষা নেই। মহানুভব সরকার তখন আর ক্ষমা করবেন না। গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য ক'রে নিলাম ডাকবেন। তালুক-কে-তালুক বিকিয়ে যাবে। বেহাত হয়ে যাবে।

তবে, এই বকলমের এষ্টেট তদারক করেন স্বয়ং সরকার। যন্ত্রের মত কাজ হয়ে যায় প্রতি তহশীলে।

জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখতে বলেছিলেন কুমুদিনী। বিহার যাত্রার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত পাখী-পড়া ক'রে শিখিয়েছেন ম্যানেজার বাবু বাদশাহী আর নন্-বাদশাহীর তফাৎ শুধু নয়, আরও অনেক কিছু। এক দিনে অধিক বললে পাছে ভ্রম হয় সে জন্য একেক দিনে একেক বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দশশালা বন্দোবস্তের পরে চাকরাণ জমি কি ভাবে মালগুজারি জমিতে পরিণত হ'ল বলতে গিয়ে জমিদারীর প্রকৃত মালিকের ক্ষমতার সীমানা কতটা তাও শিখিয়েছেন। কৃষ্ণকিশোর নিবিষ্টচিত্তে শুনেছে আর ম্যানেজার বাবু একে একে বলে গেছেন:—

[২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

স্ত্রীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের গোপনা পত্র

[শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীর নিকট এই গোপন চিঠিগুলি ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় পুলিশ মিঃ নর্টনের হাত দিয়ে আদালতে প্রথম প্রকাশ করে। চিঠিগুলো থেকে নর্টন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, অরবিন্দই মজঃফরপুরে বোমার গুপ্তচক্রের প্রধান বিপ্লবী নেতা। আবার এই চিঠিগুলো থেকেই ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করেন যে, "অরবিন্দের সঙ্গে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সম্পর্ক ছিল না। অরবিন্দের বয়স তখন ৩৪ বৎসর, স্ত্রী মৃণালিনীর বয়স ১৯ বছর ৬ মাস। মাত্র চার বছর ৪ মাসের দাম্পত্য-জীবন। মৃণালিনীর অভিযোগ, অরবিন্দের "কোন উন্নতি হইল না।" অরবিন্দ স্ত্রীকে জানালেন তিন পাগলামীর কথা—১। তুচ্ছ মানুষ হয়ে উপায়ের সব টাকা দুঃখীদের বিলিয়ে দেওয়া, ২। ভগবান দর্শনে সস্ত্রীক সাধনা করা, ৩। মাতৃভূমির বন্ধন মোচন আগে, তার পর সুখ ও সংসার। মৃণালিনীকে গান্ধারীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর পাগলামীর পথের সঙ্গিনী হতে বলেছেন—হিন্দু-রক্তের দোহাই দিয়েছেন, ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের মেয়েদের আদর্শের নিন্দা করছেন। ১৯০২-১৯০৪ ভারতে গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের সুরু। এ সময় অরবিন্দের শত্রুবধে নিযুক্তা বগলামুখীর সাধনা। বরোদার বাসায় বন্ধ কুটীরে তান্ত্রিক পূজো করেন বগলার স্বর্ণ-প্রতিমা দেবী। বাঁ হাতে শত্রুর জিহ্বা আকর্ষণ করে ডান হাতের গদাঘাতে শত্রুকে প্রপীড়িত করছেন। এ সময় দেশ-জননী ছাড়া আর কিছু বুঝেননি অরবিন্দ। তিনি তাই স্ত্রী মৃণালিনীকে জানিয়েছিলেন, "মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায়?" জননীকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ যোগ সাধনা আরম্ভ করে দেখলেন হিন্দু ধর্মের কথা মিথ্যা নয়। ১৯০৫এর আগষ্টের এই সাধনা থেকেই পরবর্তী শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি।]

১

30th August 1905.

প্রিয়তমা মৃণালিনি,

তোমার ২৪এ আগষ্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মা'র আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন্ ছেলেটি পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হলে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ-দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়াছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম; পনের টাকা যদি দরকার, পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্য দার্জ্জিলিংএ কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এই দিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব। পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি; আর তিন চারি টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটি বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে এক জন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক বা মহাপুরুষ হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে. ঋষিগণ এই উপায় *ঠিক* করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমো গুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে-কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্য ধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? [illegible] মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান, তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটি পাগলামী আছে, প্রথম পাগলামী এই, আমার

দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এত দিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্যে কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া-পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না' এই উন্নতির একটা পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে, আজ-কালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে-পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই, যে অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজ-কালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে, কোথাকার বদলোক আমার সরল ভাল মানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি, তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি। তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে, আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এই ভাবে থাকিবে, আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, এক জনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর

ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়, ব্রাহ্মস্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব ঈশ্বর উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা, কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া, নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে?

তোমার

২

23 Scotts Lane
Calcutta
17th February 1907.

প্রিয় মৃণালিনি—

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই সেই আমার চিরন্তন অপরাধ তাহার জন্যে তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে, আমার আর উপায় কি? যাহা মজ্জাগত তাহা এক দিনে বেরোয় না, এই দোষ সুধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে!

8th জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেই-খানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে ছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল, যে এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না। এই পর্য্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক, কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি, ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন। এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

পুনশ্চ—সংসারের কথা সরোজিনীকে লিখিয়াছি, আলাদা তোমাকে লেখা অনাবশ্যক, তাহা পত্র দেখিয়া বুঝিবে।

৩

6th December 1907.

প্রিয় মৃণালিনি,

আমি পরশ্ব চিঠি পাঠাইয়াছিলাম, সেদিনই র‍্যাপারও পাঠান হইয়াছিল, কেন পাও নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাণ্ডি আজকে পাঠান হইবে। অবিনাশ এখানে নাই, সুধীরও নাই, বারিনও ছিল না, সে জন্যে দেরী হইল। সুকুমারের দেখা পাওয়া কঠিন। আমার এইখানে এক মুহূর্ত্তও সময় নাই, লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, বন্দে মাতরমের গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটি কথা শুনিবে কি? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারি দিকে যে টান পড়েছে, পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে, আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্লচিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব। জানি, দেওঘরে একেলা থাকতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের সফলতা তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, যাহাদের সঙ্গে তুমি এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন তাঁহারা কটুবাক্য বলিলে, অন্যায় কথা বলিলে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ করো না। আর যাহা বলেন, যে তাহা সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যে বলা হয়েছে তাহা বিশ্বাস করো না। অনেক বার রাগের মাথায় না ভেবে কথা বেরোয়, তাহা ধরে থাকা ভাল নয়। যদি নিতান্ত না থাকিতে পার আমি গিরিশ বাবুকে বলিব, তোমার দাদা মহাশয় বাড়ীতে থাকিতে পারেন আমি যত দিন কংগ্রেসে থাকি।

আমি আজ মেদিনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে সুরাটে যাব। হয়ত 15th or 16thই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে ফিরিয়া আসিব। তো—

বারীনকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্র

[বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বর্ত্তমান 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক, অগ্নিযুগের বারীনদা হলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ্য সহোদর। লাল মুখের জাতকে ভারতবর্ষের বাইরে তাড়াতে তখন বাঙালী যে মহৎ ব্রত অবলম্বন করে, শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীনকে সেই ব্রতের হোতা বললেই যথার্থ বলা হয়। ভাইয়ের মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে, দাদার কাছে জানতে চেয়েছে ভাই। শ্রীঅরবিন্দ কনিষ্ঠকে এই পত্রে তার কিছু-কিছু জবাব দেন।]

৭ই এপ্রিল, ১৯২০

স্নেহের বারীন,

পর পর তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হ'য়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা mirace- (আশ্চর্য্য কাণ্ড)*, কেননা আমার পত্র লেখা হয় once in a blue moon (ক্বদে মঙ্গলবারে একবার) বিশেষ বাংলায় লেখা, যা এই পাঁচ-সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ ক'রে যদি Postএ (ডাকে) দিতে পারি, তা হ'লেই miracle (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও, আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। * * * যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, জেলে যা দিয়েছিলেন * * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক-ওদিক ঘুরে দেখা, পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটি-ওটি ছোঁয়া, তোলা, হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা, এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটির পিছনে যাওয়া।

তার পর পণ্ডিচেরীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্যামী জগৎগুরু আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ, এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে, এখনও শেষ হয়নি, আরও দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগপন্থাটি কি, তাহা পরে লিখবো, অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এইমাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণকর্ম্ম ও পূর্ণ ভক্তির ~~সামঞ্জস্য~~ ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূল তত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মনবুদ্ধিকে জানত আর আত্মাকে জানত। মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে, অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না, ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর 'উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক-এক জন করতে পারেন বটে, কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানে মূর্ত্তিমান করা, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে—to realise God inli (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐ করতে পারেনি। জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়ি দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি; গীত যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহ ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রে ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহী বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি আগে মানসিক level-এ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত কর হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞান-ভূমিতে উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solv (মীমাংসা) হয় না। সেইখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখ হয় না; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যা বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্।" অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞা আনন্দ, এই হল আত্মার পাঁচটি ভূমি। যতই উঁচুতে উঠ মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠ আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থ স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীব মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clu (মূল কথা)।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমা বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তা মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি, তবে এই সব সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন তখন চলব।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্ম-প্রতিষ্ঠা—আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি—সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হইয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংয়ের ছায়া যদি পড়ে সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এটিই তাই; (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি

---

* বন্ধনীর ভিতরের বাংলা অনুবাদ বারীন বাবুর।

রা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) লও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না লই (যেন ভ্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে সংঘের কি দরকার ? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে কব, সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারে মধ্যেই যা ।। সে সত্যি কথা ; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। মাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও লাতে হবে ; আবার মুক্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) তি নেই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খেয়ালি নয় ; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, মরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না ; রাজনীতি, ণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে ; এই সকলকে তন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন ? আমাদের রাজনীতি ভারতের াসল জিনিষ নয় বলে, বিলাতী আমদানী, বিলাতী ঢংএর অনুকরণ ত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের জনীতি করেছি ; না করলে দেশ উঠত না, আমাদের experience অভিজ্ঞতা) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। নও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্ত দেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে বার ; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ য়া চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise (অধ্যাত্মভাবে) অনু- াণিত করতে চায় * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, ক রকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বলসেভিজম্) রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নেই, যাঁর যে প্রেরণা তিনি তাই ন। তবে এটা আসল বস্তু নয়, অশুদ্ধ রূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) ক ঢাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ঙ্গ যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে ; সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই। iritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই expended (খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে ন করতে। বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যত দিন সেই শক্তি বে। আমরা কিন্তু ভারত-মন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, তার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। না করলে দিশেহারা হব। প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Indivi- lly (ব্যক্তিগত ভাবে) সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে র তার শত গুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়া- ড় রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম ন রূপ ; যার আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানা স্থানে কাজ ব ; পরে Spiritual Commune-এর (অধ্যাত্ম-সংঘ) মত দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যোগানুরূপ আকৃতি ।। শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয় ; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানা ভঙ্গী লয়ে এটিকে ও প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে : করতে করতে Sp Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার এখন idea (ভাব), এখনও পূরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তার পর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ব বস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে, এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার, বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেকদিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের supramental রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তার পর বড়-ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা দুর্ব্বলতার হিসাব রাখে না ; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল ? সময় কি লাগেনি ? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন ? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দেবতা হয়েছি না কি হয়েছি জানি না ; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি— ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তা। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু'-একটি কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think (চিন্তা করবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তত তার শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃংখল শক্তির

খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাঁদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলট-পালট—এ সব নব সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারতে দেখ। কয়েক জন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্ব্বত্রই * * সোজা মানুষ অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ) যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলী-মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে, য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলংঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্বশাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation (সীমা) surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তা-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্ম্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থার যত দিন থাকবে, তত দিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে, এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতে কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ; তার পর অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি, জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারি দিকে হাহাকার, ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে-প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায়? বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম। স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোন ফল হয়নি। হয়েছে; যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ possibilityর (সম্ভাবনার) বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise (বাস্তব রূপদান) করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমত্ততা) ভাব, মন মাতানকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি, শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ-লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পূরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভেতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎজীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বক্তৃতা) পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield (বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে, আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে, সে পুঁটলি St. Peter-এর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ-গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হইনি বলে। অপক্ব অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?

ইতি
তোমার 'সেজদা'।

৮।২৯।১
৮।২৯।১০

বিশ্বদেবা দেবতা। মরীচিপুত্র কশ্যপ অথবা বৈবস্বৎ মনু ঋষি। দশটি ঋক্। একটি দ্বিপদী। বিংশতি অক্ষরা সূক্ত।

বভ্রুরেকো বিষুণঃ সূর্ণরো যুবা
ঽঞ্জ্যঙ্‌ক্তে হিরণ্যয়ম্। ১

যোনিমেক আ সসাদ দ্যোতনো
ঽন্তর্দেবেষু মেধিরঃ। ২

বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীম্
অন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ। ৩

বজ্রমেকো বিভর্তি হস্ত আহিতং
তেন বৃত্রাণি জিঘ্নতে। ৪

তিগ্মমেকো বিভর্তি হস্ত আয়ুধং
শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ। ৫

পথ একঃ পীপায় তস্করো যথা
এষ বেদ নিধীনাম্। ৬

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি চক্রমে
যত্র দেবাসো মদন্তি। ৭

বিভির্দ্বা চরত একয়া সহ
প্র প্রবাসেব বসতঃ। ৮

সদো দ্বা চক্রাতে উপমা দিবি
সম্রাজা সর্পিরাসুতী। ৯

অর্চন্ত একে মহি সাম মন্বত
তেন সূর্যমরোচয়ন্। ১০

একটি রয়েছেন—
বর্ণ তাঁর স্বর্ণ-কপিশ।
তাঁর সুধাময় স্বর্ণবর্ণে
শান্ত হয়ে যায় দুঃখ,
আসে পুষ্টি।
তিনি সর্ব্বত্র গতিমান
(চন্দ্রনেত্রিকা) রাত্রির তিনি সুষ্ঠু নেতা।

এই তরুণ যুবার আবির্ভাব হয় প্রতিদিন
হিরণ্ময় প্রকাশনী অলঙ্কারে তিনি দীপ্যমান ॥ ১।

একটি রয়েছেন—
সমাসীন নিজের যোনিতে,
দ্যুতি প্রকাশের মহিমায়।
দেবতাদের মধ্যে তিনিই মেধা-দানে দক্ষ ॥ ২।

একটি রয়েছেন—
হস্তে তাঁর আয়সী বাশী। (লৌহকুঠার)
দেবতাদের মধ্যে তিনিই অটল
অক্লান্ত সত্য-কর্ম্মা ॥ ৩।

একটি রয়েছেন—
ধারণ করেন তিনি বজ্র,
তাঁর হস্তে আহিত আছে বজ্র,
তিনিই হনন করেন বৃত্রদের—
আবরণ-কারী পাপেদের ॥ ৪।

একটি রয়েছেন—
হস্তে ধারণ করেন তিনি
তীক্ষ্ণধার আয়ুধ।
তিনি শুচি তিনি উগ্র,
তিনি শীতল ভেষজের আধার ॥ ৫।

একটি রয়েছেন—
তিনি রক্ষণ করেন পথ।
তস্করের মত—
তিনি জ্ঞাত আছেন
পৃথিবীতে কোথায় থাকে সঞ্চিত ধন ॥ ৬।

একটি রয়েছেন—
তাঁর বীর্য্যে ক্রন্দন করে শত্রুমণ্ডলী।
ত্রিপাদ তিনি বিক্রম করেন সেখানে
যেখানে মদমত্ত হয়ে রয়েছেন দেবতারা ॥ ৭।

দুই জন রয়েছেন—
তাঁরা সঞ্চয় করেন
একা-র সহিত
গমন-সাধন অশ্বে।
প্রবাসীর মত তাঁদের পথ-বাস ॥ ৮।

দুই জন রয়েছেন—
তাঁরা একে অন্যের উপমা।
আকাশে তাঁরা নির্ম্মাণ করেছেন আস্থান।
তাঁরা সম্রাট্, তাঁরা ঘৃতহবিষ্ক ॥ ৯।

কয়েক জন রয়েছেন—
যাঁরা অর্চ্চনায় বিহ্বল
যাঁরা উন্মনন করেন মহান্ সঙ্গীত। (সাম)
সেই সঙ্গীতে তাঁরা রুচিমান করেন
সূর্য্যকে ॥ ১০।

---

* এটি রহস্য-সূক্ত।

শীতের বিপদ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোট-প্যাণ্ট প'রে ভাবে, শীত কাটানো দায়—
খালি গায়ের লোকে ভাবে, শীত তো চ'লে যায়—
সকলের ভাবা শেষে, শীত ভাবে থামি,
কার ভাবা মূল্যহীন, কার ভাবা দামী?

প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।
—'স্ফুলিঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ

জীবনের বহু দিন রবীন্দ্রনাথ অর্থব্যয় করে বহু দেশ ঘুরেছেন, গোটা পৃথিবীটাই এক রকম তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশেও তিনি বহু জায়গায় গিয়েছেন, পর্বত-নদী-সিন্ধুমালা দেখা হয়েছিল তাঁর অনেকই, এ কথা কে না জানে। কিন্তু ঘরের কাছের ক্ষুদ্র এক-একটি জিনিস কখন চোখ এড়িয়ে গেছে, হঠাৎ ও-রকম একটা ধারণা মনে হতে অপরিচয়ের বেদনা "স্ফুলিঙ্গ" স্ফুরিত হয়েছে তার কাব্যকণিকায়। বলছেন, এত জায়গায় গিয়ে এত দেখলাম, দেখিনি শুধু ঘরের কোণের ধানের শিষের শিশিরবিন্দুটি।

সাধারণত তাই হয়, দূরেরটাই দেখি, কাছেরটা থাকে প'ড়ে। সহজ সুলভের মূল্যে ঔদাস্য প্রায় লেগেই থাকে। যিনি "চঞ্চল", যিনি "সুদূরের পিয়াসী" তাঁর পক্ষে সে ঔদাস্য কিছুটা স্বাভাবিক, এটা তো ধ'রেই নেওয়া চলে। তবু কবির মুখে কথাটা শুনতে কেমন লাগে। যিনি এত দেখেছেন, এত লিখেছেন,—এটুকু কি আর তিনি দেখেননি?

ঋতুতে ঋতুতে "শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা" কিংবা "ধানের শিষে পুলক ছোটা"র গান যে আমরা তাঁর কাছেই পেয়েছি, আর, ঠিক ধানের শিষে শিশিরবিন্দুকে জড়ানো না দেখে থাকুন, বর্ণনায় তার কাছাকাছি যায়, এমন জিনিসটিই যে রয়েছে তাঁর নাটকে। 'শারদোৎসবে' দ্বিতীয় দৃশ্যের মাঝামাঝি সন্ন্যাসী বলছেন :

"······বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?···আর ধানের ক্ষেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠছে। গাও, গাও, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও।" তার পরেই ঠাকুর্দা নাটকে গান ধরলেন, "আমার নয়ন ভুলানো এলে।" এই গানের মধ্যেই তিনি গেয়ে চলেছেন "শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে।" "অরুণরাঙা চরণ ফেলে" শারদা যে এসেছেন এ গান তারই আগমনী। শিশু-মহলে, অক্ষর চেনার আগেই এখন ঘরে ঘরে ছন্দের দোলা লাগায় এই কবিরই তো লেখা :

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

এত যিনি দেখেছেন, দেখতে কি তাঁর এত ভুল হবে। সুতরাং, কথাটাকে তাঁর দিক থেকে আত্মনেপদী করে তিনি যতই বলুন, একটু ঘুরিয়ে দেখলে, আমাদের দিক দিয়েও আত্মগত ক'রে আমরা দেখতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে, অন্ত কোনো বিষয়ে না হোক, কবি সম্বন্ধে কৌতূহল ব্যাপারে একটা বিষয়ে অবহিত হই। বহু খবর তো তাঁর নিয়ে থাকি, যেখানে তিনি থেকে গেছেন, তার আশে-পাশের টুকিটাকি খবর একটু নিলে হয় না কি? এর জন্ত দু'পা গেলেই বা ক্ষতি কী? হোক্ না কবির খবরের আসরে তার দশা—সে আস্বত খবরটুকু—ধানের শিষের শিশিরকণার সামিল!

ঠাকুর-পরিবারের পুরুষানুক্রমিক বাস কলকাতা, কবির বাস শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন বহু দিন "বোলপুর স্কুল বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম" নামেই দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল, স্বয়ং কবিও শান্তিনিকেতন স্থলে "বোলপুর" শব্দ বহু দিন বহু স্থলে ব্যবহার করেছেন। এমন কি, আমেরিকায় প্রকাশিত কবির গ্রন্থাবলীর একটি বহুমূল্য সুদৃশ্য বিশিষ্ট সংস্করণের নামকরণই হয়েছে—"বোলপুর সংস্করণ"। কিন্তু, আধুনিক কালে বোলপুরের নাম চাপা প'ড়ে 'শান্তিনিকেতনই' ক্রমে মুখ্য হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, সুখের বিষয় যে, কবির ভাবাদর্শকে রূপায়িত করে তুলবার প্রেরণা নিয়ে, বোলপুরও আত্মস্বাতন্ত্র্যে আজ পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়াতেই উন্মুখ।

শোনা যায়, পুণ্যতীর্থ কাশী শহর পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর বাইরে; বিশ্বনাথের ত্রিশূলের ভিত্তি তাকে পৃথিবী ছাড়িয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র সত্তা দিয়েছে। শান্তিনিকেতন বীরভূমের সীমায় বটে, কিন্তু বীরভূমের নয়; বিশ্বকবির নামের সংযোগই তাকে দিয়েছে বিশ্ব-সংসারের রূপ। কবির স্মরণীয় পত্রের উক্তিতেই যে রয়েছে : "ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল-বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।" (১১১৬) সে জয়ধ্বজা রোপিত হয়েছে, কিন্তু বীরভূমের ছাপ নিয়ে নয়। লাল কাঁকরের খোয়াইয়েতে আর প্রাকৃতিক ঋতুপর্যায়ের সাজেই শান্তিনিকেতনের গায়ে তবু বীরভূমের ছাপ এখনো যা একটুকু লেগে আছে! শান্তিনিকেতনের সব-কথা ঠিক বীরভূমের কথা নয়, কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে দু'পা এগিয়ে বোলপুরের ছোট্ট শহরটি, এদিকে-ওদিকে বীরভূম। কবির সঙ্গে সেই বীরভূমের যোগের কথা, খুব বেশি কি আমাদের এ যাবৎ ঔৎসুক্য জাগিয়েছে? খুঁজে-পেতে কিছু যদি মেলে, তা দু'-এক কথাই যদি হয়, আর—কিছু মূল্য থাক্-না-থাক্, ছোট্ট টুকিটাকি ব'লেই তার একটা সার্থকতা থাকতেও বা পারে। ধানের শিষের শিশিরকণা আকারে নগণ্য, কিন্তু সৌন্দর্যে অপরূপ; তলিয়ে দেখলে বাস্তব একটা মূল্যও হয়তো কম দাঁড়াবে না, যেহেতু শিশিরকণার যোগেই ধানে হয় চাল, এও বীরভূমেতেই শোনা কথা। এবং, সঙ্গে এও প্রবাদ, সে সময় গোরুর দুধ উবে গিয়ে হয় সেই শিশিরকণা; তাই ফসলের মুখে ধানের মধ্যে চালের রূপ তখন দেখা যায় দুধালো।

বোলপুরের উল্লেখ কবির ছিন্নপত্র থেকে শুরু ক'রে নানান গদ্য-পদ্য রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। বীরভূমে কবির আদি পদার্পণ এগারো বছর বয়সে। সেটি ছিল ১২৭৯ সনের ফাল্গুন মাস, বসন্ত কাল। এ অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ঘুরপাক খেত সঙ্গীর মুখে বহুশ্রুত এ দেশের "ধানের খেত"কে কেন্দ্র ক'রেই। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখাল-বালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধান-খেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।" ধান-খেত দেখার কৌতূহল নিয়ে কবির যাত্রা সেদিন "ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া" নয়, নিরানন্দই

মাইলের সীমায় এসে প্রথম এই বোলপুরেই ঠেকেছিল। কিন্তু, প্রভাতে প্রথম চোখ মেলে কবি যা দেখলেন, সে একেবারে উলটো ব্যাপার! লিখছেন: "ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের ক্ষেত। রাখাল-বালক হয়তো বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখাল-বালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।"

পূর্বোক্ত 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্য হতে উদ্ধৃত কাব্যকণিকায় উল্লিখিত শেষ দিনের কৌতূহলের বিষয়ের সঙ্গে কিছু অংশে এখানে প্রথম দিনের কৌতূহলের বিষয় ধান জিনিসটি নিয়ে আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য ঐতিহাসিক ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। "তখন মাঠে ধান কি রকম দেখতে হয় কখনো চক্ষে দেখিনি। সেটা দেখবার জন্ত ভারি কৌতূহল ছিল।···সেই প্রথম বোলপুর দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে।" এ কথা লিখছেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে ১৮৯৪ সালের ২০ অক্টোবর এবং লিখছেন 'বোলপুর' থেকেই।

কিন্তু বীরভূমের এই প্রথম দর্শন আরেক দিক দিয়ে কবির ক্ষোভ মিটিয়েছিল: "যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তর-লক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটি মাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।" "পশ্চিমের আকাশ-প্রান্তে······নীলাঞ্জন রেখা"টির কথা বহু বারের মধ্যে শেষ দিকে আরেক বার বলেছেন কবি "পুনশ্চ" কাব্যের 'খোয়াই' কবিতায়। "নীলাঞ্জন রেখার গণ্ডি" অথচ সেই সঙ্গেই "অবাধ সঞ্চরণ"-এর কথাটি সূত্র হয়ে উঠে পাশাপাশি মনে পড়িয়ে দেয় কবির পরিণত বয়সের একটি বিখ্যাত গানকে:

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

বোলপুরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তটি অন্য নানা বাস্তব অভাব সত্ত্বেও কবির কাছে মধুরই লেগেছিল; কারণ, কবির জীবন-বীণার বিশিষ্ট গান সীমায় বাঁধা অসীমের সুরের সঙ্গে সেইক্ষণে বোলপুরের প্রাকৃতিক আবেদনের সুরে মূলত কিছু অমিল ছিল না। পরবর্তী কালে সে সংগতি কবির সপ্তস্বর বিকাশেরও সহায়ক হয়েছিল। অন্তত অনেক গান ও কবিতা যে এই নীলরেখার গণ্ডীবদ্ধ দিক্‌চক্রবালেরই দান, তাতে সন্দেহ নাই।

'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে কবি স্পষ্টই লিখেছেন: "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে-দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে—এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।" এই প্রবন্ধেরই শেষ দিকে আছে: "এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ [illegible] ······[illegible] পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে-বিকালে পিতৃদেবের পূজায় নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।"

প্রথম আগমনের পর্বেই কবি সেদিন এখানে বসে একখানি কাব্য লিখে ফেলেছিলেন: "বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্কর-শয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।"

"পৃথ্বিরাজের পরাজয়" নামান্তরে "রুদ্রচণ্ড" নাটিকা হয়ে ১৮৮১ সনে প্রকাশিত হয় ২৫ জুনে। এইখানি "কবির প্রথম নাটক।" আজ অচলিত-সংগ্রহ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১ম খণ্ডে এর সাক্ষাৎ মিলে। কিন্তু সেই শিশু নারিকেল গাছটি! তার সাক্ষাতের আর উপায় নেই। বোলপুরে কবির প্রথম আগমনের সঠিক তারিখটিও সে সঙ্গে আজ নিখোঁজ। আশ্রমের বহু দিনের বিশিষ্ট অধিবাসী রবীন্দ্র-জীবনীকার গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থাগারের বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উক্ত নারকেল গাছটি অবস্থিত ছিল, তাঁরা সেটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

যা হোক, সেদিন শান্তিনিকেতন বিশ্বের ছাপ পায়নি। খোয়াই আর খোয়াইয়ের পাথরনুড়ির মাধ্যমে বীরভূমের সঙ্গে কবির সম্বন্ধের সূত্রপাত। জীবন-স্মৃতিতে লিখছেন: "বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া, মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। ···আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংষ্টোন। এটা যেন একটা দূরবীণের উলটা দিকের দেশ। নদী পাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম, বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো।" ঘুরে-ঘুরে এত যে সব দেখতেন, এর কোনোটাই সজল শ্যামল কোমল কমনীয় বস্তু নয়। লিখছেন "ছায়ায়-রৌদ্রে-বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল, এখানে না আছে কোনো জীব-জন্তুর বাসা;···উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর আর নিচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানা রকমের বাঁকা-চোরা বন্ধুর রেখায়"; কিন্তু রুক্ষ, রক্ত কঠিন আবরণের মধ্যেও কবির মন বীরভূমের বিশিষ্ট প্রকৃতির রসমাধুর্য উপভোগে সেদিন বিরত থাকেনি। সেই প্রথম জানাজানি। তার পরে কবির কাছ থেকে গানের পর গানের ডালিতে পেয়েছি আমরা আর-একটি গান: "বজে তোমার বাজে বাঁশি"।

শুধু সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভবের অনুকূল নীলাঞ্জন রেখারি

াসীম দিগন্তর নয়, বজ্রের মধ্যে বাঁশি শোনার, কঠিনেরও মধ্যে মধুরকে দেখবার যোগ্য পরিবেশটি,—কবির চার পাশে এ সব ছড়িয়ে রেখেছিল বীরভূমেরই এই বোলপুর প্রান্তর। কবির পক্ষে বজ্রের গান যে সহজই ছিল, বীরভূমের রুক্ষ-কঠিন পাথর-নুড়ি নিয়ে বাল্যখেলার আনন্দের মধ্যেই সে সহজ সুরের আভাস মিলে। শেষ জীবনে খোয়াই' হয়েছে 'পুনশ্চ' কাব্যের চতুর্থ কবিতার উৎস। সে দিনটিতেও সে কবির মন টেনেছে; তার সে রূপ-বর্ণনায় কবি লিখেছেন :

মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।

প্রকৃতপক্ষে রুদ্র মধুর দুই দিকই আছে বীরভূমের প্রকৃতিতে। কবিকেও সে তাই নাড়া দিয়েছে দুই দিকেই। সে পরিচয়টি বিচিত্র। কবির ক্ষেত্রে বীরভূমের ধর্মপ্রকৃতির সাদৃশ্যের দিকটা তার মধ্যে স্বল্প পরিসরের হলেও বিশেষ কৌতূহলজনক।

তান্ত্রিকের মহাপীঠ এই বীরভূম। কবি নিজেই লিখেছেন আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা প্রবন্ধে" : "তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমাণ্টিক অর্থাৎ কাহিনী রসের জিনিষ ছিল। যে-সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এক কালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক।···বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায়নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্রবংশের লোককে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন ব'লে জনশ্রুতি নে এসেছে।" কবির সাহিত্যে অন্যত্র এ দেশের একটি শাক্ত-পীঠের নামও এক স্থানে একটু উঁকি দিয়েছে। "রথের রশি" নাটিকায় তৃতীয় ছত্রে প্রথমার উক্তি :

কংকালীতলার দীঘিতে ছুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল,

তন্ত্রপুরাণ মতে জানা যায়, 'মহিষমর্দিনী' ভগবতী, দেবী দুর্গারই মূর্তিবিশেষ হচ্ছেন কংকালী। শান্তিনিকেতনের ৩ মাইল পূবে আদিত্যপুর পেরিয়ে এই পীঠস্থান দেশবিখ্যাত। মহাদেবের স্কন্ধদেশ থেকে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীদেহের কাঁকাল-অংশ এখানে খসে পড়ে,—সেই থেকে পীঠের উৎপত্তি। নাটকেরই প্রয়োজনস্থলে, সে দিনকার সংস্কার-কঠিন সামাজিক পটভূমিকাটির ব্যঞ্জনামুখে কংকালীতলা'র কথাটা কবির লেখনীতে সহজেই এসে বসে গেছে। তবুও কংকালীতলার দীঘির খোঁজ একটু দুর্ঘট (কিন্তু শুনা যায়, ঐ রকম একটি রথ কংকালীতলায়ও না কি আগে এক দিন ছিল) এবং রথের সঙ্গে কংকালীতলার ঐতিহ্যিক যোগটা একটু বিসদৃশ, কিন্তু সেটা এখানে আলোচ্য নয়। এ সঙ্গে "ব্যঙ্গ কৌতুক" গ্রন্থের 'বশীকরণ' নাটিকাটির তান্ত্রিক আবহাওয়া স্মরণীয় এবং গল্পগুচ্ছের গল্প 'সুধন'-এর সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও তার সেই সাংকেতিক কথানিও। তবে, বৈষ্ণবের লীলাপাটও রয়েছে এই মাটিতে নানা স্থলেই। বীরভূম বাউলের মেলার জন্ম বিখ্যাত। দেশপ্রকৃতির বাউল রূপটি যেন মিশে রয়েছে এখানে "গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথে পথে।" কবির মন ভুলেছে তাতেও।

১২৯৪ সালে প্রকাশিত 'সমালোচনা' গ্রন্থে কবির 'বাউলের গান' সম্বন্ধে একটি আলোচনা দেখা যায়। বাউলের ধারা কবির গানে, নাটকে বহু স্থলেই প্রতিভাত। বীরভূমের বাউলের গান কবিকে যে আকৃষ্ট করেছিল, তার একটি সাক্ষাৎ প্রমাণ পরে দেওয়া হবে। কিন্তু আপাতত তাঁর সাহিত্য থেকে আমরা দেখছি, 'জীবন-স্মৃতিতে' তিনি অন্তত একটি ঘটনার ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন "সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ" অধ্যায়ে :

"ইহার অনেক দিন পরে এক দিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল :—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

দেখলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে।" কথাটি লিখেছেন তাঁর লেখা "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী" গানখানির ভাবব্যাখ্যায় ও সংগীতের মধ্যে সুরের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে। এর পাঁচ বছর পরে, ১২৯৯ সালে "সোনার তরী" কাব্যে "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে" কবিতাটি লেখা হয়। খাঁচা এবং পাখি, সে সঙ্গে দেহতত্ত্বের প্রসঙ্গ,—অনেক সময় হঠাৎ পূর্বোক্ত বাউল কবিতাটির প্রভাব না হোক সাদৃশ্য কিছুটা মনে করিয়ে দেয়। 'গোরা' উপন্যাসের প্রারম্ভেই এই "খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়" বাউলের গানটি একটি বাউলের মুখেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কবির বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সুবিদিত। তাঁর লেখা "বৈষ্ণব কবির গান" প্রবন্ধ ১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'নব-জীবনে' প্রকাশিত হয়। তিনি "মহাজন পদাবলী"র মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ দ্বারা 'পদরত্নাবলী' নামক গ্রন্থ ১২৯২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। শেষ জীবনেও শিশুদের উপযোগী ক'রে একখানি বৈষ্ণব কবিতা-সংগ্রহ সম্পাদন ক'রে প্রকাশের তিনি চেষ্টা করেছিলেন, পাণ্ডুলিপিটি হয়তো "রবীন্দ্র-ভবনে" পাওয়া যেতে পারে। ১২৯৪ সনে তাঁর 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ বেরয় "সমালোচনা" গ্রন্থে। মৈথিলী বিদ্যাপতির ভাষাতেই তিনি রচনা করেছিলেন 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে ১২৯১ সালে প্রকাশিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" কাব্য। তার পরে "সোনার তরীতে" 'বৈষ্ণব কবিতা' এক্ষেত্রে সকলেরই মনে পড়ে থাকবে। ছন্দের দিক দিয়ে জয়দেবের সাদৃশ্য আছে। জীবন-স্মৃতিতে 'পিতৃদেব' অধ্যায়ে কবি লিখছেন : "এক বার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম।······সেই গীতগোবিন্দখানা যে কত বার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।······আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।" পরিণত বয়সেও জয়দেব সম্বন্ধে কবির ঔৎসুক্যের প্রকাশ দেখা যায় চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডের প্রথম চৌধুরী মহাশয়কে লেখা ২ নং পত্রে : "জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখলে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝতে পারচি নে। তার কবিতা

সম্বন্ধে কি বলতে চাও?" ঐ ৩য় পত্রে: "তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম।" কিন্তু কবির হৃদয়ের যোগ বিশেষ ভাবেই ঘটেছিল চণ্ডীদাসের সহজ পদে। বীরভূমেরও যোগটা সেখানেই রয়েছে কবির সহজ খাতের মধ্যে গোড়া থেকে নিহিত।

শেষ দিকে 'খোয়াই' কবিতাতে যেমন ফুটেছে বীরভূমের রুদ্রশুষ্ক কঠোর তান্ত্রিক রূপ, তেমনি তার বিপরীত ছাঁদের মৃদু-মধুর লাবণ্যময় রস-রূপটি ঝলক দিচ্ছে 'পুনশ্চ' কাব্যেরই প্রথম কবিতা "কোপাই"তে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।···
ছিপছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজে নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো,—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

বীরভূমের সাধারণ লোক-জীবনটি সচল হয়ে দেখা দিয়েছে এই কবিতাটিরই শেষ ক'টি লাইনে। কবির উক্তি থেকে বোঝা যায়, ছন্দের নূতন খেলায় কবির কাব্যে গদ্য-কবিতার অভিনব ভঙ্গি প্রবিয়ে দিয়ে শেষ জীবনটিকে তাঁর উৎসাহদীপ্ত ও সৃষ্টি-সমৃদ্ধ করে তুলছে কোপাই, খোয়াই; এখানে কবির উক্তির মধ্যে, আড়ালে থেকে প্রসাদ লাভ করবার কারণ আছে নিশ্চয়ই বীরভূমের-ও কবি লিখছেন:

কোপাই আজ কবির ছন্দকে ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার-গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুকহাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে ক'রে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

বীরভূমের ভঙ্গুর জীবনের জীর্ণতার ছায়া খেলে কবির 'ছড়ার ছবি' কাব্যের "অজয় নদী" কবিতায়:

চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়।

'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের চুয়ান্ন সংখ্যক পত্রে আর এক বার অজয়ের উল্লেখ ক'রে কবি এই সুরেই বলেছেন: "মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখের অজয় নদীর মতো।"

কিন্তু আনন্দের যোগানে অজয়েরও দান কবির খাতায় লেখা আছে। "গল্পসল্প" গ্রন্থের ছুটি লাইনে:

সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে,
সেদিন ছুটির মাতন লাগে অজয় নদীর ধারে।

অজয়ের তীরের পিকনিকের দিনগুলি শান্তিনিকেতনবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তো বটেই, বড়োদেরও অনেকেরই মনে আলো আনবে।

অজয় এবং কোপাই ছাড়াও ময়ূরাক্ষী নদীটি কবির 'বাসা' কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। পুনশ্চের 'বাসা' কবিতায় বলেছেন:

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।—
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

কবিতাটি তাঁর বৌমা প্রতিমা দেবীকে লেখা একখানি ব্যক্তিগত পত্র থেকে গদ্যকাব্যে রূপান্তরিত। চিঠি-পত্র তৃতীয় খণ্ডে পত্রখানি পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ঐ গ্রন্থেরই ৩৮ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য: "ময়ূরাক্ষী নদীটা বোধ হচ্ছে যেন সম্ভবপরতার পরপারে।" বোলপুর ষ্টেশনের কাছাকাছি ৪ মাইলের মধ্যে অজয় এবং কোপাই আর সাঁইথিয়া ষ্টেশনের প্রান্তবর্তী ময়ূরাক্ষী নদী, অনেকেই হয়তো এ পথে ট্রেনে আসতে-যেতে দেখে থাকবেন। ময়ূরাক্ষীর নামোল্লেখ "পথে ও পথের প্রান্তে" গ্রন্থের বিয়াল্লিশ সংখ্যক পত্রেও এক বার করা হয়েছে। সেখানে কবি বলছেন: "নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে, কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী —তাদের সঙ্গে প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ।" সরকারী বাঁধের পরিকল্পনাসূত্রে এই ময়ূরাক্ষীই আজ দেশে পরিচিত। "প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ" তার সঙ্গে আরো পাকা করবার ব্যবস্থা সে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বীরভূমের নদী তিনটির সব ক'টিই (অর্থাৎ অজয়, কোপাই, ময়ূরাক্ষী) কবির সাহিত্যের আসরে অভ্যর্থিত হয়ে ফসল ফলিয়েছে। যদিও কবির উত্তর-বঙ্গের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত নাগর, ইচ্ছামতী, পদ্মা বা কলকাতা ও উড়িষ্যার জীবনের গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদীর স্মৃতির পাশে, আকারে বীরভূমের নদী ক'টি শুষ্ক ও নগণ্য, না-থাকার তুল্য, খালের মতো বললেই যাদের ঠিক বলা হয়, তবু তাদেরই বর্ণনায় আনন্দের তাঁর শেষ নাই, তাদের শূন্যপ্রায় রূপের মধ্যেও তিনি অপরূপ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছেন।

"ভানুসিংহের পত্রাবলী"র কয়েকখানি পত্রেই জানা যায়, কবি পাহাড় তত মন টানে না, যেমন টানে নদী। বলেছেন পঁয়ত্রি সংখ্যক পত্রে: "পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি,—সেখা

গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা ক'রে ধরে এক দল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় এক পাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,—সেই জন্যে বাংলা দেশের বড়ো বড়ো দ্বিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি।"

বোলপুরকে ভালো-লাগার মূল বাস্তব সূত্রটি এখানে পাওয়া গেল। কবির পাহাড় ভালো লাগে না, নদী ভালো লাগে,—কিন্তু নদীও ভালো লাগে 'নদীর ধারে অবারিত আকাশ' মেলে ব'লে। বোলপুরে যদিও শান্তিনিকেতনের ঘনিষ্ঠ সীমায় কোনো নদী নেই, কিন্তু প্রান্তর আছে চারি দিকেই। আকাশের অবারিত সীমা দিয়ে কবিকে বশ করেছে বীরভুম এই প্রান্তরের সুযোগেই।

এই প্রান্তরকে তিনি কত ভালোবাসতেন, বোঝা যায়, তাঁর বিদেশে গিয়ে দূরের থেকে লেখা চিঠিগুলিতে;

চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে ১৯১৩ সনের ৬ই মে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন লণ্ডন থেকে: "ভালো লাগচে না—কেন না আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ উপুড় করে ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে।" দার্জিলিং থেকে ১৯৩১ সনের ২৩ অক্টোবরে ইন্দিরা দেবীকেই আরেক চিঠিতে লিখছেন: "···সমতটের মানুষ, গিরিরাজের উত্তুঙ্গ দরবারে মন পালাই পালাই করে। শান্তিনিকেতনে মাঠের ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকব বলেই পণ করেছিলুম।"

বৌমাকে পিকিং থেকে একখানাতে লিখছেন: "তার পরে ঘুরতে ঘুরতে এক দিন সেই শান্তিনিকেতনের মাঠের ধারে গিয়ে সেই বারান্দায় আরাম-কেদারায় গিয়ে বসব।"—চিঠিপত্র তৃতীয় খণ্ড, ১৫ নং পত্র; ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র ৩৭ সংখ্যক পত্রে আরেক বার বলছেন: "লিখব পড়ব ছবি আঁকব, আমার কাঁকর-বিছানো বাগানে সকালে-বিকালে একটু পায়চারি ক'রে আসব, তার পরে জানলার ধারে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে খোলা আকাশে রঙীন মেঘের সঙ্গে আমার রঙীন কল্পনার মিলন ঘটাব—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি।"

বৌমাকেই জোড়াসাঁকো থেকে এক বার লিখছেন: "বৌমা, পাড়াগাঁ আমার ভালো লাগে কিন্তু নিজের কোণটুকু আমার আরো ভালো লাগে। নিজের জগৎ নিজের হাতে বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করা আমার বরাবরকার অভ্যাস, সেই জন্যে সম্পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ না পেলে দুই একদিনেই হাঁপিয়ে পড়ি। আদর যত্ন সেবা ভালো লাগে না তা নয়, কিন্তু তাতেও জায়গা জোড়ে, মন বাধা পায় তাই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেচে। কালই অপরাহ্ণ চারটের গাড়িতে দৌড় দেব।" এই পত্রের 'পাড়াগাঁ' উল্লেখের সময় বীরভূমের কথাই যে তাঁর সাধারণ নির্দিশেষ সীমার মধ্যেও একটু তখন বিশেষ স্থান অধিকার ক'রেছিল, তা স্বাভাবিক সত্য।

'চিঠিপত্রে'র ৬৪ নং পত্রে মংপু থেকে লিখছেন, "মন রয়েছে বিমুখ···লিখতে বসেছি···থমকে থমকে লেখা। পাহাড় ডিঙিয়ে শরতের বাঁশির সুর এসে পৌঁছচ্ছে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের আলপনা দেওয়া দিগন্ত থেকে এখানকার শৈলমালার স্বপ্নে দেখা আবছায়া নীলিমায়।"

কত জায়গায় কত রকম ক'রে এই প্রান্তর আকাশের রূপকে তিনি ভাষা দিয়েছেন, সুরে ভরিয়েছেন, তা ক্ষুদ্র পরিসরে বলার নয়। এক ভদ্রলোক গল্প করছিলেন, হাওড়া থেকে মধ্যাহ্নে চড়েছেন তিনি বোলপুরের গাড়িতে। কিছু দূর অতিক্রমের পর গাড়িতে এক কোণ থেকে এক যাত্রী-যুবকের কণ্ঠে গান উঠল, "মধ্য দিনে যবে গান"। তার মধ্যে ভদ্রলোক যখন শুনলেন "অম্বর প্রান্তের কোণে, রুদ্র বসি তাই শোনে, মধুরের স্বপ্নাবেশে ধ্যানমগন আঁখি", তখন মুহূর্তে যে ছবিটি অগোচরে মনে খেলে গিয়ে তাঁর চোখ জলে ভরিয়ে তুলল, সে ঐ বীরভূমেরই শান্তিনিকেতন ঘেরা—খোলা নীলাকাশের ধূসর প্রান্তর। সেখানেও কবির বর্ণনা—"হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।" শ্রোতা ভদ্রলোক অবশ্য ছিলেন বোলপুর সহরবাসী। শান্তিনিকেতনের সীমায় যারা চোখ বুলিয়েছেন, তাদের চোখে তালতোড় থেকে বোলপুর-ঠেকা পূব-দিগন্তের রেল-লাইনের প্রান্তটি নিশ্চয়ই ভেসে উঠবে, যখন 'ছড়া' কাব্যের ৫ সংখ্যক কবিতায় তাঁরা পড়বেন;—

মাঠের ধারে ধক্‌ধকিয়ে চলতি গাড়ির ধোঁওয়াতে,
আকাশ যেন ছেয়ে চলে কালো বাঘের রোঁওয়াতে।

বীরভূমে পাহাড় নেই। শান্তিনিকেতনের উত্তরে সুদূর দিগন্তে যে আবছা মেঘের ইশারা দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় এক পাহাড়শ্রেণী রূপকথার দেশের মতো দেখা দেয়, সে সাঁওতাল পরগণায় অধিকারে। পাহাড়-উদাসীন কবির লেখায় তার উল্লেখ বিরল। কেবল 'অচলায়তন' নাটকের মধ্যে বালক সুভদ্রের মুখে শোনা যায়:

"সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানালা খুলে—আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—"

'ডাকঘর' নাটকেও একটি পাহাড়ের কথা আছে, কিন্তু তাতে এমন দিক্ নির্ণীত করা নেই, "অচলায়তন" নাটকের মতো উত্তর দিকের নিশানা দিয়ে পরোক্ষভাবে ঐ পাহাড়কে বীরভূমের সীমা সঙ্গে কোনো দিক দিয়ে যুক্ত করা কঠিন; তবে বিষয়-বিন্যাস, ঠিকানা ও ভাষার মিলের সূত্র ধ'রে ক্ষীণ ভাবে একটু যদি যোগের দাবিতে মাত্র ইঙ্গিত করে রাখতে হয়, তবে অবশ্য সে সুযোগ বীরভূমে বিলক্ষণই আছে বলতে হবে। কেন না "ডাকঘরে"র দ্বিতীয় অংকে দইওয়ালা যখন অমলকে শুধাল:

"দইওয়ালা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনো দিন গিয়েছিলে না কি?" তখন অমলকে বলতে শুনি: "না; কোনো দিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি অনেক পুরোনো কালের বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।— আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব।" বলে রাখা ভালো, গোয়ালপাড়া শব্দটি এখানে নিছক গোয়ালদের পাড়া হিসেবেই ব্যবহৃত।

কিন্তু, এখন বাস্তবকেই দেখা যাক্। কবির শান্তিনিকেতনের আবাস-গৃহ থেকে গবাক্ষপথে উত্তর দিকে পাহাড় দৃশ্যমান। উত্তর দিকে রাঙা রাস্তা চলে গেছে "গোয়ালপাড়া" * নামক গ্রামেরই ভিতর দিয়ে। বহু দূরদিগন্তে সে রাস্তা বেয়ে চলে দৃষ্টি ঠেকে গিয়ে ঐ পাহাড়ের রেখায়। নানা লোকজন যান-বাহনের মধ্যে দইওয়ালারাও ঐ গোয়ালপাড়ার দিক থেকেই ঐ পথ বেয়ে এসে গ্রামে গ্রামে ও বোলপুরের হাটে দই বেচে বেচে বেড়ায়। আর গোয়ালপাড়া ও পিয়ার্সন রাস্তার মোড়ে বুড়ো বটতলায় এসে তারা আশ্রয় নেয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি উঠতেই প্রথমেই যে গোরু-চরা খোয়াই-প্রান্তর পেরুতে হয়, সেখানে গোয়ালপাড়ার মুখে বয়ে-যাওয়া ঝিরঝিরে ঝরণার গা ছুঁয়েই চোখ রেখে যেতে হয়। ডাকঘরের অমলের মতো কবিও কোনো দিন সে পাহাড়ে যাননি। এর সঙ্গে আরেকটুকু তথ্য যোগ ক'রে নিতেও দোষ নেই। 'ডাকঘর' নাটকটি কবির শান্তিনিকেতনেই লিখিত। সুতরাং অতঃপর সীমার মামলায় অসীম কালের দরবারে বীরভূমের পক্ষে দেওয়ানিতে ডিক্রি পাবার আশাটা একেবারে মাঠে মারা না যেতেও পারে।

বিশেষতঃ যখন কবির প্রথম দিকের কাব্য 'খেয়া'-র 'পথের শেষ' কবিতাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পাই :

আঁকা-বাঁকা রাঙা মাটির লেখা
ঘর ছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
প্রভাত কালে অপার পানে চেয়ে
কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
বহু দূরের অরণ্য পর্বত।
নানা দিনের নানা পথিক-চলা
ঘর-ছাড়া এই নানা দেশের পথ।

'বহু দূরের অরণ্য পর্বত' আলোচ্য পর্বতেরই দিকে ইশারা জানাচ্ছে।

'পথের শেষ' কবিতাটি বোলপুরে ১৩১২ সনের ১৪ই চৈত্রে লিখিত। ঐ দিনই বোলপুরেই কবির 'বিদায়' নামক বিখ্যাত কবিতাটিও রচিত হয়েছিল। স্বদেশী যুগের আলোড়ন কাটিয়ে জীবনের একটি বিশেষ পর্ব সমাপন ক'রে কবি সেদিন বিশ্বমুখী সাধনায় এসে শান্তিনিকেতনে আত্মসমাহিত হয়ে বসবার মুখে এই 'বিদায়' কবিতাতেই বলেছিলেন—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তোমার নাই।

জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ স্বার্থসংঘর্ষের নগ্ন বীভৎসতা সেদিন দেশে বিদেশে উগ্রমূর্তিতে দেখা দিয়ে কবিচিত্তকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল তার মধ্যেই আবার নানা পথের স্বীকৃতি ও সমন্বয় সাধনের জন্য বিশ্বের যে পরিস্থিতি বা চিন্তাধারাই সেদিন তাঁর মনে প্রেরণা যোগাক না কেন, অতি নিকটের অব্যবহিত বাস্তব পরিবেশে "আঁকা-বাঁকা রাঙা মাটির লেখা ঘর-ছাড়া ওই নানা দেশের পথ"বাহী বীরভূমের প্রাকৃতিক বিশিষ্টতাও যে কবিকে তাঁর পথের নির্দেশ যোগাতে সহায় হয়েছিল, এ কথা কবির লেখাতেই প্রকাশমান। সুতরাং রবীন্দ্রধারার বাঁকে-বাঁকেই বীরভূমের এরূপ এক-একটি সংযোগ-লেখা যে রহস্যময়রূপে বিদ্যমান রয়েছে, একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে।

পথের প্রভাব কবির মনে সক্রিয় ছিল বহু দিন। ১৩২৮ সনে তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানির রূপান্তর করেন। পাণ্ডুলিপিতে প্রথম তার নাম দেন 'পথ', পরে নাম বদলে 'মুক্তধারা' নাম দিয়ে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ভানুসিংহের পত্রাবলীতে লিখছেন :—"আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'।" প্রায়শ্চিত্ত নাটকের রাঙা মাটির পথের রেখা 'মুক্তধারা'য় অস্পষ্ট হয়ে এলেও, এখানেও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়,—নাট্যস্থলীর উত্তর দিকেই রয়েছে পার্বত্যপ্রদেশ।

প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে যে কয়টি জিনিস বোলপুরে সচরাচর চোখে পড়ে, অন্তত কবির পড়েছে, রাঙা রাস্তা বা এই পথ তার একটি। 'পত্রপুটে' রয়েছে :

উত্তরে গোয়ালপাড়ার রাস্তা,
গোরুর গাড়ি বিছিয়ে দিল গেরুয়া ধুলো
ফিকে নীল আকাশে।

"পুনশ্চের" "ছুটির আয়োজন" কবিতায় রয়েছে :

"গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে রাস্তা গেছে এঁকে-বেঁকে
হাটের পাশে নদীর ধারে,"

অবশ্য 'হাটের পাশ'টা বাদ দিলে, এ . রাস্তার ভৌগোলিক সংস্থান সবটাই বাস্তবে ঠিক মেলে; উল্টো মুখে ঐ রাস্তাই "বোলপুর ষ্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তা।" কবির বাসগৃহের "সামনে দিয়ে ষ্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়

শহরের দাদন-দেওয়া দড়ি-বাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা-ছটা করে"

পুজোর ছুটির দিনে কবি টেনে নিতে দেখেছেন। এই কথাটি পাই 'পুনশ্চ' কাব্যের 'ছুটির দিনে' নামক কবিতায়। দু'বছর পরে চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডের অন্তর্গত শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি

* গোয়ালপাড়া গ্রাম শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন প্রতিবেশী গ্রাম। উত্তরায়ণের ঢালু রাঙা মাটির রাঙা পথের ধারে কোপাই নদীর কোলে অবস্থিত। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের পুঁথি-ভবন বিভাগে মূল্যবান অনেক প্রাচীন পুঁথি, বিশেষ ক'রে 'ধর্মমঙ্গল' এ গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে।' এককালে এ গ্রামে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাস ছিল। সেই সব পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ বহন করে চলতেন। আজো পণ্ডিত-বংশ এ গ্রামে বর্তমান আছে। এখানকার বৈশাখী 'ধর্মপূজা'ও বিখ্যাত। ঐতিহাসিক বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের গবেষণাযোগ্য বহু উপাদানে এ গ্রামের ইতিহাস সমৃদ্ধ। এক দিন শান্তিনিকেতনও "গোয়ালপাড়ার ডাঙা" নামেই সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিল।

ত্রে ঠাট্টা করে লিখছেন: "মাদ্রাজ যাত্রার উপক্রমণিকা চলছে। তার উপরে নানাবিধ খুচরো কাজ। চারি দিকেই ছুটি। কেবল রজোর দালানের পথযাত্রী গলায় দড়ি বাঁধা ছাগল এবং রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই।" "লিপিকা" গ্রন্থের "প্রাণমন" কথিকায় রয়েছে এই পথের খবর: "আমার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।" রূপ আরো কত জায়গায় এই রাস্তাটিই কত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। চমৎকার একটি বর্ণনা মিলে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে ত্রিশ সংখ্যক পত্রে। হাটে না গিয়ে থাকুন, স্থানীয় হাটবারের দিনটির খবর কবি যে রাখতেন, সে তথ্যটুকুও এর মধ্যে লক্ষ্যণীয়:

"ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইষ্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানি নে; এক জনের হাতে ঝুলচে এক থেলো হুঁকো, এক জনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, এক জনের কাঁধে চড়ে বসেছে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। এ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল—অত্যন্ত ছেঁড়া-খোঁড়া রকমের চেহারা।"

বোলপুরের পথের মতো বোলপুরের আরো কয়েকটি জিনিসই কবিকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল, একটি তার তালবনে ঘেরা দীঘি বা বাঁধ, অন্যটি শালবন।

বাঁধ এবং বাঁধের পাড়ির তালবনের ছবি কবির বহু রচনায় অঙ্কিত হয়ে আছে। বিশেষ ক'রে প্রথম দিককার 'খেয়া' কাব্যের একাধিক স্থলে তা দেখা যাবে। নাম ক'রে নির্দিষ্ট না থাকলেও স্থানটি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে সে বর্ণনার লক্ষ্যটি নির্ণয় করতে ঠেকবে না। 'বৈশাখে' কবিতায় আছে:

আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারি বাঁধা তালের বনে।

'ঝড়' কবিতায় লিখেছেন:

তালের তলে শিউরে ওঠে
বাঁধের কালো জল।

'দীঘি' কবিতাতেও এই বাঁধেরই ছায়া ঝলসিত হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই রসের অনুভূতি পথে এই বাঁধটি কবির অন্তর অধিকার করে বসেছিল। এরই আশে-পাশে 'তালের বনের করতালির' সঙ্গে যেখানে

শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,

সেখানটিতেই প্রতিষ্ঠিত কবির শান্তিনিকেতন। তাকে বুকে ক'রে বীরভূম মানুষের জগতে চিরদিন শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হয়ে রইল। শান্তিনিকেতনের শাল বন এক মহাক্ষেত্র।

কবিকে যাঁরা জানতে চান এমন অনুরাগীদের জন্য শেষ দিকের 'সেঁজুতি' কাব্যে 'স্মরণ' কবিতায় কবি বলছেন:

যখন রব না আমি মর্তকায়ায় তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় যেথা এই চৈত্রের শালবন।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে, ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে, রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়। কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায় যেথা এই চৈত্রের শালবন।

বিশেষ এই শালবনটি বীরভূমেরই বুকের বাস্তব সত্তার মধ্যে সীমায়িত, সুতরাং আমরা যত দূরে দূরে গিয়ে দূর দূর দেশে কালে যত ক'রে যত দিক থেকে খোঁজ-খবর নিই না, কবিরই নির্দেশ রয়েছে এই ব'লে যে, এক বার তাঁর এই ঘরের দোরেও আমাদের আগাগোনা করা ভালো। এখানে বসে স্মরণ করলে তবে তাঁকে পাবার সাহায্য স্বভাবের জাদু থেকে সহজ হয়ে আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হবে। যদি ভাব-জগতের পাওয়াতেই পাওয়ার শেষ না হয়, বাস্তব পরিবেশটার দরকারও যদি কিছুটা সে-সঙ্গে অনুভূত হয়, তবে শালবনেরই সঙ্গে বীরভূমের এই পরিচয়টুকুও কিছু সার্থকতা পাবে আশা করি।

বীরভূমে জয়দেবের আছে কেঁদুলি, চণ্ডীদাসেরও আছে নান্নুর, রবীন্দ্রনাথের রইল শালবন। মন্দির নয়, স্তূপ, নয়, সৌধ নয়, সড়ক নয়, দেশীয় পন্থায় কবিকে স্মরণ করা,—এই রকমই একটা কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কবি টেনিসনের জীবনী আলোচনায় 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। জীবন-প্রারম্ভে সে সুদূর অতীতের কথা। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, শালবনের সীমার মায়াতেই কবি মর-জগতের শেষ বাঁধনটুকুতে বাঁধা পড়লেন এই বীরভূমের প্রান্তরেই। এই জন্যই শালবনটির প্রসঙ্গ বিশেষ ক'রেই আমাদের প্রণিধানযোগ্য। কত আগে থেকে এই শালবন তাঁর অনুভূতি এবং রচনার সীমাবর্তী হয়েছে, তার খবর নিলেও আমরা কবির সঙ্গে এর নিগূঢ় এক বিশেষ সম্বন্ধ-সূত্র অবগত হতে পারব।

এই শালবনের সঙ্গে কবির বহু দিনকার এক বন্ধু-স্মৃতি বিজড়িত। সে জন্যই আরো তা প্রিয় ছিল। "বনবাণী" কাব্যের 'শাল' কবিতাতে ভূমিকাংশে ১৩৩৪ সনে বলেছেন: "প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপ-গুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে।...আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধু-সংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি—তেমনি ওই শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুতর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।" কবিতাটিতে 'শাল'কে উদ্দেশ করে বলছেন:—"তার পরে

"দেখতে পাও ? উহুঁ, কিছু দেখতে পাও না।"

একটু থেমে স্তানিন্ বলল, "আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্ত আমি তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করছি এই বলে যে, তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে শীগ্‌গির।"

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মারিয়া আইভানোভ্‌না বলে উঠলেন, "কী ? লীডার বিয়ে হচ্ছে ?—কা'র সঙ্গে ?"

"আহা,—নোভিকফ এর সঙ্গে—"

"তা তো বুঝলুম। কিন্তু স্তারুডিন ?"

"গোল্লায় যাক্ সে!" স্তানিন্ প্রত্যুত্তর করল। "তাতে তোমার কি গেলো-এলো ? অন্তের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যাও কেন ?"

"কিন্তু, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!" উচ্ছ্সিত হয়ে মারিয়া আইভানোভ্‌না বললে, "লীডার বিয়ে হচ্ছে, লীডা—"

নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্তানিন্ বলল, "কি বুঝতে পারছ না ? লীডা এক জনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল, এখন সে আরেক জনের প্রেমে পড়েছে। কালকেই হয়ত অন্ত কারো প্রেমে পড়তে পারে। ঈশ্বর ওর কল্যাণ করুন!"

"কি ছাইভস্ম বকছো ?"—মারিয়া আইভানোভ্‌না রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।

টেবিলে হেলান দিয়ে স্তানিন রাগত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার জীবনে তুমি কি মাত্র এক জনের প্রেমেই পড়েছিলে ?"

"মা'র সঙ্গে কেউ ও-রকম ক'রে কথা কয় না।"

"জীবন তুমিও উপভোগ করেছ;"—স্তানিন্ বলল, "লীডাকে বাধা দেবার অধিকার তোমার নেই।"

"নিজের মা'র সঙ্গেও কথা বলবার মতো ভদ্রতা শেখোনি ?"—মারিয়া আইভানোভ্‌না অতঃপর কি করবেন, তা' ঠিক করে উঠবার আগেই, স্তানিন্ এগিয়ে এসে ওঁর হাত ছ'টো ধরল। এবং বিনম্র ভাবে বলল, "ও কথা নিয়ে আর কিছু ভেবো না তুমি। বরঞ্চ তুমি নজর রেখো স্তারুডিন্ যেন এ-বাড়ীতে আর ঢুকতে না পারে।"

স্তানিন-এর এই কথায় মারিয়া আইভানোভ্‌নার সমস্ত রাগ গ'লে জল হ'য়ে গেল। তিনি স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "লীডা কোথায় ?"

ঠিক এই সময়ে ঝি এসে খবর দিল যে, স্তারুডিন্ এবং আরেক জন কে যেন দেখা করতে এসেছে।

স্তানিন্ বলল, "ওদের ছ'টোকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দাও।"

"আমি তা' পারি না কি ?"—বলেই দাসী ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

মারিয়া আইভানোভ্‌না মুখ উঁচু ক'রে নীচে নেমে গেলেন।

মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে বসবার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে স্তারুডিন এবং তা'র বন্ধু ভলোশিন্ দাঁড়িয়ে ওঁকে নমস্কার করল। কিন্তু ওঁর মুখে একটা কাঠিন্ত লক্ষ্য ক'রে ও মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। ভাবছিল, না এলেই হয়ত ভালো ছিল। ভাবলো: যে কোনো মুহূর্ত্তেই হয়ত লীডা এসে পড়তে পারে। সেই দিনকার পর এই প্রথম লীডার সঙ্গে ওর দেখা হবে। কি রকম একটা অনিশ্চিতের দুশ্চিন্তা!···হয়ত লীডার মা ওদের সব ব্যাপারই জেনে ফেলেছে!···একটা সিগারেট ধরালো।···অকারণেই ইতস্তত: তাকালো।

গৃহকর্ত্রী ভলোশিন্‌কে প্রশ্ন করলেন, "অনেক দিন থাকবেন না কি ?"

"না, তেমন আর কি!" শহরের আভিজাত্য নিয়ে মফঃস্বলের প্রশ্নের উত্তর দিল ভলোশিন্।

আলোচনা এগিয়ে চলল প্রাণহীন নিষ্প্রাণ ভাবে। দু'পক্ষই যথাসাধ্য ভদ্রতার মুখোস এঁটে বসেছিল। ভলোশিন্ উশখুশ করছিল। চোখের একটা ইঙ্গিত করল স্তারুডিনকে। স্তানিন এদের আলোচনায় কোনো অংশ গ্রহণ না ক'রে বসে বসে সব লক্ষ্য করছিল।

স্তারুডিন্, নিজের বাহাদুরীটা পাছে ভলোশিন্-এর কাছে খাটো হয়ে যায়, এই আশংকায়, আর থাকতে না পেরে, মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীমতী লিডিয়া পেট্রোভ্‌নাকে দেখছি না যে!"

মনে মনে বললেন, আবাগীর ব্যাটা, তোর তাকে কি দরকার তোর সঙ্গে তো আর তা'র বিয়ে হচ্ছে না!'—কিন্তু মুখে বললেন মারিয়া, "কি জানি, বোধ হয় ওর নিজের ঘরে রয়েছে!"

ভলোশিন্ বলল, "আপনার মেয়ের সম্বন্ধে এত সুখ্যাতি শুনেছি যে,—এক বার পরিচিত হবার সৌভাগ্য পাব বলে আশা করেছিলুম।'

মারিয়া আইভানোভ্‌না মনে মনে যুগপৎ বিরক্ত এবং আশ্চর্য হয়ে উঠছিলেন এদের ধৃষ্টতা দেখে। স্তানিন্ ভাবল, যদি আরো সময় এদের বসতে দেওয়া হয়, তাহলে লীডা ও নোভিকফ,—দু'জনেরই অমংগল ছাড়া আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই।

"শুনছি,"—হঠাৎ স্তানিন্ বলে উঠল,—"আপনারা শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,"—স্তারুডিন জবাব দিল,—"এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে তো মর্‌চে ধ'রে যাবে!"

স্তানিন্ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। এতক্ষণ ধ'রে সবাই মিলে যে আলোচনা করছিল তা'র কৃত্রিমতায় স্তানিন্ ভারী মজা উপভোগ করছিল। কুর্শিভরে, দাঁড়িয়ে উঠে, ও এবার বলল, "বেশ, বেশ! আমার মনে হয়, আপনারা যত শীঘ্রই যাবেন ততই ভালো।"

চোখের নিমেষে যেন প্রত্যেকের মুখ থেকে মুখোসের ভারী আবরণ খসে পড়ল! মারিয়া আইভানোভ্‌না পাণ্ডুর হয়ে উঠলেন, ভলোশিন্-এর চোখে পশুর মতো ভয়ের প্রকাশ, স্তারুডিন্ উঠে দাঁড়ালো। বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ও কথা বলবার মানে ?"

স্তানিন্ ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না; হাতে ক'রে ভলোশিন্-এর হ্যাট্‌টা বাড়িয়ে দিল।

স্তারুডিন্ ক্রুদ্ধ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কি বললেন আপনি ?"—মনে মনে বলল, 'একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে দেখছি।'

ঠিকই বলেছি।"—স্তানিন্ জবাবে বলল। "এখানে আপনাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আপনারা চলে গেলেই আমরা খুসী হবো।"

শেকলে বাঁধা একটা বন্য পশুর মতো স্তারুডিন্ কেঁপে উঠল। "তাই না কি ?"—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল।

"বেরিয়ে যান—"স্তানিন্ অনতি-উচ্চ কণ্ঠস্বরে বলল।

ভলোশিন্ দরোজার দিকে পা বাড়ালো।

দরোজার কাছে লীডা দাঁড়িয়ে।

সাদাসিধে বেশভূষা, মুখে হাসির আভা,—অবিকল স্তানিন্-এর মতো ওকে দেখাচ্ছে! মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠস্বরে সুধা ঢেলে ও বলল, "এ কী ভিক্‌টর সার্গেজেভিচ্, চললেন কেন? এই তো আমি এসে গেছি।"

অবাক্ হয়ে স্তানিন্ ওর মুখের দিকে তাকালো। 'কি মৎলব ওর?'—ভাবল মনে মনে।

তিক্ত মনোভাব, অবিশ্বাস এবং ভদ্রবেশী ভণ্ডামীর আলোচনায় পূর্ণ ঘরের ঝোড়ো আবহাওয়াটা মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন শান্ত হয়ে গেল।

স্যারুডিন্ তোৎলাতে তোৎলাতে বলল, "জানেন লিডিয়া পেট্রোভ্‌না—"

নাটকীয় ভঙ্গিতে, যেন কোনো রাণী কথা বলছে—এমনি ভাবে লীডা বলল, "আমি কিছু জানতে চাই না।..." তার পর খানিকটা থেমে বলল, "কই—" স্যারুডিন-এর দিকে তাকিয়ে,—"এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না?"—ভলোশিন্‌কে দেখিয়ে বলল।

"ভলোশিন্,—পাভেল্ ল্যাভিশ্..." স্যারুডিন্-এর জিহ্বার জড়তা তখনও যায়নি। নিজের মনে আপশোষ করল স্যারুডিন্, 'হায়, হায়, এই মেয়েটাই এক দিন আমার নর্ম্মসহচরী ছিল!'—

লীডা মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে কে ডাকছে যেন—।"

মারিয়া আইভানোভ্‌না প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করবার সাহস পেলেন না। গুড়িসুড়ি মেরে বেরিয়ে গেলেন।

"বড্ড গরম। বাগানে চলুন না"—লীডা বলল।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ ওর পেছু-পেছু সবাই গিয়ে বাগানে উপস্থিত হোল। লীডাই আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করছিল। অবশ্য আজে-বাজে সব কথা,—মনের অস্থিরতা চাপা দেবার প্রবল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু যে ক'টি কথাই বলল, ভলোশিন্-এর সঙ্গেই। ওর ব্যবহারে ভলোশিন্-এর একটুও মনে হোল না যে, স্যারুডিন্-এর সঙ্গে ও কখনো প'টে গিয়েছিল।

মন্থর নিরাসক্ত আলোচনা দীর্ঘকাল চালানো যায় না। স্যারুডিন্-এর সহ্যের সীমা অতিক্রান্তপ্রায় হয়ে আসছিল। লীডার হাসি, ওকে গোচরীভূত না করার প্রয়াস,—লীডার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা স্যারুডিন্-এর কানে যেন ঘৃষি-বর্ষণ করছিল। অসহ্য বোধ করল স্যারুডিন্। এক সময়ে, থাকতে না পেরে ব'লে উঠল, "এবার উঠি তা' হ'লে!"

"সে কি, এরই মধ্যে?"—লীডা প্রশ্ন করল।

ভলোশিন্,—নাগরিক ভলোশিন্—লীডার কথাবার্ত্তায় বেশ খানিকটা প্রশ্রয়ের সুর লক্ষ্য করেছিল। ভাবল: মেয়েটাকে হাত করা খুব কষ্টকর হবে না দেখ্‌ছি। তাই, স্যারুডিন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বলল, "ওর মেজাজটা ঠিক নেই কি না, তাই আর বসতে পারছে না।"

ওরা চলে গেলে পর লীডা আবার ওর চেয়ারে বসল। দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

স্তানিন্ এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কি হয়েছে? তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কাঁদছ কেন?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লীডা বলল, "ভালো মানুষ কি পৃথিবীতে নেই?"

স্তানিন্ হাসলো।

"না, নিশ্চয়ই নেই। মানুষের প্রকৃতি অতি নীচ। তা'র কাছে কোনো ভালো কিছু আশা কোরো না।...সে যা ক্ষতি করবে তোমার, তা' নিয়ে মন খারাপ কোরো না।"

অপরূপ, অশ্রুভরা চোখ মেলে লীডা প্রশ্ন করল, "তোমার চার পাশে যারা আছে, তাদের কাছে কোনো ভালো প্রত্যাশাই তুমি করো না?"

"না, কখনোই না।" স্তানিন্ উত্তরে বলল, "আমি নিঃসঙ্গ।"

আঠারো

পরের দিন স্তানিন্ বাগানে গাছের গোড়া পরিষ্কার করছিল, এমন সময় সংবাদ এলো দু'জন অফিসার এসেছেন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আশ্চর্য্য হবার কথা নয়। স্যারুডিন্ ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারে এ রকম একটা ধারণা ওর হয়েছিল।

'গাধা, নীরেট মুখ্যু!'—মনে মনে স্যারুডিন্ ও তা'র সহকারীদের উদ্দেশ্যে বিশেষণপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করতে করতে ও বসবার ঘরে এগিয়ে গেল।

ধোপ-দুরস্ত পোষাক প'রে টানারফ, এবং ফন্ ডীজ বসেছিল, ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে স্তানিন্ ওদের অভ্যর্থনা করলে।

ভূমিকা না করে', টানারফ,—মুখস্থ বুলি আউড়ে গেল,—"আমাদের বন্ধু ভিক্‌টর সার্গেজেভিশ স্যারুডিন্—আপনার ও তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারের আলোচনার জন্য আমাদের দু'জনকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।"

"হুঁ!"—কপট গাম্ভীর্য্য নিয়ে স্তানিন্ উচ্চারণ করল।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে টানারফ, বলে চলল, "তাঁর প্রতি আপনার ব্যবহার...মোটেই...হুম্..."

"তা' আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।"—ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে স্তানিন্ ওকে বাধা দিল।

"ব্যবহার...মোটেই...—ও-সব কথার কাজ না; আমি তাকে প্রায় লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—এই হচ্ছে ঠিক কথা।"

টানারফ, সে কথায় কান না দিয়ে বলল, "মশাই, তিনি চান আপনি কথার প্রত্যাহার করুন।"

স্তানিন্ হেসে ফেলল। "প্রত্যাহার কর্‌ব! কি ক'রে তা সম্ভবপর? খাঁচার ছাড়া-পাওয়া পাখীর মতোই তো কথা, তাকে ফেরাবো কি ক'রে?"

"ঠাট্টার কথা নয়," টানারফ, বলল, "আপনি প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন কি ন'ন?"

স্তানিন চুপ ক'রে ভাবছিল, 'গো-মূর্খ কোথাকার!' একটা চেয়ার টেনে বসে স্তানিন্ বলল, "স্যারুডিন্‌কে খুসী করতে বা শান্ত

করতে হয়তো আমি প্রত্যাহার করতাম। যা' বলেছিলাম তা'কে, তা'র ওপর আমি কোনো গুরুত্ব দেই না। কিন্তু প্রথমতঃ, তাতে বিপরীত ফল হ'বার সম্ভাবনা আছে; আমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পেরে,—নীরব না থেকে, স্যারুডিন্ হয়ত এই প্রত্যাহারের কথা নিয়ে বক্‌বক্ ক'রে বেড়াবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি স্যারুডিন্‌কে যার পর নাই অপছন্দ করি। সুতরাং আমার পক্ষে প্রত্যাহার করবার কোনো অর্থই হয় না।"

টানারফ—"বেশ, তা হলে···"

এই লোকটাকে স্যানিন্ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। বাধা দিয়ে বল্‌ল, "বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু, একটা কথা শুনে রাখুন; স্যারুডিন্-এর সঙ্গে লড়াই করবার আমার মৎলব নেই।"

টানারফ এবং ফন্ ডীজ, দুজনেই দারুণ বিস্মিত হোল। তাচ্ছিল্যের সুরে টানারফ, জিজ্ঞাসা করল, "কেন, দয়া ক'রে বলবেন কি?"

উচ্চৈঃস্বরে স্যানিন হেসে ফেলল। বলল, "শুনুন তা' হলে। প্রথমতঃ, স্যারুডিনকে খুন করবার ইচ্ছা আমার নেই; আর দ্বিতীয়তঃ, তা'র হাতে আমার প্রাণ খোয়াতে তো নয়ই।"

ঘৃণাপূর্ণভাবে টানারফ, বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু-টিন্তু নয়; আমার মত নেই, বাস্। কারণ দর্শাবার মাথা-ব্যথা আমার নেই। আর সেটা আশাও করবেন না।"

"অবশ্য সেটা আপনার বিচার্য্য। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—"

স্যানিন্ হেসে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু স্যারুডিন্ যেন আমাকে স্পর্শও করতে না আসে। যদি ক'রে, তা' হলে তাকে রাম-ঠ্যাঙানী দেব, বুঝলেন?"

"দেখুন,—"ফন্ ডীজ রাগে যেন ফেটে পড়ল। "আমাদের নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। এ আমি সহ্য করব না।···শুনুন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অস্বীকার করার মানে কি, জানেন না?—"

স্যানিন্ প্রশান্ত ভাবে ওর রেগে-লাল-হওয়া মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে বল্‌ল, "আর এই লোকটাই কি না নিজেকে টলষ্টয়ের অনুরাগী বলে বড়াই করে!···শুনুন মশাইরা, আপনারা যা খুসী মনে করবার করুন গিয়ে, আর স্যারুডিন্‌কে বলবেন—সে একটি আস্ত গাধা।"

ফন্ ডীজ তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে বল্‌ল, "আপনার কোনো অধিকার নেই এ কথা বল্‌বার।—"

টানারফ ওকে বল্‌ল, "চলুন—"

"না,···কী আস্পর্দ্ধা—" ফন্ ডীজ গজ গজ করতে লাগল।

•

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ শেষ। স্তিমিত সূর্য্যরশ্মিতে আসন্ন সন্ধ্যার আভাষ। ধূলি-ধূসর শহরের পথে স্যানিন্ চলেছে আইভানফ্-এর বাড়ীর দিকে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে স্যানিন্ বল্‌ল, "শুনেছ, একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে!"

আইভানফ, হাতে ক'রে কাগজ মুড়িয়ে সিগারেট্ বানাচ্ছিল। স্যানিন্-এর কথায় বল্‌ল, "ভারী মজা তো! কা'র সঙ্গে? কেন?"

"স্যারুডিন্-এর সঙ্গে। আমি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলাম, আর তাতে সে অসম্মানিত বোধ করেছে।"

"ওহো! তাহলে তো তোমাকে লড়তেই হবে!" আইভানফ্ বলল, "আমি তোমার সহকারী হব। তা'র নাকটা গুলী মেরে উড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

"কেন? শরীর-সংস্থানে নাকের মূল্য খুব বেশি, তা' জানো?" স্যানিন্ বল্‌ল। "আমি লড়াই করবই না।"

আইভানফ মাথা নেড়ে বল্‌ল, "তা ঠিক্। দ্বন্দ্বযুদ্ধটা নিতান্তই অনাবশ্যক।"

"কিন্তু আমার বোন লীডা তা' মনে করে না।"

"কারণ, তোমার বোন একটি পাতিহাঁস।" আইভানফ্ বল্‌ল, "মানুষ যে কত রকম আহাম্মুকীই বিশ্বাস করে!"

শেষ সিগারেটটা মুড়ে রেখে আইভানফ, দাঁড়ালো। "কোথায় যাওয়া যায়?"

"চলো, সোলোভিচিক্-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"—স্যানিন্ বল্‌ল।

"উঁহু; না।"

"কেন না?"

"ওকে আমার পছন্দ হয় না। ও একটা পোকা।"

"আর পাঁচ জনের চেয়ে খারাপ নয়।···চলো।"

সোলোভিচিক্ বাড়ী ছিল না! তাই ওরা শেষ অবধি শহ বুলভারে গেল। সেখানে দেখা পেলো ডুবোভা, শাফ্‌রফ, ইউরা সোলোভিচিক্,···অনেকেরই। ওর বাড়ীতে ওরা গিয়েছিল শু সোলোভিচিক্ খুব বিনয় প্রকাশ ক'রে বলল, "এ আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনারা আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। আ জানলে আমি নিশ্চয় বাড়ী থাকতুম।"

ওরা কথা-বলাবলি ক'রে এগোচ্ছিল, পাশের রাস্তা থে বেরিয়ে এলো টানারফ, ভলোশিন্ এবং স্যারুডিন্। স্যানিন্‌ই ওদে আগে দেখতে পেয়েছিল। স্যানিন লক্ষ্য করল স্যারুডিন্ ও এখানে দেখতে পাবে এ আশা করেনি, ওর মুখে-চোখে তাই এক অস্বস্তির ভাব। সুশ্রী মুখখানায় ওর কে যেন কালী মাখিয়ে দিল!

আইভানফ, ভলোশিন্-এর দিকে চোখ রেখে বল্‌ল, "বদমাস এখানেও জুটেছে!" ভলোশিন্ ওদের দেখেনি; সীনা ওদের আ আগে চল্‌ছিল—তা'র দিকেই ওর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ।

স্যানিন্ হেসে উঠে বল্‌ল, "তাই তো রে!"

স্যারুডিন্-এর মনে হোল স্যানিন্-এর এ-হাসি ওকেই লক্ষ ক'রে;—কে যেন সপাং ক'রে ওর গালে চাবুক মারলো! এ দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে অন্ধপ্রায় হয়ে ও এগিয়ে এলো স্যানিন্-এর দিকে।

স্যারুডিন-এর হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক ছিল, স্যানিন্ তা' ওপর লক্ষ্য স্থির ক'রে তাকালো; বল্‌ল মনে মনে: কী চায় ও?

বিকৃত কণ্ঠস্বরে স্যারুডিন্ বল্‌ল, "আপনার সঙ্গে একটু কথ বলতে চাই।···আমার চ্যালেঞ্জ পেয়েছিলেন?"

ওর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়া-চড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে স্যানিন বল্‌ল, "হ্যাঁ।"

"আর, আপনি অস্বীকার করেছেন···মানে···কোনো ভদ্রলোকই যা' কল্পনাও করতে পারে না"···স্যারুডিন্-এর হাতের মুঠোয় ঘাম জমে উঠছিল। বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদের জানা-শুনা সবাই ওদের চারি দিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। একটা অনিশ্চিত আশংকার ছায়া ওদের প্রত্যেকের মুখে-চোখে।

চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত প্রশান্ত ভাবে স্যানিন্ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করি ডুয়েল লড়তে।"

স্যারুডিন্-এর দম আটকে আসছিল! ওর বুকের ওপর যেন এক জগদ্দল পাথর চাপা পড়েছে। বলল, "আমি আরেক বার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি,—আপনি ডুয়েল লড়তে অস্বীকার করছেন?"

সোলোভিচিক্ ভয়ে ঘাবড়ে গেল! স্যারুডিন্ পাছে স্যানিন্কে মেরে বসে, তাই সে এগিয়ে গিয়ে স্যানিন্কে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো! বলল, "কী হচ্ছে এ-সব?"

স্যারুডিন্ ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

স্যানিন্ আগের মতোই শান্ত স্বরে জবাব দিল, "আমি সে কথা তো আগেই বলেছি।"

স্যারুডিন্-এর চারি দিকের দৃশ্যবস্তু বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে। কী করছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু না ভেবেই সে চাবুকটা উঁচু করল। একটা মেয়ে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে স্যানিন্ ওর মুখের ওপর ঘুঁষি মারল।

অজ্ঞাতেই আইভানফ্ বলে উঠল, "বেশ!"

ঘুঁষির বেগ সামলাতে না পেরে স্যারুডিন্ পড়ে গেল। ওর চোখের দৃষ্টি লুপ্ত হোল, মুখের বাঁ দিকটা ফুলে উঠল, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু করল।

ইউরাই ও শাফ্‌রফ্ ছুটে গেল স্যানিন্-এর দিকে। ভলোশিন্-এর নাক থেকে প্যাঁশনে চশমাটা ছিটকে পড়ে গেল,—ঊর্দ্ধশ্বাসে ও ছুটল উল্টো-মুখে। টানারফ্ও দাঁত কড়মড় করে' ছুটে আসছিল, কিন্তু আইভানফ্ ওর কোর্টের কলারটা চেপে ধ'রে ওকে নিবৃত্ত করল। "কী ভয়ানক!"—শব্দ ক'টা উচ্চারণ ক'রে সীনা কার্সাভিনাও সরে পড়ল ওদের সামনে থেকে।

"কাপুরুষ!"—ইউরাই স্যানিন্-এর মুখের ওপর চীৎকার করে উঠল।

"কাপুরুষ!" স্যানিন্ বলল ঘৃণামিশ্রিত ভাবে—"আমি না মেরে ও মারলেই বোধ হয় ভালো হোত!"

একটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে স্যানিন্ দ্রুত পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করল।

কয়েক মিনিটের ঘটনা;—কিন্তু এরই মধ্যে স্যারুডিন্-এর জীবনে যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। হাসির মুখোস খসে প'ড়ে দেখা দিল যেন একটা পশুর বীভৎস মূর্ত্তি।

টানারফ্ ওকে একটা গাড়ীতে ক'রে বাড়ি নিয়ে গেল। সারাটা পথ স্যারুডিন্ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল, যদিও ওর চেতনা নষ্ট হয়নি। ওর মনে হোল, পথের দু'পাশের কৌতূহলী চোখ মেলে যারা ওর দিকে তাকাচ্ছিল, তারা যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে। ও ইচ্ছা করেই চোখ বুজে পড়ে রইল। সব চেয়ে ওর বিশ্রী লাগছিল টানারফের উপস্থিতি। এই টানারফ্,—যাকে ও কোনো সময়েই সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে মনে করত না, সেই কি না শেষ অবধি স্যারুডিন্-এর অপমানে লজ্জাবোধ করবে! ছিঃ ছিঃ,—এর চেয়ে মরণও স্যারুডিন্-এর পক্ষে ভালো ছিল।

ধরাধরি ক'রে ওকে টানারফ্ এবং আর্দালীটা বিছানায় শুইয়ে দিল। ডাক্তার ডাকার প্রস্তাবে স্যারুডিন্ ঘোরতর প্রতিবাদ করল। ও চায় না যে কেউ এসে ওর এই কলঙ্কিত ঘটনার খবর শুনুক।

টানারফ্-এর মনে হঠাৎ একটা বিরক্তি ও ঘৃণা স্যারুডিন্-এর জন্য দেখা দিল। ও যেমন এক দিকে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল এই ভেবে যে, কেন ও নিজে স্যানিন্কে আঘাত করল না। ওর নিজের কাছে রিভলভার ছিল, ইচ্ছে করলে স্যানিন্কে সাবাড় করেও দিতে পারত! কিন্তু কেন যে ও তা করতে পারল না, এমন কি—স্যারুডিন্কে মারবার পরেও স্যানিনের গায়ে হাত অবধি তুলতে পারল না, এই ভেবে ও যেমন আশ্চর্য্য হচ্ছিল, তেমনই নিজের ওপর ওর ধিক্কার আসছিল। অন্য দিকে ও খানিকটা খুসীই বোধ করছিল। স্যারুডিন্-এর কাপ্তানী ওকে বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হোত, কিন্তু স্যানিন্-এর কাছে আজকে মার খাওয়ার ফলে স্যারুডিন্-এর যে অপমান হোল, তাতে ও খানিকটা খুসীই বোধ করল। এখন অফিসারদের আড্ডায় গিয়ে কলাও ক'রে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনা বার জন্য উসখুস্ করতে লাগল। স্যারুডিন্-এর কাছে থাকাটা এখন বিরক্তিজনক।

কটাক্ষে তাকিয়ে দেখল স্যারুডিন্-এর চোখ বোজা। বোধ হয় ঘুমিয়েছে। চুপি-চুপি ও দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ স্যারুডিন্ চোখ মেলে তাকালো। পরস্পরের চোখে চোখ পড়ল। টানারফ্-এর উদ্দেশ্য স্যারুডিন্ বুঝতে পারল। ও আবার ঘুমোবার ভাণ ক'রে চোখ বুজল। টানারফ্ নিজেকে বোঝালো এই বলে যে, স্যারুডিন্ ঘুমিয়ে আছে। মাথা নীচু ক'রে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সেই কয়েকটি মুহূর্তের ভেতর ওদের দু'জনের এত দিনকার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গুঁড়ো হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেল। দু'জনেই বুঝলো—এই ভাঙা বন্ধুত্ব আর কোনো দিন জোড়া লাগবে না।

স্যারুডিন্ তা'র ঘরের কৌচের ওপর পড়ে' রইল—নির্বান্ধব, একাকী। ওর আরদালী চা, খাবার, পানীয়,—জলপটি সবই দিয়ে গেল; মাঝে-মাঝেই এসে তদারক করেও যেতে লাগল; কিন্তু স্যারুডিন্ মনের ভেতর একটা দুঃসহ নির্জ্জনতা অনুভব করল। এক সময় সে আরদালীকে একটা আরসী নিয়ে আসতে বলল।

আরসীতে নিজের মুখ দেখা মাত্রই স্যারুডিন-এর গলা থেকে একটা ব্যথিত কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে এলো। কী বিশ্রী আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে মুখটা! একটা দিক হয়ে উঠেছে কালো ও নীল, চোখ ফুলে গেছে,···

ফুঁপিয়ে উঠল স্যারুডিন্।

আরদালীটা যে ওকে এতটা সহৃদয় সেবা করছে এটা স্যারুডিন্-এর

মনের বাঁধ ভেঙে দিল। এ ছাড়া আর কেউই নেই আজকে যে কি না ওকে একটু দরদের চোখে দেখে। পায়ের কাছে স্যারুডিন্-এর কুকুরটা মুখ তুলে বসে আছে।

চোখ ফেটে জল এলো স্যারুডিন্-এর।

জানালা দিয়ে যেন তারা-ভরা রাতের আকাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ভয় করতে লাগল ওর।

"জীবন ব্যর্থ হয়েছে আমার!"—ভাবল স্যারুডিন্। "দুর্ব্বহ এই জীবন। সব শেষ হয়ে গেল! সব? কেন?—অপমানিত হয়েছি ব'লে? কুকুরের মতো আমাকে মুখের ওপর মেরেছে!···"

চোখের ওপর ওর ভেসে উঠ্‌ল সন্ধ্যার ঘটনাটা—আনুপূর্ব্বিক।

"ডুয়েল লড়বার চ্যালেঞ্জ যদি ও গ্রহণ করত!···হয়ত আমার মাথায় ওর রিভলবারের গুলী বিঁধত! আরো কষ্টদায়ক হোত অবশ্য।···কিন্তু লোকের কাছে আমি এতটা ছোট হয়ে যেতাম না। বন্ধু-বান্ধবরা আমার প্রশংসাই করত।···এখন!···না, আমার পক্ষে রেজিমেণ্ট ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই!···

"আমার হাতে চাবুক ছিল। কেন মারলাম না ওকে? আমিই তো আগে ওকে মারতে পারতাম! ওর ঘুষি তুলবার আগেই আমার মারা উচিত ছিল। কী ভুলটাই করেছি! ফলে কি হোল? এই অপমান···

"না, আর কোনো পন্থাই নেই। সবাই দেখেছে। দেখেছে আমার মুখের ওপর কি রকম মারল, আর আমি মাটিতে পড়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম! না, সারা জীবনেও আমি এ কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাব না।···আর আমি স্বাধীন রইলাম না। আমাকে সৈন্য-বিভাগের চাক্‌রী ছাড়তেই হবে।···"

ডানা-কাটা পাখীর মতোই ওর চিন্তাধারা একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে পড়তে লাগল,—অপমানবোধ এবং রেজিমেণ্ট ছেড়ে দিতে হবে,—এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে।

ওর মনে পড়ল, একবার একটা মাছি সিরাপের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে সে পা টেনে-টেনে চল্‌ছিল···

এই রকম ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হবে?

এই মুহূর্ত্তে, কতো লোক আনন্দে, হল্লায় মজগুল হয়ে রয়েছে। আর, নির্বান্ধব, অন্ধকারে একাকী ও দিশাহারা, চিন্তায় ও বিভ্রান্ত। এক জন কেউ নেই ওর, যে কি না এই দুঃসময়ে ওর কাছে এসে বসে। পরিচিত মুখগুলোকে ও মনে করবার চেষ্টা করল। মনে হোল, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাণ্ডুর তাদের মুখ, ওর অপমানে ঠোঁটে তাদের চাপা-হাসি।

লীডাকে মনে পড়ল। শেষ যেদিন লীডা ওর কাছে এসেছিল সেদিনকার স্মৃতি। হাল্‌কা একটা ব্লাউজ ছিল ওর গায়ে; উচ্ছল কোমল স্তনরেখা তা'র আড়ালে সুস্পষ্ট। কোনো ঘৃণা বা ঈর্ষার চিহ্ন মাত্রও ছিল না তা'র মুখে; শুধু একটা কাকুতিপূর্ণ নালিশের অ-বলা বাণীর আভাষ। মনে পড়ল, ওর চরম দুঃসময়ে ওকে কি রকম অবহেলায় ত্যাগ করেছিল। লীডাকে হারিয়েছে এই চেতনা ওকে ছুরীর ফলার মতো আঘাত হান্‌লো। স্যারুডিন্-এর দুঃখ বা কষ্ট লীডার সঙ্গে তুলনাই হয় না।

"আমার চেয়ে কতো বেশিই না কষ্ট পেয়েছে ও···আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি···সে ডুবে মরুক এই আমি চেয়েছিলাম; তা'র মৃত্যুকামনা করেছিলাম।"

নিমজ্জমান লোক যেমন শেষ তৃণখণ্ডেও আশ্রয় পেতে চায়, স্যারুডিনও তেমনি সমগ্র অন্তরাত্মা প্রসারিত ক'রে দিল লীডার দিকে। একটু আদর, একটু সহানুভূতি···ওর সমস্ত কষ্ট অপমান দৈন্য—সব নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায় তা'হলে। কিন্তু, এ স্বপ্ন শুধু অলীক স্বপ্ন; স্যারুডিন্ জানে, লীডা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না,—আসবে না। আজ স্যারুডিন্-এর সামনে রয়েছে শুধু এক অতলস্পর্শী অন্ধ গহ্বরের বিস্তৃতি!

এক হাতে ভর ক'রে স্যারুডিন্ কাৎ হয়ে উঠবার চেষ্টা করল। অন্য হাতে কপাল টিপে ধরল: অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। না, না, কিছু শুনতে চায় না স্যারুডিন্, কিছু দেখতে চায় না! অসহ্য এই অনুভূতি। উঠে দাঁড়ালো স্যারুডিন্; তার পর টল্‌তে-টল্‌তে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে।

"সব হারিয়েছি আমি, সব, সব; আমার জীবন, লীডা, সব কিছু!"

বিদ্যুতের ঝলকের মতো ওর মনে নিজের জীবনের সত্যিকার রূপ ভেসে উঠল। মন্দ, অসুখী, অসুস্থ; হীন, বিকৃত, বুদ্ধিহীন। খাসা চেহারা স্যারুডিন্-এর, জীবনের শ্রেষ্ঠ সব-কিছুরই ওপর ওর দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, গ্রহবৈগুণ্যে তা' হয়ে উঠল না; আর হবেও না কোনো দিন। সারা জীবন এখন ওকে একটা মানুষের শরীর ও মনের কঙ্কাল, বেদনা ও অসম্মানের ভেতর দিয়ে বয়ে বেড়াতে হবে।

"এ-ভাবে আমি বাঁচতে পারব না," ভাবল স্যারুডিন্, "ও-ভাবে বাঁচা মানে আমার অতীতকে নিঃশেষে মুছে ফেলা। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে হবে, সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে আমাকে; আমাকে দিয়ে তা' হবে না!"

মাথাটা ওর ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর।

নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতির শিখাটা কেঁপে-কেঁপে ওর নিশ্চল দেহের ওপর ক্ষীণ আলো ছড়াতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

শারদা

"শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে—
বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

মানিকগাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় এ কি নাচের ভঙ্গিতে—
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।"—রবীন্দ্রনাথ

কনফুসিয়াসের জীবনী ও বাণী

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন চীনের সংস্কৃতি কনফুসিয়াসের চিন্তাধারায় উর্ব্বর হয়ে উঠেছিল। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটা মূল্যবান কথা বলে গিয়েছেন, মানুষের ইতিহাসে সে কয়েকটা কথা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কনফুসিয়াস শাণ্টাং নামক একটা চীনা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, তাঁর জন্মের তারিখ হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫২ অব্দ। কনফুসিয়াসের পিতা ছিলেন এক জন বৃদ্ধ সৈনিক। বলা হয়েছে, সত্তর বৎসর বয়সেও যখন কনফুসিয়াসের পিতা কোন পুত্রসন্তান লাভ করেননি, তখন তিনি নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের কথা চিন্তা করে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, কারণ একমাত্র নিজের ছেলে ছাড়া আর কোন ব্যক্তি এই ক্রিয়া সম্পাদন করবার উপযুক্ত অধিকারী নন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁর নয়টি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। শুধু তাই নয়। জনৈকা উপপত্নীর গর্ভে তাঁর দু'টো ছেলেও ছিল। অথচ শাস্ত্রানুসারে এদের পিতার শেষানুষ্ঠান কিম্বা পারিবারিক পূজার অধিকার ছিল না। তাই বৃদ্ধ সৈনিক তাঁর প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করতে চাইলেন এবং দ্বিতীয় বার বিয়ে করবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, কনফুসিয়াসের পিতা প্রাচীন কুং-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, এই বংশটি না কি খুবই সম্ভ্রান্ত ছিল। তাই কনফুসিয়াসের পিতা দ্বিতীয় বার এমন এক বংশের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন, যেটার মর্য্যাদা তাঁর নিজের বংশের মর্য্যাদার সমান। এই বাসনা নিয়ে তিনি ইয়েন-বংশের জনৈক ভদ্রলোকের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোকের তিনটি মেয়ে ছিল। তিনি মেয়েদের বৃদ্ধ সৈনিকের বাসনার কথা জানালেন। পিতার কথা শুনে প্রথম দু'টো মেয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু চিং-শে নামক তৃতীয় মেয়েটি বৃদ্ধ সৈনিককে বিয়ে করতে রাজী হল। মেয়েটির বয়স ছিল আঠার বৎসর। এই পত্নীর গর্ভে বৃদ্ধ সৈনিকের যে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল সে সন্তানটি সমস্ত জগতের কাছে কনফুসিয়াস নামে পরিচিত। চীনে এই মর্ম্মে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে এক পাহাড়ের গুহায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, যখন কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন চীনা সমাজে শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় লেগে থাকত। রাজকর আদায়কারীদের অত্যাচারে প্রজাদের জীবন খুব জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছিল।

বলা হয়েছে কনফুসিয়াসের আসল নাম হচ্ছে কুং-ফুৎজে। বিগত ষোড়শ শতাব্দীতে চীনে যে সব জেসুইট পাদ্রী বসবাস করতেন, তাঁরা কুং-ফুৎজে শব্দটিকে কনফুসিয়াস বলে উচ্চারণ করতেন। কুং শব্দের অর্থ হল আচার্য। এখানে একটি জিনিষ মনে রাখা দরকার। সে জিনিষটি হচ্ছে, জন্মের সময়ে তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়নি। কিন্ নামেই তাঁকে সবাই ডাকত, কিন্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র পাহাড়। বাল্যকালে তাঁর আরো একটা নাম ছিল। সে নামটি হচ্ছে চুংনি।

কনফুসিয়াস না কি চৌদ্দ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করলে জানা যায়, শিক্ষক যখন বুঝতে পারলেন যে, কনফুসিয়াস সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তখন তিনি তাঁকে নিজের বিদ্যালয়ে পড়াতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যৌবনে কনফুসিয়াস সারথি, শিকারী, এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি একটা সরকারী চাকুরী পেয়েছিলেন। যদিও যে পদটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেটা ততটা উচ্চ নয়, তথাপি পদটি খুব সম্মানার্হ ছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ফলে তিনি সু ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শোনা যায়, এক বার এক ভূমিখণ্ড নিয়ে প্রজাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়েছিল। সে ঝগড়া মীমাংসা করতে গিয়ে কনফুসিয়াস যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে তাঁর প্রথম বক্তৃতা। প্রজাদের ঝগড়ার অনাবশ্যকতা বুঝাতে গিয়ে তিনি মানুষের জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন। চার্লস ফ্রান্সিস পটার-এর মতে তিনিই হলেন মানবধর্ম্মের আদি আচার্য। পৃথিবীতে প্রাক্-বৌদ্ধযুগে যে কয়েক জন ধর্ম্মগুরু আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কনফুসিয়াস হলেন অন্যতম। চীনের ধর্ম্ম-সমাজে তাঁর স্থান হচ্ছে লাউৎজের পরেই। কিন্তু এইচ. এ গাইল্‌স লাউৎজের চাইতে কনফুসিয়াসকে উচ্চতর স্থান দিয়েছেন। এইচ. এ গাইল্‌স হলেন কনফুসিয়ানিজম্ এ্যাণ্ড ইট্‌স্ রাইভাল্‌স্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মতে কনফুসিয়াস কল্পনার জগৎ থেকে মানুষের কর্ম্ম-জীবনে ধর্ম্মকে নিয়ে এসেছিলেন। চীনা-সাহিত্যের নয়টি বিখ্যাত বই-এর সাথে ঋষি কনফুসিয়াসের নাম জড়িত রয়েছে। পাঁচটি বই-এর নাম হচ্ছে "কিং" এবং বাকী চারখানির নাম হল "শু"। কনফুসিয়াস কিন্তু কোন ধর্ম্মমত প্রচার করেননি। আত্মার অমরত্ব, পূজা, ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেননি। তবে তিনি নৈতিক জীবন গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কনফুসিয়াস বলেন, "কোন লোক তোমার প্রতি যে কাজ করলে তুমি অসন্তুষ্ট হও সে কাজ অন্য লোকের প্রতি কখনও করো না।"

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হিউম তাঁর বইতে লাউৎজে এবং কনফুসিয়াসের মতবাদের মূলগত পার্থক্য চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন। বইটির নাম হচ্ছে থি বিলিজিওন অব চাইনা অথবা চীনের তিনটি ধর্ম্ম। কনফুসিয়াস এবং লাউৎজে নৈতিক আদর্শ প্রচার সম্বন্ধে একমত। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, যখন এই দুই জন ঋষির মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন কনফুসিয়াস এবং লাউৎজের বয়স ছিল যথাক্রমে চৌত্রিশ এবং চৌরাশি বছর। লাউৎজে বলেন, একমাত্র প্রেমই ঘৃণাকে অভিভূত করতে সক্ষম এবং সৎই অসৎকে পরাস্ত করতে পারে। কিন্তু কনফুসিয়াসের অভিমত হল, "ন্যায়ের দ্বারা অনিষ্টের প্রতিদান করবে এবং সৌজন্যের প্রতিদানও হল সৌজন্য।" তাঁর মতে ভদ্র ব্যক্তি নয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন, যথা—সুস্পষ্ট ভাবে দেখা, শ্রুত বিষয়কে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা, ব্যবহারে শিষ্টাচার, আচরণে আত্মসম্মান রক্ষা করা, বাক্যে প্রমাদহীনতা, কর্ম্মে কুশলতা, সন্দেহ স্থলে প্রশ্ন, ক্রোধের সময়ে বিপদের ভাবনা, এবং লাভের সময়ে সত্যনিষ্ঠা। এ ছাড়া তাঁর আরো কয়েকটা মূল্যবান কথা বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন "অনেকের অবহেলা এবং বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য"; "যিনি ভদ্র তিনি নিজের দোষ দেখেন, যিনি অভদ্র তিনি অপরের দোষ দেখেন"; "প্রাচুর্য্যহীন উচ্চপদ, শ্রদ্ধাশূন্য ক্রিয়া, ব্যথাবর্জ্জিত শোক অর্থহীন।"

কনফুসিয়াসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, যখন তাঁর উনিশ বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের এক বছর পরেই তিনি একটি সন্তান লাভ করেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কনফুসিয়াসের যখন চব্বিশ বৎসর বয়স তখন তাঁর মাতা পরলোক গমন করেন। চীনা-প্রথা অনুসারে মৃত মাতা কিম্বা পিতার জন্ম ছেলেকে দীর্ঘকাল যাবৎ শোক প্রকাশ করতে হয়। কনফুসিয়াস না কি তাঁর মাতার জন্ম সাতাশ মাস পর্যান্ত শোক প্রকাশ করেছিলেন। শোনা যায়, মা'র মৃত্যুর পরেই কনফুসিয়াসের জীবনের আসল মিশন সুরু হয়েছিল। তিনি পরিব্রাজক হয়ে প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। সে সময়ে তিনি কয়েক জন শিষ্যের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে প্রচারকার্য্য চালান অনেকটা সুবিধাজনক হয়েছিল। কনফুসিয়াস চীনের প্রাচীন কৃষ্টিকে সময়োপযোগী করে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রাচীন কৃষ্টির ধারাগুলোকে তিনি এমন চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করতেন, যার ফলে চারি দিক থেকে শত শত লোক তাঁর ব্যাখ্যা শুনবার জন্ম ছুটে আসত। শোনা যায়, যখন তাঁর একুশ বৎসর বয়স, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তিনি তাঁর নীতির প্রচারকার্য্য সুরু করেছিলেন। পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়ীতে চড়ে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করবার জন্ম গ্রামবাসীদের অনুপ্রেরিত করতেন। এখানে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার। সে জিনিষটি হচ্ছে এই যে, তিনি কেবল মাত্র নৈতিক উপদেশ দেননি। তিনি জনসাধারণকে সঙ্গীত, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, এবং কবিতা ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দান করেছিলেন। কনফুসিয়াস কখনও এমন কথা বলেননি যেটা প্রাচীন ধর্মপ্রথার বিরোধী। তাছাড়া বিপ্লবাত্মক আন্দোলন কিম্বা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেননি। শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল খুবই নিবিড়। শোনা যায়, তিনি যখন গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন তখন প্রায় তিন শত শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করতেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তাঁর অনেক শিষ্য অবস্থাপন্ন এবং ধনী ছিলেন। তাই বলে গরীব শিক্ষার্থীর প্রতি কনফুসিয়াস কখনও অবজ্ঞাসূচক মনোভাব প্রদর্শন করেননি, তিনি সকলকে ধর্মপ্রাণ এবং অধ্যয়নশীল করে গড়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে কনফুসিয়াস সমাজ-বিজ্ঞানকে খুব পছন্দ করতেন। তাছাড়া তিনি যে-সব বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন সে-সব বিষয়ের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞান খুব জনপ্রিয় ছিল।

সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম কনফুসিয়াস দু'টো পথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম পথটি হচ্ছে প্রাচীন ধর্মপ্রথার প্রবর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সামাজিক নীতির প্রবর্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। লাউৎজে কিন্তু কনফুসিয়াসের এই মনোভাব সমর্থন করতে পারলেন না। তাও-তত্ত্বের উপর জোর দিবার জন্ম তিনি কনফুসিয়াসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কনফুসিয়াস কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "আকাশে কি ভাবে পাখী ওড়ে, জলে মৎস্য কি ভাবে সন্তরণ করে, বনে কি ভাবে পশু বিচরণ করে সেটা আমি জানি; কিন্তু হাওয়ায় চড়ে ড্রাগন কি ভাবে মেঘের উপর ওঠে এবং স্বর্গে চলে যায় সেটা আমি জানি না। লাউৎজেকে আমি দেখলাম। তাঁকে ড্রাগনের মত অদ্ভুত এবং অবোধ্য মনে হল।" কনফুসিয়াস বলেন, যদি ব্যক্তিগত নীতি এবং সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হয়, তা হলে রাজকীয় শাসন সম্ভবপর নয়। আগেই বলা হয়েছে, তিনি সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি এমন একটা মতবাদ প্রচার কচ্ছিলেন যেটার সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন করা সম্ভবপর। কনফুসিয়াস-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হলেন মেনসিয়াস। কনফুসিয়াসের তিরোভাবের এক শত বছর পরে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কনফুসিয়াসের বাণী প্রচার করাই হল তাঁর জীবনের ব্রত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, গুরুর চিন্তাধারার চাইতে তাঁর চিন্তাধারা না কি অধিকতর গণতান্ত্রিক ছিল। তিনি প্রচার কচ্ছিলেন, প্রজার স্থান রাজার উপরে এবং প্রজা তুষ্ট হলে ভগবান তৃপ্ত হন। মেনসিয়াস জোর দিয়ে বলেছেন, "অনাহারী প্রজা কখনও সৎ এবং শান্ত হতে পারে না। দেশের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য।"

কনফুসিয়াসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, যখন তাঁর বয়স একান্ন বৎসর তখন তিনি লু ষ্টেটের ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন। শাসন-কার্য্যে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রথমে পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী এবং পরে বিচার বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর শাসনাধীনে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজ করত। তিনি বলতেন, সরকারী কর্মচারীরা যদি নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তা হলে দেশ এবং প্রজার মঙ্গলের জন্ম শান্তিস্থাপন অবশ্যম্ভাবী। কনফুসিয়াস সর্ব্বদা ব্যক্তির আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবার পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া। তাই তিনি কবিতা, সঙ্গীত, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপর অতটা জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কবিতার মধ্যে রয়েছে উদ্বোধনী শক্তি এবং উচ্চ চিন্তার পক্ষে সঙ্গীত খুব প্রয়োজনীয়। কনফুসিয়াসের নিজের একটা বাঁশী ছিল। শিক্ষাদান কিম্বা বই লেখার আগে তিনি বাঁশীটি বাজিয়ে নিতেন। 'লি কি' গ্রন্থে কনফুসিয়াস লিখেছেন, "যখন সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, সঙ্গীতের সুরে যখন হৃদয় ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সৎ, মহৎ ও ভদ্র-হৃদয় সহজে বিকশিত হয় এবং আনন্দ স্ফুরিত হয়। এই আনন্দ হইতে প্রশান্ত ভাব প্রসূত হয়। এই প্রশান্ত ভাব-স্রোত নিরবচ্ছিন্ন হয়। তাহার ফলে মানবের অন্তর স্বর্গে পরিণত হয়।"

১৯১২ সালের মার্চ মাসের এক দিন জাহাজ থেকে মাল নামাবার সময় নেপল্‌স্ বন্দরে এক আশ্চর্য দুর্ঘটনা ঘটে যায়। স্থানীয় কাগজগুলিতে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝড় বয়ে যায় নানা আজগুবি অনুমানের। অন্যান্য যাত্রীদের মতো সেখানে ভীড় না জমিয়ে হৈ-চৈ থেকে হাঁপ ছাড়বার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়ি—তবু সন্ধ্যে বেলাটা তো নির্বিঘ্নে শান্তিতে কাটাতে পারবো সমুদ্রের ধারে। কেন সেই ঘটনাটি ঘটলো এবং কি ক'রে ঘটলো তা কেবল একমাত্র আমিই জানতাম। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে, মুছে গেছে লোকের মন থেকে—এখন আর সব খুলে বলাতে কোন দোষ নেই, তাই বলছি।

আমি তখন মালয় চেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ বাড়ী থেকে জরুরী তার আসায় দেশে ফেরার জন্যে সিঙ্গাপুরে 'উটন্' জাহাজে চড়তে হোল। জাহাজে প্রচণ্ড স্থানাভাব; ইঞ্জিনের একদম গায়েই আমার ঘুপচি কেবিন, আর তেমনি সাংঘাতিক গরম। না আছে আলো, না আছে বাতাস। তাই পাখাটাকে সর্বদাই চালিয়ে রাখতে হোত। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝকানিতে আমার ঘরটা থর-থর ক'রে কাঁপতো, ঘরের পাশ দিয়ে যেন হরদম একটা কুলি ভারী বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করছে—এমনি অস্থিরতা আমার ঘরে! এর ওপর আছে ছাদের ওপর জুতোর মসমসানির আওয়াজ!

মালপত্রগুলো ঘরের এক কোণে জড়ো ক'রে রেখে ওপরের ডেকে উঠে গেলাম। খোলা বাতাসে শরীর-মন যেন জুড়িয়ে গেলো। ডেকেও কম ভীড় নয়, গোলমালও তেমনি; লোকগুলো হড়বড় করে কথা বলতে বলতে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেক-চেয়ারগুলোয় টান হয়ে শুয়ে মেয়েগুলো হাসির ঝড় তুলছে ক্ষণে ক্ষণে; এই অফুরন্ত চলা-বলার মধ্যে আমি কেমন যেন বেমানান ভালো লাগছে না কিছুই। মালয়, তারও আগে বর্মা, শ্যাম—কতো জায়গায়ই তো গেছি। সেই সব দেশের এক-একটা ছবি ভেসে যাচ্ছে মনের মধ্যে, উন্মনা করে দিচ্ছে আমায়। এখানের হট্টগোলে নিভৃত হওয়া অসম্ভব, কি-ই বা করি, পড়তেও চেষ্টা করেছি দু'-একবার কিন্তু মন বসাতে পারিনি।

তিন দিন অবিরাম চেষ্টা করেছি এখানের আবহাওয়ায় নিজেকে কোন রকমে খাপ খাইয়ে নিতে, আদিগন্ত সমুদ্রের পানে চেয়ে চেষ্টা করেছি সময় কাটিয়ে দিতে। দু'চোখ যেদিকে যায় নীল—নীল, কেবল মাঝে মাঝে রাত্তির বেলা সমুদ্রের কতকটা অংশ ঝলমল ক'রে ওঠে আলোয়। এই ভাবে কেটে গেলো তিন দিন, যাত্রীদের অবিশ্রাম কোলাহল আমায় তেমনিই অস্থির করে, বাধ্য হয়ে ঢুকি কেবিনে। বিশেষ ক'রে, সাংহাই থেকে ওঠে কয়েকটি ইংরেজ তরুণী, খাবার সময় পর্যন্ত তাঁরা জুড়ে দিয়েছিলো এক বেলেল্লা নাচের গৎ। আমার সহ্য হচ্ছিলো না—নীরবতাই আমার একমাত্র কাম্য।

বিকেলের খাওয়ার সময় দু'বোতল বিয়ার গিলে ভাবলাম যেমন ক'রেই হোক এদের নাচের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে! সময়ের বাঁধন এড়িয়ে বাস কোরব মনের স্বপ্নলোকে। ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলাম সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ঘরটাও যেন বেশ গরম, ঘাম গড়াচ্ছে গা দিয়ে। পাখাটা চালিয়ে দিলাম। সময়টা গভীর রাত বলেই মনে হোল, গান-টান সব থেমে গেছে কখন; মাথার ওপরও আর শোনা যাচ্ছে না জুতোর দুম-দাম। শুধু দৈত্যের মতো ইঞ্জিনের হৃৎস্পন্দন রাত্রির স্তব্ধতাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে কোনো রকমে ডেকে হাজির হয়ে লক্ষ্য করলাম সেখানে জনপ্রাণী নেই। আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো জাহাজের কালো মোটা চোঙাগুলোর ওপর, তার পরই তারকাখচিত ঝকমকে আকাশ। এমন দিগন্তভরা অনন্ত আকাশ আগে কোন দিন আমার নজরে পড়েনি। বাতাসে কেমন শিরশিরে আমেজ, দূর কোন দ্বীপের সুগন্ধ যেন মাখানো! এতো চমৎকার পরিবেশ যে নিজেকে বিরহিণীর মতো আকাশের আলিংগনে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ডেকের ওপর শুয়ে-শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় তারাদের ভাষা!

হঠাৎ শুকনো কাসির শব্দে চমকে উঠলাম। নজরে পড়লো আবছা আলোয় কোন মানুষের চশমার দু'টো কাচ। এগিয়ে গিয়ে জার্মাণ ভাষায় বিনীত ভাবে বললাম, "ক্ষমা করবেন।" সংগে সংগে উত্তর এলো, "এতে ক্ষমা করার কি আছে?"

কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি। রাতের আবছা অন্ধকারে আমার সামনে তাঁর অস্পষ্ট চেহারা কেমন যেন রহস্যময়, কেউই কোন কথা বলছি না। আমার অসহ্য ঠেকে, মনে হোল সরে পড়ি। কি করি—কি করি, ধরিয়ে ফেললাম একটা সিগারেট। কাঠির আকস্মিক আলোতে দু'জনেই চট্ করে দু'জনকে এক নজর দেখে নিলাম, লোকটি আমার কাছে একান্তই অপরিচিত। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউই কোন কথা বলতে পারলাম না, চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে আমার মন ভরে যাচ্ছিলো অশান্তিতে। আর কতো চুপ করে থাকি, বলে উঠলাম, "আচ্ছা, নমস্কার!" জড়িত স্বরে উত্তর শোনা গেলো, "নমস্কার!" তার পর আবার তিনি বলতে লাগলেন, "ক্ষমা করবেন, ব্যক্তিগত শোকে ম্রিয়মাণ বলে জাহাজের কারুর সংগে আলাপ করতে পারিনি। আপনি দয়া করে আমার এখানে অবস্থিতির কথা কাউকে বলবেন না, এই আমার অনুরোধ।" আর কিছু না বলে তিনি থেমে গেলেন, আমিও অঙ্গীকার করলাম, তাঁর অনুরোধ আমি পালন করবো। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে, আমি এক জন পর্যটক, এখানে আমার পরিচিত কেউ নেই, কাজেই আপনার কথা আমি কাউকেই বলবো না।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, ফিরে এলাম কেবিনে। কিন্তু মোটেই ঘুম হোল না সে রাত্রে।

ভ্রমণ-পথে ছোট-খাট ঘটনাও মনে দাগ রেখে যায় অনেক সময়, আমারও সেই অবস্থা হোল। রাত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিটির প্রতি কেমন যেন আকর্ষণ অনুভব করি। সারা দিন মানসিক অধৈর্যের মধ্যে কেটে যায়, কতোক্ষণে রাত আসবে, কতোক্ষণে আবার সেই লোকটির সংস্পর্শে আসবো—এই ভাবনাতেই সারাটা দিন গেলো। দিনটা যেন আর কাটতেই চায় না; বেশি দেরী না করে সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ঠিক সময়ে ঘুমটা ভেঙে গেলো, রেডিয়ম-ডায়াল ঘড়িতে দেখলাম দু'টো। তাড়াতাড়ি পোষাক চড়িয়ে উঠে গেলাম ডেকে।

আজকের রাতটাও কালকের মতোই গভীর, অগুণতি তারার ভারে আকাশ যেন ফেটে পড়ছে, মনের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে এগিয়ে গেলাম গত রাত্রের স্থানটিতে, না-জানি এখনও এসেছেন কি না। নজরে পড়লো অন্ধকারে ভদ্রলোকটির পাইপের আগুন, ঠিক জায়গাতেই তিনি বসে আছেন। হঠাৎ মনে হোল, গিয়ে কাজ নেই, কি হবে, তার চেয়ে ফিরে যাই কেবিনে—ইতস্তত করছি, দেখলাম ভদ্রলোকটি তাঁর জায়গা থেকে উঠে এগিয়ে এলেন, বিনম্র কণ্ঠে বললেন, "আমায় এখানে দেখেই হয়তো ফিরে যাচ্ছিলেন, আসুন না, বসি।" আমি আমতা ক'রে বলি, "না না, সে কী কথা! আমি ভাবলাম আপনি একা আছেন, আমার উপস্থিতিতে হয়তো মানসিক ব্যাঘাত ঘটবে, তাই ফিরে যাবো ভাবছিলাম।" তিনি দুঃখিত ভাবে বললেন, "আপনার উপস্থিতিতে আমার কোন অসুবিধেই হবে না, বরঞ্চ কিছু শান্তি পাবো আপনার সংগে কথা কয়ে, মনটাও হালকা হবে।"

তিনি বলে চলেন, "কতো দিনই আমার এমনি একা-একা কেটেছে, এমন একটা লোক পাইনি যার সঙ্গে প্রাণ খুলে দু'টো কথা বলি, চুপ-চাপ থাকতে আর ভালো লাগে না। থাকতে পারি না কয়েদীর মতো একা-একা কেবিনে বন্ধ হয়ে। আর যাত্রীদের হাসি-গল্প-গান তো আমি বরদাস্তই করতে পারি না।" তার পর হঠাৎ উঠে পায়চারি করতে করতে বললেন, "আমার কথা হয়তো আপনার ভালো লাগছে না।" আমি বাধা দিলাম, "না, আপনার কথা শুনতে আমার বেশ ভালোই লাগছে, আপনি সংকোচ করবেন না। আপনার সংগ আমার খারাপ তো লাগছেই না, বরং আসুন, ভালো ক'রে জমিয়ে বসি, নিন, একটা সিগরেট ধরান।" দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিতে আবার এক বার তাঁর মুখখানা দেখে নিলাম। মনে হোল, সে-মুখে যেন উত্তেজনা, হয়তো তিনি আমায় কিছু বলতে চান। আমরা বসে আছি জাহাজের গুটোনো রশিগুলোর পাশে। মৌনতা ভেঙে ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনি কি খুব ক্লান্ত?"

আমি জবাব দিলাম, "না তো।"

এবার তিনি সোজাসুজি আরম্ভ করেন, "আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই, আশা করি তা শুনতে আপনার আপত্তি নেই?"

ভালো ক'রে নড়ে-চড়ে বসে তিনি ভালো ভাবেই শুরু করলেন, প্রথমেই তাহ'লে আপনাকে জেনে রাখতে হবে—আমি এক জন ডাক্তার, এবং যে-ঘটনা বলতে যাচ্ছি, তা আমাকে কেন্দ্র করেই। হয়তো উত্তেজিত হয়ে পড়ছি, তাতে যেন ভাববেন না যে আমি মাতলামি আরম্ভ করলাম। তবু বলতে বাধা নেই, মদ একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেছে!

"এছাড়া কী-ই বা করতে পারি বলুন, প্রাচ্যে মদ খেয়ে কোন ক্রমে সময় কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই বিশ্রী দেশের অপদার্থ লোক আর জীব-জন্তুর মধ্যে কাটাতে হয়েছে, এ-অবস্থায় মাথার ঠিক রেখে ভদ্র-জীবন যাপন কি সম্ভব? আপনিই বলুন? এই সাত বছরে নিজের দেশের কোন লোক নজরে পড়েনি, তাই আজ আপনাকে পেয়ে মনের খুশিতে বেশি কথা যে বলবো, এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?"

অন্ধকারে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন, তার পর ঠুন্ করে আওয়াজ হতে বুঝলাম পাশে দু'টো মদের বোতল রেখেছেন গ্লাসে এক পেগ ঢেলে আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খান একটু!" এক চুমুকে কিছুটা খেলাম, গ্লাসের অভাবে তিনি বোতলেই চুমুক দিলেন!

ঘড়িতে আড়াইটে হয়েছে। খানিক উসখুস্ করে তিনি শুরু করলেন, "ঘটনাটা আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু বলে যাবো লুকোব না কিছুই, বা লজ্জা করে চেপেও যাবো না। রুগীরা আমার কাছে আসতো রোগের পরামর্শ নিতে; তাতে গোপন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর অনাবৃত দেহের বিশেষ জায়গা আমায় পরীক্ষা করতে হোত, আর এই সব নোংরা অংশ দেখে-দেখে আমি সূক্ষ্ম রুচিবোধ ফেলেছিলাম নষ্ট করে। প্রাচ্য দেশে অনেক রহস্য আছে বটে, আছে সৌন্দর্য; কিন্তু কেবলই নোংরা ঘেঁটে-ঘেঁটে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি, জীবনীশক্তি নিঃশেষ হতে বসেছে। কুইনিন খেয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরকে সাময়িক ভাবে চাপা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু একবার ঐ সাংঘাতিক জ্বরের কবলে পড়লে শরীর-মন অকেজো হয়ে যায়, হাজার ওষুধেও আর তা ঠিক হয় না। ইউরোপের কোন ভদ্রলোককে যদি প্রাচ্যের কোন মফঃস্বলে থাকতে হয় দীর্ঘদিনের মেয়াদে, তাহলে অচিরেই তিনি মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলবেনই, এ একেবারে অবধারিত। তাই নিজেই ক্লেশ ভুলতে এই সময় কেউ-কেউ মদে ডুবে যান। কারুর আবার বাড়ীর জন্যে অবিরাম মন কেমন করতে থাকে—এই রকম ভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন। ক্রমেই মনের মধ্যে হতাশা এসে বাসা বাঁধে, 'কী-ই বা হবে আর বাড়ী ফিরে, কে-ই বা চিনবে এতো দিন পরে, আর কি আমায় তারা ভালো ভাবে গ্রহণ করবে!'—

"ডাক্তারী পড়েছি আমি জার্মাণীতে। পাশ করার পর লিপজিগের এক ক্লিনিকে চাকরী পাই। আমার নাম আর পশার ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, এমন সময় আমার কপাল—এক নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যৎটি একদম গোল্লায় গেলো। হাসপাতালের এক নার্সের পাল্লায় পড়ে গেলাম। এই মেয়েটি এক সময় এক ভদ্রলোককে প্রেমের প্যাঁচে এমন কষেছিলো যে ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছিলেন, এমন কি আত্মহত্যা করতেও চেষ্টা করেন।

"আমার অবস্থাও প্রায় সেই ভদ্রলোকের মতোই হয়ে এসেছিলো। এক ধরণের অসচ্চরিত্রা নারী আছে যারা পুরুষের ওপর একচ্ছত্র অধিকার খাটাতে পারে, তাদের কাছে আমি একেবারে কেঁচো! তার মোহে পড়ে আমি আমার সত্তা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম তার পায়ে। আমাকে সে যা হুকুম করতো, আমি অম্লান বদনে তাই পালন করতাম, প্রতিবাদ করার এতোটুকু ক্ষমতা ছিলো না আমার। তারই কথায় আমি একবার হাসপাতালের সিন্দুক ভাঙি, কিন্তু ধরা পড়ে যাই। সে যাত্রায় আমার এক কাকার দয়ায় বেঁচে গেলাম, টাকাটা তিনি দিয়ে দিলেন।

"লিপজিগে আর কোথাও চাকরি জুটলো না, সবাই তো জেনে ফেলেছে আমার গুণপণা। এমন সময় খবর পেলাম, ডাচ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের উপনিবেশে পাঠাবার জন্যে জন কয়েক ডাক্তার নেবেন; দরখাস্ত করতেই হয়ে গেলো চাকরী। দশ বছরের চুক্তিনামায় সই

করে অনেকগুলো টাকা আগাম হাতে এলো। অর্ধেক দিলাম কাকাকে বাকীটা গায়েব করল আমার সেই প্রেয়সী! আর আমি খালি পকেটে কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দিলাম!—আপনি এখন যেমন ভাবে বসে রয়েছেন, আমিও ঠিক অমনি ভাবে বসেই সেদিন যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ আমার সেই সব নিঃসংগ জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

"কর্তৃপক্ষ আমাকে বাটাভিয়া, বা ঐ রকম কোন শ্বেতাংগ-পরিবৃত সহরে না পাঠিয়ে ঠেলে দিলেন ভেতরের কোন এক অখ্যাত স্থানে। জন কয়েক বদ্‌রসিক অফিসার নিয়ে সেখানকার শ্বেতাংগ সমাজ। থাকতে থাকতে জায়গাটা ক্রমে সয়েও এসেছিলো; সারা দিন কাজ করতাম, অবসর সময়ে বই নিয়ে বসতাম, অবশ্য সময় আমার খুব কমই হতো পড়বার। তবু আমি সেখানকার কোন শ্বেতাংগের সংগে মিশতাম না, তাদের সংগ আমার অসহ্য ছিলো, অন্য কোন সংগী না পেয়ে মদ খাওয়ার মাত্রা দিলাম বাড়িয়ে। আমার চুক্তি শেষ হতে আর মাত্র দু'বছর বাকী ছিলো, এর পর অবসর গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারতাম ইউরোপে, আবার আরম্ভ করতাম নতুন ভাবে জীবন; কিন্তু তা আর হোল কই!"

গল্পে হঠাৎ বাধা পড়লো। কর্কশ একটা যান্ত্রিক আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা খণ্ডিত হলো, জাহাজের প্রপেলারের থসখস্ আওয়াজও স্পষ্ট কানে আসছে। এখন একটা সিগারেট ধরালে মন্দ হয় না, কিন্তু ভরসা হোল না—দেশলাই জ্বালানোয় আওয়াজে গল্পের এই পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেতেও পারে। খানিক অপেক্ষা করার পরও ভদ্রলোক যখন কথা বলছেন না, তখন সত্যিই কি ঘুমিয়ে পড়লেন না কি? নানা চিন্তা ভীড় করছে মাথায়, আমাদের চমকে দিয়ে জাহাজের সিটি বেজে উঠলো দু'বার, বোধ হয় তিনটে বাজলো।

চোখে পড়লো তিনি নড়ছেন, হুইস্কির একটা বোতল তুললেন হাতে ক'রে, আবার সুরু করলেন তাঁর কাহিনী, "কিন্তু অপ্রিয় বলে কি হবে, আমি যেন জায়গাটায় মাকড়সার জালের মতো আটকে গেলাম। সময় আর কাটে না, বর্ষা শেষ হয়ে এলো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার চড়বড়ানি শব্দ শুনেই কাটিয়ে দিলাম। এতো দিন যে ছিলাম সেখানে তার মধ্যে কোন শ্বেতাংগের পদার্পণ ঘটেনি আমার বাড়ী, সংগী ছিলো কেবল কয়েকটি দেশী চাকর আর হুইস্কির বোতল। গল্পের বইয়ে আলোকমালায় সজ্জিত রাজপথ আর ইউরোপীয় সুন্দরীদের কথা পড়লেই দেশের জন্যে মন কেঁদে উঠতো হু-হু করে।"

দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, "আপনি হলেন পর্যটক, বিদেশে লোকের কেমন অবস্থা হয় বেশি দিন থাকতে হলে তা আপনার জানা নেই। বিদেশীদের একটা-না-একটা রোগ ধরেই, সময় সময় বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে এমন ব্যাকুল হয় যে, মনের কষ্টে ভুল বকতে সুরু করে পাগলের মতো। আমিও এই রকম একটা মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলাম। এক দিন টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে এখানের কর্মজীবন শেষ হলে কোথায় কোথায় যাবো মোড়া করছিলাম, হঠাৎ আমার চাকর দু'টো হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালো এক শ্বেতাংগ-মহিলা আমার সংগে দেখা করতে এসেছেন।

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, ইউরোপীয় মহিলা এলেন অথচ বাইরে মোটর বা গাড়ীর আওয়াজ পেলাম না! ভাবলাম, এই নির্জন আবাসে হঠাৎ কি দরকারে এলেন মহিলাটি?

"আমি তখন বসেছিলাম দোতলার বারান্দায়; তক্ষুণি পোষাক পালটে নিজেকে একটু ভদ্র করে নিলাম, তার পর নীচে নামবার সময় কেমন যেন স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম, নিজের ওপর যেন কোন জোর পাচ্ছি না। ভেবে পাচ্ছি না কিছুতেই—মহিলাটি কে হতে পারেন? এই অখ্যাত অনার্য-অধ্যুষিত স্থানে শ্বেতাংগিনীই বা কোত্থেকে এলেন, আর আমার এখানেই বা কী উদ্দেশ্যে।

"বসবার ঘরে একটা চেয়ারে মহিলাটি বসে আছেন, পেছনে একটি চীনে ছেলে, হয়তো তাঁর চাকর। দাঁড়িয়ে উঠে আমায় অভ্যর্থনা করবার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখটি একটি ওড়নায় ঢাকা। আমাকে প্রথমে বসতে অবসর না দিয়েই অনর্গল ইংরিজীতে তিনি আরম্ভ করে দিলেন, 'নমস্কার ডাক্তার বাবু, আগে থেকে এনগেজমেন্ট না করে আসার জন্যে ক্ষমা করবেন।' একটু থেমে দ্রুত বলে যেতে লাগলেন, 'এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে মোটরে যাবার সময় ভাবলাম আপনি তো এখানেই থাকেন, প্রশংসাও শুনেছি বহু, এ দেশে এমন লোক নেই যে, আপনাকে চেনে না, তাই ভাবলাম দেখা করেই যাই। আচ্ছা, আপনি শহরে যান না কেন? সব-কিছু থেকে সরে সাধুর মতো জীবন যাপনই বা কেন করেন আপনি?'

"মহিলাটি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চললেন; তাঁর অংগ-ভংগীর মধ্যে কেমন যেন স্নায়বিক দুর্বলতার স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করলাম; ভাবলাম, এই রকম ভাবে অনর্গল কথা বলার কি মানে হতে পারে, আর নিজের পরিচয়ই বা তিনি গোপন করছেন কেন? ইনি কি কোন শক্ত অসুখে ভুগছেন, না কি বদ্ধ পাগল। ক্রমশই আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলাম, তখনো তিনি আমায় বাক্যবাণে উত্যক্ত করছেন। আর তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে গেলাম। ওপরে আমার বসাবার ঘরে ঢুকে চার দিকে চোখ বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি, 'এখানের বাড়ীগুলোর গড়ন কী চমৎকার, আপনার বইয়ের সংগ্রহও অতি সুন্দর, মনে হয় এক নিশ্বাসে সব শেষ করে ফেলি!'

"বইয়ের শেলফগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি বইগুলোর নাম লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রদৃষ্টিতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে এক পেয়ালা চা দিই?' আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, এখন আর চা খাবার সময় নেই। দেখুন, আপনার বইয়ের সংগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে, ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী আপনি, নয় কি? আমাদের বাড়ীর ডাক্তার শুধু ব্রীজ খেলতেই পারে, পড়া-শুনো কিছুই করে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আপনার বাড়ীর কাছ দিয়ে মোটরে করে যাবার সময় মনে হোল, আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নিয়ে যাই, তাই এলাম।'

"আমার দিকে না ফিরে বই দেখতে দেখতেই তিনি কথাগুলো বললেন; একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, 'আপনি এখন খুব

ব্যস্ত, না? যাক গে, আরেক দিন আসা যাবে না হয়, পরিচয় তো হয়ে গেল।' আমি বললাম, 'আমার দরজা সব সময়ই খোলা, যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন কোন রকম দ্বিধা না করে চলে আসবেন আমার কাছে।'

"তিনি একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন, আমার দিকে কিন্তু তাকালেন না, 'দেখুন, অসুখটা আমার এমন কিছু শক্ত নয়, বেশির ভাগ মেয়েই যে-ধরণের অসুখে কষ্ট পায়, সেই রকম আর কি; যেমন ঘন ঘন মাথা-ধরা, ফিট হয়ে যাওয়া, গা বমি-বমি, এ-ছাড়া কিছু নয়। আজ সকালেই এক জায়গায় গাড়ীটা মোড় ঘোরার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, চাকরটা না ধরলে হয়তো নীচেই পড়ে যেতাম। খানিক জল খাবার পর কিছুটা সুস্থ হই, এ-থেকে কি আপনার মনে হয় না, সোফার অসম্ভব জোরে গাড়ী চালিয়েছিলো?' আমি বললাম, 'দেখুন, এতো তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারি না। আমায় খুলে বলুন তো, এ-রকম ফিট কি আপনার প্রায়ই হয়?' 'এর মধ্যে হয়নি, তবে গত সপ্তাহে কয়েক বার হয়েছিলো বটে। তাছাড়া সকালের দিকে আমি খুব দুর্বল বোধ করি।'

"কথা বলতে বলতে তিনি আলমারীর দিকে এগিয়ে গেলেন আবার, একটা বই টেনে অন্যমনস্ক ভাবে উলটে যেতে লাগলেন তার পৃষ্ঠাগুলো। তাঁর এই চলা-বলা, সব-কিছুর মধ্যেই একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে। ইচ্ছে করেই আর জবাব দিলাম না, অনুভব করতে লাগলাম তাঁর প্রতিটি অংগ-ভংগী; এখানে তাঁর মধুর উপস্থিতি আমার বেশ ভালোই লাগছে।

"মহিলা হঠাৎ চটুল ভাবে বলে উঠলেন, 'ডাক্তার, এতে আপনার মত আছে? অসুখটা আমার এমন কিছু নয়, এ-দেশী কোনো ব্যামোতে ভুগছি মনেও করবেন না, ভয়ের কিছু নেই এতে।'

"আমার বেশ সন্দেহ হলো, এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে, আপনাকে আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই জ্বর আছে কি না, এগিয়ে আসুন, আপনার নাড়ী দেখবো।'

"আমাকে এগোতে দেখে তিনি সরে দাঁড়ালেন, "না ডাক্তার, তার প্রয়োজন হবে না, জ্বর আমার নেই। ফিট হবার পর প্রত্যেক দিন টেম্পারেচর নিয়েছি, তাতে জ্বরের কোন লক্ষণ পাইনি, হজমও আমার বেশ ভালোই হয়।'

"তাঁর এই খাপছাড়া আচরণে আমার সন্দেহ দৃঢ় হলো; কি যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন অথচ পারছেন না, আর এই দীর্ঘ দু'শো মাইল পথ অতিক্রম করে নিশ্চয়ই ফ্লবেয়ারের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে আসেননি। চুপ করে না থেকে বললাম, 'মাপ করবেন, কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে?'

"উত্তরে মহিলাটি বললেন, 'নিশ্চয়ই, ঐ উদ্দেশ্যেই তো আপনার কাছে আসা।' আবার তিনি আমার দিকে পেছন ফিরে বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার কোন ছেলেপিলে আছে?' মহিলা উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, একটি ছেলে আছে।' 'আপনি যখন প্রথম বার গর্ভবতী হন তখন কি এখনকার এই সব উপসর্গ ভোগ করেছিলেন?' মহিলাটি বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তরে কেমন যেন উত্তেজনা। আমি আবার বললাম, 'তা'হলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়?' 'না, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।' তাঁকে পরীক্ষার জন্যে পাশের ঘরে আসতে অনুরোধ করলাম, আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তিনি বললেন, "তার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না, আমার অবস্থা আমি নিজেই স্পষ্ট বুঝতে পারছি'।"

ধীরে-সুস্থে আর এক পেগ মদ চড়িয়ে নিয়ে আবার তিনি সুরু করলেন, "ভেবে দেখুন, সেই নিঃসংগ জনবিরল জায়গায় একেই আমার যাচ্ছেতাই ভাবে কাটছিলো দিনগুলো, তারই মাঝে আবির্ভূত হলেন ঐ সুন্দরী মহিলা। বহু দিন পরে এক শ্বেতাংগিনীকে দেখলাম, আমার জীবনে সে-একটা বিশেষ দিন। তিনি আসায় আমার প্রথমটা অস্বস্তি লাগছিলো, আমার সংগে কি দু'-চারটে খোসগল্প করতে এলেন! কিন্তু একটু পরেই তিনি যা ভয়ংকর প্রস্তাব করলেন তা আমাকে তীরের খোঁচার মতো বিঁধলো। কি ধরণের সাহায্য তিনি আমার কাছে প্রত্যাশা করেন, বুঝতে দেরী হোল না। এই প্রথম নয়, এর আগেও বহু নারী এই একই দাবী নিয়ে আমার কাছে এসেছে, অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার করুণা ভিক্ষা করেছে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায়। কিন্তু শেষোক্ত নারীটি সম্বন্ধে প্রথমে আমার অন্য ধারণা হয়েছিলো, তাঁর মধ্যে থেকে যে অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ফুটে বেরুচ্ছিলো তাতে আমি প্রথমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীলই হয়েছিলাম, কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারায় আমার মনটা বিরূপ হয়ে উঠলো। তাঁর তীব্র তেজের কাছে নিজেকে বড়ো হীন মনে হচ্ছিলো, এখন তিনি ইচ্ছে মতো আমাকে দিয়ে যা-খুশি করিয়ে নিতে পারেন, আমার বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। মনের মধ্যে পাপের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম ভেতরে ভেতরে, পরম শত্রু মনে হোল তাঁকে। কিছু ক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম, অনুভব করলাম ওড়নার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ আজ্ঞাসূচক কর্তৃত্বের দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর আজ্ঞা মেনে না চলতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনো কথার জবাব না দিয়ে এমন বোকার মতো ভাণ করলাম যেন তাঁর কোন কথা আমি বুঝতেই পারিনি।

"বিষয়টা নিয়ে তাঁর সংগে অতি সাধারণ ভাবেই আলোচনা সুরু করি, 'দেখুন, এতে ভাবনার এমন কিছু নেই, গর্ভের প্রথম দিকে ও-রকম একটু-আধটু হয়েই থাকে।' মহিলাটি আমার কথায় বাধা দিলেন, 'না, হার্ট-ট্রাবলটাই বেশি, ও-ছাড়া অন্য কোন উপসর্গ নেই।' 'তাই না কি, কেবল হার্টট্রাবল?' বলে যেই ষ্টেথস্কোপটার দিকে হাত বাড়িয়েছি তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বিশ্বাস করুন, শুধু ঐ এক উপসর্গ, অযথা আপনাকে পরীক্ষা করতে হবে না, তাতে সময় নষ্ট করতে আমি চাই না। আমার প্রকাণ্ড অনুরোধ, আমি যা বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, দোহাই আপনার, আমি এখন একান্ত ভাবে আপনার ওপরই নির্ভরশীল।' আমি বললাম, 'তা'হলে অনুগ্রহ করে সব কথা আমায় খুলে বলুন। তারও আগে মুখ থেকে ওড়নাটা সরান, ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে আসার সময় ওড়নায় মুখ ঢাকাটা অশোভন নয়।'

"আমার সামনের চেয়ারটায় বসে তিনি মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে দিলেন। দেখলাম, মহিলা ইংরেজ, চোখে পড়লো তাঁর যৌবনের

নিটোল উজ্জ্বলতা। পুরো এক মিনিট আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

"আবার তাঁর স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেলো, কম্পিত স্বরে বললেন, 'ডাক্তার, আপনার কাছে আমি কি সাহায্য চাইছি, আপনি কি তা একদম বুঝতে পারছেন না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝেছি আপনি কি চাইছেন, তবু আমাদের মধ্যে কথাটা খোলাখুলি আলোচনা হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি চাইছেন, এই মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়া, গা বমি বমি থেকে আপনাকে রেহাই দিই, এই তো?' 'হ্যাঁ, আমি তাই চাই ডাক্তার।' 'কিন্তু আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে এতে আমাদের দু'জনেরই বিপদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তা ছাড়া এখানে এ-ধরণের অস্ত্রোপচার বেআইনী—এ কি আপনার জানা নেই?' আমি জানি, অনেক ক্ষেত্রে এ-ধরণের অস্ত্রোপচারকে ডাক্তারী শাস্ত্রে বৈধও বলা হয়ে থাকে।' আমি বললাম, 'অবশ্য প্রয়োজন বোধে ডাক্তারেরা এ রকম অস্ত্রোপচার করেন। মহিলা বললেন, 'আপনিই যখন ডাক্তার, তখন অস্ত্রোপচার করা না-করা আপনারই হাত।'

"তাঁর চোখ দেখে মনে হোল তিনি যেন এ-কাজ করতে আমায় অনুরোধের বদলে আজ্ঞা করছেন। তীব্র তেজের মুখোমুখি দুর্বলতা বোধ করলাম, তখুনি সংযত হয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম, কিছুতেই টলবো না। একটু ভেবে বললাম, 'দু'-এক জন ডাক্তারের সংগে পরামর্শ না করে এ-কাজে হাত দিতে আমি ভরসা পাচ্ছি না। মহিলাটি বললেন, 'অন্য ডাক্তারের পরামর্শে কোন প্রয়োজন নাই, আমি শুধু চাই আপনার মতামত।' আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু এতো ডাক্তার থাকতে আমার কাছে আসার হেতু?' শুষ্ককণ্ঠে তিনি বললেন, 'ভাবলাম, আপনি লোকালয়ের বাইরে নিঃসংগ জীবন যাপন করেন, তাছাড়া আমার পরিচয়ও আপনার অজ্ঞাত এবং অস্ত্রবিদ্যায় আপনার অসাধারণ হাতযশ, তাই এলাম আপনার কাছে। আচ্ছা, এই সাহায্যের জন্যে আপনাকে যদি প্রচুর অর্থ দিই, তাহলে বোধ হয় অনায়াসে এ-কাজে হাত দিতে পারেন?'

"আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ বয়ে গেলো, সামান্য একটা অস্ত্রোপচারের বিনিময়ে এতোগুলো টাকা? মন্দ কি! কিন্তু মন বেঁকে বসলো, নারীটি কি আমায় বশ করবার চেষ্টা করছে? মুখে বিদ্রূপের হাসি টেনে বললাম, 'তাই না কি, এর জন্যে এতগুলো টাকা আপনি খরচ করবেন!' 'হ্যাঁ, টাকা দেবো, কিন্তু কয়েকটি সর্ত আপনি পালন করতে বাধ্য থাকবেন। প্রথমত, আমার প্রস্তাবে আপনাকে রাজী হতে হবে, আর আপনাকে চিরদিনের মতো এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।' আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, তাতে আমার পেনসন একদম বন্ধ হয়ে যাবে।' তিনি বললেন, 'ভয় কি, এতো টাকা আপনাকে দেবো যা আপনার সারা জীবনের পেনসনকেও ছাপিয়ে যাবে।' 'কতো টাকা আপনি দিতে পারেন শুনি?' 'এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনি পাবেন।'

"রাগে, ঘৃণায় অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো, টাকার বিনিময়ে আমায় কিনে নিয়ে ডাচ গভর্ণমেন্টের সংগে এতো বছরের চুক্তিটা নষ্ট করে দিতে চায়! আচ্ছা শয়তানী তো! নারীটি কি আমায় বশীভূত করে ফেলেছে? নিজের ওপর কোন জোর পাচ্ছি না কেন। প্রবল অন্তর্দাহ নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর সংগে চোখাচোখি হয়ে গেলো, প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে গেলো মনের মধ্যে! কামার্ত বেদনায় সারা শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম, মনের মধ্যে জেগে উঠেছে সুপ্ত কামোন্মাদ আসুরিক প্রবৃত্তি! কী অসহ্য ঘৃণায় আমি কাঁপতে লাগলাম, একটা বিষধর সাপ যেন পাকে-পাকে আমায় জড়িয়ে ধরে ভীষণ দংশনে সারা শরীর আগুনের মতো জ্বালিয়ে দিচ্ছে! কোন দ্বিধা না করে বলে ফেললাম তাঁকে;—বুঝলেন, এখন আপনাকে বলে যাচ্ছি কখন কি ভাবে আমার মধ্যে উন্মত্ততা এসেছিলো।"

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন, "এবার একটু মদ চাই, মদ।" গেলাসে একটা বড়ো রকমের চুমুক দিয়ে আবার জোর গলায় আরম্ভ করলেন,—

"বন্ধু, আমায় ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমি যে এক জন মহৎ লোক, এমন কথা বলছি না, কিন্তু এতো দিন সাধ্য মতো শরণাগতের উপকার করেই এসেছি। যে কুৎসিত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমি থাকতাম, সেখানকার দুর্বল ভগ্নস্বাস্থ্যের মধ্যে সাধ্য মতো প্রাণসঞ্চার করাকেই নিজের ব্রত বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই মহিলাটির বেলায় তার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো, তার প্রথম দর্শনেই আমি বিচলিত হলাম, হলাম উত্তেজিত। কি জানি কেন তার আচরণে আমার ভেতরের ঘুমন্ত পশু-প্রবৃত্তি উঠলো জেগে, আমি পারিনি তাকে রোধ করতে। তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, তিন মাস আগে কোন এক দিন এতো কামাসক্ত হয়ে পড়েন যে সেই দুর্বল মুহূর্তে গর্ভস্থ এই অবৈধ সন্তানের পিতাকে নিজের দেহ দান করেন, এবং তাতেই ঘটে বিপত্তি। তার পর এই কলংক যাতে বেরিয়ে না পড়ে সেই জন্যে তিনি শরণাপন্ন হন আমার।

"এর আগে কখনো পেশাদারী ডাক্তারীর ব্যাপারে এ রকম জড়িয়ে পড়িনি। ঠিক যে যৌন-প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি নারীটির প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম তা নয়, আমার পৌরুষ দিয়ে তার নারীত্বের ওপর প্রাধান্য করবো—এই ছিলো আমার বাসনা। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, এই দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে কোন শ্বেতাংগ নারীর বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়বার সুযোগ একবারও আসেনি, সেদিক দিয়ে একে যৌন-প্রবৃত্তি বলা যেতেও পারে। তাছাড়া প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারেও এ রকম বাধা আমি পাইনি কখনো। দেশী যুবতীরা শ্বেতাংগ-পুরুষকে ভয় করে, তাই সামান্য চেষ্টাতেই তাদের অধিকারে করা যায়। এই গর্বিতা রহস্যময়ী নারীর প্রথম দর্শন লাভেই আমি মনে-প্রাণে উতলা হয়ে পড়েছিলাম, অবচেতন মনে চেয়েছিলাম তাঁর ওপর কামবৃত্তি চরিতার্থ করতে।

"এই ধরণের রাশি-রাশি অসংগত চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো মাথার মধ্যে, অনাসক্তের ভাণ করে বললাম, 'সামান্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় ও-কাজে হাত দিতে আমি অক্ষম।' হতাশার সুরে মহিলাটি বললেন, 'তা'হলে কতো হলে রাজী হতে পারেন?' বেশ ভরাটি-গলায় বললাম, 'আমাকে অভাবী ক্ষুদে ব্যবসাদার ঠাওরাবেন না, তাহ'লে আমার কাছ থেকে সাহায্যের আশা করাই

আপনার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। মনেও করবেন না, টাকার বিনিময়েই আমি এ-কাজ করবো।' মহিলার স্বরে চরম হতাশা, 'এ ছাড়া আপনি আমার কাছে আর কি আশা করেন?' আমিও গলা চড়িয়ে দিলাম আর এক পর্দা, 'আমার কাছে কেউ টাকার গরম দেখিয়ে সাহায্য নিতে আসবে, আর আমি তাতে রাজী হবো—এ যদি ভেবে থাকেন তো আপনি ভুল করেছেন। যে আমার কাছে বিনীত প্রার্থনা নিয়ে এগিয়ে আসে, আমি শুধু তাকেই সাহায্য করি।' মহিলাটি উত্তর করলেন, 'তাহ'লে আপনি কি বলতে চান, আমি আপনার কাছে হাত যোড় করে সাহায্য ভিক্ষা কোরব?' 'প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে বই কি!' দর্পভরে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, 'ও-ভাবে আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব, সে আমি কখনোই পারবো না, তার চেয়ে মৃত্যুও আমার অনেক বেশি শ্রেয়ঃ।' এতোক্ষণে সাহস করে আমি বলে ফেললাম, 'বুঝতে পারছেন তো, আমি কি চাই! আমার দাবী মেটান, তাহ'লেই আপনাকে সাহায্য করবো।'

"মহিলাটি আমার দিকে এক বার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদ্রূপের অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে দিলেন; নিজেকে কি খুব ছোট করে ফেললাম? হাসির রেশটুকু আমার কানে বাজের আওয়াজের মতো ঢুকলো, মাথাটাও যেন টলে গেলো একবার, অনুশোচনায় ভরে গেলো অন্তর, ভাবলাম ছুটে গিয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভগ্ন কণ্ঠে বললাম, "আমার অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা করবেন।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কর্তৃত্বের সুরে বলে গেলেন, 'আমাকে অনুসরণ করবেন না, করলে অনুশোচনা করতে হবে পরে—এ কথা জেনে রাখবেন।'

"নিমেষে তিনি ঘর ছেড়ে দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরটা ভয়ানক নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। মনের মধ্যে তাঁকে অনুসরণ করার বাসনা উঠলো প্রবল হয়ে; কেন জানি না, ইচ্ছে হতে লাগলো, তাঁকে ধরে এনে বেশ দু'ঘা কষিয়ে গলাটা টিপে ধরতে পারি!

"কিছুক্ষণের মধ্যে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে দ্রুত নীচে নেমে এসে বাইকটা বার করে চালিয়ে দিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে—যদি কোনো রকমে তাঁকে ধরতে পারি। মোটরে ওঠার আগেই হয়তো ধরে ফেলতে পারবো। জংগলের ধারে, রাস্তার বাঁকে নজরে পড়লো তিনি প্রায় ছুটে চলেছেন, পেছনে রয়েছে চীনে বাচ্চা চাকরটা। আমাকে পেছনে আসতে দেখে ছেলেটাকে পথের ওপর দাঁড় করিয়ে তিনি হন্-হন্ করে এগোলেন।

"আমিও প্যাডেলে আর একটু জোর দিয়েছি, ছেলেটা চাকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকে বাঁচাতে গিয়ে পড়ে গেলাম হুড়মুড় করে পাশের খাদে, ধূলো ঝেড়ে উঠে একচোট গালাগালি করলাম। সাইকেলে উঠতে যাবো, ছেলেটা হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজীতে বললো, "মশাই, দয়া করে যাবেন না। ইচ্ছে হোল, ঘুঁষি লাগিয়ে দিই, কিন্তু দিলাম না। চাকরটা ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু হ্যাণ্ডেল ছাড়বে না কিছুতেই। চাকরটা আবার অনুনয় করে, 'আপনার পায়ে পড়ি, আপনি যাবেন না।'

আমি চোখ মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিলাম, 'বেরো বলছি, নইলে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দোব, উল্লুক কোথাকার।' চোখ বড়ো-বড়ো করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আতংকিত দৃষ্টিতে, কিন্তু হ্যাণ্ডেল ছাড়ে না কিছুতেই। বেশ বুঝলাম, আমি যাতে মহিলাটিকে অনুসরণ করতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যেই চাকরটা বাধা দিচ্ছে।

"আর সময় নষ্ট না করে একটি ঘুঁসিতে তাকে ধরাশায়ী করলাম, সাইকেলে উঠতে গিয়ে দেখি আছড়ে পড়ায় সামনের চাকাটি একদম বেঁকে গেছে। কি আর করা যায়, শেষে দৌড়ে তাঁকে ধরাই স্থির করলাম। এই ভাবে দেশী লোকগুলোর সামনে দিয়ে মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েই আরম্ভ করলাম ছুটতে, লোকগুলো আমার ব্যাপার দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো—এমন দৃশ্য তারা কখনো দেখেনি। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়লাম জনবহুল বাজারে, চীৎকার করে সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়ীটা কোথায় গেলো?'

"দেশী লোকগুলোর কথায় জানলাম, গাড়ীটা এইমাত্র চলে গেছে। আমার চাল-চলনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তারা; যতো দূর দৃষ্টি চলে, মোটরের চিহ্ন নেই। কী আফশোস্, ছেলেটাকে আমার পথে বাধার সৃষ্টি করে তিনি উধাও হয়েছেন। কিন্তু এ রকম ভাবে পালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না, মুষ্টিমেয় শ্বেতাংগের সমস্ত কার্যকলাপই সকলে জেনে যায় অনায়াসে।

"জাভার মতো ছোট জায়গায় এই সব ঘটনা নিয়ে জোর আলোচনা চলে। আমার বাড়ীতে আসার সময় সোফারের কাছ থেকে মহিলাটির নাম-ধাম সবই জেনে নিই। তিনি এখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে বাস করেন, প্রসিদ্ধ এক ডাচ্-ব্যবসায়ী তাঁর স্বামী! ভদ্রলোকটি ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে মাস পাঁচেক আগে আমেরিকা গেছেন, কিন্তু মহিলাটি তাঁর অনুপস্থিতিতে মাত্র তিন মাস আগে গর্ভবতী হয়েছেন।

"এখন আপনাকে আমার উন্মত্ততা স্পষ্ট করেই বোঝাতে পারবো, আপনি শুধু শুনে যান। নিজের কোন রোগও আমি সহজেই ধরতে পারি; এর পর থেকে আমার অবস্থা হয়েছিলো জ্বরের ঘোরে রোগীর ভুল বকার মতো। নিজেকে যেন কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না; আমার আচরণ চরম অসংগত, তা বুঝলেও বারে-বারে আমি করে যাচ্ছিলাম সেই একই ভুল।

"আপনার হয়তো জানা নেই, মালয়ের লোকেরা এক ধরণের মনোবিকারে ভোগে, যাতে আমিও তখন ভুগছি। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে: রোগী সর্বদাই আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে, হঠাৎ দেখলে মনেই হয় না কিছু হয়েছে। মহিলাটি আসার আগে আমার এমনি অবস্থাই ছিলো। এই রোগাক্রান্ত লোকের মানসিক অবস্থা তখন এতো বেপরোয়া হয় যে, অনায়াসে দু'-একটা খুন-জখম করে ফেলতেও দ্বিধা করে না। ক্রমেই খুনের নেশা এমন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় যে, তাকে গুলী করে শেষ করে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না, কেন না তখন সে অবিরাম খুনের পর খুন করে যাবে।

"আমিও ঠিক এমন ব্যাধিগ্রস্ত বেপরোয়ার মতো মহিলাটিকে আর একবার দেখবার জন্যে পাগলের মতো ছুটেছিলাম তাঁর পেছনে, আমার ঘাড়ে তিনি যেন ভূত হয়ে চেপেছেন। আর দেরী না করে একটা সুটকেশে কিছু টাকাকড়ি- পোষাক-আশাক ভরে নিয়ে কাছাকাছি ষ্টেশনের দিকে ছুটলাম; কিন্তু উত্তেজনার বশে এতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কোন ফল হোল না! যতো দূর স্মরণ করতে

পারি, ষ্টেশনে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে এলো। ও-অঞ্চলটা দুর্গম পার্বত্য-প্রদেশ বলে রাত্রে ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকে, কাজেই রাত্তিরটা কাটলো ডাক-বাংলোয়। পরদিন সন্ধ্যেয় আমি পৌঁছলাম মহিলাটির দেশে, ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ী পৌঁছতে লাগলো দশ মিনিট। আপনি হয়তো ভাবছেন, লোকটা কি বদ্ধ পাগল না কি! কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অপদার্থ, কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই হুঁস নেই। কার্ড বার করে চাকরকে দিলাম, সে ফিরে এসে জানালো তিনি অসুস্থ, এখন কারুর সংগে দেখা করতে পারবেন না।

"রাস্তায় নেমে পড়ে অনেক ক্ষণ তাঁর বাড়ীর আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করতে লাগলাম, যদি একবার তাঁর দেখা পেয়ে যাই! কিন্তু আশা পূর্ণ হোল না, ব্যর্থ মনে সামনা-সামনি একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করলাম। তার পর হুইস্কি গিললাম পুরো দমে, ঘুমিয়ে পড়লাম অজগরের মতো।"

জাহাজের ঘণ্টাটা আট বার বেজে উঠলো, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে: ঢুলুনি ভেঙে আবার আগের কাহিনীতে ফিরে এলেন ডাক্তার:

"ঘুম ভাঙতে দেখলাম জ্বর এসে গেছে, মাথাটাও যেন ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। সেদিন মংগলবার, বিকেলে শহরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, শনিবার তাঁর স্বামী ফিরছেন। ভাবলাম, এখনও তো হাতে তিন দিন সময় রয়েছে, ইচ্ছে করলে ইতিমধ্যেই মহিলাটিকে বিপদমুক্ত করতে পারি। কিন্তু তাহ'লে আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না, প্রতিটি মুহূর্ত যেন এখন আমার কাছে পরম মূল্যবান বলে মনে হতে লাগলো। কিন্তু মহিলাটি আমায় এমন অপদস্থ করেছেন যে, তাঁর কোনো রকম উপকার করতেও মন সরছিলো না, তাছাড়া আমার আর সাহসেও কুলোচ্ছিলো না। কল্পনা করুন, আপনি এক জনকে গুপ্ত ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছেন, অথচ সে ভুল ক'রে আপনাকেই মনে করছে তার হত্যাকারী, এ অবস্থায় আপনি কি করতে পারেন? আমার মধ্যে মহিলাটি শুধু দেখলেন কামোন্মত্ত অনুসরণকারীকে, যে কুপ্রস্তাব করে আঘাত দিয়েছে তাঁর সম্ভ্রমে। কিন্তু তখন আমার উন্মত্ততা রূপ নিয়েছে মংগলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।

"পরদিন সকালে চীনে চাকরটাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি এখন মহিলাটিকে সাহায্য করতেই মনস্থির করে ফেলেছি এবং সম্ভবত তিনিও আমার সাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হবেন না। কিন্তু দেখা করতে আর সাহস হোল না, অনুতপ্ত অন্তরে নিজের হঠকারিতার জন্যে ধিক্কার করতে লাগলাম, তিনি কি আর আমার সাহায্য নেবেন না?

"এই অপরিচিত শহরে কি করে সময় কাটাই ভেবে ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ এক ডাচ-রাজপ্রতিনিধির কথা মনে পড়ে গেলো, মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর জখম পা আমারই চিকিৎসায় নিরাময় হয়ে ওঠে। তাঁর সংগে গিয়ে দেখা করলাম, অনুরোধ জানালাম আমায় পুরোন জায়গা থেকে বদলি করে দিতে। আরও জানালাম, ঐ বুনো জায়গায় আর বাস করতে আমি অক্ষম। ডাক্তার যে দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকায়, তিনিও সেই রকম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনি কি স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছেন?" তিনি আরো জানালেন যে, আমার জায়গায় নতুন ডাক্তার এসে গেলেই তিনি আমায় বদলি করবেন বা ছুটি দেবেন। ঘৃণা হোল নিজের ওপর, দাসত্ব ক'রে ক'রেই নিজেকে একেবারে বিক্রী করে ফেলেছি। আমি মানবো না তাঁর আদেশ, ছুটি এখুনি আমায় পেতেই হবে।

"আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বুদ্ধিমানের মতো আমাকে না চটিয়ে বললেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আপনি সেখানে প্রকৃত সাধুর মতোই জীবন-যাপন করেন এবং আশ্চর্য্য হয়েছি যে, আপনার সমস্ত কর্মজীবনে একবারও ছুটি নেননি। সে রকম আমুদে লোকের সংস্পর্শে থাকলে আপনার হয়তো এরকম মানসিক দুরবস্থা হোত না। যাই হোক, আজই সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে একটা পার্টি আছে, সব কিছু আমোদ-প্রমোদেরই বন্দোবস্ত হয়েছে, এখানের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আসছেন, আপনিও আসুন না তাতে? আপনার অনেক পরিচিত লোকেরও দেখা পাবেন, সন্ধ্যেটাও কাটবে ভালো।' বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেলো, অভ্যাগতের মধ্যে আমার ঐ মহিলাটিও কি থাকবেন না? হয়তো থাকবেন। নিমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

"সন্ধ্যেবেলা সবার আগে হাজির হলাম রাষ্ট্রদূতের ভবনে, কুড়ি মিনিটেরও ওপর একা-একা বসে রইলাম, তার পর একে-একে অতিথিরা আসতে লাগলেন। কেউ-কেউ সস্ত্রীকও এসেছিলেন সে-আসরে, প্রত্যেকেই আমায় সাদর-সম্ভাষণ জানালেন। এর একটু পরেই আবার স্নায়বিক দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম।

"হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে সেই মহিলাটি প্রবেশ করলেন ঘরে, হলদে পোষাকে তাঁকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিলো, অনাবৃত কাঁধ দু'টিতে যেন আইভরির শুভ্রতা। সকলের সংগেই তিনি মধুর ভাবে আলাপ করছিলেন, কিন্তু একমাত্র আমিই অনুভব করছিলাম তাঁর আনন্দোচ্ছাসের কৃত্রিমতা।

"তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, তিনি যেন দেখেও দেখলেন না। তাঁর মুখে-চোখে গভীর প্রশান্তির হাসি; অবাক হলাম, যাঁর স্বামী দু'-এক দিনের মধ্যে আসছেন, ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা নিয়েও তাঁর নিশ্চিন্ততা! আর তাঁর জন্যে যতো ভাবনা কি না আমার? অনুভব করলাম, বেদনাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন হাসিতে, উচ্ছ্বাসে।

"পাশের ঘর থেকে সংগীতের ঝংকার ভেসে আসছিলো, এবার সুরু হবে নাচ। একটি ভদ্রলোক মহিলাকে নৃত্য-সংগিনী হতে অনুরোধ করলেন, অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভদ্রলোকটির হাত ধরে এগিয়ে গেলেন নাচের আসরের দিকে। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় পরিচিতের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে বলে গেলেন, 'নমস্কার ডাক্তার!'

"তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টির মধ্যে কী মনোবেদনা লুকিয়ে ছিলো তা কেউই বুঝতে পারেনি; আর তাঁর আমার প্রতি অন্তরংগ ব্যবহারে আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। তিনি কি আগের গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে চান? না কি এ-ব্যবহার সম্পূর্ণ লোক-দেখানি? ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। নাচের তালে তালে তাঁর মুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রহস্যঘন আভা, তিনি কি আমাদের পুরোন আলাপের কথা মনে করে বিদ্রূপে মুখ বেঁকাচ্ছেন?

"কথাটা মনে ঘা দিতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, তাঁ

দিকে প্রথম থেকেই অপলকে চেয়ে আছি, সম্ভবত এমন নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। দু'-একবার লক্ষ্য করলাম, নাচের মধ্যে মোড় ঘোরবার সময় তেজব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমাকে সংযত হতে বলছেন। বুঝলাম, মানসিক ব্যাধি আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে, এ থেকে সহজে রেহাই নেই। মহিলাটির ইংগিতের অর্থ স্পষ্ট বুঝলেও পারলাম না নিজেকে সংযত করতে, মোহচ্ছন্নের মতো উঠে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে নব-পরিচিত অতিথি-অভ্যাগতের ভীড় ঠেলে। অভিনন্দন জানানো তো দূরে থাক, কেউ আমার সংগে একটা কথাও বললো না, প্রত্যেকেই আমার ব্যবহারে ক্লষ্ট হয়েছে। মহিলাটির আচরণেও অনুভব করলাম, আমার এই অনধিকার অগ্রসরকে তিনি মোটেই অনুমোদন করেন না, কিন্তু আমার অবস্থা তখন শোচনীয়! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি সবার কাছে বিদায় নিয়ে বললেন, 'আমার শরীর আজ বিশেষ ভালো নয়, মাপ করবেন, আমি আর থাকতে পারছি না, নমস্কার!'

"আমার দিকে পলকে চেয়ে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম; সমাগত প্রত্যেকেই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমিও লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলাম না। আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিক্ষেপ করলেন; সংগে-সংগে ক্রোধ দমন করে হাসির ঝলক তুলে বললেন, 'ডাক্তার, আমার ছোট ছেলের ওষুধের কথা বলছেন? এখানে সে-কথা কেন? ও, আপনারা আবার আপন-ভোলা বৈজ্ঞানিক মানুষ, আপনাদের কথাই আলাদা!' তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধির কেরামতিতে আমি যেন বেঁচে গেলাম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবুক আর পেনসিল বার করে একটা বাজে-বাজে প্রেসক্রিপশন্ করে তাঁর হাতে দিতেই তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

"সবাইকার সন্দেহের কবল থেকে তিনি এই ভাবে আমাকে বাঁচালেন। কিন্তু আমি বুঝলাম, তিনি আমাকে রাস্তার একটা কুকুরের চেয়ে ঘৃণা করেন। অপমানের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে টলতে-টলতে উপরি উপরি পাঁচ পেগ মদ গিললাম, আর তখন সে ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিলো না, মদ খেয়ে এক পা চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। সবার অলক্ষ্যে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, ভাবলাম, আর না, অনেক হয়েছে, বোতলের পর বোতল খেয়ে নিজেকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দোব।

"মহিলাটির বিদ্রূপের হাসি তখনো আমার কানে বাজছিলো, সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে আফশোস্ হতে লাগলো, পিস্তলটা কেন সংগে আনিনি, একটি মুহূর্তেই তাহ'লে এর সমাধান হয়ে যেতো। ক্লান্ত চরণে হোটেলে ফিরলাম। ভাবছেন, এতোই যখন আত্মধিক্কার, তখন আত্মহত্যা করলাম না কেন? ভয় পেয়েছিলাম? না। আমার কর্তব্যের কথা মনে আসতেই আত্মহত্যা স্থগিত রাখলাম, এখন আমার সাহায্যের তাঁর একান্ত প্রয়োজন। আর দু'দিন পরেই তাঁর স্বামী এসে যাচ্ছেন, তখন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে কেলেংকারীর শেষ থাকবে না, কাজেই এ অবস্থায় আমি মরি কি করে?

"আমার কোন অসদুদ্দেশ্য নেই, কেবল তাঁকে সাহায্য করতে আমি এখানে ছুটে এসেছি—এ কথা এখন তাঁকে বলা যায় কি করে? কি করি, কি করি, করতে করতে চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেলো মাথায়। চেয়ার টেনে বসে ক্ষমা চেয়ে এক চিঠি শেষ করলাম, চিঠিতে আরো জানালাম, উপকারের প্রতিদান আমি চাই না, কাজ শেষ হলেই আমি চিরদিনের মতো তাঁর কাছ থেকে বিদায় নোব। সে চিঠির ভাষা এবং ভাব এতো খাপছাড়া আর অপ্রকৃতিস্থ, যে, যে-কেউ তাকে পাগলের লেখা মনে করবে। চিঠিখানা শেষ ক'রে উঠে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো, ঢক্-ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেলাম। তার পর খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে পেছনে পুনশ্চ দিয়ে লিখে দিলাম, আপনার ক্ষমা পাবার আশায় থাকলাম, সন্ধ্যের মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই, তাহ'লে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই জানবেন। চিঠি ডাকে ফেলে সময় গুণতে লাগলাম।

"এই ভাবে সারাটা দিন কাটলো, মানসিক অশান্তিটা আবার আমাকে কাবু করছে, এ-থেকে আমার আর নিষ্কৃতি নেই। নানান আবোল-তাবোল ভাবছি, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো। একটি দেশী বালক এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিলো, তাতে লেখা আছে, 'অসম্ভব দেরী হয়ে গেছে। যাই হোক, হোটেলেই থাকবেন শেষের দিকে হয়তো আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

"আমার চিঠির জবাব যে পেয়েছি, এতেই আমি মশগুল হয়ে গেলাম, বেঁচে আমাকে থাকতেই হবে, আমাকে যে তাঁর প্রয়োজন! ওঃ, কী আনন্দ! এই রকম আত্মহারা হয়ে চিঠিতেই একটা চুমু খেয়ে বসলাম। তার পর অনুভব করতে লাগলাম আমি যেন ক্রমেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বেহুঁস হলাম।

"এই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটলো চার ঘণ্টা পরে, তখন হয়ে এসেছে। দরজায় টোকা মারার আওয়াজে এগিয়ে গিয়ে দেখি সেই চীনে চাকরটি, আমাকে দেখেই বললো, "শীগ্‌গির আমার সংগে আসুন, দেরী করবেন না, এক্ষুণি!' তার পেছন-পেছন নীচে নেমে হন্তদন্ত হয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

"গাড়ী ছাড়লে পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার বল্ তো?' উদাস-দৃষ্টিতে ছেলেটা আমার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো, জবাব দিলো না। বার-বার প্রশ্ন করেও জবাব না পেয়ে রাগ চড়ে গেলো আমার, মনে হোল দিই দু'ঘুঁসি লাগিয়ে। কিন্তু ইচ্ছে হোল না, তার বিশ্বস্ততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। গাড়োয়ানটা ঘোড়া দু'টোকে জোরে চাবুক কষাচ্ছে বার বার, তীরের মতো গাড়ী ছুটছে আর চাপা পড়ার ভয়ে রাস্তার লোকগুলো ছুটে পালাচ্ছে দু'পাশে।

"ক্রমেই আমার শ্বেতাংগদের পাড়া ছাড়িয়ে এসে পড়লাম চীনা-বস্তি এলাকায়, গাড়ী সরু একটা গলির মুখে থামলো, পাশেই বস্তির হোটেল থেকে বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে, কয়েকটা ঘরে জমেছে আফিং-এর আড্ডা, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জন কয়েক দেহ-পসারিণী। এই নোংরা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে আমাকে হাজির করা হোল একটা ঘরের সামনে। দরজায় ধাক্কা দিতেই একটি চীনে নিচুস্বরে মেয়ে বেরিয়ে এলো।

"ছেলেটার পেছন-পেছন সরু পথ ধরে ভেতরের একটা ঘরে

সামনে এসে হাজির হলাম, দরজা খুলতেই এক অস্ফুট গোঁঙানি আমার কাণে এসে বাজলো, কেউ যেন অসহ্য যন্ত্রণায় গোঁঙাচ্ছে। অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে না পেরে শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটা কথা কইতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো হঠাৎ।

"এগিয়ে গিয়ে দেখি, আমার সেই সাধের মহিলা নোংরা মাদুরের ওপর গড়াতে-গড়াতে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম ভীষণ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অবস্থা দেখে আমি শিউরে উঠলাম, ব্যাপার তো সাংঘাতিক গড়িয়েছে দেখছি। বুঝলাম, আমার কাছে সাহায্যের আশা নেই দেখে তিনি হাতুড়ে চীনে দাই-এর শরণাপন্ন হন, যার ফল দাঁড়িয়েছে এই। আমার দুর্ব্যবহার এবং অন্যায় কামুকতায় তিনি এতো বেশি অপমানিত বোধ করেছিলেন যে, তার চেয়ে ঐ অশিক্ষিত চীনে দাই-এর হাতে প্রাণ দেওয়াও তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিলো।

"আলোর জন্যে হাঁক-ডাক করাতে দাইটা একটা কেরোসিনের ডিবে এনে হাজির করলো। তাকে দেখে এমন রাগ হোল, মনে হোল গলা টিপে খুন করি, কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? আলোতে অভাগিনীর পাংশু দেহটা চোখে পড়লো। ক্রমেই কেটে যেতে লাগলো ভয়, হুঁস হোল আমি এখানে এসেছি রোগীর চিকিৎসা করতে, ভয় পেতে নয়। মহিলাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে—যেমন কোরেই হোক।

"এক দিন যে-দেহের প্রতি চরম আসক্ত হয়েছিলাম, সেই নগ্ন রুগ্নের দেহে হাত চালাতে আজ আমার কোন বিকারই এলো না। কোনো রকমে যদি মৃত্যুপথগামীকে ফেরাতে পারি—এই তখন আমার একমাত্র জেদ। কুচিকিৎসার ফলে অবিশ্রাম রক্তস্রাব ঘটছিলো, কি করে বন্ধ করি এই ভয়াবহ স্রাব। এখানে নেই কোন সরঞ্জাম, না আছে পরিষ্কার জল, না পর্যাপ্ত কাপড়। অর্ধচেতন রোগিণীকে বললাম, 'আপনাকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার, এখানে আমি কোন দিশে পাচ্ছি না।' সেই অবস্থাতেই তিনি হাত-পা ছুঁড়ে বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, তা কক্ষণো হতে পারে না, মরতে হয় এখানেই মরবো। তার চেয়ে আপনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন—বাড়ী নিয়ে চলুন।' বুঝলাম, জীবনের চেয়ে চরিত্রের মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। এর পর একটা চৌকিতে শুইয়ে তাঁর অর্ধমৃত দেহটাকে বয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলাম, কিন্তু মরণ যে তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, এবার আমি বুঝতে পারলাম স্পষ্ট।"

সহসা আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে অকথ্য বেদনায় ভদ্রলোক গুমরে উঠলেন, তারার স্বচ্ছ আলোয় আমি দেখলাম তাঁর ঝলসে ওঠা দাঁতের সারি আর চশমার দু'টো কাচ।

আবার তিনি স্পষ্ট গলায় সুরু করলেন, "আপনি তো এক জন ভ্রমণকারী, মৃত্যুর যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা আপনি কি করে বুঝবেন? অন্তিম মুহূর্তে তারা কী ভীষণ সংগ্রাম করে তার খবর রাখেন? আপনি কেবল দেশভ্রমণ করেই বেড়ান, এ সম্বন্ধে আর আপনার কী অভিজ্ঞতা থাকবে। মৃত্যু যে কতো ভীষণ তা আমি অনেক বার দেখেছি, বহু মুমূর্ষুর পাশে বসে একটু-একটু করে তার শেষ-নিশ্বাস ত্যাগও দেখেছি কতো বার। কতো অনুরোধই না করলাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি হাসপাতালে যেতে রাজী হলেন না। নিরুপায় অস্থিরতায় তাঁর পাশে বসে দেখলাম মৃত্যুর অগ্রসরতা।

"আমার ক্ষোভ হয়, তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে এ-হতভাগ্য শুশ্রূষাকারীরও মরণ হোল না কেন? পরের দিন থেকে আবার সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সার্থকতা কি? তাঁকে বাঁচাবার এতো চেষ্টা কি এমনি ভাবেই ব্যর্থ হবে? কোন ফলই কি পাবো না?

"চীনা বালকটি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ব্যাকুল ভাবে তাঁর জীবন-ভিক্ষা করছিলো, আর বার বার করুণ নয়নে তাকাচ্ছিলো আমার মুখের দিকে—আমি যেন বাঁচালেও বাঁচাতে পারি! ছেলেটি প্রয়োজন হলে রক্তও দান করতে পারতো তাঁর জীবনরক্ষায়, আমিও পারতাম। কিন্তু শেষ সময়ে কি আর হবে রক্ত ইঞ্জেকশন করে, শুধু শুধু কষ্ট বাড়ানো। তাঁর প্রাণের বিনিময়ে আমরা নিজেদের প্রাণ দিতেও তখন কেয়ার করি না। তাহ'লেই ভেবে দেখুন—কী অসম্ভব তাঁর আকর্ষণী শক্তি!

"খুব ভোরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, সেই সময়কার চাউনিতে আগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ গর্বের চিহ্নমাত্র নেই—হতভম্ব দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে যেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের পূর্বের ঝগড়ার কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে, এখন আমি যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই তিনি শান্তি পান; তেমনি শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বসবার চেষ্টা ক'রে কিছু বলবারও চেষ্টা করলেন। আমি তাঁকে শুয়ে থাকতে অনুরোধ করলাম; কথাগুলো তাঁর জড়িয়ে আসছিলো, অস্পষ্ট গলায় ফিস্‌ফিস্ করে তিনি বললেন 'কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে।' কথা দিলাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কথা পৃথিবীর কেউ-ই জানতে পারবে না।" লক্ষ্য করলাম, কেমন যেন অস্বস্তির ভাব তাঁর মুখে-চোখে, অতি কষ্টে শুধু উচ্চারণ করলেন, 'আমার কাছে শপথ করুন, এ কথা কেউ জানতে পারবে না, শপথ করুন।' আমি কথা মতোই শপথ করলাম। এতোক্ষণে তিনি নিশ্চিন্ত কৃতজ্ঞ-চোখে আমার দিকে চাইলেন, আমার এতো অন্যায়ও ক্ষমা করলেন। আরেক বার কী যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু হায়, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোল; পরম শান্তিঘন গভীর ঘুমে অভিভূত হলেন তিনি—দিন শেষ হওয়ার আগেই সব শেষ হলো।"

আবহাওয়া শান্ত, শুব্ধ; অবসাদে ভদ্রলোক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, ক্লান্তিতে এলিয়ে দিলেন নিজেকে। আকাশ থেকে তারাগুলো ক্রমশ মুছে যাচ্ছে, ফরসা হচ্ছে চারি দিক। অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করলাম, গভীর বেদনায় তাঁর মুখের রেখাগুলি কোমল।

আবার তিনি গল্পের খেই ধরলেন—"অবস্থাটা উপলব্ধি করুন। তিনি তো চলে গেলেন, মৃতদেহের পাশে বসে থাকতে হোল আমাকে। এ রকম ক্ষেত্রে নানা গুজবের উৎপত্তি হয়-ই, তাই সেখান থেকে এক পা নড়বার ক্ষমতাও আমার ছিলো না, আমি যে তাঁকে শেষ সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—এ ঘটনা কেউ জানতে পারবে না। ব্যাপার বুঝুন—ভদ্রমহিলা সেখানকার অভিজাত সমাজের এক জন মুকুটমণি বিশেষ, তার ওপর গত রাত্রেও তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসের উৎসবে যোগ দিয়ে এসেছেন, অথচ এক রাত্রের মধ্যে কী এমন হোল যাতে তিনি মারা

গেলেন! আমি চলে গেলেই খবরটা ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাকেও বাধ্য হতে হবে সত্যি ঘটনাটা প্রকাশ করতে। এক বার ভাবলাম, এখানকার সহকারী ডাক্তারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে সরে পড়ি, কিন্তু তখন তা কাজে করার ক্ষমতা আমার নেই। কী ভীষণ ফ্যাসাদে যে পড়লাম কী বলবো। চীনে চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর প্রভুর শেষ ইচ্ছে ছিলো ঘটনাটা যেন কেউ জানতে না পারে, তুই জানতিস এ-কথা? সে সরল ভাবেই উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

"তার পর ঘরের মেঝের রক্ত আর ময়লা দাগ ধুয়ে এমন পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে ফেললাম যে, কারুর মনে আর এতোটুকু সন্দেহ হবে না। স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার কর্মশক্তি যেন লাখ গুণে বেড়ে গেছে। সব কিছু যে হারিয়েছে তার বুঝি এমনই হয়, সামান্য স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে চায় বেঁচে থাকতে। আমার অবস্থাও তখন তাই, তাঁর শেষ অনুরোধটুকুই আমার সম্বল, তাকে বজায় রাখাই আমার একমাত্র কর্তব্য। মন আমার শান্ত, সংযত। ঠিক হয়ে থাকলাম যে, যদি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হয় তবে এমন এক রোগের নাম হাজির করবো যা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হতেই পারে এবং নিঃসন্দেহেই তা মারাত্মক, আর আমার কথায় কে-ই বা অবিশ্বাস করবে? যাই হোক, সাধারণ লোককে বললাম, তিনি পীড়িত হয়ে পড়তেই চীনে ছেলেটি আমায় খবর দেয় এবং আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করেই তিনি পরলোক গমন করেন।

"প্রধান চিকিৎসকের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, কেন না তিনি অনুমোদন না করলে এ-মৃতদেহের কোন ব্যবস্থা হবে না। তিনি এলেন ন'টার সময়, এই ডাক্তারের ওপরই ছিলো আমাকে বদলি করার ভার। ভদ্রলোক আমার ডাক্তারী শাস্ত্রে দখল এবং সৌভাগ্যের জন্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, ঘরে ঢুকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ম্যাডাম ব্ল্যাক কি সত্যি সত্যিই মারা গেছেন?' "আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই সকাল ছ'টায়।' তিনি আবার জানতে চান, তিনি আপনাকে কখন্ "কল" দেন? 'গত কাল সন্ধ্যেবেলা।' ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন, আমিই এ-বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার, সব জেনে-শুনেও আপনি আমায় খবর দিলেন না কেন?'

"আমি বললাম, 'তখন আর সময় ছিলো না খবর দেবার, তাছাড়া তিনি আমার ওপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করেছিলেন এবং অন্য কাউকে ডাকতেও বারণ করেছিলেন তিনি।'

"তিনি হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, 'আপনার কর্তব্য অবশ্য আপনি করেছেন, কিন্তু তাহ'লেও আমাকে এক বার পরীক্ষা করে দেখতে হবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি।'

"আমি থতমত খেয়ে গেলাম, কথা জোগালো না মুখে। তিনি পরীক্ষা করার জন্যে মৃতের গায়ের ঢাকা সরাতে যেতেই আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'দেখুন, পরীক্ষার আর প্রয়োজন নেই, প্রকৃত ঘটনাই আমি আপনাকে খুলে বলছি। ম্যাডাম ব্ল্যাক এক জন হাতুড়ে নার্সকে দিয়ে গর্ভপাতের চেষ্টায় অসমর্থ হয়েই ডেকে পাঠান আমাকে। যখন পৌঁছোলাম তখন তাঁর অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিছুতেই তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন, এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে, আর আমিও প্রতিজ্ঞা রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প।'

"ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আপনি না-হয় আপনার প্রতিজ্ঞা রাখলেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমিও এই কলংক চেপে যাবো?'

"আমি নরম স্বরে বললাম, 'ব্যাপারটা আপনি ভালো করে বুঝে দেখুন। আপনি মনে করবেন না আমিই এ-ব্যাপারের নায়ক, এতে অন্য লোক লিপ্ত ছিলো। আপনি জেনে রাখবেন, আমার দ্বারা এ-কাজ হয়ে থাকলে এতোক্ষণ আমায় জীবিত দেখতে পেতেন না। তাই বলছি, প্রকৃত অপরাধীকে বার করতে হলে মহিলাটির চরিত্রেও তার আঘাত এসে পড়বেই, আর এতে আমিও বড়ো আঘাত পাবো।'

"ডাক্তার বললেন, 'আপনার তাতে আঘাত পাবার কি আছে? আপনি যে দেখছি আমার ওপর হুকুম চালাচ্ছেন! তা হতেই পারে না। পরীক্ষা করে মৃত্যুর সঠিক কারণ আমি লিখে যাবোই, মেকী সার্টিফিকেট আপনি কখনোই আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।'

"রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, দিতে আপনি বাধ্য, না দিলে এ-ঘর থেকে আপনাকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে হবে না জানবেন।' দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলে পকেটে হাত ভরে পিস্তল ওঠাবার ভাণ করতেই ভয়ে তিনি পেছু হটলেন।

"আবার বেশ গম্ভীর ভাবেই আরম্ভ করলাম, 'জীবনটাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি, যে-কথা শেষ সময়ে আমি দিয়েছি তা বজায় রাখতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দোব, এবং তাতে যদি কারো প্রাণ নিতে হয়, তাতেও আমি পেছ-পাও নই! আপনি সার্টিফিকেট লিখে দিন, কোন এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হবার সংগে সংগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনাকে কথা দিচ্ছি, এর পর আমি এ-দেশ ত্যাগ করবো। এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহ'লে জেনে রাখুন, মহিলাটি কবরস্থ হবার পর একটি গুলীতে মাথার খুলি ফাটিয়ে নিজের প্রাণ দোব। এবার নিশ্চয়ই আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

"আমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তিনি ভীষণ ভড়কে গেলেন। তবু অজুহাতের শেষ নেই!—'জীবনে এ-ধরণের সার্টিফিকেট আমি কাউকে দিইনি, কাজেই এটা আমার চরম অধর্ম বলেই মনে হয়।'

"আমি বললাম, 'আপনার কথা আমি স্বীকার করি, এতে আত্মসম্মানেও বাধে, কাজটাও সাংঘাতিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্য রকম, সত্য ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে ওঁর স্বামীকে সারা জীবন মানসিক অস্থৈর্যের মধ্যে কাটাতে হবে, আর তার সংগে সংগে মৃতা মহিলার চাঞ্চল্যকর কাহিনী চার দিকে ছড়িয়ে গিয়ে শ্বেতাংগ সমাজের ঘৃণিত রূপ প্রকট করবে—সেটা কি ভালো হবে? আপনিই বা কেন এতো বিচলিত হচ্ছেন? মত দিন।'

"ভদ্রলোক রাজী হলেন। আমরা সার্টিফিকেটের একটা খসড়া তৈরী করতে বসলাম। কাজ শেষ ক'রে উঠে তিনি বললেন, 'আপনাকে কিন্তু সামনের সপ্তাহেই ইউরোপ রওনা হতে হবে।' 'আমিও বললাম, আপনাকে সে-প্রতিশ্রুতি তো আমি আগেই দিয়েছি।' কথায়-বার্তায়-আচরণে ভদ্রলোক একেবারে ঝানু ব্যবসাদার!

"মানসিক-চাঞ্চল্য চাপা দেবার জন্যেই যেন তিনি আরম্ভ করলেন, 'এঁর স্বামী হয়তো মৃতদেহ নিয়ে ইংলণ্ড যাবেন পরীক্ষা করতে, বড় লোকের খেয়াল তো! আমাকে আবার কফিনের মধ্যে

মৃতদেহ শীল করে দিতে হবে। ভদ্রলোক তো শীগ্‌গিরই ফিরছেন, ক'দিনই বা আর আমি আগলে রাখবো এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।'

"কিছু ক্ষণের মধ্যে তিনি আমার সংগে চরম বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে লাগলেন। এর প্রকৃত কারণ অবশ্য—আমার কবল থেকে তিনি চিরদিনের মতো রেহাই পেলেন, এখন চিকিৎসা-জগতে একচ্ছত্র হবার কোন বাধাই রইলো না তাঁর। আমার সংগে করমর্দন করে বললেন, 'আশা করি কিছু দিনের মধ্যেই আপনি সেরে উঠবেন।'

"আমাকে কি উন্মাদ ঠাওরালেন না কি ভদ্রলোক? তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরই শরীর যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগলো, মৃতার পাশেই জ্ঞান হারালাম। কতোক্ষণ এমনি ভাবে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ কানের ভেতর দিয়ে মগজে একটা উৎকট আওয়াজ ঢুকতে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে দেখলাম, সেই চীনে ছেলেটা। সে বললো, 'কে এক জন ভদ্রলোক এসেছেন।' আমি বললাম, যে-ই হোক, খবরদার ভেতরে ঢুকতে দিবি না।' ছেলেটা কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো; জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সে?'

সে শুধু বললো, 'সেই লোকটি!' লজ্জায় আর তার কথা বেরুচ্ছিলো না, আমিও বুঝলাম লোকটি কে।

"আপনি হয়তো আশ্চর্য হবেন, ভদ্রমহিলা আমার অন্যায় দাবী প্রত্যাখ্যান করার পর এই গোপনীয় ব্যাপারের নায়কটির কথা আমার একবারও মনে আসেনি। এই লোকটিকে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে দেহ দান করেন অথচ আমাকে সুযোগ দেননি। আগে হলে হয়তো লোকটিকে টুকরো করে ফেলতাম, কেন না সে-ই তাঁর আসল প্রণয়ী, যার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না।

"পাশের ঘরে ঢুকে দেখলাম এক অপরূপ তরুণকে, শোকে-দুঃখে মুখখানা ভার-ভার, তারুণ্যসুলভ কোমলতা মাখানো।

"নমস্কার করতে গিয়ে হাত দু'টো কাঁপতে লাগলো, ইচ্ছে হলো, জড়িয়ে ধরে আদর করি। প্রকৃত প্রেমিকের সব ক'টি গুণেরই অধিকারী এই ছোকরাটি, প্রেমের ক্ষেত্রে যা-কিছু প্রয়োজন সবই যেন এতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে—কাজেই মহিলাটি যে আসক্ত হয়ে দেহ দান করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

"জল-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে শুধু বললো, 'আমি মাদাম ব্লাঙ্ককে শুধু একটি বারের জন্যে দেখতে চাই।'

"তরুণের কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে যাবার সময় সে আমার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালো—এখন আমরা দু'জনেই যেন একই সুতোয় চিরদিনের মতো বাঁধা পড়ে গেছি। মৃতার শয্যাপার্শ্বে তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সরে গেলাম—আমার উপস্থিতিতে হয়তো তার সংকোচ কাটবে না, আর সে-ই যখন আসল প্রেমিক। হঠাৎ যুবকটি অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠলো। আমি আর কি করতে পারি, তাকে ধরে তুলে বসালাম সোফায়, কুঞ্চিত সুন্দর চুলগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় চালাতে লাগলাম আলতো ভাবে আঙুলগুলো। যুবকটি আমার হাতটা মুঠোয় চেপে ধরে করুণ নয়নে জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার, আমায় বলুন, সত্যিই কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন?'

"আমি বললাম, 'না, না।' তরুণ আবার জিজ্ঞেস করলো, 'এ-মৃত্যুর জন্যে অন্য কেউ দায়ী বলে কি আপনি মনে করেন?' আমিও আবার উত্তর দিই, কেউ-ই না, এ নিয়তির পরিহাস ছাড়া কিছু নয়।' সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ডাক্তার, পরশু রাত্রে তাঁর সংগে আমার নাচ-ঘরে দেখা হয়েছে, এতো শীগ্‌গির কি করে তিনি ছেড়ে গেলেন আমাদের?'

"নানা রকম আজগুবি কথা বলে আসল ঘটনাটা আমি চেপে গেলাম। প্রেমিকের মনে যাতে কোনো রকমে না আঘাত লাগে সেদিকে আমার খর-দৃষ্টি ছিলো। তাকে আমি জানতেই দিলাম না যে, মহিলাটি আমার কাছে এসেছিলেন গর্ভপাতের জন্যে, এবং আমি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি। তার সংগে দু'দিন ধরে কেবলমাত্র মহিলাটির নানা খুঁটিনাটি প্রশংসাতেই কাটিয়ে দিলাম।

"কফিন বন্ধ করার পরই মহিলার স্বামী এসে গেলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে শহরে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো, ভদ্রলোক সঠিক জানবার জন্যে আমার খোঁজ করতে লাগলেন, কেন না তিনিও গুজবটা সত্যি বলেই ধরেছিলেন। যে নারী আজীবন তাঁর কাছে নিগৃহীত হয়ে এসেছে, তার সংগে দেখা করতে আমার প্রবৃত্তি হোল না। চার দিন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাটালাম; মৃতার প্রেমিক আমাকে ছদ্মনামে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে দিলো, গভীর রাতে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে চেপে বসলাম। আমার যা কিছু সম্বল সব ফেলে এলাম পেছনে—শুধু তাঁরই জন্যে জলাঞ্জলি দিয়ে এলাম আত্মসম্মান, প্রতিপত্তি, সম্পদ। বাড়ীর ঐ জঘন্য বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে আর টিকতে পারছিলাম না, তাই রাতের অন্ধকারে চুপি-চুপি বাড়ী ছেড়ে সরে পড়লাম তাঁকে ভোলবার জন্যে—মন থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলার প্রয়াসে।

"কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম, তাঁকে ভোলা, তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে সরে যাওয়া আমার আর হোল না। মাঝ-রাতে জাহাজে উঠছি, এমন সময় লক্ষ্য করলাম—ক্রেণে ক'রে পেতলে-মোড়া একটা কফিন তোলা হচ্ছে জাহাজে। মনে হোল, আমি যেমন তাঁকে পাহাড় থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এক দিন অনুসরণ করেছি, আজ তেমনি এই কফিনটা আমার পেছু নিয়েছে, এ থেকে আমার রেহাই নেই। কফিনের পাশেই মৃতার স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে চাইতে আমার ঘৃণা বোধ হতে লাগলো। বুঝলাম, ভদ্রলোক ইংলণ্ডে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে দেহ পরীক্ষা ক'রে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে কৃতসংকল্প। আমিও ঠিক করলাম, কফিনটাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ কোরব, এবং প্রাণপণে চেষ্টা করবো যাতে সঠিক কারণ উনি কখনোই জানতে না পারেন। আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখবোই, না হয় প্রাণই যাবে।

"এখন আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন কেন যাত্রীদের কোলাহল, গান, হাসি-হল্লা আমার ভালো লাগছে না। তাঁর মৃতদেহ এই জাহাজেরই নীচের তলায় রয়েছে, দিন-রাত তাই আমার সেই কফিনের কথাই মনে পড়ছে মনে পড়ছে—মৃতার কাছে আমার সেই অন্তিম প্রতিশ্রুতির কথা। যেমন ক'রে হোক সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখবোই। ভয় হয়, গোপন রহস্য বুঝি বা ফাঁস হয়ে গেলো, কিন্তু আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না, তাঁর সুনাম আমি রক্ষা করবোই—যেমন ক'রে পারি।"

হঠাৎ জাহাজের মাঝ থেকে একটা আওয়াজ হতে ভদ্রলোক চমকে লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "না, আর এখানে আমি বসব না।"

নেশার ঘোরে ভদ্রলোকের চোখ দু'টি টকটকে লাল! তাঁর এই আচম্কা ছটফটানিতে আমি একটু অবাক হলাম। আমার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে তিনিও কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হোল। বন্ধুত্বপূর্ণ সৌজন্যের সংগে বললাম, "আজ সন্ধ্যায় দয়া করে আমার কামরায় আসুন না?" উত্তরে তাঁর কণ্ঠে বিদ্রূপ ধ্বনিত হোল, একটু শুকনো হেসে ঠোঁট কামড়ে জবাব দিলেন, "ধন্যবাদ, আমি একা-একাই বেশ আছি। হ্যাঁ, একটা কথা—"

আমিও বললাম, "বলুন—"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি যেন স্বপ্নেও ভাববেন না যে, সব কথা আপনাকে বলে আমি খুব শান্তি পেলাম। আমার জীবন টুক্রো-টুকরো হয়ে গেছে, তা আর জোড়া লাগবে না কখনো। দেখছি, ডাচ উপনিবেশে চাকরী নিয়ে আমার কোন লাভ তো হোলই না, মাঝখান থেকে নানা বিপাকে ধ্বংস হয়ে গেলাম। পেনসন বন্ধ হোল, কানা-কড়ি সম্বল করে ফিরতে হচ্ছে জার্মাণীতে, বেশ বুঝছি। দিন আমার ঘনিয়ে আসছে, তবু আপনার সংগ পেয়েও মনটা হাল্কা হোল, ধন্য হলাম আমি।"

"জাহাজের কেবিনে আমার একমাত্র সংগী এখন মদ, মদই আমার ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীবনে এনে দেয় নিবিড় প্রশান্তি। এ ছাড়া আর একটি সংগী আমার আছে, পরম বিশ্বস্ত সে, সে হচ্ছে আমার পিস্তল। স্বীকারোক্তিতে যে শান্তি পেলাম তার চেয়েও গভীর শান্তি দিতে পারবে আমার সেই বন্ধু—পিস্তল।"

একটু হাঁফ নিয়ে আবার বলে চললেন, "অনেক কষ্ট আপনাকে দিয়েছি বন্ধু, আর আপনাকে আটকে রেখে আমার অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাই না।"

তাঁর চাউনিতে বুঝলাম, গভীর লজ্জা তাঁর হৃদয় জর্জরিত করছে। আর একটি কথাও না বলে তিনি চলে গেলেন তাঁর কামরার দিকে।

সেদিনও গভীর রাত্রে ডেকের ওপর আবার তাঁর খোঁজ করলাম কিন্তু পেলাম না তাঁকে। এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে আবিষ্কার করলাম মহিলার স্বামী সেই শোকার্ত ডাচ ভদ্রলোকটিকে নিজের মনে আচ্ছন্ন ভাবে তিনি ডেকের ওপর পায়চারি ক' ফিরছিলেন।

নেপল্‌স্ বন্দরে জাহাজ ভেড়বার পরে অধিকাংশ যাত্রীই নেমে গেলো। আমিও নামলাম, নাচ দেখলাম অপেরায়, তার পর সুন্দর এক কাফেতে পরিপাটি ক'রে রাত্রের খাওয়া সারলাম।

জাহাজে ফেরার মুখে একটা গোলমাল কানে এলো, দেখলাম, সামনের নৌকোগুলো থেকে মাঝিরা টর্চ ফেলে ফেলে জলের মধ্যে কি যেন খুঁজছে। বুঝলাম না ব্যাপার কি, তা ছাড়া আমার আর কৌতূহলও হলো না তখন।

জাহাজ জেনোয়ায় এসে পৌছোল। খবরের কাগজ পড়ছি, একটা খবরের ওপর চোখ আটকে গেলো, আমি চম্‌কে উঠলাম পড়ে। 'কাগজে যা বেরিয়েছে তা সংক্ষেপে—'রাতের অন্ধকারে ডাচ বন্দর থেকে আগত একটি মহিলার শবাধার জাহাজ থেকে নৌকোয় তোলা হয়, মৃতার স্বামীও সেই নৌকোয় ছিলেন। নৌকো জাহাজ থেকে সামান্য একটু এগিয়েছে, এমন সময় এক পাগল হঠাৎ জাহাজের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নৌকোর ওপর পড়বার সংগে সংগেই শবাধার সমেত নৌকোটা তলিয়ে যায়, মৃতার স্বামী ও অন্যান্য আরোহীরা কোনো রকমে বেঁচে যান।'

কাগজের অন্য একটি জায়গায় আর একটি খবর—'নেপল্‌স্ বন্দরের তীরে অপরিচিত এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেছে, মৃত ব্যক্তির মাথায় গুলীর চিহ্ন, সম্ভবতঃ আত্মহত্যা।'

কোন লোকই মৃতব্যক্তির সংগে এ-ঘটনার যোগ আছে বলে মনে করে না; কিন্তু আমি করি, কেন না আমার কাছে কিছুই অজানা নেই আজ।

যাঁর কথা এতোক্ষণ ধরে বললাম, কাগজটা পড়ার সময় আমার অন্যমনস্ক মনের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর ঝাপসা মুখখানা আর চশমার দু'টো কাচ!

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়।

ক্ষমা

শ্রীবিমল মিত্র

—এ্রকি, বিন্তী না?

ট্রামের মধ্যেই বাসবী ইন্দু মাসীমা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

—ও মা, তোকে যে চিনতেই পারিনি, কী সুন্দর হয়েছিস্ আজ-কাল—

ইন্দু মাসীমা বাসবীর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন। কত বছর পরে দেখা! ভারী প্রিয় ছাত্রী ছিল ইন্দু মাসীমা'র। ছ'বছর বয়েস থেকে পড়িয়ে এসেছেন। ছোট্ট মেয়েটি যখন—তখন থেকে। লাল টুকটুকে ফ্রক পরলে ছোটবেলায় কোলে নিয়ে চুমু খেতেন ইন্দু মাসীমা।

—[illegible] ইস্কুল থেকে ফিরছি—তা তুই কবে বিয়ে করলি

[illegible]—ভাই

ভাবছিলাম রাঙা টুক্‌টুকে এমন বউটি কার, সাঁথের সিঁদুর পরে মাথায় কাপড়, যেন চেনা-চেনা লাগছে—ভালো করে চেয়ে দেখি ও মা আমার বিন্তীরাণী—

বলে ইন্দু মাসীমা আর একবার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন।

বাসবী চেয়ে দেখলে ইন্দু মাসীমা কিন্তু ঠিক সেই রকমই আছেন। 'সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যাভবন' এর শিক্ষয়িত্রীর হাতে সেই আগেকার মতন বেঁটে ছাতা একটি, সাদা থান ধুতিটা পার্শী মেয়েদের মত ঘুরিয়ে পরা, কাঁধের ওপর একটা সেলুলয়েডের ব্রোচ—মাথার চুলগুলো সমান মিহি করে' ছাঁটা—আর পায়ে সাদা ধবধবে কেড্‌স্—

দু'জনেই নেমে পড়লেন।

—তার পর কেমন বর হোল তোর বল্।

—চক্ষুর না দেখে আসবেন—বাসবী হাসতে হাসতে বললে।

—সে তো বাবোই, ভাবছিস্ ছাড়বো না কি, বিন্তীরাণীর বরকে না দেখে থাকতে পারি ? কি নাম তোর বরের ?

বাসবী মুচকী হাসতে লাগলো।

—লজ্জা কী, তোদের আধুনিক মেয়েদের আবার—আচ্ছা কানে কানে বল্, গুরুজনকে বলতে দোষ নেই—বলে বাসবীর স্নো-মাখা নরম গালের ওপর ইন্দু মাসীমা নিজের শীর্ণ গালটা ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন।

—বেশ নাম তোর বরের, অজয়—অজয়কে বলে দেব তো এমন সুন্দরী বউকে একলা রাস্তায় ছাড়তে আছে না কি—তা যাক্ গে বাজে কথা—ছেলেপুলে ক'টি ?

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে চলেছে শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রী। এই মোড় থেকে নতুন ট্রাম ধরে বাসবীকে আসতে হবে দক্ষিণে। অজয়ের অফিস থেকে আসবার সময় হয়েছে, ওদের নিয়ম বিকেলের চা টা দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া। যেখানেই থাক—ওই সময়ে অজয় বাড়িতে ফিরে আসবেই। ওই সময়ে অজয়ের পছন্দ মত রঙ-এর সাড়ী পরতে হবে। সাত দিনে সাতটা রঙের সাড়ী। সোমবারে মেরুণ, মঙ্গলবারে ধূপছায়া, বুধবারে জর্জেট···এমনি রুটিন করে দেওয়া আছে অজয়ের।

—ও মা, বলিস্ কী, এখনও হয়নি ?

রীতিমত চম্‌কে উঠলেন ইন্দু মাসীমা। সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও শূন্য কোল—এ কেমন কথা ! কোথাও কিছু গোলমাল আছে বৈ কি !

—লতিকে জানতিস্ তো বিন্তী, তোদের এক ক্লাশ নিচুতে পড়তো, এলাহাবাদে বিয়ে হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে, এবার সামার ভেকেশনে গেছলাম ওদের ওখানে, দেখে এমন ভালো লাগলো—পাঁচ বছরে পাঁচটি—জামাইটিকে বলে এলাম তোমার ডাক্তারী পড়া সার্থক হয়েছে বাবা—

হাসতে লাগলো বিন্তী।

—তুই আর হাসিস্ নে বিন্তী—তোদের আজ-কাল যা-সব কাণ্ড হয়েছে—আর মণ্টুকে চিনতিস তো, সেই যে ভারি কচি-কচি মুখখানা, বাসে আসতো—সেদিন আমিই সম্বন্ধ করে বিয়ে দিলাম গড়পারের এক ছেলের সঙ্গে, এক বছরও হয়নি—কাল শুনলাম··· ইন্দু মাসীমা'র মুখখানা আত্মগর্ব্বে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো—কাল শুনলাম এই আশ্বিনেই হবে—

রোদ লাগছে দেখে ইন্দু মাসীমা বাসবীর মাথার ওপরেও ছাতাটা বেঁকিয়ে ধরলেন।

—শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন ?

—কেউ নেই মাসীমা, বাপের বাড়ির দিকেও কেউ ছিল না, শ্বশুর-বাড়ীতেও কেউ নেই—ও আর আমি ফ্ল্যাট নিয়ে আছি··· যাবেন না এক দিন—

ইন্দু মাসীমা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—এক দিন কেন, আজই তো যেতে পারতুম তোর সঙ্গে—আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে দেখি—

ইন্দু মাসীমা ভাবতে লাগলেন।

বাসবী দেখতে লাগলো মাসীমাকে। এতটুকু কি চেহারায় পরিবর্ত্তন হতে নেই। ছোটবেলায় কবে বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীকে হয়ত আর মনেই পড়ে না। অল্প কিছু বাংলা লেখাপড়া জানা ছিল। সেই সময় গোয়াবাগানের মোড়ে ছোট হোগলা-পাতার ছাউনিতে "সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যাভবনে"র পত্তন হোল। সেদিন ইন্দু মাসীমাই একলা সব। জন কুড়ি ছাত্রী নিয়ে সুরু হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তার পরে ক'টি বছরের মধ্যেই তিনতলা পাকা-বাড়িতে দাঁড়াল সেই সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যাভবন। হেড মিষ্ট্রেসের চেয়ারে বসলো হেনা বোস, ইন্দু মাসীমা'রই প্রাক্তন ছাত্রী—কিন্তু তখন সে এম-এ বি-টি। কত নতুন মিষ্ট্রেস এল, কত ছাত্রী ইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেল—ইন্দু মাসীমা'র কিন্তু সেই এক অবস্থা। কাঁধে ব্রোচ, পায়ে সাদা কেডস্, হাতে বেঁটে ছাতা নিয়ে ঢুকে যেতেন হেড মিষ্ট্রেসের রুমে। বলতেন—এবার কল্যাণী ভাদুড়ীকে কেন টেষ্ট-এ পাশ করাসনি হেনা—জানিস তো তুই এগজামিনের আগে ওর কেমন ম্যালেরিয়া হয়েছিল—

পড়াতেন ক্লাশ ফাইভ-এ কিন্তু কর্ত্তৃত্ব করতেন হেড মিষ্ট্রেসেরও ওপর।

সকালে-সন্ধ্যেয় ছাত্রী পড়িয়ে আর দিনের বেলা ইস্কুলের চাকরী করে চলতো। বিন্তীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন লতিদের বাড়ী ; সেখান থেকে যেতেন কল্যাণীদের বাড়ি, তার পর ফিরে এসে নিজের সেই একখানি ঘর। বিধবা মানুষ, রান্না খাওয়ার হাঙ্গামা ছিল না। ছুটির দিনগুলো ছিল মজার। বাড়ি-বাড়ি সকলকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসতেন। লতি, বিন্তী, কল্যাণী, কনক আর মণ্টু।

ইন্দু মাসীমা সকলকে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে যেতেন কত জায়গায়। কলকাতার আশে-পাশে কোনও জায়গা আর বাকি ছিল না। সেখানে গিয়ে পিকনিক নয় চা-পর্ব্ব। চার দিকে ছাত্রীর দল ঘিরে বসে আছে আর মাঝখানে ইন্দু মাসীমা। ইন্দু মাসীমা গল্প বলছেন আর ফাঁকে-ফাঁকে কল্যাণীর গান। কল্যাণী ভাদুড়ী চমৎকার গান গাইত। সেদিন ইন্দু মাসীমা না থাকলে যে কী হোত ভাবা যায় না। জানালার গরাদের আড়ালেই হয়ত কেটে যেত সকলের। ইন্দু মাসীমাই সকলের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সব বাবা-মা'দের বুঝিয়ে মেয়েদের নিয়ে যেতেন। কিন্তু ঝক্কিও কি কিছু কম ছিল না কি !

—না রে, আজ তো হবে না, আজ শিখার বড় ছেলের জন্ম দিন—যেতে বলেছিল অনেক করে—

—তা' হলে কাল কিম্বা পরে এক দিন—বাসবী বললে।

—কালও হবে না, রিণুর বিয়ের বার্ষিকীতে নেমন্তন্ন করেছে ওর শাশুড়ী, না গেলে খারাপ দেখাবে—পরশু দিন [illegible]—
বিয়ে—তা' সে থাক গে ··· মা !

ঠিকানা রাস্তা ভা··· বাসবীকে প্রশ্ন করতে হয়।

—আর একটা ··· স হোয়েছে, ঘুম কমে গেছে, ভালো ঘুম ডাকলেন। ···রা রাত সিংহবাহিনীকে ডাকলাম। একটু কাছে গি··· আমার বাপের বাড়ীর বিগ্রহ—খুব জাগ্রত জানিস—এম··· লাম, আমার বিন্তীর কোলে একটি খোকা দাও পরে রাজি··· সংসার পূর্ণ কর মা ! সারা রাত এই কথা বললাম—ছেলে আ···ন ভোর হয়ে গেছে টের পাইনি।

এক দি··· বললে—ভালো করে খাটের ওপর পা তুলে বসুন সাঁখিদে

তখনও বাসবীর ঘুম ভাঙেনি। শনিবার দুপুরের ঘুম।

খটাখট্ কড়া নড়ে উঠলো।

ঝি উঠে দরজা খুলে দিয়ে এল। কিন্তু এখনও তো অজয়ের আসবার সময় হয়নি। তবে আর কে! কিন্তু না, সশরীরে ইন্দু মাসীমাই এসে হাজির।

—হ্যাঁ রে, এই বিকেল হতে চললো, এখনো ঘুম—ইন্দু মাসীমা ঘরে ঢুকে ছাতাটা রাখলেন।

—তা বেশ ফ্ল্যাট তোর, অজয় কোথায়? এখনও ফেরেনি অফিস থেকে? চার দিকে এক বার চেয়ে দেখলেন। বললেন—দেখি, তোর সংসারটা ঘুরে দেখে আসি···

বলে একলাই উঠলেন। বাসবীও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

—এইটি তোদের বসবার ঘর, আর এইটি বুঝি খাবার। তা বেশ হয়েছে, রান্না-ঘরের পাশেই খাবার-ঘরটি করেছিস, বেশি দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে না···ও মা, টবে করে একটি তুলসী গাছও লাগিয়েছিস্ দেখছি—

—ওটা ওই সৌরভী পুঁতেছে—আমার রাঁধুনি—বাসবী বললে।

—জানালার পর্দাগুলো নিজেই করেছিস না কি বিন্তী?

—ও তো আপনারই কাছে শেখা মাসীমা—স্কুলে আপনিই শিখিয়েছিলেন আমাদের।

—আর এ-ঘরটা বুঝি খালিই পড়ে থাকে? মাসীমা জিগ্যেস করলেন।

—কেউ এলে-গলে এইটেই ব্যবহার হয়।

—কত ভাড়া?

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করেন ইন্দু মাসীমা। ইন্দু মাসীমা আর পর নয় যে তাঁর কাছে কিছু গোপন করতে হবে। বাসবীর মা নেই, ইন্দু মাসীমা সেই মা'র মতই স্নেহ করতেন তা'কে। একটি স্নেহপ্রবণ মন বাসবীকে ঘিরে থাকবে, তার সম্পদে বিপদে শুভ-কামনা করবে এমন তো আর কেউ নেই।

ঘরে আবার ঢুকলেন। বললেন—এটা আবার তোদের কী ফ্যাসান বিন্তী—তোরা কি দু'জনে আলাদা বিছানায় শুস্ না কি?

বড় ঘরের এক কোণে অজয়ের খাট আর ও কোণে বাসবীর। বাসবী মাসীমা'র কথা শুনে হাসতে লাগলো—

ইন্দু মাসীমা বললেন—এ সব চলবে না মা, এ সব আমি চলতে দেব না—তুই হাসছিস যে? ইন্দু মাসীমা সত্যিই রাগ করলেন।

বললেন—এ কী অলুক্ষুণে ব্যাপার—স্বামি-স্ত্রী তোরা, যাকে বলে এক দেহ, এক প্রাণ, এক আত্মা—ছি ছি—তার পর যেন নিজের

[illegible]ন কেমন সন্দেহ হচ্ছে—

[illegible] না হাসিতে বাসবীর

[illegible]ছন! যেন তার মা

[illegible] দিন তাকে তার

[illegible]সব একসঙ্গে—

[illegible] দেখলেন।

[illegible]—লজ্জা

বাসবী মাসীমা'র দিকে সহাস্যে চেয়ে রইল।

—হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি—স্বামী তোকে ভালবাসে?

বাসবী চমকে উঠলো। কী অদ্ভুত প্রশ্ন! বাসবী মুখ নিচু করে হাসতে লাগলো।

—লজ্জা করিস্ নে—আমি মাসীমা হই, তোর মা থাকলে এ-কথা আমায় জিগ্যেস করতে হতো না।

বাসবী বললে—আপনার চা করতে বলি মাসীমা।

—না এখন থাক্, অজয় এলে একসঙ্গে খাবো'খন। তুই আমার কথার উত্তর দে—

বাসবী তখনও চুপ। কিন্তু ইন্দু মাসীমা বোধ হয় উত্তর না নিয়ে ছাড়বেন না পণ করেছেন। বললেন—অজয় তোকে কোলে করতে পারে?

বাসবী প্রশ্ন শুনে আর থাকতে পারলে না, হাসতে হাসতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে যখন আবার ফিরে এল তখন মাসীমা উঠে ঘরের চারি দিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। টেবিলের ওপর অজয়ের একটা ফোটো ছিল, একদৃষ্টে তাই দেখছেন।

ইন্দু মাসীমা মুখ ফিরিয়ে বললেন—তোর বরকে ভারি চমৎকার দেখতে তো?

ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ ইন্দু মাসীমা বললেন—অজয় আসবার সময় হোল। আয়, তোর চুল বেঁধে দি।

বহু দিন আগে মা তখন বেঁচেছিল। মা নিজে বাসবীর চুল বেঁধে দিত। আঁট-আঁট খোপা।

চুল বাঁধতে-বাঁধতে ইন্দু মাসীমা বললেন—এবারে এলাহাবাদে লতির চুল বাঁধা দেখে ওর বর খুব খুসী—শেষে কিছুতেই ছাড়বে না আর—আমাকেই রোজ বেঁধে দিতে হোত।

চুল বাঁধার পর পরম যত্নে বিন্তীর সাঁথিতে সিঁদূর লাগিয়ে দিলেন। বাসবী পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে প্রণাম করলে মাসীমাকে।

ইন্দু মাসীমা বাসবীর খাটে উঠে পা তুলে বসে বললেন—তোদের চিঠিগুলো দেখি বিন্তী।

—কিসের চিঠি মাসীমা?

—বিয়ের পর তোদের দু'জনের চিঠি। লজ্জা কিসের—আমি পড়লে কিছু দোষ নেই—দে—দে—

ইন্দু মাসীমা যেন না নিয়ে ছাড়বেন না। বললেন—আমি সকলের চিঠি পড়েছি, লতির বরের পড়েছি, মণ্টুর বরেরও পড়েছি—রিনু, কল্যাণী ভাদুড়ী সকলেই পড়িয়েছে আমায়।—দে, লজ্জা করতে নেই।

বাসবী আঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে অগত্যা বার করে দিলে। সিল্কের রুমালে জড়ানো একগাদা চিঠির বাণ্ডিল। চিঠির বাণ্ডিলটা ধপ করে ফেলে দিয়েই বাথ-রুমে চলে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে বাসবী যখন ঘরে এল তখন মাসীমা'র প্রায় সব চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেছে। বাসবীকে দেখে বললেন—খুব খুশী হলুম যে, তোমরা দু'জনেই সুখী হয়েছো।

অজয়ের জলখাবারের যোগাড় করতে সৌরভীকে ডাকা হোল।

মাসীমা বললেন—রোজ ওই কেক-বিস্কুট চলবে না—নিমকি-সিঙাড়া ভাজো—আমিও হাত লাগাচ্ছি।

—না, না মাসীমা, সে কি করে হয়, আপনি এলেন এক ঘণ্টার জন্যে—না, সে হবে না—মুখর হয়ে প্রতিবাদ করতে লাগলো বাসবী।

ইন্দু মাসীমা এক কথায় থামিয়ে দিলেন—ছিঃ, এতে আপত্তি করতে নেই। তোমরা আমার সন্তানের মত—আমাকে এমন পর ভাবতে পারবে না—তাতে আমি কষ্ট পাবো।

আপত্তি শুনলেন না ইন্দু মাসীমা। খাবার তৈরী হোল।

খানিক পরেই অজয় এসে হাজির। লম্বা, সুট-পরা স্বাস্থ্যবান ছেলে।

ইন্দু মাসীমা সামনে বেরিয়ে এলেন।

বাসবীর কথাতেই বোধ হয় অজয় ইন্দু মাসীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। চিবুকে হাত ছুঁইয়ে চুম খেয়ে বললেন—দীর্ঘজীবী হও বাবা!

তার পর বিস্তীর দিকে ফিরে বললেন—বেশ বর হয়েছে তোর বিস্তী!

তার পর নিজেই ব্যস্ত হয়ে বললেন—জামা-কাপড় বদলে নাও বাবা, খাবার তৈরী হয়ে গেছে। বিস্তী, তুমিও বসে পড় মা—আমি আসছি।

বাসবী ততক্ষণে তার সাড়ীটা বদলে বরাদ্দ সাড়ীটা পরে ফেলেছে। চায়ের টেবিলে চাদর পড়ে গেল। চায়ের পট এল, খাবারের ডিশ এল।

মাসীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ-এ চা ঢালতে লাগলেন। বললেন—অজয়কে ক'চামচে চিনি দেব বিস্তী?

অজয় বললে—মাসীমা আপনি বসুন, আপনি এক দিনের জন্যে এসেছেন—অতিথি আপনি—আমাদের অপরাধী করছেন—

মাসীমা সে-কথায় কান দিলেন না। ইন্দু মাসীমা'র ব্যবহারে অজয়-বাসবী দু'জনেই যেন কেমন মুগ্ধ হয়ে রইলো। এঁর কাছে যেন প্রতিবাদ করা যায় না—শুধু আদেশ পালন করতে হয়। এ যেন মাসীমা'র বাড়ী—তারা দু'জনে এক দিনের জন্যে এসেছে আতিথ্য নিতে! যেন মাসীমা'রই পালা তাদের আপ্যায়ন করা। মাসীমাই জিগ্যেস করে চেয়ে নিলেন চিনির বোয়েম। বেশী করে গছিয়ে দিলেন অজয়কে-বিস্তীকে! বললেন—এই বয়েসে যদি এইটুকু খেতেই পেট ভরে যায় তা হলে আমার বয়েসে যে খই খাবে শুধু—

এমন করে এই পরিবারে এর আগে কেউ এসে স্নেহ-ভালবাসা বিতরণ করেনি।

—আপনি নিজে কিছু নিলেন না মাসীমা—অজয় বললে একবার—

—এই তো, চা নিয়েছি আমি—একাদশীর দিন আমি আর তো কিছু খাই নে বাবা! তাতে কী হয়েছে, আমি আবার আসবো—একবার যখন বাড়ী চিনে গেছি—

বিস্তী বললে—তা হলে কিছু ফল আনিয়ে দিই আপনার জন্যে মাসীমা!

ফল আনতে দিলেন না মাসীমা। বললেন—এমন করলে আমি তো আর আসবো না বিস্তী তোর এখানে—

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাসীমা অজয়কে বলতে লাগলেন বিস্তীর কথা। অমন মেয়েকে বউ পাওয়া যে-কোনও স্বামীর ভাগ্যের কথা। বিস্তীর ছোটবেলায় তার লেখা-পড়ার কথা। বুদ্ধির কথা। বিস্তী নিজেই সে-সব জানে না। তখন সে ছোট্ট খুকী! ফ্রক পরে বেড়ায়। চার বছর বয়েস থেকে মাসীমাই তো তাকে পড়িয়েছেন। মানুষ করেছেনই বলা যায়। তখনই জানতেন তিনি যে বিস্তী ভালো ঘরে পড়বে। অজয়ের মত স্বামী পেয়েছে—এমন সৌভাগ্যে মাসীমা খুবই খুসী হয়েছেন। তাদের সুখ দেখেই মাসীমার সুখ। মাসীমা'র কে আছে আর বলো। তারাই তো তাঁর সব ইত্যাদি ইত্যাদি—

মাসীমা বললেন—একটা কথা তোমায় বলবো অজয়—এই তোমাদের আলাদা শোওয়ার কথা, এ আমার সহ্য হবে না। আমি আবার যেদিন আসবো, সেদিন যেন দেখি দু'টো খাট তোমাদের পাশাপাশি রয়েছে। মাসীমা'র এটি আদেশ মনে কোর—

তার পর খানিক পরে বললেন—অজয়, আমার একটা কাজ করতে পারবে বাবা, আমার এক ছাত্রী আছে—ভারী ভাল মেয়ে, একটি পাত্র দেখে দাও তোমাদের বন্ধুর মধ্যে থেকে—তার বিয়েটি দিতে পারলে বড় শান্তি পাই।—আবার বলতে লাগলেন—এই বিস্তী, ছোটবেলায় কী রাগীই ছিল—

ছোট বেলায় বাসবী কেমন রাগী ছিল তারই একটা গল্প বললেন। একবার খাবো না বললে খাওরায় কার সাধ্যি! কিন্তু পড়া-শোনায় ভারি সখ! ওকে আর পড়ালে না কেন? ভারি মাথা ওর লেখা-পড়ায়। খুব ছোট বেলায় আবার মাসীমা'র কোলে বসে পড়তো। ইস্কুলে এসে একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে চুপ করে বসে থাকতো। কিন্তু একবার রাগ হলে আর থামানো যেত না। আমাদের হেনা বোস এখনও বিস্তীর কথা বলে।

সন্ধ্যের আগেই ইন্দু মাসীমা চলে গেলেন। পটলডাঙায় এখনি যেতে হবে তাঁকে ছাত্রী পড়াতে।

বাসবী আর অজয় সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

বাসবী বললে—আর এক দিন আসবেন মাসীমা—

ইন্দু মাসীমা ছাতাটা হাতে ঝুলিয়ে পায়ে কেডস্ গলিয়ে পেছন ফিরে বললেন—তোমরা এসো অজয়—আমি দু'-এক দিনের মধ্যেই আসছি আবার—

সত্যি সত্যিই ইন্দু মাসীমা দু'-এক দিনের মধ্যেই এলেন।

এসেই বললেন—সকাল সকাল ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এলুম—কাল সারা রাত ঘুম হয়নি মা!

—কেন মাসীমা?—বাসবীকে প্রশ্ন করতে হয়।

—এমনিতেই বয়েস হোয়েছে, ঘুম কমে গেছে, ভালো ঘুম হয় না রাত্রে, তা সারা রাত সিংহবাহিনীকে ডাকলাম। একটু থেমে বললেন—আমার বাপের বাড়ীর বিগ্রহ—খুব জাগ্রত দেবী! তা বললাম, আমার বিস্তীর কোলে একটি খোকা দাও মা—বিস্তীর সংসার পূর্ণ কর মা! সারা রাত এই কথা বললাম—তার পর কখন ভোর হয়ে গেছে টের পাইনি।

বাসবী বললে—ভালো করে খাটের ওপর পা তুলে বসুন মাসীমা।

ইন্দু মাসীমা থামিয়ে দিয়ে বললেন—মা আমার কথা শুনলেন—বুঝলি—মা শুনলেন আমার কথা—

দেবী সিংহবাহিনী পাথরের কান দিয়ে ইন্দু মাসীমার কথা কেমন করে শুনলেন তা বিশদ করে বললেন না।

শুধু বললেন—আমার সঙ্গে তুই একবার চল তো বিন্তী। অজয়ের আসতে তো দেরি আছে এখনও—আমি তোকে নিয়ে যেতেই এসেছি।

—কোথায় মাসীমা?

—বেশী দূর নয়—যাবো আর আসবো—কাপড়টা বদলে নে।

ইন্দু মাসীমা যেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। ইন্দু মাসীমার কথা মত অজয়ের আর বাসবীর দু'টো খাট পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাসীমা বললেন—এত দিনে মানালো ঘরটা—

তার পর মাসীমা যেন স্বগতোক্তি করলেন—আহা, এমন ঘর, এমন সংসার—তবু সব ফাঁকা! তুমি দেরী কোর না বাছা, আমার আবার কাজ আছে যে মা—

সন্ধ্যেবেলা অজয় আসতেই বাসবী বললে—মাসীমা এসেছিলেন জানো—

অজয় বললে—তা' এত শীগ্‌গির চলে যেতে দিলে যে?

বাসবী বললে—আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কালীঘাটে।

—কালীঘাটে? কেন?—অজয়ের বিস্ময়ের সীমা নেই।

—আমাকে দিয়ে পূজো দিলেন, মাসীমা'র কাণ্ড যত···মায়ের প্রসাদী ফুল আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন—এই দেখ না—রোজ সকালে মুখ-হাত ধুয়ে···

রাত্রে পাশের খাটে শুয়ে অনেক ক্ষণ পরে অজয় বললে—মাসীমাকে সেই আবার অত দূরে একলা ফিরে যেতে হবে তো—থাকতে বললেই পারো—তোমার তবু এক জন কথা বলবার লোক হয়।

হঠাৎ এক দিন ভোর বেলা মাসীমা আবার এসে হাজির। তখন ওরা দু'জনে ঘুম থেকে ওঠেনি।

—এ কি, আজকের দিনে এত দেরি পর্য্যন্ত ঘুমোন···ওঠ ওঠ—আমি স্নান সেরে নিয়েছি—তোমরা শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও—আমি চা আনছি—বলে রান্না-ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। সৌরভী তখনও উনুনে আগুন দেয়নি।

অজয় বললে—আজকে কী ব্যাপার মাসীমা'র—এত সকাল বেলাই যে এলেন?

বাসবী বললে—এখন মনে পড়লো, তোমায় বলতে ভুলে গেছি—আজকে আমাদের বিয়ের তারিখ কি না—মাসীমা বলছিলেন আজকে একটা উৎসব করার কথা—তা' এখন মাসীমাকে দেখে মনে পড়লো আমার—

মাসীমা জল চড়িয়ে দিয়েই ফিরে এসেছেন।

—ফর্দ্দ করে নাও অজয়, কি কি আনবে বাজার থেকে—ভালো দেখে মাংস এনো—আর মিষ্টি দই—ধান-দূর্ব্বো আমি এনেছি—আর তোমার একখানা ধুতি আর বাসবীর একখানা শাড়ী ভালো দেখে—

বিন্তীকে দিয়ে টেবিলের চাদর, জানালার পর্দ্দা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব ফর্সা বার করালেন।

আজ যেন নতুন করে বিয়ে হচ্ছে ওদের। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ নেই। আর ইন্দু মাসীমা—তাঁর বাড়ীতেই তো কাজ। তাঁর কি বসে থাকবার গল্প করবার ফুরসুৎ আছে। বিয়ের সব গয়না বার করে পরো। এখন ঢাকাইটাই চলুক, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা যখন মাসীমা আশীর্ব্বাদ করবেন দু'জনকে, তখন বেনারসী পরতে হবে। মাসীমা এক ফাঁকে নিজের হাতে বাসবীর চুল বেঁধে দিয়ে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। চন্দনের কৌটো দিয়ে অলকা-তিলকা এঁকে দিলেন। আজ অজয়েরও পা-জামা বা স্যুট কিছুই চলবে না। বার করো গরদের পাঞ্জাবীটা, দেশী জরির ধাক্কা-দেওয়া ধুতি।

সন্ধ্যেবেলাই খাওয়া সেরে নিতে হোল। দু'জন একই জায়গায় বসে খেলে। মাসীমা আজ নিজের হাতে মাংস, পোলাও, কালিয়া রেঁধেছেন। পরিবেশন তো তিনিই করবেন। তোমরা আজ লজ্জা করবে না। তোমাদের বিয়ের তারিখ তোমাদের মনে থাকে না। মাসীমা না থাকলে কে মনে করিয়ে দিত। খেয়েই এখন শুতে যেও না। এখনও তো আসল কাজ বাকি। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াও মাসীমা'র দিকে মুখ করে—ধান-দূর্ব্বো নিয়ে ইন্দু মাসীমা দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে কী যেন মনে-মনে বললেন।

এবার অজয় বাসবীর কাঁধে হাত দিক্। দুই কাঁধ ধরে সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে বাসবীকে চুমু খাক—লজ্জা কী! আজ তো লজ্জা করতে নেই। আচ্ছা, মাসীমা এবার চোখ বুজেছেন—এবার চুমু দিক অজয়। তোমরা দীর্ঘজীবী হও, মাসীমা খুসী হয়েছেন—তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক, অমলিন হোক পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা মাসীমা করছেন।

এইবার তোমরা শুয়ে পড়ো। মাসীমা বাইরে থেকে মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এসেছেন। আজ আর মাসীমা নিজের বাড়ী যাবেন না। এখানেই পাশের ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বাড়ী যখন নিস্তব্ধ নিঝ্‌ম হয়ে এল, সৌরভীও শুয়ে পড়েছে—ইন্দু মাসীমা নতুন ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সেদিনও ইন্দু মাসীমা হঠাৎ এসে বাসবীকে আর এক জায়গায় নিয়ে গেলেন। অলৌকিক ক্ষমতা। এবার অব্যর্থ সন্ধান। এই ফাঁকা বাড়ীতে মাসীমা যে আর আসতে পারেন না! একটি ছেলে হোক, তখন ইন্দু মাসীমার মতন সুখী আর কে!

বললেন—কনকের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে এনেছি, এবার তোমার কোলে একটি এলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

কত জায়গায় ইন্দু মাসীমা নিয়ে গেলেন, কত কী অব্যর্থ প্রক্রিয়া করলেন তার আর অবধি রইল না।

মাসীমা বললেন—তোমার মা কিম্বা শাশুড়ী থাকলে আমায় এ দুর্ভোগ পোয়াতে হোত না মা, কিন্তু···

শেষ কালে মাসীমা'র অব্যর্থ প্রক্রিয়ার ফল কি না কে জানে, এক দিন মাসীমার মুখে হাসি ফুটলো।

মাসীমাই পূজো দিয়ে এলেন প্রত্যেকটি জায়গায়। যেখানে যেখানে মানত ছিল। ইন্দুদ কামাই করে গেলেন তারকেশ্বরে, গেলেন দক্ষিণেশ্বরে, গেলেন কালীঘাটে, কোথায় কোথায় না গেলেন!

বললেন—সিংহবাহিনী বড় জাগ্রত বিগ্রহ মা, কিন্তু তবু বলা যায় না, খুব সাবধানে থাকিস মা!

এক-এক দিন নিজের হাতে এক-একটা তরকারী রেঁধে দিয়ে যান। মুখরোচক, সময়োপযোগী। এক-এক দিন দেরী হয়ে গেলে এ-বাড়ীতেই থেকে যান। অজয়ের সঙ্গে বসে চা খেতে-খেতে গল্প করেন। উপদেশ দেন। বলেন—এ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকাও খারাপ, একটু হাঁটবে, হাঁটা ভালো।

অজয় ভাবে, মাসীমা এ-সব এত কোথায় জানলেন।

ফর্দ্দ করে দেন অজয়কে কি কি আনতে হবে। কি কি খাওয়া উচিত, কি কি খাওয়া অনুচিত।

সেদিন রাত্রে—অনেক রাত্রে অজয় মাসীমা'র ঘরে এসে ডাকলে—মাসীমা!

—কি বাবা!—বিধবার ঘুম, এক মুহূর্ত্তে উঠে পড়েছেন।

—কি রকম করছে যেন বাসবী, ঘুমের ঘোরে কি সব বলছে।

—চল দেখি।

মাসীমা এলেন। জাগালেন বিন্তীকে। ও বিন্তী, ওঠ মা, স্বপ্ন দেখছিস না কি!

বিন্তী উঠলো।

বললে—কই না তো মাসীমা, কিছু তো হয়নি।

মাসীমা বললেন—তুমি বড় একটুতে নার্ভাস হয়ে পড় অজয়—এত নার্ভাস হলে কি চলে—আমি কালই সিংহবাহিনীর পূজোর ফুল এনে আঁচলে বেঁধে দিচ্ছি।

সকাল বেলা অজয় বললে—তোমার মাসীমাকে বল, উনি এখানে এসেই থাকুন।

—তা' কি করে হয়—ওঁর সংসার না হয় নেই—চাকরী আছে তো?—বাসবী বললে।

তা' ছাড়া শুধু কি স্কুলের চাকরী। সকালে-সন্ধ্যেয় অতগুলি ছাত্রী পড়ানো। নিজের সংসার না থাকলেও, কত পরের সংসারের ঝক্কি ওঁর মাথায়। কনকের বিয়ে হয়ে গেছে, একটা ভাবনা চুকেছে। কিন্তু কত নতুন কনক জন্ম নিচ্ছে নিত্য-নিয়ত তার কি ঠিক আছে? কত বাসবীর সন্তান-সম্ভাবনা আসন্ন কে বলতে পারে? বেঁটে ছাতাটি, আর কেডস্ জুতো, আর সেলুলয়েডের ব্রোচ—ওতো শুধু বাইরেটা। বাইরেটাই যে সবাই দেখে।

কিন্তু মাসীমা শুনে বললেন—তা' বেশ তো মা, আমি থাকবো এখানে—তোমাদের যদি উপকার হয় তো আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আর কার জন্যেই বা চাকরী করা—একটা তো পেট।

তরকারী কুটতে-কুটতে বললেন—এক-এক সময় আমি তাই ভাবি বিন্তী, আমার এত ছেলে-মেয়ে থাকতে আমি কেন দাসত্ব করে মরি। আমি যদি শেষ জীবনটা তোর বাড়ীতেই থাকি—খেতে দিবি নে মাসীমাকে দু'মুঠো?

এ-সব মাসীমা'র চিরকালের রসিকতার মত শোনালো।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যে মাসীমা নিজের সংসারের পাট উঠিয়ে দিয়ে, বাসা ছেড়ে চলে আসবেন কে জানতো!

অজয় বললে—আপনি এলেন মাসীমা—আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

শুধু বাসা নয়, সত্যি সত্যি চাকরীটাতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন মাসীমা। আর দরকার কিসের। বিপদের দিনে দুঃসময়ের দিনের জন্যেই ভাবনা। এত দিন চাকরী করেও হাতে কি কিছু জমেছে না কি! আর দশটা বছর চাকরী করলেই যেন দশ হাজার টাকা জমে যেত আর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শেষ জীবনটা আরাম করে কাটাতেন!

বাসবীর চুলটা বাঁধতে বাঁধতে বলতে লাগলেন—আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো, আর কার জন্যেই বা বাঁচবো, এবার তোমার ছেলের মুখ দেখলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হবে মা—আর আমি কিছু চাই নে—গয়া, কাশী, বৃন্দাবন কিচ্ছু চাই নে আমি আর—

সকাল বেলা বিছানার পাশে গরম এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বললেন—এটি চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও তো মা—শরীরে বল পাবে।

সন্ধ্যে বেলা দু'পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়ে বললেন—এটা এয়োতীর চিহ্ন—পা দু'টো একেবারে সাদা দেখাচ্ছে মা—চোখে খারাপ ঠেকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বাসবীর সেবায় মাসীমা'র দিন কাটে। বিন্তী শোবে, বিন্তী খাবে, বিন্তী ঘুম থেকে উঠবে, বিন্তী সাজবে-গুজবে—এ যেন মাসীমা'র নিজের ব্যাপার। এমন করে কোনও মা-ও বুঝি কোনও মেয়ের যত্ন করতে পারেনি। এত দিনের অতীত জীবনের সমস্ত কিছু এক দিনে ছেঁটে ফেলে এমন করে নতুন এক সংসারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া—এও যেন বিস্ময়কর! এ কি শুধু পরোপকার বৃত্তি! শুধু কি শুভাকাঙ্ক্ষা—শুধু আত্মোৎসর্গ—নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার!

অজয় এক দিন বললে—মাসীমা, আপনি ছিলেন এ-সময়ে তাই ভরসা পাচ্ছি—

মাসীমা বললেন—তোমার চা জুড়িয়ে গেল—আগে খেয়ে নাও। এখন আবার চায়ের জল গরম করতে হবে—

কিন্তু কে জানতো এক দিন এমন হবে।

এত যত্ন, এত সতর্কতা, এত পরিশ্রম, সব এড়িয়ে অলক্ষ্যে এক অজ্ঞাত বিষ প্রবেশ করবে।

অজয় বললে—মাসীমা, কি হবে?

এমন যে মাসীমা তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর মুখেও কথা নেই। পা দু'টো ফুলে গেছে বাসবীর এক রাত্রের মধ্যে। মিনিটে মিনিটে অজ্ঞান হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত লাগে। চিনতে পারে না স্বামীকে, চিনতে পারে না মাসীমাকে। মাসীমা'র সব আয়োজন—সব সাধ—সব সাধনা যেন ব্যর্থ! মাসীমা মুষড়ে পড়লেন।

ডাক্তার এল। নাম-করা ডাক্তার। বত্রিশ টাকা ভিজিট-এর ডাক্তার।

পরীক্ষা করলেন বুক—পেট—শরীর। বললেন—এখনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। বাড়ীতে কে আছে দেখবার—মা বা শাশুড়ী কেউ আছে?

কেউ নেই। এক মাত্র মাসীমা। অনাত্মীয়। অপুত্রক—বিধবা!

বললেন—ওঁর দ্বারা এ সব হবে না—এ সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতাটাই বড় কথা—বাড়ীতে থাকলে সেবা হবে না।

হাসপাতালেই গেল বাসবী।

মুখ চূণ করে আসে অজয় হাসপাতাল থেকে। মাসীমা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চায়ের কাপ হাতে করে। কই, অজয় তো সন্তান চায়নি, বাসবীও কি চেয়েছিল। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে?

অজয় একটা কথা বললে না। আজ আর মাসীমা'র কাছে পরামর্শ চাইলে না। সান্ত্বনাও চাইলে না। অজয় চা খেয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। মাসীমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চ'লে এলেন।

সারা দিন কোনও কাজ নেই ইন্দু মাসীমার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবার আয়োজন নেই। রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে জেগে উঠে পাশের ঘরে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই। নেই চাকরী। সকাল বেলা ওঠবার তাগিদ নেই। ছাত্রী নেই—কিছু নেই। জীবন অর্থহীন মনে হোল মাসীমা'র। তিনি নিষ্প্রয়োজন—তিনি অনাবশ্যক! বাহুল্য! অনেক দিন কেডস্ জুতো পায়ে ওঠেনি, মাথার ওপর বেঁটে ছাতাটি খোলা হয়নি। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন সেই দুপুর বেলা।

হাসপাতাল থেকে অনেক রাত্রে ফিরলো অজয়।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছে বিন্তী?

অজয় একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা উত্তর দিলে। বিন্তীর ভাল-থাকা-না-থাকার খবর যেন মাসীমা'র না জানলেও চলে।

সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। সমস্ত শরীরে ইন্দু মাসীমা'র যন্ত্রণার আর শেষ নেই। মৃত্যু-যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। মনে হোল, তাঁরও যেন দাঁতে দাঁত লেগে আসছে, অজ্ঞান হয়ে আছেন সারা দিন। পায়ে হাত দিয়ে টিপে দেখলেন। ফুলেছে না কি! কিন্তু তাঁর অসুখ হলে কে ডাক্তার ডাকবে! সেই যন্ত্রণা নিয়েই উঠলেন দাঁড়িয়ে। টলতে-টলতে গিয়ে রঙিন ট্রাঙ্কটা খুললেন তাঁর। ওইটিই তো এক মাত্র সম্পত্তি। ওপরের কয়েকটা থান সেমিজ সরিয়ে একেবারে তলা থেকে বেরুল একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির গ্রন্থি খুলে ফেললেন। ছোট-ছোট জামা, ফ্রক—এক গাদা। কবে তিনি তৈরী করেছিলেন। ইস্কুলের মেয়েদের সেলাই শেখাবার সময় তৈরী করেছিলেন এক-একটা করে। নিখুঁত হাতের তৈরী। কার জন্যে করেছিলেন তা কি মনে আছে? বোতাম এঁটেছিলেন, হুক লাগিয়েছিলেন—এমব্রয়ডারি করেছিলেন। এক-একটা করে আবার পরিপাটি করে পাট করে রাখতে লাগলেন মাসীমা। কে এবার পরবে এ-সব। সব নিরর্থক হয়ে গেল।

অজয় বাড়ীতে আসে আবার চলে যায়। তার মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করেন বিন্তী কেমন আছে। যে-ঘরটাতে বাসবী শুতো সেখানে মাসীমা দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায়। বড় আয়নায় নিজের মুখখানা দেখেন। সমস্ত শরীরটা দেখেন। নিজের থানখানাকে অকারণে খুলে আবার গায়ে জড়িয়ে নেন। বাসবীর বড় চিরুণীটা নিয়ে মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোর ওপর বুলিয়ে দেন। অকারণে অজয় আর বিন্তীর ছবিখানা মুখোমুখি নড়িয়ে সড়িয়ে রাখেন।

সেদিন একেবারে সামনা-সামনি ধরা পড়ে গেলেন।

অজয় কখন এসেছে তা কি তিনি টের পেয়েছেন? সুট [illegible] কাপড় বদলেছে—তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

বুড়ো মানুষ, কখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে অজয়ের খাটের ওপর, অজয়ের বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সামনে অজয়কে ওই অবস্থায় দেখেই ধড়ধড় করে লাফিয়ে উঠেছেন! বললেন—কেমন দেখলে আজ বাবা?

অনেক ওষুধ কিনে এনেছে অজয়। সব হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তবে কি অসুখটা বাড়লো? অজয়ের মুখটা গম্ভীর। সত্যিই তো! ওরা তো সন্তান চায়নি। তাঁরই সখ। তাঁরই সাধ।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—আমি তোমার চা নিয়ে আসি বাবা!

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অজয় কান পেতে রইল। সারা কলকাতার কলমুখরতা এখানকার অন্ধকারে এসে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গাছের পাতাগুলো কাঁপছে, রাস্তায় আলোর সামনে লেগে তার ছায়া আরো বীভৎস হয়ে পড়ছে পিচের রাস্তার ওপর। হাজার হাজার হৃৎপিণ্ড বুঝি এখানে এমনি করে রোজ কাঁপে।

অনেকক্ষণ ছ'টা বেজে গেছে। বাড়ী গেলেই হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও শান্তি নেই।

কে বলেছিস আসতে! মাসীমা'র বিগত দিনের সমস্ত ব্যবহারগুলো বড় কদর্য হয়ে ফুটে উঠলো অজয়ের চোখের সামনে। কী নিপুণ কাঙালপণা! চাকরী ছেড়ে দিয়ে পরান্নজীবী হওয়ার কি প্রচুর সুখ! কোনও দায়িত্ব নেই—কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

ডাক্তার বলছিলেন—বাড়ীতে মেয়েমানুষ আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না, তাই একটু অনিয়ম হয়েছে—খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল নিশ্চয় ঘটেছিল,—মা না থাকলে যা হয়—

তবে আর মাসীমাকে রাখা কেন? মাসীমা কি জানেন সন্তান প্রসবের দায়িত্ব!

আজ রাতটা কেমন করে কাটবে কে জানে। সমস্ত সহর যেন থমথম করছে। আসন্ন প্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ।

অনন্যোপায় হয়ে অজয় ট্রাম-রাস্তার দিকে পা বাড়াল। যন্ত্রণায় নীল মুখখানা স্মরণ করতে গিয়ে এক বার পিছন ফিরে তাকাল অজয়। হাসপাতালের বারান্দায় জানালায় তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে হৃৎস্পন্দন। কাল সকালে সূর্য্যের পৃথিবী কি বাসবীর নাগাল পাবে!

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলে মাসীমা নয় সৌরভী।

অভ্যাস মত ঘরের ভেতর গিয়েও কেউ সামনে এসে দাঁড়াল না। কেউ চায়ের কাপ হাতে করে কুশল জিজ্ঞাসা করলে না। অজয়ের যেন কেমন বিচিত্র লাগলো।

খাবার নিয়ে এল সৌরভী। বললে—মাসীমা নেই—দুপুর বেলাই চলে গেছেন।

অজয় যেন অবাক হোল না। যেন অপ্রত্যাশিত নয় এ-ঘটনা। ক'দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল অজয়। তবু এ-যেন ভালোই হোল। যেন অনেকখানি অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন অজয়কে।

ঝড়ের পরে যেন সমস্ত শান্ত হয়ে এসেছে। মাসীমাই যেন সমস্ত অমঙ্গলের মূল। তার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাসবী বেঁচে উঠলো।

ভোর ছ'টার সময় অজয় হাসপাতালের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, বাসবী রায়, একশো সাঁইত্রিশ নম্বর বেড—ফিমেল—দু'জনেই ভাল আছে—

তার পর আরো কয়েক দিন থাকতে হবে। বিকেল বেলা চারটের সময় অজয় গিয়ে দাঁড়াল। একবারে ভেতরে চলে গেল গেট পেরিয়ে! বাসবী তখন ঘুমিয়ে আছে। বড় দুর্ব্বল দেখাচ্ছে তাকে। অনেক রাত্রির ক্লান্তির পর প্রচুর বিশ্রাম।

—বেবি কোথায়?

চঞ্চল পায়ে এসে আর একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল অজয়! ঘরের ভেতরে প্রায় পঞ্চাশটি ছোট-ছোট খাটের ওপর পঞ্চাশটি শিশু শোয়ানো। কী তাদের অক্লান্ত চীৎকার! যেন শিশুদের চিড়িয়াখানা!

—একশো সাঁইত্রিশ নম্বর বেবিকে দেখান তো—

গলা পর্য্যন্ত তোয়ালে জড়ান একটি ছোট শিশুকে এনে দেখালে নার্স। কী ছোট! কতটুকু! ভাল করে মন দিয়ে দেখতে লাগলো অজয়। আশ্চর্য্য কিন্তু। কারো চেহারার সঙ্গে মিল নেই তো! না বাসবীর, না অজয়ের। অবিকল মাসীমা'র মত দেখতে হয়েছে মেয়েকে।

পরের দিন বাসবী চোখ চাইলে। বললে—মাসীমাকে একবার খুঁজলেও না তুমি,—কিন্তু কেনই বা চলে গেলেন—অত ভালোবাসতো আমায়—

ভালো যে বাসতেন তা' কি অজয় জানে না! কিন্তু অত ভালোবাসাও বুঝি ভাল নয়। মাসীমা এলেন এবং চলেও গেলেন। কিন্তু কী ঝড়—কী বিপর্য্যয় ঘটে গেল মাঝখানে।

হাসপাতাল ছুটি দিয়ে দিয়েছে। একটা ট্যাক্সিতে তুলে অজয় সোজা আসছে বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যে হয়-হয়। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রাস্তা পিছল।

কোলে শিশুকে নিয়ে বাসবী নিরুদ্দিষ্ট ভাবে চেয়েছিল। বললে—একটা কথা মনে পড়ে গেল—

অজয় সামনের সিট-এ বসেছিল, পেছন ফিরলে।

—আজকে হাসপাতালে মাসীমা এসেছিলেন জানো—

অজয় এবার সত্যিই অবাক হোয়েছে। বললে—মাসীমা—?

—হ্যাঁ, ইন্দু মাসীমা···আমার সঙ্গে দেখাও করেননি—সকাল বেলা এসে দরোয়ানের হাতে এই পুঁটলিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—খুলে দেখি খুকির এক গাদা ফ্রক-পেনি—

বাসবী আরো কি বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ গাড়ীটা একটা ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে থামতে-থামতে আবার চলতে সুরু করল।

এক জন বুড়ী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল বুঝি। মাথায় ছাতি নিয়ে আলো-অন্ধকারে বোধ হয় ঠিক ঠাহর পায়নি···

গাড়ী আবার চলছে।

পুরোন কথার জের টেনে বাসবী বললে, একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন সঙ্গে, এই ছাখো—বলে পুঁটলিটার ভেতর থেকে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলে অজয়ের দিকে।

বাসবী বললে—আচ্ছা, মাসীমা চিঠিতে ও-কথা লিখলেন কেন বলো তো?

—কই দেখি—অজয় হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলে।

এমন সময় বাসবীর কোলের শিশু ককিয়ে কেঁদে উঠলো।

খুকির দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাসবী হঠাৎ অবাক হয়ে গেল। মাসীমাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি বাসবী। মাসীমা'র হাসির সঙ্গেই বাসবী পরিচিত। কিন্তু কোলের শিশুর কান্না দেখে হঠাৎ যেন তার মনে হোল, কাঁদলে মাসীমাকে ঠিক এমনিই বুঝি দেখাবে। তার খুকি নয়—মাসীমাই যেন ককিয়ে কেঁদে উঠছে।

চলতি ট্যাক্সিতে সামনের সিট-এ বসে অজয় মাসীমা'র চিঠিটা পড়তে লাগলো—

প্রিয় বিন্তীরাণী,

খুকীর জন্তে এই ফ্রক আর পেনি পাঠালাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরসুখী হও। তোমাদের বিপদের দিনে আমি কোনও উপকারে এলাম না, এ জন্তে আমায় তোমরা ক্ষমা করো।

বন্দেআলী মিয়া

মালতী শুকনো কঞ্চিগুলা ভাঙিয়া ভাঙিয়া উঠানের এক পাশে জমা করিয়া রাখিতেছিল। বারান্দার উপরে কোলের রুগ্ন শিশুটা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ তার নাই। কয় দিন হইতে ছেলেটির জ্বর। সরকারী ডাক্তারখানার কয়েক শিশি ঔষধ দিয়াও কোনো ফল হয় নাই। হাসপাতালে যত ফাঁকি চলে এমন আর কোনো স্থানে নয়। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারেরা খাঁটি ঔষধ বাজারে বিক্রয় করিয়া রঙ-করা জল গরীব রোগীদের জন্ত বরাদ্দ করে। যার ভাগ্যের জোর সে ঐ রাঙা জল পান করিয়াই সুস্থ হইয়া উঠে, আর যে মরিবে তাহাকে দামী ও খাঁটি ঔষধ পান করাইয়াও কে কবে জীবিত রাখিতে পারিয়াছে?

ছেলেটির পরিত্রাহি চীৎকারেও মালতীর ধৈর্য্যের কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটিল না। পাঁচটি সন্তানের জননী সে। অপর চারি জন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খাবার চাহিয়া চাহিয়া বিফল হইয়া বাহিরের দিকে নিকটেই কোথায় গিয়াছে। হয়তো এখনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাদ্যের প্রার্থনা জানাইবে। মালতী নিরুপায়। এই সব শিশুদের মুখে একমুষ্টি দানা দিবার সামর্থ্যও তাহার আজ আর নাই।

কিন্তু এমন অবস্থা তো তাহাদের চিরকাল ছিলো না। স্বামী কেরাণীগিরি করিত পাকিস্তানের কোনো একটি ফার্ম্মে। প্রায় বিশ-বাইশ বৎসরের চাকুরী। আপনার মধুর ব্যবহারে সে সহকর্ম্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাইয়া দিবে। খানিকটা জায়গা-জমির সন্ধানেও ছিলো,

সুযোগ-সুবিধা মতো পাইলেই খরিদ করিবে! দেশে সে আর ফিরিবে না। পশ্চিম-বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে তার বাসভূমি। সেই স্থানে দুই-তিনখানি খড়ের ঘর এবং চারি-পাঁচ বিঘা ধান ক্ষেত তার নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া দেশে থাকা চলে না। সেখানে বাস করিলে ছেলে-মেয়েগুলির বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। কারণ, সেই গণ্ড-পল্লীর ধারে-কাছে বিদ্যালয় নাই, তদুপরি পল্লীগ্রামের ছেলেদের সংসর্গও ভালো নহে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক রকম, বিধি করেন অন্য প্রকার। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উদ্‌যাপিত হইয়া হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি সুরু হইল। নিরীহ নরনারী ও শিশুর উষ্ণ শোণিতে মহানগরীর মাটি কালো হইয়া গেল। ইহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমগ্র ভারতে। কত নারী হারাইল প্রিয়তম পতি আর সন্তান, কত পুরুষ হারাইল স্ত্রী, কন্যা আর ভগিনী। দুর্বৃত্তদের হস্ত হইতে ধন, প্রাণ ও ইজ্জৎ কিছুই রক্ষা করা গেল না।

গোলযোগ একটু শান্ত হইলে কাশীনাথ সপরিবারে দেশের বাটীতে চলিয়া আসিল। যে খড়ের ঘর ও পল্লীগ্রামকে সর্ব্বদা সে পরিহার করিয়া চলিয়াছে সেই স্থান আজ তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়। ঘরগুলি এত দিন অনাদৃত ও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আজ দেশে ফিরিয়া জন-মজুর লাগাইয়া সেই ঘর-দুয়ারের সংস্কার করিয়া বাস করিবার উপযোগী করিয়া লইল।

এইবার তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইল। এত কাল চাকুরী করিয়াছে—প্রতি মাসে বেতন পাইয়াছে, সংসারের বিষয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করিতে হয় নাই। এবার সঞ্চিত তহবিলে হাত পড়িল। নানা দিক হইতে খরচ-পত্রকে সঙ্কোচ করিতে হইল। এক মাস দুই মাস করিয়া বৎসর ঘুরিয়া আসিল। তার পর আর এক বৎসর টানা-হ্যাঁচড়া করিয়া কাটিল। কিন্তু আর চলিতে চাহে না। কাশীনাথ নিরুপায় হইয়া চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইল। নানা স্থানে ঘুরিল-ফিরিল কিন্তু কোনো সুবিধাই করিতে পারিল না। যে সব চাকুরী খালি হইয়াছিল তাহা বিদেশীরা আসিয়া গ্রাস করিয়াছে। বাংলা দেশে বাঙালীর কোনো স্থান নাই।

অকস্মাৎ ঝর-ঝর করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িল। মালতী ভাঙা কঞ্চিগুলা তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইয়া রন্ধন-গৃহের দিকে চলিয়া গেল। যে কয়টি ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ বাহিরে ছিল তাহারা ছুটোপুটি করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত ছোটটি মৃদু স্বরে জননীর কাছে আবেদন জানাইল: বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে মা, দু'টি পান্তা ভাত দাও না।

জননী এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। গত কল্য হইতে চাল বাড়ন্ত—ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া হাঁড়িতে যে দুই-এক মুষ্টি ছিলো তাহাই খাইয়া জল দিয়া পেট ভরাইয়াছে। এমনি করিয়া তাহার অধিকাংশ দিন কাটে। নিত্য অর্দ্ধাহারে তাহার শরীর দুর্ব্বল এবং অবসন্ন। ঘরে চাউল, ডাইল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সবই বাড়ন্ত। স্বামীর হাতে একটি পয়সা নাই। সকালে থলি লইয়া বাহির হইয়াছে, কোথা হইতে যে টাকা-কড়ি যোগাড় করিবে, কি করিয়া যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবে তাহা মালতী ভাবিয়া পায় না।

মালতীর পরনের কাপড়খানি শত-ছিন্ন। সুদিনে যাহা বাক্সে বন্ধ ছিল এবং পোষাকীরূপে ব্যবহৃত হইত, আজ দুর্দ্দিনে তাহাই সর্ব্বদা পরিধেয়রূপে আব্রু রক্ষা করিতেছে। প্রাতঃকালে ঝি ও ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর বাকি বেতনের তাগাদা করিয়া গিয়াছে। ঝিটি গত মাসে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। টিউটরটিও গত দুই মাস হইতে বেতন না পাওয়ায় আর পড়াইবে না বলিয়া প্রতিদিন নোটিশ দিতেছে। বেচারী কাশীনাথ নিরুপায়। ভদ্র এবং শিক্ষিত সমাজের পর্য্যায়ভুক্ত সে। তাহার কষ্টটাই সর্ব্বাধিক। না পারে মোট টানিতে—না পারে ছোট কাজ করিতে। অথচ নিজের না আছে অর্থ—না আছে উপার্জ্জন। আপনার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা পাঁচ জনকে বলিয়া মনের বেদনা-ভার লাঘব করিবার সৎসাহস অবধি তাহার নাই। কলিকাতার বিগত হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু বহু নর-নারী তাহাদের জেলার সদরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সংসার পরিচালন বিষয়ে ইহারা বরঞ্চ অনেকটা নিশ্চিন্ত আছে। সরকারী সাহায্যে আহারের চিন্তা তাহাদের নাই। সাম্প্রদায়িক গোলমালের জন্য চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া সপরিবারে দেশে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাইভেট অফিসের চাকুরী সুতরাং চাকুরী বিনিময় হয় নাই। বেকার হইয়া বাটীতে বসিয়া থাকা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই।

ছেলে দু'টি এবং মেয়েটি মারামারি করিতে করিতে কান্না জুড়িয়া দিল। মালতী ভাঙা কঞ্চির টুকরা একখানা উঠাইয়া লইয়া ক্রন্দনরত ছেলে-মেয়ের পিঠে সশব্দে বসাইয়া দিল।

বাহিরে দুর্য্যোগ ঘন হইয়া আসিল। আকাশের জল-ভরা নিবিড় কালো মেঘ, উদ্দাম বাতাসের মাতামাতি মালতীকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। স্বামী তাহাদের অন্নের সংস্থান করিতে এই ঝড়-জলকে শিরোধার্য্য করিয়া অনিশ্চিত পথে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে একটি ছাতা অবধি নাই। ঝর-ঝর করিয়া কখনো ঝরিতেছে—কখনো বা থামিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বর্ষাকালের মেঘকে বিশ্বাস নাই, এখনই হয় তো মুষলধারে ভাঙিয়া পড়িবে। কি করিয়া যে তিনি গৃহে ফিরিবেন সে কথা ভাবিয়া মালতী দিশাহারা হইয়া পড়িল। টেবিলের উপরে একটা টাইমপিস্ টিক্-টিক্ করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতে সে রীতিমতো বিস্মিত হইল—বেলা ইহারই মধ্যে দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয় হয় নাই, তাই সময় সম্বন্ধে বিশেষ চেতনা ছিল না। বারোটা! তিনি এখনো ফিরিলেন না! হয়তো টাকা-কড়ি সংগৃহীত হয় নাই—তাই রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। ছেলে-মেয়েদের আর যে শাসন করিয়া রাখা যায় না! আপনার একান্ত অজ্ঞাতে মালতীর দু'টি আয়ত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কাশীনাথ বিমর্ষ মুখে পথ চলিতেছিল। তাহার ভাবনার অবধি নাই। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যারা তাহার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। শুধু একমুষ্টি অন্ন, ইহার বেশী প্রত্যাশা তাহাদের নাই। তাহাদের ক্ষুধিত মুখে যদি অন্ন যোগাইতে না পারে তবে তাহার বাঁচিয়া থাকা বৃথা। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে কত রঙিন কল্পনাই না সে করিয়াছে। কিন্তু আজ কোথায় সে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল!

স্বাধীনতায় সুবিধা পাইয়াছে কয়েক জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। বৃটিশের বিদায় গ্রহণে তারাই দেশের কর্ণধার। সাধারণ লোকের দুর্দ্দশার আজ সীমা নাই। কালো বাজারের কারবারীরা চতুর্গুণ মুনাফায় দিন-দিন স্ফীত হইতেছে। মরিতেছে নিরীহ শ্রমিকেরা—মরিতেছে নিরপরাধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

কাশীনাথের সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার। ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমানের কোনো আশ্বাস নাই। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে চাকুরী করিয়া উদর পূরিয়া খাইয়া বৃটিশকে প্রাণ ভরিয়া গালাগালি করিয়াছে। আজ বৃটিশ নাই—পাকিস্তানে তাই হিন্দু ধনী-মহাজনেরা নাই, মুসলমান-সমাজ দরিদ্র এবং বেশীর ভাগ লোক অশিক্ষিত। এই দরিদ্র সমাজের শ্রমজীবিদের দিকে তাকাইলে বুক বেদনায় ভরিয়া উঠে। ইহারা আজ বেকার এবং নিরুপায়। ইহাদেরই দলে যেন আজ কাশীনাথ।

বাজারের থলিটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া কাশীনাথ পথ চলিতে লাগিল। তার পকেট কপর্দ্দকহীন, চোখের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ, গতি মন্থর এবং উদ্দেশ্যহীন। সমগ্র বিশ্বের ভার তার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া বসিয়াছে—নিশ্বাস বুঝি এখনই বন্ধ হইয়া আসিবে। বোধ হয় পথের উপরে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাইবে। কাশীনাথ মনে করে, ব্যাপারটা এখন হইলেই ভালো হইত—সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া যাইত।

ধীরে ধীরে পথ চলে—ক্লান্ত পদ—বিবশ মন। মনে পড়ে রোগ-পাণ্ডুর শিশুর অসহায় মুখ। পয়সার অভাবে হাসপাতালের ডাক্তারের করুণার উপরে তাহাকে ফেলিয়া রাখিতে হইয়াছে—এক জন যোগ্য চিকিৎসককে ডাকিয়া দেখাইতে পারিল না। হায় রে দুরদৃষ্ট! মনে পড়ে পত্নীর বেদনাতুর কাতর নয়ন। হায় বেচারী! একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কচি ছেলে-মেয়েরা আজ অভুক্ত—তাদের ক্ষুধাতুর মলিন মুখগুলা চোখের সম্মুখে সে দেখিতে পাইতেছে। কাশীনাথের চোখ দু'টি জ্বালা করিতে লাগিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল: হে দয়াময়, তোমার কাছে এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি যার জন্যে এত শাস্তি দিচ্ছো! আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করো—আমায় মুক্তি দাও।

মিস এমিলি

উইলিয়ম ফক্নর

মিস্ এমিলি গ্রীয়ারসন্ যখন মারা গেলেন, তখন আমাদের সহরটা ভেঙে পড়লো তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে। পুরুষেরা শ্রদ্ধা-মেশানো ভালোবাসা নিয়ে দেখতে গেলো এমন এক জন নামধন্যা মহিলার মৃত্যু; মেয়েরা কতকটা কৌতূহল নিয়ে গেলো তাঁর ঘর-দোর দেখতে। কারণ একটা বুড়ো চাকর—তাও সে একাধারে মালী আর রাঁধুনী দুই-ই,—ছাড়া সে বাড়ীতে কেউ ঢোকেনি কোনো দিন। বেশ বড়ো-সড়ো চৌকো ধরণের বাড়ীখানা; এক কালে রঙ সাদাই ছিলো। ঘোরালো সিঁড়িতে বারান্দায় বেশ সাজানো-গোছানো,—সেই পুরানো ঢঙের বাড়ী, সব চেয়ে ভালো রাস্তার ওপরই। কিন্তু পরে গ্যারেজ আর তুলোর কলের জন্যে আশ-পাশের বাড়ীগুলো উঠে গেলেও বাদ পড়ে গিয়েছিলো মিস্ এমিলির বাড়ীখানা। তুলোর ওয়াগনগুলোর মধ্যে ওখানা বেশ মাথা উঁচু করেই ছিলো—চক্ষুশূলের মধ্যে চক্ষুশূল হয়েছিলো। আর এখন মিস্ এমিলি যেনো জেফারসনের যুদ্ধে নিহত য়ুনিয়ন ও কনফেডারেট সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সংগে সাক্ষাৎ করতে গেছেন কবরের তলায়।

বেঁচে থাকতে মিস্ এমিলি ছিলেন নিজেই এক ঐতিহ্য, জীবন্ত কর্তব্য ও যত্ন। সমস্তটা সহরের কাছে একটা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা কৃতজ্ঞতার মতো। ব্যাপারটা সেই ১৮১৪ সাল থেকেই, যখন মেয়র কর্ণেল সারতোরিস্ যিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, কোনো নিগ্রো নারী ঘোমটা ছাড়া রাস্তা চলতে পারবে না, মিস্ এমিলির কর-ভার লাঘব করে দিয়েছিলেন মিস্ এমিলির বাবার মৃত্যুর পর। সে করভার বৃদ্ধি আর হয়নি। অবশ্য মিস্ এমিলি যে দয়া-দাক্ষিণ্য চাইতেন, তা-ও নয়। কর্ণেল সারতোরিস্ এই ধরণের গল্প বানিয়েছিলেন যে, 'মিস্ এমিলির বাবা না কি সহরকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন, আর সেই জন্যে তাঁদের সহর এই ভাবে সে দেনা শোধ করছে। এ-কাহিনী উদ্ভাবন করতে পারে সারতোরিস্-পরিবারেরই কোনো লোক, কিংবা ঐ বংশের বৈশিষ্ট্য যে বুদ্ধিবৃত্তি। আর মেয়েলোক ছাড়া এ-কথা বিশ্বাস করবেই বা কে? সুতরাং পরের যুগে যখন আধুনিক আদর্শপুষ্ট লোকে মেয়র ও অলডারম্যান হলেন, তখন তাঁরা মিস্ এমিলির প্রতি এ ব্যবস্থায় খুশী হননি। বছরের প্রথম দিনই তাঁরা চিঠি লিখলেন ট্যাক্স চেয়ে। ফেব্রুয়ারী মাস গেলো, উত্তর এলো। প্রথমে তাঁরা একটা সাধারণ চিঠি লিখেছিলেন মিস্ এমিলিকে, শেরিফের অফিসে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়ে সুবিধে মতো। এক হপ্তা পরে মেয়র নিজে লিখলেন, এবং তাঁর নিজের গাড়ী পাঠাবেন বললেন এমিলির জন্যে। একটা পাতলা ফিকে কালিতে লেখা উত্তর এলো এই মর্মে যে, এমিলি আজ-কাল বাইরে বেরোন না। সংগে অবশ্য চিঠির ছিলো খামে-আঁটা খাজনা বাড়ানোর নোটিশ! তাতে কোনো মন্তব্য ছিলো না। বোর্ড-অব অলডারমানের মিটিং ডাকা হলো। প্রতিনিধি গেলো তাঁর কাছে। চীনা তৈলচিত্র সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেওয়ার জন্যে আগে যা লোকজন যেতো-আসতো, সেই আট-দশ বছর আগে। তার পরে এই প্রথম তাঁর দুয়ারে হানা দিলো ক'জন। একটা অন্ধকার হল-ঘরের মধ্যে প্রতিনিধিদের নিয়ে গেলো এক জন বুড়ো নিগ্রো। ঘরে কেমন বিশ্রী ভ্যাপসা, নোংরা গন্ধ। নিগ্রোটি তাঁদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলো। ঘরখানা বেশ চামড়া-বাঁধা আসবাবে ভরতি। নিগ্রোটা জানলার পর্দা তুলে দিলে দেখা যায় যে, সে সব অনেক জিনিষের অবস্থা শোচনীয়। এক দিকে অগ্নিকুণ্ডের ধারে ক্রেয়ন তৈলচিত্র রয়েছে মিস্ এমিলির পিতার।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন—মিস্ এমিলি এলেন। বেঁটে মোটা

(আমরাও সব মিস্ এমিলির বন্ধু হয়ে পড়লাম)। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বোন দু'টি চলে যেতে বাধ্য হলো। আর যা ভেবেছি তাই ঘটলো; এক দিন সন্ধ্যার সময়ে নিগ্রো চাকরটা দোর খুলে দিলো ব্যারণকে। আর সেই শেষ বার আমরা ব্যারণকে দেখলাম। মিস্ এমিলিকেও আর ক'দিন। নিগ্রো চাকরটা বাজারের থলে নিয়ে যেতে আসতো তার পর থেকে, আর সদর দরজা থাকতো বন্ধ। আর মিস্ এমিলিকে এখন-তখন দেখতাম পলকের জন্যে জানলায়। সেই সে রাতে চূণ ছড়িয়ে দিতে গিয়ে তাঁরা দেখেছিলেন। কিন্তু, গত দু'মাসের মধ্যে কেউই তাঁকে রাস্তায় বেরুতে দেখেনি। এ ব্যাপারটা যেন আন্দাজ করা চলে। তাঁর বাবা যে ভাবে তাঁর নারী-জীবনে বিপর্যয় এনেছিলেন তার ফলে মৃত্যুটাও যেনো তাঁর কাছে কিছু নয়।

তার পরে মিস্ এমিলিকে দেখলাম এই-ই মোটা-সোটা, চুলে ধরেছে পাক। বছরে-বছরে বেশ ধূসর হয়ে উঠলো চুল। তাঁর চুয়াত্তর বৎসর বয়েসে মৃত্যুকালে সেগুলো বেশ পেকে গেছে।

অনেক দিনই মিস্ এমিলির দরজা বন্ধ। চল্লিশ বছর বয়েস অবধি। মাঝে ছ'-সাত বছর যখন চীনা তৈলচিত্র সম্বন্ধে ক্লাস খুলেছিলেন তখন যা-হোক তাঁকে দেখা যেতো। নিচের তলায় তিনি চমৎকার ষ্টুডিও বানিয়েছিলেন। সেখানে কর্ণেল সারতোরিসের মেয়ে নাতনীরা যেতেন। রবিবারে গীর্জায় যাওয়ার মতো গাম্ভীর্য নিয়ে তাঁরা নিয়ম করেই যেতেন। সংগে নিতেন পঁচিশ সেন্ট দামের প্লেট। এই সময়ে তিনি ট্যাক্স দিতেন।

তার পর যখন এই সমস্ত ছাত্রীরা বড়ো হয়ে পড়লেন, তাঁরা আর তাঁদের মেয়েদের রঙের বাক্স, তুলি এ-সব নিয়ে তাঁর ষ্টুডিওতে পাঠালেন না। সদর দরজায় আগল পড়লো। সহরে যখন বিনা ব্যয়ে ডাকপ্রথা চলতে লাগলো, তখন মিস্ এমিলিই একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ালেন বাড়ীতে নম্বর-প্লেট লাগানোর ব্যাপারে। কারোর কথা কানে তুললেন না।

দিন-মাস-বছর যতোই যেতে লাগলো, ততোই নিগ্রো চাকরটাও বুড়িয়ে যেতে আরম্ভ করলো। কুঁজো হতে লাগলো বাজারের থলে নিয়ে। প্রত্যেক ডিসেম্বরের ট্যাক্সের নোটিশ ফিরে আসতে লাগলো বেওয়ারিশ হিসেবে। মিস্ এমিলিকে নিচের তলায় দেখা যেতে লাগলো। ওপরের তলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভাবে তিনি এক-একটা যুগ পেরিয়ে যেতে লাগলেন শান্ত সমাহিত নির্লিপ্ততায়।

শেষে মারা গেলেন। অসুখে পড়লেন সেই অন্ধকার ধূলোয় ঢাকা বাড়ীতে। বুড়ো নিগ্রো চাকর ছাড়া নির্ভর করার কেউ নেই। আমরা জানিও'নে তাঁর অসুখ। নিগ্রোটার কাছ থেকে খবর পাওয়ার আশাও আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারোর সংগে সে কথা বলতো না, বোধ হয় কথা না-বলায় গলার স্বর কর্কশ হয়ে গিয়েছিলো।

নিচের তলার ঘরে মিস্ এমিলি মারা গেলেন, হলদে বালিশে মাথাটা রয়েছে, চারি দিকে বয়সের ভার আর সূর্যহীনতার ছাপ।

নিগ্রো চাকরটা দরজার কাছেই মেয়েদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলো। চুপি-চুপি কথায়, ফিস্-ফাস স্বরে মেয়েরা এদিকে-সেদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। চাকরটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো। সে সোজা ভেতরে গেলো আর পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আর তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। সেই সম্পর্কিতা বোন দু'টি এসে পড়লেন। দ্বিতীয় দিন শবযাত্রা হলো। সমস্তটা সহর ভেংগে পড়লো। প্রচুর ফুলে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হলো মিস্ এমিলিকে। তাঁর বাবার তৈলচিত্র শবাধারের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা আর একেবারে বুড়ো-সুড়ো লোকেরা আস্তে আস্তে চলেছে। সবাই ভাবছে মিস্ এমিলি তাঁদের সমসাময়িক। এই সব বুড়োদের সংগেই যেনো তিনি নেচেছেন গেয়েছেন। সময়ের গাণিতিক গতির কথা সবাই গেছে ভুলে। বুড়োরা তাই-ই চায়। অতীতটা তাদের কাছে বিস্মৃতির ক্ষীয়মাণ সড়ক নয়। সে সড়কে যেনো শীত কোনো দিন আসেনি। আমরা জানতাম, সে অঞ্চলে ওপর তলায় এমন একটা ঘর আছে যা কেউ কোনো দিন চল্লিশ বছরের মধ্যে খোলা দেখেনি। সেটা খোলা হবে। কিন্তু তার আগে মিস্ এমিলিকে উপযুক্ত সমারোহে কবরস্থ করা উচিত।

দরজা ভাঙতে গিয়ে সমস্তটা জায়গা গেলো ধূলোয় ভরে। বাসর-ঘরের মতো সাজানো-গোছানো সে ঘরের সর্বত্র যেনো বিবর্ণ এক চিলতে মড়া-ঢাকা কাপড় পড়ে রয়েছে। ফিকে গোলাপী রঙের মশারির ওপর, গোলাপী রঙের আলো-ঢাকার ওপর; ড্রেসিং টেবিলে, রূপোর প্রসাধনী দ্রব্যাদিতে। বিবর্ণতার ছাপে অক্ষরগুলো মুছে গেছে। এখানে একটা কলার, ওখানে একটা টাই। একটা চেয়ারে ঝুলছে একটা স্যুট, পাট-পাট্ করে ভাঁজ দেওয়া। চেয়ারের নিচে রয়েছে জুতো জোড়া আর মোজা।

মানুষটা শুয়ে রয়েছে খাটে।

আমরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, মাংসহীন মুখের মুখভংগীর দিকে। শোওয়ার ভংগীটা আলিংগনের ছিলো। কিন্তু যে নিদ্রা প্রেমকেও অতিক্রম করে স্থায়িত্বে, প্রেমের সব কিছুকে জয় করে সেই নিদ্রার সে অভিভূত। রাতের পোষাক আর বিছানা থেকে তাকে পৃথক করা অসম্ভব। তার ওপর, তার বালিশে অপূর্ব সহনশীল ধূলার আস্তরণ।

দ্বিতীয় বালিশটায় গর্ত রয়েছে মাথার আকারে। আমাদের এক জন ঝুঁকে পড়ে কি একটা তুললো ধূলোর থেকে। দেখলাম সেটা বেশ পাকা একগাছি কেশ।

অনুবাদ—আনন্দ দে।

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

সুভদ্রাকুমারী চৌহান

শিল থেকে পেষা মসলা বাটিতে তুলছিল কিশোরী বধূ। এমন সময় আট বছরের ফুটফুটে মুন্নী ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল।

'আচ্ছা বৌদি, শাড়ী বেনারসী ছেড়ে সাদা কাপড় কেন পরো তুমি?'

'কেন যে পরি তা তুই কি করে বুঝবি মুন্নী?'

'বাঃ, সে আবার কি কথা? মা বুঝি তোমায় সাদা কাপড় পরতে বলেছেন?'

'মা বলবেন কেন! আমার ভাগ্যই যে আমায় সাদা কাপড় পরাচ্ছে রে!'

'ভাগ্য! সে আবার কি জিনিস বৌদি? সেও বুঝি মা'র আর আমার মত দিন-রাত বক্-বক্ করে!'

চুপ করে থাকে কিশোরী বধূ।

'ভাগ্য কোথায় থাকে আমাকে দেখাবে বৌদি?'

সমস্ত মসলাটা বাটিতে তুলে নিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৌটি বলল—'কোথায় থাকে তা আমি কি করে জানব মুন্নি!'

মুন্নীর হাত থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নেয়। তার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে তরকারির কড়াটা তাড়াতাড়ি উনুনে চাপিয়ে দেয়। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্না শেষ করতে হবে। সুতরাং হাত দু'টো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন মুন্নীর মা।

'সাড়ে দশটা বেজে গেল এখনও তোমার রান্না হোল না! ছেলে-মেয়েরা কি খেয়ে স্কুলে যাবে শুনি? এমন কি রাজ্যের কাজ করতে হয় যার জন্য রান্নাটাও চটপট তৈরী করতে পার না? সংসারে একা তুমিই কাজ কর না কি······'

রাগে ফুলতে-ফুলতে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়েন তিনি।

'ন'টাও বাজেনি এখনও মা। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে। আপনি কেন শুধু-শুধু কষ্ট করতে এলেন?'

'ফের আমার মুখের ওপর কথা! কত দিন বারণ করেছি তবু কানে যায় না! জানো, তোমার মত পঞ্চাশটা মেয়েকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পারি! এখনি রান্না-ঘর থেকে চলে যাও······'

বধূর চোখ দু'টো জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়! মুন্নী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মা'র এই ব্যবহার তাকেও বিস্মিত না করে পারে না। বৌটি চলে যেতেই সেও তার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু মা ধমক দিয়ে ওঠেন। ভয়ে-ভয়ে আবার রান্না-ঘরে ফিরে আসে। এটা একটা প্রাত্যহিক ঘটনা। দিনের পর দিন এমনি ভাবে চলে একঘেয়ে একটানা আবর্ত্তন!

সেদিন ছেলে-মেয়ের দল কিছু আগেই খেয়ে নিয়ে স্কুলে চলে গেল। রান্না শেষ করে হাত ধুচ্ছিলেন মুন্নীর মা, ঠিক সেই সময় স্বামী রামকিশোর বাবু মক্কেলদের বিদায় দিয়ে অন্দরে ঢুকলেন। আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে বেশ একটু অবাক হয়ে যান।

'সকাল বেলায় সব গেল কোথায়?'

হাত ধুতে-ধুতে গর্জ্জে উঠলেন মুন্নীর মা।

'যাবে আর কোন্ চুলোয়! ইস্কুলে গেছে সব! কতখানি বেলা বেড়েছে তার খেয়াল আছে কিছু?'

পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখলেন রামকিশোর বাবু।

'সবে তো সাড়ে ন'টা এখন! এরি মধ্যে সবাইকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলে?'

মুন্নীর মা রাগে ফেটে পড়েন।

'আল্হাদী বৌ নিশ্চয়ই কানে মন্তর দিয়ে এসেছে। সে বলে ন'টা আর তুমি বলছ সাড়ে ন'টা! সবাই সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদী হলাম আমি? বাড়ীতে চাকরের যে সম্মান, আজ আমার তা নেই!'—ফুলে-ফুলে কেঁদে ওঠেন তিনি।

প্রবল বিস্ময়ে মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন রামকিশো বাবু। 'তোমাকে আবার মিথ্যাবাদী বললাম কখন? ঘড়ি হয়ত বন্ধ হয়ে আছে; কিন্তু তাতে কাঁদবার কি হোল?'

জামাটা আলনায় টাঙিয়ে রেখে তোয়ালেটা টেনে নেন তার পর কল-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। স্ত্রীর স্বভাবের সাথে অনেক দিনের পরিচয় তাঁর। কিশোরী বধূর ওপর অত্যাচারে কাহিনীও অজ্ঞাত নয়। তার কারণ তিনি তাকে স্নেহ করেন কিশোরী তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বধূ? বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস এমনি ভয়ংকর যে, বিয়ের মাস খানেক পরেই কিশোরীর কপাল থেকে সিঁদুরের রাঙা চিহ্ন মুছে নিয়েছেন। তাই এই অভাগিনী বিধবা বধূকে সবাই করুণা করতো। রামকিশোর বাবু হয়ত বা একটু বেশী তাই ছিল মুন্নীর মা'র রাগ। স্ত্রীকে ভয়ও করতেন খুব। ফলে কিশোরী বধূর ওপর অত্যাচারের কোন প্রতিকারই করতে পারেননি প্রায়ই চুপ-চাপ থাকতেন। আজও বুঝলেন, তাঁর অজান্তে একটা কিছু ঘটে গেছে।

ভাবনার চিন্তা ক্রমেই যেন জট পাকাতে থাকে······

কোর্টে যাবার আগে কিশোরী বধূর ঘরে গিয়ে রামকিশোর বাবু বললেন—'আজ আর না খেয়ে থেকো না মা, তাহ'লে একটুও শান্তি পাব না। তুমি না খেলে আমি যে দুঃখ পাব মা!'

আড়াল থেকে সব শুনলেন মুন্নীর মা! তার পর মনে মনে গর্জাতে লাগলেন—'ওঃ এতখানি দরদ! কাছারী যাবার সময় আমার সাথে একটা কথাও বলা হোল না আর ওকে এতখানি তোষামোদ? দাঁড়াও তোমায় খাওয়াচ্ছি আজ···!'

বাকী খাবার ঝিকে দিয়ে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে রান্না-ঘরে ঢুকে কিশোরী বধূ দেখল ভাতের হাঁড়িতে তখনও কিছু লেগে আছে। জল দিয়ে তাই খেয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এদিকে কোর্টে গিয়ে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারেন না রামকিশোর বাবু। চোখের সামনে বারম্বার ভেসে ওঠে কিশোরী বধূর ব্যথা-মাখানো পাণ্ডুর মুখখানা। তাই তাড়াতাড়ি জরুরী কাজগুলো সেরে বাড়ী ফিরে আসেন। মুন্নীর মা তখন পাড়া-বেড়াতে গেছেন। তাই তাঁকে দেখতে না পেয়ে কিশোরী বধূর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। চারি দিকের দুর্দশার চিহ্ন তাঁকে ব্যথিত করে; দু'চোখ বেয়ে নেমে আসতে চায় জলের ধারা। আজ যদি চন্দন বেঁচে থাকতো তাহলে হয়ত···! নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেন। একটা ময়লা ছেঁড়া কাপড় বধূর দেহ বেষ্টন করে রয়েছে। চারি দিকের ছেঁড়ায় লজ্জা ঢাকছে না। চোখ তুললেন বিছানার দিকে। বিছানার নামে একটা ছেঁড়া কাঁথা পাতা খাটের ওপর। বালিশও নেই। মাটিতে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল কিশোরী। বাইরে পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, মাথায় কাপড় দিতে গিয়ে ফাঁস করে ছিঁড়ে গেল হাতের কাছটা। করুণ আর রুক্ষের স্নেহ-মমতার স্নিগ্ধ চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। রামকিশোর

বাবু নিজেকে সামলাতে পারেন না। ধরা-গলায় বলে ওঠেন—'তুমি খেয়েছিলে তো মা?'

'না'—অস্ফুট এক আওয়াজ বের হয় কিশোরীর মুখ থেকে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে ওঠে—'হ্যাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।'

'কিন্তু তোমার চোখ-মুখ যে না-খাওয়ার কথাই বলছে মা!'

কিশোরী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না, টপ-টপ করে পড়ে চলে।

'তুমি খাওনি? আমার দুঃখ শুধু এই যে তুমিও তোমার বুড়ো বাপের কথা রাখলে না!'

উত্তর দিতে চেষ্টা করে কিশোরী, কিন্তু ঠোঁট দু'টো কেঁপে ওঠে শুধু। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল—'আপনার কথা আমি ঠেলিনি বাবা! মিথ্যা বলছি না, রান্না-ঘরে যা ছিল তাই আমি খেয়েছি।'

রামকিশোর বাবু আশ্বস্ত হতে না পেরে ঝিকে জিজ্ঞেস করেন।

ঝি উত্তর দেয়—'আমার সামনে তো কিছু খাননি। মাইজী তো অনেক আগেই রান্না-ঘর খালি করে দেন।'

স্ত্রীর এই ব্যবহারে রামকিশোর রাগে জ্বলতে থাকেন এক দিকে আর এক দিকে পুত্রবধূর কথায় অবাক হয়ে যান। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে কিশোরীর হাতে দিয়ে বললেন—'এটা তোমার কাছে রেখে দাও মা, দরকার মতো খরচ কোরো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের গতিতে প্রবেশ করলেন মুন্নীর মা। রামকিশোর বাবুর হাত থেকে নোটটা কেড়ে নিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন—'বাবাঃ, এত দূর গড়িয়েছে! শূন্য বাড়ীতে এ কি কেলেংকারি শুনি? শেষ কালে বুড়ো বয়েসে এই কীর্তি……'

যে ভাবে এসেছিলেন সেই ভাবে বেরিয়ে যান তিনি। রাম কিশোর বাবু লজ্জায় মুখ নীচু করে অন্য দিকে পা বাড়ান। বয়েসে বুড়ো না হলেও পুত্রশোক তাঁকে অনেকখানি বৃদ্ধ করে ফেলেছে। গ্লানি আর ক্ষোভে সমস্ত মনটা ফেনিয়ে ওঠে। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে এক সময় শুয়ে পড়েন বৈঠকখানার লম্বা ফরাসে। চন্দনের স্মৃতি বার-বার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে। আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। ছোট ছেলের মত বালিসে মুখ গুজে কেঁদে ফেলেন।

'তুমি কাঁদছ বাপি?'—কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে মুন্নী তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে।

রামকিশোর বাবু বিরক্ত হন। বেশ রাগের স্বরেই বলে ওঠেন—'নিজের ভাগ্যের জন্ম মা!'

ভাগ্যের নাম শুনে সকালে বৌদিকে কাঁদতে দেখেছে মুন্নী, আবার এখন বাপিকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

'ভাগ্য কোথায় থাকে বাপি? সে বুঝি মা-মণির কোন আত্মীয়?'

এত দুঃখের মাঝে এক টুকরো শান্ত হাসি খেলে যায় রাম-কিশোর বাবুর মুখের ওপর।

'হ্যাঁ মা, সে যে তোমার মায়েরই বোন হয়?'

মুন্নী বিশ্বাস করে সে কথা, তাই বিজ্ঞের মত বলে ওঠে—'তা না হলে সে তোমাকে আর বৌদিকে এমনি ভাবে কাঁদাবে কেন?'

রামকিশোর বাবু মুন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলেন!

অনুবাদক:—তন্ময় বাগচী।

বিবর্তনবাদ

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

নদীতীরে সূর্য উঠিতেছিল।

দুইটি ভদ্রলোক নিরিবিলি প্রভাত-বায়ু সেবন করিতেছিলেন। সবুজ ঘাসের উপর হাঁটিতে হাঁটিতে রক্তিম পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া খিত্তির মশাইর মনে সাম্য-মৈত্রী প্রভৃতির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না জানি না, তিনি সঙ্গী ঘোষাল মশাইকে বলিলেন,—'আমাদের নতুন পোষ্ট-মাষ্টার বাবুটি লোক বোধ হয় ভাল। বয়সও অল্প। প্রতিবেশী হেড-মাষ্টার বাবুর বিপদে-আপদে খুব করতে দেখি লোকটিকে।'

ঘোষাল মশাই আধা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—'তাই না কি?'

বেলা ন'টা।

ঘোষাল মশাই তেল মাখিতেছিলেন। পত্নী সর্বজয়া তরকারিতে হাতা চালাইয়া কহিল,—'হেড-মাষ্টারের বড় মেয়েটা না কি আবার অসুখে পড়েছে। সুন্দরী স্বীকার করি, কিন্তু অত রূপের দেমাক কি ভাল? তা'ও তো রোজ বিছানায় থাকবি—আজ এটা, কাল ওটা! লোকে নেবে কি তবে পটের ছবি দেখতে?'

তরকারির গায়ে হাতার আঘাতের ক্ষিপ্রতা বাড়াইয়া দিয়া ঘোষাল-গিন্নি যেন দেখাইয়া দিল, মেয়েদের আসল গুণই হইল একটা শক্ত-সমর্থ দেহধারণে। দেহধারণ ব্যাপারে ঘোষাল-গিন্নি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ঘোষাল বলিলেন,—'সব সময় ঘরে অসুখ-বিসুখ থাকলে বড় ঝামেলা। তা নতুন পোষ্ট-মাষ্টার বাবু না কি খুব করছে ওদের জন্যে; সর্বদাই যাতায়াত, খোঁজ-খবর।'

সর্বজয়া হাত থামাইয়া বলিল,—'তাই না কি?'

সূর্যদেব মাথার উপরে উঠিয়াছেন।

গরমের দিনে রান্না-খাওয়া শেষ করিয়া সর্বজয়া দেহটাকে মেঝেতে গড়াইয়া দিতেছে। পাড়ার বুড়ী পিসি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া

দিয়েছে। কি কথার উত্তরে বুড়ী পিসি বলিল—'সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমরা বাপু তোমার প্রশংসা সবারই কাছে করি। এমন করিৎকর্ম্মা মেয়ে আছে না কি এ-পাড়ায়?'

বুড়ী পিসির কোন কিছুর দরকার হইলেই এই কৌশলের আশ্রয় নেয়। দু'-এক কথার পরেই সে এক টুকরা কাটা কুমড়া বাগাইয়া আঁচল বাঁধিতে বাঁধিতে বলে,—'তুমি ছাড়া এ-পাড়ায় আর যা সব, কার কি আর না জানি বল? দুর্নাম করতে জানি না কারুর, তাই না!'

দুর্ণাম কথাটা কেমন যেন ছোঁয়াচে। সর্বজয়া পানের পিক ফেলিয়া বলিল,—'তোমাদের পোষ্ট-মাষ্টার না কি হেড-মাষ্টারের বাড়ীতে যখন-তখন যাতায়াত করে?'

বুড়ী পিসি ফোকলা মুখে হাসিয়া চোখ নাড়িয়া বলে,—'ও মা, তাই না কি? তা অমন সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে হেড-মাষ্টারের ঘরে—হবে না কেন? কত বলেছি বিয়ে দে—বিয়ে দে।—ও-বয়েস আমাদেরও তো ছিল।'

সর্বজয়া সতর্ক হইয়া বলিল—'অত কিছু কিন্তু আমি জানি নে। শেষে আমাকে জড়িও না।'

পিসি বলিল—জানবি আবার কি? বাইরে থেকে কি আর সব জানা যায়?'

কুমড়োর টুকরাটা নিয়া উঠিয়া পড়ে বুড়ী।

বেলা দু'টো।

বুড়ী পিসি খুট্-খুট্ করিয়া গিয়া সমদ্দারের বাড়ী ঢোকে। সমদ্দার বহু দিন হইতে মৃতদার। বুড়ী পিসিকে জড়াইয়া তাহার একটা দুর্ণাম বহু কাল প্রচলিত ছিল। সমদ্দার শুইয়া হাওয়া খাইতেছিল, বুড়িকে দেখিয়া বলিল, কি গো, দুপুর রোদে যে? ছেলের চিঠি পড়াতে না কি?

বুড়ী পিসি বসিয়া বলে,—'চিঠি আর কোথায়? দু'মাস চিঠি পাইনি। আর আসবেই বা কি করে বল? পোষ্ট-মাষ্টারই যদি অন্য দিকে অত মজে যায় তো চিঠি আসে কি করে?

—'কি হয়েছে শুনি?'

—নতুন পোষ্ট-মাষ্টার না কি হেড-মাষ্টারের বড় মেয়েটার কাছে যাতায়াত করছে!'

—'তাই না কি?'

—'পাড়াময় ঢি-ঢি!—তুমি আর জানবেওনি!'

সমদ্দার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসে। গলা নামাইয়া বলে,—'এত দিনে না বুঝতে পারছি—অমন সুন্দরী মেয়ে অথচ কনে দেখতে এসে সেদিন এক ভদ্রলোক কেন অমত কল্লেন! মুখে বল্লেন বটে মেয়ে বড় রোগা। কিন্তু ভদ্রতা তো আছে? তারা কি আর আসল কেলেঙ্কারি মুখে বলে যাবে?'

বুড়ী পিসি সন্ধান দেয়—ভবর কাছে একটু খোঁজ নাও দেখি। ও ত পোষ্ট-মাষ্টারের ওখানে কাজ করে। ভব সমদ্দারের দূর-সম্পর্কীয় নাতি—পোষ্ট-মাষ্টারের চাকর।

বিকাল।

সমদ্দার ভবকে খবর দিয়া আনে। ভব তামাক টানিতে টানিতে সব শুনিয়া নীচু-গলায় বলে,—'অবশ্য দেখিনি কিছুই, কিন্তু তবু সত্যিই মনে হ'চ্ছে।—আর এ ছাড়া আর কি হবে? দুধে জলে ঢেলে দিলে ও আর কি আলাদা থাকে! ও ঠিকই শুনেছে।'

অপরাহ্ণ দু'টা।

পোষ্ট-মাষ্টারের বাসার চাকর ভবনাথ সন্ধ্যার আগে নিয়মিত একবার হেড-মাষ্টারের বাসার ঝি সৌদামিনীর বাসায় যায়। সৌদামিনীর হাত হইতে সাজানো পানটা নিয়া চিবাইতে চিবাইতে ভবনাথ হাসিয়া বলে,—'তোমাদের দিদিমণির ওখানে আমাদের পোষ্ট-মাষ্টার বাবু না কি রোজ রাত্তিরে বেড়াতে যান?'

'সৌদামিনী চোখ ঘুরাইয়া বলে,—'ও মা, তাই না কি?'

ভবনাথ নিজের বুদ্ধির প্রসারতা দেখাইবার সুরে বলে,—'আরে, থাকি বটে চুপ-চাপ ক'রে কিন্তু আবছা-আবছা সবই জানি সবার। আমাদের বেলাতেই যত দোষ;—ভদ্দরলোকের বেলা দোষ নাই!'

সৌদামিনীরও বুদ্ধির ছোঁয়াচ লাগে, বলে,—'হুঁ! এই জন্তেই দিদিমণির অসুখের এত খোঁজ-খবর নেওয়া। তা' বাপু, দু'দিকেই বয়স কাঁচা—এ ছাড়া আর কি হবে! এক দিন আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল,—এখন দেখছি ব্যাপারটা সত্যি!'

আধ ঘণ্টার মধ্যে ভবনাথ সমদ্দারকে জানাইল—'ব্যাপারটা সত্যি।' সমদ্দার পিসিকে ডাকিয়া বলিল, 'যা বলেছিলে সত্যি।' বুড়ি পিসি কষ্ট করিয়া হইলেও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্ত সর্বজয়াকে জানাইয়া আসিল—পোষ্ট-মাষ্টারের আর হেড-মাষ্টারের ব্যাপারটা সত্যি।' সর্বজয়া ঘোষাল মশাইকে বলিল—'বলিনি?'

ঘোষাল মশাই বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, বলিলেন, 'আমিই কিন্তু ব্যাপারটা সব চেয়ে আগে ধরেছিলাম!'—বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নদী-তীরে সূর্য অস্ত যাইতেছিল।

ঘোষাল ও মিত্তির মশাই রোজকার মত সান্ধ্য-বায়ু সেবন করিতেছিলেন। বিশেষ কোন কথা নাই। হঠাৎ এক সময় ঘোষাল বলিলেন,—'নতুন পোষ্ট-মাষ্টারকে তুমি না ভাল বলেছিলে?'

—'তাই ত আন্দাজ করেছিলাম।'

—'আসলে হেড-মাষ্টারের বড় মেয়েটার সাথে তার ইয়ে—বুঝলে?'

মিত্তির গলা নীচু করিয়া ঘোষালের কাছে মাথা সরাইয়া আনিয়া বলিলেন—'তাই না কি! আরে, সত্যি বললে আমিও তো অমি একটা আঁচ করেছিলাম।'

ঘোষাল দাঁড়াইয়া মিত্তিরের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিলেন।

মিত্তির বলিলেন, 'মাইরি!'

সূর্য অস্ত গেল।

ফ্লোরেসেণ্ট আলো

সাধনা মিত্র

সারা শহর আজ এই আলোর টিউবে ছেয়ে গেছে, তাই না ? অথচ ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। কয়েকটা পদার্থ এক ধরণের আলোতে ধরলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর যতক্ষণ আলোটাকে রাখা হয় ততক্ষণ ঐ পদার্থগুলি দীপ্তি বিকীরণ করতে থাকে। ফ্লোরোস্পার বা ক্যালসিয়াম্ ফ্লোরাইডে এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করা হয় আর তারই নামানুসারে ক্রিয়াটির নাম ফ্লোরোসেন্স। জিনিষটা প্রতিফলন নয় মোটেই, কারণ এক রঙের আলো শোষিত হয়, আবার অন্য রঙের আলো বিকীর্ণ হয়।

গাছ-পালাদের সবুজ রঙ হওয়ার কারণ ক্লোরোফিল বলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকায়। এই ক্লোরোফিলের দ্রবণ একটা অন্ধকার ঘরে রেখে আর তার মধ্য দিয়ে শ্বেতাভ আলোর একটি রশ্মি ফেলা যায় যদি, তাহলে আলোটুকু যে অংশে পড়েছে দ্রবণের সেই অংশ হতে ঝকঝকে লাল আলোর রশ্মি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভারী ধাতুটির নাম আমরা জানি—ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম অক্সাইড নিয়ে কাচের একটি ব্লককে রঙ করে যদি ঐ একই শাদা আলোকে এই ব্লকটির মধ্যে ফেলি, তা হলে বিকীর্ণ আলোটা দেখবো হলদে অথচ সমস্ত ব্লকটা ঈষৎ সবুজ আভাযুক্ত আলোময় হয়ে যাবে। প্যারাফিন্ অয়েল বা মোমতেল দিয়ে করলেও ঐ একই রকম ফল হবে।

আবার পাণ্টা একটা সেলের মধ্যে ফ্লোরোসিনের দ্রবণ রেখে সমান্তরাল শ্বেত রশ্মি তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো যায় যদি, দেখবে তরল পদার্থটির উপাঝভাগটুকু, যেখানে আলোটা পড়েছে আর কি—হরিদ্রাভ-সবুজ রঙের আলোর দীপ্তিতে জ্বলতে থাকে আর দ্রবণটির যত ভেতরে আলোটা যায়, আলোর দীপ্তি তত কমে যায়। এর কারণ হচ্ছে যে দ্রবণটির উপরিভাগের প্রথমাংশ আলোর রশ্মিগুলি শোষণ করে ফেলে, কাজেই দীপ্তি ক্রমশঃই কমতে থাকে। সঞ্চারিত (tansmitted) আলোর বর্ণালীতে দেখা যাবে যে, নীল আলোর প্রান্তটা নেই-ই মোটে আর ক্রমানুবর্ত্তী আলোর রশ্মিগুলি শোষিত হয়ে হরিদ্রাভ-সবুজ রঙেতে পুনঃ পতিত হচ্ছে।

আবার ফ্লোরোসেন্স এক' বিশেষ বস্তুর উপরে বিশেষ আলোর ক্রিয়াতেই উদ্ভূত হয়। একটা টেষ্ট-টিউবে যদি কুইনাইন সালফেট রেখে তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে একটা উজ্জ্বল অবিরত (continuous) বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে স্থাপন করা যায়, তবে বর্ণালীর লাল, সবুজ আর হলদে এই তিন রঙের অংশে ঠিক ঐ ঐ রঙেরই দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবে টেষ্ট-টিউবটি দিয়ে, কিন্তু নীল এবং বেগুনী রঙেতে হাল্‌কা নীল রঙ দেবে আর অতি-বেগুনী (Ultra-Violet) আলোতে দেবে নীল রঙ। বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইডের একটা পর্দ্দা, সৌর বর্ণালীর (Solar Spectrum) বেগুনী আর অতি-বেগুনী অংশে ধরলে সবুজাভ আলোতে জ্বলতে থাকে আর এক্‌স্-রেতে দিলে হলদে আলো হয়। ফ্লোরেসেন্স বিষয়ক খুব দরকারী তথ্য একটা বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রমণ পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বিষয়ক ব্যবহারিক গবেষণা এবং নির্ণয় করাতে ফ্লোরেসেন্সের ব্যবহার হতে পারে। তা ছাড়া কোনো তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী আলোর পথকে দৃশ্যমান করে তুলতেও পারে এই প্রক্রিয়া।

ক্যালসিয়াম্, বেরিয়াম্, ষ্ট্রন্‌শিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুর সালফাইড সল্টগুলি আবার এমন গুণবিশিষ্ট যে, কোনো আলোতে এদের কিছুক্ষণ রাখার পর যখন আলোটা সরিয়ে নেওয়া হয়, তখনো এরা অন্ধকারেই আলো বিকিরণ করতে থাকে কিছুটা সময় ধরে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় ফস্‌ফোরেসেন্স। ফস্‌ফরাস স্লো অক্সিডেশানের জন্যে ঈষৎ সবুজাভ মৃদু শাদা আলো দিতে থাকে অন্ধকারে রাখলে, তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ফস্‌ফোরেসেন্স—ফস্‌ফরাসের খাতিরে। কাজে কাজেই উপরোক্ত পদার্থগুলো দিনের বেলা আলোতে ধরলে রাত্রের অন্ধকারে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কিন্তু এই দীপ্তি বিকিরণের স্থায়িত্ব কাল পৃথক পৃথক্ পদার্থের বেলায় পুরোপুরি পৃথক্। Balmain এর আলোকবিকাশী (Luminous) রঙ—যেটা প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম্ সালফাইড দিয়ে তৈরী, সেটা উজ্জ্বল সূর্য্য-রশ্মিতে ধরার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে দীপ্তি বিকিরণ করতে থাকে, আবার এমনও কয়েকটি বস্তু আছে যেগুলোর দীপ্তি, আলো হতে সরিয়ে নেওয়ার পর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিবে যায়। বেগুনী আর অতি বেগুনী রশ্মি ফস্‌ফোরেসেন্স উদ্ভূত করতে প্রভূত মাত্রায় কার্য্যকরী।

আবার কোন ফসফোরেসেণ্ট বস্তুর দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে যদি তার উত্তাপ বাড়ানো যায়, তেমনি দীপ্তির স্থায়িত্ব কাল কমে যাবে। আলোকবিকাশী রঙ একটা কার্ডে মাখিয়ে সেটা অবলোহিত (Infra-red) আলোতে ধরলেই পূর্ব্বোক্ত তথ্যটির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যাবে সুতরাং অবলোহিত আলো-বিষয়ক পর্য্যবেক্ষণেরও সুবিধা হয় এতে।

তা হলে ফ্লোরেসেন্স আর ফস্‌ফোরেসেন্সের মধ্যে পার্থক্য হোল এই যে, প্রথমটি উদ্দীপক আলো সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট

য় যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টি তা হয় না, কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত সমভাবে প্রাজ্জ্বল থাকে।

কয়েকটা বিশেষ জলচর প্রাণী এবং জোনাকীর দেহ হতে অন্ধকারে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে সেটা কিন্তু ফসফোরেন্স নয়, সেটা ওদের জৈব দীপ্তি-বিকিরণক্ষম শক্তি। আবার পচা মাছ, বিকৃতিপ্রাপ্ত ঠ প্রভৃতি হতে অন্ধকারে যে আলো দেখা যায়, সেগুলো বিশেষ ক প্রকার জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়া কৃত। টিনড্‌ল দেখিয়েছিলেন ়, একটা আর্ক ল্যাম্পের আলো যখন আয়োডিন্ কার্বন-বাই-লফাইডের দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, তখন ই আলোটা শোষিত হয়ে যাবে কিন্তু উত্তাপ বিকিরণ-ক্রিয়া ঞ্চারিত হতে থাকবে। পাতলা কালো রঙ-করা প্লাটিনাম তের ওপরে বিকীর্ণ উত্তাপটুকু কেন্দ্রীভূত করলে তারটি জ্বলে ায় অবধি।

একবার ফস্‌ফোরেসেন্ট সংক্রান্ত পদার্থ দিয়ে একটা পর্দা তৈরী রা হয়েছিলো। অল্প শক্তিশালী আলোর সাহায্যে এই পর্দাটা ালো ধরে রাখে। যে অংশে আলোকপাত হয় সেই অংশটাই প্রদীপ্ত থাকে। কাজেই ঘরের সব আলো নিবিয়ে দিলেও র্দাটা প্রদীপ্ত অবস্থায় থাকে। এই পর্দাটা দিয়ে নিজের ছায়াকে ায়ী করে রাখা যেতে পারে। পর্দাটার সামনে একবার এসে । বসে তার পর সরে গেলে ছায়াটা কিন্তু ঠিক ভাবে পর্দার গায়ে লগে থাকে। পর্দার যে অংশে আলো পড়েনি ছায়ার জন্যে—শুধু সইখানেই দীপ্তি দেখতে পাওয়া যায় না। নিয়ন্ ল্যাম্পের লাল আলো জ্বেলে ও নির্বিঘ্নে ছায়াটাকে পুঁছে ফেলা যায়। কারণ অল্প আলো পর্দার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর ফস্‌ফরেসেন্ট আলো নিয়ন আলোর প্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের গতি

আশীষ বসু

গম-গম করছে লোক-সম্মেলনে। সভাপতি মশায় তার বক্তৃতার বিষয়-বস্তু বুঝিয়ে দিচ্ছেন মাইক্রোফোনে: 'মনে করুন, আপনি কটা চেয়ারে বসে টেবিলে খাতা ফেলে লিখছেন একমনে, আপনার টেবিলের পায়া বেয়ে উঠে এলো ছোট্ট একটা পিঁপড়ে। আপনি কলমটা খাতার উপর রেখে একমনে ভাবছেন বসে-বসে, এমন সময় পিঁপড়েটি সাহসে ভর করে উঠে এলো আপনার খাতাটার উপরে এবং কলমের ডগা থেকে চুরি করে নিলে একটুখানি কালি। তার পর পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করলে, ওঃ, কতটা কালিই না নিলাম। আর লোকটাও তো আচ্ছা বোকা! আপনি কিন্তু ছোট ঘটনাটির সবটুকুই দেখলেন, ইচ্ছে কোরলে এক্ষুণি ওই পিঁপড়েটির ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারেন। আমরা, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক অমনি একটু জ্ঞান চুরি করেছি বিরাট জ্ঞানের সাগর থেকে, আর বসে-বসে ভাবছি, কি ঠকানই না ঠকিয়েছি বিধাতাকে—!' গত বারের আগের বারের কলিকাতা সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের অংশ।

দেড় হাজার বছর আগে কসমস্ নামে এক জন সন্ন্যাসী একখানা ভূগোল লেখেন। তার ভূগোলের মতে পৃথিবী একটা সমান্তরাল ক্ষেত্র। এর দৈর্ঘ প্রস্থের দ্বিগুণ। আজ কেউ সে-কথা বিশ্বাস কোরবেন কি? Ptolemic Astronomyতে বিশ্বাস করবেন কি কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বা Helliocentric Astronomy আবিষ্কারের পরেও। বিধর্মী বিচার-সভা তাঁকে পুড়িয়ে মেরেও বিজ্ঞানকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বিজ্ঞান তার এই জয়যাত্রার পথে চলেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই হঠাৎ যেন বিজ্ঞান কেমন একটা ঘা খেয়েছে, কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছে।

আকাশে অনুসন্ধান কোরতে গিয়ে বিজ্ঞান দেখেছে সৌরকেন্দ্রিক তারকার রাজ্যকে। এই তারকা-রাজ্যের প্রজার-সংখ্যা না কি ত্রিশ লক্ষ বা তারও বেশী। আমাদের মহাপ্রভু সূর্য্যদেব সেই তারকা-রাজ্যের একটি নগণ্য প্রজা মাত্র। অধুনা এক বৈজ্ঞানিকের মত এইরূপ যে, সূর্য্যও দাঁড়িয়ে নেই আর এক বড় সূর্য্য তাকে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের এই গতি আপেক্ষিক, তাই বোঝবার উপায় নেই কোন মতেই যে পৃথিবীর মত সূর্য্যও ঘুরছে। বিশ্বের সব মহা-মহা রথীরাই না কি এমনি ঘূর্ণায়মান। কিন্তু কে সেই মহা শক্তিমান প্রজ্ঞা যিনি এই সব ঘোরাবার মূলে? বিজ্ঞান তার উত্তর জানে না। বিজ্ঞান জানে এই তারকা-রাজ্য বা Stellar system আরও এক বৃহত্তম তারকা-লোকের অংশ মাত্র। অমনি বিরাট বিরাট তারকা-রাজ্য—যতই উপরে ওঠা যাবে ততই পাওয়া হাজারে-হাজারে। দুই তারার মধ্যে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধান জুড়ে আছে ছায়া পথ বা milky way। ছায়া-পথ আর তারকা-রাজ্য নিয়ে এই সমস্ত systemটির নাম Galatic system। এই লক্ষ লক্ষ Galatic system না কি আবার Spiral nebulaeর একটি অংশ মাত্র।

কোপারনিকাসের যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত ছিলেন জড় বস্তুর বিশ্লেষণে। ক্রমশ অণু থেকে তাঁরা যখন পরমাণুতে এসে পৌছুলেন তখন ভাবলেন, ল্যাঠা চুকলো বোধ হয় এবার। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন, এমন সময় রাদারফোর্ড Electron নামে এক অদ্ভুত চীজ আমদানী করলেন বিজ্ঞানীদের হাটে। পরমাণু ভেঙ্গে দেখা গেল ভূত সেই সর্ষের ভেতরেও। সেখানেও সেই stellar system, তারকারাজির খেলা সূর্য্যকে কেন্দ্র করে। রাদারফোর্ড তাদের বললেন, 'Tiny specks floating in void. এডিংটন বললেন, 'The revelation by modern physics of the void within the atom is more disturbing than the revelation by astronomy of the immense of interstellar space.' সমস্ত বিজ্ঞানীরাই চমকে উঠলেন এই আবিষ্কারে। কিন্তু কি এই Electron। পুঞ্জীভূত শক্তি। কিন্তু কোথায় তার উৎস? তাহলে এর কি কোন উৎস নেই? এ কি শক্তি নিজেই তৈরী করে? এর সংজ্ঞা কি? Potential formএ কোন শক্তি এর মধ্যে থাকে কি না? এমনি হাজারো প্রশ্ন হোল। Eddington তার উত্তরে বললেন, 'To a request to explain what electron really is

supposed to be, we can only answer, it is part of A, B, C of physics.' পদার্থবিজ্ঞার শুরু হলো তবে এই Electron থেকে! উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা তবে কোরলাম কি! গলাবাজি। Spencer যে অত চিৎকার করে দর্শনকে দরজা দেখালেন। Heckel যে ব্রহ্মকে 'Ether God' বলে ব্যঙ্গ কোরলেন, ভগবানকে বললেন 'Gaseous Vertibrate' তা তো সবই বিজ্ঞানের জোরে।

এই গণ্ডগোলের মধ্যে আর এক গণ্ডগোল বাধালেন আইনষ্টাইন তাঁর Theory of relativity বার কোরে। Russel তার Outline of Philosophy বইতে বলছেন, 'The theory of relativity leads to similar destruction of the solidity of matter by a different line of argument.' কি অসোয়াস্তি বলুন তো? আমাদের চারি পাশের বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, চেয়ার-টেবিল সব-কিছুই আছে কি না সন্দেহ। সব-কিছুই ওজন আমাদের দাঁড়িপাল্লার ওজনের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী। সব কিছুই শূন্যে ভাসমান Electric chargeএর সমষ্টি। এই chargeগুলো কি? Electron নিশ্চয়ই। Electron কি? জবাব দেওয়া যায় না। Eddington তার বিখ্যাত বই Science and the Unseen Worldএ বলছেন, 'The answer will not be a description in terms of billiard balls or flywheels or anything concrete he will point, instead, to a number of symbols and a set of mathematical equations which they satisfy.' যদি জিজ্ঞাসা করি Symbolগুলি কিসের? 'To understand the phenomenon of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is being symbolised.' এডিংটনের উত্তর।

আমরা দেখি। দেখি মানে দৃশ্য-বস্তু থেকে আলোক-তরঙ্গমালা আমাদের চোখে আসে, চোখের পর্দা বা Retinaতে আঘাত দেয়, সেই আঘাতের স্পন্দন optic nerveগুলির মধ্য দিয়ে গিয়ে Brainএর Electron-গোষ্ঠীকে ধাক্কা দেয়, তাই আমাদের চেতনা যোগায়। Eddington তার Science and the Unseen World বইতে বলছেন, 'then if natural law determines the way in which the configuration of atoms succeed one another, it will simultaneously determine the way in which thoughts succeed one another in the mind.' Now the thought of Txy in a boy's mind is not seldom succeeded by the thought ৮৫৫6. What has gone wrong?'

এই সমস্ত সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান সত্যি হতচকিত হয়ে প'ড়েছে। দর্শনের নির্দেশিত পথে তাকে ধীরে ধীরে যেতে হবেই এবং হচ্ছেও। সভাপতি মহাশয়ের কথা সত্যি— যত দিন আমাদের কাছে অজ্ঞাত তত দিন আমরা দর্শনকে গলা-ধাক্কা দিয়েছি। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়ছে ততই আমরা দর্শনকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, এই সমস্ত সমস্যারই সমাধান করা আছে ঐ পথে।

নীল রিবার্গ ফিনসেন

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

ড্যানিস চিকিৎসক ফিনসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ সালে ১৫ই ডিসেম্বর। শৈশবে আইস্‌ল্যাণ্ডের আলো-ছায়ার অপূ দৃশ্য তাঁর মনকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করে যে উত্তর-জীবনে তিনি সজী পদার্থের ওপর আলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে অনুপ্রাণি হন। তাঁর যৌবনে জ্ঞান স্থুরু হয় কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ১৮৯০ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়েই তিন বছর ঐ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সেই স শারীরবিদ্যার শিক্ষকতার স্থযোগ পান। তার পর ১৮৯৩ সা তাঁর মনে পরিবর্ত্তন আসে এবং সেই জন্তে নিজেকে শিক্ষকত দিক থেকে সরিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্পূর্ণরূপে ডুবি দিলেন। শৈশবে আলোর খেলা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বলেই মানু স্বাস্থ্য, জীবনের ওপর আলোর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় গবেষণায় স জীবনের সাধনা তিনি নিয়োজিত করেন।

লাল আলোর সাহায্যে বসন্ত চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখে তি অন্যান্য জীবাণুর ওপর আলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ব আবিষ্কার করেন যে, lupas valgaris (লুপাস ভালগারি অতি-বেগুনী আলোর সাহায্যে চিকিৎসা করা সম্ভব। আলো-চিকিৎসার জনক ফিনসেন তখন নিজের নামে, ১৮৯৬ সালে, Light Therapeutic Institute গড়ে তোলেন আরো ব্যাপক ভাবে ঐ সম্বন্ধে গবেষণা করার আশায়।

গবেষণায় সফলতার সম্ভাবনা দেখে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য আসতে লাগলো তাঁর কাছে লুপাস ব্যাধিকে চিরতরে নির্মূল করার গবেষণার জন্তে।

তার পর ১৯০১ সালে তিনি হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের ব্যাধি নিয়ে গবেষণার জন্তে কোপেনহাগেনে একটি স্যানাটোরিয়াম খোলার ব্যবস্থা করেন।

১৯০৩ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবার পর তিনি সেই অর্থের অর্দ্ধেক তুলে রাখেন তাঁর ইন্‌স্টিটুটের জন্তে ও অর্দ্ধেক খরচ করেন স্যানাটোরিয়ামের জন্তে।

আলোর সাহায্যে চিকিৎসা-সম্পর্কিত গবেষণার জন্তে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯০৩ সালে।

তিনি সারা জীবনে তাঁর গবেষণার ওপর বিভিন্ন বই লেখেন যার মধ্যে Photo-therapeutics (১৮৯৯), on the use of concentrated light rays in the art of healing (১৮৯৬) বইগুলিই প্রধান। ১৮৯৯ সালে তিনি অধ্যাপকের পদ পান এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভার স ছিলেন।

নোবেল পুরস্কার পাবার মাত্র এক বছরের মধ্যে, ১৯০৪ সালে ২৪শে সেপ্টেম্বরে, তাঁর মৃত্যু হয়।

আপনার অনিন্দ্য মুখরাগ অম্লান রাখতে

এই দু'ভাবে যত্ন নেবেন

মুখখানি ফরসা ও মসৃণ রাখতে হ'লে **দুটি** ক্রীম আপনার চাই-ই—একটিতে ময়লা কাটবে, অপরটি মুখশ্রী নিখুঁত রাখবে। রাত্রিতে মাখবেন ত্বক নির্ম্মল রাখার জন্য সুমিশ্রিত তৈলাক্ত ক্রীম—পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর দিনের বেলায় **রঙ-কালো-করা** সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্যে মাখবেন সুশীতল **হাল্কা** একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

আপনার 'রূপচর্য্যায়' এই নিয়ম মেনে চলুন ঃ

রোজ রাত্রে

ত্বক নির্ম্মল করার জন্য সারা মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মেখে মালিশ ক'রে বসিয়ে দিন। তাতে লোমকূপের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

রোজ ভোরে

হাল্কা ভাবে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে মুখশ্রী নিখুঁত রাখুন। এ মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে কিন্তু অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর দিনভোর রঙ-কালো-করা সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী অম্লান রেখে দেবে।

POND'S COLD CREAM for Cleansing

POND'S VANISHING CREAM Protection and Powder Base

পণ্ড্‌স

কারবারের খোঁজখবর ঃ

এল, ডি, সিমুর এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

বোম্বাই—কলিকাতা—দিল্লী—মাদ্রাজ—নোভা গোয়া

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় নারীর স্থান

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন পবিত্রতম ভাবের স্থূল বিগ্রহ। তিনি নয়ত সমাধিস্থ থাকতেন এবং এই থাকাটাই ছিল তাঁর স্বভাব। তবে তাঁর এই দিব্য স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে তিনি কখন কখন সাধারণ মানুষের ভাবে থাকতেন জীবের প্রতি করুণায়। সেই যে এক সচ্চিদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বরূপতঃ যাহা, তাহা যে কি, কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "সচ্চিদানন্দ যে কি তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন অর্দ্ধনারীশ্বর, কেন না দেখাবেন ব'লে যে পুরুষ-প্রকৃতি দুই-ই আমি। তার পর তা থেকে আর এক থাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মূলে এই মহাশক্তি, পরমা প্রকৃতি, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দেহকে আশ্রয় ক'রে লীলা করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববিজয়ী সন্তান বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দজী বলেছেন, "The future will call Ramkrishna Paramhansa an incarnation of Kali. I think there's no doubt that she worked up the body of Ramkrishna for her own ends. I can not but believe that there is somewhere a great power that thinks of herself as feminine and called Kali and Mother," অর্থাৎ 'ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার বলবে। আমি মনে করি যে, নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রামকৃষ্ণ-দেহ আশ্রয়ে কাজ করেছিলেন। আমি বিশ্বাস না ক'রে পারি না যে, এমন এক মহাশক্তি আছেন, যিনি নিজেকে নারী বলে মনে করেন এবং যাঁকে কালী এবং মা বলা হয়।' অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার আদিতে, তার মূলে এই জগন্মাতা কালী যাঁকে আমরা মাতৃভাবে উপাসনা করি। এই মহাদেবী মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা। জীব যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়, তখন তাকে পথ দেখাবার জন্য বিদ্যারূপা মহামায়া নরবিগ্রহ ধারণ ক'রে সংসারে অবতীর্ণ হন। যখন তিনি আসেন তখন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি দৈবী সম্পদের ছড়াছড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"তাঁকে মা ব'লে ডাকলে শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়। শক্তির উপাসনা করলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। শক্তি ব্রহ্ম দু'টি আলাদা জিনিষ নয়, একই জিনিষ।" জগতে যাবতীয় নারীতে যে এক মহাশক্তির বিকাশ, সেই জননীরূপা নারীর স্থানই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে। নারীকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখাই শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি পবিত্রতার ঘনীভূত বিগ্রহ ছিলেন। এই পবিত্র দৃষ্টির যেখানে ব্যতিক্রম সেখানেই অপবিত্রতা, সেখানেই পাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আহূত সন্তানগণের প্রত্যেককে এই পবিত্রতম দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তাঁর প্রিয় সন্তান, মহা কর্ম্মবীর অথচ প্রশান্ত মূর্ত্তি স্বামী সারদানন্দজী তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা" পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছেন,—"যাঁদের কৃপায় লেখক প্রত্যেক নারীতে জগন্মাতার আবির্ভাব দর্শনে ধন্য হ'য়েছেন।" ইত্যাদি! বেলুড় মঠে এক দিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীকে সকলে প্রণাম করছেন এবং তিনি ভাব-গম্ভীর মূর্ত্তিতে সকলকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করছেন, এমন সময় ২।১টি বালিকা তাঁর পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন, মহাপুরুষ মহারাজের হাত দু'খানি তন্মুহূর্ত্তেই যন্ত্রচালিতবৎ সংযুক্ত হ'য়ে তাঁর কপাল স্পর্শ করল। এর দ্বারা এই বুঝা যায়, নারীতে জননীজ্ঞান এঁদের স্বভাবসিদ্ধ। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা। নারী ও পুরুষ নিয়েই মানব-সমাজ। সমাজের এই অর্দ্ধেক অঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় কিরূপ স্থান পেয়েছে তাহাই—তাঁর সম্পর্কে যে-সব নারী এসেছিলেন তাঁদের এক-এক জনকে নিয়ে, এইবার আলোচনা করা যাচ্ছে।

যে মহীয়সী মহিলার গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেই চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন দয়া, মমতা, স্নেহ, কোমলতা প্রভৃতি নারীসুলভ গুণের

মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপা। তাঁর সরলতা, লোভরাহিত্য, আতিথেয়তা, সংসারে অনাসক্তি প্রভৃতি গুণ তাঁতে যে ভাবে রূপায়িত হয়েছিল, তা মনে হয় জগতে অতুলনীয়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি যথারীতি সংসার ত্যাগ ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগদাধরের সান্নিধ্যে এসে বাস করেন এবং সেখানেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এতই মাতৃভক্ত ছিলেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও পাছে মায়ের প্রাণে কষ্ট হয়, এই জন্ম কখন গৈরিক ধারণ করেননি। নারী-চরিত্রে মাতৃত্বই ভারতে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। আদর্শ জননীই আদর্শ পুত্রের প্রসূতি। আদর্শ পুত্রগণ দেশ ও জাতির অভ্যুদয়ের হেতু। এই কারণ দেশের কল্যাণ নারী জাতির অভ্যুদয় না হ'লে হবার সম্ভাবনা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী এইরূপ আদর্শ মা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁর মা ছিলেন বিশ্বজননীর প্রকট বিগ্রহ। ত্যাগী-শিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও মাকে ত্যাগ করেননি, প্রত্যহ মাকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম করতেন, তাঁকে প্রসন্না রাখবার জন্ম যথাযোগ্য চেষ্টা করতেন। তিনি আজীবন মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর উক্তি এই যে, যে-মা'র দেহ হতে এই দেহ হয়েছে, তিনি ও ঐ মন্দিরের আনন্দময়ী জগজ্জননী একই। মাতৃভক্তি শিক্ষার পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সর্ব্বোচ্চ ও অতুলনীয় আদর্শ।

চন্দ্রদেবীর পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত আর এক ভাগ্যবতী নারীর বিষয় আমরা জানতে পারি। যিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণজাতা হ'য়েও শ্রীরামকৃষ্ণ হ'তে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। বালক গদাধরের জন্ম সময় হ'তেই ইনি তাঁকে প্রতিপালন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহিলাকে এতই অনুগ্রহ ক'রেছিলেন যে, তিনি উপবীত ধারণ কালে কুলপ্রথা অতিক্রম ক'রে এই ধনী-নামা কর্ম্মকার-কন্যার হাত হ'তে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং কোনও এক সময়ে তাঁর রাঁধা ব্যঞ্জনাদিও গ্রহণ করেছিলেন। নারীকে শ্রদ্ধা দেখান বিষয়ে জাতি-কুল বিচারাদি তুচ্ছ ব্যাপার। নারী যে-কুলসম্ভূতাই হন না কেন, বা যে দেশেই তাঁর জন্ম হ'ক না কেন' তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানগণের জীবন হ'তে আমরা এ শিক্ষা পাই। দক্ষিণ-ভারতে অবস্থান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী কোন খৃষ্টান মহিলাকে সম্মান প্রদর্শন করলে, তিনি তার কোন প্রতিদান না দেখিয়েই চ'লে যান। উৎকট সাম্প্রদায়িক ভাবই উক্ত মহিলাটির অভদ্র ব্যবহারের মূলে বর্ত্তমান ছিল। কেন মহাপুরুষ তাঁকে শিষ্টাচার দেখাতে গেলেন, এইরূপ জিজ্ঞাসায় মহাপুরুষ উত্তর দিয়েছিলেন—"মাতৃজাতিকে সম্মান করতে হয় তা যে-দেশেরই হোক! 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—সেই জগজ্জননীই জগতের সকল স্ত্রীরূপে রয়েছেন।" বালক গদাধর কামারপুকুরের সমবয়সী বালিকাগণকে ভগিনীবৎ স্নেহ-ভালবাসা ও বয়ঃজ্যেষ্ঠাগণকে মাতৃবৎ সম্মান দেখাতেন। তাঁরাও প্রতিদানে তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। নারীকে তিনি বাল্যকাল হ'তেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে আগমন সময় হ'তে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। এর পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্ম কলকাতা ঝামাপুকুর অঞ্চলে থাকা কালে তিনি ঐ পল্লীর নারীদের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন ও তাঁদিগকেও তিনি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাঁর সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে তাঁদের চিত্ত-বিনোদন করতেন। নারী যে জগন্মাতার বাস্তব রূপ, তাঁকে কি তিনি কখনও অশ্রদ্ধা দেখাতে পারেন? এইবার দক্ষিণেশ্বরে তিনি যে দুই জন নারীর সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে এক জন হচ্ছেন রাণী রাসমণি ও দ্বিতীয় জন মথুর বাবুর স্ত্রী জগদম্বা দাসী। রাণী রাসমণি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, ভক্তিমতী ও জ্ঞানবতী নারী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন মাত্র তাঁর অনুপম আকৃতির কমনীয়তায় ও দেব-ভাবে মুগ্ধ হন ও তাঁকে দেবীপূজায় ব্রতী করবার জন্ম তিনি ও মথুর বাবু বদ্ধপরিকর হন। রাসমণির ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করতে লাগলেন এবং শ্যামপুকুর ও কাশীপুর বাড়িতে জীবনের শেষ কয়েক মাস থাকা বাদে দক্ষিণেশ্বরই তাঁর প্রধান লীলাস্থল ছিল। এই প্রধান লীলাস্থলের নির্ম্মাণ-ভার মহামায়া আদ্যাশক্তি রাণী রাসমণির উপর দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন যে, রাণী মহামায়ার অষ্টসখীর এক জন, ধরায় দেবকার্য্য সাধন ও ঐ কার্য্যে সহায়তা করার জন্ম নারীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল বলে যে দক্ষিণেশ্বর আজ আন্তর্জাতিক তীর্থ খ্যাতি লাভ করেছে ও বাস্তবিকই মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে, সেই দক্ষিণেশ্বরের অস্তিত্ব নির্ভর করে রাণী রাসমণির ওপর। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে আমরা দেখি—নারীর স্থান সর্ব্বাগ্রে। বালক শ্রীরামকৃষ্ণকে রাণী শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে সন্তানের ন্যায় দেখতেন এবং ঠাকুরও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবানুসারে রাণীকে মায়ের ন্যায় জ্ঞান করতেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় ঠাকুরের প্রতি রাণীর ব্যবহারে। আবার নির্ভরতার সঙ্গে অভিভাবকত্বের সম্মেলন দেখা যায় রাণীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারের। সর্ব্ব বিষয়ে বর্ষীয়সী মহিলা রাণী রাসমণির ওপর ঠাকুর সন্তানের ন্যায় যেমন নির্ভর করতেন, তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ম নিজে অভিভাবক সেজে কন্যার ন্যায় রাণীর কোমলাঙ্গে শ্রীহস্ত-প্রহারের ঘটনাও অবগত হওয়া যায়। অতএব আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় নারী কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনয় ক'রে উহাকে মাধুরী-মণ্ডিত করে রেখেছেন। জগদম্বা দাসীর প্রতিও ঠাকুরের অনুরূপ ভাব ছিল। জগদম্বাও শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন পুত্রবৎ জ্ঞান করতেন, তেমনি তাঁর অলৌকিকত্বে অবাক হ'য়ে তাঁকে অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করতেন। 'মানববিগ্রহে স্বয়ং জগন্মাতাই শ্রীরামকৃষ্ণ' এই ধারণা যে মথুর বাবুর ন্যায় জগদম্বা দাসীরও বদ্ধমূল ছিল—ইহা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। দক্ষিণেশ্বরে বা জানবাজার বাড়িতে জগদম্বা দাসী ও অপরাপর পরিবারস্থ মহিলাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে দিব্য ব্যবহার, উহা যেন মর্ত্তে স্বর্গের সুষমা বিস্তার। এই ভাগ্যবতীগণের সঙ্গে ঠাকুরের পূত সম্বন্ধের নিবিড়তা পরিমাপ করা কাহারও সাধ্য নয়।

এই বার আমরা সেই মহিলার কথা আলোচনা করব, যিনি ঠাকুরের তন্ত্রসাধন কালে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেছিলেন। এই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন স্বয়ং বিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক গুরু। ব্রাহ্মণীকে গুরুত্বে বরণ করায় বুঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় নারীর স্থান কত উর্দ্ধে। ব্রাহ্মণী এক দিকে যেমন তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন, অপর দিকে বৈষ্ণবশাস্ত্রেও অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

ঠাকুর তাঁকে মায়ের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন এবং ব্রাহ্মণীও ঠাকুরকে সন্তান হিসাবে নিজ প্রতিপাল্য জ্ঞান করতেন, আবার কখন বা তাঁকে গোপালরূপে দেখতেন। বাৎসল্যের এই পবিত্র সম্বন্ধ—কি মধুর, কি উপভোগ্য! প্রতি নারীতে মাতৃজ্ঞান ও জগৎকারণকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা-রূপ যে তান্ত্রিক দক্ষিণাচার, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্মত মতবাদ। তিনি এই ভাবের বিপরীত যে বামাচার, তাহা কখন মঞ্জুর করেননি। বাউলাদি সম্প্রদায়-সম্মত বামাচারী-সাধনে পতনের অনুকূলতা করে, তাই বামাচার তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। স্থূল ভাবে মধুর ভাব-সাধনও পতনের বিশেষ সহায়ক, তাই ঠাকুরের সহিত কোনও নারীর মধুর ভাবের সম্বন্ধ ছিল না। মাতৃভাবে সাধনা ও সন্তান ভাবে অবস্থানই মানুষের মনকে পবিত্রতায় পূর্ণ করে, তাই পবিত্রতার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাব ভিন্ন অন্য কোন অশুদ্ধ ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেননি। শিবের কলম হয় হক, তাই বলে যে মার্গে পতনের সম্ভাবনা এবং যে পথ অশুদ্ধ সেই বাম-মার্গ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

ঠাকুরের পরিণয়ের পর ঠাকুরের জীবনের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীমা ছিলেন পবিত্রতা-স্বরূপিণী। তাঁর সহিত ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভালবাসার সম্বন্ধ, যা জগতের ইতিহাসে কখন দেখা যায়নি। যাকে তিনি সন্ন্যাসী হ'য়েও ত্যাগ করেননি, যেমন শ্রীগৌরাঙ্গদেব বা বুদ্ধদেব করেছিলেন। তিনি তাঁকে ত্রিপুরাসুন্দরী মহাবিদ্যারূপে পূজা করেছিলেন এবং আজীবন তাঁকে আনন্দময়ী মা বলে জ্ঞান করতেন। আবার মজা এমনি যে, মা-ও ঠাকুরকে বিশ্বজননী কালী ব'লে জ্ঞান করতেন। এই জগৎ-ছাড়া দম্পতির মধ্যে যে দিব্য সম্বন্ধ, তা সাধারণ সংসারের মানুষ কখন বুঝতে পারবে না। নারী-জগতের আদর্শস্থানীয়া শ্রীশ্রীমা'র স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় যে কত উর্দ্ধে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্নেহ, করুণা, মমতা, ক্ষমা এই ছিল মায়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অভিনয় অভিনীত হয়েছিল মায়ের জীবনে। তাই এ কথা বলা খুবই সঙ্গত যে, শ্রীরামকৃষ্ণলীলার আদিতেও নারী, মধ্যেও নারী ও অন্তেও নারী। নারী দেবী, শ্রদ্ধার পাত্রী, নারী দর্শন মাত্রেই পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তির হৃদয় পবিত্রতায় ভরে ওঠে। সেই নারী জননীই শ্রীরামকৃষ্ণলীলার মুখ্য উপাদান। পবিত্র মা শব্দে শক্তির ভাব, ভক্তির ভাব ও পবিত্রতার ভাব স্বতঃই মনে উদিত হয়। তাই পবিত্রতার আধার শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে এত উচ্চ স্থান দিয়ে গিয়েছেন।

গঙ্গা মাতা নামে আর এক জন পবিত্রহৃদয়া নারীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—যখন ঠাকুর তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না গঙ্গামায়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শনমাত্রেই চিনেছিলেন যে, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা। ঠাকুরও গঙ্গা মা'র ভক্তিতে এতই আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনেই থেকে যাবেন মনে করেছিলেন। এই ঘটনাটিও নারীর প্রতি ঠাকুরের শ্রদ্ধার একটি নিদর্শন।

এই বার ঠাকুরের নারী-ভক্তগণ সম্বন্ধে দু'-এক কথা ব'লে প্রবন্ধের উপসংহার করার চেষ্টা করা যাক। ঠাকুরের অনেক নারী-শিষ্যার কথা অবগত হওয়া যায়, তবে তাঁরা কুল-ললনা, তাই সকলের নাম পাওয়া যায় না। কয়েক জনের নাম পাওয়া যায় মাত্র। এক জন ছিলেন সন্ন্যাসিনী, নাম গৌর দাসী—যাঁকে সকলে গৌরী-মা বলতেন। ইনি ছিলেন মহা তেজস্বিনী শক্তিময়ী। নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এঁর কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রত্যেকেই এঁকে মাতৃ-আহ্বান করতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। ইনি এবং যোগীন্দ্রমোহিনী, গোলাপসুন্দরী ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী শ্রীশ্রীমা'র এক প্রকার জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ পবিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তবে যে সব ভক্ত সাধকের জীবন যাপন করতেন, তাদিগকে ঠাকুর নারী-ভক্তদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিতেন না। চারা গাছে বেড়া দিয়ে উহাকে রক্ষা করতে হয়, গাছের গুঁড়ি মোটা হ'য়ে গেলে বেড়া'র আর তত দরকার হয় না। এমন কি, ঠাকুর স্বয়ংও নারীভক্তদের নিকট অধিক ক্ষণ থাকতে পারতেন না। তিনি ছিলেন পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী আদর্শ অবতার। এ সম্বন্ধে তাঁর দু'-একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই তার সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যাবে। তিনি বলেছেন,—(১) "মেয়ে-ভক্তরা আলাদা থাকবে আর পুরুষ-ভক্তরা আলাদা থাকবে, তবেই উভয়ের মঙ্গল। (২) "লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার। (৩) "যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, মাতৃবৎ দেখেন ও সর্ব্বদাই পূজা করেন ও অন্তরে থাকেন। (৪) "যত স্ত্রীলোক, সব শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হ'য়ে স্ত্রীরূপ ধ'রে রয়েছেন। যত স্ত্রী সবই তিনি, আমি তাই বৃন্দেকে (দাসী) কিছু বলতে পারি নে। (৫) "মেয়েরা আমার মা'র একটি-একটি রূপ কি না তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি নে। (৬) "ঈশ্বর দর্শন না হ'লে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না। (৭) "যে মেয়েমানুষ থেকে এত সাবধান হ'তে হয়, সাধনের অবস্থায় যে কামিনী দাবানলস্বরূপ, সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান দর্শনের পর সেই মেয়ে-মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী, মা আনন্দময়ী। (৮) "যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চোখে দেখেন না যে, ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ।" নারীকে শ্রদ্ধা, নারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা, মাতৃভাবে নারীকে দেখে হৃদয়কে পবিত্রতায় পূর্ণ করা ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা।

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী, গণুর মা, মনোমোহনের মা, স্ত্রী ও ভগিনী, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী, বলরাম বাবুর স্ত্রী ও স্ত্রীর মা প্রভৃতি অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। গোপালের মা নাম্নী কামারহাটির বামনীর সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধ ছিল বাৎসল্য ভাবের। বামনীর আরাধ্য গোপালকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে লীন হ'তে দেখেন, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ হ'তে গোপালের পুনরাবির্ভাব দেখে বামনী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—যিনিই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনিই তাঁর গোপাল। এই কারণ তাঁকে সকলে গোপালের মা বলতেন। বৃদ্ধা গোপালের মা দেবী অঘোরমণি ঠাকুরকে তাঁর আরাধ্য সন্তান গোপাল ব'লে দেখতেন ব'লে তিনি কখন ঠাকুরকে প্রণাম করতেন না এবং শ্রীশ্রীমাকে কখনও 'বউমা' ছাড়া মা বলতেন না। অতএব দেখা যায়, ঠাকুর [illegible] অর্দ্ধেকাংশ যে নারী তাঁহাদিগকে যখন অবজ্ঞা করেছেন, বরং মাতৃজ্ঞানে তাঁহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করেছিলেন। এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে স্বামী

বিবেকানন্দজীও বলেছেন, "প্রথমে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর কন্যাগণ, তার পর পিতা ও তাঁর পুত্রগণ। আমার নিকট শ্রীশ্রীমা'র কৃপা বাবার কৃপা অপেক্ষা লক্ষ গুণে অধিকতর মূল্যবান। শ্রীশ্রীমার কৃপাই আমার প্রধান সম্বল।" ইত্যাদি।

স্থুল শরীরে লীলা-সম্বরণের পর ঠাকুরের লীলার আসরে এলেন সমগ্র জগত হ'তে বাছাই-করা নারী-ভক্তবৃন্দ। ভগিনী নিবেদিতা, সারা, সি বুল প্রভৃতি কয়েক জন নারী-ভক্তের নাম জগদ্বিখ্যাত। বর্ত্তমানেও তাঁর লীলার আসরে কত নারী-ভক্তের আবির্ভাব হচ্ছে তার হিসাব লওয়াও সম্ভব নয়, কারণ সমগ্র জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নারী-ভক্তগণকে যেমন নারীজনোচিত লজ্জা ও কোমলতাদি গুণমণ্ডিত হ'তে শিক্ষাদান করতেন, সেইরূপ তাঁদিগকে শক্তি-সাহস অর্জ্জন করতে ও কর্ম্মকুশলা হ'তেও উৎসাহ দান করতেন। যাঁরা কুলের বধূ এমন ভক্তকেও তিনি দক্ষিণেশ্বর হ'তে আলমবাজারে পাঠিয়ে তাঁদের দ্বারা বাজার করিয়ে নিয়েছেন এবং কখন কখন পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করতেও উৎসাহিত করতেন। তাঁর শিক্ষায় কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। যে নারী তাঁর লীলায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁকে তিনি আদর্শ নারী-জীবন গঠনে প্রেরণা দান করতেন। ঠাকুর ত্যাগী ছিলেন বটে, কিন্তু সমাজত্যাগী ত্যাগী ছিলেন না, এবং গৃহী ছিলেন বটে, কিন্তু সংসারে তাঁর আসক্তির ভাঁজও ছিল না। শক্তি উপাসনায় তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন ও দ্বৈতবাদ মতে সাধনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু অদ্বৈত পথে নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও মগ্ন থাকতেন। তবে তিনি যুগাবতার, তাই সমাধির সর্ব্বোচ্চ স্তর হ'তেও 'আমি, আমার'-রাজ্যে নেমে আসতে পারতেন ও জীবশিক্ষায় ব্রতী হতেন। নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই তিনি এক ব্রহ্ম-সত্তারই উপলব্ধি করতেন বটে, তত্রাপি জগৎ-লীলায় নারী জগতের মায়েরই প্রতিনিধিস্বরূপা ব'লে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান দান করতেন। বৈরাগ্যবান নিজ সন্তানকে তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে উৎসাহিত করতেন বটে, কিন্তু 'কামিনী ঘৃণার পাত্রী, নরকের দ্বারস্বরূপ' এরূপ উক্তি তাঁর শ্রীমুখ হ'তে কখন নির্গত হয়নি। সকল নারীতে, এমন কি, পতিতা নারীতেও তিনি জগন্মাতাকে দর্শন করতেন ব'লে নারী-দর্শন মাত্রেই তাঁর হৃদয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় নারী যে এইরূপে সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভ ক'রে গেছেন এতে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

স্থুল শরীরে লীলা অবসানের প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে তাঁর আরব্ধ যুগ-কার্য্য পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। জনৈক ভক্ত একবার স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা জননীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ঠাকুর আপনাকে এরূপে একা রেখে গেলেন কেন?" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন, "জগতে মাতৃভাব প্রচার করবেন ব'লে!" দেখা যায়, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা অগণিত সন্তানকে তাঁর অভয় পাদপদ্মে স্থান দান করেছেন ও এই ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় নারীর স্থানই সকলের ঊর্দ্ধে।

কন্থা

লীলা মিত্র

কুটীর-শিল্পে বাঙ্গালী নারী এক দিন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁদের সীবন-শিল্পের যে পরিচয় আমরা আজও পাই, তাতে গর্ব্ব ও আনন্দে মন ভরে ওঠে। সূচী-শিল্পের মধ্যে কারুকার্য্যময় কাঁথার সর্ব্বজনপ্রিয়তা আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই কাঁথা এক দিন কি ধনী, কি দরিদ্র, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলের কাছে ছিল অতি আদরের। বঙ্গের কুলবধূগণ এই শিল্পটিকে বিশেষ রকম আয়ত্ত করে সূচী-শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। কত তুচ্ছ উপকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে এঁরা শিল্পকলা-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন—সে কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই সাধনার পশ্চাতে ছিল জীবনব্যাপী সুগভীর সাধনা, অটল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। এই শিল্পটি যে কত কাল থেকে চলে আসছে, তা বলা কঠিন—সম্ভবতঃ হাজার বছরেরও পূর্ব্বে কাঁথার প্রচলন ছিল। বাইরের কর্ম্ম-জগতের ক্ষেত্র হতে নারী যেদিন থেকে ধীরে ধীরে আপন আপন গৃহ-প্রাচীরের সীমানার মাঝে নির্ব্বাসিত হতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই দিন থেকে বঙ্গের নিভৃত কুটীর-অঙ্গনে, আম্র-পনসের সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কুল-লক্ষ্মীদের সুনিপুণ হস্তে এই শিল্পটি গড়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী দরিদ্র হলেও তার সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান বা সৌন্দর্য্য-প্রীতি কোন দিনই হ্রাস পায়নি। তাই নিজ নিজ গৃহের সামান্য উপকরণ দিয়েই পুরনারীগণ আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন। সেকালে এই সীবন-শিল্পটিতে মেয়েদের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ত। তখনকার দিনে সমাজের সর্ব্ব স্তরের লোকেরা এই শিল্পটির সমাদর করতেন বলেই হয়ত এর এত উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। প্রাচীন কালে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের ঘর-কন্নার কাজ ও পূজো বা ব্রত-পার্ব্বণাদির আয়োজনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-প্রাচীরে বা অঙ্গনে আলিপনা দেওয়া, বিবাহের পিঁড়ি, দারুময় পাত্র বা মৃৎপাত্র চিত্র করা, সন্দেশের ছাঁচ কাটা, চরকায় সূতো কাটা এবং কারুকার্য্যময় কাঁথা সেলাই করা ইত্যাদিতেও নৈপুণ্য দেখাতে হোত। বিবাহের পরও হয়ত প্রশংসার আকাঙ্ক্ষায় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এঁরা নানাবিধ শিল্পে অভাবনীয় পারদর্শিতা দেখাতেন। এক-একখানি কাঁথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে গিয়ে কোন মহিলা হয়ত এক-জীবনে শেষ করতে পারেননি—উত্তরাধিকারী-সূত্রে কন্যা, পুত্রবধূ বা পৌত্রীর ওপর সে ভার পড়েছে। সাদা জমীর ওপর চারি ধারে ঢাকাই সাড়ীর পাড়ের মত হাতে তৈরী পাড়, চার কোণায় বড় বড় কল্কা, মাঝখানে বিকশিত কমল, পদ্মের কলিকা ইত্যাদি দিয়ে সাধারণতঃ বড় বড় কাঁথাগুলি সেলাই করা হোত। কত না অভিনব কল্কা, প্রকৃতির কত না বিচিত্র লতা-পল্লব, লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের নিদর্শন ধান্যশীর্ষ, কত না বর্ণের পক্ষী, পদ্ম ফুল ইত্যাদির অঙ্কন, গঠন ও অপূর্ব্ব বর্ণ-সুষমা অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পকলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া কত বিশেষ উৎসবের সজ্জিত হাতীর মিছিল, অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা, দেব-দেবীর বিশেষ বিশেষ কাহিনী বা লীলা, পৌরাণিক উপাখ্যান এই সীবন-শিল্পের ভিতর দিয়ে বাস্তবতায়

রূপায়িত হোত, এবং জীবন ও নানা বর্ণ-সমাবেশে কুলবধূগণের যে মৌলিকত্ব, উদ্ভাবনী-শক্তি ও সৃষ্টি-নৈপুণ্য প্রকাশ পেত তাহা বিস্ময়কর!

এই শিল্প-সৃষ্টির মূলে ছিল প্রিয় পরিজনের প্রতি স্নেহ-মমতার প্রেরণা। ভবিষ্যতের স্বপ্ন-মধুর কল্পনায় বিভোরা মুগ্ধা বালিকা বধূটি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের অবসর সময়ে নিরলস হয়ে অনাগত সন্তান-সন্ততির সেবার আশায় আত্মনিয়োগ করতেন। গৃহিণীগণ সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য সমাপন করে কন্যা, বধূ প্রভৃতি পরিবৃতা হয়ে একত্র হয়ে সেলাই করতে বসতেন; এই ভাবে কর্ম্মের ভেতর দিয়ে তাঁদের অবসর যাপনও হোত এবং একত্রিত হয়ে কাজ করবার আনন্দ ও নূতন সৃষ্টির প্রেরণাও লাভ করতেন। কতকগুলি কারুকার্য্যময় বিশালকায় কাঁথা শুধু গৃহের একটি মূল্যবান আসবাবের মতই গৃহস্বামীর মর্য্যাদা এবং গৃহকর্ত্রীর শিল্পকৌশলের পরিচয় দিত। অন্য প্রয়োজনে তাদের লাগান হোত না। এই রকম দেড় শত কি দুই শত বৎসরের পুরাতন কাঁথাও আজ-কাল দেখা যায়। সাধারণতঃ কাঁথাগুলি যে শুধু দেখতেই সুন্দর হোত, তা নয়—মাতৃ-হৃদয়ের সমগ্র কোমল স্নেহ ও বাৎসল্যের মধুরতা দিয়ে তৈরী হোত বলে যেমন লাবণ্যময় তেমনি উষ্ণ। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সংসারের বহু প্রয়োজন এর দ্বারা মেটান হোত এবং বহু সংসারের মেয়েরা এই শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনেরও উপায় করতেন। পুরুষেরা বাইরে বেরুবার সময় সূক্ষ্ম কাজ-করা কাঁথা গায়ে দিয়ে বেরুতেন। এতই ছিল কাঁথার সমাদর এবং প্রয়োজন!

এই শিল্প-সৃষ্টিতে বাংলার মেয়েদের কোন ব্যয়ই নেই। সঞ্চয়ের অভ্যাস থেকে সাধারণতঃ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলাগণ পুরাতন সাড়ী বা ধুতি—যা প্রায় অব্যবহার্য্য হয়ে গেছে এবং সেই সব সাড়ীর পাড়ের সুতো তুলে যত্ন করে রেখে দিতেন। তার পর ধীরে ধীরে এই সামান্য উপকরণ দিয়ে স্বামি-পুত্রের শীতবস্ত্র, বিছানার চাদর, বালিশের বা বাক্‌সের ঢাকনী, বসবার আসন ইত্যাদি তৈরী করা হোত। এই শিল্পে প্রচুর পরিমাণে সহিষ্ণুতা ও অভিনিবেশের প্রয়োজন। তাই শিশুকাল হতেই বাড়ীর ছোট-ছোট মেয়েদের দিয়ে কাপড় ভাঁজ করা, যত্ন করে সুতো তোলা, সুতো পাকান ও জড়িয়ে রাখার অভ্যাস করান হোত। পাড়ের সুতো তোলাতে যে কতটা সূক্ষ্ম মনোযোগ, নিপুণতা ও অভিনিবেশের প্রয়োজন তা হয়ত অনেকেই জানেন। একটি বড় কাঁথা সেলাই করবার পূর্ব্বে তা "পেতে নেওয়া" একটা কষ্টসাধ্য ও বহু ধৈর্য্যের ব্যাপার! কারুকার্য্যের কথা বাদ দিলেও শুধু কাঁথাটির ঘন ফোঁড়ের সাদা ঢেউ-খেলান জমী তৈরী করাতেই অনেক সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও নিপুণতার দরকার। এই রকম একখানি কাঁথা ওয়াড় পরিয়ে যত্ন করে ব্যবহার করলে উনিশ-কুড়ি বৎসর অনায়াসে টিঁকে যায়। তা ছাড়া যাঁরা ব্যবহার করেছেন, তারাই জানেন যে, এই কাঁথা কতটা আরামদায়ক। একটি কাঁথাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করে তুলতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন—সে জন্য যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস থাকাও দরকার। এইরূপ শিক্ষায় মেয়েরা অবশ্য বাল্যকাল হতেই কতগুলি বিশেষ গুণ ও অভ্যাসের অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারেন। সুতরাং এই শিল্পের প্রতি শিশুকাল থেকেই মেয়েদের উৎসাহিত করা উচিত এবং বর্ত্তমান যুগে অবহেলিত এই শিল্পটাকে আবার আমাদের বাঁচিয়ে তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ নিদারুণ অর্থ-সমস্যার দিনে এই শিল্পটির প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবাইকে অবহিত হতে হবে। উপকরণ সামান্য—খরচ বিন্দুমাত্র নেই, অথচ সংসারে প্রত্যহের কত না প্রয়োজন এ দিয়ে মেটান যায়—মেয়েদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম চারু কারু-শিল্প-সৌন্দর্য্য-জ্ঞানেরও বিকাশ ঘটে!

কলালক্ষ্মী শুধু প্রাচুর্য্যের মাঝেই অধিষ্ঠিতা হন না—নিষ্ঠার টানে প্রসন্ন হাসি হেসে দরিদ্রের জীবনেও আনেন সার্থকতা।

এই শিল্পটির প্রতি মনোযোগ দিলে, মনে হয়, বর্ত্তমানের দুঃস্থ মহিলাগণের জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান হতে পারে। ধনী, সহৃদয়া মহিলাগণ, সাড়ী ও সুতো ও সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দিয়ে—উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুঃস্থ মহিলা দ্বারা নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করিয়ে নিতে পারেন—এতে খরচও অনেক বাঁচে।

কুমারী এলিস বেকন

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বৃটেনে লেবার পার্টিই বর্ত্তমান সরকার পরিচালনা করছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টারী লেবার পার্টি সেই বৃহৎ সংগঠন থেকেই উদ্ভূত। এবার এই বৃটিশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়েছেন এক জন সামান্যা রমণী, নাম—কুমারী এলিস বেকন।

কুমারী এলিস বেকনের বাড়ী ইয়র্কশায়ারের ওয়েষ্ট রাইডিং নামক স্থানে। তিনি শ্রমিক রাজনীতির পরিবেষ্টনীর মধ্যেই মানুষ হন। তাঁর পিতা খনিতে কাজ করেন এবং নর্ম্যান্টন এলাকায় ২৮ বছর মাইনার্স ফেডারেশন বা খনি শ্রমিক-সংঘের সম্পাদক ছিলেন।

কুমারী এলিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য শিক্ষা লাভ করেন। পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন সম্বন্ধে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি লেবার পার্টিতে যোগ দেন এবং ভাল বক্তৃতা দিতে পারার জন্য শীঘ্রই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪১ সালে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি লেবার পার্টির কার্য্যকরী সমিতিতে নির্ব্বাচিত হন এবং তদবধি প্রতি বার ঐ সমিতিতে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি লেবার পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এলিসের ন্যায় এক জন সামান্যা রমণীর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

তিনি যুব আন্দোলনে বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সমাজতন্ত্রী যুব আন্তর্জাতিকের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য কুড়ি লক্ষ নারী লইয়া গঠিত বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির তিনি চেয়ারম্যান এবং জাতীয় শিক্ষক-সঙ্ঘের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্রী। বিদেশে বহু সম্মেলনে যোগদান করে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি উত্তর-পূর্ব্ব লীডস নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮৫০০ ভোট বেশী পেয়ে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনে সাফল্য এই কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁ

পক্ষে নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্য চালায় কেবলমাত্র তাঁর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে তিনি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে তাঁর নির্ব্বাচনে দাঁড়াবার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সব ভেস্তে যায়। ১৯৪০ সালে এক উপনির্ব্বাচনেও তাঁর দাঁড়াবার কথা হয়, কিন্তু সেবার লেবার পার্টি এই উপনির্ব্বাচনে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

১৯৪৫ সালে পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ার পর ১০ই অক্টোবর তারিখে তিনি পার্লামেন্টে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। জাতীয় বীমা-বিল সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করিয়া তিনি বক্তৃতা দেন। এই সময় তিনি নারী-উপদেষ্টা সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। এই সমিতি শ্রম-মন্ত্রীকে যুদ্ধের কাজে নারী-নিয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। এক্ষণে এই সমিতি যুদ্ধ-ফেরত নারীদের বে-সামরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করছেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি দোকান খোলা রাখার সময়, কাজের সময় ও তরুণ-তরুণীদের অবস্থা নির্দ্ধারণকল্পে গঠিত হোম অফিস কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হন।

কুমারী এলিস বেকন হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, রাশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রীয়া, ইস্রায়েল প্রভৃতি দেশ কার্য্যব্যপদেশে ভ্রমণ করেছেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন হইতে সৌভ্রাত্র প্রতিনিধি হিসাবে আমষ্টারডামে ওলন্দাজ সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে যোগদান করেন। দু'মাস পরে জার্ম্মাণীর বৃটিশ এলাকার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য তথায় যে পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়, তাহার অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি জার্ম্মাণী যান। জুন মাসে তিনি সমাজতন্ত্রী শুভেচ্ছা মিশনের সদস্য হিসাবে স্বর্গীয় অধ্যাপক ল্যাস্কি, মিঃ মর্গ্যান ফিলিপস ও স্থাবন্ড ক্লের সহিত রাশিয়া গমন করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কানাডায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে ভিয়েনায় সমাজতন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিকে যোগ দেন এবং ১৯৪৯-৫০ সালে সম্মিলিত শ্রমিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইস্রায়েলে যান।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হেষ্টিংসে নারী-শ্রমিক সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারী-শ্রমিকদের সমান বেতনের দাবী জানান। কুমারী এলিস ষ্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় পরিষদের পরামর্শ-পরিষদে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে যোগ দেন।

অ্যাটম্ বোমার দেশে

অমিতা দত্ত-মজুমদার

১

ওয়াশিংটন যাত্রা

স্কুল-কলেজে যখন পড়তাম তখন বড় হয়ে বিলেত যাবার সখ ছিল—যেমন আর পাঁচটি ছাত্র-ছাত্রীর থাকে; তবে সেই চেষ্টাকে সফল করতে হলে খাটতে হয়, চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু আমার সেটা হোলো না। ছাত্রী-জীবনের শেষ কয় বৎসর আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এমন ভাবে কাটলো যে, বৃটিশের দেশে যাওয়ার চেয়ে বৃটিশের জেলে যাওয়াটাই অধিকতর গৌরবের বলে বোধ হোলো। অন্ততঃ সহজসাধ্য ও ব্যয়হীন যে সে সম্বন্ধে তো কোনো প্রমাণেরই দরকার হোলো না। সুতরাং বিলেত বা সমুদ্রপারের আর কোনো দেশে যাওয়ার প্রশ্ন মন থেকে মুছেই গেল। কিন্তু হস্তরেখায় সমুদ্রযাত্রা ছিল, তা কে খণ্ডাবে? তাই হঠাৎ কয়েক মাসের জন্য যুক্ত-রাষ্ট্রে গিয়ে বাস করা এবং ভূ-প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসা ঘটে গেল।

১৯৪৭ এর অগাষ্ট মাসে আমাদের দেশের নেতাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যখন ইংরাজরাজ ভারত ছাড়লেন তখন থেকেই সুরু করা যায় আমার বিদেশ-যাত্রার কাহিনী। বৎসর দু'য়েক আগে থেকেই আমার স্বামী (ডাঃ নবেন্দু দত্ত-মজুমদার) আমেরিকায় ছিলেন, এবং কয়েক বারই তিনি পত্রযোগে এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, আমিও গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে বেশ হয়। নানা বিঘ্নবশতঃ তা কার্য্যত হয়নি। তার মধ্যে প্রধান বিঘ্ন ডলার নেবার অসুবিধা। ভারতবর্ষ থেকে টাকা ডলারে রূপান্তরিত করে বিদেশে নেওয়া সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাঁধাবাঁধি আছে। ১৯৪৭এর অগাষ্টে তিনি সে দেশে এমন একটি অধ্যাপনার কাজ পেলেন যাতে করে নিজের ব্যয়নির্ব্বাহের পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে; অতএব দেখা গেল যে, বেশী টাকা সে দেশে নেবার অনুমতি যদি কর্ত্তৃপক্ষ না-ও দেন তা হলেও আটকাবে না। এই সংবাদ পেয়ে নূতন উদ্যমে বিদেশযাত্রার উদ্যোগে রত হলাম।

প্রথমেই পাসপোর্টের দরখাস্ত দিলাম। অনেকেই যেমন জেলখাটার সার্টিফিকেটের জোরে চাকরীর প্রত্যাশা করেছেন, আমিও তেমনি সেই সুবাদে চটপট পাসপোর্ট পাব বলে আশা করলাম। খুব বেশী দেরীও হয়নি। হাঙ্গামা হোলো ডলার নিয়ে। কিছু ডলার যোগাড় করবার অভিপ্রায় আমার ছিল। কারণ, জানতে পেরেছিলাম যে যদিও আমাদের দেশের মত সে দেশে অধ্যাপকদের "তিন্তিড়িপত্রের ঝোল-সহযোগে অন্ন ভক্ষণ" করতে হয় না, তবু বেশ মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলারই প্রয়োজন হয়। দেশে মিতব্যয়িতা করা ভাল; কিন্তু বিদেশে দু'-চার মাসের জন্য গিয়ে ভাল করে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে না পারলে যাওয়াটার সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়াই তো হয় না তা ছাড়া ঘোরাঘুরির খরচটা সে দেশে খুব বেশী। সুতরাং সেই খরচটার সংস্থান দেশ থেকেই করতে হবে। ডলার-অনুমতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে শুনলাম যে, "ষ্টুডেণ্ট"-হিসেবে দরখাস্ত করলেই সব চেয়ে সহজে ও সর্ব্বাগ্রে সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। সুতরাং সেই ভাবেই দরখাস্ত করব ঠিক করলাম। এতে যেন কেউ না মনে করেন যে, আমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছা ছিল টাকা-পয়সা খরচ করে যখন বিদেশে যাব এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শেই বাস করব তখন কিছু পড়া-শুনো অবশ্যই করব, এ ইচ্ছা আমার গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু জানতে পারলাম—কোথায়, কি পড়তে চলেছি এবং কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছি কি না, তা-ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জানাতে হবে। অতএব এ সংবাদ ওয়াশিংটনে জানিয়ে দিন কতক অপেক্ষা করতে হোলো। আমার স্বামী তখন সেখানে "দি অ্যামেরিকান্ ইউনিভার্সিটি"তে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপনা করছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে দিয়ে একটি 'কেবল্' করালেন, তার মর্ম্ম এই যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্রীরূপে গৃহীত হয়েছি। এই 'কেবল্'-গ্রামে'র সহায়তায় দিন কতক ঘোরাঘুরি করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডলারের অনুমতি পেয়ে গেলাম।

তার পর প্রয়োজন আমেরিকার একটি visa। উপরোক্ত আয়োজন-গুলি করতে করতেই নভেম্বর মাস এসে গিয়েছিল। সুতরাং অবিলম্বে আমেরিকান্ কন্সালের অপিসে দেখা করে দরখাস্ত পূরণ করে দিলাম। তাঁরা বললেন যে, পনেরো দিনের মধ্যে তাঁরা সব-কিছু প্রস্তুত

করে দিতে পারবেন। তাঁদের কথা মত তাঁদেরই সুপারিশ-করা এক আমেরিকান্ ডাক্তারকে দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট নিতে হোলো। তার পর তাঁরা বললেন যে, ডিসেম্বরের প্রারম্ভে রওনা হবার জন্ম আমি উড়ো-জাহাজের টিকিট কিনতে পারি, কোনো কিছুর জন্মই ঠেকবে না। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রগামী জাহাজ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম—এপ্রিলের আগে পর্য্যন্ত কোনো জাহাজেই স্থান নেই। কাজেই আমি উড়ো-জাহাজে যাওয়া স্থির করেছিলাম। প্যান্ আমেরিকান্ ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ-এ খোঁজ-খবরও নিয়েছিলাম। ২রা ডিসেম্বর ওদের একটি বড় ক্লীপার বিমান দমদম্ থেকে ছাড়বে,—তাতেই আমি সীট্ বুক করে টিকিট কিনে আনলাম।

যাত্রার দিন ২রা, মঙ্গলবার। তার আগের মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আমেরিকান্ visa না পেয়ে মরীয়া হয়ে আবার তাদের আপিসে গেলাম। শুনলাম, পুলিশ-রিপোর্ট আসেনি, তার জন্ম তারা অপেক্ষা করছে। দেখলাম, নিজে উঠে-পড়ে লেগে পুলিশ রিপোর্টটি ইলিশিয়াম্ রো থেকে রওনা করিয়ে না দিলে হবে না। টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলে পরের দিন সকালে ইলিশিয়াম্ রো-তে গেলাম। এই সেই ইলিশিয়াম্ রো—যেখানে আগেও আসতে হয়েছে; কিন্তু তখনকার আসার ও আজকের আসার মধ্যে মনের দিক থেকে যে পার্থক্য ছিল, সেটা অনুভব করে কৌতুক বোধ করলাম; আনন্দও হোলো। যাক্, আধ ঘণ্টা বসার পরই জানতে পারলাম যে, রিপোর্টটির কাজ সম্পূর্ণ করা ও তাকে ডাকে দেবার জন্ম প্রস্তুত করা হয়ে গেল। হয়তো বিকেলেই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। হৃষ্টচিত্তে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। পরের দিন সকালেই আমার "ভিসা" পাওয়া গেল।

যাত্রার অন্যান্য আয়োজনও এরই সঙ্গে সঙ্গে করছিলাম। সবই যথাসময়ে সাঙ্গ হোলো। ২রা সকালে রওনা হবার জন্ম প্রস্তুত হলাম। ১লা সন্ধ্যায় একবার প্যান্ আমেরিকান্-এর অপিসে টেলিফোন করলাম প্লেন ঠিক সময়ে ছাড়ছে কি না জানবার জন্ম। শুনলাম, প্লেনটি তখন পর্য্যন্ত কলকাতায় তো পৌঁছয়ইনি, এমন কি কখন পৌঁছবে তাও তাঁরা জানেন না। এই প্লেনটির যাত্রা সুরু হয় স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো থেকে। প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে নানা দ্বীপে থেমে এটা কলকাতায় আসে। এখন শীতকাল—নানা জায়গায় ঘন কুয়াশার মধ্যে প্লেনকে পড়তে হয়। তাই কি করে পথে দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই দেরীর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে চব্বিশ ঘণ্টাই বেড়ে গেল। ২রা দিনের মধ্যে কয়েক বারই খোঁজ নিলাম প্লেন এসেছে কি না। অবশেষে সন্ধ্যা বেলায় জানতে পারলাম যে ৩রা বেলা সাড়ে ১১টায় দমদম থেকে প্লেন ছাড়বে।

৩রা সকাল সাড়ে ৮টায় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলাম। ৯টার মধ্যে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পি, এ, এ-র অপিসে পৌঁছতে হবে। সঙ্গে আত্মীয়রা কেউ-কেউ গেলেন। অগ্রহায়ণ-প্রভাতের শীতের হাওয়ায় বোধ হয় আমার উত্তেজনার উষ্ণ অংশ শীতল হয়ে গিয়েছিল; না হয়তো তেমন করে উত্তেজনা অনুভব করার পক্ষে একটু বেশী প্রাচীন হয়েই পড়েছি। মোটের উপর, সেই সময়কার মনোভাবের বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে, পরীক্ষার হলে ঢোকবার আগে যেমন হয় এ-ও প্রায় তেমনি; অজানার ভীতি এসে ঢেকে দিয়েছে অজানাকে পাড়ি দেবার উত্তেজনাকে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পৌঁছে দেখলাম, একতলার লবীর এক পাশে ওদের যে কাউণ্টার আছে সেখানে মাল ওজন করা হচ্ছে। আমিও সেখানে অপেক্ষা করে রইলাম। যথাসময়ে আমারও ডাক পড়লো। মাল ওজন করিয়ে তাতে স্লিপ লাগানো প্রভৃতি হয়ে গেলে পরে কোম্পানীর ছাপ-মারা নীল একটি স্লীপ লাগানো ব্যাগ দিল। তার পর ওদের চমৎকার বাসে করে আমাদের দমদমে নিয়ে চলল। কলকাতার রাজপথ দিয়ে সেদিন সকালে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল আবাল্যের পরিচিত এই মহানগরীকে বহু দিন দেখব না; মনে মনে এর কাছে বিদায় নিলাম। দমদমে পৌঁছবার পরে অনেকক্ষণ শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না। এখানে customsএর পরীক্ষা হবে; তার পরে ভিতরে এরোপ্লেনের কাছে যেতে পাবা যাবে। তার পর অবশ্য আর বাইরে আসার নিয়ম নেই। বাড়ী থেকে আত্মীয়-স্বজনরা মার কন্যা দু'টিকেই নিয়ে আসবেন কথা ছিল। আমি তাদের পথ চেয়েছিলাম। আত্মীয়রা কেউ-কেউ এসে গেলেন। দেখলাম, মেয়ে দু'টি তাঁদের সঙ্গে আসেনি। তারা পরে আসছে। এমন সময়ে customsএর কাউণ্টারে ডাক পড়ল। সেখানকার পরীক্ষার পরে যাত্রীদের ভিতরে runwayতে চলে যাবার কথা। আমি তাই মেয়েদের আশায় অধীর হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময়ে তারা এসে পৌঁছল। আমি তখন customs বিভাগে কাগজ-পত্র দেখাচ্ছি ও সই করছি। এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মেয়ে দু'টিকে সঙ্গে করে এরোপ্লেনের নীচে পর্য্যন্ত নিতে পারি কি না। তিনি বললেন আরেক জনকে জিজ্ঞাসা করতে। আমি তখনই গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। বৃটিশ সরকারের গোরা কর্ম্মচারীদের কাছে "না—না" শুনে আমরা এত বেশী "না"-তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, হঠাৎ "হাঁ" পেয়ে মনে হোলো যেন এতটা আশা করিনি। মেয়েরা আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এল। ভিতরে এসে দেখলাম runwayর এক ধারে অন্য আত্মীয়রাও এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে আমার মা-ও ছিলেন। মেয়েদের ক্রমে সেখানে ভিড়িয়ে দিয়ে অন্য যাত্রীদের কাছাকাছি আসতেই শুনি, এক জন কর্ম্মচারী একটা বড় ফর্দ্দ হাতে নিয়ে নাম ডেকে চলেছেন। এরোপ্লেনটা সেই জায়গা থেকে প্রায় ৫০ হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল। যেমন নাম ডাকা হতে লাগল, তেমনি যাঁদের যাঁদের নাম ডাকা হোলো তাঁরা দ্রুতপদক্ষেপে মধ্যবর্ত্তী ভূমি অতিক্রম করে এরোপ্লেনের দিকে চলে যেতে লাগলেন আর বিরাট এরোপ্লেনের গর্ভে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। আমারও নাম ডাকা হোলো। আমিও অন্যদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্ম যথাসাধ্য দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম; যাবার সময়ে বারে-বারেই আত্মীয়-স্বজনদের দিকে তাকাতে তাকাতে গেলাম। এরোপ্লেনের কাছে গিয়ে দেখলাম যে, নীচের কপাট খুলে যাত্রীদের লাগেজ ওঠানো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভিতরে ঢুকলাম। বিয়াল্লিশ জন যাত্রীর স্থান আছে এই প্লেনে; আর যাত্রিসংখ্যা পরিপূর্ণ না হলেও পরিপূর্ণর কাছাকাছিই হয়েছিল; কাজেই ভিতরে উঠে অবাক্ হয়ে প্লেনের ভিতরের চেহারা দেখবার আগেই নিজের জন্ম একটি আসন সংগ্রহ করবার দিকে মন দিতে হোলো। "বাসে"র মত আসনের ব্যবস্থা—মাঝখানে পথ চলে গেছে, দু'পাশে পুরু গদীমোড়া দু'টি দু'টি করে চারটি চেয়ার। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি খালি আসন

দেখে আমি গিয়ে বসলাম। বসেই প্রথম চেষ্টা হোলো পাশের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপন-জনদের শেষ বার দেখা। কিন্তু দেখা গেল না,—আমি উল্টো দিকে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম, সামনের দেওয়ালের মাঝামাঝি একটা দরজা রয়েছে; সেই দরজার মাথায় আলোর অক্ষরে কয়েকটি কথা ফুটে উঠেছে—"Fasten your seat belt. No smoking." লেখাটি দেখে seat belt খুঁজতে তৎপর হলাম। সেটা এঁটে-সেঁটে লাগাতে না লাগাতেই এঞ্জিন গর্জ্জন করে উঠল। দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; এবার প্লেন চলতে আরম্ভ করল। প্রকাণ্ড runwayতে ঘুরে ছুটে অনেক দূর চলে গিয়ে একবার দাঁড়ালো। তার পর আবার ছুট দিয়েই আকাশে উঠে পড়লো। একবার মুহূর্ত্তের জন্ম নীচের মানুষদের দেখতে পেলাম; তার মধ্যে একটি বাঙালী-পরিবারও ছিল; তার পরেই এরোড্রোমের এলাকা ছাড়িয়ে দূরে চলে গেলাম। নীচে দেখলাম প্রশস্ত গঙ্গাকে, উঁচু থেকে আর তত প্রশস্ত দেখায় না। তার পর বাংলা দেশের ঘন বৃক্ষচ্ছায়াসমাকীর্ণ নগর গ্রাম শস্যক্ষেত্র পার হয়ে যেতে লাগলাম। ট্রেণে যাবার সময়ে বাইরেও দেখতে পাওয়া যায় একটা তীব্র গতি; কিন্তু প্লেনের গতিবেগ এতই বেশী যে, তা বিশেষ অনুভূত হয় না। শুধু নীচে দেখা যায় দৃশ্যপট অতি ধীরে ধীরে বদ্‌লাচ্ছে। দেখলাম, ক্রমে ভূভাগের শ্যামলতা কমে গিয়ে রক্তাভা ফুটে বেরোতে লাগলো; রাঙা মাটির দেশে পৌঁছেছি।

দমদম্ ছেড়েছি আমরা বেলা সাড়ে ১১টায়। নীল-পোষাক-পরা পুতুলের মতো চেহারার air-hostess প্রথমেই একবার chewing gum পরিবেষণ করে গেল। তার পর ১টার সময়ে কাগজের বাক্সে করে lunch ও কাগজের গেলাসে কফি দিয়ে গেল। দরজার উপরকার সেই নির্দ্দেশটা অনেকক্ষণ আগেই—প্লেন আকাশে ওড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে গিয়েছিল। আমরাও সকলে beltএর বাঁধন খুলে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসেছিলাম। ধূমপায়ীদের ব্যসনেও কোনো বাধা ছিল না। এখন হোটেলের দেওয়া খাবারের বাক্স খুলে আহার আরম্ভ করলাম। এই প্রথম অ্যামেরিকান্ লাঞ্চ খাচ্ছি। এ আহার যে এত রসহীন ও স্বল্প সে ধারণা আগে ছিল না। দেশে আমরা সকাল বেলায় সাহেবদের মতো ভরা-পেট ছোট-হাজরী খাই না। যা সামান্য খাবার খাই তাতে ১টার সময়ে প্রচুর ক্ষুধা পাবার কথা। আমার খুবই ক্ষুধা হয়েছিল। তা, এ কী খাবার! একখানি স্যাণ্ডুইচ, একটি আলু-সিদ্ধ, কয়েক টুকরো বীন্-সিদ্ধ, এক টুকরো fried chicken (তাও ঠাণ্ডা) আর ছোট এক টুকরো কেক্। এ তো আমাদের জলখাবার। দেশে সাহেবী বড় হোটেলে লাঞ্চ খেয়েছি, সে বেশ বড় খাওয়া। তবে কি প্লেনে যেতে হবে বলে কম খাবার দেয়? বোধ হোলো তাই। পরে জেনেছি, আমেরিকান্‌দের লাঞ্চ একটু বেশী হাল্কা হওয়াই নিয়ম। এ দেশে অনেকেই প্রাতরাশের পরে শুধু স্যুপ, আর স্যাণ্ডুইচ খেয়ে বা হ্যাম্‌বার্গার খেয়ে দিন কাটায়, সন্ধ্যায় ডিনার খাওয়া পর্য্যন্ত। তবে কফিও রা প্রত্যেক আহারের সঙ্গেই খায়। যা হোক, আমাকে তখন সেই স্বল্প খাদ্য খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হোলো।

আমার পাশের জানলাটি গোল, আর তাতে ডবল করে গোল কাচ লাগানো, এঁটে বন্ধ করা ও চাবি দেওয়া। ভিতরে
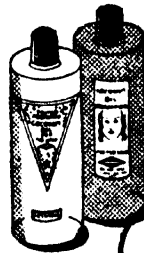
air-condition করা হয়েছে, বাইরের হাওয়া এখন বরফের মত ঠাণ্ডা ; তার লেশমাত্র ভিতরে আসতে দেওয়া হবে না। রোদের দিকে ঘুরলে কাচের জানলা দিয়ে রোদ এসে গায়ে লাগে ; তাই রোদ আড়াল করবার জন্য খুব সুন্দর পর্দা জানলায় ঝুলছে। আসন খুব পুরু গদীতে মোড়া। হাত রাখবার হাতলের নীচে একটি বড় গোল বোতাম ; সেটা টেপবার সঙ্গে সঙ্গে আসনের পিঠ পিছন দিকে হেলে যায়। খানিকক্ষণ হেলান দিয়ে বসে সহযাত্রীদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। নানা বয়সের নানা চেহারার শ্বেতকায় মেয়ে পুরুষ। তার মধ্যে একটি যুবতী মহিলাকে দেখলাম বছর দুয়েকের দু'টি যমজ শিশু নিয়ে চলেছেন ; শিশু দু'টি তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। অনবরত তাদের এটা-ওটা প্রয়োজনে সারা দিনই মাকে ওঠাচ্ছে, স্থির হয়ে বসবার অবসর দিচ্ছে না। আমার পাশের আসনটিতে বসেছেন এক বৃহদাকার প্রবীণ ভদ্রলোক ; তিনি অনবরতই ঘুমোচ্ছেন। আমার মোটেই ঘুম এলো না। আবার জানলা দিয়ে নীচে তাকালাম। পরিষ্কার আকাশ—নীচেকার দৃশ্যের ব্যাঘাত করবার কিছু নেই, তবু দূরত্বের জন্য ভূপৃষ্ঠের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কেবল বোঝা যাচ্ছে যে, মাটির রং এখন ধূসর। বেলা তখন ৩টে বাজে ; ভাবছি কত দূর এলাম। এমন সময়ে একটা ছাপানো circular যাত্রীদের হাতে হাতে ঘুরতে-ঘুরতে আমার হাতে এসে পৌছল। তাতে আমাদের প্লেন ও তার গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক তথ্য রয়েছে। দেখলাম, আমরা এখন ঘণ্টায় তিন শত মাইল বেগে চলেছি, অথচ নীচের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে যেন আমরা স্থির হয়ে রয়েছি। এরোপ্লেনের গতি ঠিক করতে হলে এঞ্জিনের গতির সঙ্গে বায়ুর গতির (তা সে অনুকূলই হোক বা প্রতিকূলই হোক্) একটি হিসাব কষতে হয়, সেই সব হিসাব দেওয়া আছে। আরো নানা বিষয়ে খবর আছে ; তবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে খবরটি তা হচ্ছে যে আর দু'মিনিটের মধ্যেই আজমীর সহর দৃষ্টিগোচর হবে। তাহলে আমরা এখন রাজপুতানার উপর দিয়ে চলেছি। আজমীরে আমি আগে গিয়েছি, তাই সেখানটা আবার দেখবার জন্য বেশ ঔৎসুক্য হোলো। ব্যগ্র হয়ে জানলা দিয়ে দেখতে গেলাম। ধূসর অসমতল ভূমির উপরে ছোট্ট একটি সাদা বিন্দুর বেশী আর কিছু দৃষ্টিগোচর হোলো না। অনির্দ্দেশ্য ধূসর ক্ষেত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি এলো। হেলান দিয়ে বসলাম বই হাতে করে। কখন একটু ঘুমিয়েও পড়লাম। হঠাৎ জেগে দেখি করাচী এসে পড়েছি। তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। যে করাচীকে আগে হাওয়াই-মহলে বলা হোতো Getway to India, তা এখন আর Indiaর অন্তর্গত নয় ; ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী। কাজেই এখানে আবার পাসপোর্ট প্রভৃতি দেখাতে হবে। সে জন্য প্লেন থেকে নামতে হোলো।

বাইরে বেশ গরম। জানি না, করাচীর এরোড্রোমটা সমুদ্রের ধারে, না সমুদ্র থেকে দূরে, ভিতরে ; বেরিয়ে গিয়ে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু বিকেলটা সেদিন গুমোট গরম লাগছিল। ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যায় বাংলা দেশে কোথাও এতটা গরম থাকে না। প্লেন থেকে নেমে যাত্রীদের সঙ্গ ধরে এগিয়ে গেলাম। এক জায়গায় পাসপোর্ট ও এক জায়গায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে হোলো। শুনলাম, ৭।৮টায় প্লেন ছাড়বে। এই সময়টা কি করা যায় এই ভাবছি, এমন সময়ে সহযাত্রী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। তিনি এক জন আমেরিকান্ মিশনারী, কিন্তু কথা বললেন পরিষ্কার বাংলায়,—যদিও ভাষাটা কেতাবী বাংলা। নিজের পরিচয় দিলেন,—ষোলো বৎসর যাবৎ মিশনের কাজে পূর্ব্ববঙ্গে (এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে) বাস করছেন। ঢাকার কাছে কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত এক গ্রামেই অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। সেখানে তাঁদের মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি স্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই দু'টিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। জিজ্ঞাসা করলাম—আমেরিকার যে-কোনো স্থানে জীবন-যাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের রাজধানীর চেয়েও বেশী। এরূপ অবস্থায় তিনি সে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—বৈদ্যুতিক আলো-পাখা ইত্যাদি এবং কলের জল প্রভৃতি—ছেড়ে বাংলার পল্লীতে আছেন ; তাঁর এই জীবন কেমন লাগছে? তিনি বললেন, গ্রামই তাঁর ভালো লাগে ; বরং সহরেই বড় কোলাহল ; দিবা-রাত্রি কোলাহলে শান্তিভঙ্গ হয়। এই যে সব বিদেশী মিশনারীরা আমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও সেবার কাজ করছেন, এঁদের কাজের সুফল সম্বন্ধে আমাদের যার যা মতই হোক্ না কেন, এঁদের ত্যাগ ও ব্যক্তিগত চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ; বরং এঁদের ত্যাগের তুলনায় নিজেদের ক্ষুদ্রতা দেখে লজ্জিতই হতে হয়। যা হোক, এই ভদ্রলোক এত দিন বাংলা দেশে থেকে বাঙালী মেয়ের স্বভাব বোধ হয় ভাল করেই বুঝেছেন। আমি যে চট্‌ করে পাঁচ জন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে সময় কাটাবার পথ সুগম করতে পারব না, তা বুঝেই বোধ হয় ইনি আমার সঙ্গে অতিশয় সহৃদয় ব্যবহার করলেন। করাচীতে তাঁর সঙ্গেই গল্পে-সল্পে সময় কাটলো। পরেও প্রত্যেক বন্দরেই তিনি আমার তত্ত্ব নিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্ক পৌছে বিদায় নেবার সময়ে আমি তাঁকে আমার ওয়াশিংটনের ঠিকানা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে রাখলাম, তিনিও বললেন ওয়াশিংটনে এলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় করাচী বন্দর ছাড়লাম। তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। ভিতরে সারি-সারি আলো জ্বলেছে। গোটা কয়েক বড় আলো ছাড়াও প্রত্যেক আরোহীর ঠিক মাথার উপরে তারই হাতের নাগালের মধ্যে সুইচ্‌ সুদ্ধ একেকটি আলো আছে। বই পড়তে চাইলে ঐ আলো জেলে নিলেই সুবিধা হয়। এ আলোগুলির পরিধি সঙ্কীর্ণ ; অন্য যাত্রীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় না, অথচ পাঠকের কোলের উপরকার বইয়ের পাতায় উজ্জ্বল ভাবে পড়ে। আমি এখন সেই আলোটি জেলে নিয়ে পড়তে বসলাম। বিমানের দোলনিতে কিন্তু খুব শীঘ্রই ঘুম এসে গেল। সৌভাগ্যক্রমে পাশের সেই নিদ্রালু ব্যক্তিটি নেমে গেছেন ; আমার পাশের আসনটি শূন্য। দুই আসনের মধ্যবর্ত্তী হাতলটি নেড়ে-চেড়ে দেখলাম সেটি স্থানচ্যুত করা যায়। হোস্টেস্ একটি বালিশ ও একটি কম্বল দিয়ে গেলে পরে আমি আস্তে আস্তে হাতলটি খুলে মেঝের কার্পেটের উপর রেখে আলোটি নিবিয়ে যথাসম্ভব পা মেলে শুয়ে পড়লাম ; সেই স্বাদ-গন্ধহীন খাদ্য আরেক বার গ্রহণ করবার কোনো আগ্রহই অনুভব করলাম না।

[ক্রমশঃ।

তরুণী বধূর এই প্রশ্ন শুনে···

ডাক্তার তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন

জীবাণু-সংক্রমণের খুঁটিনাটি ঃ

রোগবাহী জীবাণুরা শরীরে সংক্রমণের বিষ ছড়িয়ে দেয়। প্রথম থেকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই সব জীবাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংক্রমণের বিষে সারা শরীর বিষাক্ত ক'রে তুলতে পারে। এগুলি এত ক্ষুদ্রাকার যে কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই দেখা যায়। স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজার গুণ বড়ো ক'রে এক জাতীয় জীবাণুর চেহারা এখানে দেওয়া হল, দেখুন।
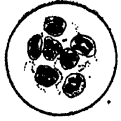
কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন ঃ

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রথম উপায়।

চতুর্দ্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়, 'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে ঃ

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার ঘায়ের যন্ত্রণা উপশম হয় ও ঘা শুকিয়ে যায়।

মাথার চুলকানিতে ঃ

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।

মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় ঃ

'ডেটল'-এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

ANTISEPTIC DETTOL NON-POISONOUS GERMICIDAL

'DETTOL'

TRADE MARK

DBI-6

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা।

গ্রাম-ভারতের সংগঠন

শ্রীমনকুমার সেন

গ্রাম-প্রধান ভারতে গ্রামের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার কল্যাণে শহরের এত দ্রুত সম্প্রসারণের পরেও আজ অবধি ভারতের শতকরা ৭৮ জনেরও অধিক লোক গ্রামের বাসিন্দা। সুতরাং গ্রামের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি। শহরের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হউক তাহাতে ঈর্ষাবোধ করিব না,—কিন্তু সেই শ্রীবৃদ্ধির মূলে যেন গ্রামের অধিকতর শোষণ ও শ্রী-সংহার প্রশ্রয় না পায়। আরও দেখিতে হইবে, শ্রী ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনা রচনা ও কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্য কি? আমরা গ্রামের বাসিন্দা শতকরা ৭৮ জনের মঙ্গল চাই, না শহরের শতকরা ২২ জনের মঙ্গল চাই? যদি বলা হয়, শতকরা ১০০ জনের ইষ্টসাধনই পরিকল্পনা ও প্রয়াসের লক্ষ্য, তাহা হইলেও ভাবিয়া দেখিতে হইবে দেশের মূল সম্পদ কি, প্রকৃত পরিবেশ কি, কোন্ পথে স্থায়ী ফল লাভ হইতে পারে,—কেবল বস্তু-সম্পদের উৎপাদনই নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে দেশবাসীর মনে শান্তি ও চরিত্রে একটা বলিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে পারে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারায় সভ্য ও উন্নত দেশ হইতেছে বৃটেন, উন্নত দেশ আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি। এই উন্নতি বলিতে উহাদের জীবনধারার বৈচিত্র্য ও ভোগ-ব্যবহারের সামগ্রীর বাহুল্যকেই বুঝায়—অর্থাৎ বস্তু-সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোগ-বৈচিত্র্যই এই সকল দেশের সভ্যতার মানদণ্ড। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ভারত দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অবজ্ঞা করে নাই,—কোন দেশই তাহা করে না, করিতে পারেও না,—কিন্তু এই ভোগ-বিলাস-বাসনাকেই সে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করে নাই। দৈহিক সুখের বেদীতে আত্মিক সমৃদ্ধিকে ভারত কদাপি বলি দেয় নাই—সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া জীবনকে সে দেখিয়াছে, মানব-সমাজের প্রকৃত আদর্শ রূপায়ণের পথকেই সে বাছিয়া লইয়াছে। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব যদি সভ্যতার মানদণ্ড হয়, তবে আজও ভারতের সভ্যতাই খাঁটি—উহাতে খাদ নাই, কৃত্রিমতা নাই। বৃটিশ-শাসনের দুই শত বৎসরের কু-শাসন ও শোষণের ফলে সব কিছু হারাইয়াও ভারত তাহার আত্মাকে হারায় নাই, জীবন-দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া একটা কৃত্রিম সভ্যতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই। পাশ্চাত্যে এত ভোগ-বিলাসের সুখ দেখিতেছি,—কিন্তু সত্যই কি পাশ্চাত্যের মানুষ সুখী? তাহার পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তির কোন লক্ষণ কি প্রকাশ পাইতেছে? একটা যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আবার যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিতেছে,—ইহা কি পাশ্চাত্যবাসীর সুখ, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ? সুখ, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও মানসিক স্থৈর্য্য যাহার নাই, সে কি সভ্য? যে সভ্যতা কোটিপতির যজ্ঞে কোটি কোটি মানুষকে অনায়াসে বলি দিতে পারে, শোষণই হইতেছে যে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, তাহা কি সভ্যতা, না মার্জিত বর্বরতা?

আজিকার ভারতের মানুষ আমরা যদি প্রাচীন ভারতের সুমহান্ সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনকে বিস্মৃত হইয়াও থাকি, তথাপি পাশ্চাত্যের জীবন-সংহারী সৃষ্টিহীন সভ্যতা, শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেন আমাদিগকে সচেতন করে—ভ্রান্ত পথের ভয়াবহ পরিণতি যেন আমাদিগকে যথার্থ পথের সন্ধানে প্রেরণা দেয়। যেখানে সমতা, স্থায়ী শান্তি শুধু সেখানেই সম্ভব। সমতা যেখানে নাই, সেখানেই শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-বিদ্বেষ, কলহ-কোলাহল, সংঘাত ও পরিশেষে আত্মঘাতী সংগ্রাম। অসমতার অর্থই হইতেছে অশান্তি আর এই অসমতার মূলে থাকে শোষণ। শোষণ উৎপাটিত করিতে না পারিলে জনসাধারণের জীবনে সংস্কৃতি দূরের কথা, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করাও অসম্ভব। আধুনিক সভ্যতা এমন এক নূতন আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে, যাহার সাহায্যে কোটি কোটি মানুষের সমাধি রচনা করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কোটিপতি হইতেছে। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ধারণ ও বহন করিবে কে—জন কয়েক কোটিপতি, না কোটি কোটি সংখ্যার জনসাধারণ?

অতীতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক জীবনের সৌন্দর্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জীবন ও জাতি গঠনের এই মূল সত্যটি সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। চিন্তা করিবার ও তদনুযায়ী কর্মনীতি প্রবর্তনের দ্বারা জনসাধারণের জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারতের কোটি কোটি মানুষ বাস করে গ্রামে,—অতীত ভারতকে চরম দুর্দৈবের মুখেও আজ তাহারাই সূক্ষ্মসূত্রে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভারত-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য গ্রামের এই কোটি কোটি মানুষকে সুস্থ দেহ ও সবল মানবতার অধিকারী করিতে হইবে। কোন্ পথে এই মহৎ কার্য সাধন সম্ভব?

কৃষি ও শিল্প গ্রামবাসীর প্রধান বৃত্তি। প্রাচীন ভারতের প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংনির্ভর—খাদ্যশস্যের প্রয়োজন মিটাইত কৃষি আর অপরাপর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইত শিল্প। কৃষক ও কুটীরশিল্পীই ছিল সেদিনের ভারতে প্রধান রূপকার। বৃটিশের কু-শাসনে, বৃটিশের শোষণমূলক ব্যবসা ও বাণিজ্যে এই রূপকারেরা মরিয়াছে—ভারতের রূপও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আজ সর্বত্র একটানা দারিদ্র্য ও হতাশার ক্রন্দনই শুধু শোনা যায় না কি?

স্বাধীন জাতিরূপে সত্যই যদি আমরা বাঁচিতে চাই, মানুষের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই,—তবে আবার সেই স্বয়ং-নির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির পথ আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। জমিদারী-প্রথার বিলোপ ও ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। কংগ্রেস এই পরিবর্তনের পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আজ বাধা-বিপত্তি সম্মুখে যাহাই আসুক, আইনের অদ্ভুত জটিলতা যত বিঘ্নই সৃষ্টি করুক, জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এই প্রতিশ্রুতি পালনে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে,—নচেৎ এক অবাঞ্ছিত ও বেদনাদায়ক দুর্যোগের মধ্য দিয়াই ভূম্যধিকার-বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের সুপ্ত চেতনা কালের স্বাভাবিক গতিবেগে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইবে। শত বৎসর সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা সংগ্রাম করিলাম, আজ আইন ও অর্থাভাবের বাধা কি এতই দুরতিক্রম্য হইয়া পড়িল যে, আমরা শত বৎসরের প্রতিশ্রুতিকে অবলীলাক্রমে পিছাইয়া দিতেছি?

কৃষকের পরেই স্থান কুটীরশিল্পীর। কুটীরশিল্পের অপমৃত্যুতে গ্রাম-ভারতের জীবন-স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে,—কর্মের চঞ্চলতা ও সজীবতা সেখানে আর নাই। শতকরা ৭৮ জনের গ্রাম আজ শ্মশান—সহরের বাকী ২২ জনকে লইয়া আমরা স্বর্গরচনার বিচিত্র প্রয়াস পাইতেছি!

সম্প্রতি শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবের নেতৃত্বে ভারত সরকার কুটীরশিল্প

সংগঠনের এক নূতন পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছেন। ভূতপূর্ব শিল্প ও সরবরাহ-সচিব শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত নিখিল ভারত কুটীরশিল্প-সংঘই স্বাধীনতা-উত্তর সরকারী কুটীরশিল্প পরিকল্পনার প্রথম সর্বভারতীয় প্রয়াস। কিন্তু সেই প্রয়াসের কোন কার্যকরী ফল গ্রামের কুটীরশিল্পীর জীবনে আজিও প্রসব করে নাই। সরকারী প্রচেষ্টা তথা সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে যে গলদ রহিয়াছে তাহাই এইরূপ ব্যর্থতার কারণ। গ্রামের শিল্প-সংগঠনের অর্থ সেই শিল্পগুলিকে স্বয়ংনির্ভর হইবার সুযোগ দেওয়া। সরকার এক দিকে সংগঠনের কথা বলিতেছেন, অপর দিকে শিল্পগুলিকে যে অত্যাবশ্যক কাঁচা মাল-মশলা ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে পরনির্ভর ও অসহায় করিয়া রাখিতেছেন। তাঁতশিল্পের সংগঠনের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ অসীম, অথচ তন্তুবায়কে সুতার জন্য মিল-মালিকের সহৃদয়তার উপর যেরূপ অসহায় ভাবে নির্ভর করিয়া লাঞ্ছিত হইতে হয় তাহার প্রতিকার হইতেছে কই? প্রতিটি শিল্প সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী যদি দূরপ্রসারী না হয়, তাহা হইলে সরকারী কুটীরশিল্প পরিকল্পনার তোড়জোড় মূষিকও প্রসব করিবে না। গ্রামশিল্প, গ্রামের কুটীরশিল্প, গৃহশিল্প প্রভৃতি শ্রেণীবিন্যাস করিয়া গ্রাম্য সমবায় সমিতির মারফৎ গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিলে আবার গ্রাম-ভারতে প্রাণের সাড়া জাগিবে, এবং সেদিনই আসিবে স্বাধীনতার সাধনালব্ধ ফল জনসাধারণের স্বরাজ।

পল্লীর মানুষ বার্ণার্ড শ'

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দাসকানুনগো

চিরকাল দেখা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এক দল সুসভ্য মানব পল্লীকে অবহেলার চোখে দেখিয়াছেন, আবার কেহ নগরের মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া পল্লীর প্রতি দরদ দেখাইয়াছেন; ইহার প্রবলতা বাড়িয়াছে বিংশ শতাব্দীতে, ইহার পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশ মানব পল্লীবক্ষে সাধন-মার্গে বিচরণ করিতেন, বর্ত্তমান এই সাধন-মার্গ প্রস্তুত হইয়াছে নগরে, সেই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পল্লীর কদর নাই। কিন্তু নগরকে যতই আঁকড়াইয়া থাকা যাউক না, পল্লী ব্যতিরেকে কোন উপায় নাই, যেমন পাখী আকাশে উড়িলেও নীচে নামিতে বাধ্য হয়, তেমনি নাগরিকেরও অবস্থা।

আমাদের পল্লী-দরদী বার্ণার্ড শ' চিরকাল পল্লীর মানুষ, এক কথায় তিনি ভারতীয়ের চোখে চাষা। চাষা না হইলে পল্লীতে কেহ বাস করিতে চায়? পল্লীর সহিত সম্বন্ধ মনে-প্রাণে, তাই তাঁহার লেখনীমুখে যাহা প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা পল্লীর গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষার কথার মতই প্রকাশিত হইয়াছে। কখনও কাহারো খাতির রাখিতে তিনি সত্যের অপলাপ করেন নাই, যাহা সত্য—চির-সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা তিনি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার জন্য কোন দিন কাহারও মান-অপমানের খাতির-যত্নের ধার ধারিতেন না।

বাল্যকাল হইতে তিনি তাঁহার জীবনের এক অংশ পল্লীক্রোড়ে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি আজ আমাদের দেখাইয়াছেন—'জগতে মানুষ হইতে হইলে—মানবতার পূজারী হইতে হইলে পল্লীর নিকটতম আত্মীয় হইতে হইবেই। যে ব্যক্তি পল্লীকে আত্মীয়রূপে বরণ করিতে পারে নাই, সে আবার দেশ সম্বন্ধে জানিবে কি?' তাই দেখিতে পাই—দরিদ্র পল্লীবাসীর দুঃখমোচনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক, ইহারই ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বে দেখাইয়াছেন ধনতন্ত্রবাদের কুপরিণাম। নিরন্ন দরিদ্র মানুষের মুখে কি ভাবে মানুষ ভাষা যোগাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারে—বিদ্রোহ করাইতে পারে—কি ভাবে সে তাহার দারিদ্র্য মোচন করিতে পারে—ইহাই ছিল তাঁহার লেখ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। ইহারই ফলে তিনি বিশ্ববাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, যাহার জন্য বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; রাশিয়া পরিভ্রমণান্তে, মার্কসবাদ পাঠান্তে তিনি স্বদেশ-সেবার জন্য রাজনৈতিক কর্ণধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজতন্ত্রী মতবাদকে সমর্থন করিয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাম্যবাদী মতবাদের সমর্থক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু যাহা সত্য, কষ্ট ভোগের জন্য তিনি সেই সত্যের অপলাপ করেন নাই। সত্য যে এক কালে প্রকাশ লাভ করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকে, ইহা তাঁহারই জীবনে ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের সহিত শেষ জীবনের তুলনা করিলে মনে হয় যেন আকাশ-পাতাল সম্বন্ধ।

পল্লীর প্রতি, মানব জাতির কল্যাণের প্রতি, দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁহার টান ছিল বলিয়াই তিনি আজ এত বিখ্যাত হইয়াছেন। এত খ্যাতি অল্প লোকেই দেশে-বিদেশে পাইয়াছেন, পৃথিবীতে বহু মহামানবের আর্বিভাব ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু জীবনে এত খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, আমাদের রবীন্দ্রনাথের পরেই বানার্ড শ';—ইহাই পৃথিবীতে খ্যাতির পর্য্যায়ে দ্বিতীয় স্থান। আমরা তাঁহার জীবনী হইতে এইটুকু শিক্ষা পাইলাম—সত্যের জন্য লড়াই করিয়া যদিও পরাজয়, বদনাম প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলেও এক দিন জয় সুনিশ্চিত; সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে হইলে বার্ণার্ড শ'র জীবনী অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পল্লীর নিভৃত আড়ম্বরহীন কক্ষে অবস্থান করিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়া গেলেন—'যতক্ষণ পর্য্যন্ত পল্লীর উন্নতি না হইবে, পল্লীকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত ভালোবাসিতে না পারিবে, ততক্ষণ সমগ্র দেশ কেন জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, তাহাতে কাহারো উন্নতি হইতে পারে না; নয় নগর আর নয় পল্লীর, নয় দেশের নয় বিশ্বের। পল্লীই আমাদের প্রাণ, পল্লীই আমাদের জননী, পল্লীই আমাদের মান-যশ, পল্লী সবই।'

বিশ্বপল্লীর নিরালা-নিভৃত কক্ষে যে দীপটি এত কাল জ্বলিয়া অন্ধকারে আলোকপাত করিতেছিল, এক দমকা হাওয়ায় সে দীপটি নিবিয়া গেল, আজ যেই তিমিরে সেই তিমিরে!

তাঁহার জীবনী জানা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার বিরাট পুরুষকারকে প্রকাশ করিতে চাই অধিক সময় ও অধিক স্থান। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যাহা প্রয়োজন তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইল। যে সময় ইংরাজ তাড়াইবার জন্য ভারতবাসী প্রথম মতলব খাড়া করিতেছে আর ইংলণ্ডে চলিতেছে ভারত শাসনের নূতন আইন-আলোচনা, সেই কুক্ষণে, সেই দুর্দ্দিনের মাঝে ১৮৫৬ খৃঃ ২৬শে জুলাই আমাদের নমস্য তথা বিশ্বের প্রণম্য বার্ণার্ড শ' ডাবলিনের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা জর্জ কার শ' ডাবলিন আদালতের এক জন কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা লুসিণ্ডা এলিজাবেথ গার্লি ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা। শ' পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, সেই হিসাবে আদর-যত্ন পাইতেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শিশু অবস্থা কাটিবার পর বিদ্যাভ্যাসের জন্য ওয়েসলিয়ান কনেকসনাল স্কুলে গমন করেন, এবং তথায় মাত্র চৌদ্দ বৎসর কাল কাটাইয়া বিদ্যাভ্যাসে ইস্তফা দিয়া কর্ম্মী জীবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অধঃপতনের দিকে তাকাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীরা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিলেন; কিন্তু শ' কাহারো কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিতে এক দালালী অফিসে বার্ষিক আঠার পাউণ্ড বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর চাকুরী জীবন কাটাইয়া স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। পাড়া-প্রতিবেশীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ছাত্র-জীবনে ফিরিয়া আসেন নাই; ধরা-বাঁধা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পুঁথিগুলি উদরস্থ করিতে কোন দিনই তাঁহার অন্তর ও বিবেক সায় দেয় নাই, স্বাধীন চিন্তাধারাই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রিয়। ১৮৭৬ খৃঃ বেকার-জীবন লইয়া তিনি মাতার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য সাধন-মার্গে প্রবেশ করেন, এবং প্রথম নয় বৎসর অতি দুঃখে-কষ্টে অতিবাহিত করিয়া অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। ইঁহার মাতা ছিলেন এক জন সুপ্রসিদ্ধা সঙ্গীতজ্ঞা; তাঁহারই সাহায্যে ইঁনি সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন, এবং তাঁহারই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে একটি দীপ জ্বলিয়া উঠিল। বার্ণাড শ' পাঁচখানি উপন্যাস হস্তে করিয়া প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোনই লাভ হইল না, শেষে বিরস বদনে তাঁহাকে সাধন-পথে প্রত্যাগমন করিতে হইল। শোকে-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তায় কালাতিপাত করিতে করিতে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে সমালোচক পদে নিযুক্ত হইলেন।

কালক্রমে দেশের আবহাওয়া বদলাইতে লাগিল, মার্কসবাদের প্রবলতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইল; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপন্যাসগুলি সমাজতন্ত্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৮২ খৃঃ ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ' ভূমি জাতীয়করণ প্রসঙ্গে হেন্রী জর্জের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজতন্ত্রী নেতারূপে পরিগণিত হইয়া বহু বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতাদের সহিত বন্ধুত্ব-ডোরে আবদ্ধ হইয়া দেশবাসীকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। পথে-পথে, মোড়ে-মোড়ে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়িতে বাধ্য হইলেন, এবং বহু অপমান সহ্যও করিলেন।

তাঁহার বহু পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর—নাট্যকার, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, ধার্ম্মিক, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। এই খ্যাতনামা বার্ণার্ড শ' ছিলেন অতি সরল, উদার ভাবাপন্ন, তাঁহার জীবনযাত্রায় ছিল না বাহ্যাড়ম্বর বা গর্ব্বের লেশ। কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিতেন বলিয়া লোকে ভাবিত তিনি অহঙ্কারী, দাম্ভিক; কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন মাটীর মানুষ, ইহা তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্যতিরেকে অপরে জানিত না।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিবার পর ভগ্নস্বাস্থ্যে মিস টাউনসেণ্ড নাম্নী এক আইরিস মহিলাকে বিবাহ করিলেন এবং বিবাহের পর হৃতস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিবার পর ১৯৪৩ খৃঃ বৈরাগ্য জীবনে পদার্পণ করিলেন এবং এই বৈরাগ্য জীবনেই তাঁহার মহাপ্রস্থান। তাঁহার লেখনী চিরকারই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চালিত হইত। "প্রচলিত ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, কায়েমী স্বার্থ ও অযোগ্যের আড়ম্বরের প্রতি বীতস্পৃহা, প্রচলিত নীতিবিরোধের প্রতি ঘৃণা, নির্য্যাতিত মানবতার পক্ষ লইয়া সংগ্রাম, তাঁহার বলিষ্ঠ রসবোধ ও গম্ভীর মুখ পণ্ডিতমাহ্মদের অস্বীকার করিবার সাহসিকতার দ্বারাই তিনি বুদ্ধিজীবি যুব-সমাজের হৃদয় জয় করিলেন।" এবং ১৯২৫ খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া পুরস্কারের সকল অর্থ তিনি 'ইঙ্গ-সুইডিশ' সোসাইটীতে মুক্ত-হস্তে দান করিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেক্সপীয়র-পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে জর্জ বার্ণাড শ'। বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী সাহিত্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার ভাবধারা শুধু ইংরাজী সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে নাই, বিশ্ব-সাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করিয়াছে। একাধারে তিনি মার্কস্, বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি সাম্যবাদী মহাপুরুষগণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, হয়ত এই জন্যই তাঁহার কক্ষে এ সকল মহাপুরুষের প্রতিকৃতি বিরাজ করিত।

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজীর মধ্যে "দি ইন্‌টেলিজেণ্ট উম্যানস্ গাইড টু সোস্যালিস্ এণ্ড ক্যাপিটালিজম, এড্রি বডিস্ পলিটিক্যাল হোয়াটস্ হোয়াট, দি ডক্টরস্ ডায়লেমা, গেটিং ম্যারেড এণ্ড দি সেমিং আপ অবক্সো পসনেট, আর্মস এণ্ড দি ম্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া চিন্তা করিবার মত বিষয়বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব বেশী ডিগ্রীধারী নহেন, তাহা বলিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য কম নয়। এই জন্য তাঁহাকে বলা হয় অন্তর্নিহিত ভাবুক।

যদিও তিনি ল্যাবরেট্যারিতে বসিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন নাই, তাহা হইলেও তিনি ছিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পুস্তকাবলী বৈজ্ঞানিকদেরও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গবেষণায় বসিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তিনি সাজানো কারবার বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

১৯৫০ খৃঃ ২রা নভেম্বর ৫টা বাজিতে ১ মিনিট বাকী, এমন সময় বিশ্বদীপ নিবিয়া গেল। আজ শ'এর বিয়োগে পল্লী নিস্তব্ধ, প্রকৃতি শোকাতুরা, জগৎ মুহ্যমান।

আমি কিরণময়ী

[প্রবন্ধটি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত]

শ্রীশুকদেব সিংহ

আমি কিরণময়ী।
শরৎচন্দ্রের মানস-মেয়ে, উটকো কেউ নই।

আমি নিজের কথাই বলতে এসেছি, করুণ গাথা শোনাতে এসেছি তোমাদের। আমার কথা শুনবে তো তোমরা? চরিত্রহীন একটা মেয়ে ব'লে, দিবাকরকে প্রতারিত ক'রেছি উপেন্দ্রর মৃত্যু-মুহূর্তে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি ব'লে দূরে ঠেলে দেবে না তো? সত্যি, তোমরা বিশ্বাস করো, ওর জন্যে দায়ী আমি মোটেই নই। যদি কেউ দায়ী থাকে তো সে আমাদের মানুষের জীবনের অনিবার্য ট্র্যাজিক্ পরিণতি। দিবাকরকে আমি ভালোবাসতাম না, কি মতিচ্ছন্ন হ'ল, উপেনের অহেতুক তিরস্কারে রেগে গিয়ে তাকে শায়েস্তা করবার জন্যেই তার একান্ত প্রিয়পাত্র দিবাকরের সঙ্গে আরাকান অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম, আঘাতটা দিতে চাইলাম আমার মনের মানুষ উপেনকেই, কিন্তু তা হ'ল না। সঙ্গে দিবাকরও আঘাত পেলো, কারণ অপরিণত-বুদ্ধি সে তার সাথে আমার পালানোর মধ্যে কোথায় পাওয়ার ইঙ্গিত লাভ করেছিল। সেই জন্যে পরে আমাকে না পাওয়ায় মুসড়ে পড়েছিল দিবাকর অনেকখানি। কিন্তু আমি কি করবো? জগতের ট্র্যাজেডি তো সেখানেই; চাওয়ার আতিশয্য আছে, কিন্তু পাওয়ার উপায় নেই। ভালো আমি উপেনকেই বাসি, সে-ভালোবাসা মহানুভবতা দেখিয়ে দিবাকরকে তো দিতে পারি নে! আর, উপেনের মরণ-মুহূর্তে ঘুমিয়েছি কেন? এর উত্তর দিতে আমার কথা বেরুচ্ছে না। প্রিয়জনের শেষ বিদায়ের ক্ষণে বিকৃত-মস্তিষ্ক হ'য়ে নির্ভাবনায় ঘুমানো যে অদৃষ্টের কত-বড় পরিহাস, আজ তা বুঝতে পাচ্ছি। ব্যথায়-কান্নায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। এ-কথার উত্তর দিতে আমি পারবো না, চাইও নে। তোমরা অসম্পূর্ণ অসংগত ট্র্যাজিক্ জীবনকে যদি স্বীকার না করো তো আমায় দোষ দিও। প্রতিবাদ করবো না, একটি কথাও বল্‌বো না। শুধু অনুরোধ, উপস্থিত আমার কথাগুলো শুনে যাও।

ঘুম থেকে উঠে উপেনের মৃত্যু-সংবাদে আমি আঘাত পেলাম যথেষ্ট, একেবারে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত হ'য়ে পড়লাম। সমস্ত শরীরটা আমার ঝিম্-ঝিম্ ক'রে উঠলো—বিশেষ ক'রে যেন মাথার ভেতরটা। তা'তে আমি কেমন পাগলামি হ'তে মুক্ত হয়ে পড়লাম তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, ব্যর্থ জীবনের অতীতকে, অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, লাভ-ক্ষতিকে। এ-সময়ে হয়তো ব্যর্থতার দুঃখেই আমার মনটা ভ'রে উঠতো, কিন্তু তা আর হ'লো না। নিজের উদাহরণ দেখিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতেই যেন অতীতের একটা নারীমূর্তি এসে দাঁড়ালো। দেখলাম, সম্মুখে আমার বিকচযৌবনা লাজনম্রা বিধবা কুন্দনন্দিনী দাঁড়িয়ে। সে ব'লে গেল তার নিজের কথা। শুনলাম, সে ভালোবাসায় মজলো, বিধবা হয়েও বিয়ে করলো নগেন্দ্রকে, তার পর নগেন্দ্রর চিরন্তন প্রেম পাওয়ায় অক্ষম হয়ে ম'রলো নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কিন্তু এখানেই আমার গল্প শোনা শেষ হ'ল না। স্মৃতি থেকে কুন্দনন্দিনীর রূপ মুছে যেতেই রূপ নিলো 'চোখের বালি' বিনোদিনী। সেও বিধবা। সেও ভালোবাস্‌লো আশার স্বামী মহেন্দ্রকে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম-বিনিময়ের শেষ মুহূর্তে তার অন্তঃকরণে চোরাবালির খোঁজ পেয়ে বিনোদিনী ফিরিয়ে নিলো তার ভালোবাসা, আকর্ষণ করতে চাইলো ঝঞ্ঝা-অটল অবিক্ষুব্ধ বিহারীকে কিন্তু বুঝি তা পারলো না, তাই প্রাণগতিকে অস্বীকার করার জন্যে জীবনের বাকী অংশটা কাটিয়ে দিতে সে নিজের উদ্দীপ্ত কামনার ওপর বৈরাগ্যের ছাই ছড়িয়ে দিলো, প্রেমের হাজার হাজার রঙীন বাতি নিবিয়ে সেবার স্তিমিত ঘিয়ের প্রদীপ হাতে গোধূলির ছায়ায় ঢাকা রোগ-কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল…গেল সকলের দৃষ্টিপথের বার হয়ে…

এমনি ভাবে একটা নারী মরলো, অপর জন চলে গেল দৃষ্টির বাইরে! কিন্তু তাদের অন্তর-বেদনায় রক্ত করবীর মতো ফুটে-ওঠা প্রতিবাদ, জিজ্ঞাসাটুকু রেখে গেল আমার মাঝে। তাইতো শুধাই, ভালো নয় বেসেছিলাম আমরা, তা বলে চিরকাল দুঃখভোগ করবো? সমাজের ঘৃণা বিদ্রূপ লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যাবো মুখ বুজে? অন্য উপায় না দেখে সমাজবুদ্ধি তোমরা হয়তো বলবে, বিধবা যখন, তখন অন্যকে ভালোবাস্‌লে কেন? আমি শুধাই—বিধবার কি ভালোবাস্‌তে নেই? আর সকলের মত রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জায় গড়া তার জীবন নয়? সকলের মত মনের মণিকোঠায় কিছু মাত্র বাসনা তার লুকিয়ে থাক্‌তে নেই। যদি থাকেই, তোমরা বলবে, সংযম দিয়ে তা দমন ক'রে রাখতে হয়! বেশ কথা। কিন্তু এ অপরিসীম সংযম তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বামীকে যে সম্পূর্ণরূপে ভালোবাস্‌তে, মনে তার চিরবিগ্রহ গড়ে তুলতে সুযোগ পেলো না, কি ক'রে সে সেই অনাস্বাদিত স্বামিপ্রেমের স্মৃতিতে মশগুল হয়ে কামনাকে কাটিয়ে উঠবে! ওটা সম্ভব নয়, বোধ করি উচিতও নয়। তাই আমরা ভালোবেসেছি যুগে-যুগে জনে-জনে—কুন্দনন্দিনী—বিনোদিনী আর কিরণময়ীর ভেতর দিয়ে। এ ভালোবাসা আজকের নয়, মানুষের আদিমতার অনুবৃত্তি। যুগ পরিবর্তনের অমোঘ ফলে এর লোপ হয় না, রূপান্তর হয় শুধু। আমাদের তিন জনের ভেতর দিয়েও এ রূপান্তর চ'লেছে। বিষয়টা বুঝিয়ে বলি।

সমাজ-জীবনের প্রথমের দিকে থাকে না কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা বিচক্ষণতা। তাই সে সময় অকারণে ভাবোচ্ছ্বাস, গানের সুর আর রোম্যান্সের রঙ অতিমাত্রায় থাকাও সম্ভব। এমনিতর একটা যুগে, বঙ্কিমের আমলে কুন্দনন্দিনী জন্মেছে। স্বাভাবিক মানুষের কামনা-বাসনা সব কিছুই তার ছিল। কিন্তু যুগের ধর্মে ইচ্ছে ক'রে কাউকে ভালোবাস্‌তে হয়নি, নগেন্দ্রর সাথে হঠাৎ ভালোবাসায় পড়ে গেছে। তার পর সে উচ্ছ্বাসে অনভিজ্ঞতায়, মুগ্ধতা আর সারল্যে সেই ভালোবাসা শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এ-ভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রাধান্য পেলো…সমাজ থেকে প্রথম দিকের উচ্ছ্বাস, গানের সুর আর কৌশলহীন পদক্ষেপ লুপ্ত হয়ে যেতে বস্‌লো। এ আরক্ত-লুপ্তির কালে, রবীন্দ্র-যুগে জন্ম নিয়েছে বিনোদিনী; যৌবনে মহেন্দ্রর ভালোবাসায় পড়ে যায়নি, আপনা হতেই তাকে ভালোবেসেছে, সংযত সংহত কৌশলময় মায়া-বিস্তারে এক পা-এক পা ক'রে অগ্রসর হয়েছে, মহেন্দ্রকে পেতে চেষ্টা করেছে। এ এগিয়ে চলার ছন্দে রবি বাবুর মনোবিশ্লেষণ বেশ সম্ভব হয়েছে।

তবু তাঁর আঁকা ভালোবাসা কোথাও কোথাও তখনো 'কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা' অর্থাৎ তা'তে ছিল লুপ্তপ্রায় কল্পনার রঙ। এটা একেবারে মুছে গেছে আমার জীবনে। এ জীবনে উচ্ছ্বাস, কল্পনা, এ সমস্তের নামগন্ধ নেই, অনিবার্য বাস্তবতা সব জায়গায়। ভালো আমি বাসি, ভালোবাসা আমি চাই। এ চাওয়ার সুর বা ঝাঁজ বোধ করি আগের বিনোদিনী অপেক্ষাও বেশী! হতভাগী বিনোদিনী যাকে প্রাধান্য দিয়েছে, কিন্তু যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেনি, অদৃষ্ট ব'লে স্বীকরি ক'রে নিয়েছে বৈ আত্মক্ষমতার দাঁড় করাতে চায়নি, আমি কিরণময়ী, অধিকতর বলশালিনী, তাও করেছি। কতটা যে সুফল পেয়েছি তা জানি নে। সে-বিচারের ভার আপাততঃ তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। একটা কথা না বলে পারছি নে। তোমরা বাইরে যতই প্রগতির বড়াই করো না কেন, ভেতরে সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রয়ে গেছ। আর সেই জন্যেই কুন্দর জীবনের ওপর যত অবিচার হয়েছে, তাদের দোষগুলো অবলীলাক্রমে বঙ্কিম বাবুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়ো, ভেবে দেখো না—তাঁর পক্ষে সে-সময়ে ওর বেশী কিছু করার উপায় ছিল না। তাঁর মধ্যেও ছিল দু'টি সত্তা,—একটি তাঁর স্বাধীন ব্যক্তি-চেতনা, অন্যটি সামাজিক সংস্কারের অন্তর-প্রবাহ। এ দু'টির দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছেন। স্বাধীন ব্যক্তি-চেতনা দিয়ে কুন্দর দুঃখ তিনি বুঝেছেন, তাই বুঝি সুবিচার করবার জন্যেই তাকে ডেকে এনেছেন সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে, কিন্তু এই পর্যন্ত! এর বেশী এগোতে পারেননি! দ্বিতীয় সত্তা তাঁর বলবত্তর হয়ে উঠেছে, সামাজিক সংস্কারের অদৃশ্য হাত ব্যক্তি-সত্তার গলা টিপে ধরেছে। পিছিয়ে গেছেন বঙ্কিম, যেতে বাধ্যই হয়েছেন। ফলে মরেছে কুন্দ; তার মরণ তখনকার সাহিত্য আর সমাজ-নীতির বাস্তব পরিণাম। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও কুন্দর জীবনটা ট্র্যাজিক্ হয়ে ওঠেনি, তার মনে ঠাঁই পায়নি অমীমাংসিত কোন জটিল দ্বন্দ্ব—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাকে বলে complex। ট্র্যাজেডিটা বরাবর লেখকের মনেই রয়ে গেছে।

তার পর বিনোদিনীর জীবনে আর এমনটি হয়নি! লেখকের মন হতে ট্র্যাজেডি এখানে মানস মেয়ের মনে এসে পৌঁছেচে। বিনোদিনী মানসিক এক সত্তায় চায় মহেন্দ্রকে, আর সত্তায় ভাবে আশার স্বামীকে প্রেমে আকর্ষণ ক'রে সে ভালো করেছে না। এ দু'-সত্তার বিবাদ আগাগোড়া বিনোদিনীর জীবন ছেয়ে আছে। বাইরের চক্ষুলজ্জার সংকোচ, অন্য দিকে মনের আহ্বান—বিনোদিনী একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। তবু তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠিকমত সূক্ষ্ম রূপ ধরেনি, তখনো দ্বন্দ্বের একটা পক্ষ ছিল বাইরের স্থূলতা-ক্লিষ্ট। পরে তাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে আমার এ জীবনে। এখানে দু'টো সত্তাই সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে। একে উপেন্দ্রকে ভালোবাসে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের একটা প্রকারকে প্রশ্রয় দেয়, বলে প্রাণ যা' চায় তাই করো; অন্যটি কেমন যেন বাধা দেয়, তবু সে বাইরের কেউ নয়, স্বার্থ-সর্বস্ব চাওয়ার মাধুর্যেই মগ্ন কোন গুপ্ত চেতনা, পাওয়ার দিকে যার কিছু মাত্র লক্ষ্য নেই। এর ফলে আমি পিছনে ছুটেও চাইনি দিবাকরকে, আর উপেনকে চেয়েও হাতের কাছে পাইনি। ট্র্যাজেডি আমার জীবনে প্রধান স্থান নিয়েছে। আমার জীবনটাকে দুর্বহ বেদনা-বিধুর ক'রে তুলেছে। তবু বলবো তারো প্রয়োজন ছিল; কারণ, আমার জীবনে ট্র্যাজেডির এমন পূর্ণ প্রকাশ না ঘটলে আমার পরে যে এসেছে, সেই তেজোময়ী 'কমল' বোনটি ট্র্যাজেডিকে কাটিয়ে উঠতে পারতো না। সে আমার জীবনের সমান বলশালী দু'টো সত্তার অহর্নিশ দ্বন্দ্ব দেখেছে বলেই নিজ মনের স্বাধীন সত্তা দিয়ে সমাজ-চেতনাকে পরাস্ত করতে পেরেছে; দৃঢ়তার সঙ্গে আপন মত ব্যক্ত করেছে। ফলে সে জাগতিক সুখ পায়নি সত্যি কথা, কিন্তু মনোজগতের দ্বন্দ্ব-বিপর্যয়ের হাত হতে অব্যাহতি লাভ করেছে। এটা কি তার কম লাভ! লাভটা আমারো কম নয়; নিজের জীবনের বিনিময়ে এটাতে সাহায্যও তো করতে পেরেছি, এই যথেষ্ট!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের একটু গুণগান ক'রে ফেললাম। রাগ করলে না তো? আর করলেই বা কি হবে বলো, এ তো তোমাদের আমাদের সকলেরই দোষ। অনিবার্য্য কারণে আমাদের দিয়ে যা' ঘটেছে, তারি জন্যে বড়াই করি আমরা। কথাটা যে কত দূর সত্যি তা আজকের ঔপন্যাসিকদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। আমার, আমার মতো এমনি আরো অনেকের, একের বেশী জন্মের সাধনাতেও যখন বঞ্চিতা সধবা কি বিধবা নারীর পক্ষে তোমাদের কাছে সামাজিক মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হল না, তখন এ শ্রেণীর মধ্যে জেগে উঠলো সমাজ-বিদ্রোহের একটা আকুতি। আর তারি ফলে আমার মেয়ের মত যারা, যাদের আজকের ঔপন্যাসিকেরা প্রাণ দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপ্তি—এটা মানসিক বা সব দিকের অধঃপতনের চিহ্ন সন্দেহ নেই,—কিন্তু চিরন্তন নয়, সাময়িক অভিমানাহত মনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ মহা সত্যটাই আজকের লেখকেরা মান্‌তে চান না, তাঁরা পাশ্চাত্য ভাব নিয়ে এর সম্বন্ধে নতুনত্ব সৃষ্টির আত্ম-গরিমা বোধ করেন, ভাবখানা এমন দেখান যেন, অবস্থার পরিবর্ত্তনেও এ ঘৃণিত রীতি তাঁরা ত্যাগ করবেন না। কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করি নে। আমার বিশ্বাস, বঞ্চিতারা সামাজিক সক্রিয় সহানুভূতি আর মর্যাদা পেলেই এমনতর ঘৃণ্য কদর্যতার পরিসমাপ্তি হবে। আর সেই জন্যেই তোমাদের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানিয়ে গেলাম। অযাচিত ভাবে দু'-চারটে কথা শুনিয়ে গেলাম হৃদয়ের আবেগে—বিদায়ের মুহূর্তে সেই পুরানো প্রশ্নটাই ক'রে গেলাম—বলতে পারো মানুষের জন্যে সমাজ, না সমাজের জন্যে মানুষ?

"বিবর্তনের চক্র চলে সর্বদা উপরের দিকে, তবে চক্রেরই মত তারা উর্ধ্বে চলে না। সোজা সরল রেখায়। তার চলবার ধারায় পাই, অগণিত উত্থান আর পতনের বিন্যাস, তবে বিবর্তনের স্বার্থের পক্ষে যা বিশেষ প্রয়োজন তা থাকে রক্ষিত, অথবা সাময়িক ভাবে তারা মিলিয়ে গেলেও আবার দেখা দেয় নূতন রূপে নূতন যুগের উপযোগী হয়ে।"

—শ্রীঅরবিন্দ।

পুরানো জেলের কথা

শ্রীবিধুভূষণ বসু

১৯১০ সালের মার্চ মাসে খুলনার ম্যাজিষ্টেট সাহেবের কাছে ১২১ ও ১৫৩ ধারায় ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড পেয়ে ১৫ দিন খুলনা ও আলিপুর জেলে থেকে, হাজারিবাগ জেলে আসি। সেখানে এসে দেখি, আর ১৫ জন আছে, মানিকতলা বম্ কেসের পরেশ, শিশির, নিরাপদ, নগেন, ধরণী; বাঙ্গা-বাজিতপুরের ডাকাতি কেসের কার্ত্তিক দত্ত, বিডন স্কোয়ারের ইংরেজের হাতকাটা সত্য দাঁ, বিপ্লবী সাহিত্যিক কিরণ মুখুয্যে, যুগান্তরের ফণী মিত্র, সিরাজগঞ্জের বিপ্লবী নেতা মহম্মদ সিরাজি, আরও কয়েক জন। সকলেই সেল্-বন্দী। কাজ ১০ সের গম পেষা। গলায় লোহার তারে তক্তি বাঁধা, পরনে জাঙ্গিয়া, একটি কোর্ত্তা, মাথায় তাজ, তাতে নম্বর খোদা। শয্যা ৩ খানা ঘোড়ার কম্বল। তবু বেশ লাগলো সাথী-সহচর পেয়ে—যদিও পৃথক সেলে বাস, কারু সঙ্গে কথা বলবার অধিকার নাই।

লোহার থালা-বাটি, তাতেই ভাত-জল খাই, তাই নিয়েই পায়খানায় যাই। খাদ্য সকালে লপসি, দুপুরে ভাত, ডাল,. শাক, তেঁতুল। বিকাল পাঁচটায় চাপাটি রুটি ও ডাল। রাত্রে যে সেলে থাকি, সকালে তার পরিবর্ত্তন, আবার সন্ধ্যায় অন্য সেল। ৪ জন এক সাথে চৌবাচ্চায় নাইতে যাই, সেই সময়ে যা আলাপ-পরিচয় হয়। ৫।৭ দিন মধ্যেই সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো।

বিশটা সেলে ২২ জন ওয়ার্ডার পাহারা, ১ জন তিন লাল বেল্লার জমাদার। জমাদার দশরথ সিং বৃদ্ধ, বড় ভালো মানুষ, আমরা তাকে ঠাকুরদা বলে ডাকি। তিনি আমাদিগকে সকল রকম সুখ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত। দুপুর বেলায়—ঘণ্টা দুই সেলের দুয়ার খুলে দিতেন, আমরা পরস্পর আলাপ করতাম। এক দিন জিজ্ঞাসিলাম—ঠাকুরদা, এ ভাবে ত তোমার চাকরী থাকবে না। তিনি বল্লেন,—নেহাৎ যাবে যাক, আর কত কাল বা বাঁচবো, তবু তোমাদের যা পারি একটু সেবা করে যাই। আহা, এমন কচি-কচি ছেলে সব!

বেশ কাট্‌তে লাগলো দিন। ৪টার পর আধ ঘণ্টার জন্য আমরা বেড়াতে পাই সেই পলিটিকেল কম্পাউণ্ডের ভিতরে, তখন যা আলাপ-পরিচয় হয়। ফণী সুকণ্ঠ গায়ক, তার শ্যামা-সঙ্গীতগুলি যেমন মধুর তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। "ও মা ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি" গানটি এখনও যেন বুকে গাঁথা আছে। পরেশ গায় স্বদেশী গান, রবি ঠাকুরের গান, কাব্যবিশারদের গান। নগেন বৈষ্ণব, তার কীর্ত্তন গান, নিরাপদ ১৭ বৎসরের বালক ব্যঙ্গ গান গায়, যেমন তার মিষ্টি চেহারাটি, তেমনি তার ফষ্টিনষ্টি আলাপ, বড় ভালো লাগে। কিরণের হাতে-পায়ে খোঁড়া, কিন্তু অদম্য তেজস্বী, আঠারো বৎসরের বালক, সেও কালীভক্ত, পরমহংসদেবের অকপট ভক্ত। তার, "বালির শয্যায় কালী নাম দিও কর্ণমূলে" গানটি কোনও দিন ভুলবো না। সত্যও বিশ বৎসরের বালক মাত্র, কৃষ্ণবর্ণ, পালোয়ানের মত চেহারা, অমিত তেজস্বী। কার্ত্তিকও অমিত বিক্রমী, নির্ভয়, দেশসেবায় সর্ব্বত্যাগী, কালীভক্ত, তার চণ্ডী-স্তোত্রগুলি প্রাণে শিহরণ জাগায়। তার ডাকাতির গল্পগুলি রূপকথার মতন শুনতাম। বাঙ্গা ডাকাতি করে তারা ১৫ জন ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ২৬ দিন হাঁটা-পথে ঢাকা থেকে কলিকাতায় এসেছিল। ১৫ জন ১৫ পথে, রাত্রে থাকিত জঙ্গলে। খেত চিড়া-গুড়, কোনও দিন বা ভিক্ষার ভাত। দুঃখ হোত নগেন ধরণীর জন্য। তারা নিরপরাধ। নগেনের ছিল একটি কবিরাজি দোকান, উল্লাসকর দত্ত তার ঘরে রেখে যান একটা বাক্স, তার মধ্যে ছিল বোমা। পুলিশ তাই ধরে। নগেনের ছোট-ভাই ধরণী ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ভাই-এর বাসায় থেকে পড়তো। তাতে হয় তাদের দশ বছর জেল। নগেন সংস্কৃত পণ্ডিত, ইংরাজী লেখা-পড়া জানে না। তাদের বৃদ্ধ বাপ-মা'র অন্নাভাব, বড় কষ্ট। নগেন ধরণী রাজনীতির আলোচনা কোনও দিনই করে নাই। মানিকতলা বম্ কেসের মীমাংসার আগেই তাদের হয় ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

ওয়ার্ডাররা দশরথ সিং-এর আইন অমান্যের কথা উপরওয়ালার কাছে লাগালেন। দশরথ বদলী হলেন। সেখানে আসিল তিন বেল্লার জমাদার রামস্বরূপ; তার উপর আবার—চার বেল্লার বড় জমাদার দেওকীনন্দন। দুই জনেরই অসুরের মতন মূর্ত্তি। বড়-বড় গোঁফ, গালপাট্টা। বাৎ-চিৎ মাৎ করো গে, ঠাণ্ডা কর দেগা, বদমাইসি মাৎ করো গে। এই সত্য, তু বহুৎ বদমাইস—ইত্যাদি তাদের ভাষা! ফণী গান করতে গেলে বলে, চোপ রও সয়তান! ছেলের দল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। দিনের বেলায় পায়খানায় যেতে হলে ৪ জন ওয়ার্ডার সাথে থেকে পায়খানা নিয়ে যেতো। ওয়ার্ডারদের ডাকতে হতো, বাবুসা'ব বলে। খোকা নিরাপদ এক দিন ডাকলো, এই দারোয়ান, ঝাড়া ফিরনে হোগা। ওয়ার্ডাররা সব ক্ষেপে গেলো। রামস্বরূপ হাত উঁচু করে তাড়িয়ে এলো। নিরাপদ বলে, তোমাদের মতন দারোয়ান আমাদের বাড়ীতে আছে। তখন সবাই বলতে লাগ্‌লো দারোনজি। অশান্তি বাড়্‌তে লাগলো। খোঁড়া কিরণ দেওকীনন্দনের গোঁফের বাহার দেখে এক দিন বলে, গোঁফ্‌রাজ। দেওকীনন্দন রেগে আগুন। হারামজাদ বলে গালি দিয়ে উঠ্‌লো। তখন আমরা চারি জন চৌবাচ্চার জলে স্নান কচ্ছিলাম, এই ছিল দস্তুর। কার্ত্তিকও ছিল সেখানে। সে তখন দেওকীনন্দনের এক ধারের গোঁফগুচ্ছ ধরে বল্লে, গোসা কাহে হোতা গোঁফরাজ! রামস্বরূপও তেড়ে আস্‌লো। কার্ত্তিক হাসিমুখে দু'-হাতে দু'জনের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতেই রামস্বরূপ পড়ে গেলো। নালিস রুজু হলো। সুপার সাহেব এলেন, কার্ত্তিক বলিল, এতগুলো শেয়াল-কুকুর আমাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছ, তাড়া দিতে গিয়ে কোন্‌টা কবে খুন হয় বলা যায় না। সাহেব বলে, তোমাদের বেত মেরে শাসন করবো। বেত? whip? তাতে রক্ত পড়বে? blood shed? তাই ত সাহেব, অনেক দিন রক্ত দেখি না। রক্ত দেখবে? এই বলে ডান হাতের নখ দিয়ে বাম বাহুর ৪ ইঞ্চ লম্বা চামড়া ছিঁড়ে ফেলে হাতটায় ঝাড়া দিলে। সাহেবের কাপড়ে মুখে ছিট্‌কে গেলো। গ্রিফেন সাহেব আইরিস, মোটের উপর ভদ্রলোক। তখনই ডাক্তারকে বল্লেন, কার্ত্তিকের হাত আইডিন দিয়ে বেঁধে দিতে। আর হুকুম করে গেলেন ওয়ার্ডারদের উপর, তারা যেন বন্দীদের সঙ্গে কোনও বাজে কথা না বলে।

দেওকীনন্দন ঠাণ্ডা হোলো, কিন্তু রামস্বরূপের দাপ পড়ে না। সত্য নাম রাখলো রামদাস, নিরাপদ বলে পবননন্দন। সকাল-সন্ধ্যায় খানাতল্লাসী করতে আসে। কিরণ খোঁড়া পায়ে নেচে-নেচে গায়—"ও ভাই লজ্জার কথা কও তুমি, সীতা বন্দ জনমদুখিনী।"

জেলার ছিলেন লোকনাথ তেওয়ারী। কালো বেঁটে ছোট লোকটি। মাথায় একটা টুপি। নিরাপদ নাম রাখিল কালীর বোতল। তিনি হুকুম জানালেন, জেলার বা সুপার এলে সেলাম জানাতে হবে। সেলাম কেউ করে না; তার দণ্ড হলো—পাঁচ দিন রেমিশন কাটা। নিরাপদ এক দিন সেলাম জানালো, "সেলাম ভাই কালীর বোতল।" জেলার ঠিক বুঝিল না, কিন্তু একটা কিছু গালাগালি ভাবিল। আমার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসিল—What do you mean by কালীর বোতল? আমি ইন্দিরা বই-এর কালীর বোতলের গল্পটা বুঝাইয়া দিলাম।

অশান্তি চলিতেই লাগিল। সকলে ঠিক করিল, অবিরাম পায়খানায় যেতে হবে। এক জন আসে আর এক জন যায়। ওয়ার্ডাররা অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রে সেলের ভিতরেই টুকরি পাতা, জল দিতে হবে ওয়ার্ডারদের। সকল রাত ভরে "পানি পাড়ে দরোয়ানজি" চল্‌তে লাগলো। সত্য কিন্তু আজ দু'দিন ধরে পায়খানায়ই যায় না তার উপর সবার রাগ হচ্ছিল। সকালে ৯টায় সুপার সাহেব আস্‌বার কালে একটা ঘণ্টি পড়ে। যেমন ঘণ্টি পড়া, অমনি সত্য ডাকে, ঝাড়া ফিরনে হোগা। রামস্বরূপ ধমক দিয়া বলে, আভি নেই হোগা, সাহেব আতেহেঁ। বাস্। সত্য তার জাঙ্গিয়াটি খুলে রেখে সেলের দরজার গোড়ায় তার দু'দিনের সঞ্চিত মল ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে—একটা হিংস্র কোনও জানোয়ারের মতই। দরজা খোলা মাত্র সাহেব শিউরে উঠে ছটকে গেলেন। What is that? সেই সাড়ে ৪ হাত লম্বা ঘোর কৃষ্ণমূর্ত্তি সত্যচরণ সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহে হাত কপালে তুলে সেলাম করিল সাহেবকে! মাথা বিগড়েছে বলে সাহেব সরে যায়, সত্য আরও এগিয়ে যায়—hear me sir; hear me; সত্য স্বচ্ছন্দে বুঝাইয়া বলিল, বড় বাহ্যের বেগ হয়েছিল, হাজার ডাকলেও সাড়া দেয় না—কি করি সাহেব। তখনই তার শৌচের ব্যবস্থা হইল, মেথর ডেকে মল সাপাই হলো। অর্ডারবুকে, এগারো জনের টাকা টাকা ফাইন, আর-জমাদার রামস্বরূপের দু' টাকা। "এচ্ছা নেহি হুয়া" অনেক বার বলিল, সাহেব কোনও কথা শুনিল না।

রামস্বরূপ কেঁদে ভাসাইল। তার চাকরী খারাপ হলো। সে ২২ বছর চাকরী কচ্ছে, তার বড় জমাদার হবার কথা, আরও পেন্‌সনের সময় নিকট। সেই থেকে রামস্বরূপ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সুপার সাহেব সত্যই ভালো মানুষ। আমি সবার উপরে বয়স্ক, সাহেব আমায় কিছু খাতির করিতেন। আমি পর সপ্তাহে সাহেবকে বললাম,—সাহেব, ওয়ার্ডারদের মাপ করুন। নেহাৎ ভুল করে ফেলেছে। নেহাৎ বোকা, এ সব রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে আঁটতে পারে না। সাহেব আমার সুপারিশে সে জরিমানা মাপ করে দিলেন। রামস্বরূপ আমায় সেলাম জানিয়ে বলে, ২২ বরিষ নক্‌রী কিয়া, এচ্ছা কয়দী কভি নহি দেখা।

সেই দিন থেকে হুকুম হলো, বাইরের পায়খানায় কারু যেতে হবে না। সেলে এক কুঁজা জল থাক্‌বে, টুকরি থাকবে। মেথর থাক্‌বে, ডাক্‌বা মাত্র সাপাই করে নেবে। তবু এই উপলক্ষে দিনে দু'-এক বার বাইরের মুখটা দেখতে পেতাম। তা বন্ধ হয়ে গেলো। তবু সত্য ভাইয়ের বীরত্ব-কথা সকলেরই মুখে।

ক্রমে আরম্ভ হলো আরও কড়াকড়ি। সকালে লপসির পরিবর্ত্তে দেওয়া হতে লাগলো ৩টা করে মিঠা আলুসিদ্ধ। একটা বাল্‌তিতে করে নিয়ে আস্‌তো এক জন বাবুর্চি, সঙ্গে থাক্‌তো রামস্বরূপ, দেওকী-নন্দন, আরও ১১ জন সেপাই। সত্য এক দিন বাল্‌তি ধরেই কেড়ে নিলে। তেড়ে এলো দেওকীনন্দনের দল। গম পেশার ঢিপিতে পোঁতা থাক্‌তো একটা লোহার ডাণ্ডা, তা দশ জনে টেনেও তুলতে পারে না। সত্য তখন এক টানেই ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। দেওকীনন্দনের দল ছুটে পালিয়ে পাগলা-ঘণ্টি দেয়। হাতিয়ারবন্দী হয়ে ছুটে আসে, সুপার জেলার সকলেই। এসে দেখে, সত্য ঠিক ভীমের মতন বক-রাক্ষসের খাবার খাচ্ছে, আলু-ভরা বাল্‌তি সাম্‌নে রেখে। বাঁ হাতে তার লোহার এক হাত লম্বা ডাণ্ডা ধরা। সাহেব কাছে আস্‌তেই সত্য ডাণ্ডা তাঁর হাতে দিয়ে আলু খেতে থাকে। ৪৮টি আলুর ৪০টিই তখন খাওয়া হয়ে গেছে। সত্য বলে—দেখো সাহেব, ৩টা করে মিঠা আলু দাও, খেয়ে লোভ যায় না, তাই ত কেড়ে খেলুম। সাহেব বলে—তুমি ও-ডাণ্ডাটা তুল্লে কি করে? সত্য বলে—১৫টা কুকুর তাড়াতে একটা কিছু লাঠি ছাড়া লাগে বৈ কি? তাই ডাণ্ডাটা টান্ দিলুম উঠে গেলো। তবে ওদের উপর এটার ব্যবহার করতুম না। কোত্তা দেখলেই ত কুকুর পালায় কি না?

"এতগুলো আলু তুমি খেলে?"

"ভাল লেগেছে, পেটেও খিদে ছিল, তাই খেলুম।"

"কটা করে দিলে হয় বলো ত?"

"নেহাৎ পক্ষে ১২টা হলে জলখাবার মত হয়।"

সুপার সাহেব সেই দিন থেকে আটটা বরাদ্দ করে গেলেন। কিন্তু সকলে আটটাও খেতে পায় না, খেতো—সত্য, কার্ত্তিক আর বত্তিনাথ। সেই দিন থেকে গম-পেশা উঠে গেলো। ধাঁতার লোহার ডাণ্ডা পুঁতে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে সাহেব গম-পেশার ঢিপি তোলার হুকুম করে গেলেন। আসল কথা, সত্য ডাণ্ডাটা এক টানে তুলতে পারে নাই। সমস্ত রাত্রি সে ঐটা নেড়ে নেড়ে তুলে রেখেছিল। ওয়ার্ডারগুলিকে ভয় ধরিয়ে দেবার জন্তই তার এই কাণ্ড। সত্যের নাম হলো—"হিরো দি ব্লাক।" নামকরণ করে কিরণ। এক ছোকরা মুসলমান ছিল ডাক্তার। সে রোজ আসতো খোঁজ নিতে। আমার বেশ টনসিল বেড়েছিল, তাকে বলতে সে বললে হাঁ কর তো। যেমন হাঁ করেছি, অমনি সে তার বাঁ হাতখানা আমার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছে। অগত্যা আমিও তখন তার মুখে বাঁ হাতে একটা চাপড় কষে দিতে বাধ্য হই। তার নালিশে সুপার সাহেব এলেন। আমি বললুম, যে জানোয়ার মানুষের মুখের ভিতর বাঁ হাত ঢোকাতে যায় টনসিল পরীক্ষা করতে, তাকে চড় মারতে আমায় হাতখানা অজান্তে উঠেই পড়েছে। আমার ৩ দিন রেমিশন কাটা গেলো। মুসলমান ডাক্তার বদলি হলো। এক জন বাঙ্গালী ডাক্তার এলেন। তিনি খবরের কাগজের টুক্‌রায় মোড়ক করে আমাদের ওষুধ দিতেন। লেখা থাক্‌তো, read। ওষুধের প্রয়োজনে নয়, বাজে কিছু পাউডার, সোডাই প্রায়। টুকরাগুলি জুড়ে নিয়ে আমরা পেতাম বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক খবর। যেদিন জরুরী খবর থাকতো, সেই দিন ওষুধ আসতো বেশী। এ ছাড়া বাইরের খবর জান্‌বার আমাদের কোনও উপায়ই ছিল না।

তার পর কাজ দেওয়া হতে লাগলো। ছোবড়ার দড়ি পাকানো, কোর্ত্তা-জাঙ্গিয়া সেলাই, জড়ানো সুতো গুছিয়ে রাখা। তাতে সরকারের লাভের চেয়ে লোকসানের ভাগই হতো বেশী। মাস তিনেক পরে কি করেই কামজারি উঠে গেলো। দিনরাত্রি শোয়া-বসা বা যার বই থাকে তার পড়া। জেল থেকে কোনও বই-কাগজ দেওয়া হতো না। তাতেই হতে লাগলো বেশী কষ্ট, যারা বৈষ্ণব তারা অবিরাম বলতো "হরিবোল, হরিবোল।" কার্ত্তিক তাদের ব্যঙ্গ করতো। আরম্ভ হলো ঘাটা খাওয়া। মকাই বা ভুট্টা সিদ্ধ করে তৈরী হতো ঘাটা, তার সঙ্গে ডাল। বেহারী খাদ্য। দুপুর বেলাই তাই, আর সন্ধ্যা বেলায় ভাত বা রুটি। ঘাটা খেয়ে সবারই হয় আমাশয়। নগেন, ধরণী, আর আমি ঘাটা খাই নাই। দুপুরে মাত্র ডালটুকু খেতাম, আমাদের অসুখ কিছু হয় নাই। সিরাজি সাহেব আর শিশির একেবারেই মরণাপন্ন হলেন। চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্তই ছিল না। শুশ্রূষার তো কথাই নাই। পাথরের মেঝের ওপর ঘোড়ার কম্বল-শয্যা। বালিশও কম্বল জড়িয়ে। ২ হাত লম্বা দেড় হাত আড়ে গামছাখানা চাদর, নইলে কম্বলের তীক্ষ্ণ লোম গায়ে বেঁধে। রাত্রিতে আলোর কোনও ব্যবস্থাই নাই সেলে। তারই মধ্যে রোগী থাকবে অসহায় একাকী। আমরা জিদ করলাম, রোগীকে একলা থাকতে আমরা দিবই না। রাত্রি বেলায় ওয়ার্ডারদেরও বন্দীর সেলে প্রবেশের অধিকার নাই। বিকাল ৪টায় আমাদিগকে বেড়াতে খুলে দেয়। সেই সময়ে আমরা ঢুকলাম শিশির ও সিরাজির ঘরে। সত্যই নেতা,—দ্বারে দাঁড়িয়ে বললে, আমরা আমাদের রোগী-ভাইদের শুশ্রূষা করবো। মরণ পর্য্যন্ত পণ। জেলার আসলো, ঐ একই কথা। ডাক্তার এসে বলে, আমরা অন্য লোক রেখে দিচ্ছি। সত্য, নিরাপদ, ফণী, কার্ত্তিকের অটল প্রতিজ্ঞা। সুপার এসে মীমাংসা করলেন। দু'জন করে রোগীর ঘরে থাকতে পারবে। দু'জন রোগীকে দু'টি ছোট চাদরেরও ব্যবস্থা হইল।

সিরাজি বাঁচলেন এবং খালাস পেয়ে চলে গেলেন। শিশিরকে ধরল যক্ষ্মায়। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন সকাল ৮ টার সময়ে আমাকে ও পরেশকে বাইরে নিয়ে বলা হয়, তোমাদের খালাসের হুকুম হয়েছে। আমার তখন ৪ বছরের এক বছর দশ মাস হয়েছে, পরেশের হয়েছে সাত বছরের ৩ বছর মাত্র। সুপার আদেশ দিলেন, আমাদিগকে সাড়ে ৫টা করিয়া দু'জনকে ১১টা টাকা ও এক জোড়া জুতা, কাপড়-জামা দিয়া গেটের বার করে দিতে। জেলার একখানা আট হাত ধুতি, ৪ হাত একটা চাদর, একখানা ছেঁড়া কম্বল দিয়া গেট খুলে দিল। টাকা দিল না। আমরা বাইরে গিয়ে বসে থাকলাম। সুপার ফিরে এসে বলেন, তোমরা বসে কেন? আমরা বললাম, টাকা পাই নাই। তখনই জেলারকে ডেকে সুপার খুব গাল দিলেন। জেলার অগত্যা টাকা দিল, জুতা দিল না। আমাকে তখনও ঠিক কয়েদীর মতনই অসম্ভ্রমে কথা বললে। আমিও বললুম, "ভদ্র ভাবে কথা বলতে শেখো লোকনাথ। আর মনে রেখো, এই বিশ জনের মধ্যে আমি এক জন বাইরে যাচ্ছি, মাসের মধ্যেই খবর পাবে।" বেহারী দু'টি ওয়ার্ডার এসে বলে, আমাদের বক্‌শিস্ দিয়ে যাও।

জেল থেকে সহর দু'মাইলের বেশী দূরে। সহর থেকে আবার ষ্টেশন ৪২ মাইল দূর। উটের গাড়ি অথবা মানুষে-টানা পুষ্‌পুষ্‌ গাড়ি মাত্র যান। তাতে করেই সহরে যাই। ডিসেম্বর মাস, দারুণ শীত, ভীষণ কন্‌কনে হাওয়া। সহরে এক উকিল বাবুর বাড়ীতে রাজার অভিষেক উৎসবের আয়োজন, পত্র-পল্লবে সাজানো বাড়ীতে পতাকা উড়ছে। রাজা জর্জের অভিষেক উৎসব। সেই বার রাজধানী কলিকাতা থেকে উঠে গিয়ে বসলো দিল্লীতে, আর বঙ্গ-ভঙ্গ বন্ধ হয়ে গেলো রাজার শুভাগমনে। খবর পেলাম বাইরে গিয়ে।

আমরা সে বাড়ীতে ঢুকতেই গৃহস্থ আমাদিগকে সমাদরেই তাড়াইয়া দিলেন নেহাৎ অস্পৃশ্য হরিজনের মত। জেল-ফেরতা রাজনৈতিক চোরকে যায়গা দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু দু'টি কিশোর ছেলে আমাদের ডেকে নিয়ে বসালে একটি দোকানে। দুঃখের কথা, তাদের নাম ভুলে গেছি। সেখানে তারা আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। আমরা দু'জনে দু'টি ছিটের জামা ও দু'জোড়া দড়ির সোলের কাপড়ের জুতা কিনলাম। তাতে সেই ১১টি টাকা খরচ হয়ে গেলো। ঐ দু'টি ছেলে আমাদের উটের গাড়ি ভাড়া করে দিলেন এবং ১০টি টাকাও ধার দিলেন—ফেরত না নিবার ইচ্ছায়।

কলিকাতায় এসে আমি আমার জেল-বিবরণ দিয়া আসলাম 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে। তাঁহার দেবী-স্বরূপিণী পত্নী ৺ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা আমাদের দু'টিকে স্বহস্তে রান্না করে খাইয়ে যে বিশুদ্ধ সন্তান-সেবার আনন্দ পেলেন সে চিত্রটি বুক থেকে মুছবার নয়। আমরা খেতে খেতে যখন ঘাটার গল্প করলাম, তখন তাঁহার চোখের মুক্তাধারার কথা কি জীবনে ভুলিব?

স্যর সুরেন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী'র প্রবন্ধ অনুবাদ করে 'বেঙ্গলী'তে প্রকাশ করেন। সসম্ভ্রমে স্বীকার করব, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখবার চেষ্টা করতেন। চোরাকারবারী, ঘুষখোরীর ক্ষমা ছিল না। তখনই হাজারিবাগের জেলে গিয়েছিল তদন্ত কমিশন। হাতে-হাতেই ধরা পড়েছিল ঘাটা, পোকা-মিশানো শাক, কাঁকর-ভরা ভাত, ভূষির রুটি, আর রোগীদের অসহায় অবস্থা। তখন পাঁচ জন ছিল ডিসেন্‌ট্রি রোগী, আর দু'জন টি, বি। পরে শুনেছি ফণীর কাছে সেই তদন্তের বিবরণ। জেলারের হয়েছিল জরিমানার সঙ্গে ডিগ্রেট, সমস্ত ষ্টাফই হয়েছিল বদলি—সমেত গ্রিফেন সাহেব সুপার। ঘাটা উঠে গেলো, বন্দীদের দিনের বেলায় সেল-বন্দীও উঠে গেলো।

তার পর শহীদ যতীন্দ্রনাথের প্রাণদানের পর, সখের জেলও খেটেছি ৬ মাস—ত্রিশ সালে।

আমার বড় কাতর আহ্বান—আমার সেই কালের জেল-সহযাত্রী যদি কেউ থাকেন, তবে ঠিকানা জানতে পেলে একবার দেখা করতে অতি উৎসুক—অতি প্রিয়জন সম্ভাষণের আনন্দে।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'[illegible]' বলিতেছেন :—"গোলমালের আশঙ্কা করিয়া জেলার মফঃস্বল অঞ্চল হইতে যাহারা দলে দলে পাকিস্থান অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল এবং পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দুদের গৃহাদি, গো-মহিষাদি ও জমি-জমা বদলী সূত্রে দখল করিয়াছিল, তাহারা আবার দলে দলেই বদলী করা বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ফিরিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে প্রত্যহই নিত্য-নূতন প্রশ্ন দেখা দিতেছে। বদলীনামা সাধারণতঃ আইন অনুযায়ী বদলীনামা হয় নাই কারণ তখন তাহা হইবার কোন উপায় ছিল না। পক্ষগণ নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা অনুসারেই এইরূপ দলিলাদি করিয়াছিল। এই সকল অভাগাদের অবস্থা কি হইবে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে ধীর ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। অবশেষে ইহাদের একূল-ওকূল দুই-ই হারাইতে না হয়। অবস্থা দেখিয়া আমরা ঐরূপই আশঙ্কা করিতেছি। এই সকল অভাগাদের উপকারে আসিতে পারে এইরূপ কোন ব্যবস্থা কি দেশবিভাগের পর হওয়ার কোন উপায় নাই ?"

* * * *

'শিলিগুড়ি পত্রিকা'য় প্রকাশ যে :—"অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের বাজারে গুড়ের মূল্য ছিল মণ প্রতি ৩০৲ হইতে ৩৫৲ টাকা। সাম্প্রতিকতম সংবাদে প্রকাশ, গুড়ের মূল্য হ্রাস পাইয়া সরকার-নির্দ্দিষ্ট স্তরে নামিয়াছে। গত মরশুমে গুড় ও খান্দেশ্বরীর মূল্য নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কাজেই অনেক স্থলেই চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষাও চড়া দরে গুড় বিক্রয় হইয়াছে। ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন রাজ্যের গুড়ের উচ্চতম মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় খান্দেশ্বরীর মূল্যও গড়ে মণ প্রতি ৩০৲ টাকা কমিয়াছে। ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার ফলেই এই মূল্য হ্রাস সম্ভবপর হইয়াছে। মীরাটের গুড় ব্যবসায়ীরা না কি ঠিক করিয়াছেন যে, সরকার কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট উচ্চতম মূল্যেই গুড় বিক্রয় করা হইবে এবং যাহারা তদপেক্ষা বেশী মূল্য দাবী করিবে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। গুড়ের সরকার-নির্দিষ্ট মূল্য মণ-প্রতি ১৮৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা।"

* * * *

'দামোদর' সংবাদ দিতেছেন যে :—"সোনামুখী ও পাত্রসায়ের থানার ৫৪ জন কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের নিকট তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়াছেন এবং নবগঠিত কৃষক-প্রজা-মজদুর দলে যোগদানের [illegible] উক্ত দলের সংগঠন সম্পাদক শ্রীদাশরথি তা'র নিকট কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া উক্ত দলে যোগদান করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। তন্মধ্যে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসুশীলকুমার পালিত, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-চাষী সংঘের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীমোহিনীমোহন রায় এবং জেলা মহকুমা ও থানা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সদস্যগণ রহিয়াছেন। কংগ্রেস আদর্শচ্যুত হওয়ায় এবং ইহার ভিতর থাকিয়া গান্ধীজী পরিকল্পিত কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াই তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে জানাইয়াছেন।"

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' মন্তব্য করিতেছেন :—"সরকারী কৃষি বিভাগ বোরো ধান উৎপন্নের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছি। বর্ধমান জেলায় খড়ি নদীর পার্শ্ববর্ত্তী জমীগুলিতে নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া বোরো ধানের চাষ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। গত কয়েক বৎসর হইতে খড়ি নদীর স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া আরও বেশী পরিমাণ জমীতে বোরো ধান উৎপন্ন করিবার আগ্রহে বোরো বাঁধ সমবায় "সমিতি গঠন করিয়া সরকারী সাহায্যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর নতুন ভাবে জেলার তিনটি এলাকায় সরকারী পরিচালনায় বোরো ধান উৎপন্নের চেষ্টা হইতেছে। ইহার সাহায্যে জেলায় খাদ্য-শস্য উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িবে এবং পতিত জমিগুলি উদ্ধার হইবে।"

* * * *

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' বলিতেছেন—"মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা ও সদর মহকুমার অংশবিশেষ ধান্য ও চাউল সংগ্রহ বিভাগ বর্ত্তমানে কর্ডনড্ করিয়া দিয়াছেন। বহরমপুর সহরের মিউনিসিপ্যাল এলাকার সবটুকুই কর্ডনড্ এলাকার সামিল না করিয়া রেল লাইন বরাবর কর্ডন লাইন পরিকল্পিত করার ফলে কাশীমবাজার ওয়ার্ডের বেশীর ভাগ বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। এই কর্ডন লাইন সরাইয়া আরও দূরে দিবার জন্য কাশীমবাজার ও মণীন্দ্রনগর উদ্বাস্তু উপনিবেশের অধিবাসিবৃন্দ এ যাবৎ বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন, সভা-সমিতি করিয়া প্রস্তাবও অনেক গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হয় নাই। কর্ডন যথারীতি রেল লাইনেই থাকিয়া গিয়াছে। কর্ডন [illegible] সীমান্ত হইতে যে ভাবে টানা হইয়াছে, তাহাতে

চাউল উৎপাদনকারী কয়েকটি বড় থানা বাদ পড়িয়াছে এবং তাহা যে ভাবে শক্তিপুরের নিকটে আনা হইয়াছে, ধরিতে গেলে গঙ্গার অপর পারে একটি মেঠো রাস্তার এধার-ওধারের মধ্যে তাহাতে পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। যাহার ফলে সাধারণ লোকের জমির চাল-ধান আনিতে যেমন নানাবিধ আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, চোরাকারবারীদেরও তেমনি আইনকে ফাঁকি দিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কর্ডন লাইন মেঠো পথের অপর পার্শ্ব হইতে কোনও প্রকারে এই দিকে কিছু চাল পাচার করিতে পারিলেই মণ-করা পাঁচ টাকা মুনাফা আসে, ইহা উক্ত অঞ্চলের বালকেও জানে। কাজেই শক্তিপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলে ছোট-বড় চোরাকারবারীদের একটি ঘাঁটি থাকিয়াই গিয়াছে।

* * * *

'আসানসোল হিতৈষীর' সর্ব্বজন-সমর্থনযোগ্য মন্তব্য :—"এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটের, সমাজ-সেবা বিভাগের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা পূজাবকাশে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে শুধু ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক ইহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেই কৃতকার্য্য হইবেন না, আমরা আসানসোল কলেজের ছাত্রবৃন্দ তথা ছাত্র-সংহতির সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানাইতেছি যে, আগামী গ্রীষ্মাবকাশে যাহাতে বিভিন্ন দল বিভিন্ন গ্রামে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া গ্রামগুলির কৃষক, মজদুর সম্প্রদায় লইয়া উক্ত কেন্দ্রগুলি যাহাতে ভাল ভাবে চলে, সে দিকে মনোযোগ দিয়া শুধু জনসাধারণের প্রশংসাই হইবেন না, বরং সমাজসেবা কাজও করিবেন বলিয়াই আশা রাখি।"

* * * *

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' বলিতেছেন :—"কুক্ষণেই ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের ভারত বা পাকিস্থানে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচনের সুযোগ দিয়াছিলেন। ফলে পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দু কর্ম্মচারী শূন্য হওয়ায় সংখ্যালঘু হিন্দুর নিরাপত্তা ব্যাহত হইয়াছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কর্ম্মচারী-সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়িয়াছে! শাসনের ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করা গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। গভর্ণমেণ্টের আর একটি নীতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা-জনক হইয়াছে। সকল বিভাগই উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কোনও কর্ম্মখালি হইলে উদ্বাস্তুদের দাবী অগ্রে গ্রাহ্য হইবে। আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ও উপযুক্ত যুবকের দাবী অগ্রাহ্য করার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? তাহারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এই জন্যই কি তাহারা নিজের দেশে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে বঞ্চিত থাকিবে? কোন্ অপরাধে তাহাদিগকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইতে হইবে? সরকারী চাকুরীতে কার্য্যদক্ষতাই একমাত্র যোগ্যতা বিবেচিত হওয়া উচিত।"

বাঁকুড়ার 'প্রচারে' প্রকাশ :—"রাষ্ট্রে খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য বোম্বাই সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ আইন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বার আনা সের দরে গোয়ালা বা গোয়ালিনীর দুগ্ধ কিনিয়া কত পারসেণ্ট দুধ আছে তাহা গৃহস্থের গবেষণার বিষয়-বস্তু হইয়াছে—ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া বাঁকুড়া জেলার জনসাধারণের পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, ফলে পাকস্থলীর রোগ ঘরোয়া হইয়া পড়িয়াছে। দালদা নামক পদার্থে বাজার ছাইয়া গিয়াছে—আটায় ভেজাল, পশুতে ভেজাল, বালিতে ভেজাল, ভেজাল হরলিক্সও বাঁকুড়ার বাজারে ভেজালের যেরূপ প্রাচুর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, আশঙ্কা হয়, মানুষের নশ্বর দেহখানাই আগোনে ভেজাল হইয়া বাজারে চালু হইবে। এইরূপ ভেজাল-বিদ্যাবিশারদগণকে উচ্চতম শাস্তি বিধান করিতে না পারিলে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিকে একটু নজর দিলে ভাল হয় না কি?"

* * *

'বর্ধমানের কথা' সমবায় সম্মেলন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"রাষ্ট্রের কর্ণধার মাননীয় মন্ত্রিগণ, জেলার এবং প্রদেশের কংগ্রেসনেতাগণ এবং সমবায়-কর্মিগণ সম্মেলনে সমবায়ের বিভিন্ন গতি ও রূপ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে কার্যকরী করার জন্য পথনির্দেশ দিয়াছেন। এক কথায় উদ্যোগ-আয়োজনের কোন অভাবই হয় নাই। কিন্তু সমবায় প্রসারের জন্য যে মনোবল লইয়া কর্মীদের আজ কাজে লাগিতে হইবে এবং ইহার সাফল্যের জন্য কর্মীদের যেরূপ ধৈর্য্য ও ত্যাগের প্রয়োজন হইবে, সেইরূপ দৃঢ়চেতা নিষ্ঠাবান কর্মী সংগ্রহের পক্ষে ইহা কতখানি সহায়ক হইল তাহাই একমাত্র বিবেচনার বিষয়। কারণ অনুরূপ কর্মীর উপরই সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করিতেছে। দিকে দিকে আজ দল গঠনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য চিন্তিত নেতা ও কর্মীর আজ অভাব নাই। কিন্তু এইরূপ নেতা ও কর্মীর প্রাচুর্য্য যত দেখা যাইতেছে দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা ততই বাড়িতেছে।"

* * *

'বীরভূমবাসী' বলিতেছেন,—"বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানায় বৃষ্টি না হওয়ায় একেবারে ধান হয় নাই। ইহা ছাড়া নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া ইলামবাজার, দুবরাজপুর প্রভৃতি থানায় ধান অধিকাংশ জলাভাবে মরিয়া গিয়াছে। ফলে জেলায় অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। সিউড়ী বাজারে বর্ত্তমান সপ্তাহে চাউলের মণ ২২৲ হইতে ২৫৲ টাকা, খুচরা দর বিক্রয়ের দর আরও বেশী। রামপুরহাট সহরে এবং ময়ূরেশ্বর থানায় চাউলের খুচরা দর ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকায় উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রে বিভিন্ন জেলার চাউলের উচ্চ মূল্যের সংবাদ পাইয়া দোকানদার ও ব্যবসায়িগণ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চাউলের দাম বাড়াইয়া দিয়াছে। বীরভূম জেলা প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ মণ চাউল সরবরাহ করিতেছে; ইহা উদ্বৃত্ত জেলা। এ, আর, সি, পি, বিভাগ কোন চাষীর ঘরই ধান মজুত রাখিতে দেন নাই, সীল করিয়া লইয়াছেন। এ অবস্থায় জেলার ফসল জলাভাবে নষ্ট হওয়ায় যাহারা চাউল খরিদ করিয়া খায়, সেইরূপ শ্রমিক মধ্যবিত্ত এবং সহরের বাসিন্দাদের খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এ বৎসর যে সব এলাকায় ধান হইয়াছে সে সব এলাকা হইতে চাউল সীল করিয়া বাহিরে না পাঠাইয়া সর্ব্বাগ্রে জেলার লোকের এক বৎসরের মত খাদ্য মজুত রাখিয়া পরে যেন উদ্বৃত্ত ধান-চাউল জেলার বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা সরকার করেন।"

উইলিয়াম ফক্‌নর

(এই বৎসরে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন)

১৯৪৯ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারটা এ বছরে মার্কিণী সাহিত্যিক উইলিয়াম ফক্‌নরকে দেওয়া হয়েছে।

১৯১৮ সালে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে অতলান্ত-পারের দেশ থেকে বেড়িয়ে। ফক্‌নর ফিরে এলেন তাঁর নিজের দেশ মিসিসিপিতে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষত দুনিয়ার সমস্ত ব্যথাটা যেন তাঁর বুকে অনেক দিনের পুরোনো সর্দির মতো জমে রইলো। ভাবনা জাগলো। তরংগিত ভাবনার ঢেউ। বালক-কালে দেখা স্মৃতি-ভেজা দিনগুলোকে টেনে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে দিলেন সদ্য যুদ্ধ-উত্তীর্ণ দিনগুলোর পাশে। কী ছিলো আর কী হলো। আদিম আরণ্যক যুগের দিকে আরও এগিয়ে গেলেন; তখন কী ছিলো, মধ্যে কী হলো, আর আজ তার কী পরিণতি। ফক্‌নার গোড়া ধরে টান্ দিলেন। মিসিসিপি বা তার ধার-কাছের দেশের প্রাচীন কথার, আদিম চেতনার থেকে সুরু করে একেবার আধুনিক যুগের চিন্তা-ভাবনা, উঠতি-পড়তির একটা ছবি এঁকে ফেল্লেন ফক্‌নর উপন্যাসের মধ্যে। বিরাট তার ক্যানভাস্, আশ্চর্য তার টান-টোন, নিখুঁত তার দ্যোতনা বাণীতে ও বক্তব্যে। যুগে যুগে এক-একটা পরিবারের বংশের কেমন করে কতোখানি পরিমাণে চেহারা যাচ্ছে বদ্‌লে, নতুনতরো চেতনার জোয়ারে কেমন করে তার মনের তটরেখা ভেংগে যাচ্ছে এক পারে আর গড়ে উঠছে অন্য পারে আঘাতে-সংঘাতে, ফকনরের উপন্যাসে লেখা হয়ে রইলো তারই অনুপূর্ব ইতিবৃত্ত। বাঙালী পাঠক সেদিক থেকে সাহিত্যিক নজীর পাবেন নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। সে কথা পরে। ফক্‌নরের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় এই যে জীবনের কথা-চিত্র এতে তীব্র ও প্রগাঢ় সাংস্কৃতিক মানসের সমস্যাগুলোর আশ্চর্য জীবন্ত ইংগিত করা হয়েছে। কম্‌পসন্-পরিবার, ইয়োক্‌নাপাটোয়াফা কাউন্টি ও সেখানকার জন-জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য। এই প্রসংগে আমি একটি ইংরাজী উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্যকে প্রশস্ত ও সহজ করি। উদ্ধৃতি ফক্‌নরের সাহিত্য-কীর্তির মূল কথাকেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে: He related even his minor personages with one another, he elaborated their genealogy from generation to generation, he gave them a country-side; a deep land of Baptists, of brothels, of attic secrets, of swamps and shadows, 'Jefferson', Mississippi, is the capital of this world which reaches backward in time to the origins of southern culture and forward to the Norrid prophecis of its extinction and which ranges down in social strata from dying landed aristocracy, the sartories and Compson families, to the new commercial oligarchy of the snopses. ফক্‌নরের উপন্যাসের। সবগুলিতে পতনবিদার আর অভ্যুদয়ের এই যে বিরাট কাহিনী আলাদা-আলাদা ভাবে বলা হয়েছে অথচ তারা পরস্পর অদৃশ্য সমাদর্শসূত্রে গ্রথিত, একে তুলনা দেওয়া চলে একই সাতমহলা বাড়ীর এক-একটি পৃথক্ দালানের সংগে। কম্‌পসন-পরিবারের আমেরিকায় পদার্পণ করার কাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত, সমস্তটা সময়ের ইতিহাস, তার গতি, বৃদ্ধি, তার এতো কালের পেরিয়ে-আসা দিনের সাফল্য-অসাফল্য, ফক্‌নর মনোরম ভাবেই বলেছেন, আন্তরিকতার সংগেও। সাহিত্যে 'লোকাল কলার' বা স্থানিক বা আঞ্চলিক চেতনা নিয়ে লেখার রেওয়াজটাকে ফক্‌নর অপূর্ব ব্যবহার করেছেন, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ফক্‌নরের কথা-চিত্র সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, Faulkner always seems consciosu of its wider application. তাই তাঁর কাহিনীতে সব সময়েই দেখা গেছে সমাজ-সংস্থানকে নিয়ে মাথা ঘামাতে। এই সমাজ-সংস্থানের জন্যেই তাঁর উপন্যাসে, কাহিনীতে এসে পড়েছে হরেক রকমের প্রশ্ন, নীতির, সভ্যতার, ধনতন্ত্রের, বণিক-সভ্যতার, মনস্তত্ত্বের, এমন কি মানুষের শৈশবকালীন চিন্তার ধারার। আর যতোই তিনি এগিয়ে আসছেন যুগ-বদলের হাওয়ার ঘোড়ায় চেপে ততোই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের রূপটা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, 'পপেই' চরিত্র থেকে তা বোঝা যায়। যন্ত্র-সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে পপেইকে যান্ত্রিক-সভ্যতাপুষ্ট যান্ত্রিক শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন ফক্‌নর, যেমন 'পপেই'র চোখ 'রবারের বলের মতো', 'মুখখানা যেনো আগুনের পাশে ভুলে-রেখে-আসা মোমের পুতুলের মুখের মতো' ইত্যাদি। তাঁর "স্যাংচুয়ারী" (১৯৩১) উপন্যাসের এই 'পপেই' চরিত্র যান্ত্রিক-সভ্যতার প্রতিভূ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ফক্‌নর একে জঘন্য করেই এঁকেছেন। এবং 'ধনতন্ত্র-বাদের যতো মন্দ গুণ থাকতে পারে এই উপন্যাসে তিনি তা স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। কোথাও সে বিশ্লেষণ নগ্ন, কোথাও বা প্রতীকী। ফক্‌নর তাঁর এই উপন্যাসকে নিতান্ত খেলো আদর্শে লেখা এবং পয়সার জন্যে লেখা বলে মন্তব্য করেছেন। এবং এতে

যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও যৌন-চেতনার প্রলেপ আছে তা পরে 'লাইট-ইন-আগষ্ট' (১৯৩২) উপন্যাসে আরও ব্যাপকতরো হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জনপদে তিনি যে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেছেন এ দু'টো উপন্যাসে তারই পরিচয়। 'লাইট-ইন-আগষ্টে'র লেখার মধ্যে নিম্নজাতীয়দের যৌন-উর্বরতার প্রসংগই টানা হয়েছে।

ফকনর তাঁর জন্মভূমির নর-নারীদের প্রতি প্রচণ্ড মমত্ববোধে আপ্লুত ছিলেন। আর সেই জন্তেই প্রতিটি উপন্যাসে গল্পে এদের কথা বলতে গিয়ে সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়েছেন, পাছে সত্যিকারের জীবন তাদের না-জানার জ্ঞানে ভুল রূপায়িত করে বসেন। তাই বার্তমানিক মার্কিণ সাহিত্যের আসরে ফকনরের লেখায় যতোখানি গভীরতা, যতোখানি স্বচ্ছ আন্তরিকতা আমরা পাই, তেমন বোধ হয় এক ড্রেইসারের লেখায় ছাড়া পাই নে। ফকনরের প্রথম উপন্যাস বেরোয় ১৯২১ সালের বসন্ত কালে, রোমান্তিক কবিমনের করুণা নিয়ে লেখা সার্তোরিস্। সার্তোরিস্-এর কাহিনীরই পর্যায়ক্রম বৃদ্ধি অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে। সার্তোরিস্-এর ছ'মাস আগে লেখা হলেও ফকনরের দ্বিতীয় উপন্যাস দি-সাউণ্ড-এণ্ড-ফিউরী বেরোয় ১৯৩০ সালে। এতে কম্পসন-পরিবারের পতনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই উপন্যাসখানি ফকনরের পরিচিতি শুধু জাহির করে না, তাঁর স্থায়ী আসনের প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাও করে সাহিত্যের জলসা-ঘরে। এ সব উপন্যাসে ফকনর নিরংকুশ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, আংগিকের ঘষা মাজার আটপৌরে গৃহিণীপণা। লাইট্-ইন্-আগষ্ট-এ যে গল্পের মধ্যে গল্প (tale within tale) বলার বিস্তৃত প্রচেষ্টা দেখি তার সূত্রপাত সাউণ্ড-এণ্ড-ফিউরী উপন্যাসে। এবং এখানেই আশ্চর্য দুর্বোধ্য মিষ্টিসিজম্ থেকে কেমন সহজে কড়া গন্ধকীর্ণ কথার জাল বুনে গেছেন। যা শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সুন্দর, সম্ভব। আর শৈশবকে বিচার করা হয়েছে from an adult frame-work of values। এই ধরণের প্রচেষ্টা এই-ই বোধ হয় প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে। সাউণ্ড-এণ্ড-ফিউরীতে, ফকনরের যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তথা সাহিত্যিক-চেতনা, ক্ষীয়মান ভৌম-আভিজাত্যের সংগে উদীয়মান বণিক-সভ্যতার মানদণ্ডের ঠোকাঠুকির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বলে নেওয়া দরকার যে, তাঁর সমস্ত উপন্যাসে যে স্থানের নাম জেফার্সন পাই, তা একান্ত কল্পিত। এবং তা তাঁর জন্মভূমিরই প্রতীক। আর উপন্যাসের চরিত্রগুলো ত' তাঁর দেশেরই অবহেলিত নর-নারী। লাইট্-ইন্-আগষ্ট তাঁর সর্ব-উত্তম উপন্যাস। ফকনরের বাস্তবতা বোধ এখানে অনেক স্বচ্ছ। সার্তোরিস্-পরিবার নিয়ে লেখা আর একখানি উপন্যাস দি-ভ্যানকুইস্‌ড বের হয় ১৯৩৮ সালে। 'এ্যাবসালোম, এ্যাবসালোম্!' উপন্যাসখানা ফকনরের আত্ম-জীবনের ছাপ বহন করে বেড়াচ্ছে। এই উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এতে ফকনর কর্ণেল স্টুপেনের মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আমি ঘৃণা করি নে, আমি ঘৃণা করি নে।' ফকনর ঘৃণা করেন না তাদের যাদের জীবন-কথা নিয়েই তাঁর সাহিত্য। এবং সম্ভবত সমস্ত মানব-সমাজ, সমগ্র সভ্যতার প্রতিও তাঁর বাণী এই-ই। সারতোরিস্ বা স্যাংচুয়ারীতে যে বিভীষিকা আছে, এখানেও তার কিছু ব্যতিক্রম নেই। যদিও অনেক জায়গায় এই উপন্যাসে খাপছাড়া অনিপুণতা আছে, তবু অনেকখানি সবল উপন্যাসের রূপ আছে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হ্যামলেট উপন্যাসে স্নোপেস জাতির সম্বন্ধে লেখা। হ্যামলেট উপন্যাস পড়লেই সহজেই চোখে পড়ে একটা উজ্জ্বল সত্য: ফকনরের প্রতিভা গল্প-লেখকের প্রতিভাই, উপন্যাসের নতুন-কেনা জুতোয় তার প্রতিভা ঠিক আঁটে না। নিগ্রো-জীবনের প্রেক্ষিতে লেখা 'গো ডাউন, মোসেস' বের হয় ১৯৪৩ সালে।

ফকনরের উপন্যাস-সমষ্টির নাম দেওয়া হয় সাগা-অব-দি-সাউথ। স্থানিক জীবন-চেতনার স্পর্শ আছে বলেই। অথচ বাহির বিশ্বের বহতা-ধারার আওতা থেকে তা নিরংকুশ মুক্ত নয়। আগেই সে-কথা বলেছি। ফকনরের প্রত্যেকখানি উপন্যাসই স্বতন্ত্র, আপনাতে আপনি মহৎ। তবু তাদের মধ্যে এক আশ্চর্য অদৃশ্য (!) যোগসূত্র রয়েছে, যে জন্যে সমালোচক বলেন: it is as if each new book was a chord or segment of a total situation always existin· in the author's mind। এই ধরণের উপন্যাস লেখার প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন বাল্জাকের দৃষ্টান্ত দেখেই। আর সাহিত্যকর্মের ব্যাপারে ফকনরের ওপর প্রভাব মাত্র কেবল বাল্জাকের নয়, ফ্লোবেয়ার, ওয়াইল্ড, জয়েস, মার্ক টোয়েন, এমন কি যৌনতত্ত্বের ব্যাপারে ডি-এচ-লরেন্সেরও প্রভাব রয়েছে। হেমিংওয়েকেও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু ফকনরের নিজস্বতা আছে নিশ্চয়। প্রধানত তা বস্তু-নির্বাচনে। কবিতার মতো ছন্দ-সুন্দর নমনীয় ভাষায় (ফকনর কবিতাও লেখেন, এবং তাঁর কবিতাই তাঁর উপন্যাসের সাহায্যে নামধন্য হওয়ার পথের আগেকার ঘটনা। এবং সে কবিতায়, কীট্‌স্, এলিয়ট, ও কামিংস্ এর প্রভাব রয়েছে।) তিনি সাহিত্যে স্থানিক মহিমার কথা ঘোষণা করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অনগ্রসর অপচয়সুলভ বিকৃতি ও বৈকল্যের জীবনকে আবেগসমৃদ্ধ কথার বাহুডোরে বেঁধে রাখলেন। ফকনরের এই যে বিশ্বব্যাপী অনুকম্পার অমৃতমুখিতা, এইটেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের একান্ত আপনার ধন। হয়ত মাঝে-মাঝে

উইলিয়াম ফকনর

অতি বীভৎসতার ভিড়, ঝোড়ো মধুযুগীতার উন্মুখর আবেগে তা হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তবু এইখানেই তাঁর জ্যোতির্ময় আভিজাত্য। কিন্তু শেষের দিকের রচনায় এই অপগুণ অনেকখানি কেটে গিয়ে বাণীরূপে সাবলীল ছিমছাম্ চেহারা ফুটে উঠেছে।

ফক্‌নরের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে আশ্চর্য যোগসূত্র থাকলেও মাঝে-মাঝে একাত্মতা বজায় নেই। নেই বলেই সবগুলো উপন্যাসকে একই উপন্যাসের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড হিসেবে ধরা চলে না। ফক্‌নরের উপন্যাসে নানা রকমের চরিত্রের সমাবেশ দেখি: উদার-হৃদয় থেকে সুরু করে অবরুদ্ধ হীন চরিত্রের শোভাযাত্রা। সাদা আর কালোর মধ্যে জাতিগত পার্থক্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই গুণগত বৈষম্য দেখা দেয়নি। কিন্তু ফক্‌নরের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে প্রচুর—অস্বাভাবিকও বটে,—খুঁত রয়ে গেছে। কেউই নিজের নিজের গণ্ডীতে সহজ, সবল, বলবীর্য্যসম্পন্ন মেরুদণ্ড নিয়ে আগন্তুক বিপদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি প্রচণ্ডতা নিয়ে। সাধ ছিল, সাধ্যও হয়ত ছিল, কিন্তু সাধনা ছিল না। তাই যতোখানি ছাপ রেখে যাওয়ার কথা তা যেনো তারা রেখে যায়নি। এ দুর্বলতা ফক্‌নরের নিজেরই। অনেক বাঙালী সাহিত্যিক জাঁ-পল্ সার্ত্রের কথা তুলেছেন যে, "গল্প বলার ভংগীতে ফক্‌নর একটি প্রচণ্ড বিপ্লব এনেছেন যা আজ ফরাসী সাহিত্যকেও প্রভাবান্বিত করে তুলেছে।" কথাটা অবিশ্বাস্য নয়; কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখায় যে চরম দুর্বলতা দেখে আঁদ্রে জিদ্-এর মতো সাহিত্যিক বলেন: "সত্যি কথা বলতে কী, ফক্‌নরের কোনো চরিত্রেরই আত্মা (soul) নেই।"—সে কথাটা কি ভেবে দেখবার নয়? ভালো-মন্দ সব চরিত্রই ফক্‌নরের নিয়তির সম্মুখে পড়ে অদ্ভুত নমনীয়তার পরিচয় দেয়। ব্যর্থ হয়ে তারা কপালে করাঘাত হানে। অবস্থা-বিপাকে পড়ে ব্যর্থ হয়েও। তাই স্নুটপেন সম্বন্ধে ফক্‌নর যে মন্তব্য করেছেন :…"Not what he wanted to do but what he just had to do, has to do it whether he wanted to or not because if he did not do it he knew that he could never live with himself for the rest of his life"—তা ফক্‌নরের আত্মকথা নয় কি। কথাটা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ফক্‌নরের প্রায় সব ক'টি চরিত্রই ছুটে গেছে সেই দিকে যে সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস, আস্থা বলতে গেলে ছিলো না কারণসংগত ভাবে। আশাহীন, দুরাশাজীর্ণ এ ছুটাছুটির সার্থকতা ফক্‌নর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেননি। একটি চরিত্র বলছে: ভগবান যে-ই হোক্ না কেন, তিনি ক্ষমা করবেন না… ইত্যাদি। টি এস-ইলিয়টের ঈশ্বর-চেতনায় যুক্তি আছে, ফক্‌নরের তা নেই। তাই আঁদ্রে জিদের কথা সত্য বলে মনে হয়। এখানে ব্রেইসারের চরিত্র অন্তর মথিত করে কেঁদে ওঠে জীবনের জন্যে, দেহের রহস্যে-বাঁধা জীবনের জন্যে। বুলওয়ার্ক উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

তবু ফক্‌নরের প্রতিভা গল্প বলায়, গাল্পিক হিসেবেই। তাঁর কবিতার দাম নেই হয়ত, কিন্তু তাঁর গল্প বলার, কথাশিল্পের ক্ষমতা অনস্বীকার্য। তাঁর উপন্যাসে যাঁরা গাঠনিক দুর্বলতা, আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখেন তাঁরা তাঁর গল্পে সন্তুষ্ট হন। কারণ অনেক গল্পকে টেনে-বুনে বিস্তারিত করে পরে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদকে স্বতন্ত্র গল্প বলে চালানো কিছু অসম্ভব নয়। যাঁরা ফক্‌নরের উপন্যাস পড়েছেন তাঁরাই এ-কথা বলবেন। উদাহরণও উল্লেখ্য "গো-ডাউন মোসেস" উপন্যাসখানা। সাউণ্ড-এণ্ড-ফিউরীর চারটি পর্বের ফলশ্রুতি উপন্যাসের কিন্তু গঠন নিতান্তই ছোটো গল্পের। অনেক ইংরেজ সমালোচক এই প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, সারতোরিস্ উপন্যাসের চিঠি চুরির ঘটনাটাই না কি বহু বৎসর পরে লিখিত "একদা-এক-রাণী-ছিলেন" গল্পের প্রেরণা যোগায়। এর দ্বারা আর যা-ই প্রমাণ হোক এটা প্রমাণ হয় যে, ফক্‌নর আসলে গল্প লিখতে গিয়ে উপন্যাস নিয়ে পড়েন। প্রতিটি উপন্যাসের গঠন-ভংগিমা আমার কথার সত্যতা ঘোষণা করে। ফক্‌নরের সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে আমার আর একটি বক্তব্য আছে, সেটি হলো, তাঁর পটভূমি, পুরোভূমি নিঃসন্দেহে বিরাট, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অনেকটা সসীম। সমষ্টিগত চেতনা অনেকখানি কম। বাইরে ছড়ানো বিস্তৃত জীবনের সংগে যোগসূত্রটা বেশ স্পষ্টত ক্ষীণ,—এটা তাঁর মতো সাহিত্যিকের পক্ষে গৌরবের নয়; এবং এটা ঘটেছে ব্যক্তিগত জীবনে ফক্‌নর মোটেই দিলদরিয়া ভাবে মিশতে পারেননি বলেই সম্ভবত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো তাই অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক। জীবনে তিনি যে ক্ষয়-ক্ষতি ভাঙা-চোরার মধ্য দিয়ে চলেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোতেও তার ছাপ আশ্চর্য স্পষ্ট। এই দিক থেকে বাঙালী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে সাদৃশ্য আছে। নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের ওপর ফক্‌নরের প্রভাবও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে জীবন-দর্শনের সৌসাদৃশ্যটা। লাইট-ইন্-আগষ্টের প্রভাব। ফক্‌নরের দার্শনিক প্রগলভতা কিন্তু নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের মধ্যে ততোখানি নেই। নারায়ণের গৃহিণীপণা আছে আর ফক্‌নরের অমিতব্যয়ী অমৃতমুখিতা। যে ইংরেজ সমালোচকের লেখায় থেকে আমি প্রচুর সাহায্য নিয়েছি তাঁর কথা দিয়ে এ প্রবন্ধের শেষ করি: For all the weakness of his own, he is an epic or bardic poet in prose (বিভূতিভূষণের মতোই), a creator of myths that he weaves together into a legend of the South—তপস্বীর মতো একান্তে বসে ফক্‌নরের সাহিত্য-সাধনা আজ তাঁর নিজের দিক থেকে সার্থক বলে পৃথিবী স্বীকার করলো। আজকের আনন্দের ভোজে সেটা মনে রাখতে হবে।

অনুবাদক—আনন্দ দে

৪৩ বৎসরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের ইতিহাস। ১৯৪৯ সালের মতো দুর্বৎসরেও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-এর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির পরিচয়—

এ যাবৎ হিন্দুস্থানের ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪৭টি বীমাপত্রে বীমাকারিগণ ভবিষ্যতের জন্য যে সংস্থান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৩ হাজার ২১৮৲ টাকা। বীমাকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে হিন্দুস্থানের মোট ১৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭১৲ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন নিরাপদ ও লাভজনক ব্যাপারে লগ্নি আছে। বীমাকারী ও তাঁহাদের ওয়ারিশগণের বীমাপত্রের যে দাবী এ বৎসর মিটানো হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৭১ লক্ষ ২ হাজার ৫০০৲ টাকা। হিন্দুস্থান যে প্রতি বৎসরই বীমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আলোচ্য বৎসরের ১৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬ হাজার ২৪৩৲ টাকার নূতন বীমার কাজেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশদ বিবরণ সহ প্রকাশিত ১৯৪৯ সালের উদ্বৃত্তপত্রে সোসাইটির সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।

হেড অফিস: হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

৮

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

গদ্যশাখা : ভূমিকা

হিন্দী গদ্যের উদ্ভব : ইংরাজ ও বাঙ্গালী

হিন্দী গদ্য-সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করলে এই ইতিহাসকে ইংরাজের প্রেরণা, বাঙ্গালীর প্রাণনা আর শিক্ষিত হিন্দীভাষীর প্রাণশক্তির মিলনে রচিত একটি ত্রিবেণী-সঙ্গম বলে মনে হবে।

ইংরাজের প্রেরণা

কোলকাতাকে কেন্দ্র কোরে ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের বিচিত্র বিকাশের পক্ষে যেমন, হিন্দী গদ্যের বিকাশের পক্ষেও তেমনই কাজ করেছে। বাংলা গদ্যের সেই 'হাঁটি-হাঁটি পা পা'র যুগে ইংরেজের উৎসাহকে অবলম্বন কোরে এগিয়ে যাবার চেষ্টার কথা সকলেরই জানা। বাংলা গদ্য মোটামুটি খাড়া হচ্ছিল কিন্তু মুস্কিল হচ্ছিল তার সংস্কৃত আর আরবী-ফারসীকে নিয়ে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ—বাংলা গদ্য এক বার এদিকে হেলছিল এক বার ওদিকে। হিন্দী গদ্যের জন্যও রাজপথ তৈরী হয়নি। উঁচু-নীচু রাস্তায় তাকে এক বার ডাইনে এক বার বাঁয়ে হেলতে হচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে হিন্দী সাহিত্যজ্ঞদের কাছে লল্লুলাল ও সদল মিশ্রের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের যোগ্য। লল্লুলালের 'প্রেমসাগর'* আর সদল মিশ্রের 'নাসিকেতোপাখ্যান' হিন্দী গদ্যের বিচিত্র বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত সহায়তা করেছিল। এঁদের পিছনে ছিলেন জন গিলক্রাইষ্ট। সে হোলো ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা। এর সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারী কেরী প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দীতে বই লেখার ব্যবস্থা কোরতে লাগলেন। তার পর আরও কিছু পরে হোলো ইংরাজদের অনুগ্রহে স্কুল বুক সোসাইটি। এই স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র কোরে হিন্দীতে ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক বেরুতে লাগল। অর্থাৎ মোটামুটি ইংরাজরা (ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (খ) মিশনারী-কাজ (গ) স্কুল বুক সোসাইটির মধ্য দিয়ে হিন্দী গদ্যকে মোটামুটি খাড়া হবার সুযোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই ধরণের ইংরাজী গুরুপ্রসাদীর ফলে হিন্দী গদ্যের বিকাশ হচ্ছিল বটে, কিন্তু সেই গদ্য ঠিক সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। কেন না ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরা ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি এতটা নেকনজর দিচ্ছিলেন কেবল দেশভাষা শেখবার জন্য। তাঁরা হিন্দী শিখতে চান, হিন্দী বুঝতে চান, হিন্দী বলতে চান—অতএব লেখ made easyর মত বই। তাঁরা কি বাংলার ক্ষেত্রে, কি হিন্দীর ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রসারের কথা ভাবেননি, আপন প্রয়োজনের জন্য হিন্দী গদ্যকে মোটামুটি আয়ত্ত কোরে চাকরী চালাবার চেষ্টা কোরছিলেন। সুতরাং হিন্দী গদ্য হয়ত কিছুটা দাঁড়াল, কিন্তু সাহিত্য হল না। আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিবিলিয়ানদের জন্য লিখিত গদ্যগ্রন্থ আটকে রইল সেখানেই, পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে কেবল বয়ে চলল সে ধারা। সমগ্র ভারতবর্ষকে ভাব ও রসে অভিপ্লুত করার জন্য কোনও চেষ্টা হোল না। সে চেষ্টা হোলো বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে আদর্শ কোরে।

মিশনারীরা যে গদ্যগ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন তা মোটামুটি ইংরাজী হোতে খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থের দেশীয় অনুবাদ। সে বই মিশনারীদের ছড়াবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সমগ্র দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ একে তো তার মধ্যে আমাদের ধর্মপ্রাণতাকে আঘাত করার কথা, তার পর আমাদের হিন্দু দেবদেবীর স্থানে যীশু ভজনার ব্যাপার। সুতরাং দেশীয় শিক্ষিত লোকেরা বিশেষ কোরে অবস্থার বিপাকে ধর্মত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর না হোলে এ সকল বইও পড়তেন না, এ সকল বইয়ের গদ্য-শৈলীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টাও করেননি। সুতরাং সিবিলিয়ান-হিতার্থ গদ্য মরতে সুরু কোরল ফোর্ট উইলিয়ামে, আর মিশনারী গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও দেশকে প্রভাবান্বিত বিশেষ কোরতে পারল না। কারণ গোঁড়া হিন্দুস্থানী চট্ কোরে জাত-ধর্ম খোয়াতে মোটেই রাজী ছিল না। বাংলা বিহারে ও মাদ্রাজে অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ছিল বেশী, তারা সহজেই তাই যীশু ভজনাতে মাততে পেরেছিল কিন্তু পশ্চিমাদের মধ্যে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার জিনিষটা বেশ সহজ হোল না। অতএব মিশনারী গদ্যও ভাষার মিউজিউমেই রয়ে গেল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইস্কুলের বই নিয়ে হোলো 'স্কুল বুক সোসাইটি'। এঁরা বাংলা দেশের 'স্কুল বুক সোসাইটির' দিকে তাকাতে সুরু কোরলেন। বাংলা তখন আগরওয়ালা। সুতরাং বাংলা স্কুল বুকের দেখাদেখি সুরু হোলো লেখালেখি।

কিন্তু তবু এ তিনটি প্রচেষ্টা গদ্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা, গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা নয়। আর এ প্রচেষ্টা তিনটি সমগ্র দেশকে নিয়ে নয়, দেশের কিছু অংশে হিন্দী গদ্যের মাধ্যমে বিদেশী ধর্ম, বা ইস্কুলের ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা মাত্র।

বাঙ্গালীর প্রাণনা

হিন্দী গদ্য-সাহিত্যে বাংলার আদর্শ, বাঙ্গালীর কর্ম-প্রেরণা যুগান্তর সৃষ্টি কোরল। সেদিন বাঙ্গালীর বাহু সত্য সত্যই ভারতের বাহুকে বল দিয়েছিল। বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে নব সাজে সজ্জিত কোরে তুলছিল।

বাংলা দেশে আসন গেড়ে বসেছিল কোম্পানী। বাঙ্গালী প্রথমেই হারালো তার জাত-ধর্ম, এবং কিছু দিন বাদে সারা ভারতের জাতটি মেরে বসে রইল। সে যুগের কায়দা হোলো ইংরাজীয়ানা।

---

* 'প্রেমসাগর' ব্যতীত লল্লুলালের "সিংহাসনবত্তীসী", "বৈতাল পচ্চীসী" "শকুন্তলা নাটক", 'মাধোনল' প্রভৃতি আছে। এই বইগুলির ভাষা "বিলকুল উর্দু" বলা বোধ হয় ভুল হবে না।

সে কায়দাতে বাঙ্গালী ছিল সকল প্রদেশের মধ্যে পুরোহিত। অগ্রণী বাঙ্গালী হোলো অন্যান্য প্রদেশের কাছে অগ্রগণ্য।

বাংলা দেশে তখন অদ্ভুত জীবন-চেতনা। ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে উঠে পড়েছেন রামমোহন, খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে মিশনারীরা, অসংস্কৃত হিন্দু-ধর্ম নিয়ে একাধিক সাহিত্যসেবী। রামমোহনের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' দেশে আলো আনার চেষ্টা করছে, দেশকে বাঁচাবার চেষ্টা কোরছে। ইংরাজ আর মুসলমান তখন হাত মিলোবার জন্য ব্যস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে। কেন না দু'জনেই পৌত্তলিকতার বিরোধী, আর মুসলমানরা বিরোধী নন খৃষ্টধর্মের। ("ইসলাম ভী 'সামী' মত হৈ ঔর একেশ্বরবাদ উসকা মূল সিদ্ধান্ত হৈ, ইসলিয়ে ইসলামী তহজীব মেঁ ঈসাঈ ইয়া মসীহী তহজীব কী বিশেষতাএঁ পাই জাতী হৈঁ।"—গার্সি দ্য তাসী)। রামমোহনের মত একেশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতাবিরোধী ধর্মস্রষ্টার যে কতখানি রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল তা কে অস্বীকার কোরবে? আমার আলোচনা কিন্তু তা নিয়ে নয়। আমি এই কথা বোলতে চাই নানা ধর্মের গোলমালকে কেন্দ্র করে বাংলাতে গড়ে উঠছিল কতকগুলি সাময়িক পত্র। এগুলিকে সংবাদপত্র নাম না দিয়ে বলা যেতে পারে বিবাদ-পত্র। এই বিবাদপত্রগুলি দেশের সাহিত্য-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করেছিল। দলগত মতবাদকে দেশগত মতবাদে রূপান্তরিত করবার জন্য বাংলা দেশে তখন কাগজে কাগজে 'ধুল পরিমাণ'। সংবাদকে সাহিত্যিক চাটনীতে রূপান্তরিত কোরে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সাহিত্য ও সংবাদকে একই মাল্যবন্ধনে বেঁধে ফেলায় চেষ্টা কোরছিল। রামমোহন হিন্দীতে 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' অনুবাদ কোরলেন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। বলা বাহুল্য, হিন্দীতে এ ধরণের চিন্তাপ্রসূ গদ্যগ্রন্থ তখন বিশেষ ছিল না। রামমোহনের হিন্দী ভাষা হয়ত আদর্শ হিন্দী ভাষা ছিল না তবু চিন্তাপূর্ণ রচনাকে কি ভাবে হিন্দী গদ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, এদিক দিয়ে রামমোহনের দান অস্বীকার করা যায় না। এই ভাষার সমালোচনা কোরে পণ্ডিত শুক্ল বোলেছেন, "রাজা সাহব কী ভাষা মেঁ এক আধ জগহ কুছ বংগলাপন জরুর মিলতা হৈ, পর উসকা রূপ অধিকাংশ মেঁ ওহী হৈয় জো শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানোঁ কে ব্যবহার মেঁ আতা থা।"

রামমোহন তার কয়েক বছর বাদে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) হিন্দীতে সাময়িক পত্রও বার কোরলেন (সম্বত ১৮৮৬ মেঁ উন্‌হোনে 'বঙ্গদূত' নাম কা এক সংবাদপত্র ভী হিন্দী মেঁ নিকালা।)। এর কিছু দিন পূর্ব্বে অবশ্য হিন্দীর প্রথম সংবাদপত্র পণ্ডিত জুগুলকিশোর সম্পাদিত "উদন্তমার্ত্তণ্ড" (খৃষ্টাব্দ ১৮২৯) কানপুর হোতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম সংবাদপত্রটিও সংবাদকে পত্রস্থ কোরতে গিয়ে বাঙ্গলা পত্রিকাগুলিকে স্মরণে এনেছেন, আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কোরেছেন।* সম্পাদক জুগুলকিশোর লিখলেন, 'ইয়হ উদন্তমার্ত্তণ্ড' অব পহিলে-পহল হিন্দুস্তানিয়োঁ

* কোলকাতা হোতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও হিন্দী দৈনিকপত্র শ্যামসুন্দর সেন সম্পাদিত "সমাচার সুধাবর্ষণ" বেরোল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে। এ সংবাদ হিন্দীভাষাভাষীদের জানা না থাকিতে পারে।"

কে হিত কে হেত জো আজ তক কিসীনে নহীঁ চলায়া, পর অঙ্গরেজী ও পারসী ও বঙ্গলে মেঁ জো সমাচার কা কাগজ ছপতা হৈ উসকা সুখ উন বোলিয়োঁ কে জান্নে ও পঢ়নেবালোঁ কো হো হোতা হৈ। ইসসে সত্য সমাচার হিন্দুস্তানী লোগ দেখ কর আপ পঢ় ও সমঝ লেঁয় ও পরাই অপেক্ষা ন করেঁ ও অপনে ভাযে কী উপজ ন ছোড়েঁ ইসলিয়ে' ইত্যাদি।

কিন্তু এ তো গেল বাংলা পত্রিকার দেখাদেখি হিন্দীতে পত্র চালানোর কথা। আর এ পত্রও বছর খানেকের মধ্যে মরুপথে তার ধারা হারিয়ে ফেলল। এর পর হিন্দী ভাষার যেদিন চরমতম দুর্দিন এল, যেদিন ইংরাজ হিন্দীকে 'গঁওয়ারী বোলী' 'ভদ্দীবোলী' বোলে ঘৃণা কোরতে সুরু কোরল, যেদিন হিন্দীর স্থানে উর্দ্দু আপন আসন গেড়ে বসার চেষ্টা কোরতে লাগল, যেদিন বীমস্ হিন্দীর কৌলীন্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, তাসী সাহেব খড়্গহস্ত, শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব বোলে বসলেন (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) "ইয়হ অধিক অচ্ছা হোতা যদি হিন্দু বচ্চোঁ কো উর্দ্দ সিখাই জাতী, ন কি এক এসী 'বোলী' মেঁ বিচার প্রকট করনে কা অভ্যাস করায়া জাতা জিসে অন্তমেঁ একদিন উর্দ্দুকে সামনে সির ঝকানা পড়ে গা।" এই যখন দেশের অবস্থা, যখন শিক্ষার আন্দোলন ও ধর্মের আন্দোলনে হিন্দীকে চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা হোচ্ছে, সেদিন বাঙ্গালীই এগিয়ে এসেছিলেন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সুন্দর হিন্দী নিয়ে।

কাশী থেকে "বনারস অখবার" যা বেরুচ্ছিল তার ভাষা হোলো উর্দ্দ আর অক্ষর হোল দেবনাগরী (ইস পত্র কী ভাষা ভী উর্দ্দূ হী রখী গঈ, যত্তপি অক্ষর দেবনাগরীকে থে)। এই দুর্দিনে বাবু তারামোহন মিত্র সম্পাদিত কাশীর দ্বিতীয় সংবাদপত্র "সুধাকর" বেরোল (১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)। আর এই পত্রের ভাষা হোলো পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র শুক্লের মতে "ইস পত্র কী ভাষা বহুৎ কুছ সুধরী হুঈ, তথা ঠীক হিন্দী থী"।

আগরার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে মুন্সী সদাসুখলাল সম্পাদিত 'বুদ্ধিপ্রকাশ' বেরোল। তার ভাষার আদর্শ হোলো বাংলা সংবাদপত্র। বিষয়-বস্তুর আদর্শও অনেক স্থানেই বাংলার হোতে লাগল। সেদিন বাংলার একাধিক সংবাদপত্র বাঙ্গালীর অভ্যস্ত জীবনাদর্শের ভুল-ত্রুটি বার করার চেষ্টা কোরছে। বিশেষ কোরে ব্রাহ্মরা অমার্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের একাধিক সংস্কারকে সভ্যতার ক্ষেত্রে উপদ্রব বলে মত প্রকাশ করছিলেন। বাংলা দেশের গঙ্গাতীরে 'অন্তর্জ্জলী'র ব্যাপার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে কতখানি তীব্র কশাঘাত সহ্য কোরেছে, তা অনেকেরই জানা আছে। আগরার 'বুদ্ধিপ্রকাশ' সেই ধরণের ভাবকে বাংলানুসারী হিন্দী গদ্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত কোরেছেন নীচের উদাহরণে :—

"কলকত্তে কে সমাচার

ইস পশ্চিমীয় দেশ মেঁ বহুতোঁ কো প্রগট হৈ কি বংগালে কী রীতি কে অনুসার উস দেশকে লোগ আসন্ন মৃত্যু রোগী কো গঙ্গাতটপর লে জাতে হৈঁ ঔর ইয়হ তো নহীঁ করতে কি উস রোগীকে অচ্ছে হোনে কে লিয়ে উপায় করনে মেঁ কাম করেঁ ঔর উসে যত্ন সে রক্ষা মেঁ রকখেঁ বরন্ উসকে বিপরীত রোগী কো জল কে তট পর লে জাকর পানী মেঁ গোতে দেতে হৈঁ ঔর "হরী বোল, হরী বোল" কহকর উসকা জীব লেতে হৈ।"

এই সময় সরকার মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উর্দ্দুর দিকে ঝুঁকছিলেন, হিন্দীকে শিক্ষার ক্ষেত্র হোতে উঠিয়ে দেবার জন্ত প্রাণপণ প্রচেষ্টা কোরছিলেন। সরকারের তখন 'হিন্দী' সম্বন্ধে মনোভাব হোলো "যে ভাষা দেশের সরকারী বা অপিসী ভাষা নয় সে ভাষা সকল বিদ্যার্থীদের পক্ষে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য বলে আমাদের মনে হয় না। এ ছাড়া মুসলমান বিদ্যার্থী, যাদের সংখ্যা দিল্লী কলেজে বেশ কিছু, তারা একে ভাল চোখে দেখবে না।" (সম্বৎ ১৯০৫, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৮) *

হিন্দী-বিরোধের প্রাবল্য দিন-দিন বাড়তে লাগল। সেদিন রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দীর পক্ষ অবলম্বন কোরে হিন্দীকে উর্দ্দুর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কোরছিলেন। কিন্তু তবু রাজা শিবপ্রসাদ সর্ব্বান্তঃকরণে উর্দ্দুকে বিদায় দিতে পারেননি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি যে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি লিখেছিলেন তার ভাষাতে একেবারে উর্দ্দুয়ানী এসে গিয়েছিল। তাই পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় দুঃখ কোরে বোলেছেন, "সম্বৎ ১৯১৭কে (১৮৬০ খৃঃ) উপরান্ত জো ইতিহাস, ভূগোল আদি কী পুস্তকেঁ রাজা সাহেব নে লিখী উনকী ভাষা বিলকুল উর্দ্দুপন লিয়ে হৈ।"

রাজা শিবপ্রসাদ নিজেই আরবী ফারসী শব্দাবলীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন কোরেছেন এই বোলে :—

"I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words even those which have become our household words, from our Hindi books and use in their stead Sanskrit words quite out of place and fashion or those coarse expressions which can be tolerated only among a rustic population."

রাজা শিবপ্রসাদ সেই ভাষাতে তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ কোরেছেন :—

"হম লোগোঁ কো জহাঁ তক বন পড়ে চুননে মেঁ উন শব্দোঁ কো লেনা চাহিয়ে কি জো আম-ফহম ঔর খাস পসন্দ হো অর্থাৎ জিনকো জিয়াদা আদমী সমঝ সকতে হৈঁ ঔর জো ইহাঁ কে পড়ে লিখে আলিম-ফাজিল, পণ্ডিত বিদ্বান কী বোল-চাল মেঁ ছোড়ে নহীঁ গয়ে হৈঁ ঔর জহাঁ তক বন পড়ে হম লোগোঁ কো হর্গিজ গৈর মুলুক কে শব্দ কাম মেঁ ন লানে চাহিয়ে ঔর ন সংস্কৃত কী টকসাল কায়ম করকে নয়ে নয়ে উপরী শব্দোঁ কে সিক্কে জারী করনে চাহিয়েঁ।"

হিন্দী ভাষার, বর্ত্তমান সৌষ্ঠবের জন্ত রাজা শিবপ্রসাদকে সে জন্ত খুব বেশী কৃতজ্ঞতা জানান চলে না, কেন না বর্ত্তমান হিন্দী হোলো তৎসম শব্দপ্রধান সাহিত্যিক বাংলানুসারী হিন্দী। যে হিন্দীর

---

* এসী ভাষা কো জাননা সব বিদ্যার্থিয়োঁ কে লিয়ে আবশ্যক ঠহরানা জো মুল্ক কী সরকারী ঔর দফ্তরী জবান নহী হৈ, হমারী রায় মেঁ ঠীক নহী হৈ। ইসকে সিবায় মুসলমান বিদ্যার্থী, জিনকী সংখ্যা দেহলী কালেজ মেঁ বড়ী হৈ, ইসে অচ্ছী নজরসে নহী দেখেঙ্গে।

কথা রাজা শিবপ্রসাদ চিন্তা কোরছিলেন তা হিন্দী নয়, হিন্দুস্তানী অর্থাৎ নাগরী অক্ষরে লিখিত উর্দু। তিনি চাননি সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার হোতে শব্দ-বস্তু সংগ্রহ কোরে হিন্দী গদ্যকে বলশালী কোরতে। তিনি পরিষ্কার বোলে দিলেন "সংস্কৃতের ট্যাঁকশাল থেকে নূতন নূতন শব্দের coinage নিরর্থক।" আধুনিক হিন্দী কিন্তু যে সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে, তাতে যত দূর সম্ভব আরবী ফারসীকে মহাপ্রস্থানের পথে পাঠান হয়েছে।

হিন্দী ভাষার পূর্ব্ববর্ণিত দুর্দিনে ১৯১৯ সম্বতে রাজা লক্ষ্মণ সিংহের 'শকুন্তলা'র অনুবাদ বেরোল। ১৯১৯ সম্বৎ* অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত সরস হিন্দী গদ্যে-পদ্যে রচিত শকুন্তলার অনুবাদ বেরোল। এই হিন্দী গদ্যই হোলো মোটামুটি আধুনিক হিন্দী গদ্যের পূর্ব্বাভাস। এতে সংস্কৃত-প্রধান শব্দ রয়েছে। লক্ষ্মণ সিংহের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা কোরে হিন্দী সাহিত্য সমালোচকেরা বোলেছেন, "রাজা লক্ষ্মণ সিংহ কে সময় মেঁ হী হিন্দী গদ্য ভাষা অপনে ভাবী রূপকা আভাস দে চুকী থী।"

এই ভাষা যদি বাংলার আদর্শানুসরণ হোয়ে থাকে তাহ'লে বাংলা গদ্য যে কতখানি হিন্দী গদ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার কোরেছে তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে আমি এ মাসে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না, আগামী মাসের আলোচনাতে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ পাব।

আর এক দিকের কথা বিচার কোরলে বাংলার দান সম্বন্ধে ভালো ধারণা হবে। পঞ্জাবে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় পঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগ হোতে হিন্দীকে রক্ষা কোরে আসছিলেন। ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পাঞ্জাবে একাধিক হিন্দী বই প্রকাশিত করেছিলেন। এ সব বই অনেক দিন পর্য্যন্ত ইস্কুলে হিন্দীর টেক্‌স্‌ট বই ছিল। এ ছাড়া পঞ্জাবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার এবং পঞ্জাবে বাংলার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হোতে "জ্ঞান-প্রদায়িনী" পত্রিকা বার কোরেছিলেন। এঁর প্রচেষ্টা আর স্থান নির্দেশ কোরে পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন, "এইখানে এই কথা বলে দেওয়া দরকার যে শিক্ষা বিভাগ থেকে নবীন বাবু যে হিন্দী গদ্য প্রচারে সাহায্য কোরছিলেন তা ছিল শুদ্ধ হিন্দী। আর হিন্দী উর্দুর ঝগড়াতে ইনি হিন্দীকে রক্ষা কোরে আসছিলেন। রাজা শিবপ্রসাদ যেরূপ সংযুক্ত প্রান্ত হোতে উর্দুর পক্ষপাতীদের সঙ্গে লড়াই কোরে আসছিলেন, সেরূপ পঞ্জাব হোতে হিন্দীকে রক্ষা কোরে আসছিলেন নবীন বাবু। বিদ্যার উন্নতির জন্য লাহোরে 'অঞ্জুমন লাহোর' নামে একটি সভা স্থাপিত হোয়েছিল, তাতে উর্দুর সমর্থকদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ কোরে নবীনচন্দ্রই বলেছিলেন যে, দেশে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা উর্দু নয় হিন্দী হওয়াই উচিত। কারণ উর্দু প্রচলিত হোলে দেশবাসীর কোনও লাভ হবে না, কেন না এ ভাষা হোলো মুসলমানদের ভাষা। এতে মুসলমানেরা অনর্থক অনেক আরবী-ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। পদ্য বা "ছন্দোবদ্ধ" রচনাতেও উর্দুর উপযোগিতা নেই। হিন্দুদের কর্ত্তব্য হোলো তারা যেন আপনাদের পরম্পরাগত ভাষার উন্নতি ক'রে চলে। উর্দুতে প্রেমের কবিতা ছাড়া আর কোনও গম্ভীর বিষয় পরিব্যক্ত করার শক্তি নেই।"*

মোটামুটি এই সময়েই হিন্দী গদ্য দাঁড়াল, এই রকম ভাবে। এই যে গদ্য দাঁড়াল তা হোলো সাহিত্যিক গদ্য। এই হিন্দী গদ্যের মধ্যে সাবলীলতা এল কিন্তু ঐশ্বর্য্য এল না। তার জন্য আবার তাকাতে হোলো বাংলার দিকে। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন কোরে হিন্দী গদ্য ঐশ্বর্য্যের পথে এগিয়ে চলল। তা নিয়ে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা কোরব।

এবারের আলোচনার মোটামুটি বিষয় সংক্ষেপ কোরলে দাঁড়ায় এই :—

(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হিন্দী গদ্য বিশেষ ছিল না। পূর্বে যে দু'-একটি গদ্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে ব্রজ-ভাষা আর খড়ীবোলী অব্যবস্থিত রূপে রয়েছে।

(খ) হিন্দী গদ্যের উদ্ভবের ইতিহাসে (১) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (২) মিশনারী-প্রচেষ্টা (৩) স্কুল বুক সোসাইটির কাজ বিশেষ স্মরণযোগ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথম দু'টি প্রচেষ্টা কেবল দেশের কোনও কোনও অংশকে নিয়ে হয়েছে। হয় সিবিলিয়ান বা ধর্মান্তর গ্রহণেচ্ছুর কাছে এই হিন্দী গদ্যের কিছুটা প্রসার হোয়েছিল। আর এ গদ্য আরবী ফারসী আর সংস্কৃতের ভারে মারা পড়ছিল, এর সঙ্গে ব্রজভাষার অসংবদ্ধ রূপও ছিল।

(গ) হিন্দী আর উর্দ্দুর মধ্যে তখন প্রবল রেষারেষি। উর্দ্দুকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন ইংরাজ আর মুসলমানেরা। বাঙ্গালী সেদিন কোলকাতা, কাশী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান থেকে তৎসম-প্রধান হিন্দীর পক্ষ অবলম্বন কোরে জোর আন্দোলন চালাচ্ছিল।

(ঘ) আধুনিক হিন্দী গদ্য হোলো তৎসম-প্রধান শব্দপরিপূর্ণ গদ্য। এই গদ্যের মধ্যে আরবী-ফারসী-ব্রজভাষার উৎকট আতিশয্য বিদূরিত কোরেছে বাংলা সাহিত্যাদর্শ ও বাঙ্গালী সাহিত্যিক।

(ঙ) হিন্দী সাময়িক পত্র হোলো বাংলার দেখাদেখি বা বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায়, ভাষা দাঁড়াল বাংলার অনুকারী, সাহিত্যাদর্শও হোতে লাগল বাংলা মারাঠী। উর্দুকে মহাপ্রস্থানের পথে পাঠিয়ে হিন্দী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। নবোদ্ভূত হিন্দী গদ্য সম্বন্ধে সমালোচকের কথা হোলো এই, "জব কি বংলা, মরাঠী আদি অন্য দেশীভাষায়োঁ কা গদ্য পরম্পরাগত সংস্কৃত পদাবলী কা আশ্রয় লেতা হুয়া চল পড়া থা তব হিন্দী গদ্য উর্দু কে ঝমেলে মেঁ পড় কর কব তক রুকা রহতা।"

হিন্দী গদ্যের উদ্ভব হোলো এমনি কোরে! স্থান পরিষ্কৃত কোরে হিন্দী গদ্য-দেবীকে নিয়ে এলেন ইংরাজ; সে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোলো বাঙ্গালী ও পশ্চিমা ভাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়।

[ক্রমশঃ।

---

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা 'শকুন্তলা' এরই কাছাকাছি বেরিয়েছে। বর্ত্তমানে আমার নিকটে ঈশ্বরচন্দ্রের 'শকুন্তলা' না থাকায় এবং বাংলা 'শকুন্তলা' ও হিন্দী 'শকুন্তলা' পাশাপাশি স্থাপন করতে না পারায় ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা পরের মাসে কোরব।

* উর্দুকে প্রচলিত হোনে সে দেশবাসিয়োঁ কো কোই লাভ ন হোগা। ক্যাঁ কি উহ ভাষা খাস মুসলমানী কী হৈ। উসমেঁ মুসলমানোঁ নে ব্যর্থ বহুৎ সে আরবী ফারসী কে শব্দ ভর দিয়ে হৈ।"—ইত্যাদি।
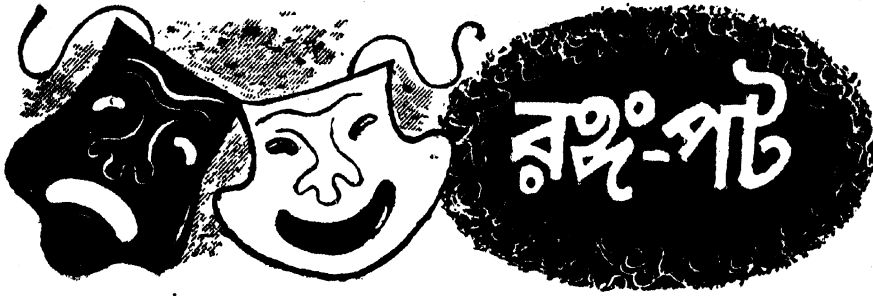
ডেভিড গ্যারিক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে যাঁকে গণ্য করা হয় তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ এক মজার ব্যাপার। লণ্ডনের সহরতলীর এক অখ্যাতনামা রঙ্গমঞ্চে "হার্লেক্যুইন্ ষ্টুডেণ্ট," নামে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। সময়টা আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ বেশীর ভাগ স্থানীয় কসাই, মুষ্টি-যোদ্ধা, সার্কাসের খেলোয়াড় এবং এই ধরণের লোক। তারা এই থিয়েটারের অভিনয় দেখতে ভালবাসে। দলে দলে আসে প্রতি রাত্রে। কিন্তু কোন নট অভিনয় ভাল না করতে পারলে তাদের ক্রোধের অন্ত থাকে না। তাই তাদের সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন উষ্মার হাত থেকে অভিনেতাদের রক্ষা করবার জন্তে মঞ্চের সামনে লোহার ফলা-লাগানো বেড়া দিতে হয়েছে।

এ-হেন এক প্রেক্ষাগারে যখন উক্ত নাটক অভিনীত হচ্ছিল তখন ডেভিড গ্যারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু সেই দিনই নয়, সেই রঙ্গালয়ের প্রতি অভিনয়েই তিনি উপস্থিত থাকতেন! মঞ্চের অভ্যন্তরে তাঁর অবাধ গতিবিধি। অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ জানা-শোনা। স্বয়ং ম্যানেজার তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। গ্যারিকের তখন উঠতি বয়স। এক মদের দোকানের মালিকরূপে সেই অঞ্চলে তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। কাছেই ছিল তাঁর দোকান। মদের অর্ডার লিখে নেবার জন্য নিত্যই তিনি সেই থিয়েটারে আসতেন এবং অভিনেতাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতেন।

নিজের ব্যবসা-কর্ম্মে না ছিল তাঁর মাথা, না মন। মদের অর্ডার লেখার চেয়ে অভিনয়ের ধারা এবং অভিনেতাদের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করবার দিকেই তাঁর নজর থাকতো বেশী। তন্ময় হোয়ে তিনি অভিনেতাদের গতিবিধি অভিনয়-পদ্ধতি অনুধাবন করতেন! ছোটবেলা থেকেই অভিনয়-শিল্পের প্রতি তাঁর মনে আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। মদের ব্যবসা ভাল চলত না। কিছু কাল থেকেই তিনি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজছিলেন।

অভাবিতরূপে সেদিন সেই সুযোগ এল। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন ইয়েট্‌স্ নামে তখনকার দিনের সে-অঞ্চলের নাম-করা অভিনেতা। অভিনয়ের শেষের দিকে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হোয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন। ষ্টেজের ভিতর মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। অভিনয় শেষ না করতে পারলে দর্শকরা নিশ্চিত ক্ষেপে উঠবে। সকলের মুখে বিমূঢ়তার ছায়া। এমন সময়ে গ্যারিক গিয়ে দাঁড়ালেন ম্যানেজারের সামনে। জানালেন, ওই পার্ট তাঁর আগাগোড়া কণ্ঠস্থ এবং সুযোগ দিলে বাকীটুকু তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন; মেক-আপ, যদি নিখুঁত হয় তাহলে কোন গোল হবে না।

ম্যানেজার তো প্রথমে তাঁকে হাঁকিয়ে দিলেন। এও কখনো সম্ভব না কি। ইয়েট্‌স্-এর জায়গায় এই আনকোরা নতুন ছোকরা। দর্শকরা তাহলে সত্যিই কাউকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু তখন অন্য উপায়ই বা কি! অঙ্গ-সজ্জাকর এগিয়ে এলো। বললে, দেখাই যাক না।

শেষ পর্য্যন্ত গ্যারিককে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। সাজ-সজ্জায় ইয়েটস্-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজে ধরা যায় না। যবনিকা উঠ্‌লো। অভিনয় আবার আরম্ভ হল। দর্শকরা বুঝতে পারলে না যে ইয়েটস্-এর বদলে অন্য লোক অভিনয় করছে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার তো বিস্ময়ে হতবাক্।

এই হল গ্যারিকের প্রথম আত্মপ্রকাশ। তখন তিনি যে অভিনেতা হিসাবে খুব বড় দরের তা বলা যায় না। কিন্তু নকলিয়ানায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল ভাল ভাবেই।

কয়েক মাস পরে সেই রঙ্গমঞ্চেই তৃতীয় রিচার্ডের ভূমিকায় গ্যারিকের অভিনয় দেখবার জন্য লণ্ডনের ফ্যাশনেবল্ সমাজ ভেঙে পড়েছিল এবং বন্ধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বৃদ্ধ আলেকজেণ্ডার পোপ সেই অভিনয় দেখে মন্তব্য করেছিলেন—এই যুবকের তুল্য অভিনেতা কেউ নেই এবং কেউ কখনো এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও সক্ষম হবে না।

* * *

১৭১৬ সালে ফেব্রুয়ারী ডেভিড গ্যারিকের জন্ম। বাপ সৈন্য বিভাগে চাকরি করতেন। অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। বাল্যকালে ডেভিড ভাল মত লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাননি। ছেলেবেলা থেকেই নাটক করবার দিকে ডেভিডের অদম্য ঝোঁক ছিল। এগারো বছর বয়সে তিনি এক থিয়েটার পার্টি গ'ড়ে তোলেন এবং সেই দলের অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

কিছু দিন পরে ডেভিডকে লিসবনে তাঁর এক খুড়োর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। খুড়োর ছিল মাছের ব্যবসা। সেইখানে

ডেভিড কেরাণীরূপে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেরাণীগিরির কাজে তাঁর মন বসত না। খুড়ো দেখতেন, ভাইপো তাঁর চমৎকার সেক্সপীয়র আওড়াতে পারে, সকলের সঙ্গে সমান তালে নানা আলোচনা চালাতে পারে, কিন্তু দোকানের কাজে তার বেজায় গাফিলতি।

এই সময়ে ডেভিডের বাবার অবস্থার কিছু উন্নতি হল এবং তিনি তাঁর ছোট ছেলে ডেভিডের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলেন। অবশেষে দুই ভাই-এ পরামর্শ করে ডেভিডকে আইন পড়বার জন্যে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

লণ্ডনে পৌঁছবার মাস খানেকের মধ্যেই অকস্মাৎ ডেভিডের জীবনে বিষম বিপদ্‌পাত হ'ল। প্রথমে তাঁর বাবা মারা গেলেন, তার পর গেলেন খুড়ো, সমগ্র গ্যারিক-পরিবার দুঃখে-শোকে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুহ্যমান হ'ল।

ডেভিডের খুল্লতাত উইল ক'রে তাঁর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। পারিবারিক পরামর্শ-সভায় স্থির হ'ল, অতঃপর ঐ হাজার পাউণ্ড দিয়ে বড়'ভাই পিটার আর ছোট ভাই ডেভিড দু'জনে মিলে মদের ব্যবসা খুলবেন। পরামর্শ মতোই কাজ হ'ল। ডেভিড নিলেন লণ্ডনের দোকান চালাবার দায়িত্ব আর পিটার নিলেন তাঁদের স্বগ্রাম লিচফিল্ডের দোকানের ভার।

অচিরকালেই লণ্ডনের দোকান ডুবু-ডুবু হ'ল। পিটার লণ্ডনের দোকান পরিদর্শন করতে এসে দেখলেন, খাতা-পত্র কিছুই ঠিক নেই। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, এমন কি, মজুত মালের হিসাব মেলাও দুষ্কর। পিটার বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। ডেভিড লজ্জায় অধোবদন! কি ক'রে, কোন্ মুখে স্বীকার করেন যে, ব্যবসা দেখার চেয়ে তিনি থিয়েটার দেখেছেন বেশী করে, হিসাব লেখার চেয়ে অভিনেতাদের সঙ্গ তাঁর কাছে বেশী প্রিয় এবং প্রকাশ্য ভাবে রঙ্গালয়ে যোগদান করবার ইচ্ছা ক্রমেই তাঁর মনে দুর্নিবার হোয়ে উঠছে?

কিন্তু তখনকার দিনে বিলাতেও পেশাদার নটের বৃত্তি সমাজের কাছে নিন্দার বস্তু ছিল। সেখানেও তখনো পর্য্যন্ত পেশাদার অভিনেতার কোন মর্য্যাদা ছিল না। তাই মনের অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও ডেভিড তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় রঙ্গালয়ে নাম লেখাতে সাহস করেননি। মায়ের প্রতি তাঁর অবিচলিত ভক্তি ছিল। মায়ের মনে আঘাত দিতে তাঁর মনে সরেনি।

মায়ের মৃত্যুর পর তিনি যখন প্রকাশ্য ভাবে রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন তখনো তাঁর মনে কত কুণ্ঠা! সেই উপলক্ষে ভাইয়ের কাছে যে পত্র দিলেন, তার প্রতি ছত্রে তাঁর মনের ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন—"আমার মনের গতি আর ইচ্ছাকে আর দাবিয়ে না রেখে আমি এই পথই বেছে নিলাম। আমি জানি, তুমি আমার এই কাজের জন্ত খুবই অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যখন দেখবে যে, অভিনয়-প্রতিভায় তোমার ভাই কারুর চেয়ে খাটো নয় এবং আরও যখন দেখবে যে, এই পেশার আনুষঙ্গিক বদ্‌খেয়াল এবং দোষগুলি আমার কলঙ্কিত করতে পারেনি, তখন আশা করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে এবং আমাকে ভাই বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করবে না।"

গ্যারিকের আত্মীয়বর্গ তাঁর এই কাজে প্রথমটায় সমাজের কাছে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁদের বংশ-গরিমা বুঝি ক্ষুণ্ণ হল! তাদের বংশের ছেলে পেশাদার নটের বৃত্তি অবলম্বন করল! ছি ছি!

তার পর অতি শীঘ্রই যখন গ্যারিকের খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, গ্যারিকের অসামান্য প্রতিভা দেখে দেশের লোক যখন মুগ্ধ-বিহ্বল হল, খ্যাতির শিখরে উঠে গ্যারিক যখন প্রচুর সম্মান এবং প্রচুরতর অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন, তখন বোধ করি তাঁর আত্মীয়দের অনুশোচনা অন্তর্হিত হোতে বাধা পায়নি।

বিলাতের রঙ্গাকাশে গ্যারিকের অভ্যুদয় এক নিমেষে যেন এক নূতন যুগের সূচনা করেছিল। যেন নূতন সূর্য্যোদয়, পুরানো পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে নবতর অভিনয়-ধারার প্রবর্ত্তন। যুগ-প্রবর্ত্তকরূপে গ্যারিক অভিনন্দিত হলেন: মুগ্ধ-বিস্ময়ে দর্শক-সমাজ তাঁকে বরণ ক'রে নিল। পুরানো দিনের বিখ্যাত অভিনেতারা এই নবাগত শিল্পীর সামনে তখন আর দাঁড়াতে পারলে না, একসঙ্গে সবাই হ'টে গেল। তখনকার দিনের সব চেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ক্যুইন বলতে বাধ্য হলেন—"এই ছোকরার অভিনয়-পদ্ধতি যদি যথার্থ এবং নির্ভুল হয় তাহলে আমরা এত দিন যা করেছি সব ভুয়ো।"

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্যারিক অভিনয়-জগৎ জয় করলেন।

কিন্তু ঈর্ষা-কাতর ব্যক্তির অভাব ছিল না। অভাব ছিল না কটূক্তিকারী দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচকের। তাই নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত গ্যারিককে সর্ব্বদা যত্নবান ও সতর্ক থাকতে হয়েছে। 'কিং লিয়র' চরিত্রে তাঁর অভিনয় রঙ্গজগতে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। রাতের পর রাত রঙ্গালয়ের সামনে গাড়ীর লাইন লেগে যেত। কিন্তু তখনো নিন্দুকের কণ্ঠ একেবারে স্তব্ধ হয়নি।

তার পর, ছ'বছর ধরে গ্যারিক ধাপে-ধাপে যশ ও সৌভাগ্যের সোপানে উঠতে লাগলেন। "গ্যারিক-প্রীতির" বন্যায় রঙ্গজগৎ প্লাবিত হল। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত—উভয় প্রকার রসাশ্রিত ভূমিকাই তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন। সেক্সপীয়রের সতেরোটি চরিত্র তিনি নিজের ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করেছিলেন। কয়েকখানি নাটক নিজেও রচনা করেছিলেন।

সফলতার মাদকতা তাঁকে নষ্ট করতে পারেনি। নিজের জীবদ্দশাতেই জনগণের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পূজা বললেও অত্যুক্তি হয় না, কম শিল্পীই পেয়েছেন। কিন্তু এই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁকে কোন দিন অহমিকায় আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গই ছিল তাঁর কাম্য। সাজ-ঘরের চেয়ে বৈঠকখানার আবহাওয়াই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। বাল্যবন্ধু স্যামুয়েল জনসনের সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন চিরদিন অটুট ছিল।

১৭৪৯ সালে গ্যারিক ইভা মারি ভিগেল নামে এক নর্ত্তকীকে বিবাহ করেন। বিবাহের আগে এই মেয়েটির নাম ছিল মাদামোয়াজেল ভায়োলেট। এই বিবাহের প্রণয়-পশ্চাতপটকে কেন্দ্র ক'রে পরবর্ত্তীকালে "ডেভিড গ্যারিক" নামে এক মিলনান্ত নাটক রচিত হয়। স্যর চার্লস্ ওয়াইনডহ্যাম নামে জনপ্রিয় অভিনেতা বহু বার উক্ত নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই নাটকের আখ্যানভাগের মধ্যে আছে যে, এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা গ্যারিকের প্রেমে পড়েছেন; কিন্তু সমাজের বহু লোক এই বিবাহের ঘোর বিরোধী এবং নিজের প্রেমাস্পদার কল্যাণার্থে গ্যারিক আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে যাতে ক'রে মেয়েটির মন তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং বিবাহ ভেঙে যায় সেই উদ্দেশ্যে মেয়েটির সামনে নিজেকে লম্পট এবং মাতালরূপে সাজিয়ে অভিনয় করছেন। অবশেষে অবশ্য তাঁর অভিনয় ধরা পড়ে যায় এবং তাঁদের মিলন হয়।

বাস্তব জীবনে গ্যারিক যে সত্যই এই রকম ছদ্ম অভিনয় করেছিলেন তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও এ কথা জানা গেছে যে, এই প্রণয়-ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্যারিক খুব বড় মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৭৭৬ সালে তিনি অভিনয়-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেই উপলক্ষে তিনি পর পর কয়েকখানি বিখ্যাত নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও তাঁর অতুলনীয় অভিনয়-প্রতিভার অপূর্ব্ব তেজস্বিতা তখনো বিন্দু মাত্র খর্ব্ব হয়নি। দর্শকগণ বিহ্বল হোয়ে সেই অভিনয় উপভোগ করেছিল। শেষ বারের মত সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে মহাসাধক যেন অভিনয়ের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন, লুপ্ত হোয়ে গেছে তাঁর সকল সত্তা। অবাক-বিস্ময়ে দর্শকমণ্ডলী সেদিন ভেবেছিল—কত বারই তো দেখলাম, কিন্তু গ্যারিকের এমন অভিনয় এর আগে যেন আর কখনো দেখিনি।

শেষ অভিনয়-রজনীতে অভিনয়ের অন্তে যখন যবনিকা নামলো তখন গ্যারিক আবেগে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন, অভিনয়ের শেষে প্রথানুযায়ী যে ভাষণ দেওয়ার রীতি তা দেবার শক্তি তাঁর লুপ্ত হয়েছে। বার বার করতালি-ধ্বনি হোতে লাগল। বার বার যবনিকা উঠল। অবশেষে স্খলিত কণ্ঠে কয়েকটি কথায় গ্যারিক দর্শক-সমাজের কাছে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। তার পরে ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে হাঁটতে মঞ্চ থেকে চলে যেতে লাগলেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও তাঁর আয়ত দুই চোখের প্রাণস্পর্শী দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য তখনো কিছু মাত্র ম্লান হয়নি; মমতায় ভরা গভীর সেই দৃষ্টি দর্শকদের প্রতি নিবদ্ধ রেখে তিনি করজোড়ে তাদের কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন!

তিন বছর পরে ১৭৭৯ সালের ২০শে জানুয়ারী তাঁর জীবনের যবনিকা নামে। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে সেক্সপীয়রের মর্ম্মর-মূর্ত্তির পাদদেশে তাঁর সমাধি রচিত হয়।

জন উইস

সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের জন্ত ভারতবর্ষে সমুদ্রপারের নাট্যসম্প্রদায় পূর্ব্বেও এসেছেন। কলকাতার সহরে সে অভিনয় আমরা দেখেছি। সম্প্রতি পুনরায় আরেক দল ভারতবর্ষে এসে দিল্লী সহর থেকে এখন কলকাতায় আসর জমিয়েছে। এই দলের সঙ্গে আছেন তিন জন অভিনেত্রী, চার জন অভিনেতা, মঞ্চ এবং ব্যবসার জন্ত দু'জন আর প্রয়োজক স্বয়ং। জন উইস সেক্সপীয়রের নাটকে নায়কের অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তিনিও এসেছেন।

বাংলার কবি ও কাব্য

[ময়নামতীর গান]

বিনোদশঙ্কর দাশ

বাংলা দেশে ইংরেজ আসবার আগে মংগল-কাব্য ছাড়া আর এক ধরণের কাব্য লেখা হয়েছিল—তাদের আমরা নাথ-কাব্য বলতে পারি। বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম মিশিয়ে একটি ধর্মমত তখন গড়ে উঠেছিল, সেই ধর্মের নাম যোগী বা নাথধর্ম। তাঁরা এক নূতন সাহিত্য ও মতের সৃষ্টি করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের ধর্ম বাংলা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এখন অবশ্য তাঁদের প্রভাব বাংলা দেশ থেকে ছেড়ে গেছে কিন্তু তাঁরা আমাদের যা' দিয়ে গেছেন, আমরা তা' এখনও ছাড়তে পারিনি। আমাদের নামের পরে যে 'নাথ' শব্দটি ব্যবহার করি তার ব্যবহার শুরু করেন এঁরা। এঁদের এক জন সিদ্ধপুরুষ চৌরংগীনাথের নাম থেকেই কোলকাতার বড়ো রাস্তাটায় নামকরণ হয়ে গেছে। বাংলা দেশে যুগী নামে যে জাত রয়েছে, অনেকে বলেন, তাদের জন্ম হয়েছে এই যোগী বা নাথ-সম্প্রদায় থেকেই। সব শেষে, তাঁদের রচিত কাব্যগুলি, যেমন গোরখবিজয় বা ময়নামতীর গান, এ-গুলি প্রাচীন বাংলার নর-নারীদের আনন্দ তো দিয়ে এসেছেই, এমন কি আজও সে-সব গান পাড়াগাঁয়ে শুনতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই সব কাহিনীগুলি সুদূর পাঞ্জাব, রাজপুতানা ছাড়িয়ে চলে গেছে। সেখানে এই গানগুলি গেয়ে এখনও যোগীরা ভিক্ষা করে বেড়ান। এমন কি, ময়নামতীর গান না কি অভিনয় করা হয়ে থাকে সে সব দেশে।

নাথ-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হলেন মীননাথ আর তাঁর শিষ্য গোরখনাথ; দু'জনেই সিদ্ধপুরুষ আর অলৌকিক প্রতিভাশালী। এঁরা একটি তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন—নাম তার মহাজ্ঞান। এই মহাজ্ঞানমন্ত্র জানলে জন্ম-মৃত্যুর সব রহস্য জানা যায়; এমন কি মৃত্যুকেও বাঁচানো যায়।

এক সময় গোরখনাথ মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের বাড়ীতে অতিথি হলেন। তিলকচন্দ্রের এক মেয়ে ছিল, নাম তার ময়নামতী, তিনি খুব ভক্তিমতী ও সেবাপরায়ণা। তিনি গোরখনাথের খুব সেবা-যত্ন করে প্রার্থনা জানালেন, "আপনি আমায় মহাজ্ঞান মন্ত্র দিন।" গোরখনাথ তাঁর সেবা-যত্নে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বললেন—"তাই হবে।" গোরখনাথ ময়নামতীকে মহাজ্ঞান মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। মন্ত্র লাভ করে ময়নামতী হ'য়ে [illegible] আর জ্ঞানবতী। তার পর তাঁর বিয়ে হোল রাজা মাণিকচাঁদের সঙ্গে। মাণিকচাঁদের অনেক রাণী। ময়নামতীর সঙ্গে এঁদের কারুর মনের মিল ছিল না। তখন রাজা ময়নামতীকে ফেরুসা নামে এক গ্রামে বসবাস করতে পাঠালেন। একে একে দিন কেটে যায়। সহসা রাজা পড়লেন মৃত্যুশয্যায়। বললেন, "ময়নামতীকে একবার ডেকে পাঠাও।" লোক গেল ময়নামতীকে ডাকতে। ময়নামতী তাড়াতাড়ি চলে এলেন, বললেন রাজাকে, "রাজা, আমি এমন মন্ত্র জানি যা' তুমি যদি শেখ তা হলে মরবে না।" রাজা বললেন, "তা' তো হতে পারে না। তুমি হলে আমার রাণী। আমি কি কখন গুরু বলে তোমার পদধূলি নিতে পারি? তার চেয়ে তুমি গুপীচাঁদকে এই মন্ত্র শিখিও।" রাণীর একমাত্র ছেলে গুপীচাঁদ। গুরু গোরখনাথের বরে তিনি একে পেয়েছেন। রাজা মারা গেলেন। সুতরাং গুপীচাঁদ এবার রাজা হবেন। সারা রাজ্যময় হোল উৎসব আর হৈ-চৈ। ময়নামতীর মনে কিন্তু সুখ নাই। কেন না, জন্মের সময় পণ্ডিত, পাঠক আর মোহন্ত-গোস্বামীরা একবাক্যে বলে গিয়েছিলেন যে, "এর আয়ু আঠারো বছর, তবে এই ছেলে যদি হাড়িফার পদসেবা করতে পারে তাহলে মরবে না।" হাড়িফা ময়নামতীর গুরুভাই। ময়নামতী তাঁরই হাতে ছেলেকে সঁপে দিতে চাইলেন। ছেলে কিন্তু বেঁকে বসল। বা-রে, এই সবে নূতন রাজা হয়েছি, হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যাকে বিভা করেছি, কতো আনন্দ করছি, আর মা কি না বলছেন সন্ন্যাসী হতে? রাণীরাও নাছোড়বান্দা। বলেন, "তা' কি হয়? রাজা কখনও গৃহত্যাগ করতে পারেন না।" অবশেষে কোন উপায় না দেখে ময়নামতী বললেন, "এই ছেলের—

"আঠারো বৎসর প্রমাই, উনিশে মরিবেক
হাড়িফার চরণ সেবি অমর হইবেক।"

সুতরাং বাঁচতে হলে হাড়িফার চরণ-পূজা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ একে করতেই হবে। গুপীচাঁদ মা'র উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে হাড়িফার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

তার পর কেটে গেল বারো বছর। হাড়িফা নানা রকম দুঃখে কষ্টে গুপীচাঁদকে ফেলে তার ধৈর্য্য পরীক্ষা করলেন। আর সব পরীক্ষাতেই গুপীচাঁদ কৃতিত্ব ও অটল দৃঢ়তার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তখন হাড়িফা তাঁকে রাজ্যে ফেরার অনুমতি দিলেন। দীর্ঘ বারো বছর সকলের উপর দিয়ে পরিবর্ত্তনের ঝড় বয়ে গেছে। তা' গুপীচাঁদ যখন রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন, কেউ তখন চিনতে পারলেন না তাঁকে। রাণীরা কুকুর লেলিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। কিন্তু কুকুর চিনতে পারলো তাঁকে। দৌড়ে কামড়াতে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়

তাঁর পায়ে। রাণীরা অবাক! এই সন্ন্যাসী কি তবে গুপীচাঁদ! গুপীচাঁদ তখন পরিচয় দিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে রাজা আবার রাজবেশ ধারণ করলেন। দেখতে দেখতে সারা রাজ্যে গুপীচাঁদের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ল; রাজ্যের রাজা মহাজ্ঞান মন্ত্র লাভ করে আবার তাঁর রাজ্যে ফিরে এসেছেন। চারি দিকে বসে গেল আনন্দের হাট, নানা রকম উৎসব আয়োজন। রাজা গুপীচাঁদ সেই উৎসব-কোলাহলের মধ্যে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে শুরু করলেন।

বাংলা-সাহিত্যের পুরাতন পুঁথি-পত্তরগুলি যাঁরা ঘাঁটছেন তাঁরা বলেন, এই গল্পের মূলে হয়তো কিছুটা সত্য কাহিনী আছে, কিন্তু তা এমন ভাবে কবি-কল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে যে, সত্যিকারের ইতিহাসটি বের করা এক রকম অসাধ্য হয়ে পড়েছে। হিন্দু-মুসলমান অনেক কবি এই গল্পটি নিয়ে কাব্য লিখেছেন, তার মধ্যে দুর্লভ মল্লিকের রচনাটিকেই সব চেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয়। এ ছাড়া ভবানী দাস, আবদুল সুকুর মোহম্মদের লেখা ময়নামতীর গানও বিশেষ নাম কিনেছে।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীঅমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দিন সকাল বেলা কলিকাতার কোন এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের বসিবার কক্ষে এক গরীব ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ভৃত্য আসিয়া বলিল, আজ দেখা হইবে না। তিনি বড় ব্যস্ত।

—'দেখা হবে না?' ব্রাহ্মণ হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তবু আশা ছাড়িলেন না। তিনি ঠিক করিলেন, যখন ব্যারিষ্টার মহাশয় বাহির হইবেন তখন তিনি দেখা করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে চিনিতেন না।

কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া অপেক্ষমান মোটরে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, 'শুনুন, আমি দাশ মশায়ের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু আমাকে কেউ দেখা করতে দিচ্ছে না। আমার বড় বিপদ।'

—'বিপদ? কি বিপদ?'

—'আজ আমার মেয়ের বিয়ে। কিন্তু হঠাৎ বরপক্ষ তিনশো টাকা বেশী চেয়েছে। যদি না দিতে পারি, আমার মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।'

—'ওঃ। আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আদালতে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব। তিনি আমার বন্ধু।'

আদালতে যাইয়া ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে একটি ঘরে বসাইয়া নিজের চেম্বারে গেলেন। সেখান হইতে একটি পাঁচশো টাকার চেক লোক মারফৎ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে হতবাক্। ইহাও কি সম্ভব!

—'যাঁহাকে দেখলাম না, দুঃখের কথা বললাম না, তাঁর সাহায্য নেব কি করে? তাঁকে আমি দেখতে চাই, কে এই সাহায্য-দাতা?'

ব্রাহ্মণের অনুরোধে সাহায্যদাতা দেখা দিলেন। অবাক-বিস্ময়ে ব্রাহ্মণ দেখিল, সারা রাস্তা মোটরে বসিয়া যাঁহাকে তিনি নিজের সকল দুঃখের কথা বলিয়াছেন, ইনি সেই ব্যক্তি।

তোমরা কি জান, এই দয়ালু মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি কে? আজ যাঁর দানের কথা গল্পের মত মনে হয়, তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

* * * *

ছোট একটি ছেলে।······ভীতু আর লাজুক বলে বন্ধু-মহলে তার আদর ছিল না একটুও।

এক দিন স্কুলের টিফিন হয়েছে। সেই ছোট ছেলেটি একটি গাছতলায় আপনমনে বসেছিল। এমন সময় সেখানে হাজির হল তার এক বন্ধু।

—এই, এই জর্জ্জ! শোন।

—এ্যাঁ? কে, ও, টমাস! কি বলছ?

—তোর ছুটির পর এই বইখানা জনকে দিয়ে যাস, বুঝলি। আমিই যেতাম, কিন্তু মাছ ধরতে যাচ্ছি কি না তাই যেতে পারব না। দিয়ে দিস, ভুলিসনি যেন।

···স্কুলের ছুটির পর জর্জ্জ বেরিয়ে এল তার বই-খাতাপত্র নিয়ে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল জনের বইখানা তাকে দিয়ে আসতে হবে। সে জনের বাড়ীর দিকেই এগোল।

মস্ত বড় বাড়ীটার সামনে এসে যখন জর্জ্জ দাঁড়াল তখন সে রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে। কান দু'টো আগুন হয়ে উঠেছে। একবার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জনকে ডাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব! লজ্জা তার গলাটাকে যেন চেপে ধরেছে। একটুও আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে, হতাশ হয়ে জর্জ্জ নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

এই ভীতু আর লাজুক ছেলেটির নাম জানতে কার না আগ্রহ হয়? এই ছেলেটিই ভবিষ্যতে জি-বি-এস নামে সারা পৃথিবীতে চমক লাগিয়েছিলেন। এঁর পুরো নাম জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'। শ'এর তীক্ষ্ণ লেখা ও কথাবার্ত্তা শুনলে তাঁর শৈশবের এই সব ঘটনা গল্প বলেই মনে হয়।

গল্প হলেও সত্যি

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

ট্রেণ ছুটে চলেছে হু-হু ক'রে। প্রথম শ্রেণীর একটি কামরার মধ্যে এক জন যাত্রী ঘুমুচ্ছেন। যাত্রীটি আসছিলেন কলকাতা থেকে। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামল। এক জন সাহেব মাল-পত্তর নিয়ে উঠল সেই কামরায়। সীটের অপর দিকে নিদ্রিত যাত্রীটিকে দেখে তার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। লোকটা যেমন মোটা তেমনি কদাকার! সাহেব বিরক্ত-মুখে ঘুমোবার ব্যবস্থা করতে থাকে।

ঘুমোতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল সীটের নীচে একজোড়া বিরাট নাগরা জুতো। বোধ হয় লোকটারই হবে। সাহেবের মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে! এক নেটিভের জুতো সামনে রেখে কি ঘুমোন যায়! উঠে এসে জুতোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেয়। তার পর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে সুরু করে।

কিছুক্ষণ পরে যাত্রীটির ঘুম ভাঙ্গল। নীচে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর জুতো নেই। এদিকে-সেদিকে তাকালেন, কিন্তু পেলেন না কোথাও। সাহেবের দিকে তাকালেন, ঘটনাটা অনুমান করতে বিশেষ কষ্ট হোল না। ধীরে-ধীরে উঠলেন, বাঙ্কের ওপর সাহেবের কোটটি ঝুলছিল, সেটি তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দেন, তার পর বসেন নিজের সীটে এসে।

সাহেব খানিকক্ষণ বাদে উঠে বসল। তার গন্তব্য স্থান এসে গেছে, নামতে হবে শীগ্‌গিরই। মাল-পত্তর সে গুছিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। বাঙ্কের ওপর থেকে কোট নিতে গিয়ে দেখে, বাঙ্ক শূন্য। কে নিল কোট? যাত্রীটির দিকে তাকায়। তিনি বসে আছেন জানলার দিকে চেয়ে, সাহেবের কাজে দৃক্‌পাত নেই কিছু মাত্র। সাহেব বুঝতে পারে, এই যাত্রীটিরই কাজ, ওই ফেলে দিয়েছে কোটটাকে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে সাহেব, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন যাত্রীকে, 'আমার কোট কোথায়?'

শান্ত ভাবে বলেন যাত্রীটি, 'তার আগে বল আমার জুতো কোথায়?'

সাহেব একটু থতমত খেয়ে যায়, এ রকম পাল্টা প্রশ্ন সে আশা করেনি। যাই হোক, কঠোর কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি ফেলে দিয়েছি।'

গম্ভীর ভাবে প্রত্যুত্তর দেন যাত্রীটি, 'তোমার কোট আমার জুতোকে খুঁজে আনতে গেছে।'

সেই বিশাল দেহ যাত্রীটির সঙ্গে আর বাদানুবাদ করবার সাহস হয় না সাহেবের, ভাল মানুষের মত ষ্টেশনে নেমে যায়।

এর পর বোধ হয় আর বলবার দরকার হবে না যাত্রীটি কে? সেই পরাধীনতার যুগে আশুতোষ যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ভাবলে আজও আমাদের মনে বিস্ময় জাগে।

চালস্‌ চ্যাপলিনের গল্প

সুখেন্দু দত্ত

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক চার্লস্‌ চ্যাপলিনের নাম তোমরা সবাই শুনে থাকবে। কেউ কেউ হয়ত তাঁর তোলা ছবিও দেখেছ দু'-একখানা। গত ত্রিশ বছর যাবৎ চ্যাপলিন চমৎকার সব ছবি তুলে আসছেন আর এই সময়ের মধ্যে প্রায় খান পনের ছবি তিনি তুলেছেন। এই ছবি ক'খানাই চ্যাপলিনকে চলচ্চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে সম্মান এনে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়। চ্যাপলিনের মত অমন জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পারেননি ও-দেশের কোন অভিনেতা। সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকে—ও-দেশে বিকেলের শো-তে টিকিটের দাম কম বলে যারা দলে-দলে ছুটে আসে ছবি দেখতে—তাদের কাছ থেকে চ্যাপলিন পেয়ে থাকেন উচ্ছসিত প্রশংসা। কারণ এই সব দর্শকেরা চ্যাপলিনের ছবিতে সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের নিজেদের জন্য, একটা সত্যিকারের দরদ দেখতে পান।

অবশ্য এতে অবাক হবারও কিছু নেই। দারিদ্র্যের পরিচয় চ্যাপলিন তাঁর নিজের জীবনেও যথেষ্টই পেয়েছেন। ছোটবেলায় ——— এমন ছিল যে, সব সময়ে পেট ভরে খাওয়া পর্যন্ত জুটতো না তাঁর। বেশ কিছু কাল তাঁকে একটা "পুওর-হাউসে" পর্যন্ত কাটাতে হয়েছিল। এই সব "পুওর-হাউসে" সাধারণের খরচে দরিদ্রদের ভরণপোষণ করা হয়। পরবর্তী জীবনেও চ্যাপলিন তাঁর এই তিক্ত শৈশবের কথা ভুলে যাননি কোন দিন। তাই তো তাঁর যত বইয়ের নায়ক হন সব কারা জান? যত রাজ্যের ভবঘুরে, নাপিত, কারখানার মিস্ত্রী, ব্যাঙ্কের কেরাণী—এই সব!

এ হেন চ্যাপলিনের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। তার মধ্যে একটা ভারি মজার গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। এটা কিন্তু কাল্পনিক কোন কাহিনী নয়, সত্যিকারের গল্প। ঘটনাটা ঘটেছিল মাস ছয়েক আগে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহরে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় বাসে চেপে হোটেলে ফিরবার পর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে চ্যাপলিন দেখেন যে, তাঁর কোটের পকেটে একটা দামী সোনার ঘড়ি। ঘড়িটা তিনি এর আগে আর কখনও দেখেননি, তাঁর নিজের তো নয়ই। তিনি তো ভেবেই পেলেন না যে, এটা কি করে তাঁর পকেটে এল। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত চ্যাপলিন ও-আপদ পুলিশের কাছেই জমা দিয়ে দেবেন বলে স্থির করে ফেললেন এবং করলেনও তাই।

এর পরের দিনই তিনি একখানা চিঠি পেলেন। পত্রলেখক তাঁকে সবিনয়ে জানিয়েছেন:

"পকেট-মারাই আমার বৃত্তি। কাল যখন বাসে আমার ... চেয়ে প্রিয় অভিনেতাকে দেখলাম তখন পাশের ... ভদ্রলোকের পকেট থেকে তাঁর ঘড়িটা তুলে আপনার পকেটে রেখে দিয়েছি। আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ ... করে ওটা আপনি রেখে দেবেন।"

এই ধরণের "শ্রদ্ধার নিদর্শন" গ্রহণ করতে চ্যাপলিন অবশ্য কত রাজী ছিলেন বলা শক্ত! সে যাই হোক, এদিকে পুলিশ ঘড়ির মালিকের কোন সন্ধান করতে না পেরে ঘড়িটা চ্যাপলিনকেই ফিরিয়ে দিয়ে যায়। ব্যাপারটাও আর চাপা রইল না। একে চার্লি চ্যাপলিন, তায় আবার এ-রকম একটা মজার কাণ্ড! কাগজওয়ালারা তো খবরটা একেবারে লুফে নিল। মার্কিণ সংবাদপত্রে খুব ফলাও করে ছাপা হল যে, পকেটমারেরাও চ্যাপলিনকে কত ভালবাসে। ঘড়ির আসল মালিকও তাঁর ঘড়ি চুরি যাওয়ার রহস্য জানতে পারলেন এবার খবরের কাগজ থেকে।

উঁহু, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। ঘড়ির মালিক কিন্তু এ আবার এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যাতে তিনি চ্যাপলিনের পকেটমার ভক্তটিকেও টেক্কা মেরে গেলেন একেবারে!

কয়েক দিন বাদেই চ্যাপলিন আর একখানা চিঠি পেলেন। তাতে তাঁকে লেখা হয়েছে:

"মিঃ চ্যাপলিন, ঘড়িটা আমার পকেট থেকেই চুরি গিয়েছে। খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেলাম, এক পকেটমার আপনাকে উপহার দিয়েছে। ওটা আপনার কাছেই থাক। আর সেই পকেটমারের চাইতেও আমি যে আপনাকে শ্রদ্ধা করি তার প্রমাণ-স্বরূপ ঘড়ির চেনটাও এই পাঠিয়ে দিলাম।" ব্যাপার দেখে চ্যাপলিন তো অবাক্!

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
কিনিবার সময়
আসল জিনিষ
দেখিয়া লইবেন
CASTOROL
La-bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯
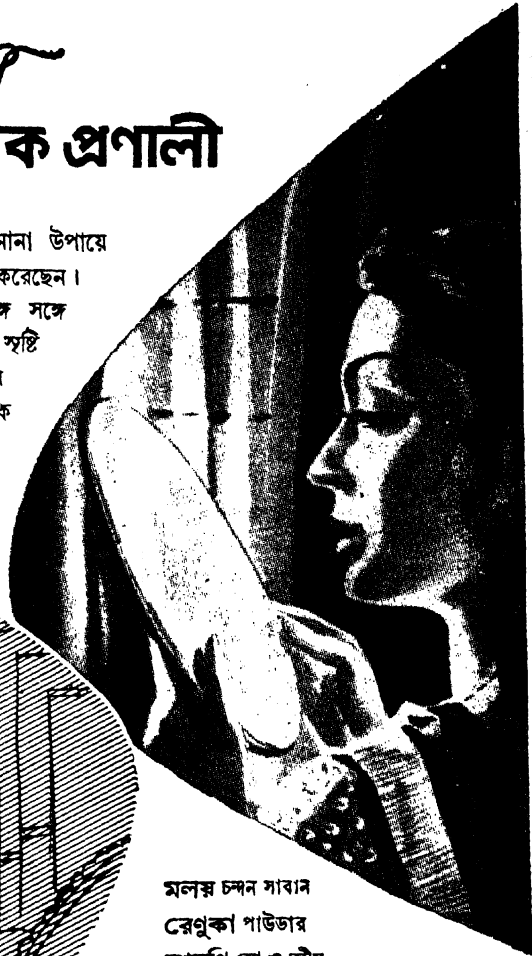
গল্প হলেও সত্যি

মণি মাইতি

অনেক দিনের কথা। তখনও এই আধুনিক কলকাতার জন্ম হয়নি। তখনও এই সৌন্দর্য্যময়ী নগরীর বুকে আজকের মত অসংখ্য বিদ্যাভবনের ভিৎ পোতা হয়নি। তখন ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা, টোল প্রভৃতি, আর ছিল তখনকার মহামান্য শাসকগণের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মিশনারী বিদ্যালয়। দেশীয় ভাষার অপমৃত্যু ঘটিয়ে বিদেশী ভাষার জন্ম দেবার জন্য গড়ে উঠেছিল এই বিদ্যালয়গুলি; আরও একটি প্রয়োজন ছিল—সস্তা কেরাণী তৈরী করবার জন্য। থাক সে কথা, এখন যে দুষ্ট ছেলেটির কথা বলতে বসেছি তাই এখন বলব।

কলকাতার প্রাচীন এক বনিয়াদি অভিজাত বংশে তার জন্ম। শিক্ষাই ছিল এই বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই ছেলে বেলাতেই বাড়ীর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাকে পাঠশালে গুরু মশায়ের নিকট পাঠ অভ্যাসের নিমিত্ত গমন করতে হত। গুরু মশায় ছিলেন ভীষণ বদরাগী। দুষ্ট ছাত্রদের তাঁর সেই লাল দেড়-হাতি বেত্র দ্বারা বেদম প্রহার করে দুষ্টামি থেকে যাতে বিরত থাকে, সেই চেষ্টা করতেন। গুরু মশায় যখন তাঁর সেই লাল বেত্রটি ছাত্রদের সামনে লক্-লক্ করে নাচাতেন তখন ছাত্ররা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। দুষ্টুমির কথা তারা চিন্তাই করতে পারত না। কিন্তু এই ছেলেটি দুষ্টুমির কথা চিন্তা করতে পারত না বটে, তবে সেই সময় ছেলেটি এক অভিনব চিন্তা করত। সে ভাবত যে, সে যদি এই রকম একটি গুরু মশায় হয়, আর তার কয়েকটি দুষ্ট ছাত্র থাকে, তবে সেও এইরূপ ভাবে তার দুষ্ট ছাত্রদের বেত্রাঘাত করে একে একে সোজা করবে। এই চিন্তা এক দিন তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। তাকে গুরু মশাই হতেই হবে। আর তার দুষ্ট ছাত্রদের প্রহার করে সোজা করতেই হবে। শিশু-মনের এমনি বৈশিষ্ট্য যে, সে মনে-মনে যা অভিনব বলে চিন্তা করবে, চোখের সামনে দেখে যা অনুভব করে, তাই তার হবার, তা করবার ইচ্ছা যাবে। তাই এক দিন দ্বিপ্রহরে যখন বাড়ীর সকলে দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিল, চাকর-বাকররা যে-যার মহলে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময় এই দুষ্ট ছেলেটি বাড়ীর সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্বাধীন সত্তা নিয়ে বহু চেষ্টায় একটি বেত্র সংগ্রহ করে বাড়ীর নির্জ্জন বড় বারান্দায় এসে উপস্থিত হয়েছে। সে ভাবল এটাই হবে তার পাঠশালা আর সে নিজে হবে গুরু মশায়। কিন্তু ছাত্র কোথায়? তার সেই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে চিন্তার স্রোত বইতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তার ছাত্র স্থির করতে পারল না। কিন্তু সে এক দিন পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করবে, তার এই সামান্য বিষয়ের সমাধান করতে বেশী কালক্ষয় হয় না। সামনেই তাঁর অসংখ্য বারান্দার রেলিং দৃষ্টিগোচর হ'ল। সেগুলিকেই সে তার ছাত্র বানিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাল-মন্দ ছাত্র স্থির করে নিল। আর তার পর বেত্র দ্বারা বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করল দুষ্ট ছেলেদের। অনুকরণপ্রিয়তা শিশুর স্বভাব অনুযায়ী এই দুষ্টটি সেদিন গুরু মশায়ের অভিনয় করল। এইরূপে সে প্রায়ই গুরু মশায় সেজে রেলিংগুলোকে বেদম প্রহার করত। গুরু মশায়ের বেত্রাঘাতে দুষ্ট ছাত্রদের গায়ে যেমন দাগ পড়ে যেত, তেমন দাগ না পড়া পর্য্যন্ত সে তার ছাত্র রেলিংগুলোকে প্রহার করত। এই দুষ্ট ছেলেটি কে জানো? এই দুষ্ট ছেলেটি সকলেরই কাছে চিরপরিচিত। শুধু আমাদের দেশে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে সে পরিচিত হয়েছে, খ্যাতি অর্জ্জন করেছে শেষ বয়স পর্য্যন্ত। এই দুষ্ট ছেলেটির নামই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি বিজ্ঞপ্তি

মাসিক বসুমতীর ১৩৫৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "সাহিত্য পরিচয়ে" প্রকাশিত একটি নামহীন রচনা সাহিত্যিক-মহলে অত্যন্ত ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিষয়টি অনেক পরে আমাদের গোচরে আসে। নতুবা আমরা তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে আলোকপাত করিতাম। উক্ত লেখাটিতে ১৩৫৫ সালের শারদীয়া সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে কয়েক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের প্রতি কটু-কাটব্য করা হয়, যথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কয়েক জন। লেখায় কোন নাম না দেখিয়া অনেকে আমাকে না কি উক্ত লেখার লেখক হিসাবে ধার্য্য করেন এবং আমার প্রতি মনে মনে কোপ পোষণ করেন। এখন জানাইতে বাধা নাই, উক্ত লেখার লেখক বর্ত্তমান সম্পাদক নহেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত লেখার লেখকের নাম আমরা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না, তবে সাহিত্যিক-মহলে যিনি 'শ্রীবৎস' নামে পরিচিত তিনিই সেই রচনার লেখক। তিনি দৈনিক বসুমতীতে কিছু কাল সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।—সম্পাদক

আকাশ-পাতাল

[১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট রাজস্ব অবধারিত কিস্তী মোতাবেক কালেক্টরিতে দাখিল করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারেশানক্রমে জমিদারী উপভোগ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, মালিক ইচ্ছানুসারে জমি দান, বিক্রয়, বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, মালিক ইচ্ছানুসারে পত্তনি, মৌরশী, মকররি প্রভৃতি অধীন স্বত্বের সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ, সনন্দ দ্বারা নিষ্কর, চাকরাণ প্রভৃতির সৃজন করিতে পারিবেন।

পঞ্চমতঃ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে আপোষে বা আইনের সাহায্যে কর আদায় করিতে পারিবেন।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছে কৃষ্ণকিশোর। ম্যানেজার বাবুর জ্ঞানের পরিধি দেখে শ্রদ্ধায় মন তার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর প্রতি। তা ছাড়া নিজের মনে যে-সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তাও সে স্বেচ্ছায় জিজ্ঞেস করেছে। কাছারীতে এই যে এত লোক, এত বিভাগে কলম পিষছে দিবারাত্র তারা কে, কেন রয়েছে জানতে চেয়েছে সে। বলেছে,—আমিন, জমানবিশ, খাতাঞ্চী, মোক্তার, মহাফেজ, মুন্সী এরা সব কারা?

শুনে মৃদু হেসেছিলেন ম্যানেজার বাবু। বলেছিলেন,—শুনে অতি খুশী হলাম হুজুর। একে একে শুনুন তা হলে বলি। সমস্ত আদায় ওয়াশীলের কাগজ পরীক্ষার জন্য আমিন সেরেস্তায় প্রয়োজন হুজুর। জমা সম্বন্ধীয় সমুদয় রেজেষ্টী রাখা এবং মফঃস্বলের আদায় ওয়াশীলের ওপর control রাখার জন্য জমা সেরেস্তা। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য হুজুর আপনার গিয়ে খাতাঞ্চী সেরেস্তা। তার পর হুজুর, আপনার গিয়ে মকদ্দমা সংক্রান্ত রেজেষ্টী রাখা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করার জন্য মকর্দ্দমা সেরেস্তার আবশ্যক। জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজাত ও দলিলাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুজুর আপনার গিয়ে মহাফেজ সেরেস্তা। সদর এবং মফঃস্বলের মধ্যে পত্র ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ আপনার গিয়ে correspondence-এর নিমিত্ত মুন্সী সেরেস্তার একান্ত প্রয়োজন হুজুর। বুঝতে সব কিছু না পারলেও মন দিয়ে শুনেছে সে।

ম্যানেজার বাবু বলেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। হেমনলিনী আগে আগে যেমন ছড়া কেটে-কেটে শোনাতেন, প্রায় সেই রকম গল্পের ছলে বলে গেছেন ম্যানেজার বাবু। চণ্ডীমহলে এবার না কি অসময়ে পুণ্যাহ হবে। মা গঙ্গা এবার না কি মুখ তুলে চেয়েছেন। অনেক নতুন চর মাথা তুলেছে চণ্ডীমহল তওজীরের সীমানায়। চতুর্গুণ নিরিখে বিলি হয়েছে সেই সব জমি। পুণ্যাহ এবার তাই পৌষ-লক্ষ্মীতে না হয়ে বৈশাখেই অনুষ্ঠিত হবে। ম্যানেজার বাবুর সেই আদেশ-পত্র সই হ'তে পাঠিয়েছেন কলকাতার সদরে। আদেশ-পত্রটির লেফাফায় লেখা আছে, বহুল সম্মানপুরঃসর মমানুগ্রাহক মহেকাত্তমসন্দ প্রবল প্রতাপেষু, ইত্যাদি। আদেশ-পত্রটি এইরূপ।

শ্রীহরি শরণং

চণ্ডীমহল কাছারী
১২৮৫ সালের ১১ই বৈশাখ
পত্র নং ৬

বিহার প্রদেশে মদীয় জমিদারী ৫৮৭ নং তৌজির মহাল লাট রঘুনাথপুর খোরারী ওরফে রঘুনাথপুর বরারী ও ৫১০ নং তৌজির মহাল মৌজে চণ্ডীমহল বরারী কলম আওয়েল ও ৩৩৪৬ নং তৌজির মহাল মৌজে চণ্ডীমহল বরারী কলম দুয়ের দিগরের বকলম এষ্টেটের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীগুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখনং আগে উক্ত মহলের ফসলী সন ১২৮৫ সালের কর গ্রহণের শুভ পুণ্যাহের দিন আগামী ২৩শে বৈশাখ রবিবার বেলা ৭৷৩০ মিনিট হইতে ১১৷৩০ মধ্যে দিন ও সময় নির্ণয় করিয়া দেখা যায় আপনি নিয়মানুসারে সাধারণ প্রজাবর্গকে নিমন্ত্রণ করতঃ উক্ত শুভ দিনে শুভ নিয়মানুসারে পুণ্যাহ পূজাদি সমাপনান্তে শুভক্ষণে শুভ পুণ্যাহ করা হইলে এবং পুণ্যাহের আদায়ী বকেয়া শোধ ও হাল সনের টাকা কলিকাতা সদর অফিসে যাহাতে সদস্তকরণ হুজুর বসেন এবং লাগোয়া বাড়ীকে বসবাস করেন, সেইখানে চালান দিবেন। কামনা দধি মৎস্য সহ পাঠাইবেন।

চিঠিতে যে সব কথা জানিয়েছেন তা প্রতিপালিত করবেন কলকাতার সদর কার্য্যালয়ের নিযুক্ত নায়েব মশাই। কৃষ্ণকিশোর শুধু একটা সই করবে আদেশ-পত্রের শেষে। তাতেই প্রথম বারে কত আনন্দের অশ্রু পড়েছিল কুমুদিনীর চোখ থেকে। ছেলে তো তাঁর নামটাও সই করতে শিখেছে।

অনন্তরাম টানা-পাখার আওতায় এসে একটু বা ঢলে পড়ে তন্দ্রায়। দেওয়াল ঘেঁষে বসে। কি মনে হয়, কৃষ্ণকিশোর ঘরের বাইরে যেতে চায়। খসখসী-টাটির অন্ধকার থেকে আগুনের হলকায়। বাইরে সোঁ-সোঁ শব্দ; বৈশাখী হাওয়ায় ভাসছে যেন কাঠফাটা রোদ্দুর। পুড়ে যাচ্ছে যেন গাছ-পালা, পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী।

গ্রীষ্মকালে কুমুদিনী জলসত্রের ব্যবস্থা করেন।

ফটকের এক-পাশে হোগলার একটা ছাউনী পড়ে। তৃষার্ত্ত পথিকের তৃষা নিবারণের একটা স্থান হয়। ছোলা, গুড় আর শীতল বারি বিতরিত হয়। যে আসে সেই পায়। দশটা থেকে পাঁচটা লোক থাকে ছাউনীতে।

বৈঠকখানার সামনে লম্বা দালান। সামনে সোজা ফটক।

ঘর থেকে বেরিয়ে সেই দালান থেকে ফটক শুধু নয়, সম্মুখের অপর দিগন্ত চোখে পড়ে। গাছের সারি আর ইটের তৈরী সব বাড়ী। মধ্য দিনের সূর্য্যতেজে ঝলসে গেছে যেন। কৃষ্ণকিশোর আকাশে চোখ মেলে। শুভ্র অনন্ত আকাশ। কয়েকটা চিল শুধু স্থির ডানা ছড়িয়ে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে উড়ে নয় যেন চরে বেড়াচ্ছে অতি ধীর-গতিতে। গোমস্তাদের এক-জন, প্রায় ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ এসে উপস্থিত। কাছাকাছি এসে বললে,—হুজুর, থাকবেন না এখানে। চলে যান শীঘ্রি! একেবারে অন্দরে চলে যান।

বিস্ময় নয়, অত্যন্ত ভাতু মনে হয় যেন লোকটিকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কেন বলুন তো? কি হয়েছে কি?

কানের কলমটা খ'সে পড়ে যায় লোকটির তাড়াহুড়ায়। কলম তুলে নিয়ে পুনরায় বলে,—হুজুর, বড়বাবু আসছেন হুজুর। আপনি চলে যান এখান থেকে। শীঘ্রি যান হুজুর, দেরী করবেন না। শেষটায় কি একটা—

এতক্ষণে ব্যাপারটা ঠাওরাতে পারে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। দেখবেন, একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবেন না যেন। তিনি কি মদ্যপান করেছেন?

—হুজুর, সে আর শুনে কাজ নেই। একেবারে চুর যাকে বলে। আপনি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন। লোকটি এবার যেন সত্যিই ভয় পেয়েছে। দেখছে ইদিক-সিদিক। দেখছে মালিককে দেখতে পেলেন কিনা বড়বাবু।

বড় বাড়ীর বড়বাবু। প্রিন্স অব ওয়েলস্! পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। শহর কলকাতার নামজাদাদের এক জন চাঁই বললেও হয়তো ঠিক বলা হবে না। সকাল থেকে জল পান করেন না পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। যা পান করেন তার নামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশী-বিলিতি যখন যা পান।

কেন কি কারণে বেলা বারোটা থেকে একেবারে বেঠিক হয়ে গেছেন। দাঁড়াতে পারছেন না, পড়ে যাচ্ছেন টলতে-টলতে। তিনি জ্যেষ্ঠ, তাই তাঁর দাবী অগ্রগণ্য। এই তাঁর বক্তব্য তিনি যা করবেন তাই হবে। যা বলবেন তাই।

কাছারীতে ঢুকে সব তচনচ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পূর্ণেন্দ্রশেখর। গোমস্তারা হেই-হেই ক'রে ছুটে এসেছে। সামলেছে পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। আর তিনি একেবারে গলা ছেড়ে কাঁচা খিস্তী করতে শুরু করে দিয়েছেন বেমালুম।

বড়বাবুর আকৃতি অদ্ভুত। দৈর্ঘ্যে মাত্র সাড়ে চার হাতও হবেন কি না সন্দেহ, প্রস্থে কত তা কেউ মেপে দেখতে সাহসী হয়নি এখনও পর্য্যন্ত। অবশ্য খেয়াল হলে তিনি না কি স্বীকার করেন যখনও সখনও, যে তিনি ঠিক যেন ঐ মদের পিপের মত। যার মনে যা ধরে, তিনি মদের পক্ষপাতী, অর্থাৎ তাই পিপের মতই মনে হয়েছে তাঁর।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এক নারীর প্রতি গভীর আকর্ষণে আকৃষ্ট। সহরের বাবু-মহলে অনেকেই জানেন, কোন এক নারীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ রাগসূত্রে না কি আবদ্ধ। এক কড়া-ক্রান্তিও খরচের না কি হিসেব নেই, সেই নারীই ভুলিয়ে রেখেছে বড়বাবুকে। পূর্ণেন্দ্র কেবল মাত্র জড়োয়া গয়না দেখিয়ে মনোহরণ করেছেন সে-নারীর। সেই নারীর নাম না কি বড়বাবুর ডান হাতে উল্কীর নক্সার ভেতরে লেখা আছে। কুন্দরা, না ঐ ধরণের কি একটা নাম!

কুন্দরাকে বড়বাবু না কি নীলকান্ত-মণির আঙটি উপহার দিয়েছেন। ছাঁকা পান্নার বালা! মুক্তার পাঁচ-নরী! নবরত্নের বক্‌টি-পিন্! চুণীর কণ্ঠী। হীরের ঝাপটা।

তিনি জ্যেষ্ঠ সেই অজুহাতে স্বর্গতা পিতামহী, প্রপিতামহীর অঙ্গের ভূষণ না কি যাকে-তাকে বিলিয়ে দেওয়ার অধিকারও তাঁর আছে।

সেই গয়না পরিয়ে কুন্দরাকে সঙ্গে নিয়ে একেক রাতে হয়তো বা জেদের বাড়ীতে এসেই হাজির হয়েছেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। গৃহে পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের পরমাসুন্দরী স্ত্রী। তিনি মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে গেছেন সে-ঘটনা চোখের সামনে দেখে। বড়বাবু আর কুন্দরাকে পাশাপাশি দেখে!

এ-বাড়ীর 'পরে তাঁর আক্রোশের কারণ, এই বালকের যদি কোন প্রকারে মৃত্যু ঘটে, তাতে না কি পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের প্রচুর লাভ। সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারেন তিনি—এই তাঁর ধারণা।

মদের নেশায় কি করেন, কি বলেন সেই ভেবে অন্দরে চলে যায় কৃষ্ণকিশোর। নিজের ঘরে চলে যায়।

অনন্তরাম তখনও ভোঁস-ভোঁস ক'রে নাক ডাকায়। ঘুমোয় অঘোরে। কিছু জানতে পারে না। আর উজবুকটা তখনও হুজুর ঘরে আছেন অনুমানে টানাপাখার দড়ি টেনে যায় অবিরাম। প্রায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে। আর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয় বৈঠকখানায়।

অন্দর থেকে সদরের কথাবার্ত্তা কেন চেঁচামেচিও শোনা যায় না।

বড়বাবু তার-স্বরে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে যান ফটকের বাইরে। দু' জন পাইক তাঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যায়। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ গেলেন বলতে বলতে,—দেখে নেবো না উল্লুকের বাচ্ছাকে! শালা আমাদের জমিদার হয়েছে, কিশোর শালা কি না জমিদারীর মালিক? ফুঃ—

বলতে বলতে হঠাৎ পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ হো-হো শব্দে অট্টহাসি শুরু করলেন। যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন ফটকের কাছ বরাবর। খাতাঞ্চীদের এক জন তামাসা দেখছিল সহাস্যে। নাম তার ফটিকচাঁদ দাস। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ তার দুই গাল দু' আঙুলে ধ'রে বললেন,—কি হে প্রাণ-সজনী! হুজুর কোথা?

ফটিকচাঁদ চার হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে,—কি জানি, হুজুর হয়তো অন্দরে রয়েছেন।

শুনে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। চলে যেতে-যেতে বললেন,—হুজুরকে জানিয়ে দিও, ভবিষ্যতে আর মুখ দেখাতে হচ্ছে না সমাজে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এমন ব্যবস্থা করেছি, বাছাধনকে আমার শ্বশুর-ঘর করতে হচ্ছে না আর! "কাতুকুতু" কাগজে কেচ্ছা ছাপিয়ে দেবো তোমার হুজুর নামে, দেখবে, যে হবে না। শালা কি না জমিদার হয়েছে!

কথার শেষে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে থাকলেন না পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। টলটলায়মান অবস্থায় ফটকের বাইরে চলে গেলেন। ফটিকচাঁদ সব শুনে শুধু বললে,—যে আজ্ঞে। হুজুরকে জানিয়ে দেবো।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণে সারা কাছারীর মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঢং-ঢং শব্দে চারটে বাজলো।

ঘরে বসে থাকতে মন চায় না। দিকে-দিকে যেন বহ্নি বহে।

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। টম ঘরের এক কোণে একটা কেদারার তলায় চুপটি ক'রে বসে থাকে। লালাসিক্ত জিহ্বা তার বেরিয়ে পড়েছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে টম। উত্তাপের বিভীষিকা আর দাবানলের সন্তাপে কাতর হয়ে পড়েছে। পিপাসায় পশুর শুষ্ককণ্ঠ!

বড় বেশী মনে পড়ছে অরুণেন্দ্রকে আজ।

কেমন আছে, কি করছে এখন কে জানে। হিন্দু কলেজে পড়ছে কি? না উড়ো খৈ বাউণ্ডুলের মত সময় নেই, অসময় নেই যখন-তখন ঘুরছে পথে-পথে। গৃহবাসের একমাত্র যে আকর্ষণ ছিল তার, সেই লিলিয়ান তো চলে গেছে স্বর্গে। আর কে আছে। নষ্টপ্রাণ বিনয়েন্দ্র, অরুণের পিতা?

ফার্ষ্ট বুক প'ড়ে থাকে বিছানায়। পাতা-খোলা অবস্থায়। কৃষ্ণকিশোর চটি জুতার শব্দ না ক'রে সন্তর্পণে সদরে চলে যায়। তার ঘরের খানকয়েক ঘরের পরেই কুমুদিনীর ঘর। তিনি একাদশীর উপবাস ক'রে হয়তো এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।

না, কুমুদিনী এখন এক খণ্ড হালের 'বঙ্গদর্শন' পড়ছেন। কি এক ধারাবাহিক উপন্যাস চলেছে।—পড়ছেন সাগ্রহে।

সদরে যেতেই দেখতে পায় অনন্তরাম হাই তুলতে তুলতে বৈঠকখানা থেকে বেরোচ্ছে। রৌদ্রের প্রখরতায় ঘুমভাঙ্গা চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে ফেলে। কৃষ্ণকিশোর তাকে দেখেই বললে,—অনন্তদা, কি ব্যাপার হয়ে গেল দেখলে না? প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোলে!

চোখ খুলে বলে অনন্তরাম,—কি হ'ল আবার?

কৃষ্ণকিশোর হাসতে হাসতে বললে,—প্রিন্স অব ওয়েলস্ এসেছিলেন! আমি তো ভেতরে চলে গেলাম। কখন গেছেন কি জানি!

টুসকি দিতে-দিতে আর একটা হাই তুলে জিজ্ঞেস করলে অনন্তরাম,—মত্ত অবস্থায় ছিলেন তো?

—তাই তো শুনলাম। কৃষ্ণকিশোর বলে,—আমার না কি সন্ধান ক'রেছিলেন খাতাঞ্জী বললেন।

—আস্ত খেয়ে ফেলে নাই তো? কথার শেষে চলতে শুরু করে অনন্তরাম। মুখে-চোখে জল দিতে যায়।

কথা শুনে হেসে ফেললো সে। অনন্তরাম অদৃশ্য হ'তে সম্মুখের আকাশের দিকে চোখ তুললো।

• •

হের প্রিয়ে গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর।

সলিল সন্ধানে হুত হুতাশন। তীক্ষ্ণকর দিনমণি। প্রচণ্ড পবনে ধূলি উত্তলিছে গগনে। বাতাসে অনল; শুষ্কপত্র ঝরে। শুষ্কপর্ণ শাখা, দগ্ধতৃণাঙ্কুর আর কচি কিশলয়। শন্-শন্ শব্দ। পিপাসায় পথিকের শুষ্ক কণ্ঠ। মদন মাদন এই ঋতুর বিভব, শুধু যামিনীতে কামিজন করে অনুভব।

এক বিন্দু জল। দাও এক কণা ছায়া। জলসত্রে আর্ত্ত মানুষের আগমন।

খানিক বাদে অনন্তরাম কখন এসে পেছন থেকে বলে,—সানাই শুনছিস্?

এতক্ষণে যেন কানে পৌঁছয় সে-শব্দ।

সত্যিই সানাই বাজে কোথায় এই অগ্নিময় বিভীষিকায়! রাগ-রাগিণীর খেলা চলে বাঁশীতে। বেলা-শেষে পূরবীর তান ধরে সানাইওলা। স্তব্ধ হয়ে শোনে যেন এ অঞ্চল। কার বাড়ীতে কিসের উৎসব কে জানে!

অনন্তরাম বললে,—মা'র সঙ্গে কথা বলেছিস আজ?

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না, তিনিও কথা বলেননি। পায়চারী করতে শুরু করে সে, সদরের দালানে। এদিক থেকে ওদিকে যায় আবার ওদিক থেকে ইদিকে আসে। টম ছুটতে ছুটতে আসে ভেতর থেকে। দাঁড়ায় না প্রভুর কাছে, ফটকের দিকে ছোটে! এক বিন্দু জল যদি পাওয়া যায় ঐ জলসত্রের ধারে-কাছে কোথাও! লোম নাচিয়ে ছোটে টম।

অনন্তরাম ভেতরে চলে গেছলো। কোথা থেকে এসে কানে-কানে বললে,—তোর পড়ার ঘরে কে এসেছেন রে?

—কে বল তো? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

—বিশ্বাস না হয় দেখবি আয়।

অনন্তরামের পিছু-পিছু গিয়ে পড়ার ঘরে কাকেও দেখতে না পেয়ে সে বললে,—কে আবার এলো?

—এলো নয় গেলো। প্রতিমা দেখবি? রহস্যের সুরে বললে অনন্তরাম। জানলার বাইরে ভাখ্, আকাশে প্রতিমা।

আইভিলতা? ঐ তো বাতায়ন-পথে।

লাল চেলী কেন। অঙ্গে ফুলের গয়না। মুকুট কেন মাথায়? গোলাপ কুঁড়ির। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর।

হঠাৎ মুখ খিঁচিয়ে অনন্তরাম বললে,—নমস্কার জানাও না মুখ্যু। দেখছিস্ না হাত তুলে তোকে নমস্কার করছে।

আইভিলতা করজোড় কপালে স্পর্শ করে।

পর-মুহূর্ত্তেই সরে যায় বাতায়ন থেকে। বোধ হয় কনের পিঁড়েয় বসতে যায়। এবার বুঝতে পারে কেন এমন অসময়ে বাজে সানাই। অবাক-বিস্ময়ে কৃষ্ণকিশোর চেয়ে থাকে ঐ শূন্য বাতায়নে।

সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে ভাঙা-মনে। জুড়ী ঢিমে-তালে চলে। দিন-শেষের পথ লোকে লোকারণ্য। জুড়ীর গতি কোন্ দিকে হয় শেষ পর্য্যন্ত কে জানে।

তার কানে তখনও সানাইয়ের রেশ! চোখে আইভিলতার লাল-চেলী। আর ফুলের গয়না।

[ক্রমশঃ।

—অন্তরা সম্বন্ধে—

[অন্তরার লেখক জানিয়েছেন যে তিনি না কি সাগরপারে চলে যাচ্ছেন। সেই হেতু যথাসময়ে হয়তো প্রতি মাসের লেখা পাঠাতে পারবেন না। 'অন্তরা' সবে শুরু হয়েছিল এবং গল্প এখনও তত জমে ওঠেনি। অন্তরা শুরুতেই শেষ হচ্ছে জানবেন। পাঠক-পাঠিকা আমাদের দোষ ধরবেন না।—স]

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ

শ্যামাপুর মহালটি বাগুলী ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধ তালুক। সাতকড়ি সামন্ত নামে বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া তহশীলদাররূপে এখানে বাহাল আছে। ফটিক পাল ও শীতল রায় নামে দুই জন মুহুরী, তিন জন পিয়াদা এবং পাইক ও খিদমৎদার ভৃত্যাদি লইয়া অতিরিক্ত আরও সাত-আট ব্যক্তি প্রধান তহশীলদার নায়েব মহাশয়ের অধীনে এখানে নিযুক্ত আছে। ষ্টেটের অন্যান্য কাছারীগুলির মত এখানেও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, দীর্ঘিকা, ঝিল, বাসোপযোগী বড় বড় বাড়ী দর্শনীয় বস্তুরূপে বাগুলীর ভূস্বামীদের উদ্দেশে বহু বর্ষ ধরিয়া প্রজাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

যে-সকল গুণ থাকিলে মফঃস্বলের তহশীলদারগণ সদরে অবস্থিত জমিদার-প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া বাহালতবিয়তে খোসমেজাজে ও পরম সুখ-শান্তিতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সেই গুণগুলির প্রত্যেকটিকে ভূষণস্বরূপ করিয়া সুকৌশলী সাতকড়ি সামন্ত হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর মত দুর্দ্ধর্ষ ভূস্বামীর একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারিরূপে চিহ্নিত হইতে পারিয়াছিল। ফলে, প্রজামহলের অবিদিত ছিল না যে, সাতকড়ি সামন্তের অজ্ঞাতে সদরে খোদ জমিদার হুজুরের সেরেস্তায় কোন দরখাস্ত দাখিল করিলেই তাহা 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার' পর্য্যায়ে পড়িবে এবং সামন্তের কূটনীতির প্যাঁচে পড়িয়া তাহা ত বানচাল হইবেই, অতঃপর সেই দুঃসাহসী দরখাস্তকারীর দুর্গতিরও অন্ত থাকিবে না। সদর সেরেস্তার আমলাদের সহিত সাতকড়ি সামন্তের এরূপ ঘনিষ্ঠ দহরম-মহরম যে, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। হয়, দরখাস্তগুলি আশ্চর্য ভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়, নয় ত, নালিশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নকল সামন্তের হাতে আসিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং কূটনীতি ও প্রতিপত্তির প্রভাবে অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে না। এরূপ অবস্থায় তালুকের প্রজাবর্গ সাতকড়ি সামন্তকেই তাহাদের ক্ষমতাশালী ভূস্বামী ভাবিয়া সর্বতোভাবে তাহার তুষ্টিবিধানে সচেষ্ট থাকিত। সাতকড়িও জমিদারের মত প্রচণ্ড দাপটে এই বিস্তীর্ণ তালুকটির উপর তাহার প্রভুত্বের শকট চালাইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিত। আবার, অন্ধভাবে সামন্তর তোষামোদে অভ্যস্ত—এই তালুকের মধ্যেই এমন বহু ব্যক্তির সন্ধান মিলিবে। সামন্ত যে কূটনীতিতে পরিপক্ব—এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইলে ভেদনীতিকে সেখানে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই সামন্ত বাছিয়া বাছিয়া সকল শ্রেণী হইতেই এমন কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে মুঠার মধ্যে আনিয়াছিল, সমাজে যাহাদের শক্রর অভাব নাই। নায়েব মহাশয়ের সাহায্য পাইবার আশায় তাহারা একেবারে বর্ত্তাইয়া যায়; নায়েব মহাশয়ও তাহাদিগকে অভয় দিয়া দলভুক্ত করিয়া লয়। অথচ, এই ঘনিষ্ঠতার কথা তাহারা যাহাতে ব্যক্ত না করে, সে সম্বন্ধেও কড়া নির্দেশ থাকে। এই ভাবে সাতকড়ি সামন্ত তালুকের একটি বৃহৎ অংশকে এমন ভাবে তাহার দলভুক্ত করিয়া ফেলে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বা আন্দোলন হইলে ইহারাই সর্বাগ্রে তাহার প্রতিরোধ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগে। নায়েবের অজ্ঞাতে এই তালুক হইতে কোন দরখাস্ত সদরে দাখিল হইলে, তাহার পরেই নায়েবের অনুকূলে অধিক সংখ্যক লোকের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত সদর সেরেস্তায় উপনীত হইয়া পূর্বের দরখাস্তকে বরখাস্ত করিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অগ্রাহ্য করিতে তাঁহারাও কুণ্ঠিত হন—যখন দেখা যায় যে, তালুকের অধিকাংশ লোকই নায়েব সাতকড়ি সামন্তের পক্ষপাতী ও গুণানুরাগী।

এ-হেন প্রতিপত্তিশালী সুকৌশলী নায়েব সাতকড়ি সামন্তের প্রবল প্রতাপে বাধা দিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপর্যয় উপস্থিত করে সর্বপ্রথমে শ্যামাপুরের অন্যতম সম্ভ্রান্ত প্রজা কবিরাজ করালী চট্টোপাধ্যায়ের কুমারী কন্যা চণ্ডী। সমগ্র তালুকের প্রজা যে নায়েব মহাশয়ের রক্তচক্ষু দেখিয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠে, এই বালিকাই তাহার চক্ষুর উপরে তর্জনী তুলিয়া বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানাইতে চায়—এ আপনার অন্যায়, মানুষ কখন মানুষের অন্যায় সহ্য করতে পারে না।

চণ্ডী তখন পাঞ্জাব হইতে শ্যামাপুরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি ব্যাপারে এই অঞ্চলে অন্যায় ও অনাচার দেখিয়া চণ্ডীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ সাহসিকতায় সে প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়। প্রথমেই সে পল্লীবাসিনী নিম্নশ্রেণীর অবীরাদের উপার্জনের বাধা সরাইয়া দেয় বহিরাগত ফিরিওয়ালাদের চালানী ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া। ইহারা বড়-বড় ঝাঁকায় ভরিয়া বাহিরের ভেজাল খাবার ও আনাজ-পত্রাদি পল্লী মধ্যে ফিরি করিয়া ব্যাপার চালাইতে আরম্ভ করায়, এই অঞ্চলবাসিনী নিম্নশ্রেণীর নারীদের বেসাতি বন্ধ হইবার উপক্রম ঘটে। পল্লীজাত অল্প-স্বল্প টাটকা তরি-তরকারী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী-বাড়ী যোগান দিয়া কোন রকমে ইহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। বাহিরের পুরুষ ফিরিওয়ালাদের প্রাদুর্ভাব ঘটায় ইহারা বিপন্ন হইয়া পড়িলে চণ্ডী ইহাদের পক্ষ সমর্থন করে। প্রথমে সে ফিরিওয়ালাদিগকে ভালো করিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলে যে, তাহারা

গ্রামাঞ্চলে ফিরি না করিয়া গঞ্জে বা হাটে বসিয়া তাহাদের মালপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা যেন করে। কিন্তু চণ্ডীর সেই যুক্তি তাহারা উপেক্ষা করায় তাহার যে প্রতিক্রিয়া ঘটিল, তাহাতে নানা ভাবে নাস্তানাবুদ হইবার পর শ্যামাপুরের ত্রিসীমায় ঝাঁকা লইয়া প্রবেশ করিতে আর তাহাদের সাধ্যে কুলায় নাই।

ইহার পরেই চণ্ডীর দৃষ্টি পড়িল শ্যামাপুরের মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়টির উপরে। পল্লীর শিশুদের মুখে যিশুর গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত কুৎসিত ছড়া শুনিয়াই সে শিহরিয়া উঠে এবং জানিতে পারে যে, স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়টিই ইহার উৎসস্বরূপ। চণ্ডী জানিতে পারিল, চর্চ মিশন সোসাইটি বালিকাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত শ্যামাপুরে বিদ্যালয় নির্মাণ করাইয়া মিস্ খৃষ্টকুমারী নাম্নী ধর্মান্তরিতা এক খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর উপর ইহার পরিচালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত খৃষ্টান সোসাইটির অর্থপুষ্ট বিদ্যালয়গুলি হইতে 'পল্লী-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার আলোকপাত হইয়া থাকে। অবশ্য সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ শিক্ষয়িত্রীদিগকে এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, শিক্ষা বলিতে কেবল মাত্র বাইবেল পড়ানোই হইবে বা যিশুর গুণকীর্তনের সংগে হিন্দুর-দেবদেবীদের কাহিনী বিকৃত করিয়া নানারূপ ছড়া বাঁধিয়া ছাত্রীদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে দিবে। সকল শিক্ষয়িত্রীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ত' আর একই রকমের নহে ; বিশেষতঃ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বা নিপীড়িত হইয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিলে সাধারণতঃ পূর্বধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষী হইয়া থাকে এবং ইহারাই কোন সূত্র পাইলেই পরিত্যক্ত ধর্মের কুৎসা রটাইয়া পরম তৃপ্তি পায়। স্থলবিশেষে প্রভুস্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়েও ইহাদিগকে এতটা হঠকারী হইতে দেখা যায়। শ্যামাপুর মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিস্ খৃষ্টকুমারী এই শ্রেণীর এক শিক্ষয়িত্রী।

খৃষ্টকুমারী দক্ষিণ-বাঙলার কাকদ্বীপ অঞ্চলের এক বাগ্‌দীর কন্যা। পিতার নাম মুচিরাম সিংহ। ইহার পূর্বপুরুষ না কি বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাবের পক্ষে লড়াই করিয়া সিংহ উপাধি পাইয়াছিল। তদবধি এই বংশের সকলেই নবাব-দত্ত উপাধিকে কৌলিক পদবী করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদার-সরকারে পাইক-লাঠিয়ালরূপে কুল-পুরুষের পেশার অনুসরণে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া আসিয়াছে। মুচিরামের পিতাই প্রথমে পৈতৃক পেশার মোহ কাটাইয়া মাছের ব্যবসায় সুরু করে। মাথা ঘুরাইয়া জাল ফেলিতে এবং জলাশয়ের ভৌল মধ্যে লুক্কায়িত মৎসকুল পাকড়াও করিতে তাহার না কি জুড়ি ছিল না। মুচিরাম মাথা খেলাইয়া জালে মাছ ধরার পরিবর্তে মাছ ধরিবার দেশীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে লাগিয়া পড়ে। তাহার হাতের তৈয়ারী ঘুর্ণি, আটল, ঝাঁঝরি প্রভৃতি বাজারে খুব আদৃত হয়। এই ব্যবসায়ে পয়সার মুখ দেখিয়া মুচিরাম মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যাকে স্থানীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেয়। ছেলের নাম হরিরাম, আর মেয়েটির ভালো নাম ক্ষীরোদা হইলেও ক্ষীরি নামেই সে পরিচিত হইয়া উঠে। হরি যখন দশ বছরে পড়িয়াছে এবং ক্ষীরির বয়স চলিয়াছে মাত্র সাত বছর, সেই সময় সহসা মুচিরাম সর্পদষ্ট হইয়া মারা পড়ে। ছেলে-মেয়েকে খৃষ্টানী স্কুলে পড়িতে দেওয়ায় মুচিরামের আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতীয় প্রতিবেশীরা তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। পিতৃহীন পুত্র-কন্যাকে কেহই আশ্রয় দিতে বা তাহাদের অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায় মিশনারী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর পিতৃহীন ভ্রাতা-ভগিনীকে চর্চ মিশন সোসাইটির অপর এক কেন্দ্রে পাঠান হয়। সেখানকার পাদরী পরিচালক মরিনো সাহেব ভ্রাতা-ভগিনীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া সোসাইটি কর্তৃক ব্যাপ্টাইজড, শরণার্থী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তখন হইতে হরিরাম 'হেরিস্' এবং ক্ষীরোদা 'খৃষ্টকুমারী' নামে পরিচিত হয়। ফলে, সোসাইটির রেজিষ্টারী খাতায় এবং স্কুলে এই নামই চালু হইয়া যায়। তখন হইতে ইহাদের খাওয়া-পরা ও পড়া-শোনা সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ ঘটে না—নির্ভাবনায় ও নিরুদ্বেগে পল্লীর নিকৃষ্ট পরিবেশে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাগ্‌দী-নন্দন-নন্দিনীর জীবনের গতি মিশনারীদের নিয়মনিষ্ঠ আদর্শে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। কিছু কাল পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে খৃষ্টকুমারীকে খৃষ্টধর্ম-প্রচারিকার পদে মিশন কর্তৃপক্ষ যেমন মনোনীত করেন, তেমনি বি-এ পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিয়া হেরিসকে আই, সি, এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন। চর্চ মিশন সোসাইটির সুপারিশের জোরে হেরিস ওরফে এইচ সিন্‌হা সাহেবের পক্ষে কার্যারম্ভের সূচনাতেই প্রেসিডেন্সী বিভাগের মহকুমায় হাকিম হইয়া আসা দুরূহ হয় নাই। প্রচারিকার কার্যে দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে খৃষ্টকুমারীও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত শ্যামাপুরের মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ে হেড মিষ্ট্রেস হইয়া আসে। তাহার দপদপায় শুধু বালিকা-বিদ্যালয়টি নহে—সমগ্র অঞ্চলটি যেন ত্রস্ত হইয়া উঠে। সে যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী সোসাইটির মেয়ে, পদস্থ রাজপুরুষদের সঙ্গে তাহার বিশেষ দহরম-মহরম, তাহার ভ্রাতাও যে শীঘ্রই জেলার হাকিম হইয়া আসিতেছে—এ সব কথা খুব জাঁক করিয়া সে স্কুলের দাসী, চাপরাসী, অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া এ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে সগর্বে প্রচার করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। বিদ্যালয়ের অধ্যয়নেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। সে যে মাষ্টারী করিবার আগে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত—শিক্ষার ব্যাপারেও তাহা প্রতিপন্ন করিল ; ফলে, পাঠ্যপুস্তক পড়ানো ব্যাপারটাই গৌণ হইয়া দাঁড়াইল এবং প্রাধান্য পাইল খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ ভাবে প্রচার করা। পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা এ-সব ব্যাপারে প্রতিবাদের কথা ভাবিতেই পারে না—নবাগতা মেমদিদি তাহাদের দৃষ্টিতে কোন্ এক মহিমান্বিতা মানবী—সহসা সামনাসামনি হইলেই তাহাদের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে ; অম্লান বদনে তাহারা তোতা পাখীর মত শিখানো কথা কণ্ঠস্থ করে। অভিভাবকগণও গ্রাহ্য করেন না—কন্যাদের মুখে স্বধর্মের নিন্দা এবং পরধর্ম সম্পর্কে অহেতুক প্রশস্তি শুনিয়া নীরব থাকেন। বিনা বেতনে মিশনারীরা পল্লী-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করেন—যিশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে কত লোভনীয় দ্রব্য উপহার দেন ; প্রতি বর্ষে পুরস্কার দিবার কি ঘটা, ফেল করিলেও মেয়েরা দুঃখে ফুলকোমুখী হইয়া ফিরিয়া আসে না, তাহাদেরও কিছু-না-কিছু মনোহর খেলনা দিয়া খুসী করা হয় ; এ অবস্থায় যদিই তাহারা খৃষ্টধর্মের কথা শুনায় বা আমাদের ধর্মের

নিন্দাই করে—তাহাতে কি এমন আসিয়া-যাইবে ? কিন্তু তাহাদের এই ভুল চোখে আঙুল দিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত সত্যই যে এক দিন একটি মেয়ে এ গ্রামে আসিবে এবং তাহার দাপটে সারা গ্রামখানি শিহরিয়া উঠিবে, এ-কথা কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল ?

আগেই বলা হইয়াছে, চণ্ডী এক সুযোগ্য সহকর্মিণীর সাহায্য পাইয়াছিল, তাহার নাম গৌরী। ক্রমে সে কৌশলে বিভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি স্বাস্থ্যবতী বলিষ্ঠা মেয়েকে তাহার দলভুক্ত করিয়া লয়—তাহারা চণ্ডীর একান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত হইয়া উঠে। গ্রামের বারোয়ারীতলাটি ইদানীং ক্রিয়াকলাপের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পিছনেও অনেকখানি জমি দীর্ঘকাল ধরিয়া 'পতিত জমি'-রূপে বাতিল হইয়া থাকে। জঙ্গলময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া চণ্ডী তাহার পরিকল্পিত কর্মক্ষেত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করিল। সহায় হইল তাহার সহচরী গৌরী এবং গুটি পনেরো বালিকা। ইহাদের মধ্যে চাষী-মজুরদের ঘরের মেয়ে বেশী ছিল। এক দিন গ্রামের সকলে অবাক-বিস্ময়ে দেখিল—কুঠার, কোদাল, কাটারি, কাস্তে লইয়া এক মেয়ে-পল্টন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। সোঁদাল, বাবলা, খিরিস প্রভৃতি শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বড়-বড় আগাছাগুলি ছিন্নমূল হইয়া দুর-দাড় শব্দে ভূপতিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়িয়া তাহাদের শিকড় পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া জমিকে সমতল করিবার অপরূপ পাট চলিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে বহু দিনের এই পোড়ো জমির জঙ্গল ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করা হইতেছে, সে কথা চণ্ডী প্রকাশ করে নাই; এখন অনুসন্ধিৎসু মহল হইতে এই সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন উঠিল। চণ্ডী সহজ ভাবে জানাইল : গ্রামের ভালোর জন্তেই এ জঙ্গল ভাঙা হচ্ছে—অন্ধকার ঘুচে আলো ফুটবে, সাপ-খোপের ভয় থাকিবে না, আর গ্রামের মেয়েদের একটা আস্তানা হবে।…গ্রামের লোক বুঝিল, মেয়েদের নিয়ে এই পণ্ডশ্রমের আসল মতলব হইতেছে তাহাদের একটা খেলাঘরের ব্যবস্থা করা। এই মেয়েটা যে ছেলেদের মতন বে-পরোয়া হইয়া সব কাজে আগাইয়া যাইতে চায়, সে পরিচয় আগেই তাহারা পাইয়াছিল। কিন্তু গ্রামের একাংশে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগটি গ্রামবাসীদের পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াও বহু বৎসর যাবৎ এই ভাবে পড়িয়া আছে, এই মেয়েটি যে দলবল লইয়া কোমর বাঁধিয়া তাহার রূপান্তর ঘটাইতে আগাইয়া আসিবে, ইহা কেহ ধারণা করিতেই পারে নাই। বিশেষতঃ, শ্যামাপুর গ্রামের সৃষ্টিকাল হইতেই এই পতিত জমির ব্যাপারে কাহাকেও বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায় নাই। ইহার মালিকান-স্বত্ব সম্বন্ধে গোলমাল থাকায় মামলা-মকদ্দমার ভয়ে এই জমি কেহ ক্রয় করিতে বা জমা-বন্দোবস্ত করিতে সাহস পায় নাই। গ্রামবাসীদের মতে ইহা ইজমালী জমি—এই ভূভাগের চারি পাশে যাহাদের জমি আছে, তাহাদের কিছু-না-কিছু অংশ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। পক্ষান্তরে জমিদার সেরেস্তার চিঠায় এই সমগ্র জমিই 'জঙ্গল বুড়ী-বন্দ' নামে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট থাকায় জমিদার সরকার ইহার মালিকান-স্বত্বে ষোল আনাই দাবী করেন এবং রাস্তার দিকে এই জমির কিছুটা সমতল অংশে পূর্বে যখন বারোয়ারী উৎসব হইত, তজ্জন্ত তৎকালে গ্রামবাসিগণ জমিদার সরকারের মঞ্জুরী লইয়া জমিদারের পূর্ণ স্বত্বাধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্ত বিস্মিত গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে পুনরায় প্রশ্ন উঠিল চণ্ডীর উদ্দেশে : জঙ্গল ভাঙবার মঞ্জুরী পেয়েছে ?…চণ্ডী বলিল : মঞ্জুরী !…মুখের ভঙ্গি বিকৃত করিয়া গ্রাম্য মাতব্বর জানাইয়া দিলেন : এ হচ্ছে জমিদারের জমি, এখানকার নায়েব মশায়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে এতে হাত দিলেই কিন্তু ফ্যাসাদে পড়তে হবে।…অবজ্ঞায় ঠোঁট দু'টি উলটাইয়া চণ্ডী বলিল : জঙ্গল ভেঙ্গে জমি লাগাচ্ছি গ্রামের কাজে—এই যথেষ্ট, এর জন্তে আবার বন্দোবস্ত করব কি ! আমাদের কাজ দেখলে আর উদ্দেশ্য শুনলে খুসি হয়েই জমিদার জমি ছেড়ে দেবেন।…এই ধরণের কথা শুনিতে—বিশেষত কোন মেয়ের মুখে—গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরাও অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন অবস্থায় ইহার পরিণতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জঙ্গলের একটি বৃহৎ অংশকে পরিষ্কৃত করিয়া সেই স্থানটিকে অভিনব ব্যবস্থায় চণ্ডী যেন একটি আশ্রম করিয়া ফেলিল। এই স্থানটির এক দিকে বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃহৎ এক নিম গাছ ছিল। সেই গাছের নিচে সর্বাগ্রে চণ্ডী তাহার পাঠশালা বসাইল। নিম গাছের প্রকাণ্ড কাণ্ডের সামনের দিকের কিছুটা ছাল ছাড়াইয়া তাহার উপর কালো রঙ উপর্য্যুপরি কয়েক বার লাগাইয়া লিখিবার বোর্ডে পরিণত করিল। তাহার পর পরিষ্কৃত স্থানটি মাটি ও গোবরের প্রলেপ দিয়া এমন ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন করিয়া লইল যে, দেখিবা মাত্র মনে হয় যেন কোন গৃহস্থ বাড়ীর অন্দরমহলের বর্ধিষ্ণু উঠান। জঙ্গলের গাছ-পালা বাঁশ-কঞ্চি দিয়া বিস্তীর্ণ স্থানটিকে সুদৃঢ় ভাবে ঘিরিয়া দ্বারপথে আগল লাগাইল—গরু-বাছুর এবং বাহিরের লোক-জন যাহাতে অনায়াসে আসিয়া পড়া-শোনায় ব্যাঘাত দিতে না পারে। সঙ্গিনীরূপে যে মেয়েগুলি চণ্ডীকে সাহায্য করিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। ইহাদিগকে লইয়াই চণ্ডী তাহার পাঠশালার কাজ আরম্ভ করিল এবং শিক্ষাদান ব্যাপারে গৌরী হইল তাহার সহকারিণী। নিম গাছের কাণ্ডকে কালো বোর্ড করিয়া এবং তাহাতে খড়ি দিয়া এক-একটি অক্ষর লিখিয়া এমন এক অভিনব প্রণালীতে চণ্ডী তাহার নিরক্ষর ছাত্রীদিগকে অক্ষর পরিচয় করাইতে লাগিল যে, ছাত্রীরা তাহার মধ্যে চিত্তাকর্ষক গল্পের আস্বাদ পাইয়া বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। পরদিন হইতেই কৌতূহলী বালিকারা অনাহূত ভাবে আসিয়া পাঠশালার উঠানে বিছানো চাটায়ের উপর বসিয়া গেল চণ্ডীদি'র গল্প শুনিতে। যাহাদের অক্ষর পরিচয় হইয়া গিয়াছে, বানান শিখিয়াছে, কিম্বা যাহারা লেখা-পড়ায় আরো অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের পড়ার প্রণালীও গল্পকে আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকায়—বড়দের পড়ানোও ছোটরা আগ্রহে শুনিয়া যেমন আনন্দ পায়, ছোটদের পড়াইবার সময় বড়রাও তেমনই আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া থাকে। বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ, পত্রপাঠ, কথামালা, বোধোদয়, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক—যাহা কিছু পড়ানো হয়, প্রত্যেকটি এমন মিষ্ট গল্পের মাধ্যমে যে, বালিকারা ভাবে তাহারা গল্প শুনিতেছে; অথচ তাহার মধ্যে তাহাদের শিক্ষা অজ্ঞরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বসিয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দিনেই গাছতলায় বসানো চণ্ডীর এই পাঠশালার কথা পাড়ার মেয়েদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল এবং পাকা বাড়ীর ভিতরে নানা রকম জাঁক-জমকের সঙ্গে চালিত মিশনারী বিদ্যালয়ের
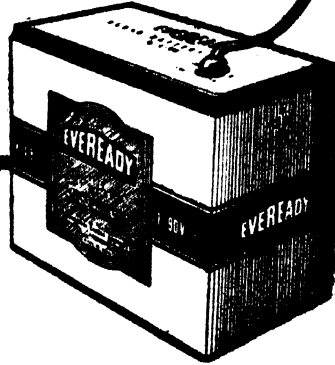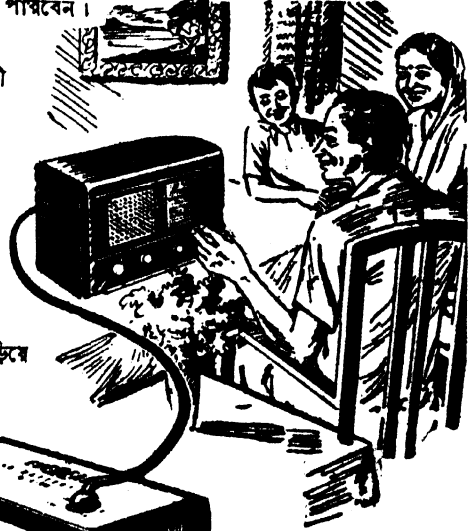
ছাত্রীপূর্ণ বেঞ্চিগুলির মধ্যে ফাঁক পড়িতে লাগিল দ্বিতীয় দিন হইতেই।

তৃতীয় দিনে যথা-সময় চণ্ডীর পাঠশালা বসিয়াছে, এমন সময় জমিদারী কাছারীর নায়েব সাতকড়ি সামন্তের হুকুম বহন করিয়া আনিল তাহার অন্তরঙ্গ অনুচর রাখাল বক্সী। কৌতূহলী লোক জন যাহাতে মানুষ-প্রমাণ উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা আঙ্গিনায় অনায়াসে ঢুকিয়া পড়া-শোনায় ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্য প্রবেশ-দ্বারের জাফরি দেওয়া আগল বা দরজাটি বন্ধ করিয়া পড়ার কাজ চালানো হইয়া থাকে। বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরটি যেমন দেখা যায়, পড়া শুনিতেও অসুবিধা হয় না। পাড়ার অনেকেই বাহিরে দাঁড়াইয়া চণ্ডীর এই আশ্চর্য রকমের পড়া শুনিয়া থাকে এবং শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা মুগ্ধ না হইয়া পারে না। রাখাল বক্সী দন্ত ভরে আসিয়া দেখিল, সাত-আট জন লোক এই ভাবে সাগ্রহে পড়া শুনিতেছে। চণ্ডী তখন গাছের গায়ের কালো বোর্ডে সাদা খড়িতে খুব বড় করিয়া 'ই' লিখিয়া এই অক্ষরটি বুঝাইতেছিল :

'অ' আর 'আ' তোমরা চিনেছ। ঐ দু'টো অক্ষর থেকে কত কি বড় বড় শব্দ হোয়েছে—কত দেশ, কত জাত, কত রাজা, কত বীরপুরুষের নাম আর গল্প তোমরা শুনেছ দু'দিনে। কাজেই স্বরবর্ণের গোড়ার ঐ দু'টি অক্ষরের সঙ্গে তোমাদের এমনি চেনা-শোনা হয়েছে যে, কিছুতেই ভুলতে পারবে না। কেমন? আচ্ছা, এখন স্বরবর্ণের তৃতীয় অক্ষর 'ই'কে এনেছি তোমাদের সামনে। এর চেহারাটি দেখছ ত? এখন শোন—এই হ্রস্ব ই অক্ষরটি থেকে কত কি হতে পারে—দেবতা, দৈত্য, মানুষ, পশু, দেশ, বস্তু আরো কত কি! তোমরা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র দেবতার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই; সেই ইন্দ্রের নাম বলতে বা লিখতে হোলেই এই ইকারটিকে চাই। তোমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো হয়—সকাল-সন্ধ্যায় মেয়েরা ঘরে-ঘরে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে মা-লক্ষ্মীকে মনে মনে গড় করে; কেন না—মা-লক্ষ্মীর দয়া না হোলে সংসারে সুখ-শান্তি হয় না। সেই লক্ষ্মী-দেবীর আর একটি ভালো নাম—ইন্দিরা। ইন্দ্রের মত ইন্দিরা লিখতেও এই ইকারটি চাই। আকাশের চাঁদকে তোমরা চেনো, চাঁদ দেখতে ভালোবাস। সেই চাঁদের আর এক নাম ইন্দু। আর এই ইন্দু বলতে বা লিখতে হোলেই এই ইকারটি এসে পড়ে। তোমরা রাবণ রাজার নাম জানো নিশ্চয়ই, তাঁর এক ছেলে ছিল; সে মেঘের আড়ালে লড়াই করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকেও হারিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে তার নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। এই ইকার থেকেই ইন্দ্রজিৎ হয়। ভারতবর্ষে আর এক মস্ত রাজা ছিলেন। পুরীর জগন্নাথের কথা তোমরা শুনেছো, এই রাজা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল—ইন্দ্রদ্যুম্ন। আবার মহাভারতের দ্রৌপদীর ভাইএর নামও ধৃষ্টদ্যুম্ন। এই শক্ত নামটিও হোয়েছে এই ইকার থেকে। অর্জুনের এক বীর ছেলের নামও ছিল ইরাবান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি ভীষণ বীরত্ব দেখিয়ে নিহত হয়েছিলেন। এই ইকার থেকেই হয়েছে ঐ বীর ইরাবানের নাম। এখন এক দৈত্যের গল্প বলি শোন; তার নাম ছিল ইল্বল। এমনি সে দুষ্টু, আর মায়াবী ছিল যে, মিছিমিছি নিরীহ মানুষদের বধ করে আনন্দ পেত। সে করত কি, তার বাতাপী নামে এক বোনকে ভেড়া করে তাকে কেটে বেঁধে অতিথিদের খেতে দিত। তার পর মন্ত্র পড়ে 'বাতাপী বাতাপী' বলে ডাকতো। বোনটির ঐ নাম ছিল। সে তখন মায়া-বিদ্যার জোরে যারা যারা মায়া-ভেড়ার মাংস খেয়েছিল, তাদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। বেচারী অতিথিরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরত, আর ভাই-বোনে তাই দেখে আনন্দে নাচতে থাকত। এর পর হলো কি, অগস্ত্য মুনি এক দিন এলেন ইল্বল দৈত্যের সেই মায়া অতিথিশালায়। সেদিন তিনি একাই অতিথি; কাজেই ভেড়ার সমস্ত মাংস একলাই খেয়ে ফেললেন। ইল্বল ত দেখেই অবাক! অগস্ত্য বললেন—খেয়ে বড়ই তুষ্ট হয়েছি! ইল্বল দৈত্য তখন মন্ত্র পড়ে ডাকতে লাগল—'বাতাপী, বাতাপী!' অগস্ত্য মুনিও নিজের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে থাকেন—'বাতাপী—বাতাপী।' ইল্বল দেখল—বাতাপী ত এই অতিথির ভুঁড়ি ভেদ করে বেরিয়ে এলো না! সে আবার ডাকতে লাগল। অগস্ত্য তখন হাসতে হাসতে বললেন—'কেন আর ডাকাডাকি করছ বাপু, বাতাপী আর আসবে না—আমি তাকে খেয়ে হজম করে ফেলেছি যে! আমাকে ত চেন না, আমিই যে অগস্ত্য মুনি!' ইল্বল তখন কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে প্রিয় বোনটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। কিন্তু অগস্ত্য ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—'তা হয় না ইল্বল, পাপের শাস্তি আছেই। পরের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতি হবেই।' কেমন গল্প বল দেখি! ইল্বলের এই গল্প শুনে শুধু খুসি হোলে চলবে না, এই সঙ্গে ইল্বলের ইকারটিকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখা চাই। এর পর বলছি শোন, ইকার থেকে কোন কোন দেশ, জাতি, আর কি কি জন্তু হয়েছে।

ঠিক এই সময় দরজার আগলের অপর পার্শ্ব হইতে জাফরির ফাঁকে স্থূল গুম্ফযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কর্কশ মুখখানা রাখিয়া রাখাল বক্সী রুক্ষ স্বরে বলিল : থামেন গো মা-ঠাকরোণ, থামেন। নায়েব মশাই আপনারে নিতে পাঠিয়েছেন—চলেন।

গাছের কাছে দাঁড়াইয়া চণ্ডী চাটায়ের উপরে উপবিষ্টা বালিকা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণ-পরিচয় সম্পর্কে গল্প বলিতেছিল। আর, গৌরী ছোট ছোট বালিকাদের শ্লেটে ইকার অক্ষরটি লিখিয়া দিয়া গাছের বোর্ডে লেখা অক্ষর, চণ্ডীর কথা ও ইহাদের শ্লেটে লেখা অক্ষরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছিল। আগন্তুকের কথায় চণ্ডীর মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল, বালিকারাও চমকিত হইয়া আগলের ও-পাশে বক্রভঙ্গিতে দণ্ডায়মান লোকটির দিকে চাহিল।

দৃঢ় স্বরে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল : কি বলছ তুমি? দেখতে পাচ্ছ না এখানে আমি পড়াচ্ছি—তোমার নায়েব মশায়ের কাছে যাবার এখন ফুরসদ ত আমার নেই।

রাখাল বক্সী বলিল : এজ্ঞে, ফুরসদ আপনাকে করতেই হবে মা-ঠাকরোণ! ভাবেন ত, হুকুমটা জাছেন কেডা!

হুকুমের কথায় চণ্ডীর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, আপনাকে শক্ত করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল : তোমার নায়েব মশাইকে বল গে তাঁর হুকুমের কোন তোয়াক্কা আমি রাখি না।

প্রবল প্রতাপশালী নায়েব মশাইটিকে উদ্দেশ করিয়া এই ধরণের কথা বলিতে শুনিয়া বক্সী প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার পর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল : কিন্তু আমারে যে হুকুম জালেন গো মা-ঠাকরোণ—আপনকারে লিয়ে যাবার তরে। ছেলেমানসী করবেন না—চলেন।

চণ্ডী এবার জলন্ত দৃষ্টিতে বক্সীর দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল : পড়ার সময় মিছিমিছি গোল কোর না বলছি! তোমার নায়েব মশাইকে বল গে—লাট সাহেব এসে ডাকলেও পড়ানো ফেলে রেখে আমি যেতাম না! তাঁর দরকার থাকে এখানে আসবেন।

কথাটা শেষ করিয়াই চণ্ডী তাহার ছাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিল। রাখাল বক্সী গজ-গজ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল : এ! তবু যদি ম্যাম সাহেবের পাকা ইস্কুল হোত গো! জঙ্গল ভেঙে খেলা-ঘর বানালে—তাও সরকারের জমীনে। হুঁ—এরেই কয় পরের ধনে পোদ্দারী ফলানো।

সাতকড়ি সামন্ত সে সময় সেরেস্তার কাজকর্ম সারিয়া চণ্ডীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই মেয়েটার বিরুদ্ধে অনেক নালিশই তাহার সেরেস্তায় গিয়া জমা হইয়াছে, কিন্তু সে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই এই ভাবিয়া যে, এখানে কোন পক্ষেই প্রাপ্তির কোন আশা নাই। অভিযুক্তা মেয়েটির পিতা করালী চট্টোপাধ্যায় গ্রামের এক জন বিশিষ্ট কবিরাজ; গৃহস্থ হইলেও তিনি এ অঞ্চলে সবার শ্রদ্ধেয়। স্বয়ং সাতকড়িও তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ—যেহেতু, কয়েক মাস পূর্বে তাহার স্ত্রী সূতিকা রোগে মৃতকল্প অবস্থায় উপনীতা হইলে, এই করালী কবিরাজের চিকিৎসার গুণেই কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছিল। সুতরাং এ-হেন হিতকারী ব্যক্তির কন্যার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতে তাহার চক্ষু-লজ্জায় বাধিতেছিল। কিন্তু তাহা হইলেও সরকারী সম্পত্তির স্বত্বহানির ব্যাপারে সেই কন্যাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত দেখিয়া সাতকড়ির পক্ষে নীরব থাকা সম্ভবপর নহে। এই অঞ্চলের কোন ব্যক্তি এ পর্যন্ত যে জঙ্গলমুখী বন্দটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন বৃক্ষের গায়ে কাটারির একটা কোপও বসাইতে সাহস করে নাই, করালী কবিরাজের কন্যাটি কি না মেয়ে-বোম্বেটের মত দল বাঁধিয়া সেই জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়াছে, পাঠশালা বসাইবার ফন্দী করিয়া স্বত্ব কায়েম করিতে চাহিয়াছে! সেই জন্যই সাতকড়ি তাহাকে কাছারী-বাড়ীতে আনিয়া ভয় মৈত্রী দেখাইয়া নিরস্ত করিবার সিদ্ধান্ত আঁটিয়াছিল। কিন্তু তাহার অনুচর বক্সী আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে সাতকড়ি সামন্তের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সেরেস্তার মধ্যে একটা সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সাতকড়ি তাহার অধীনস্থ দুই মুহুরী ফটিক পাল ও শীতল রায়, অনুচর রাখাল বক্সী এবং দুই জন যষ্টিধারী পাইক লইয়া অকুস্থল অভিমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইল।

চণ্ডী তখন ইকারের অন্তর্গত ইট, ইদারা, ইমারৎ, ইঞ্জিন প্রভৃতির গল্প বলিতেছিল। অভিযাত্রী দলটির আবির্ভাবে পুনরায় পাঠে বিঘ্ন ঘটায় চণ্ডীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রাখাল বক্সীর কথায় ছাত্রীরা কৌতুক বোধ করিয়াছিল, কিন্তু এখন এই প্রবল দলটিকে দেখিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সাতকড়ি সামন্তের প্রতাপ তাহাদের অবিদিত ছিল না।

সাতকড়িই সর্বাগ্রে আগলের কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল : আগড়টা দেখছি শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে; খুলে দেবে, না ভাঙতে হবে?

সাতকড়ির কথায় চণ্ডী ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকাল এই উদ্ধত প্রৌঢ় মানুষটির বিকৃত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরক্ষণে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে বলিল : আপনি যে ভাঙতে খুবই পটু, আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন, আপনার মুখের কথা এবং সঙ্গের দলটি দেখেই তা বুঝিছি। কিন্তু মেয়েদের এই পড়ার আস্তানার প্রতি আপনার এ আক্রোশ কেন, সেটিই বুঝতে পারিনি!

চণ্ডীর কথা শুনিয়া সাতকড়ি স্তব্ধ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তাহার পরে মনে মনে কি ভাবিয়া সে বলিল; ও-সব বোঝবার আগে আমার কথার জবাব দাও তুমি। লাটের কিস্তীর পরে আমি যেই দেশে গেছি, সেই ফুরসদে তুমি সরকারী জমির জঙ্গল ভেঙে এ সব কাণ্ড করেছ কোন্ অধিকারে?

চণ্ডী উত্তর করিল : প্রয়োজনের অনুরোধে। আর আপনি যে বললেন, আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ কাজ করেছি, ও-কথা ঠিক নয়। আপনার থাকা-না-থাকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমার মনে ওঠেনি। আমি এখানে এসে এখানকার অবস্থা দেখে জেনেছিলাম, এ জমি আমাকে নিতে হবে; তাই নিয়েছি। আপনি থাকলেও নিতাম।

এই বয়সের কোন মেয়ের মুখে এই ধরণের কথা সাতকড়ি ঘোষাল তার জীবনে কোন দিন শুনে নাই। এই কথার ভারে সে নিজের কথার খেই বুঝি হারাইয়া ফেলিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল : কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ জানো? কবিরাজ মশাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁর খাতিরে তোমার বেয়াদপি সহ্য করেছি। কিন্তু সহ্য করবার একটা সীমা আছে, এ কথা ভুলে যেও না।

চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হইয়া বলিল : দেখুন, আমার বাবার

প্রসঙ্গ এখানে আনবার কোন প্রয়োজন নেই, আমি নিজের দায়িত্বেই এ সব করেছি। আমার বাবার মুখ চেয়ে না-ই বা সহ্য করলেন আপনি? আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

দুই চক্ষু পাকাইয়া চণ্ডীর দিকে চাহিয়া সাতকড়ি বলিল: তোমার কথা শুনে কি করব ভেবেছ? মেয়ে-মুখে খুব লম্বা লম্বা কথা শোনাচ্ছ যে! কত ধানে কত চাল সে খবর ত রাখো না! জানো, জমিদারের বিনা হুকুমে এ জঙ্গল ভেঙে তুমি কি গর্হিত কাজ করেছ?

শান্ত কণ্ঠে চণ্ডী উত্তর করিল: আমি যা ভালো বুঝিছি তাই করেছি। দীর্ঘকাল ধরে যে সব জমি পড়ে থাকে, বন-জঙ্গল হয়ে সাধারণের স্বার্থহানি করে, সে সব জমি সাধারণের কাজে লাগাবার জন্যে দখল করা অবিশ্যি দুঃসাহসের কাজ, কিন্তু আপনি যে বললেন—গর্হিত, তা নয়।

বিদ্রূপের সুরে সাতকড়ি বলিল: তুমি কি আমাকে আইন শেখাচ্ছ?

গম্ভীর মুখে চণ্ডী উত্তর দিল: আইন আপনার ঠিক মত জানা থাকলে 'যুদ্ধং দেহি' বলে এ ভাবে এখানে ছুটে আসতেন না। আপনার সেরেস্তার কাগজ-পত্র খুঁজলে দেখতে পাবেন, আপনার সরকারই এই জমিকে 'জঙ্গল-বুড়ী' বন্দ বলে স্বীকার করেছেন।

চণ্ডীর মুখের এ কথা যেন জোঁকের মুখে নুণের মত পড়িল—বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল: তুমি জানো—কাকে জঙ্গলমুখী-বন্দ বলে?

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আপনি কি ভেবেছেন, আমি জাহাজে চড়ে বিলেত থেকে এসেছি? জঙ্গল ভাঙতে গেছি তার খবর না নিয়েই? অনেক দিন ধরে পোড়ো বুনো জমি নিজের খরচে পরিষ্কার করে নেবার জন্যে আপনাদের সেরেস্তা থেকেই ইস্তাহার বেরিয়েছিল। কিন্তু এ জমি ইজমালি—পরে গোল বাধবে এই ভয়ে কেউ বন্দোবস্ত করতে এগোয়নি। জঙ্গলমুখী জমির ব্যাপারেই ও-ভাবে ইস্তাহার জারি হয়ে থাকে।

সাতকড়ি অসহিষ্ণু হইয়া বলিল: তুমি তা'হলে কি সাহসে এ জমি ভাঙতে গেলে শুনি?

চণ্ডী বলিল: আমি ত নিজের স্বার্থের জন্যে কিছু করিনি, কাজেই জমি যারই হোক, যখন জানা গেছে জঙ্গল-বুড়ী, তখন জঙ্গল ভেঙে পাঠশালা বসালে কেউ আপত্তি করবে না—অবিশ্যি, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে যদি তার কিছু মাত্র পরিচয় থাকে।

কথাটা বলিয়াই চণ্ডী তাহার সুতীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি এমন ভাবে সাতকড়ির মুখে নিবদ্ধ করিল যে, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া চণ্ডীর এই কথা, তাহার তীক্ষ্ণ কটাক্ষই যেন স্পষ্ট করিয়া সেই লোকটিকেই দেখাইয়া দিল।

চণ্ডীর এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষপূর্ণ অপমানের আঘাতটি সামলাইয়া লইতে সাতকড়ির কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। সে এবার বিতর্কের পথ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বিলোচিত ভঙ্গিতে বলিল: এখন কথা হচ্ছে, নিজের স্বার্থেই কর, আর পরের স্বার্থেরই দোহাই দাও, আসলে এটা বোঝা যাচ্ছে—জমিদার-সরকারে কোন বন্দোবস্ত না করে, এখানকার সেরেস্তা থেকেও কোন মঞ্জুরী না নিয়ে, জঙ্গল-বুড়ী-বন্দ হোলেও এতে হাত দেবার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই। ভেবো না যে, ভয়ে পড়ে বেড়া বেঁধে আগলে শিকলি এঁটে রাখলেই রেহাই পাবে।

সাতকড়ির মুখে এ কথা শুনিবা মাত্র চণ্ডী নীরবে ক্ষিপ্র বেগে আগলের কাছে আগাইয়া গিয়া আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া ক্ষুদ্র তালাটি খুলিয়া শিকলের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর আগলটি এক পাশে ঠেলিয়া পথমুক্ত করিয়া দিয়া বলিল: মানুষের ভয়ে এ ভাবে আগল বেঁধে রাখা হয়নি, গরু-বাছুরের উপদ্রবের জন্যেই আগল দেওয়া হয়েছিল। এখন ত খুলে দিলাম, আপনি কি করতে চান তাই বলুন।

সাতকড়িও সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিল: আমি লোক দিয়ে সমস্ত বেড়া ভেঙে দেব, এখানে পাঠশালা বসাতে দেব না।

সহজ কণ্ঠে চণ্ডী বলিল: বেড়া ভেঙে দেওয়া মানেই বাড়ী ভেঙে দেওয়া। চার দিকে বেড়া দিয়ে বাড়ীর মত করেই আমি এখানে মেয়েদের পাঠশালা বসিয়েছি। এখানে সেঁধিয়ে জোর করে কিছু করতে যাওয়া মানেই অন্যের আস্তানায় অনধিকার প্রবেশ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমগ্র অঙ্গনটি ভালো করিয়া দেখিয়া পরক্ষণে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া সাতকড়ি এবার তর্জন করিয়া উঠিল: কি, এ তোমার আস্তানা? ও! জমিটা চোস্ত করে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে! দাঁড়াও, আমি এখনি এই উঠোন চষে সর্ষে বুনে তবে ছাড়ব। এই—ভিতরে আয় তোরা।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই তিনি পিছনে চাহিয়া পাইকদের আহ্বান করিয়া ভিতরে ঢুকিতে গেলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই চণ্ডী বিদ্যুদ্বেগে দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল: এই আগলটা খুলে দিয়েছি বলেই কি আপনি ভেবে নিলেন, আমি ভয় পেয়ে আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করবারও অনুমতি দিয়েছি? জানেন—পাঠশালার ভিতরে জেলার কলেক্টরও জোর করে ঢুকতে পারে না? ও-চেষ্টা করবেন না নায়েব মশাই!

নায়েব সাতকড়ি সামন্তর পুরন্ত মুখখানা তখন ফুলিয়া বুলডগের মুখের মতন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে বাহিরে গ্রামের বহু লোক সমবেত হওয়ায় কাছারীর পুরাতন পাইকদ্বয় লাঠি লইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। নায়েব উত্তেজিত হইয়া সাধারণ বুদ্ধি হারাইলেও অশিক্ষিত ও অন্ত্যজ ব্যক্তি হইয়াও তাহারা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিয়াছে—পাড়ারই সম্ভ্রান্ত বাড়ীর একটি মেয়ের সামনে গিয়া কেমন করিয়া তাহারা লাঠি হাঁকরাইবে?

পাইকদ্বয়কে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সাতকড়ি পুনরায় তর্জন করিয়া তাহাদিগকে ডাকিল: ভুলে, পাঁজা, তোরা এগিয়ে আয়; কটিক, শীতল, কাছারীর সবাইকে নিয়ে ভিতরে এসো; দেখি—এই ডেঁপো মেয়ে কি ক'রে আমাদের ঠেকায়।

শান্ত কণ্ঠে চণ্ডী সাতকড়িকে লক্ষ্য করিয়া কহিল: চেঁচাবেন না, মনে রাখবেন—মাতালের মতন অনর্থক হাঁক-ডাক করাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়। সোজা কথায় আমি বলছি—আমার নাক দিয়ে যতক্ষণ নিশ্বাস পড়বে—আপনাদের দলের এক প্রাণীও এর মধ্যে সেঁধুতে পারবে না।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডী দুই হাত প্রসারিত করিয়া মুক্ত দ্বারপথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাজি এই সময় আলুলায়িত হইয়া উভয় গণ্ডের পাশ দিয়া পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, নিটোল বলিষ্ঠ দেহ ধীর স্থির অবিচলিত—মনে হইতেছিল যেন দক্ষ শিল্পীর হাতে নির্মিত এক অপরূপ মর্মর মূর্তি; পুরন্ত মুখ ও আয়ত দুই চক্ষু দিয়া যেন একটা দিব্য জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে।

চণ্ডীর এই অপরূপ মূর্তির দিকে চাহিয়া সাতকড়ি সামন্তও মুহূর্তের জন্ত বুঝি স্তম্ভিত হইল। কিছু পূর্বেই সে বুঝিয়াছিল, তাহার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া ইহার আগে কোন গ্রাম্য নারী ত দূরের কথা, দুরন্ত পুরুষ পর্য্যন্ত এ ভাবে কথা কহিতে সাহস করে নাই। কিন্তু এই মেয়েটি যেন কথার সঙ্গে সঙ্গে চাবুক হাঁকরাইয়া তাহাকে শাসাইতেছে—এমনই তাহার স্পর্ধা! আর, এখন তাহাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এ ভাবে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার মনে হইল যে, এমন বলিষ্ঠ ও তেজোদৃপ্ত নারীমূর্তি তাহার জীবন-পথে এই প্রথম আসিয়া দেখা দিল। সামন্ত ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরক্ষণে সহসা যেন সর্বশক্তি কণ্ঠে আনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল: তুমি যদি এখানে বাধা দাও, তা'হ'লে আমার লোক জন বেড়া ভেঙে এর মধ্যে ঢুকবে—ভালো চাও ত পথ ছাড়ো।

চণ্ডীও নির্ভীক কণ্ঠে বলিল: এটা পথ নয় পাঠশালা—আমরা এখানে পড়া-শোনা করি; পথে দাঁড়িয়ে অনেকেই পড়া শোনেন, কিন্তু কেউ জোর করে এখানে সেঁধুতে চাননি। আর, বেড়া ভাঙবার কথা যা বললেন—ওখানেও একই কথা। আমাদের মাথাগুলো না ভেঙে বেড়া ভাঙতে পারবেন না।

বেড়ার কথায় বাঁশ-বাঁকারি, সেওড়া ও রাঙচিত্রি গাছের ডাল-পালা দিয়া কাতার দড়িতে মজবুত করিয়া বাঁধা বেড়াগুলির দিকে সামন্তর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল—কোমরে আঁচল শক্ত করিয়া বাঁধিয়া এক দল মেয়ে বেড়ার গায়ে ইতিমধ্যেই আর এক সারি বেড়ার মত সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর সাতকড়ি সামন্তের মুখে আর কথা যোগাইল না; ইতিমধ্যে গ্রামের বহু ব্যক্তি অকুস্থলে আসিয়া ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল—তন্মধ্যে সাতকড়ির অন্তরঙ্গ-স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। নিষ্ফল ক্রোধ কথায় ফুটাইয়া সাতকড়ি শাসাইতে লাগিল: দাঁড়াও, এখনি আমি থানায় জানাচ্ছি, আর সদরে হুজুরকেও লিখছি, তখন বুঝবে এর ফল কি হয়—তোমার দোষে তোমার বাবা পর্যন্ত মুস্কিলে পড়বে।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমার বাবাকে আবার টানছেন কেন? থানায় ত জানাচ্ছেন, আর আপনার হুজুরকেও লিখছেন—বেশ ত, তাঁরা এসে যদি বলেন যে আমিই দোষ করেছি—একলা আমিই শাস্তি নেব। এখন দয়া করে বাড়ী যান দেখি—আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করি।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পরিপূর্ণ ভাবে চণ্ডীর বিহসিত মুখের উপর আর একবার নিবদ্ধ করিয়া সাতকড়ি সামন্ত নীরবেই স্থান ত্যাগ করিয়া পথের দিকে পা বাড়াইল। কাছারীর কর্মচারী এবং গ্রামের লোক জন তাঁহার অনুসরণ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনবগোপাল সিংহ

শ্যামা পল্লীর পল্লবঘন নিভৃত নীড়ে
একদা এমনি আলোকোজ্জ্বল উদয়-পথে
অজ্ঞান-তমোঘন-ধরণীর বক্ষ চিরে
যুগের সূর্য্য মর্ত্ত্যে নামিল স্বর্ণ-রথে।

পুণ্য পরশে বন-অঙ্গনে পুলক জাগে
ফাগুনের বুকে কুসুম-কোরকে আলোর শিখা
অশোক-কুঞ্জ রাঙা হ'লো চারু অঙ্গরাগে
কিংশুক-দীপে সমারোহে চলে আরাত্রিকা।

উভয় যুগের দ্বিমহামানব কৃষ্ণ, রাম
একক আধারে নব যুগে হ'লো একত্রিত.

কামারপুকুর সহসা হ'লো রে তীর্থধাম
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হ'লো উদ্বেলিত।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের মর্ম্মবাণী
মূর্ত্ত হ'লো সে মহামানবের হোমাগ্নিতে
ধর্মান্ধের সঞ্চিত যত দ্বন্দ্ব, গ্লানি
অবসিত হ'লো শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে।

ভবতারিণীর পূত মন্দিরে পুণ্য ক্ষণে
সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় যে ধ্বনি জাগে
বীর-বিবেকের মাধ্যমে তাহা গম্ভীর স্বনে
বিস্ময়-ঘন বিশ্ব-সভায় কাঁপন লাগে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোরিয়ায় জাতিপুঞ্জ-বাহিনীর বিপর্যয়—

সমগ্র উত্তর-কোরিয়া দখল শেষ হওয়া যখন অদূরবর্তী বলিয়া মনে হইতেছিল, বড়দিনের পূর্বেই মার্কিণ সৈন্যরা দেশে ফিরিতে পারিবে বলিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার যখন আশা করিতেছিলেন, তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম এড়াইয়াই সমগ্র কোরিয়া কম্যুনিষ্ট-প্রভাব হইতে মুক্ত করার আশু সম্ভাবনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যখন আনন্দের বান ডাকিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনী এমন গুরুতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে যে, কোরিয়া দখলের আশাই শুধু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় নাই, তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের প্রবল আশঙ্কাও সকলের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য অক্টোবর মাসের (১৯৫০) শেষ ভাগেই উত্তর-কোরিয়া বাহিনী পুনর্গঠিত হইয়া প্রবল বাধাদান আরম্ভ করিয়াছিল। এই বাধাদান প্রবলতর আকার ধারণ করে যখন নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে চীনা কম্যুনিষ্টরাও উত্তর কোরিয়া বাহিনীর সহিত যোগদান করে। কিন্তু ২রা নবেম্বর (১৯৫০) চীনা ও কোরীয় কম্যুনিষ্টরা যেমন হঠাৎ প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে তেমনি পাঁচ দিন পরে হঠাৎ এই প্রতি-আক্রমণ থামিয়া যায়। চীনা কম্যুনিষ্টরা হঠাৎ আক্রমণ করিল কেন, আবার হঠাৎ এই আক্রমণ বন্ধই বা করিল কেন, তাহা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তথাপি কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ বন্ধ করাকে মার্কিণ, বৃটিশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যরা যে নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। টোকিও হইতে ২৩শে নবেম্বরের এক সংবাদে জানা যায়, ২২শে নবেম্বর তারিখে চীনা কম্যুনিষ্টরা ২৭ জন আহত মার্কিণ বন্দী এবং ৭০ জন দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যকে মুক্তিদান করে। কম্যুনিষ্ট চীন যে আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় না তাহারই চিহ্ন-স্বরূপই না কি তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চীনা এবং উত্তর কোরীয় কম্যুনিষ্টদের প্রতি-আক্রমণ বন্ধ হওয়ার পর ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত গুরুতর সংগ্রাম কিছু হয় নাই, যদিও জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনী উত্তর কোরিয়া দখলের কাজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তর কোরিয়া দখল শেষ করিবার জন্য জেনারেল ম্যাকআর্থার চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করেন ২৪শে নবেম্বর (১৯৫০) তারিখে। আরও ১০ দিন আগেই না কি এই অভিযান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। চূড়ান্ত অভিযানের তারিখ ১০ দিন পিছাইয়া দেওয়ার প্রকৃত কারণ সামরিক, না রাজনৈতিক তাহা অনুমান করা সহজ নয়। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নিরাপত্তা পরিষদের আমন্ত্রণে পিকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দল ২৪শে নবেম্বর নিউ ইয়র্ক সহরে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পরে জেনারেল ম্যাকআর্থার চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করেন। চীনা প্রতিনিধি দলের নিউ ইয়র্কে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই উত্তর কোরিয়া দখলের শেষ অভিযান কেন আরম্ভ করা হইল তাহার তাৎপর্য্য উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহাকে কাকতালীয় ন্যায়ের মত মনে করা সত্যই সম্ভব কি না, তাহা ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করা আবশ্যক। গত ৬ই নবেম্বর জেনারেল ম্যাকআর্থার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে-বিশেষ রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে তিনি জানান যে, তাঁহার সৈন্যবাহিনী উত্তর কোরিয়ায় চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনীর সহিত লড়াই করিতেছে। ৮ই নবেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কোরিয়ায় চীনা কম্যুনিষ্টদের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে জেনারেল ম্যাকআর্থারের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার আগের দিন নিরাপত্তা পরিষদ জেনারেল ম্যাকআর্থারের রিপোর্ট সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করেন। উত্তর কোরিয়া হইতে চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য পিকিং গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়া একটি ষড়-শক্তির প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। ১১ই নবেম্বর কম্যুনিষ্ট চীন কোরিয়া সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের রিপোর্ট সম্পর্কে পিকিং গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে পত্র বা স্মারক-লিপি প্রেরণ করেন তাহাতে এই রিপোর্টকে 'from beginning to end a perversion of the facts and completely contrary to the truth' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ পিকিং গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ম্যাকআর্থারের রিপোর্টকে আগাগোড়া ঘটনা-সমূহের বিকৃতি এবং সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপে পরিপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোরিয়ায় চীনের হস্তক্ষেপকে চীনা-জনগণের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ সাহায্য দান যে স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত তাহাও উল্লেখ করা হয়। উক্ত স্মারক-লিপিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, চীনের বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক কার্য্যের অভিযোগ করিতে চীনের জনগণ সম্পূর্ণরূপে অধিকারী।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের চূড়ান্ত অভিযান যদি দশ দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইত, তাহা হইলে উহা ১৪ই নবেম্বর আরম্ভ হইত। এই

১৪ই নবেম্বর তারিখেই ফরমোসায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় যোগ দিবার জন্ম কম্যুনিষ্ট চীন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দল পিকিং হইতে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেন। তাঁহাদের যাত্রার এই তারিখটি জেনারেল ম্যাকআর্থার পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। অবশ্য এই প্রতিনিধি দলের যাত্রার দিনেও চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করা যাইত। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দেওয়ার সময় উত্তর কোরিয়া দখলের শেষ পর্য্যায় আরম্ভ ও শেষ হইলে ব্যাপারটা যে চমকপ্রদ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু তাক-লাগানো ছাড়াও উহার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি জেনারেল ম্যাকআর্থারের দৃষ্টি ছিল। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়াই যে তিনি চূড়ান্ত অভিযানের তারিখ ১০ দিন পিছাইয়া দিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। নিরাপত্তা পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির সময় যদি উত্তর কোরিয়া দখল শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের মার্কিণ প্রতিনিধিবৃন্দ শক্তিমান হইয়া চীনা প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতে পারিতেন এবং মার্কিণ প্রতিনিধি দলের সর্ত্তাবলী মানিয়া লওয়া ছাড়া কম্যুনিষ্ট চীনের উপায়ান্তর থাকিত না। সুতরাং একটা শক্তিশালী অবস্থা বা 'position of strength' সৃষ্টি করিবার জন্যই যদি ২৪শে নবেম্বর চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে কেন? এই অভিযান আরম্ভ করার সময় জেনারেল ম্যাকআর্থার বলিয়াছিলেন যে, এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইলে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবে। মার্কিণ সৈন্যদিগকে তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, তাহারা বড়দিনের পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধ শেষ করার অভিযান আরম্ভ হওয়ার পরের দিনই উহা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে এমন অবস্থা হয় যে ডানকার্ক বা তব্রুকের পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনী অতিক্রত অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনী কোরিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনী যে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার পরিণামে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে-তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের আশঙ্কা।

আমেরিকা, চীন ও জাতিপুঞ্জ—

প্রতি-আক্রমণের সম্মুখে জেনারেল ম্যাকআর্থারের চূড়ান্ত অভিযান যখন সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় গত ২৮শে নবেম্বর (১৯৫০) নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারেণ অষ্টিন কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহা 'position of strength' হইতে করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনী যখন হারিয়া যাইতেছিল সেই সময় নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে পিকিং প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ উ শিউ চুয়ান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে প্রত্যভিযোগ উপস্থিত করেন তাহা শ্রুতিমধুর হইবারও কোন কারণ দেখা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদ কোরিয়া ও ফরমোসা সমস্যা একই সঙ্গে আলোচনা করা স্থির করেন এবং মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ অষ্টিনকেই প্রথম বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। মিঃ অষ্টিন তাঁহার বক্তৃতায় কোরিয়া যুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপকে প্রকাশ্য এবং কুখ্যাত আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক শান্তি এবং উক্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনী গত সপ্তাহে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করে। এই অভিযান এখন এমন ভাবে প্রতিহত করা হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়ায় দুই লক্ষেরও অধিক সশস্ত্র চীনা কম্যুনিষ্ট যে যুদ্ধ করিতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।" চীনের রাজ্যের প্রতি কোন লোভ নাই বলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে অন্যায় অভিপ্রায় নাই সে-সম্বন্ধে আশ্বাস দিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আর কি করিতে পারে?" সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আশ্বাসে কম্যুনিষ্ট চীন আশ্বস্ত হইতে পারে এমন কি কি ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা মিঃ অষ্টিন নিষ্প্রয়োজন মনে করিতে পারেন, কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে তাহা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আশ্বাসের মূল্য বিচার করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কুয়োমিণ্টাং চীনের পরিবর্ত্তে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিকে আসন দানে অস্বীকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর প্রাচ্যে জেনারেল ম্যাকআর্থারের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই কম্যুনিষ্ট চীনের আশঙ্কাকে শুধু গভীরতর করিয়াই তুলিয়াছে মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসারেই চালিত হইয়া থাকে। কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া পিকিং গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর ভরষা স্থাপন করিবে কিরূপে?

মিঃ অষ্টিনের বক্তৃতার পর কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ চুয়ান ১০৫ মিনিট-ব্যাপী বক্তৃতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি এবং ফরমোসা অভিযানের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং চক্রের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাকে এখন পর্য্যন্ত চীনের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি বলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকার করায় মিঃ চুয়ান তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, চীনের জনগণ এইরূপ অবস্থা সহ্য করিতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব চীনের জনগণের মানিয়া লওয়ার কোন কারণ নাই।" কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ যে চীনের নিরাপত্তাকে গভীর ভাবে বিপন্ন করিয়াছে সে-কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ চুয়ান অভিযোগ করিয়াছেন যে, মার্কিণ বিমান ১০ বার চীনের উপর হানা দিয়াছে। মার্কিণ যুদ্ধ-জাহাজ চীনা বাণিজ্য-জাহাজের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে এবং জোর করিয়া চীনা বাণিজ্য জাহাজ খানাতল্লাস করিয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। মিঃ চুয়ান আরও বলিয়াছে

যে, চীনের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সকল প্রত্যক্ষ আক্রমণ চীনের জনগণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট চীন এই ভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিতে সাহস করিবে, ইহা বোধ হয় অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন নাই। অভিযোগ সত্য হইলেও শক্তিমানের বিরুদ্ধে উহা উপস্থিত করিতে দুর্ব্বলের সাহসে কুলায় না। বোধ হয় এই জন্যই মিঃ চুয়ানের বক্তৃতা অনেকের কাছে অত্যন্ত তীব্র বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য অপেক্ষা তীব্র এবং তিক্ত আর কিছুই নাই। মিঃ অষ্টিন মিঃ চুয়ানের অভিযোগের যে-উত্তর দিয়াছেন তাহাতেও বুঝায়, কম্যুনিষ্ট চীনের দুঃসাহসে তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি মিঃ চুয়ানের অভিযোগকে সত্যের বিকৃতি, দুর্ণাম রটনা এবং নিছক মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, "চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তিনি একা সকলের বিরুদ্ধে।" ফরমোসার বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের অভিযোগকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়া কোরিয়ার যুদ্ধ যাহাতে বিস্তৃতি লাভ না করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা সত্বর শেষ করিবার উদ্দেশ্যে ষড় শক্তির উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচনা করিতে তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করেন। কিউবা, ইকুয়েডর, ফ্রান্স, নরওয়ে, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ষড় শক্তি কর্ত্তৃক কোরিয়া হইতে চীনা কম্যুনিষ্টদিগকে অপসারিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহাই ষড় শক্তির প্রস্তাব নামে খ্যাত। ৩০শে নবেম্বর এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবের পক্ষে নয় ভোট হয়। ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। রুশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে। অতঃপর ৫ই ডিসেম্বর ষ্টিয়ারিং কমিটি উক্ত প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যতালিকা-ভুক্ত করেন। সাধারণ পরিষদও এই প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে একা কম্যুনিষ্ট চীন সকলের বিরুদ্ধে, না সকলে মিলিয়া একা কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না কি?

পরমাণু বোমার হুমকী—

উত্তর কোরিয়ায় জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনী যখন পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন, সেই সময় পিকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ চুয়ানের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আমেরিকায় যে নৈরাশ্যময় বিক্ষুব্ধ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই নৈরাশ্যময় বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে গত ৩০শে নবেম্বর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, কোরিয়ায় পরমাণু বোমা ব্যবহারের কথা বরাবরই বিবেচনা করা হইয়া আসিতেছে। উহা ব্যবহার করা হইবে কি না তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব সামরিক কর্ত্তাদের। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, পরমাণু বোমা ব্যবহারের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুমোদন লওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে উহাও একটি অস্ত্র এবং উহা ব্যবহার করিতে আমেরিকার স্বাধীনতা আছে। তবে তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরমাণু বোমা বর্ষণ করিবার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এইরূপ আকস্মিক ভাবে পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী দেওয়ায় বিশ্ববাসী যেমন বিস্মিত না হইয়া পারে নাই, তেমনি তাহাদের মনে গভীর উদ্বেগেরও সঞ্চার হয়। কোরিয়ায় জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনী যখন গুরুতর পরাজয়ের সম্মুখীন, সেই সময় নিরাপত্তা পরিষদে পিকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ চুয়ান কর্ত্তৃক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী দিলেন কেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই হুমকী দিলেন তাহার তাৎপর্য্য মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদা' ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫০) তারিখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইতে বলিয়াছেন যে, চীনকে ভয় দেখানই ছিল উহার উদ্দেশ্য, কিন্তু সকলের আগে উহাতে ভয় পাইয়াছে আমেরিকার ছোট সরিকরা। বৃটেন ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাই যে আমেরিকার ছোট সরিক তাহা সকলেরই জানা কথা। কোরিয়ায় পরমাণু বোমা ব্যবহার করিয়া যে কোন ফল হইবে না তাহা কোরিয়া-যুদ্ধের গোড়া হইতে শোনা যাইতেছে। মার্কিণ সামরিক কর্ত্তাদের প্রধান (U. S. Army Chief of Staff) গত ৬ই ডিসেম্বর সিউলে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমেরিকার 'ট্রাম্প কার্ড' পরমাণু বোমা বর্ষণ করিতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যদি সিদ্ধান্তও করেন তাহা হইলেও সামরিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণের কোন কারণই তিনি দেখিতে পান না। পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকীতে চীনের পরিবর্ত্তে বৃটেন এবং ফ্রান্স ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল কেন, তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। কোরিয়াবাসীদের প্রতি দরদ ইহার কারণ নয়। শুধু বোমা বর্ষণ করিয়াই কোরিয়ার সহর ও গ্রামগুলি যে-ভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে বোমা বর্ষণের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ভীত হওয়ার কারণ বুঝা যায় মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি হইতে। ৩০শে নবেম্বর তারিখে কমন্স সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, চীনের সহিত যুদ্ধে জড়িত না হওয়ার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কারণ, তিনি মনে করেন, বিশ্বের ঘটনাবলীর গতি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ গ্রহণ করিবে তাহা নির্দ্ধারিত হইবে ইউরোপে। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য কি ইহাই নয় যে, বিশ্বের ঘটনাবলীর গতি নির্দ্ধারক যুদ্ধটা ইউরোপে হইবে বলিয়াই তিনি আশঙ্কা করেন? কথাটা তিনি আরও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তাঁহার ধারণা, রুশিয়া ও চীনের মধ্যে যদি একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও রুশিয়া এখনই ইউরোপে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিবে না। বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী যত দূর সম্ভব গভীর ভাবে চীনের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়া যাহাতে ইউরোপে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করাই রুশিয়া ও চীনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি মনে করেন। মিঃ চার্চ্চিলের এই আশঙ্কা অমূলক কি না তাহাই বড় কথা নয়। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিলে আরও অনেক বেশী পরিমাণে সৈন্য ও

সমর-সম্ভার সুদূর প্রাচ্যে না পাঠাইলে চলিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র যোগাইতে পারিবে বটে, কিন্তু চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার মত প্রচুর সৈন্য পাওয়া যাইবে কোথায়? পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি সামরিক শক্তিতে এমনিই দুর্ব্বল, ইহার উপর চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যদি ইউরোপ হইতে সৈন্য পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে পশ্চিম ইউরোপের দুর্ব্বল রক্ষা-ব্যবস্থা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। শুধু অস্ত্র-শস্ত্রই নয়, সৈন্যবলের দিক দিয়াও পশ্চিম ইউরোপ একান্ত ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধেই আমেরিকা যে ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে পৃথিবীর অন্যত্র যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে আমেরিকার পক্ষেও তাল সামলান বড় সহজ হইবে না। জার্ম্মাণীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুই ডিভিশন সৈন্য আছে এবং অষ্ট্রীয়া ও ত্রিয়েস্তে আছে অর্দ্ধ ডিভিশন সৈন্য। কোরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১০ ডিভিশন নিয়মিত সৈন্য এবং ছয় ডিভিশন নেশন্যাল গার্ড ছিল, জাপানে অবস্থিত ছিল চারি ডিভিশন সৈন্য এবং ইউরোপে আড়াই ডিভিশন সৈন্য। কোরিয়ার যুদ্ধে জাপানে অবস্থিত চারি ডিভিশন সৈন্য তো নিয়োজিত হইয়াছেই, অধিকন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেও দুই ডিভিশন পদাতিক সৈন্য এবং এক ডিভিশন নৌ-সৈন্য কোরিয়ার যুদ্ধে পাঠাইতে হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অবশ্য বিপুল অর্থই কংগ্রেসের নিকট দাবী করিয়াছেন। কিন্তু রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতেও কিছু সময় প্রয়োজন হইবে। এদিকে পশ্চিম জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার প্রশ্ন লইয়া পশ্চিম ইউরোপ রক্ষার জন্য সম্মিলিত বাহিনী গঠনেও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা সন্দেহও যে নাই তাহাও নয়। পশ্চিম ইউরোপের ইকনমিক কো-অপারেশন এডমিনিষ্ট্রেশনের ডিরেক্টর মিঃ হফম্যান ডিরেক্টরের পদ হইতে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া লণ্ডন হইতে আঙ্কারা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। ঐ সকল দেশের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং দেশরক্ষা মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইউরোপকে রক্ষা করিবার পূর্ণ দায়িত্ব আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার এবং ইউরোপে রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করিবার মূলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় যে যুদ্ধ নিরোধ করা, যুদ্ধ আরম্ভ করা নয়, সে-সম্বন্ধেও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই।

ইউরোপে যেখানে এই অবস্থা সেখানে চীনের সহিত লড়াই করিতে খুব বেশী সৈন্য পাওয়া সম্ভব নয়। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই পর্য্যাপ্ত স্থলসৈন্য সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু ভারত এখন পর্য্যন্তও মনে-প্রাণে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকে যোগদান করে নাই, ইহাই আমেরিকার ধারণা। ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনীর অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করা সমর্থন করে নাই। ভারত কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সমর্থন করিলেও সৈন্য দিয়া সাহায্য করে নাই, বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছে। ইহার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর ভাষায় পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই। আবার ভারত ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানা ভাবে প্রচার-কার্য্য করা হইয়াছে এবং হইতেছে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এবং 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র প্রতিনিধি মিঃ রবার্ট ট্রামবুল গত নবেম্বর (১৯৫০) মাসের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে দুইটি রুশিয়ান দলকে পশ্চিম তিব্বতের বৃহৎ অঞ্চল জরীপ করিতে এবং ঘাঁটী স্থাপনের স্থান নির্ণয় করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মানস-সরোবর এবং রাকাস হ্রদের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূভাগে প্রধান ঘাঁটী স্থাপন করা হইবে। উহা নয়াদিল্লী হইতে মাত্র তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী। এই বিবরণ সত্য কি মিথ্যা তাহা কিছু অনুমান করিবার উপায় নাই। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য অনুমান করা কঠিন নয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পরমাণু বোমার হুমকীটা যে কম্যুনিষ্ট চীনকে লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হয় নাই তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনে ত্বরান্বিত করা এবং তাহাদিগকে আরও নিবিড় ভাবে মার্কিণ সামরিক প্রভাবে আনয়ন করা যে উহার একটি উদ্দেশ্য তাহা অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য চীনের আসন্ন সংগ্রামে এশিয়ার দেশগুলি বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ যাহাতে সৈন্য প্রদান করে তাহার জন্য অনুপ্রাণিত করা, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? ভারত অবশ্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দাবী একটুকুও ছাড়িবে না। কাজেই চীনও তাহার দাবী নরম করিতে রাজী হইবে না। চীনের জন্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হইল না, এই যুক্তিতে চীনের সহিত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাওয়া যাহাতে সম্ভব হয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ পরিস্থিতিই সৃষ্টি করিতে চায়।

ট্রুম্যান-এটলী বৈঠক—

পরমাণু বোমার হুমকীতে ভয় পাইয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী যখন ওয়াশিংটনে ছুটিয়া গিয়াছিলেন তখন মনে হইয়াছিল, চীনের সহিত যুদ্ধ নিরোধ করাই ছিল তাঁহার আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্য। রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রবীণ সহযোগীদের সহিত আলোচনা করেন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ প্লেভেন এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব মঃ সুম্যানের সহিতও তাঁহার আলোচনা হয়। জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বৃটিশ দেশরক্ষা সচিব মিঃ শিনওয়েল যে মন্তব্য করেন তাহাতেও মিঃ এটলীর ওয়াশিংটনে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল। কমন্স সভায় শ্রমিক দলের প্রায় এক শত জন সদস্য চীনের সহিত যুদ্ধের বিরোধী বলিয়াই মিঃ এটলী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, এইরূপ একটা ধারণাও সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ট্রুম্যান-এটলী বৈঠকের সিদ্ধান্ত যখন প্রকাশিত হইল তখন এই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে বিলম্ব হইল না।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫০) ওয়াশিংটনে

পৌঁছান। ঐ দিন হইতেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত তাঁহার আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত মিঃ এটলীর মোট বৈঠক হয় ছয়টি। ষষ্ঠ বৈঠকের পরে ৮ই ডিসেম্বর ট্রুম্যান-এটলী বৈঠকে গৃহীত যে দশ দফা সম্বলিত কর্ম্মসূচী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চীনের সহিত যুদ্ধ এড়াইবার অভিপ্রায়ের কোন ইঙ্গিত মাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং মিঃ এটলীর ওয়াশিংটনে যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রথমে যাহা মনে হইয়াছিল ঠিক তাহা যে নয় তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? ট্রুম্যান-এটলী সিদ্ধান্তে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ হইয়াছে পশ্চিম ইউরোপের অর্থাৎ উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থাই মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টা অবিলম্বে তীব্রতর করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। সুতরাং সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে আমেরিকা আরও গভীর ভাবে জড়াইয়া পড়িলে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। যুদ্ধ নিরোধ করিতে হইলে যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেশরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকৃতি হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যত দ্রুত সম্ভব বৃটেন এবং আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কাজ এমন ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যে, যে-সকল স্বাধীন জাতি সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিয়াছে তাহাদিগকে যেন সাহায্য করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তে পশ্চিম ইউরোপ যে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া কাঁচা মাল লইয়া যে-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারও একটা মীমাংসা হইয়াছে। রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এবং অসামরিক জনগণের জন্য যে-সকল কাঁচা মাল অত্যাবশ্যক সেগুলি বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থায় যে-সকল দেশ যোগদান করিয়াছে সেই সকল দেশের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিবার সুবিধাটুকু মিঃ এটলী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে মিঃ এটলী ওয়াশিংটন গিয়াছিলেন বলিয়া সকলের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল সে-সম্বন্ধে ট্রুম্যান-এটলী বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে?

কোরিয়ার যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হইলে এবং চীনের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে রুশিয়ার পরমাণু বোমা ইংলণ্ডের সহরগুলিতে বর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া বৃটিশারগণও মনে করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই সকলের মনে হইয়াছিল যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে পরমাণু বোমা বর্ষণের হুমকী প্রত্যাহার করাইবার জন্য এবং চীনের সহিত জড়িত না হইতে তাঁহাকে রাজী করাইবার জন্য মিঃ এটলী ওয়াশিংটন গিয়াছিলেন। কিন্তু পরমাণু বোমা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট হইতে তিনি এইটুকু মাত্র প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে পারিয়াছেন যে, পরমাণু বোমা ব্যবহার করা হইলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সে-সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে ওয়াকিবহাল রাখিবেন। সুতরাং পরমাণু বোমা বর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। চীনের সহিত যুদ্ধে জড়িত হওয়া সম্পর্কে সোজাসুজি কোন কথা বলা হয় নাই বটে, কিন্তু তোষণ-নীতি অনুসরণ বা আক্রমণকারীকে পুরস্কৃত করা হইবে না বলিয়া তাঁহারা যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাতেই চীন সম্পর্কে কি নীতি অনুসরণ করা হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধের মীমাংসায় অবশ্য আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু চীনের যে-কোন দাবী পূরণ করাই যে তোষণ-নীতি বা আক্রমণকারীকে পুরস্কৃত বলিয়া গণ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। শান্তিপূর্ণ উপায় ফরমোসা সমস্যার সমাধান করিবার আগ্রহও অর্থহীন বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ট্রুম্যান-এটলী আলোচনার পরেও কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। বরং সুদূর প্রাচ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে যে-সকল বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ এটলী একমত হন নাই, সেইগুলির গুরুত্বই বেশী।

চীনের কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টকে চীনের আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন দান এবং কোরিয়া ও ফরমোসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ এটলীর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান চীনা কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টকে চীনের আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিতে, কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন প্রদান করিতে রাজী নহেন। ইহা যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পথে প্রধান বাধা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে কি করা হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের তেরটি দেশ অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম না করিবার জন্য গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৫০) চীনের কম্যুনিষ্টদের এক আবেদন করিয়াছে। এই তেরটি দেশের নাম ভারত, আফগানিস্থান, ব্রহ্ম, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, লেবানন, পাকিস্তান, পারস্য, ফিলিপাইন, সৌদী আরব, সিরিয়া ও ইয়েমেন। এই আবেদনে কম্যুনিষ্ট চীনের গবর্ণমেণ্ট এবং উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনী অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই, এই মর্ম্মে ঘোষণা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আবেদনে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করিলে সুদূর প্রাচ্যের বিরোধ মীমাংসার জন্য সময় পাওয়া যাইবে এবং ইহা দ্বারা আর একটি বিশ্বযুদ্ধ এড়াইতে সাহায্য করা হইবে।

এই তেরটি রাষ্ট্রের আবেদন শুনিয়া প্রথমেই সিঙ্গম্যান রীর উক্তি মনে পড়িবে। গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) জেনারেল ম্যাক-আর্থার কর্তৃক সিউলের কর্তৃত্ব-ভার সিঙ্গম্যান রীর হাতে অর্পিত হওয়ার পর তিনি সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "There is no 38th Parallel." অর্থাৎ অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা বলিয়া কিছু নাই। তেরটি রাষ্ট্রের আবেদন শুনিয়া বুঝা যাইতেছে, অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা সত্যই

আ দক্ষিণ কোরিয়ায় নূতন সৈন্য ও সমর-সম্ভার আনিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থারকে তাঁহার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের সময় ও সুযোগ দিবার জন্য এই আবেদনকে একটা চাল বলিয়া মনে করিবার অবশ্য কোন কারণ নাই। কম্যুনিষ্টরা অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম না করিলে যে পুনরায় উত্তর কোরিয়া দখলের আক্রমণ আরম্ভ করা হইবে না সে-সম্বন্ধে পিকিং গবর্ণমেণ্ট বা উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত তেরটি রাষ্ট্রের নিকট কোন প্রতিশ্রুতিও দাবী করেন নাই। পিকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ চুয়ান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ বি, এন, রাওকে জানাইয়াছেন যে, চীন গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সত্বর কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ করিতে চান। এই উক্তি হইতে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করা-না-করা সম্পর্কে পিকিং গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না। অবশ্য মিঃ রাও কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। গত ১২ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে তিনি বলিয়াছেন যে, পিকিং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ চান না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাঁহাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য তাঁহার প্রয়াসের পরিণাম অনুমান করিতে আমরা চেষ্টা করিব না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই মিঃ একিসন চীনের সহিত 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধের' ধুয়া তুলিয়াছেন। কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুই সেণ্ট লরেণ্ট বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত আলোচনার পর বলিয়াছেন, "আমি জানিতে পারিলাম, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিছুতেই কোরিয়া হইতে বিতাড়িত হইতে রাজী হইবে না।"

নেপাল কংগ্রেসের অভিযান—

নেপাল কংগ্রেসের অভিযান প্রারম্ভেই যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করিয়াছিল এবং অভিযানের গতি অগ্রসরও হইতেছিল দ্রুতগতিতে। কিন্তু অভিযানের পঞ্চম দিবস হইতেই যেন তীব্রতা হ্রাস পাইতে থাকে। বস্তুতঃ, অভিযানের প্রথম দিনেই নেপালের দ্বিতীয় প্রধান সহর বীরগঞ্জ দখল করিয়া নেপাল কংগ্রেস সেখানে যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছিল, নেপাল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে নয় দিন পরে উক্ত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের আয়ুষ্কাল শেষ হয়। নেপাল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যরা ২০শে নবেম্বর অপরাহ্ণে বীরগঞ্জ পুনরায় দখল করে। ইহার পর হইতে নেপাল কংগ্রেসের অভিযান যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অভিযান একেবারে বন্ধ হয় নাই। বীরগঞ্জ ত্যাগকে উদ্দেশ্যমূলক ও সুপরিকল্পিত বলিয়া নেপাল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অভিহিত করিয়াছেন। নেপাল কংগ্রেসের অভিযানের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা হয়ত সঠিক ভাবে বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু নেপালের অনেকটা অঞ্চল নেপাল কংগ্রেসের দখলে রহিয়াছে এবং অভিযাত্রী বাহিনী এখনও নূতন নূতন অঞ্চল দখল করিতেছে। কিন্তু নেপাল কংগ্রেসের এই অভিযানের ভবিষ্যৎ কি? সমগ্র নেপাল মুক্ত করা নেপাল কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না, তাহা বলা কঠিন।

নেপাল কংগ্রেসের অভিযান এ ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার কারণ কি, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। অনেকে মনে করেন, সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সংগঠনের অভাবই ইহার কারণ। নেপাল কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধ, গরিলা বাহিনীর কার্য্য-কলাপ এবং ভারতের ১৯৪২ সালের আন্দোলনের মত আন্দোলন আরম্ভ করা প্রভৃতি অনেক কথাই অবশ্য বলিয়াছেন। কি অবস্থায় পড়িয়া এই সকল কথা তাঁহারা বলিয়াছেন, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। ভারতকে ঘাঁটি করিয়াই এই অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতকে ঘাঁটি করিয়া এই অভিযান চালাইতে দেন নাই। অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভারত হইতে নেপালে এবং নেপাল হইতে ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় ভারতে অবস্থিত নেপালীরা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইয়া এই অভিযানকে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। অভিযান চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। অভিযাত্রী বাহিনী বীরগঞ্জ দখল করিবার সময় বীরগঞ্জের সরকারী কোষাগারের সমস্ত অর্থ দখল করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ ঐ অর্থ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। অভিযান চালাইবার জন্য নেপাল সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ভারতীয় অঞ্চলে যে-সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ মজুত করা হইয়াছিল, বহুসংখ্যক গৃহ তল্লাস করিয়া ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। জনৈক ভারতীয় অফিসারের প্রদত্ত সংবাদ অনুসারেই নেপাল গবর্ণমেণ্ট রাণা-শাসনবিরোধী আন্দোলনের সমর্থকদিগকে গ্রেফতার করেন এবং গোপন মজুত অস্ত্র-শস্ত্রের সন্ধান পাইয়া ঐগুলি দখল করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমর্থন করিলেও নেপাল কংগ্রেসের অভিযান সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি রাণা-শাসনের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রিকা নেপাল কংগ্রেসের অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন: "আমরা যদি নেপাল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি, তাহা হইলে শাসন-পরিচালন ব্যবস্থাকে তো ধ্বংস করিবই, সম্ভবতঃ আমাদের নিরাপত্তারও বিপদ টানিয়া আনিব।" এই মন্তব্যের মধ্যেই রাণা গবর্ণমেণ্ট এবং নেপাল কংগ্রেসের অভিযান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিচয় কি পাওয়া যায় না? ভারত গবর্ণমেণ্ট অবশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে নেপালের রাণা-শাসনকে গণতান্ত্রিক রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উহার ফল এ পর্য্যন্ত কি হইয়াছে?

নেপাল-ভারত আলোচনা—

নেপালের রাণা-গবর্ণমেণ্ট যে প্রত্যক্ষ ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অসন্তুষ্ট করিতে চান না, তাহা নেপালের রাজনৈতিক শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার জন্য দুই জন মন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে ভারতে আগমন করা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। গত ২৭শে নবেম্বর (১৯৫০) নেপাল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জেনারেল কৈশব সমশের জং বাহাদুর এবং জেনারেল বিজয় সমশের নয়াদিল্লীতে পৌঁছান। ২৮শে নবেম্বর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের আলোচনা আরম্ভ হয়। ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আলোচনা চলা সত্ত্বেও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। যতটুকু বুঝা যায়, নেপালের মহারাজাধিরাজকে স্বীকার এবং রাজনৈতিক সংস্কার উভয় ব্যাপার লইয়াই আলোচনায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে এবং নেপালের

মন্ত্রিদ্বয় প্রধান মন্ত্রীকে সাক্ষাৎ ভাবে আলোচনার ফলাফল জানাইবার জন্য নেপালে ফিরিয়া গিয়াছেন।

আলোচনার ধারা সম্পর্কে কোন বিবরণ অবশ্য প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাহাতে মনে হয়, নেপালের মহারাজাধিরাজকে স্বীকার করার প্রশ্নের উপর অপ্রয়োজনীয় ভাবে অত্যধিক জোর দিয়া মূল সমস্যা নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রশ্নকে গৌণ করিয়া তোলা হইয়াছে। রাণা-গবর্ণমেণ্ট যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজী হন, তাহা হইলে নেপালাধীশকে স্বীকার করা-না-করার প্রশ্ন স্থির করিবার অধিকার নেপালের জনগণের। গণভোট এবং গণপরিষদের মারফৎ এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই গণতন্ত্র-সম্মত। কাজেই আশঙ্কা হইতেছে যে, এই আলোচনার মূলেই গলদ রহিয়াছে। রাণা-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বৈর-শাসন এতটুকুও পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। রাণা-গবর্ণমেণ্টের এই দৃঢ়তার মূলে বৈদেশিক প্রভাব কতখানি, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়।

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সুদূর প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ স্যার ই, ডেনিং এবং ভারতস্থিত বৃটিশ ডেপুটী হাই কমিশনার মিঃ রবার্টস্ ৩রা ডিসেম্বর কাটামুণ্ডে পৌছেন। এই উপলক্ষে কাটামুণ্ডের প্রায় ২৫ হাজার নরনারী প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে পুলিশ দমন-নীতি চালাইয়াছিল। ভারতে মার্কিণ দূতাবাসের উপদেষ্টা মিঃ লয়েড এইচ, ষ্টীয়ার ৬ই ডিসেম্বর কাটামুণ্ডে গমন করেন। নেপালের রাণা-গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন তাহা কে বলিবে? স্বৈরতান্ত্রিক রাণা-শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা যদি বৃটিশ ও মার্কিণ স্বার্থের অনুকূল হয়, তাহা হইলে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? নেপাল সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতিও বৃটেন ও আমেরিকা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত, এই প্রশ্নও উপেক্ষা করা যায় না।

কলম্বো পরিকল্পনা—

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ৫৭ কোটি নরনারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথের রচিত পরিকল্পনা গত ২৮শে নবেম্বর (১৯৫০) প্রকাশিত হইয়াছে। উহাই কলম্বো পরিকল্পনা নামে খ্যাত। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা অক্টোবর (১৯৫০) পর্য্যন্ত লণ্ডনে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন হয়, তাহাতে এই পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় এবং বৃটিশ বোর্ণিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশ। এই পরিকল্পনা ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে ছয় বৎসরে সমাপ্ত হইবে। মোট ব্যয় হইবে ১৮৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে বৈদেশিক অর্থ পাওয়া যাইবে ১০৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। এই পরিকল্পনার কতখানি প্রচার-কার্য্য এবং কতখানি সার-বস্তু, তাহা বলা কঠিন। পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত অর্থ ব্যয় করিলেই যে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৯৪৯ সালের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ৭৫ কোটি ডলার সাহায্য দান [illegible]। [illegible] কুইরিনোর দলের লোকেরাই শুধু অধিকতর বিত্তশালী হইয়াছে, জনগণের দুর্গতি আরও বাড়িয়াছে। উত্তর কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট স্বৈর-শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু বিলাতের 'টাইম' পত্রিকার প্রতিনিধি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, উত্তর কোরিয়ায় কণ্ট্রোল ব্যবস্থা এমন ভাবে কার্য্যকরী করা হইয়াছিল যে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে নাই এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও অভাব ঘটে নাই।

তিব্বতে কি ঘটিতেছে?—

প্রায় এক মাস ধরিয়া তিব্বত সংক্রান্ত সংবাদের ফ্রণ্টে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। ৮ই নবেম্বর (১৯৫০) দলাই লামা গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করেন। নয়াদিল্লীর ১৫ই নবেম্বরের সংবাদ প্রকাশ, লাসাস্থিত ভারতীয় মিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, চীন ও তিব্বতের মধ্যে চুক্তি হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, লাসা অভিমুখে চীনের অভিযান অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলিতেছে। লাসা হইতে দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত গিয়ামদা চীনা বাহিনী দখল করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাও সত্য নয়। গিয়ামদা এখনও তিব্বত গবর্ণমেণ্টের দখলে রহিয়াছে। পেম্বাগোর পশ্চিমে অবস্থিত লারিগোওতে অবস্থিত তিব্বতী বাহিনী চীনা বাহিনীকে বাধা দান করিতেছে বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে। কালিম্পংয়ে অবস্থিত তিব্বতের অর্থ-সচিব মিঃ সেপোন সাকাপ্পা গত ১৭ই নবেম্বর বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের গতি মন্থর হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ-বিরতি হয় নাই। ফোঙ্গো ডং (লাসা হইতে ৩৫ মাইল), নাগচু (লাসা হইতে ১৫০ মাইল), রেটিং (লাসা হইতে ৪০ মাইল) এবং গিয়ামদা চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক দখল করার সংবাদও তিনি অস্বীকার করেন। সেরা ও রেটিং মঠের লামারা বিদ্রোহ করার সংবাদও তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইহার পরে তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত কোন সংবাদই আর পাওয়া যায় নাই। তিব্বত এমনই রহস্য-ঘেরা দেশ যে, উহার আভ্যন্তরীণ সংবাদ দীর্ঘ দিন গোপন রাখা মোটেই কঠিন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পঞ্চম দলাই লামার মৃত্যু-সংবাদ ষোল বৎসর পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত গোপন রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

১৭ই নবেম্বর তারিখের সংবাদে জানা যায়, দলাই লামা গবর্ণমেণ্ট তিন জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধি দল লেক সাক্সেসে প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু উক্ত প্রতিনিধি রওনা হইয়াছেন কি না তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু গত ১৮ই নবেম্বর (১৯৫০) এল সেলভাডর বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক তিব্বত আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অনুরোধ করে। কিন্তু ২৪শে নবেম্বর (১৯৫০) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষ্টিয়ারিং কমিটি চীনের তিব্বত আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়টি কার্য্য-তালিকাভুক্ত করার প্রশ্ন মুলতুবী রাখিয়াছেন। তিব্বতের অভিযোগ সম্পর্কে ভারতের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পিকিং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সর্ব্বশেষ যে পত্র পাইয়াছেন তাহাতে তিব্বত-সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করা হয় নাই বলিয়া পিকিং

গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। ইহার পর চীনের তিব্বত আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয় কার্য্যতালিকাভুক্ত করার প্রশ্ন মুলতুবী রাখা হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ২৬শে অক্টোবর (১৯৫০) পিকিং গবর্ণমেণ্টের নিকট যে-পত্র দেন, ১৬ই নবেম্বর পিকিং গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। নূতন চীনা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক এই পত্রের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিব্বতে ভারতের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সেখানে নূতন কোন সুযোগ লাভের অভিপ্রায় না থাকা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন ঘোষণায় আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'চীন গবর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বত সমস্যার মীমাংসা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ না করিলেও চীনা গণমুক্তি বাহিনীর তিব্বতে প্রবেশের পরিকল্পনা আর স্থগিত রাখা যায় না।' কিন্তু তিব্বতের ভিতরের প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, চীনা বাহিনী লাসায় প্রবেশ করিলে বৃটেন হেলিকোপটার বিমান-যোগে লাসা হইতে দলাই লামাকে লইয়া আসিবে। ইহা হয়ত গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কালিম্পং হইতে ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে দলাই লামার শীঘ্রই ভারতে আগমনের সম্ভাবনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রায় এক শত খচ্চর-বোঝাই জিনিষ-পত্র তিব্বত হইতে ভারতে আসিতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। প্রত্যেক খচ্চরের পিঠে দুইটি করিয়া ব্যাগ এবং প্রত্যেক ব্যাগের উপর 'দলাই লামার সম্পত্তি' এই লেবেল আঁটা। দলাই লামার বহু মালপত্র কালিম্পংয়ে পৌঁছায় এবং তাঁহার বাসের জন্য একটি মনোরম দ্বিতল বাটি প্রস্তুত রাখার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। দলাই লামা ভারতে পৌঁছিলেও বহু দিন যদি সে-সংবাদ গোপন থাকে, তাহা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—

গত কয়েক মাস ধরিয়া উত্তর-ইন্দোচীনে ফরাসী বাহিনী হো চি মীন বাহিনীর নিকট যে-ভাবে পরাজিত হইতেছে, তাহাতে ফ্রান্স, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ চিন্তিত না হইয়া পারে নাই। সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের দখলে যাওয়ার পর কম্যুনিষ্ট চীনের সাহায্যে হো চি মীন আক্রমণ আরম্ভ করিবে, এই আশঙ্কা ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। হো চি মীন তাঁহার পরিকল্পিত অভিযানের আয়োজন প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়াও শোনা গিয়াছিল। বস্তুতঃ, এপ্রিল মাসের শেষ ভাগেই ফরাসী বাহিনীর সহিত হো চি মীনের গণফৌজের সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠে। মে, জুন এবং জুলাইয়ের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত যুদ্ধে ফ্রান্স তথা বাও দাইয়ের বাহিনী অনেক বার পরাজিত হয়। অতঃপর কিছু দিন স্তব্ধতার পর সেপ্টেম্বর মাস হইতে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক মাসে ফরাসী সৈন্যরা সীমান্তের সাতটি ঘাঁটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

কম্যুনিজম নিরোধের নীতি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে ইন্দোচীনে সাহায্য দিতে রাজী হইয়াছে। গত জুলাই মাসে মার্কিণ সামরিক মিশন সাইগনে উপস্থিত হইয়াছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য, শুধু ফরাসী সৈন্যদিগকে আধুনিক মার্কিণ অস্ত্রপ্রয়োগ শিক্ষা দেওয়াও নয়, বাও দাইয়ের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়িয়া তোলাই এই মিশনের উদ্দেশ্য। ইহা যে সময় সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্টোবর মাসে কোরিয়া যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখন এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কোরিয়া যুদ্ধে নিয়োজিত যুদ্ধজাহাজ এবং বিমান-বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর অংশ হিসাবে ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে সাহায্য করিবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইন্দোচীনে কোরিয়ার পুনরভিনয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া সাহায্য দানের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করিবার প্রতিশ্রুতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দিয়াছে। সাইগনে মার্কিণ কূটনৈতিক মিশন, সামরিক প্রচার-কার্য্যের মিশন এবং মার্শাল সাহায্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আছে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভিয়েটনামীরা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, মার্কিণ হস্তক্ষেপের ফলে তাহার পরিমাণ কি হইবে তাহা বলা কঠিন।

বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেস—

গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৫০) হইতে ইংলণ্ডে শেফিল্ডে বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু সংখ্যক প্রতিনিধিকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় ওয়ারসতে উহার অধিবেশন হয়। ফ্রান্সের খ্যাতনামা অধ্যাপক জোলিয়ত কুরীকে পর্য্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয় নাই। এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ৩০শে অক্টোবর বৃটিশ শ্রমিক দল এবং বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীদ্বয় এই সম্মেলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া এক সার্কুলার জারী করেন। এই বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেস যদিও কম্যুনিষ্টদের প্রভাবাধীন তথাপি বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহও সমাজতন্ত্রী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতিতে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারী নগরীতে শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কয়েক জন খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিকে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ছাড়পত্র না দেওয়ায় ঐ সময়ে একই সঙ্গে প্রাগে আর একটি কংগ্রেস হয়। প্যারী অধিবেশনে একটি স্থায়ী বিশ্ব-শান্তি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাসে ষ্টকহলমে এই কমিটির এক প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়। অতঃপর শেফিল্ডে বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল।

বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যতই থাকুক, ওয়ারস অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং গৃহীত প্রস্তাব হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে, ইংলণ্ডে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে কোনই ক্ষতি হইত না। বৃটিশ টোরী-গোষ্ঠীর মতে সোশ্যালিজম কম্যুনিজমের পথ প্রশস্ত করে মাত্র। সুতরাং বৃটিশ সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, এক দিন সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধেই এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতে পারে।

শ্রদ্ধা-নিবেদন

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

সঙ্গীত-সাধক শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৮ই নভেম্বর ৪০ বর্ষে পদার্পণ করলেন। সেই উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ ৪নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এক সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করেন। আমারও সেই সভায় উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সভার আয়োজন ও সাফল্যের মূলে ছিল বাংলার ক্রীড়ামোদিগণের নিকট-সুপরিচিত শ্রীপ্রবোধ দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা। রূপে, রসে, গন্ধে, গানে সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত দত্তের এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ভীষ্মদেব বাবু পণ্ডিচেরী থেকে আসবার পর এরূপ কোন স্থানে মিলিত হইয়া তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়, এমন প্রস্তাবেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু এবারে গুণমুগ্ধ শিষ্যবৃন্দের আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেননি। সভায় আনবার জন্য তাঁর বাড়ীতে যখন গেলাম, দেখি, তিনি বিছানায় বসে গল্প করছেন। এদিকে সভার সময়ও হয়ে গেছে। আমাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। একবার বললেনও "কেন এরূপ আয়োজন। গানের ব্যাপারে ত আমি নাই। হঠাৎ এরূপ একটা সভায় আমাকে ডাকাতে বড়ই লজ্জা মনে করছি।" এমন আত্মভোলা সাধক খুব কম দেখেছি, শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে যায়। সভায় তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। যাঁরা যাঁরা গান গা'ন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী শেফালীশোভা দত্ত, বাংলার প্রথিতযশা অভিনেত্রী শ্রীমতী ছায়া দেবী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করলাম, ওস্তাদ তাঁর প্রিয় শিষ্যদের গানে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। নিজেও শেষে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তা শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে গেলাম। সভার সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনলেন।

ছায়া দেবী, তারাদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভীষ্মদেব, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালীশোভা দত্ত, প্রবোধ দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

লেখক, ভীষ্মদেব ও সত্যেন ঘোষাল

সেদিনকার সভায় এক জনের অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল, তিনি হলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ও আমার সোদরপ্রতিম বনৈলীর কুমার শ্রীশ্যামানন্দ সিং। এই প্রসঙ্গে তাঁর কথা কিছু না বলে থাকতে পারছি না। যে সব লোক সঙ্গীতকেই জীবনে বরণ করে নিয়েছেন, সঙ্গীতই যাঁদের ব্রত ও ধ্যান-ধারণা, সেই দলের লোক ইনি। আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের বড়ই দুর্দ্দিন, এই সময়ে এঁর মতন দরদী ও সঙ্গীতপ্রাণ ব্যক্তির তাই একান্ত প্রয়োজন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার সরাই নামক গ্রাম ভীষ্ম বাবুর জন্মস্থান। পিতার নাম শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা স্বর্গগতা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। প্রায় ৬ মাস বয়সেই ভীষ্মদেব বাবু পাণ্ডুয়া ত্যাগ করেন। পরে তাঁর পিতামহের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাণ্ডুয়ায় বিশেষ ধুমধাম হয়, এবং তখন তাঁহার বয়স ৫ বৎসর। সেই সময়ে তিনি একবার গ্রামে আসেন। তাঁর ছাত্র-জীবন কলকাতায় শেষ হয়। ভীষ্ম বাবুর উর্দ্দু ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য আছে, ঐ ভাষায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। নানারূপ উর্দ্দু রচনাও তিনি করেছেন। যে সকল দেশবরেণ্য গুণীদের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন তাঁদের নাম যথাক্রমে:—শ্রীনগেন দত্ত মহাশয়, বাদল খাঁ সাহেব ও সঙ্গীত-সূর্য্য ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। আজ ইঁহাদের কেহই নাই।

ভীষ্মদেব বাবুর সুদূর পণ্ডিচেরী থেকে আসবার পরই আমার পূজ্যপাদ ও শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীসত্যেন ঘোষাল মহাশয় এবং আমি তাঁর কাছে যাই। সেই দিনই বুঝেছিলাম যে পূর্ব্বের ন্যায়ই তিনি সাধনায় মগ্ন আছেন। তাহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। তাঁর কণ্ঠে যে স্বর্গীয় গান শুনেছি, তা বিচার করবার ক্ষমতা যদিও আমার নাই, তাতে আমি অভিভূত। দীর্ঘ রেওয়াজের অভাবেও সে সুর কিছুমাত্র ম্লান হয়নি।

আজ ভাবলেও মন আনন্দে ভরে যায় যে, বহু দিন পরে তিনি আবার আমাদের মধ্যে। যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত তিনি বহু কাল ধরে পরিবেশন করেছেন তা শাশ্বত হয়ে থাকবে। বাংলার সঙ্গীত রস-পিপাসু সমাজ কোন দিনই ভুলবে না। যে বিচিত্র ভঙ্গী ও মাধুরী তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দান করেছেন তা একান্ত তাঁরই নিজস্ব, বাংলা দেশে সে এক অভিনব ধারার সূচনা করেছে।

তাঁর স্নেহধন্য আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই তাঁর চরণে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণ

এক পক্ষ কাল যাবৎ রোগ ভোগের পর গত ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার পণ্ডিচেরীতে স্বীয় আশ্রম-ভবনে বিপ্লবী বাঙ্গালার জননায়ক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঋষি ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণে সমগ্র ভারত গভীর শোকাভিভূত হইয়াছে। ঋষি অরবিন্দের মহাপ্রয়াণে ৫ই ডিসেম্বর প্রাতে অরবিন্দ-আশ্রম ও সমগ্র পণ্ডিচেরী সহর শোক-মগ্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এই বৎসর ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ৭৯তম জন্মতিথি পালিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ গত ২৪শে নভেম্বর তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে শেষ দর্শন দান করেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন ও তথায় তাঁহার আশ্রম স্থাপন করেন। কালক্রমে আশ্রমটি এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং দেশ-বিদেশ হইতে ভক্তবৃন্দ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে গমন করেন। বর্ত্তমানে আশ্রমে প্রায় আট শত আশ্রমিক রহিয়াছেন।

তাঁহার মৃতদেহ আশ্রমের দ্বিতলস্থ কক্ষে একখানি খাটের উপর শায়িত রাখা হয়। এই কক্ষেই তিনি ১৯২৭ সাল হইতে অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত গভীর শোকে মগ্ন হয় এবং সর্ব্বত্র শোক-সভায় তাঁহার

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী ৺মৃণালিনী দেবী
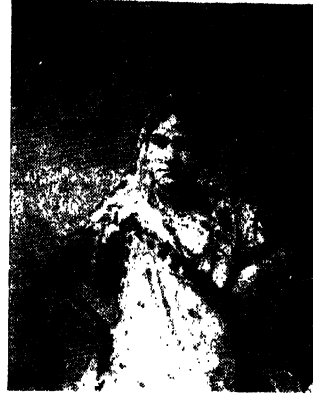
কর্ম্মময় জীবনের বিচিত্র কাহিনী আলোচনা করা হয়। নেতৃবৃন্দ শোক-বাণীতে মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহকর্ম্মী, দৈনিক বসুমতী-সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেন—

"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ঋষি শ্রীঅরবিন্দ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঠিক এমন সময়ে মহাপ্রয়াণ করিলেন যখন তাঁহার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব যখন এক সর্ব্বনাশা তৃতীয় মহাসমরের সম্মুখীন, যখন বিধ্বংসী শক্তিসমূহ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাকে কসাইখানাতে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে ঠিক সেই সময় প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার যোগসূত্রটি ছিন্ন হইল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনার মধ্য দিয়া এক নূতন জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই সমস্ত সন্দেহ, ঘৃণা ও হিংসা ভাবী যুগোন্মেষের অবশ্যম্ভাবী প্রসব-বেদনাস্বরূপ। তিনি তাঁহার স্বপ্নকে সার্থক করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—তাঁহার অমর আত্মা ভারতের উপর বিরাজ করিবে এবং প্রকৃত সঙ্কট অতিক্রম ও বিশ্বে পরম শান্তি ও প্রীতির স্বর্গ রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা শিশু-মানবতাকে স্বীয় পক্ষপুটে আশ্রয় দিবে।"

প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন—

"প্রাচীন কালের ঋষিদের ন্যায় নির্ভীক চিন্তাশীল ব্যক্তি হইলেও শ্রীঅরবিন্দ কাজের লোক ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গভীর

পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ জন্মভূমির ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়নে মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ও অবিশ্রান্ত সাধনার দ্বারা তিনি তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন হইলেও তাঁহার অমর বাণী আধ্যাত্মিক রসে যুগ-যুগ ধরিয়া মানব-জীবনকে সঞ্জীবিত করিবে। ভারত শাশ্বত কাল ধরিয়াই তাঁহাকে মহান্ সত্যদ্রষ্টা ও আত্মিক পুরুষ হিসাবে পূজা করিবে।"

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন—

"শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে আমরা সকলে নিদারুণ মর্ম্মাহত হইয়াছি। কেহই ভাবে নাই যে, তিনি এত শীঘ্র ইহলীলা সম্বরণ করিবেন। পুরাতন যুগের লোক তাঁহাকে ভারতের স্বাধীনতার প্রোজ্জ্বল আলোক-শিখা বলিয়া স্মরণ করিবে। পরবর্ত্তী কালে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যান এবং দর্শন ও ধর্ম্মের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যেই তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে এবং সাম্প্রতিক কালে যদিও অল্প লোকই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থরাজিই তাঁহার বাণীকে দূর-দূরান্তরে লইয়া গিয়াছে। এই মহা ক্ষতিতে আমরা সকলেই শোকে মুহ্যমান।"

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক বিবৃতিতে বলেন—"শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম দিনগুলির কথা আমার মনে পড়িতেছে। নির্ভীক দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার সাহসী ও বীর সৈনিকরূপে তিনি যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টিই দেশের কার্য্যে বিলাইয়া দেন। তিনি অনেককেই আত্মত্যাগ ও দুঃখ-বরণের শক্তি যোগাইয়াছেন। বরোদা কলেজের অধ্যাপকরূপে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন হইতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করে। সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বহু অনুগামী লাভ করেন। কিন্তু আমাদের সমস্যাবলীর প্রতি তাঁহার আগ্রহ চির-জাগ্রত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত তাঁহার এক বিশিষ্ট সন্তানকে হারাইল এবং আধ্যাত্মিক জগৎ হারাইল এক মহাঋষিকে।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন—"ভারতবাসীদের মধ্যে যে সকল মহান্ ব্যক্তি ভারতের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁহার নিজের নীতি অনুসারে কাজ করিতেন। তাঁহার দৈহিক মৃত্যু ঘটিলেও তাঁহার আত্মা আমাদের মধ্যে কাজ করিয়া যাইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের উল্লেখ করিয়া বলেন—"১৯০৮ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন হয় তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্ব এক সঙ্কট মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিতেছে। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার ন্যায় মহামানব জীবিত থাকিলে তিনি আত্মিক শক্তির বলে মানবতাকে পরিচালিত করিতে পারিতেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রূপ। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

রুশিয়ার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ডাঃ এস, [illegible] এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তির বিকাশ। রাজনীতি ও দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার দান ভারত কখনও বিস্মৃত হইবে না এবং দর্শন ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে পৃথিবী তাঁহার অমূল্য দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে।"

শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর ১১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পরে ৯ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে ঠিক পাঁচটার সময় আশ্রমের প্রধান প্রাঙ্গণে একটি বড় গাছের নীচে তাঁহার মর-দেহ সমাহিত হইয়াছে। ঐ স্থানেই একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে। এই সমাধি-কার্য্য হইয়াছিল খুবই সহজ এবং ইহাতে কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করা হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবে বঙ্গমাতা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম যুগ-প্রবর্ত্তক সন্তানকে হারাইলেন, কিন্তু তাঁহার অমর বাণী চিরদিন আমাদের অন্তরে জাগরূক থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের গৌরবময় জীবন-কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ সেই সময়ে কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর এক কন্যার সহিত ডাঃ কে, ডি, ঘোষের বিবাহ হয়। অরবিন্দ দুই বৎসর দার্জ্জিলিংয়ে সেণ্ট পলস্ স্কুলে পড়া-শুনা করেন। ইহার পর মাত্র সাত বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন এবং তথায় তিনি ১৪ বৎসর অবস্থান করিয়া সেণ্ট পলস্ ও কেম্ব্রিজ কিংস কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়েই তিনি পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ অশ্বারোহণ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আই, সি, এস হইতে পারেন নাই। ইহার পর অরবিন্দ কিংস কলেজে বৃত্তিধারী ছাত্র হিসাবে পড়িতে থাকেন ও ১৮৯২ সালে ক্লাসিকস্ সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরী গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বরোদায় ১৩ বৎসর চাকুরী করেন। যখন তিনি বরোদায় ষ্টেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস জাতীয়তার নূতন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতেছিল। তাঁহার জীবন-ধারায় সেই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্য-সম্মান সব কিছু তুচ্ছ করিয়া তিনি জাতির স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দেশের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ইহার পর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

পরে আলিপুর বোমা মামলা সম্পর্কে অরবিন্দ সর্ব্বপ্রথম গ্রেপ্তার হন। কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তিনি গীতা ও উপনিষদ পাঠ ও যোগ-সাধনায় মগ্ন ছিলেন। দেশবন্ধু সি, আর, দাশ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন ও তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯১০ সালে রাজদ্রোহের [illegible] তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য এক পরোয়ানা জারী হয়, কিন্তু

পরে তাহা প্রত্যাহৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার মতলব করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি চন্দননগরে চলিয়া যান এবং পরে তথা হইতে ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে উপনীত হন। ১৯১৮ সালে তাঁহার পত্নী মৃণালিনী দেবী পরলোক গমন করেন। পণ্ডিচেরীতে গিয়া তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় যোগ-সাধনায় মগ্ন হন।

সর্দ্দার প্যাটেলের তিরোধান

স্বাধীনতার অক্লান্ত সৈনিক, ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী লৌহ-মানব সর্দ্দার প্যাটেল আর ইহজগতে নাই। সর্দ্দার প্যাটেলের যে প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাবোধ সকল ভারতবাসীর অন্তরে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিত, তাহা এক্ষণে স্তিমিত হইল। সর্দ্দারজীর মৃত্যুতে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি অক্লান্ত ভাবে ভারতের সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরও স্বাধীন ভারতের শাসন পরিচালনা কার্য্যে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গেলেন, তাঁহার সেই কীর্ত্তি ভারতের ইতিহাসে প্রশংসার সহিত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি এক জন অমিতবিক্রম সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই নব ভারতকে ঐক্যের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া গেলেন। তিনি নীরবে কাজ করিয়া যাইতেন এবং যাহা সত্য বলিয়া একবার ঠিক করিয়া লইতেন, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে সহকর্ম্মীদের সঙ্গেও যখন তাঁহার বিরোধ হইত, তখনও তাঁহার নিজস্ব মতবাদ, সংকল্প ও আদর্শ অবিচলিত থাকিত। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপে ভারতের পুরুষসিংহ সর্দ্দারজী জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে নবীন ভারতবর্ষের ও স্বাধীন ভারতবর্ষের ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সিংহ-পুরুষ আজ আর আমাদের মধ্যে নাই—রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অপরাজেয় জীবনের অমর বাণী। ভারতবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল তাঁহার জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে। তাঁহার অমর আত্মার প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

গত ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৯-৩৭ মিনিটের সময় তিনি বোম্বাইয়ে বিড়লা-ভবনে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার পুত্র শ্রীদয়াভাই প্যাটেল, তাঁহার সর্ব্বক্ষণের অনুগামী কন্যা কুমারী মণিবেন প্যাটেল, পুত্রবধূ, প্রপৌত্রী, বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবি, জি, খের, স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীমোরারজী দেশাই, বোম্বাইয়ের মেয়র শ্রীএস, কে, পাতিল এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীভি, শঙ্কর উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কিছু পরেই সর্দ্দার প্যাটেলের মৃতদেহ শোক-শোভাযাত্রা সহ বিড়লা-ভবন হইতে যাত্রা করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া এক দল পুলিশ শোভাযাত্রা পরিচালনা করে এবং উহার ঠিক পশ্চাতে সর্দ্দারজীর মৃতদেহ বহনকারী কামানবাহী গাড়ী অগ্রসর হইতে থাকে। সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ভজন "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। কংগ্রেস ভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় শোভাযাত্রার গতি মন্থর হইয়া আসে এবং কংগ্রেস-ভবনে পৌঁছিলে শোভাযাত্রাটি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ হয়। তিনখানি বিমান আকাশপথে শোভাযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া অগ্রসর হয় এবং শোক-সন্তপ্ত সহস্র সহস্র শবানুগামীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে। বেলা ৫-১৫ মিনিটের সময় বিড়লা-ভবন হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটের সময় শোভাযাত্রাটি সোনাপুর শ্মশানঘাটে উপনীত হয়। পরলোকগত নেতাকে শেষ দর্শন ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য বহু লোক শ্মশানে সমবেত হয়। সোনাপুর মহাশ্মশানে ১৭ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে সর্দ্দারজীর ভ্রাতা বিঠলভাই প্যাটেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক সেই স্থানেই বল্লভভাই প্যাটেলের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। সর্দ্দার প্যাটেলের পুত্র শ্রীদয়াভাই প্যাটেল চিতায় অগ্নি সংযোগ করার পর ভারতের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারী এবং প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরলোকগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া বক্তৃতা করেন।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের তিরোধানের সংবাদ ছড়াইয়া পড়া মাত্র সারা ভারত গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই একনিষ্ঠ ও নির্ভীক সৈনিকের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য স্বাভাবিক নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখা হয়। মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্ব্বত্র সরকারী-বেসরকারী দপ্তর, আদালত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষায়তন সমূহ বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের প্রিয় নেতা ও বরেণ্য সহকর্ম্মীকে হারাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বেদনাপ্লুত অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ভারতের রাজধানী এবং সর্দ্দারজীর শেষ জীবনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র দিল্লী গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভারতীয় সংসদে সদস্যবৃন্দ সমবেত হইয়া নীরবে পরলোকগত জন-নায়কের প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং ইহার পর ১৮ই ডিসেম্বর

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সোমবার পর্য্যন্ত ভারতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। ভারত সরকার সর্দ্দারজীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সপ্তাহে সকল সরকারী ভবনের উপর পতাকা অর্দ্ধনমিত রাখা হইবে এবং কোন রাষ্ট্রীয় আমোদ-প্রমোদ হইবে না।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদে সর্দ্দারজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন যে, তাঁহাকে একটি মর্ম্মন্তুদ সংবাদ ঘোষণা করিতে হইতেছে। আজ সকাল ৯-৩৭ মিনিটের সময় ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিন দিন পূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বোম্বাইয়ে যান। কঠোর পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। বোম্বাইয়ে পৌছিবার পর তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হয়, কিন্তু কাল শেষ রাত্রে তাঁহার পীড়া আকস্মিক বৃদ্ধি পায় এবং আজ সকালে তাঁহার বিরাট কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার জীবন-কথা সমগ্র দেশ জানে। ইতিহাসে তাঁহার জীবনালেখ্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। নব ভারতের তিনিই স্রষ্টা। নব ভারতকে ঐক্যের স্বর্ণসূত্রে তিনিই গ্রথিত করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি ছিলেন এক জন অমিতবিক্রম সেনাপতি, সম্পদে এবং বিপদে তিনি আমাদের পথের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধু, সহকর্ম্মী ও সহযাত্রী। তাঁহার উপর আমাদের নির্ভরশীলতা প্রচুর ছিল। তিনি আমাদের শক্তির উৎসস্বরূপ ছিলেন। বিপদের সময় ও সংশয়-সঙ্কুল অবস্থায় তিনি আমাদের মনে আশা ও ভরসার সঞ্চার করিতেন। এই কক্ষে একই আসনে তিনি ও আমি পাশাপাশি বসিতাম। তাঁহার শূন্য আসনের দিকে তাকাইয়া আমি নিজেকে নিঃসহায় বোধ করিব। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনায় আমরা এরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, আজ তাঁহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা সম্ভব নহে। তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য রাজাজী ও আমি এখনই বোম্বাই যাইতেছি।

সোনাপুর শ্মশান-ভূমিতে সর্দ্দার প্যাটেলের চিতা প্রজ্বলিত হইবার পর অন্ত্যেষ্টিকালীন ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীরাজাগোপালচারী বলেন যে, সর্দ্দার প্যাটেলের অন্তরঙ্গ ও প্রবীনতম বন্ধু হিসাবে শেষ কয়েকটি কথা বলিবার দুঃখময় দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, "বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজে গান্ধীজী আমাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করেন যে, বল্লভভাইয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে কি না। বল্লভভাই সাহসী ও অতীব বিশ্বাসী। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি বল্লভভাইয়ের নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য লাভ করিয়াছি। বল্লভভাই আজ জীবিত নাই। তাঁহার নশ্বর দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাও আমাদের চক্ষের সম্মুখে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি যে প্রেরণা, আত্ম-বিশ্বাস, সাহস ও শক্তির উৎস ছিলেন, তাহা ধ্বংস হইতে পারে না। সর্দ্দারজীর চিতাভস্ম হইতে আমরা সাহস ও বিশ্বাস ফিরিয়া পাইব। সর্দ্দারজীর ন্যায় অপর কাহাকেও আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু সর্দ্দারজীর দৃষ্টান্ত বৃথা যাইবে না। আমাদের সাহস সঞ্চার করিতে হইবে—বৃথা অশ্রুপাত করিয়া কোন ফল হইবে না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার জীবদ্দশায় অনেকেই চলিয়া গিয়াছে সর্দ্দারজীও আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন। সর্দ্দারজীর আ কাজ শেষ করিবার ভার সর্দ্দারজীর ভাই জওহরলাল নেহরুর স্ক আসিয়া পড়িয়াছে।"

কম্পিত কণ্ঠে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, "চিতার অ সর্দ্দারজীর নশ্বর দেহ গ্রাস করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর কো অগ্নিই সর্দ্দারজীর খ্যাতি গ্রাস করিতে পারিবে না। সর্দ্দার প্যাটেলে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু সর্দ্দার প্যাটেল দেশের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা যাঁহারা জীবিত আছি—তাঁহারা সর্দ্দারজীর আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার ভার গ্রহণ করিব। আজ আমরা সর্দ্দারজীর মৃত্যুতে ক্রন্দন করিতেছি না। আমরা নিজেদের কথা চিন্তা করিয়া দুঃখে ক্রন্দন করিতেছি। সর্দ্দারজী তাঁহার বৃহৎ পরিবারবর্গকে রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু সমগ্র জাতি তাঁহার পরিজন ছিল, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্দ্দারজীর ন্যায় আমরাও দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিব, এই প্রতিশ্রুতি আমাদের দিতে হইবে। সর্দ্দারজীর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।"

ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নিকট নিম্নোক্তরূপ তার প্রেরণ করেন—"সর্দ্দার প্যাটেলের মৃত্যু সংবাদে আমি গভীর মর্ম্মাহত হইয়াছি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে ও আপনার সহকর্ম্মিগণকে এবং ভারতের অধিবাসিগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার জাতির ইতিহাসে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বেতারবাণী প্রদান প্রসঙ্গে বলেন—"ব্যক্তিগত ভাবে সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত আমার যে সম্পর্ক ছিল, বিশেষতঃ গত ৩ বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার সহিত যে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে যাওয়া সত্যই কঠিন। গত ৩ বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব মহান্ ও অবর্ণনীয় ছিল, অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও সর্দ্দারজীর নাম প্রত্যেকের নিকট সুপরিচিত ছিল। তিনি বিশ্বের সেই শ্রেণীর লোক যাঁহারা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হইয়াও অটুট সঙ্কল্প ও কার্য্যের মধ্য দিয়া নীরবে সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বারদোলী তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়াছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে তিনি বীরোচিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি প্রকৃতই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের জনগণের মর্ম্মবাণী তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যিক কঠিন আবরণের অন্তরালে কত গভীর স্নেহ ও কোমলতা ছিল তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। আজ আমরা তাঁহার অভাব একান্ত ভাবে অনুভব করিতেছি। বিশ্বের যে কোন জাতির পক্ষে তিনি গৌরবস্বরূপ। যে ভারত তিনি সযত্নে গড়িয়া গিয়াছেন তাহার মর্য্যাদা ও সংহতি আমাদের অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে।"

পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বাণীতে বলেন—"সর্দ্দার প্যাটেলের মৃত্যুসংবাদ অপ্রত্যাশিত না হইলেও সমগ্র দেশবাসী তাহা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিবেন। আমার নিকট তাঁহার মৃত্যু ব্যক্তিগত ক্ষতিস্বরূপ, কারণ এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণের পর হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার গভীর যোগাযোগ ছিল। শাসন-কার্য্যে তাঁহার বাস্তব পরামর্শ ও নেতৃত্বের উপর নির্ভর করিতে আমি সর্ব্বদাই ভালবাসিতাম। দেশের নিকট তিনি দায়িত্বের প্রতীক-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সুষ্ঠ বিচার ও বাস্তব বুদ্ধি এই দেশকে বহু সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। সত্যই তিনি তাঁহার প্রিয় দেশের সেবায় নিজকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কারণ, খারাপ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁহার দুর্দ্দমনীয় শক্তি বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রকৃতির আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সর্দ্দারজীর মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার শোকার্ত্ত দেশবাসিগণের মধ্যে তাঁহার আত্মা চিরজীবী হউক ইহাই আমার প্রার্থনা।"

পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বেতারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"যাঁহার শোকে আজ সারা ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তিনি বহু বৎসর অমর ও অক্ষয় হইয়া থাকিবেন। দু'শো টুকরায় ভাঙ্গা ভারতবর্ষকে যে কাম্যশ্রেষ্ঠ অখণ্ড রূপ দান করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রত্যেক ভারতবাসীর ঋণ অবিস্মরণীয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনাচার ও অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেশের বহু চিন্তাশীল মনকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় যে মহান কর্ম্মী তাঁহার সবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের গর্বশক্তিকে সুসংহত ও সুসংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি আজ শ্রদ্ধা জানাই। অনেক নেতা আছেন, যাঁহারা পণ্ডিত, আদর্শবাদী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌। কিন্তু এই মানুষটির কাছে দেশই ছিল একমাত্র ধ্যান ও ধারণা। কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মে তাঁহার ক্লান্তি আসে নাই। নিরলস, নিরবকাশ জীবনে কর্ম্মই ছিল তাঁহার একমাত্র বিশ্রান্তি। সাক্ষাৎ পরিচয়ে যেটুকু কঠোরতা দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি তার চেয়ে ঢের বেশী কোমলতা। কথা বলিতেন অতি সামান্য। কিন্তু যাকে বলিতেন তাঁহার অনেক বেশী বুঝিয়া লইবার কোন অসুবিধা হইত না। সেই জন্যই যখন যে কাজের ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন তাহা বুঝিয়া লইতে কর্ম্মীদের কোন বিভ্রান্তি ঘটে নাই। নূতন ভারত গঠনের কাজ এখনও অনেক বাকী আছে। সেই গঠন-কাজে আমাদের নেতা, আমাদের সহকর্ম্মী, আমাদের সর্দ্দারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাদের পাথেয় হউক। শোক প্রকাশ না করিয়া সর্দ্দারের এক জন অনুগত সৈনিক হিসাবে তাঁহার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা জানাইতেছি।"

সর্দ্দারজীর গৌরবময় জীবন-কথা

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৮৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর গুজরাটের অন্তর্গত করমসদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাদীয়াদ হাই-স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া পরে জিলা ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করেন ও বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ১৯১৩ সালে মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ঐ বৎসরেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আহমেদাবাদে আইন ব্যবসা সুরু করেন। ১৯১৬ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময় হইতেই তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সত্যাগ্রহের নেতা হিসাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম কয়রা সত্যাগ্রহ ও পরে নাগপুর জাতীয় পতাকা আন্দোলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯২৪ সালে তিনি আমেদাবাদ পৌরসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং বার বৎসর কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২৮ সালে তিনি আমেদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বারদোলী স্বরাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ বৎসরই বারদোলীর কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিখ্যাত বারদোলীর সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন ও মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক 'সর্দ্দার' উপাধিতে ভূষিত হন। সর্দ্দারজী কংগ্রেসের ৪৬তম করাচী অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সর্দ্দারজী দুই বার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালে কারামুক্তির পর লর্ড ওয়াভেল আহূত সিমলা কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তিনি বারদোলীতে কর-বর্জ্জন আন্দোলনের পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকেন এবং দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব কমিটীর চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী সমূহের পার্লামেণ্টারী কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্তি করণ ও ভারতের মধ্যে উহাদের বিলুপ্তি সাধনে এবং স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী সঙ্কট কালে ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্দ্দার প্যাটেলের সাফল্য বিশ্বের প্রশংসা অর্জ্জন করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হইতে তিনি ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি কেবল জাতীয় কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন না, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী

গঠনতান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতাকে আরও কঠোর করার উদ্দেশ্যে ৪ঠা ডিসেম্বর সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গৃহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে পুনরায় এরূপ সতর্কবাণী প্রদান করা হয় যে, গঠনতান্ত্রিক অভিযোগের প্রতিকার আশায় কোনও কংগ্রেসকর্ম্মী আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এক প্রস্তাবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, কোনও কংগ্রেসকর্ম্মী যদি কোন কংগ্রেস কমিটী বা কর্ম্মকর্ত্তার বিরুদ্ধে আইন-আদালতে মামলা দায়ের করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিয়মানুবর্ত্তিতা লঙ্ঘনের জন্য দোষী গণ্য করা হইবে এবং কংগ্রেসের সদস্য পদ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইবে।

গঠণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্পর্কিত কমিটীর প্রস্তাবে কংগ্রেসকর্ম্মীদের বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক

অবলম্বিত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহার প্রতিকারের জন্য যেন ব্যবস্থাপিত ট্রাইবুনাল বা অন্য কোন প্রদত্ত ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে সদস্যদের ইহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মামলা দায়ের করা এবং কংগ্রেস কমিটী বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক তরফা বিচার-ব্যবস্থা করা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ হানিকর।

নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন কোন প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার পর গত জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল।

কংগ্রেস-বিরোধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা অশোভন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অনাচার ধামা-চাপা না দিয়া যাহাতে তাহা দূরীভূত হয়, সে বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সচেতন থাকা আবশ্যক।

কংগ্রেস কমিটী নিম্নলিখিত ছয় জন উচ্চস্থানীয় নেতাকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী দল গঠন করিয়াছেন—

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট (পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান), পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীসি, রাজাগোপালাচারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রীজগজীবন রাম। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কটরাও ও শ্রীমোহনলাল গৌতম বোর্ডের সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

কংগ্রেস কমিটীর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী দল এরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, যাহাতে শ্রীজওহরলাল নেহরুর একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই।

ডেমোক্র্যাটিক দল গঠনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার আলোচনান্তে দলের নেতা আচার্য্য কৃপালনীর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিবার অধিকার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় সংসদের অধিবেশন

গত ১৪ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত সংসদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এক সঙ্কটজনক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করার জন্য সাড়ে তিন মাস পূর্ব্বে সংসদের এক বিশেষ অধিবেশনে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, সঙ্কট-পূর্ণ যে কয়েকটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে, ঐ সময়ে আমার সরকার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব-শান্তিরক্ষা ও কোরিয়া যুদ্ধের বিস্তৃতি প্রতিরোধ করার জন্য ক্রমাগত ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মানবতার পক্ষে শান্তি যে একান্ত প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাতিসমূহের আতঙ্কের ফলে শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের মহান্ জাতিগুলি যদি শান্তিলাভের অভিপ্রায়ে কাজ করিয়া যায় তবেই বিশ্ব-শান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, অন্যথায় যে কোন জাতি যুদ্ধকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিলে যুদ্ধ বাধিতে পারে। এই সংবাদ হইতে বারংবার শান্তির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইবে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য সরকার ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় ভাগে অথবা ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল বা মে মাসে তারিখ ঘোষণা সম্পর্কে সরকারের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

১৯৫২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে দেশকে খাদ্য বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারের দৃঢ় অভিপ্রায়ের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বাক্ষরিত ভারত-পাকিস্তান চুক্তির ফলে অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং এ দেশে আগত উদ্বাস্তদের অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে আবার ফিরিয়া গিয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা শীঘ্রই দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করা হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

ভারতীয় সংসদে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধক বিলটি এবং পোর্ট ট্রাষ্ট ও পোর্ট আইনের সংশোধক বিলটি আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন যে, ব্যয়সঙ্কোচমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৫২ সালে কলিকাতার লেক মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শিবিরে উদ্বাস্তর সংখ্যার বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের জন্য কোথায় কোনও সাহায্য-শিবির নাই। কাশ্মীরী উদ্বাস্তদের জন্য দুইটি এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের জন্য ১১৫টি মোট ১১৭টি আশ্রয়-প্রার্থী শিবির বর্ত্তমানে ভারতে চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্ত-শিবিরে কোন মুসলমান নাই।

পাক-ভারত বাণিজ্যের বিবরণ প্রদান করিবার সময় অর্থসচিব শ্রী সি, ডি, দেশমুখ বলেন যে, কমনওয়েলথ অর্থসচিব সম্মেলনে পাকিস্তানের টাকার মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই। ১৯৫০ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানের সহিত ভারতের ৪৫ কোটি টাকার বাণিজ্য বিনিময় হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ঠিক একই সময়ে ৬৩ কোটি টাকার বাণিজ্য বিনিময় হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের সহিত যে বিশেষ বাণিজ্য-চুক্তি হয়, তদনুযায়ী পরবর্ত্তী কালের বাণিজ্য হইয়াছে। কাজেই পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাস না হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এখন এই বাণিজ্য-চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার পর আর নূতন কোন চুক্তি হয় নাই। তবে সীমান্তে লেন-দেন চলিতেছে। এই লেন-দেনে পাক-ভারত টাকার আনুপাতিক হার ছিল ১০০ পাকিস্তানী টাকায় ১১৫ হইতে ১১২ পর্য্যন্ত ভারতীয় টাকা। সেপ্টেম্বরের শেষে এই হার ১০০ পাকিস্তানী টাকায় ১১৬ হইতে ১১৮৲ পর্য্যন্ত ভারতীয় টাকায় উঠিয়াছিল। সীমান্তের এই স্বাধীন আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬.১২ কোটি ও ১০.৭৩ কোটি টাকা।

খাদ্য-সম্মেলন

দেশের গুরুতর খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার তিন দিন-ব্যাপী অচল অবস্থার পর গত ১৩ই ডিসেম্বর ২২টি রাজ্যের

খাদ্য-মন্ত্রিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে প্রত্যেক রাজ্য আগামী বৎসরের চাহিদা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা বজায় রাখিবে। কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীকে, এম, মুন্সী ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত বিশেষ কমিটার প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ জানাইয়া বলেন, 'জনসাধারণের আহার্য্য জোগাইবার ব্যাপারে আমরা এক সিণ্ডিকেটরূপে কাজ করিয়া যাইব। আমরা যেন আগামী বৎসর জগৎ সমক্ষে এই ঘোষণা করিতে পারি যে, দেশবাসী আমাদের উপর যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল আমরা তাহার যোগ্য প্রমাণিত হইয়াছি।" শ্রীযুক্ত মুন্সী বলেন যে, আগামী বৎসর দেশের পক্ষে ভীষণ দুর্ব্বৎসর। অবস্থা যে গুরুতর তাহা বার-বার বলার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন যে, আমাদের সহযোগিতা ও উৎসাহের উপরই আমাদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রস্তাবটি সমর্থন করার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

সাব কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত এবং সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ছয় দফা সিদ্ধান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) চারিটি রাজ্য ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলিতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে দেশের খাদ্য-সঙ্কট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিও জটিল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ১৯৫১ সালের মধ্যেই সুসংহত নীতি ও কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণকল্পে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

(২) খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন আবশ্যক। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে (ক) জরুরী প্রয়োজনের জন্য খাদ্য মজুত করার ব্যবস্থা, (খ) জাতীয় স্বার্থের খাতিরে খাদ্য-শস্যের পরিবর্ত্তে অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য যে ঘাটতি হইবে, তাহা পূরণের ব্যবস্থা এবং (গ) প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে যে ঘাটতি হইবে, তাহা পূরণের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সকল কারণেই বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে ৩৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানির পরিকল্পনা আছে! কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিলে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং তজ্জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ অথবা বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন আলোচনা চলিতে পারে না। খাদ্য-শস্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখিতে হইবে। যত দূর সম্ভব খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবে। ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রত্যেক রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবে।

(৫) অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত খাদ্য পরিকল্পনার অংশীভূত। বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভব ক্ষেত্রে খারিফ শস্যের মরশুমে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি জটিল হইলেও আয়ত্তের বাহিরে নহে। জনসাধারণের পক্ষে কোন ক্রমেই আতঙ্কে অভিভূত হওয়া সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের ও সংবাদপত্র সমূহের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে।

প্রস্তাবগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ তাহা সকলেই উপলব্ধি করিবেন, কিন্তু দীর্ঘ সাত বৎসর দুঃখ-ক্লেশভোগ ও অনশন-অর্দ্ধাশনের পরে এখনও যদি আগামী বৎসর নিদারুণ দুর্ব্বৎসর হইবে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সংবাদে কেহই আশ্বস্ত হইতে পারিবেন না। খাদ্য-পরিস্থিতি দিন দিন এরূপ জটিল আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে জনসাধারণ ক্রমশঃ অধৈর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরমায়ু যতই বাড়িতেছে আমাদের খাদ্যাভাব ততই প্রবল হইতেছে। যে স্থলে রেশন ব্যবস্থায় দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ার মত খাদ্য পাওয়া যাইতেছে না, সে স্থলে রেশন ব্যবস্থা বহাল রাখিবার সার্থকতা কি, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছে না।

স্যার যদুনাথ সরকার সম্বর্দ্ধিত

গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতায় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের আশীতিতম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সভায় বঙ্গীয় ইতিহাস

পরিষদ ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারকে মানপত্র প্রদান করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের পক্ষ হইতে শ্রীলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর; লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, দিল্লী, কলিকাতা, পুণা, ওসমানিয়া, রাজপুতানা, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত সরকারের দীর্ঘায়ু ও ইতিহাসে তাঁহার দানের উল্লেখ করিয়া যে সকল বাণী ইতিহাস পরিষদের নিকট পাঠান

হইয়াছিল, তাহা সভায় পঠিত হয়। সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতুল গুপ্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্য শ্রীযদুনাথের গুণাবলী ও ইতিহাসে তাঁহার অমর দানের উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার দীর্ঘায়ুঃ হইয়া তাঁহার সাধনায় নিমগ্ন থাকুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

টেলিফোনের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সুর কলিকাতা টেলিফোন বিভাগের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীযুক্ত সুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র, তিনি বি-এস্-সি পরীক্ষায় গণিত-শাস্ত্রে অনার্স সহ প্রথম
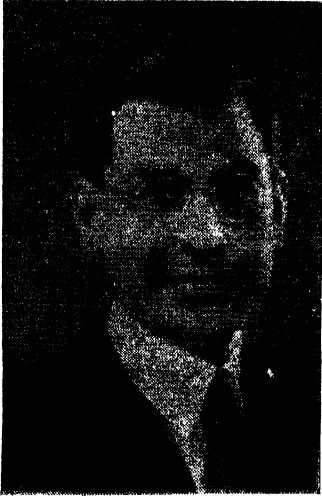
বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে গণিত-শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি লণ্ডনে যান এবং খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত সুর ডাক ও তার বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় হৃষিকেশ সুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার খুল্লতাত ছাপরার (বিহার) এক জন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী। শ্রীযুক্ত সুর টেলিফোনের সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকটই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা টেলিফোন ক্লাবের তিনি সাধারণ সম্পাদক। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩৪ বৎসর। এত অল্প বয়সে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ন্যায় উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন নাই। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, চারিটি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক; যথা—হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ একত্রিত হইয়া "ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড" নাম গ্রহণ করিয়া ১৯৫০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এবং রিজার্ভ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। সমগ্র ভারতে (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যতীত) মূলধন ও রিজার্ভের দিক দিয়া ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য এই ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর সম্পদ আছে। তহবিল পরিচালনার ব্যাপারে ইহা ভারতে বৃহৎ পাঁচটি ব্যাঙ্কের অন্যতম হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র এই ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হইতেছে এবং আমানতকারী ও পৃষ্ঠপোষকগণ এক্ষণে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবেন। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সদস্য লইয়া ডাইরেক্টার্স বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব শ্রীকে, সি, নিয়োগী এম, পি, চেয়ারম্যান স্বরূপে ব্যাঙ্কে যোগদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাসে এই নূতন যুগের সূচনাকারী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে আমরা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, ইহা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।

পরলোকে ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক মিঃ ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ৭২ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পর-পর উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৭ সালে তিনি শিক্ষা-বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ও পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি "ষ্টেটস্‌ম্যানে'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন এবং কয়েক বার অস্থায়ী সম্পাদকরূপেও কাজ করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে তিনি ইংরেজ ও বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

পরলোকে সুকুমার গুপ্ত

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার পশ্চিম-বঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টার-জেনারেল শ্রীসুকুমার গুপ্ত তাঁহার কলিকাতা ভবনে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গুপ্ত একমাত্র পুত্র শ্রীমুকুল গুপ্ত ও তাঁহার বিধবা পত্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
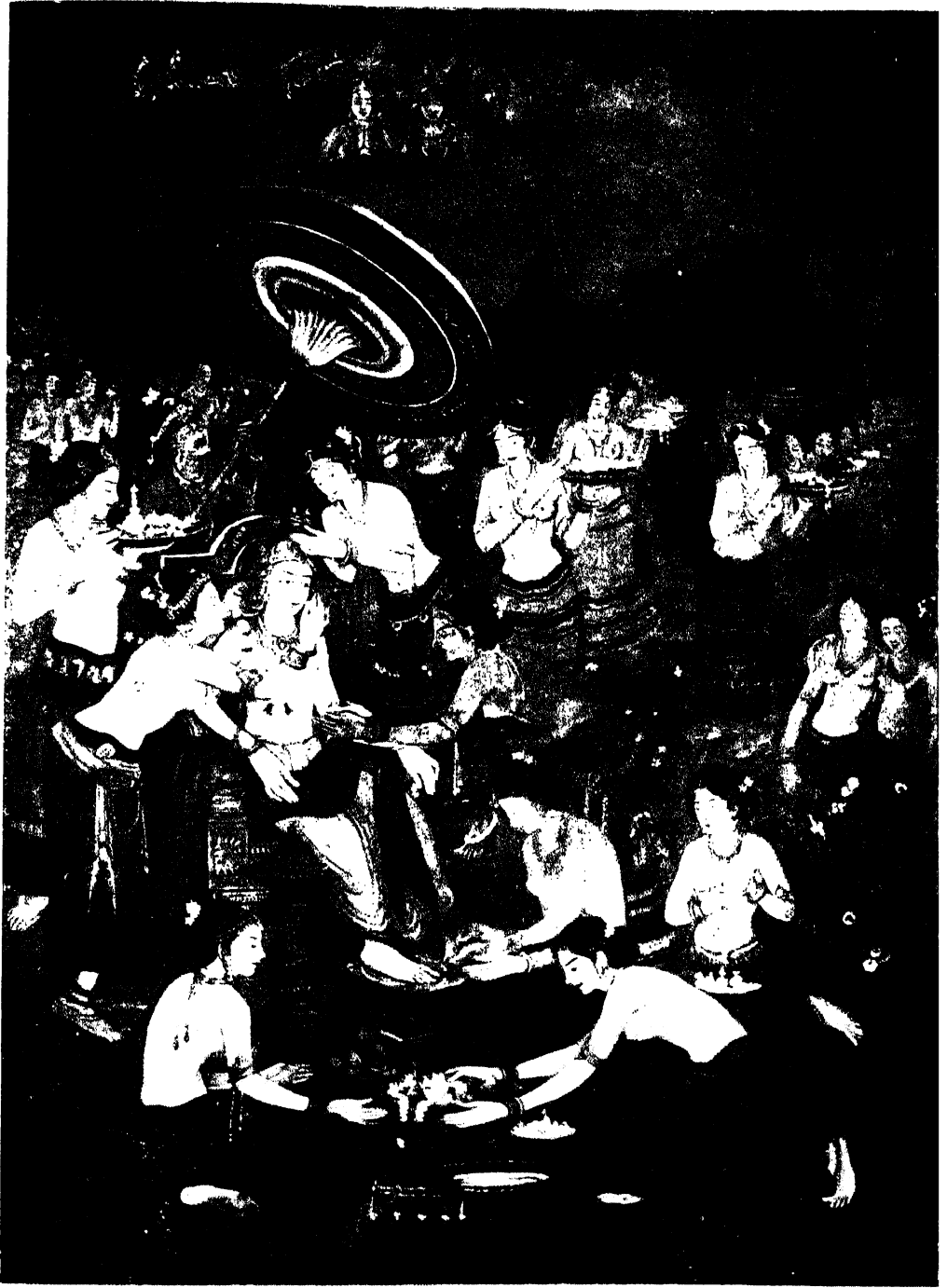
অভিষেক

[এই চিত্রটির শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। চিত্রটি লেখক-সংগ্রাহক শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে আমরা পাই।]
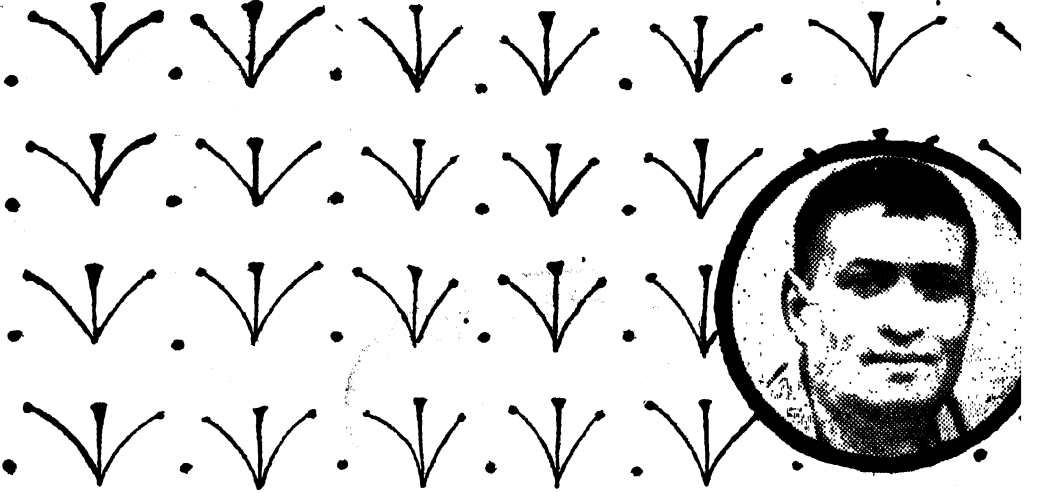
২৯শ বর্ষ ঃ মাঘ ১৩৫৭]   সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত   [২য় খণ্ড ঃ ৪র্থ সং

যু গ বা ণী

"মানুষ যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী। দেহ ঘরস্বরূপ, তিনি ঘরণী, দেহরথের সারথী রথী। মানুষ অহং-বুদ্ধিতে অশান্তি পায়। মনটিও যে তিনি, মন নারায়ণ।"

—ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।—গীতা ; ৩-১২

"Blessed are they—who have not seen but believed." —Bible

"আমি আর তোমাদের কি বলিব ? আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক।"

—কল্পতরুভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণ।

"যেদিন হইতে ঠাকুরের আবির্ভাব সেই দিন হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

"কে তোমারে জানতে পারে, কে তোমারে চিনতে পারে—প্রভু তুমি না চিনালে পরে। বেদবেদান্ত পায় না অন্ত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে।"

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

"এক দিন আমি খ্রীষ্টানদের বললাম, 'কিছু ক্রাইষ্টের কথা শোনান।' তারা কিছু বলছে না দেখে আমিই বললাম। এক জন আমার মুখ থেকে শুনে বললে, 'আপনি এ সব রহস্য কি করে জানলেন ?' মনে মনে ভাবলাম, আমরা যে তাঁকে দেখেছি। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি। তিনি বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, যে খ্রীষ্ট, যে চৈতন্য, সেই আমি।' কি করে বা তারা বুঝবে ? ভোগ নিয়ে থাকলে বোঝা যায় না। আবার তার ওপর পেটের চিন্তা। পেটের চিন্তাই মনকে নীচু ক'রে রেখে দেয়।"

—শ্রীম।

বিশ্বকবির হস্তলিপি

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

গল্প গুচ্ছ

গল্প গুচ্ছ —

গল্প গুচ্ছ —

গল্প - গুচ্ছ —

গল্প গুচ্ছ

গল্প গুচ্ছ

গল্প গুচ্ছ

গল্প গুচ্ছ

কাব্য চয়নিকা —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য চয়নিকা —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতামহ এক সময় ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউসে মাত্র এক বৎসর কালের জন্য কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও চয়নিকা মুদ্রিত হয়। পুস্তকের মলাটের উপর কবিগুরু তাঁর হস্তলিপির ব্লক ছাপার জন্ত কিছু নমুনা সাদা কাগজে লিখে পাঠিয়েছিলেন। প্রেসে পছন্দ মত একটি নমুনা কেটে তুলে নিয়ে ব্লক করেছিল। বাকী নমুনা লিপিগুলো তেমনিই রয়ে গিয়েছে।

পিতামহ এগুলি তাঁর অনুমতিক্রমে রতন-লাইবেরীতে রক্ষা করেছেন। যাই হোক, "কাব্য চয়নিকা", "গল্পগুচ্ছ" ও নিজ নামের ব্লক তৈরী করবার জন্য, কয়টি কথা কবিগুরুকে লিখতে হয়েছিল, এত কাল পর জানতে পেরে কি আনন্দ পাওয়া যায় না?

কবিগুরুর ১৩১৮ সালে ২৭শে বৈশাখ পিতামহকে এক পয়সা মূল্যের একটি পোষ্টকার্ডে লিখিত একখানা পত্র প্রকাশ করা গেল। পোষ্টকার্ডখানি এখন জীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেচে।

ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এল আলো;
আজকে আমার ছুটোছুটি লাগ্‌ল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্ অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল ফেলে এলেম খেলা।
আজকে আমার ছুটি আমার শনিবারের ছুটি,
কাজ যা আছে সব রেখে আয় মা তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্ এই হেথা চৌকাঠ,
বল্ আমারে কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিকট পিতামহ ৺শিবরতন মিত্র মহাশয় বালকদের 'হস্তলিপি' পুস্তক রচনা কালে তাঁর সুন্দর হস্তলিপির জন্য অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে "ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো" কবিতাটি মাত্র ৮ লাইন রচনা করে পিতামহের হাতে দেন। (আনুমানিক ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ)। পরে উক্ত কবিতাটি কবি বর্দ্ধিতাকারে অন্যত্র প্রকাশ করেছিলেন। কবিতাটি সৃষ্টির এই হোল ইতিহাস। ৺শিবরতন মিত্র রচিত হস্তলিপির ভূমিকার কিয়দংশ—

"বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্রাট কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রার্থনা মত হস্তলিপির জন্য সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী একটি স্বরচিত কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আশা করি, শিশুগণ তাঁহার সুগঠিত অক্ষরছন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া অক্ষরের গঠন রচনা করিবে। কবিবরের এই অনুগ্রহের জন্য আমাদের সহিত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যদ্বংশীয় শিশুগণ চিরঋণে আবদ্ধ রহিবে।—আশ্বিন ১৩১৫ বঙ্গাব্দ"

ইংরেজী নববর্ষের

ডায়েরী থেকে

১৬২০ সালে আমেরিকায় অভিযাত্রী নায়কের প্রথম খৃষ্টমাস

সোমবার ২৫শে, আমরা সমুদ্র-তটে উঠেছিলাম। রাত্রের দিকে আমাদের মধ্যে কার্য্যরত কয়েক জন ইণ্ডিয়ানদের গোলমাল শুনতে পায়। কাজেই আমাদের সকলকে নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকতে হয়েছিল। কিন্তু পরে আর গোলমাল শোনা যায়নি। তাই আমরা কুড়ি জনকে পাহারায় রেখে বাকী সবলে জাহাজে ফিরে এলাম। রাত্রে বিশ্রী ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। ২৫শে তারিখ সোমবার খৃষ্টমাস দিবস পড়ায় আমরা জাহাজে বসেই জলপান করি, কিন্তু রাত্রে প্রভুর কৃপায় আমাদের কপালে কিছু বিয়ার (এক প্রকার মদ) জুটে যায়। কাজেই জাহাজে বসে আমরা কয়েক বার বিয়ার পান করলেও ডাঙার লোকেরা কিছুই পায়নি।

(উইলিয়ম বেডফোর্ড, দি হিষ্ট্রী অফ প্লাইমাউথ প্ল্যান্টেসন, ১৬৫১)

এ্যান্টনী এ উড

২৫শে ডিসেম্বর, ১৬৭১। নেল গুইন রাজার আর একটি জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

জোনাথন সুইফ্ট (লেখক)

২৪শে ডিসেম্বর, ১৭১১। খৃষ্টমাসের খরচা বাবদ আমি প্যাট্রিককে আধ ক্রাউন (মুদ্রা) দান করেছিলাম। সর্ত ছিল, সে সদ্ভাবে থাকবে। কিন্তু মাঝ রাতে সে পানোম্মত্ত অবস্থায় বাড়ী ফেরে। ব্যাপারটা আমার স্মরণে থাকবে কারণ আমি তাকে আর এক পেন্সও দিতে চাই না। নির্মম ঠাণ্ডা পড়েছে।

(ষ্টেলার কাছে লেখা রোজনামচা)

লেডি মেরি ওটলে মন্টেগু

২৫শে ডিসেম্বর, ১৭২২। সহরের সব চেয়েও তাজা খবর হচ্ছে এই যে, তিন রাত্তির আগে লর্ড ফিঞ্চের সুদর্শন ভাই যখন এক অতি প্রিয় গণিকার সঙ্গে একত্রে বসে মদ্যপান করছিলেন, সেই সময় তাঁর মারাত্মক এক দুর্ঘটনা ঘটে। এই গণিকাটির নাম শুনে থাকবে—স্যালি স্যালিসবারী। ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে মেয়েটি তার বুকে ছুরিকাঘাত করে এবং তৎক্ষণাৎ সে গড়িয়ে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এক জন ডাক্তার এনে তার বুক থেকে যখন ছুরিখানাকে দেহ থেকে বার করা হল, তখন তার চোখের পাতা খুলে গেল এবং স প্রথম কথায় মেয়েটিকে তার প্রতি বন্ধুত্বপরায়ণা হতে অনুরোধ করে তাকে চুমু খেলো। গত রাত্রি পর্যন্ত মেয়েটি তার বিছানার পাশেই বসেছিল। তার পর যখন সে বুঝতে পারল যে, সে আর বাঁচবে না, তখন সে মেয়েটিকে চলে যেতে অনুরোধ করে। মেয়েটি এই অনুরোধ মেনে নেয় এবং সম্ভবত প্যারিসে বাসা বেঁধে সে তোমাদের সম্মানিত করবে।

টমাস টার্ণার, ইষ্ট হোটলীর দোকানদার (সাসেক্স)

২৫শে ডিসেম্বর ১৭৫৬। আমি দুই ছেলে এবং ভৃত্য সহ গীর্জায় গিয়েছিলাম। আমি আর আমার ঝি কমিউনিয়নে (খৃষ্টের শেষ ভোজন নামক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান) ছিলাম। আজ খৃষ্টমাস দিবস পড়ায় বিধবা মার্চাণ্ট, হান্না এবং জেম্স্ মার্চাণ্ট আমাদের সঙ্গে ভোজন করেন। খেতে দেওয়া হয়েছিল গোরুর মাংস আর ভেড়ার চর্বি মেশানো কিসমিসের পুডিং। সন্ধ্যায় ডেভী এসেছিল আমাদের বাসায়। আমি তাকে দু'টো "নালিশ" পড়ে শোনালাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে "মৃত্যুভয়ের বিরুদ্ধে খৃষ্টানের জয়"—মহৎ বিষয়।

উইলিয়ম চার্লস ম্যাকরেডী (অভিনেতা)

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৩৭। ঘুমোবার জন্য যে সামান্য সময়টুকু আমি পাই, তাও ভাঁড়ামীর চিন্তার অশান্তিতে কেটেছে। শেষ দৃশ্যের উভয় সঙ্কটের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় বাতলাবার জন্য থিয়েটারে গিয়েছিলাম···

জেন ওয়েলস কার্লাইল (সাহিত্যিকের পত্নী)

১লা জানুয়ারী, ১৮৪৭··· শুধু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আমার জন্য একটি খৃষ্টমাসের উপহার কিনে আনা ছাড়া উনি আর কিছু করেননি এবং অত্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমের বেপরোয়া ভাবে আমার জন্য কিনে এনেছেন একটা ঢিলে জামা। মেয়েদের ঢিলে জামা! খৃষ্টমাসের সকালে আমার কুশল-বার্ত্তা নিতে এসে তিনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে জামাটা আমার বিছানার পায়ের দিকে চেয়ারের উপর ফেলে রেখে চলে যান। দুপুর বেলায় যখন জামা-কাপড় পরছি, তখনই সেটা আমার প্রথম নজরে পড়ে···বোকারাম কার্লাইল! তাঁর এই উপহারে অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দময় অনুভূতি জাগা উচিত ছিল—যাই হোক, জিনিষটা দেখে তাঁর সামনে আমি যত দূর সম্ভব খুশীর ভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। জামাটা আমার পরা চলবে এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি খুব সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জিনিষটা না কি তিনি "গ্যাসের আলোয়" দেখে কিনেছিলেন কিন্তু সকাল বেলায় সেটাকে দেখে একেবারে বিগড়ে যান। তিনি কিন্তু কিনেছেন বিস্ময়কর একটি জামা—গরম এবং ভারী বিশ্রী। কাট-ছাঁট ভালই, শুধু আমার চেহারার পক্ষে সম্পূর্ণ বে-মানান, কারণ জামাটা লেবু রংএর ডোরা-কাটা লালচে রংএর কাপড়ে তৈরী। কলারটা আবার লাল ভেলভেটের!

উইলিয়ম এ্যালিঙহাম, (লেখক)

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৭। প্যাটমোরের স্ত্রীর অসুস্থতার সময় সে যে কি ঝঞ্ঝাটে পড়েছিল, সেই কাহিনী শোনালো সে। বিছানা নেই। আগুনের ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েদের ঘটি-বাটি নাড়া-চাড়ার শব্দে জেগে উঠল। পাশের ঘরে গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সেখানেও কারা জানি ঘটি-বাটি নাড়া-চাড়া করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে সেই চলাচলের পথেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেখানেও তার ঘুম ভাঙল ডাক্তারের জুতোর চাপে।

রাণী ভিক্টোরিয়া

১লা জানুয়ারী ১৮৩৯। ৯টায় উঠলাম। পরম ঐকান্তিকতার সহিত আমি সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সারা বছর ধরে আমাকে এবং আমার একান্ত প্রিয়জনদের নিরাপদে রক্ষা করেন এবং এত দিন যা-কিছু যে-ভাবে চলেছে, এখনও যেন সেই ভাবে চলে। প্রার্থনা করি তিনি আমায় আমার কর্মের পক্ষে প্রতিদিন যোগ্যতর করে তুলুন···

মেরী গ্লাডস্টোন (রাজনীতিবিদের কন্যা)

১লা জানুয়ারী, ১৮৬৭। বাড়ী ফিরেই মহান লিজ এসে আমাদের সঙ্গে খেলতে সুরু করে দেন।···ভয়াবহ ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, আমাকেই প্রথম খেলতে হয় তাঁর সঙ্গে। ফলে সামান্য পক্ষাঘাতাক্রান্ত হয়ে পড়ি।

জন পার্সিভাল, (এগমণ্টের আর্ল)

১লা জানুয়ারী ১৭৩৩। এই সপ্তাহে পাশের গ্রাম প্লামষ্টেডের এক মজুরের বউ স্বপ্ন দেখে যে, সে তার শূয়রের খোঁয়াড় খুঁড়লে মাটির তলায় ঘড়া বোঝাই টাকা পাবে। সকালে উঠেই সে তার স্বামীকে খোঁয়াড় খুঁড়তে বলে। স্বামী রাজী হয় না। তাই নিজেই সে কোদাল হাতে কাজে লেগে যায় এবং সত্যি সত্যিই রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কিছু রৌপ্য মুদ্রা লাভ করে। এই টাকা দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে তার দেনাপত্র মিটিয়ে দেয়। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল এই যে, তার এক পড়শী বেড়ার পাশ থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল এবং সেও এই টাকার অর্দ্ধাংশ পেতে পারে কি না, তাই জানতে সে এক আইনজীবির কাছে যায়। এই ভাবে কথাটা রিচমণ্ডের ধনী জমিদার মিঃ মিচেলের কানেও ওঠে। তিনি টাকাটা দাবী করে এক জন কনেষ্টবল সহ কিছু লোক পাঠিয়ে দেন।···স্ত্রীলোকটি বলে যে, টাকাটা সে খরচ করে ফেলেছে, তবে যদি কেউ চায় তাহলে সে খরচের রসিদগুলো দিয়ে দিতে পারে।

চার্লস ডিকেন্স (লেখক)

অধ্যাপক ফেলটনকে, ২রা জানুয়ারী ১৮৪৪।···গত কাল নববর্ষ দিবসের সকালে প্রাতরাশ সেরে আমি যখন নিজের ছোট কাজের ঘরে ঢুকে জানলা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে বাগিচায় তুষারপাত দেখছিলাম (গত রাত্রের অস্বস্তিকর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকার ফলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না), তখন পিয়ন এসে দ্বারে করাঘাত করল। আমি তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করলাম। কিন্তু তার আনা চিঠিতে তোমার হাতের স্পর্শ দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে আমি আশীর্বাদ করলাম, এক গ্লাস হুইস্কি খেতে দিলাম, তার পরিবারের কুশল-প্রশ্ন করলাম (তারা সকলেই ভাল আছে) এবং উৎসাহ-সজল চোখে চিঠিখানা খুলে ফেললাম······

স্যামুয়েল পেপিস (নৌ-বিভাগের অফিসার)

১লা জানুয়ারী ১৬৬২। আজ সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই কনুই দিয়ে বউয়ের নাকে-মুখে জোর এক গুঁতো মারলাম। যন্ত্রণায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভারী দুঃখিত হলাম আমি। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

১লা জানুয়ারী ১৬৬৪। কফি-হাউসে ভারী ধনী সুন্দরী এক বিধবা তরুণীকে নিয়ে গাল-গল্প শুনলাম। বিধবাটির স্বামী ছিলেন স্যার নিকোলাস গোল্ড, ব্যবসায়ী। অবস্থা পড়ে আসছিল। যে বিরাট বিরাট পারিষদের দল এখন মেয়েটির দেখা-শোনা করছে, তাদের গল্পও শুনলাম। মেয়েটির স্বামী মারা যাবার পর এখনও এক সপ্তাহ কাটেনি।

—সুনীল ঘোষ অনূদিত

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত লোকের সংখ্যা

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৫০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত লোকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া মার্কিণ বাণিজ্য বিভাগ জানাইয়াছেন, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে গড়পড়তা কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯,৪০০,০০০ এবং ৫৮,৭০০,০০০; ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটিতে।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে গড়পড়তা কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৫৭,০০০,০০০, আগষ্ট মাসে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২,৪০০,০০০, অসামরিক কর্মরত লোকের ইহাই সর্বাধিক সংখ্যা।

কৃষিকার্য্য ছাড়া অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল গড়ে ৫২,৫০০,০০০। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালের তুলনায় ঐ সংখ্যা অধিক।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল গড়ে ৭,৫০০,০০০। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালের কর্মরত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা ঐ সংখ্যা কম।

১৯৫০ সালে বেকার সংখ্যা ছিল গড়ে ৩,১০০,০০০। ১৯৪৯ সালের তুলনায় ঐ সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ কম। ১৯৫০ সালের শেষ ভাগে বেকার সংখ্যা কমিয়া ২৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়।—মার্কিণ-বার্তা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উনত্রিশ

'আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো?'

হাততালি দিতে-দিতে হরিনাম করছে রামকৃষ্ণ। সকাল সন্ধেয় যেমন চিরকালের অভ্যাস। হয় হরিবোল, হরিবোল, নয় তো হরি গুরু, গুরু হরি। হয় আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, নয় তো মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে এ সব আবার কী ছেলেমানসি!

বিরক্ত হল তোতাপুরী। ঠাট্টা করে বললে, 'হাত চাপড়ে-চাপড়ে রুটি তৈরি করছ না কি?'

'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি— শুনতে পাচ্ছ না?'

'ঈশ্বরের নাম করছ তো তালি দিচ্ছ কেন?'

কেন দিচ্ছে কে জানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ও-সব ভাবের ব্যাপার কিছুই বুঝবে না তোতাপুরী।

সে ব্রহ্ম নিয়েই মশগুল। তার সঙ্গিনী যে মায়া, যে ভাবরূপিণী শক্তি, তার সে খবর রাখে না। বিচারে-বিতর্কে ঈশ্বরকে শুধু সন্ধানই করা যায়; তাকে যে ভালোবাসা যায়, তার জন্যে যে কেউ কাঁদতে পারে, নাচতে পারে—এ তার ধারণার অতীত। সে মনন-চিন্তন বোঝে, কীর্তন-ভজন বোঝে না। শম-দম বোঝে, বোঝে না বাৎসল্য-মাধুর্য। ভক্তি তার কাছে নিছক প্রলাপোচ্ছ্বাস। বুদ্ধির বিক্লিষ্ট বিকার।

সে অভীঃ। তার ধুনির আগুনের মত সে মায়াশূন্য, নিষ্কলঙ্ক।

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছে তোতাপুরী। মন্দিরচূড়ায় একটা পেঁচা ডাকছে। থমথম করছে চার পাশ।

হঠাৎ দীর্ঘাকার একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল। দাঁড়াল এসে সামনে। এ কি, এ যে তারই মত উলঙ্গ।

'কে তুমি?' জিগগেস করল তোতাপুরী।

'আমি ভূত—ভৈরব। গাছের উপর থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি। কিন্তু তুমি কে?'

বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না তোতা। বললে, 'তুমিও যা, আমিও তা।'

'আমি তো ভূত।'

'হলেই বা। তুমিও ব্রহ্মের প্রকাশ, আমিও ব্রহ্মের প্রকাশ। আমাতে-তোমাতে কোনো তফাৎ নেই। বোসো এসে পাশে। ধ্যান করো।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল ভূত।

পরদিন তোতা বলল সব রামকৃষ্ণকে।

'জানি। অনেক বার দেখেছি তাকে।' রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত বললে।

'বলো কি? দেখেছ? ভয় পাওনি?'

'ভয় পাব কেন? আমাকে কত সে ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছে। সে বার কি হয়েছিল জানো না বুঝি—?'

বারুদ-ঘর করবার জন্যে কোম্পানি পঞ্চবটীর জমি নেবে ঠিক করেছিল। একটু নির্জনে বসে মাকে ডাকি, তাও উঠে যাবে? কোম্পানির বিরুদ্ধে মথুর খুব লড়লে একচোট। মামলায় কে হারে কে জেতে তখন সেটা একটা সঙিন অবস্থা। এমন সময় এক দিন রাত্রে দেখি ভৈরবটি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন গাছে। 'কি খবর?' ইসারায় বললে, ভয় নেই। মামলায় হেরে যাবে কোম্পানি।

হলও তাই। কোম্পানি ডিসমিস খেয়ে গেল।

তুমি জ্ঞানে নির্ভয়, আমি ভালোবাসায় নির্ভয়। তুমি ব্রহ্ম পেয়ে ব্রহ্ম নিয়েই থাকো। আমি ব্রহ্ম পেয়ে জীব নিয়ে থাকব। তোমার আগেও জ্ঞান পরেও জ্ঞান। আমার ভক্তি থেকে জ্ঞান। আবার জ্ঞান থেকে ভালবাসা। আমার কখনো পূজা কখনো জপ কখনো ধ্যান কখনো শুধু নামগুণ গান।

কখনো বা দু'হাত তুলে নৃত্য। আমি শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। তুমি একরোখা, একঘেয়ে। আমি বিচিত্র। আমি বহুল। আমার সর্বসমন্বয়।

ভক্তি-ভালবাসা না মানলে কি হয়, তোতাপুরী যখন রামকৃষ্ণের গান শোনে, কেঁদে ফেলে।

ভক্তির বীজ আর যায় না। যতই জ্ঞান-চাপা দাও, আঁকুর থেকে ফুল-ফল হবেই। হাজার জ্ঞান বিচার করো, আবার ঘুরে-ফিরে 'মা'-'মা', আবার ঘুরে-ফিরে হরিবোল, হরিবোল!

তুমি অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকো। আমি অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করি। আমার কত কাজ, কত কথা। আমি না বললে শুনবে কে? আমি না করলে করবে কেন? আর এই আমিটি আমি নয়, কেউ নয়। সকলই তিনি, সকলই তুমি।

তিনিটি জ্ঞান। আর তুমিটি ভালবাসা।

'অদ্বৈতভাব কেমন জানিস? যেমন, ধরো, অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার উপর খুব খুশি। তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। এক দিন করলে কি,—তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। কি কর, কি কর—চাকর তো সঙ্কোচে এতটুকু। আঃ, বোস না---মনিব তাকে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। বললে, তুইও যে, আমিও সে। অদ্বৈতভাব এই রকম।'

পদ্মলোচন প্রকাণ্ড বৈদান্তিক। দেশজোড়া প্রসিদ্ধি। বর্ধমান-রাজার সভাপণ্ডিত হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ ধরল মথুর বাবুকে। বললে, আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে চলো। পণ্ডিতকে একবার দেখে আসি।

যেখানে পাণ্ডিত্য আর ভক্তি একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে তো ভগবানের অধিষ্ঠান। সেই তো তীর্থক্ষেত্র।

যেতে হল না রামকৃষ্ণকে। পদ্মলোচনই চলে এল কামারহাটি। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। শরীর সারাবার জন্যে রয়েছে গঙ্গাতীরে।

'একবার গিয়ে পণ্ডিতের খোঁজ নিয়ে আয় তো।' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ।

'সে আবার কে?'

জানিস না বুঝি? প্রকাণ্ড সাধক। ঈশ্বর-প্রেমিক। বিদ্যেবুদ্ধিতে প্রচণ্ড, আবার ভক্তিতে মেদুর। যেমন সদাচার ইষ্টনিষ্ঠা তেমনি আবার ঔদাসীন্য আর ঔদার্য। যেমন সরল তেমনি স্পষ্টবাদী। একবার রাজসভায় তর্ক উঠল, শিব বড় না বিষ্ণু বড়? মীমাংসা হচ্ছে না, ডাকো পদ্মলোচনকে। পদ্মলোচন এসে বললে, তার আমি কি জানি! আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ শিবও দেখেনি বিষ্ণুও দেখেনি। বড়-ছোট বলব কি করে? যার কাছে যে বড় তার কাছে সেই বড়।

'গিয়ে কি করতে হবে?' জিগগেস করল হৃদয়।

'গিয়ে দেখে আয় তার মধ্যে অভিমান আছে কি না।'

হৃদয় গিয়ে দেখে এল পদ্মলোচনকে। বললে, 'সে তোমার জন্যে বসে আছে'। আমাকে তোমার ভাগ্নে জেনে কত খাতির।'

তক্ষুনি চলল রামকৃষ্ণ। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা কিছু সৎসঙ্গ করবার করে নাও। দিন থাকতে-থাকতে দেখে নাও দিনমণিকে।

পদ্মলোচন দেখল তার দুয়ারে পদ্মপলাশলোচন এসেছে।

পরস্পরকে দেখে গলে গেল দু'জনে। সুরু হল কথার হোলিখেলা। রামকৃষ্ণ গান করলে। পদ্মলোচন কেঁদে আকুল।

'এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত,' বললেন এক দিন ঠাকুর, 'তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না। জানিস, কথা কয়ে এমন সুখ আর পাইনি কোথাও।'

আর পদ্মলোচন বললে, 'ঝুড়ি-ঝুড়ি বই পড়ে যা জেনেছি ও এক পৃষ্ঠাও না উলটিয়েও তার চেয়ে বেশি জেনেছে।'

বেদান্তবাদী হলে কি হয়, পদ্মলোচন তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর শক্তিবলে তর্কে সে সর্বজয়ী। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রহস্য ছিল। সব সময়েই তার কাছে থাকত একটি জলে-ভর্তি গাড়ু আর একখানি গামছা। তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে সেই জলে সে মুখ ধুয়ে নিত। ব্যস, একবার মুখ ধুয়ে নিতে পারলেই সে কেল্লা মেরে দিয়েছে। কেউ আর হারাতে পারবে না তাকে। তার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

একটা অত্যন্ত সাধারণ আচরণ। বাগদেবীকে জিহ্বাগ্রে আনবার আগে এই একটু মুখ-ধোওয়া।

কিন্তু বিষয়টা কি, রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল। জগদম্বা বলে দিলে।

সেদিন তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে পদ্মলোচন যথারীতি মুখ ধুতে উঠেছে। কিন্তু কোথায় গাড়ু-গামছা? বা, তার গাড়ু-গামছা কি হল? মুখ না ধুয়ে সে শাস্ত্রালোচনা সুরু করে কি করে? সে কি কথা? তার গাড়ু-গামছা কে নিল? এইখানেই তো ছিল—

আর কে নেবে। রামকৃষ্ণই লুকিয়েছে।

'কি, আরম্ভ করো মীমাংসা!' রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু।

'কি আশ্চর্য!' পদ্মলোচন তো হতবাক: 'তুমি জানলে কি করে? তবে তুমি কি অন্তর্যামী?'

পদ্মলোচনের দুই চোখ জলে প্লাবিত হয়ে গেল। করজোড়ে স্তব করতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরে বললে, 'আমি নিজে এক সভা বসাব। ডাকাব সব পণ্ডিতদের। বলব তুমি ঈশ্বরাবতার,—দেখি কে কাটতে পারে আমার কথা।'

সে-সভা আর বসাতে পারেনি পদ্মলোচন। তার অসুখ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে।

এক দিন বললে রামকৃষ্ণকে, 'ভক্তের সঙ্গ করব এ কামনা ত্যাগ কোরো, নইলে নানা রকমের লোক এসে তোমায় পতিত করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'পতিত-অভাজনদের মধ্যেই তো এখন ঠাঁই নেব। আমাকে আমার পতিত করবে কে?'

দক্ষিণেশ্বরে মথুর বাবু বিরাট ব্রাহ্মণ-বিদায়ের আয়োজন করেছেন। এক হাজার মণ চাল বিলোনো হবে, সঙ্গে বহু বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সোনা-রূপোও যথেষ্ট। গাইয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেক, যার গানে যত বেশি ভাব হবে রামকৃষ্ণের তাকে তত বেশি টাকা দেবেন—শয়ে-শয়ে টাকা, সঙ্গে শাল, ক্ষৌম-বস্ত্র। মথুর বাবুর ইচ্ছে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু সে যেমন গোঁড়া, হয়তো নেবে না নিমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণকে বললে, 'তুমি একবার দেখ না বলে।'

'হ্যাঁ গা, তুমি যাবে না দক্ষিণেশ্বর?' পদ্মলোচনকে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

পরম নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। বললে, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!'

কিন্তু শরীরে শেষ পর্যন্ত কুলোল না। রামকৃষ্ণের থেকে বিদায় নিয়ে কাশী চলে গেল। আর ফিরল না।

সিঁতির বাগানে আরেক পণ্ডিত এসেছে। নাম দয়ানন্দ সরস্বতী। আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

রামকৃষ্ণ গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। যেখানে প্রসিদ্ধি সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। আর যেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি সেখানেই রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি।

'কেমন দেখলেন সরস্বতীকে?'

'দেখলাম শক্তি হয়েছে—বুক লাল। কথা কইছে খুব, যাকে বলে বৈখরী অবস্থা। ব্যাকরণ লাগিয়ে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করছে। নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব, এই অহঙ্কার ষোলো আনা।'

'আর জয়নারাণ পণ্ডিত?'

'আহা, তার কথা বোলো না। এত বড় বিদ্বান, এক বিন্দু অহঙ্কার নেই। নিজের মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিল আগে থেকে। টের পেয়ে বললে, কাশী চললুম।'

আর এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর বিশ্বাসে একেবারে আগুন। কি? একবার তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ? অসম্ভব।

'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু, শাক-পাতা খোসা-ভুষি যা দাও গব-গব করে খায়, সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।'

কৃষ্ণকিশোরের ডাকাতে বিশ্বাস। তেষ্টা পেয়েছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। কুয়োর কাছে কে এক জন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললে একটু জল তুলে দিতে। সে বললে, আমি মুচি, ছোট জাত। হলেই বা। একবার শিব নাম নাও, অমনি শুচি হয়ে যাবে। একবার নাম নিলেই হবে? হ্যাঁ, বলছি কি, একবার নিলেই হবে। একবারই যথেষ্ট। লোকটা তাই একবার 'শিব' বললে। জল তুলে দিল কৃষ্ণকিশোরকে। কৃষ্ণকিশোর পরম তৃপ্তিতে জল খেল।

কৃষ্ণকিশোর বলে, তোমরা রাম নাম করো, আমি বলি 'মরা'-'মরা'। রামের চেয়েও 'মরা'

বেশি শক্তিশালী। মরাতেই রত্নাকরের উদ্ধার, মৃতের পুনর্জীবন। তোমাদের কী মন্ত্র জানি না, আমার এই মরা মন্ত্র।

বিষয়ীসঙ্গ সহ্য হত না, রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসত কৃষ্ণকিশোরের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের ঈশ্বর ছাড়া বাক্য নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্তব্ধতাও নেই। কৃষ্ণ-কিশোর সচল তীর্থ, উদ্ঘাটিত শাস্ত্র।

হলধারীকে দেখতে পারত না দু'চোখে।

একবার রামকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর এক সাধু দর্শনে চলেছে। তুমি যাবে? জিগগেস করল হলধারীকে।

হলধারী বললে, 'পঞ্চভূতের একটা খাঁচাকে দেখে লাভ কি?'

খেপে উঠল কৃষ্ণকিশোর। 'যে লোক ঈশ্বরের নাম করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে, সে খাঁচা? সে জানে না যে ভক্তের হৃদয় চিন্ময়?'

কচু! তা হলে অজামিলকে আর দুশ্চর তপস্যা করতে হত না। একবার 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেই তরে যেত।

কিন্তু কিছুতেই মানবে না কৃষ্ণকিশোর। তার ভক্তির তমঃ—মারো-কাটো-বাঁধো—জবরদস্ত ভক্তি। আবার কত বার বলবে? একবার বলেছি, এতেই হয়েছে। এতেই ছিনিয়ে নেব জোর করে। আমি কি ভিখিরি? আমি ডাকাত।

দক্ষিণেশ্বরে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলেই ফিরিয়ে নিত মুখ। অমন ক্ষুদ্র যার বিশ্বাস, যে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়, তার সে মুখ দর্শন করবে না।

এক দিন রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখে, কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছে বসে-বসে। কি হয়েছে? আনমনা কেন?

'ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল। বললে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।'

'তাই ভাবছ?' রামকৃষ্ণ হেসে উঠল: 'নিক না ঘটি-বাটি। চাই কি, বেঁধে লয়েই যাক না। কিন্তু তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। তুমি তো আকাশবৎ।'

ঠিকই তো। আমাকে কে নেয়! আমাকে কে বাঁধে! কিন্তু তুমি যে এ-কথা বললে, তুমি কে?

তুমি 'অ'। "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"। তুমি সেই অ-কার। তুমি প্রণবের আদ্য অক্ষর।

এ হেন কৃষ্ণকিশোরের পুত্রশোক হল। দু-দু উপযুক্ত পুত্র মারা গেল পর-পর। কোন জ্ঞানেই কিছু কুলোল না। শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল।

তা অর্জুনই অধীর, এ তো কৃষ্ণকিশোর। যার জন্যে এত গীতা, যার জন্যে এত আত্মার বিশ্লেষণ সে-ই কি না অভিমন্যু শোকে মূর্ছিত। সঙ্গে কৃষ্ণ, কৃষ্ণর এত সব শিক্ষা-দীক্ষা। কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে সব ভেসে গেল।

বশিষ্ঠ যে এত বড় জ্ঞানী, সেও পুত্রশোকে অস্থির। তখন লক্ষ্মণ বললে, এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত। রাম বললে, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার সুখবোধ আছে তার দুঃখবোধও আছে। তাই তোকে বলি, তুই দুইয়ের পার হ। সুখ-দুঃখের জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যা।'

রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গেল দেখতে। দেখে হাড় শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে। এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। রামকে বললে, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের দেহে এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। রাম বললে, ও সব ছিদ্র বাণের জন্যে নয়। শোকে তার হাড় জর-জর করেছে। ও সব ছিদ্র শোকের চিহ্ন।

তেলির ছেলে গোবিন্দ, থাকে বরানগর। ছোকরা বয়স, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসে। আর রামকৃষ্ণর কথামৃত শোনে।

এক দিন বললে, 'গোপালকে আনব এখানে?'

'কে গোপাল?'

'আমার এক বন্ধু। আমারই সমবয়সী।'

'বেশ তো। নিয়ে আসিস এক দিন।'

গোপাল এল গোবিন্দর সঙ্গে। রামকৃষ্ণের মুখে কথা শুনেই কেমন বেহুঁস হয়ে গেল। রামকৃষ্ণের যেমন সমাধি হয়, প্রায় তেমনি।

এক দিন গোপাল এসে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিলে। বললে, 'চলে যাচ্ছি।'

'সে কি? কোথায় যাচ্ছিস?' জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'জানি না। এ সংসার তার ভাল লাগছে না তাই আর থাকছি না এখানে।'

কত দিন তার ছেলে ছুটোর কোনো খবর নেই। এদিকে আর আসে না। কি হল কে জানে।

এক দিন গোবিন্দ এসে হাজির।

'আরে! কি খবর?'

'গোপাল মারা গেছে।'

মারা গেছে? রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল।

ক'দিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গিয়েছে ওপারে।

ভাগ্যিস ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমার কে। রামকৃষ্ণ বলে আর চোখ মোছে।

ত্রিশ

তোতাপুরী জগদম্বাকে মানে না, কিন্তু তোতাপুরীর উপর জগদম্বার অপার করুণা। করুণাবলেই তার সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। দেখাননি তাকে তাঁর রঙ্গিণী মায়ার খেলা। অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মায়ার ইন্দ্রজাল। দেখাননি তাকে তাঁর সর্বগ্রাসিনী করালী মূর্তি। প্রকটিতরদনা-বিভীষীকা। বরং তাকে দিয়েছেন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য, সরল মন আর বিশুদ্ধ সংস্কার। তাই নিজের পুরুষকারের প্রয়োগে সহজ পথে উঠে গিয়েছে শিখরে। আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরদর্শনে, নির্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে। এখন মহামায়া ভাবলেন, ওকে এবার বোঝাই আসল অবস্থাটা কী!

লোহার মত শরীর, লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে তোতাপুরী—হঠাৎ তার রক্ত আমাশা হয়ে গেল।

সব সময়ে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। কি করে মন আর ধ্যানে বসে! ব্রহ্ম ছেড়ে মন এখন শুধু শরীরে লেগে থাকে। মনের সেই শান্তির মৌন চলে গিয়ে দেখা দেয় শারীরিক আর্তনাদ।

ব্রহ্ম এবার পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েছেন। এবার মহামায়ার কৃপা না হলে আর রক্ষে নেই।

তোতাপুরী ভাবলে এবার পালাই বাংলা দেশ থেকে। কিন্তু শরীর ভাল থাকছে না এই ওজুহাতে পালিয়ে যাব? হাড়-মাসের খাঁচা এই শরীর, তাকে এত প্রাধান্য দেব? তার জন্যে ছেড়ে যাব এই ঈশ্বর-সঙ্গ? যেখানে যাব সেখানেই তো শরীর যাবে, শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে রোগও যাবে। আর, রোগকে ভয়ই বা কিসের? শরীর যখন আছে তখন তো তা ভুগবেই, শেষও হয়ে যাবে এক দিন। সেই শরীরের প্রতি মমতা কেন? যাক না তা ধূলায় নস্যাৎ হয়ে। ক্ষয়হীন আত্মা রয়েছে অনির্বাণ। রোগ বা জরা বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সে প্রদীপ্ত চৈতন্য শরীর-বহির্ভূত।

নানা তর্ক করে মনকে স্তব্ধ করলে তোতাপুরী।

কিন্তু রোগ না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমেই তা শিখা বিস্তার করতে লাগল—যন্ত্রণার শিখা। ঠিক করল, আর থাকা চলবে না দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণর থেকে শেষ বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে রামকৃষ্ণকে তা বলে এমন তার সাধ্য নেই। কে যেন তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা কইতে বাধা দিচ্ছে। আজ থাক, কাল বলব—বারে-বারে এই ভাব এসে তাকে নিরস্ত করছে। আজ গেল, কালও সে পঞ্চবটীতে বসে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেদান্ত নিয়েই আলোচনা করলে, অসুখের কথা দন্তস্ফুট করতে পারল না।

কিন্তু বুঝতে পারল রামকৃষ্ণ। মথুর বাবুকে বলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালে।

মনকে সমাধিস্থ করে যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খুঁজছে তোতাপুরী। আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি জীব নই আমি ব্রহ্ম এই দিব্যবোধে নিমগ্ন হয়ে থাকছে। শরণ নিচ্ছে যোগজ প্রজ্ঞার।

কিন্তু কত দিন?

এক দিন রাতে শুয়েছে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হল। উঠে বসল তোতাপুরী। এ যন্ত্রণার কিসে নিবারণ হবে? মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে চাইল সেই অদ্বৈতভূমিতে। কিন্তু মন আর যেতে চায় না। একটু ওঠে আবার পেটের যন্ত্রণায় নেমে পড়ে। শরীরবোধের আর বিচ্যুতি ঘটে না। ভীষণ বিরক্ত হল তোতাপুরী। যে অপদার্থ শরীরটার জন্যে মনকে বশে আনতে পারছি না সে শরীর রেখে আর লাভ কী? তার জন্যে কেন এত নির্যাতন? সেটাকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত, শুদ্ধ, অসঙ্গ হয়ে যাই।

তোতাপুরী স্থির করল ভরা গঙ্গায় ডুবে মরবে।

গঙ্গার ঘাটে চলে এল তোতা। সিঁড়ি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে জলে নামতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এগুতে লাগল গভীরের দিকে, মাঝ-নদীতে।

কিন্তু এ কি! গঙ্গা কি আজ শুকিয়ে গেছে? আদ্ধেক প্রায় হেঁটে চলে এল, তবু এখনো কি না ডুব-জল পেল না? এ কি গঙ্গা, না, একটা শিশে খাল? প্রায় ও-পারের কাছাকাছি এসে পড়ল, এখন কি না ফের হাঁটু-জলে এসে ঠেকেছে। এ কি পরমাশ্চর্য! ডুবে মরবার জল পর্যন্ত আজ গঙ্গায় নেই।

'এ ক্যা দৈবী মায়া!' অসহায়ের মত চীৎকার করে উঠল তোতাপুরী।

হঠাৎ তার চোখের ঠুলি যেন খসে পড়ল। যে অব্যয়-অদ্বৈত ব্রহ্মকে সে ধ্যান করে এসেছে তাকে সে এখন দেখলে মায়ারূপিণী শক্তিরূপে। যা ব্রহ্ম তাই ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, কিন্তু শক্তিতেই জীব-জগৎ। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। যেমন সাপ আর তির্য্যক গতি। যেমন মণি আর বিভা।

সেই বিভাবতী জ্যোতির্ময়ীকে দেখল এখন তোতাপুরী। দেখল জগজ্জননী সমস্ত চরাচর আবৃত করে রয়েছেন। যা কিছু দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা সব তিনি। শরীর-মন রোগ-স্বাস্থ্য জ্ঞান-অজ্ঞান জীবন-মৃত্যু—সব তাঁর রূপচ্ছটা! "একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।"

মা'র এই বিরাট বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখে তোতা অভিভূত হয়ে গেল।

লুপ্ত হয়ে গেল ব্যাধিবোধ। নদী ভেঙে ফের সে ফিরে চলল দক্ষিণেশ্বরে।

পঞ্চবটীতে ধুনির ধারে বসল গিয়ে সে চুপচাপ। ধ্যান-চোখ বোজে আর দেখে সে জগদম্বাকে। চিৎসত্তাস্বরূপিণী পরমানন্দময়ীকে।

সকাল বেলা তোতাকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক। শরীরে রোগের আভাসলেশ নেই। সর্বত্র প্রহর্ষ-প্রকাশ।

'এ কি হল তোমার? কেমন আছ?'

'রোগ সেরে গেছে।'

'সেরে গেছে? কি করে?'

'কাল তোমার মাকে দেখেছি।' তোতার চোখ জলজ্বল করে উঠল।

'আমার মাকে?'

'হাঁ, আমারো মাকে। জগতের মাকে। সর্বত্র তাঁর আত্মলীলার স্ফূর্তি -চিদৈশ্বর্যের বিস্তার—'

'কেন বলেছিলাম না?' রামকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে উঠল: 'তখন না বলেছিলে, আমার কথা সব ভ্রান্তি? তোমায় কী বলব, আমার মা যে ভ্রান্তিরূপেও সংস্থিতা—'

'দেখলাম যা ব্রহ্ম তাই শক্তি। যা অগ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দু তাই সিন্ধু। ক্রিয়াহীনে ব্রহ্মবাচ্য, ক্রিয়াযুক্তেই মহামায়া।'

'দেখলে তো, দেখলে তো?' রামকৃষ্ণের খুশি আর ধরে না। 'আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পারো? যোগে বসে এত দেখছ আর আমার মহাযোগিনী মাকে দেখবে না?'

যা মন্ত্র তাই মূর্তি। এক বিন্দু বীর্য থেকে এই অপূর্বসুন্দর দেহ, এক ক্ষুদ্র বীজ থেকে বৃহৎ বনস্পতি, এক তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে বিস্তীর্ণ দাবানল। তেমনি ব্রহ্ম থেকে এই শক্তির আত্মলীলা।

'এবার তোমার মাকে বলে আমাকে ছুটি পাইয়ে দাও।'

'আমি কেন? তোমার মা, তুমি বলো না।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তোতা চলে এল ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে মাকে। প্রসন্ন মনে মা তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন দিকে।

কোন দিকে গেল কেউ জানে না।

একত্রিশ

তোতাপুরী গেল, এল গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ রায় জাতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আরবি-ফার্সিতে পণ্ডিত। ইসলামের একভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছে।

ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। আস্তানা গেড়েছে কালীবাড়ির বাগানে।

তখন এমনি উদার ব্যবস্থা। রাণী রাসমণির পুণ্যের আকর্ষণে হিন্দু সন্ন্যেসির মত মুসলমান ফকিররা এসেও জমায়েত হত। যেখানে ভক্তির রাজ্য, ভাবের রাজ্য, সেখানে আবার জাত বিচার কি! তা ছাড়া রাণী যেখানে অন্নপূর্ণা।

গোবিন্দ রায় দরবেশ। সুফী-পন্থী। প্রেম-ভাবে মাতোয়ারা। ভাবের পশরা মাথায় নিয়ে ভবের হাটে কেনা-বেচা করে।

রামকৃষ্ণর চোখ পড়ল গোবিন্দর উপর। ভাবেশ্বরীই তাকে পথ দেখালেন।

'কি হে, এসেছ?' ছুটে গেল রামকৃষ্ণ।

'তুমি ডাকলে যে। না এসে কি পারি?' গোবিন্দ রায় মহানন্দে হাসল।

চুম্বকের ডাকে লোহা চলে এসেছে।

যেখানেই অনুভূতির গভীরতা সেখানেই স্বচ্ছ সারল্য। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানেই প্রেমের সদানন্দ।

গোবিন্দ রায়ের বিতর্কহীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। দেখল, এও তো একটা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার। এই পথেই তো মা কত লোককে টেনে নিয়ে চলেছেন, পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে। এই পথটা একবার দেখে এলে কেমন হয়? পথ যখন আরেকটা আছে তখন সেটাই বা তার কাছে রুদ্ধ থাকবে কেন? সমস্ত রসের রসিক সে। সমস্ত পথের সে পর্যটক।

যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে।

তেমনি ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যে ভাবেই ওঠো, একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। দু' সিঁড়িতে পা দিলে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। যখন যেটা ধরেছ সেটা ধরেই উঠে যাও। দেখ ঠিক উঠছ কি না।

ধর্ম তো আর ঈশ্বর নয়। ধর্ম হচ্ছে শুধু একটা কিছু ধরবার জন্যে। যেটা ধরে উঠতে পারবে উপরে, পর্বতচূড়ায়, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যা তুমি ধরবে, তা বাপু, একটু শক্ত করে ধোরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

কালীঘাটে যাবার নানান রাস্তা। নানান বাহন। তোমার গাড়ি-ঘোড়া না জোটে, না জুটুক, তোমার খুব দূরের পাড়ি হয়, হোক যত দূর খুশি। তুমি পায়ে হেঁটেই চলে এস মন্দিরে। সোজা ভক্তি-বিশ্বাসের পথ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ধরল গিয়ে গোবিন্দ রায়কে। বললে, 'আমি মুসলমান হব।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোবিন্দ রায়। দেখল সে কী মহাভাববিচ্ছুতি রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছে। দেখল ভক্তি-ভালোবাসার বিশাল ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে গেছে সব বিধি-নিষেধ, সব সংস্কার-সংকীর্ণতা। অভিমানের জঞ্জালস্তূপ।

তবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হল না গোবিন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হবে?'

'মুসলমান হব। ইসলামের পথও তো একটা পথ। এই পথে কত সাধকই তো বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পৌঁছুচ্ছেন। আমি সে পথটাই বা বাদ দেব কেন?'

'সত্যি বলছ মুসলমান হবে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমার আর দেরি সইছে না—খিদের মুখেই আমার আস্বাদন চাই।'

গোবিন্দ রায় যথাবিধি দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলল। লুঙ্গির মতন করে পরল দু'গাজি কাপড়। মুখে আর 'মা' 'মা' নেই, শুধু 'আল্লা', 'আল্লা'। মন্দিরের ধারে-কাছেও যায় না। যে শ্যামা তার চক্ষুর চক্ষু ছিল তাকে দেখবার জন্যে আর এক বিন্দু ব্যাকুলতা নেই। বরং দেবদেবীর নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। সেই একেশ্বর খোদাতাল্লার ভজনা করে।

থাকে মথুর বাবুর কুঠির এক পাশে। চোখের উপর এত বড় যে একটা মন্দির সেটা চোখে পড়ে না। শোনে না সকাল-সন্ধ্যার ঘণ্টার আওয়াজ। পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে তদ্গত মনে। নামাজের আগে পুকুরে ওজু করে নেয়।

এক দিন বললেন মথুর বাবুকে, 'মুসলমানের রান্না খাব।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, খুব ঝাল-পেঁয়াজ-রশুন দেওয়া উগ্র রান্না। রান্নার গন্ধ বাতাসে টের পাওয়া যাবে।'

মথুর বাবু রাজি হন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের দাবি দৃঢ়তর।

বেশ, মুসলমান বাবুর্চি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন। তাই সই। শিগগির-শিগগির চাপিয়ে দাও রান্না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

আমাশায় ভোগা রুগী, আঝাল ঝোল-ভাত যার পথ্য, তার জন্যে ঐ উগ্রচণ্ড রান্না। কিন্তু উপায় নেই। রামকৃষ্ণ যখন গোঁ ধরেছে তখন মানতেই হবে।

মুসলমান-বাবুর্চি বলে দিচ্ছে, আর তার কথামত রাঁধছে হিন্দু বামুন। কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছে রামকৃষ্ণ। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে।

হঠাৎ ডাকিয়ে আনলেন মথুর বাবুকে। বললেন,

'এ ঠিক হচ্ছে না। বামুনকে বলো কাছা খুলে ফেলতে। ওতে আর ঐ বাবুর্চিতে কিছু তফাৎ নেই আমাকে ভাবতে দাও সেই কথা।'

মথুর বাবুর নির্দেশে বামুন কাছা খুলে ফেলল।

সানকিতে করে ভাত খেল রামকৃষ্ণ। জল খেল বদনাতে করে।

এ কি ভাব হল রামকৃষ্ণের—মথুর বাবু ভাবনায় পড়লেন। কিন্তু হৃদয় এল তেড়েফুঁড়ে, ভীষণ চোটপাটের সঙ্গে।

'এ সব কী হচ্ছে পাগলামি? নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কী ব্যবহার? পৈতে ফেলে দিয়েছ বলে কাছাও ফেলে দেবে? কাছা ফেলে দিয়েছ বলে নামাজ পড়বে ওঠ-বোস করতে করতে? পাগলামি ছাড়ো। যাও, মন্দিরে যাও। মন্দিরে গিয়ে মার কাছে বোসো। তাকে ভজনা করো।'

ধরে টেনে ঠেলে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিলে মন্দিরের দিকে।

কতক্ষণ পরে হৃদয় মন্দিরে এসে দেখে রামকৃষ্ণের টিকিটিও কোথাও নেই। কোথায় গেল মামা? ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল হৃদয়। মথুর বাবুর কুঠির বারান্দাতেও নেই, নেই বা গঙ্গার ধারে-কাছে। বাগান-পঞ্চবটীও শূন্য। তবে কোথায় অদৃশ্য হল?

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে সামনের মসজিদে।

দেখল মসজিদে নামাজ পড়ছে রামকৃষ্ণ।

দুষ্টুমি করার সময় ছোট ছেলে যেন ধরা পড়েছে অভিভাবকের কাছে। হৃদয় যেন রুদ্রচক্ষু গুরুজন আর রামকৃষ্ণ অবোধ অপোগণ্ড শিশু।

বললে, 'আমি কি করব বল্, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে কে যেন জোর করে এখানে টেনে এনেছে।'

সকাল বেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ দে-ছুট।

'এ কি, তুমি কে?' প্রথম দিন জিগগেস করেছিল মুসলমানেরা।

ওদের থেকেই কে এক জন বললে, 'ওকে চেন না? ও মন্দিরে থাকে, পুজো-টুজো করে—'

'করে না করত। আমি এখন ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি। আমার ভাইদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করব।'

সকলে ভাবলে পাগল হবে বা। কিন্তু সাধ্য নেই তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। নামাজের প্রত্যেকটি কৃত্য-করণ তার মুখস্থ। আর সব চেয়ে মর্মস্পর্শী হচ্ছে তার মুখস্থ ভাবটি। যে ভাবটি আসে শুধু সরলতা থেকে, ব্যাকুলতার সরলতা।

তিন দিন ছিল এই ইসলামভাবে।

এক দিন হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে আবির্ভূত হল। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে এসেছে। বৃদ্ধ ফকিরের বেশ, মাথার চুল সব সাদা, গোঁফ-দাড়িও তাই। গলায় কাঁচের মালা, হাতে লাঠি। বললে, 'তুমি এসেছ? বেশ—' বলে হাসল, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করল।

সেই পুরুষ-প্রবর বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভাস।

পরে আরো এক দিন দেখেছিলেন তাকে ঠাকুর। বললেন, 'মা ভেদবুদ্ধি সব দূর করে দিলেন। বটতলায় বসে ধ্যান করছি, দেখালেন এক জন বুড়ো মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই দুই নেই—'

মার মন্দিরে বসে তোরা চোখ বুজে কেন ধ্যান করিস বল তো? সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নে। ছাখ তাঁর আয়ত-শান্ত চোখ দুটি, ছাখ তার পাদপদ্ম দুখানি। যখন আপন মার কাছে যাস মাকে দেখতে, তখন কি চোখ বন্ধ করে মার কাছে বসিস, না, মালা ফেরাস বসে-বসে?

চেয়ে ছাখ দেখি—এ তোর আপনার মা নয়?

'শিখেরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়ালু। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি! ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালন-পালন করবে না, করবে কি বামুন-পাড়ার লোকেরা?'

কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছে রামকৃষ্ণ:

'ও মা, ও মা ওঁকাররূপিণী মা! এরা কত কি বলে মা, কিছু বুঝতে পারিনি। কিছু জানি না, মা। শুধু শরণাগত! শরণাগত! কেবল এই কোরো মা তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না। শরণাগত! শরণাগত!'

[ক্রমশঃ।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

তূণ—তূণীর, ইষুধি, তর্কব, বাণকোষ।
তূরী—ক্ষুদ্র ভেরী, ভোড়ঙ্গ, রণশিঙ্গা।
তূর্ণ—শীঘ্র, দ্রুত, ঝটিতি, ত্বরায়, বেগ।
তূল—তুৎ, নিস্তী, তুলো।
তূলা—বীজোদ্ধৃত কার্পাস।
তূলী—তুরী, তুলিকা, চিত্রকরের বর্ত্তি।
তৃণ—ঘাস, খড়, যবস, গবাদির খাদ্য।
তৃণগ্রাহী—তৈলস্ফটিক, চন্দ্রক্ষয।
তৃণদ্রুম—গুবাক নারিকেলাদি বৃক্ষ।
তৃণধান্য—উড়ীধান্য, বনধান্য।
তৃণরাজ—তাল বৃক্ষ।
তৃতীয়—তিনের পূরণ।
তৃপ্তি—ক্ষুন্নিবৃত্তি, পরিতোষ, আহ্লাদ।
তৃষা—তৃষ্ণা, পিপাসা, স্পৃহা, পানেচ্ছা।
তৃষ্ণক—পিপাসু, কামুক, ইচ্ছুক।
তেঁই—সেই নিমিত্তে, সেই কারণে।
তেঁতুল—তেতুল, তিন্তিড়ী।
তেকালা—টেঁটা, কালা, ত্রিশূল।
তেকোণা—ত্রিকোণা, ত্রিকোণবিশিষ্ট।
তেজ—বল, তীক্ষ্ণতা, প্রতাপ, বীর্য্য।
তেজপত্র—তেজপাত, তেজপাতা।
তেজস্বী—সতেজ, প্রতাপান্বিত, দীপ্তিমান্।
তেজাল—তীব্র, সতেজ, তেজস্বী, সবল।
তেজিত—শাণিত, মার্জ্জিত, তীক্ষ্ণকৃত।
তেড়া—বক্র, টেরচা, টেরাদৃষ্টি।
তেতালা—ত্রিতল, তিনতালা গৃহ।
তেপান্তর—ত্র্যবান্তর, প্রশস্ত মাঠ।
তেমত—তেমন, সেই প্রকার, তদ্রূপ।
তেমনি—নিতান্ত সেইরূপ।
তেলচাটা—তেলাপোকা, আরশুলা, তৈলপায়িকা, তৈলপা।
তেলা—চিক্কণ, স্নিগ্ধ, তৈলাক্ত।
তেলাজা—সৈন্ধ, ঘোদ্ধা, পিপীলিকা।
তেলী—তৈলিক, কলু, জাতিবিশেষ।
তৈজস্—পিত্তলাদি নির্ম্মিত দ্রব্য।
তৈত্তিরীয়—যজুর্ব্বেদী।
তৈল—তেল, তিলাদি নিঃসারিত।
তোক—সন্তান-সন্ততি, পুত্র-কন্যা।
তোড়—জলের বেগ, স্রোত, প্রবাহ।
তোড়ন—খণ্ডন, ভাঞ্জন, তিরস্করণ।
তোড়ল—বলয়, বালা, আভরণবিশেষ।
তোড়ানি—আমানি, কাঞ্জী, খুদরা পয়সা, ভাঙ্গানি।
তোৎলা—অস্পষ্টবাক, জড়বক্তা।
তোরণ—চাঁদনী, পিড়া, বারান্দা, বেদী।
তোলক—তোলা, অশীতি রত্তিকা।
তোলন—ছোলন, উৎপাতন, উত্থাপন।
তোষ—হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ।
তোষণ—হর্ষ করণ, আনন্দ করণ।
তৌল—পরিমাণ ক্রিয়া, গুরুতা।
ত্যক্ত—বর্জ্জিত, দত্ত, উৎসৃষ্ট, বিরক্ত।
ত্যজন—ত্যাগ করণ, বিবর্জ্জন, ছাড়ন।
ত্যাগ—ছাড়া, বিবর্জ্জনা, উৎসর্গ।
ত্রপা—ব্রীড়া, লজ্জা, লাজুকতা, হায়া।
ত্রয়—তিন, তৃতীয়, তিনের পূরণ।
ত্রয়ী—ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ।
ত্রাণ—রক্ষা, উদ্ধার, মুক্তি, নিস্তার।
ত্রাতা—রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক, ত্রাণকারী।
ত্রাস—ভয়, ভীতি, শঙ্কা, আশঙ্কা।
ত্রি—তিন।
ত্রিকটু—মরীচ, পিপুল, শুঠ এই তিন।
ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান।
ত্রিকুল—পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুর কুল।
ত্রিগুণ—সত্ত্বরজস্তমো গুণ।
ত্রিজগৎ—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন; ত্রিদিব, ত্রিজগৎ, ত্রিলোক, ত্রৈলোক্য।
ত্রিদোষ—পিত্তবাতশ্লেষ্মঘটিত বিকার।
ত্রিধা—তিন প্রকার, ত্রিবিধ, তিন ধারা।
ত্রিপথগা—গঙ্গা, জাহ্নবী, ভাগীরথী।
ত্রিফলা—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া।
ত্রিবিধ—তিন প্রকার, তিন ধারা, ত্রিধা।
ত্রিযামা—রাত্রি, রজনী, যামিনী, নিশা।
ত্রিলোচন—শিবের এক নাম, ত্র্যম্বক।
ত্রিশূল—শিবের অস্ত্রবিশেষ, তেকালা।
ত্রিসন্ধ্যা—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ।
ত্রুটি—ক্ষতি, নাশ, অপচয়, দোষ।
ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ, অগ্নিত্রয়।
ত্র্যহস্পর্শ—এক দিবসে তিথিত্রয় মিলন।
ত্বক—ত্বচ, চর্ম্ম, বৃক্ষাদির ছাল, বাকল।
ত্বঞ্চ—প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ধূর্ত্ততা।
ত্বরা—বেগ, শীঘ্রতা, ঝটিতি, দ্রুত।
ত্বরিত—বেগযুক্ত, দ্রুত, ত্বরায়, শীঘ্র।

[ক্রমশঃ।

[মানুষই মানুষকে পত্র দেয়। পিতা সন্তানকে, স্বামী স্ত্রীকে, বন্ধু বন্ধুকে, প্রজা জমিদারকে এবং ভৃত্য তার প্রভুকে। চিঠি হ'ল মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনীয় সহায়ক, যার সাহায্যে মানুষ মনের কথার আদান-প্রদান করে পরস্পরে। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা গল্প, উপন্যাসেও দেখা যায় লেখকরা তাঁদের লেখাকে সজীব এবং জীবন্ত করবার মানসে গল্প কিংবা উপন্যাসেও ঐ "চিঠির" সাহায্য গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের নায়ক হয়তো নায়িকাকে চিঠি লিখছেন। কিংবা নায়িকা লিখছেন নায়ককে। আমরা এই সংখ্যায় কতকগুলি এই ধরণের পত্র মুদ্রিত করলাম। চিঠিগুলির সঙ্গে আছে লেখা এবং লেখকের পরিচয়।]

এই পত্র চণ্ডীচরণ সেনকৃত "মহারাজ নন্দকুমার" হইতে

নাথ! আমাদের এখন যেরূপ বিপদ, তাহাতে আমরা এখন কাহাকেও টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারি, এমন সাধ্য নাই। কিন্তু তথাপি তোমাকে এই দুঃখিনী সাবিত্রীর দুঃখবিমোচনার্থ ইহার যত টাকার আবশ্যক হইবে তাহা দিতে অনুরোধ করি। তোমাকে এস্থারের এই অনুরোধ রাখিতে হইবেই হইবে। এই দুঃখিনীর দুরবস্থা যখন মনে হয়, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ সকলেই মরিয়া গিয়াছে। কেবল একটি ভাই এবং ইহার স্বামী এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে। রামহরি ইহার ধর্ম্মনষ্ট করিবার চক্রান্ত করিলে পর আমি নিজের গৃহে ইহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। সাবিত্রী পতিপ্রাণা, তাই পতির উদ্ধারার্থে কলিকাতায় চলিয়াছে। যেরূপে পার, ইহার ভ্রাতা এবং স্বামীকে কারামুক্ত করিয়া দিবে।

তোমার চিরানুগত দাসী
এস্থার।

এই পত্র শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত "মেজো বউ" হইতে

প্রিয়তমেষু,

তোমার চরণাশীর্ব্বাদে এ দাসী ভাল আছে। কিন্তু এখানকার সমুদায় বিশৃংখল। শুনিলাম তুমি বাড়ী খরচার জন্য কাজ করিতেছ। আমি দেখিতেছি, তুমি দেনায় জড়াইয়া পড়িতেছ। আমাকে যে এ সকল কথা জানাও নাই, সে জন্য আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি। আমি কি কখনও তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া উপেক্ষা করিয়াছি? তবে কোন্ অপরাধে আমাকে আজ নিজ চিন্তার ভার দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? সেখানে যে চিন্তায় তোমার শরীর মন জীর্ণ হইবে, আর আমি সুখে নিদ্রা যাইব, আমাকে কোন্ অপরাধে এমন শাস্তি দিতেছ? তুমি কি জান না যে, তোমার একটি দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা আমার কাছে টাকা নয়? তুমি কি জান না তোমার মুখ একটু বিষণ্ণ দেখিলে আমার প্রাণে নিতান্ত ক্লেশ হয়? তবে কোন্ অপরাধে আজ দাসীকে হৃদয়ের বাহির করিয়া দিতেছ? লোকমুখে শুনিলাম, কলেজ ছাড়িবার ইচ্ছা করিতেছ, এমন কাজ করিও না; পরীক্ষার এই কয়েকটা মাস যো শো করিয়া চালাইতে হইবে। কোন ছেলে পড়াইবার কাজও জুটাইবা না, তাহাতে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে। তোমার প্রমদাকে এই কয়েক মাস তোমার হইয়া সংসার চালাইবার ভার দাও। আমি আজ বাবাকে পত্র লিখিলাম, আমাকে মাসে যে দশ টাকা দেন তাহা একেবারে তোমার কাছে পাঠাইবেন। সেই দশ টাকা তুমি লইয়া এখানে পাঠাইবে। আমি দিতে গেলে মা অপমান বোধ করিবেন বলিয়া তোমার হাত দিয়া পাঠাইতে বলিতেছি। এই ১০৲ দশ টাকা এবং এই লোকের হস্তে আমার গলার চিকগাছি পাঠাইতেছি বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে তাহা হইতে মাসে মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইবে; এই ২৫৲ টাকা হইলেই আমাদের চলিয়া যাইবে। তুমি ভাবিও না; আমার মাথা খাও, চিকগাছি ফিরাইয়া দিও না। তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন ওরূপ কত চিক হবে। আমার চিকেই বা প্রয়োজন কি? তুমিই আমার চিক্, তুমিই আমার মহামূল্য ভূষণ।

পত্র লিখিতে এত বিলম্ব কর কেন? আমার এক দিন যায় না এক এক বৎসর যায়। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও।

তোমারই প্রমদা।

এই দুই পত্র প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত "বামাতোষিণী" হইতে

প্রিয়তমে শান্তে,

আমার জন্য চিন্তিত হইও না, আমি কিয়ৎকাল অস্থির ছিলাম, এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে ভাল আছি। শারীরিক কোন পীড়া নাই। যাহা দেখিবার যোগ্য ও যাহার সহিত আলাপ করিলে উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহাই দেখিতেছি ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করিতেছি। যত দূর সম্ভাবে হৃদয়কে নির্ম্মল ও শান্ত রাখিতে পারি তত দূর করি; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমাকে ও কন্যা-পুত্রকে না দেখিবার ক্লেশ উপস্থিত হইলে কাতর হইয়া পড়ি। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী এক শরীর এক প্রাণ, এক আত্মা জ্ঞান করে, তাহারা স্বতন্ত্র হইলে আপনাকে অর্দ্ধস্বরূপ জ্ঞান করে, কিন্তু তাহারা কি অন্তরে স্বতন্ত্র হইতে পারে? অনেক দিন তোমার মুখের বাণী শুনি নাই, তুমিও আমার কথা শুন নাই, এ জন্য বিস্তার পূর্ব্বক তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে সর্ব্বদাই অন্তরে দেখিতেছি।

আমি অনেক রম্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি তোমাকে বলি। সেণ্ট জেম্‌স পার্ক অতি মনোহর স্থান। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ, প্রশস্ত মাঠ, বৃহৎ সরোবর যাহাতে নানা জাতীয় পক্ষীগণ কেলি করিতেছে। রিজেণ্ট পার্ক বড় নির্জ্জন স্থান, এ স্থানে হট্‌ হৌসে অর্‌কিড ও অন্যান্য নানা বর্ণীয় পুষ্পলতা রক্ষিত হয়। হাইড পার্ক, কিউ গারডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিবার যোগ্য। হট্‌ হৌস চারা ঘরে যে সকল ফল এখানে ফলে

না, সেই সকল ফল কৌশলে ঐ স্থানে জন্মান হয়। বিলাতে আম্র, কলা, লেবু, আনারস প্রভৃতি জন্মে না; কিন্তু বিশেষ তদ্বিরের দ্বারা হঠ, হৌসে, তাহা জন্মে। হঠ, হৌস গেলাসে নির্ম্মিত। গেলাস দিয়া সূর্য্যের আভা ভিতরে আইসে ও তাহার নিম্নে প্রস্তর ও নল গরম জল দ্বারা তপ্ত করিয়া রাখা হয়, তদ্দারা মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। এখানের পুষ্প সকল বঙ্গদেশের ন্যায় নহে। নানা প্রকার গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প আছে। ঐ সকল পুষ্প সুন্দর বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের পুষ্প সকলের চটক অধিক।

যে সকল রম্য স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সেই স্থানে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা দর্শন-শ্রবণ-মননে লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমা বিহীনে অসম্পূর্ণরূপে ভোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী জানিবার ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম যে, ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্যাদিগকে বাটীতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্ত্তী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপন আপন কন্যাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন।

ধনীলোকদিগের কন্যারা ফরাসিস্, লেটিন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করেন। অনেক পরিবারে কন্যারা অবিবাহিতা থাকেন ও অন্যান্য বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। শিল্প কার্য্য, উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও লেখাপড়ার অনুশীলন করতঃ পুস্তকাদিও প্রকাশ করেন। মহারাণীর বংশীয় কন্যারা নানা প্রকার শিল্প-কর্ম্ম করেন ও ঐ সকল দ্রব্যাদি দীনদরিদ্র ব্যক্তির উপকারার্থে প্রকাশ্য নীলামে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা লেখাপড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করেন ও যাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততি নাই, তাহারা ধনীলোকের বাটীতে শিক্ষা দেওন জন্য নিযুক্ত হন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া ডাক্তারি করেন। কোন কোন স্ত্রীলোক পুস্তকাদি লিখিয়া অথবা পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা শিল্পবিদ্যালয়ে নানারূপ শিল্প শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। ভদ্রলোকের বাটীতে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা দেওনের প্রণালী অতি সুন্দর। চিত্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, তারা, নক্ষত্রবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হয় ও গৃহ মধ্যে এক ঘরে অনেক জানিবার যোগ্য তসবির গঠিত থাকে। বালক-বালিকারা রাত্রে অগ্নি পোয়াইবার সময় মাতার নিকট আসিয়া যাহা চক্ষু-আকর্ষণীয় তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করে। মাতা সস্নেহ ও মুখচুম্বনের দ্বারা সকল সৎ উপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে থাকেন। এইরূপে মাতা হইতে যে উপকার হয়, তাহা পাঠশালার অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে না। তাহারা কেবল নিয়ম ও প্রথা ও প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেন। মাতার শুদ্ধ ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার গৃহ স্বর্গ-স্বরূপ। মাতার উপদেশ দ্বারা বালক-বালিকার স্বভাব উৎকৃষ্ট হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, ঈশ্বর জ্ঞান হয় জীবন চরিতার্থ হয়। পাঠশালায় স্মরণশক্তির অধিক চালনা হয়, কিন্তু বিবেকশক্তির মার্জ্জনা তত হয় না। শুনিতে পাই কবেট নামক এক জন ইংরেজ ছিলেন। তিনি সন্তানদিগকে লইয়া সর্ব্বদা মাঠে যাইতেন। স্বভাবের অনন্ত বস্তুর প্রতি তাহাদিগের মনোনিবেশ করাইয়া তাহাদিগের বিবেক শক্তির চালনা অভ্যাস করাইতেন।

এইমত অনুসারে মহামান্য ডাক্তার আর্ণল্ড চলিতেন। তিনি স্বীয় চেষ্টা দ্বারা বালকদিগের জ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন, তাহারা আপনা আপনি কিরূপে শক্তি চালনা করিতে পারে তাহাই কেবল বলিয়া দিতেন। এইরূপ শিক্ষার তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিবে। পুস্তকাদি অল্প পড়াইতেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মাতৃশিক্ষা হেতু বিখ্যাত হইয়াছেন। সেণ্ট আগস্টিন মাতার উপদেশে পবিত্র হয়েন। কবি কৌপর প্রথমে পাপগ্রাসে পতিত হয়েন, পরে মাতার উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে জমির উপরে ও নিম্নে রেলগাড়ী চলে, গমনাগমনের ভারি সুযোগ। বিলাতে নৈসর্গিক এক আশ্চর্য্য বিষয় শুন। এখানে প্রতি বৎসর জুন মাসের ২১ তারিখের পূর্ব্বাবধি কয়েক দিবস দীর্ঘ হয়। প্রাতে তিনটায় সূর্য্য প্রকাশ হয় ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, রাত্রি প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথচ চন্দ্রমা প্রকাশ হয়। শীত এখানে অতি উগ্র। শীতকালে বিশেষতঃ কুজ্ঝটিকা হইলে আলোক জ্বালাইতে হয়। আমি এই চিঠি দিবসে লিখিতেছি, কিন্তু গ্যাস আলোক সম্মুখে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। শীঘ্র উত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাপিত হৃদয় শীতল কর। কন্যা-পুত্রকে আমার অকৃত্রিম প্রেম দিবে ও তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুকরণ করে।

* * * *

প্রিয়তমপতে!

আপনার গমনাবধি নির্জ্জনে ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে, অস্থির অবস্থা অপেক্ষা শান্ত অবস্থা শ্রেয়। এজন্য নিয়মিতরূপে ঈশ্বরধ্যান ও পুত্র-কন্যার উন্নতি সাধন জন্য উত্তমরূপে চেষ্টা করা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য। আপনি যখন নিকটে ছিলেন, তখন এ কার্য্য আপনার দ্বারা উত্তমরূপে সাধিত হইত। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, পুরুষ জ্ঞানদাতা, কিন্তু স্ত্রীলোক সদ্ভাব প্রদান করিতে পারে ও বালক-বালিকার হৃদয়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইলে জ্ঞান আদর পূর্ব্বক অন্বেষিত ও গৃহীত হয়। আমার কি শক্তি যে আমি বাল্য হৃদয়ে শুদ্ধভাব প্রেরণ করি? আমি কেবল এই যত্ন করিতেছি যে, শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে কুমতি না জন্মে। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা জগদীশ্বরের কৃপায় হইবে।

আপনার লিপি পাইয়া পরম আহ্লাদিতা হইলাম। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আনন্দিতা হইলাম। দেখিতেছি বিলাতে স্ত্রীলোকেরা নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও বাদ্যগান শিখে, ইহাতে চিত্ত স্থির থাকে। এখানে শিল্প কার্য্যের তত-বাহুল্যরূপে শিক্ষা হয় না। যদিও সংগীত এদেশে পূর্ব্বকালে চলিত ছিল, এক্ষণে কতিপয় পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের কন্যা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক কয়েকটি গান লিখিয়াছে। যখন শ্রান্ত বোধ হয়, তখন তাহার গান শুনিয়া আমি আরাম পাই। আপনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য পবিত্রতা ও আন্তরিক পবিত্রতা সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। এ কথাটি আমার মনে বড় ভাল লাগিয়াছে। যেমন নির্ম্মল বায়ু, নির্ম্মল বারি, পরিষ্কার গৃহ, পরিষ্কার পরিধেয়, উৎকৃষ্ট এবং বলদায়িনী মিতাহার শরীর রক্ষণার্থে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ পবিত্রচিন্তা, পবিত্র কার্য্য ও পবিত্র অনুশীলন ধর্ম্ম উন্নতির জন্য আবশ্যক।

এই পত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণকান্তের উইল" হইতে

...মর !

...য় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। ...বৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ...লিও।

আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয়, সকলই তুমি শুনিয়াছ। ...দি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার. আমি ...তামার মন রাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার ...াছে ভিখারী।

আমি এখন নিঃস্ব, তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত ...রিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

আমার যাইবার এক স্থান ছিল কাশীতে, মাতৃক্রোড়ে। মার ...াশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—হয়, তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার ...ার স্থান নাই—অন্ন নাই।

তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রা গ্রামে এ কালা মুখ দেখাইব,—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে নিরাপরাধে ...রিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার ...াবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন তাহার আবার লজ্জা কি? ...ামি এ কালা মুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী; ...াড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি ...ান দিবে কি? পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে ...া কি?

* * *

প্রণামা শতসহস্র নিবেদন বিশেষঃ,—

আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার, আমার হইলেও ...ামি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দান পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজেষ্ট্রী ...াপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা ...িদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রা গ্রামে আসিয়া আপনার নিজ ...ম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও ...াপনার, আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার ...াকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে ...ামার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন ...র্ব্বাহ হইবে।

আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি ...ালয়ে যাইব। যত দিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ...ত দিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ...জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট, ...পনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।

এই পত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিপ্রদাস" হইতে

সুচরিতাসু,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ী দাঁড়িয়ে, বললেন মাঝে মাঝে খবর দিতে। বললুম কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি পত্র লেখা সহজে আসেও না, ভাল লিখতেও জানি নে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে যান।

শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপরে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন দ্বিতীয় অনুরোধ করলেন না। হয় ত ভাবলেন, অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভাল কথা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে।

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন কিছু লিখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। সে-লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই?

দাদার ইষ্ট-দেবতা শুধু চোখ বুজেই থাকবেন চেয়ে কখনো দেখবেন না? অঘটন যা ঘটলো সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই?

দেখা গেল নেই—সেই শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললো তাঁর ভক্ত। নির্বাত নিষ্কম্প দীপ-শিখা আজও তেমনি উর্দ্ধমুখে জ্বলচে, জ্যোতিঃর কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিন দিন হলো দাদা বাড়ী ফিরে এসেছেন। সকালে যখন গাড়ী থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামল বাসু। খালি পা, গলায় উত্তরীয়। গাড়ী ফিরে চলে গেল আর কেউ নামল না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার—ঠিক অমবস্যার রাত্রির মত। বোধ করি মিনিট-দুই হবে, তারপরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নিচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন দ্বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্য ভাবে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে। মা কোথায়?

ঢাকায়। তাঁর মেয়ের বাড়ীতে।

ঢাকায়? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, আসতে হয় ত পারবেন না কিন্তু মাতৃদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বই কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকলো। তারপরে কেঁদে উঠলো। সে-কান্নারও যেমন ভাষা নেই চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশি হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও তোকে ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝাবার লোক পাবি কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক, বাপ না থাক কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারব না কিন্তু অস্বীকার করব না কখনো। আজ সব চেয়ে ব্যথা সব চেয়ে ক্ষতির দিনে এই রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াব না, কথার আছেই বা কি। ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, গোঁয়ার, মা বলতেন, চুয়াড়, কতবার রাগ করেছেন দাদা—অনাদরে, অবহেলায় কতদিন এ বাড়ী হয়ে উঠেছে বিষ, তখন বৌদিদি এসেছেন কাছে, বলেছেন, ঠাকুরপো, কি চাই বল ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েছি, কিছুই চাই নে বৌদি, আমি চলে যাব এখান থেকে?

কবে গো?

আজই।

শুনে হেসে বলেছেন, হুকুম নেই যাবার। যাও ত দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয় নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনিই গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্তেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে ঘটলো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হলো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবত—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সুবিধে কোথাও হলো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেইখানেই মারা গেলেন।

ব্যস্।

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হলো বলি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আর আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যান নি দাদা?

বললেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা-দশেক পূর্ব্বে পর্য্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেসা করলুম, সতী মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ! তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। বলো সব রইলো। ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘর। ছবি তোলাতে তাঁর ভারি লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকনো তাঁর আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবি নি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করি নি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্তই থাক তাঁর কথা।

এবার আসি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করি নি ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো আনা আনন্দই যদি ঘুচলো এক আনার জন্তে আর টানাটানি করব না। কিন্তু সে-ও আর হয় না— বৌদিদির মৃত্যু এনে দিল অলঙ্ঘ্য বাধা। বাধা কিসের? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হলো ভারি। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেছে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে বাসু উঠলো কেঁদে। তারে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়চেন। —কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেছিস বল? তাঁর পানে চেয়ে যা বলতে এসেছিলুম বলা হলো না। ভাবলুম, ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেছেন তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্য কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাদ্ধের পরে আপনি কোথায় থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে, যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরব না।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ সঙ্কল্প টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু অনুনয় বিনয়, কাঁদা কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ?

তারপর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনি নি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাই নি। মনে পড়লো আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন বন্ধুর যখন হবে সত্যিকার প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁছে দেবেন তাকে দোর গোড়ায়। বলেছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানি নে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে এক দিন সে আসবেই।

দ্বিজদাস।

এই পত্রখানি প্রমথনাথ চৌধুরীর "বীরবলের টিপ্পনী" হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কর্জ্জন, বড়লাট মহোদয়

প্রবলপ্রতাপেষু—

দিল্লীতে অপূর্ব্ব রাজ-দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, এই সংবাদে আপনার যাবতীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অধীনেরা যত দূর

আনন্দ অনুভব করিয়াছে, সেরূপ আনন্দ অনুভব করা এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের ত্রিশ কোটি অধিবাসীদিগের মধ্যে অপর কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, ভারতবাসীমাত্রেই স্বভাবতঃ কুণো, ঘরাও,—কেবল মাত্র আমরা দরবারী। আমাদের জীবন এক কথায় Club life. মদ্যপান একা ঘরে বসিয়া করা যায়, কাঁচা আফিংও একা চলে, কিন্তু সহপায়ী ব্যতীত গুলী খাওয়া চলে না। কাজেই মহামান্ত গুলীখোর সম্প্রদায়ের মেম্বর আমরা সকলেই মিশুক লোক; এবং আনন্দ অনুভব করা সম্বন্ধেও আমাদের সমকক্ষ আর কেহই নাই; কারণ, উহাই আমাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। হরিতানন্দের ভক্তেরা যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা আশু ও তীব্র হইলেও ক্ষণস্থায়ী; অপরপক্ষে আমাদের আনন্দ মৃদু হইলেও চিরস্থায়ী। আমাদের চিদাকাশে বাঁধা রোশ্‌নাই। আমরাই শুধু মশ্‌গুল হইতে জানি।

কিন্তু এই মহা আনন্দের মধ্যে আমাদের একটি আক্ষেপের কারণ ঘটিয়াছে। আপনি এই দরবারে রাজা, মহারাজা, জমিদার, দোকানদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ডাক্তার, এমন কি, সংবাদ-পত্রের সম্পাদককে পর্য্যন্ত সবান্ধবে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত শুভকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যদিও ইঁহারা কেহই সমজদার নহেন। কেবল মাত্র এই হতভাগ্যেরা ফাঁকে পড়িয়াছে। ইহাই আমাদের হরিষে-বিষাদের কারণ। আমাদের আপাততঃ এই বিনীত প্রার্থনা যে, আমরাও উক্ত দরবারে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা যেন পাই। তাহাতে আমাদেরও মনের দুঃখ দূর হইবে, দরবারও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা যে নিতান্ত অযথা ও অসঙ্গত নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের পরিচয় দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই আবেদন-পত্র হুজুরের হস্তে অর্পণ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি।

আমরা অহিফেনসেবী, শুধু সেবনের প্রকারভেদের দরুণ ভাষায় আমাদিগকে গুলীখোর বলে। অহিফেন সেবন এ দেশের একটি সনাতন প্রথা। উক্ত প্রথা অতি প্রাচীন কালেও যে প্রচলিত ছিল, হিন্দু-দর্শনই তাহার প্রধান প্রমাণ। এই অহিফেনের গুণেই পৃথিবীর সম্মুখে হিন্দু জাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই অহিফেনের প্রসাদেই চীনজাতি আমাদের কাছে চিরঋণী। ভারতবর্ষ পুরাকালে বৌদ্ধদর্শন নামক মানসিক অহিফেন দান করিয়া চীন দেশকে সভ্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা সত্ত্বেও পূর্ণ সভ্যতার পক্ষে তাহাদের যেটুকু বাকী ছিল, একালে আসল অহিফেন দিয়া তাহা পূর্ণ করিতেছে। আমাদের আসল বক্তব্য এই যে, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বহু কাল হইতে অহিফেন সেবন করিয়া আসিতেছে। গুলীর আড্ডায় বর্ণভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই—সেখানে আমরা অহিফেনের যোগসূত্রে সকলে সমান আবদ্ধ। সে বন্ধন ছিন্ন করে, এমন সামর্থ্য কাহারও নাই। ভারতবাসীদের একতার কেন্দ্রস্থল গুলীর আড্ডা এবং কালে গুলীর প্রচার যত বৃদ্ধিলাভ করিবে, আমাদের জাতীয় একতাও ততই ঘনীভূত হইয়া আসিবে। আমাদের দ্বারা এই যে মহৎ কার্য্যের সাহায্য হইতেছে, সেই জন্য আমরা হিন্দুস্থানবাসী মাত্রেরই—বিশেষত ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিতে পাই যে, এই দরবারের অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একতা স্থাপন করা। যেহেতু, আমরা উক্ত একতা সাধনব্রতে চিরদিন ব্রতী আছি—সেই জন্য এই অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যোগ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদেরই আছে।

দ্বিতীয়ত—আপনার সকল প্রজার ভিতর আমরা সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত। সর্ব্বসাধারণের ভিতর যেরূপ ও যে পরিমাণ রাজভক্তি বিদ্যমান, তাহা ত আমাদের আছেই, উপরন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, কারণ, যাহা আমাদের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান, অর্থাৎ—অহিফেন, তাহা আমরা উক্ত গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে লাভ করিয়া থাকি। আমাদের উপকারার্থে সরকার বাহাদুর অহিফেন চাষ করেন এবং যাহাতে আমরা খাঁটি মাল পাই, সেই জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অহিফেন প্রস্তুত করাইয়া, উক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের উপরেই তাহার প্রচলনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যখন Sir Joseph Pease-প্রমুখ ইংলণ্ডের জনকতক অরসিক ব্যক্তি আমাদিগকে অহিফেন হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন সরকার বাহাদুর "কমিশন" (আহা, ইচ্ছা করে, কমিশনের বালাই নিয়ে মরি!) বাহির হইয়া এই আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং এ দীনেরা যে কি কঠিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছে, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। যাঁহার ছিল—De Quincy,—তিনি বহু দিন হইল অহিফেন-লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত—আপনার প্রজাদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুশীল ও সচ্চরিত্র। অহিফেনের প্রসাদে আমরা একরূপ জীবন্মুক্ত। শরীরের ভাগ এতই কম যে, দূর হইতে আমাদিগকে লোকের ছায়া বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার উপর আমরা এত দূর মৃদুস্বভাব যে, ঘোড়া দেখিলে এক শত হাত দূরে থাকি, হাতী দেখিলে হাজার হাত এবং মাতাল দেখিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিই। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক ভীরুতা এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই আমাদিগকে এত সুশীল ও নিরীহ করিয়াছে। খুন, জখম, দাঙ্গা, হাঙ্গামা প্রভৃতি কোনরূপ দুঃসাহসের কার্য্যের ভিতর আমরা থাকি না। সুতরাং আমাদের নিকট হইতে সমাজের কিংবা শাসনকর্ত্তাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। সেই কারণে, সমাজ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু ভয় করে না। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইবার আমরা সম্পূর্ণ দাবী রাখি।

চতুর্থত—আমাদের নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলিও আপনার মতে যদি যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে নিম্নকথিত কারণকে আপনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দিল্লীর দরবারে সকল ভারতবাসী একত্র হইয়া পরস্পরের সহিত idea-র বিনিময় করিবে। ইহাই যদি দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বাদ দিয়া দরবার ঠিক Hamletকে বাদ দিয়া "Hamlet"এর অভিনয়ের মত। কারণ, ইহা জগদ্বিখ্যাত যে, ভারতবর্ষের মত original idea, সবগুলির আড্ডাতে জন্মলাভ করে। আমাদের wit এবং wisdom হিন্দুস্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট সুপরিচিত, তাহা ভারতের চির-আনন্দের সামগ্রী। আমাদের আড্ডা ideaর রাজ্য আমাদের মন খেচর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন লুক্কায়িত স্থান

নাই—যেখানে সে মনের গতিবিধি নাই। এ বিশ্বের ধূম্রে উৎপত্তি ও ধূম্রে বিলয়। তাই আমরা ধূম্রসেবী বলিয়া বিশ্বের সকল তত্ত্ব অবগত আছি। উক্ত কারণে এই দিল্লীর দরবারে, এই Idea-র বাজারে, আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করা উচিত।

পূর্ব্বে দরবারে যোগদান করিবার পক্ষে কি কি উপযোগিতা আছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। পরে, আমাদের কোনরূপে যে অনুপযোগিতা নাই, তাহাই জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত, আমরা অসন্তুষ্ট নহি। কারণ, শিক্ষার ধার আমরা ধারি না। বিশ্ব লইয়া যাহাদের কারবার, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। সরকারের চাকরীরও আমরা প্রত্যাশা রাখি না। ছিঁচকে চুরিতেই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা Congressওয়ালা নহি; কারণ, গুলীর আড্ডায় আমরা পৃথিবীর যত "রাজা রুজীর" মারি। বাহিরের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না। আমরা বক্তা নই; আমরা শুধু সার কথা বলি, সুতরাং স্বল্পভাষী। সংবাদপত্রের সহিতও আমাদের কোন সংস্রব নাই, কারণ, গুলীর আড্ডাই সকল সংবাদের জন্মভূমি; আমরা প্রতি জনে একাধারে Reuter এবং Times.

জনরব যে, দরবার Economic linesয়ে চালানো হইবে। সে হিসাবেও আমাদের কোন অনুপযোগিতা নাই। পূর্ব্বে আমাদের স্বভাবের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, হাতী-ঘোড়ায় আমাদের দরকার নাই। আমরা সকলেই মিতাহারী—আমাদের ঝোঁক শুদ্ধ দুধের দিকে। যখন এই দরবারে এত গরুর যোগাড় করা হইয়াছে, তখন আমাদের খোরাকের জন্য কোন ভাবনা নাই। দিল্লীতে শুনিতে পাই জলকষ্ট হইয়াছে। আমরা যেহেতু জল দেখিলে ডরাই, সেই জন্য জলের অনাটন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে বাধা হইতে পারে না। মেরু-বাস্ন আমরা নিজে যোগাড় করিয়া লইব। আর ছিটে, সে ত সরকার বাহাদুরের নিজ গুদাম হইতেই সরবরাহ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, অন্তত আপনার অনুষ্ঠিত Art Exhibition-এর জন্যও আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, আমরা হিন্দুস্থানের একটা বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পদার্থ। শেষ কথা এই যে, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ না করিলেও আমরা দরবারে উপস্থিত থাকিব, কারণ, আমরা রবাহূতের দল। তবে বিনা নিমন্ত্রণে আমরা প্রকাশ্য ভাবে যাইতে পারি না, ভদ্রলোকের বেশধারণ করিয়া যাইব—এই যা তফাৎ। ইতি—

সেবক

সাং বাগবাজার — শ্রীমহামান্য গুলীখোর সম্প্রদায়

কলিকাতা। — The Honourable Society

কার্ত্তিক, ১৩০১ — of Opium Smokers,
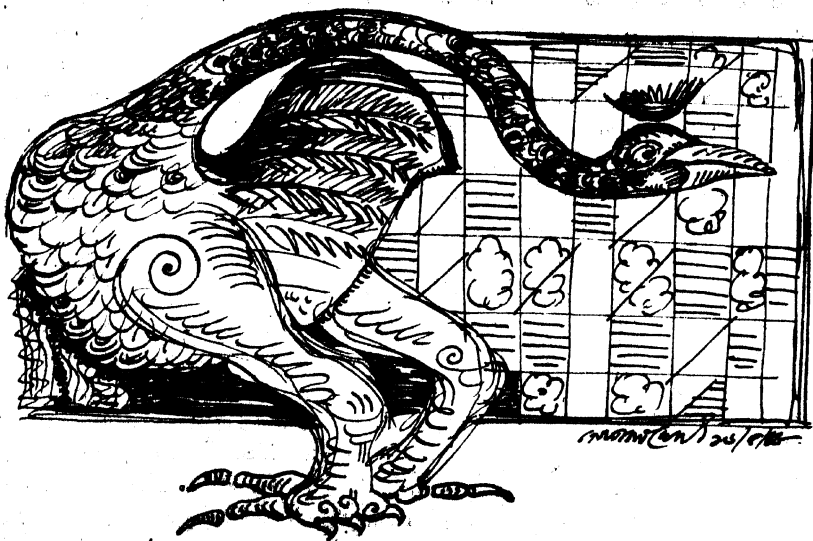
সরস্বতী —বিমলেন্দু অধিকারী
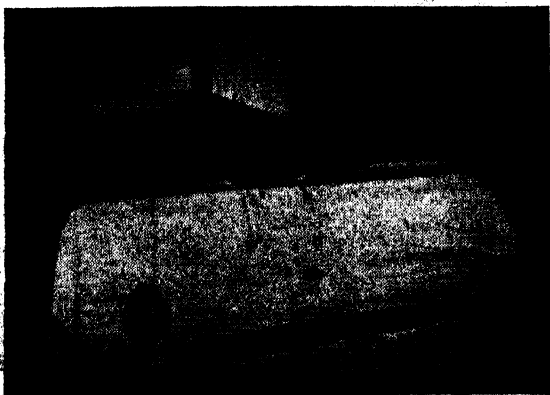
মুর্শীদকুলীর সমাধি

—অসিত চট্টোপাধ্যায়
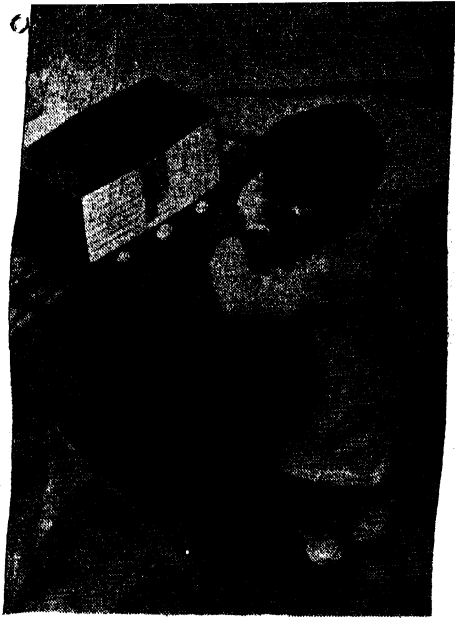
শ্রোতা —শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী
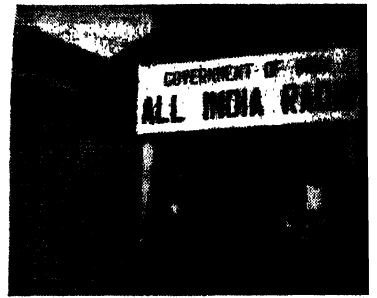
মূল কেন্দ্র ? —রণজিৎকুমার ভট্টাচ

ময়ূর

—কমলকৃষ্ণ সিংহরায়
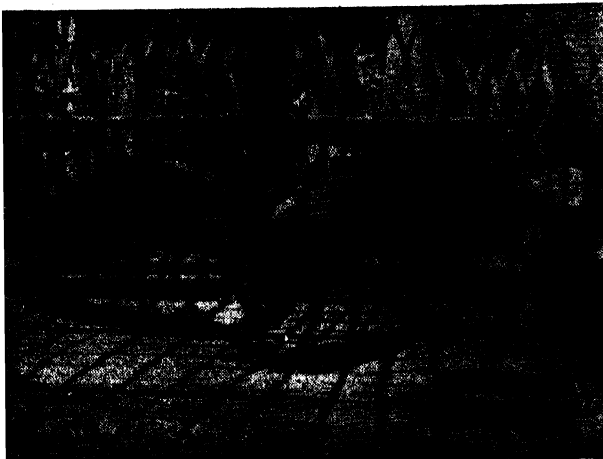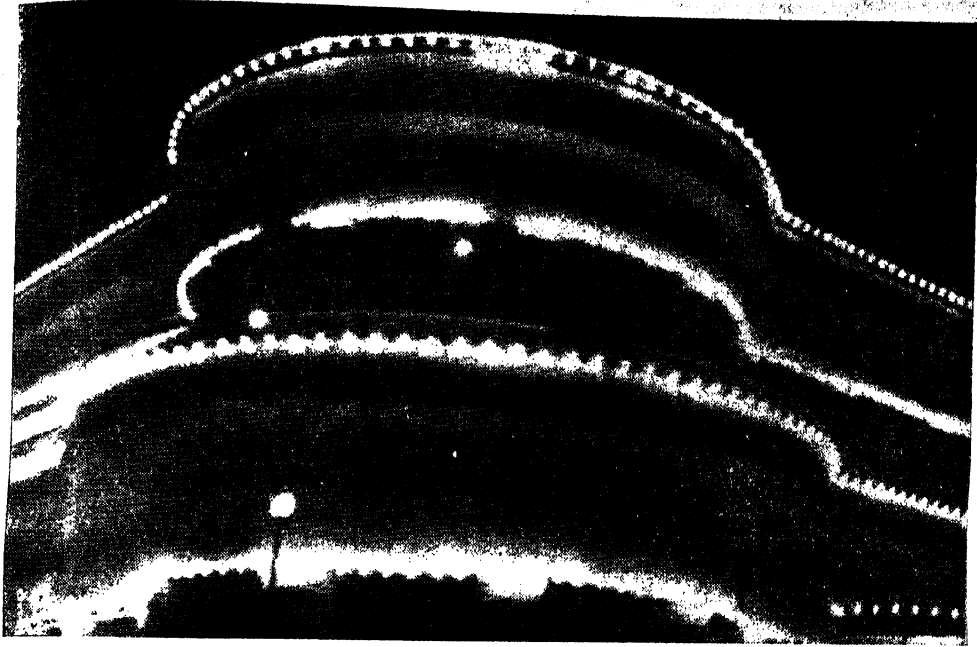
শহর কলকাতা —ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী
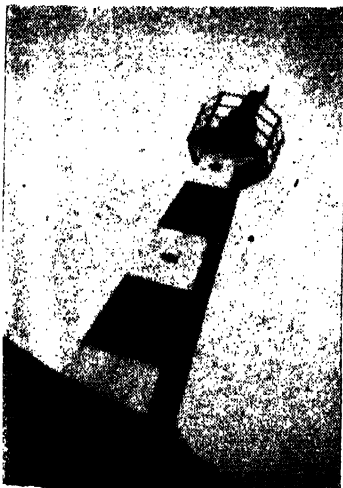
হরী —রঞ্জিত সরকার
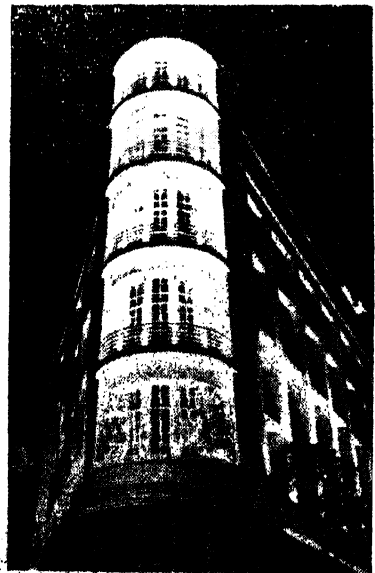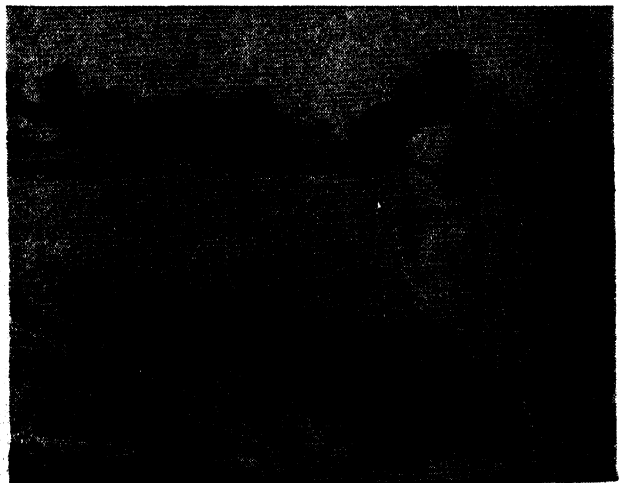
শহর কলকতা —প্রসাদকুমার বসু

চিংড়ি ভাণ্ড

—অনিলকুমার দাস

দিন শেষে

—পঙ্কজকুমার রায়

প্রাচীন

—গীতারাণী সিংহ-রায়

"লেখক, তুমি কে জানিনে। তোমার দৃষ্টি আছে, দরদ আছে, লেখনীর শক্তি আছে। আর ভরসা করি, তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায়ও আছে। আমি এক সাহিত্যাশ্রয়ী অকুণ্ঠে তোমায় নমস্কার জানাচ্ছি। তুমি আমার সগোত্র। আমাদের পরাজিত করো। আমাদের পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যাও। সাহিত্যগর্বী আমরা—পরাজয়ে অপমান মনে করব না, আনন্দোদ্ভাসিত চোখে অগ্রগমন দেখব।"

—মনোজ বসু
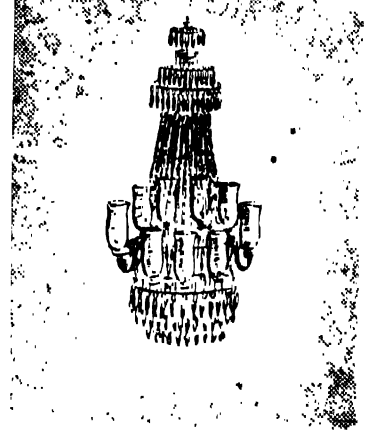
আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

নাম-করা লেখকদের গল্প-উপন্যাস পড়ি নে। নিজের লেখাও নয়। এটা ঔদ্ধত্য নয়, ঔৎসুক্যহীনতা। তাঁদের ধরণ-ধারণ জানি। অনেক বার পড়া বইয়ের সম্পর্কে অবহেলা আসে—এ-ও ঠিক তাই। অনামীদেরও পড়ি নে। ইস্কুল-মাষ্টারির প্রসাদাৎ পঙ্কোদ্ধার করতে হয়েছে অনেক। ঐ কর্মে এখন অরুচি নয়—আতঙ্ক জন্মে গেছে।

আমার শুধু নয়—খোঁজ নিয়ে দেখুন, সকল সাহিত্যিকেরই এই ব্যাপার। খোঁজ পাওয়া কঠিন অবশ্য। গল্প-উপন্যাস অর্থাৎ মিথ্যে কথাই লিখে আসছি—দু'টো মিথ্য কথা কি গুছিয়ে বলতে পারি নে? লেখকদের উপহার-দেওয়া বই সম্পর্কে অকুণ্ঠে চোখা-চোখা বিশেষণ প্রয়োগ করি, ধরা-পাড়া করলে দু'ছত্র লিখে দিতেও আপত্তি নেই। কিন্তু সে এমন সার্টিফিকেট—পড়তে চমৎকার লাগবে, পড়ার পরে সারবস্তু খুঁজে পাবেন না এক কণিকাও। অধ্যবসায়ী কেউ যদি খুঁটিনাটি নিয়ে দেখা করতে চান, তখনই বিপদ। নিঃসংশয়ে পাশ কাটিয়ে পালাব। অর্থাৎ প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন লেখকেরই গল্প-উপন্যাস পড়া ঘটে ওঠে না বড়-একটা।

অ-আ-ই 'আকাশ-পাতাল' লিখছেন মাসিক বসুমতীতে। লেখক নতুন না পুরানো? জানি না। জানবার জন্য কৌতুহলীও নই। 'আকাশ-পাতাল'ই তাঁর পরিচয় হয়ে থাকুক। সুপ্রতিষ্ঠ লেখককেও ছদ্মনাম নিয়ে নতুন ঢঙের লেখা লিখতে দেখা গেছে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—আমাদের পরম সম্মান ও সমাদরের বুড়ো দাদা—'জাতক' লিখতে শুরু করলেন মহাস্থবির নাম নিয়ে। এর সঙ্গে তাঁর আগেকার সাহিত্যকর্মের মিল নেই—অতএব নতুন নাম নিয়ে ঠিকই করেছেন তিনি। 'প্রেমাঙ্কুর আতর্থী' চিহ্নিত লেখা মুগ্ধ মন নিয়ে কখনো পড়তাম না—লেখক সম্পর্কীয় ভালো-মন্দ সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে থাকতাম, মন এত দূর দোলায়িত হত না নিঃসন্দেহ। 'যাযাবর' 'রঞ্জন' ইত্যাদি ছদ্মনামীরা ইদানীং চমক দিয়েছেন মাসিক বসুমতীতে। অকপটে স্বীকার করি, অ-আ-ই নামটাই আমাকে প্রলুব্ধ করল 'আকাশ-পাতাল' পড়তে।

একটি সংখ্যা মাত্র পড়েছি। অগ্র-পশ্চাৎ জানি নে—উপন্যাসটা শেষ অবধি কি রকম দাঁড়াবে, কিছুই বলতে পারি নে। অংশবিশেষ পড়ে সমালোচনা চলে না। আর সমালোচক নইও আমি। এ আমার পরম ভাগ্য। ভাল-লাগা মন্দ-লাগা একান্ত ভাবেই আমার। কেন ভাল লাগল—এ তথ্য নিরূপণ আমার কাছে বাহুল্য। একটি মাত্র কিস্তি পড়েই বিস্ময়োৎফুল্ল হয়েছি—বন্ধু-স্বজনের কাছে আনন্দ প্রকাশ করেছি, সম্পাদকের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টেলিফোন যোগে অভিনন্দন জানিয়েছি লেখকের উদ্দেশে। তার পরে সম্পাদক অনুরোধ করলেন, আমার মুগ্ধতার কথা একটুখানি লিখে জানাতে। তাতে লেখকের উৎসাহ বাড়বে। তা যে হয়, আমি জানি। সাহিত্যরাজ্যে প্রথম সসঙ্কোচ পদক্ষেপের কথা মনে পড়ে। অজস্র প্রেরণা পেতাম অপরের প্রশংসায়। আমার ভাল লেগেছে, নতুন কালের সাহিত্যশিল্পীর সবল পদধ্বনি শুনতে পেলাম একটুখানি ঐ লেখার মধ্যে। আগাগোড়া পড়বার জন্য লোভান্বিত হয়ে আছি—মুগ্ধ কণ্ঠে বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

মুশকিল হল, সেই এক খণ্ড বসুমতীও কোথায় লোপাট হয়ে গেছে, কোন্ সংখ্যা তা-ও খেয়াল নেই। কয়েকটা ছবি শুধু জলজ্বল করছে চোখের সামনে। কোন এক বাড়ি—তার কত ঐশ্বর্য, কত মহিমা! ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টা বেজে-বেজে উঠছে, ধুচুনি-লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করছে খানসামা···সারকুলার রোডের কবরখানায় কবর খুঁড়ছে ওদিকে লিলিয়ানের!···কে অমন্তরাম, কে কৃষ্ণকিশোর, কে বিনোদা, কে-ই বা লিলিয়ান—কিছু জানি নে। ছবি নিখুঁৎ, তা বলছি নে। আমি হলে এ রকমটা লিখতাম না ঠিক।

এইটেই পরম আশ্বাসের কথা যে কারো অনুকরণ নয়। নিজের চোখ দিয়ে দেখা, নিজের মন ও কলমে আঁকা। জমজমাট আসরের একটুকু মাত্র একবারই আমি উঁকি দিয়ে দেখেছি। লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছেন একটি বধূ—ঘন কৃষ্ণ কেশদাম পিঠে এলিয়ে পড়েছে, হাতে লাল-গালা ও সোনার চুড়ি। গলায় আঁচল-জড়ানো যুক্তপাণি আর এক জন বসে তাঁর সামনে। পিলসুজে আলো। পড়ার শেষে কলম দিয়ে চিহ্নিত করলেন অংশটা···

বসুমতীটা খুঁজে পাচ্ছি না—তা হলে উদ্ধৃত করতাম জায়গাটা। আমি চোখে দেখেছি সেকালের এই ছবি। আমি চিনি ঐ পাঠরতা বধূ ও ভক্তিমতী শ্রোত্রীকে। আমি যেন কানে শুনতে পাই পুঁথির মৃদু গুঞ্জন। সে পিলসুজের আলো নিবে গেছে চিরদিনের মতো। ঘনান্ধকারে দেখতে পাবো না ঐ বধূদের! বিদ্যুতের মতো ক্ষণিকের জন্য শুধু ঝলক দিয়ে উঠলেন তাঁরা লেখনী-মায়ায়। লেখক, তুমি কে জানি নে। তোমার দৃষ্টি আছে, দরদ আছে, লেখনীর শক্তি আছে। আর ভরসা করি, তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায়ও আছে। আমি এক সাহিত্যাশ্রয়ী অকুণ্ঠে তোমায় নমস্কার জানাচ্ছি। তুমি আমার সগোত্র। আমাদের পরাজিত করে। আমাদের পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যাও। সাহিত্যগর্বী আমরা—পরাজয়ে অপমান মনে করব না, আনন্দোদ্ভাসিত চোখে অগ্রগমন দেখব।—মনোজ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাত্রি গেল কোথা দিয়ে।

কেউ জানে না। মা-ও নয়, ছেলেও নয়। কুমুদিনী নির্জ্জলা উপবাসের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজের সংসার আর ছেলের সম্বন্ধে ক'বার দেখেছেন কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। শুধু ঐ ছেলের জন্যে হতাশা, লজ্জা আর অপমানের অসংলগ্ন সব কাহিনী। এই বংশের মর্য্যাদা আর গৌরবহানির। মাঝে-মাঝে ভেঙ্গে গেছে ঘুম, ঘুম-চোখে দেখেছেন জানলার বাইরের আকাশ। নিঃসীম অন্ধকার। দেখে আবার মুদিত করেছেন চোখ। আর ছেলে কখন ঘুমিয়েছে জাগেনি এক বারও। অকাতরে ঘুমোচ্ছে এখনও।

আকাশে শুকতারা জ্বলছে দপ্‌দপিয়ে।

একেশ্বরের দম্ভ যেন তার দ্যুতিতে। সারা আকাশে এখন আর কোন তারা নেই, শুধু ঐ শুকতারা জ্বলছে দপ-দপ। শয্যা থেকে উঠে ঘরের এক কোণের তেল-ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপটা নিবিয়ে দেন ফুঁ দিয়ে। তার পর দরজার অর্গল খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন। সামনের বারান্দায় এক জন দাসী ঠিক যেন মরার মত পড়েছিল। নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কুমুদিনী ডাকলেন,—দাসী ও দাসী!

ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো দাসী। কুমুদিনী বললেন,—কোচমানকে বল, গাড়ী চাই এখুনি। আমি নিজে যাবো। আর বিনো'কে গামছা-কাপড় সঙ্গে নিতে বল। নৈবিদ্যির ঘরের চাবি খুলতে বল বামুনদি'কে।

সূর্য্যোদয়ের আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে।

বৈশাখের বেলা, কড়া রৌদ্রের তেজ। ফিরতি পথে ঐ ঘোড়া দু'টো কত কষ্ট পাবে। তাও পথ যদি সামান্য হত। কতটা যেতে হবে। সে কি এখানে? কলকাতা শহর ছাড়িয়ে আরও কতটা। গেলে কি খালি-হাতে যাওয়া যায়। শূন্য হাতে? উপচার চাই চাই ফল, ফুল আর রূপোর টাকা। লালপাড়ের বস্ত্র একখানা। দেশী চিনির মিষ্টান্ন। গঙ্গাজল। রাত থাকতে উঠে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কুমুদিনী। এ-বাড়ীর ঘর-দোর তাঁর চেনা, নয় তো এই অন্ধকার দুর্গ-পুরীতে কেউ পারে চলতে-ফিরতে। কুমুদিনী জানেন এ বাড়ীর কোনখানে সাবধানে না চললে হোঁচট খেতে হয়। কোন্ দরজায় মাথা নীচু না করলে কপাল ঠুকতে হয়। পরিচয়? জীবনযাত্রায় যে শুভ দিনে এক থেকে দু'য়ে মিলিত হয়েছেন, সে দিন থেকে জানা-শুনা হয়েছে এই গৃহের সঙ্গে। তাঁরা দু'টিতে যেদিন একসঙ্গে এসেছেন, সেই প্রথম পদার্পণ থেকেই দেখছেন। তার পর যেদিন দুই থেকে এক হলেন, সেদিন থেকেও তাঁকে দেখতে হচ্ছে। কি করবেন না দেখে। উপায় কি? তাই চোখ বন্ধ ক'রেও হয়তো চলা-ফেরা করতে পারেন এই প্রাসাদের সর্ব্বত্র।

কোথাকার কোন্ খিলানে কবুতরের ডাক শুরু হয়েছে। বক্‌বকম্‌ করতে শুরু ক'রে দিয়েছে এই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে।

রাস্তা থেকে শব্দ আসছে ছুটন্ত গাড়ীর। ডাষ্টবিনের যত সব ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলো বেরিয়ে পড়েছে। চাকার উৎকট শব্দ শুনে হয়তো জেগে উঠেছে শহরবাসী। আকাশের পুব কোণে বোধ হয় একটু গোলাপী রেখা ফুটে উঠলো এতক্ষণে। একটু বা আলোর বিকাশ সেই সঙ্গে।

দাসী-মহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। যে যার উঠে পড়ে। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করবেন গৃহকর্ত্রী। দাসীরা সবাই জানে এই দিনটির বিশেষ মূল্য। পুরানো আমলের যারা, তারা মুখে গুলপোড়া দিয়ে এখনও বসে থাকে কেউ-কেউ। ঘুমে ঢুলতে থাকে।

উপচার জোগাড় করতে যতক্ষণ সময় নেয়। বিনোদাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুদিনী গাড়ীতে উঠে বসেন। গাড়ীর জানলা বন্ধ হয়ে যায়। দরজাও। কোচম্যানের পাশে উঠে বসে এক জন পাইক। তকমা-আঁটা পোষাক তার। আকাশ শুভ্র হওয়ার আগেই যাত্রা হয়। টন্‌-টন্ শব্দ করতে-করতে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছোটায় আবদুল। ভোরের ফাঁকা রাস্তা কাঁপতে থাকে যেন ঘোড়া দু'টোর তীব্র পদক্ষেপে। রাস্তার দু'-পাশের টিমটিমে আলোগুলো জ্বলছে তখনও মুমূর্ষুর হৃৎপিণ্ডের মত।

সবাই ঘুমোয়। এ-বাড়ীর কুকুরটি পর্য্যন্ত।

শুধু ঘুম আসে না কি ঐ ঘড়ি-ঘরের চোখে। রাত ফুরিয়ে যাওয়ার নির্লজ্জ নিশানা শোনায় ঘড়ি-ঘর। ভোরের আলো-আঁধারি আবহাওয়াকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে ঘড়ি-ঘর কয়েক ক্ষণের জন্যে তান ধরে। এ তল্লাটের সকলে জানতে পারে ক'টা বাজলো।

একটা কাকও যেন ডাকলো না? বাগানের কোন গাছে হয়তো। ফুরফুরে হিমেল বাতাস। যেন ভাসিয়ে নিয়ে এলো কাকের ডাক। গাছের কচি-কচি পাতা আর মাটিতে দূর্ব্বা। কাঁপছে সেই হাওয়ায়।

কাছারীর গোমস্তাদের কে এক জন হাঁফানিতে ভুগছে। এ্যাজ্‌মা হয়েছে তার। সে শুধু একটি মানুষ, কাশছে বুকে হাত দিয়ে। বিরাম-বিহীন কাশির বেগ। আর আর গোমস্তারা তাদের ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে সব বিরক্ত হয়ে উঠছে। কেউ বা পাশ ফিরে আবার এক ঘুম দেওয়ার জন্যে তৎপর হচ্ছে।

কাক ডাকলো আবার। একসঙ্গে অনেক কাক। কাছাকাছি ডাকছে বাগানে, দূরেও ডাকছে। যেন এক পূজার মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে তারা। আপন ভাষায়। ডাকছে হয়তো ঐ ঈশ্বরকেই, যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান।

আকাশের একটা দিক্ হঠাৎ কাঁচা রূপো ছড়াতে শুরু করলো। কে এক জন আসছেন, তাঁর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করলো যেন লোহিত রেখায়।

সপ্ত অশ্ব আসছে। সুষুপ্তিকে বিদীর্ণ করে তারা বহন ক'রে আনছে সহস্রচক্ষু সবিতা দেবতাকে। শহর কলকাতা যেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে রয়েছে ঐ দিকে।

এমন সময় সানাইয়ের বাঁশীটা শুধু একবার বেজে উঠলো। শুধু বাঁশীটা। সানাইওলা সুর পরীক্ষা করছে এক বেসুরো সুরে। এবার একটা তান ধরবে। প্রতিবেশীর একটি মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তার পতির ঘরে যাত্রা করবে। তারই জন্যে এই বাজনার কান্না শুরু হবে। বিয়ে-বাড়ীর ক্লান্ত মানুষদের ঘুম ভাঙবে ঐ সানাইয়ের সুরে। খানিক্ষণের মধ্যেই সানাই শুরু হ'ল। কি একটা ভোরের তানের গান ধরলো!

ছেলের ফিরতে দেরী দেখে শয়ন-ঘরেই রাত্রির আহার ঢেকে রাখতে বলেছিলেন কুমুদিনী ব্রাহ্মণীকে। ছেলে তার সব খায়নি। কিছু-কিছু খেয়েছে। যেন ঠুকরেছে। রাতের এঁটো থালা-বাটি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। সাফ করবার ফুরসৎ পায়নি কেউ। রাত্ত বেশী হওয়ার দরুণ দাসীরা আর কেউ পেড়ে নিয়ে যেতে আসেনি।

ঘরের ভেতর সূর্য্যালোক পড়েছে পূবের জানলা দিয়ে। ঘুম থেকে জাগতেই সারা শরীরে যেন জ্বরের জ্বালা অনুভব করলে কৃষ্ণকিশোর। কেমন যেন জড়তায় ক্লান্ত সর্ব্বাঙ্গ। অন্য দিনের মত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে না। শুয়ে থাকে পূবের জানলায় চোখ চেয়ে। গত রাত্রির কিছু-কিছু ঘটনা মনে পড়ে। মনে পড়ে সানাইয়ের সুর আর আইভিলতার বিয়ে হয়ে যাওয়া। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন চাপা অভিমানের তোলপাড় শুরু হয়। আর দেখতে পাবে না তাকে, যাকে রোজ দেখতে পাওয়া যেতো। আর দেখা দেবে না রোজ দেখা দিতো যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে। আইভিলতার একেক বেশ ভেসে ওঠে যেন চোখের সামনে। একেক দিনের গম্ভীর, আর একেক দিনের হাসি-খুশী মুখ।

প্রেম নয়, স্নেহ। মায়া নয়, মমতা। কত দিন থেকে দেখছে ঐ আইভিলতাকে। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন তাই ব্যাকুল আলোড়ন। না পাওয়ার বিরহ? না, দেখতে না পাওয়ার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা।

দরজা খুলে ভেতরে আসে অনন্তরাম। বলে,—ইদিকে যে সাতটা আটটা বাজলো। ঘুম কি আর ভাঙবে না না কি!

দরজা খোলা পেয়ে টমও এসে ঢুকলো। ঘরের ভেতর বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে বসলো এক পাশে। চার পা ছড়িয়ে আলস্য ভাঙলো দেহের। চোখ দু'টো পিট-পিট করলো।

অনন্তরাম বললে,—উদিকে মা আবার গেলেন যেন কমনে।

মা! কুমুদিনী। এ বাড়ীর কুমু। কোথায় আবার গেল এমন অসময়ে! বলা নেই, কওয়া নেই চলে গেল!

—গঙ্গাস্নানে গেলেন? মায়ের ছেলে প্রশ্ন করে।

অনন্তরাম বলে,—কে জানে কোথায় গেলেন। পাল্কীতে নয়, তোমাদের পক্ষীরাজে গেলেন।

একেক সময়ে কি মনে হয়, যে যা নয় তাকে তাই বলে অনন্তরাম। সামান্যকে অসামান্যরূপে বর্ণনা করে। জুড়ীকে তাই বলে পক্ষীরাজ। শুধু পক্ষীও নয়, আবার পক্ষীরাজ।

—পিসীমার কাছে গেলেন? ছেলে শুধোয়। বলে,—হ্যাঁ, তাই গেছেন। কোথায় আবার যাবেন?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ, তা যেতে পারেন। ঠিক বলেছিস্ তুই।

গাড়ী তখন প্রায় সীঁথির কাছাকাছি।

সম্রাট শেরের বানানো রাস্তা ধরে সোজা ছুটে চলেছে উর্দ্ধশ্বাসে। আর বেশী দূরে নয়! যাত্রার সময় শুধু পাড়ার কাছাকাছি এক জনদের বাড়ী থেকে তুলে নিয়েছেন এক জনকে। একটি বৌকে, যে কয়েক সন্ধ্যায় এটা-সেটা পড়ে শুনিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করিয়েছে কুমুদিনীকে, অপূর্ব্ব রূপবতী সেই পাঠরতা বধূটিকে। বধূটি জাতে ব্রাহ্মণ। রূপে ও রুচিতে, শিক্ষা আর দীক্ষায় এ তল্লাটের মেয়ে-মহলে পরিচিত। পরম ভাগ্যবতী। কুমুদিনী তাকে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যেন। এক দিন আসতে তাই বলেছেন, আবার যেন আসো।

এখন নাম ধরে ডাকেন কুমুদিনী। বধূটির নাম পূর্ণশশী। শশী নামেই তাকে ডাকা হয়। ভাগ্যবতী এই জন্য যে স্বামী তার জহুরী মহলের এক জন। অবশ্যই জহুরী মানে, জহরৎ নিয়ে ঠিক কারবার নয়, প্রত্নতত্ত্বই হল তাঁর গবেষণার একমাত্র বিষয়। কি ঠিক, কি ঠিক নয়; কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা ভুল নয়, শুধু এই বিচারেই তিনি দিবানিশি রত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করেন।

বিলেতী পত্রিকায় স্রেফ, বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-রচনা পাঠিয়েই শশীর স্বামীর উপার্জ্জন। প্রচুর অর্থ না কি তিনি উপার্জ্জন করেন। শশীর গায়ে তাই এত গয়না। 'লণ্ডন নিউজ' পত্রিকায় শশীর স্বামীর ছবি বেরোয়। শশীর এক পুত্র, এক কন্যা। শশী তাদের এখন নীতি-পাঠ পড়াচ্ছে। তারা নেহাৎই শিশু। আধো-আধো কথা কয়।

গাড়ীর ভেতর তিন জন। কুমুদিনী, ঐ শশী আর বিনোদা। কথা হচ্ছে, ছেলে গত রাত্রে ফিরলো কখন তাই নিয়ে। লাখো কথা বলছেন কুমুদিনী ছেলের মতি-গতি সম্বন্ধে। শশী হাসতে হাসতে শুনছেন। আর মাঝে-মাঝে ফোড়ং কাটছে বিনোদা।

বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে বিদ্যাসাগরের জননীর মত নারী অসংখ্য আছেন। তাঁদের ছেলেরা হয়তো সবাই এমন কিছু বিদ্যাসাগরের মত কেউ হয় না। এই কুমুদিনী, ঐ শশীর মত নারীও হয়তো আছেন। কিন্তু, ঐ ঘর-জ্বালানো বিনোদার মত চরিত্রের যদি কেউ থাকে, যে কোন সংসারের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। ঐ বিনোদার মত অজ্ঞ, নিরক্ষর, হীনমনা অশিক্ষিতারা অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে তোলে কত ঘরে। রাতকে দিন করে আর দিনকে রাত।

বিনোদা বলছিল,—তা, তা তুমি যতই বল, তুমি কি মনে করেছো তোমার ছেলে এখনও ঠিক আছে? বিগড়ে গেছে, নয়তো শুধিয়ে ওঠা মিথ্যে! দেখে নিও।

কুমুদিনী চোখ দু'টোকে শুধু একবার পাকালেন। বললেন না আর কিছু?

বিনোদা থামলো না। বললে,—কোথায় গিয়ে কুচ্ছিৎ অসুখ-বসুক হবে। তার চেয়ে একটা মেয়ে দেখে এই বেলা বিয়ে দিয়ে দাও।

শশী যেন লজ্জানুভব করলেন কথাগুলি শুনে। তাঁর মুখ থেকে হাসি অপসৃত হ'ল। বললেন,—ছিঃ, কি যেন বল ঝি। দুধের ছেলে বৈ তো নয়?

মেয়ে দেখা। একটা মেয়ে। শুধু যেন দেখবার অপেক্ষায়। শুধু মুখের কথায়!

কাছারীর দিকে এগোচ্ছিল ছেলে তখন।

মা পিসীমার ওখানে গেছেন মনে করে একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে কাছারীতে চলেছিল। কাজ দেখতে কিংবা বুঝতে নয়, কাছারীতে গিয়ে শুধু বসতে। কড়িকাঠের চালিতে স্তূপাকার খাতা-পত্র। খেরোর কাপড়ের একেকটা চৌক পুঁটলি। হস্তাক্ষরে লেখা আছে কোন্ সালের কোন্ নম্বর। পুরানো দলিল-পত্র। একটা অদ্ভুত বিচিত্র গন্ধ আছে যেন এই কাছারীতে। পুরানো কাগজ-পত্র আর তামাকের গন্ধ। বয়স্ক আমলারা কেউ-কেউ তামাক খান চোখে চশমা এঁটে। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে আছে নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত। রূপোয় বাঁধানো থেলো হুঁকো আছে। একেক জন আমলা কাজ করছেন এক খাতা নিয়ে নয়। সামনে খোলা রয়েছে তিন-চারখানা খাতা। একটু বেলা হতেই যে যার সব কাজে বসে গেছেন। আবার কেউ-কেউ আপন অভ্যাস বশতঃ ছোলা আর আদা চিবোচ্ছে এখনও। এইবার বসবেন, তারই তোড়-জোড় করছেন।

আর কড়িকাঠের চালিতে স্তূপাকার খাতা-পত্র। পুরানো আমলের সব জমাবন্দি, কড়চা, সেহা, রোকড়। খাস-খরিদা আর বন্দোবস্তের রেজিষ্ট্রী, নামপত্তন আর খারিজের রেজিষ্ট্রী, বাকি জায়। বয়নামা আর দাদনের রেজিষ্ট্রী। আমানত আর জামিনের মকদ্দমার, ভাউচার আর অ্যাডভাইস ফরম। জমা-ওয়াশীল-বাকি। একসঙ্গে একত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় রয়েছে। আর আছে একটা বোলতার বাসা। কোথায় এক পাশে, ঐ চালিতে। একটা বোলতার নয়। একটা বাসা। অনেক বোলতা আছে সেখানে। তারা না কি ক্ষতি করে না কারও। এক কথায়, পোষমানা বোলতা, তাই কারও দৃক্‌পাত নেই।

হুজুর বসে আছেন কাছারীর ফরাসে। একখানা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন। গোমস্তাদের কে এক জন আবার থিওজফি সোসাইটির মেম্বর। তিনিই নিয়ম মত তত্ত্ববোধিনী সংগ্রহ করেন। হালের সংখ্যা একখানা ফরাসে পড়েছিল।

এক জন পাইক এসে জানালে,—হুজুর, মেসোমশাই আসছেন।

সমস্ত কাছারী যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। মেসো মশাই আসছেন, কৃষ্ণকিশোর পায়ে জুতো গলিয়ে চললো সেদিকে। অভ্যর্থনা করতে গেল। একেই মা আবার নেই।

মেসো মশাই। ঠিক হুলো-বেড়ালের মত চেহারা। পাকা চুল, পাকা ভ্রূ, পাকা গোঁফ ভুঁড়ো শিয়ালের মত। চশমার কাচ দুটো ভীষণ রকমের পাওয়ারফুল। ঠিক কোন দিকে তাকিয়ে থাকেন ধরা যায় না। কৃষ্ণকিশোর জানে, কুমুদিনীই এই মানুষটিকে এড়িয়ে থাকতে চায়। নিজের বাপের বাড়ীর মানুষ হলে কি হবে।

মেসো মশাই কত বার আসেন। আর দেখতে চান না কি কুমুদিনীর নিজস্ব দলিল-পত্র। কুমুদিনী কখনও দেখান না। বলেন—সে-সব কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে তার ঠিক নেই। প্রথমটায় নাছোড়বান্দা হন মেসো মশাই। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতেও যখন হয় না তখন ব্যথাহত মুখে গোটা কয়েক মিষ্টি খেয়ে বিদায় নেন। মেসো মশাই আসেন কেমন যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, দেখলেই তা বোঝা যায়। শুধু ঐ দলিল-পত্র দেখবার উদ্দেশ্য। এষ্টেট সরকার দেখা-শুনা করছেন, সেদিকে আর চোখ দেননি। কুমুদিনীর হাতে নগদে আর কাগজ-পত্রে কত কি আছে তারই খোঁজ করেন।

মেসো মশাই যখন এসেছেন তখন তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে হয়। সাত-সকালে এসে পড়েছেন। কুমুদিনী নেই জানতে পেরে আর বসলেন না। বললেন,—মা এলে বলবে যে নিবারণ এসেছিল। একটু বিশেষ দরকার ছিল। বলবে, আবার এক দিন আসবো। তা তোমার কি করা হচ্ছে এখন?

কৃষ্ণকিশোর বললে আমতা-আমতা সুরে—পড়ছি আর কাজ শিখছি সেরেস্তায়।

—তা বেশ বেশ। হ্যাঁ, দু'টোই তো আবার দরকার। পড়াও যেমন দরকার, তেমনি ঠিক সেরেস্তাটাও দরকার। মেসো মশাই কথা বলতে-বলতে এগোলেন ফটকের দিকে। গোঁফের একটা দিক পাকাতে-পাকাতে।

ফটকের কাছে আসতেই দেখা যায় ওদিকের রাস্তায় জনারণ্য। আট ঘোড়ার গাড়ী। কাগজের ফুলের অশ্বরথ। ব্যাণ্ডপার্টি। ব্যাগপাইপ আর রসুন-চৌকিওলাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে কত লোক। প্রতিবেশীর একটি মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাবে, তারই জন্যে এই আনন্দ-বাদ্যোৎসব।

তবুও কোথায় যেন দুঃখের রেশ দেখা দেয় কারও কারও মনে। মেসো মশাইকে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণকিশোর ফিরে আসে তখুনি দেখে-শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। আর গম্ভীর হয়ে যায়।

কাছারীতে ফিরে আবার সেই তত্ত্ববোধিনীর পাতা ওলটায়। অদ্বিতীয়মের কি এক ব্যাখ্যা পড়তে থাকে। পড়তে থাকে না আরও কিছু। মুখে কিছু বলতে পারছে না। অর্থাৎ মুখ দিয়ে কথা আর বেরোচ্ছে না ছেলের। নির্ব্বাক্ তাকিয়ে আছে শুধু বইয়ে।

—দাদা বাবু? দাদা বাবু আছো না এখানে?

কাছারী-শুদ্ধ চমকে ওঠে যেন কথা শুনে। দরজার কাছে এসে পড়েছে। ডাকছে,—দাদা বাবু!

কৃষ্ণকিশোর সাড়া দেয়,—কে?

—আমি কান্না দাদা বাবু। একবারটি শুনে যাও।

এতটা বুঝতে পারেনি। কৃষ্ণকিশোর তাড়াতাড়ি উঠে যায় তার কাছে। বলে,—কি বলছো?

কান্না নয়, কানা।

কথা বলার দোষে কানা কেমন টেনে-টেনে কথা কয়। কাঁণাকে বলে তাই কান্না। কান্নাও ঠিক নয়, কান-ন্-না। অন্ধ, তাই তার নাম হয়ে গেছে কানা। এ বাড়ীতে খায়-দায়-থাকে। বস্তা-বস্তা সুপুরীর খোসা ছাড়ায়। জাঁতায় ডাল ভাঙে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেওয়াল ধরে ধরে চলে তার নির্দ্দিষ্ট সীমানায়।

—ক' গণ্ডা পয়সা দেবে দাদা বাবু? জিজ্ঞেস করে কানা। কাকুতির সুরে।

—কেন, কি করবি পয়সায়? এক জন গমস্তা রাশভারী গলায় শুধোয়।

কানা বলে,—একখান্না প্রথম ভাগ আর একখান্না ধারাপাত কিনবো দাদা বাবু। আমি লেখাপড়া শিখবো ন্না!

কানার কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হয়। চোখ নেই, নেই দৃষ্টি, তবে আবার পড়বে কোন্ চোখে! কানা দেখবে হাতী? সকলেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে তার কথায়।

—আমাকে যে পড়াবে বলেছে নায়েব বাবু। কানা সলজ্জায় বলে।

গমস্তাদের যিনি পড়াবেন বলেছিলেন তিনি সহাস্যে বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে'খন। তুই এখন যা, কাজ করতে দে।

কানা বুঝতে পারেনি নায়েব বাবু একটা মস্করা করেছিলেন তার অন্ধত্বের সুযোগে। কানা বলে,—তুমি আমাকে বললে না সিদিন? চোখ নেই তোর, শুনে-শুনে তুই পড়বি। এই তো কত কথা বললে, পড়াবো, পড়িয়ে তোকে মানুষ করবো। বই কিনতে বললে। বললেন্না? এখন আর কথা বলছোন্না কেন ভুজঙ্গ বাবু?

ভুজঙ্গ বাবু আবার হাসলেন খানিক। নিজের রসিকতায় হাসলেন। কানা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেল সুপুরীর খোসা ছাড়াতে। আর আর সকলে একবার দেখলেন ভুজঙ্গকে। বিতৃষ্ণ নয়নে।

কাছারীর আবহাওয়াটা কেমন যেন বিসদৃশ হয়ে উঠলো এই কয়েক মুহূর্ত্তে। সকলের মনেই কিছুটা দয়ার সঞ্চার হল। কানা আপন মনে কি সব বলতে বলতে নিজের আস্তানার দিকে চললো ধীরে-ধীরে। কাছারী-ঘরের ঘড়িটা শুধু বেজে চললো টকাটক শব্দে।

কারা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এই কাছাকাছি কোথায়।

রণ-দামামার মত একসঙ্গে বাজলো ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ আর পিকলু। শুধু কাছারী-ঘরের এক জনের মনের সঙ্গোপনে শুরু হল অস্ফুট গুমরানি। তত্ত্ববোধিনীর পাতা ওলটাতে শুরু করলো ঘন-ঘন। গমস্তাদের কেউ কেউ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে বাদ্যধ্বনি শুনে। শুধু এক জন আর মুখ তুললে না খোলা বইয়ের পাতা থেকে। তত্ত্ববোধিনীর সব চেয়ে উৎসাহী পাঠকের মত মনোনিবেশ করলে পড়তে। কিন্তু একটা পঙ্‌ক্তিও কি পড়ছে?

হঠাৎ একটু হাওয়া বইতে লাগলো। বোশেখী দিনের ঈষৎ তপ্ত, উষ্ণ হাওয়া।

কলকাতার গঙ্গায় তখন সবে জোয়ার শেষ হয়েছে। করালমূর্ত্তি গঙ্গার। কোথা থেকে ঝাঁক-ঝাঁক কচুরীপানা ভেসে আসছে। ছাড়া ছাড়া এখানে-সেখানে নানান রকমের সব নৌকার হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা জোয়ারের মন্থর বেগে ভাসমান। খান কয়েক জাহাজ পরস্পর রেশারেশি করিতে করতে আসছে ঐ হুগলীর দিক থেকে কলকাতার দিকে। জাহাজগুলোতে সব লাল রঙের মানুষ। খাস-সাহেব। জাহাজের দোতলার ডেকে বেতের চেয়ারে সব বসে আছে। কালা আদমীর মধ্যে যারা রয়েছে তারা সব বাবুর্চি। বোতল আর গেলাস সাহেবদের হাতে দিচ্ছে আর নিচ্ছে। জনা কয়েক মেম-সাহেব রয়েছেন।

রাণী রাসমণির ঘাট। মন্দিরের চত্বরে লাগোয়া। রাসমণি ঘাট ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তীর্থযাত্রী আর দর্শনপ্রার্থী আসে। স্নানার্থী। মায়ের রাঙা চরণ দেখতে আসে, এসে দু'টো ডুব দিয়ে যায় এই সমুখের গঙ্গায়। কত সাধু-সন্ন্যাসী আসে। কত ফকির আসে। আবার তেমনি কোটিপতিও কত আসে। আসে মায়ের কাছে, মায়ের টানে আসে। আবার যে স্নান করে না, সে ঐ পৈঠেয় থেকে জলস্পর্শ করে মাথায়।

মায়ের চরণোদক খেয়ে চলে যায়। এমন দিনের পর দিন।

জলে নেমেছিলেন কুমুদিনী। শশীও নেমেছেন। এনাদের স্নান হলে বিনোদাও জলে নামবে। ডুব দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলছিলেন কুমুদিনী। শশীও বলছিলেন। এর আগে কবে তাঁরা এখানে এসেছিলেন সেই কথা হচ্ছিল। মন্দিরে ভিড় হবে বলে তাঁরা স্নান করছেন খুব দ্রুত। ভিড় হলে আর দেখা হবে না মাকে। মায়ের চরণকে। তাই ঘাটে এসেই কুমুদিনী বলেছেন,—বৌ, মন্দিরে ভিড়। বেলা হলে আর দেখতে পাবে না এত ভিড় হবে!

ঘাটের নাট-মন্দিরে কীর্ত্তনীয়ারা মায়ের নাম গাইছে। খোল-করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে। পরম ভক্তিভরে। কয়েক জন নিঃস্ব ভিক্ষাজীবি বসে আছে এখানে-সেখানে। চাল আর পাই-পয়সার আশায়। যাদের দয়া হচ্ছে তারা দিচ্ছে, যারা নির্দ্দয় তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

আর গৈরিকবসনা গঙ্গা কুলুকুলু রবে ভেসে চলেছে। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ফেরী নৌকায় এপারের যাত্রী ওপারে যাচ্ছে। ওপারের যারা তারা আসছে এপারে। রাসমণির দ্বাদশ শিবমন্দির

গঙ্গা থেকে দেখা যায়। কেদারযাত্রীরা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে।

•

মাতা আছেন। আর পিতা আছেন।

প্রকৃতি আছেন আর আছেন পুরুষ! পিতৃবক্ষে করালবদনা মহামায়া স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শঙ্কর আর শঙ্করী। জগৎপিতা আর জগদম্বা। দিগম্বর আর দিগম্বরী।

এই মন্দিরের আশ-পাশে আরও এক জন কে না কি আছেন। অজ্ঞ, নিরক্ষর, আত্মভোলা কে এক জন। মায়ের ছেলে? রাত নেই, দিন নেই ডাকছেন মাকে।

উপচার পুরোহিতের হাতে দিয়ে নিজের নামে সঙ্কল্প করালেন কুমুদিনী। নিজের মঙ্গলের জন্যে। নিজের আর নিজের ছেলের হিতের জন্যে। প্রণাম করলেন কতক্ষণ। শেষে মা'র চরণামৃত মুখে দিয়ে মন্দির থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় কা'কে দেখলেন কুমুদিনী। দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শশীও দেখলেন। দেখে যেন বিস্মিত হয়েছেন।

একটি কুমারী। মা নয় তো?

লাল বেণারসী পরনে। সদ্যঃস্নাতা। সিক্ত কেশ ঝুলছে পৃষ্ঠদেশে। চন্দনের একটা ফোঁটা কেটেছে কপালে। চন্দনের মত গায়ের রঙ, বৈশাখী রৌদ্রে ফুটে বেরোচ্ছে যেন। চোখে আবার কাজল। কাদের বাড়ীর মেয়ে! কুমুদিনী সেখানে আর না দাঁড়িয়ে নেমে এলেন মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে। কুমারীটির সঙ্গে রয়েছেন এক জন বৃদ্ধা। লক্ষ্য করলেন তাঁকে। শশীকে বললেন,—শশী, মেয়েটার রূপ দেখলে? আহা, যেন প্রতিমা!

শশী বললেন,—দেখলাম তো। বলুন তো খোঁজ করি আপনার ছেলের জন্যে। শশীর কথায় যেন আনন্দের আবেশ। মুখে হাসি। রৌদ্রালোকে শশীর গায়ের গয়না যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। আর সীঁতির সিন্দুর!

আর ছেলে তখন তত্ত্ববোধিনী রেখে একখানা খাতা টেনে নিয়েছে। এক জন গমস্তার খাতার স্তূপ থেকে। মফঃস্বল থেকে আগত নিকাশি কাগজ পরীক্ষা করে যে খাতায় তার ফল লিখে ম্যানেজার বাবুর নিকট উপস্থিত করতে হয় সেই খাতাখানা। এই সালের।

তা-ও বেশীক্ষণ ভাল লাগলো না।

এক এক জনের নিকাশ। চেকমুড়ীর সঙ্গে সেহার মিল আছে না নেই। প্রত্যেক আইটেমে মিল আছে কি না। সেহার ঠিকগুলি যথার্থ কি না। সেহার দৈনিক টোটাল রীতিমত রেকর্ড বইয়ে উঠানো হয়েছে? সেহার আদায় কড়চায় ওয়াশীল দেখাওয়া হয়েছে? এই সবের রিপোর্ট আছে খাতাখানায়। খাতা রেখে দিয়ে ফরাস থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। 'নেহাৎ ঐ ব্যাণ্ড আর ব্যাগ-পাইপ থেমে গেছে তাই। নয় তো এতক্ষণ যেন হতভম্বের মত বসেছিল। আস্তে আস্তে উঠে চললো বাগানের দিকে। মালীরা আছে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করবে। আলাপ করবে।

ওদিকে ছেলেকে গাঁথবার ব্যবস্থা করছেন মা। মায়ের মন্দিরের চত্বরে।

কুমারীর সঙ্গে যে বৃদ্ধাটি ছিলেন, তিনি একেবারে কাছাকাছি আসতেই শশী তার সামনে গেলেন। বললেন,—এই মেয়েটি আপনার কে?

বৃদ্ধার হাতে ছিল মায়ের পাদপদ্মের নির্ম্মাল্য। আর একটি হাত ঐ কুমারীটি ধরেছিল। বৃদ্ধা বললেন,—আমার বোনের মেয়ে মা। কে বল তো তুমি?

শশী মৃদু হেসে বললেন,—ঐ উনি বলছিলেন খোঁজ করতে। আমার দিদি।

কুমুদিনী এগিয়ে এলেন। কুমারীটি অবাক-চোখে তাকিয়ে রইলো। কুমুদিনী বললেন,—জাতে কি মা ব্রাহ্মণ?

বৃদ্ধা বললেন,—হ্যাঁ মা। তা নয় তো কি? তা তোমাদের তো চিনতে পারছি না?

শশী বললেন,—কোথা থেকে চিনবেন? নাতনীটিকে দেখে যেচে কথা বলতে এসেছি। আমাদের একটি পাত্র আছে। দেবেন বিয়ে?

বৃদ্ধাটি হাসলেন কুমারীটির মুখের দিকে চেয়ে।

বললেই তো আর হবে না।

কোষ্ঠী দেখাতে হবে। মিল করাতে হবে। যোটক মিল না হলে কি করে বিয়ে দেবেন? বিয়ে কি শুধু মুখের কথায় হয়? কুমুদিনী আর কথা না বাড়িয়ে বললেন,—আপনার ঠিকানাটা বলুন। আমি কথা কইবার জন্যে লোক পাঠাবো।

বৃদ্ধা বললেন,—কুড়োরাম ভট্টাচায্যির বাড়ী। আমার ছেলের নাম কুড়োরাম। কাশী মিত্তির ঘাট ষ্ট্রীট। কলিকাতা। এই তো আমার ঠিকানা।

কুমুদিনী আর শশী বৃদ্ধাকে প্রণাম করলেন। তার পর কুমারীটির চিবুকে হাত স্পর্শ করে ত্বরিত পদে চললেন দ্বাদশ মন্দিরের পাশের দালানে। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। মাকে দেখলে আর মায়ের ছেলেকে দেখবে না?

অজ্ঞ, নিরক্ষর হলে কি হবে, গায়ের রঙ ঠিক দুধে-আলতার মত। পরম কমনীয় কান্তি। রাণী রাসমণির মন্দিরের পুরোহিত। শাস্ত্রের মন্ত্র জানে না, তবুও পুরোহিত। তন্ত্র জানে না তবুও। কিছু জানে না, তবুও, তবুও।

ঐ পুরোহিতের কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফের ফাঁকে দেখা যায় হাসির রেখা। ভুবন-ভোলানো মাকে দেখে ভুলে গেছেন ত্রিভুবন। আবার দেখতে না পেলেই কাঁদছেন। কি বলতে বলছেন কি সব কথা। ইড়া পিঙ্গলা আর সুষুম্নার কথা তাঁর মুখে। বলছেন—আমার নয় তাঁর মুখের কথা। তিনিই বলাচ্ছেন।

তাঁর ঘরেও দর্শনপ্রার্থীর সমাবেশ। তাঁকে ঘিরে সব বসে রয়েছে। তিনি গান গাইছেন। হাসছেন। কথা বলছেন। আবার কখনও একটাও কথা নেই, একেবারে নির্বিকল্প সমাধি।

কুমুদিনী আর শশী ভূমিতে মাথা রেখে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। মানুষের ভিড় সরিয়ে তাঁর কাছে আর যেতে পারলেন না। শুনলেন দু'-একটা কথা। পরমহংস কি বলছেন। কথামৃত।

ভক্তেরা শুনছেন। হাসির রোল উঠছে কখনও কখনও। তিনি কোনো কথার সূত্র ধরে হয়তো হাস্তকর উপমা দিচ্ছেন। উচ্চ মার্গের।

বাড়ীর লাগোয়া বাগান।

ঐ বাগানের এক দিকে আছে মালীদের ঘর। ছায়া-ঘেরা দরিদ্রের সংসার। সপরিবারে থাকে তারা। ভূমিদারের প্রজা, পরিশ্রমের বিনিময়ে আহার এবং বাসস্থান পায়। বাগান সাফ রাখে, মাটি কুপোয়, কলম কাটে, গাছ-গাছড়ার তদারক করে। সাজি ভরে পুষ্পাহরণ করে। মালীদের কয়েক জন একটা গাছের ছায়ায় বসে গজালী করছিল। তাদের হুজুরকে আসতে দেখে তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো যে যার। মালিনীরা লজ্জায় ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো হাসতে হাসতে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা এক পাশে খেলছিল কয়েকটা ছাগলের বাচ্চার সঙ্গে। তারা আর খেলা বন্ধ করলে না। শিশু তারা, অত-শত বোঝে না। বোঝে না কে মনিব আর কে প্রভু। আর ছাগলদের তো কথাই নেই! বাচ্ছা তো দূরের কথা।

—আসেন বাবু মশায়। হেথায় কি মনে ক'রে? মালীদের এক জন এগিয়ে আসে আর বলে।—ফুল লিবেন না কি? বানিয়ে দেব একটা তোড়া?

—না, না, ফুল চাই না। তোমাদের দেখতে এসেছি। এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—তোমরা সব ভাল আছো?

—আর বাবু মশায়, আপনার কিপায়, যেমন রেখেছেন। আছি, ভালই আছি। মনের সুখে সব রয়েছি। মালীদের মধ্যে বয়স্ক এক জন বললে কথাগুলি।—তা বাবু মশায়, দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? একখানা কেদারা নিয়ে আসি না, বসে বসে দু'দণ্ড কথা ক'ন আমাগোর সঙ্গে।

—না, কেদারা আর আনতে হবে না। মনিব কথা বলছে যেন কথায় মন নেই। কেমন যেন অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য চলনে-বলনে। কেমন যেন উড়ু-উড়ু ভাব। মেজাজ নেই যেন কথাবার্ত্তায়।

বাগানের শেষ প্রান্তে আছে কয়েকটা তালপাতার চালা। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কেমন মানুষের বসতির জন্তে নয়, ঝাঁক-ঝাঁক পোষা হাঁস আছে। পাতি আর রাজহাঁস। তারা থাকে ঐ ঘর ক'খানায় রাত্রি বেলায়। আর দিনে থাকে স্থলে নয়, জলে। এ বাড়ীর ঐ পুকুরে। সাঁৎরে চলে দলে-দলে। গুগ্‌লী আর মাছের সন্ধানে জলে চক্কর দিয়ে বেড়ায়।

এক জন পাইক ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে এসে হাজির হলো। বললে,—হুজুর, ওস্তাদজির ছেলে এসেছেন। মাঙছেন আপনাকে।

ওস্তাদজি! শুনেও যেন খানিকের জন্তে মনটা আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো। তবুও একটা কথা বলবার পাত্র পাওয়া গেছে এতক্ষণে। এই বিরহ দিবসে। ওস্তাদজির ছেলে। বাঘের বাচ্ছা বাঘ। যোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান। ওস্তাদজি ছিলেন কৃষ্ণকান্তর শিক্ষাগুরু, সহচর, তারিফদার। গানের সুর আর যন্ত্রের ব্যবহার শিখতেন কৃষ্ণকান্ত তাঁর কাছে। কালোয়াতী গাইতেন ওস্তাদজি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কৃষ্ণকান্ত তানপুরা ধরতেন। শিষ্য গুরুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রশংসা করতেন, গুরু শিষ্যের হাতযশ গাইতেন। কত আসরে নিয়ে যেতেন কৃষ্ণকান্তকে। দেশ-বিদেশের কত গুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। কত দুর্লভ সুর শিখিয়ে দিতেন। কত রকম-বেরকমের যন্ত্রের ব্যবহার। ওস্তাদজি ছিলেন পশ্চিমা মুসলমান, মিঞা নসিরুদ্দিন আলী তাঁর নাম। সেই নসিরুদ্দিনের ছেলে বসিরুদ্দিন।

সেই বসির এসেছে। কি মনে করে?

অর্গাণ্ডির বুটিদার পাঞ্জাবীতে সাদা সুতোর কলকা। ময়ূরকণ্ঠী রঙের আলপাকার লুঙী। পায়ে লাল ভেলভেটের শুঁড়তোলা জরিদার নাগরা। মাথায় লাল বনাতের ফেজ। পাঞ্জাবীর বুকে চুণীর বোতাম। হাতে চার রতি পোকরাজের আঙটি। মুখে তবক-দেওয়া পান। জামার পকেট থেকে সুর্ত্তির ডিপে বের করে সুর্ত্তি খেলে বসির। তার পর কাছারীর সমুখের প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে লাগলো। বসিরের বয়স এখন আর কত? এই ত্রিশ-বত্রিশ।

—বসির, তুমি যে আর আসো না? সানন্দে দূর থেকে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর। কাছে এসে বললে,—চল, বাজনার ঘর খুলতে বলি। অর্গান শুনব। তুমি বলে গেছলে, এক দিন এসে শুধু অর্গান শুনিয়ে যাবো। বলে, সেই যে গেলে আর দেখা নেই?

পানের একটা পিক গলাধঃকরণ করে বললে বসির,—বেণারসে ছিলাম বহুৎ দিন। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে কনৌজে চলে গেলাম। ছিলাম না যে এখানে।

—অর্গান না শুনে ছাড়ছি না তোমাকে। চল, বাজনার ঘরেই বসা যাক। আমি ঘর খুলতে বলছি। তার কথার সুরে অধৈর্য্য। চোখে-মুখে অদম্য ব্যাকুলতা। আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা নয়, মুখ থেকে কথা খসাতে না খসাতেই।

একটু হেসে বসির বলে,—আমার সাথে চল না এখুনি, গান-বাজনা শুনে মন-মেজাজ তর্ব্ব হয়ে যাবে। অর্গান আউর এক দিন শোনাবো।

—কোথায় বসির? কোথাও আসর হয়েছে বুঝি? তার প্রশ্নে আকুল আগ্রহ।

বসির আবার একটু হাসে। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে। বলে,—আরে চল-ই না। গিয়েই দেখবে। গান শুনে আর উঠে আসতে চাইবে না।

গানের কিছুই বোঝে না। বোঝে না গৎ, তাল, মাত্রা, লয়ের খেলা। তবুও শুনতে ভালবাসে! গাছের ফুল কি সকলেই দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দেয় মন্ত্র বলতে বলতে? কেউ কি আর গন্ধে মুগ্ধ হয়ে পান করে না তার আঘ্রাণ? সঙ্গীত-সাধনার মূল্য বোঝে না সে। শুধু শুনতেই ভালবাসে। কণ্ঠ-সঙ্গীত আর যন্ত্র-সঙ্গৎ!

—যাও, যাও, দেরী কর না। পোষাকটা একটু ভদ্দর করে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। কথার শেষে বসির আবার সুর্ত্তি মুখে দেয়। একটু হাসে যেন, কেমন রহস্তের হাসি।

ইতি-উতি ভাবে কৃষ্ণকিশোর। ভাবে, মা বাড়ীতে নেই, কখন আসবে কে জানে। আর সে চলে যাবে গান শুনতে। মাকে না জানিয়ে? তবুও বাড়ীতে যেন আর ভাল লাগছে না। যেতে ইচ্ছা হচ্ছে এমন কোথায়, যেখানে গেলে আইভিলতাদের ঐ শূন্ত বাতায়ন-পথ নজরে পড়বে না। এ-কথা সে-কথা ভেবে বললে,—তুমি অপেক্ষা করবে এখানে? চল না বৈঠকখানায় বসবে। আমি এখুনি তৈরী হয়ে আসব। আর তুমি একটু কিছু খাবে না?

বসির আবার একটু হাসে। বলে,—তুমি কি আমার সাথে কুটুম্বিতা করছ? বেশ আছি এখানে, যাও চটপট এসো। খাওয়া কি পালাচ্ছে!

কৃষ্ণকিশোর অন্দরের দিকে এগোয় আর বসির পায়চারী করতে থাকে। সূর্য্যদেব পূর্বাকাশ ত্যাগ করে অগ্রসর হয়েছেন আরও একটু। বৈশাখী রৌদ্রের কড়া তেজ হয়েছে।

মা বাড়ীতে নেই।

কুমুদিনী তখন মন্দিরের বাইরে দোকানে সওদা করছেন। মন্দিরের বাইরে ফটক পর্য্যন্ত রাস্তার ওপরেই বসেছে যত দোকান-পত্র। দর্শনপ্রার্থীরা সব বিকিকিনি করছে। লোহা আর পেতলের বাসন, মাটির খেলনা আর পুতুল, ছাপা-ছবি, আর কাচের জিনিষ-পত্রের দোকান। কুমুদিনীও কিনছেন গেরস্থালী এটা-সেটা। শশীকে কিছু কিনতে দিচ্ছেন না। যা পছন্দ হচ্ছে তাঁর তাই কিনে দিচ্ছেন। নিজের জন্যে কিনেছেন খান কয়েক ছবি। মাতৃমূর্ত্তির ছবি, পরমহংস আর শ্রীশ্রীমার ছবি। ছেলের জন্যে কিনেছেন সরস্বতীর একখানা ছবি। দেখেও যদি একটু মন হয় লেখাপড়া-শুনায়। সরস্বতী যদি কৃপা করেন। আর শশীর শিশু ছেলে-মেয়ের জন্যে কিনে দিয়েছেন কয়েকটা মাটির রঙীন পুতুল। ডানা-ওড়ানো পরী, বাঘ, সিংহ, আরও কত কি!

কুমুদিনী সওদা করতে করতে বললেন,—দেখো বৌ, মেয়েটাকে হাতছাড়া করা হবে না। মায়ের কাছে এসে পেয়েছি ওকে, পারি তো ওর সঙ্গেই বিয়ে দেবো ছেলের। তুমি কি বল?

শশী বললেন,—বেশ তো। আপনার যখন মনে ধরেছে তখন আর কথা কি! আর এমন যখন মেয়ে।

কুমুদিনী বললেন,—নামটা কি যেন বললে মেয়ের বাপের? বুড়োরাম ভট্টাচার্য্য, কাশী মিত্তির ঘাটের রাস্তা, তাই বললে না?

শশী বললেন,—হ্যাঁ। আমার মনে আছে।

সওদা শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু নেওয়া যায় কি না দেখতে দেখতে কুমুদিনী বললেন,—চল বৌ, এবার ফেরা যাক্।

গাড়ীতে উঠে বসলেন তাঁরা। পাইকটা সওদা রাখলে একটা ধামায়, যাতে উপচার এসেছিল পূজার। ধীরে ধীরে-গাড়ী চলতে শুরু করলে। ফটক পেরিয়ে সরকারী রাস্তায় এসে পৌঁছলো গাড়ী। দর্শনপ্রার্থীর সমাবেশ, গাড়ীর গতি তাই মন্থর।

এক নম্বর মিহি আদ্দির পিরান। চুনোট-করা কাঁচির ধুতি। সাপের চামড়ার সেলিম জুতো। হীরের বোতাম। তিন আঙুলে তিনটে জহরের আঙটি। তসরের রুমাল পকেটে। মৃগনাভি আতরের গন্ধে চারি দিক আমোদিত করে ছেলে এসে হাজির হলো। মাথার চুলে বিলেতী পমেড্, এ্যালবার্ট কায়দায় চুল পিছনে তোলা। নব্য বাবুর মত বেশ। নব বাবুর বিলাস?

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে হাজির হলো। বসির নিয়ে যাচ্ছে, চাকর হয়ে সে আর কি বলবে। কথাটি বললে না।

বসির বললে,—সঙ্গে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আমার তো এই ছিরি। তা চল এখন যাওয়া যাক। কেউ পুছলে বলবে এ তোমার দেহরক্ষী। বডিগার্ড। কি বল?

তার মুখে সলাজ হাসি। বলে,—কি যে বল বসির! তোমাদের গুণে তোমাদের পরিচয়। আর আমরা?

বসির বললে,—একটা কথা বলছিলাম। যাচ্ছো যখন তখন পঁচিশ-পঞ্চাশ পকেটে নিয়েছো তো? একেবারে কিছু না নিয়ে—

কথাগুলো শুনে যেন কিছুটা বিস্মিত হয় সে। ভাবে, টাকা দিয়ে গান শুনতে হবে? তবুও বসির যখন বলছে তখন লজ্জার খাতিরেও নিতে হবে টাকা। সে কাছারী থেকে সত্যিই টাকা নেয় পঞ্চাশটা। পাঁচ-খানা দশ টাকার নোট। হাত-খরচা বাবদ খরচ লেখেন নায়েব মশাই।

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে বসির,—তোমাদের গাড়ী কোথায়? আস্তাবলে দেখলাম না তো?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—মা গাড়ীতে বেরিয়েছেন। পিশীমা'র ওখানে গেছেন।

একটা ফীটন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বসির থামালে গাড়ীখানা। বললে,—এসো, এই গাড়ীতেই যাওয়া যাক।

গাড়ীতে উঠে বসলো দু'জনে। ফীটন চললো শ্লথ গতিতে। পকেট থেকে ডিবে বের করে গোটা কয়েক পান আর একটু সুর্ত্তি মুখে দিলে বসির। হাসলে একটু, কেমন রহস্যের হাসি। গাড়োয়ানকে বললে, গলা বাড়িয়ে,—এই, চলো গরাণহাটায়। হেঁকে চল একটু।

ঘোড়া দু'টোর পিঠে বার-কয়েক সপাং-সপাং চাবুক মারতেই দ্রুত হল যেন গাড়ীর গতি। বসির বললে,—একবার গান শুনলে আর উঠে আসতে মন চাইবে না। তার পর, দেখলে তো আর কথাই নেই।

গান শুনতে যাচ্ছে, গান শুনে চলে আসবে। দেখাদেখির কি আছে! সে আর কিছু বলে না। নীরবে শুনে যায় বসিরের কথা। বসির বলে,—কলকাত্তা শহরে দু'টি আর পাবে না অমনটি। যেমন গলার আওয়াজ তেমনি—। বসির কথা শেষ না করে আবার একটু হাসে।

জুড়ী আসছে। ফটকের রক্ষাকারী শুনতে পেয়েছে জুড়ী আসার রাস্তা-কাঁপানো শব্দ। সে উঠে আগে-ভাগেই ফটক খুলে দিয়েছে। জুড়ী রাস্তা থেকে সোজা ফটকে ঢুকলো। কুমুদিনী আর বিনোদা নামলো গাড়ী থেকে বাড়ীর দরজায়। শশী আগেই তাঁর বাড়ীতে নেমে গেছেন। কুমুদিনী সন্তর্পণে ধরে আছেন একটি তামার পাত্র। মায়ের চরণামৃত আছে। ছেলের জন্যে এনেছেন। ভেতরে গিয়ে অনন্তরামের মুখে ছেলে বসিরের সঙ্গে বেরিয়েছে শুনে হতবাক্ হয়ে গেলেন যেন তিনি। তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল।

আর ছেলে তখন বসিরের সঙ্গে কোথায় গেছে কে জানে। ঠাকুরপোর ওস্তাদ নসিরুদ্দিনের ছেলে বসির! বসিরুদ্দিন আলী। সে আবার কোথা থেকে এসে জুটলো। কুমুদিনী জানতেন নসিরুদ্দিনের ছেলে বসির বাপের মত নয়। বসিরের নামে শুনেছেন যেন কি সব কথা। অনন্তরামের মুখে কথা ক'টা শুনে কুমুদিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হল। মায়ের চরণামৃতের পাত্রটা বুঝি বা প'ড়ে যায় হাত থেকে। কুমুদিনী চোখ দু'টোকে বন্ধ করে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখে যেন তিনি অন্ধকার দেখছেন। মুখে কোন কথা সরছে না।

আর ছেলে তখন বসিরের সঙ্গে— [ক্রমশঃ।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষ কারার বাহিরে এলেন।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি যখন স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালিত হয়ে চলেছে, তখন সংবাদ এল সুভাষ গৃহে নাই।

গুপ্তচরের চমূ এড়িয়ে নাটকীয় কৌশলে দুর্জ্জয় কর্ম্মী দুর্জ্জয় কর্ম্মের সন্ধানে বাহির হয়েছেন। বৃটিশসিংহের টনক নড়ল। কিন্তু দৈব যার সহায় মানুষ তার কিছু করতে পারে না। সুভাষ চারি দিকে পেলেন সহায়তা, বন্দিজীবন পিছে ফেলে তিনি চললেন বৃটিশ-শত্রুদের কাছে।

উত্তমচাঁদ এই অজ্ঞাত-যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

কাবুল নদী ধীর তরঙ্গে বয়ে যায়। তার তীরে বরফের উপর দিয়ে হাঁটছেন ক্লান্ত যাত্রী—মলিন শালওয়ার গায়ে, মলিনতর একটি শার্ট—সম্পূর্ণ পাঠানের ছদ্মবেশ তাঁর। উত্তমচাঁদ ভকতরামের অনুরোধে সুভাষকে আশ্রয় দিলেন।

উত্তমচাঁদকে সুভাষ বলেন যে, ১৫ই জানুয়ারী মৌলবীর বেশে তিনি ঘর থেকে বার হয়ে পড়েন এবং ৪০ মাইল দূরে পাঞ্জাব মেলে চড়েন। পেশোয়ার হয়ে তিনি কাবুল যান। ১৭ই মার্চ্চ কাবুল থেকে সুভাষ মস্কো রওনা হন এবং ২৮শে মার্চ্চ মস্কো হয়ে বার্লিনে গমন করেন। এই যাত্রা বিদ্রোহীর যাত্রা।

কারাগারের অন্তরালে দিনের পর দিন আত্মহত্যা করতে তিনি প্রস্তুত নন। উত্তমচাঁদের প্রশ্নে তিনি বলেন—"বৃটিশ ভারত ছাড়বে না, ভারতের স্বাধীনতার জন্য চাই বিদেশে বিদ্রোহের আয়োজন—চক্রশক্তির সাহায্যে সেই বিদ্রোহ সুরু করতে আমি যাব।"

ভক্ত উত্তমচাঁদ বিস্ময়ে বক্তার মুখে চেয়ে রয়।

৪৩ দিনের সহবাস। সেই সৎসঙ্গই নামগোত্রহীন উত্তমচাঁদকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখবে। মৃত্যুভয়হীন বিদ্রোহীর বীর-যাত্রায় সে ছিল সহকারী। উত্তমচাঁদ যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করলে। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। পেশোয়ারে এক নির্জ্জন কারাকক্ষে দীর্ঘদিন উত্তমচাঁদ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করলেন।

তপস্বী অর্জ্জুনের জীবনে এসেছিল উর্ব্বশী—তাকে প্রত্যাখ্যান করে পার্থ বিজয়ী হয়েছিলেন। সুভাষের বার্লিন-জীবনে এসেছিল তেমনই হেলেন ভাগনার। অসামান্যা সুন্দরী—তরুণী সুভাষের রূপে ও গুণে মুগ্ধ। সে জানে ছলা-কলা, বিলাস-বিভ্রম। অষ্টাদশ বসন্তের একগাছি মালা। সংসারে আর যে কেহ সেই তরুণীর প্রেম-নিবেদন উপেক্ষা করতে পারত না।

কিন্তু সুভাষ কামজয়ী। তরুণী ছাত্রীর মুখ খোলে—"সুভাষ, আমি ভারতকে ভালবাসি।"

"কেন?"

"ম্যাক্সমূলারের বই যেদিন পড়ি, সেদিন আমি ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। ভারত আমার স্বপ্নের ত্রিদিব—আমার ধ্যানের অমৃত—তুমি আমায় ভারতের 'স্বাধীনতা-যুদ্ধে' সঙ্গী করে নেও।"

"তা সম্ভব নয় বন্ধু—"

"সম্ভব বন্ধু সম্ভব, আমি যাব তোমার সঙ্গে, থাকব তোমার পাশে—দুঃখে যুদ্ধে হব তোমার সহায়—তুমি চাও বন্ধু, তোমার উজ্জ্বল চোখ দু'টি দিয়ে—আমায় একবার আলিঙ্গন কর—"

"হায় নারী! তা সম্ভব নয়। জীবনের পথে আমি একক—তুমি ভালবাস সে আমার সৌভাগ্য, কিন্তু ভালবাসা নেওয়ার অধিকার আমার নেই—"

নেতাজী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতিলাল দাশ

ব্যগ্র বাহু অধীর হয়ে সুভাষকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তিনি নিশ্চল নিষ্কম্প—এই নাটকীয় অভিনয়ের তিনি নিরপেক্ষ দর্শক।

মেরী মেগডোলেনের মত তরুণী আপন হৃদয় পিছনে ফেলে দুঃখে ব্যথায় ক্ষোভে চলে যায়। সুভাষ নির্বিকার চিত্তে আপন পথে যাত্রা করে। তাঁর তরে নহে স্নিগ্ধ গৃহকোণ—তাঁর তরে নয় রমণীর ভালবাসা—তিনি চান বৃহৎ গভীর আশা, ভূমার পিপাসা!

পূর্ব্ব-এশিয়ায় এত দিনে ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়েছে।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু—যিনি ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন—তার পর জীবনের দীর্ঘদিন তাঁর জাপানে কাটে। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব করছিলেন, কিন্তু নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় স্থির হল বার্লিন থেকে সুভাষকে আনতে হবে।

পথে পথে বাধা—বৃটিশ ও আমেরিকান রণতরীর সতর্ক পাহারা, প্রাণ নিয়ে এই পথ অতিক্রমণ অসম্ভব। কিন্তু নেতাজী মৃত্যুঞ্জয়, তিনি প্রাণ পণ করেই সাবমেরিনে উঠলেন। সাবমেরিন তাঁকে আফ্রিকার মাদাগাস্কার উপকূলে নিয়ে আসে, সেখান থেকে জাপানী সাবমেরিনে তিনি পেনাং আসেন এবং সেখান থেকে বিমানে টোকিও গমন করেন।

নেতাজীকে আনতে রাসবিহারী জাপান গেলেন। ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই বেলা ১১টার সময় নেতাজী সিঙ্গাপুরে নামলেন। মাথায় গান্ধী টুপি, গায়ে হালকা বাদামী রঙের পোষাক—সবাই তাঁকে সগৌরবে অভ্যর্থনা করে নিল। ৪ঠা জুলাই তিনি রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে সমস্ত ভার নিয়ে নিলেন।

তারস্বরে তিনি বক্তৃতা করলেন :—

"বন্ধুগণ, সৈন্যগণ, তোমাদের জয়ধ্বনি হোক দিল্লী চলো দিল্লী চলো। জানি না এই স্বাধীনতা সমর শেষে আমাদের কয় জন প্রাণে বেঁচে রবে। কিন্তু এ কথা আমি জানি, আমরা বিজয়ী হব—যতক্ষণ আমাদের বিজয়ী সৈন্য পুনরায় দিল্লীর লাল কেল্লায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমাধিভূমির উপর বিজয়-দর্পে পাদচারণ না করে ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই···

"আমি সারা জীবন এই কথাই ভেবেছি—স্বাধীনতার জন্য ভারত সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত—শুধু ভারতের মুক্তিসাধক সেনা-বাহিনী চাই। জর্জ্জ ওয়াশিংটন আমেরিকাকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর ছিল সৈন্যবল। গারিবল্ডী ইতালিকে মুক্ত করেন, কারণ তাঁর ছিল রণশিক্ষিত স্বেচ্ছাবাহিনী। তোমাদের জীবনের পরম গৌরব—তোমরা সবাই এসেছ ভারতের জয়যাত্রায় প্রথম অভিযাত্রী দল হয়ে···"

ছন্দের তালে তালে ভাষণ—তার সাথে সাথে প্রাণে প্রাণে জাগল অপূর্ব্ব উদ্দীপনা। সে উন্মাদনা যারা দেখেননি, তাঁরা বুঝতে পারবেন না—'জয় হিন্দ' নামক পুস্তকে রাণী ঝাঁসি বাহিনীর এক জন মহিলা এই সময়ের কাজের দিনলিপি প্রকাশ করেছেন—তাই থেকে

আমরা এই অপূর্ব্ব জ্যোতি-ভাস্বর দিনগুলির এক চমকের রেখা-চিত্র পাই।

নেতাজীর এই বিরাট আয়োজনের রাজনৈতিক মর্য্যাদা আমরা দেই না—কারণ আমরা ভাব-বিলাসী, কর্ম্মের মহত্ব আমরা অনুভব করি না।

নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় তাঁর কাজের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন—

"দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা কি করছি—জগৎকে আজ তা জানাবার দিন এসেছে। ভারতের বাইরে পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা এক বিরাট শক্তিশালী ফৌজ গড়েছি—যা ভারতের বৃটিশ বাহিনীকে স্পর্দ্ধিত আহ্বান জানায়। যখন আমরা আক্রমণ সুরু করব, তখন ভারতীয়েরা এবং ভারতীয় সৈন্যদলেরা বিদ্রোহে যোগ দেবে—ভিতর এবং বাহিরের এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে—আর ভারত পাবে স্বাধীনতা। * * * বন্ধুগণ! আমরা করব সর্ব্বায়ত যুদ্ধ আর তার জন্য চাই সর্ব্বস্ব পণ।"

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—এই মন্ত্র নিয়ে চলল তখন থেকে অক্লান্ত কর্ম্মপ্রবাহ। এই কর্ম্মের গুরুত্ব আজ ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যদি অনুধাবন করি তবে বলতে পারি, সুভাষের এই দূরদর্শী প্রচেষ্টার অমূল্য মহিমা তার হতভাগ্য দেশবাসী আজ পর্য্যন্তও উপলব্ধি করতে পারেনি।

পক্ক আম্রফলের মত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি—যারা তার জন্য প্রাণ দিল, ক্লীব জড়-চিত্ত আমরা তাদের জয়গান করতেও সঙ্কুচিত—এর চেয়ে গভীর পরিতাপ আর কি হতে পারে? হয়ত আরও গভীরতম দুঃখের ও বেদনার মাঝে দিয়ে আমাদিগকে ফিরে পেতে হবে সত্যকার অভ্যুদয়।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর বেলা ১০—৩০ মিনিট। স্থান সিঙ্গাপুরের ক্যাথায় প্রাসাদ। সেখানে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘের এক ঐতিহাসিক অধিবেশন।

রাসবিহারী বসু অভ্যর্থনা জানিয়ে অভিভাষণ পাঠ করেন। কর্ণেল চাটার্জ্জি সম্পাদকের বিবরণ পাঠ করেন। তার পর নেতাজী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। যখন তিনি জলদগম্ভীর সুরে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন তখন স্বর্গ থেকে অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি হয়ত হয়েছিল।

"আমি সুভাষচন্দ্র বসু ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের আটত্রিশ কোটি নর-নারীর স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত এই পবিত্র সংগ্রাম করব।"

বিপুল নিস্তব্ধ জনতা—মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁদের প্রত্যেকেই মনে মনে এই শপথ গ্রহণ করলেন। তার পর নব গঠিত রাষ্ট্রের ঘোষণা পাঠ করা হল।

ঘোষণায় বলা হল :—"এই সাময়িক ভারত রাষ্ট্র প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য লাভের অধিকার রাখে এবং তাহা দাবি করে। ভারতীয় নাগরিকগণের প্রত্যেককেই ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা, বিবর্দ্ধনের ও বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগের সমান অধিকার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। ইহা ভারতবর্ষের সমগ্র জাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প—ইহা ভারতীয় প্রত্যেক সন্তানকে সমভাবে পালন করিবে। অতীতে বিদেশী ছলে-কৌশলে যে সমস্ত অন্যায় ভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ইহা সমূলে উৎপাটন করিবে।"

১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর নব গঠিত আজাদ হিন্দ সরকার বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার পর পদব্রজে, জাহাজে, ট্রেণে এবং মোটরে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল পর্য্যন্ত পৌঁছায়।

সেই গৌরবময় যুদ্ধাভিযানের কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিত্যস্মরণীয় হওয়া উচিত। ভারতভূমিতে মোডক নামক স্থানে পৌঁছে যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ মহা সমারোহে জাতীয় পতাকা তুলল—সেদিন কি মহা গৌরবের দিন!

সমবেত সৈন্যদলের সম্মুখে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল :—

সব সুখ চায়েন কী বরখা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা
পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য, হিমাচল, নীল যমুনা গঙ্গা
তেরে নিত্ গুণ গাঁয়ে, তুঝ্ সে জীওন পাঁয়ে
সব তন্ পাঁয়ে আশা
সুরয বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো জয়, জয়, জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা!
সব কে দিলমে প্রীতি বসে, তেরি মিঠি বাণী,
হর সুবে কে রহনেওয়ালে হর মজহব কে প্রাণী,
সব ভেদ ঔর ফার্ক্ মিট কে সব গোদ-মেঁ তেরী আয়কে
গুন্ থে প্রেম কী মালা
সুরয বন কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো জয়, জয়, জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা।
সুবা সবেরে পাংখা পাখেরু তেরেহি নিত গুণ গাঁয়েঁ
বাস ভরী ভর পুর হাওয়েঁ, জীওন মেঁ রুং লাঁয়ে
সব মিল করে হিন্দ পুকারে জয় আজাদ হিন্দ কি নারে
পিয়ারে দেশ হামারে
সুরয বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো, জয়, জয়, জয়, জয় হো
ভারত নাম সুভাগা!

এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কিন্তু যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

সেদিনের ব্যর্থ অভিযানের সুদূরপ্রসারী ফল আজ আমাদের করতলগত—শুধু আজ আমরা সেই বিধ্বস্ত নিঃস্বার্থ বীরগণের পূজায় কোন আয়োজন করছি না।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের ব্যর্থতার মধ্যেও দেখি তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা।

সংগঠনের যাদুকর তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে মৃতে এসেছিল প্রাণ-সঞ্জীবন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, তিনি কাজ করে চলেছেন। কর্ণেল শাহনওয়াজ কঠোর সমালোচকের চক্ষে নেতাজীর জীবনের এই অংশের পরিচালনা করেছেন।

নেতাজী ছিলেন শৃঙ্খলায় বজ্রাদপি কঠোর, আর আন্তরিকতায় কুসুম-কোমল। তাঁর এই অনুপম চরিত্র-মাধুর্য্যে তিনি সকলের হৃদয় হরণ করে নিয়েছিলেন।

নেতাজী যখন রেঙ্গুন ত্যাগ করেন, তখন অসীম করুণা ও মহাপ্রাণতায় পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাজেয় নেতৃত্ব সেদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

"আমি আশাবাদী—সাময়িক পরাজয় আমাদের হয়েছে, কিন্তু অচিরেই ভারত স্বাধীন হবে, এ বিশ্বাস আমায় অটুট আছে। বন্ধুগণ, আপনারাও সেই বিশ্বাস পোষণ করুন। আমি সব সময়েই বলে এসেছি, নিশীথ তমস্বিনীর তমিস্রার শেষে রক্তিম অরুণোদয় ঘটে—আমরা এখন গভীরতম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি—তাই প্রভাতও আসছে—ভারত স্বাধীন হবেই হবে।"

মণিপুর, ইম্ফল, কোহিমা, আরাকান, প্রভৃতি কত যুদ্ধের স্মৃতি পিছনে পড়ে রইল—কত প্রাণ বিসর্জ্জন—কত দুঃখ—কত ত্যাগ।

জীবনে এমন ভাবে আসে পরাজয়। তবু সেই পরাজয়ের মাঝে সমস্ত দেশ ও কালের ব্যবধানের বাধা পার হয়ে কানে বাজে নেতাজীর জলদ-গম্ভীর আহ্বান :

"ওই, ওই দূরে, ওই নদীর পরপারে, ওই গহন অরণ্যের শেষে, ওই দুরারোহ পর্ব্বতমালার পিছনে রয়েছে আমাদের সাধের দেশ—যে দেশের মৃত্তিকায় আমাদের জন্ম—যে দেশে আমরা এখন যাব। শোনো, ওই শোনো, ভারতবর্ষ ডাকছে—রাজধানী দিল্লী ডাকছে···আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী ডাকছে। রক্ত রক্তকে আহ্বান করছে। ওঠো, জাগো, সময় নেই। ধর তরবারি। ওই তোমার সম্মুখে রয়েছে পথ, যে পথ—আমাদের পূর্ব্বসূরীরা তৈরি করে গেছেন—সেই পথেই আমরা চলব। আমরা শত্রুর সেনাদল ভেদ করে বিজয়-যাত্রা করব অথবা সহিদের মরণ বরণ করব। আর আমাদের শেষ-নিদ্রায় সেই পথের ধূলি চুম্বন করব—যে পথ দিয়ে আমাদের বিজয়ী সেনাদল যাবে দিল্লী।—চলো দিল্লী! দাও আমায় তপ্ত রুধির—আমি দেব সত্য মুক্তি।"

সেই আহ্বান আজও শেষ হয়নি। যতক্ষণ ভারত-সংস্কৃতি তার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, যতক্ষণ না এক অখণ্ড ভারতবর্ষ জগৎ রাষ্ট্রসভায় তার ন্যায্য আসন গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পথ-যাত্রী—ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের শুনতে হবে পথের আহ্বান—চলো দিল্লী!

বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হল। আনবিক বোমার অভিঘাতে জাপান বিধ্বস্ত—জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। নেতাজী সিঙ্গাপুরের জাপানী সেনাপতিকে বললেন—"আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বতন্ত্র স্বাধীন ফৌজ, তাদের সম্বন্ধে কোনও চুক্তি আপনি করবেন না।"

সেনাপতি ইটাগাকি উত্তর দিলেন :—"আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না—যে আদেশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নায়ক মার্শাল কাউণ্ট তেরায়ুচি দেবেন, আমাকে তাই মেনে নিতে হবে।"

এই কথা শুনে নেতাজী ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক রওনা হলেন। সাইগনে তেরায়ুচির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন—"টোকিও যা বলবে তাই তিনি করবেন।" কাজেই নেতাজী টোকিও রওনা হলেন।

সঙ্গে রইল বিশ্বাসী সঙ্গী কর্ণেল হবিবুর রহমান। ফরমোসা বিমান ঘাঁটি থেকে যখন তাঁরা রওনা হলেন তখন একটা শকুনি এসে পাখার উপর পড়েছিল। সেই আঘাতে বিমানে আগুন লেগে গেল। বিমানটি একটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে যায়।

হবিবুর নিজে গুরুতর আহত হয়েও জ্বলন্ত বিমান থেকে নেতাজীকে বাইরে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ছয় ঘণ্টা পরে ভারত ভাগ্যবিধাতা নেতাজী তাঁর লীলা সংবরণ করেন।

যারা নেতাজীকে ভালবাসেন তারা মনে করেন, নেতাজী আজও মরেননি। তিনি আবার ফিরে আসবেন।

মানুষের ইতিহাসে যুগোত্তর মহামানবের প্রত্যাগমন নিয়ে এমন ভাবে নানা দেশে নানা পুরাণ গড়ে উঠেছে। বীর আর্থারের প্রয়াণ চিরপ্রয়াণ নয়, তিনি আবার পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ফিরবেন। যীশু খৃষ্ট স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আবার আসবেন। কিন্তু আশা দিয়ে নির্ম্মম সত্যকে উল্টানো যায় না। নেতাজী আর নাই—আজ তাঁর পথে চলতে হবে হতভাগ্য দ্বিধা-বিভক্ত বাঙ্গালীদের।

নেতাজী তোমাকে সত্যই ফিরতে হবে। তুমি যদি তোমার মর্ত্ত্য শরীরে না ফের, তবে তোমার অমর্ত্ত্য-শরীরে এসে বাংলাকে বাঁচাও। বাঁচাও বাংলার কৃষ্টি—বাঁচাও বাংলার মানুষকে।

জয়তু নেতাজী!

তুমি বীর বাংলার গুরুজী—তুমি কিশোর বাংলার বাপুজী, তুমি যুবা বাংলার নেতাজী। দাও আমাদের তোমার অমোঘ বীর্য্যে দীক্ষা—দাও তোমার ঐক্যের শপথ, দাও তোমার কল্যাণের আদর্শ। তোমার বজ্র-নির্ঘোষ আবার ধ্বনিত হোক—এক সুভাষের স্থলে শত শত সুভাষ জন্ম গ্রহণ করে দুঃখিনী বঙ্গজননীর অশ্রু মুছাক।

হে মহাপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয় তপস্বী—আজ তপস্যার হোমানল বাংলা দেশে জ্বেলে দাও। আসুক দিক-দিগন্তর হতে নব নব তপস্বীর দল। তোমার অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হোক।

"বন্ধুগণ, এটা জলের মত পরিষ্কার যে, ব্রিটিশের অবনতিতেই ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার আশা। যে ভারতীয় ব্রিটিশের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, সে তার মাতৃভূমির উদ্দেশ্যের প্রতিরোধ করছে; সে ভারতের বিশ্বাসঘাতক। ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের যারা বিরোধিতা ক'রে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিচ্ছে তারা এ-যুগে মীরজাফর অথবা উমিচাঁদের চাইতে কোন অংশে ভাল নয়।"

—সুভাষচন্দ্র বসু।

আগষ্ট বিপ্লবে বাংলা

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৯৪২ সনের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ৯ই আগষ্ট নেতৃবৃন্দ সরকার কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। অতি সতর্ক ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করেন। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই সহরে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তাহা ক্রমেই সহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচণ্ড দাবদাহের সৃষ্টি করিল। বোম্বাই সহরের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের সহিত ইংরাজ সৈন্য ও পুলিশের কয়েক দিন খণ্ডযুদ্ধ হয়। সহরের সমস্ত কারখানার শ্রমিক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে; ক্রমে এই আন্দোলন অহিংস গণবিপ্লবের প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে স্থানে জনগণ বৃটিশ-কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য "সংগ্রাম ঘোষণা করিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর ভারতের মুক্তিকামী জনগণের শৃঙ্খল ভাঙ্গার ইতিহাসই আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাস।

বিপ্লবের বহ্নিশিখা বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে ছড়াইয়া পড়ে। তবে পশ্চিম-বাংলা, যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে এবং বিহারের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উড়িষ্যায় বিপ্লব তীব্র আকার ধারণ করে নাই। দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলি ব্যতীত সমগ্র বিহার, বাংলা, ও যুক্তপ্রদেশের বিদ্রোহের গুরুত্ব ও ব্যাপকতায় ইংরাজের মিত্রশক্তিগণের প্রতিনিধিগণ যাঁহারা ভারতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া যান। প্রধানতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থাই বিপ্লবীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করিবার জন্য টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া, রেল-লাইন উঠাইয়া দিয়া, রেল-ষ্টেশন ধ্বংস করিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মধ্যে খাল কাটিয়া ট্রেণ ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করা হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকঘর, থানা, আদালত-গৃহ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করা হয়। ইহা ছাড়া বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর পরিচালনার জন্য রেলওয়ে ও সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহ বিপ্লবী দলের অন্যতম কার্য্য ছিল।

এই সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ের কার্য্যাবলী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এক প্রকারের হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নেতৃবিহীন অবস্থায় চলে। এক মাসের মধ্যেই দেখা যায়. আন্দোলনের ধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে কয়েক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী দিল্লীতে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে কয়েক জন কর্ম্মী গান্ধীজী অনুসৃত অহিংস নীতির পক্ষে থাকিলেও অধিকাংশ কর্ম্মী সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপক্ষে মত পোষণ করায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে অহিংস নীতি পরিত্যক্ত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীদলের সশস্ত্র বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য বোম্বাই প্রদেশের বিপ্লবী দল অর্থ সাহায্যের ভার গ্রহণ করেন।

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায় আগষ্ট আন্দোলন জন-সংগ্রামের রূপে ব্যাপক ভাবে যদিও প্রকাশ লাভ করে নাই, তথাপি বাংলার জনসাধারণের মনের উপর দিয়া এই আন্দোলনের আবেগ বহিয়া গিয়াছে, বাংলার জনসাধারণের চিত্তে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইবার যে স্পৃহা বাংলা দেশকে ১৯০৫ সাল হইতে বৈপ্লবিক চেতনায় নিষিক্ত রাখিয়াছে তাহা আগষ্ট বিদ্রোহে প্রচণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির রুদ্র রোষ ও করাল দুর্ভিক্ষ বিরাট প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও বাংলার কয়েকটি স্থানে এই আন্দোলন সত্যিকারের গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

ইহার মধ্যে মেদিনীপুরের আন্দোলনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আভাষ দেখা দেয়। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার ও বিদ্যুৎবাহিনী সজ্ঞের তৎপরতা বাংলা তথা ভারতের গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ঝটিকা ইত্যাদি প্রকৃতির রোষে পড়িয়াও মেদিনীপুরের গরীব জনসাধারণ জাতীয় পতাকার মর্য্যাদাকে প্রাণপাত করিয়া সর্ব্বাগ্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য জীবন বলি দিবার আগ্রহে ও চরম ত্যাগস্বীকারে মেদিনীপুরের জনসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে—মৃত্যুর পরিব্যাপ্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়াও ইহারা নত হয় নাই। ৭৩ বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা জাতীয় পতাকার সম্মুখে পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিয়াছে, দুগ্ধপোষ্য সন্তান প্রাণ দিয়াছে। এই মেদিনীপুরেই পীড়িত নিরন্নের মৃতদেহ শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হইয়াছে। বস্ত্রাভাবে কুলনারী আত্মহত্যা করিয়াছে। এই দুঃসহ ক্লেশের দাহনে পুড়িয়া সমগ্র মেদিনীপুরের আত্মা একটি গুণে সোনা হইয়া রহিয়া গিয়াছে—তাহা তাহার দেশপ্রেম।

বাংলা দেশের কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে আগষ্ট বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি কাপুরুষের ন্যায় নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর লাঠি চালনা ও গুলী করিয়াছে। রাণাঘাটের নিকট জনতার উপর বিমান হইতে মেশিন গান চালাইতেও ইংরাজগণ দ্বিধাবোধ করে নাই।

আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসী একটি নূতন শিক্ষালাভ করে। তাহা হইল স্বাধীনতার দাবীতে সংগ্রাম যখন আরম্ভ হয়, তখন জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি ঐক্য দেখা যায়, অন্য কোন সময় তাহা বড় চোখে পড়ে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা—পরলোকগত মিঃ জিন্না মুসলমান সম্প্রদায়কে আগষ্ট আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছিলেন; ইহার পূর্ব্বে কয়েকটি আন্দোলনে, বঙ্গভঙ্গ ও আইন অমান্য আন্দোলনে দেখা গিয়াছিল, তৃতীয় পক্ষের দালালেরা চেষ্টা করিয়া সাম্প্রদায়িক দাবী চালাইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘগুলির ব্যাপক প্রচার-কার্য্যে এক শ্রেণীর দেশবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করিলেও দেখা যায় আগষ্ট বিপ্লবের সময় তাহা একেবারে বিফল হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মুসলমান আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে—কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় নাই—কোন মুসলমান ইহাকে হিন্দুর সংগ্রাম মনে করে নাই। মুসলমান সম্প্রদায় বিরোধিতা তো করেই নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল।

আগষ্ট বিপ্লবে আনিয়াছে জাতির জীবনে শঙ্কাহীনতা। 'করিব অথবা মরিব'—এই বাণী জাতির জীবনে সফল হইয়াছে। নিরস্ত্র জাতির অভ্যুত্থানের একমাত্র পথ, অন্যায় প্রতাপের দম্ভকে অস্বীকার ও তুচ্ছ করা, সশস্ত্রের বিদ্রোহ অপেক্ষা নিরস্ত্রের বিদ্রোহ

ঐতিহাসিক সত্তাব্যত্তায় বেশী ঐশ্বর্য্যবান এবং অনেক বেশী শৌর্য্যময়। অন্যায় যদি কামান-বন্দুক লইয়াও হুমকি দিতে আসে তবুও জনসাধারণ ভয় পায় না। পিছাইয়া যাইতে প্রস্তুত নহে। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে জাতীর চেতনায় এক নূতন ঐশ্বর্য্য গড়িয়াছে। চাষী, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতির মধ্যে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং মৃত্যু বরণ করিয়াছে। ইহারা কোন কালে অহিংসার দর্শন-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিল না বা সেইরূপ আদর্শ কায়মনোবাক্যে পালন করিত না, কিন্তু সংগ্রাম পরীক্ষায় ইহারা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের বিদ্রোহ ও ব্যক্তিত্বকে জাহির করিয়াছে। এই ঐতিহাসিক সত্যই জাতীয় জীবনে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে"—এই দৃঢ়তাই জাতীয় জীবনে অসীম শক্তির প্রেরণা দিয়াছে। নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজের ধ্বনিতেও সেই আত্মবলিদানের প্রেরণা স্ফুরিত হইয়াছে—ইত্তিফাক, ইত্তিমদ ও কোরবানী। ভারতের সশস্ত্র জাতীয় সিপাহীও হত্যা করিতে চায় না—স্বাজাদীর জন্য নিজেকে কোরবানী দিতে চায়। সমগ্র মেদিনীপুর এই গণ-অভ্যুত্থানে বাত্যাহত ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়াও বিপ্লবের হোমানলে চরম আত্মাহুতি দিয়া যে ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিল ইতিহাস চিরকালের জন্য তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিবে।

কাঁথি ও তমলুকের অধিবাসিগণ ধ্বংসের প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যেও সৃজনী-শক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা বিদেশী শাসন-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া নিজেদের শাসন-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানের গণ-বিপ্লব সাফল্যের বিজয়-গৌরবে যদিও মণ্ডিত হয় নাই তথাপি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিরস্ত্র বিপ্লব বিদেশী রাজশক্তির মনে তীব্র ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

আগষ্ট বিপ্লবে দুর্ম্মদ রাজশক্তি কলিকাতার রাজপথে নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে মেসিনগান-সমন্বিত সাঁজোয়া গাড়ীতে ব্রিটিশ গোলন্দাজগণ নিরস্ত্র জনগণের সহিত যে অপূর্ব্ব সংগ্রাম করিয়াছে তাহা ব্রিটিশ-বীরত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে! বিশ্বের বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে পশ্চাৎ অপসরণ করিলেও অনশনে অর্দ্ধাশনে মৃত্যুপথযাত্রী নিরস্ত্র শিশু ও নারীদের হত্যা করিয়া বৃটিশ ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখিয়াছে। আগষ্ট বিপ্লবের হোমানলে বাংলার প্রথম আহুতি বৈদ্যনাথ সেন।

ক্ষুব্ধ জনতার রুদ্ধ আক্রোশের ফলে সহরের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও পুলিশের সহিত প্রবল সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফলে মহানগরীর রাজপথ পুলিশ ও মিলিটারী লরীর ভস্মস্তূপে যান-বাহন চলাচল অসাধ্য হইয়া উঠে। বিডন ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা পোষ্ট অফিস সমূহ, বহুবাজার, সারকুলার রোড, পার্শীবাগান, গড়িয়াহাটা প্রভৃতি স্থানের আবগারী দোকান, ঢাকুরিয়া রেল-ষ্টেশন, ট্রামগাড়ী ও ট্রেণের কামরা প্রভৃতি জনতা কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হয়। সহরে কৃষ্ণবর্ণ রাজপথ মৃত শহীদের শোণিত-রেখায় নব্য ভারতের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে।

মেদিনীপুরের আন্দোলন আরম্ভ হয় কাঁথি মহকুমা হইতে। ১৪ই আগষ্ট পটাশপুর, ভগবানপুর ও খেজুরী থানা এলাকায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। কাঁথির স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও শোভাযাত্রা সহ নগর প্রদক্ষিণ করে। বিপ্লবী কর্ম্মীরা বিভিন্ন স্থানে সভা শোভাযাত্রা করিয়া জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিবার আহ্বান জানায়। স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বানে বহু চৌকিদার, দফাদার ও সরকারী কর্ম্মচারী চাকুরী ছাড়িয়া দেশ-মাতৃকার বন্ধন-মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর দশ হাজার লোকের দুইটি শোভাযাত্রা মফঃস্বল হইতে কাঁথি সহরে আসে। কর্ত্তৃপক্ষ শোভাযাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করে নির্ম্মম গুলী ও লাঠি চালনা দ্বারা। এই ঘটনার পর মহিষ-গোঠ, বেলবাণী, ডাইটগোড়, ভগবানপুর প্রভৃতি স্থানে দাবানল জ্বলিয়া ওঠে। বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী জনতাকে স্তব্ধ করার জন্য বৃটিশের রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল এবং অগ্নি-নালিকার মুখে ৩১ জন নিহত ও ১৭৫ জন আহত হয়। বিদেশী শাসক ইহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই। সরকারী দুর্বৃত্তগণ নিরীহ গ্রামবাসীর গৃহে অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ-তন্ত্রের কোন ধারাই বাদ রাখে নাই।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ মেদিনীপুরের গৌরবময় ইতিহাসকে আরও গৌরবময় করিয়াছে, শোণিত-রেখায় জাতির ইতিহাসকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। সরকারী অত্যাচারে জনগণ ধৈর্য্যহীন হইয়া উঠিল, তাহারা ঠিক করে ২৯শে সেপ্টেম্বর থানা, আদালত ও অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রে যুগপৎ হানা দেওয়া হইবে। সেই দিন মিলিত হিন্দু-মুসলমানের লক্ষাধিক জনতা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গাছ ফেলিয়া তমলুক-পাঁশকুড়া, তমলুক-মহিষাদল প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রোধ করা হয়। ৩০টি পুল ভাঙ্গিয়া ও ২০ জায়গায় সড়কের উপর বড় গর্ত্ত করিয়া ২৭ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার বিনষ্ট করা হয়। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাহ্ণ ৩টার সময় বিভিন্ন দিক হইতে ৪টি বৃহৎ শোভাযাত্রা সহরের দিকে অগ্রসর হয়। সরকারী ব্যবস্থা ও সমারোহ কম ছিল না। শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যপূর্ণ সহরটিকে দেখিয়া দূর হইতে সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়াই ভ্রম হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি সড়ক সিপাহীরা লাঠি লইয়া পাহারা দিতেছিল এবং প্রতিটি সিপাহীর পিছনে ছিল রাইফেলধারী সৈন্য।

পশ্চিম দিক হইতে একটি বড় শোভাযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে প্রায় আট হাজার বিপ্লবী। থানার নিকটবর্ত্তী হইলে জনৈক বাঙ্গালী দারোগার আদেশে সিপাহীরা অহিংস শান্ত জনতার উপর লাঠি চালনা আরম্ভ করিল। ইহাতে শোভাযাত্রা থামিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। লাঠি চালনা ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত দারোগার গুলী চালাইবার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেপরোয়া গুলী বর্ষণ আরম্ভ হইল। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইলেও গুলী বর্ষণের মুখে কয়েক জন বিপ্লবী থানা অভিমুখে অগ্রসর হয়। সৈন্যদল দৌড়াইয়া থানায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মৃত্যু-ভয়হীন বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ সৈন্যদের আবার রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল। গুলীর আঘাতে বিপ্লবী দল এক-এক করিয়া ধরাশায়ী হইলেন। গুলী ও লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত সংজ্ঞাহীন রামচন্দ্র বেরাকে মরণভয় দল পা ধরিয়া টানিতে টানিতে থানার সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়া রাখে। যখন রামচন্দ্রের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল,

তখন তিনি ক্ষতের বেদনা ভুলিয়া গিয়া আপনার গুলী-জর্জ্জর দেহটিকে থানার দরজা পর্য্যন্ত কোন প্রকারে লইয়া গেলেন। জয়ের আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি এখানে.—থানা দখল হইয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইল।

আর একটি শোভাযাত্রা উত্তর দিক হইতে সহরে প্রবেশ করে প্রায় একই সময়ে—শোভাযাত্রার পুরোভাগে জাতীয় পতাকা হস্তে ৭৩ বর্ষীয়া বৃদ্ধা মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরা। বৃটিশ সৈন্যদল পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। বানপুকুরের পাশে সঙ্কীর্ণ স্থানে আসিবা মাত্র ব্রিটিশের অগ্নি নালিকা পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল। জনতা কিছু দূর সরিয়া গেল। স্বাধীনতার সৈনিক দল পুনরায় দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়। গান্ধীজীর নামে উপবাসী মহিলার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল—"করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে"। সমবেত বিপ্লবী জনগণের প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ সৈন্যগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। পুনরায় গুলী বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিপ্লবী জনতাও দৃঢ়পদে গুলী বর্ষণের মুখে অগ্রসর হইতেছে—এমন সময় মৃত্যুভয়-লেশহীনা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীর দুই হস্তে দুইটি গুলী আসিয়া লাগিল। জাতীয় পতাকা সামান্য নত হইলেও বৃদ্ধা জাতীয় পতাকা সমগ্র শক্তিতে ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও ভারতীয় সৈন্যদের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক হইতে অনুরোধ করিলেন। ইহার উত্তরে আসিল আর একটি বুলেট—যাহা তাঁহার কপাল ভেদ করিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। পরাধীন ভারতের এই মহিয়সী নারীর রক্তে তাম্রলিপ্তের ধূলি পবিত্র হইল। তাঁহার হস্তস্থিত জাতীয় পতাকা আর এক জন বিপ্লবী সৈনিক আসিয়া গ্রহণ করিল। মহিষাদল ও সুতাহাটাতেও সেই দিন গুলী বর্ষণের মুখে বিপ্লবীদের জয় ঘোষিত হয়। এদিকে ১৬ই অক্টোবর তারিখে সমগ্র কাঁথি মহকুমায় এক প্রলয়ঙ্কর বাত্যা ও প্লাবন বহিয়া যায়। নিষ্ঠুর সরকার এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়কে তাহার অত্যাচারের এক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করিল অসহায় নর-নারী ও শিশুর উপর। অবশেষে বিদেশী সরকারের পাশবিক শক্তিকে পরাজিত করিয়া ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্তে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে ৮ই আগষ্ট গান্ধীজীর আদেশে তাম্রলিপ্ত সরকার ভাজিয়া দেওয়া হয়।

আগষ্ট আন্দোলনে যাঁহারা প্রকাশ্য বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইলেও এই মহা বিপ্লবে বাংলার অবদানের ইতিহাস আজিও অসম্পূর্ণ আছে। রক্তের স্বাক্ষরে লেখা আগষ্ট বিপ্লবী দুর্গাদাসের শেষ পত্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে বাংলার বাহিরে সুদূর দাক্ষিণাত্যের কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে রাত্রির গোপন অন্ধকারে বিচারের প্রহসনের পর নয় জনের মৃত্যুদণ্ড, দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং এক জনের সাত বৎসরের জেল হয়। অন্যতম মৃত্যুপথযাত্রী দুর্গাদাস ফাঁসীর শেষ রজ্জু চুম্বনের পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহা জাতির অপূর্ব্ব সম্পদ।

"প্রিয় বন্ধুগণ,—

কেন ফাঁসী হবে তা' জানতে চেয়েছ। ওরা তো বলে, আমরা না কি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমাদের মধ্যে ন'জনকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে, দু'জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে কাটাতে হবে। আর এক জনকে সাত বছর জেল খাটতে হবে। আমরা সব বাংলার সৈনিক। ভাই সব! তোমরা ভারতমাতার সনাতন ডাকে আজ সাড়া দিয়েছ আর তারই জন্যে আজ কারা-জীবন বরণ ক'রে নিয়েছ। এর জন্য অন্তর থকে ধন্যবাদ জানাই তোমাদের। দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমাদের কাজ তোমাদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ আমাদের কাছে সান্ত্বনার উৎস-স্বরূপ হবে।······ দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করার জন্য আমরা ঠিক করেছি। আজ, তোমাদের হিন্দু-মুসলমানদের সবার এক মন, এক প্রাণ হয়ে কাজ করার সময় এসেছে। ভাই সব! নিজের পায়ে একবার উঠে দাঁড়াও। মাতৃভূমির দাসত্ব ঘোচাবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বিদেশী শক্তির উপর কঠিন আঘাত হানো। আমাদের ভবিষ্যতের সাথীরা যাতে উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে, তার জন্য আমরা তোমাদের পেছনে রেখে যাচ্ছি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীষ। প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রার্থনা করি উদ্দেশ্য তোমাদের সফল হোক, সফল হোক তোমাদের জীবন, আর সার্থক হোক তোমাদের ভারতীয় নাম, তোমাদের কাছে ভাই এই আমাদের শেষ কথা। শুক্রবার সকাল থেকে প্রত্যেক দিন দু'জন করে আমরা একে-একে পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। আমাদের ভালবাসা জেন।" ইতি

দুর্গাদাস (রক্তের দ্বারা স্বাক্ষর)

"এক কথায়, আজকের দিনে বাঙালার সাহিত্য-সমাজ লোকে লোকারণ্য এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গ-মহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন, তা নয়, অনেকখানি জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ, এ স্থলে এঁরা ব'সে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলেছেন। ইংরাজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে Peaceful penetration, সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল ক'রে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে, এ রাজ্য হয়ত ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে।"

—প্রমথ চৌধুরী।

ঋগ্বেদ—রূপান্তর

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১।১৯।১—৯

অগ্নিমারুতী দেবতা—কণ্বপুত্র মেধাতিথি ঋষি—গায়ত্রী ছন্দ।
বর্ষণের জন্য কারিরি যজ্ঞে এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

প্রতি ত্যং চারু মধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ১।

নহি দেবো ন মর্ত্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ২।

যে মহো রজসো বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৩।

য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৪।

যে শুভ্রা ঘোর বর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৫।

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৬।

য ইঙ্খয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৭

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৮।

অভি ত্বা পূর্ব-পীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৯॥

হে অগ্নি,
মরুৎদের সাহিত্তী-তে তুমি এস।
আমার সুচারু যজ্ঞে বারংবার তুমি এস।
তোমাকে এই আমার আহ্বান।
জ্যোতির রস-পানের উদ্দেশ্যে
এই আমার আবাহন। ১॥

হে অগ্নি, তুমি এস
মরুৎদের সঙ্গহীন কোরো না।
বারংবার এসো।
তোমার এই যজ্ঞের পরিচ্ছন্নতার পর-পারে
আপেক্ষিত দেবত্ব নেই— ;
মর্ত্ত্যত্বতা নেই।
তুমিই কি মহৎ? ২॥

হে অগ্নি তুমি এস।
মরুৎদের সাহিতী-তে তুমি এস।
যিনি মহৎ—সেই তিনি
রাজসিকতাকে প্রদান করেছিলেন বেদনা।
তার পরে আসে,—
দেবসঙ্ঘের প্রতি আদ্রোহীতা। ৩॥

হে অগ্নি, তুমি এস
মরুৎদের সাহিতী-তে তুমি এস।
তাদের মধ্যে রয়েছে অর্ক পূজা।
উগ্র প্রবলতার তেজস্বিতা আমার অসহ্য। ৪॥

হে অগ্নি তুমি এস,
মরুৎদের সাহিতী-তে তুমি এস।
তারা দান করে শুভত্য,
তাদের পর্ব্বে পর্ব্বে রয়েছে ঘোর উগ্র-রূপ।
তাদের মধ্যে রয়েছে ক্ষাত্র সুসংহিতা।
তারা হিংসিত দানকে
ভক্ষণ করে সম্পূর্ণরূপে বারংবার। ৫॥

হে অগ্নি, তুমি এস—
মরুৎদের সাহিতী-তে তুমি এস।
তারা বাস করে
আকাশের অধীনতায়;
বসে থাকে
যেন দেবতাদের সঙ্ঘ-
রুশ্চিমান্ দিব্যতায়। ৬॥

যিনি দর্শন করেছেন
পর্ব্বতগুলি—
এবং সলিল-শালিত সমুদ্রের তীর
হে অগ্নি তুমি, তাঁর সঙ্গে-
এবং মধুস্বের সঙ্গে এস। ৭॥

ঐ মরুতেরা
তেজে এবং বীর্য্যে
জ্যোতির সমুদ্রের তীরে
গঠনকারী-দেবতা।
হে অগ্নি, তুমি এস
মরুৎদের সাহিতী-তে তুমি এস। ৮॥

হে অগ্নি,
তোমার পূর্ব্বপানের অধিকারের সৌকর্য্যে
আমি সৃষ্টি করেছি সৌম্য মধু
মরুত্তদের সহকারিতায় তুমি এস। ৯॥

অগ্নি-পরিচয়

সংস্কৃত অগ্নি এবং ল্যাটিন ইগ্‌নিস (Ignis) এই উভয় শব্দে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অগ্নি (পুং) অঙ্গ-নি। অঙ্গের্ন-লোপশ্চ। উন্ পাদ। অঙ্গতি উর্দ্ধং গচ্ছতীতি। অনল, বহ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, তনূনপা, কৃশানু, বায়ুসখা, রোহিতাশ্ব, চিত্রভানু, আশুশুক্ষণি, পাবক, শুক্র, বিভাবসু, অরণি, হিরণ্যরেতস, সপ্তজিহ্ব প্রভৃতি অগ্নির অপরাপর নাম। পরম পুরুষের মুখে অগ্নির জন্ম। ঋক্ ১০।৯০।১। মতান্তরে ধর্ম্মের ঔরসে বসু-ভার্য্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। কোন স্থলে দেখা যায়, অগ্নি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অগ্নি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ। ইহার কেশশ্মশ্রু, ভ্রূ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, হাতে শক্তি ও অক্ষসূত্র। বাহন ছাগ। অগ্নি দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্বাহা অগ্নির স্ত্রী। আর্য্যেরা অরণি মথিত করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন। মানুষের যখন চক্ষু ফুটে নাই, জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, তেমন অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই সম্ভব। হিন্দু, পারস্য, কালডিয়া, মিসর, ইহুদী, গ্রীক, রোমক, চীন প্রভৃতি সকল জাতির শাস্ত্রেই দেখা যায় যে, দেব-মন্দিরে রাত্রি-দিন তাহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিত।

মাইকেল আরৎজিবাষেভ

বাইশ

সূর্য্যের উত্তাপটা ঠিক বসন্ত কালের মতোই তীব্র, কিন্তু শান্ত স্বচ্ছ হাওয়ায় যেন হেমন্তের স্পর্শ। গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় রঙের উৎসব ; নিস্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ পাখীর ডাক। ফুলের শুক্‌নো পাপড়ীতে আর বিবর্ণ-ঘাসের ওপর পতঙ্গের গুঞ্জন একেবারেই লুপ্ত হয়নি।

ইউরাই বাগানে পায়চারী করছিল। আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে একবার সে মুখ তুলে তাকালো আকাশের দিকে, সবুজ হল্‌দে শাখা-পল্লবের দিকে, নদীর চক্‌চকে জলের দিকে,—যেন তার এই শেষ দেখা,—মনের গহনে যেন এই চার পাশের ছবির স্মৃতি সে চিরতরে অন্তরের পটে এঁকে নিতে চায়। কী রকম একটা অস্পষ্ট বেদনা ও মনে অনুভব করছে এই ভেবে যে, মুহূর্ত্তের প্রবাহ বয়ে কি যেন সব ওর জীবন থেকে খসে-খসে পড়ছে—যা কি না ও কোনো কালেই ফিরে পাবে না। যৌবনে পেলো না ও তারুণ্যের আনন্দ ; যে বিরাট কাজে ও এককালে করেছিল আত্মনিয়োগ, তার থেকেও পায়নি কোনো দিন কর্ম্মের দ্যোতনা। তথাপি নিজের শক্তি সম্বন্ধে ছিল ও অত্যন্ত আত্মসচেতন,—সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের পরিচালনা করবার ক্ষমতা ওর আছে—এই ওর বিশ্বাস। এত বড় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে কেন ওর এমন নৈরাশ্যবাদী মনোভাব তা ও কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না।

নদীস্রোতের দিকে তাকিয়ে ও বল্‌ল স্বগতঃ, "হয়তো আমি যা' করছি তাই শ্রেষ্ঠ। যতই চেষ্টা করি না কেন মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।" এমন সময় ও দেখল, লালিয়া আস্‌ছে। ভাবল : "আঃ, লালিয়া কী সুখী! প্রজাপতির মতো ও জীবনকে উপভোগ করছে! ওর মতো যদি পারতাম আমিও!"

"ইউরাই! ইউরাই!"—ডাক্‌তে ডাক্‌তে লালিয়া কাছে এলো, দুষ্টুমীর হাসি হেসে একটা গোলপী খামের চিঠি দিল ইউরাই-এর হাতে।

"কে লিখেছে?"

মুখের ওপর আঙুল নেড়ে লালিয়া জবাব দিল, "শ্রীমতী সিনোচ্‌কা কার্সাভিনা।"

লালিয়ার হাত থেকে একটি সুগন্ধি গোলাপী খামের চিঠি পেতে ইউরাই ভয়ানক লজ্জিত হোল। চিরকালের, সব দেশের বোনেদের মতোই লালিয়াও ভাই-এর প্রেমের ব্যাপারে সকৌতুক আনন্দ বোধ করত। আঃ, দাদা যদি সীনাকে বিয়ে করে, খুব—খু-ব ভালো হয়।

'বিয়ে'!—চম্‌কে উঠল ইউরাই। ওর চোখের সামনে এক গতানুগতিক জীবনের ছক যেন খুলে গেল।—বোনের মারফৎ ওর বান্ধবীর সঙ্গে পূর্ব্বরাগ, চিরাচরিত প্রথায় বিবাহ, সংসার, স্ত্রী, সন্তান,···বীভৎস পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার।

"কি সব ছাই-ভস্ম বল্‌ছো?"—ইউরাই ওকে ধমক দিল।

"বাজে বোকো না!" লালিয়া ন্যাকামীর সুরে বল্‌ল। "যদি

প্রেমে পড়েই থাকো,—কি অন্যায়টা হয়েছে? আমি বুঝতেই পারি না, তুমি কেন যে এমন এক অসাধারণ বীরপুরুষের মুখোস পরে' বেড়াও।"

রেগে দুম্-দুম্ করে লালিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাম খুলে ইউরাই পড়ে গেল :—

"ইউরাই নিকোলাইভেভিচ,

আপনার যদি সময় হয় এবং আপত্তি না থাকে, একবারটি মঠে আসবেন আজকে? আমার পিসিমা'র সঙ্গে আমি সেখানে যাবো। তিনি দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সারা দিন গীর্জ্জাতেই থাকবেন। বড্ডো বিশ্রী আর একলা লাগবে আমার; আর আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবারও আছে। আসবেন যেন। বোধ হয় আপনাকে লেখা আমার উচিত হোল না, কিন্তু আপনাকে আশা করব।"

যে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব ওর মাথায় এতক্ষণ গিজ্‌গিজ্ করছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তা গেল উবে। প্রায়শারীরিক একটা পুলক ও অনুভব করল। এই নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটি তার মনের গোপন ভালোবাসার কথাটি ওর কাছে বিশ্বাস করে প্রকাশ করেছে। আহা! সব কিছুই যেন ত্যাগ স্বীকার ক'রে ওর কাছে আত্মনিবেদন করবার প্রস্তুতি নিয়েই মেয়েটি ওকে চিঠি লিখেছে!

সন্ধ্যার দিকে একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে ও মঠের দিকে গেল; নদীর পারে এসে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে নৌকো নিল। মঠের ঘাটে গিয়ে ও নৌকোর মাঝিকে খুসী হয়ে আধ রুবল্ বক্‌শিসই দিয়ে দিল।

সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ও মঠের দিকে উঠছে, চত্বরটার কাছাকাছি আসতেই কে যেন পেছন থেকে ওকে ডাক্‌ল, "হ্যালো, স্বারোগিশ্!"

ফিরে তাকালো ও। শ্যাফ্‌রফ, শ্যানিন্, আইভানফ্, পীটর, মহা উল্লাসে চত্বর পেরিয়ে আসছে। ওদের উল্লসিত কলরবে সত্যিই মঠের গাম্ভীর্য্য যেন ব্যাহত হচ্ছিল, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দু'-চার জন সন্ন্যাসী ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেনও।

"আমরাও এসেছি," বলল শ্যাফরফ ওর দিকে এগোতে এগোতে।

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি!"—বিরক্ত সুরে বিড়-বিড় করে বলল ইউরাই।

"আসুন না আমাদের সঙ্গে"—শ্যাফ্‌রফ বলল।

"না, ধন্যবাদ, আমি একটু ব্যস্ত আছি।" অধৈর্য্য হয়েই জবাব দিল ইউরাই।

"ও কিছু না! আমি জানি আপনি ঠিক আসবেন!" বলেই আইভানফ্ ওকে ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রেগে গিয়ে ইউরাই বলল, "না, না, তা হয় না।" আইভানফ্-এর এ রকম চাষাড়ে আপ্যায়ন ওর ভালো লাগল না। বলল, "আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।"

ওর রাগত ভাব আইভানফ্ লক্ষ্য করল না। তবে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "অল্ রাইট্! আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। মনে থাকে যেন।"

হৈ-হল্লা করতে করতেই ওরা বিদায় নিল। ওরা চলে যেতেই মঠের চত্বরটায় আবার নেমে এলো নিস্তব্ধ প্রশান্তি। গীর্জ্জার দিকে পা বাড়াতেই ও দেখতে পেলো—একটা থামের পাশে সীনা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ধূসর রঙের জ্যাকেট এবং খড়ের টুপিতে ওকে অনেক কম-বয়সী স্কুলের ছাত্রী বলে মনে হচ্ছে। ইউরাইকে দেখতে পেয়েই ও যেন কেমন ব্রীড়ানতা হয়ে পড়ল।

সকালের মনোভাব মনে পড়তেই ইউরাই ভাবল, 'তা'হলে সত্যিই সুখী হওয়া যায়?' ভাবল: 'তা যাবে কেন? মৃত্যু এবং জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে আমার যা মনোভাব তা পাকা বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তবু এ কথাও স্বীকার করা যেতে পারে যে, কোনো কোনো সময়ে মানুষ সুখীও হতে পারে।'

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে সীনা বলল, "বাইরে আসুন।"

নীরবে ওরা দু'জনে পাশাপাশি হয়ে গীর্জ্জার থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

নদীটা যেখানে পাহাড়ের পাড় ঘেঁসে বয়ে চলছিল, ওরা দু'জনে গিয়ে সেখানে বসল। কার্পেটের মতো ঘাস যেখানে কোমল আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীর ধূলি আর মাটি,—পাশাপাশি মাটিতে হেলান দিয়ে ওরা পরস্পরকে চুম্বন করল;—কোনো ভূমিকা কোনো কথার উপক্রমণিকা প্রয়োজন হোল না ওদের।

মৃদু স্বরে সীনা বলল, "আপনি আমাকে ভালোবাসেন?"

যেন বনের রোমাঞ্চের বাণী ওর কথার সুরে আভাষ মাখিয়ে দিয়েছে।

নিজেই নিজেকে আশ্চর্য্য হয়ে ইউরাই শুধোলো, "এ আমি কী করছি?" এক লহমার ভেতর ইউরাই-এর কাছে সব বিস্বাদ হয়ে গেল, বারিসিক্ত শীতের ঘোলাটে দিনের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠল সব। আনিমীল নয়নে সীনা ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। কী রকম একটা লজ্জা বোধ করল,—কুঁচকে সরে এলো ইউরাই-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে। পরস্পরবিরোধী অজস্র ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইউরাই তখন অভিভূত। ও আবার সীনাকে আদর করবার অভিপ্রায়ে জড়িয়ে ধরতে গেল, কিন্তু এবার সীনা বাধা দিল। আহত ভীত একটা পশুর মতো সীনার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ইউরাই আর চেষ্টা করল না ওকে আলিঙ্গন করতে।

অসহ নীরবতা। হঠাৎ ইউরাই বলে উঠল, "মাপ করুন আমাকে···আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছি।"

দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝতে পারলে ইউরাই, সীনাকে এ কথা বলা ঠিক হয়নি। এ কথায় ও আঘাত পেয়েছে হয়তো। বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে কতগুলি অবান্তর মামুলী ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপের ভাষা;—ও নিজেই জানে এ-সব কথার কোনো মানে হয় না। সীনার কাছ থেকে এখন পালাতে পারলে যেন ও বেঁচে যায়। পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

সীনা ইউরাই-এর মনোভাব বুঝল। ও বলল, "আমার···ফিরে যাওয়া উচিত···"

ওরা উঠে দাঁড়ালো। ইউরাই একবার ওর মানসিক উত্তেজনা ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা ক'রে সীনাকে দুর্ব্বল ভাবে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সীনা বুঝল এ আকুতি মূল্যহীন; ইউরাই-এর চেয়ে নিজের মনের জোর বেশি বলে উপলব্ধি করল। নিজে থেকেই ইউরাইকে সবলে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন দিল ওর ঠোঁটে

বলল, "গুড বাই! কালকে আসবেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে!"

নীচে নেমে আস্‌তে আসতে আপন মনে বলল ইউরাই: "একটি নিষ্পাপ মেয়েকে নষ্ট করা কি আমার মানায়? আর পাঁচ জন যা করে, আমিও কি তাই কর্‌ব! ভগবান ওর মঙ্গল করুন। বড়ো অন্যায় হোত কিন্তু···কী বিশ্রী ব্যাপার···পশুর মতো—কোনো কথা না বলে···কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই···!"কিছু সময় আগে যে চিন্তাটাই ওর কাছে সুখকর ছিল, এখন হয়ে উঠ্‌ল তা ন্যক্কারজনক। তবুও, ও মনে-মনে অনুভব করল একটা চরম অতৃপ্তি এবং লজ্জা। ওর হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন ওর কোনো নিজস্ব সত্তাই নেই,—এমনই অবসন্ন বোধ করল নিজেকে।

ক্ষোভের সঙ্গেই প্রশ্ন করল নিজেকে: "আমার কি বেঁচে থাক্‌বার সত্যিই কোনো ক্ষমতা আছে?"

তেইশ

এক জন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ছাদের একটা কোণের দিকে দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, শহর থেকে সাতটি যুবক এসেছেন—তাঁরা ওদিকেই আছেন।"

ও এগিয়ে যেতে-যেতেই শুনতে পেল, শ্যাফ্‌রফ বলছে, "জীবন হচ্ছে এমন একটা রোগ যা কি না নিরাময়যোগ্য নয়।"

"আর তুমি হচ্ছ একটি চিকিৎসার অযোগ্য গোমূর্খ।"—প্রতিবাদ ক'রে আইভানফ, বল্‌ল, "তোমার এই কথার মার-প্যাঁচটা থামাও তো বাপু!"

ওদের কাছে আসতেই ইউরাই এক প্রগল্‌ভ সরব অভ্যর্থনা পেলো।

শ্যাফ্‌রেফ্‌-এর খুসীটাই বেশি প্রকট হয়ে উঠল। ওর হাত ধরে লাফাতে লাফাতে বল্‌ল, "এ আমি ভাবতেই পারিনি··· ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,···এক লাখ ধন্যবাদ!"

ইউরাই গিয়ে স্যানিন্‌ এবং পীটরের মাঝখানে বস্‌ল। স্বল্পালোকিত মঠের ছাদ থেকেও আকাশের তারাগুলিকে পরিষ্কার জল্‌ জল্‌ করছে দেখা যাচ্ছে; দূরের পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট। বন থেকে পতঙ্গ উড়ে আসছিল; একটা পোকা ওদের সামনে জ্বালিয়ে-রাখা মোমবাতীর শিখার চার দিকে উড়ছিল। ইউরাই এর মনে হোল: "আমরাও তো ঐ রকমই দীপশিখার মতো উজ্জ্বল এক-একটা আইডিয়ার চার পাশে ঘুরছি, আমাদেরও পরিশেষ তো ওদেরই মতো। আমরা ভাবি পৃথিবীর মর্ম্মবাণী বুঝি ঐ এক-একটা উজ্জ্বল আইডিয়াতেই আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু আদতে ওগুলো আমাদের নিজেদের উষ্ণ মগজেরই বিকৃতি ছাড়া আর কিছু না!"

সহৃদয় ভাবে একটা ভদ্‌কার বোতল এগিয়ে দিয়ে স্যানিন্‌ ওকে পান করতে অনুরোধ করল।

খেলো বটে, কিন্তু ইউরাই-এর চিন্তার জট ক্রমশঃই আরো বেশি করে জড়িয়ে যেতে লাগল। "মৃত্যুই হোক্‌, আর সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসনই হোক, কিছুই যায়-আসে না,"—ভাবল ইউরাই,—"মোদ্দা কথা এই যে, আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু যাবো কোথায়? যেখানেই যাই না কেন, নিজের কাছ থেকে পালাতে তো পারব না! জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে শান্তি কখনোই আসে না,—তা এখানকার এই গর্ত্তেই থাকো আর সেন্ট্‌ পীটারস্‌বার্গেই থাকো।"

শ্যাফরফ্‌ চেঁচিয়ে বল্‌ল, "আমি এইটে বুঝি যে, একক ক'রে বিচার করে দেখলে মনে হবে,—মানুষের কোনো মানেই হয় না। ···ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের দাম নেই কিছুই। শুধু তাদেরই যা-কিছু অবদান পৃথিবীকে শক্তিশালী করেছে, যারা জনগণের ঊর্দ্ধে থেকে, অথচ সংস্পর্শরহিত না হয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ না ক'রে থাকতে পারে,—তারাই যা-কিছু সামর্থ্যের অধিকারী; তাদের বুর্জ্জোয়াই বলুন আর যাই বলুন।"

মারমুখো হয়ে আইভানফ্‌ বলে উঠল, "এই শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায় কি ভাবে শুনি! গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে? খুব সম্ভব তাই! কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সুখ-সমৃদ্ধির লড়াইতে জনসাধারণ কি ভাবে তাদের সাহায্য করবে?"

"তুমি অতি-মানুষ হতে পারো, তোমার সুখ-সমৃদ্ধির ধারণা হয় তো আলাদা কিছু। কিন্তু আমরা যারা জনসাধারণ,—আমরা মনে করি, আমাদের মতো অন্যান্যের সুখ-সুবিধার জন্য লড়াই-এর মধ্যে আমাদের নিজেদেরও মঙ্গল নিহিত আছে। যে আইডিয়া নিয়ে আমরা লড়াই করছি, তার জয়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত মংগল পরিস্ফুট হবে।"

"আর যদি সেই আইডিয়া একটা ভুল আইডিয়া হয়?"

"তাতে কিছুই যায়-আসে না। বিশ্বাসই সব কিছু।"

"বাঃ!"—ব্যঙ্গের সুরে আইভানফ্‌ বলল, "প্রত্যেকেই মনে করে যে, তার নিজের কাজটাই পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের তুলনায় সব চেয়ে মূল্যবান। এমন কি, মেয়েদের পোষাক বানায় যে দরজী, —সেও তাই ভাবে। তুমিও সে কথা বেশ জানো; মনে হচ্ছে ভুলে গেছ। তাই, বন্ধু হে, তোমাকে সেই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

ইউরাই বল্‌ল, "তা হলে আপনার মতে কিসে সুখ-শান্তি হতে পারে?"

"নিশ্চয়ই অনবিচ্ছিন্ন দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ এবং এমন সব প্রশ্নের ভেতর নেই,—যেমন, 'এই যে আমি হাঁচলাম বা কাস্‌লাম, তা কি ভালো হোলো,—আমার কর্ত্তব্য কি এই হাঁচি বা কাসির ভেতর দিয়ে কিছুটা করা গেল?'—"

"কিন্তু জীবনের একটা প্রোগ্রাম থাকা চাই তো!"

"সত্যিই কি তার কোনো দরকার আছে? আমার খুসী হোলো,—ক্ষমতা আছে,—যা-হয় কিছু করা যেতে পারে; আমি তো তাই-ই করি। ঐ আমার প্রোগ্রাম!"

"আহা-হা, কী আশ্চর্য্য প্রোগ্রাম!"—রেগে গিয়ে শ্যাফরফ্‌ বল্‌ল।

আলোচনা ক্ষান্ত রেখে সবাই মিলে নীরবে ভদ্‌কা পান করতে লাগল।

ইউরাই স্যানিন-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ কা'কে বলে, তাই নিয়ে ওর নিজের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। শ্যাফরফ্‌ ওকে শ্রদ্ধা করত, সে গরুড়ের মতো ওর দিকে তাকিয়ে

রইল। আইভানফ্ ওর দিকে পেছন ফিরে মন্তব্য প্রকাশ করল, "ঢের শুনেছি ও কথা।"

স্তানিন্ আলস্য ভরে বলল, "থামুন থামুন! বিশ্রী লাগছে না আপনার? নিজের মতামত গঠন করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কি বলেন?"

ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্তানিন্ চত্বরের দিকে বেরিয়ে গেল। নেশায় এবং আলোচনা শুনে-শুনে ওর শরীর গরম হয়ে উঠেছিল; বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভারী আরাম বোধ করল ও।

একটি ছোট ছেলে এগিয়ে এলো ওর কাছে।

"কি চাই?"—জিজ্ঞাসা করল স্তানিন।

"মাদাম কার্সাভিনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,—সেই যে স্কুল-টিচার!"—ছেলেটি বলল।

"কেন রে?"

"একটা চিঠি এনেছি, ওঁকে দিতে হবে।"

"ওহো,—কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। দেখো তো গীর্জায় আছে না কি?"

ছেলেটা গীর্জার দিকে এগিয়ে গেল। স্তানিন নিঃশব্দে ওর পেছন-পেছন চলল।

গীর্জার পাশে যেখানে সারি-সারি ঘর রয়েছে দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছুদের ও তীর্থযাত্রীদের থাকবার জন্য, সীনা ও তার পিসী এরই একটা ঘরে উঠেছিল।

স্তানিন দূর থেকে ঘরের আলোয় দেখল সীনাকে। পরিধানে রাত্রিবাস, মৃদু আলো ওর গ্রীবাদেশে প্রতিফলিত। আপন চিন্তায় আত্মনিমগ্না, চোখের পাতা যেন কোন্ আবেশে কেঁপে উঠছে! স্তানিন মুগ্ধ হয়ে তাকালো ওর দিকে।

দরোজায় করাঘাত হতেই সীনা এগিয়ে এলো। ছেলেটা খুঁজে পেতে গিয়ে হাজির হয়েছিল শেষ অবধি। চিঠিখানা ওর হাতে দিল।

ভুবোভার চিঠি:

"সম্ভবপর হলে আজই সন্ধ্যায় ফিরে এসো। স্কুল পরিদর্শক এসে গিয়েছে, কালই সকালে পরিদর্শন কাজ হবে। তোমার অনুপস্থিতি ভালো দেখাবে না।"

সীনার বৃদ্ধা পিসীমা শুধোলেন, "কি রে?"

"ওলগা ফিরে যেতে লিখেছে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন।"—চিন্তান্বিত ভাবে সীনা বলল।

হাঁটু-ভরতি কাদা মেখে ছেলেটা উসখুস্ করছিল; বলল, "আপনাকে নিশ্চয় করে যেতে বলে দিয়েছেন।"

"যাচ্ছ না কি?"—পিসীমা প্রশ্ন করলেন।

"কি ক'রে যাব? একলা, এই অন্ধকারে?"

"চাঁদ উঠে গেছে"—ছেলেটি জানালো,—"বাইরে বেশ আলো হয়েছে।"

ইতস্তত: ক'রে সীনা বলল, "যেতেই হবে।"

"যা বাছা যা, নইলে শেষটায় যদি কোনো গোলমাল হয়।"

"চলি তা হলে পিসীমা।"

চটপট করে জামা-কাপড় পরে সীনা পিসীমা'র কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলো। ছেলেটাকে শুধোলো, "তুইও যাবি তো?"

"না, আমি মা'র কাছে থাকব বলে এসেছি, মা এখানেই সাধুদের কাপড়-জামা ধোয় যে।"

"তা হলে, বাচ্চু, কি করে একলা যাব বল তো?"

"অল রাইট! আমিই যাচ্ছি, পৌঁছে দেব"—ছোট বীরপুরুষ আশ্বাস দিল।

মাটির, বনের, ফুলের, পাকা ফলের, গন্ধভারে মন্থর হাওয়ার মাঝখানে, তারার চাঁদোয়ার নীচে এসে সীনা দাঁড়ালো।

চমকে উঠল হঠাৎ কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।

"আমি"—হেসে জানালো স্তানিন্।

কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিয়ে সীনা করমর্দ্দন করল ওর সঙ্গে।

"এত অন্ধকার,—আমি দেখতেই পাইনি।"—সীনা কুণ্ঠিত ভাবে বলল।

"কোথায় চলেছেন?"

"শহরে। আমাকে ফিরে যাবার জন্য লিখেছে।"

"সে কি, একা?"

"না, এই বাচ্চু আমার দেহরক্ষী হয়ে চলেছে।"

"দেহরক্ষী! হা-হা—" স্তানিন্ ও বাচ্চা ছেলেটা—দু'জনেই হেসে উঠল।

"আপনি এখানে কি করছেন?"—সীনার প্রশ্ন।

"আমরা ভদ্‌কা খাচ্ছিলাম।"

"আপনারা?—

"এই আমি, স্তাফরফ্, স্বারোগিশ্, আইভানফ্......"

"ও:, ইউরাই নিকোলাইভিচ্ ও আপনাদের সঙ্গে আছেন বুঝি?"—প্রশ্ন করেই ও আরক্তিম হয়ে উঠল। প্রেমাস্পদের নাম উচ্চারণ করতেই কি রকম একটা শিহরণ ও সর্ব্বশরীরে অনুভব করল।

"কেন জিজ্ঞাসা করলেন?"

"না, এই,—ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না।" লজ্জায় আরো যেন নুইয়ে পড়ল সীনা।

"আপনি যদি বলেন, তা'হলে আপনাকে নৌকোয় ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসি। তা নইলে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে আপনাকে।"—স্তানিন প্রস্তাব করল।

"না, না, তার দরকার নেই।"

"হ্যাঁ, তাই ভালো হবে; নদীর পারে বড্ড কাদা।"—ছেলেটা জানালো।

"সেই ভালো। তা'হলে তুমি তোমার মা'র কাছে যেতে পারো।"

"ওপারে একলা মাঠ পেরোতে আপনার ভয় করবে না তো?"—ছেলেটা বলল।

"আমি শহর অবধিই আপনাকে পৌঁছে দেব।"—স্তানিন জানালো।

"আপনার বন্ধুরা কি বলবে?"

"কি বলবে? সকাল অবধি ওরা থাকবে এখানে। তা' ছাড়া, ওদের সঙ্গ আমার বিরক্তিকর লাগছে।"

"আপনার দয়া! যা রে বাচ্চু, তুই যেতে পারিস্।"

"গুড নাইট্ মিস্—" বাচ্চাটা চলে গেল।

"আমার হাত ধরুন,"—স্তানিন্ বলল, "নইলে পড়ে যেতে পারেন।"

সীনা ওর হাত ধরল। ইস্পাতের মতো শক্ত ওর পেশীগুলি। অন্ধকারে, বন পেরিয়ে ওরা নদীর পাড়ে পৌঁছাল।

"কী অন্ধকার!"

"তাতে কি?"—কানে-কানে বলল স্তানিন্। "রাত্রেই বন দেখতে আমার ভালো লাগে। আপন-আপন মুখোস খুলে ফেলে এই সময়েই মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে, রমণীয় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আশ্চর্য্য।"

পায়ের তলাকার বালুমাটি সরে-সরে যাচ্ছিল বলে পা ঠিক রাখা সীনার পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। এই অন্ধকার, এবং এই রমনীয় সুস্থ শক্তিমান পুরুষটির সান্নিধ্য সীনার মনে এক অভূতপূর্ব রম্য ভাবের সঞ্চার করছিল।

পাহাড়ের তলায় অন্ধকার একটু হালকা। নদীর ওপর চাঁদের আবছা আলো। মৃদু-মন্থর হাওয়ায় ছোট-ছোট ঢেউ উঠছে।

"কৈ আপনার নৌকো?"

"ঐ যে।"

স্তানিন্ বসল দাঁড় ধরে, হালে গিয়ে বসল সীনা।

"আমাকে দাঁড় বাইতে দিন। দাঁড় বাইতে আমার ভালো লাগে।"

"বেশ! তাহ'লে বসুন এসে এখানে।"—নৌকোর মাঝখানটায় স্তানিন্ দাঁড়ালো।

আবার ওর সুঠাম দেহের স্পর্শ পেলো স্তানিন্।

নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলল নৌকা। স্বল্পালোকিত নদীর জল, দাঁড়ের শব্দ, সীনার পীনোন্নত বক্ষদেশ,···স্তানিন-এর মনে হল ওরা যেন কোন্ পরীরাজ্যের দিকে চলেছে!

"কী সুন্দর রাত!"—সীনার কণ্ঠে ভাবাবেগ।

"সুন্দর! নয় কি?"—নীচু স্বরে স্তানিন্ বলল।

খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল সীনা; বলল, "কেন, জানি না, ইচ্ছা করছে মাথার টুপীটা জলে ছুঁড়ে ফেলি, আর চুল দিই এলো ক'রে উড়িয়ে।"

মৃদু স্বরে স্তানিন্ বলল, "তাই করুন না—"

ওর মন যে কী খুসীই হয়েছে, তা কি স্তানিন্ জানে?—ভাবল সীনা। বলল, "আপনি ইউরাই নিকোলাইজেভিচ্‌কে অনেক দিন থেকেই চেনেন, নয় কি?"

"না, না,"—স্তানিন্ পাল্টা সুধোলো, "কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

"এই এমনিই। উনি খুব চালাক আর বুদ্ধিমান,—তাই নয় কি?"

ছেলে মানুষের মতো ওর প্রশ্নের ধরণ।

স্তানিন্-এর হাসি ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন ছড়িয়ে পড়ল। স্তানিন্ বলল, "হ্যাঁ—"

ভারী লজ্জা পেলো সীনা। বলল, "সত্যিই উনি খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু বড়ো অখুসী বলে বোধ হয়।"

"খুব সম্ভব। অ-খুসী নিশ্চয়ই। ওর জন্য কি আপনার দুঃখ হয়?"

ন্যাকামী ক'রে বলল সীনা, "দুঃখ হয় বই কি!"

"দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।" স্তানিন্ বলে চলল, "কিন্তু ও সত্যিই আপনি 'অখুসী' এই বিশেষণে তো তা বলতে চাইছেন না! আপনি বলতে চান যে, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাবান কোনো লোক যেন আধ্যাত্মিক দিক থেকে অসুখী না হয়েও তার নিজের প্রতিটি কাজ ও ভাবকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে-দেখেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। এই অনবরত আত্মবিশ্লেষণের জন্যই, আপনি তাকে সম্ভ্রমের আসনে বসিয়েছেন, তাকে দিয়েছেন অন্য সকলের চেয়ে উঁচুতে আসন।"

"তাই তো বটে!"—সীনা বলল।

স্তানিন্-এর অনন্য প্রতিভার কথা ও অন্যদের কাছে শুনেছিল। ওর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্তির সামনে এতটা কথা বলতে পেরে সীনা অস্বস্তি বোধ করছিল।

স্তানিন্ হেসে বলল, "এক দিন ছিল, যখন মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডীর পরিধিতে পশুর মতো বাস করত; নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য কোনো দায় বোধ করত না। এর পরে এলো বিচার-বুদ্ধির যুগ,—যে যুগের সূত্রপাত থেকেই মানুষ নিজের রুচি, প্রয়োজন এবং কামনা-ভাবনাকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে সুরু করল। এই যুগের শেষ বংশধর হচ্ছে এই ইউরাই। যে যুগের আবহাওয়া ওর অস্তিত্বের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, সে যুগ চলে গিয়েছে—তা আর কোনো দিন ফিরবে না। বিষের মতো ছড়িয়ে রয়েছে ওর শিরায় উপশিরায় সে-যুগের আরক। ও কি নিজের জীবন ভোগ করছে? প্রতি কাজে প্রতি চিন্তায় ও অনবরত প্রশ্ন ক'রে চলেছে, 'এটা কি ভালো করলাম?' 'এটা কি অন্যায় করলাম?'—নিজের কাছেই ও নিজে বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কার্য্যকলাপেও ও নিশ্চিন্ত নয়; অন্য সবার সঙ্গে হাত মেলাতেও ওর দ্বিধা, রাজনীতির থেকে সরে দাঁড়ানোও ও অসম্মানকর বলে মনে করে। ওর মতো আরো অনেকে আছে। ওর অনন্য বুদ্ধিমত্তার জন্যই ওকে অদ্ভুত একক বলে মনে হয়।"

ভয়ে-ভয়ে বলল সীনা, "আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। ও যা নয়, আপনি যেন তারই জন্য ওকে দোষ দিচ্ছেন। জীবন থেকে যদি সান্ত্বনা না পাওয়া যায়, তা হলে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তো তাকে থাকতে হবে।"

"জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।"—স্তানিন জবাব দিল, "মহামানবের ও তো একটি অণুমাত্র। হয় তো ও অখুসী। কিন্তু ওর মনের অশান্তি তো ওর নিজেরই মধ্যে। নিজের প্রয়োজনের খোরাক ও জীবন থেকে সংগ্রহ করতে পারে না, অথবা সংগ্রহ করবার সাহস নেই ওর। কতকগুলো লোক আছে যারা কারাগারেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে ভালোবাসে; খাঁচার পাখী যেমন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও আবার উড়ে ফিরে আসে খাঁচায়, —এদের দশাও তাই।···শরীর এবং আত্মা একটি সুসম যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলে, একমাত্র মৃত্যু এসে এই যোগাযোগকে ক'রে দেয় বিপর্য্যস্ত। আমরাই, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-বোধের অসঙ্গতির দ্বারা এই সুসম যোগাযোগকে ব্যাহত ক'রে থাকি। শরীরের আনন্দকে আমরা পাশব আনন্দ বলে অভিহিত করেছি; আমরা তার বিকাশে লজ্জা পাই। যাদের প্রকৃতি দুর্ব্বল তারা এটা লক্ষ্য করে না,—শৃঙ্খলে বাঁধা হয়েই সারাটা জীবন তারা কাটিয়ে দেয়; আর যারা জীবন সম্বন্ধে একটা পঙ্গু মনোভাব পোষণ করে—তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে তথাকথিত শহীদের দল। অবরুদ্ধ শক্তি চায় প্রকাশের সুযোগ; শরীর কাঁদতে থাকে আনন্দের

জন্য, নিজের ক্লীবতায় নিজেই দেয় নিজেকে কষ্ট। বেসুর এবং অব্যবস্থিততা নিয়েই কাটে তাদের সমস্ত জীবন ; নতুন নতুন নৈতিক অনুশাসনকে এরা মজ্জমান লোকের খড়ের টুক্‌রোকে অবলম্বন করবার মতোই জড়িয়ে ধরে, ফলে হয় এই যে, শেষ অবধি এরা কিছু ভাবতেও ভয় পায়, বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতেও ভয় পায়।"

এক পাল নূতন চিন্তা যেন সীনাকে আক্রমণ করল। চার পাশের নিস্তব্ধ রাত্রির পরিবেশ থেকে,—বন, নদী, চাঁদের আলো, সব থেকেই,—যেন ও নূতন ক'রে জীবনের খোরাক পেল।

স্যানিন্ বলে চলল, "এক সোনালী দিনের স্বপ্ন আমার চোখে।—যেদিন মানুষের আনন্দ সংগ্রহের পথে থাকবে না কোনো অন্তরায়, যখন নির্ভীক স্বাধীন মানুষ গ্রহণ করবার উপযোগী সব আনন্দকেই করবে আয়ত্ত।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভবপর ?—বর্ব্বর যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ?"

"না। বর্ব্বর যুগের মানুষ বাস করত বড়ো পশুর মতো, বড়ো কষ্টে। মনের ওপরে ছিল তখন শরীরের তাগিদ। সে সময়কার জীবনের পটভূমিকায় ছিল না কোনো অর্থ বা তেজ। মানব-সভ্যতা তো বৃথাই যুগ-যুগান্তের চক্রবাল পেরিয়ে আসেনি! অজস্র নূতন ঘটনা সংস্থানের দ্বারা এই সভ্যতা, স্থূল চিন্তা, স্থূল কর্ম্ম এবং অজ্ঞেয়বাদের সম্ভাবনা করেছে তিরোহিত।"

"কিন্তু প্রেম ? তাকি আমাদের দেয় না কোনো দায়বোধ ?"—চট্ ক'রে সীনা প্রশ্ন করল।

"না। প্রেম যদি এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তা'হলে বুঝতে হবে তা হয়েছে শুধু ঈর্ষার ফলেই। ঈর্ষা আসে প্রভুত্ব ও দাস-মনোভাবের প্রাবল্যের জন্যই। যে কোনো নামই দিন না কেন, দাসত্ববোধ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে থাকে। ভয়হীন কুণ্ঠাহীন বন্ধনহীন জীবন-বিলাস হচ্ছে প্রেমের অবদান। তারই ফলে হয়ে ওঠে প্রেম মহত্তর, আরো মূল্যবান, অধিকতর মনোরম এবং দেশকালপাত্রভেদে বৈচিত্র্যময়।"

সীনা তাকালো স্যানিন্-এর দিকে। সুদর্শন, প্রাণবান, সুগঠন দেহ। ভাবল : "কী সুন্দর দেখতে ওকে!" মুগ্ধ হোল সীনা। নিজের চিন্তায় হাসিতে উদ্ভাসিত হোল ওর মুখ।

স্যানিন্ নিশ্চয়ই ওর মনোভাব বুঝতে পেরে থাকবে। ওর নিশ্বাস দ্রুততর হয়ে এলো।

হঠাৎ ও উঠে দাঁড়ালো।

"কি হোল ?"—সীনা চমকে উঠল।

"কিছু না। আমি শুধু···"

সীনাও উঠে দাঁড়িয়ে হালের দিকে পা বাড়ালো।

নৌকাটা প্রবলবেগে দুলে উঠল। ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে সীনা টলে পড়ে যাচ্ছিল। স্যানিন্ হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল।

যেটুকু সময় দরকার, তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কি সীনা ওর বক্ষ-সংলগ্ন হয়ে রইল ?

স্যানিন্ ওকে চেপে ধরে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিল।

"কি করছেন আপনি ?···ছেড়ে দিন! দোহাই আপনার···" ক্ষীণ স্বরে সীনা বাধা দিতে গেল।

তারাময়ী রাত্রি প্রতিরোধের শেষ শক্তিটুকু ওর দেহ থেকে নিঃশেষ ক'রে দিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গেল অবশ হয়ে। অপরের ইচ্ছার কাছে সীনা পরাজয় মান্‌ল।

[ক্রমশঃ।

স্বামী বোধানন্দ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর হইতে ১৯০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় তিন বৎসর স্বামী বোধানন্দ বেলুড় মঠেই ছিলেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ টাইফয়েড রোগে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হন। স্বামী বোধানন্দ অক্লান্ত ভাবে ব্রহ্মানন্দজীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। ১৯০৫ খৃঃ স্বামী বোধানন্দ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে কেদারবদ্রী এবং আর কয়েকটি তীর্থ ও কয়েকটি স্থান দর্শনপূর্বক মাদ্রাজ মঠে গমন করেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া তত্রস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে চৌদ্দ মাস অবস্থান করেন। তখন তিনি তথায় নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা দিতেন এবং সাপ্তাহিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে নির্দ্দেশ দেন। সংঘ-গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে ভারত ত্যাগ করিয়া তিনি মে মাসের শেষ সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। তখন হইতে প্রায় আট মাস স্বামী অভেদানন্দের সহকারীরূপে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে তিনি কাজ করেন। তৎপরে পিটসবার্গে যাইয়া বেদান্ত প্রচার আরম্ভ করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় ছয় বৎসর তিনি পিটসবার্গে বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সংঘ-গুরুর নির্দ্দেশে তিনি নিউ ইয়র্কে আসিয়া স্থানীয় বেদান্ত সমিতির কার্যভার গ্রহণ করেন। তখন বেদান্ত সমিতির কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না এবং উহার আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল ছিল। প্রায় প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর সমিতিকে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে আর একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইত। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক ধনী শিষ্যা কুমারী মেরী মর্টন তাঁহাকে চল্লিশ হাজার ডলার দান করেন। কুমারী মর্টন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক ভাইস প্রেসিডেন্টের কন্যা ছিলেন। তদ্দত্ত অর্থে নিউ ইয়র্ক নগরীর এক ভদ্র পল্লীতে

একটি ছয় তলা গৃহ সমিতির জন্ম কেনা হয়। ১৯২১ খৃ: বেদান্ত সমিতি উক্ত স্বামী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি উক্ত গৃহেই সমিতির কার্য চলিতেছে। ইহা আমেরিকার সর্বাপেক্ষা পুরাতন বেদান্ত সমিতি এবং ১৮৯৪ খৃঃ স্বামিজীর প্রেরণায় স্থাপিত হয়।

স্বামী বোধানন্দ সমিতি-গৃহে প্রত্যেক রবিবার একটি সাধারণ বক্তৃতা দিতেন এবং সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীগণকে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিতে বহু মার্কিণ নর-নারীর সমাগম হইত। তিনি আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার ধর্মশিক্ষা বহু নর-নারীর জীবন পরিবর্তিত করিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্বপ্রভাবে ও চরিত্রমাধুর্যে ও অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি শত শত নর-নারী আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ লাগিয়া থাকিত। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল তাঁহার সহযোগী ও পদানুগ হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে তিনি একটি বাঙ্গালী ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, 'স্বামিজীর মত মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ, ঠাকুরের দরবারে স্থান লাভ এবং সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ —এই তিনটিই আমার জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করি।'

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে যাইয়া স্বামী বোধানন্দ মাঝে-মাঝে থাকিতেন। স্বামী যতীশ্বরানন্দ যাইয়া তাঁহার সহিত নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে কিছু দিন ছিলেন। তখন তাঁহাকে বোধানন্দজী স্বীয় প্রাচীন স্মৃতি মহানন্দে বলিতেন। স্বামিজী, শ্রীমা ও ব্রহ্মানন্দজী প্রভৃতির কথা বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' এবং 'রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র সকল ভাগ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলেন। আহার-বিহারাদি সব কাজ সময় মত করিতেন ঘড়ি ধরিয়া। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছিলেন। সময়ানুবর্তিতা, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মসংযম তাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কঠোর বহিরাবরণের মধ্যে যে কোমল হৃদয় লুক্কায়িত ছিল, তাহা স্নেহ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যে সকল সন্ন্যাসী সহকর্মী, তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন তাঁহারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সাধু-জীবনের মূলমন্ত্র সংযম। সংযম সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য সাধু স্বীয় জীবনকে বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়া বাঁধেন। সেই জন্যই বোধানন্দজীকে গ্রীকদেশীয় ষ্টোইকদের মত কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ দেখা যাইত।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামী রাঘবানন্দ নিউ ইয়র্কে যাইয়া স্বামী বোধানন্দের সহকারীরূপে কার্য্য করেন। এক জন সহকারী পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভে সমর্থ হন। স্বামী রাঘবানন্দ নিউ ইয়র্ক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে স্বামী বোধানন্দ যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনান্তে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং বেদান্ত সমিতিতে লইয়া যান। সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি একটি ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়াছিলেন রাঘবানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া। তথায় উভয়েই কোন শিষ্যার অতিথিরূপে ছিলেন কয়েক সপ্তাহ। রাঘবানন্দজী যাইবার তিন মাস পরে বোধানন্দজী ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হন এবং নবাগত সহকর্মীকে কাজ বুঝাইয়া ও সমিতির সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন এবং ক্লাস বক্তৃতাদি করিতে বলেন। ভারতযাত্রার পূর্বে বোধানন্দজী রাঘবানন্দজীকে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশিতে এবং সভ্যদের সহিত ধর্মদর্শন ব্যতীত অন্য বিষয়ে আলোচনা করিতে নিষেধ করেন। রাঘবানন্দজী তখন উক্ত উপদেশের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধানন্দজী চলিয়া আসিবার পর উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। আমেরিকার বহু লোকে সমিতিতে আসে সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য, সাধুরা যাহা বলে তাহা কাজে করে কি না দেখিবার জন্য। বোধানন্দজী নিজেও হিন্দু সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন ভোগ-বিলাসভূমি নিউ ইয়র্ক সহরে। তিনি সাধুর কড়া নীতি মানিয়া চলিতেন এবং মেয়েদের সহিত মেলা-মেশা করিতেন না।

স্বামী বোধানন্দ সামাজিকতার বেশী প্রশ্রয় দিতেন না এবং বাহিরের লোকের সহিত বেশী সংশ্রব রাখিতেন না। সহজে তাঁহার নিকট কেহ যাইতে বা কথা বলিতে পারিত না। পূর্ব হইতে সময় নির্দেশ করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে হইত। সমিতির সভ্য-সভ্যাদের সহিতও ক্লাসের বা বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কথা বলিতে চাহিতেন না। তাঁহার কোন ছাত্রী একবার অসুস্থা হইয়া পড়েন। ছাত্রীটি বেদান্ত শ্রবণে আগ্রহান্বিতা এবং বোধানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাঁহার অসুখের সময় তিনি সাধারণ ভাবে ঔষধ-পথ্যের নির্দেশ দেন, বন্ধু-বান্ধবের অসুখ হইলে লোকে যেমন করিয়া থাকে। ছাত্রীর স্বামী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আদালতে এই অভিযোগ করেন, 'বোধানন্দজী ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত চিকিৎসক নহেন। তাঁর উচিত নয় রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া।' ভুল বোঝাই জগতের সাধারণ নিয়ম। এই মিথ্যা মোকদ্দমায় বোধানন্দজীকে আদালতে যাইতে হইল। তখন হইতে বিরক্ত হইয়া তিনি লোক-সঙ্গ বর্জ্জন করিলেন। এই কারণে সাধুর জীবনে লৌকিকতার প্রশ্রয় না দিবার জন্য শাস্ত্র এত নিষেধ করিয়াছেন। তবে তিনি অসামাজিকও ছিলেন না, সমাজের সব সংবাদ রাখিতেন। বেস বল (Base Ball) খেলা দেখিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং যুবক দর্শকদের মত খেলা দেখিতে দেখিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া টুপী ও ছড়ি তুলিয়া খেলোয়াড়দের বলিয়া উঠিতেন, 'এগিয়ে যাও!' 'সাবাস্!' 'চমৎকার!'

স্বামী বোধানন্দ অক্টোবর মাসে নিউ ইর্য়ক হইতে যাত্রা করিয়া ইউরোপে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ১০ই ডিসেম্বর বোম্বাইতে পদার্পণ করেন। বোম্বাইতে তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান করেন। বোম্বাই নগরীর কাওয়াজী জেহাঙ্গীর হলে তাঁহাকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সতের বৎসর আমেরিকায় অবস্থান সত্ত্বেও তিনি পূর্বের সেই সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধুর মতই ছিলেন। বোম্বাইতে তিনি কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মোহিত না হইয়া খাঁটী ধর্মজীবন যাপনই তাঁহার সাফল্যের প্রধান কৌশল।' প্রায় এক সপ্তাহ বোম্বাইতে কাটাইয়া স্বামী বোধানন্দ ২০শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে উপস্থিত হন।

২০শে জানুয়ারী রবিবার কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে তাঁহাকে উক্ত সভায় অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী এবং ডাঃ এইচ, ডবলিও, বি, মোরেনো প্রভৃতি বক্তাগণ আমেরিকায় স্বামী বোধানন্দের বেদান্ত

প্রচার সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তৎপরে সভাপতি একটি রৌপ্যমণ্ডিত কমণ্ডলু ও মানপত্র স্বামী বোধানন্দকে দান করেন। স্বামী বোধানন্দ উপহার ও মানপত্র দানের জন্য উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে বলেন, 'বহু আমেরিকাবাসী হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে আমেরিকা ভারত অপেক্ষা নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ। আমেরিকার ন্যায় ভারতেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে।' তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, তিনি শাশ্বত সত্য সরল সহজ ভাবে বলিলেন, পুষ্পিত বাক্যে ঘুরাইয়া বলিলেন না। তাঁহার বাক্যে ছিল দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও অনুভূতির অসামান্য সমাবেশ। স্বামী বোধানন্দ কলিকাতায় যে অভিনন্দন-পত্র পাইলেন, তাহা নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভ্য-সভ্যাগণ পড়িয়া পরম আনন্দিত হন। সমিতির বাৎসরিক সভায় ইহা পঠিত ও প্রশংসিত হয়। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা এল্‌, ষ্টুয়ার্ট অভিনন্দন পাঠান্তে বোধানন্দজীকে ভারতে একখানি পত্র* লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আছে, "প্রিয় স্বামী,…এই নিউ ইয়র্ক নগরীতে আপনি বেদান্ত-বাণী স্বীয় জীবনে দেখাইয়া এবং সরল মধুর ভাবে প্রচার করিয়া আমাদিগকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা আপনার কাছে ঋণী। আপনি আমাদের সম্মুখে একটি মহৎ আদর্শ দেখাইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন।" উক্ত ভাষণে তিনি তাঁহার গুরুর বাণী সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। কলিকাতা অভিনন্দনের পর তিনি সহরের নানা সমিতিতে ধর্মালোচনাদি করিয়াছিলেন।†

১৪ই মাঘ ১৩৩০ (২৮শে জানুয়ারী) সোমবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়। এই উৎসবের অঙ্গরূপে যে সভা আহূত হয় তাহাতে বালক-বালিকাগণ স্বামিজীর কবিতাবলী আবৃত্তি করে। স্বামী বোধানন্দ তাহাদিগকে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করেন এবং উক্ত সভায় বাংলা ভাষায় স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী বোধানন্দ ১৯২৪ খৃঃ ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রবিবার পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে তথায় ইংরাজীতে যে বক্তৃতা দেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। পাটনা হইতে তিনি কাশী গমন করেন এবং তথায় অদ্বৈতাশ্রমে থাকেন। কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ সমভিব্যাহারে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। কাশী ও রেঙ্গুনে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

স্বামী বোধানন্দ কথা-প্রসঙ্গে এক দিন বলিলেন, 'পাণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভালরূপে আমেরিকায় পড়েছি।' জন্মভূমি দর্শনে বাগাণ্ডা গ্রামে যাইয়া পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। আন্দুল মৌরীতে কাকার বাড়ীতে তিনি একবার গিয়াছিলেন। তখন এই কালী-সঙ্গীত দুইটি তিনি পরমানন্দে শুনেছিলেন—

(১) হৃদি-কমলে বড় ধুম লেগেছে (২) দে মা শ্যামা চরণ দুটি। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিবার জন্য তিনি ভক্তগণ ও আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। বারাসতে মুচীদের একটি সম্মিলনী হয়। স্বামী বোধানন্দ সেখানে যাইয়া তাহাদের ধর্মোপদেশ দেন এবং তাহাদের বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ করেন।*

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়া স্বামী বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন।† প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে বোধানন্দজী আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি দিয়া বলেন, 'পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও ধর্মজীবনে অনুন্নত। মানব-সমাজে শান্তি ও সাম্য স্থাপনের জন্য মানবের আন্তর বিকাশ অপেক্ষা বাহ্য সমৃদ্ধিকে তাহারা অধিকতর মূল্যবান মনে করে। আমেরিকাবাসিগণ জড়বাদী ও কর্মকৌশলী হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য ধর্মবিশ্বাসী ও নীতিভাবসম্পন্ন আছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষ আমি আমেরিকায় একটিও দেখি নাই। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক সহায়তা আমেরিকার আবশ্যক। হিন্দুদের উচিত তাহাদের কর্মকৌশল ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতা শিক্ষা করা। পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিক আলোক দানই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্য।'

দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিলেও পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার উপরে পড়ে নাই। আসবাব-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ খুব সামান্যই তাঁহার সঙ্গে ছিল। প্রকৃত সাধু স্থান ও কালের প্রভাব এড়াইয়া চলেন। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের প্রতি তাঁহার কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি। বেলুড় মঠের পুরাতন বাড়ীর পশ্চিম দিকের বারান্দায় হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্বামী বোধানন্দ বসিয়া আছেন। এক জনের তামাক খাওয়া হইলে বোধানন্দজী হুঁকাটি স্বহস্তে সরাইয়া শরৎ মহারাজের কাছে রাখিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'থাক্, থাক্।' তাহা সত্ত্বেও বোধানন্দজী সশ্রদ্ধ ভাবে এই সামান্য সেবাটি করিলেন। কারণ, শ্রীগুরুর গুরুভ্রাতাদিগকে তিনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামী বোধানন্দ ১৯২৪ খৃঃ ৮ই এপ্রিল পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর সহিত ট্রেণে মান্দ্রাজ যান। মান্দ্রাজ মঠে তিনি মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। স্থানীয় শ্রীসচ্চিদানন্দ সংঘে ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে যথাক্রমে 'ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও আমেরিকার কর্মনিষ্ঠা' এবং 'আমেরিকার জীবন' সম্বন্ধে দুইটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। উক্ত ছাত্রাবাসে বুদ্ধোৎসবের দিন বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন এবং ভেপারী আনন্দ আশ্রমে 'তত্ত্বমসি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর যাইয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি আর এক মাস থাকেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে প্রত্যেক রবিবার তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং সহরে দুইটি সাধারণ বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ২৭শে জুন বাঙ্গালোরবাসিগণ তাঁহাকে রত্নাবলী থিয়েটারে বিদায়-অভিনন্দন দেন। সভায় সহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাও

* ১৯২৪ খৃঃ মার্চ সংখ্যায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিকে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

† ১৯২৪ খৃঃ জুলাই মাসে 'বেদান্ত কেশরী'তে প্রকাশিত।

* ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে 'উদ্বোধন' মাসিকে এই সংবাদ প্রকাশিত।

† ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সমগ্র কথোপকথন পাওয়া যায়।

সাহেব চিন্নাইয়া মানপত্রটি পাঠ করেন। উহার একখানি পার্চমেন্টে ছাপাইয়া একটী সুন্দর চন্দন কাঠের বাক্সে করিয়া বোধানন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। স্বামিজী অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর দেন। মিশনের স্বামী সোমানন্দ স্থানীয় জেলে কয়েদীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। সোমানন্দজীর আমন্ত্রণে স্বামী বোধানন্দ জেলে যাইয়া তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সুখী হন। কয়েদিগণও বোধানন্দজীকে একটি মানপত্র দিয়াছিল। ২১শে জুন বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে ফিরিয়া কয়েক দিন অবস্থানের পর তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে ১৫ই জুলাই তিনি জাহাজে উঠিয়া ইউরোপে যান এবং ইটালী, সুইজারলণ্ড ও ফ্রান্স দেখিয়া নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। প্রায় এগার মাস অনুপস্থিতির পর তিনি মহোৎসাহে বেদান্ত প্রচার আরম্ভ করেন। ১৯২৪-২৫ খৃঃ স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তন্মধ্যে চব্বিশটি পুস্তকাকারে সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যা ও সমিতির সভ্যা তখন নিউ ইয়র্কের বাহিরে গিয়াছিলেন। স্বয়ং বক্তৃতা শ্রবণে অক্ষম হইয়া তিনি সাঙ্কেতিক লেখক নিযুক্ত করিয়া বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করান। সেইগুলিই সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত। পুস্তকটির নাম 'বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী' (Lectures on Vedanta Philosophy). ইহা ৩২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই চব্বিশটি বক্তৃতায় বেদান্ত-দর্শনের মূল তত্ত্ব, কর্ম্মবাদ, যোগসাধন, প্রাণায়াম-বিজ্ঞান, বুদ্ধবাণী, শঙ্করদর্শন, পুনর্জ্জন্মবাদ, মৃত্যুতত্ত্ব, উপনিষদের বাণী প্রভৃতি বিষয় প্রাঞ্জল ভাবে মার্কিণ নর-নারীগণের উপযোগী করিয়া আলোচিত। এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বামী বোধানন্দ লিখিয়াছেন, 'এই বক্তৃতাগুলি আমার কাছে এত সামান্য ও অনাবশ্যক যে, আমি এগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কখনো করি নাই।' আত্মগোপনে অভ্যস্ত সাধু আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক। 'বেদান্ত-দর্পণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও তিনি কিছু কাল পরিচালন করেন। উহাতে তাঁহার বক্তৃতাবলী মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হইত।

এই ভাবে নীরবে অনুকরণীয় আধ্যাত্মিক জীবন চুয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ স্বামী বোধানন্দ আমেরিকায় যাপন করেন। এই চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র তিনি ভারতে আসেন ১৯২৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে। শেষ জীবনটি পুণ্যভূমি ভারতে কাটাইবার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ১৯৫০ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল বর্ত্তমান লেখককে তিনি স্বহস্তে বাংলায় এই পত্র লিখিয়াছিলেন :

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় বেদান্ত সমিতি
৩৪ ওয়েষ্ট ৭১তম ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক ২৩
ইউ, এস, এ

শ্রীমান্ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কল্যাণবরেষু,

তোমার ১ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিখানি প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। উহাতে তুমি স্বামী আত্মানন্দের জীবনীতে প্রকাশের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছ। উহা এই পত্র সহ পাঠাইতেছি। উহাতে অনেক ভুল আছে। সংশোধন করিয়া দিও। এখানকার বর্ত্তমান সংবাদ কুশল। আগামী গ্রীষ্মে সোসাইটীর কার্য্য তিন মাস বন্ধ থাকিবে। এখানে এখনও বেশ শীত। গত রাত্রে ভয়ানক বরফ পড়িয়াছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এরূপ বরফ কখনো পড়ে নাই। এখানকার কার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এক রকম চলিতেছে। কত দিনে আমার ভারতে যাওয়া হইবে, জানি না। যদি যাওয়া ঘটে পূর্ব্বে সংবাদ পাইবে। সকলে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। এই চিঠিখানি পাইবার পর প্রাপ্তি সংবাদ পাঠাইবে। ইতি

কিছু দিন যাবৎ স্বামী বোধানন্দ Prostrate glands (মূত্রাশয়ের গ্রন্থি) রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগবৃদ্ধি হওয়ায় ১৪ই মে রবিবার বৈকালে তিনি চিকিৎসার্থ নিউ ইয়র্ক সহরের রুজভেল্ট হাসপাতালে ভর্ত্তি হন এবং ১৮ই মে বৃহস্পতিবার বৈকাল ৩-১৫ মিনিটে অস্ত্রোপচার কালে দেহত্যাগ করেন। স্বামী বোধানন্দ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আমেরিকা ও ভারতের নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বেদান্তের বার্ত্তাবহরূপে আমেরিকায় এবং বিবেকানন্দ-বাণীর ধারক ও বাহকরূপে ভারতে স্বামী বোধানন্দের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

নেপাল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

গোরীতে পৌঁছুতেই নেপাল সরকারের লোক আমাদের জিনিষ-পত্র পরীক্ষা করে দেখলেন, আমাদের সঙ্গে কোন মাদক দ্রব্য কিংবা আপত্তিকর কোন জিনিষ আছে কি না। ঘণ্টা খানেক বাক্স-বিছানা হাতড়ে যখন তেমন কিছু পাওয়া গেল না তখন আবার যাওয়ার অনুমতি পেলুম। আরো কিছু দূর যেতে দেখি পাহাড়ের উপরে সিঁড়ি উঠে গেছে। সেই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে করে একটি নেপালী সৈনিক। সেখানেও আবার থামতে হলো। এক জন কর্ম্মচারী এসে আমাদের কাছে নেপালে যাওয়ার পাশ চাইলেন। রাক্সৌল থেকে যে পাশ আমরা এনেছিলুম সঙ্গে করে, সেগুলি তাঁকে দেখান হল। ইন্দু বাবু তাঁকে নেপালী ভাষায় কি সব বললেন। সেখান থেকে ছাড়ান পাওয়া গেল। আবার চলা। লাঠিতে ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। চটীর জল গোরী পর্য্যন্ত আসতেই ফুরিয়ে গেছলো। কাজেই গলা শুকিয়ে গেলে রাণী কাকী, মানে, ইন্দু বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে লজেন্স চেয়ে নিয়ে খেতে লাগলুম। রোপওয়ের তলা দিয়ে কত বার যেতে হলো। দেখলুম, বস্তা-বস্তা জিনিষপত্র কাঠ লোহার ট্রেতে করে নেপালের দিকে চলেছে। নেপাল থেকে যে সব ট্রে আসছিল, সেগুলি সব খালি। যেগুলি নেপালের দিকে যাচ্ছিল, সেগুলি সবই দেখলুম

জিনিষপত্র ভর্ত্তি। বুঝলুম, নেপালের নিজস্ব বলতে এমন কিছুই নেই যা সে বাইরে বিক্রি করে ছু'পয়সা ঘরে আনতে পারে। আর যদিও খনিজ কিংবা অন্য কিছু থাকে, তবে তা বাইরে রপ্তানী করবার মত অবস্থা নেপালের এখন হয়নি কিংবা ইচ্ছে করেই করে না। তাই তাকে পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। নিজের যা দরকার, সে-সব কিনে আনতে হয় পরের কাছে থেকে। বিকেলের দিকে সিসাগিরি পাহাড় থেকে নামতে লাগলুম। যখন পাহাড়ের একেবারে নীচে নেমে এলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে এল। পাহাড়-তলীর গ্রামবাসীদের ঘরে-ঘরে জ্বলে উঠলো সাঁজের প্রদীপ। অন্ধকার যখন রীতিমত জমাট বেঁধে গেল, তখন আমরা এসে পৌছুলুম কুলখানি গ্রামে।

নেপাল সরকার থেকে তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল দেখা গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহ টেনে নেওয়া হলো সেই তাঁবুর ভিতরে। মেয়েদের আলাদা তাঁবু ঠিক করা হলো। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সবাই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গা, হাত-পা যেন বরফের মতো জমিয়ে দিতে লাগলো। খাওয়ার শেষে হোল্ডঅল পেতে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলুম। শীতের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পরলুম পুল-ওভার, স্লিপিং সুট, মাফলার, মোজা। আরো কিছু পরতে পারলে ভাল হতো, এত শীত! তাঁবুর ভিতরে ভিজে মাটীতে হোল্ডঅল পেতেছিলুম, সকাল বেলায় উঠে দেখি বিছানা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে। তাঁবুর বাহিরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে-হাতে লাগছে; মনে হতে লাগলো, কে যেন বরফের ছুরি দিয়ে মুখ-হাত কুচি-কুচি করে কাটছে। কম্বলটা মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে বিছানার উপরে বসলুম। রাত্রে শোবার সময়ে হাতের কাছে টর্চ্চ, লাঠি আর ক্যামেরাটি রেখে দিয়েছিলুম। বিছানায় বসে কি খেয়াল হলো ক্যামেরাটিকে হাতে করে তুলতে গিয়ে "ওরে বাপ রে" বলে তাড়াতাড়ি ফেলে দিলুম বিছানায়। ক্যামেরা নয় তো এক খণ্ড বরফ যেন! কম্বল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবুও ছাড়তে হলো। ছাড়বা মাত্র শীতে গা, হাত-পা কনকনিয়ে উঠলো। স্লিপিং-স্যুটের পা-জামা মোটেই শীত আটকাতেই পারলো না, কাজেই কোন মতে পা-জামার তলায় পরলুম নেপালি ভাষায় যাকে বলে 'সুরুয়াল'। তবু যা হোক খানিক শীত আটকানো গেল।

কাল যে কুলী যে জিনিষ কিংবা যাকে ঝড়িতে বয়ে এনেছিল আজো সেই কুলী নিজের বইবার ভার ঠিক করে নিল। কুলীরা রওনা হলো আজ জিনিষপত্র আর মেয়েদের নিয়ে। আরো ছু'টো ঘোড়া পাওয়া গেল আমার আর ইন্দু বাবুর জন্যে। তিন-চারটা ঝোলা-পুল পার হয়ে গেলুম। পেছনে রেখে চললুম কত ঘর-বাড়ী, কত গ্রাম। দেখলুম সেখানকার বাড়ীগুলি ছোট-ছোট। ধানের ক্ষেতগুলিও দেখলুম ছোট-ছোট ভাগ করা। ও-দেশের দোতলা 'উঁচু বাড়ী আমাদের এক তলার উঁচু বাড়ীর সমান। গ্রামগুলি ছোট-ছোট। লোকগুলিও বেশীর ভাগ ছোট অর্থাৎ বেঁটে। শুধু ছোট নয় ও-দেশের পাহাড়গুলো।

বেলা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কুলখানি থেকে রওনা হওয়ার সময় ওখানের দোকান থেকে চা, পুরী খেয়ে এসেছিলুম এবং থার্মোফ্লাস্কে ভরে নিয়েছিলুম চা। পথ চলতে চলতে সে চা-ও গেল শেষ হয়ে। পরে এক গ্রামে এসে এক দোকান থেকে জল নিয়ে থার্মোফ্লাস্ক ভরলুম। কিছু দূর যাওয়ার পর এলুম মার্কুলা গ্রামে। মার্কুলা গ্রাম পার হয়েই উঠতে হলো ছোট-খাটো আর একটি পাহাড়ে। ক্রমে চেতলাং গ্রামে এসে পড়লুম। সেখানে খানিক বিশ্রাম করে আবার সবাই রওনা হলুম। সেই সুদূর দেশে অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গেও দেখা হলো। দেখলুম একটি মহিলার গায়ে হয়েছে ধবল। তাঁর পুরুষ সঙ্গীদের কাছে থেকে শুনলুম, তিনি চলেছেন ৺পশুপতিনাথের কাছে প্রার্থনা করতে যেন তার ঐ বিশ্রী রোগ সেরে যায়।

বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা চন্দ্রগিরি নামে আর একটি বড়ো পাহাড়ে উঠতে লাগলুম, প্রখর রোদে সারা শরীর গরম হয়ে উঠলো। ঘোড়ার গা দিয়ে টপ-টপ করে ঘাম ঝড়ে পড়তে লাগলো। পাহাড়ে উঠবার পথ অতি খারাপ। ঘোড়া তারই উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগলো, জীন চেপে ধরে বসে থাকলুম। ঘোড়া আপন মনে এঁকে-বেঁকে চলতে-চলতে থামলো যখন তখন আমরা এসে পড়েছি চন্দ্রগিরির চূড়ায়। কুলীরা এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিলো। গ্রামের ভিতরে দিয়ে আসবার সময় তারা মকাই-গুড় খেয়ে নিয়েছিল। এখানে এসে আরাম করে খানিকটা সিগারেট টেনে নিলো। নেপালে যাওয়ার পথে চন্দ্রগিরি থেকে নামবার ২টা পথ আছে। একটা সোজা, একটা ঘোরালো পথ। ঝড়ি নিয়ে কুলীরা সোজা পথে নেমে যায়; ঘোড়া এবং ডুলী যায় ঘোরানো চওড়া পথ দিয়ে। মিনিট ৫।১০-এর মধ্যে আমরা এসে পৌছুলুম থান কোটের হোটেলে। স্নান করা আর অদৃষ্টে ঘটলো না। একটি ঝর্ণার জলের নালা দিয়ে অল্প অল্প জল পড়ছিলো; তারই তলায় মাথা দিয়ে কোন রকমে মাথাটা ধুয়ে নিয়ে খেতে বসলুম। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলুম। পরে মোটর-বাস ঠিক হলে জিনিষপত্র বোঝাই করে আমরা রওনা হলুম নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুর দিকে। সন্ধ্যার মুখে কাটমাণ্ডুতে এসে পৌছানো গেল।' আমরা সবিস্ময়ে দেখলুম আমাদের পথের ছু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা। ছুর্গম পাহাড়ে ক্রমাগত ছু'দিন ধরে চলবার পর কাটমাণ্ডুর ঐ সব অট্টালিকাগুলি আমাদের কাছে কেমন যেন নতুন লাগলো। আমরা মোটেই ভাবিনি এতগুলি ছুর্গম পাহাড় পার হয়ে দেখবো ঐ সব আধুনিক রুচিসম্মত অট্টালিকা, প্রস্তর মূর্ত্তি, বৈদ্যুতিক আলো, সুসজ্জিত উদ্যান, প্রশস্ত মাঠ। আমরা টুরীগেল-এর পাশ দিয়ে মোটর-বাসে ক'রে গেলুম। ড্রাইভার আধা-হিন্দিতে আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলো। 'টুরীগেল' হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে প্যারেড গ্রাউণ্ড। নেপালী সৈনিকেরা এখানে কুচ-কাওয়াজ করে। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে ঐ মাঠে নেপালী সৈনিকেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে পাঁচ মিনিট ধরে অনবরত বন্দুকের আওয়াজ করে।

হাসপাতাল দেখলুম। বেশ বড়ো বাড়ী। প্রস্তর-মূর্ত্তিও দেখলুম। ড্রাইভার বললো, মূর্ত্তিগুলি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের এবং রাজাদের। ইন্দু বাবু অনেকগুলি মূর্ত্তির সবিশেষ বিবরণ দিলেন। কলকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়ায়-চড়া মূর্ত্তি দেখে যত-না অবাক হয়েছি, এখানে এই পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝে ঐ ধরণের মূর্ত্তিগুলি দেখে তার

চাইতে বেশী অবাক হলুম। 'টুরীগেল'-এর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মনে হলো—আমরা যেন গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে চলেছি। ভুলে গেলুম আমরা নেপালে। একটা ছোট-খাটো মনুমেণ্ট দেখলুম। ড্রাইভার কি বললে বুঝতে পারলুম না ভালো করে। ইন্দু বাবু বললেন, কোন উৎসব উপলক্ষে ঐখান থেকে বিউগল বাজান হয়। গত ভূমিকম্পে মনুমেণ্টটি তিন টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেছলো, আবার সেটিকে খাড়া করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় যেখান থেকে—দেখলুম সে বাড়ীটিকে অতি সুন্দর করে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। আরো অনেকগুলি বড়-বড় বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো। আমরা আগেই জানতুম, নেপালের রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনবীর বিক্রমশা'র রজত-জয়ন্তী উৎসব চলছে নেপালে। আসার পথে তার কোন চিহ্নই পাইনি। কাটমাণ্ডুতে এসে সুসজ্জিত আলোকমালা দেখে মনে পড়ে গেল—রাজার জয়ন্তী উৎসবের কথা। ক্রমে 'টুরীগেল' ছেড়ে কাটমাণ্ডুর আরো ভিতরে আমাদের মোটর-বাস চল্লো। বড়-বড় অট্টালিকা, বৈদ্যুতিক আলো আর দেখা গেল না। দেখা গেল ছোট-ছোট মাটীর এবং কাঠের বাড়ী, আলো নেই, অন্ধকার। মোটর-বাসের হেড লাইটের সাহায্যে আমরা পথ চিনে চললুম মুস্কালে ইন্দু বাবুর বাড়ীতে। অন্ধকার ভূতের মত বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে। মাঝে-মাঝে দু'-একটি করে দোকান—দর্জ্জির, চাল-ডালের, পান-বিড়ির। বুঝলুম, টুরীগেল হচ্ছে নেপালের গড়ের মাঠ। নবাগত কেউ যদি কলকাতায় এসে কেবল এসপ্ল্যানেড এবং ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে চলে যান, দেখেন না বেলেঘাটা কেমন জায়গা, কাঁকুরগাছিতে কি আছে, তিনি কলকাতার সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে যাবেন, কাটমাণ্ডুতে এসে তার ভিতর না গিয়ে বাইরের থেকে কেবল 'টুরীগেল' দেখে কেউ যদি চলে যান—তার ধারণাও ঠিক ঐ কলকাতা দর্শকের মতোই হবে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় নেপাল দরিদ্রের দেশ। ও-দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নেই বললেই হয়। যারা গরীব তারা খুবই গরিব; আর যারা ধনী, তাদের লাখোপতি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। তবে সম্প্রতি নেপালীদের মধ্যে অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কুটীর-শিল্পের দিকে ঝোঁক দিয়েছে। কাজেই মনে হয়, শীঘ্রই হয়তো ও-দেশে এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হবে যাকে আমরা প্রকৃত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলতে পারবো।

খানিকক্ষণ এঁকে-বেঁকে চলবার পর বাস এক জায়গায় এসে থেমে গেল। ইন্দু বাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম—জায়গাটির নাম 'দেওপাটান'—মানে দেবতার স্থান। নেপালের সুবিখ্যাত ৺পশুপতিনাথের মন্দির এইখানেই অবস্থিত। ইন্দু বাবু আর বাবা নেমে গেলন বাড়ীর খোঁজে। দেওপাটানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। গভর্ণমেণ্ট রেষ্ট-হাউসে ইন্দু বাবু আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। রাত্রি তখন ১টা হবে। কুলী ডাকিয়ে জিনিষপত্র ঘরে তোলা হলো। ঘরের শিকল এমন ভাবে তৈরী যে, নেপালী তালা না লাগালে চলে না।

পরদিন শিবচতুর্দ্দশী।

দিদিমাদের নিয়ে স্নান করতে গেলুম নদীতে। নদীর নাম বাগমতি। জল নয় তো যেন বরফ! হাঁটু ডোবে না এমন নদী। ঘটা করে জল নিয়ে মাথায় ঢালতে হয়। স্নান সেরে ৺পশুপতিনাথের মন্দিরে গেলুম। সোনার পাত দিয়ে বাঁধান মন্দির। দেওয়ালে নানা রকম কারুকার্য্য দেখবার জিনিষ। মন্দিরে এক দিকে একটা মস্ত পিতলের ষাঁড়। অনেকে সেখানেও ফুল বেলপাতা দিচ্ছেন। মন্দিরের চারি দিকে চারটে দরজা। যে দরজা দিয়েই দেখা যাক না কেন ৺পশুপতি-নাথের মুখ দর্শন হবে। সত্যি কথা বলতে কি, নেপালের ৺পশুপতিনাথ মুখ-সর্ব্বস্ব, অর্থাৎ চারমুখো মুণ্ডুটিই তার আছে—ধড় নেই। রাঁচির দিদিমা তার ব্যাখ্যা করলেন। পৌরাণিক ঘটনা। কোন এক অসুরের ভয়ে মহাদেব মোষ-সেজে এক পাল মোষের মাঝে নিজেকে লুকোলেন। মহাদেবের সে কারসাজি অসুর বুঝতে পারলো। পা দু'টো ফাঁক করে রাস্তা আগলে দাঁড়ালো সে, সব মোষ তার পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল। কেবল মোষ-বেশী মহাদেব, দেবতা তিনি, অসুরের পায়ের তলা দিয়ে গেলেন না। অসুর বুঝতে পেরে তাড়া করলে মোষ-বেশী মহাদেবকে। মহাদেব তখন চার পা তুলে ছুটতে ছুটতে কেদারে এসে তাঁর ধড় রেখে তাঁর মুণ্ড ফেললেন নেপালে। তাই নেপালের ৺পশুপতিনাথের মুণ্ডই আছে, ধড় নেই।

যত দূর সাধ্য শক্তির কসরত দেখিয়ে ভীড় ঠেলে ৺পশুপতিনাথের দর্শন করলুম এবং এক-এক করে দিদিমাদের দর্শন করিয়ে দিলুম। বেলপাতায় ৺পশুপতিনাথকে প্রায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে। দর্শন পাওয়া মুস্কিল।

নেপালের পুলিশরা হিন্দুস্থানী বোঝে। খাকি পোষাক পরে, মাথায় বাঁধে লাল পাগড়ী। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে কাটমাণ্ডুর আশে-পাশের গ্রাম থেকে অগণ্য মেয়ে-পুরুষ এসেছে ৺পশুপতিনাথ দর্শনে। কাটমাণ্ডুর পথে সুসজ্জিত নর-নারীর ভীড়। নেপালী পুরুষদের সবারই এক রকম পোষাক। পরনে পায়জামা, নীচের দিকে পায়ের সঙ্গে এঁটে থাকে। নেপালীতে তাকে বলে 'সুরুয়াল'। গায়ে দেয় হাতওয়ালা জামা, 'ভোটো' বলে তাকে। ভোটোর উপরে পরে লম্বা ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর উপরে, কোমরে কাপড় জড়ায়। সেই পাঞ্জাবীর উপরে পরে ওয়েষ্ট কোট। কী গরীব কি বড়লোক সব নেপালী পুরুষেরই ঐ একই ধরণের সাজ। তফাতের মধ্যে, গরীবেরা পরে সূতির পোষাক, বড়লোকেরা পরে সিল্কের। ঐটুকু তো দেশ, তাও তো অশিক্ষিত। অশিক্ষিতই বা বলি কি করে, যাদের মধ্যে অমন ঐক্য, অমন জাতীয়তা। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলি, সভ্য বলে গর্ব্ব করি, অথচ আমাদের ভিতর জাতীয়তা বলে কিছু নেই।

কলকাতায় থাকতে আমার ধারণা ছিল নেপালীরা বেঁটে হয়, তাদের রং হয় তামাটে। নেপালে গিয়ে আমার সে ধারণা বদলে গেল। বেশীর ভাগ লোকই লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষেরা প্রায়ই ফর্সা দেখতে। নেপালী মেয়েরা সাজ-গোজ করে খুব ঘটা করে। পুঁথির মালা পরতে ভালোবাসে দেখলুম। চুল বিনুনী করে বাঁধে; সে বিনুনী বোধ হয় সাত জন্মেও খোলে না। বাগমতীতে স্নান করবার সময় চোখে পড়েছিল এক নেপালী বুড়ী। বিনুনী তার জটার আকার ধারণ করেছে। একাধিক রূপোর ফুল গোঁজা সেই বিনুনীতে। হয়তো পাছে তার চুলের সাজ খুলতে হয় তাই সে বুড়ী স্নান করলো না। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নদীর থেকে উঠে পড়লো।

আমাদের দেশের মেয়েদের মতো ও-দেশের মেয়েরাও বিয়ে হ'লে সিঁদুর পরে। নেপালী মেয়েরা অধিকাংশই স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। দুধে-আলতা রং-এর মতো নেপালী মেয়েদের গায়ের রং বললে অন্যায় বলা হবে না।' প্রকৃতির কারখানায় তৈরী লিপষ্টিক রুজ তাদের ঠোঁটে-গালে সারাক্ষণই লেগে থাকে। প্রকৃতির দেওয়া ঐ রূপ তারা যত্ন করে রাখে মুখে ময়দা এবং ভূসি মেখে—স্নো কিংবা পাউডার মেখে নয়। ঘোড়া যদি না খেতে পায় তাকে ডলাই-মলাই করলে কি তার স্বাস্থ্য ভালো হবে? আসলে খেতেই পারে না আমাদের মেয়েরা। নেপালী মেয়েরা যেমন খাটে—তেমন তাদের যোগ্যতা অনুসারে খায়। তাদের তুলনা করতে হয় আপেলের সঙ্গে—গোলাপের সঙ্গে নয়। আপেলের মতো তারা লাল টুকটুকে রসাল অথচ শক্ত; গোলাপের মতো রং হলেও গোলাপের মতো একটুতেই ঝরে পড়ে না।

বিকেলে ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরের দিকে বেরুলুম। মন্দিরের গেটে ঢুকতে যাবো, এমন সময় মহা হৈ-চৈ ক'রে লোকে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ভয় পেয়ে গেলুম, ভাবলুম, কি জানি কি হলো! ঘোড়ায় চড়ে এক দল সৈন্য এসে গেটের দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি সুযোগ বুঝে একটা বাড়ীর বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। কয়েক জন পদাতিক সৈন্য এসে লোক-জনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মন্দিরে ঢুকবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিলো। একটু পরেই বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজিয়ে এলো পাঁচ-ছয়খানা মোটর। মন্দিরের গেটের কাছে এসে মোটর থেমে যেতেই মোটর থেকে নামলেন কয়েকটি অসামান্যা রূপসী তরুণী। তাঁরা হচ্ছেন রাজকন্যা, রাজবধূ এবং তাঁদের সখীরা। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে তাঁরা এসেছেন ৺পশুপতি-নাথ দর্শনে। মন্দিরে ঢুকবার সময় প্রথমে গেলেন এক জন নেপালী ভদ্রলোক, বোধ হয় রাজবংশেরই হবেন। তাঁর পেছনে সার বেঁধে তরুণীরা গেলেন। সূর্য্যের আলো পড়ে তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ঝলমল ক'রে উঠলো। সবার পেছনে তাঞ্জামে চড়ে মন্দিরে ঢুকলেন বড় মহারাণী। খানিক পরেই রাজবংশের সবাই ফিরে এলেন মন্দির থেকে। চারি দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো: "মহারাণীর জয়।" মোটর চলে গেল—পেছনে ছুটলো অশ্বারোহী সৈনিকেরা। রাজবংশের মেয়েরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পর জনসাধারণ অধিকার পেলো মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার। আমি মন্দিরের ফটো নিলুম।

রাস্তায় কত লোক চলেছে। পথের দু'ধারে দোকানের সারি। সখের জিনিষের চাইতে খাবার জিনিষই বেশী। একটু দূরে, রাস্তার এক কোণে দু'-এক জন যাদুকর ঘর তৈরী ক'রে যাদু দেখাচ্ছে। সেইখানেই লোকের বেশী ভীড়। এমন সময় শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এক দল অশ্বারোহী সৈন্য এসে রাস্তার দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়ালো। একটু পরেই দেখা গেল মহারাজধিরাজ এবং মহারাজা মানে প্রধান মন্ত্রী রাণা মোটরে ক'রে মন্দিরের দিকে গেলেন। চারি দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো। রাজদর্শনে চারি দিকে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

এই আধুনিক যুগেও নেপাল অন্ধকারে পড়ে আছে। ঠিক কথা বলতে গেলে নেপালের সত্যিকারের যাঁরা শাসনকর্তা, মানে রাণারা, নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, দেশের উন্নতির জন্যে মাথা ঘামান না। বরং জনমতের টুঁটী চেপে রাখা হয়েছে। সারা দেশে গুপ্তচরের অভাব নেই। লোকে ভয় পায় অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। আর নালিশ জানাবেই বা কার কাছে? রাজা নিজেই প্রধান মন্ত্রী রাণার হাতে কাঠের পুতুল হয়ে আছেন। রাজা হচ্ছেন নারায়ণ; এবং নারায়ণ যেখানে পা দেবেন, সে জায়গা তো তাঁরই হ'য়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এ যুগে রাজারূপী নারায়ণ যদি নেপালের বাইরে পা দেন তবে তা' যদি না হয় তবে রাজার নিজের দেশে থাকাই শ্রেয়ঃ। নেপালীদের এই কথাই বুঝিয়ে রেখেছেন ঐ রাণারা। তবু যারা অবুঝ তাদেরই এক জন (ইন্দু বাবুর পরিচিত) আমাকে এক দিন নির্জ্জনে পেয়ে কথায় কথায় নীচু গলায় বললেন: "এ দেশের কিস্সু হবে না। পাছে লোকে বাইরের জগতের কথা জানতে পারে, তাই আজ পর্য্যন্ত একটা সিনেমা হলো না এখানে। লোকগুলোকে ইচ্ছে ক'রে মূর্খ ক'রে রেখেছে এরা। পাঠাগার তো নেই। সভা-সমিতি একেবারে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। স্কুল-কলেজ নাম মাত্র। হাসপাতাল আছে বটে, লোক-দেখানো। রাস্তা-ঘাট আর বাড়ী-ঘর-দোরের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখলেন।···ভালো বাড়ী লোকে করতে পারলেও করে না, পাছে রাণাদের সন্দেহের চোখে পড়ে যায়। আর যাদের অবস্থা সত্যিই খারাপ, তারা দেশে থাকে প্রায় অনাহারে আর পেট ভরে খাবার জন্যে যায় বিদেশে চাকরীর খোঁজে।···হ্যাঁ, তা বলে ভাববেন না যেন, নেপালের রাজকোষের অবস্থা খারাপ। তরাই জঙ্গলের কাঠ, জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, রোপওয়ে, টেলিফোন, রেলওয়ে, খাজনা, নানা রকম ট্যাক্স থেকে রাজ্যের আয় হয় প্রচুর; কিন্তু সে টাকার 'সিংহের ভাগ' যায় রাণাদের পকেটে বেতন, ভাতা, ভ্রমণ বা শীকারের ব্যয় হিসাবে। আবার রাণাদের বেতন ও ভাতার মোটা টাকাটা যায় নেপালের বাইরে বিদেশী ব্যাঙ্কে—মানে বিদেশে।"

আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম সব গোপন ব্যাপার। 'অবুঝ' নেপালী ভদ্রলোক আমার কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে বললেন: "আর ঐ সব রাণাদের অন্দর-মহলে প্রায় ১০০/১৫০ করে রূপসী আছেন, রাণাদের সেবাদাসী, তাঁদের জন্যেও তো খরচ আছে।···যাক গে ও-সব কথা।"···ভদ্রলোক সামলে নিলেন: "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কী দরকার! আবার পাঁচ কান হলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আপনাদের দেশে মাছ-কোটা আর আমাদের দেশে মানুষ-কাটা প্রায় একই ব্যাপার! খাঁড়া যে কখন কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। দোহাই, এ দেশে যেন এ কথা আপনার মুখ থেকে না বেরোয়।"

মাথা নেড়ে জানালাম: "ভয় নেই! আপনার পেটের কথা আমার পেটেই থাকবে—অন্ততঃ যতক্ষণ আপনাদের দেশে আছি।"

পরদিন ইন্দু বাবুকে ধরলুম সহরে কোথায় কি আছে দেখাতে হবে। ইন্দু বাবু রাজী হলেন। সিংহ-দরবার অর্থাৎ মন্ত্রণা-সভা দেখলুম; মস্ত বড় অট্টালিকা। রাজপ্রাসাদও দেখা হলো। জন্মোৎসব উপলক্ষে রঙীন পতাকা দিয়ে রাজপ্রাসাদকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। রাস্তার মাঝে-মাঝে জলের কলের ব্যবস্থা আছে। মোটর এবং মোটর-বাসে কলকাতার মতো রাস্তা চলা দুষ্কর না হলেও অসাবধান হয়ে চললে চাপা পড়বার ভয় আছে প্রতি মুহূর্ত্তে। সারা পথ চলেও ঘোড়ার গাড়ী চোখে পড়লো মোটে একটি। 'টুরীগেজ'

পাশ থেকে বেঁকে গেলুম 'ইন্দ্রচক' নামে একটি বাজারে। যেমন বাজার হয়ে থাকে তেমনি—নতুনত্ব কিছুই নেই। বাজারে ঢুকতেই চোখে পড়ে—কতকগুলি নেপালী নানা রকম টাকা-পয়সা নিয়ে বসে আছে। ওরা 'এক্সচেঞ্জ রেট' অনুসারে কোম্পানীর টাকা, মানে আমাদের দেশের টাকা ভাঙিয়ে নেপালী টাকা অর্থাৎ মোহর দেয়। আবার প্রয়োজন মতো মোহর বদলে দেয় কোম্পানীর টাকা। নেপালী পয়সাগুলি দেখলুম—আমাদের পয়সার মতো তামারই তৈরী; তবে আকারে ছোট, আমাদের আধলার মতো। পয়সার এক পিঠে লেখা থাকে দেবনাগরী অক্ষরে:

"শ্রীপশুপতিনাথ
এক পয়সা
নেপাল"

অন্য পিঠে দু'খানি ভোজালী X আকারে আঁকা থাকে; আর লেখা থাকে: "শ্রীত্রিভুবন বীর বিক্রম সাহ।"

ইন্দ্রচক থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে গেলুম বাগবাজার, দিল্লী বাজার এবং আরো অন্যান্য কয়েকটি জায়গা। বাজার বল্‌তে সবই প্রায় একই রকম। বাজারের ভিতর দিয়ে চলছিলুম, হঠাৎ চোখে পড়লো একটি জুতোর দোকান। লাল-সবুজ সব ন্যাকড়ার জুতো; তলায় দড়ি। ও-সব নেপালী জুতো ও-দেশে প্রায় সবাই পরে। বাজার দেখা শেষ হলে ইন্দু বাবু আমাদের নিয়ে এলেন একটি মস্ত বড় রাস্তায়। দু'ধারের বাড়ীগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—যেমন থাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন য্যাভিন্যুয়ের দু'পাশে। ইন্দু বাবু জানালেন, রাস্তাটি কলকাতার চিত্তরঞ্জন য্যাভিন্যুয়ের আইডিয়া নিয়েই করা। কিন্তু রাস্তাটি অত চওড়া নয়। 'টুরীগেল' থেকে রাস্তাটি বেরিয়েছে। রাস্তায় ঢুকতেই সামনে পড়ে একটি মস্ত বড় গেট। ওদের প্রধান মন্ত্রীর নামে ঐ রাস্তাটির নাম হয়েছে 'যুদ্ধ-সড়ক।'

১৩ই মার্চ্চ—শনিবার।

শনিবার হচ্ছে নেপালের ছুটির দিন। সারা সপ্তাহের কাজের পর রবিবারে যখন আমরা বিশ্রাম করি, নেপালে তখন নেপালীরা সারা সপ্তাহের জন্যে নতুন উদ্যমে কাজ করতে লাগে। ওদের দেশের 'রবিবার' যেন আমাদের দেশের 'সোমবার'।

দুপুর বেলায় একটি মোটর-বাস ঠিক ক'রে দিদিমাদের নিয়ে সহরের বাইরে যে-সব দেখবার জিনিষ আছে সেগুলি দেখবার জন্যে বার হলুম। আধা হিন্দিতে বাস-ড্রাইভারের সঙ্গে জুড়ে দিলুম গল্প। জিজ্ঞাসা করলুম, বাইরের থেকে মোটর এবং মোটর-লরি কি করে আনা হয় নেপালে। আসবার সময় পাহাড়ের পথ তো দেখে এসেছি। সে পথে মোটর চালিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব। মোটরের যা কিছু দৌড়-ঝাঁপ আমলেকগঞ্জ থেকে ভীমফেরী এবং নেপালের দিকে থানকোট থেকে কাটমাণ্ডু পর্য্যন্ত। ড্রাইভার বুঝিয়ে দিলো মোটরের ইঞ্জিনটা রোপওয়েতে ঐ দুর্গম পাহাড় পার হয়ে আসে এবং 'বডি' আসে কুলীদের ঘাড়ে চড়ে। পরে নেপালে মোটরের ধড়ের সঙ্গে প্রাণ জুড়ে দিয়ে জীবন দান করা হয়।

কাটমাণ্ডু থেকে ১০।১২ মাইল দূরে 'নীলকণ্ঠে' এসে পৌছুলুম। দেখলুম, একটি বড় চৌবাচ্চা জলের মধ্যে পাথরের 'অনন্ত-শয্যা'র মূর্ত্তি তৈরী করা। দিদিমা'রা যখন বিষ্ণু-দর্শনে তন্ময়, আমি তখন ভালো একটি 'স্ন্যাপ' নেওয়ার জন্যে সুবিধা মত 'য্যাঙ্গেলে'র খোঁজে ব্যস্ত। তাই-ই হয়। এক জিনিষকে আমরা কত রকম করে দেখে থাকি। বিষ্ণুর পাষাণ মূর্ত্তির অপরূপ শিল্প-চাতুর্য্য দেখে যখন আমি প্রশংসায় শতমুখ, তখন দিদিমা'রা ছিলেন হয়তো বিভোর—পাথুরে মূর্ত্তিতে তাঁদের সেই প্রাণের ঠাকুর বিষ্ণুর চিন্ময় রূপ দর্শন ক'রে। 'অনন্ত-শয্যা'র সেই পবিত্র মূর্ত্তি যখন তাঁদের হৃদয়-পটে রেখাপাত করছিল, তখন আমি ছিলুম ব্যস্ত সেই মূর্ত্তির ছায়া নিতে আমার ক্যামেরার ফিল্মের বুকে।

'অনন্ত-শয্যা' দেখা হলে আমরা গেলুম 'বাইশধারা' দেখতে। 'বাইশধারা' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—একটি ঝরণাকে ইটের কারুকার্য্য করা প্রাচীরের সাহায্যে গতিরুদ্ধ করা হয়েছে; এবং সেই প্রাচীরের গায়ে বাইশটি গর্ত্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে ঐ গতিরুদ্ধ ঝরণার জল বার হয়ে যাওয়ার জন্যে। ভেবেছিলুম, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের মতো আশ্চর্য্যের জিনিষ না হ'লেও 'বাইশধারার' যখন এত নাম—তখন আশ্চর্য্যের কিছু দেখা অসম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ 'বাইশধারা' দেখে আমাকে হতাশ হতে হলো।

'বাইশধারা' থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আর মাইল খানেক গেলেই বাসায় পৌছানো যায়—এমন সময় আমাদের বাস গেল বিগড়ে। ইঞ্জিনের বনেট খুলে ড্রাইভার আর আমি অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা টিপলুম, ঘুরালুম, পরিষ্কার করলুম কিন্তু কিছুই হলো না। ৮টা বেজে গেল। আর ঘণ্টা খানেক বাকী। তার পর রাস্তা চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে। ৯টার সময়কার সরকারী বাঁশী বাজবে। তখন রাস্তায় চল্‌তে হলে রাস্তার মোড়ে প্রত্যেক পুলিশকেই জবাবদিহি দিতে হবে—কেন আমরা এ গভীর রাত্রে (তাঁদের মতে) রাস্তা দিয়ে চলছি। তাও আবার নেপালী পুলিশ। আমাদের কথা যদি না বুঝতে পারে তো সে তার কর্ত্তব্য করাই উচিত বিবেচনা করবে এবং সে রাত্রের মতো থাকতে হবে সরকারের অতিথি হয়ে। পরদিন সকালে হবে বিচার। কি বিচার হবে সে ঈশ্বরই জানেন। অতএব ৯টার মধ্যে বাসায় পৌছানোই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। ড্রাইভারকে বলে দিলুম, বাস সারিয়ে সে যেন বাসায় গিয়ে ভাড়া নিয়ে আসে। ড্রাইভার রাজী হ'লো।

গাঢ় অন্ধকার। অচেনা পথ। ড্রাইভার শুধু বলে দিয়েছে বাঁয়ে গিয়ে খানিকটা গেলে ডাইনে যে পথ পাওয়া যাবে সেটা ধরে সোজা ১০।১২ মিনিট গেলে আবার বাঁ-হাতি যে রাস্তা পাওয়া যাবে সেই রাস্তারই শেষে না কি আমাদের বাসা। তার নির্দ্দেশ মত শেষ পর্য্যন্ত সবাই পৌছলুম বাসায়।

১৪ই মার্চ্চ। রবিবার। এবার ফেরার পালা।

সকাল হতেই মোটর করে কাটমাণ্ডু থেকে রওনা দিলুম। এবার সঙ্গে পুরুষ মানুষ বলতে একা আমি। দিদিমাদের 'বডি-গার্ড' হয়ে চললুম। থানকোটে এসে ঝাঁপি, ডুলি, তাঞ্জাম, কুলী ঠিক করে পাহাড়ে উঠবার ব্যবস্থা করলুম। যে পথ দিয়ে এসেছিলুম সেই পথ দিয়ে ফিরে এলুম। কাজেই পথের আর নতুন পরিচয় দেব কি? নেপালে যাওয়ার পথে যেখানে-সেখানে একটু ক'রে বিশ্রাম নিয়েছিলুম—ফিরবার পথে চোখে পড়লো সে সব জায়গা। কিন্তু বিশ্রাম আর নিলুম না সেখানে। ঘরমুখো বাঙালীর বিশ্রামের কি দরকার?

তার পর এক দিন সন্ধ্যে বেলায় বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়লুম। সেদিন ছিল ১৮ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ

৩

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

জীবনের ঘটনাংশ

ভালো ক'রে সবটুকু দেখতে না-দেখতেও বীরভূমের যেটুকু কবির লেখার এলাকায় এসে পড়েছে, সেটুকু কবির সঙ্গে বীরভূমের যোগের একটা দিক মাত্র; এই সাহিত্যিক দৃষ্টির দিক ছাড়াও জীবনের ব্যবহারিক দিক আছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কবির সেই প্রত্যক্ষ যোগের ঘটনাটুকু মিলিয়ে নিলে তবে যোগের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। লেখার দিকের মতো সেদিকটিতে তথ্যের প্রাচুর্য না থাকলেও, তার গুরুত্বও কিছু কম নয়।

আগে-আগে চারি পাশের লোকেরা কবির জায়গা শান্তিনিকেতনে বেশি এসেছে খেলার মাঠে, ফুটবলের মরশুমে দর্শক হয়ে। আর এসেছে তারা আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের সময় সাতই পৌষের মেলায়; ক্রমে এখানকার উৎসব, জলসা ও নাট্যাভিনয়ে তাদের ভিড় বাড়তে থাকে। এখনো শান্তিনিকেতন চার পাশের নিম্ন-সাধারণের কাছে অভিহিত "কাঁচ বাংলা" "শান্তিনি" বা 'শান্তিনিকেতন' ব'লেই। কবির অনুষ্ঠানকে বহু দিন ধ'রে কৌতূহলের সঙ্গেই তারা দেখে এসেছে;—তাঁর ভাব ও কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস গড়ে উঠেছে খুব ধীরে-ধীরে। সে ইতিহাসের পথ-রেখা অবলুপ্ত না হতে একবার তার সন্ধান নেওয়া ভালো। পুরোনো লোকের অভাব, তাছাড়া স্মৃতির নির্দেশ ক্রমেই বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

বোলপুরের লোক কবিকে স্থানীয় স্কুল, লাইব্রেরি, খেলা-ধুলাদি নানা ব্যাপারে নানা সময়ে তাঁদের মধ্যে পাবার জন্য চেষ্টা করেছেন; বহু পূর্ব্বে একবার কেবল এরূপ চেষ্টা সফল হয়েছিল। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৯১৪ কিংবা '১৫ সনে কবি উপস্থিত থেকে অভিভাষণ দান করেছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর ভাষণে পুরস্কার বিতরণ-নীতিরই নিন্দা করে কিছু বলেন। স্কুলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সে সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল; শান্তিনিকেতনের প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আর এক জন শ্রোতা বর্ত্তমান স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছেই এ ঘটনাটি প্রথম জানা যায়। শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর রায়ও তাঁর উক্তির সমর্থন করেন। শান্তিনিকেতন এবং বোলপুরবাসী সাধারণের নিকট এ ঘটনা আজ অপরিজ্ঞাত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, মৃত্যুর দু'বছর আগে ১৯৪০ সনের ২৪ জুলাই বোলপুরে আর একবার কবি গিয়েছিলেন, এ অঞ্চলের ট্রাঙ্ক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কেন্দ্র-উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। সাধারণ পাঠাগারের সীমায় এ উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীগণ সেখানে গান করেছিলেন। কবি নিজে এ অনুষ্ঠানে দু'টি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন,—একটি তার "আজি হতে শত বর্ষ পরে," এ উপলক্ষ্যে তিনি নিম্নলিখিত বাণীটি দু'দিন পরে লিখে দিয়েছিলেন:—(অপ্রকাশিত) "**It was a great pleasure to me to open the telephone exchange at Bolpur with a trunk call to Sir G. Bewoor on Wednesday 24th july last. I hope the public will fully take advantage of its benefit.—Rabindranath Tagore, Santiniketan. July 28, 1940.**"

কবির পত্র থেকে বোলপুরের স্থানীয় খবর একটু পাওয়া যায়। চিঠি পত্র ৫ম খণ্ডে প্রমথ চৌধুরী মশায়কে লেখা ১০০ নং পত্রে লিখছেন: "কয়েক দিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত-আটশ…র সমাগম হয়েছিল। রক্তবৃষ্টির পূর্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে—সিউড়ি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস আসাতে চাপা পড়ে গেল। রক্তমক্ষণের পরে কলকাতার বায়ু-প্রকোপের কিছু উপশম হয়েছে শুনছি। ইতি ১৮ বৈশাখ, ১৩৩৩"।

মহাত্মা গান্ধী যখন একবার প্রথম দিকে বোলপুরে আগমন করেন, সে সময় শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত করার জন্য ষ্টেশন থেকে আশ্রম অবধি পথে তোরণ নির্ম্মাণ ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল; তার মধ্যে বোলপুরবাসীর উৎসাহ, উদ্যম ও শৃঙ্খলার কথা জেনে কবি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর ভস্মাস্থি শান্তিনিকেতনে আনবার দিনটিতেও সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ ভাবে পথের দু'পাশে অপেক্ষমান বোলপুরের জনতার নীরব শ্রদ্ধা-নিবেদনও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র শহর বোলপুর। সাহিত্যে, শিল্পে, এক কথায় সাংস্কৃতিক দিকে বা পৌর-জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সে তেমন উন্নত ছিল না। কবির সমস্তরের সংযোগ-পথও স্বভাবতই ছিল সংকীর্ণ। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সৌহার্দ্য ঘটাতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা এমনিতেই তাঁর জীবনে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বোলপুর ছিল ব্যবসায়-কেন্দ্র। কিন্তু সেদিক দিয়ে কবির আগ্রহ সে জাগাতে পারেনি। কিন্তু আজ দেখা যায়, বোলপুরবাসীকে দিনে দিনে নানা সূত্রে তিনি একরূপ আশ্রম-পরিবারভুক্তই করে তুলেছেন।

শুধু বোলপুর নয়, বিদ্যার দিকে সারা বীরভূমেরই দৈন্য কবিকে সর্বপ্রথম ব্যথিত করেছে। গোড়ার দিকে তিনি আশে-পাশে কতকগুলি পাঠশালার ব্যবস্থা মাত্র করতে পেরেছিলেন। আর এ ছাড়াও একটি মহা সুযোগ সৃষ্টির কথা আশা করি স্থানীয় লোকেরা চিরদিন স্মরণ করবে। স্থানীয় সাধারণ শ্রেণীর ছেলেরা যাতে উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হয়, তার জন্য তিনি নিজের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীতে বীরভূমের শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ প্রদান করেন। আশ্রমের কর্মী-পরিবার ছাড়া এ অধিকার কেউ পায় না। সেই থেকে বীরভূমের বহু ছাত্র-ছাত্রী বোলপুর থেকে এসে শান্তিনিকেতনে পড়ছে। পথ এবং যান-বাহনের ব্যবস্থা থাকলে, প্রথম থেকেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রীই করতে পারতেন। কিন্তু কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি; বর্ত্তমানেও বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন বিভাগে স্থানীয় বোলপুরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

কবির বৃহত্তর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের স্বপ্ন আজ বোলপুরের এক-একটি পল্লীতে শিক্ষার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। বিশেষ ক'রে বোলপুরেরই কর্মী ও শিক্ষিত নর-নারীর চেষ্টায় কবির আদর্শেই গড়ে উঠেছে বোলপুর বালিকা-বিদ্যালয় এবং উচ্চ-ইংরাজী বালক বিদ্যালয়। বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও সংগঠিকা শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপিকা। এক সময়ে এঁকে কবি

শান্তিনিকেতনের "ছাত্রী বিভাগের অধিনায়িকা" ক'রে শ্রীভবনের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। একখানি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন: "…তার পরে এখানকার ছাত্রী বিভাগের অধিনায়িকা। তুই যে আধা-ডাক্তারণীর কথা লিখেছিলি, খাপ খাবে কি না বুঝতে পারা গেল না—জানা লোকের জানাশোনা মানুষ যদি হোতো বিচার করা যেত—তার পরে বেতনের সমস্যা।…আপাততঃ স্থির করেছি, সুধা—প্রভাতকুমারের স্ত্রী—সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা—তাঁকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত করা—রাতের বেলায় মেয়েদের আগলাবার জন্যে কিঞ্চিৎ সস্তা দামে কোনো ভদ্র মেয়েকে সুধার সহকারিণীরূপে রাখব।"—(চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৪-১৫)

অবশেষে আজ বোলপুরে কলেজও প্রতিষ্ঠিত হল। দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথেরই এক কালের নিয়োজিত চিকিৎসক ডাঃ রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব রয়েছে তার পুরোভাগে। কলেজ-কমিটি যাঁকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন, ঘটনাক্রমে সেই সুধীসজ্জন হচ্ছেন, কবিরই এক সময়কার বিশেষ স্নেহভাজন ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি ময়মনসিংহবাসী। নাম তাঁর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন হোম রায়। বাংলার বর্তমান প্রচার-সচিব শ্রীযুক্ত অমল হোম এবং রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারের প্রথম গ্রহীতা ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়ের তিনি ভ্রাতা। অধ্যক্ষ সুধেন্দু বাবু কবির ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন শ্রীঅরবিন্দের দাদা মনমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ অনুলেখকরূপে। ভাষণটি তখনকার কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক 'বৈকালী'তে প্রকাশিত হয়ে কবির দৃষ্টিগোচর হয়। কবি বিশেষ প্রীত হন। অনুলেখন-প্রথার তখন সূচনা-যুগ। এর আগে 'রক্তকরবী' নাটকের 'নন্দিনী' নামক মূল পাণ্ডুলিপিটি জরুরী প্রয়োজন স্থলে সুধেন্দু বাবু সম্পূর্ণ কপি ক'রে কবিকে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঐ সূত্রে পরিচয়ের সুযোগ কিছু ঘটেছিল। এবারে সেই ঘটনারই অনুবৃত্তিতে কবি বলেন: কত বক্তৃতা কত আলাপ কালের গর্ভে শূন্যে বিলীন হয়েছে,—কেউ যদি তা টুকে রাখত! কিন্তু যা গেছে, আর তো তা ফিরিয়ে পাবার উপায় নেই।—এই ব'লে, পরে কবি তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী তরুণ অনুলেখককে পুরস্কৃত করেছিলেন অপ্রত্যাশিতরূপে একখানি স্নেহসিক্ত পত্র দিয়ে। সেই পত্রে মাইকেলের বিখ্যাত কবিতা-পংক্তির প্যারডিতে নিজেরই উপরোক্ত মন্তব্যের জের টেনে একটি কবিতাকণাও সংযুক্ত করা ছিল। লিখেছেন:

(অপ্রকাশিত পত্র)

শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন হোম রায়
২০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রতিলিপির কাজে তুমি যেমন ওস্তাদী দেখিয়েচ, অনুলিখনের কাজেও তেমনি দেখচি তোমার পাকা হাত। যা মুখে বলেছিলেম ঠিক তাই ত দেখলুম ছাপার কাগজে। আমাকে অনেক সভায় অনেকবার ডাক পড়েচে তাতে অনেক কথাও বলেচি—আজ তাদের টিকি দেখবার জো নেই। তাই মাঝে মাঝে গুঞ্জনস্বরে মনের খেদে বলে থাকি:

সভার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
বকুনিপ্রবাহ বহি' কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে!

তুমি যদি আরো কিছুকাল পূর্ব্বে সভাসমিতিলোকে আবির্ভূত হ'তে তাহলে আমাকে এত বড় শোকাবহ গানটা গাইতে হত না। কথার পুঁজি শূন্য করে আমার কণ্ঠ যখন হাঁ হাঁ করচে তখন তোমার অনুলিপির নিপুণ পাশহস্তে আজ কোন্ বাণীকে শীকার করতে এসেচ? বাজপক্ষী গেল, কোকিলপক্ষী গেল, ধরেচ কি না এক চড়াই পক্ষীকে। তবু তোমার তারিফ করচি। ইতি ১৪ মার্চ্চ ১৯২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণের পর্বে ময়মনসিংহের ভাষণগুলির অনুলিখন সমস্তই এই সুধেন্দু বাবুর দ্বারা লিখিত হয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

যে আলো, যে সম্পদের উৎস রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের প্রান্তরে উদ্গারিত করে গেছেন, দিন আসবে যেদিন সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বীরভূমও তার সম্যক্ মূল্য সন্ধানে ব্রতী হবে; সেই সন্ধানের নিগূঢ় পথ এই শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আরো সুগম হবে। কবি-অনুরাগী বোলপুর কলেজের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর রায়ের যোগ্য পরিচালনায় ও তৎসহ বোলপুরবাসী জনসাধারণের উৎসাহে কবির অবর্তমানেও বীরভূমের স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে কবির যোগ নিশ্চয়ই আরো ঘনিষ্ঠ হবে, এমন আশা থেকে আজ আমাদের আনন্দ লাভ করতে দোষ নেই।

ভারতরাষ্ট্রে সম্প্রতি পল্লী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তনের কথা উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লী-মহাবিদ্যালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সাতটি কলেজ স্থাপিত হবে, বোলপুর কলেজ তার অন্যতম। এই পরিকল্পনার দ্বারা এক দিকে যেমন জনসংখ্যাস্ফীত মহানগরীর দূষিত বদ্ধ আলো-বাতাসে তিলে-তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ-শীর্ণ পঙ্গু কিশোর শিক্ষার্থী-জীবনগুলির পক্ষে নিজ-নিজ বাসভূমি অঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশে বাস ক'রে সুস্থ দেহে-মনে স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ হবে, তেমনি তাতে পল্লীপ্রদেশগুলিও আপনা থেকেই শিক্ষার আবহাওয়ায় উন্নত হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সামাজিক-জীবনের নানা দিকেই তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষিতের সঙ্গে সাধারণের উন্নাসিকতার দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ নানা দিক দিয়েই ঘুচবে। জাতির সুস্থ সহজ ও সংঘবদ্ধ জীবন গঠনের পক্ষে, সুনিয়ন্ত্রিত হলে পরে এ পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলেই আশা করা যায়। অন্যথায়, এর প্রতিক্রিয়া আবার তেমনি মারাত্মকও হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে এমনি একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ নিয়েই এসে বসেছিলেন বোলপুরের প্রান্তরে। সেদিন থেকে বহু শিক্ষার্থী এবং সে-সঙ্গে বহু শিক্ষক ও সাধক কবির এই সাধন-ক্ষেত্রে এসে সমিধ জুগিয়ে চলেছেন। শান্তিনিকেতন কায়িকভাবে আপন ভৌগোলিক সীমাতেই রয়েছে পূর্বাপর সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার প্রাণ, তার প্রথা দিনে দিনে নানা অন্তর্লীন পথে প্রবাহিত হয়ে বৃহত্তর জাতীয় উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ক্রমশ জারিত হয়ে বিচিত্ররূপে আজ

মুক্তিলাভ করছে। দ্রষ্টাদের চক্ষে তার মূল উৎসটি ধরা পড়তে বিলম্ব ঘ'ট না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপনের দিনে তাঁর পরিকল্পনায় বলেন: "সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ-বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"—(বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ বৈশাখ)

আজকের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-পরিকল্পনার পশ্চাতেও এই পল্লী-আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের যে যোগ দেখা যায়, সে শুধু ভাবগত নয়, এর সঙ্গে বাস্তব ঘনিষ্ঠতার সূত্র রয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরই সুযোগ্য ছাত্র ডা: ধীরেন্দ্রমোহন সেন, স্বয়ং বাংলার শিক্ষাবিভাগের পরিচালক মশায়। শান্তিনিকেতনের ও বিলাতের পাঠ সমাপ্ত ক'রে কর্মজীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথেরই আহ্বানে এসে তাঁরই সান্নিধ্যে থেকে সুশৃঙ্খল ক'রে গড়ে তোলেন তিনি বিশ্বভারতীর স্কুল ও কলেজ বিভাগ। ব্যক্তিগত জীবনের সেই অভিজ্ঞতা আজ বিস্তৃত ধারায় সার্থক হতে উন্মুখ। শিক্ষা অর্জন এবং তার প্রয়োগ, দু'দিক দিয়েই বোলপুরই তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। কবির সাধনার এই বিশিষ্ট ধারাবাহীর কাছে বোলপুরবাসী এবং সে-সঙ্গে দেশবাসী সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে ভাবীকালে রবীন্দ্র-ধারার বহু বিকাশ দ্বারা দেশের চিত্তসমৃদ্ধি আশা করা স্বাভাবিক।

বড়ো বড়ো মান্যগণ্য কৃতাবিদ্যদের ক্ষেত্রেই যে রবীন্দ্র-ধারা এরূপ সম্ভাবনার পথ কেটে চলেছে তা নয়, তার সার্থকতার আরেক ক্ষেত্রের সন্ধান নিতে হবে ছোটোদের মধ্যেও,—সে ছোটোরা শহরের নয়, তারা গ্রামের অতি দরিদ্র সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত যুবক। তাদের আক্ষরিক শিক্ষা যেটুকু, সেটুকুও বিশ্বভারতীর নৈশবিদ্যালয় যোগে। আর, "রবীন্দ্র-উৎসব-সংঘ" এবং শান্তিনিকেতনের সান্নিধ্য তাদের সহজাত গুণী-প্রতিভার স্ফুলিঙ্গকে অনুকূল বায়ু-ব্যজনে কিছুটা প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। ভুবনডাঙা গ্রামের কিশোর ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে সংস্কৃতির সেই আলো-কণিকার আভা দৃশ্যমান। কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ এদের জীবিকার অবলম্বন। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীত, অভিনয়, সাহিত্যচর্চা, সংঘবদ্ধ ভাবে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান এবং খেলা-ধুলায় এদের সহজ আগ্রহ; এর মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্যে, বিশেষত তারের বাদ্যযন্ত্রাদি নির্মাণে শ্রীনেপাল পরামাণিক এবং রবীন্দ্র-সংগীতে শ্রীভিক্ষপদ হাজরা ও শ্রীরেণুপদ হাজরার উদ্যম ও অধিকার বিশেষ আশাপ্রদ।

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সব সাংস্কৃতিক প্রভাব পার্শ্ববর্তী পল্লীর রক্ষণশীল নারীসমাজেও পথ করে চলেছে। সাধারণ শিক্ষা, সূচীশিল্প, নৃত্যগীত অভিনয়াদি আজ তাদের কাছে নূতন জিনিষ নয়। যথোচিত উৎসাহ ও আনুকূল্য পেলে ভুবনডাঙার এই ধারাই এক দিন সমাজ-জীবনের সাধারণ স্তরগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অপূর্ব দান বইয়ে দিয়ে যে এক মহা পরিবর্তন এনে দিতে না পারবে, তা কে জানে!

উপরে "বোলপুর রবীন্দ্র-উৎসব-সংঘের" কথা উল্লিখিত হয়েছে। তার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণকে যোগযুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই সংঘ স্থাপিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশীদের নিয়েই প্রধানত তা গঠিত। শুধু প্রতিবেশেই নয়, পশ্চিমবঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরেও এ সংঘের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীত এবং রবীন্দ্র-রচনার আবৃত্তি ও আলোচনার মাধ্যমে সংঘ যোগবিস্তারের কাজ করে থাকেন। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরবর্তী কালে এর প্রতিষ্ঠা হলেও ইতোমধ্যে প্রতিবেশের সঙ্গে যোগের কাজে এর বিশেষ সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভুবনডাঙার অদূরেই, বোলপুর কলেজের পাশে বিরাটাকারে গড়ে উঠছে স্থানীয় সরকারী চিকিৎসালয় ও প্রসূতিসদন। রাস্তার অপর পাশে সাধারণের পাঠাগার। তারি সংলগ্ন রয়েছে বাঁধগড়া গ্রাম। ভুবনডাঙা ও বাঁধগড়ায় কবি দু'টি কর্মকেন্দ্র স্থাপন ক'রে কর্মীদের তথায় নিযুক্ত করেছিলেন। বাঁধগড়াবাসী ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের গ্রামে নিয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ও পল্লীপ্রাণ কালীমোহন ঘোষ। গ্রামের মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়ে কবিকে বরণ করেছিল, গ্রামবাসী শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছিল হাল আমলের ফুলের মালা দিয়ে নয়,—ক্ষেতের ফসল, আখ, গুড়, মুড়ি ইত্যাদি দিয়ে। কবি সেখানে গিয়েছিলেন একটি চাষী-পরিবারে ঘরের লোকের মতো। বাঁধগড়ার বর্তমান বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে এই উপলক্ষে একটি সভা সেদিন আহূত হয়েছিল ও গ্রামের খুঁটিনাটি সমস্যা এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কবি তাতে আবেদন জানিয়েছিলেন।

তথ্যটি লেখককে জানান প্রথমে বোলপুরের প্রাক্তন পেশকার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনগুপ্ত। কবি যাবেন শুনে তিনি ছিলেন সেদিনকার সভায় রবাহূত শ্রোতা। ভোলানাথ বাবু বলেন, সেদিনকার কবি-ভাষণের একটি কথা তাঁর খুবই মনে থেকে গেছে,—গ্রামবাসীকে মধুর স্বরে আহ্বান ক'রে কবি বলেছিলেন, এত দিন তোমরা আমাকে ডাকনি, তাই আমিও আসিনি; আজ ডেকেছ, আমি এসেছি। মনে রাখতে হবে, সেইবারই মাত্র স্থানীয় পল্লীবাসীদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এসে কবির প্রথম মেলামেশা।

দেখা যায়, এই গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কোন দলাদলি, ভেদ বৈষম্য স্থান পায়নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, সি এফ এণ্ড্রুজ প্রভৃতি দেশপূজ্যগণ এই গ্রামের কাজ দেখতে বিভিন্ন সময়ে এখানে

পদার্পণ করেছেন ; গ্রামের এই সৌভাগ্য সম্ভব হয়েছে গ্রামটি কবির শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশে অবস্থিত ব'লে। জানা দরকার, সমবায় স্বাস্থ্যসমিতির দেশব্যাপী বিস্তার লাভের মূলে রয়েছে ক্ষুদ্র পল্লী এই বাঁধগড়া-অধিবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগ। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ১৩৩৩ সন থেকে ১৩৪৬ সন পর্যন্ত এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝি বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবাবিভাগের পরিচালনা অনুযায়ী তিনি ভুবনডাঙা, বাঁধগড়া, কালী-পুর ও বোলপুরে এক-একটি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্য্যকর করবার জন্ত ব্রতী থাকেন। তাঁর এই কার্য্যে উপদেষ্টা ছিলেন স্বর্গীয় কালী-মোহন ঘোষ। কালীমোহন বাবু বোলপুরের আশে-পাশের গ্রামের সেবাব্রতীদের নিয়ে কবির শ্রীনিকেতন-কার্য ধারাকে প্রাণবন্ত ক'রে যে ভাবে গড়ে তোলেন, পরে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে বলা হবে।

লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। কবিকে যোগ দিতে দেখেছিলেম সাঁওতালদের বাঁধনা পরবে। ১৩২৯ সন হবে। সাংগলীর রাণীসাহেবা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ; পৌষ-সংক্রান্তি পড়েছিল সেই সময়েই। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনের পথে প্রথম সাঁওতাল পাড়াটির (কালীগঞ্জ) প্রাঙ্গণে চলেছে সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব। রাণীকে নিয়ে কবি মোটরযোগে বিকেল বেলায় সেখানে যান এবং নাচ-গান দেখে-শুনে ফিরে আসেন।

বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্য দু'বার কবির সাক্ষাতে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম বার উদয়ন-গৃহের দোতলার পিছনের ছাদে ; এই নৃত্য-পুনরুজ্জীবক গুরুসদয় দত্ত মশায়ের উত্তোগে ; কেবল মাত্র কবি ও তাঁর পারিপার্শ্বিক মণ্ডলীটিকে অনুষ্ঠানটি দেখানো হয় ; দ্বিতীয় বার খেলা হয়েছিল দেশীয় হাড়ি-বাগ্‌দীদের নিজেদের একটি দলের স্বাধীন ব্যবস্থাতেই। স্থান ছিল শিশু বিভাগের উত্তর প্রাঙ্গণ। রায়বেঁশের উল্লেখ রয়েছে কবির কৌতুক রসের কাব্য 'খাপছাড়া'তে :

রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে
বর হেসে কয় ঠাট্টা।

আসরে বসে কবি বীরভূমের কীর্তন শুনেছিলেন উত্তরায়ণের উদয়ন-গৃহের একতলাকার পিছনকার বারান্দায় ;—সন্ধ্যায় বিনোদন-পর্বে সেদিন 'নৌকাবিলাস' পালা গেয়েছিলেন ভেদে-নিবাসী পেশাদার কীর্তনীয়া থাদু গোঁসাই। ময়নাডালার বিখ্যাত রসময় মিত্রের কীর্তনও গীত হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতেই প্রায় কুড়ি বছর আগে, বিত্তাভবনের বারান্দায়। বহু পূর্বে নীলকণ্ঠের যাত্রাও কবি শুনেছেন শান্তিনিকেতনের মেলার আসরে। "৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল···চাঁদোয়ার নিচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়।"—(ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৩০) কবির পার্শ্বচর সচ্চিদানন্দ রায় ওরফে 'আলু-দা'র উত্তোগে গোমাণির কবি-গানও কবি-সান্নিধ্যে কোণার্কের বারান্দায় একবার গীত হয়েছিল।

কবির মৃত্যুর বছর পাঁচ-ছয় আগে, 'বিশু দাস' নামে দীর্ঘশ্মশ্রু সুকণ্ঠ এক বৃদ্ধ বাউল মাঝে-মাঝে আসতেন কবির কাছে, কবিকে গান শুনিয়ে যেতেন। বোলপুরের কাছারিপটির দিকে ছিল তাঁর আখড়া ; সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তাঁর একখানি রেখাকৃতি রচনা করেছিলেন। আর এক জন বাউল নিয়মিত ভাবে বহু দিন শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া করেছে, তার নাম গোপাল খেপা।

কবি শান্তিনিকেতনে একটি জনসভা ডেকেছিলেন। ঘটনাটি ঘটে গান্ধিজীর পুণা-উপবাস উপলক্ষে। চার পাশের গ্রামের লোক যাতে বেশি ক'রে সে সভায় যোগদান করে, সে জন্ত বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল,—আশ্রমবাসীরা তো সবাই ছিলেনই। সিংহসদনে অপরাহ্ণে সে সভা হয়। অস্পৃশ্যতা দূর করবার আবেদন ক'রে কবি আবেগপূর্ণ এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। মেথর, মুচি ইত্যাদি পাঁচ জন হরিজন মাল্যচন্দন ও পানীয় বিতরণ করে। সভার শেষে খিচুড়ীর ভোজ হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সভাতেই মেথরের দ্বারা বিতরিত মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করেন।

এর কিছু দিন পরে শ্রীনিকেতনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের কাজ সম্পর্কে বীরভূম জেলা কর্মীমণ্ডলীর একটি অধিবেশন হয়। অনেক বিশিষ্ট কর্মী তাতে যোগদান করেন। সেই সভায় মেদিনীপুরের নেতা সাতকড়িপতি রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবি স্বয়ং ছিলেন সভার উদ্বোধক। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদার। যতদূর মনে পড়ে, বীরভূমের জননায়ক সিউড়ির ডা: শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নান্নুরের অনাদিকিঙ্কর রায়, কীর্ণাহারের কর্মীপ্রবর কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং বোলপুরের ধূর্জটিদাস চক্রবর্তী, হংসেশ্বর রায়, নিশাপতি মাঝি প্রভৃতি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবং তাঁরা কবির আহ্বানে জেলাব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের গঠনের দিকটি সার্থক করতে শান্তি-নিকেতনে কেন্দ্র স্থাপন ক'রে কবির পৃষ্ঠপোষকতায় 'সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়। সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য ছিল :

"১। হিন্দু-সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা।
২। দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।
৩। পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা।
৪। জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করা।" (Mahatmaji and Depressed Humanity)

সে সময় "সংস্কার ভবন" নামক শান্তিনিকেতনে একটি বিভাগ পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল : "বিনা দক্ষিণায় দুর্গতদের ছেলেদের 'সংস্কার ভবনে' রেখে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সমভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্য থেকেই 'সংস্কার সমিতির' ভাবী কর্মী ও কেন্দ্রপরিচালক তৈরি করাই ছিল উদ্দেশ্য। এই আবাসিক শিল্পাশ্রমের ছাত্রগণ প্রথম থেকেই যাতে আয়কর বৃত্তি শিখে নিয়ে কাজ ক'রে নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করে এবং ভবিষ্যতেও উপার্জনক্ষম হয়, সে ব্যবস্থায় তাদের 'সংস্কার ভবনে' গ্রহণ করা হত। বীরভূমের অনেক দরিদ্র ও হরিজন ছেলে আবাসিক ভাবে 'সংস্কার ভবনে' থেকে শিক্ষা লাভ করে।"—(দ্র: Mahatmaji and Depressed Humanity)

সিউড়ির শিল্প ও কৃষি (বড় বাগানের মেলা) প্রদর্শনীতে কবি দু'বার যোগ দেন। প্রথম বার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদর্শনীর

দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন, সিউড়িতে রব উঠেছিল—দুই রাজা আসছেন। কবিকেও লোকে 'রাজা' বলেই সেদিন ধ'রে নিয়েছিল। সেবার থেকেই এই প্রদর্শনীতে বেসরকারী দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্বোধনের কাজের সূত্রপাত হয়। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী এ তথ্যটি লেখককে জানান। কবির মৃত্যুর বছর দুই আগে আরেক বার সিউড়িবাসীর আগ্রহাতিশয্যে কবি সেখানে যান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে সেখানে বিপুল আড়ম্বরে ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা ক'রে অভিনন্দন দান করেন।

সিউড়িতে অবসরপ্রাপ্ত শেষ-জীবনযাপন কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপক বীরভূমবাসী ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় একবার কবি-সকাশে এসেছিলেন। তখন তাঁর বাগানের এবং বিশেষ ক'রে গোলাপবাগের চাষে বিশেষ যত্ন ছিল। কবির সঙ্গে 'শ্যামলী'র উত্তর-পুব কোণের কক্ষে ব'সে সে-সম্বন্ধেও নানা কথা হয়। সিউড়ির উকিল বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে বীরভূমের পাবলিক প্রসিকিউটর) ছিলেন সদরে আশ্রমের পক্ষের ব্যবহারাজীব। তিনি সময়ে সময়ে এখানে এসেছেন; কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে।

সুলতানপুরের অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শ্রীনিকেতনের কাজে, বিশেষ ভাবে ব্রতীবালক-সংগঠনে বিশেষ আগ্রহান্বিত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবির সাক্ষাতে তাঁর যাতায়াত ছিল। কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও মিঃ এল, কে, এলম্‌হার্স্ট একবার সুলতানপুরের জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

লাভপুরের কবি-অনুরাগী জমিদার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যাতায়াত ঘটেছে শান্তিনিকেতনে। লাভপুরে তাঁর উদ্যোগে ও শিক্ষাধীনে রবীন্দ্রনাথের নাটক 'চিরকুমার সভা' অভিনীত হয়। কবির নাটকের মফঃস্বলে এমন সুচারু অভিনয় কমই হয়েছে। শান্তিনিকেতনের জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ ইত্যাদি বহু ব্যক্তি সে অভিনয় দর্শন করেন। তাঁদের মুখে এর প্রচুর সুখ্যাতি শোনা গেছে। একবার কবির পঁচিশে বৈশাখের জন্মোৎসবে আশ্রমের ছুটির মধ্যে 'উদয়ন'-গৃহে নির্মলশিব বাবু সভাপতিত্ব করেন ও তাঁর ভাষণে শ্রদ্ধা-নিবেদন ক'রে কবির সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন। সেবার কবি ছিলেন বিদেশে।

আগে আগে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক ব্রতীদল-সমাবেশ-উৎসবে বহু বার শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদলে যোগদান করেছেন। ব্রতীসংগঠন ও ফুটবল খেলার সূত্রে বীরভূমের নানা কেন্দ্রেই কবির অনুষ্ঠানের সহিত যোগ ঘটেছে স্থানীয় তরুণদের।

বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ নেতা রামপুরহাটনিবাসী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবির কাছে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রথম দিকে তাঁর তেমন যোগ ছিল না। একবার তিনি জাতীয় মহাসভার পক্ষ থেকে পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বে যোগ না থাকলেও, যেহেতু তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, কবি সেই কারণ দর্শিয়েই তাঁকে সমর্থনের কথা সকলকে বলেন। একরূপ শেষ মুহূর্তে কবির যৌক্তিকতায় আশ্রমবাসী বহু লোক গিয়ে বোলপুরে জিতেন্দ্রলালের পক্ষে ভোট দেন। কবির মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে কবিকে যখন সিউড়িবাসী সিউড়িতে নিয়ে অভিনন্দিত করে, সে সময়ে সেই জনসভায় পৌর-সমিতির পক্ষ হয়ে জিতেন্দ্রলালই কবিকে অপূর্ব বাগ্মিতায় সেখানকার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের খয়রাশোল থানার রূপোসপুর গ্রামের অধিবাসী। কবির হাত থেকে তিনিই বোধ হয় আধুনিক কথা-সাহিত্যিকমণ্ডলীতে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি-পত্র লাভ করেন। শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কবির বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন; কবি তার গল্পের অনুরাগী ছিলেন, জলসাঘর, ছলনাময়ী ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ সম্বন্ধে প্রচুর সুখ্যাতি করে গেছেন। কয়েক বারই তারাশঙ্কর বাবু শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কবি-দর্শনও তাঁর ঘটেছে। রায়পুরের লোক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস শান্তিনিকেতনে এসে কবির কাছ থেকে কবির কতকগুলি পুরোনো রচনা যাচাই করে নেন। তাঁর 'রাজহংস' কাব্যোপহার কবিকে বিশেষ আনন্দিত করেছিল। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে তাঁর শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের কবিতা" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: "চয়নিকা পাঠের পর আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথের চরণ-বন্দনা করিয়া আসিয়াছিলাম।"—(শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৭) কবিপ্রয়াণের পরে বোলপুরের রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উৎসবে বোলপুর হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে এক সভায় হরেকৃষ্ণ বাবু সভাপতিত্ব করেছিলেন। সিউড়ির স্বর্গত শিবরতন মিত্রের সহিত কবির পত্রালাপ ঘটেছিল। কবির মধ্য-জীবনে যখন এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, সে সময় প্রেসের কাজের সূত্রে শিবরতন বাবুর হাতে কবির উপন্যাস 'গোরা' ও কাব্য-সংকলন 'চয়নিকা'র পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ এসে পড়ে। তিনি সেগুলি যত্নসহকারে রক্ষা করেন। আজো শিব রতনবাবুর পরিবারে তা সুরক্ষিত রয়েছে। (বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডলকে লিখিত শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মিত্রের পত্র) শিবরতন বাবুর পরলোকগত পুত্র গৌরীহর মিত্র তাঁর 'চরিত কীর্তন' পুস্তকে (পৃ ৫৪) লিখেছেন: "পিতৃদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; অথচ তিনিও এই লাইব্রেরী লইবার বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।" বীরভূমের গ্রন্থকারদের মধ্যে স্বল্পখ্যাত হলেও বোলপুরের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনগুপ্ত (অধুনা—ভোলা সেন) তাঁর "গোরুর গাড়ি" কাব্য কবির হাতে দেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন; "রক্তকরবীর মর্মকথা" গ্রন্থও এঁরই রচিত। এইরূপই আর এক জন স্বল্পখ্যাত কবি স্বর্গীয় সৌরেশ. চৌধুরী, কবি-সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন তিনিও।

বোলপুরের ডাক্তারদের মধ্যে শান্তিনিকেতনে ডাক পড়েছে কয়েক জনেরই। তাঁদের মধ্যে এখনকার ডাঃ রামরঞ্জন মুখোপাধ্যা[illegible] আছেন প্রাচীনতম ব্যক্তি। শ্রীনিকেতনের ডাক্তার হয়েই তাঁ[illegible] চাকরি নিয়ে প্রথম বোলপুরে আসা। শ্রীনিকেতনেই একটি মে[illegible] তিনি থাকতেন। বছর দুই কাজ করে তিনি বোলপুরে স্বাধীন ভা[illegible] চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। তাঁর কাছে কবির বিষয়ে এক[illegible] বিশেষ খবর জানা যায়। গল্পটি তাঁরও শোনা হয়েছিল, তঁ[illegible] মেসের সহবাসী শ্রীনিকেতনের তৎকালীন কর্মী মিঃ খাম্বাটের ক[illegible]

থেকে। কবি না কি কিছু দিন নিজের 'কমোড' নিজে সাফ করেছিলেন। আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে আগের দিন থেকে বারবার খাম্বাটেকে ঘরে-বাইরে করতে হচ্ছে। সেদিন সকালে একরূপ রাত্রি থাকতেই বাইরে থেকে যেমন তিনি নিজের ঘরে ফিরছেন, পথিমধ্যে দেখেন স্বয়ং কবিকে। হাতে তাঁর পরিষ্করণীয় পাত্র। কবি তখন কিছু দিন যাবৎ শ্রীনিকেতনবাসী হয়ে আছেন। বিস্মিত খাম্বাটেকে বললেন, "দেখেই ফেললে দেখছি! মহাত্মাজি বলেছেন বটে, তবু কাজটা আশ্রমের সকলকে করতে বলা যায় কি না, ভাবছি। নিজে ক'রে না দেখে তো পরকে বলা ঠিক হবে না। তাই দিন কুড়ি এটা করবার সংকল্প নয়েছি। আজ সতেরো দিন।" গান্ধিজীর স্বাবলম্বন নীতিতে দিনচর্যার দ্বারা প্রতি বছর একটি দিন শান্তিনিকেতনে 'গান্ধি দিবস' পালন করা হয়। কবি এক সময়ে এ কাজে ব্রতী হবার গল্পটি সত্য প্রমাণ হলে, তথ্যের মূল্যে কথাটি খুবই মূল্যবান হবে সন্দেহ নেই। বর্তমান শ্রীনিকেতন-সচিব এবং শ্রীনিকেতনের প্রাচীনতম কর্মী শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ রায় ঘটনাটি অসম্ভব মনে করেন না। তিনি বলেছেন, খাম্বাটে নামক পার্শী কর্মী শ্রীনিকেতনের প্রারম্ভ-পর্বে এক জন ছিলেন বটে, এবং গুরুদেবেরও সে-সময় মাঝে-মাঝে এখানে বাস ঘটেছে। গান্ধিজী-প্রবর্তিত দিনচর্যার সঙ্গে সুসংগত-করা নিজের উদ্ভাবিত একটি বিশিষ্ট পন্থায় মিঃ এল, কে, এলমহর্স্ট শ্রীনিকেতনের ছোটো কর্মীমণ্ডলীটি নিয়ে তখন সুরুল-কুঠিতে কাজ করছেন। তাঁদের আদর্শের মূল কথাটি হচ্ছে, "ফিরে চল মাটির টানে।" কবির চিন্তা ও রচনার ধারা এ সময় থেকে এলমহর্স্টের এই বিশিষ্ট আদর্শের সম্বর্ধনায় উদ্বারিত হয়। তিনি এলমহর্স্টের একটি প্রবন্ধ "ভূমির উপর দস্যুতা" নাম দিয়ে অনুবাদ ক'রে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যে ভূমির বুকে আমরা থাকি, এবং যারই দানে আমাদের জীবনধারা চলে, তার সংস্পর্শ হতে জীবনকে দূরে সরিয়ে না নিয়ে, জীবনের দানে আবার সেই ভূমিকেই উর্বর ক'রে চললে, দেওয়া-নেওয়ার সাধু ও স্বাভাবিক রীতিতে সৃষ্টিধারা সঞ্জীবিত থাকবে—এই বিশ্বাসে এলমহর্স্ট শ্রীনিকেতনের দিনচর্যার সূত্রপাত করেন। সেখানে সে ধারা সফলতাও লাভ করেছিল। গুরুদেব তা লক্ষ্য ক'রে শান্তিনিকেতনের বৃহত্তর সংঘজীবনে সে-ধারা প্রবর্তনের প্রয়াসে ঐরূপ পরীক্ষণ স্বহস্তে করতে চাইবেন, তা কিছু আশ্চর্য নয়। ধীরানন্দ বাবু এক কালে কালীমোহন বাবুর সহকারীরূপে রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবা বিভাগে থেকে বীরভূমের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের যোগের কাজ করেছেন। ব্রতীসংগঠনের ভার ছিল তাঁরই হাতে।

ডাঃ রামরঞ্জন বাবুর কথা-প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বহু দিন পূর্বে এক কালে শান্তিনিকেতনের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিভাগ পরিদর্শনের ভার ছিল বোলপুরের ডাক্তারদের উপরেই ন্যস্ত। সাময়িক ভাবে তাঁরা সকালের দিকে এসে এক বেলা কাজ করে যেতেন। প্রথম এ ভার নিয়ে নিযুক্ত হন ডাঃ চারুচন্দ্র সিংহ, তিনি হলেন আধুনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণ সিংহের পিতা। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা অনেকের মনে আছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের সম্পর্কে চারু বাবু এখন বিস্মৃত। হরিচরণ বাবুর পরে সেই স্থলাভিষিক্ত হন বর্তমান ডাঃ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ডাঃ দ্বারিকানাথ ঘোষ ছিলেন চতুর্থ এবং শেষ ব্যক্তি। ডাঃ আশু পাল মশায় প্রায় প্রতি বছরই এসে কবিকে প্রণাম করে যেতেন। আশ্রমের 'শাস্ত্রী মশাই'-এর সঙ্গে তাঁর সৌহৃদ্য ছিল। আধুনিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর রায়কেই তবু মাঝে-মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতে-যেতে দেখা গেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

বিপ্লবী যুগের বীর, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্,
'স্বদেশ-উদ্ধার' ছিল প্রথমার্ধ জীবনের ব্রত ;
তখন ছিল না শঙ্কা, ছিল নাকো ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ,
তোমারি শঙ্কাতে ছিল রাজদণ্ড সন্ত্রস্ত সতত।

অন্তরে অন্তরে কিন্তু ছিল অন্য পিপাসা কঠিন,
তাই তো দৈবাৎ নিলে বেছে একা কৃচ্ছ্র সাধনাকে ;
বিশুদ্ধ জীবন লভি' তপস্যাতে কাটায়েছো দিন,
তবুও প্রত্যহ অর্ঘ্য পাঠায়েছো দেশ-মাতৃকাকে।

তোমার সাধনা শুধু চাহেনিকো শোষণের ক্ষয়,
তোমার সাধনা সিদ্ধ মানুষের আনন্দে, কল্যাণে,
তোমার কল্পিত সঙ্ঘে মানুষ, একান্ত শ্রেষ্ঠ সৎ,
অংশু উদ্দেশ্যে গায় ভগবৎ-জীবনের জয়।
সেখানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্ব জনে কর্মে আর জ্ঞানে
তোমার মুক্তির মন্ত্রে সৃষ্টি করে অনিন্দ্য জগৎ।

কে এই রহস্যময় হত্যাকারী

শিশিরকুমার সেনগুপ্ত

[জোসেফ বর্ণষ্টাইন পনের বছর ধরে 'দাস তাসুবুখ' নামক একটি বিখ্যাত জার্মাণ সাপ্তাহিকের সম্পাদকতা করেন। জার্মাণীর শাসন-শক্তি হিটলারের করায়ত্ত হলে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভদ্রলোক আমেরিকার সামরিক সংবাদের অফিসে রেডিও সেকসনের ডেপুটী চীফ ছিলেন। ট্রটস্কির হত্যাকারীর বিচার হয়েছে বিশেষ আদালতে যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই সাক্ষীর বিবৃতি, অনুসন্ধানকারী অফিসারের দলিল-পত্র এবং বিভিন্ন দেশীয় যারা হত্যাকারীকে চিনত তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এই প্রবন্ধের মাল-মশলা সংগৃহীত হয়েছে। 'এ যুগের কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক অপরাধের কাহিনী' নাম দিয়ে লেখক যে রচনা করেছেন তাতে এই প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে।]

মেক্সিকোর কারান্তরালে বাস করে এক রহস্যময় বন্দী। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বিচারকেরা তাকে নরহত্যার দায়ে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। কিন্তু বন্দী নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যা বলেছে তার বিন্দু-বিসর্গও বিশ্বাস করেননি বিচারকেরা। সারা পৃথিবী জুড়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের প্রথম পৃষ্ঠায় বন্দীর ছবি ছাপা হয়েছে—তার কাহিনী বড়-বড় হরফে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু তাকে চেনে এমন একটি কথাও উল্লিখিত হয়নি কোথাও। আজো সে তার পরিচয় ও যারা তাকে হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করেছে গোপন রেখেছে তাদের নাম।

এই অজ্ঞাতকুলশীল বন্দী বলেছে—তার নাম জাক্স মোরনার্ড ভ্যানডেন ড্রেসথদ্। জাতিতে বেলজিয়ান, সে কিন্তু জন্মেছে পারস্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। ষ্টালিনের পয়লা নম্বরের শত্রু এবং যাকে তিনি সব চাইতে ঘৃণা করেন সে সেই ট্রটস্কির হত্যাকারী লোকটি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত লোকটি সম্বন্ধে কোন খবরই পাওয়া যায়নি। এই সময় নিউ ইয়র্কের শিক্ষাবোর্ডের নিযুক্ত একটি সতেরো বছরের মেয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে এসে উপস্থিত হয়। মেয়েটির নাম সিলভিয়া। প্যারিসে আসার কয়েক দিন পরেই সে আলাপিত হয় এক সুকান্তি যুবকের সঙ্গে। ছেলেটি সোরবর্ণে সাংবাদিকতার পাঠ নিচ্ছিল তখন। নব পরিচিতাকে নিয়ে থিয়েটার, যাদুঘর, রেস্তোঁরা, নৈশ ক্লাবে চলতে লাগল আনন্দ সঞ্চয়ন। হাতে অফুরন্ত টাকা—নাই কোন দায়িত্ব পালনের নীরস ঝামেলা। এক ধনী ও অভিজাত বেলজিয়ান-পরিবারের ছেলে বলে পরিচিত হয়েছে সে সিলভিয়ার কাছে।

দেখতে দেখতে মোরনার্ড-সিলভিয়ার পরিচয়ের একটি বছর অতিক্রান্ত হোল। সিলভিয়ার এক বোন গেছে মেক্সিকোতে ট্রটস্কির প্রাইভেট সেক্রেটারী হতে। যুক্তরাজ্যে ট্রটস্কিপন্থীদের সাথে সিলভিয়ারও খুব জানা-শুনা—বহুৎ দহরম-মহরম। কিন্তু এ কথা সিলভিয়ার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি যে, তার সঙ্গে মোরনার্ডের বন্ধুত্বের পিছনে কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে। রাজনীতিতে মোরনার্ডের কোনই আসক্তি নেই এবং ট্রটস্কির কথাও কোন দিন উল্লেখ করেনি সে।

এক দিন মোরনার্ড সিলভিয়াকে জানাল যে, সে তাকে আর্থিক [illegible] করতে আগ্রহান্বিত। আরগাস পাবলিশিং কোম্পানী মনোবিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ লেখার জন্য তাকে মাসিক তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে স্বীকৃত হয়েছে। মোরনার্ডের যোগাযোগেই সাধিত হয়েছে ব্যাপারটা। সিলভিয়া এই সংবাদে অত্যন্ত প্রীত হোল এবং প্রতি সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ লিখে দিতে লাগল মোরনার্ডকে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি কোন দিনই ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়নি—অন্ততঃ কেউ দেখেনি।

বন্ধুত্বের প্রথম অধ্যায়ে মোরনার্ড একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য অদৃশ্য হয়েছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ব্রুসেলস্ থেকে এক চিঠি পেলে সিলভিয়া। মোরনার্ড লিখেছে, তার মা মোটর দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন—তবে সৌভাগ্যক্রমে বাবা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেছেন। দু'বছর পরে এই চিঠির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে মেক্সিকো পুলিশকে বলেছিল যে, তার বাবা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই তথাকথিত দুর্ঘটনার বার বছর আগে গতায়ু হয়েছেন।

হঠাৎ উপস্থিতির দ্বারা বিস্মিত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিলভিয়া এক দিন ব্রুসেলসে এসে উপস্থিত হোল, কিন্তু মোরনার্ডের লিখিত ঠিকানায় তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। এর কিছুকাল পরে মোরনার্ড আবার প্যারিসে উদিত হল। হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে ইংলণ্ডে চলে যাওয়ায় ব্রুসেলসে সিলভিয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। এ কৈফিয়ৎ সিলভিয়া বিনা প্রতিবাদেই বিনা সন্দেহে গ্রহণ করল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মোরনার্ড জানাল, একটি বেলজিয়ান সংবাদপত্র তাকে আমেরিকার সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছে। সিলভিয়াও দেশে ফিরে যাচ্ছে। অতএব আমেরিকায় আবার হবে তাদের সাক্ষাৎ।

নিউ ইয়র্কে ফিরে সিলভিয়া অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল মোরনার্ডের। কেব্‌ল্ গেল। উত্তরে মোরনার্ড লিখলে, তার ভিসা পেতে অসুবিধা হচ্ছে। সিলভিয়া ব্রুকলিনে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে যোগ দিল।

মোরনার্ড নিউ ইয়র্কে এসে উপস্থিত হোল সেপ্টেম্বর মাসে। এবার তার নাম হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ মোরনার্ড জানাল যে, বেলজিয়ান নাগরিক হিসেবে সে সমর বিভাগে যোগ দিতে বাধ্য এবং আমেরিকায় যাওয়ার পাসপোর্টও পাচ্ছি না সেই কারণে। তাকে ভুয়া কানাডিয়ান পাসপোর্টের জন্য ৩৫০০ ডলার গুনাগাত দিতে হয়েছে। তাছাড়া তার বৃত্তিরও ঘটেছে বিবর্তন। এবার সে মেক্সিকোর এক কাঁচা মালের ইউরোপীয় দালালের সহকর্মী। সিলভিয়া শুনে হতাশ হোল বটে, কিন্তু এই কাহিনী তার মনে কোন সন্দেহের রেখাপাত করেনি তখনও। সেপ্টেম্বর মাসে ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন পাড়ি জমাল মেক্সিকোতে। কিছু দিন যেতে-না-যেতেই সিলভিয়া নিরালা জীবনের হতাশা ও বেদনা-মধুর পত্র পেতে লাগল ফ্র্যাঙ্কের কাছ থেকে। সিলভিয়াকেও মেক্সিকোতে আসার কাতর মিনতি জানাতে লাগল।

লিয়ঁ ট্রটস্কি এই সময় মেক্সিকো সহরের উপকণ্ঠে কোয়োকানে বাস করতেন। তা ছাড়া তখন তিনি সংবাদপত্রের মানুষ—প্রায় রোজই তাঁর নাম সংবাদপত্রের একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থাকত। কমিউনিষ্টরা তাঁকে "আমেরিকার ধনতন্ত্রের সুহৃদ" এবং "মেক্সিকো ও রাশিয়ার মজদুরদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী" বলে প্রচণ্ড গালি-গালাজ সুরু করেছে। ট্রটস্কিকে বিতাড়িত করতে হবে মেক্সিকো থেকে—এই দাবী জানিয়ে তারা প্রবল আওয়াজ তুলেছে সংবাদপত্রে।

লেলিনের উত্তরাধিকারী হবার সংগ্রামে ষ্টালিন কর্তৃক পরাজিত ট্রট্স্কি রাশিয়া, তুরস্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে থেকে ক্রমান্বয়ে বিতাড়িত হয়ে অবশেষে মেক্সিকোতে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখান থেকেই ষ্টালিন আর তাঁর নীতিবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিকুলতা করছেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিলভিয়া তিন মাসের ছুটি নিয়ে মেক্সিকোতে এসে উপস্থিত হোল। ট্রটস্কির সেক্রেটারী তার বোন এবং আমেরিকার পরিচিত বহু ট্রটস্কিপন্থীরাও সে সময় ছিল সেখানে। সিলভিয়া তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্র্যাঙ্ককে।

মার্চে ছুটির মেয়াদের শেষে আবার সিলভিয়াকে ফিরে যেতে হবে ব্রুকলীনে। জ্যাকসন নব পরিচিতদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে লাগল—বিশেষ করে ট্রটস্কির অতিথি ও অন্তরঙ্গ রোস্‌মার দম্পতীর সঙ্গে তার চলতে লাগল গভীর আঁতাত। জ্যাকসন যখন শুনলে মে'র শেষে রোস্‌মাররা ভেরা ক্রুজ থেকে ফ্রান্সের দিকে রওনা হবেন এবং ট্রটস্কি-গৃহিণী তাঁদের তুলে দিতে যাবেন ভেরা ক্রুজ অবধি, তখন সে তাদের নিজের মোটরে সেখানে পৌঁছে দেবার এক প্রস্তাব করলে। প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হোল।

২৮শে মে যাত্রার দিন নির্ধারিত হোল। ২৪শে মে সকাল বেলা তিনটে কি চারটের সময় মেক্সিকান আর্মি-কর্ণেলের সাজে সজ্জিত এক ব্যক্তির নেতৃত্বে মেক্সিকান পুলিশের ইউনিফর্ম-পরিহিত জনা ত্রিশ লোক ট্রটস্কির গৃহের সান্ত্রীদের পর্যুদস্ত করে হাত-পা বেঁধে ফেলল। ট্রটস্কির এক বিশ্বস্ত দেহরক্ষীকে আক্রমণকারীরা জোর করে তুলে নিল তাদের গাড়ীতে। তার পর উঠোনে একটি মেশিন গান বসিয়ে তারা গৃহটির দরজা-জানলা লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ করতে থাকে প্রবল ভাবে। ট্রটস্কি বিছানা থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে রইলেন মরার মত। অন্ধকার শয়নকক্ষে অপরিচিত কার প্রবেশের আওয়াজ হোল—আবার এক পশলা গুলীবর্ষণ। কেউ আর বেঁচে নেই ঘরেতে এমনি একটা ধারণা নিয়ে অজানা লোকটি নিষ্ক্রান্ত হোল ঘর থেকে। মৃতকল্পিত ট্রটস্কি মেঝেতে শুয়ে-শুয়ে শুনতে পেলেন শত্রুবাহিনী দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই আক্রমণের রহস্যও কখনো ভেদ হয়নি। ট্রটস্কি ও তাঁর পত্নী দৈবক্রমে বেঁচে যান সে যাত্রা। কয়েক সপ্তাহ পরে দেহরক্ষীর মৃতদেহ একটি গর্তে চূর্ণ-চাপা অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়।

এই ঘটনার চার দিন পর জ্যাকসন রোসমার ও মিসেস ট্রটস্কিকে ভেরা ক্রুজে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। ট্রটস্কিরা তখন প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন—জ্যাকসনেরও ডাক পড়ল সেখানে, কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ। এই প্রথম ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন ট্রটস্কিকে চোখে দেখলেন। এই দিনটির পর জ্যাকসন হামেশাই আসত ট্রটস্কির গৃহে এবং সাদরে গৃহীত হোত।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের পর ট্রটস্কির বাড়ীটি একটি দুর্গে পরিণত হোল। গৃহের প্রবেশ-পথের কাঠের পাল্লার পরিবর্তে ইলেকট্রিক-নিয়ন্ত্রিত দু'টো ভারী ষ্টীলের দরজা বসল। মোটা-মোটা ষ্টীলের খড়খড়ি লাগান হোল দরজা-জানলায়। বোম-প্রুফ মেঝে সিলিং নির্মিত হোল। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হোল বাড়ীটাকে চারি দিকে গুপ্ত সান্ত্রী মোতায়েন হোল, সেখান থেকে তারা নজর রাখবে শত্রুর উপর। কিন্তু জ্যাকসনের এ গৃহে অবারিত দ্বার। সেক্রেটারী ও সান্ত্রীদের নিকট সে "বুড়োর অতি অন্তরঙ্গ" বলে পরিচিত।

আগষ্টে গ্রীষ্মের ছুটির শেষে সিলভিয়া মেক্সিকোতে ফিরে এসে দেখল জ্যাকসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে—তাঁর চোখে-মুখে অসুস্থতার লক্ষণ। বস্তুতঃ কঠোর মানসিক নিপীড়নে যে ভুগছিল সে তার আর কোন সন্দেহ নেই। ১৫ই আগষ্ট ট্রটস্কি তাদের চা'য়েতে নিমন্ত্রণ করলেন। এই চা-পানের সময় জ্যাকসন সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। কি ভাবে ট্রটস্কির প্রচার-কার্য চালান উচিত তা নিয়ে চলেছিল ঘনিষ্ঠ আলোচনা। ট্রটস্কির মতের সহিত তার কোন বিরোধিতা নেই এবং ট্রটস্কিকে সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখারও প্রস্তাব করেছিল সে। সিলভিয়াই বরং সেদিনের চায়ের আসরে জ্যাকসন ও ট্রটস্কির বিরুদ্ধতা করেছে শেষ অবধি।

এক সপ্তাহ পরে জ্যাকসন একটি প্রবন্ধের খসড়া এনে দেখাল ট্রটস্কিকে। ভাসা-ভাসা, এলোমেলো লেখা কয়েক ছত্র। আগামী বৃহস্পতিবার সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি এনে দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিল সে।

পঁচিশে আগষ্ট—পাঁচটা ত্রিশ। ট্রটস্কির তিন বন্ধু ট্রটস্কির গৃহের ছাদে শত্রুর আগমন ঘোষণার উদ্দেশ্যে একটি সাইরেন বসাতে ব্যস্ত। এমন সময় জ্যাকসন এল দেখা করতে। পাহারা রত সান্ত্রী নিয়ে গেল তাকে ট্রটস্কির কাছে। ট্রটস্কি তখন বাড়ীর পিছন দিকটায় খরগোস আর মুরগীর ছানাগুলিকে নিজের হাতে খাওয়াচ্ছিলেন। জ্যাকসন জানাল তাঁকে বিদায় জানাতে সিলভিয়া যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। আগামী কাল তারা দু'জনে নিউ ইয়র্কে যাচ্ছে। এই সময় মিসেস্ ট্রটস্কীকে ব্যালকনিতে দেখতে পেয়ে জ্যাকসন তাঁকে বললে—"বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল দিন তো।" মিসেস্ ট্রটস্কি তার মুখের ধূসরতায় এবং আচরণে কেমন একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করছিলেন। তা ছাড়া সেদিন তার বেশেরও পরিবর্তন ঘটেছিল—মাথায় ছিল টুপি আর বাঁ হাতে ঝুলান একটি বর্ষাতি।

জ্যাকসন ও মিসেস্ ট্রটস্কি ফিরে এলেন খরগোসের খাঁচার কাছে। ট্রটস্কি বললেন—"এবার তোমার প্রবন্ধটা নিয়ে আলোচনা করব।" তিনি জ্যাকসনকে ষ্টাডিতে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিন কি চার মিনিটের বিরতি। মিসেস্ ট্রটস্কি রন্ধনশালায় এবং বিশ্বস্ত বন্ধুরা ছাদে কর্মব্যস্ত, এমন সময় এক বীভৎস বুক-কাঁপানো চীৎকার উঠল—দীর্ঘায়ত বেদনাতুর আর্ত্ত চীৎকার। ষ্টাডিতে কেউ ছুটে যাওয়ার পূর্বেই রক্তাপ্লুত ট্রটস্কি টলতে-টলতে রান্না-ঘরে প্রবেশ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

এদিকে ষ্টাডিতে রিভলভার হাতে জ্যাকসন ছটফট করছে। পাহারা-রত সান্ত্রী বাঘের মত তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে চেপে ধরল মাটিতে। অর্ধ অচেতন অবস্থায় তার মুখ দিয়ে একবার শুধু বের হয়েছিল—"তারা আমায় এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। বাধ্য করেছে আমায়। তারা আমার মাকে বন্দী করে রেখেছে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই জ্যাকসন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতেই পলায়নের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সান্ত্রী তাকে আগেই

কায়দা করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে জ্যাকসন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল এবং তখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করল। একটি কথা মাত্র বলেছিল সে—"সিলভিয়ার কোন যোগ নেই এর সাথে। 'G P U'এর কোন যোগ নেই।"

কয়েক মিনিট পরেই গোয়েন্দারা এসে উপস্থিত হলেন এবং দেখতে পেলেন ঘরের চারি দিকে রক্তের ছোপ। চেষ্টার ডেস্ক উল্টান—কাগজ-পত্তর মেঝেতে ছড়ান। ডেস্কের এক পাশে আততায়ীর অস্ত্র। ভারী কাঠের বাঁট লাগান একটি তীক্ষ্ণ ইস্পাতের গাঁইতি।

জ্যাকসন গোয়েন্দাদের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল যে হত্যার পূর্বে ট্রটস্কি ডেস্কে বসেছিলেন আর সে তাঁর বাম পাশে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ট্রটস্কি প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করতেই সে বর্ষাতির ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে। "আমি গাঁইতি উঁচু করে ধরে চোখ বন্ধ করে গায়ের সকল জোর দিয়ে আঘাত করেছি।" বলেছে জ্যাকসন। ট্রটস্কি আর্ত চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। তার পর সুরু হয় ধস্তাধস্তি আক্রমণকারীর সঙ্গে। বাষট্টি বছরের বুড়োর পক্ষে এ অসমসাহসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু ধারাল অস্ত্রটা তাঁর মাথায় কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গিয়েছিল। ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে ট্রটস্কি মারা যান।

হত্যাকারী ভাল ভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। গাঁইতি ও রিভলভার ছাড়াও নয় ইঞ্চি একখানা ছোরা পাওয়া গিয়েছিল তার পকেটে। কিন্তু কোন সনাক্ত-পত্র বা দলিল পাওয়া যায়নি। কানাডিয়ান পাসপোর্টটিও সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। তার ওয়ালেটে পাওয়া গিয়েছে ৮৯০ ডলার। ফরাসী ভাষায় টাইপ-করা একটি পত্রও হস্তগত হয়েছিল গোয়েন্দাদের। পত্রখানিতে তারিখ ছিল ২০শে আগষ্ট, ১৯৪০—ট্রটস্কিকে হত্যার দিন—এবং পেনসিলে 'জ্যাক' নাম সই করা ছিল চিঠিতে।

পত্রখানিতে হত্যাকারী অথবা 'হত্যাকারীর পশ্চাতের কেউ' এই 'জায়কার্যের' একটি কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করেছে এবং তার অনভিপ্রেত কিছু ঘটলে পত্রখানি ছাপাতেও অনুরোধ জানিয়েছে।

বিবৃতির মুখবন্ধে আছে—"আমি এক জন সম্ভ্রান্ত বেলজিয়ান পরিবারের ছেলে।" তার পর লেখক নিজেকে এক জন সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছে যে পরে প্যারিসের ট্রটস্কি-পার্টিতে যোগদান করে। এক দিন ট্রটস্কির "ফোর্থ ইণ্টারনেশন্যাল" সংসদের এক অনামা সদস্য তাকে মেক্সিকোতে গিয়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব করে এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ ও ভুয়া পাসপোর্ট যোগাড় করে দেয় তাকে। কিন্তু মেক্সিকোতে উপস্থিত হওয়ার পর তার ভুল ভেঙ্গে যায়। ট্রটস্কিকে তখন তার মনে হয়েছে অতি জঘন্য চরিত্রের লোক, ষ্টালিনের ভাষায় 'যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অনুগতদের ব্যবহার করে থাকে'। জ্যাকসনের সমস্ত মোহ কেটে যায় তখনই যখন ট্রটস্কি নিজে তাকে রাশিয়ায় গিয়ে ষ্টালিন প্রভৃতি কয়েক জনের প্রাণনাশের জন্য দল গঠন করতে আহ্বান জানান। উপসংহারে জ্যাকসন লিখেছে—"আমি এক জন মেয়ের প্রেমে পড়ি, যাকে আমি সত্যি অন্তর থেকে ভালবাসি—সে আমার বাগ্‌দত্তা।" কিন্তু ট্রট্স্কি দাবী করতে থাকেন মেয়েটির সঙ্গেও সকল সম্পর্ক ছেদন করতে হবে; কারণ মেয়েটি তার দলের নয়ই গোষ্ঠীভুক্ত। পত্রটি শেষ হয়েছে এই বলে যে—"আমার এই কাজে সে হয়ত আমাকে আর না-জানার ইচ্ছাও করতে পারে। আমি শুধু তারই জন্য আত্মাহুতির সংকল্প করেছি।"

এই স্বীকারোক্তির লেখক একটি কথা ঠিকই বলেছে—সিলভিয়া এ-খবর শোনার পর লিয়োঁ ট্রটস্কির হত্যাকারীকে জীবনে না-জানারই আন্তরিক কামনা করেছিল। হত্যাকাণ্ডের পর জ্যাকসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মেয়েটি বলেছিল—"ঘৃণ্য খুনী! অপদার্থ চর! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনে আর কখনো যেন তোমার মুখ দর্শন করতে না হয়।" অশ্রু-প্লাবিত চোখে নিজেকে বার-বার সিলভিয়া ধিক্কার দিয়েছে এই বলে যে, ট্রটস্কিকে হত্যা করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সে।

ট্রটস্কিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল যারা, তারা ভেবেছিল হত্যাকারী হয় পলায়ন করবে নয় ত নিহত হবে। তৃতীয় সম্ভাবনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না ষড়যন্ত্রকারীরা। আর জ্যাকসনের প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য ট্রটস্কিও দায়ী। কারণ সান্ত্রীরা যখন তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, ট্রটস্কি তাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"ওকে মেরে ফেলো না—ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে।"

প্রথম মৌখিক স্বীকারোক্তিতে জ্যাকসন যা-যা বলেছিল, লিখিত বক্তব্যের সহিত তার বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অমিল আছে। এই পরস্পরবিরোধীতারও সঙ্গত কারণ দিতে পারেনি সে। অনুসন্ধান-কারীদের ধারণা, খুব সম্ভবতঃ সে প্রথম স্বীকারোক্তির নায়ক নয়। পরিচয়-সম্পর্কিত জেরায় সে সিলভিয়ার কাছে যা-যা বলেছে তারই পুনরুক্তি করেছে মাত্র! কিন্তু মেক্সিকোর বেলজিয়ান প্রতিনিধি তার সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনার পর ঘোষণা করেছেন যে, লোকটি আদৌ বেলজিয়ান নয়। বেলসিয়াসের জীবন সম্বন্ধে জ্যাকসনের প্রতিটি বিবৃতিই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে—তার ফরাসী উচ্চারণও এমন যে, মনে হবে লোকটি সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছে।

অনুসন্ধানের প্রতি স্তরে স্তরে এই কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্যাকসন নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যা-যা বলেছে তা কেবল সর্বৈব মিথ্যাই নয়, বস্তুতঃ তার সমস্ত স্বীকারোক্তিটিই পূর্ব-পরিকল্পিত।

কানাডিয়ান পাসপোর্টের কথা প্রশ্ন করা হলে জ্যাকসন তার নামটি ছাড়া আর কোন কথাই স্মরণ করতে পারেনি। পাসপোর্টটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখারই অবসর হয়নি কখনো তার এবং কোথায় ও কখন ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন নামটির জন্ম হয়েছে, সে-খবরও রাখে না সে।

কিন্তু মেক্সিকো সহরে আমেরিকান কনসালেটের যে অফিস আছে, সেখানে অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে, ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন নামক এক ভদ্রলোক মনট্রিলে যাওয়ার ভিসা প্রার্থনা করেছিল এবং আবেদনপত্রে পাসপোর্ট ও ইনসিয়োরেন্সের নম্বর, আবেদনকারীর জন্মের স্থান ও কাল উল্লেখিত আছে—লোভিয়াইন, যুগোস্লাভিয়া, ১৩ই জুন ১৯০৫। কানাডার সরকারী মহল অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে, জ্যাকসনের ভিসার আবেদনে যে নম্বর উল্লিখিত আছে, সেই নম্বরের একটি খাঁটি পাসপোর্ট টোনি ব্যাবিচ নামক কানাডায় অবস্থিত এক জন ব্রিটিশ প্রজাকে দেওয়া হয়েছিল—তারও জন্ম ১৩ই জুন ১৯০৫, যুগোস্লোভিয়ার লোভিয়াইনে। অনুসন্ধানে আরো প্রকাশ,

ব্যাবিচ ভলান্টিয়ার হিসেবে স্পেনে গিয়েছিল এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে লয়্যালিষ্ট পার্টির পক্ষে লড়েছিল। আন্তর্জাতিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধে সে নিহত হয়—স্প্যানিশ সরকারের রিপোর্টে তার মৃত্যু-সংবাদ পরিপোষিত হয়েছে।

সম্ভবতঃ কি ঘটেছিল, পশ্চিম-ইউরোপের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান সচিব জেনারেল ওয়াল্টার ক্রিভিৎস্কির বিবৃতিতে তা প্রকাশিত। ভদ্রলোক এক সময় ষ্টালিনের লৌহ বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে এসে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ওয়াশিংটনের এক হোটেলে তাকে রিভলভারের গুলীতে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। In Stalin's Secret Service নামক পুস্তকে ক্রিভিৎস্কি লিখেছেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক বাহিনীর সকল সদস্যকে তাদের পাসপোর্ট নিজ নিজ অফিসারের নিকট দাখিলের আদেশ দেওয়া হয়। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের পাসপোর্ট মস্কোতে পাঠান হয়েছিল। এই পাসপোর্টগুলিই পরে বিদেশে প্রেরিত গুপ্তচরেরা ব্যবহার করেছে।

বিচারের সময় জ্যাকসনের জেল-কক্ষে গ্রামোফোন রেকর্ড, বই প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল—তার প্রাত্যহিক আহার্যও আসত দামী রেঁস্তোরা থেকে। জ্যাকসনের আইনজীবি মারফৎ এই সমস্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক কোথা থেকে যে এর অর্থ পেতেন তার রহস্য গোপন রেখেছেন।

এই ঐতিহাসিক মামলার বিচার বহু দিন ধরে গড়িয়ে চলে—হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করেন, তখনও এর যবনিকাপাত হয়নি। ষ্টালিন তখন মিত্রশক্তির বন্ধু। অবশেষে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে মেক্সিকোর বিচারালয় পূর্ব-পরিকল্পিত নরহত্যার অভিযোগে জ্যাকসনকে কুড়ি বছর কারাবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। বিচারকেরা রায়ে এ কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, লোকটি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যা-যা বলেছে, তার একটি বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাকে মেক্সিকোতে কারা পাঠিয়েছিল, আজ পর্যন্ত তাদের কারুর নাম প্রকাশ করেনি জ্যাকসন। তার নিজের আসল পরিচয়ও গভীর রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

পরকাল

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক—সকলেই এই বিষয়ে একটা-না-একটা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা শাকওয়ালী মাছওয়ালী যাহাকেই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সে অভ্রান্ত ভাবে উত্তর দিবে যে, মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হইয়া যমের বাটী যাইতে হয়, তথায় বিচার হইয়া গেলে দণ্ড লইতে হয়—অথবা স্বর্গে যাইতে হয়। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। দার্শনিক মত স্বতন্ত্র। তাহা সত্য কি মিথ্যা দার্শনিকেরাই জানিতেন। পরলোকের কথা যিনি যাহাই বলুন, সমুদয় অনুভবমূলক। তবে যে আমরা এ বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি তাহা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বাল্য সংস্কার ছাড়িয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া পরকাল সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে চাহেন—তাঁহাদের বলি, আমাদের কথা সম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করুন। প্রমাণ আমাদের নিকট লইতে হইবে না, তাঁহারা নিজের প্রমাণ নিজে অনুসন্ধান করুন—তার পর বুঝিবেন আমরা যাহা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তখন আমাদের মন বুদ্ধি এ সকল কিছুই হয় না, কেবলমাত্র দেহটি হয়। মাতৃগর্ভের কার্য্য দেহ গঠন। তাহা সমাধা হইলে, দেহ বহিষ্কৃত বা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পর দেহের মধ্যে মনুষ্যত্ব সঞ্চার হইতে থাকে। দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। তথায় সেই মনুষ্যত্ব যে দেহে বা যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব তাহা প্রাপ্ত হইয়া বহিষ্কৃত হয়।—সেই দ্বিতীয় জন্মকে লোকে বলে মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিই দ্বিজ। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম দেহ হইতে।

যাঁহারা বলেন মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—সকলই ফুরায়—তাঁহারা এ দ্বিজত্ব স্বীকার করিবেন না—তাঁহারা মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদের এ ভ্রান্তি। মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়া যাক—তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এই জন্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনেক ঘটনা তাঁহারা দৈবাৎ ঘটিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হন—কিন্তু ঘটনাগুলি বাছিয়া, বুঝিয়া দেখিতে পারিলে—তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে দেহমুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটিয়াছে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কেবল গঠিত হইতে থাকে মাত্র। আমরা বলিয়াছি মাতৃগর্ভে দেহ মাত্র হয়—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেহের ভিতর মনুষ্য গঠিত হইতে থাকে। তখন একটি দুইটি করিয়া ক্রমে বৃত্তিগুলির উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। প্রথমের অধিকাংশ বৃত্তিগুলি দেহরক্ষার্থ, দেহ গেলে আর সেগুলি থাকে না—যথা রাগাদি। কতকগুলি সদ্‌বৃত্তি দেহ সম্বন্ধে নহে, সেগুলি মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়। সেইগুলি লইয়াই মানুষ মানুষ, তাহা না জন্মিলে মনুষ্য অসম্পূর্ণ হয়—নষ্ট হইয়া যায়—মৃত্যুর পর আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

যেমন মাতৃগর্ভে দেহ গঠন হইতে হইতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত গর্ভস্রাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়—এ সংসারে সে দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ দেহে নানা বৃত্তির স্থানে যদি কেবল দৈহিক বৃত্তি উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সে বৃত্তিগুলি যায়, পরকালে সে মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য শিশু ও বালক প্রভৃতির পরকাল নাই। তাহাদের দৈহিক বৃত্তিমাত্র হইয়াছিল—দেহের সঙ্গে সেগুলি গেল—বাকি কিছুই থাকিল না; সেইরূপ আবার যে সকল বৃদ্ধের কেবল কাম-ক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিমাত্র জন্মিয়াছে আর কোন সদ্‌বৃত্তি বিকাশিত বা অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহাদেরও সেই দশা, তাহাদেরও পরকাল নাই।

সকল দেশে ধর্ম্মবেত্তারা সদ্‌বৃত্তির আলোচনার যে অনুরোধ করিয়া থাকেন, সদ্‌বৃত্তি থাকিলেই পরকাল ভাল হয় যে বলেন, তাহার হেতু এই। ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে একটা কথা মনে হয় যে, সদ্‌বৃত্তিই আমাদের দীর্ঘায়ুর মূল। সদ্‌বৃত্তি না থাকিলে দেহ নাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহ নাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্‌বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেহ নাশের পরও জীবিত থাকি।

—প্রচার।

ডি-ভ্যালুয়েশনের এক বৎসর

শ্রীমনকুমার সেন

সেপ্টেম্বর ১৯৫০, ভারতীয় টাকায় ডি-ভ্যালুয়েশন বা বহির্মূল্যহ্রাসের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ডি-ভ্যালুয়েশনের আগে ও পরে উহা লইয়া বহু বিতর্ক ও জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। সরকারী তরফে মুদ্রামূল্য হ্রাসের অনুকূলে যেমন জোরালো যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, তেমনি বেসরকারী ও সরকারী নীতির সহিত ভিন্ন মতাবলম্বী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের যুক্তিও এ-বিষয়ে সহজে খণ্ডনযোগ্য ছিল না, এমনও নহে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে, এক বৎসরের খতিয়ান হইতে ডি-ভ্যালুয়েশনের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়বিধ যুক্তিরই একটা বিচারসহ পর্য্যালোচনা করা। এইরূপ মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক তথ্যগুলি পরিবেশন করিয়া প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত আমরা আমাদের অভিমত মুলতুবী রাখিতেছি।

ডি-ভ্যালুয়েশনের কারণ

ভারতের বহির্বাণিজ্যে রপ্তানীর অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় বা আমদানির অনুপাতে বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি না পাওয়ায় যে বিপুল ঘাটতি প্রকাশ পাইতে থাকে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের উহাই প্রধান কারণ। বিশেষরূপে ডলার অঞ্চলের দেশসমূহের (যথা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, কষ্টারিকা, কিউবা, ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, সালভেডর, ভেনিজুয়েলা ও লিবেরিয়র) সহিত বাণিজ্য-ঘাটতির ফলে ভারত ও স্টার্লিং মুদ্রার অপরাপর দেশগুলি দ্রুত সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছিল। ডলার পাওনা অপেক্ষা দেনার বহর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই যে ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি, উহা পূরণের পথ ছিল দুইটি; যথা—ডলারে পরিবর্ত্তনযোগ্য ষ্টার্লিং তহবিলের একাংশ, এবং দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক ধন-ভাণ্ডারের ঋণ। বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য এই দুইটি পথের কোনটিই বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করা যায় না, কেন না প্রথমতঃ, যে ডলারের সাহায্যে ডলার অঞ্চল হইতে ভারতের পুনর্গঠনমূলক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দেশের স্থায়ী উন্নতিবিধান করা যাইত, চলতি প্রয়োজন মিটাইতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আন্তর্জ্জাতিক ধন-ভাণ্ডারের ঋণ পরিশোধের ঝুঁকির কথা বাদ দিলেও বাণিজ্য ক্ষেত্রের 'ঋণ' পরিশোধের জন্য আবার অপর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহণ নীতি হিসাবে খুবই দুর্ব্বল ও যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারত আন্তর্জ্জাতিক ধন-ভাণ্ডার হইতে যে কর্জ্জ করিয়াছে তাহার পরিমাণ ৩২ কোটি ৪ লক্ষ। সুতরাং ডলারে রূপান্তরিত যোগ্য ষ্টার্লিং তহবিল রক্ষা এবং আন্তর্জ্জাতিক ভাণ্ডার হইতে কর্জ্জ গ্রহণের দায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ডলার অনুপাতে ভারতীয় টাকার বহির্মূল্য হ্রাস অন্যতম পন্থারূপে গৃহীত হয়। এইরূপ মূল্য-হ্রাসের ফলে ডলার দেশের আমদানীকারকগণের নিকট ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ হ্রাস পায় এবং স্বভাবতঃই তৎ-তৎ দেশে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানী বা চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত বহির্বাণিজ্যে ভারতের যে ঘাটতি চলিতেছিল, পরবর্ত্তী মাস হইতে তাহার বাড়তি বা উদ্বৃত্তে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়:

(কোটি টাকার হিসাবে)

	রপ্তানী	আমদানি	উদ্বৃত্ত
১৯৪৯—নভেম্বর	৫২·১৪	৪৩·১৭	৮·৯৭
ডিসেম্বর	৫১·৮৭	৩৩·৭৮	১৬·০৯
১৯৫০—জানুয়ারী	৪৭·৪৯	৩৮·৪০	৯·০৯
ফেব্রুয়ারী	৪৪·৫৫	২৮·৫৪	১৬·০১
মার্চ্চ	৪৬·২১	৩৩·২৩	১২·৯৮

(নৌ বাহী বাণিজ্যের হিসাব, এপ্রিল, ১৯৫০ হইতে গৃহীত)

নভেম্বর হইতে মার্চ্চ (১৯৫০) পর্য্যন্ত এইরূপ বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ফলে মোটের উপর ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে ১০৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকার ঘাটতি চলিতেছিল, তাহা হ্রাস পায়, (১৯৪৯-৫০) আর্থিক বর্ষ শেষে ৮৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং তহবিল হইতে ঘাটতি পোষাইবার বিপদ হইতেও যে ভারত রক্ষা পায় তাহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ডলার এলাকার সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের রূপান্তর লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৯ সালের মে ও জুন মাসে এই এলাকার সহিত ভারতের সর্ব্বাধিক বাণিজ্য-ঘাটতি প্রকাশ পায়। ঐ দুই মাসে ভারতের রপ্তানী ও আমদানি বাণিজ্যের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৫ কোটি ৯২ লক্ষ ও ১৩ কোটি ৮৬ লক্ষ, এবং ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ও ১২ কোটি ২৮ লক্ষ। টাকার বহির্মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতীয় বাণিজ্যের রূপান্তর হয় এইরূপ:

(কোটি টাকার হিসাবে)

	রপ্তানী	আমদানি	উদ্বৃত্ত
১৯৪৯—নভেম্বর	১৩·৫৩	৮·৮৬	৪·৬৭
ডিসেম্বর	১১·০৪	৬·৩৩	৪·৭১
১৯৫০—জানুয়ারী	৯·৭৪	৫·৯১	৩·৮৩
ফেব্রুয়ারী	১১·৪৯	৫·৪২	৬·০৭
মার্চ্চ	১০·৮৫	৫·৯১	৪·৯৪

রপ্তানী বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং আমদানী বাণিজ্যের সমূহ হ্রাসই যে ডলার এলাকার সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের উল্লিখিতরূপ ক্রমোন্নতির কারণ তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ, ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ অর্থ-মন্ত্রী সম্মেলনে ডলার এলাকা হইতে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ কমাইবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের আমদানী-বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৮·৩৩ কোটি টাকা, সেই স্থলে ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাসের আমদানী ছিল মাত্র ৫·৪৬ কোটি টাকা।

ডি-ভ্যালুয়েশনের পূর্ণ এক বৎসরের হিসাব

ডি-ভ্যালুয়েশনের পরবর্ত্তী পূর্ণ এক বৎসরের হিসাবে ভারতের ৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকার বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত লক্ষ্য করা যায়। এই এক বৎসরে মোট আমদানী হইয়াছে ৫০৪ কোটি ২ লক্ষ টাকার এবং রপ্তানী ৫১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার,—ফলে বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনামূলক বাণিজ্যের একটা চুম্বক হিসাব দেওয়া যাইতেছে:

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৪৯-৫০	১৯৪৮-৪৯	বাণিজ্যের বৃদ্ধি
	(অক্টোবর—সেপ্টেম্বর)		বা হ্রাস
মোট বাণিজ্য :	১০১৬.৭	১০২১.৪	— ৪.৭
আমদানী :	*৫০৪.২	৬১৭.৬	— ১১৩.৪
রপ্তানী :	*৫১২.৫	৪০৩.৮	+ ১০৮.৭

(* ৫১২.৫ — ৫০৪.২ = ৮.৩ : উদ্‌বৃত্ত)

সিদ্ধান্ত

বহির্বাণিজ্যের উপরি-উক্তরূপ ক্রমোন্নতির বিবেচনায় ডি-ভ্যালুয়েশনের গুণই কীর্ত্তিত হইতেছে বটে, কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তৎসহ বিচার করিলে ডি-ভ্যালুয়েশনকে নির্দোষ ব্যবস্থারূপে গ্রাহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাণিজ্যের আশানুরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু একমাত্র ডি-ভ্যালুয়েশনই এই কৃতিত্বের অধিকারী বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। ডি-ভ্যালুয়েশনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই কঠোর ভাবে আমদানী হ্রাস এবং রপ্তানীর সমূহ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের উন্নতিই মুদ্রামূল্য হ্রাসের অবশ্য লক্ষ্য হইলেও অপরাপর ক্ষেত্রেও এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বিচার্য্য বিষয়। রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তথা দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির অভিযান বেকার সমস্যার সমাধানে যে বহুল সহায়তা করে, মুদ্রামূল্য হ্রাসকারী অন্যান্য দেশ এবং তন্মধ্যে বিশেষরূপে ব্রিটেন সেই উদ্দেশ্যকেও সম্মুখে রাখিয়া তদনুযায়ী অর্থনীতির সর্ব্ব দিকে একটা অভূতপূর্ব্ব সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। সেই তুলনায় ভারত উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বা কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাকে শুধু অকিঞ্চিৎকরই বলা যায়। শিল্পপতি ও মালিকগণ সরকারের সম্ভব-অসম্ভব যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও উৎপাদন বৃদ্ধির পর্য্যাপ্ত প্রেরণা লাভ করেন নাই। ইহাতে তাহাদের নীচাশয়তাই প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের অর্থ নৈতিক সঙ্কটে উৎপাদন-ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহলে এইরূপ দায়িত্বহীনতা ও স্বার্থান্ধতা সরকারকে অনিবার্য্যরূপেই বিব্রত করে, দেশের উন্নতির মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। অপর দিকে আমদানী যে আরও নিয়ন্ত্রিত করা যাইত, সরকার তদ্বিষয়ে সম্যক্ সচেতন ছিলেন বা আছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রিটেনের সর্ব্বশ্রেণীর লোক একযোগে যেরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া সুখ-সম্ভোগের দ্রব্যসামগ্রী হইতে দূরে থাকিয়া আমদানী-বাণিজ্যের হ্রাসকরণে সহায়তা করিয়াছে, আমাদের দেশে সেই উদ্দীপনা বা পরিকল্পনা কোথায়? ধনিক শ্রেণীর বিলাস যেমন মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইতে চাহে না, তাহাকে স্তব্ধ করিবার মত সুকঠোর ভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টারও অভাব। জন-সাধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিশেষতঃ খাদ্যসামগ্রীর আমদানির প্রশ্নই সরকারকে যেরূপ উদ্ব্যস্ত করিতেছে, তাহাতে অনাবশ্যক বিলাস-ব্যসনের সামগ্রীর আমদানি নির্ম্মম ভাবে ছাঁটাই করা মস্ত প্রয়োজন। তদ্দ্বারা মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেও সমগ্র ভাবে দেশের কল্যাণ হইবে, সরকারও দেশের অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবেন। সূতা, বস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ না থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাহাও মোটা পরিমাণেই রপ্তানী করিতে হইতেছে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণ যে ক্ষতি ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতেছে, শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ তাহার তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন বা করিতেছেন? উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ প্রচেষ্টায় অভাব এবং অত্যাবশ্যক জিনিষের বহির্দেশীয় রপ্তানীর ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্যের মান হ্রাস পাইতেছে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ঊর্দ্ধমুখী। সুতরাং অনুকূল বাণিজ্যের স্থায়ী উন্নতি জন্য তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতিবিধানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনই যে এক্ষণে সর্ব্বাধিক, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। পর্য্যাপ্ত ও উচ্চ মানযুক্ত পণ্যোৎপাদনের দ্বারা দেশেও যেমন কর্ম্মসংস্থানের বৃহত্তর অবকাশ ঘটিবে, তেমনি বহির্দেশেও ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বজায় থাকিবে। এবং শুধু এই পথেই ডি-ভ্যালুয়েশনের সুফল স্থায়ী করা সম্ভব।

বিরহ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

যোজনের ব্যবধান, দু'দিনের অদর্শন শুধু
তবুও তোমার লিপি বহে আনে বাসনার ভাষা।
জাগে দেহে, জাগে মনে, জাগে অণু পরমাণু মাঝে
সমস্ত চেতনা-হরা অনির্ব্বাণ মিলন-পিপাসা।

আমার কামনাগুলি উড়ে যায় বলাকা পাখায়
তোমার মানস-তীরে আনন্দ-কমল অন্বেষণে।
জানি তুমি জানাইবে সে সবারে সাদর সম্ভাষ
মুগ্ধ করি, লুব্ধ করি, মগ্ন করি গাঢ় আলিঙ্গনে।

বেপথু বক্ষের তব অর্দ্ধস্ফুট আবেগ-স্পন্দন
আমার অন্তর দিয়ে আজো আমি শুনিবারে পাই।
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল তব রোমাঞ্চিত সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
সৃষ্টির রহস্য-কথা নব রূপে ধ্বনিছে সদাই।

গন্ধে, গানে, রূপে, রসে, কূজনে গুঞ্জনে দিয়া ভরি,
তোমার প্রেমের পাত্রে আমার সর্ব্বস্ব নিও হরি।

কি শিখিলাম

শ্রীহরিহর শেঠ

আমার রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা

রাজনৈতিক জীবন ও পাবলিক্ লাইফ ঠিক এক কি পাবলিক্ লাইফ আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়, রাজনৈতিক জীবন তাহারই অন্তর্গত, ইহার ব্যবধান ঠিক করিতে না পারায় এবং সুপবিত্র দেশ-সেবা ও রাজনীতিকে এক পর্য্যায় ব্যবহার করার জন্য প্রথমেই পাঠক-পাঠিকা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উভয়ের মধ্যে যে একেবারেই বিরুদ্ধ সম্পর্ক তাহা মনে না করিলেও, বহু ক্ষেত্রে তাহাই, এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে একটি বিষয় উভয়ের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায় যে, একই প্রকার মিশ্রণ উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক জন ধুরন্ধর বা সাহিত্য-সমাজে প্রতিভাবান বলিয়া পরিচয় না থাকিলেও, এতদুভয়ের সংশ্রবে আসিয়া সেখানে আমার শিক্ষার কথাপ্রসঙ্গে নিজেকে ব্যবসায়ী বা সাহিত্যিকরূপে পরিচয় দিতে যতটা না বাধে, নিজেকে এক জন দেশসেবক এবং রাজনীতিজ্ঞ করিয়া লইয়া আমার পাবলিক্ লাইফের শিক্ষার কথা লিখিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ হয়। তথাপি যে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি, তাহার কারণ দুইটি। প্রথম, ব্যবসা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রের ন্যায় স্থানীয় রাজনীতি আদৌ ব্যাপক নহে। চন্দননগরের রাষ্ট্রভাগ্য বিধির বিধানে ভারতরাষ্ট্র হইতে কিছু স্বতন্ত্র এবং নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে' হিসাবে আমার রাজনীতিক-জীবনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আর দ্বিতীয়তঃ, আমরা আমাদের সম্পর্কে রাজনীতি কথাটি সর্ব্বদা ব্যবহার করিলেও, স্বর্গীয় বিচারপতি মনীষী আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের "Subject nation has no politics" পরাধীন জাতির যে রাজনীতি নাই, এই মন্তব্যে আমি আস্থাবান। তাহা হইলেও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে যে হিসাবে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া থাকি, সে হিসাবে আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মধ্যে কি থাকিতে পারে, কিছুই নয়। তবে ইউরোপীয় শাসনের কল্যাণে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সুলভে বা বিনাব্যয়ে শাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ রাষ্ট্র-পরিচালনায় কতিপয় অবান্তর বিভাগে নির্ব্বাচনের যে ব্যবস্থা আছে, সাধারণতঃ তৎসংক্রান্ত বিষয়টিই এ দেশের সাধারণের কাছে রাজনীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথার্থ রাজনীতি এখানে দুর্লভ। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে বলিয়াছেন,—"জয় রাধেকৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো। ইহাই পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" সুতরাং তাঁহার ও চৌধুরী মহাশয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই।

বৈদেশিক রাজার বা শাসকদিগের নির্দ্ধারিত নীতিতে রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত কোন কোন বিভাগ পরিচালনার্থ যোগ্য লোক বাছাই জন্য যে নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহা লইয়াই যাহা কিছু আমাদের রাজনীতি বা পলিটিক্স। অর্থাৎ রাজা বা শাসক সম্প্রদায়ের বিষয়-বিশেষে প্রদত্ত প্রজার স্বেচ্ছামূলক প্রবেশাধিকার এবং নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে বিচরণ অথবা এক কথায় এ-ক্ষেত্রে আমাদের বাঁধন-রজ্জুটা একটু দীর্ঘ এবং আলগা থাকায় সেই পরিসরের মধ্যেই আমাদের যাহা কিছু রাজনীতি। আর এই রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রচুর প্রচার দ্বারা যে-কোন প্রকারে সাধারণকে বিশ্বস্ত বা বিভ্রান্ত করিয়া অথবা অন্য প্রকারে তাঁহাদের সমর্থক করা ইহাই হইতেছে সাধারণ রাজনীতিজ্ঞদিগের কাজ এবং কৃতিত্ব। যাঁহারা এই কার্য্যে যত পারদর্শী তাঁহারা তত পলিটিশিয়ান্ বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ভাবে আমি ইহাই বুঝি।

অধুনা গণতন্ত্রানুমোদিত যোগ্য লোক বাছাইয়ের পক্ষে বাহিরের প্রভাব-বর্জিত নির্ব্বাচনই যে প্রকৃষ্ট পথ, এ কথা সকলেই বলিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে দিন-কালে সর্ব্বত্রই যে ব্যাভিচার দাঁড়াইয়াছে, তাহার ফলে হয়ত ইহার দ্বারা নগণ্য কোন কোন ক্ষেত্র ভিন্ন প্রজাসাধারণের ইষ্টের কথা যত না থাকুক, বিদেশী শাসক বা রাজার ইষ্ট যথেষ্টই থাকে। এমন কি বৈদেশিক শাসকের রাজ্য-রক্ষার পক্ষে ইহা একটি অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে প্রত্যক্ষে ভুয়া সম্মান ও পরোক্ষে অপর কিছুর প্রলোভনে বিনাব্যয়ে বহু কার্য্য আদায় করা। অন্য দিকে যে ঐক্য বৈদেশিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র অবলম্বন, তাহা ছেদনের জন্য এমন অস্ত্র বুঝি আর দ্বিতীয় নাই। এমন কি এ অস্ত্রে মরিচা ধরিবার ভয় নাই, শান দিবার ব্যয় নাই। পরিচালনার নৈপুণ্যও বিশেষ আবশ্যক হয় না।

রাজনীতি সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপই। এ হেন রাজনীতিই যখন এখনকার অনেকের সর্ব্বস্ব, তখন ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বা দীর্ঘকাল হইতে দেখিয়া-শুনিয়া যে শিক্ষাটুকু পাইয়াছি বা যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

আমাদের রাজনীতি বলিতে ঠিক কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কথা স্বীকার করিলেও, যে আবেষ্টনীর মধ্যে আমি বাস করি, সেখানে রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বা রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বলিয়া খ্যাতিপন্নদের মূল্যানুসন্ধান করিতে যাহা খুঁজিয়া পাই, তাহাতে বুঝি আর না বুঝি, আমাকেও যাঁহারা তাঁহাদের পর্য্যায়ে স্থান দিয় থাকেন, তাহাতে এমন কিছু ভুল হয় না। তবে এ কথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি এবং তাহা বলিতে আনন্দ বোধ করি, যেমন সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লেখারূপ নিজের ঢাক নিজে পিটিয়া সাহিত্যিক হইয়াছি, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নহে বরং বিপরীত। এখানকার রাজনীতি আমি যাহা বুঝিয়াছি, পনের আনা স্থলে, যে কয়টা দেশের কাজ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান আছে, অনুনয়-বিনয়-অর্থব্যয়ে বা লাঠিবাজি যাহা দ্বারাই হউক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার হীন কৌশল বা চাতুরী যাঁহার যত আয়ত্তের মধ্যে থাকে, তিনি তত রাজনীতিজ্ঞ। এই উপলব্ধি ভুল হউক আর ঠিক হউক, ইহা সুদীর্ঘ কাল হইতেই আমার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি মিউনিসিপ্যালিটীর মেয়রের কার্য্যভার ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, তখন আমাকে উদ্দেশ করিয়া এখানকার স্থানীয় সাপ্তাহিক 'নবসঙ্ঘ' পত্রিকায় "সাধারণের নিবেদন" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাকে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবার

জন্য অশেষ প্রকারে অনুরোধ করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি করেন,—"তিনি হয়ত নিজের আশানুরূপ কিছু করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট এবং তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার কর্ম্মে সাধারণ সন্তুষ্ট এবং সাধারণের পক্ষ হইতে আমরা বলি, তিনি ছাড়িতে চাহিলেও আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে দিব না, আমরা তাঁহাকেই চাই।"—নবসঙ্ঘ ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

ইহার উত্তরে আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দি, তাহার মধ্যে আমি লিখিয়াছিলাম,—"রাজনীতিক বিজ্ঞতায় আমি ধুরন্ধর নহি। নির্ব্বাচন কালে ভোট-যুদ্ধে জয়লাভের পথ সোজা করবার, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা সহজ করবার, প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ করবার বা কাউন্সিলে নিজেদের জিদ রক্ষার জন্য স্বপক্ষ সমর্থনকারী সর্ব্বদা রাখবার নামান্তর যে পলিটিক্স বা পলিসি, সে পলিটিক্স আমি বুঝি না, বুঝিতে চাহি না। প্রতিগ্রাহী হলেও দান করা জিনিষের উপর দাতার লোলুপ দৃষ্টি হতে গোপনে এক কণা সংগ্রহ করে ভোগ করা, কিম্বা তাহা পাবার জন্য বিতণ্ডা বা পদলেহন এতে আমার বোধের অগম্য। কর্ত্তব্য, ন্যায় ও সত্যের ব্যাভিচারের উপর যে লাভের প্রতিষ্ঠা, তাহা নিজস্বই হউক, আর জাতিরই হউক, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য বলিয়াই মনে করি।"—নবসঙ্ঘ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। জীবনের শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া আজিও এ সব ধারণা অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে।

আমাকে যখন আরও দুই বার মিউনিসিপ্যাল্ সদস্যের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, একবার নির্ব্বাচকদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় এবং আর একবার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বিশেষ অনুরোধে মনোনয়ন দ্বারা ; তখন আমার দেশবাসীর কাছে আমার রাজনৈতিক জীবন বলিতে যে কিছুই নাই তাহা মনে করিতে না পারিলেও এ পরিচয় দিয়া কি লিখিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময় চন্দননগরের নবগঠিত অস্থায়ী শাসন-পরিষদের সভাপতির পদ হেলায় লাভ করায় এবং তাহার পরই স্বাধীন নগরী বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৌরসভা ও শাসন-পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় এখানকার রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমার কিছুটা স্থান যে আছে, তাহা ধরিয়া লই এবং ইতস্ততঃ ভাব ক্রমে কাটিয়া যায়। তৎপরে "মুক্তিসাধনায় চন্দননগর" নামক মল্লিখিত চন্দননগরের অন্তবর্ত্তী কালের পরিচয়-পুস্তক পাঠে প্রথিতনামা অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় আমায় "বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ" এবং স্বনামখ্যাত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "ষ্টেটসম্যান" বলিয়া অভিনন্দিত করায়* যদিও আমি জানি, এই প্রশংসা তাঁহাদের আমার কার্য্যাবলী দেখিয়া অভিজ্ঞতা-প্রসূত নহে, আমার পুস্তক পাঠে মাত্র ; তাহা হইলেও আমাকে একটু উৎসাহিত করে এবং আমার ধারণা ও শিক্ষার কথা লিখিতে প্ররোচিত করে।

এখানকার রাজনীতি বা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে মনুষ্যত্বসম্পন্ন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী যে একেবারে দুর্লভ, তাহা না হইলেও, সাধারণ ভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা কোন দিনই উচ্চ নহে। অতি নগণ্য ক্ষেত্র ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহারা দেশ বা জনসেবার পুণ্যকার্য্যে যতই রত থাকুন, খেচরবিশেষের ন্যায় উর্দ্ধাকাশে বিচরণ করিলেও যেমন দৃষ্টি থাকে ভূতলের পূতিগন্ধময় স্থানবিশেষের দিকে, তেমনই সাধারণতঃ তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে নিজেকে কেন্দ্র করিয়াই। নিজ স্বার্থই সেখানে আসল কথা। অন্য সব স্বার্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আবার কি করিয়া পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন, অন্ততঃ তাহার পথ পরিষ্কার রাখা জনসেবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। মহামতি ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"নিজের স্বার্থের জন্য আমরা যা করি, অনেক সময়ই সেটাকে পরোপকার বলে চালিয়ে দি। তারই নাম পলিটিক্স।"

কার্যকালে বিজয়ী নেতৃবর্গের গর্ব্বদীপ্ত নেতৃত্ব বা আচরণ ও ব্যর্থ নেতৃত্বকামী অথবা সংখ্যালঘু সহকর্ম্মী দলের ঈর্ষা, দ্বেষ ও ক্রোধের সংঘর্ষে অনেক সময় অনেক কল্যাণকর পরিকল্পনা ভাসিয়া গিয়া সাধারণের স্বার্থ ব্যাহত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। সেখানে নিঃস্বার্থ দেশসেবক যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্মশক্তিও পঙ্গু হইয়া যায়। আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ বা জনসেবার অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও, প্রত্যক্ষে পলিটিক্স ও দেশসেবা যুক্ত ভাবে দেখার সৌভাগ্য খুব কমই ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদের রাজনীতিই দেশসেবার বাহন ধরিয়া এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন প্রচারের দ্বারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যে-কোন উপায়েই হউক সাফল্য লাভের ব্যগ্রতা দেখা যায়, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মধ্যে আর যাহাই থাকুক, জনসেবার কথা খুব কমই থাকে। বরং যাহা থাকে, তাহা আত্মসেবার নামান্তর মাত্র। বর্ত্তমান দল বা ব্যক্তিগত পলিটিক্স সাধারণতঃ দেশসেবার কলঙ্কস্বরূপ। দেশ বা জনসেবার পবিত্র ধর্ম্মে মানবতার বিকাশই হয় আর পলিটিক্স সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধনেরই সহায়তা করে। মানবতার স্থান রাজনীতির ঊর্দ্ধে। মহামতি স্যামুয়েল্ জনসন্ স্বদেশানুরাগীদের মধ্যে কি কুৎসিত ধারণাই না পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন,—"Patriotism is the last refuge of a scoundrel."

রাজনীতি ক্ষেত্রে দলের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দশ জনে মিলিত হইয়া যখন কাজ করিতে হইবে তখন দল ত হইবেই। দলের ব্যক্তিবৃন্দের মত সকল সময় এক না হইতে পারে, কিন্তু মন অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক হওয়া দরকার। নচেৎ শুধু নির্ব্বাচনে জয়লাভের দ্বারা ক্ষমতা হস্তগত করার সুবিধার জন্য যে দল, তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ অপেক্ষা সময় সময় অকল্যাণের সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিজ্ঞ গেটেল্ বলিয়াছেন—"রাজনৈতিক দল হইতেছে জন কয়েকের সমষ্টি ; সুগঠিত হউক বা না হউক; যাহার প্রধান লক্ষ্য ভোটের জোরে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করা। সে জন্য কখন রাজনীতির নামে, কখন জাতীয়তাবাদের নামে, কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মের নামে, কোন সময় শ্রেণীগত স্বার্থের নামে বা রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তাহা সৃষ্ট হয়।"

---

* শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ২৪শে অক্টোবর, ১৯৫০ আমাকে তাঁহার পত্র মধ্যে লেখেন—"আমি এত দিন আপনাকে জনহিতকারী ও সাহিত্যসেবক বলিয়া জানিতাম, এই পুস্তক পড়িয়া আপনাকে আজ elder statesmanরূপে চিনিয়া আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার পাঠাইতেছি।"

এইরূপে প্রতারণার দ্বারা কার্যোদ্ধারের পর সংবাদপত্র মারফৎ নির্ব্বাচকদিগকে বা বড় জোর কর্ম্মীদের লইয়া এক সভায় বক্তৃতার দ্বারা আধুনিক সভ্যতাসম্মত কৃতজ্ঞতা জানান হয়। তাহার পরই কর্ম্মীদের নেতার কতিপয় ভিন্ন সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের সহিত সকল সম্পর্ক রহিত হয়। এক শয্যায় রাত্রি যাপনের পরদিন চিনিতে না পারা রাজনৈতিক ধর্ম্ম।

পলিটিক্স-এর ক্ষেত্রে আমি মূর্খ। প্রকৃত রাজনীতি বিষয়ে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ। তাহা সত্ত্বেও চন্দননগরের রাজনীতিতে যখন আমার স্থান আছে মানিয়া লইয়াছি, তখন আমিও উক্ত সব অপবাদমুক্ত নহি বলিয়া যদি কেহ ধরিয়া লন, তাহার জন্য আমি দুঃখিত বা চিন্তিত নহি। আমার দেশপ্রেম ও দানের কথা যাঁহারা বলেন, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক বলিয়া যাঁহারা মান করেন, তাঁহাদের আমি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতেছি, আমার দান তাহা স্বচ্ছ সরল ও একেবারে নিষ্কলুষ নহে। তাহার মধ্যেও আবিলতা আছে। প্রথম কথা, উহা ঠিক দান নহে; মাতৃ-অঙ্গে দুই-একখানি অলঙ্কার পরাইবার সখ মিটান। দ্বিতীয় কথা, উহাও আমার ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য নহে। সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক, ইহাও একটা আমার প্রতি স্নেহসূচক সম্মান দেখান মাত্র। ঐ সব আখ্যা পাইবার মত যোগ্যতা আমার কিছুই নাই। ইহার মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকে, তাহা আমি চন্দননগরকে ভালবাসি। এবং অনেক কিছু প্রশংসা যাহা আমি পাইয়া থাকি, মূলতঃ যে ইহা হইতেই, তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

আমার কিছুমাত্র অন্যায় নাই শুধু এই ভালবাসা সম্ভূত কল্যাণ-প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত ভাবে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহাও কম নহে। আমি যে কখন কাহারও অন্যায় করি নাই বা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, এ ভাবের কোন কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এ কথা বলিতে পারি, যে কয়েক জন আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে কারণ অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছি, আমার কার্য্য তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বার্থমূলক অভিসন্ধির সমর্থক ও সহায়ক না হইতে পারাই একমাত্র কারণ। আমার মনে পড়ে, বহু দিন হইল এখানকার এক জন পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি এক দিন উচ্চশিক্ষাহীন ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র আমার ভিতরেই বহু গুণের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন। আমাকেই যোগ্য মনে করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে আগাইয়া দিয়াছিলেন। যুবক-মণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক বন্ধুর সহিত তুলনা করিতে এই অধীনের নামই উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরে নিজে রাষ্ট্রক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশের পথ পরিষ্কারের জন্য তাঁহার স্বার্থমূলক অনুরোধে সহায়তা করিতে আমার অক্ষমতার কথা শুনিয়া, তিনিই আবার আমাকে "চন্দননগর চন্দননগর করিয়া মরি" বলিয়া 'কূপমণ্ডূক' আখ্যা দিতে, অবজ্ঞার সহিত Iron monger বলিয়া বিশেষিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। অবশ্য এক দিন আমি লৌহ-ব্যবসায়ী ছিলাম ইহা সত্য, আর চন্দননগরের বাহিরে কিছু করিতে না পারায় হয়ত আমার কূপমণ্ডূকত্বই প্রকাশ পায়, ইহাও সত্য। কিন্তু আমার মত স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্মানসূচক উপাধিই আমি মনে করি। জানি, দেশ-প্রেমিকের কাছে ভৌগোলিক সীমা বাধা হইতে পারে না, কিন্তু আমার মত স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কাছে নিজ জন্মস্থানের অবহেলা করিয়া দূরে যাওয়া সুবিবেচকের কাজ, ইহা কখন মনে করিতে পারিলাম না।

এই অধ্যায়ে আমার অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার কথা ব্যক্ত করিতে যে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রিয় আলোচনায় রত হইয়াছি, তাহা যদি কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হয়, সে জন্য লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন যদি কিছু পাইবার থাকে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। এই সুদীর্ঘ দ্বি-সপ্ততি বৎসরের মধ্যে আমার পাবলিক লাইফে যে সকল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে, আমার সুহৃদ ও শুভেচ্ছু বন্ধুগণই সব সময়ে আমায় তথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাই সাহায্য করিয়া আমাকে চালাইয়া লইয়াছেন, এ কথা কৃতজ্ঞতার সহিত আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহারা সকলেই এখানকার রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ। এখানকার কলুষিত রাজনীতি সম্পর্কে আমার তীব্র মন্তব্য ভ্রান্ত বা ঠিক যাহাই হউক, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের কাহারও যে কিছু সম্পর্ক নাই এ কথা বলিলে মিথ্যা বলাই হইবে। সে জন্য মাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করাই চলিতে পারে। তাহা পাওয়া না পাওয়া অদৃষ্ট।

যেমন পাশ্চাত্য মতে প্রেমের রাজ্যে অনেক কিছু অপকার্য্যে দোষ হয় না, তেমনই অনেকে বলিয়া থাকেন, রাজনীতিতে মিথ্যা চাতুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে পাপ নাই বা এ সবের মাপ আছে। কতকটা বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত রাজনীতিজ্ঞদের গতি অবাধ। জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার আত্মজীবনচরিতে বলিয়াছেন,— "Washington never told a lie until he was a politician." ওয়াশিংটন এক জন বিশ্ব-বিশ্রুত রাষ্ট্র-ধুরন্ধর। তাঁহার এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তাঁহার মত লোকেরই উপযুক্ত হইলেও ইহা মিথ্যা চাতুরী প্রভৃতির সমর্থক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, বরং ইহা নিন্দারই দ্যোতক। পলিটিক্সের নেতাদের মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন এরূপ খাঁটি লোক কদাচিৎ দেখা যায়। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় পলিটিক্স সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণিত মত পোষণ করেন। তিনি তাঁহার "মর্ত্তের স্বর্গে" বলিয়াছেন,—"সেণ্ট যদি পলিটিক্সে হাত দেয় তবে সেণ্টলিনেসের উপর থেকে শ্রদ্ধা চলে যায়, পলিটিক্স জিনিষটা এমনি নোংরা।"

রাজনৈতিক বিদ্যা-বুদ্ধিতে এখানে আমার স্থান নেতৃবর্গের কত নিম্নে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। তাহা হইলেও মিথ্যা চাতুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে কোন দোষ হয় না এ-কথা আমি কোন দিনই মনে করিতে পারি নাই। এমন কি, নির্ব্বাচনে সাফল্যের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন সংলোকের পক্ষে সত্যের আশ্রয়ই সমধিক কার্য্যকরী এই বিশ্বাসই আমি পোষণ করি। তথাকথিত নেতাদের চেষ্টায়, কৌশলে, অর্থবলে সরল সাধারণ জনমণ্ডলীর সচ্ছন্দ সরল ইচ্ছামত কার্য্যে বাধা আনিয়া না দিলে যাহা সত্য ও শ্রেয় তাহাই জয়যুক্ত হয়, কারণ সকলে প্রথম অনুসন্ধান করেন ভাল লোক। এমন একটা সময় এই স্থানেই আসিয়াছিল যদ্দারা আমার উক্ত বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নহে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এ বিষয়টির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও এবং আমার

কর্ম্ম-জীবনের শিক্ষার কথা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইলেও এখানে পুনরায় তাহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশগুলির ন্যায় চন্দননগরেও সকল নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধ-নিবৃত্তির পর যখন পুনরায় নির্ব্বাচন হয়, তখন তদানীন্তন প্রবল পলিটিক্যাল্ দল যথাপূর্ব্ব আর্যোবন-অভ্যস্ত প্রলোভন, চাতুরী ও প্রপাগ্যাণ্ডার দ্বারা নির্ব্বাচনে জয়লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নয় বৎসরের পর নির্ব্বাচন হওয়ার জন্য, কি কি জন্য ঠিক বলিতে পারি না, তখনকার নবীন যুবকগণ দলগত রাজনীতির স্বাদ অজ্ঞাত থাকার জন্যই বোধ হয়, তাঁহাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হওয়ায়, দেশের সাধারণ নির্ব্বাচকগণ রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেহই আগ্রহশীল বা ইচ্ছুক নহেন, এরূপ নূতন লোকদের নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধু এবং পারদর্শী—আমি এই কথাই বলিতেছি না, নির্ব্বাচকগণ তাঁহাদিগকে তাহা মনে করিয়াই যে চাহিয়াছিলেন, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। নির্ব্বাচন ব্যাপারে কতকগুলি ব্যয় আছেই। জনমত প্রবল থাকার সে ব্যয় সে বারে সামান্য হইলেও, যাহা হইয়াছিল তাহা কে বা কাহারা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে জানেন জানি না, আমিও নির্ব্বাচিতদের মধ্যে অন্যতম হইলেও অন্ততঃ আমি এখন পর্য্যন্ত জানি না।

এখানে বাহিরের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বলা দরকার, ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নির্ব্বাচন বিষয়ে পদপ্রার্থীরূপে পূর্ব্বাহ্নে নাম দিবার অর্থাৎ নমিনেশন্-পেপার ফাইল করার কোন নিয়ম নাই। নির্ব্বাচকগণ স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচকদিগের মধ্যে যাঁহাদের নির্ব্বাচন করেন তন্মধ্যে ভোটাধিক্যে সদস্য স্থির হইয়া থাকেন। বরাবরই বিভিন্ন দল চেষ্টা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে জয়-পরাজয় আছেই। কিন্তু প্রাচীন দল যাঁহাদের মধ্যে এখানকার প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ ছিলেন তাঁহারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই নবীন নিষ্ক্রিয়, যাঁহাদের এ সব অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র ছিল না, তাঁহাদের কাছে যে ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন, তেমন আর কখন হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। আর বাহিরের প্রভাবমুক্ত নির্ব্বাচকদিগের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এরূপ নির্ব্বাচনও আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সত্যের জয়যাত্রা বলিয়াছি, তাহা আর কিছু নয়, কোনরূপ অন্যায় পথ না লইয়া প্রাচীন বহুদর্শীদিগের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রীয়-জ্ঞানহীন নূতন ব্যক্তিদের কৃতকার্য্য হওয়ার কথাই আমার বক্তব্য। আমি ত মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রবিষ্ট হইলাম। ম্যারের কার্য্যভারও আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমার এ সব কার্য্যে পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র ছিল না; অবসরেরও যথেষ্ট অভাব ছিল, ফরাসী ভাষায় জ্ঞান ছিল না, আর এ সবের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কখন মনেও করি নাই, লোভও ছিল না। সুতরাং কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার যোগ্যতার অভাব অনুভব করিয়া এক বৎসরের মধ্যে গভর্ণরের নিকট তিন বার পদত্যাগ পত্র পাঠাইলাম। প্রথম বার সদলেই লিখিয়াছিলাম। পণ্ডীচারী হইতে গভর্ণর সাহেব আসিয়া আমাদের নিরস্ত করিলেন। দ্বিতীয় বার আমায় লিখিলেন, আমার একটা নৈতিক কর্ত্তব্য আছে, আমাকে দেশের লোক চান, গভর্ণমেন্ট চান, সুতরাং আমি ছাড়িতে পারি না। আমি তাঁহার কথায় আরও কিছু দিন থাকিয়া, আর কোন অনুরোধের সুযোগ না রাখিয়া, বৎসরের শেষে পদত্যাগ পত্র দিই এবং মেরী অফিসে* আর যাইলাম না।

আমার রাজনৈতিক জীবনের ইহাই আরম্ভ। আমার দেশবাসীর যে আমার প্রতি বিশ্বাস ছিল, তাহা আমিও মনে করিতাম। তাঁহাদের দেওয়া এই একটি মাত্র কার্য্যভার ঠিক মত পালন না করিতে পারায় এবং অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদত্যাগ করিতে হওয়ায় আমার একটু কষ্টও হইয়াছিল। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরলপ্রাণ অধিবাসীদের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ব্বাচক-দিগের বিশ্বাসের অপব্যবহার করা অপেক্ষা ইহাই তখন সমীচীন মনে হইয়াছিল। কিন্তু তখন হইতে এ জীবনে যেমন তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তেমন ত আর কোথাও হয় নাই। আজি সেই সব কথা নানা ভাবে সবিস্তারে বলিতে না জানি আমার জন্য কি লাঞ্ছনা কি নির্য্যাতন অপেক্ষা করিতেছে।

যদিও এখানে শিক্ষালাভ হইয়াছে—ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে ইহাই একটি মাত্র স্থান যেখানে প্রবঞ্চনা, শঠতা, প্রতারণা, পরের চক্ষে ধূলি দেওয়া প্রভৃতি কোন অপকর্মই নির্ব্বাচন ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে সমাজে দোষনীয় হয় না। এখানে দলের নামে দেশের নামে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই সব চেয়ে বড় কাজ। অন্য সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মীদের পরীক্ষা যত সহজ, এখানে তত সহজে সম্ভব নয়। কৃতিত্বের ঠিক মাপকাঠিও নাই। যে সকল উকিল-ব্যারিষ্টার হয়কে নয়, নয়কে হয় করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই যেমন খ্যাতিপন্ন হন, তেমনই স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে যাঁহারা চাতুরী দ্বারা নিজ অভিসন্ধিকে পশ্চাতে রাখিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁহারা তত বড় বলিয়া পরিচিত। বন্ধু, আত্মীয়, শ্রদ্ধাশীল, বরেণ্য ব্যক্তিকেও ছলে-বলে-কৌশলে তাঁহাদের নির্ব্বাচনের পথ হইতে সরাইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিপুণ। এমন কি, যে মাটি ধরিয়া তাঁহারা উঠেন, নিজ স্বার্থে তাহাকেই পদদলিত করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। আবার এমনও দেখা যায়, যাঁহারা ঝুনা রাজনীতিজ্ঞ, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় অপকর্ম্ম ধরা পড়িয়া যত লাঞ্ছনা-অবমাননাই হউক, বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কখন স্বেচ্ছায় গদি ত্যাগ করেন না। ইহাই তাঁহাদের লক্ষণ। তাঁহারা বেশ জানেন, যতক্ষণ গদি ততক্ষণই শক্তি। বিচিত্র এই রাজনীতি এবং ততোধিক বিচিত্র এই গণতান্ত্রিক ভণ্ডামি।

এখানকার রাষ্ট্রীয় পরিবেশের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আমার এই লব্ধ শিক্ষা যখন আমার দেশবাসী আমার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতেই প্রধানতঃ পাওয়া, তখন সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক। একবার চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বড় কর্ম্মচারী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য কোন সহকর্ম্মী বন্ধুর ক্ষতির আশঙ্কায় আমাকে আমার ভাষণে চন্দননগরের কথা-প্রসঙ্গে, যাঁহাকে চন্দননগরের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া মনে করি, সেই কানাইলালের নামোচ্চারণ করিতে বিরত থাকিতে

---

* মিউনিসিপ্যাল অফিসকে চন্দননগরে মেরী অফিস বলে।

হইয়াছিল। আজি রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমার শিক্ষার কথা বলিতে অনেক অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভরসার কথা, এখানে তেমন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কারণ যদি আমার মন্তব্য ভ্রমাত্মক বা কোন গোপন উদ্দেশ্যমূলক মনে হয়, তবে হয়ত তাহা এক জন দায়িত্বজ্ঞানহীন অরাজনৈতিকের মন্তব্য ধরিয়া লইয়া অনেকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনিবেন না। না! আর যদি কথাগুলি সত্য বলিয়াও মনে হয়, তাহা হইলে কচু-পাতায় যেমন জলের দাগ লাগে না, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে তেমনি নিন্দার কোন কার্য্যকরী শক্তি থাকে না।

এই রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রলোভন আমাদের বড় শত্রু। এই টোপ গলাধঃকরণ করিবার লোভ সংবরণ করিবার মত বীর-পুরুষ বড় একটা দৃষ্টিপথে পড়ে না। আমাদের দেশের ধর্ম্মগত বৈষম্য যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা আনিতে না পারিয়াছে, নির্ব্বাচনলব্ধ শূন্যগর্ভ পদ-লালসা ও প্রতিষ্ঠা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনিয়াছে। এ শুধু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে নয়, জাতিতে-জাতিতে নয়, গ্রামবাসী, পল্লীবাসী, বন্ধু-বান্ধব, স্বজন এমন কি এক সংসারের মধ্যে পর্য্যন্ত। বুঝিয়াছি নেতৃত্বের মোহ, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা অনেকের কাছে অন্ন-বস্ত্রের নীচেই ইহার স্থান। কিন্তু হায় হায়, জনসাধারণের উপর নেতৃত্বের ভার মানেই যে জনসাধারণের সেবা, এই সেবা করিয়া যে আনন্দ, যে মর্য্যাদা, তাহা যে কত বড় তাহা খুব অল্প লোকেই বুঝেন।

"জীবনের রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেখিলাম—তিনটি শ্রেণীর অভিনেতা। প্রথম, নিঃস্বার্থ কর্ম্মী; দেশহিত-ব্রতের একনিষ্ঠ সাধক। স্বার্থের পূতিগন্ধময় আবেষ্টনীর ঊর্দ্ধে তাঁর চিত্ত প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়, একান্ত স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ, সুবিধাবাদী। তাঁর সকল কিছু কার্য্যকলাপে প্রচ্ছন্ন বা ব্যক্ত হয়ে থাকে তাঁর স্বার্থসেবা। তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যে দেখি এক শ্রেণীর কর্ম্মী যিনি স্বার্থের পূজাকে দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন না। তিনি দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মযশ লাভে পরাঙ্মুখ নন। প্রথম শ্রেণী সুদুর্লভ, দ্বিতীয় সুপ্রতুল, তৃতীয় সুদুর্লভ নহে; অথচ দ্বিতীয়ের ন্যায় বহুলও নহে। আমার জীবনের চরম উপলব্ধি, বর্ত্তমান কালে সাধারণতঃ জীবনের ভিত্তি হল মেকী বা মিথ্যা। সর্ব্ব ক্ষেত্রেই দেখিতেছি মেকীর জয়।" *

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি ইহাই। তাই বলিয়া ভারতের কাম্য গণতন্ত্র বা স্বরাজ যে ইহাই, এ কথা কেহই বলিবেন না। এখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিজেদের হইলেও, জনসাধারণ কর্ত্তৃক একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ভোট দিয়াই তাঁহাদের কার্য্য শেষ হওয়াই যে প্রকৃত স্বরাজের লক্ষণ, এটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি এটা গণতন্ত্রের যুগ, age of democracy কিন্তু যেখানে জনগণের পনের আনা অশিক্ষিত, তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিজেরা পরস্পর বিভক্ত, সেখানে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ভণ্ড প্রতারকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়াই সম্ভব। যথার্থ স্বরাজ আশা করিতে পারা যায় না। রাজনীতি ও প্রজানীতি অভিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ঠিক মত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অনেক সময় এখনকার অধিকাংশ রাজনীতিকদিগের কার্য্যকলাপ সত্যই গণতান্ত্রিক ভণ্ডামি বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার এমনও কেহ কেহ থাকেন যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, করণীয় অকরণীয় বিষয়-অন্তরে সম্পূর্ণ অবহিত থাকেন; এমন কি তাঁহাদের বিবেক অনেক সময় তাহার বাণী শুনাইবার জন্য সদা ব্যগ্র থাকিলেও, পাছে তাঁহারা তাহা শুনিয়া ফেলেন, এ জন্য নিজের কর্ণরন্ধ্রে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করেন।

আমার এই জীবনের শিক্ষায় যাহা বুঝিয়াছি, দেশসেবা অতি পুণ্য কর্ম্ম, প্রকৃত দেশসেবকগণ জাতির নমস্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও, দেশসেবার নাম লইয়া যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া যে-কোন উপায়েই হউক রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জনে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের সান্নিধ্য হইতে দেশ দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। সবের মধ্যেই ভাল ও মন্দ দুই-ই থাকে। আমরা অজ্ঞতা বা যে, জন্যই হউক, পলিটিক্স-এর মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে, আমার এই পাপ চক্ষে তাহা এ পর্য্যন্ত খুব কমই ধরা পড়িয়াছে। প্রথম স্বেচ্ছায় না হইলেও যাঁহারা দলে পড়িয়া দলের সাফল্যের জন্য একবার পলিটিক্সের আবর্ত্তে পড়িয়া যান, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আমরণ সেই আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে দেখা যায়। আবার এমনও দেখা যায়, কোন কোন ভাল লোক ভাল উদ্দেশ্য লইয়া যদি কিছু দেশের কাজ করিতে পারেন, এই মনে করিয়া ঢুকিয়া ক্ষমতা ও প্রভুত্বজনিত বিভ্রান্তিতে অথবা অপরের হাততালিতেও নষ্ট হইয়া যান।

পাশ্চাত্য শাসনের প্রভাবে জাতির মধ্যে এমনই একটা নেশা ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অভিজাত সম্প্রদায় যাঁহাদের প্রবৃত্তি বা খেয়াল হইতে উদ্ভূত জাতি ও সমাজ-কল্যাণ-বিরোধী কার্য্যাবলী মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও ক্রমে সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত হইয়া রাজনীতিই যেন সাধনার শ্রেষ্ঠ বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। পলিটিক্স লইয়াই যাঁহারা মাতিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্পর্কে ভ্রমাত্মক কি না, তাহার বিচারক আমি হইতে পারি না। আমার যাহা দৃঢ় ধারণা তাহাই কঠোর ও তীব্র ভাবে মন্তব্য করিতে হইল, সে জন্য আমি দুঃখিত। পরিশেষে আমি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়ের কথায় বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি,—"দুর্ভাগা সে জাতি, দুর্ভাগ্য সে যুগ, যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা পলিটিক্স।"*

---

* ইহা আমারই কথা, আমার স্নেহভাজন চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত কমলপ্রসাদ ঘোষ আমার নিকট এই অভিমত শুনিয়া লিখিয়াছিলেন।

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ; ৩০শে ফাল্গুন ১৩৫৫। এই প্রবন্ধ লিখিতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এর নিকট হইতে কিছু সাহায্য লইয়াছি।

—লেখক

সংশ্লেষিত মৌল

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্তমান বিজ্ঞান-জগতে রসায়ন শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত যতগুলো আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে বলতে গেলে, যুগান্তরকারী আবিষ্কার হোলো মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক্ টেবল্ বা পর্যায় সারণী আবিষ্কার। রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ নিয়ে গভীর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অনেকগুলি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের গুণাগুণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে এবং এ থেকেই তিনি পিরিয়ডিক্ টেবল বা পর্যায় সারণী প্রথম সূত্রপাত করেন। এই টেবল্‌টা আর কিছুই নয় শুধু মাত্র একটা ছক এবং মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজনকে মান (standard) ধরে এক-দুই-তিন করে তিনি সাজাতে আরম্ভ করলেন ছকের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ঘরে এবং সেই সঙ্গে যে সব মৌলিক পদার্থের গুণাগুণের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাদের তিনি সাজালেন একই সারিতে। এমনি করে উপর থেকে নীচে সমান্তরাল সারিতে পাওয়া গেল সাতটা সারি আর পাশাপাশি সারিতে নটা সারি। এটা হোলো আঠারো শতাব্দীর একটা আবিষ্কার। পর্যায় সারণী তার পর বহু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিজ্ঞানীরা পর্যায়-সারণীর বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ নিয়ে আরো গবেষণা করে দেখতে পেলেন যে, কয়েকটি মৌল অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ, যাকে ইংরিজিতে বলা হয় element (এলিমেণ্ট), মেণ্ডেলিফের সাজানো ঘরে ঠিক মত খাপ খায় না। এতে বিজ্ঞানীরা ঐ ঐ মৌলের পরমাণবিক ওজন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আরো সূক্ষ্ম ভাবে সন্দেহপূর্ণ মৌলের পরমাণবিক ওজন মাপতে গিয়ে দেখেন যে সারণীর ভুলগুলো ঠিক মত শোধরানো গেল না। তার পর এগিয়ে এলেন মোসলে এই সমস্যা সমাধানে। তিনি নানা পরীক্ষার পর মেণ্ডেলিফের মতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিজ্ঞান-জগৎকে দৃঢ় ভাবে জানালেন যে, পর্যায় সারণীর বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন মৌলকে বসাতে হলে পদার্থের পরমাণবিক ওজনকে মান (standard) না ধরে ধরতে হবে পরমাণবিক সংখ্যাকে। এখন পরমাণবিক ওজন ও পরমাণবিক সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর মধ্যে একটা অংশ আছে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিক এবং এই কেন্দ্রিকে থাকে প্রোটন নামক ধনাত্মক কণা এবং নিউট্রন নামক বিদ্যুৎহীন কণা। কিন্তু হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে আছে মাত্র একটি প্রোটন। প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান এবং যে হেতু প্রোটন ধনাত্মক কণা সেই জন্য পরমাণুকে তড়িৎহীন রাখতে প্রোটনের সমান সংখ্যায় ইলেকট্রন নামক খুব হালকা ঋণ তড়িৎ কণা ঘোরে ঐ নিউক্লিয়াস্ বা কেন্দ্রিককে কেন্দ্র করে, ঠিক যেমন করে সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ। মৌলের পরমাণবিক ওজন হোলো কেন্দ্রিকস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি, কিন্তু পরমাণবিক সংখ্যা হোলো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা। মেণ্ডেলিফ বিভিন্ন মৌলকে পর্য্যায়-সারণীতে সাজাতে পরমাণবিক ওজনকেই মাত্র নির্দ্দিষ্ট ধরেছিলেন, কিন্তু মোসলে সাজালেন বিভিন্ন মৌলের প্রোটন সংখ্যাকে একক করে, ফলে মেণ্ডেলিফের টেবলে দোষ-ত্রুটিগুলো শোধরানো সম্ভব হোলো।

বিভিন্ন মৌলকে গুণানুযায়ী সাজাতে সাজাতে দেখা গেল, সারণীর অনেকগুলি ঘর ফাঁকা পড়ে থাকছে এবং এতে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ বাণী করলেন যে, এক সময় ঐ অজানা মৌলগুলো আবিষ্কৃত হবেই, শুধু তাই নয়, তাঁরা ঐ অজ্ঞাত মৌলগুলির গুণাগুণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। এক যুগ বাদে তাঁদের এ ভবিষ্যৎ বাণী মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রায় সব ঘরগুলো ভর্ত্তি হয়ে গেল, শুধু ফাঁকা রয়ে গেল ৪৩, ৬১, ৮৫ ও ৮৭ পরমাণবিক সংখ্যার মৌলের ঘরগুলো। কিন্তু এতে বিজ্ঞানীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে আরম্ভ করলেন আরো গভীর অনুসন্ধান। ইতিমধ্যেই রাদারফোর্ড, নীল বোর, আইরিন কুরী প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবুও বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য আকর (ore) নিয়ে গভীর পরীক্ষা করে ঐ মৌলগুলির একটিও এতটুকু পরিমাণে পেলেন না যাতে নিঃসন্দেহে ঐ সব মৌলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতিতে এর অভাব দেখে তাঁরা তখন আরম্ভ করলেন কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ সংশ্লেষিত উপায়ে (synthetically) ঐ মৌল তৈরী করতে তাঁদের গবেষণাগারে এবং এইখানেই আরম্ভ হোলো transmutation of elements বা মৌলের রূপান্তর করণ। একটা মৌলকে অন্য কোনো মৌলে পরিবর্ত্তিত করতে হলে দেখতে হবে, উভয় মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রিকের স্থায়িত্ব বা stability কতখানি। আগেই বলে নিয়েছি যে, মোসলে পর্য্যায়-সারণী সাজিয়েছিলেন মৌলের পরমাণবিক সংখ্যাকে একক ধরে এবং এই সংখ্যাই যে ঐ মৌলের প্রোটন সংখ্যা তাও জানিয়েছি। সুতরাং পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়ে ইচ্ছামত পরমাণুটিকে এগিয়ে বা পেছিয়ে দেওয়া যায় পর্য্যায়-সারণীতে। কিন্তু নিউট্রনের তারতম্য ঘটিয়ে যা পাওয়া যায় তা হোলো ভিন্ন ওজনের ঐ একই পরমাণু এবং ঐ ভিন্ন ওজনের পরমাণুকে বলে

আইসোটোপ (isotope) বা সমস্থানিক। প্রকৃতিতে তথাকথিত বিরানব্বইটি মৌলের মধ্যে শেষের দিকের কয়েকটি মৌল তেজস্ক্রিয় অর্থাৎ ঐ সব মৌল থেকে আপনা থেকে বিভিন্ন রশ্মি বেরোতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ মৌলগুলি পরিবর্তিত হয় সীসায়। বিরাশি নম্বরের মৌল সীসার আগে মাত্র দু'টি মৌল তেতাল্লিশ (টেক্‌নিটিয়াম) ও একষট্টি (প্রোমিথিয়াম) পাওয়া যায়নি প্রকৃতিতে এবং সেই জন্যে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হলেন কৃত্রিম উপায়ে ঐ মৌল দু'টি সৃষ্টি করতে। প্রকৃতিতে এর অভাবের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেন যে, এদের পরমাণুর নিউট্রন ও প্রোটনের পারস্পারিক পরিবর্তনের জন্যেই টেকনিটিয়াম জাতীয় মৌলের সৃষ্টি হয়নি। কারণ, এ যুগের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে, নিউট্রন একটা প্রোটন ও একটা ইলেকট্রনের মিশ্রণ, যার ফলে নিউট্রন তড়িৎহীন এবং পরমাণুর এই নিউট্রন অনেক সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে হয়ে পড়ে শুধু প্রোটন, যার ফলে ঐ পরমাণুটি তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয় পরবর্তী মৌলে এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে Beta instability বা বিটা অস্থায়িত্ব। এইবার আলোচনা করবো বিভিন্ন কৃত্রিম মৌল সম্পর্কে।

মৌল ৪৩

সংশ্লেষিত উপায়ে প্রথম সৃষ্ট মৌল হোলো টেকনিটিয়াম এবং এই টেকনিটিয়ামের অস্তিত্ব প্রথম ঘোষণা করেন C Perrier ও Segre, ১৯৩৭ সালে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রনের সাহায্যে মলিবডিনাম নামে আর একটি মৌলকে ডিউটেরন দিয়ে উত্তেজিত করে এঁদের কাছে পাঠানো হয় এবং এ থেকেই তাঁরা টেকনিটিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই টেকনিটিয়ামের কতকগুলি স্বল্পস্থায়ী সমস্থানিক নিয়ে পরীক্ষা করে জানা গেল, আরো বেশী স্থায়ী সমস্থানিক পাওয়া সম্ভব এবং বিজ্ঞানীরা তখন ঐ স্থায়ী টেকনিটিয়াম সমস্থানিক প্রস্তুতে মন দিলেন। বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে দেখা গেল, ৯৮ পরমাণবিক ওজনের মলিবডিনামকে নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করলে ঐ মলিবডিনাম পরমাণু প্রথমে একটা অস্থায়ী ৯৯ ওজনের মলিবডিনাম মৌলে পরিবর্তিত হয় আর তার পর ঐ ৯৯ ওজনের মলিবডিনাম একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়, ফলে তৈরী হোলো ৯৯ ওজনের টেকনিটিয়াম এবং এই উপায়ে কয়েক মিলিগ্রাম টেকনিটিয়াম তৈরী হয়েছে এর গুণাগুণ বিচারের জন্যে।

বিরল মৃত্তিকার একাধিক মৌলের মধ্যেই ৬১ নম্বরের মৌলও একটি। যে হেতু এটা তেমন একটা প্রয়োজনীয় মৌলের মধ্যে পড়ে না, সেই জন্যে এই মৌল প্রস্তুত করবার প্রণালী নিয়ে আলোচনা চালানোর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এই মৌলকেও ঠিক টেকনিটিয়ামের মত করে তৈরী করা যেতে পারে।

মৌল ৮৫

মলিবডিনামকে নিউট্রন বুলেট দিয়ে আঘাত করে যেমন পাওয়া যায় টেকনিটিয়াম, তেমনি করে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে পঁচাশি ঘরের মৌল পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ টেকনিটিয়ামের সময় আমরা সাহায্য নিয়েছি ঠিক তার আগের মৌল মলিবডিনামের এবং এই মৌল প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং, ৮৫ মৌল যার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাসটাটিন, তৈরী করতে দরকার ঠিক তার আগে মৌল পোলোনিয়ামকে কিন্তু এই পোলোনিয়াম প্রকৃতিতে খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্যে বিজ্ঞানীরা পোলোনিয়ামের আগের মৌল বিসমাথ্‌কে (Bismuth) পরিবর্তিত করে অ্যাসটাটিন তৈরী করতে মনস্থ করলেন। এখন বিসমাথ হোলো তিরাশি নম্বরের মৌল এবং এই তিরাশিকে পঁচাশি করতে প্রয়োজন দু'টো প্রোটন ঢোকানো। সেই জন্যে তাঁরা বিসমাথ পরমাণুকে দ্রুতগামী হিলিয়াম কেন্দ্রিক দিয়ে আঘাত করলেন, কারণ হিলিয়ামের কেন্দ্রিকে আছে দু'টো নিউট্রন ছাড়াও দু'টো প্রোটন এবং এই ভাবে D. R. Corson, K. R. McKenzie এবং Segre পঁচাশি নম্বরের মৌল তৈরী করতে সক্ষম হন এবং যেহেতু এই মৌলের সঙ্গে ক্লোরিন ব্রোমিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে তাই তাঁরা এর নাম দিলেন অ্যাসটাটিন। অ্যাসটাটিনের প্রথম যে সমস্থানিকটি তৈরী হোলো সেটা অ্যাসটাটিন (২১১) এবং এই সমস্থানিকটি খুবই অস্থায়ী, কারণ এই সমস্থানিক থেকে আপনা থেকে অ্যালফা কণা (alpha partile) বেরিয়ে যায়, ফলে পরমাণুটি পরিবর্তিত হয় অন্য কোনো পরমাণুতে। এ ছাড়া এই সমস্থানিকটি দু'ভাগে ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ কতকগুলো পরমাণু যে ভাবে ভাঙে অন্য পরমাণু সে ভাবে না ভেঙে—ভাঙে অন্য ভাবে কিন্তু শেষে উভয়েই অ্যালফা কণা ছেড়ে দেয়। কতকগুলি পরমাণু সোজাসুজি অ্যালফা কণা ছেড়ে দেয়, ফলে পরমাণুটি সোজাসুজি পরিবর্তিত হয় ২০৭ ওজনের বিসমাথে। অ্যালফা কণাকে বলা যেতে পারে হিলিয়াম কেন্দ্রিক অর্থাৎ এর ভেতরে আছে দু'টো প্রোটন ও দু'টো নিউট্রন। সুতরাং ২১১ ওজনের অ্যাসটাটিন পরমাণু একটা অ্যালফা কণা ছেড়ে দিলে অর্থাৎ দু'টো নিউট্রন ও প্রোটন বেরিয়ে গেলে পরমাণুটির ওজন কমে হয় ২০৭ এবং সেই সঙ্গে দু'টো প্রোটন বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পরমাণু দু'ঘর পেছিয়ে এসে হয়ে পড়ে সেই ৮৩ নম্বরের বিসমাথ। আরো কতকগুলো পরমাণু ইলেকট্রন টেনে নিয়ে পরিবর্তিত হয় ২১১ ওজনের পোলোনিয়ামে। এখন ২১১ ওজনের অ্যাসটাটিনের মধ্যে আছে ৮৫টা প্রোটন ও ১২৬টা নিউট্রন। সুতরাং অ্যাসটাটিনের কোনো পরমাণুর কেন্দ্রিকের একটা প্রোটন ঐ ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয় একটা নিউট্রন, ফলে একটা প্রোটন কমে পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা হয় ৮৪, কিন্তু ওজন থাকে ঐ ২১১ এবং এই চুরাশি নম্বরের মৌলই হোলো পোলোনিয়াম। কিন্তু এই পোলোনিয়াম খুবই অস্থায়ী, সেই জন্যে এই পোলোনিয়াম থেকে একটা অ্যালফা কণা বেরিয়ে গিয়ে তৈরী হয় ৮২ নম্বরের ও ২০৭ ওজনের মৌল সীসা।

মৌল ৮৭

বিরানব্বইটি ঘরের মধ্যে এখন শুধু ফাঁকা থাকছে ৮৭ মৌলের ঘরটি এবং এই ঘরের মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে ফ্রানসিয়াম।

সত্যি কথা বলতে কি, এই মৌলটিকে ঠিক কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বলা যেতে পারে না। কারণ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌল যখন ভাঙতে আরম্ভ করে তখন যে সব মধ্যবর্তী মৌল সৃষ্ট হয় তাদের সেই ভাঙনের পথে, ফ্রানসিয়াম তাদেরই অন্যতম মৌল বলে

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল। বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, অল্প-বিস্তর প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় মৌলই ভাঙতে থাকে আপনা থেকে এবং তাদের এই ভাঙনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটা হোলো থোরিয়াম শ্রেণী বা সিরিজ, একটা ইউরেনিয়াম সিরিজ ও অপরটি অ্যাকটিনিয়াম সিরিজ। এই শ্রেণীর প্রথমটা আরম্ভ হয় থোরিয়াম দিয়ে এবং সেই থোরিয়াম ক্রমে ভাঙতে-ভাঙতে এসে থামে স্থায়ী সীসায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথমে আছে ইউরেনিয়াম যা নানা অস্থায়ী স্বল্পস্থায়ী পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হতে-হতে এসে থামে ভিন্ন ওজনের সীসায় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রথমে আছে অ্যাকটিনো-ইউরেনিয়াম যা প্রথমে পরিবর্ত্তিত হয় অ্যাকটিনিয়মে এবং যা ভাঙতে-ভাঙতে এসে থামে আরেক ওজনের সীসায়। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলের এই ভাঙনের কথা জানবার পর বিজ্ঞানীরা মনে করলেন যে, ইউরেনিয়াম ও সীসার মধ্যবর্ত্তী মৌলগুলির সমস্থানিকের মধ্যে হয়তো বা ৮৭ মৌলের কোনো একটা সমস্থানিক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরে জানা গেল, ঐ তিন শ্রেণীর ভাঙনের পথে ৮৭ মৌল সৃষ্ট হয় না, হয় অন্য কয়েকটি মৌল।

১৯১৪ সালে Stefan Meyer, V. F..Hess ও Paneth প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জানালেন যে, ২২৭ ওজনের অ্যাকটিনিয়াম যা স্বাভাবিক অবস্থায় শুধু ইলেকট্রন ছাড়ে, তা মাঝে-মাঝে আল্‌ফা কণা ছেড়ে দিয়ে ভাঙতে আরম্ভ করে। এখন অ্যাকটিনিয়াম হোলো ৮৯ মৌল। সুতরাং একটা অ্যালফা কণা ছেড়ে দিলে অর্থাৎ দু'টো প্রোটন ও দু'টো নিউট্রন ছেড়ে দিলে, অ্যাকটিনিয়ামের প্রোটন সংখ্যা কমে হয় ৮৭ এবং এই ৮৭ মৌলই হোলো ফ্রানসিয়াম এবং এর ওজন হোলো ২২৩, যেহেতু প্রোটনের আর নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান। এর পর ১৯৩৯ সালে ফ্রান্সের নারী বিজ্ঞানী M. Perey ২২৭ ওজনের অ্যাক্‌টিনিয়াম থেকে পেয়েছিলেন স্বল্পস্থায়ী ৮৭ নম্বরের মৌল এবং ফ্রান্সের নাম অনুসারে এর নাম দেন ফ্রান্‌সিয়াম।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ভাঙনের প্রায় কোনো অবস্থাতেই ৮৭ মৌল যে সৃষ্ট হয় না তা আগেই বলেছি, কিন্তু পরে যখন ইউরেনিয়ামোত্তর নেপচুনিয়াম মৌল কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হোলো, তখন এই নেপচনিয়াম থেকেই ভাঙনের আর একটা শ্রেণী আরম্ভ হোলো এবং এই শ্রেণীর মৌলের ভাঙনের ফলে তৈরী হোলো ২২১ ওজনের ফ্রানসিয়াম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক উপায়ে ফ্রান্‌সিয়াম সৃষ্ট হয় ২২৭ ওজনের অ্যাক্‌টিনিয়াম থেকে। শতকরা নব্বই ভাগ এই অ্যাক্‌টিনিয়াম বিটা কণা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রন ছেড়ে দিয়ে রূপান্তরিত হয় ২২৭ ওজনের থোরিয়ামে এবং সেই সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণে অ্যাক্‌টিনিয়াম, মাঝে-মাঝে আল্‌ফা কণা ছেড়ে দিয়ে রূপান্তরিত হয় ২২৩ ওজনের ফ্রান্‌সিয়ামে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ফ্রান্‌সিয়াম তৈরী করতে প্রথমে ২৩২ ওজনের থোরিয়াম নিয়ে তাকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে থোরিয়াম নিউট্রনটা টেনে নিয়ে পরিবর্ত্তিত হয় থোরিয়ামের অন্য একটি সমস্থানিকে আর তখন এর ওজন হয় ২৩৩। এই ২৩৩ ওজনের থোরিয়াম মধ্যবর্ত্তী পাঁচটা বিভিন্ন মৌলে রূপান্তরিত হতে-হতে এক সময় রূপান্তরিত হয় ২২১ ওজনের ফ্রান্‌সিয়ামে এবং এই ফ্রান্‌সিয়াম বিরানব্বইটা মৌলের মধ্যে শেষ অনাবিষ্কৃত মৌলরূপে প্রকৃতির ক্ষমতায় যতি টানলো। আর তার পরই আরম্ভ হোলো বিজ্ঞানীদের ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল সৃষ্টি করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল

১৯৩৪ সালে বিখ্যাত কুরী-দম্পতীর কন্যা আইরিন ও তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক আবিষ্কার করেন যে সাধারণতঃ স্থায়ী কোনো মৌলকে আলফা কণার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় করা যেতে পারে। এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা অন্যান্য মৌলকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এর পর দু'টো আবিষ্কার এই গবেষণাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেল। প্রথম আবিষ্কার হোলো লরেন্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্র, যার সাহায্যে কোনো তড়িৎযুক্ত কণাকে অনেক বেশী বেগবান করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হোলো, চ্যাডউইকের নিউট্রন নামে তড়িৎহীন কণার আবিষ্কার। চ্যাডউইকের এই নিউট্রন আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞানে একটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, কারণ এই নিউট্রন তড়িৎহীন বলে স্বচ্ছন্দে কেন্দ্রিকে ঢুকতে পারে এবং এই নিউট্রন পেতে দরকার কিছু বেরিলিয়াম ধাতু আর কিছু রেডিয়াম। এই রেডিয়াম থেকে আলফা কণা আপনা থেকে বেরিয়ে সোজা আঘাত করে বেরিলিয়াম পরমাণুকে আর এই আঘাতের ফলে বেরিয়ে আসে নিউট্রন বেরিলিয়াম থেকে। পরমাণু-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণায় ইটালীর বিজ্ঞানী ফার্মি ও তাঁর কয়েক জন সহকর্মীর নাম প্রথমে করা উচিত। তাঁরা এই নিউট্রন কণাকে সাইক্লোট্রনের দ্রুতগামী করে বিভিন্ন পরমাণুকে আঘাত করে পরমাণু রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন এবং এর ফলেই ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমরা আগেই যে কোনো ভারী মৌলের স্থায়ী পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে পরমাণুটি ঐ নিউট্রনটি টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় একটা ইলেকট্রন, ফলে পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পরমাণুটি রূপান্তরিত হয় পরবর্ত্তী পরমাণুতে আর এমনি করে টেকনিটিয়াম তৈরী করা সম্ভব হয়েছে মলিবডিনাম থেকে। এ দেশে বিজ্ঞানীরা মনে করলেন, এই উপায় অবলম্বনে ২৩৮ ওজনের ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে পরমাণু থেকে বিটা কণা অর্থাৎ ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে তৈরী হবে ইউরেনিয়ামোত্তর তিরানব্বই নম্বরের মৌল নেপচুনিয়াম। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা পেলেন একটা বিরাট অপ্রত্যাশিত আঘাত। কারণ দেখা গেল, নিউট্রন বুলেটের আঘাতের ফলে পরমাণু ভেঙে গিয়ে ছাড়তে আরম্ভ করে শক্তি এবং এই ভাবেই সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে জানা গেল পরমাণুর ভাঙন। এখানে যেমন ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল খুঁজতে গিয়ে জানা গেল তেজস্ক্রিয় মৌলের ভাঙন, তেমনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের E. M. MacMillan ও তাঁহার কয়েকটি সহকর্মী পরমাণু ভাঙন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পেলেন ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল নেপচুনিয়াম, তেমনি আকস্মিক ভাবে। নেপচুনিয়ামের এই আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত সমস্থানিকটি খুবই স্বল্পস্থায়ী। সেই জন্যে ১৯৪২ সালে A. C. Wahl ও Seaborg ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘস্থায়ী নেপচুনিয়াম

সমস্থানিক তৈরী করতে চেষ্টা করেন এবং পরে সক্ষম হন প্রস্তুত করতে। তার পর নেপচুনিয়ামের গুণাগুণ নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেল, সারণীতে স্থানলব্ধি ঐ সারির আবার মৌল রিনিয়ামের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই বরং আছে ইউরেনিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় মৌলের সঙ্গে।

মৌল ৯৪

কৃত্রিম উপায়ে তিরানব্বই নম্বরের মৌল নেপচুনিয়ামের আবিষ্কারের পরেই বিজ্ঞানী-মহলে ৯৪ নম্বরের মৌল আবিষ্কারে সাড়া পড়ে গেল। MacMillan ও Abelsonএর গবেষণা থেকে জানা গেল যে, ২৩৯ ওজনের নেপচুনের বিটা কণা অর্থাৎ ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ভাঙতে থাকে। এখন এই ইলেকট্রন আসে কেন্দ্রিকের নিউট্রন থেকে। সুতরাং একটা নিউট্রন থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পড়ে থাকে একটা প্রোটন এবং সেই জন্যে নেপচুনিয়ামের পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় চুরানব্বই। কিন্তু নেপচুনিয়ামে এত হারে ভাঙন হয় যে, তা দিয়ে পরীক্ষা সম্ভব নয়। তখন ১৯৪০ সালের শেষাশেষি কোনো সময়ে Seaborg, MacMillan, J. W. Kennedy এবং A. C. Wahl প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ৯৪ মৌল তৈরী করতে চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। তাঁরা তখন ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভারী হাইড্রোজেন ডিউটেরিয়ামের কেন্দ্রিক ডিউটেরন দিয়ে আঘাত করে প্লুটোনিয়ামের আর এক সমস্থানিক তৈরী করেন। কিন্তু প্লুটোনিয়ামের এই সমস্থানিক, যার ওজন ২৩৮ এত স্বল্পস্থায়ী যে পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, ২৩৯ ওজনের প্লুটোনিয়াম অনেক বেশী স্থায়ী। ক্রমে ১৯৪২ সালে B B Cunningham ও L B Werner শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতব রসায়ন গবেষণাগারে সামান্য পরিমাণে এই স্থায়ী প্লুটোনিয়াম তৈরী করতে সক্ষম হন। তার পর হানফোর্ডে বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিমাণে প্লুটোনিয়াম তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবে প্রকৃতির ক্ষমতার বাইরের মৌলকে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করেন বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে।

প্লুটোনিয়ামোত্তর মৌল

কৃত্রিম নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, সাইক্লোট্রন, আর নিউট্রন বিজ্ঞানীদের প্লুটোনিয়ামোত্তর মৌল তৈরী করতে অনুপ্রাণিত করে। যেমন সাইক্লোট্রনের সাহায্যে নিউট্রন জাতীয় কণাকে দ্রুতগামী করে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে কৃত্রিম নেপচুনিয়াম প্লুটোনিয়াম তৈরী সম্ভব হয়েছে, তেমনি ৯৫ নম্বরের মৌল অ্যামেরিকাম ও ৯৬ মৌল কুরিয়াম তৈরী সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে আলফা কণাকে আরো দ্রুতগামী করে প্লুটোনিয়ামকে আঘাত করে R. A. James ও L. O. Morgan তৈরী করেন কুরিয়াম এবং এই কুরিয়াম, ৯৫ মৌল অ্যামেরিকামের আগেই তৈরী হয়। এর পর Seaborg, James ও A. Ghioroso প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ৯৫ মৌল তৈরী করতে প্রথমে তৈরী করেন ২৪১ ওজনের প্লুটোনিয়াম এবং এই ৯৪ মৌল প্লুটোনিয়াম পরমাণুর নিউট্রন থেকে একটা বিটা কণা বেরিয়ে গেলে তৈরী হয় ৯৫ মৌল অ্যামেরিকাম।

আজ থেকে বছর পাঁচ-ছয় আগে এই মৌল দু'টি এমনি করে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে আরো একটি নতুন মৌল জন্ম নিল বিজ্ঞানীদের কৌতুহলের ফলে। এর জন্মভূমি বার্কলের নাম অনুসারে এই ৯৭ মৌলের নাম দেওয়া হোলো বার্কেলিয়াম। এই বার্কেলিয়াম তৈরী হোলো সাইক্লোট্রনের সাহায্যে দ্রুতগামী আলফা কণা দিয়ে অ্যামেরিকামকে আঘাত করে।

সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, আরো নতুন মৌল তৈরী করার সম্ভাবনা মোটেই ফুরিয়ে যায়নি। তবে এটা ঠিক যে ইউরোনিয়ামোত্তর মৌল তৈরী করা ক্রমাগত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হয়তো ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসবে যখন কোনো উপায়েই আর নতুন মৌল তৈরী করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এর ভবিষ্যৎ আজ কিছুতেই সঠিক ভাবে বলা যেতে পারে না। বিজ্ঞানীদের এই নতুন নতুন মৌল আবিষ্কারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও কৌতুহল দেখে হয়তো অনেকের মনে পড়বে সেই ব্যাঙ-নাচানো অধ্যাপক গ্যালভানির কথা। দুটো ভিন্ন ধাতুর তার একটা মরা ব্যাঙের গায়ে ঠেকাতে ব্যাঙটা লাফিয়ে উঠলো দেখে তখন অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করার সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলো—ব্যাঙটা না হয় নাচলো কিন্তু কি লাভ হোলো তাতে? পরে দেখা গেছে, গ্যালভানির সেই কৌতুহল থেকেই জন্ম নিলো আজকের এই বিদ্যুৎ। তেমনি পরমাণুবিদদের নতুন নতুন মৌল তৈরী করতে দেখে আজকে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করবে—কি লাভ এতে! কিন্তু হয়তো এমন সময় আসবে যখন মনে হবে, বিজ্ঞানীদের আজকের এই কৌতুহল ভবিষ্যতের কোনো নতুন আশার প্রথম সোপান।

"জ্ঞানসমূহের মধ্যে দুইটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। সম্মুখে যে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আমার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি বিসদৃশ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা; এবং এই কুকুর দেখায় ও ঐ কুকুর দেখায় অন্য কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা মাত্র পার্থক্য অনুভব করিতেছি; সম্মুখে কুকুর দেখিবার সময় আর যাহা যাহা দেখিতেছি, পার্শ্বে দেখিবার সময় সেই সেই বস্তু দেখিতেছি না। সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ।"

—জিজ্ঞাসা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের বাণী

স্বামী সিদ্ধানন্দ

ঈশ্বর

মূলকে ধরে থাক। তিনিই সব করাচ্ছেন। ইষ্টই হচ্ছেন সেই মূল। তিনিই পরম গুরু—ভগবান। শ্রীগুরু সেই মূলকে ধরিয়ে দেন।

ভগবান অন্তর্যামী। তাঁকে অন্তর থেকে প্রাণ ভরে ডাকতে হয়। তবে তাঁর কৃপা হয় ও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। বাইরের ভেক নিলেই হয় না। ভগবান খাঁটি; অন্তর খাঁটি না হলে তাঁকে লাভ করা যায় না। মনের গলদ যতই ধুয়ে-মুছে যাবে, তাঁর কৃপা ততই প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে।

ভগবানকে কেউ 'অধর' মানুষ বলে থাকে, কথাটা ঠিক। তিনি দয়া করে ধরা না দিলে কেউ কি তাঁকে ধরতে বা চিনতে পারে? ত্যাগী ভক্তের নিকট তিনি আপনি এসে ধরা দেন। এমনি ত্যাগের আদর ও মহিমা। ভগবান ভক্তি-ডোরে বাঁধা। এই জন্যেই তো বলে—ভক্তের ভগবান। ভক্তের শুদ্ধ চিত্তে তিনি নিজে নিজেই প্রকাশিত হন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। যার ত্যাগ নেই, সংযম নেই, সাধন-ভজন নেই—এমন সাধন-সম্বল-হীন লোক কী ভেট্ নিয়ে সেই রাজরাজেশ্বরের দরবারে পৌঁছবে?

ভগবানকে ঠিক ঠিক চাইলে তিনিই তাঁকে পাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেন। সাধকের যখন যা দরকার, তিনিই সব জুটিয়ে দেন। তাঁকে ধরে থাকলে সাধুসঙ্গ, কৃপা—এ সব সবই হবে। তবে তিনি বাজিয়ে নেন, মেকি হলে চলবে না। ঠিক ঠিক অনুরাগ হয়েছে কি না তিনি দেখে নেন।

ভগবান জীবকে দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে তাঁরই দিকে নিয়ে চলেছেন—জীব বুঝুক আর না বুঝুক। ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্ষুদ্র মানুষ বুঝবে কি করে? যাঁরা ঠিক ঠিক সাধু তাঁরাই তাঁর মহিমা জানেন। এই জন্যই তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন ক'রে বসে থাকেন।

তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলা করছেন। তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময়, দয়াময়—তিনি সবই। তাঁর নাম অনন্ত, তাঁর লীলা অনন্ত, তাঁর ভাবও অনন্ত। তিনি অনন্ত ভাবময়। সামান্য জীব তাঁর অনন্ত ব্যাপারের কতটুকু বুঝবে?

ভগবানের শরণ নিয়ে থাক। তাঁর চরণে একান্ত নির্ভর করে পড়ে থাকলে তবেই তিনি এই মায়ার হাত থেকে ত্রাণ করেন। নইলে কিছুতেই বাঁচোয়া নেই; সকলকেই বিষম নাকানি-চোপানি খেতে হয়। তাঁর শরণাগত হও। তাঁর চরণে নিজেকে বিকিয়ে দাও। 'আমি' বা 'অহং' ভাব থাকলে তাঁর দরজা খোলে না। 'আমি' মরলে তিনি হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন।

ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম

ভগবানকে পেতে হলে যেমন করেই হোক্ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। বীর্য্য ধারণ না করলে দেহ-মন কিছুতেই শুদ্ধ হতে পারে না। নিত্যশুদ্ধ ভগবানকে ধারণা করবে কি করে? সংযমী না হলে মানুষের কোনো সদ্‌বৃত্তিরই বিকাশ হয় না। সে পশুর চেয়েও অধম হয়ে হয়ে পড়ে। কোনো বড় কাজ তার দ্বারা হতে পারে না। এখনি এক কথা বলছে কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই লোভে পড়ে অন্য কাজ করছে। যে ব্যক্তি সৎ হবে তার ব্রহ্মচর্য্য থাকা চাই-ই—অন্য কিছু থাক আর না থাক্। রিপুকে জয় না করতে পারলে কিছুই হবার যো (উপায়) নেই।

সাধু হওয়া কি চারটি কথা? কতো প্রলোভন আসে এবং সংস্কারে বাধা দেয়। সব অবস্থাতেই অবিচলিত থেকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম না থাকলে প্রলোভন প্রলুব্ধ করে সাধককে বাধা দেয়। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হলে সেই অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম থাকলে সাধককে কোনো অবস্থাতেই তারা সহজে প্রলুব্ধ করতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্ম-সাধনার মূল। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবান হতে হবে। তবেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আপনা-আপনি প্রকাশিত হতে থাকবে। তখন সাধক বুঝতে পারবে ধর্ম্ম কী জিনিষ।

পবিত্র হও—পবিত্র হও। ভক্তের সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ ও নিয়মিত ধ্যান-জপে সংযম আসে।

পবিত্রতাই ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি। শাস্ত্র বলেছেন—শৌচ অর্থাৎ অন্তরে-বাহিরে শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধ না হলে ধর্ম্মের তেজ ও আনন্দ ধারণ করা যায় না। কলির জীবের ব্রহ্মচর্য্য নেই বলে ধর্ম্মভাব বুঝতে পারে না। নইলে ধর্ম বুঝবার ও বোঝাবার জন্য এত মিটিং আর বক্তৃতার দরকার হত না। ধর্ম্ম হচ্ছে স্বয়ং-প্রকাশ।

ভোগ-বাসনাকে গোড়া থেকেই দাবিয়ে দিতে হয়। রিপু-জনিত ভোগ-বাসনার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই নেই। একটু সংযমের অভাব হ'লে এরা প্রশ্রয় পেয়ে অলক্ষ্যে প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং সাধককে সাধন-মার্গ হতে নামিয়ে দিতে চায়। তখন আবার সে অবস্থা ফিরে পেতে গেলে চার গুণ খাটতে হয়। সেই জন্য কামভাব উঠবার আগেই তাকে বিবেক ও মনের জোরে নিরোধ করে দিতে হয়। তা হলে ক্রমে ক্রমে প্রবল শক্তি আসে এবং সাধকের বড় একটা পতনের ভয় থাকে না। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে সাধকের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা উচিত। তাই বলছি—সাধু সাবধান!

ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সৎসঙ্গ কর্। তার পর যদি কিছু না বুঝতে পারিস্, তবে আমাকে বলবি। সাধুসঙ্গ যে কী, তখন প্রাণে-প্রাণে বুঝতে পারবি এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবি। ব্রহ্মচর্য্য নেই, সংযম নেই, শুধু ঘুরে-ঘুরে আর সাধু-সন্ন্যাসীদের বকিয়ে কী হবে? যতই সাধুদের কাছে আসা-যাওয়া কর্ না কেন, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম জীবনে না থাকলে কিছুই হবার যো নেই।

শাস্ত্রপাঠ

ভাগবত পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা—শুধু শুনলেই কি হয়? সেই কথা মত কিছু-কিছু জীবনে অভ্যাসও করতে হয়। তাহলে কল্যাণ হয় কি না বুঝতে পারবে। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) বলতেন:—"শাস্ত্র আমায় কৃপা করে।" তিনি সব সময় সাধনের ওপর থাকতেন বলে এ সব তাঁর সব সময়েই উপলব্ধি হত।

গীতা অন্য কাউকে শুনাচ্ছি—এমন মনে করে পাঠ করবে না। ভগবানের কথা তাঁকেই শুনাচ্ছি—এই ভাব নিয়ে পাঠ করলে, মনে শুদ্ধি-অশুদ্ধির জন্য কোনও সঙ্কোচ বোধ হবে না।

বরং তাঁর কথা তাঁকেই শুনাচ্ছি, এই ভাব মনে উদয় হয়ে হৃদয় আনন্দে ভরে যাবে। এই ভাব নিয়ে চণ্ডী বা অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করলেও কল্যাণ হবে।

অনেক লোক মান, যশ বা বাহবা পাবার জন্য গীতা, চণ্ডী এ সব পাঠ করে। আবার কেউ-কেউ পরের কল্যাণের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও চণ্ডীপাঠ করে থাকে। এরূপ স্বস্ত্যয়নকারীর অকল্যাণ হয়। তার দৈন্য-দারিদ্র্য কোনো দিনই ঘুচে না। অমন করার চেয়ে ভগবানের কাছে ভক্তি-কামনা ক'রে গীতা বা চণ্ডী পাঠ করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর দয়ায় সব অভীষ্ট পূরণ হয়ে যায়।

গীতা, ভাগবত লোককে শুনাচ্ছি এই ভাব মনে আনা খুব খারাপ। শ্রীভগবানকে শুনাচ্ছি এই ভাব নিয়ে সে সব পাঠ করলে কর্ম্মক্ষয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার অভিমানও নাশ হতে থাকে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা করবে তাতেই অহং ভাব নাশ হবে এবং চিত্ত শুদ্ধ হবে।

সদ্গুরু

সদ্গুরুর আশ্রয় পেলেই ঠিক ঠিক গতি হয় যদি কায়মনোবাক্যে তাঁর আদেশ মেনে চলা যায়। গুরুবাক্যই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। যার গুরুর উপর ভক্তি-বিশ্বাস আছে তার ষোল আনা ধর্ম্ম হয়। গুরুকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জ্ঞান করবে। ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলতেন স্বয়ং ঈশ্বরই কৃপা ক'রে সদ্গুরুরূপে আসেন। সদগুরু ভগবানের করুণাঘন মূর্ত্তি। তাঁর দয়া অসীম—অফুরন্ত। কোন কিছুরই দ্বারা তা মাপ করা যায় না। এই সব শাস্ত্র কেবল গুরুর কথাই বলছে।

শ্রীগুরুর প্রতি যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তার অনিষ্ট হওয়ার কোনও যো নেই। ভগবান্ তাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। গুরুনিষ্ঠা হলে ঈশ্বর কী জিনিষ তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হতে থাকে।

গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা হলে তাঁর গুণ ও শক্তি শিষ্যের ভেতর সঞ্চারিত হতে থাকে। তখন শিষ্যের জীবন বদলে যায়। সে ভগবৎ আনন্দের অধিকারী হয় ও শান্তিলাভ করে।

সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করলে তবে ঠিক পথে গতি হয়। তখন তার পথ খোলা—এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তার আগে তার যত, সব কর্ম্মক্ষয়।

গুরুসেবা কি কম ভাগ্যের কথা? গুরুসেবায় অসম্ভব সম্ভব হয়। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকলে কোন কিছুরই দরকার হয় না। আপ্‌সে (নিজে নিজে) সব হয়ে যায়! এমনি সদ্গুরুর মহিমা!

গুরুর সঙ্গ না করলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। তাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। আবার কারো-কারো বেশী দিন গুরুর সঙ্গ ক'রে তাঁর প্রতি সংশয় ও সন্দেহ আসে। যখন সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস—এ সব আসবে তখন বরং একটু তফাতে গিয়ে থাকবে এবং খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর ভাল গুণ সব ভাববে ও ধ্যান করবে। তাহ'লে ও-সব চলে যাবে এবং পরে তাঁর সঙ্গে থাকলে অনিষ্ট হবে না—কল্যাণই হবে। গুরুতে কখনো মানুষ-বুদ্ধি আনবে না। সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে তিনি তোমায় কৃপা করেছেন জানবে।

দেখ্, সদ্গুরুর কৃপা পেয়ে আর দেরী করিস্ নে। তাহ'লে ঠক্‌বি। তাঁর কাছে ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কিছু নেই। তিনি যা দয়া ক'রে দিয়েছেন, তাই সব। তার চেয়ে বেশী আর কেউ দিতে পারে না—অবতারও না। দেখছিস্ না গুরু-মহিমা বোঝবার জন্য অবতার-পুরুষরাও গুরুকরণ করেছেন। এতো দেখেও মানুষের চৈতন্য হয় না—সব কর্ম্মফল।*

---

* শ্রীমৎ লাটু মহারাজের একনিষ্ঠ সেবক স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ সংগৃহীত তথ্যাবলী অবলম্বনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও লিখিত। কার্ত্তিক মাসের বাণীগুলিও ইঁহারই সঙ্কলিত ও লিখিত।

টাকার অপর দিক

"টাকা দিয়ে তাদের সব ঠাণ্ডা করতে হয়। টাকা থাকলে অর্দ্ধেক জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, টাকা থাকলে সাধু-সেবা গুরু-সেবা, তীর্থ দর্শনাদি হয়। পুরুষদের কি দোষ নেই? কেন তারা সাধুসঙ্গ, নির্জ্জনবাস করে না? মাখন তুলে মুখে ধরলেও খেতে চায় না? দশ বছরের বেদান্ত পড়ার কাজ ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। দশ বছর বেদান্ত পড়ে যে সব জিনিষ বোঝা যায় না, ঠাকুরের কথা চিন্তা করলে সে সব সোজা হয়ে যায়। অনায়াসে বোঝা যায়।"

—শ্রীম

তরুলতার ঘর—একা-একা শুইয়া আছে, চোখে ঘুম নাই, মুখে দুশ্চিন্তা।

অনিমার ঘর—রাত্রি ১২টা বাজিল ; অনিমা, ঝি ও ঠাকুর।

অনিমা। বাবুর ঘরে বাবুর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি বাড়ী চলে যাও।

ঠাকুর। যে আজ্ঞে মা।

[প্রস্থান।

ঝি। আমি আজ আর বাড়ী যাব না বৌঠাকরুণ, রাত্তির দুপুর বেজে গেল, এখনো বাবু এলেন না, আপনি ছেলে মানুষ!

অনিমা। আচ্ছা, তুমি ভাঁড়ার ঘরের পাশে ছোট ঘরটায় শুয়ে থাকো।

Dinner table,

অভয়। (গেলাস দিয়া) তুমি না খেলে আমি খাবই না।

রতন। তরু বড় রাগ করবে।

অভয়। আর তোমার বোন বুঝি আমার গলায় জয়মাল্য দেবে। স্ত্রীগুলো সব একই ধরণের (রতন মদ্যপান করিল)। That's like a good boy.

রতন। But অভয়, you are really a genious. কি করে জানলে ওই ঘোড়া উঠবে?

অভয়। আছে আছে—সব বিদ্যে এক দিনে শিখে নেবে না কি? কিছু দিন সাকরেদি কর।

রতন। রাত্রি—

অভয়। একগাদা টাকা নিয়ে বসে আছ। আর স্ত্রীকে বাঁয়ে বসিয়ে মোটর গাড়ীতে হাওয়া খাচ্ছ।

রতন। তুমি যা করতে বলবে আমি তাতেই টাকা invest করবো। Really I want to do something.

অভয়। You have money, I have brains, let us go in hands. Share-market is the place for you.

(গভীর রাত্রে তরুলতা ও রতন)

তরুলতা। তুমি মদ খেয়েছ!

রতন। তুমি এখনো জেগে আছ তরু?

তরুলতা। আমার কথায় উত্তর দিলে না?

রতন। কুটুম্ব, ওর জন্যে আজ টাকাটা পাওয়া গেল, ছাড়লো না—কি করি বলো।

তরুলতা। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর অভয় বাবুর সঙ্গে কখনো মিশবে না।

রতন। অভয় তো খারাপ লোক নয়। অল্প একটু drink করে। আজকের দিনে ও-রকম একটু-আধটু সবাই খায়। মাতাল বলা চলে না। তোমায় অভয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, আমায় বললে।

তরুলতা। কি বললে তোমায়?

রতন। বললে—রতন, তোমার টাকা-কড়ি ধন-সম্পত্তি যা কিছু আছে তার চেয়েও তোমার স্ত্রীর মূল্য অনেক বেশী, ও-রকম স্ত্রী পেলে লোকে কুঁড়ে ঘরে সুখী হয়।

তরুলতা। আমি বেশী কিছু বলতে চাই নে। আমার অনুরোধ, তুমি অভয়কে এড়িয়ে চলো।

(অপ্রকাশিত)

৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

(অনিমার ঘর—অভয় ও অনিমা)

অভয়। কোথায় ছিলাম, এত রাত কেন হল, জানতে চাইলে না যে?

অনিমা। আমি জানি। দাদার ওখানে গিয়েছিলে শ্রীমতী তরুলতাকে দেখতে।

অভয়। তরুলতা তোমায় phone করেছিল না কি?

অনিমা। তুমি কি করো, কোথায় যাও, কি ভাব, সব আমি জানি, আমার অন্তর্যামী জানিয়ে দেন।

(Music, The march of time.)

[সময় চলিয়াছে। রতনের টাকাও মুক্ত পাখীর মতো Race course, Share market এবং বিলাতী মদের দোকান—এই ত্রিধারায় ছুটিয়াছে।]

(তরুলতার ঘর—তরুলতা ও নলিনাক্ষ)

তরুলতা। (নলিনাক্ষের পায়ের ধুলা লইয়া) এত দিনে ছোট বোনের কথা মনে পড়েছে। বৌদি কেমন আছেন দাদা?

নলিনাক্ষ। তোমার বৌদি তো ভাল আছেন। কিন্তু তোমায় তো বড় ভাল দেখছি নে বোন?

তরুলতা। আমি ঠিক আছি দাদা।

নলিনাক্ষ। হ্যাঁ রে, রতন না কি অভয়ের সঙ্গে মিশে Share marketএ Raceএ বিস্তর টাকা নষ্ট করেছে—মদ খেতে শিখেছে?

তরুলতা। (মৃদু হাসিল)

সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী,
মরণেরে বাজায়ে কিঙ্কিণী।

(এমন সময় রতন আসিল—শুষ্ক কেশ, শুষ্ক বেশ। নলিনাক্ষ ডাকিলেন—রতন। রতন আসিয়া পায়ের ধুলা লইল)

নলিনাক্ষ। আমি সব শুনেছি। দাদা মশায়ের টাকা তোমার সহ্য হল না। যদি রক্ষা পেতে চাও একমাত্র উপায় ছোট কাজ, Nothing but manual labour can save your soul.

রতন। Sir, এ সব speculationএর ব্যাপার, আপনি ঠিক বুঝবেন না। এক সময় ভাঁটার টানের মতো সব চলে যায়। আবার জোয়ারের সময় দশ গুণ আসে। Big financeএর ব্যাপারই আলাদা।

নলিনাক্ষ। Rubbish.

অনিমার বাড়ী

(অনিমা, অনিমার বাবা হরেন্দ্র বাবু ও মা মহামায়া দেবী মেয়েকে দেখিতে আসিয়াছেন)

অভয়। আপনারা কিছু দিন নিয়ে যেতে চান—নিয়ে যান না, আমি এক রকম চালিয়ে নেব।

মহামায়া। আমরা নিয়ে যেতে চাইলে কি হবে বাবা। অনিমা যে তোমাকে ছেড়ে যেতে চায় না। বলে দিন-রাত কাজ-কর্ম্মে ঘুরে বেড়ান, আমি না থাকলে সময় মতো নাওয়া-খাওয়া হবে না।

হরেন। তার পর তোমার কাজ-কর্ম্ম যুদ্ধের বাজারে কেমন চলছে?

অভয়। Marketএর অবস্থা ভাল নয়। তবে আমার মায়ের কৃপায় এক রকম ভালই হচ্ছে। কাজ প্রায় দশ গুণ বেড়ে গেছে। আমি ভাবছি নিজে firm করবো।

হরেন। আমাদের রতনটা শুনলুম বড় বকে গেছে। Raceএ টাকা ওড়াচ্ছে Share marketএ ওড়াচ্ছে। শুনলাম মদও ধরেছে।

অভয়। আমি এত চেষ্টা করি—কারো কথা কানে তোলে না। ও বড়লোক, ওর কথা ছেড়ে দিন।

হরেন। না, আর বেশী বড়লোক নেই। শুনলুম fixed depositএর সব টাকা শেষ করেছে। খান পাঁচেক বাড়ী গেছে, দু'খানা বাড়ী ভাড়ার টাকায় এখন সংসার চলে, ওর বৌটা বড় অপয়া।

মহামায়া। বৌয়ের নাম আর কোরো না, কানা-ঘুসো যা শুনি তাতে তার মুখ দেখতে প্রবৃত্তি হয় না।

হরেন। তুমি খুব নিষ্ঠাবান হিন্দু শুনেছি। জপ-তপ খুব কর।

অভয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, আমাদের তন্ত্র-তান্ত্রিক নিষ্ঠার সঙ্গে করলে ঠিক ফল পাওয়া যায়। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

রতনের বাড়ী—তরুলতা একা।

(নেপথ্যে অভয়ের কণ্ঠস্বর—রতন, রতন আছ।)

তরুলতা। (ঘর হইতে বাহির হইয়া) ভেতরে আসুন, উনি বাড়ী নেই।

অভয়। (হাত যোড় করিয়া) আজ আমার কি সৌভাগ্য, তুমি আমায় ডেকেছ।

তরুলতা। থাক ও-কথা। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে?

অভয়। আমার সত্যি মনোবাঞ্ছা কি জান?

তরুলতা। আমি বিবাহিতা স্ত্রী, আমার স্বামীর ঘরে বসে এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না।

অভয়। You are a modern society lady.

তরুলতা। Modern lady সম্বন্ধে আপনার এই ধারণা?

অভয়। তুমি এক দিন আমায় ভালবেসেছিলে। তুমিই সাহস দিয়েছিলে, তার প্রমাণ এখনো আমার কাছে আছে। অতি যত্নে তুলে রেখেছি, এই দেখ। (চিঠি দেখাইল)

তরুলতা। তুমি আমার সঙ্গে পাগলের মতো ব্যবহার করেছিলে, তোমায় ক্ষ্যাপাবার জন্যে তোমায় প্রথম চিঠি লিখি।

অভয়। তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। আমি সত্যই পাগল হয়েছিলাম। আমি এখনো পাগল।

তরুলতা। সে চিঠি লেখার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার সামনে চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলো। টাকার শোকে আমার স্বামী পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ সময়ে যদি ঘুণাক্ষরে এ চিঠির কথা জানতে পারেন—

অভয়। এই চিঠি আমার শেষ অস্ত্র।

(রতন হঠাৎ আসিল)

রতন। কি, ব্যাপার কি?

অভয়। শ্রীমতী তরুলতা দেবীকে একটা mag দেখাচ্ছিলাম।

রতন। You are a magician.

(এই প্রথম অভয় ও তরুলতাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখিল)

অভয়। চল, চল, শীগ্‌গির আফিসে চল। মাথা ঠাণ্ডা কর ভায়া—মাথা ঠাণ্ডা কর। এসব big financeএর গতি ঠিক cyclic orderএ চলে, যখন টাকা আসে বর্ষার জলের মতো মাথা টাকা বৃষ্টি হয়, আবার যখন চলে যায় কোথাও আর কিছু থাকে না মাস খানেক তোমার এই crisisটা চলবে; শুধু যদি stick করে থাকতে পার, যা গেছে তিন মাসের মধ্যে চার গুণ ফিরে আসবে।

(স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি চাহিল। দু'জনেই গম্ভীর, দু'জনেরই জীবন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর বাঁচিবার সাধ নাই)

Share market, Crowd.

(অভয় ও রতন গাড়ী হইতে নামিল।—"আইয়ে বাবুজি, আইয়ে বাবুজী" বলিয়া এক দল মড়োয়ারী অভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।)

অভয়। আপিসে চল।

Office.

(অভয়, অভয়ের partner হরদৎ সিং গোয়েঙ্কা)

হরদৎ সিং। অভয় বাবু, আপনি রোতন বাবুকে আর share দিবেন না।

অভয়। এখন কাজ বন্ধ হলে উনি recover করবেন কি করে?

হরদৎ সিং। যে সব share উনি লিয়েছেন তার দরুণ অনেক টাকা ওঁকে pay করতে হবে।

অভয়। But without further speculations he can't get anything. যে সব share কেনা আছে সেগুলোর দাম দিন-দিন পড়ে যাচ্ছে।

হরদৎ সিং। রোতন বাবু, আপনি আমার পরামর্শ লিন, আর risk করবেন না।

অভয়। এখন যদি উনি risk না করেন, he will be ruined.

হরদৎ সিং। He already is a ruined man. I am afraid.

অভয়। কেন, এখনো ওঁর দু'খানা ভাড়াটে বাড়ী আছে, বসত বাড়ীখানার দাম অন্ততঃ পক্ষে লাখ টাকা।

হরদৎ সিং। রোতন বাবু, ভগবানের কৃপায় আপনি এখনও রক্ষা পেতে পারেন। Share marketএ আসবেন না, Race courseএ যাবেন না। You are too good for all these things.

অভয়। রতন, তুমি ভয় পেও না ভাই। এখন কিছুতেই ছাড়া চলে না, এখন ছাড়লে সব গেল, একবার একটু ভাল নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরদৎ সিং। আপনি ভাল পরামর্শ দিচ্ছেন না অভয় বাবু! আমি এ firm থেকে ওঁকে আর share দেব না।

অভয়। আপনারা ওঁকে অসময়ে ত্যাগ করতে পারেন আমি পারি নে। Well I shall find another firm for him.

(অন্য ঘর—Refreshment room)

রতন। বাড়ীর দলিল mortgage রাখতে হবে?

অভয়। সে কিছু না, কিছু না। তুমি তো বাড়ী mortgage দিচ্ছ না। শুধু দলিলগুলো তোমার Iron safeএ না রেখে officeএর Iron safeএ থাকবে। তার পর share বিক্রী হলে তুমি দলিল নিয়ে যাবে, টাকাও নিয়ে যাবে।

রতন। মাথাটা কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে—তুমি আমায় একটু whisky খাওয়াতে পারো?

অভয়। Certainly! এই তো whisky খাবার সময়—। বয়! দু'টো পুরো peg whisky.

(বয় whisky লইয়া আসিল,—রতন উপরি-উপরি দুই peg whisky খাইল।)

অভয়। আমার জন্যে একটু রাখলে না, brother!

(রতন অভয়ের দিকে চাহিল।)

রতন। লাখ টাকার share বেচবে?

অভয়। যে share তোমায় দেব তার দাম এক সপ্তাহ পরে দশ লাখ টাকা হবে। You will recover every farthing you lost.

রতন। আজই transaction শেষ করবো। চল—বাড়ী চল, দলিল তোমার হাতে দেব।

নলিনাক্ষের ঘর।

(নলিনাক্ষ ও সরোজিনী)

নলিনাক্ষ। বরাত মানতেই হবে, কি বল?

সরোজিনী। লোকে তো মানে।

নলিনাক্ষ। এত টাকা—এত ঐশ্বর্য্য, তিন বছর যেতে না যেতে সব ফাঁক!

সরোজিনী। কি রকম দেখলে রতনকে?

নলিনাক্ষ। High fever delirium বড্ড shock পেয়েছে তো, তবে ডাক্তার বললে, জীবনের আশঙ্কা নেই।

সরোজিনী। আমি তখন বকতুম—তুমি রাগ করতে, তোমার বোনটি বড় অপয়া। বাপের অমন সম্পত্তি ওর দেখতায় সব গেল! তার পর স্বামীর ঘরে গিয়ে তিন বছরের ভেতর অত টাকা-কড়ি বাড়ী-বাগান-গাড়ী সব উড়ে-পুড়ে গেল। ও যেখানে যায় সেখানে আর কিছু থাকে না।

নলিনাক্ষ। যদিও তোমার কথায় কোন যুক্তি কিছু নেই তবু অস্বীকার করতে পাচ্ছি না। রোগী স্বামীকে নিয়ে বসে আছে, দু'দিন স্নান করেনি কিছু খায়নি, তবু দেহ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে, এ সময় যদি তাকে দেখতে—অভাগীকে অপয়া বলতে সাহস করতে না।

তরুলতার ঘর।

(তরুলতা স্বামীর শিয়রে বসিয়া আছে। রাত্রি এক প্রহর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাহিরে এক জন বৈরাগী গান গাহিতেছিল।)

গানের দুই পদ ঘরে শোনা গেল—

"হরি তুমি দুখ দাও যে জনারে।
তার কেউ দেখে না মুখ—ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ
দুখের উপর দুখ সুখ নাহি মিলে এ-সংসারে।

(পথ বাহিয়া বৈরাগী চলিয়াছে)

তার জলে বাস করলে ঘরে ধরে আগুন
পুড়ে কোঠা বাড়ী ছোটে টালী চুণ
যার ভাগ্যে যখন লাগে রে আগুন
তার লোহার কড়িতে ঘুণ ধরে।

(গান শুনিয়া তরুলতার মুখ মৃদু হাস্যে উদ্ভাষিত হইল)

(অভয় প্রবেশ করিল)

অভয়। কেমন আছে রতন।

রতন। কে? অভয়! দশ লাখ টাকা পাওয়া গেছে?

তরুলতা। (অভয়কে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল)

অভয়। (তরুলতাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল)

(তরুলতা রতনকে ঘুম পাড়াইয়া ধীরে ধীরে উঠিল)

পাশের কক্ষ—অভয় ও তরুলতা।

তরুলতা। কি খবর?

অভয়। অত্যন্ত খারাপ খবর।

তরুলতা। আমি জানি বাড়ীখানা গেল তো?

অভয়। শুধু বাড়ীতে সমস্ত টাকা cover করবে না।

তরুলতা। আমার গহনা ক'খানা দিতে হবে?

অভয়। না, না, গহনা দিতে হবে না।

তরুলতা। নিশ্চয়ই দিতে হবে, কাল সকালে দিলে চলবে?

অভয়। তাড়াতাড়ি কিছু নেই, রতন সেরে উঠুক।

তরুলতা। উনি সেরে উঠবেন।

অনিমার ঘর।

(বহু কাল পরে অনিমা গান গাহিতেছে)

বল কোন পারেতে নামিয়ে দেবে মোরে ওরে আমার নেয়ে
আমার সারাটি দিন কেটে গেল নদীর এপার-ওপার চেয়ে—
ছাড়িয়ে এলাম গ্রাম, লোকালয়-দেব-মন্দির-মঠ।
ডাইনে-বাঁয়ে দু'ধারেতে সবুজ তৃণ-তট।
আকাশ-ভরা তারার আলো দেখে আমার চোখ জুড়াল
পাল তুলে ওই আসছে মাঝি তরণী বেয়ে।
বল গভীর রাতে কোথায় যাব একলা কুলবতী মেয়ে।

(অভয় আসিল)

অভয়। তুমি তাহ'লে এখনও গান গাও? আমি ভেবেছিলুম গান গাওয়া ছেড়েই দেছ।

অনিমা। তুমি তো আমার গান শুনতে চাওনি কোন দিন—

(অভয় whisky সোডা বাহির করিল)

অভয়। (এক পাত্র খাইয়া) সেই বিয়ের রাত থেকে কি যে তোমার হল তিন বছরের ভেতর একটু ভাল করে কথা কইলে না। কি সন্দেহ হয় স্পষ্ট আমায় বললেও তো পার ?

অনিমা। আমার সামনে মদ খেতে তোমার আটকায় না।

অভয়। তোমার সামনে মদ খেতে দোষ কি ? তুমি wife, তুমি তো আর গুরুজন নও। কত wife স্বামীর সঙ্গে দু'-এক পাত্র খায়। খাবে—একটু খাও না ?

অনিমা। থাক।

অভয়। তুমি দু'-পাত্তর খাও, বাকিটে আমি খাব। তার পর দু'জনে Motorএ করে বেরিয়ে আসি, মনটা বড় খুশী আছে—

অনিমা। কি হয়েছে ?

অভয়। মস্ত বড় বাড়ী কিনেছি। সেই—যে বাড়ীতে তোমার বিয়ে হয়—

অনিমা। তাহ'লে এত দিনে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হল—দাদার সব গেল।

অভয়। রতনের গেল—রতনের বোকামীতে।

অনিমা। এইবার ওই বাড়ীতে রাজা হয়ে বসবে—তার পর শ্রীমতী তরুলতা।

অভয়। (ইহার মধ্যে দু'-এক পাত্র পান করিয়া উত্তেজিত হইয়াছে) হ্যাঁ, শ্রীমতী তরুলতা—তার জন্তেই তো এত।

অনিমা। তুমি রাগ করছো কেন ? আমিও তাই বলছি। আমি সব জানি, তরুলতাকে দিন-রাত দেখতে পাবে বলে আমায় বিয়ে করেছিলে।

অভয়। ঠিকই তো, তুমি কে—তরুলতাকে পাবার উপায়—আমাদের ভালবাসা—কত দিনের জান ?

অনিমা। জানি। বিয়ের রাতে তার পায়ে ধরেছিলে, নিজের চোখে দেখেছি তবু মরিনি, যাও, যাও, তুমি আমার কাছে থেকো না।

(অভয় চলিয়া গেল)

Music.

(অভয় নেশার ঘোরে একটি ছোট্ট ব্যাগ ফেলিয়া গেল। বহু দিন আগেকার চিঠি। অনিমা চিঠি পড়িল, আবার চিঠি রাখিয়া দিল)

রাত্রি—রতন ও তরু।

রতন। তরু, তরু, তুমি কোথায় ?

তরু। এই যে আমি।

রতন। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে, জ্বর আর নেই।

তরু। ডাক্তারও তাই বলেছিলেন।

রতন। তরু, আমি তোমায় কিছু বলিনি।

তরু। আমি সব জানি, আর কিছু নেই।

রতন। তোমার গায়ের গহনা ?

তরু। খুলে রেখেছি।

রতন। খুলে রেখেছ না অভয় নিয়ে গেছে।

তরু। যদি নিয়ে যায় তাতেই বা ক্ষতি কি ? তুমি আছ আমি আছি, মাথার উপর ভগবান আছেন, জীবনে টাকাই সব নয়।

সকালে—অভয়, রতন, তরুলতা

অভয়। আমার partnerএর behalfএ বাড়ী দখল করতে যাচ্ছে।

রতন। আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে ?

তরু। তুমি চুপ কর, আমি কথা বলছি।

অভয়। তোমরা মাস খানেক guest houseটায় থাক না। তার পর সুবিধে মত বাড়ী-ঘর দেখে নিও।

তরু। (কিছুক্ষণ ভাবিল) আচ্ছা তাই।

বহির্বাটী

Main buildingএর সঙ্গে একটা corridorএর দ্বারা সংযোগ। Main building হইতে তরুলতা ও রতন বাহির হইতেছে। অনিমা গাড়ী হইতে নামিয়া gate দিয়া ভিতরে ঢুকিল। তরুলতা ও অনিমা চোখাচোখি দেখা হইল। কেহ কথা কহিল না।)

বহির্বাটীর দ্বিতলের ছোট ঘর—রতন ও তরু।

রতন। অভয় আমার এ সর্ব্বনাশ করলে কেন, বলতে পার তরু ?

তরু। বলতে পারি। কিন্তু আজ বলবো না। আজ তুমি সইতে পারবে না।

রতন। অভয় কি কোন দিন তোমায় ভালবেসেছিল ?

তরু। আজ থাক। তুমি দুর্ব্বল। মামা আসছেন।

(মিঃ মণিলাল আসিলেন)

মণিলাল। রতন !

রতন। আসুন, মামা।

মণিলাল। আমি সব শুনেছি, তুমি পালাও কলকাতা ছেড়ে। চলে যাও, এ বাড়ীতে আর থেকো না।

রতন। কোথায় যাব ?

মণিলাল। তোমার বাবার জন্মস্থান যশোর জেলায় চিত্রা নদীর পারে। সেখানে তোমার পৈত্রিক বাড়ী আছে। একটুও দেরী না করে বৌমাকে নিয়ে চলে যাও।

রতন। কি করে চলবে মামা ?

মণিলাল। Try to depend on divine will, my boy. একটা কথা—অনেকে তোমার স্ত্রীকে অপয়া বলে, তাদের কথা বিশ্বাস করো না। বৌমা অত্যন্ত ভাল typeএর মেয়ে। চিত্রা নদীর ধার বড় ভাল জায়গা, আমি ছেলে বয়সে একবার গিয়েছিলাম। এখনো ছবির মতো মনে আঁকা আছে। ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গী, সোয়ারি পান্সী, পালের নৌকা, মাল বোঝাই বহর, মাঝে মাঝে steamer, গেরস্থ বউয়েরা ঘেরা ঘাটে নাইছে—wonderful picture. Beg in new life.

অনিমার ঘর—বড় বাড়ীতে অনিমা ও তরুলতা।

তরুলতা। আমি এসেছি—আজ তোমায় সব কথা বলবো।

অনিমা। দরকার নেই—আমি জানি, তোমার চিঠি পড়েছি।

তরুলতা। আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, স্পষ্ট করে বল।

অনিমা। তোমার রূপে মেয়েমানুষেরও চোখ ঝলসে যায়।

তোমার গুণের তুলনা নেই, বিদ্যা-বুদ্ধির অন্ত নেই, কোন পুরুষ যদি তোমায় দেখে মুগ্ধ হয় আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই। আমার মিনতি, তুমি আমার স্বামীকে বুঝিয়ে বল, এ অন্যায় তুমি প্রশ্রয় দিও না।

তরুলতা। আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি এই তোমার ধারণা! তোমার স্বামী আমার স্বামীর কি সর্ব্বনাশ করেছে তুমি জান?

অণিমা। তোমার জন্যেই তো দাদার ওপর তাঁর আক্রোশ— তোমার পায়ে ধরছি, তুমি আর সর্ব্বনাশ কোরো না।

তরুলতা। অণিমা, তুমি ছেলেমানুষ। কিন্তু এত ছেলেমানুষ? আমি সর্ব্বনাশ করেছি এই তোমার বিশ্বাস?

সাত দিন পর। রতনের ঘর—রতন, তরু।

রতন। আমি মনস্থির করেছি তরু, মামা যা বললেন তাই, কলকাতার প্রলোভনের মধ্যে আর থাকবো না, আমি আজ একবার যশোর জেলায় পৈত্রিক বাড়ী দেখতে যাব।

তরু। আমায় সঙ্গে নাও—আমিও যাব।

রতন। না, আজ তুমি যেও না, দু'টো দিন এ বাড়ীতে থাক। আমি একবার দেখে আসি।

তরু। এ বাড়ীতে আর এক দণ্ড আমার থাকতে ইচ্ছে নেই। আচ্ছা, তুমি এসো।

রাত্রিকাল—দ্বিপ্রহর, ঘড়িতে দু'টো বাজিল।

[অভয় শুইয়াছিল। বিছানা হইতে উঠিল—দরোজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অণিমা উঠিল। অন্ধকারে তাহার মনে হইল অভয় ঘরে নাই। আলো জ্বালিয়া দেখিল শয্যা শূন্য, দরজা খোলা। আলো নিবাইয়া সে-ও বাহির হইল। বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিল—অভয় যে corridor দিয়া guest houseএ যাওয়া যায় সেইখান দিয়া তরুলতার ঘরের দিকে যাইতেছে। অতি কৌতূহলী হইয়া অণিমাও সেই পথ দিয়া চলিল—তাহার পথ জানা। মাঝখানে একটা যায়গা উঁচু ছিল, অণিমা সেই উঁচু জায়গা হইতে ৩।৪ ধাপ ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। প্রচণ্ড শব্দ হইল। তাহার মুখ দিয়া যন্ত্রণার স্বর বাহির হইল—"উঃ মাগো!" দূর হইতে অভয়—"কে?" অভয় নিকটে আসিল। অণিমা তখনো পড়িয়া আছে। অভয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে? উত্তর দাও, এ কি অণিমা, তুমি? তুমি আমায় সন্দেহ করে আমার পিছনে পিছনে আসছিলে?"]

অভয়। (অণিমাকে তুলিল)—কোথায় লেগেছে?

অণিমা। বড় যন্ত্রণা, বোধ হয় বুকের হাড় ভেঙ্গে গেছে।

অভয়। তুমি তো জান আমি জ্ঞানহারা, তবে কেন গিয়েছিলে?

অণিমা। ও কথা তুমি আমার মুখের উপর বলো না, এইটুকু দয়া কর আমায়।

তরুর ঘর

(তরু আপন মনে হাসিতেছিল ও গুন-গুন করিয়া গাহিতেছিল।)

"সে ফুলের মতো ফুটেছিল শরৎ কালের সকাল বেলায়—
একটি দিনের ছোট্ট জীবন কাটবে বুঝি রঙীন খেলায়।
হেসেছিল মলিন হাসি, বলেছিল ভালবাসি,
কেঁদেছিল, কাঁদিয়েছিল যাবার আগে সন্ধ্যা বেলায়।"

(একটি ছোট ছেলে আসিয়া চিঠি দিল)

ছেলে। আপনার চিঠি (ছেলেটি চলিয়া গেল)।

তরু,

কাল রাত্রে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। জানি না কিসের আশায় আমি কাল রাত্রে দোতলার বারান্দা দিয়া তোমার ঘরের দিকে যাইতেছিলাম—যে ঘরে তুমি শুইয়া আছ সেই ঘরখানি দেখিতে। সন্দেহের বশে অণিমা আমার পিছনে পিছনে যায়। পথ জানা না থাকায় অন্ধকারে ভীষণ ভাবে পড়িয়া গেছে। বুকের হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গেছে, বাঁচিবে কি না জানি না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার স্ত্রী করিল, এই ঘটনা হইতে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তোমার চিঠি ক'খানি ফেরৎ দিব। তোমার ঘরে যাইতে আমার সাহস নাই, রতন এখানে নাই, তুমি একা আছ, আমি যাইব না। রাত্রি ৮টার আগে আমি বাড়ী ফিরিব না। ঐ সময় একবার অণিমাকে দেখিতে আসিবে, আমি সেই সময়ে চিঠি কয়খানি ফেরৎ দিব, এবং যদি তোমার লইতে আপত্তি না থাকে তোমার গহনাগুলিও তোমায় দিব। ইতি

হতভাগ্য অভয়।

তরু পত্র পড়িয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল।

রাত্রি ৮টা বাজিল।

(অভয়ের মোটর বাড়ীতে ঢুকিল। তরুলতা একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া নীচে আসিল।)

অভয়ের ঘর।

অভয়। তরু! (অভয় দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

তরু। অণিমা কেমন আছে?

অভয়। দেখতে যাবে?

তরু। আমায় দেখলে তার যন্ত্রণা বাড়বে, আমি বেশীক্ষণ থাকবো না। দাও, চিঠি ফেরৎ দাও।

অভয়। একটু বস, আমি তোমায় দেখবো, তোমার জন্যে আমি কি করেছি একবার ভেবে দেখ।

তরু। সেই জন্যেই তো তোমার উপর রাগ করা কঠিন। দাও, চিঠি দাও। আমি স্বীকার কচ্ছি তোমায় চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেছিলাম।

Guest house.

রতন। (ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল ঘর বন্ধ) "তরু! তরু, কোথায় গেল? অভয়ের বাড়ী যাবে বলে তো মনে হয় না।"

ঘরের ভিতর—অভয়, তরু।

বাহিরে রতন। অভয়—অভয় আছ?

অভয়। রতন!

তরুলতা। দোর খুলে দাও—আমার মনে পাপ নেই।

অভয়। আমার মনে পাপ আছে। আমায় সে নিশ্চয়ই ঘৃণা করে, একটা খুন-খারাপি হতে পারে। আমি তোমায় লুকিয়ে রাখি—

তরু। তার পর!

অভয়। পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। আমি রতনকে

নিয়ে অণিমার কাছে যাব, সেই অবকাশে তুমি—তুমি ঘরে যেও—এসো।

('ঘরের ভিতর একটা পোষাকের আলমারী ছিল—সেইটার ভিতর অভয় তরুকে লুকাইয়া রাখিল।)

তরু। আমি দমবন্ধ হয়ে মারা যাব যে!

অভয়। কথা বল না!

(রতনের কণ্ঠস্বর—"অভয়, অভয়—অণিমা")

অভয় দরজা খুলিল—

রতন। তোমার চাকর বল্‌লে তুমি ঘরের ভেতর, অথচ সাড়া-শব্দ নেই।

অভয়। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাই। অণিমাকে নিয়ে কাল সমস্ত রাত্রি জাগতে হয়েছে।

রতন। তরু এখানে এসেছিলো?

অভয়। কই, না—

রতন। কোথায় গেল তাহ'লে?

অভয়। কেন, ঘরে নেই?

রতন। না।

অভয়। তাহ'লে বোধ হয় কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

রতন। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে গেছে—তার মানে?

অভয়। মানে এখন তুমি যা বোঝ। কেন বিয়ের আগেই তো ও বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেত!

রতন। অভয়! Scoundrel! তুমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছ, আমি কোন দিন কোন কথা বলিনি; কিন্তু এ আমি সইব না।

অভয়। থাক ভাই, বেশী কথার দরকার কি, দেখছো এ ঘরে নেই, তোমার সন্দেহ হয় বাড়ী খুঁজে দেখ।

(রতন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর দুর্ব্বল ছিল বলিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা গেল)

অভয়। রতন, রতন!—তাই তো, মহা মুস্কিল দেখছি! ওরে কে আছিস? (এক জন চাকর আসিল) শীগ্‌গির যা আর এক জন কাউকে ডেকে নিয়ে guest houseএ বাবুর ঘরে শুইয়ে দিয়ে একটু বাতাস করবি।

(চাকরেরা রতনকে লইয়া গেল)

অভয়। (অভয় কম্পিত পদে উঠিয়া) হা ঈশ্বর! আমি কোথায় তরুকে আটকে রেখেছি! ওখানে তো বাতাস যায় না। তবে—তবে—

(কম্পিত হস্তে আলমারীর দরজা খুলিয়া তরুলতার মৃতদেহ বাহির করিল)

তরু, তরু, তরু! মারা গেছে! (অনেকক্ষণ হাত দেখিল) "হ্যাঁ, মারাই গেছে! এ আমি কি করলুম!—

(আস্তে আস্তে গিয়া দরজা বন্ধ করিল তার পর তরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর! তোমার দেহ কামনা করেছিলাম তাই বুঝি এমনি করে তোমার প্রাণহীন দেহ আমায় উপহার দিলে।

অভয়ের ঘর।

(অভয় বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মতো চুপচাপ বসিয়াছিল, হঠাৎ মনে হইল মৃতদেহটি গোপন করিতে হইবে। মৃতদেহটি একটি বস্তার ভিতর পূরিল। ঘরের বাহিরে থাকিয়া দেখিল কোন দিকে কারো সাড়া-শব্দ নাই। gate বন্ধ করিয়া দরোয়ান ঘুমাইতে গেছে। তাহার কাছে gate-এর duplicate চাবি ছিল, সেই চাবি দিয়া দরজা খুলিল। garage হইতে বড় গাড়ী বাহির করিয়া দরজার পাশে রাখিল। তার পর নিজে বহন করিয়া মৃতদেহটি গাড়ীতে তুলিল। তার পর গাড়ী start দিয়া নিজেই drive করিতে লাগিল।)

অণিমার ঘর।

(অণিমা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, বাড়ীর ঝি তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছিল।)

অনিমা। গঙ্গার মা, বাবু কোথায়? এখনো আসেননি?

গঙ্গার মা। একবার এসেছিলেন। ও-বাড়ীর আপনার দাদা বাবু এসেছিলেন। একবার বৌঠাকরুণের গলাও পেয়েছিলাম।

অণিমা। তার পর?

গঙ্গারমা। তার পর কি যে হোল বুঝতে পাচ্ছি না।

অণিমা। উঃ ভগবান! এমনি করেই সব শেষ হবে। আমি বুঝতে পাচ্ছি—বুঝতে পাচ্ছি—সব বুঝতে পাচ্ছি।

(অভয় কলিকাতা ছাড়াইয়া অনেক দূর-পল্লীতে গঙ্গার ধারে গেল, তার পর পথের ধারে গাড়ী রাখিয়া মৃতদেহ নিজে বহিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিল।)

অভয়। তোমায় গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলাম, আশা করি এতেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!

শেষ

(ডাক্তার বাবু লিখিতেছিলেন, গল্প শেষ হইল, কংকাল কথা কহিল।)

কংকাল। শুনলেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ, আপনার জীবন ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আপনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন। আপনার স্বামীর কি হল?

কংকাল। তিনি আর ওঠেননি। স্বামীকে আমি পেয়েছি কিন্তু অভয়কে ক্ষমা করতে পারিনি, তাই এই কংকাল উপলক্ষ করে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। আপনাকে যা বলেছি তাই করুন।

পরদিন—সকাল।

(কংকালের গায়ে একখানি কাগজ—কংকালের ইতিকথা। ডাক্তার বসিয়া চা-পান করিয়েছেন ও মাঝে মাঝে কংকালের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন।)

(অভয়ের গাড়ী বাড়ীর দরজায় থামিল—অভয় ঘরে আসিলেন)

ডাক্তার। আসুন অভয় বাবু, বসুন, একটু চা খাবেন?

অভয়। Thank you doctor, চা খেয়ে বেরিয়েছি।

ডাক্তার। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

অভয়। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না ডাক্তার বাবু, কাল শেষ রাত থেকে হঠাৎ ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা গেছে, এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গেনি, আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে।

ডাক্তার। আচ্ছা, আমি কাপড়টা বদলে আসি।

অভয়। এ কি, আপনার এ skelitonএর গায়ে কাগজ মারা কেন?

ডাক্তার। পড়ে দেখুন না, চমৎকার গল্প,—Life story of this skeliton. আপনি অবশ্য বিশ্বাস করবেন না। আমি আসছি।

(ডাক্তার চলিয়া গেলেন। অভয় গল্পটি পড়িতে লাগিল, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া চমকাইয়া উঠিল।)

(প্রথমে তরুলতা, তার পর তাহারই পাশে রতন। সে শিহরিয়া উঠিল, হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। অমনি কংকাল অগ্রসর হইয়া দুই হাতে জোর করিয়া তাহার মাথাটি আকড়াইয়া ধরিল। অভয় যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিল।)

ধ্বনি। তুমি দেহ চেয়েছিলে দেহ পেয়েছ।

অভয়। আমার অণিমা!

ধ্বনি। তাকেও তুমি মেরে ফেলেছ।

("কি, কি—ব্যাপার কি,"—বলিয়া ডাক্তার ঘরে আসিলেন। দেখিলেন অভয় বাবু যেমন চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া আছেন—দেহে প্রাণ নাই। ডাক্তার তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই দেহটি পড়িয়া গেল।)

সমাপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২৫ সাল শীতকাল। দু'টি প্রশ্নের সমাধান করতে না পেরে আমার মনে শান্তি নাই। দর্শন এবং ধর্ম্মগ্রন্থাবলী প্রশ্নের সমাধান না করে বরং মনে কুজ্ঝটিকার তরঙ্গ তুলিল। বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে কিনারা পেলাম না। শ্রীঅরবিন্দকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার লেখা পড়ে আমি তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মনে হলো তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন। তাঁকে চিঠি লিখলাম। আমার প্রথম প্রশ্ন, "ভগবান প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় কি না?" আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখলাম আপনার উত্তরপাড়া বক্তৃতায় আপনি বলেছেন, "নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া'—এটা কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অতিশয়োক্তি বা শ্রোতাদের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করবার প্রয়াস? আমি যদি আপনার ঘরে যাই তাহলে আমাকে যেমন প্রত্যক্ষ দেখেন, নারায়ণকে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ঐরূপ কথা বলেছিলেন? এ রকম প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উপনিষদে পাই। পরমহংসদেবও ঐরূপ কথা বলতেন। কিন্তু তাঁরা নর-জগতে নাই। আপনাকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি, সে জন্য আপনার নিকট আমার সংশয়াকুল চিত্ত তার প্রশ্নের সমাধান চাহিতেছে।"

আমার পত্রের উত্তরে পণ্ডিচারী থেকে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৯।১১।১৯২৫ তারিখে আমাকে লিখলেন, "আপনার পত্রখানি শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন। তাঁহার উত্তর নিয়ে লিখিলাম। ভগবান আছেন ইহা খুবই সত্য এবং তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূতিগম্য। অবশ্য বিশ্বাস ভগবানের পথের সহায়, কিন্তু ভগবান যদি শুধুই বিশ্বাসের বস্তু হইতেন তাহা হইলে তাঁহার কোনই বিশেষ মূল্য থাকিত না। ভগবান একটা মানসিক সিদ্ধান্ত বা থিওরিতে পরিণত হইতেন। অরবিন্দের পুস্তকাদি আপনি পড়িয়াছেন লিখিয়াছেন, তাহা হইতে তো সহজেই অনুমিত হয় যে, যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা।"

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন "ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কি?" শিবসংহিতায় আছে, "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" কিন্তু এক জন খ্যাতনামা ইংরাজের Physiology পুস্তকে পড়েছিলাম যে, একটা ষাঁড় একটা খোজা-করা ষাঁড়ের চাইতে অনেক বলীয়ান্ এবং সেই জন্য সেই লেখকের মতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করলে স্বাস্থ্যহানি হয়। শ্রীঅরবিন্দের জবাব নিয়ে দিলাম, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, বীর্য্যধারণ মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কারণ হয় যখন বীর্য্যধারণ খাঁটি হয়। শুধু শারীরিক বীর্য্যস্তম্ভন ও তাহার সহিত মানসি বা প্রাণের কাম-বাসনার খেলা চলিলে তাহাতে সুফল হয় না। মন, প্রাণ ও দেহ শুদ্ধ ও শান্ত হইয়া সমস্ত সত্তা হইতে যে কর্ম্মবিরতি তাহাই মহা ফলপ্রদ।

১০ নভেম্বর ১৯২৫ শ্রীঅরবিন্দের চিঠিতে আমার প্রশ্নের সমাধান হইল। সংশয়ের উদ্দাম তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান মন থেকে সংশয় দূরীভূত হইল। প্রাণে পেলাম অপার আনন্দ এবং অনির্ব্বচনীয় শান্তি। জীবনের প্রধান অবলম্বন শ্রীঅরবিন্দের বাণী স্মরণ করে তাঁরই উদ্দেশে আমি ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করিতেছি।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

৯

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

গদ্যশাখা : ভূমিকা

হিন্দী গদ্যের ক্রমবিকাশ

হিন্দী গদ্যের উদ্ভব কেমন কোরে হোয়েছিল তা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। হিন্দী গদ্যের আধুনিক রূপ ইংরাজ আর বাঙ্গালীর অনুপ্রেরণাকে অবলম্বন কোরে গড়ে উঠেছিল। প্রাগাধুনিক গদ্য ছিল 'ব্রজভাষা'-গদ্য। আধুনিক গদ্য যা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে জন্মাচ্ছিল তাতে এক দিকে ছিল 'পণ্ডিতাউপন' অথবা তা হচ্ছিল "বিলকুল উর্দ্দু।" এদিক ওদিক ঠেলছিল হিন্দী। আর শুধু তাই নয়, হিন্দীকে "গঁওয়ারী বোলী" বোলে মেরে ফেলার চেষ্টাও হচ্ছিল। সেদিন বাংলার সাহিত্যিক আদর্শ আর বাঙ্গালী কেমন কোরে হিন্দীকে দাঁড়াবার সুযোগ দিচ্ছিলেন তা পূর্ব্বের মাসিক বসুমতীতে আলোচনা করেছি। এমনি কোরে আধুনিক হিন্দী গদ্যের উদ্ভব হোলো।

রাজা লক্ষ্মণসিংহের 'শকুন্তলা' অনুবাদ হিন্দী গদ্যকে মোটামুটি সুব্যবস্থিতরূপে খাড়া কোরল। এ ভাষার মধ্যে সাবলীলতা এল বটে কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিশেষ এল না। "ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র" আধুনিক হিন্দীর বিচিত্র বিকাশের পক্ষে আপনার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করে হিন্দী গদ্যকে মনোহর করে তুললেন। আর এই যে হিন্দী গদ্যের মনোহরণ রূপ, এও বাংলারই দান। 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' এসেছিলেন বাংলা দেশে, বাংলার সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে মিশেছিলেন, বাংলা সাহিত্য হোতে অনুবাদ কোরেছিলেন হিন্দীতে, আর বাংলা সাহিত্যের দেখাদেখি হিন্দীকে সমৃদ্ধ কোরতে চেয়েছিলেন।

পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' গ্রন্থের ৪৪১ পৃষ্ঠা থেকে অনুবাদ কোরে দিচ্ছি :—

ভাষা আর সাহিত্য দু'য়ের ওপরেই ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের গভীর প্রভাব পড়েছিল। যেমন উনি গদ্যের ভাষাকে পরিমার্জ্জিত কোরে সুন্দর আর স্বচ্ছ রূপ দিয়েছেন, সেরূপ হিন্দী সাহিত্যকেও নবীন পথে পরিচালিত কোরেছেন। ওঁর ভাষা-সংস্কারের গভীরতা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার কোরেছেন, আর উনি যে আধুনিক হিন্দী গদ্যের প্রবর্ত্তক তা মেনে নিয়েছেন। মুন্সী সদাসুখের ভাষা সাধু হোলেও তাতে ছিল পণ্ডিতীয়ানা, লল্লুলালের ব্রজভাষা-পনা আর সদল মিশ্রের ভাষাতে ছিল পূর্ব্বদেশের ভাষার ঢং। রাজা শিবপ্রসাদের উর্দ্দুয়ানা কেবল শব্দের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাক্যবিন্যাসের ভিতরেও ঢুকে পড়েছিল। রাজা লক্ষ্মণসিংহের ভাষা মধুর এবং বিশুদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাতেও আগরার বোল-চালের ঢং-ঢাং কম ছিল না। ভাষার মার্জ্জিত সাধু সর্ব্বজনীন রূপ ভারতেন্দুর কলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হোলো।

এর চেয়ে বড় কাজ ইনি কোরলেন কি সাহিত্যকে নতুন পথ দেখালেন, আর তাকে নিয়ে এলেন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহচর্য্যে। নতুন শিক্ষার প্রভাবে লোক-জনের বিচারধারা বাচ্ছিল বদলে। লোকের মনে দেশহিত, সমাজহিত প্রভৃতি নূতন ভাবধারা উৎপন্ন হচ্ছিল। কালের গতির সঙ্গে ওঁদের ভাব আর বিচারধারা আগে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু সাহিত্য পড়েছিল পিছনে। ভক্তি আর শৃঙ্গার রসের পুরানো কবিতার ধারাই চলে আসছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কিছু শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছিল, কিন্তু দেশ-কালের উপযোগী সাহিত্য সাধনার ব্যাপক প্রয়াস তখনও পর্য্যন্ত হয়নি। বাংলা দেশে হয়েছিল নতুন ঢংয়ের উপন্যাস আর নাটকের সূত্রপাত, যার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল দেশ এবং সমাজের নতুন রুচির প্রতিবিম্ব। কিন্তু হিন্দী সাহিত্য আপনার পুরানো পথেই চলেছিল। ভারতেন্দু ঐ সাহিত্যকে অন্য পথে পরিচালিত কোরে আমাদের জীবনের সঙ্গে আবার সংযুক্ত কোরে দিলেন। এই ভাবে আমাদের জীবন আর সাহিত্যের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ছিল তা উনি বিদূরিত কোরে দিলেন। আমাদের সাহিত্যকে নূতন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত করালেন হরিশ্চন্দ্র।"

—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (পৃষ্ঠা ৪৪১।৫০)

আর শুধু হিন্দী গদ্য ও সাহিত্যকেই তিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলা দেশে এক অপূর্ব্ব সাহিত্যিক-গোষ্ঠী নির্ম্মাণ কোরে বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশে পরম সহায়তা কোরেছিলেন সেরূপ হরিশ্চন্দ্রও কোরলেন একটি সাহিত্যসেবি-সঙ্ঘ। এঁরা গড়ে তুললেন হিন্দী সাহিত্যের পাকা ইমারত। এই সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী, ঠাকুর জগমোহন সিংহ, পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই হরিশ্চন্দ্রের হিন্দী সাহিত্যের নব রূপায়নের পশ্চাতে রয়েছে বাংলা দেশ, হরিশ্চন্দ্রের অনুচর সাহিত্যসেবীদের আদর্শও বাংলা। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' হোতে আবার অনুবাদ কোরছি :—

"ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আপন পরিবার সহিত পুরী গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে ওঁর পরিচয় ঘটেছিল বঙ্গদেশের নবীন সাহিত্যিক প্রগতির সহিত। উনি দেখলেন, বাংলাতে নূতন ঢংয়ের সামাজিক দেশদেশান্তর সম্বন্ধী, ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটক ও উপন্যাস এবং হিন্দীতে এই ধরণের পুস্তকের অভাব অনুভব কোরলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উনি বাংলা থেকে বিদ্যাসুন্দর নাটক অনুবাদ কোরে প্রকাশ কোরলেন। এই অনুবাদেতেই ইনি হিন্দী গদ্যের বিশেষ মার্জ্জিত রূপের আভাষ দিয়েছিলেন।"

ভারতেন্দুর নজর প্রথমের দিকে বাংলা নাটকের দিকেই গিয়েছিল। ইনি পরবর্ত্তী কালে বঙ্গভাষা হোতে উপন্যাস অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন (হরিশ্চন্দ্র নে হী অপনে পিছলে জীবন মেঁ বংগভাষা কে উপন্যাস কে অনুবাদ মেঁ হাথ লগায়া ঽা, পরপুরা নে কর সকে থে।") মোটামুটি হরিশ্চন্দ্রের অনূদিত নাটক হোলো— "বিদ্যাসুন্দর", "পাষণ্ডবিড়ম্বন", "ধনঞ্জয়বিজয়", "কর্পূরমঞ্জরী",

"মুদ্রারাক্ষস", "সত্য হরিশ্চন্দ্র", "ভারতজননী", 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' নাটকটি প্রথমে মৌলিক রচনা বলে অনেকের ধারণা ছিল কিন্তু রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় লিখেছেন—'সত্য হরিশ্চন্দ্র' মৌলিক সমঝা জাতা হৈ পর হম নে এক পুরানা বাংলা নাটক দেখা হৈ জিসকা উন্নহ অনুবাদ কহা জা সকতা হৈ"। বলা বাহুল্য, কর্পূরমঞ্জরী, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি মূল রাজশেখর বা বিশাখদত্ত হোতে অনূদিত নয়, বাংলা অনুবাদের অনুবাদ মাত্র। 'হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা' নামে এক পত্রিকা হরিশ্চন্দ্র প্রকাশ কোরেছিলেন, এই পত্রিকা হোতেও হিন্দীর নব রূপায়ন চলেছিল।

হিন্দী সাহিত্যের গদ্যের ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র একটা মস্ত-বড় শক্তি (force), কিন্তু এই শক্তির উৎস সন্ধান কোরলে আমাদের বাংলা দেশে আসতে হবে।

আর হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিকগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এঁরা হিন্দী সাহিত্যকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত কোরেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের হিন্দী গদ্যের অনেকখানিই বাংলার আদর্শ।

হরিশ্চন্দ্র সাহিত্য-গোষ্ঠীর ভিতর যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা একে একে আলোচনা করা যাচ্ছে।

(১) পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র—(ক) পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতেন্দু বাংলা গদ্যকে মোটামুটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কোরেছিলেন। পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ ভারতেন্দুকে গদ্য রচনাতে আদর্শ হিসাবে কিছুটা গ্রহণ কোরেছিলেন। ("প্রতাপনারায়ণ মিশ্র যদ্যপি লেখন কলামেঁ ভারতেন্দু কো হী আদর্শ মানতে থে পর উনকী শৈলী মেঁ ভারতেন্দু কী শৈলী সে বহুৎ কুছ বিভিন্নতা ভী লক্ষিত হোতী হৈ।") এই ভাবে পরোক্ষ ভাবে হিন্দী গদ্যাদর্শ বাংলা গদ্যাদর্শের অনুকারী হচ্ছিল। (খ) প্রতাপনারায়ণ নিজেই বাংলাকে আদর্শ কোরে রচনা কোরতে সুরু কোরেছিলেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল বলছেন যে, বাংলা উপন্যাস হোতে অনুবাদের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র, তাঁর দেখাদেখি প্রতাপনারায়ণ মিশ্র আর রাধাচরণ গোস্বামী প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস অনুবাদে আত্মনিয়োগ কোরেছিলেন। ("হরিশ্চন্দ্র নে হী অপনে পিছলে জীবন মেঁ বংগভাষা কে উপন্যাস কে অনুবাদ মেঁ হাথ লগায়া থা, পর পুরা ন কর সকে থে। পর উনকে সময় মেঁ হী প্রতাপনারায়ণ মিশ্র ঔর রাধাচরণ গোস্বামী নে কই উপন্যাসোঁ কে অনুবাদ কিয়ে।") পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণের গদ্যের নমুনা :—

"যদি রোকা ন জায় তো কুছ কাল মেঁ আলস্য ঔর অকৃত্য কা ব্যসন উৎপন্ন করকে জীবন কো ব্যর্থ এবং অনর্থপূর্ণ কর দেতা হৈ।"

(২) উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী (প্রেমঘন)—এঁর রচনা ও শৈলী অপেক্ষাকৃত মৌলিকত্ব দাবী কোরতে পারে। কারণ ইনি হরিশ্চন্দ্রগোষ্ঠীতে থেকেও সব সময়ে হরিশ্চন্দ্রের গদ্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেননি। এঁর রচনাতে অনুপ্রাস যমকের হাস্যকর বাড়াবাড়ি আছে। এও অবশ্য জঘন্য ঈশ্বরগুপ্তীয় গদ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ইংরাজী 'ইউফুউসিম্‌'এর মতই তা এক দিন মানুষকে আকর্ষণ কোরেছিল। বদরীনারায়ণের গদ্য এইরূপ :-

"ঈশ্বর কা ভী ক্যা খেল হয় কি কভী তো মনুষ্যেপর দুঃখ কী রেল পেল ঔর কভী উসী পর সুখ কী কুলেল হয়।"
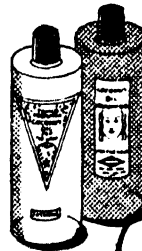
আর একটি কথা।

হিন্দীতে বাংলা আদর্শের আর একটি কথা।

নাটকের মধ্যে "গর্ভাঙ্ক" বোলে একটি জিনিষ ছিল সংস্কৃতে। তার অর্থ ছিল অনেকটা 'a play within a play'র মত। বাংলাতে 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অর্থ হয়েছিল দৃশ্য—Scene; হিন্দীতে 'গর্ভাঙ্ক' সম্বন্ধে চৌধুরী বলছেন :—

"নাটককে প্রবন্ধ কা কুছ কহনা হী নহীঁ। এক গঁওয়ার ভী জানতা হোগা কি স্থান পরিবর্ত্তন কে কারণ গর্ভাঙ্ক কী আবশ্যকতা হোতী হৈ। অর্থাৎ স্থান কে বদলনে মেঁ পরদা বদলা জাতা হৈ ঔর ইসী পর্দে কে বদলনে কো দুসরা গর্ভাঙ্ক মানতে হৈঁ।"

(৩) পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৬৪—১৯১৪)—এঁর রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গদ্যের আদর্শের জন্য ইনি বাংলাকে কিছুটা গ্রহণ কোরেছিলেন। ইনি মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' এবং 'শর্মিষ্ঠা'র অনুবাদও কোরেছিলেন হিন্দীতে। এ ছাড়া 'কলিরাজ কী সভা' 'রেল কা বিকট খেল'* প্রভৃতি স্মরণযোগ্য।

এ ছাড়া বাবু গদাধর সিংহ বাংলা হোতে 'বঙ্গবিজেতা' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি অনুবাদ কোরলেন। তার পর তারাশংকরের 'কাদম্বরী'কে হিন্দীতে অনুসরণ করলেন। এই সময় থেকে শুরু হোলো বাংলা উপন্যাসাদির অনুবাদ ধারা। "পীছে তো বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস, বাবু কার্ত্তিকপ্রসাদ খত্রী, বাবু রামকৃষ্ণ বর্ম্মা আদি নে বঁগলা কে উপন্যাসোঁ কে অনুবাদ কী জো পরম্পরা চলাই উয়হ বহুৎ দিনোঁ তক চলতী রহী। ইন উপন্যাসোঁ মেঁ দেশ কে সর্বসামান্য জীবন কে বড়ে মার্মিক চিত্র রহতে থে।"

এমনি কোরে বাংলা অনুবাদের প্রবল স্রোতে হিন্দীর ক্ষেত্র উর্বর হোয়ে উঠল। প্রথমে প্রথমে কিন্তু এই অনুবাদ-স্রোতের প্রবল ধাক্কায় হিন্দী ভাষা বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। যেমন বেশী সাহেবদের হাতে বাংলা বাংলাপনা হারিয়েছে সেরূপ বেশী বাঙ্গালীয়ানার ফলে হিন্দীর ব্যাকরণও কিছুটা বিপর্য্যস্ত যে না হোলো তা নয়। তাই পণ্ডিত শুক্ল বলেছেন, "অধিকাংশ অনুবাদক প্রায়: ভাষা কো ঠীক হিন্দী রূপ দেনে মেঁ অসমর্থ রহে। কহীঁ কহীঁ তো বঁগলা কে শব্দ ঔর মুহাবরে তক জ্যোঁ কে ত্যোঁ রখ দিয়ে জাতে থে—জৈসে "কাঁদনা", "সিহরনা", "ধূ ধূ করকে আগ জলনা", "ছল ছল আঁসু গিরনা" ইত্যাদি।

* চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গাড়ীর আড়ি'র রচনা-কালটি কেউ আমাকে জানাবেন কি?

এই ভাবে বাংলাকে অনুসরণ করার ফলে কি হিন্দী গদ্য এবং কি হিন্দী বিষয়-বস্তু যথেষ্ট উন্নীত ও পরিমার্জ্জিত হোলো এ কথা পণ্ডিতপ্রবর শুক্লজী স্বয়ং স্বীকার কোরেছেন।

হিন্দী গদ্য সম্বন্ধে শুক্লজী বোলছেন :—"বঁগলা উপন্যাসোঁ কে অনুবাদ ধড়াধড় নিকলনে লগে থে। বহুৎ সে লোগ হিন্দী লিখনা সীখনে কে লিয়ে কেবল সংস্কৃত শব্দোঁ কী জানকারী হী আবশ্যক সমঝতে থে জো বঁগলা কী পুস্তকোঁ সে প্রাপ্ত হো জাতী থী। ইহ জানকারী থোড়ী বহুৎ হোতে হী বে বঁগলা সে অনুবাদ ভী কর লেতে থে ঔর হিন্দী কে লেখ ভী লিখনে লগতে থে। অত: এক ওর তো অংরেজী ঢাঁচে কী ওর সে "স্বার্থ লেনা", "জীবন হোড়," "কবি কা সন্দেশ", "দৃষ্টিকোণ" আদি আনে লগে; দুসরী ওর বংগভাষাশ্রিত লোগোঁ কী ওর সে "সিহরনা", "কাঁদনা", "বসন্ত রোগ" আদি। ইতনা অবশ্য থা কি পিছলে কৈঁড়ে কে লোগোঁ কী লিখাবট উতনী অজনবী নহীঁ লগতী থী, জিতনী পহলে কৈঁড়েওয়ালোঁ কী। বঙ্গভাষা ফির ভী অপনে দেশ কী ঔর হিন্দী সে মিলতী জুলতী ভাষা থী। উসকে অভ্যাস সে প্রসংগ ইয়া স্থল কে অনুরূপ বহুৎ হী সুন্দর ঔর উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দ মিলতে থে। অত: বংগভাষা কী ওর জো ঝুকাও রহা উসকে প্রভাব সে বহুৎ হী পরিমার্জিত ঔর সুন্দর সংস্কৃত পদবিন্যাস কী পরম্পরা হিন্দী মেঁ আঈ, ইয়হ স্বীকার করনা পড়তা হৈ।"

আবার হিন্দীর বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রেও অনুবাদ-ধারা কম প্রভাব বিস্তার করেনি। পণ্ডিত শুক্ল বলছেন, "এই সকল অনুবাদ থেকে জোর কাজ হোলো এই যে, নূতন ধরণের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি ঘটল এবং উপন্যাস রচনার প্রবৃত্তি এবং যোগ্যতা উৎপন্ন হোল।"*

এইবার নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে, বাংলাকে অবলম্বন কোরে হিন্দী গদ্যের উদ্ভব হোলো, বাংলাকে আদর্শ কোরে হিন্দী গদ্যের ক্রমবিকাশ হোলো। আজ পর্য্যন্ত এই ধারা চলেছে। এইবার হিন্দী গদ্যের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করে, হিন্দীর মৌলিক গদ্য-গ্রন্থাদির উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে আলোচনা কোরব।

* "ইন অনুবাদোঁ সে বড়া ভারী কাম ইয়হ হুয়া কি নয়ে ঢং কে সামাজিক ঔর ঐতিহাসিক উপন্যাসোঁ কে ঢংগ কা অচ্ছা পরিচয় হো গয়া ঔর উপন্যাস লিখনে কী প্রবৃত্তি ঔর যোগ্যতা উৎপন্ন হো গঈ।"

[ক্রমশ:।

বৃটেনে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা

বর্ত্তমানে বৃটেনে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২,৫০০, সেই তুলনায় ১৯৩৯ সালে হয় মাত্র ১,৫০০। মোট ২,৫০০ ছাত্রের মধ্যে ৮৮১ জন ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারীং এবং ফলিত বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা লাভ করছে, এদের মধ্যে আবার ৪৮৪ জন্ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৩৯৭ জন বিভিন্ন শ্রমশিল্পে—যেখানে তারা ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করছে।

বৃটেনে মেডিক্যাল ছাত্রের সংখ্যা ৩৮৪, এরা প্রায় সকলেই স্নাতকোত্তর গবেষণার কাজে ব্যাপৃত। এর মধ্যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী ছাত্রের সংখ্যা ১১৫—মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩।

বৃটেনে মোট ভারতীয় মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা ২৩৪—এরা সকলেই সেখানে প্রধানত চিকিৎসা, নার্সিং এবং শিক্ষা সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করছেন। এদের মধ্যে মেডিক্যাল ছাত্রীর সংখ্যা হবে ৪৩, নার্সিং ৫৭, শিক্ষা ২০। বাকী সকলে অন্যান্য বিভাগে শিক্ষা লাভ করছে।

খাস লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১,১০০—অন্যান্য প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা এই রূপ—কেম্ব্রিজ ৭৪, অক্সফোর্ড ৩৭, স্কটল্যাণ্ড ১০৯, মানচেষ্টার ৪৩, লিভারপুল ৩৩, নিউক্যাসল-অন-টাইন ৩১, বার্কিংহাম ৩৭।

কথ্য ভাষা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিভূমি আজ জন-জীবন। জনতার ভাষা, সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা সে-সাহিত্যে স্থান পাইবে—ইহাই স্বাভাবিক। এতদিনকার বাংলা ভাষার বনিয়াদ ছিল পশ্চিম-বাংলার ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষা; কিন্তু আজ সে-অঞ্চলে পদ্মা-মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত জনপদের লক্ষ লক্ষ জন আসিয়া স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিতেছে। ইঁহারা উদ্বাস্তু হইলেও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাণশক্তিতে এখানকার সাধারণ মানুষ অপেক্ষা দীন নহেন; ইঁহাদেরই চিন্তা, চেষ্টা এবং শ্রমে পূর্ব্ববাংলা এক দিন সোনার বাংলায় পরিণত হইয়াছিল, এবং ইঁহাদেরই সংস্পর্শে পশ্চিম-বাংলাও আবার এক দিন ধন-ধান্যে-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আশা করা যায়, গণতন্ত্র যতই অগ্রসর হইবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ইঁহারা সুযোগ পাইবেন এবং যে বাংলা ভাষার বন্ধন ইঁহাদিগকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, সেই ভাষার ভিতর দিয়াই এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হইবে। ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষায় তখন পরিবর্ত্তন আসিতে বাধ্য—এখনই যেমন আসিয়াছে মাড়োয়ারী-ভাটিয়া-মালিকগোষ্ঠীর এবং বিহারী-উড়িয়া-হিন্দুস্থানী-শ্রমজীবীর চাপে। পূর্ব্বাঞ্চলের অসংখ্য শব্দ, নূতন শব্দার্থ, বাক্‌রীতি তখন আপনা হইতেই গাঙ্গেয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে। গোঁড়াদের শত হৈচৈ এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেগুলি আর এখানকার মাটি হইতে উপড়াইয়া ফেলা যাইবে না। যে-ভাষা জীবন্ত, সে ভাষা যুগে যুগেই বদলায়, সে-ভাষায় নূতন নূতন শব্দ, নূতন নূতন রীতি গৃহীত হয়। বাংলা ভাষায়ও তাহাই চিরদিন হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-জননীর ভাণ্ডার হইতে যে পাথেয় লইয়া সে জীবন-পথে যাত্রা করিয়াছিল, একমাত্র তাহাই সে সম্বল করিয়া বসিয়া নাই। হাঁটিতে চলিতে দৌড়িতে প্রতিদিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কত সম্পদ সে আহরণ করিয়াছে, করিতেছে, কত নূতনের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে। বাংলার মাটিতে আর্য্য অনার্য্য দ্রাবিড় চীন শক হুন পাঠান মোগল ইংরেজ কত জাতি যুগে যুগে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, জাতিকে জাতি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতির ছাপ, ভাষার ছাপ বাঙ্গালীর সংসারে, সমাজে ও সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর অন্যান্য বহু জাতির ন্যায়ই একটি মিশ্র জাতি, বাংলা ভাষাও তাহাই—একটি মিশ্র ভাষা।

বর্ত্তমানে আমি কয়েকটি বাংলা শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচনা করিব। কিছু দিন পর এইরূপ আলোচনার আর আবশ্যক হইবে না। বাঙ্গালী আজ যেমন 'বিদ্যালয়'ও বোঝে 'স্কুল'ও বোঝে, তেমনি ভাগীরথী অঞ্চলের উভয়-বঙ্গের সম্মিলিত জনতা (যাহাদের মুখের ভাষার একেবারে কাছাকাছি হইবে আগামী যুগের বাংলা সাহিত্যের ভাষা) অচিরেই 'চুঁচা'ও বুঝিবে, 'চিকা'ও বুঝিবে—বুঝিবে দুইটিই এক গন্ধমূষিক। বুঝিবে যেই "তোলো" সেই 'টউ,' যেই 'চিনিমান' সেই 'দস্তুর', যেই 'ধামা' সেই 'আগৈল' সেই 'ঢাকি।' আবার 'খড়ি' বলিতেও যেমন তাহারা বুঝিবে জ্বালানী কাঠ, তেমনি বুঝিবে চক বা খড়িমাটি, 'গড়' বলিতে যেমন বুঝিবে দুর্গ, পরিখা, তেমনি বুঝিবে জঙ্গল, বন। বাংলা অভিধানগুলিতে এত দিন প্রধানতঃ ভাগীরথী অঞ্চলের জনতার ভাষাগুলিই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু এখন প্রয়োজনের তাগিদে সেই জনতার সঙ্গে একান্ত ভাবে সম্মিলিত পদ্মা-মেঘনা অঞ্চলের জনতার ভাষারও স্থান দিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত কয়েকটি মাত্র শব্দ ও শব্দার্থ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে,—আমাদের অভিধানকারেরা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী বাংলা ভাষার কত শব্দ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন! ঐ এক-একটি শব্দের ভিতর কত লুপ্ত জাতির কত ইতিহাস নিহিত আছে। রন্ধনের চুল্লীকে এক জনে বলিতেছে উনান, এক জনে পাকাল, আর এক জনে আখা, আর এক জনে চৌকা। সকলেরই ভাষা বাংলা, এই বাংলা ভাষার বন্ধনে সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু এই ব্যবধান কেন? 'বিছা' বলিতে কেহ বোঝে কাঁকড়া বিছা, কেহ বোঝে শুঁয়াপোকা! একই মাছ—কেহ বলে চিংড়ী, কেহ ইচা! একই শাক—কেহ বলে ঢেঁকি শাক, কেহ বলে পালই! একই কলা—কেহ বলে মর্ত্তমান, কেহ বলে সবরী! দুই জনেরই গর্ব্ব সে বাংলা কথা বলে, অথচ এই ব্যবধান কেন? এই 'কেন'র উত্তর কে দিবে? কবে দিবে?

এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলি বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেরই পরিচিত; কিন্তু একই কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিলেও, তদ্দ্বারা এক-এক স্থানে, এক-একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা প্রাণী নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। আবার এমন কতকগুলি বস্তু বা প্রাণী আছে, যেগুলি বাংলার সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একই বস্তু বা প্রাণী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হয়। এই দুই-এর প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া অতঃপর আলোচনা করা যাইতেছে। আমি আলোচনার অনেক স্থানেই পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ নাম উল্লেখ করিয়াছি, দুই-এক জায়গায় জেলা-মহকুমার কথাও বলিয়াছি। পূর্ব্ব-বঙ্গ বলিতে আমার দৃষ্টি প্রধানতঃ ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতির দিকে এবং পশ্চিম-বঙ্গ বলিতে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী জেলাগুলির দিকে রহিয়াছে।

পোনা, পোনামাছ

মাছ বাঙ্গালীর অতি প্রিয় খাদ্য এবং পোনা বা পোনামাছ কথাটি সারা বাংলায়ই প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব-বাংলার পোনামাছ এবং পশ্চিম-বাংলার পোনামাছ এক জিনিষ নহে, নাম এক হইলেও দুই স্থানের দুইটিতে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে। কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে 'পোনা' বলিতে রুই, কাতলা ইত্যাদির বাচ্চা এবং 'পোনামাছ' বলিতে রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ বোঝায়। পক্ষান্তরে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ঢাকার এক বিস্তৃত অঞ্চলে শোল, গজার এবং লেটা মাছের বাচ্চাকে পোনা বা পোনামাছ বলা হইয়া থাকে। দুই পক্ষই বাঙ্গালী এবং একই বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা কেহ বুঝিতেছে মাছের সেরা রুই কাতলা, কেহ বুঝিতেছে নগণ্য শোল লেটার বাচ্চা; কাহারো ধারণা হইতেছে বিরাটের, কাহারো অতি ক্ষুদ্রের। পশ্চিমবঙ্গীয় ডাক্তার যখন কিশোরগঞ্জের কোনও উদ্বাস্তু রোগীকে পোনামাছের ঝোল ও ভাত পথ্য করিতে বলেন, তখন হয়তো নবাগতরা একটু মুস্কিলে পড়েন, কারণ, যে জাতীয় পোনামাছের সঙ্গে তাঁহারা পরিচিত, কলিকাতার হাট-বাজারে সচরাচর তাহা পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও কোন বিবেচক ডাক্তার উহা রোগীর পথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না।

শুধু শোল মেটার বাচ্চা নয়, সাধারণ ভাবে যে কোনও মাছের বাচ্চা—এই ব্যাপক অর্থেও পূর্ববঙ্গে 'পোনা' কথাটির প্রচলন আছে, কিন্তু সে স্থলে যে-মাছের বাচ্চা, পোনার সঙ্গে সে-মাছের নাম উল্লেখ করিতে হয়, যেমন—রুই-এর পোনা, কাতলার পোনা, পুঁটির পোনা, কৈ-এর পোনা ইত্যাদি।

থোড়, মোচা

বাঙ্গালীর আর একটি খাদ্য থোড় এবং এদিক দিয়া দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু থোড়, থোর বা থোঁর নামে যে তরকারিটি আমরা গলাধঃকরণ করি, তাহা বাংলার সকল জেলায় এক জিনিষ নহে। কলাগাছের ভিতরের শক্ত অংশ—যাহা পূর্ববাংলার এবং উত্তর-ভারতের বহু স্থানে ভেরাইল বা ভেরালি নামে পরিচিত, পশ্চিম-বাংলার উপরোক্ত জেলাগুলিতে তাহা থোড় নামে বিখ্যাত। আবার পূর্ব-বাংলার বহু স্থানে যে জিনিষটিকে থোর বা থোঁর বলা হয়, কলিকাতা অঞ্চলে তাহাকে বলা হয় মোচা। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গীয় গৃহিণী যদি নবাগত পূর্ববঙ্গীয় চাকরকে থোড় আনিতে বলেন এবং সে বাজার হইতে মোচা লইয়া ফিরে তাহার ত্রুটি অবশ্যই মার্জনীয়।

কাঁদি, ছড়া, ছড়ি

কলা-সম্পর্কিত এই তিনটি শব্দ লইয়াও গোল হয়। পশ্চিম-বাংলায় যাহাকে বলে 'কলার কাঁদি,' পূর্ব বাংলার কোথাও তাহাকে বলে 'কলার ছড়ি', কোথাও 'কাঁইদ'; আবার পশ্চিম-বাংলায় যাহাকে বলে কলার 'ছড়া', পূর্ব-বাংলার কোথাও তাহা কলার কান্দি বা কান্দা (কান্দি কাঁদিরই রূপান্তর), কোথাও বা কানা। কাজেই কাঁদি শব্দে এক অঞ্চলে বোঝায় একটি মাত্র গুচ্ছ বা ছড়া, অপর অঞ্চলে বোঝায় বহু গুচ্ছ বা ছড়ার একটি সমন্বিত রূপ। তবে গুচ্ছ অর্থে ছড়া শব্দেরও পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচলন আছে—ধানের ছড়া, কলাইর ছড়া।

মরিচ, লঙ্কা

কাঁচা, শুক্‌না এবং গোল বিশেষণে বিশেষিত হইয়া, কখনো বা না হইয়াই মরিচ শব্দটি প্রায় সমগ্র পূর্ব-বাংলায়ই প্রচলিত আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মরিচ বলিতে সাধারণতঃ এক গোল মরিচকেই (black pepper) বোঝায়। পূর্ব্ব-বাংলার কাঁচা মরিচ, শুক্‌না মরিচ বা মরিচ পশ্চিম-বাংলায় কাঁচা লঙ্কা, শুকনা লঙ্কা বা শুধু লঙ্কা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে বর্ত্তমানে লঙ্কা ও মরিচের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে; বিক্রেতাদের অনেক সময়ই উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতে শুনা যায়—'চাই বাবু লঙ্কা মরিচ।'

বিছা

সরীসৃপ জাতীয় 'বিছা' প্রাণীটির সনাক্তকরণেও বাঙ্গালী গোল করিয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় যে-জীবটিকে বলা হয় 'শুঁয়াপোকা', পূর্ব্ব-বাংলার অধিকাংশ লোকই তাহাকে বলে 'বিছা'; কিন্তু পশ্চিম বাংলার 'বিছা' স্বতন্ত্র এবং তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সরস্বতী বিছা, তেঁতুল বিছা ও কাঁকড়া বিছা। সরস্বতী বিছা ও তেঁতুলে বিছা পূর্ববঙ্গে চেলা ও সাপচেলা নামে অভিহিত হয় এবং কাঁকড়া বিছাকে সেখানে বলে বিচ্ছু, কোথাও বিকরে বিছাও শুনা যায়। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, পশ্চিম-বাংলার বিছায় কামড়ায়—ব্যথায় শরীর অবসন্ন হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব্ব-বাংলার বিছায় কামড়ায় না। উহার ছোঁয়াচ লাগিলে গা জ্বালা করে। এ জন্ম কোথাও ইহাকে 'ছেঙ্গা' নামেও অভিহিত করা হয়।

গড়

বাংলা অভিধানে গড় শব্দের অনেক অর্থই লেখা হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বাংলা-ভাষাভাষী প্রায় দুই কোটি লোক যে-অর্থে গড় শব্দ ব্যবহার করে, তাহা তাহাতে ধরা পড়ে নাই। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'গড়' বলিতে সাধারণ লোক বোঝে জঙ্গল বা জঙ্গুলে স্থান,—ব্যবহারও করে ঐ অর্থেই, যেমন—গজারি গড় (শাল জাতীয় কাঠের বন), বাঁশগড় (বহু ঝাড়-বিশিষ্ট বাঁশের বন), সুপারি গড় (সুপারি বাগান), কচু গড় (কচু গাছে পূর্ণ জঙ্গুলে স্থান)। গড়ে (জঙ্গুলে স্থানে) জন্মে বলিয়া একরূপ বিষাক্ত কীটকেও সে অঞ্চলে 'গড়' নামে অভিহিত করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গে কেহ গড় বলিতে জঙ্গল বোঝে না—বোঝে দুর্গ, পরিখা; 'গড়ের মাঠ' এখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ-সংলগ্ন বিরাট মাঠ, ময়দান। তবে বাংলার সর্বত্রই যে এক সময়ে দুর্গ বা পরিখা অর্থে গড় শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাদশাহী আমলে ঢাকা বিভাগের মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চলে যে দুর্গ ছিল, তাহা তো ঐতিহাসিক সত্য। এতদ্ব্যতীত আরও যে-যে স্থানে 'গড়' ছিল বলিয়া লোকশ্রুতি আছে বা প্রমাণিত হইয়াছে, আজ দুই-তিন শত বৎসর ধরিয়া সেই-সেই স্থানে মানুষ পুরুষানুক্রমে কি দেখিয়া আসিতেছে? দেখিতেছে শুধু নিবিড় বন-জঙ্গল। দুর্গের ইট-পাথর কামান-বন্দুক সমস্ত চাক্ষুষ প্রমাণ আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এখন বন-জঙ্গল। তাই কালক্রমে সে সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট গড়ের মানে রূপান্তরিত হইয়াছে বনে-জঙ্গলে। মধুপুরের গড়, ভাওয়ালের গড় বলিতে এক সময়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের দুর্গকেই হয়তো বুঝাইত, কিন্তু আজ লোকে বোঝে মধুপুরের জঙ্গল, ভাওয়ালের জঙ্গল।

শিলনোড়া, শিলপাটা, পাটাপোতা

এই কথা তিনটির প্রথমটি পশ্চিম-বঙ্গে, দ্বিতীয়টি ময়মনসিংহ-ত্রিপুরায় ও তৃতীয়টি ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশালে বিশেষ করিয়া প্রচলিত এবং তিনটির অর্থই এক—মশলাদি পিষিবার পাথরের সরঞ্জাম বিশেষ। কিন্তু 'শিল' 'পাটা' ও 'নোড়া' বস্তুগুলির সনাক্তকরণে দুই বঙ্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। যে পাথরের উপর মশলাদি পেষণ করা হয়, পশ্চিম-বঙ্গে তাহাকে বলা হয় শিল এবং যদ্দারা পেষণ করে তাহাকে বলে নোড়া; কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে ঠিক ইহার বিপরীত,—সেখানে যে মুষলাকৃতি পাথরটির দ্বারা পেষণ করে তাহারই নাম 'শিল' বা 'পোতা' বা 'পুতা' এবং যাহার উপর পেষণ করে তাহার নাম 'পাটা'। কাজেই পূর্ব্ব-বঙ্গের শিল পশ্চিম-বঙ্গের নোড়া এবং পশ্চিম-বঙ্গের শিল পূর্ব্ব-বঙ্গের পাটা।

খন্তি, খুন্তি

এই নামটির সঙ্গেও বাঙ্গালী মাত্রেই পরিচিত, কিন্তু বস্তুটির সনাক্তকরণে সকলে একমত নহে। খন্তি—খুন্তি বলিতে কেহ

বোঝে ভাজাকাটি—ভাজা বড়া উল্টাইবার লোহার বা পিতলের চেপ্টা কাটি, কেহ বা বোঝে মাটি খুড়িবার বাঁশ বা কাঠের হাতলযুক্ত লোহার এক প্রকার যন্ত্র—যাহা উভয় বঙ্গেই খন্তা নামেও অভিহিত হয়। খুন্তি বা ভাজাকাটির পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে একটি স্বতন্ত্র নামও আছে—'ছেনা'।

ঘুড়ি, তেলেঙ্গা

ঘুড়ি জিনিষটির সঙ্গে কে না পরিচিত! পশ্চিম-বঙ্গের আকাশে রঙীন কাগজের চতুষ্কোণ যে জিনিষটি হাজারে হাজারে উড়ে এবং যাহাকে ঘুড়ি বলে, পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক স্থানেই তাহাকে বলা হয় 'তেলেঙ্গা' বা 'তেলেঙ্গা ঘুড্ডী'; সে অঞ্চলে ঘুড়ির আকৃতি স্বতন্ত্র—কোনটি উড়ন্ত চিলের ন্যায়, কোনটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ন্যায়, কোনটি লণ্ঠনের ন্যায়, কোনটি বা বেলুনের ন্যায়। সেগুলি সাধারণ গুলিসূতায় উড়ান যায় না ছিঁড়িয়া চলিয়া যায়;. পাট বা শনের সূতায় সে ঘুড়ি উড়ে, সে ঘুড়ি বড় দুরন্ত—পদ্মারই মতো প্রমত্ত। পূর্ব্ব-বঙ্গের গ্রাম্য উচ্চারণে সে-ঘুড়ি—ঘুড্ডী।

খড়ি

এই 'খড়ি' কথাটিতে পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসামের প্রায় তিন কোটি লোক বোঝে—লাকড়ি, জ্বালানী কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি; আর পশ্চিম-বঙ্গের লোক বোঝে—চক, খড়িমাটি। পূর্ব্বাঞ্চলে পাটশোলা বা পাঁকাটিরও অপর নাম পাটখড়ি। সে অঞ্চলে চক বা খড়িমাটি অর্থে যে 'খড়ি' কথার প্রচলন একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু উহা প্রধানতঃ শিক্ষিতসমাজেই আবদ্ধ; সাধারণ লোক 'খড়িমাটি'ই বলিয়া থাকে।

আইল্সা, আলিসা

এই শব্দটির অভিধান-ধৃত এক অর্থ হইতেছে ছাদের প্রান্ত বা কার্নিশ। কিন্তু স্থানভেদে ইহা অন্য জিনিষকেও বোঝায়। টাঙ্গাইল ময়মনসিংহেরই একটি মহকুমা, অথচ এই দুই স্থানের 'আইলসা' কথাটির উদ্দিষ্ট বস্তুতে কি বিরাট পার্থক্য। টাঙ্গাইলে 'আইলসা' বলা হয় আগুনের মালসাকে, আর পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে আইলসা বলা হয় গাছপিড়িকে বা খাটো পায়াযুক্ত লম্বা বেঞ্চিকে; এই অঞ্চলে টাঙ্গাইলের 'আইলসা' 'আইল্যা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কাঠা

কাঠা শব্দটির একটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য অর্থ হইতেছে—জমির মাপ-বিশেষ। কিন্তু এই মাপের পরিমাণ বাংলার স্থানভেদে এতই বিভিন্ন যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। শহরে বন্দরে সরকারী খাতাপত্রে অবশ্য কাঠার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাপ আছে এবং তাহা হইতেছে '৩৩ শতাংশে এক বিঘা বা ২০ কাঠা এবং এক কাঠায় ৭২০ বর্গ-ফুট বা ৩২০ বর্গ হাত। পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামেও এই মাপই প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব-বাংলার পল্লীগ্রামের স্থানীয় মাপগুলি লক্ষ্য করিবার মতো। পূর্ব-ময়মনসিংহের নশিরুজিয়াল, হুসেনসাহী প্রভৃতি কয়েকটি পরগণায় ১৮০০ বর্গ-হাতে বা '১২ শতাংশে এক কাঠা; কাজেই কলিকাতায় যেখানে '৩৩ শতাংশে এক বিঘা বা ২০ কাঠা ধরা হয়, উক্ত অঞ্চলসমূহে মাত্র ৪ কাঠায়ই যাইয়া দাঁড়ায় '৩৮ শতাংশ। স্পষ্টতঃই কলিকাতার প্রায় ৬ কাঠা ওদিককার ১ এক কাঠার সমান। অনেক উদ্বাস্তুই হয়তো তাহা জানেন না; জমি কিনিতে বসিয়া, বায়নাপত্র করিয়া, শতাংশের অঙ্ক হইতে পরে জানেন, জানিয়া বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন—কাঠা কত পড়িল—৩০০৲ তিনশ' কি ১৮০০৲ আঠারশ'।

কলিকাতা এবং ময়মনসিংহের দূরত্ব তো অনেক—প্রায় ৩০০ মাইল। এক ময়মনসিংহেরই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের এপারে-ওপারে কাঠার মাপের কত পার্থক্য। নশিরুজিয়াল পরগণায় যেখানে ১২ শতাংশে এক কাঠা আলাপসিংহ ও রণভাওয়াল পরগণায় সেখানে এক কাঠা ৬২ শতাংশে। আর অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব না।

ধান চাল ইত্যাদি মাপিবার পাত্রবিশেষকেও কাঠা বলা হয়; স্থানভেদে ইহার পরিমাপও বিভিন্ন। ১ কাঠা ধান বলিলে কোথাও বুঝাইবে দশ সের, কোথাও পাঁচ সের, কোথাও বা পনেরো সের কি কুড়ি সের।

এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আমি আর অধিক উত্থাপন করিব না। বারান্তরে একই বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায়, অথচ পশ্চিম-বঙ্গে ও পূর্ব-বঙ্গে স্বতন্ত্র নাম ব্যবহৃত হয়—এইরূপ কতকগুলি শব্দ (নাম) লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এ কথা সত্য যে, এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে; এখন একই পরিবারে একই জিনিষের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম প্রবেশলাভ করিতেছে।

কোহিনূরের মূল্য

কোহিনূরের ইতিবৃত্ত নিতান্ত অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে ঐ মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা উজ্জয়িনী-রাজের শিরোভূষণ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ অধিকার করিয়া উহা প্রাপ্ত হন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে ঐ মণি মোগলদিগের অধিকারে আসে। ইহার পর নাদির শাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে পরাজিত করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত হন। আহম্মদ শাহের পরলোক প্রাপ্তির পর উহা তদীয় উত্তরাধিকারী শাহ সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিং শাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। এক্ষণে উহা ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর নিকট রহিয়াছে। কথিত আছে, একদা বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি কোহিনূরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎ সিং হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এস্কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্বাধিকারীর নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছেন। বৃটিশ দস্যুরা যেমন ভারতের নিকট হইতে কোহিনূর মণি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, ভারতেরও কি এখন, তেমনি ঠিক ঐ মূল্য দিয়া ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে কোহিনূর ফিরাইয়া আনিবার সময় হয় নাই?

সতী

লিন উ টাং

—"মেইহুয়া, ভিতরে এস"—মেয়েকে ডেকে বললে ওয়েন—"তোমার মত সোমত্ত মেয়ের এ ভাবে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না।"

মেইহুয়া গভীর লজ্জায় মাথা নত করে ঘরে ঢুকল। অসামান্য সুন্দরী দেখতে মেয়েটি। সাদা ধবধবে মসৃণ দাঁতের সারি, লাল টুকটুকে ঠোঁট, আর গায়ের রং পীচ ফলের মত। সরল, তেজী, একটু বা জেদী—এই ধরণের মেয়েদের সাধারণতঃ গাঁয়ের দিকেই চোখে পড়ে। মাথা নীচু করে যদিও সে ঘরে ঢুকল কিন্তু তার অনিচ্ছুক পদক্ষেপে মনের অসন্তোষই প্রকাশ পেতে লাগল। মনটি বাইরের জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে মেয়েটির।

—"অন্য মেয়েরাও তো, দেখছে"—প্রতিবাদের সুরেই কথাটি বলে সে ঘরে গেল সেখান থেকে। সোত্তর-আর্মী লুনের একটি সেনাদল সেই সময় মার্চ করে যাচ্ছিল তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। ইট-বসান সরু রাস্তাটি তাঁদের পায়ের চাপে গম্-গম্ করছে। নারী-পুরুষ সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে দেখতে কোথায় চলেছে তারা। বুড়ীরা বাইরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে আর তরুণীরা দরজার ভিতরে চিকের আড়াল থেকে দেখছে। তারা দেখছে কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

কিন্তু মেইহুয়া একেবারে চিকের বাইরে রকে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সহজেই নজরে পড়তে পারে সবাইকার। সৈন্যদলের শেষে চলেছে দীর্ঘদেহ ক্যাপ্টেন। মেইহুয়া ধরা পড়েছে তার তন্বী কিশোরীর দেহ-লোলুপ দৃষ্টির জালে। যখন সে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেও স্মিত হাস্যের দ্বারা অভিনন্দিত করেছে ক্যাপ্টেনকে। দৃষ্টি বিনিময় করে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেন—মেয়েটির সুন্দর মুখাবয়বের প্রতি আর দ্বিতীয় বার ফিরেও চাইলে না।

দক্ষিণে ত্রিশ মাইল দূরে সুচাও থেকে এসেছে বাহিনীটি—একটি দস্যুদলকে উৎখাত করতে। দস্যুদলটি নীল পর্বতমালায় ঘাঁটি করে পার্শ্ববর্তী সহরাঞ্চলে দুর্দ্ধর্ষ অভিযান চালাচ্ছে কিছু কাল ধরে। স্থান চোয়াংয়ের মত ছোট্ট সহরে সেনাদলের থাকার স্থান খুবই সংকীর্ণ। কয়েকটা মন্দির পাওয়া গেল কিন্তু অফিসারদের থাকতে দিতে হবে গৃহস্থদের ঘরে, যেখানে তারা অন্ততঃ রাতে মাথা গুঁজতে পারবে সুখকর শয্যায়।

ক্যাপ্টেনের মনেও উদয় হয়েছে কথাটা এবং সে যদি বাড়ীটি চিনে রাখার উদ্দেশ্যে আর এক বার মুখ ফিরিয়ে দেখত মেয়েটিকে, তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যেত না। সৈন্যদের ব্যবস্থা করে বিকেলের দিকে ফিরে এল সে মেয়েটির গৃহে এবং যাচ্ঞা করল তাদের আতিথেয়তা। বাড়ীটিতে থাকে মাত্র দু'জন বিধবা—মেয়েটির মা আর তার ঠাকুমা। কিন্তু ক্যাপ্টেন তা জানত না। নিজের অবস্থা সে বিশদ ভাবে বর্ণনা করল। মাসাধিক কাল এই অভিযান স্থায়ী হতে পারে—বেশীর ভাগ সময়টাই তাকে কাটাতে হবে বাইরে। কিন্তু সহরে যখন সে ফিরে আসবে তখন যদি রাতে মাথা গুঁজবার মত একটু জায়গা পায় বড় বাধিত হবে সে। নাম আদান-প্রদান হোল। ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে জানতে পারলে যে, বাড়ীতে কোন পুরুষ নেই।

সকালে যে মেয়েটিকে দেখেছিল সে-ও আছে। মা-ঠাকুমা যাতে হাঁ বলেন সেই আশায় উত্তেজিত, উৎকন্ঠিত সে। ঠাকুমা'র বয়স যাটের কোঠায়—দেহে বলিরেখা দেখা দিয়েছে—মাথায় বাঁধা একটি কালো ভেলভেটের ফিতা। মা পরিণত যুবতী—একটু কৃশ কিন্তু সুন্দরী। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছে। ছোট মুখের তুলনায় সুগঠিত নাক বেশ টিকোল। মেয়েরই শান্ত ঢাকা রূপ হোল মায়ের। যে খর যৌবন-জ্বালা ও কামনা মেয়ের সর্বাঙ্গে ঝকঝক করে, মায়ের মধ্যে সেগুলি অনেক প্রশমিত, কিন্তু মনে হয়, সে আগুন আজো নেভেনি, বরং চিত্ত-শিখায় সযত্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। তার বুদ্ধিদৃপ্ত তীক্ষ্ণ চোখে এমন একটা রহস্যনিবিড়তা যা ভেদ করার একটা মূল্য আছে,—মনে হোল ক্যাপ্টেনের কাছে।

তিন যুগের প্রতিভূ তিনটি নারীর এক পরিবারে এক জন অপরিচিত পুরুষকে থাকতে দেওয়ার মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে বই কি! কিন্তু এই তরুণ অফিসারের মুখের দিকে তাকালে যে-কোন নারী-হৃদয় সহজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রলুব্ধ হবে। ক্যাপ্টেনের চেহারাটি বেশ দীর্ঘ সুচিক্কণ—প্রশস্ত বক্ষ—প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত—আর মাথাভরা এক রাশ ঘন কালো চুল। পেইয়াং সামরিক বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট সে। কথাবার্তা, আচার-আচরণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শালীনতার ছাপ সুপরিস্ফুট। তার নাম হোল লি সিং। লোকে ডাকে সিং বলে।

"—আমার খাবারের জন্যে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমি চাই শুধু একটি আরামী শয্যা, স্নান করার একটি পরিচ্ছন্ন জায়গা, আর সময়-অসময়ে চা।"

—"এ আর এমন বেশী কি।" বললে ওয়েন। "আপনার যদি সুবিধে হয়, সহরে যখন থাকবেন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে বড়োই আহ্লাদ হবে।"

বাড়ীটি নোংরা, কিছুটা অন্ধকারও। তবু হল-ঘরের সামনে একটি বাঁশের কৌচের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। অবশ্য তাহলে মেইহুয়াকে শুতে হবে অন্দরে উঠোনে তার মায়ের সাথে। ঠাকুমা'র উপস্থিতি যে কোন প্রকার কানাঘুষার হাত থেকে আগলে রাখবে তাদের।

স্বামিহারা এই নারী দু'টি যে মুহূর্তে ক্যাপ্টেনকে দেখেছে তখন থেকেই তাদের মনে হয়েছে মেইহুয়ার পক্ষে এই উপযুক্ত লোক। মেইহুয়ার বিয়ের বয়স হয়েছে—কথা পাড়লেই হয়। অদ্ভুত সুন্দরী মেইহুয়া। তার প্রণয়ীর অভাবও নেই, সে-ও জানে সে কথা।

কিন্তু ওয়েন-পরিবারে হতভাগ্য পুরুষদের সম্বন্ধে একটি কুসংস্কার আছে। এর মধ্যেই দু'জন বিধবার সংখ্যা বেড়েছে—বাবা ও ঠাকুর্দা বিয়ের সামান্য ব্যবধানের মধ্যেই গতায়ু হয়েছেন। পর-পর দু'বার যখন ঘটেছে তিন বার ঘটতেই বা বাধা কি! মেইহুয়ার পাণিপ্রার্থী যে, সে তো সব জেনে-শুনেই মৃত্যুকে যাচ্ঞা করবে। এই বাড়ীখানা ছাড়া সম্পত্তি বলতে তো আর কিছু নেই। কাজেই লোকেরাও নিরাসক্ত তাদের প্রতি। মেইহুয়ার রূপমুগ্ধ তরুণরা তাদের বাপ-মা কর্তৃক নিরুৎসাহিত হয়। তাই উচ্ছল মেইহুয়ার বয়স যদিও উনিশ হয়েছে আজো কোন পুরুষ আসেনি তার জীবনে নিবিড় হয়ে।

ক্যাপ্টেন লি সিং এ বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি নারীর জীবনে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ক্যাপ্টেন মেইহুয়ার প্রতি একটু বেশী মনোযোগী—অন্য নারী দু'টির সঙ্গও উপভোগ

করে। অমায়িক সে—ঠাকুমা'র প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ওয়েনের সঙ্গেও প্রেম-প্রত্যাশী পুরুষের মতই অদ্ভুত নরম আচরণ করে। এই স্বামিহারাদের গৃহে সেই তো এনেছে পুরুষের কণ্ঠস্বর—বহু দিন অজ্ঞাত হাসির ঝংকারে গম্-গম্ করে সারা বাড়ী। চিরকাল থাকবে ক্যাপ্টেন এই প্রত্যাশাই করে তারা।

প্রথম দিন ক্যাম্প থেকে ফিরে লি সিং মেয়ের খোঁজে এসে পেল মাকে অন্দরে। এখনও সে জানে না যে, এই পরিবারের বংশ-কুলুজীতে এই বিধবাদের এক অতুলনীয় মর্যাদার ইতিহাস আছে এবং ইতিমধ্যেই জ্ঞাতিরা একটি সতী-তোরণের জন্য আন্দোলন সুরু করেছে।

মনে মনে যদিও সে মেইহুয়ার কথা ভাবছিল, জিজ্ঞেস করলে ঠাকুমা'র কথা। "বোধ হয় তিনি বাগানে আছেন। দেখা করবেন, চলুন"—বললে ওয়েন।

বাড়ীটার তুলনায় বাগানটি সুপ্রশস্ত। কয়েকটি ন্যাসপাতি, পুষ্পিত গুল্ম, এক সার বাঁধাকপি, পেঁয়াজ ও অন্যান্য তরি-তরকারি—এই নিয়ে বাগান। পড়শীদের বাড়ীর দেয়াল ঘিরে রেখেছে বাগানটিকে। শুধু পূব কোণে পাশ-দরজা দিয়ে যাওয়া যায় একটি সরু গলির পথে। এই দরজার পাশেই একখানি ঘরের আকারের কাঠামো—অনেকটা পাহারা-ঘরের মত দেখতে—তার পরই মুরগীর খোঁয়াড়।

ঠাকুমা একটি পুরোনো কাঠের চেয়ারে বসে পড়ন্ত বেলার রোদ পোয়াচ্ছেন। একটি কালো পোষাকে ওয়েন নিজেকে ঘিরেছে অতি নিখুঁত ভাবে। চুলগুলি কপালের উপর উঁচু করে বাঁধা। ক্যাপ্টেনকে সে বাগান ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল। তার মুখে শ্লীলতা আর গর্বের এমন এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ যা বিমোহিত করে মনকে। চোখেতেও কেমন একটা নরম দ্যুতি—আর দেহ-সৌষ্ঠবের মার্জিত রুচিবোধ দেখে মনে হয়, সৌন্দর্যের পূজারিণী এই নারীর সব কিছুই এমন সুছন্দবদ্ধ যে, নিজের গণ্ডীর মধ্যেই আপনা সমাহিত সে। এটা সে ভাল করেই জানে যে, যদি সে ইচ্ছা করে যে কোন মুহূর্তে'ই বিয়ে করতে পারে।

—"আপনি নিজের হাতেই বাগানের সেবা করেন বুঝি?"

—"না। চ্যাং দেখে-শুনে।"

—"চ্যাং কে?"

—"বাগানের মালী। ফুটি, শসা, বাঁধাকপি বিক্রীর দরকার হলে সেই বাজারে নিয়ে যায়। এমন সজ্জন লোক দেখা যায় না।" পাহারা ঘরের দিকে দেখিয়ে বললে—'ঐ খানে থাকে সে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের দরজা দিয়ে দেখা দিল চ্যাং। গরম কাল। কোমর অবধি অনাবৃত। রোদে মাজা সুগঠিত মাংসপেশী চকচক করছে। বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার বেণীটি চাষীদের মতই পিছনে খোপা করে বাঁধা। তার মুখের ভাব এমন যে, যে-কোন অবস্থাতেই তাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

চ্যাংকে পরিচয় করিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। ঘেরা কুয়োর কাছে গিয়ে এক বালতী জল তুলে তুম্বী পাত্রে ঢেলে প্রথমে চকচক করে খেয়ে নিল খানিকটা—তার পর বাকিটা ঢেলে ফেললে হাতে। এই দৃশ্যের অকৃত্রিমতা মুহূর্তে'ই মুগ্ধ করে মনকে। সে যখন জল পান করছিল এবং তার পরিচ্ছন্ন দেহাবয়ব সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল, ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করল ওয়েনের ওষ্ঠাধর মৃদু কাঁপছে দীপশিখার মত।

—"ও না থাকলে আমাদের যে কি হোত ভাবতে পারি না"—বললে ওয়েন—"মাইনে চায় না। তিন কুলে কেউ নেই। ওর শুধু দরকার খিদের সময় খাবার আর ঘুমের সময় মাথা গোঁজবার মত একটা আস্তানা। ও বলে, পয়সা নিয়ে ও করবে কি। ওর মা যখন বেঁচে ছিলেন তিনিও থাকতেন আমাদের সঙ্গে আর তখন ও এমন মাতৃভক্ত ছিল! এখন ও সম্পূর্ণ একা—পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। ওর মত এমন পরিশ্রমী সাধু লোক আমি দেখিনি কাউকে। গত বছর অনেক সাধ্যি-সাধনার পর একটি জ্যাকেট তৈরী করে নিতে বাধ্য করেছি। আমাদের পরিবারের কাছ থেকে ও যা পায় তার চেয়ে ঢের বেশী করে আমাদের।"

আহারের পর ক্যাপ্টেন আবার যখন বাগানে ফিরে এল চ্যাং তখন মুরগীর খোঁয়াড় ঠিক করছিল। লি সিং তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ছোট-খাট ঘটনা আমাদের জীবনে এমনিই অর্থদ্যোতক যে, এই মুরগীর খোঁয়াড়ই এক দিন ওয়েনের ভাগ্যের সূত্রের সঙ্গে এমন অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, ক্যাপ্টেন সে কথা পরে ভেবে বিস্ময় বোধ করেছে। ওয়েন সম্বন্ধে নানা কথা ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করতে লাগল চ্যাংকে।

কথায় কথায় বললে চ্যাং—"ওঁর তুলনাই হয় না। উনি যদি না থাকতেন, বুড়ো বয়সে মা এত আরাম বা সুখ পেতেন না। লোকেরা বলাবলি করছে রাজগুরু শীগ্‌গিরই সরকার থেকে এঁদের জন্যে একটি সতী-তোরণের ব্যবস্থা করে দেবেন। কুড়ি বছর বয়সে ওর শাশুড়ী বিধবা হয়েছেন। তাঁর একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় ওয়েনের। কত দিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও যেন স্পষ্ট শুনতে পাই—এক দিন সকালে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ছেলেটা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গেল। আঠার বছর বয়সে ওয়েন বিধবা হলেন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্বা। তার পর মেয়ে হোল। সেই মেইহুয়া এখন সোমথ মেয়ে হয়ে উঠেছে। ওকে বিয়ে করুন না কেন ক্যাপ্টেন। যে-কোন পুরুষের পক্ষে ও উপযুক্ত বৌ হবে।"

চ্যাংয়ের সারল্যে শুধু হাসলেন ক্যাপ্টেন। মেইহুয়ার সৌন্দর্য সম্বন্ধে আর অত করে বোঝাতে হবে না তাকে।

—"সতী-তোরণটা কি?"

—"জানেন না আপনি? এই সহরে একমাত্র হু-পরিবারে সতী-তোরণ আছে এবং ওয়েন-পরিবারের তাতে ঈর্ষার কারণ ঘটেছে। তারা রাজগুরুকে চিঠি লিখে জানিয়েছে নিজেদের বংশের এই স্বামীহারা বিধবা দু'টির কথা। ওয়েনের শাশুড়ী চল্লিশ বছর নিষ্কলঙ্ক বিধবার জীবন যাপন করেছেন। সবাই বলাবলি করছে, রাজগুরু না কি তাঁদের সম্মানের জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন করেছেন একটি সতী-তোরণ নির্মাণ করে দেবার জন্য। একই পরিবারে অত অল্প বয়সে স্বামীহারা দু'টি বিধবা খুব কম দেখা যায়—একটু অস্বাভাবিকও বটে।"

—"তাই না কি?"

—"আপনার সঙ্গে রহস্য করে আমার লাভ? আর এ সব

ব্যাপার নিয়ে কি রহস্য করা চলে! লোকে বলে, সতী-তোরণের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট বাহাদুর না কি হাজার টাকা দেন। টাকা ও নাম দুই-ই হবে? তবে সত্যিই এঁরা যোগ্য পাত্রী।"

ক্যাপ্টেন বহু বার এলেন গেলেন—দম্পতিদলকে অনুসরণ করার চেয়ে মেইহুয়াকে অনুসরণ করতেই বেশী উৎসাহী যেন সে।

মেইহুয়াও ক্যাপ্টেনকে ভালবেসে ফেলল—এমন ভালবেসে ফেললে যে, এর আগে কোন মেয়ে যেন আর এমন বাসেনি। সিং যেন মায়া-মুগ্ধ। সেও এই প্রেম-অনুরাগ একটুও গোপন রাখলে না তার কাছ থেকে। মেইহুয়ার মধ্যে সে কি পূজা করে এবং কেন তাও বললে তাকে। অন্য মেয়েদের পক্ষে এটা মন-ভোলানোর একটা কৌশল মনে হতে পারে। কিন্তু মেয়েরা যখন মন-প্রাণ উজাড় করে ভালবাসে—মেয়েরা যেখানে অকপট সেখানে এ রকম ঘটে। সংযত হলেও ক্যাপ্টেন আর মেইহুয়ার আচরণে বড়রাও জানতে পারে এই মন দেওয়া-নেওয়ার কথা। লি সিং এখন সাতাশ। সেও একলা জীবনে। কাজেই ঠাকুমা'র কাছে সব-কিছুই ভবিতব্য বলে দৃঢ়-প্রতীতি জন্মায়।

কোন প্রকার অন্যায় কিছু না ঘটে সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা হোল। অন্দর-মহলের পশ্চিম-দুয়ারী ঘরে ঘুমায় ঠাকুরমা আর পূব-দুয়ারী ঘরে মা ও মেয়ে। রাতের আহার-পর্ব সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর-মহলের দরজায় খিল পড়ে যায় আর ওয়েন বিশেষ করে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভোলে না।

কিন্তু মা যেন নিজেকে প্রতারণা করছেন। লি সিং মাঝে-মাঝে ক্যাম্পে থাকে—অন্যত্র মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটাও বিচিত্র নয়। মেইহুয়াও মাঝে-মাঝে বিকেলে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায় এবং ফেরে রাত করে। ঠিক যে সময়ে ক্যাপ্টেন নগরে থাকেন না তখনই ঘটে এই ঘটনা।

এক দিন সে রাতের আহারের সময়ের দু'ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরল। তখন জুলাই মাস। দিনগুলি দীর্ঘ। সহরের বাইরে একটি সড়ক ধরে নেমে এল সিং ও মেইহুয়া এক অরণ্য-সমাকুল পাহাড়ের দিকে। অপূর্ব বিকেল। দুপুর-রবির সে হুল-ফোটানো তেজ মিলিয়ে গেছে—চিকচিকানি সবুজ শেওলা-ঢাকা পাহাড়ের বুকে বনস্পতির অরণ্যে উঠেছে স্নিগ্ধ বাতাসের হিল্লোল। দূরে দীঘি। আর দীঘির সবুজ পাড়ে ছাড়িয়ে পড়ে আছে সুন্দর হ্রদটি। ক্যাপ্টেন পাশে—মেইহুয়ার জীবন যেন শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসার রাখীতে বাঁধা দু'টি প্রাণী। যৌবন কালে মাও যে কী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন মেইহুয়া বললে সে কথা ক্যাপ্টেনকে—কত লোক তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটু কৃপা-কটাক্ষের জন্য কিন্তু প্রত্যেককেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। মেইহুয়া ক্যাপ্টেনের কানে-কানে বললে—"আমি যদি 'মা' হতুম আমি আবার বিয়ে করতুম।"

—"মা'র জন্য গর্ববোধ কর না?"

—"করি। তবে পুরুষকে নিয়ে মেয়েরা ঘরকন্না করবে এই আমি চাই।"

—"কিন্তু এ একমাত্র ধার্মিকা নারীর পক্ষেই সম্ভব।"

—"মেয়েদের জীবন কিসের জন্য"—মেইহুয়ার কথায় প্রতিবাদের সুর—"বিয়ে করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না করা—এই নয় কি? আমরা যদি এত গরীব না হতুম মা কখনই অত অল্প বয়সে বিধবা হতেন না। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি?"

—"ঐ সব সতী-তোরণ-টোরণ আমি বিশ্বাস করি না।"

হো-হো করে হেসে ওঠল ক্যাপ্টেন।

—"বড় হয়ে এ সব কথা আমি অনেক ভেবেছি। মা খু উচ্চাকাংখী মেয়ে—নিজের বিষয়ে ভয়ংকর কঠোর। বিধবা হওয়া পর দ্বিতীয় বার বিয়ে না করার মধ্যে সম্মানের অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয়, মা এই সম্মানে গর্বিত, জানি না কেন এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করছি।"

তার মা ও ঠাকুমা'র জন্য তাদের পরিবারের লোকেরা যে সতী-তোরণের চেষ্টা করছে, সে সম্বন্ধেও সিং অনেক কথা জিজ্ঞেস করল মেইহুয়াকে।

—"মা'র জন্য আমিও গর্ববোধ করি। কিন্তু বিয়ের পর আমরা তো চলে যাব এখান থেকে। তখন তিনি একলা জীবনে ঐ হাজার টাকা নিয়ে কি করবেন? আরো দীর্ঘ কুড়িটি গৌরবময় নিরালা জীবনের বন্দিত্ব? তার পর মৃত্যু—পুণ্যাত্মা শবের মৃত্যু!"

এ রকম কথা শুনতে বেশ আমোদ লাগছিল ক্যাপ্টেনের। জীবনের স্বার্থে আত্মহারা এই কুমারীকে কি করে বলা যায় যে তুমি ভুল করেছ? এই দুই বন্ধ্যা নারীর গৃহের নিরানন্দ জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে। হয়ত সে যা বলছে গভীর অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হচ্ছে। হঠাৎ বুঝতে পেরে মেইহুয়া বলে উঠল—"ও: মা! আমাকে ছুটতে হবে যে। এত দেরী হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি।"

ক্যাপ্টেনের দ্বিতীয় অনুপস্থিতির ব্যবধানে ঘটল একটি ঘটনা। পড়শীদের কাছ থেকে মা জানতে পারলেন যে, প্রেমিক যুগলকে সহরে একসঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে। নগরের পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে যাবার সড়কেও দেখা গেছে তাদের। মায়ের সতর্ক দৃষ্টিতে এড়ায় না কিছুই। মা প্রশ্ন করে মেয়েকে। জলভরা নত চোখে মেয়ে স্বীকার করে নিজের অপরাধ। ক্যাপ্টেন যে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে-কথাও জানাতে ভোলে না। মা দুর্বাশা-ক্রোধে আগুন হয়ে ওঠেন।

—"আমারই মেয়ে যে আমাদের পরিবারে এত বড় অসম্মান বয়ে আনবে ভাবতে পারিনি। তোমার ঠাকুমা আর আমি এ সহরের আদর্শ। তুই ওয়েন-পরিবারের মুখে কলংক দিলি। পাড়া-পড়শীরা যখন জানতে পারবে তারা তো নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। আমার মেয়ে তুই!"

চোখের জল মুহূর্তে-মুহূর্তে মেইহুয়া ঝংকার দিয়ে উঠল—"আমি একটুও লজ্জিত নই। আমার বয়স হয়েছে বিয়ের। যদি তাকে পছন্দ না হয় অন্য বর জুটিয়ে দাও। আমি তরুণী—এই প্রেমহীন গৃহে নিজেকে তিলে-তিলে ক্ষয় হতে দেব না নিজেকে। আর তোমার এই নিঃস্ব মরুভূমি জীবনে যাকে তুমি পবিত্র বৈধব্য বল—আমি তো কিছুই খুঁজে পাই নে।"

মেয়ের উক্তি শুনে বিস্ময়ে মায়ের দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

—"কি বললি তুই ?" কথার খেই হারিয়ে যায়—মেয়ের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে মাথা ঘুরতে থাকে ওয়েনের।

—"বাজ পড়ুক তোর মাথায়—তোর জিভ কেটে নিক"—

এই প্রকার উলঙ্গ সোজাসুজি ভাবে বোমা নিক্ষেপের ক্ষমতা একমাত্র তরুণী কিশোরীর পক্ষেই সম্ভব। কতখানি যে সে মাকে আঘাত করেছে—তার কথাগুলি অপ্রত্যাশিত ভাবে কত গভীর দাগ কেটেছে—কোন ধারণাই নেই তার! মা'র আবার বিয়ে—এ যে অচিন্তনীয় ব্যাপার! এ যে কত রূঢ়—মর্মন্তুদ! "তোকে আমি এত দিন তোতা পাখী পড়া পড়িয়েছি। তোর একটুও লজ্জা বোধ নেই"—

মা ভেঙ্গে পড়লেন—অসহায়ের মত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। একটি মাত্র কথা সময় সময় যে কী অঘটন ঘটাতে পারে ভাবলে বিস্ময় লাগে। এই দীর্ঘ উনিশ বছরের এত ব্যথা-বেদনা যা জমাট বেঁধেছিল এত দিন, আজ বিগলিত হয়ে ঝরে পড়তে লাগল চোখের লোণা জল হয়ে। কত না তিনি সয়েছেন। আর এখন তাঁর নিজের পেটের মেয়ে তা নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করছে—ব্যঙ্গ করছে এত দিনের স্বার্থত্যাগ আর আত্মত্যাগের বিড়ম্বনাকে, যার মূল্য একমাত্র তিনিই জানেন।

যখন ছোটটি ছিলেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত বৈধব্যের শুচিতা, তাঁর আদর্শের সার্থকতা সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তোলেনি কোন দিন। এ যেন সূর্যকেই প্রশ্ন করার মত! আবার বিয়ের কথা কেবল অচিন্তনীয়ই নয়, এই দীর্ঘ বছরগুলিতে কোন দিনই সে চিন্তা তিনি আমলই দেননি মনে। চিরদিনের মতই এ ব্যাপারের যবনিকা টেনে দিয়েছেন তিনি জীবনে। মেয়েকে আর তিরস্কার করলেন না। টুকরো-টুকরো হয়ে দুঃখের স্তূপে পরিণত হয়েছেন তিনি। মেইহুয়া কেমন একটা আতংকে আর দ্বিরুক্তি করলে না। কিন্তু মা মেয়ের এই রূঢ় বিদ্রূপে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। বিধবার নিষ্ফলা বন্ধ্যা-জীবন সম্বন্ধে মেইহুয়া যা বলেছে সব সত্যি—অতি সত্যি। তিনি টেবিলের উপর হাত রেখে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মন চলে উধাও পাখা মেলে। ক্যাপ্টেন মেইহুয়ার মুখে কৃত্রিমতার আবিলতা নেই। তিনি যখন তরুণী ছিলেন তখন যদি এমনি কোন তরুণ আসত তাঁর জীবনে।

ওয়েন ক্যাপ্টেনের ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করা স্থির করলেন। হয়ত সে এখন সহরেই আছে। মেয়ে হয়ত তাকে গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসতে পারে—পালিয়েও যেতে পারে। তিনি মেইহুয়াকে ঘরে তালা-চাবী বন্ধ করে রাখলেন।

তিন দিন পরে ক্যাপ্টেন ফিরে এলে ওয়েনই তাকে একা অভ্যর্থনা করলেন। একটু গম্ভীর মুখেই যেন।

—"মেইহুয়া কোথায় ?"

—"ভিতরে। ভালই আছে।"

—"সে এল না যে—"

—"এই প্রশ্নের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমি" ওয়েনের কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা। তিনি ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন—"ভেবেছিলাম তুমি সহরেই আছ। ও যে কেন তোমাদের মিলন-স্থলে যায়নি—অবাক করলে।"

—"মিলন-স্থল ? কোথায় ?" বিস্ময় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে—"আজই আমি এসেছি সহরে।"

—"ধাপ্পা দিয়ো না। আমি সব জানি"—

ওয়েনের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ-রোষের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। মুখে সেই মুগ্ধকর শালীনতা আর গর্বের অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

ক্যাপ্টেন নির্বাক্। ভিতর-মহল থেকে মেইহুয়ার আর্ত চীৎকার ভেসে আসছে—"আমায় ছেড়ে দাও। সিং, আমি এখানে, আমায় বাঁচাও। আমায় যেতে দাও"—তার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ।

এ সবের অর্থ ? ক্যাপ্টেন রেগে ছুটে গেল ভিতর-মহলের দিকে—ঠাকুমাও বেরিয়ে এসেছেন নিজের ঘর থেকে। ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে এসে অশ্রুভরা চোখে বললেন তিনি—"তুমি কি ওকে বিয়ে করতে রাজী ?"

বিস্ময়ে সিং মাথা নত করল। এবার সে বুঝতে পারলে সব কথা।

—"নিশ্চয়ই রাজী। এবার দরজা খুলুন—কথা বলতে দিন ওর সাথে"—

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মেইহুয়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংয়ের কোলে। কাঁদতে কাঁদতে বলল—"আমায় এখান থেকে নিয়ে চল—নিয়ে চল।"

এবার মায়ের পালা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার। ক্যাপ্টেন বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগল—নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু এ সবের সাথে যে কান্নার কোন যোগই নেই সে কথা খেয়ালই হোল না তার।

ক্যাপ্টেন এমন ভাবে কথা বলতে লাগল যেন সে ভাল করেই জানে, কোন মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে সে। যা-যা করেছে তার জন্য দুঃখিত সে সত্যি, কিন্তু মেইহুয়াকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই মনে আসেনি তার। সমস্ত দোষ সে নিজের মাথায় নিলে—ক্ষমা চাইলে তাদের কাছে।

সংকট-মুহূর্ত কেটে গেলে অবস্থাটা কোন দিক থেকেই খারাপ মনে হোল না। ক্যাপ্টেনের বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সমস্ত ঘটনার মোড় ঘুরে গেল। দস্যু-অভিযানও শেষ হয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন-পরিবারের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল, একটু যেন তাড়াতাড়িই বিয়ে হয়ে গেল মেইহুয়ার।

মানুষের মন এমন এক বস্তু যার সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। মেইহুয়া আর ক্যাপ্টেনের সংক্ষিপ্ত প্রেমানুরাগ বিয়েতে পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু ওয়েনের মনের উপর এক অদ্ভুত প্রভাব রেখে গেল সব কিছু।

তিন মাস পরে ঠাকুমা মারা গেলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগ দিতে ক্যাপ্টেন একাকীই এলেন।

ওয়েন ক্যাপ্টেনকে জানালেন যে, তাদের দাদা মশাই তাকে রাজগুরুর চিঠি দেখিয়েছেন—সতী-তোরণের জন্য সুপারিশ করবেন তিনি। এই সংবাদ জ্ঞাতি-মহলে রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সতী-তোরণ পাওয়ায় তাদেরই যেন স্বার্থ আছে এমন ভাব দেখাতে লাগল তারা।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা—ওয়েন যখন এই ঘটনা বলছিল

ক্যাপ্টেনকে, একটু উৎসাহ বা উত্তেজনা আদৌ প্রকাশিত হোল না তার আচরণে।

—"এ তো ভারী বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনি একটুও উত্তেজনা বোধ করছেন না?" লি সিং উৎসাহ দেখাতে চেষ্টা করে।

—"জানি না। মেইহুয়া কেমন আছে?"

লি সিং জানাল শীগ্‌গিরই তারা তাদের প্রথম শিশুর মুখ দেখবে আশা করছে। এ কথা শোনা মাত্রই ওয়েন যেন উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন—"আমায় এতক্ষণ এ কথা বলনি কেন? এত বড় একটা সংবাদ?"

—"কিন্তু সতী-তোরণের চেয়ে তো এ আর বড় ঘটনা নয়—"

—"সতী-তোরণের আলোচনা এখন থাক্।"—ওয়েনের কথায় বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে।

এমন দুষ্প্রাপ্য সম্মানের প্রতি তার এ-হেন ঔদাসীন্য বিস্মিত করে লি সিং-কে।

—"আমি কি এটা নেবো, বিশ্বাস কর?" হঠাৎ ওয়েন ফিরে আসেন আগেকার কথায়। অদ্ভুত প্রশ্ন।"

—"না নেওয়াটা কি বোকামির কাজ"—কথাটা শেষ করতে না করতেই কেমন একটা সন্দেহে খট করে উঠল মন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ায় ওয়েন একাকী ফিরে এসেছে গৃহে। বাহির ও অন্দর-মহলে এখনও শোকের চিহ্নগুলি ঝুলছে। এই এত বড় বাড়ীতে একাকী থাকায় নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরিবিলিতে ভাববার প্রচুর অবসর পেলে সে। অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেই আতংকিত হয়ে উঠল ওয়েন। মাত্র কয়েক মাস আগে শাশুড়ী, মেয়ে-জামাই, হাসি-আনন্দরোলে বাড়ীখানি মুখর করে রেখেছিল। তার পর একের পর এক কত ঘটনা ঘটে গেল—মেইহুয়ার প্রেম, বিয়ে, শাশুড়ীর মৃত্যু, হঠাৎ এই বেদনা-বিধুর গৌরবময় যশলাভ, অনাগত শিশু—একের পর এক চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

সমগ্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে চ্যাংয়ের আচরণ তার কাছে ঠেকেছে সব চেয়ে অদ্ভুত। শোক-সন্তপ্ত ওয়েনের সেই এখন একমাত্র অবলম্বন। মেইহুয়ার হয়ে সে-ই বাজার করে দিতে লাগল—গৃহস্থালীর কাজ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা—এমন কি তরি-তরকারি বেচে সংসারের সাশ্রয় করতে লাগল সে। রান্না-ঘর থেকে ওয়েন এই বিশ্বস্ত উদ্যান-রক্ষকের সকল কাজ লক্ষ্য করে—মাঝে-মাঝে নিঃসঙ্গতায় ক্লান্ত হলে বাগানেও আসে গল্প করতে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাগানের কোন সম্পর্ক নেই—প্রতিবেশীরা তাদের দেখা পায় না। এই ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল একটা স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতা।

দাদা মশাই এক দিন দেখা করে জানিয়ে গেলেন যে, রাজগুরু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একশ' রজত মুদ্রা পাঠিয়েছেন। তোরণ নির্মাণ আর আরো হাজার মুদ্রা পাওয়া এক রকম সুনিশ্চিত।

কিন্তু দাদা মশাই জল খেতেই ওয়েন উল্টো সিদ্ধান্ত করতে বসল। চ্যাং সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করল ওয়েনকে তার এই সৌভাগ্যের জন্য। ওয়েনের সৌভাগ্যে সে সুখী, গর্বিত। সে যে এক জন পুণ্যবতী নারী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই চ্যাংয়ের।

কয়েক বার ওয়েন প্রশ্নটা উত্থাপন করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এক জন নারী—বিশেষ করে সাধ্বী বিধবা কেমন করে তুলবে প্রস্তাবটা পুরুষের কাছে। কয়েক বার সে এসেছেও বাগানে—তরি-তরকারি নিয়ে কথাও হয়েছে। কিন্তু উপরে নীল আকাশ, লাল সূর্য, নিজের শালীনতা বোধ, দীর্ঘ বছরের শিক্ষা-সংস্কৃতি সব-কিছু যেন তার মনোবাঞ্ছা প্রকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। 'বলি বলি' করেও আর বলা হয়ে ওঠে না। চ্যাং এত সৎ—এত বিশ্বস্ত। সে যে নারী সে-দিক থেকে চ্যাং কখনো ভেবে দেখেনি কথাটা।

মেইহুয়ার মেয়ে হলে ক্যাপ্টেন মেয়েকে দেখাতে নিয়ে এল তার ঠাকুমাকে। নাতনীকে দেখে ওয়েনের সারা দেহে যেন রোমাঞ্চ হোল—ছোট্ট ধবধবে নাদুস-নুদুস মেয়ে—তাকে বুকে চেপে ধরে অনুচ্চ স্বরে আদর করতে লাগল ওয়েন।

—"মেইহুয়া, তোর এমন বিয়ে হওয়ায় খুব খুশী হয়েছি আমি। স্বামী আর মেয়েকে পেয়ে তুই নিশ্চয়ই খুব গর্বিত।"

মা'র কথায় মেইহুয়ার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল। আগের চেয়ে মা যেন অনেক নরম হয়ে পড়েছেন। মাকে সে মনে মনে ক্ষমা করে ফেলল। প্রথম যেদিন এসে মাকে দেখেছিল মেইহুয়া, মা একাকী বসেছিলেন—মা'র মুখে ছিল বেদনার ছাপ। আগেকার সে আত্মময়ী প্রশান্ত মা আর নেই।

এর পরই ক্যাপ্টেন জানতে পারলেন বিস্ময়কর সংবাদটি। বাগানে এসে দেখল চ্যাং মাটি কোপাচ্ছে। বিস্ময়ের বিষয়; তা'কে দেখতে পেয়ে চ্যাং নিয়ে গেল একেবারে তার নিজের ঘরে। চ্যাংয়ের মুখে এক অদ্ভুত সুখের আলো—উত্তেজনা আর বিমূঢ়তার ছায়া।

—"ক্যাপ্টেন, বলুন তো আমি এখন কি করি? আমি মুখ্য লোক।"

—"ব্যাপার কি?"

মুহূর্ত কাল ইতস্ততঃ করে চ্যাং।—"ওয়েনকে নিয়েই ব্যাপারটা।"

—"শাশুড়ী ঠাকরুণ কি কোন বিপদে পড়েছেন?"

—"না না। আপনিই আমাকে একমাত্র উপদেশ দিতে পারেন। কি যে করব ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না।"

—"আগে বিপদটা কি বল। আমাদের চলে যাওয়ার পর ঘটেছে কি তোমাদের মধ্যে?"

তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে না চ্যাং—সব কথা গুছিয়ে বলতেও সে অনভ্যস্ত। যে-ভাবে সে গল্পটা বললে শুনে ক্যাপ্টেনের তো নিজের কানকেই অবিশ্বাস হতে লাগল। ধীরে ধীরে এবং গম্ভীর ভাবে শুরু করলে চ্যাং তার কাহিনী।

আজ-কাল গ্রীষ্মের রাতগুলো অত্যন্ত গরম। চ্যাং প্রায় অনাবৃত দেহেই শুয়ে থাকে মাদুরে। সপ্তাহ কাল আগেকার কথা—এক দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল চ্যাংয়ের। ওয়েন ডাকছে—'চ্যাং!'

পশ্চিম-গগনে ক্ষীণ চাঁদ আরো ক্ষীণমান হয়ে পড়েছে—বিছানার উপর এক ঝলক তরল জ্যোৎস্না ফুট-ফুট করছে। চ্যাং চেয়ে দেখল ওয়েন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে প্রশ্ন করল—'কি দরকার?'

উত্তর এল নেতিবাচক।

—'তোমার ঘুম দেখছি বড্ড গাঢ়।' বললে ওয়েন—'মুরগীগুলো

ডাকছিল, ভাবলাম, পাহাড় থেকে বুঝি খাটাশ এসেছে ওদের চুরী করতে।'

মুরগীর খোঁয়াড়ে যেতে হলে চ্যাংয়ের ঘরের পাশ দিয়েই যেতে হয়। তখন রাত প্রায় তিনটে হবে। ঘাস শিশিরে ভেজা।

—'শুয়ে পড়। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে—খালি গায়ে দাঁড়িয়ে থেকো না।' বললে ওয়েন চ্যাংকে।

কিন্তু ওয়েন যতক্ষণ না রান্না-ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ততক্ষণ চ্যাং জোর করে দাঁড়িয়ে রইল দোর-গোড়ায়!

খাটাশদের কথা ভাবতে লাগল চ্যাং—যারা রাতে পাহাড় থেকে নেমে গৃহস্থের জীব-জন্তু চুরী করে নিয়ে পালায়। কিন্তু মুরগীর চীৎকার সে তো শুনতে পায়নি। নিশ্চয়ই খুব গভীর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

পরের দিন ওয়েন বললে চ্যাংকে—'ভাল করে খোঁয়াড়টা বন্ধ করে রেখ, যাতে না কোন খাটাশ ভিতরে ঢুকতে পারে।'

—'সে ভয় নেই—'

আগে কথনো এ রকম ঘটেনি। কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে সত্যি সত্যি একটা খাটাশ জাল বেয়ে উপরে উঠে একটি কালো মুরগী চুরী করে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। চ্যাংয়ের ঘুম ভাঙ্গে যখন তার মনে হোল কে যেন তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখল ওয়েন ঠেলছে তাকে।

—'কি ব্যাপার?'—উঠে বসতে বসতে সে জিজ্ঞেসা করল।

—'একান্ত একটা খাটাশ দেয়াল টপকে পালিয়ে গেল'—

চ্যাং তাড়াতাড়ি উঠে জ্যাকেটটা পরে নিল। মুরগীর খোঁয়াড় পরীক্ষা করে দেখতে পেলে জালে মস্ত বড় একটা ছ্যাঁদা। খাটাশটাকে কোথায় দেখেছে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল ওয়েন। কিন্তু আশ্চর্য! পায়ের ছাপ কোথাও দেখা গেল না। অকুস্থলে এসে দেখলে, শুধু কালো মুরগীটা দেয়াল-ঘেঁসা ফুল গাছের ঝাড়ের কাছে মরে পড়ে আছে। গলায় মারাত্মক ক্ষত। এই অসতর্কতার জন্ত চ্যাং ক্ষমা চাইতে লাগল, কিন্তু ওয়েন এ সব গায়েই মাখল না। দয়ার প্রতিমূর্ত্তি যেন সে—বললে—'কিছুই তো ক্ষতি হয়নি। কাল ওটাকে বেঁধে ফেলব।'

—'কিন্তু আপনার ঘুম তো ভারী হাল্কা'—

—'ওঃ, আমি তো প্রায়ই জেগে থাকি রাত্রে। ঘুমের মধ্যে সামান্ত শব্দও শুনতে পাই।' তারা ফিরে এল চ্যাংয়ের ঘরে—ওয়েন দাঁড়িয়ে রইল দোর-গোড়ায়। ওয়েনের পোষাকে আঙ্গুলে রক্তের ছাপ। মরা মুরগীটাকে মেঝেতে রেখে চ্যাং তার হাতে জল ঢেলে দিল। চা খাবে কি না জিজ্ঞেসা করল চ্যাং। প্রথমটা ওয়েন অস্বীকার করলে কিন্তু কি ভেবে বললে, খাবে। ঘুমের ঘোর তার একেবারে কেটে গেছে—আর ঘুমুতে যাবে না সে।

—'ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব কি?'

—'না। এখানটা এমন চমৎকার সুন্দর।'

—'এক মিনিটের বেশী দেরী হবে না'—

—'তাড়াতাড়ির দরকার কি?—

ওয়েন বসল চ্যাংয়ের বিছানার উপর—মাদুর, খালি চৌকি আর ছেঁড়া চাদর স্পর্শ করলে হাত দিয়ে।

—'এ কি, আমায় তো বলনি তোমার চাদর নেই? কাল একটা দেব'—

পরের দিন মুরগীর মাংস পরিবেশনের সময় আবার ওয়েন খাটাশের কথা স্মরণ করিয়ে দিল চ্যাংকে।—'খোঁয়াড়টা সেরেছো তো?'

সেরেছে বই কি।

—'আজো হয়ত খাটাশটা আসতে পারে।'

—'কি করে জানলেন?'

—'কাল যার জন্তে এসেছিল তাকে নিতে পারেনি তো। ভয়ংকর ভীতু ছিল জানোয়ারটা। প্রায় সরে পড়েছিল আর কি, কিন্তু তাড়া খেয়ে ফেলে পালিয়েছে। মুরগী চাই-ই এবং জানে সে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে। ঘটে যদি সামান্ত বুদ্ধি থাকে আজ রাতেই আসবে। কি, ঠিক কি না?'

চ্যাং বলতে লাগল—কাজেই আমি ঠিক করলাম রাতে জেগে বসে থাকব খাটাশের জন্ত। কর্ত্রী-ঠাকরুণকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করলাম। আলোটা কমিয়ে দিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে রইলাম টুল পেতে, হাতে একটা ঠাঙ্গা নিয়ে খাটাশ এলে এক ঘায় মাথার খিলু বের করে ফেলব।

চাঁদ মাথার উপর এল—কোন খাটাশের দেখা নেই। চাঁদ অস্তাচলশায়ী হল—তখনও দেখা নেই কোন খাটাশের।

বেশ শীত করছিল। ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম। হঠাৎ ওয়েনের নরম কণ্ঠস্বর কানে এল।

—'চ্যাং'—

ফিরে তাকিয়ে দেখি ওয়েন শাদা পোষাকে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসছেন ঠিক পরীর মত। আমার অতি কাছাকাছি এসে ফিস ফিস করে বললেন—'কিছু দেখতে পেয়েছ কি?'

—'কিচ্ছু না'—

—'চল, তোমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।'

—এমন সুন্দর রাত জীবনে দেখিনি। আমরা দু'জনে বসলাম। সারা পৃথিবী ঘুমে নিঝুম। আজ সকালেই ওয়েন এই চাদরটা দিয়েছেন আমাকে। এত শাদা আর নতুন যে এর উপর শুয়ে এটাকে দোমড়াতে ইচ্ছা যাচ্ছিল না। সেইখানেই গুঁড়ি-গুঁড়ি মেরে বসে আমরা দু'জনে রূপালী চাঁদের কিরণ লক্ষ্য করছিলাম। মনে হতে লাগল আমরা দু'জনে যেন কত যুগ-যুগের চেনা।

আমরা বসে গল্প করতে লাগলাম। বরং বলা ভাল তিনিই কথা কইছিলেন নানান বিষয়ে—বাগান, খাটা-খাটুনি, জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা। তিনি আমায় জিজ্ঞেসা করলেন আমার অতীত জীবনের কথা এবং কেনই বা আজো পর্যন্ত বিয়ে করিনি জানতে চাইলেন। বললুম, বিয়ে করা আমার সাধ্যের অতীত।

—'যদি সাধ্যের মধ্যে হয় বিয়ে করতে তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিসেস্ ওয়েন।

—'নিশ্চয়ই'—

ওয়েনকে কেমন যেন আত্মহারা, স্বপ্নময়, অবাস্তব মনে হতে লাগল চ্যাংয়ের। চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে তার বিবর্ণ মুখাবয়বে—চোখ দু'টো ঝকঝক করছে মণির মত। চ্যাং ভয় পেয়ে গেল রীতিমত। চোখ দু'টো তার দিকেই নিবদ্ধ অথচ মনে হচ্ছে তাকেও দেখছে না। চ্যাং তার দিকে না তাকিয়ে পারলে না।

—'আমার দিকে ও-ভাবে তাকিয়ে দেখছ কি? আমি মেয়ে। আমায় ছুঁও না।' ওয়েন হাত বাড়িয়ে দিল। চ্যাং স্পর্শ করল তার হাত। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ওয়েনের সারা দেহ।

—'ভয় পেলেন?' মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করল চ্যাং—'মনে হচ্ছিল আপনি মানুষ নন পরী বুঝি—এই ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে এসেছেন এখানে।'

হেসে উঠল ওয়েন। চ্যাংয়ের বুক থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।

—'আমি বুঝি পরীর মত সুন্দরী? এই রকমই যেন থাকি চিরদিন। আচ্ছা বল তো, মর্তের লোকের মত স্বর্গের অপ্সরা-অপ্সরীরা বিয়ে করে কি না?'

—'তা আমি কি করে বলব'—চ্যাং ওয়েনের কথার ইংগিত ধরতে পারে না। 'ওদের সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ হয়নি কখনো।'

এইবার ওয়েন এমন একটা প্রশ্ন করে বসল যাতে চ্যাং সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

—'আচ্ছা, এখন যদি কোন পরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তোমার, কি করবে বল ত? তাকে কি প্রেম জানাবে? আমি মর্তের মেয়ে না পরী? কোন্‌টা হলে তোমার পছন্দ?'

—'কি ঠাট্টা করছেন?'

—'ঠাট্টা নয়। ক্যাপ্টেন-মেইহুয়ার মত আমরা দু'জনেও যদি স্বামী স্ত্রীর মত থাকি চিরকাল তাহলে কি সুখী হও না?'

—'বিশ্বাস হয় না! সে ভাগ্য কি আমার হবে? আর তাহলে সতী-তোরণেরই বা গতি হবে?'

—'চুলোয় যাক্ সতীতোরণ। তোমাকেই চাই আমি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা এক সাথে থাকব। লোকে কি বলবে তা নিয়ে মাথা ঘামাই নে। কুড়ি বছর আমি বৈধব্য ভোগ করেছি, আর নয়।'

ওয়েন চুমু খেল চ্যাংকে।

—'ক্যাপ্টেন, বলুন এবার এখন আমি কি করব?'

এক নিশ্বাসে তার কাহিনী শেষ করে বললে চ্যাং—"সম্রাট বাহাদুরের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হবার সাধ্য কি আমার? কিন্তু ওয়েন বলেন সব ঠিক আছে। এখনই তাঁকে বিয়ে করতে হবে, তা না হলে জীবনে আর তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। ভাবুন একবার। ওয়েন বলেন, আমাকে পেলেই খুশী হবেন তিনি—আর এখন যেমন চলছে তেমনি ভাবেই কেটে যাবে সংসার। ক্যাপ্টেন, এবার বলুন দেখি আমি কি করব?'

সমস্ত ব্যাপারটা সিংয়ের মাথায় ঢুকতে একটু বিলম্ব হোল। প্রথমটা সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল—চ্যাংয়ের এলোমেলো কথার ঝুড়ি থেকে আসল তথ্য আহরণ করা সোজা নয়। সব শুনে বললে—"গর্দভ কোথাকার! কি করবে? বিয়ে করবে?"

বিদ্যুদ্‌গতিতে ক্যাপ্টেন পৌঁছে দিল কথাটা মেইহুয়ার কানে। মেইহুয়া শুনে বললে—"যাক্, খুশী হলাম।" তার পর কানে-কানে বললে—"মাসি নিজে কালো বেড়ালটা নিজে মেরেছিলেন, না? চ্যাংয়ের মত লোক-জনদের জন্যও সতী-তোরণ জাতীয় কিছু করা দরকার।'

সেই দিনই খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে ক্যাপ্টেন ওয়েনের কাছে পাড়লে কথাটা—"আমি একটা কথা বলব ভাবছি। আমার মেয়েটি দেখছি আপনাকে নিরাশ করেছে। জানি না, আমরা কবে সেই শিশুর মুখ দেখতে পাব যে ওয়েন-বংশের নাম বহন করবে।'

ওয়েন মুখ তুলে তাকালেন। ক্যাপ্টেন মাটির দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বলে যেতে লাগল—'আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি। আপনি হাসবেন না আমার কথা শুনে। ঠাকুমা মারা গেছেন—আপনি নিঃসঙ্গ একলা দিন কাটাচ্ছেন। চ্যাং অতি সজ্জন ব্যক্তি। যদি অনুমতি করেন তো বলি—চ্যাং ওয়েন-বংশের ধারা বজায় রাখতে রাজী আছে।'

মিসেস্ ওয়েনের আনন আরক্ত হয়ে উঠল। "হ্যাঁ ওয়েন-বংশের ধারা"···বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

চ্যাংয়ের সঙ্গে ওয়েনের যেদিন বিয়ে হোল জ্ঞাতিবর্গের পক্ষে সেটা হয়েছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক আঘাত।

—"মেয়েদের সম্বন্ধে চরম কিছু বলা যায় না কখনই"—সব শুনে মন্তব্য করলেন দাদা মশাই।

অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

প্রতিকার

শ্রীচুণীলাল রায়-চৌধুরী

ছোট সহর। মেয়েটা আরও ছোট কিন্তু মাটিতে পা পড়ে না তার এমনই দেমাক। তার রূপের যেমন খ্যাতি, রসনার তেমনই অখ্যাতি। নাম সুজাতা, কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। ছোট সহর সুজাতার আবির্ভাবে বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠতার উত্তাপ এত বেশী যে, একটু নিকটবর্তী হইলে গায়ে ফোস্কা পড়ে। রসালাপ জমানো শক্ত, কারণ একখানা তীক্ষ্ণ রসনা সর্বক্ষণ তীব্র বিষ ঢালিবার জন্য উদ্যত থাকে। তবু কোন কোন কৌতূহলী রূপের নেশায় প্রলুব্ধ হয় কিন্তু ছোবল খাইয়া ফিরিয়া আসে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে। অপমানাহত পুরুষদের লাঞ্ছনাটা সুজাতা পরম কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করে।

সুজাতা সুন্দরী, সুগায়িকা, বুদ্ধিমতী, স্মার্ট এবং প্রগতিশীলা। কোন পুরুষকে সে এখনও আমল দেয় নাই বটে কিন্তু নর-নারীর সম্পর্কে তাহার যা মতবাদ তাহাতে কানে আঙুল দিতে হয়। ধর্ম্ম জিনিষটা তাহার মতে কুসংস্কার এবং সে যে কোন্ ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহা তাহার আচরণে বোঝা দুষ্কর। খাদ্যাখাদ্যের বিচার কম, দেব-দ্বিজে নিষ্ঠা আরও কম। তাহার তর্কের মুখটা শাণিত ফলার মত মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসকে কেবল বিঁধিবার জন্যই যেন উদ্যত থাকে। এমনতর দাম্ভিক মেয়েটা যখন আর সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া খেয়ালে ভর করিয়া ডানা মেলিয়া উড়িয়া-চলিয়াছিল তখন অলক্ষ্যে দর্পহারী মধুসূদন বোধ করি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিলেন।

সুজাতার আবির্ভ
জুটিল একটি নবাগত
ব্যবহারে সে যেন এ
মাথায় আগাগোড়া স
গায়ে এবং তালতলার
চলাচল করে—দেখিলে
গোরাকে সে আদর্শ ক
করে, প্রাচীনকে পূজা ক
পুরোপুরি স্বীকার করিয়া
আছে আশ্চর্য্য রকমের দক্ষত.
অসামান্য কৃতিত্ব। অল্প কাল ম
গাড়িয়া বসিল এবং এত দিন প
করিয়া দিবার মত পুরুষদের এক
ছেলের দল উল্লসিত হইয়া উঠিল।

সমশক্তি বিকর্ষণের সৃষ্টি করে। ও
প্রথমতঃ পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে লা
দাঁড়ায় নাই, কখনও বাক্যালাপ করে
অন্যকে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু
যে বলিয়া থাকেন বিকর্ষণ আকর্ষণেরই
সত্য কি না জানি না—কিন্তু এই দুইটি তরু
তাহা আশ্চর্য্য ভাবে মিলিয়া গেল। অল্প কাল
গেল, পরস্পরকে জানিবার জন্য উভয়ে বেশ কৌতূ
উঠিয়াছে।

সুযোগ মিলিল কলেজের ডিবেটিং ক্লাসে। সমাজতন্ত্রবাদ
প্রশস্তি গাহিয়া এবং ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরণ করিয়া সুজাতা এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। প্রত্যুত্তরে মহিম প্রকৃতি-রাজ্যের অসাম্য দর্শাইয়া তদনুযায়ী সমাজ গঠনের আবশ্যকতা জানাইয়া এবং ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের গুণেই যে অসাম্য আপনিই গড়িয়া ওঠে তাহার উল্লেখ করিয়া, জোর করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, তাহার নিন্দা করিয়া সুজাতার মতবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইল। তর্ক সেদিন সেখানে শেষ হইল কিন্তু কোন মীমাংসায় উপনীত হইল না। কাজেই তাহার জের চলিল সুজাতার ড্রয়িং-রুমে বৈকালিক চায়ের আসরকে কেন্দ্র করিয়া। উভয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কিছু দিন জোয়ারের মুখে ছুটিয়া শেষে ভাটার টান ধরিল। তখন বিজয়ী হওয়ার চাইতে অন্যের কাছে হার স্বীকার করাটাই যেন উভয়ে বেশী পছন্দ করিতে লাগিল। আলোচ্য বিষয় ও গুরু-গম্ভীর দার্শনিকতা হইতে সরিয়া গিয়া কাব্যলোক আশ্রয় করিল। এক সময়ে কাব্যের সুর তাহাদের জীবনকেও স্পর্শ করিল। তখন মনে হইল, মহাকবির সকল কাব্য যেন এই দুইটি নর-নারীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দুনিয়ার রং এবং রূপ যেন আগাগোড়া পাল্টাইয়া গেল এবং এত অসহ্য পুলক যে তাহাদের জন্য সঞ্চিত ছিল তাহা যেন ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বোধ-স্নায়ুতে ধরা দেয় নাই। দেখিতে দেখিতে পরস্পরের সম্বোধন আপনি হইতে তুমির পর্য্যায়ে নামিয়া আসিল এবং পূর্ব্বরাগ-অনুরাগের পালা শেষ করিয়া তাহারা যখন প্রজাপতির দরবারে প্রণয়ের স্বীকৃতি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন অকস্মাৎ

অ.
হইয়া
তাহাকে
ক্ষুব্ধ হইত,
পৌরুষে বাধিত

এক দিন অ.
সুজাতা ড্রয়িং-রুমে
সময় হইলে এই মাধুর্য
কিন্তু আজিকার এই
দিল। সুজাতা তাহার
আপনাকে বিস্তার করিয়া দি
গভীর ভাবাবেশে স্তিমিত নে.
করিতেছেন। ঘটনাটার মধ্যে দৃ
ঈর্ষিতের কাছে এই অবস্থাটা অস.
মধ্যে মূর্ত্তিমান রসভঙ্গের মত মহিম অ
যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলিল, 'চ
এসেছে, দেখে আসি। টিকেট কাটা হয়েছে।"

সুজাতা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তা' তো সম্ভ
আমার টেনিসের কম্পিটিশন, সুব্রত বাবুর সঙ্গে।"

"আরেক দিন খেললে হয় না?"

"না"—সংক্ষিপ্ত জবাব। কিন্তু মহিমের কাছে তাহা

তার

ট লেগেই

হবে, জানতে

ব দিল, "আমার

তর আমি ধার ধারি

ঠোঁট কামড়াইয়া গুম হইয়া

রয়া হইয়া বলিল, "এত দিন ধরে

তোমার কৃতিত্ব আছে, তা স্বীকার

থাক, ভাল। এখন আর তোমার সঙ্গে

নেই। আমি চললুম।"—বলিয়াই ঝড়ের

হইতে বাহির হইয়া গেল। মহিম কিছুক্ষণ

ড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মহিমকে সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছিল। এবং

রাছিল বলিয়াই সুব্রত বাবুকে মধ্যবর্তী রাখিয়া লঘু

মহিমের ভালবাসা যাচাই করিয়া দেখিতেছিল।

শাসের সীমা ছিল,

করি শোভন হইত।

মহিম আসিবে এবং

র স্বাভাবিক অবস্থায়

আসিল না। সেদিন

পরদিনও নয়। উদ্বেগে

ন নিজেই তাহার খোঁজে

যে সংবাদ পাইল তাহাতে

দুলিয়া উঠিল। মহিম চলিয়া

লয়া গিয়াছে, সে আর কখনও

দনের মত চলিয়া গেল, তাহার

ও কোন সূত্র মিলিবে না, অবস্থাটা

টা ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল, নিদারুণ

ইয়া পড়িল। তবু ক্ষীণ আশা জাগিয়া

চলিয়া গিয়াছে তখন অভিমান জানাইয়া

হ ডাকের আশায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া

। কিন্তু দিন গেল, মাস গেল, না আসিল

পাইল কোন সংবাদ। এই নিদারুণ মনস্তাপে

ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুব্রত বাবু নিয়মিত হাজিরা

হইতে কোন সাড়া না পাইয়া নিজেকে সরাইয়া

জাতা এখন একা, নিঃসঙ্গ, একা শুধু বিগত দিনের

কালে মানস-নেত্রে মহিমের অশরীরী রূপ বিরাজ করিতে

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী পাকিস্তানী বর্ব্বরতার তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইল। সুজাতারা বুঝিল, এইবার তাহাদেরও পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। এই নরপশুদের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজ বার বার মনে পড়িল মহিমের কথা—যে লক্ষ্যহীন অনির্দ্দিষ্ট পথে আজ তাহারা যাত্রা করিতেছে জীবনে আর কোন দিন মহিমের সাক্ষাৎ মিলিবে কি না কে জানে? এই চরম বিপদের দিনে তাহার বলিষ্ঠ হস্তের সাহায্য হয়ত কোন উপায়ে বিপদমুক্ত করিতে পারিত।

যে রূপের অহঙ্কারে এক দিন সে অনেক অনুরাগীকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে, আজ বিপদের দিনে সে রূপই তাহার কাল হইল। পাকিস্তান সীমান্ত পার হওয়ার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে অপহরণ করিল। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে পথে পা বাড়াইয়াছিল। তাই যখন শুনিতে পাইল, তাহাদের মনিব মইনুদ্দিনের ভোগের জন্যই তাহাকে হরণ করা হইয়াছে তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সেই মহা পাপিষ্ঠের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

দুর্ব্বৃত্তগণ যখন তাহাকে তাহাদের মনিবের গৃহে পৌঁছাইয়া দিল তখন মনিবকে দেখিয়া সুজাতা আঁৎকাইয়া উঠিল,—এ যে মহিম! এই অল্প কাল মধ্যে সে ভোল ফিরাইয়া খাঁটি মুসলমান বনিয়া গিয়াছে। যে মহিম ধর্ম্ম নিয়া এত মাতামাতি করিয়াছে তাহার কি শোচনীয় অধঃপতন!

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—উভয়ে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া

মহিমই প্রথমে কথা কহিল—"এত দিনে তাহলে তোমার সময় হয়েছে, সুজাতা ?"

তীব্র ঘৃণায় সুজাতা জবাব দিল, "ছিঃ ছিঃ! এই তুমি কি করলে ? শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান হয়ে গেলে ?"

মহিম একটুও দমিল না, সহজ ভাবে জবাব দিল, "তাতে কি হয়েছে সুজাতা ! মুসলমান ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয় ? আর তাছাড়া ধর্ম্ম নিয়ে কোন দিন ত তোমার বাড়াবাড়ি ছিল না ! চিরদিন তুমি ওটা কুসংস্কার বলে অগ্রাহ্য করেই এসেছ।"

সুজাতা জ্বলিয়া উঠিল, বিদ্রূপ কণ্ঠে বলিল, "ধর্ম্ম নিয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি ছিল না, ছিল তোমার। তাই সেই অতি আতিশয্যের বস্তুকে তুমি অনায়াসে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করোনি। ইসলাম ধর্ম্মকে আমি ঘৃণা করি নে কিন্তু আমি ঘৃণা করি তাদেরই, যারা এই ধর্ম্মকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।"

সুজাতা আরও বলিল, "চেয়ে ভাখো, আজ আমারই মত লক্ষ লক্ষ নর-নারী ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে। যদি বেঁচে থাকাটাই তাদের একমাত্র কাম্য হত তাহলে তারা অনায়াসে তোমার মতন ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের জন্মভূমিতেই টিকে থাকতে পারতো। কিন্তু আজ কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল, ধর্ম্ম জিনিষটা মানুষের সব চাহিদার উর্দ্ধে।"

মহিম কাতর কণ্ঠে বলিল, "তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারই ত আমাকে এ কাজে প্রবৃত্ত করালো সুজাতা !"

সুজাতা জবাব দিল, "হয়ত আমার ভুল হয়েছিল, তোমাকে ঠিক মত চিনতে পারিনি, কিন্তু তুমি যে এত নীচে নেমে যেতে পারো তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

মহিম মিনতি করিয়া কহিল, "আমাকে যদি কখনও ভালবেসে থাকো তবে সেই কথা স্মরণ করে কি আমাকে ক্ষমা করে গ্রহণ করতে পারো না, সুজাতা ?"

সুজাতা হতাশ কণ্ঠে বলিল, "তা আর হয় না, মহিম ! তোমার অধঃপতনই এনে দিয়েছে আমার প্রেমের অপমৃত্যু। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও। এর পর আর আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা দেখতে পাই নে।"

"কে বললে বেঁচে থাকার সার্থকতা নেই ? এখনই যে তোমার একান্ত প্রয়োজন সুজাতা !" এইবার মহিমের দৃপ্তকণ্ঠে শোনা গেল—"তোমার মত এমনই অগণিত লাঞ্ছিতা হিন্দু নারী এই মুসলিম সমাজের আনাচে-কানাচে চিরদিনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আছে। কে প্রসারিত করে দিবে তাদের মুক্তির পথ ? অপমানাহত অসংখ্য নারীর কাতর আর্ত্তনাদই ত আমাকে এই পথে টেনে এনেছে। যত আইন, যত প্যাক্ট, যত পরিকল্পনা যা-ই কিছু গ্রহণ করা হউক না কেন, বাইরের থেকে যত চেষ্টাই করা যাউক, এই অপহৃতা নারীদের সন্ধান কোনো কালেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ত আমি এদের সমাজের মধ্যিখানে ঠাঁই করে নিয়েছি।

"তুমি ব্যঙ্গোক্তি করেছিলে, আমি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলুম কি বলে ! ধর্ম্ম ত আমি বিসর্জ্জন দেইনি, ধর্ম্ম আমার কাছে চিরদিন অত্যাজ্য। প্রয়োজন হলে তোমাকে ভুলতে পারি সুজাতা, কিন্তু আমার ধর্ম্মকে নয়। আজও আমি মুসলমানের বেশে খাঁটি হিন্দু।

তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরেও পাছে তোমার কোন বিপদ ঘটে তাই বরাবর তোমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে এসেছি। সে কথা যাক্। হ্যাঁ—তোমাকে ধরে আনলাম কেন? প্রথম কারণ, এখানে না এলেও তোমার বিপদের সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই কাজে সাহায্য করার জন্য তোমারই মত একটি মেয়ের আজ একান্ত দরকার—যার বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, সাহস আছে, আর আছে স্বজাতির প্রতি প্রীতি।

তুমি বিশ্বাস কর, আজ আর আমার তোমার প্রতি কোন লোভ নেই। আজ মানবতার দাবী আমার সব চাহিদাকে ছাপিয়ে উঠেছে। আমাদের এই কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি সানন্দে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবো। শুধু এই কয়টা দিন আমার এই কাজে সহায়তার জন্য তুমি কি এগিয়ে আসবে না, সুজাতা?"

সুজাতা একমনে শুনিয়া গেল। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে অভিভূত হইয়া পড়িল। ছিঃ ছিঃ—মহিমের সম্বন্ধে সে কি না ভাবিয়াছিল! মহিম তাহার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এই আত্মগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যখন সে তাহাকে কটূক্তি করিয়া তাহার দম্ভকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিতেছিল তখন মহিম অবিচলিত থাকিয়া মিনতি করিয়া, তাহার করুণা যাচ্ঞা করিয়া অবশেষে তাহার প্রতি তাহার যে কিছুমাত্র লোভ নাই তাহা স্পষ্ট কথায় জানাইয়া দিয়া এই দর্পিতা নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছে।

তা দিক। মহিম তাহাকে যত ইচ্ছা আঘাত করুক কিন্তু এই যুবকটি সমস্ত আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার আত্মত্যাগ ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই! প্রশংসাহীন, গৌরবহীন নিঃসঙ্গ জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বিপদ-সঙ্কুল পথে তাহার অভিযান—ধরা পড়িলে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে ইহা জানিয়া যে বিপদের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার মহত্ত্বের পরিমাপ হইবে কোন্ মাপকাঠি দিয়া?

শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, কৃতজ্ঞতায় সুজাতার মস্তক আপনিই নত হইয়া মহিমের পায়ে লুটাইয়া পড়িল! কাতর কণ্ঠে সে শুধু বলিল, "আমি তোমায় বুঝতে পারিনি। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে তোমার যোগ্য করে নাও।"

অপঘাত

গীতা চৌধুরী

তিমিরাবৃত রাত্রির দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তমসা। "তমসা" মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে সে। তমসাই বটে, যিনি তার নাম রেখেছিলেন তমসা, আশ্চর্য্য মানুষ তিনি। তাহলে এ কালেও ভবিষ্যতের গর্ভে যা নিহিত থাকে, মানুষ তা দেখতে পারে? না হলে এ রকম সার্থকনামা হবে সে কি করে? তমসার মন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে চলে।

মনে পড়ে সুদূর বাঙলার এক ছায়া-ঘেরা গ্রাম। পাশ দিয়ে তার রূপসা বয়ে চলে। যদিও রূপসা ছোট বিল, তবু তাতেই গাঁয়ের ঝি-বৌদের প্রয়োজনের দাবী মেটে। গ্রামে কয়েক ঘর হিন্দু, কয়েক ঘর মুসলমান নির্ব্বিবাদেই বাস করে আসছিল। তারা জানতো না রাজনীতি কি। শুধু মধ্যবিত্ত চাষী জেলে তাঁতি এই নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঙলা মায়ের স্নেহভরা আবেষ্টনে বাস করছিল মায়ের দুই ভিন্ন ধর্ম্মের সন্তান। তার পর নেমে এল বাংলার ওপর ঘন কুয়াশা-জাল। স্বার্থান্বেষীদের কূট চক্রান্তজালে দ্বিখণ্ডিত হল সোনার দেশ, তখনও পূর্ব্ববঙ্গের এই ছোট গ্রামটুকু জানেনি বাইরের হিংস্র কোলাহল।

ছোট মাটীর ঘর, টালির ছাত দেওয়া, বাইরে এক টুক্‌রো জমি। তাতে কয়েকটি গাঁদা, দোপাটী ফুলে-ফুলে হাসছে। টালির ছাত বেয়ে উঠেছে লাউ শাকের ঝাড় লতিয়ে। এই বাড়ী তমসাদের। তমসা তার বিধবা মা ও ছোট ভাই মণ্টুর সঙ্গে থাকে। গরীব বিধবার গৃহ, তাতে আড়ম্বর নেই সত্ত্য, তবু আরাম আছে অপর্য্যাপ্ত। কয়েক বিঘে খামী জমি আছে, পাশের বাড়ীর আবদুল জ্যেঠাই দেখা-শোনা করেন। ফসল পৌঁছে দিয়ে যান বাড়ীতে। কিছু ধান বিক্রির অর্থে ও কিছু প্রতিবেশীর সদয় দাক্ষিণ্যে কোন অভাবই অনুভূত হয় না তাদের। "চাচি, মা এই গাছের বেগুন পাঠিয়েছে, ধর।"—বাইরে থেকে ডাক আসে বন্ধু ফতিমার। নয় ত পাড়ার হরিশ কাকার ছেলে বিনু এসে ডাকে, "ও তমিদি, মা কলা পাঠিয়ে দিলেন, নিয়ে যাও।" তমসা এক টুক্‌রো আমসত্ত্ব এনে দেয় তার মায়ের হাতের। লোভী ছেলেটি মহানন্দে ছুটে চলে যায়।

বিকেলে সূর্য্য যখন তাঁর দিনের কাজ শেষ করে পাটে বসতে যাচ্ছেন, কলরব করে এসে ঢোকে বান্ধবীর দল। ঘর থেকে তমসাও বেরিয়ে আসে কলসী কক্ষে। হাসি-তামাসায় সারা পথ মুখরিত করে চলে তারা বিলের দিকে। "জানিস্ ভাই সুমি, তমি তো এবার আমাদের মায়া, গাঁয়ের মায়া, কাটিয়ে চল্‌লো"—বল্‌লো সীতা।

"ও মা, তাই না কি! বাবা, তমি কি চাপা মেয়ে রে! তুই কি করে জানলি রে সীতা?"

ব্যস্! চার দিক্ থেকে প্রশ্নের ভীড়ে সীতা কার কৌতূহল মেটাবে ভেবে পায় না। বিব্রত হয়ে দেখিয়ে দেয় পরীকে। পরী তমসাদের বাড়ীর পাশের আবদুল জ্যেঠার মেয়ে। সে-ই দিয়েছে তাকে এই খোস্-খবর।

পরী একবার তমসার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে, তার পর বলে, "তোদের একটা গল্প বলি শোন্। নতুন যে ডাক্তার বাবু এসেছেন গাঁয়ে, তাঁরই ছেলে সুজিতের জন্যে তমিকে পছন্দ করেছেন। সুজিত সহরে পড়ে বি, এস-সি। ছুটীতে এসেছে। সে-ই কোন দিন বেড়াতে বেরিয়ে তমসাদের বাড়ীর সামনে তমসাকে গাছে বারিসিঞ্চনরতা দেখে বোধ হয় শকুন্তলা ভেবে ভুল করে।"

সকলের হাসির উচ্ছ্বাসে খানিক চুপ করে আবার পরী বলতে আরম্ভ করে—"তার পর যা হয়ে থাকে। মুগ্ধ দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমেই বোধ হয় পড়ে যান। তার পর শ্রীমান্ মণ্ট

বাবুর সঙ্গে তার সূত্রে বাড়ীতে সবার সঙ্গে পরিচিত হন। একালের ছেলে, ক্রমে মাকে জানায় তার মনের কথা। ডাক্তার-গৃহিণীও প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপ করতে এসে পছন্দ করে যান এই সুশ্রী নতমুখী কর্ম্মশীলা মেয়েটিকে। ডাক্তার বাবুও যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। অবশেষে"—"বলতে বলতে সকলে উলুধ্বনি ও মুখে শঙ্খরোল ক'রে পরিণতিটুকু দেখিয়ে দেয় গল্পের।

তমসা কিন্তু এ-সবের মধ্যে যোগ দিতে পারে না। মন তার সুজিতের স্বপ্নে তখন মগ্ন। সত্যি, কি অপরূপ ছেলে এই সুজিত! তার নিরুপায় বিধবা মা যখন তার বিয়ের দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত তখন দেবতার মতই এই তরুণ ছেলেটি এল তার বরাভয় নিয়ে। ডাক্তার বাবু আর মাসীমাও দয়া করেছেন।

"কি রে, তুই যে ঘুমিয়ে গেছিস্?"—সঙ্গিনীদের কণ্ঠস্বরে চেতনা ফিরে পায় লজ্জিতা তমসা।

"না ভাই, ভাবছি, মণ্টুকে এবার বড় ইস্কুলে দেওয়া দরকার, তার কি করি।"

"ও মা, কি কঠিন ভাই তুই, আমরা যখন তোর দুষমন্তর অভিযানে ব্যস্ত, তুই তখন চাল-ডালের হিসেব করছিস্?"

জলকেলি সেরে দলটি যখন আবার ফেরে জেলে-পাড়ার মধ্যে দিয়ে, দেখে, নিতাই মাঝির উঠোনে নিতাই আর ক্ষুদু গল্প করছে আর জাল থেকে আগাছা শেকড় পরিষ্কার করছে। তাদের দেখে নিতাই জাল নামিয়ে বলে, "তমিদি, তোমার ওষুধ খেয়ে ছেলেটার পেটের ব্যামো ভাল হয়েছে, বাঁচিয়েছ দিদি।" ক্ষুদুও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়—দিদির ওষুধ যেন কথা কয়।

মৃদু হেসে দলটি আবার অগ্রসর হয়। এই ক্ষুদুর আসল নাম খোদাবক্স—কবে যে তা ক্ষুদুতে রূপান্তরিত হয়েছে কেউ জানে না। এ রকম আরো আছে। দুধু, সুখী, হারুণার থেকে হারাণী। হিন্দুর আবেষ্টনে হিন্দুর রীত-করণই শিখেছে তারা।

ক্রমে গ্রামের আবহাওয়া বদলাতে থাকে। নতুন নতুন মুখ, আচারব্যবহার আমদানী হতে লাগলো তাদের গাঁয়ে—তাদের শান্তির নীড় মধুখালিতে। যে মুসলমানদের তারা চিনতো, জানতো, যাদের আপনার এক জন মনে করে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে, তাদের মত এরা নয়। এদের অপমানকর ভাষা, দস্যুস্বভাব, অশ্লীল ইঙ্গিত ও চাহনীতে বন্ধ হয়ে গেল গ্রামের বৌ-ঝিয়ে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা। গ্রামের মেয়েদের মিলন-ক্ষেত্র রূপসা বিল থাকে জনশূন্য। মেয়েদের সম্মিলিত হাসির লহরীতে ও আলোড়নে আর তার বুকে স্পন্দন জাগে না। সভয়ে হিন্দুরা জানলো, এটা না কি তাদের দেশ নয়, যেহেতু এটা হিন্দুস্থান নয়, এটা না কি পাকীস্তান! এত দিনের ভালবাসার একতার বনিয়াদের পাথরে এবার লাগলো চিড়। অশিক্ষিত নিরক্ষর গ্রামের মুসলমানদের অনেকেই এই সব নবাগতদের বাক্যের মোহে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মূর্খ দরিদ্রদের সামনে পীর ফকিররা তুলে ধরে ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মের বাণী, যাতে সহজে পরাস্ত হয় এই সব ধর্ম্মভীরুরা। এবার এত দিন পর মধুখালির হিন্দুরা জানলো পাকীস্তান নামের অর্থ। তমসার বিধবা মা এবার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তমসার বিয়ের জন্য। ডাক্তার-গৃহিণীকে ধরলেন তিনি, সামনের ফাল্গুন যেন বাদ না যায়।

* * * *

আজকের এই লাহোরের এক গৃহের গবাক্ষে বসে প্রকৃতির প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে নিমগ্না এক বাঙালী নারী অতীতের সুখস্মৃতিতে হারিয়ে ফেলে বর্ত্তমান বাস্তবকে।

* * *

মাঘের শেষ, তমসার বিয়ের আর সাত দিন দেরী। কোলাহল নেই, আনন্দ নেই, বিয়ের কোন আড়ম্বরও নেই। দরিদ্র বিধবার গৃহে আড়ম্বর করবেই বা কে? আনন্দ করতে পারতো প্রতিবেশী সঙ্গিনীরা, কিন্তু গ্রামের নির্ম্মল আবহাওয়ায় আনন্দের উৎস গেছে শুকিয়ে। অনেকেই চলে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। কিছু দিন থেকেই গ্রামে কানাকানি। কতকগুলি করুণ ভয়ার্ত্ত মুখ প্রতীক্ষা করছে কোন অনাগত অদৃশ্য অশুভকে। আশে-পাশে আরম্ভ হয়েছে বিভীষিকার তাণ্ডব। লুঠ হত্যা চারি দিকেই শোনা যাচ্ছে। মধুখালিতেও নিষ্ঠুর দৈত্যের স্পর্শ না লেগেছে এমন নয়। কয়েক দিন আগে গ্রামের মধ্যে অর্থবান পোদ্দার-বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে, বাড়ীর বুড়ো কর্ত্তা কয়েক জনকে না কি চিনেও ছিলেন, কয়েকটি নবাগত পাঠান মুসলমানদের সাথে গাঁয়ের ক'জন মুসলমানের মুখ চিনতে পারেন তিনি। তাঁর বিস্মিত মুখে বাণী না ফুটতেই লাঠির আঘাতে চৈতন্য হারান কর্ত্তা। এক দিন রূপসার ধারে ছুরিকাঘাতে মৃত এক দেহ পাওয়া গেল, দেহ হিন্দুর, মুখ বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। আবদুল জ্যেঠা এক দিন ডেকে সতর্ক করে দিলেন তাদের। ডাক্তার বাবুরাও বিয়ের দিনটা গুণছেন। কোন রকমে একটু সিঁদুর স্পর্শ করিয়ে চলে যাবেন তাঁরা। তমসার মা যাবেন না, মণ্টুকে দিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে।

শীতের অপরাহ্ণ। বাইরে দাওয়ায় বসেছিল সুজিত—পাশে খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বেপথুমানা তমসা। সুজিত উঠে এসে সামনে দাঁড়াতেই আরো নুয়ে পড়ে সে। সুজিত জোর করে তার মুখ উঠিয়ে প্রশ্ন করে,—"কথা বল শকুন্তলা, বল, বিয়েতে কি তুমি নেবে আমার কাছ থেকে।" তমসার বান্ধবীদের শকুন্তলা নামের রহস্য জেনেছিল সে।

উত্তর দিতে পারে না তমসা।—"আঃ, মা'র কি আজ চাল ঝেড়ে আনা হবে না, কখন গেছেন মিত্তির বাড়ী? মণ্টু পাজীটাই বা কোথায়?"—তমসা বুঝি আর পারে না, তার হর্ষ-কম্পান্বিত দেহকে আয়ত্তে রাখতে। বুঝি এই একান্ত কাম্য দস্যুটি দস্যুর মতই নেবে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে!

সুজিতের তৃষিত ওষ্ঠ ধীরে ধীরে নেমে আসে লাজারুণ তমসার মাথায়। বাইরের চাপা থমথমে ভাব যায় দু'জনে বিস্মৃত হয়ে। তাদের অবচেতন কানে ধ্বনিত হতে থাকে বাইরের কোলাহল। কিন্তু তাতে মন দিতে পারে না তারা। সমস্ত আশঙ্কা, সতর্কতা ভুলিয়ে বিশ্বের সেই আদিম তরুণ-তরুণী জেগে ওঠে তাদের সত্তায়।

হঠাৎ তমসাদেরই দুয়োরের পাশে ভয়ঙ্কর উল্লাস-ধ্বনিতে সচেতন হয়ে ওঠে দু'জনে। সামনে দৃষ্টিপাত করে আশঙ্কায় নীলবর্ণ হয়ে যায় তমসা। সুজিতের রক্তে আগুন ধরে ওঠে। ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পিশাচের দল। পৃথিবী তখন ঘন তমসায় আচ্ছন্ন।

তমসার জীবনেও নেমে এল তার আবরণ। কি যে ঘটে বুঝতে পারে না তমসা। তার মূঢ় দৃষ্টির সামনে দেখে ক্ষীণ শব্দের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে তার দয়িতের দেহ। আর চতুর্দ্দিকের ভূকম্পনের সঙ্গে স্মরণ হয়—মা—মণ্টু! আর জানে না কিছুই সে।

* * * *

তার পর? তার পরও আছে। রাত্রি তখন নিজের কৃষ্ণবর্ণ আঁচলখানি ধরিত্রীর বুক থেকে তুলে নিচ্ছেন, জলের ওপর দাঁড় বাওয়ার মৃদু ছপছপ শব্দে ও মুখের ওপর কার উগ্র ঘৃণ্য নিশ্বাসে চেতনা ফিরে পায় তমসা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না সে। কিন্তু সামনে ওই লুব্ধ ক্ষুধার্ত্ত পশুর দৃষ্টি তার হৃতসম্বিত ফিরিয়ে আনে। প্রাণপণ বলে সে পশুটার আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টায় মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলে।

তমসা বুঝতে পারে, কার নির্দ্দেশে যেন নৌকাটা থেমে গেল। ছৈয়ের ভিতর আলোর রেখার সঙ্গে প্রবেশ করে যে মূর্ত্তি, তাকে দেখে আবার ভীত হয়ে পড়ে তমসা। পরিচ্ছদ আগন্তুকের পদ-মর্য্যাদার পরিচয় দিচ্ছে এই সব দানবের থেকে। কিন্তু জাতি?—তবু আগন্তুকের দৃষ্টিতে যেন আশ্বাস পায় তমসা, তাতে লুব্ধ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দেখা যায় করুণার ছাপ। কি যে ঘটে জানে না সে, খেয়াল হল যখন নবাগতের আহ্বানে তার জলযানে পা দিচ্ছে তমসা। মন তার ঠিক করতে পারে না—ভাল করছে না মন্দ করছে। মন্দ!—এর থেকে আর মন্দ কি হতে পারে?

বাইরে প্রকৃতির ক্রুদ্ধ ঝড় ও বারিপাত কমে আসছে, ভেতরে শয্যার পাশে ফিরে তাকাল তমসা। পূর্ব্ব-জীবনের তমসা বর্ত্তমানের মেহেরুন্নিষা। "মা, মাগো, জন্মের মত তোমার কোল ছেড়ে এসেছি, ছেড়ে এসেছি জন্মভূমি জননীকেও। তুমি হয়তো পারনি সে দুঃসহ শোকের আক্রমণ এড়াতে। সর্ব্ব যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছ। ভাইটি মণ্টু, একই রক্তের বড় আদরের অনুজ তার। আজ তো তাকে আর আপন বলে দাবী করা চলে না।

* * * *

সামনে প্রশস্ত শয্যার এক ধারে শুয়ে আছে সেদিনকার আগন্তুক—বিধর্ম্মী আলী রহমান সাহেব। লাহোরের পুলিশ বিভাগের বড় দারোগা। আর বিধর্ম্মীই বা কেন, সেই তো এখন মেহের, তারও ধর্ম্ম এই। পঙ্কিলতার আবর্ত্ত থেকে তুলে এনে সম্মানের আশ্রয় দিয়েছেন তার স্বামী রহমান সাহেব। তবু, পিতৃপুরুষের রক্ত-কণিকার প্রতি বিন্দুটি মিশিয়ে আছে তার দেহে, সে পারে না তার দুর্ব্বার আহ্বান এড়াতে। মাত্র কয়েকটি বৎসরের ব্যবধানে ভুলবে সে কি করে নিজের গত জীবন! রহমান সাহেবের পাশে সুপ্তির আশ্রয়ে মগ্ন ছোট্ট শিশু যখন জন্ম নিল, সে তার আত্মজ হলেও পারত না তমসা তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে ভাবতে। তাই শিশুর ডাকে তাকে আদর করতে তুলে ধরতো যখন, শিশুর মুখের ওপর ভেসে উঠতো রহমানের প্রতিচ্ছবি। আত্মবিস্মৃতা তমসা উদ্যত হাত গুটিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই শিশুর আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করে অঝোর কান্নায় ডুবে যেত। সর্ব্ব-তাপহারী শিশু-লুণ্ঠকের স্পর্শে শান্তিতে ভরে উঠত তনু-মন!

এ কি দ্বন্দ্বে ফেললে ঠাকুর? আকুতি জানায় তমসা। বালকের পর জন্ম নিল ফুলের মত কন্যা। মা'র রূপের ধারা পেয়েছে সে। একসঙ্গে বাঙলা মার মত মানুষ করতে লাগলো সে দুই ভিন্ন রূপের সন্তান। নিয়তির নির্ম্মম বিধান বলেই ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল সে। কালের প্রলেপে ক্রমশঃ মন তার শান্ত হয়ে আসছিল। ভুলেও ছিল অনেক কিছু।

কিন্তু হঠাৎ কাল বিকেল বেলা অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পেয়েছিল সে সুজিতকে। কেন জানি না এসেছে। এ দেশে তো ওর আসার কথা নয়। প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল তমসা। সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ছেঁড়া পাতাখানা সামনে খুলে গিয়েছিল। তাই অজ্ঞাতসারেই তার দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল রহমান সাহেবের অস্তিত্ব ভুলে। প্রথমে সুজিত চিনতে পারেনি। পরক্ষণেই চকিতে তার মুখে খেলা করে গেল ভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। প্রথমে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু তমসার পাশে রহমানকে দেখেই কেমন যেন গভীর ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তার মুখে। কিছু না জেনে, কোন কথার অবসর না দিয়েই দ্রুতপদে মিলিয়ে গেল সে জোর করে টেনে-আনা অতীতের যবনিকাখানি সরিয়ে দিয়ে।

* * * *

তাই এত কথা, এত ব্যথা, তার বিনিদ্র রজনীর সাক্ষ্য হয়ে থাকলো। ধীরে—অতি ধীরে দুঃখ-দহনে শুষ্ক তমসা এসে তার ছেলে-মেয়েকে স্পর্শ করে বর্ত্তমানকে অনুভবের জন্য।

লেখা এবং ছবি

[কোন লেখা, কিংবা কোন ছবি ছাপাবার জন্যে আমাদের কাকেও অনুরোধ করবেন না। সরাসরি বিচারের আশায় "মাসিক বসুমতী"র নিয়মাবলী পালন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সংখ্যায় নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।]

BENGALI SERIES NO:3

কেশের শ্রী রূপপ্রসাধনের প্রধান অঙ্গ

তাই কেশপরিচর্য্যার নব নব ধারা ও উপাদান সৃষ্টিতে কোন দিন মানুষ ক্লান্তি বোধ করে নি।

গত সত্তর বছর ধরে সারা ভারতে নানা রুচির নানা ধারার কেশপরিচর্য্যায় তৃপ্তি দিয়ে জবাকুসুম আজ অর্জ্জন করছে মহাকালের জয়তিলক।

আমাদের দেশে ধূলাবালির প্রাচুর্য্যের জন্য চুলের গোড়ায় ময়লা জমে। প্রখর আবহাওয়ায় মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি সহজেই তপ্ত হয়। দু কারণেই চুলের স্বাভাবিক শ্রী ও পুষ্টি নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদীয় জবাকুসুম এমন ভেষজ উপাদানের সুমিশ্রণে প্রস্তুত যে অতি সহজেই সব ময়লা পরিষ্কার করে দিয়ে গোড়াগুলিকে শক্ত ও পুষ্ট করে তোলে। এর স্নিগ্ধ স্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হয়।

জবাকুসুম নিত্যব্যবহার করলে সুগন্ধে মন ভরে উঠবে, গুচ্ছে গুচ্ছে জেগে উঠবে ঘনানীর অপরূপ চিকণ শ্রী, চেহারায় ফুটে উঠবে ব্যক্তিত্বের স্বকীয়ত্ব।

সত্তর বছরের সুনামে সমৃদ্ধ

জবাকুসুম

কেশের শ্রী ফুটিয়ে তোলে-মস্তিষ্ক শীতল রাখে

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস-কালিকাতা

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

রবীন্দ্র-সংগীতে ভগবৎপ্রীতি

দীপা সর্বাধিকারী

'কথার যেখানে শেষ গানের সেখানে শুরু'; ভাব যেখানে ভাবাহীন সংগীত সেখানে মুখর; জীবন যখন ব্যক্ত কথায় তার প্রকাশ; যখন সে অব্যক্ত তখনই সৃষ্টি হয় সংগীতের। গান মানুষকে নিয়ে যায় দীনতা-তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে, মানুষের ক্ষুদ্র আমিত্ব বিরাটের গভীরতায় নির্ব্বাণ লাভ করে। অসীম একের মাঝে নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেওয়ার মানুষের চিরন্তন আকুতি যা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। তাঁর জীবনের যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মহান্, জীবনে "ব্যথার বাঁশি"তে বেজে ওঠা "আনন্দের গান" তিনি সুরে-সুরে উৎসর্গ করেছেন তাঁর অন্তরতমকে। ভৈরবীর সুরে, সন্ধ্যায় পূরবী রাগিণীতে সেই একই সুর বার বার অনাহত তন্ত্রীতে বিচিত্র মূর্চ্ছনায় আপনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। জীবন-বিধাতাকে কখনো তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর অন্তরের অন্তরতম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, কখনো বিশ্বের মাঝে—সারা জীবন ধরে এই আত্মনিবেদনের সুর তাঁকে কাঁদিয়েছে। বিচিত্র লীলায় তাঁকে নিয়ে গেছে সুর থেকে সুরে, গান থেকে গানে, প্রাণ থেকে প্রাণে। তাঁর এই অসমাপ্ত সুরের অর্ঘ্য "বিশ্ব-গানের ধারা" বেয়ে চলেছে সেই মহাযন্ত্রীর পায়ে। কবির গানে আত্মপ্রকাশ করেছে এক বিরাম-বিহীন পথ চলা। ক্লান্তি, শেষের গানের মধ্যে তাঁর কানে এসে পৌঁচেছে অশেষের সুর, গানের ঝর্ণাধারায় তিনি শুনতে পেয়েছেন মহাসাগরের কল্লোল; কোলাহলহীন গভীর রজনী নেমেছে তাঁর হৃদয়ে, তার অতল অন্ধকারে তিনি উপলব্ধি করেছেন "গভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার, পরিপূর্ণ মহাজ্ঞানের" জ্যোতির্ময় রূপ, রবীন্দ্র-সংগীতের সুর তাই নিবেদনের সুর—

"হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।"

অসীমের গানে মহাজীবনের এই বিরাম-বিহীন যাত্রাপথে কবি তাঁর জীবনের এই শেষ কথাটি নানা ছলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর গুরু তাঁকে করেছেন "অশেষ" ফুরিয়ে ফেলে আবার ভরেছেন "জীবন নব নব"। সারা জীবন তিনি গান গেয়েছেন, সুরের গঙ্গায় প্লাবিত করেছেন সমস্ত পৃথিবী, সুরের সে স্রোতোধারা সাগরের পানে অভিযাত্রী—

"তোমা পানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।"

জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কবি তাই প্রার্থনা করেছেন—

"এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।"

বিশ্বের অন্তরে কবি দেখতে পেয়েছেন বিশ্ব-পিতার আসন। রুদ্ধ মন্দিরের কোণে নেই তাঁর হৃদয়নাথ, তিনি আছেন অগণ্য মূক মূঢ় দীনের মাঝে—"সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে"। "দুঃখ রাতের রাজাকে" তিনি দেখেছেন দুঃখের মধ্যে। সংসারের আবর্জ্জনা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, পার্থিব মোহ তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে, তাই কবি বলেছেন—

"জীবনে আমার সংগীত দাও আনি
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।"

অসীমের মাঝে নিজেকে উপলব্ধি করবার কবির এই সংগীত সৃষ্টির সংগীতের সংগে এক তারে বাঁধা। মহাবিশ্বের যবনিকার অন্তরালে যে মহাকবির গানের সুর রূপে-রেখায় তরঙ্গিত হয়ে বারে বারে আপনাকে ব্যক্ত করতে চাইছে—সৃষ্টির মাঝে, ঋতুর থালায় যা বারে বারে পূর্ণ হয়েও রিক্ত থাকে, জীবন-সন্ধ্যায় ঘরছাড়া পথিকের উদাস মনকে যা ব্যথাতুর করে তোলে—সমস্ত জগৎ জুড়ে সৃষ্টির সেই ক্রন্দসী সুর অলক্ষ্যে থেকে মর্ত্ত্য-কবির বীণায় উচ্ছল হয়ে বেজে উঠেছে। সৃষ্টির বীণার এত সংগীত, এত ঝঙ্কার কেন না "সেখানে বীণার পেছনে আমাদের ওস্তাদজী আছেন, সেই ওস্তাদজীর আনন্দই গানের ভেতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়।" মহাযন্ত্রী বাজিয়ে চলেছেন তাঁর বীণা, সেই সুরে কবি তাঁর জীবন মেলাতে চেয়েছেন। কবি চেয়েছেন ওস্তাদজীর আনন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে।

"তুমি একলা ঘরে বসে বসে
কি সুর বাজালে প্রভু,
আমার জীবনে।"

সৃষ্টির তীরে বসে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক কাজ-ভোলা চিরশিশু বাজিয়ে চলেছে তার বাঁশি, গানে-গানে খুঁজে ফিরছে তার গুরু মহাকবিকে—"নীল আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথ রাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তার বাঁশি ফিরে নেবে।"

বেলা-শেষের অস্তাচল-পথযাত্রী রবি কবির জীবনেও এনেছে যাত্রাশেষের আহ্বান, তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন গভীর শান্তি, পরম পুরুষের সঙ্গে মিলনের এই শুভক্ষণটিতে জীবনের কোন অপূর্ণ বাসনা, পেয়ে হারানোর বেদনা তাঁর মনকে ব্যথিত করতে পারেনি।

...নের শেষ অর্থ বুঝতে পেরেছেন তিনি, গানে-গানে সারা ...ন দান করেছেন নিজেকে, তাই মুক্তির আশায় তিনি ব্যাকুল, ... "গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি" অবসান প্রায় আসন্ন প্রভাতের ... বাণী তাঁর অন্তরে পৌঁছেচে! তিনি চলেছেন, যেখানে—

"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছে দাঁড়ায়ে।"

কবির জীবনের শেষ কথা আজও তাই গানে-গানে যাত্রা করেছে ...ন্তের পূজাবেদীমূলে, সৃষ্টির বীণার সাথে বেজে চলেছে, তাঁর বাঁশি— ...ম বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের পায়ে সে সুরের সমাপ্তি—

"একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।"

নারী-প্রগতি কোন্ পথে?

শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা রায়

নারী-প্রগতি কোন্ পথে? এ প্রশ্ন উঠলেই আজ বলতে ইচ্ছে করে যে, "নারী-প্রগতি আজ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে।"—অবশ্য চক্ষুলজ্জায় না বাধে, বা সত্য-ভাষণের সাহসের অভাব না হয়। ...র-পারের সভ্যতা আজ ভারতের, বিশেষ কোরে বাঙ্গলার নারী, ...জে এমন বীভৎস আলোড়ন এনেছে যে, তার দিকে আজ চাইতেই ... যায় না। শিক্ষা রসাতলে গেছে, সামাজিক বিধি-নিষেধের ...ই নেই, বসনের শাসন নেই, রুচির বিচার-ভেদ নেই, প্রবৃত্তির ...ম নেই, ধর্ম্মের অনুশাসন নেই, উন্মত্তের মত নারী-সমাজ আজ ...ম চলেছে অনিবার্য্য ধ্বংসের প্রবল বন্যাস্রোতে। পিছনে কি ...ল রেখে যাচ্ছি তা ফিরে দেখবার পর্য্যন্ত সাহস নেই। কারণ ...নে, যা ফেলে রেখে যাচ্ছি তার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। ... প্রত্যেকটি নারীর দিকে পুরুষ চাইছে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে আর ...ত্যকটি পুরুষের দিকে নারী চাইছে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে। কেউ ...উকে বিশ্বাস করে না। এর সত্যতা লক্ষ্য করা যাবে নর-নারীর ...াহের প্রতি বিমুখীনতা দেখে। প্রশ্ন উঠবে অর্থনৈতিক অবস্থার। ... উঠবে সংসার প্রতিপালনের অক্ষমতার দরুণ ছেলেরা বিবাহে ...াজ, প্রশ্ন উঠবে পণ দেবার অক্ষমতা হেতু পিতা-মাতা কন্যার ...াহ দিতে অপারগ। আমি বলবো—না, ছেলেরা আজ যথেষ্ট ...ভাবাপন্ন মন নিয়ে চলা-ফেরা করে। সুতরাং তাদের পিতা-...া এমন কোনও পণ চেয়ে বসবেন না, যা কন্যাপক্ষ দিতে একেবারে ...ারগ হবেন। আর ছেলেরা যদি বলে যে সামান্য উপার্জ্জনে ...হ সম্ভব নয় তবে আমি বলবো যে, তারা অবিবাহিত অবস্থায় ...দের পেছনে অবৈধ ভাবে যে অর্থের অপব্যয় করে, সিনেমা-...টারে দেখে যে পয়সা নষ্ট করে, সেই পয়সাতেই সুন্দর দাম্পত্য ...ন যাপন করা সম্ভব। প্রত্যেকটি নর-নারীর জীবনে সঙ্গী বা ...নীর প্রয়োজন, নইলে কিছুতেই চলতে পারে না। কাজেই নৈতিক প্রশ্ন তোলা মিথ্যা। আসল কথা দায়িত্ব নেবার ...মতা নয়, আসল কথা হোচ্ছে এই যে, কেউ কাউকে আজ ...াস করে বিবাহ করতে চায় না। কে জানে, বিবাহের পর ...র মধ্যে থেকে কি গরল বেরুবে। বিশেষ করে মেয়েরা আজ এত সস্তা হোয়ে উঠেছে যে বিনা পরিশ্রমেই তাদের পাওয়া যাবে, এমন একটা ধারণাই জেগেছে পুরুষের মনে। পুরুষের মনে এই ধারণা জাগার হেতু কি? হেতু—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের বিকৃত রুচি, অশ্লীল প্রকাশ। হেতু—চিত্র-জগতের নারীকে নিয়ে খেলাটি; তাদের প্রেম, তাদের ভালবাসাকে নিয়ে অপমানজনক পরিস্থিতির উদ্ভব করা; হেতু—তাদের যৌবনের উদ্দীপ্ত শিখাকে গগনস্পর্শী কোরে তুলে ধরে পুরুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করা, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, ভারতের নারী আজ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছে, ভারতের নারী-সমাজ আজ তাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসকে ভুলবার জন্যে প্রস্তুত। তারা আজ চীৎকার কোরে বলছে—আমরা গার্গেয়ী, মৈত্রেয়ীকে ভুলবো, আমরা ভুলবো বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তারা আজ হাতছানি দিয়ে পুরুষকে ডাকছে, তারা বলছে—আমরা আজ নেমে এসেছি পুরুষের শ্রদ্ধার আসন থেকে; নেমে এসেছি স্বর্গের সিংহাসন থেকে এই মর্ত্তের মৃত্তিকায়। আমাদের নারীত্ব আজ ধূলি-লুণ্ঠিত, মাতৃত্ব আজ অবমানিত। নারী-সমাজ এই যে আজ সর্বনাশকে ডাক দিয়েছে এই সর্বনাশা অগ্নির লেলিহান শিখা প্রত্যেকটি বাড়ীর প্রত্যেকটি ইটকে স্পর্শ করবে। প্রত্যেকটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করবে আজ বর্ত্তমান নারী-সমাজের সর্বনাশা ডাক। আজ সাবধান হবার সময় এসেছে।

আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, নারীর ইঙ্গিত না থাকলে কোনও পুরুষ তার কাছে আসতে সাহস করবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, নারী হাতছানি দিয়ে না ডাকলে কোনও পুরুষ তাকে স্পর্শ করবে না। তাই আজ নারী-সমাজের বিরাট দায়িত্ব। তাকেই আজ বাঁচাতে হবে সমাজকে, বাঁচাতে হবে ধর্ম্মকে, রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হবে সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে। এ দায়িত্ব নারীর, এ দায়িত্ব তাকে আজ গ্রহণ করতেই হবে।

আজ বাঙ্গলার নারীকে বলতে শুনি—'বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন' পাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন; বাঙ্গলার ছেলেদের বলতে শুনি—'হিন্দু কোড বিল' পাশ হওয়া একান্ত দরকার। 'ভারতীয় সংসদে' 'হিন্দু কোড বিল' পাশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কেন আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বনাশা আলোর ঝিলিমিলি খেলা দেখতে পাই? আমরা কি বুঝবো না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের নর-নারীর নৈতিক জীবনে আজ ভাঙ্গন ধরিয়েছে, তার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় আজ তার বিষ-দাঁত বসিয়েছে। নর-নারীর নৈতিক জীবনকে তারা মানে না। তাদের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একনিষ্ঠতার একান্ত অভাব। দেহবাদ তাদের কাছে বড়। কিন্তু ভারতবর্ষ চিরদিন শান্ত সমাহিত জীবন যাপন করে এসেছে, তার মধ্যে ছিল অরণ্যের গভীরতা, হিমাদ্রির গাম্ভীর্য্য ও সমুদ্রের মৌনতা। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ পথহারা, দিশাহারা, অশান্ত, চঞ্চল। আজ নারীকেই তাই ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে পুরোহিত হোতে হবে। তার নৈতিক জীবনকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব আজ নারী-সমাজের। এ না হলে ভারতের মুক্তি নেই।

উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভেসে যাওয়া নর-নারীকে নিয়ে ভারতের কোনও মঙ্গল সাধিত হবে না। নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশাকে বন্ধ করার একান্ত প্রয়োজন হোয়েছে আজ। এ দায়িত্ব আজ অভিভাবকদের নিতে হবে। এই অবাধ মেলা-মেশা যদি স্বামী বা স্ত্রী

নির্বাচনের জন্মে হোত তবে হয়তো সমাজের এ অমঙ্গল হোত না। কিন্তু আজ এই অবাধ মেলা-মেশা এসে দাঁড়িয়েছে একমাত্র দেহবাদকে আশ্রয় কোরে। সেখানে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, নিষ্ঠা নেই, একটা ক্লেদাক্ত মন নিয়ে তারা মেলা-মেশা, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা তা মনে হোলেও গা শিউরে ওঠে। বিচ্ছিন্ন তাদের এক দিন হোতেই হবে এ তারা জানে, কারণ এমন নৈতিক সাহস এদের থাকে না যে, সমাজের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা বিবাহিত হবে। সুতরাং গোপনে তাদের বিচ্ছিন্ন হোতেই হয়। এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে ভয়াবহ পরিণতি তাই আজ ভারতের সমাজের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাধির মত ফুটে উঠছে। এর ফলে এই হয় যে—এই সব ছেলে-মেয়েদের অন্ত জায়গায় এক দিন বিবাহ হয়, কিন্তু তাদের অতীত ইতিহাস চাপা থাকে না, প্রকাশ এক দিন হয়। কারণ, এ চাপা থাকা বা চাপা রাখার জিনিষ নয়। এর ফলে শুধু দু'টি দম্পতীর জীবনই যে ব্যর্থ হোয়ে যায় তাই নয়, দু'-দু'টি পরিবারের কারও মুখ দেখাবার উপায় থাকে না। অশান্তি ও অসন্তোষে পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণীর মন বিষাক্ত হোয়ে ওঠে। সমগ্র জীবন নষ্ট হোয়ে যায় দু'টি দম্পতীর। কিন্তু আর ফিরবার উপায় থাকে না। কারও পক্ষেই কাউকে ত্যাগ করা আর সম্ভব হয় না। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার ও বিবাহের পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় থাকে না।

এইবার এই রকম একটি দম্পতীর জীবনযাত্রার এইখান থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাক্।

প্রেমহীন, ভালবাসাহীন, নিষ্ঠাহীন অসন্তোষপূর্ণ দাম্পত্য জীবন-যাত্রার সুরু হোল। পদে-পদে রুক্ষতা, কঠোরতা ও ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা নিয়ে তাদের প্রতিটি দিন কাটে। প্রীতি নেই, মমতা নেই, স্নেহ নেই, শ্রদ্ধা নেই, অনুরাগ নেই, অথচ একসঙ্গে বসবাসের ফলে রয়েছে একটা জৈব কামনা। তার হাত থেকে এরা কেউ নিস্তার পায় না—সে মনোবল কারও নেই, [illegible] সম্ভব নয়। মুহূর্ত্তের জন্মে তারা সব ভুলে যায়, ভুলে যায় তাদের অসন্তোষ, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি। এদের মধ্যে কি ছেলে, কি মেয়ে—যে অপরাধী নয় তার দুঃখ অবর্ণনীয়। তাকেও ভুলতে হয় সব। সেখানে নীতির কোনও বন্ধন নেই, সমাজের রক্তচক্ষু নেই, ধর্ম্মের অনুশাসন নেই, সেখানে স্বভাবতই সে দুর্বল। শুধু তাই নয়, আর এক পক্ষ থেকেও রয়েছে বিরাট আবেদন। এ ক্ষেত্রে যদি পুরুষ অথবা নারী একটা বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়, কঠোর নীতিজ্ঞান ও আত্মসংযমের অভাব হয়, তবে সেখানে পদস্খলন থেকে তাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদিও এটা অপরাধ নয় তবুও ধর্ম্মের দিকে চেয়ে, নীতির দিকে চেয়ে, আদর্শের দিকে চেয়ে, ভবিষ্যৎ বংশধরের দিকে চেয়ে একে অন্যায় বলে মেনে নিতেই হবে। কারণ, যে শিশুপুত্রের আবির্ভাব হবে তার পিতা-মাতার যদি কোনও পরিচ্ছন্ন পরিচয় না থাকে তবে সে অভিশাপ সন্তানের জীবনে ভয়াবহ মূর্ত্তি ধরে দেখা দেবে। তার ফলে তার জীবনে কোনও মহান্ আদর্শ ফুটে উঠতে পারবে না। সে হবে সমাজের, মনুষ্যত্বের, মানব জাতির এক অপ্রার্থিত, অবাঞ্ছনীয় শিশু। এর চেয়ে সে শিশুর আবির্ভাব না হওয়াই মঙ্গলের।

এর আর [illegible] দিক আছে সেটা হোচ্ছে এই যে—প্রেমহীন, নিষ্ঠাহীন ভালবাসাহীন দাম্পত্য জীবন যাপনে যে শিশুর আবির্ভাব হবে, নিঃসন্দেহে সে হবে বিকলাঙ্গ ও বিকৃত বুদ্ধি। সেই শিশু নিয়ে সেই দম্পতী সমাজে কার কাছে মুখ দেখাবে? এর চেয়ে সেই শিশুর আবির্ভাব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ শত-সহস্র দম্পতীর শত-সহস্র শিশুর আবির্ভাব হোয়েছে। এদেরই সমষ্টি নিয়ে আজ বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। তাই দিকে-দিকে আজ নীতিজ্ঞানহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়াবহ রূপ প্রকাশমান। এদের চরিত্র ও মনোবল থাকা সম্ভব নয়। মানবতার সম্মিলভার এদের স্কন্ধে সইবে না। এই পাপ বংশপরম্পরায় পাপের জন্ম দিয়ে যাবে। সমাজ যাবে রসাতলে, নীতি হবে শৃঙ্খলিত, মনুষ্যত্ব হবে পদদলিত, নারীত্ব হবে লাঞ্ছিত। মানুষ আর মানুষকে শ্রদ্ধা করবে না, ভালবাসবে না। পুরুষ আর মর্য্যাদা দেবে না নারীকে, মাতৃত্বের বেদমন্ত্র আর উচ্চারণ করবে না।

এখনও সময় আছে, তাই আজ সমগ্র নারী জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি আমার প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে—তারা সুস্থ হোক। সবল হোক। পুরুষের কামনার যূপকাষ্ঠে তারা বলি মাত্র, এই পরিচয়েই যেন তারা জগতে বেঁচে না থাকে। মহাশক্তির অঙ্গ তারা এ কথা তাদের ভুললে চলবে না। তাদের ভুললে চলবে না যে, এই মহাশক্তির তেজোবহ্নি থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্মে পরম পুরুষকে আবির্ভূত হোতে হয়েছিল। মহাশক্তির ক্রোধবহ্নি থেকে জগতকে বাঁচাবার জন্মে পরম পুরুষকে বসতে হোয়েছিল এই মহাশক্তিকে কোলে নিয়ে। তাই বলি, যাদের মধ্যে এই মহাশক্তির অংশ রয়েছে তাদের কি পুরুষের বিলাস-ব্যসনের সস্তা সামগ্রী হওয়া শোভা পায়? পুরুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকা কি তাদের শোভা পায়? তাদের নিজেদের চিনতে হবে, জানতে হবে। মহা কল্যাণ রয়েছে তাদের মধ্যে নিহিত। তাকে জাগাতে হবে। তাদের একনিষ্ঠ প্রেমে, ভালবাসায়, অনুরাগে পুরুষ দুর্বার হোয়ে উঠবে, বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগবে তাদের মনে। একটি মাত্র পুরুষের জন্মে একটি মাত্র নারীর পরম প্রতীক্ষা, একটি মাত্র নারীর জন্ম একটি মাত্র পুরুষের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, তাদের মিলন যে জগতের কি বিরাট মঙ্গলের সৃষ্টি করবে তা চিন্তা করতেও আনন্দে আমার চোখ অশ্রুসজল হোয়ে ওঠে। পুরুষের সর্বপ্রথম প্রেম সর্বপ্রথম নারীকে ঘিরে সার্থক হোয়ে উঠুক, ধন্য হোয়ে উঠুক। নারীর সর্বপ্রথম ভালবাসা, প্রেম, পুরুষকে ধূপের ধোঁয়ার মত আচ্ছন্ন করে রাখুক, নারীর মাঙ্গল্য রচনায় পূত হোক, পবিত্র হোক পুরুষের জীবন।

যুগে-যুগে নারী আত্মনিবেদন করে এসেছে পুরুষের পায়ে। পুরুষ তাকে তুলে নিয়েছে মাথায়। মাথায় মণি কোরে রেখেছে। বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করেছে, তার সমস্ত অমঙ্গলকে দিয়েছে ঢেকে। তার সমস্ত দিনের পরিশ্রম নিঃশেষে বিলুপ্তি লাভ করেছে নারীর মঙ্গল-স্পর্শে। পুরুষ সব কিছু সমর্পণ কোরেছে নারীর কাছে—সমর্পণ কোরেছে তার বাহুবল, তার কর্মক্ষমতা, তার অর্থ, তার সব! সব দিয়েও তার যেন তৃপ্তি নেই; আরও কি দেবে তারই সন্ধান করে প্রতিদিন। তবুও কিন্তু পুরুষের পায়ের কাছে নারীর আত্মনিবেদনের পালা সাঙ্গ হয়নি? এই তো ভারতের শাশ্বত নারী! নারী যেন নিজেকে না হারায়।

শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে

শ্রীমহামায়া দে

শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতারই পরিচয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, বিশেষ আমার মত লোকের পক্ষে। কারণ, সমুদ্র গভীরতায় কতটা এবং তাতে জল আছে কতখানি, সেটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেপে হিসাব বার করা খুব শক্ত নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের মহাসমুদ্র শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গভীর তত্ত্ব কোনও বৈজ্ঞানিক হিসাব কষে বার করতে সক্ষম নহেন, কিন্তু তবুও আমরা বলতে যাই। এবং বলতে যাই আমরা এই জন্তেই যে, তাঁকে আমরা ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালওবাসি। অনেক কিছু আড়ম্বরযুক্ত ভাষায় তার কারণ না দেখিয়ে এইটুকু মাত্র বললেই যথেষ্ট হবে।

যাকে আমরা ভক্তি করি ভালবাসি, তিনি যত বড়ই হউন, তার কথা যত মহার্ঘ এবং অনন্তই হোক, ছোট মুখে তাঁর কথা বলতে যাওয়া যত ধৃষ্টতারই পরিচয় হোক, অন্তর কিন্তু অত বড়-বড় হিসাব কষতে চায় না। অন্তর যাঁকে ভালবাসে ভক্তি করে তাঁর কথা সে বলবেই, সকল হিসাবের বাইরে, এইটাই তার সত্য কথা। তাঁর প্রসঙ্গে অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাঁর কথা না বলে সে যে থাকতে পারে না।

ছোট শিশুর মুখে বাচালতা যেমন পিতার কাছে ক্ষমণীয়, তেমনিই আমাদের এই ধৃষ্টতাটুকুও তাঁর কাছে ক্ষমণীয়।

আজ এই শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-স্মৃতি দিবসে তাঁর কথা বলতে তো চাইছি কিছু, কিন্তু কি বলা যায়?

গাছে ফুল ফুটিয়েছেন ভগবান, আমরা সেই ফুল তুলে মালা গেঁথে তাঁরই গলায় পরিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হই, গর্ব্বিত হই, নিজেকে ধন্য মনে করি, তাঁর ফুলে তাঁকেই পূজা করি। এও হবে আমাদের তেমনি পূজা-নিবেদন আমাদের অক্ষম ভাষা দিয়ে, তাঁর কথা বলে ভাষা হবে আমাদের ধন্য।

শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে যাওয়া জানতে যাওয়া সে বড় সোজা কথা নয়, অনেক বড় কথা এবং এই সামান্য প্রবন্ধ সে ক্ষেত্রও নয়। শ্রীঅরবিন্দকে জানতে হলে আধ্যাত্মিক থার্ম্মোমিটার চাই, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকা চাই, অতএব সে বৃহৎ প্রসঙ্গ থাক। এখন বাইরের দিক দিয়ে তাঁর কথা কিছু আলোচনার চেষ্টা করা যাক।

আজ দেশের মধ্যে যে বিপর্য্যয়ের সময় এসেছে, আজিকার প্রসঙ্গে তার স্থান নেই। শোনা যায় দেশ স্বাধীন হয়েছে, যদিও দেশবাসী তার নিদর্শন কিছুই পায়নি, তবুও স্বীকার করতেই হয় দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক দিন শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এক জন প্রধান নেতা। দেশবাসীর প্রাণে জাগিয়েছিলেন দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার পেণ্ডুলাম দুলিয়ে দেবার মূলেও ছিলেন তিনি, যে দোলায় দেশ আজও প্রবল ভাবে দোল খাচ্ছে। এক দিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে শ্রীঅরবিন্দ থাকলেও আজ এই অরবিন্দ-প্রসঙ্গে সে সংগ্রামের স্থান নেই। কারণ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদিম হোতা পরবর্ত্তী সময়ে বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষ সংগ্রাম করে স্বাধীন হবে না, এবং শোণিতধারায় তার মুক্তিস্নান হবে না। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, দেবতার লীলা-নিকেতন। হিংসার দ্বারা, কূট রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে সাম্য-মৈত্রীতে, মিলনে, সে মিলন মহামিলন, একজাতি প্রেম-বন্ধনে। কিন্তু সে সাম্য-মৈত্রী আসবে অস্ত্রবলে নয়, আইনের জোরে নয়, জোর জবরদস্তিতে নয়, ভয় দেখিয়ে নয়, শাসন করে নয়, সে সাম্য মৈত্রী আসবে যেমন প্রবল ভাবে বন্যা এলে খাল-বিল-পুকুর ডোবা, ঘরবাড়ী সব ডুবিয়ে দিয়ে সমান ভাবে জলস্রোত বয়ে যায়, তেমনি অধ্যাত্মিকতার স্রোতে সাম্য-মৈত্রী এনে দেবে এই দেশে, এই আমাদের ভারতবর্ষে। যখন আর হিংসা থাকবে না, মারামারি কাটাকাটি থাকবে না, প্রতিবাসীকে বঞ্চিত করবার মনোভাব থাকবে না, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্রোহও আর থাকবে না।

কিন্তু কেমন করে কোন্ মন্ত্রবলে তা হবে? জানি নে, আমাদের হিসাব এখানে হার মানে। কিন্তু সে মন্ত্র আমরা পাবো এক দিন, নিশ্চয়। পাবো আমরা কানে-কানে এবং প্রাণে-প্রাণে। প্রাণে-প্রাণে সেই পাওয়া হঠাৎ এক দিন উপচে পড়ে বান ডাকিয়ে দেবে সমতায়, মৈত্রীর বন্ধনে বেঁধে দেবে দেশবাসীকে, সেদিন স্বাধীনতার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হবে গরীয়সী মহীয়সী ভারতবর্ষে। শ্রীঅরবিন্দ আজ সাধনায় মগ্ন সুদূর পণ্ডিচারীতে ভারতবর্ষের এই নবতর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন সঙ্কল্পে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তাঁর এই কঠোরতম সাধনা এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে নয়, সমষ্টিগত জীবনের জন্যে। ব্যক্তিগত মুক্তিই তাঁর কাম্য নয়—তিনি চান সমগ্র দেশের মুক্তি। তিনি বার বারই বলেছেন তাঁর লেখার মধ্যে, তাঁর সাধনা তাঁর প্রিয় দেশের জন্য, তাঁর ভারতবর্ষের জন্য, এবং কেবল তাই-ই নয়, তাঁর সাধনা বিশ্বমানবের জন্য। যাঁরা প্রবর্ত্তক সাধক তাঁরা খণ্ড কল্যাণ চান না, তাঁরা চান অখণ্ড কল্যাণ, বিশ্ব-কল্যাণ। কথা-প্রসঙ্গে সে কথা শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকে বলেছিলেন এক দিন, বলেছিলেন তাঁর নিজের জন্যে যদি এ সাধনা হতো, তবে ঢের আগেই তিনি মুক্তি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তেমন মুক্তি তিনি চান না। তাঁর প্রিয় দেশবাসী দুঃখ-দুর্দ্দশায় ডুবে থাকবে আর তিনি মুক্তিলাভ করবেন এমন স্বার্থপরতার আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই তিনি অন্তরে পোষণ করেননি। তিনি স্বার্থপরতা সম্বন্ধে কি রকম ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীকে লেখা 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র' নামক পুস্তিকাখানিতে। তিনি স্ত্রীকে লিখেছিলেন 'ভগবান তাঁকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেছেন সেটা তাঁর প্রয়োজন অতিরিক্ত এবং যতখানি অতিরিক্ত তা অন্যের প্রাপ্য। ভগবানের দেওয়া তাঁর কাছে যে অতিরিক্ত ন্যস্ত বস্তু যাদের জন্যে, সে বস্তু তাদের না দিলে তিনি চুরি অপরাধে অপরাধী হবেন।'

নিজের শক্তির পরিমাণ অনুভব শ্রীঅরবিন্দের ছিল। তিনি জানতেন যে, ভগবৎশক্তিতে তিনি শক্তিমান। সে শক্তিতে নিজের মুক্তি ছাড়া বহু জনের মুক্তিসাধন তিনি করতে পারেন। অতএব সেই বিপুল শক্তিকে খর্ব্ব করে কেবল নিজের মুক্তির জন্য লাগালে তিনি ভগবানের কাছে অপরাধী হবেন। তাই তিনি সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সুদূর প্রান্তে গিয়ে বসলেন দেশের মুক্তির জন্য। সে মুক্তি দুঃখ থেকে মুক্তি, দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি,

রাধীনতা থেকে মুক্তি। সে মুক্তি জড়তা থেকে মুক্তি, জ্ঞানতা থেকে মুক্তি, সে মুক্তি আত্মচেতনা। সে আত্মচেতনা াসবে সকল মানুষের মধ্যে, কেবল ভারতবর্ষে নয়, আসবে বিশ্বজগতে, আসবে প্রত্যেক মানব-মনে। এই চেতন-যুক্ত মানবই বে স্বাধীন, প্রত্যেক মানবের মন এই ভাবে স্বাধীন হলে তবেই দেশ স্বাধীন হবে। মানবের মন স্বাধীন না হলে াইরে থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কেহই বোঝেনি। বিশ্বশান্তির এই অভূতপূর্ব্ব উপায়কে ফলবান করে তুলতে চাইছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজের কঠোরতম সাধনা দিয়ে।

জনপ্রেমিক যাঁরা, বিশ্বপ্রেমিক যাঁরা, তাঁরা নিজেকে এমনি করেই উৎসর্গ করেন বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়।

অনেকে বলেন, দেশের এই দুর্দ্দিনে শ্রীঅরবিন্দ গুহাহিত য়ে কি এমন দেশের কল্যাণ করছেন? বেরিয়ে আসুন তিনি দেশের বুকে, নির্দ্দেশ দিন দেশকে। বহু দিন পূর্ব্বে এ কথার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশ এখনও তৈরী নয়, উপযুক্ত সময়ে দেশ পাবে তাঁকে। আমার মনে হয়, সেদিনের আর বেশী দেরী নেই।

শেষ একটা কথা বলে আমার সামান্যতম প্রবন্ধ আমি শেষ করি। আজ এই বাস্তবতার যুগে যদিও আধ্যাত্মিকতার কথা প্রলাপ বলেই মনে হবে। আমি জানি, দেশের তরুণ ছেলেদের মনোভাব। কিন্তু তাদের আমি বলি এই যে, আধ্যাত্মিকতা প্রলাপ নয়, এবং নেশার আমেজও নয়। তারা যেন মনে রাখে আবাল্য পাশ্চাত্যে প্রতিপালিত, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাঁর জানা ছিল না, সেই শ্রীঅরবিন্দ আজ আধ্যাত্মিক সমুদ্র-মন্থনে যত্নবান এবং শুধু তাই নয়, সেই সমুদ্র-মন্থন করে যে অমৃত তিনি লাভ করবেন, বিশ্বজন হবে তার অংশীদার, এবং সে অমৃত লাভ করে হবে তারা অমর।

ছাব্বিশে জানুয়ারী

শ্রীজ্যোতি দেবী

দিল্লী-প্রাসাদে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা পথে পথে জ্বলে আলো,
বাস্তুহারারা বাসাটি হারায়ে, ভীড় জমায়েছে ভালো।
মোদের কুটীরে জ্বলেনি ত বাতি, কেরোসিন নাই তাই।
ছিন্ন বসনে ঢাকেনি শরীর খাবার কোথায় পাই?

ম্লান মূক মুখে ফোটেনি ত ভাষা আশাও গিয়াছে শুকায়ে,
ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরেতে তাই শক্তিও গেছে ফুরায়ে।
হোথায় তোমরা উৎসব-দিনে মুখর রয়েছ বুঝি?
হেথায় গরীব সারা হয়ে গেল জীবন-যুদ্ধে যুঝি।

আধপেটা খেয়ে পেটে কিল মেরে তোমারে করেছি ধনী,
হয়নি ত শোধ এখনও যে ধার এখনও রয়েছি ঋণী।
ধার শোধ তরে শাসন-শোষণ, কত কাল আর হবে?
জমীদারদের ক্ষতিপূরণের খাজনাও দিতে হবে?

অল্প মূল্যে শ্রম কিনে নিয়ে, মালিক হয়েছ তুমি—
হাড় জিরজিরে রক্ত শোষণে আরও যে গিয়েছি নামি।
স্বাধীন হয়েছ তোমরাই ওগো, ধনিক-বণিক দল!
মুষ্টিমেয়ের চাপে মারা গেছু নাই কোন সম্বল।
সাদা প্রভুদের বদলে হয়েছে কালো প্রভু পত্নীয়ান্
সাদা-কাল মিলে পিষে মেরে ফেল গরীবের এই প্রাণ।

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
কিনিবার সময়
আসল জিনিষ
দেখিয়া লইবেন
La-bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯

শুধু গল্প নয়

শ্রীঅসীমকুমার বসু

ছোট একটি মেয়ে। মাথায় তার ঘন কালো চুল। তাদের বাড়ীর সামনেই ছিল সাজানো বাগান। সেই বাগানে দেশী-বিদেশী আরও কত নাম-না-জানা ফুল ফুটত। মেয়েটি রোজ বিকেলে তার বাবার সংগে সেই বাগানে গিয়ে খেলা করত। আকাশে তখনও কিছু-কিছু আলো ছিল। সূর্য্যদেব সবে অস্তে যাবার জন্তে তোড়জোড় করছেন, এমন সময় সে তার পিছনে তার বাবার চাপা গলার আওয়াজ পেল :—চুপ, একটুও নড়ো না।

মেয়েটি তার বাবার কথা শুনে তখনই সেইখানে বসে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড কাল বিষধর কেউটে সাপ কোথা থেকে এসে তার মাথার ও'পরে ফণা মেলে ধরল। তার পর আবার আপনা আপনিই কোথায় চলে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, মেয়েটিকে সাপটি কিছুই করল না। মেয়েটির বাবা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন, এখন এসে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর বার বার বলতে লাগলেন : মেয়ে আমার খুব বড় হবে। সারা দেশ জুড়ে ওর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

তাঁর সেই কথা মিথ্যা হয়নি। সেদিনের সেই ছোট মেয়েটি এখন কত বড়ই না হয়েছে। আজ দেশ জুড়ে তাঁর নাম। ইনি কে বল ত? ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভগিনী শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। বর্ত্তমানে ইনি ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে গেছেন।

* * * *

—মা, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি আমার, মা, হ্যাঁ, আপনার মতই স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাকে আমি একলা রেখে এসেছি। মাতৃস্নেহে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আমি মায়েরই অভাগা সন্তান।

আবেগে তাঁর চোখে জল এল। এই বিরাট কর্ম্মবীর কত দুঃখনিশি যাপন করে মুক্তির সন্ধানে যাত্রা সুরু করেছেন, কিন্তু ক্ষণিকের জন্তেও তার স্নেহময়ী মায়ের অশ্রুসজল মুখখানি তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর কাছ থেকেই ত আমরা সত্যিকারের মাতৃমন্ত্রের দীক্ষা পেয়েছি। দেশজননীকে ত' এমনি করেই ভালোবাসতে হয়। তোমরা কি কেউ এই মাতৃস্নেহাতুর সন্তানটিকে চিনতে পেরেছ? তিনি আমাদের বাংলা মায়ের দিক ছাড়া বিপ্লবী সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

গুরুগোবিন্দর মৃত্যু

শ্রীসমরেশ দাশগুপ্ত

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ……। সুদীর্ঘ পৌনে তিনশ'টি বছর আগে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীব।…

ঠিক এমনি সময় এক দিন সম্রাটের ধর্মনীতির প্রতিবাদ করার অপরাধে শিখগুরু তেগবাহাদুর হলেন বন্দী। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর জীবন দান করা হবে, ঔরঙ্গজীব তাঁকে এই আশ্বাসও পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহসী শিখগুরু রাজী হলেন না শিরের পরিবর্ত্তে ধর্মের সার বিসর্জ্জন দিতে। তাই সম্রাটের আদেশে তাঁর হল মৃত্যুদণ্ড। শুধু কি তাই? শিখগুরুকে দণ্ডিত করেও যেন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব। আদেশ দিলেন মৃতদেহ পড়ে থাকবে রাজপথের এক পাশে। কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—এমন কি, তেগবাহাদুরের কোন নিকট-আত্মীয়ও নয়। সম্রাটের আদেশে প্রহরী নিযুক্ত হয় মৃতদেহখানির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্তে। তেগবাহাদুরের ছেলে গুরুগোবিন্দ তখন ষোল বছরের কিশোর। পিতার মৃত্যু-সংবাদে এতটুকু বিচলিত হল না গুরুগোবিন্দ। বরং প্রতিশোধ নেবার একটা দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা জেগে ওঠে তার মনে। মৃতদেহের ওপর সম্রাটের এই অবিচারও তার সহ্য হল না। তাই এক দিন কাউকে না জানিয়ে, কাউকে সংগে পর্য্যন্ত না নিয়ে একাই রাজধানীর পথে বেরিয়ে পড়ে গুরুগোবিন্দ।

গাড়ী ছুটে চলে। হঠাৎ মাঝ-পথে তাকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয়। তাদেরই এক পূর্ব্ব-পরিচিত বুড়ো শিখ গাড়ীওলার সাথে তার দেখা হয়ে গেল—সংগে আছে তার ছেলেও। এরা দু'জনেই শিখগুরু তেগবাহাদুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। গুরুজীর পবিত্র মৃতদেহের এই মর্ম্মান্তিক পরিণাম ওদেরও ব্যথা দিয়েছে… প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বুড়ো শিখ জবাব দেয়—'কিন্তু একা তো সেখানে তোমার যাওয়া উচিত হবে না বাবা!…অথচ এখন আর সময় ত নেই যে এক দল সৈন্ত নিয়ে যাবে; তাই আমি বলছিলুম কি, তুমি না গিয়ে বরং আমরা বাপ-বেটায় দু'জনে যাই। ভুলে যেও না বাবা, তুমিই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা—এই বিরাট জাতির ভাগ্যবিধাতা। যে কাজের জন্তে যাচ্ছ তাতে জীবননাশের আশঙ্কা প্রতি পদে পদে। আমরা চাই নে তোমার এই মহামূল্য জীবন এমনি অকালে বিনষ্ট হ'য়ে যাক্। তোমার কাছে আমরা নিবেদন করছি তুমি ফিরে যাও বাবা, ফিরে যাও তুমি।'

বুড়োর প্রস্তাব কিন্তু মনঃপূত হয় না গুরুগোবিন্দের। অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলে দু'জনের মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত দু'জনের কাছেই এই বিরাট দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল গুরুগোবিন্দ।

মহানগরীর দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলে পিতা-পুত্রের শকট। দিন যায়···। অবশেষে এক দিন ওদের গাড়ী স্পর্শ করে রাজধানীর বুক। এর মধ্যে কিন্তু ওদের পোষাক-পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। মুসলমানের ছদ্মবেশ নিয়েছে পিতা-পুত্র দু'জনেই।

মহানগরীর বুকে তখন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকার নেমে আসছে। এরা ছুটে চলে ওদের গন্তব্য স্থানের দিকে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ, রাজপথ। শুধু পথের এক পাশে তেগবাহাদুরের দেহ পড়ে আছে নিঃশব্দে। গাড়ী থেকে নেমে পড়ে পিতা পুত্র দু'জনেই। চেয়ে দেখে—না, কেউ কোথাও নেই। মৃতদেহের গন্ধের দাপটে প্রহরীগুলোও সটকে পড়েছে পর্য্যন্ত।

গুরুজীর নিস্পন্দ দেহখানি গাড়ীতে তুলতেই কিন্তু একটা প্রশ্ন বুড়োকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অগত্যা ছেলের কাছে বললে সে কথাটা—'মৃতদেহ তো সরিয়ে নিয়ে গেলুম আমরা। কিন্তু কাল এই শূন্য স্থান দেখে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে না কি রাজধানীতে? হয়তো আমরা অমৃতসরে পৌছবার আগে ধরাও পড়ে যেতে পারি। তাহলে যে গুরুজীর লেড়কার কাছে দেওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে না? তাই আমি বলছিলুম কি, তুই বরং গুরুজীর দেহখানি অমৃতসরে নিয়ে যা তাড়াতাড়ি। আমি এখানে মরে থেকে এই শূন্য স্থান পূরণ করবো'···একটু থেমে ঢোক গিলে বললে—'আমি বুড়ো হয়েছি···ক'দিনই বা আর বাঁচবো? তবু যদি এক জনের আত্মত্যাগে সহস্র মানুষ বেঁচে যায় একটা জঘন্য অপবাদ থেকে। তুই যা···চলে যা বাবা!'

বাপের কথা কিন্তু মনঃপূত হয় না ছেলের। বলে—'না বাবা, তা হয় না। তুমিই বরং গুরুজীকে নিয়ে চলে যাও। তোমার তিন ছেলের মধ্যে আমি যদি মরে থাকি এখানে, তাহলে তোমার এমন কি এসে-যায় বাবা?' তার যুক্তি টেঁকে না বুড়োর ক্রমাগত আপত্তিতে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুড়ো শুধু বললে,—'আর কথা বাড়াস নে বাবা···তুই যা—তুই নিয়ে যা গুরুজীকে।' বলতে বলতে একটা চকচকে কৃপাণ বের করে বুড়ো বসিয়ে দিলে নিজের বিশীর্ণ বুকে। শেষ বারের মতো তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট উচ্চারণ বেরিয়ে আসে—'জয় গুরুজীর জয়।' ধপাস করে পড়ে যায় বুড়োর দেহখানি। রাজপথের এক পাশে পড়ে থাকে নিঃশব্দে।

ওদিকে তেগবাহাদুরের মৃতদেহখানি নিয়ে এক জন তখন ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে অমৃতসরের পথে—দ্রুতগতিতে।

···তার পর পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে সুদীর্ঘ পৌনে তিনশ'টি বছর পার হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় আজো লেখা রয়েছে শিখগুরু তেগবাহাদুরের কাহিনী—লেখা নেই শুধু এর পেছনের রক্তাক্ত ইতিহাসটি—নেই, এক জন সাধারণ মানুষের অসাধারণ আত্মত্যাগের জীবন্ত কাহিনীটুকু।

পুত্রের কাছে পিতার চিঠি

(পিপ্‌লস চায়না থেকে অনুবাদ)

জ্যোতি রায়।

"আমার প্রিয়তম পুত্র,"

আমাদের সমাজে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে···সমাজে এমন কি প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে পরিবর্ত্তনের অমোঘ প্রভাব। যদিও তুমি খুবই ছোট, তা সত্ত্বেও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, কেমন করে নতুন সরকার জন্ম নেবার পর চীন বদলে যাচ্ছে।

আমাদের নিজেদের পরিবার থেকে সুরু করতে হলে···প্রায় দশ বছর হল, তোমার বড় ভাই চীন-বিপ্লবে অংশ নিয়ে চলেছে। যখন বাড়ী ছেড়েছিল সে, তখন তিন বছরের শিশু তুমি···স্বভাবতঃই চিনবে না তুমি তাকে। সে-ও জানে না আজ-কাল কেমন দেখতে হয়েছ তুমি।

জনগণের মুক্তি-ফৌজের অতি দ্রুত জয়লাভে ইয়াংসী নদী পেরিয়ে দক্ষিণে চুংকিং তানায়াং-এর দিকে এগিয়েছিল সে। এবং সর্বশেষে পৌঁছেছিল সাংহাইএ এসে। গত ক'বছরের মধ্যে বাড়ীতে একবারও আসেনি সে। কিন্তু কাজের চাপে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হতে হল তাকে। এল পিকিংএ···তোমারি বড় ভাই সে, যে সর্বপ্রথম বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেছে··· তোমার তো তাকেই অনুসরণ করা উচিত।

পূর্বে আমাদের পরিবারের আট জনের আমার একার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করতে হোত। তোমাদের লেখাপড়ার সময় এলে মাসিক বেতন, কাগজপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম জোগাতে ধার করতে হোত আমাকে। আজ-কাল আমি আর তোমার বড় বোন দু'জনেই আমাদের 'শিল্পবিদ্যা' বিপ্লবের প্রসারে লাগিয়েছি। তোমার মেজ ভাইও আজ-কাল শিক্ষক। আর তোমার মেজ বোন, যে তোমার চাইতে মাত্র চার বছরের বড়। সে-ও পূর্ব-চীন মিলিটারী একাডেমীতে যোগ দিয়েছে। অবশ্য শিল্পের কাজ তো পূর্বেই করেছি। তবু আমার কাজ ও জীবন এই প্রথম বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমি অনুভব করছি যেন তারুণ্য ফিরে আসছে আমাদের।

সমবেত পাঠাভ্যাস ব্যতীত 'চীন-সোভিয়েত সুহৃদ্‌ সমিতির' দ্বারা পরিচালিত রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও পাঠ নিয়ে চলেছি আমরা।

ভাল কথা, এগুলো তো সবই আমার দিক দিয়েই বলা হোল। কিন্তু গোটা পরিবারে যার সব চেয়ে পরিবর্ত্তন এসেছে, সে তোমার মা। পঁচিশ বছর আগে যখন প্রথম সন্তান হয় তার, তখন সে সাংহাই-এ কলেজের ছাত্রী। সে সময়ে···যাক্ গে, যেগুলো তুমি জানো না, তা বলেই বা তোমাকে লাভ কি? বরং তোমাকে তোমার মায়ের সে কথাগুলোই বলি যা তুমি স্মরণে রাখতে পারবে। গত দশ বছরের মধ্যে মাঝে-মাঝে সোয়েটার বোনা ছাড়া গৃহস্থালীর কোন কিছুই কাজ করত না সে। এমন কি, ছিটেফোঁটা সেলাই বা কোন কিছু মেরামত করা হয়ে উঠত না তার। মর্জি মত রান্না আর মাঝে-মাঝে দৈনিক সংবাদপত্র···পুঁথি-পত্তর পড়ত সে। কিংবা কবিতা রচনা করত, তাও সময় কাটানোর খোরাক ছিল তা।

দৈহিক পরিশ্রমের অভাবে খিটখিটে হয়ে চলেছিল সে। এর মধ্যে পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তে ধরল ভাঙন···এক জনের উপার্জনের উপর সাত জনের নির্ভরতার দরুণ।

মুক্তির পর তোমার মায়ের দিকে চাও···বদলে গেছে···বদলে গেছে একেবারে সে। যেদিন থেকে তোমার বড় ভাইএর চিঠি হাতে এসে পৌঁছেছে তার। পাঁচ বছরের মধ্যে এই ছিল প্রথম চিঠি তার। তীব্র আনন্দ ও উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠল সে। প্রচণ্ড আবেগে শিক্ষকদের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দিয়ে ফেলেছে সে। ছেড়ে গেল তোমাকেও···সংঘের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলল সে। এক মাস ধরে কটকটে রোদ অস্বীকার করে, 'নয়া গণতন্ত্র', 'মার্ক্সবাদ' ও 'লেনিনবাদ' অধ্যয়ন করছে সে। অবশ্য ব্যঙ্গ করতেও কসুর করেনি তাকে গাঁয়ের লোকেরা, এ বয়সে লেখাপড়ায় প্রচণ্ড অনুরাগ দেখে। কারণ, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে এখন তার। কিন্তু সেগুলি আমল দিত না সে। শুধু নিজের প্রতি রাখত অখণ্ড মনোযোগ। বর্ত্তমানে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সে। সৌভাগ্যক্রমে তোমাদের শ্রেণীরই ভারপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী। এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞান, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ও শ্রেণীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য তীক্ষ্ণ নজর দিতে হয় তাকে। কায়িক শ্রমের দিকেও আকর্ষণ কম নয় তার। বড় বড় ক্যাবেজ ক্ষেতগুলির অত্যন্ত যত্নের সাথে পরিচর্য্যা করে চলেছে সে! সর্বদা ব্যস্ত থাকলেও নিজের পাঠের প্রতি মন দিতে ভুল হয় না তার। নিজেও তো লক্ষ্য করতে পার, যে মহিলা কুড়েমীর দরুণ অকেজো হয়ে উঠেছিল, মাত্র চার মাসেই কেমন স্বাস্থ্যবতী ও কর্মিষ্ঠা হয়েছে সে।

তোমার কথাই ধরে দেখ বৎস! তুমি তো মায়ের সাথেই আছ। বিদ্যালয়ে কি সুখেই কাটছে তোমার দিনগুলি। কেউ হয়ত বলতে পারে তোমার জীবনের ধারা বদলায়নি। কিন্তু চিন্তা করে দেখ, আমাদের পরিবার সমাজ—সবার মধ্যেই কি আকস্মিক পরিবর্ত্তন এসেছে।

তোমারও এই পরিবর্ত্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো উচিত। সবে মাত্র শুনলাম, তুমি না কি 'গণতান্ত্রিক তরুণ-সংঘে' যোগ দিয়েছ। বেশ ভাল করেছ বৎস। আর, এটাই তো পরিবর্ত্তনের একটা মস্ত বড় দিক্।

এক কথায়, যখন তোমার পারিপার্শ্বিক বদলে যাচ্ছে, তখন সঙ্গীদের ও দেশের চূড়ান্ত সেবা করবার জন্য নিজকে গড়ে তোলা একান্ত কর্ত্তব্য। ইতি,—তোমার পিতা"

চরম মূল্য

সুখেন্দু দত্ত

ধাত্রী পান্নার গল্প তো তোমরা সবাই শুনেছ। মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি ঘোচাবার জন্য আর এক মায়ের চরম আত্মত্যাগের কাহিনী এবার শোন!

তোমরা জান, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশের বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ভিয়েৎনামীরা আজ মরণ পণ করে সংগ্রাম করে চলেছেন। সেই ভিয়েৎনামেরই একটি ঘটনা।

১৯৪৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর এক ঘন তমসাচ্ছন্ন রাত্রি। ভিয়েৎমিন বাহিনী দু'মাস ধরে রাজধানী রক্ষা করার পর শেষ পর্য্যন্ত সেই অন্ধকার রাত্রে সহর থেকে সরে এল। তাদের সংগে ছিল শত শত অসামরিক অফিসার, স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুর দল। অন্ধকার-রাত্রির সুযোগ নেওয়ার জন্য তারা দ্রুতগতিতে কিন্তু নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিল।

তাদের একশ' ফুট ওপরেই ছিল একটা ব্রিজ। ব্রিজের ওপর ফরাসী সৈন্যেরা সার্চ্চ-লাইট আর মেশিন-গান নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

দলের মধ্যে একটা শিশু সহসা মায়ের কোলে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। তার মা চমকে উঠেই ছেলেকে আরও জোরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু এতে ছেলেটা আরও জোরে চীৎকার করে কেঁদে উঠল মাত্র।

ছেলের মুখে মা এবার বুকের দুধ গুঁজে দিলেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এক হাতে তিনি তার মুখটা চেপে ধরলেন, কিন্তু তবুও শিশুর কান্না থামান গেল না। ওর মা তাকে নানা উপায়ে চুপ করাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

অসহায় ভাবে চারি দিকে একবার তাকালেন তিনি। দেখলেন, তাঁরই পাশে দু'হাজার মানুষ একান্ত সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে! ভেবে দেখলেন, একবার যদি ফরাসীরা তাঁর শিশুর কান্না শুনতে পায়, তাহলে সমস্ত দলটাই তাদের মেশিন-গানের গুলীর অবাধ লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করলেন তিনি, তার পরই নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন।

কয়েক ঘণ্টা বাদেই দলটা শত্রুর গুলীর পাল্লার বাইরে গিয়ে পড়ল। স্ত্রীলোকটি এবার নদীর তীরে বালুকাময় তটের ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

পাশে তাঁর শিশুটির মৃতদেহ।

জাতির ভবিষ্যতের জন্য চরম মূল্যই দিতে হল তাঁকে। ছেলের কান্না তিনি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন তার শ্বাসরোধ করে।

তার মা কিন্তু এর পরও বেঁচে উঠলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাঁকে! কিন্তু এ পাপের জন্য তিনি একাই সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন না।

এটা কিন্তু কোন কাল্পনিক কাহিনী নয়, জাতির মুক্তি-যুদ্ধে এক ভিয়েৎনামী জননীর চরম আত্মত্যাগের অমর কাহিনী।

বিমানের শিশু যাত্রী

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের শিশুযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বহু বিমান কোম্পানী ঐ সকল শিশুযাত্রীদের জন্য বিমানে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু বড় বড় বিমানাবতরণ কেন্দ্রে শিশু-সদন সমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেখানে শিশুযাত্রীদের জন্যই বিশেষ প্রকারের ধৌতাগার, শয্যা ও বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়াদ্রব্য রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা-মাতা যখন ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তখন শিশুসদনের জনৈক পরিচার্য্যাকারী ছেলে-মেয়েদের দেখা-শুনা করিয়া থাকে।

দূরপাল্লার সকল বিমানে শিশুদের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখা হয়। কোন কোন বিমানে উহা ছাড়াও তাহাদের জন্য বেবী পাউডার সেফটিপিন্, ছবির বই, প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা হইয়া থাকে।—মার্কিণ-বার্ত্তা।

বই পড়ার শতবার্ষিকী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

(টেকনিকাল এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট, ন্যাশানাল লাইব্রেরী)

গত ১৪ই আগষ্ট (১৯৫০) ব্রিটেনের লাইব্রেরী আইনের এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেপ্টেম্বর মাসে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল এবং ইহাতে পৃথিবীর প্রায় এক শতটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

লাইব্রেরী আইন-পাশ হইবার পূর্বেও ব্রিটেনে গ্রন্থাগার ছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা ছিল নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষাও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল লিখন-পঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাহারা চার-পাঁচ বৎসর স্কুলে যাইবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারাও সংসারে প্রবেশ করিবার কিছু কাল পরে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া যাইত। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চাষী, মজুর এবং দরিদ্র-পরিবারের নারীদের স্কুলের বাহিরে বই পড়িবার সুযোগ না থাকাই ইহার কারণ। তখনকার দিনে বই-এর দাম সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন-গুলিতেও প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংগ্রহ ছিল না। ছাত্রদের পড়াইবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকগুলি শিক্ষকদের পক্ষেও পাওয়া দুষ্কর ছিল। এই জন্যই লাইব্রেরী আইনের সমর্থকরা শ্লোগান তুলিয়াছিলেন, "we must teach the teachers." অর্থাৎ, শিক্ষকদের শিক্ষালাভের সুযোগ দিলেই তো জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা!

সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে আন্দোলন সুরু করেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মী মিঃ এডওয়ার্ডস্‌। কিন্তু পার্লামেণ্টে লাইব্রেরী বিল উত্থাপন করেন উইলিয়াম এওয়ার্ট। এই বিলের উদ্দেশ্য সে যুগে এতই অপরিচিত ছিল যে, পার্লামেণ্টে ইহার প্রতিকূলতা অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বিরোধ এবং অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ১৮৫০ সালের ১৪ই আগষ্ট রাজার অনুমোদন লাভ করিয়া বিলটি আইনে পরিণত হয়।

আইন কথাটা শুনিলেই কোন প্রকার বাধ্যতামূলক দায়ের কথা মনে জাগে। লাইব্রেরী আইন কিন্তু সেরূপ নয়। ইহা দ্বারা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাকে আইনানুগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র। এই আইনে স্থির হইল যে, ইংল্যাণ্ডের দশ সহস্রাধিক লোকের বাস—এরূপ কোন সহরের নাগরিকেরা একমত হইলে অতি সামান্য কর ধার্য করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। তিন বৎসর পর ইহার প্রয়োগ আয়র্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডেও সম্প্রসারিত করা হইল। ১৮৫৫ সালে নাগরিকের সংখ্যা দশ হাজার হইতে কমাইয়া করা হইল পাঁচ হাজার। লাইব্রেরী ফাণ্ডের জন্য কর বাড়িল এক পাউণ্ডে আধ পেন্স হইতে এক পেন্স। আইন পাশ হইবার পর প্রথম দশ বৎসরে মাত্র পঁচিশটি সহরে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষকরা এই সব পাঠাগারে আসিতেন পাঠ প্রস্তুত করিবার সাহায্য পাইতে এবং সাধারণ পাঠক উপন্যাস ও পুরানো মাসিক পত্রিকা পড়িতে পাইলেই খুসী হইত। ১৮৮৯ সালেও গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরীগুলি যত বই ধার দিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৮খানাই উপন্যাস। উপন্যাস পড়িবার সুযোগ পাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বই পড়িবার অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গ্রন্থাগারগুলিও জনপ্রিয় হইয়াছে।

এক শত বৎসর পূর্বে প্রথম লাইব্রেরী আইন পাশ করিবার সময় যাহা কল্পনাতীত ছিল আজ তাহাই সম্ভব হবয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া হইল? সাধারণ লোক তখনও লাইব্রেরীর উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার মতো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় নাই। তাই তাহারা এই বিষয়ে উদাসীন ছিল। শুধু কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ও নিষ্ঠাবান গ্রন্থাগারিকের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ধীরে-ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৮৭৭ সালে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে দেশের গ্রন্থাগারগুলির সর্ববিধ উন্নতি সাধনের দায়িত্ব প্রধানতঃ এই সমিতির উপর পড়ে। অন্য কারণগুলির মধ্যে বৃটেনের লাইব্রেরীর জন্য দানবীর কার্ণেগীর দান, লাইব্রেরী পরিচালনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এবং দেশের সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা অন্যতম। ইহা ছাড়া শিশুদের জন্য বই পড়িবার ব্যবস্থা করায় পাঠকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ছেলেবেলা হইতে বই পড়িবার অভ্যাস না জন্মিলে বড় হইয়াই হঠাৎ কেহ বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। বৃটেনে পাঠকরা যে কোন বই যাচাই করিয়া দেখিবার অবাধ স্বাধীনতা পায়। বই ও পাঠকের মধ্যে সেখানে কোন কৃত্রিম ব্যবধান নাই। এই স্বচ্ছন্দ অধিকার থাকিবার ফলে জনসাধারণ গ্রন্থাগারকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভাবিতে দ্বিধা করে না।

এক শত বৎসরের নানারূপ ব্যবস্থার ফলে আজ সমগ্র জাতিটা যেন বই-পাগল হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫৬ সালে বৃটেনের সমস্ত লাইব্রেরীগুলি মোট ধার দিয়াছিল ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বই। ১৯৪৯-এ ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একত্রিশ কোটি বিশ লক্ষ। বৃটেনে এক কোটি বিশ লক্ষ তালিকাভুক্ত পাঠক আছে। ইহাদের জন্য বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার বই কেনা হয়

বর্তমানে বৃটেনে মাত্র ষাট হাজার লোক এমন অঞ্চলে বাস করে, যেখানে লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ নাই। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকে একটি পয়সা ব্যয় না করিয়াও যে কোন বই পড়িতে পারে। সভ্য হইতে টাকা লাগে না, এবং আইন-কানুনেরও কিছুমাত্র কঠোরতা নাই।

ব্রিটেনকে নয়টি লাইব্রেরী অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সেই অঞ্চলের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে যত বই আছে তাহার যৌথ-সূচী (Union catalogue) আছে। কোন এক জন পাঠক তাহার গ্রামের লাইব্রেরীতে একটা বই পড়িতে চাহিল; বইটা হয়তো সেখানে নাই। ইউনিয়ন ক্যাটালগ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানা গেল কোন্ লাইব্রেরীতে ইহা রহিয়াছে; এবং চিঠি লিখিবার পর বই আসিয়া পড়িল। এমনি করিয়া গ্রাম, থানা, মহকুমা, জেলা প্রভৃতির লাইব্রেরীগুলি একে অন্যের সহযোগিতা করিয়া চলিতেছে। জেলা লাইব্রেরীগুলি জেলার গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারণ করে এবং অধীনস্থ লাইব্রেরীগুলির তত্ত্বাবধান করে। ব্রিটেনে ছোট-বড় পাঠাগার ও পুস্তক-বিলি কেন্দ্রের সংখ্যা তেইশ হাজার। ইহাদের সকলের উপরে হইল ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (লণ্ডন)। এই কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার এবং লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশান দেশের গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিবিধানের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

যে সব জায়গায় কোন কারণে স্থায়ী গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব নয় সেখানে কিছু দিন পর-পর মোটর ভ্যানে করিয়া "মোবাইল লাইব্রেরী" পাঠানো হয়। রুগীদের জন্য হাসপাতালে লাইব্রেরী আছে। জেলের কয়েদীরাও বই পড়িবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। যে সব বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তি লাইব্রেরীতে গিয়া বই আনিতে পারে না, তাহাদের বাড়ীতে বই পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা অনেক স্থানে করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এমন আয়োজন করা হইয়াছে, যাহাতে ব্রিটেনের দরিদ্রতম ব্যক্তিও বলিবার সুযোগ না পায় যে, বই পাই না বলিয়া পড়ি না। প্রত্যেকের চোখের সম্মুখে, হাতের কাছে' জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই সান্নিধ্যের জন্য অ-পড়ুয়ার মনেও এক দিন কৌতূহল জাগিয়া ওঠে।

ব্রিটেনের গ্রন্থাগারগুলির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত। ইহাতে পার্লামেণ্টের কোনরূপ হাত নাই। জ্ঞানবিস্তারের এমন সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা এবং এক শত বৎসরে এতটা সাফল্য পৃথিবীর আর কোনো বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানই দাবী করিতে পারে না।

নীল আকাশ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা আঙ্গিকে, শব্দচয়নে, বক্তব্যে নতুন পথ ধরতে চেয়েছেন। নির্ভেজাল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাঁশী বাজিয়েছেন তাঁরা। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত রুচি বিসর্জন দিয়ে বণিকের হাতে ক্রীতদাস হওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছেন। যদিও তাঁদের এই ক্ষণ-বিদ্রোহ পরিণতি পেয়েছে নীরবতার মনোবৃত্তিতে, তবু আঙ্গিকের সূক্ষ্মতম কলা-কৌশল, শব্দচয়ন, মিলের চমক ও নতুন ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই দান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণ হয়তো বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-চেতনার অভাব আর লেখক হয়েও না লেখা। তাঁরা শুধু নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশাভঙ্গের নির্মম স্বাক্ষর রেখেছেন।

এঁদের পরের যুগের কোন-কোন বাঙালী কবি ত্রিশঙ্কুর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ত্যাগ করতে পেরেছেন। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা নতুন জীবনের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। এই কবিদের বিশ্বাসের গভীরতা পূর্ব সুরিদের অস্পষ্টতার জটিল জাল ছিঁড়ে ফেলেছে। এঁদের কয়েক জনের কবিতা বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-চেতনার স্বাক্ষর।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা-সঙ্কলন 'নীল আকাশ'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে এ-সব কথা বলা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হল। এই দুই কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয়টির সঙ্গে তো বটেই, প্রথমটির সঙ্গেও অচিন্ত্যকুমারের যথেষ্ট পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অচিন্ত্যকুমার উক্ত প্রথম কবি-গোষ্ঠীর সমসাময়িক। তাঁর সমসাময়িক কবিরা কাব্যের যে আঙ্গিক সচেতন ভাবে ত্যাগ করতে চেয়েছেন, তিনি তাকে গ্রহণ করেছেন দ্বিধাহীন ভাবে। তাই যে কবি লিখেছেন :

> মধ্যরাতে যখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়
> নীরবতায় নীল নিঃসঙ্গ সে মধ্যরাত্রি—
> শুনতে পাই আমি কেবল ট্রেনের শব্দ :
> যেন কোথায় ট্রেন চলেছে।
> যেন কোথায় ট্রেণ চলেছে
> কোন বিস্তীর্ণ নির্জন মাঠের উপর দিয়ে
> অন্ধকার দীর্ণ করে
> দ্রুতগামী দীর্ঘশ্বাসের মত।
> যেন কোথায় ট্রেন চলেছে
> ঘূর্ণমান চাকার হাহাকারে
> এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তহীনতায়।

তিনিই আবার লিখলেন :

> আমি তো ছিলাম ঘুমে
> তুমি মোর শির চুমে
> গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে,
> চলো রে অলস কবি
> ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি
> হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

অচিন্ত্যকুমারের সময়ে বাঙলা কাব্যের নদীতে যে নতুন জোয়ার এলো তার আঘাত তাঁর কবিতায় নিঃসন্দেহে লেগেছে, কিন্তু তাঁর পূর্বসূরিদের কাব্যাদর্শের প্রভাবও তাঁর কবিতায় প্রকট। ওপরের দু'টি উদ্ধৃতি থেকে এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু কাব্য আন্দোলনের এ সব প্রশ্ন বাদ দিলেও, অচিন্ত্যকুমারের কবিতার এক উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। শব্দ-যোজনার বিস্ময়কর দক্ষতা, ছন্দের বিচিত্র গতি, নতুন মিলের চমক তাঁর অনেক কবিতাকে অবিস্মরণীয় করে রাখে।

অনেক দিন আগে অধুনালুপ্ত 'নিরুক্ত' কাগজে তাঁর আলোচ্য

কবিতা-সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত 'উত্তম' কবিতাটি পড়েছিলাম। এখনও তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কানে বাজে। সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না :

মাঝে-মাঝে দেখা দেয় উলঙ্গ উত্তম।
তরস্বান্ বীর তুরঙ্গম
মাঝে-মাঝে বাঁকা করে ঘাড়
ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় রজ্জুরশ্মিভার।
জোরের জোয়ার
তরঙ্গিত করে তোলে পেশী,
মুখে আনে স্বতঃস্ফূর্ত হ্রেষা,
যেন কোন সাম্রাজ্য-অন্বেষী—
চক্ষে জ্বলে সংগ্রামের নেশা
চর্মে জ্বলে চিক্কণ চিকুর,
অগ্নিময় খুর
ছিন্ন করি ভিন্ন করি পথের পাথর
সহর্ষ-ঘর্ষণ-উন্মুখর
ছুটে চলে উগ্র অগ্রসর—
পিঠে তার অকস্মাৎ জন্ম নেয় পাখা।
তার পর চেয়ে দেখি ঘুরিতেছে চাকা
পিছে তার। বেগবাঁধ ছাড়ি
চাবুকজর্জর মাংসে টানিতেছে ভগ্নপ্রায় গাড়ী।

'নীল আকাশ' অচিন্ত্যকুমারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'অমাবস্যা' এবং 'প্রিয়া ও পৃথিবী'-র কবিকে আমরা এখানেও পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েছি।

আলোচনা

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে বাঙ্গালাসাহিত্য-নদীর কূলপ্লাবিনী অববাহিকা তা'র গান, গল্প ও উপন্যাসের ফেনিল-চটুল উচ্ছ্বাসময়-ভাবহিল্লোলের মধ্যে যেন আত্মতৃপ্ত। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের উদ্রেক বা ব্যঞ্জনার আভাষ পেলেই আমরা একটু স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ি। 'গীতাঞ্জলি'র 'গীত' আমাদের মন-প্রাণ হরণ করে। তা'র আবেশ, রেশ, নিরুপাধিস্বরূপ 'অঞ্জলি'টি আমাদের সব সময় যে মনঃপূত হয় তা কেমন ক'রে বলি? অথচ সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তা'হ'লে গহনগভীর চিন্তাকেও বরদাস্ত করা চাই—সাহিত্যকে এক সমর্থ স্বতঃসিদ্ধ শক্তিতে পরিণত কর্‌তে হলে সাহিত্যিকের সেদিকে দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য্য। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের শৈশবে রাজা রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থসংগ্রহ' হ'তে সুরু ক'রে কৈশোরে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী'র আশ্রয়ে, তা'র উদ্দাম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় সমৃদ্ধ 'পন্থা' প্রভৃতি পত্রের ভিতর দিয়ে সাধারণের পরিবেষণে সমাহিত সাহিত্যের রসদ একথা বার বার সপ্রমাণ করেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি তাঁদের চিন্তাশীল নিবন্ধরাজির দ্বারে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারসংগ্রহ, অনুশীলন এবং গবেষণাও ক'রেছেন।

কিন্তু প্রাচীন প্রাচ্যের প্রাচ্যত্ব ও প্রাচীনত্বকে অব্যাহত রেখে আধুনিক 'বিজ্ঞানসম্মত' আকারে, রূপে, রসে, রীতিতে সাহিত্যের ভিয়ানে পাক ক'রে উপস্থাপিত করা কম শক্তি, সাহস ও প্রেরণার পরিচয় নয়! শ্রীমৎস্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহোদয় (জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দের প্রাক্তন সহকর্মী, বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচয়িতা, পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) সংস্কৃত ভাষায় 'জপসূত্রে'র কারিকার ও পরিকর শ্লোকরূপে ভূমিকা বা ভিত্তি স্থাপন এবং সরল অথচ ওজস্বী, সরস অথচ 'শরবৎ তন্ময়' বাঙ্গালায় তা'র বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে বাঙ্গালার পাঠকবর্গকে সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন। প্রাচীন ভাবের সহৃদয় বাহক ও সমর্থ ধারক অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 'পরিণতপ্রজ্ঞ' স্বামীজীর বঙ্গ-ভারতীর উদ্দেশে দত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলিকে প্রকাশ ক'রে সৎসাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় আমাদের সাম্প্রতিক নূতন পরিবেশে "সুবাতাস বহা"র, সাধারণের কাছে সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয় ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে তা'র সহকারিতার, জড়শক্তির উপাসনায় অন্ধ আণবিক বোমার আস্ফালনে দিশাহারা জগতের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা নিত্য সত্যের পুনরুন্মেষের উপক্রমে এ এক বিচিত্র কালক্রমাগত সূচনা।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তু জপ। ধর্ম-সাধনায় কর্মযোগের অন্যতম অঙ্গ জপের মূলতত্ত্ব ও সংহত শক্তি দেশকালনির্বিশেষে স্বীকৃত হ'লেও ভারতের আর্য্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠায়ই তা'র স্বমহিমায় পূর্ণ প্রকাশ। হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের কাঠামোয় সম্বদ্ধ কর্‌তে এ এক সুচিন্তিত সহজ প্রণালী। অনাদি কালের এই প্রবর্ত্তিত ধর্মচক্র প্রাচীন ধারায় প্রত্যয়হীন এ যুগেও আবর্ত্তিত দেখ্‌তে পাই—ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই এর ভণিতার কায়াকে গুণী ওঝার (রোজার) মন্ত্র প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বজায় রেখেছেন, এর মায়া এড়াতে পারেননি। বহুতর ব্যক্তি কাজ-কর্মে, পালা-পার্বণে, গ্রহণে সংক্রমণে হবনে পুরশ্চরণে, দান-ধ্যানের মত এ'কে অসঙ্কোচে মেনে নিয়েছেন। আরও অনেকে সনাতন ধর্মপ্রবর্ত্তক মনীষী মনু ও আদিকালের বৈদ্যগুরু ঋষি চরকের মত আধিব্যাধি ও আপৎ-বিপদের নিবারণে গায়ত্রী, অষ্টাক্ষর বা দ্বাদশাক্ষর বাসুদেবাদি ইষ্টদেবতার মন্ত্রের কিংবা মৃত্যুঞ্জয়, বগলামুখী প্রভৃতির বীজের সাধন এর মারফতে সার্‌তে কুণ্ঠিত হন না। শেষোক্ত দফায় এর প্রয়োগ যে শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের উৎকট কপট পটু অভিনয় নয়, এ-কথা অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হ'তে পারে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এ'র সার্থকতা সপ্রমাণ হয় না, তার কারণও দুর্বোধ্য নয়। জপ ত' এক শ্রেণীর কর্ম। কর্ম মাত্রই আশু ফলপ্রসূ হয় না—তা'র উপর মনে রাখ্‌তে হয় তত্ত্বান্বেষীরা কর্মকে 'সপ্রতিবন্ধ' ও 'অপ্রতিবন্ধ' ভেদে ভাগ ক'রেছেন। বর্ত্তমান লেখক জপের অমোঘ শক্তিতে অকাট্য ভাবে বিশ্বাস কর্‌বার পক্ষে কয়েকটা দৃষ্টান্ত জানেন। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে নিত্য-প্রবৃত্ত গায়ত্রীজপ কি অসাধ্য-সাধন ক'র্‌তে পারে তা'র লক্ষ্যভূত এই দৃষ্টান্ত কয়টী।

সাধারণ জপে পাঠ্য হ'চ্ছে মন্ত্র। মন্ত্র সজীব, সক্রিয়, বিশুদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ, 'অভীষ্ট' ও প্রবুদ্ধ হ'লে মন্ত্রজপ ইহকাল পরকালের সর্বস্ব। স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করা যাক্ (৩৪ পৃঃ):—

"মন্ত্রের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা, বিজ্ঞানের কথার মত। হয়ত পরীক্ষায় সেগুলি 'হিং টিং ছট' রূপেই ধরা পড়িতে পারে। আপাততঃ তাহাই ধরিয়া লইবার কারণ নাই। বরং সম্ভাবনাটা অন্যদিকেই বেশী। এটা বিলক্ষণই জানা আছে যে, ভারতে ত্রিশ কোটি হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই বলিতেছি) জীবনে-মরণে বিবাহে-শ্রাদ্ধে ক্রিয়া-কর্মে ও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য করিতেছে সেটা আমরা দু'-পাঁচ জন বাচাল কূপমণ্ডূক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও, সেটার চেয়ে বেশী কেজো কথা কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে।"

শাস্ত্র জপের মাহাত্ম্য শত কণ্ঠে প্রকাশ ক'রেছেন। ঋগ্বেদের ঋষির 'ঋত' এরই অপরিহার্য্য পরিণতি, যেহেতু তপস্যা জপের অবান্তর ভেদ। গীতায় ভগবান্ এ'কে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলে নিজের বিভূতির মধ্যে পরিগণিত ক'রেছেন—ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্মে'রই নামান্তর। প্রচলিত অর্থেও এ উক্তি সমর্থনীয়—যেহেতু সাধারণ দৃষ্টিতে ও মহাভারতের বিধানে জপে হিংসার অবকাশ নাই। আরও অন্যত্র যজ্ঞে দেশ-কাল-পাত্র ও উপকরণ প্রভৃতির পরাধীনতায় পদে পদে যে 'বাধা', 'বিঘ্ন', 'বৈরূপ্য', 'ব্যাজ' লাগিয়া আছে—জপে সে সব হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। মনু বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মে'র বাঁধনে বাঁধা অধিকারী অন্য কিছু করুন না করুন, জপের দ্বারায় তাঁর সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। প্রকারভেদে এর ফলের তারতম্য—সাধারণ জপ হ'তে উপাংশু জপ (যা কাছের, লোকও শুনতে পায় না) প্রকৃষ্ট, তা হ'তে মানস জপ (যাতে জিহ্বাও নড়ে না)।

কৌষীতকি উপনিষদে (২।৭) সেই সর্বজিৎ ঋষির উপাসনায় এবং বৈদিক সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রে অজ্ঞানকৃত অভক্ষ্যভক্ষণ ও অমেধ্য উচ্ছিষ্টগ্রহণাদি পাপের ত্রিকালবিহিত সন্ধ্যাকরণের দ্বারা লোপের কথা পাই। বিশেষ করিয়া গায়ত্রীজপের শক্তিতে হিন্দুর অটল বিশ্বাস—গায়ত্রী সর্বপাপহরা। ধর্মশাস্ত্রকার বশিষ্ঠ (১) 'সর্ববেদপবিত্র' বলে অঘমর্ষণ, পাবমানী, শতরুদ্রিয় প্রভৃতি মন্ত্রের জপে আনুষঙ্গিক রূপে জাতিস্মরত্বপ্রাপ্তির উল্লেখ ক'রেছেন। জাবালদর্শনোপনিষদে বেদোক্ত মার্গে মন্ত্রাভ্যাসকে জপের মুখ্য লক্ষ্য বলা হ'য়েছে—গৌণরূপে বেদের কল্পসূত্রে, বেদমাত্রে, ধর্মশাস্ত্রে, পুরাণেতিহাসের মন্ত্রে যে মনের প্রবণতা তা'কেও জপের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়ে থাকে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত ও উপাসনাকাণ্ড এই মতের প্রচারে নবধা ভক্তির উপাঙ্গরূপে অধ্যাত্মসাধনায় জপের উচ্চ স্থান নির্দেশ ক'রেছেন। শুদ্ধ প্রণব জপের এবং অজপা জপের মাহাত্ম্য আগমে নিগমে প্রচারিত হ'তে দেখি। এর জন্যে চাই যোগ—অর্থাৎ কর্মে'র কৌশল। যোগ-দর্শনে এবং তা'র অঙ্গীকৃত সাহিত্যে (যেমন যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের গ্রন্থে ও গোরক্ষসংহিতায়) অজপা জপের কৌশলকে যোগিগণের মোক্ষহেতু ব'লেও স্বীকার করা হ'য়েছে। সপ্তশতী চণ্ডীতে জগতের 'পরা জননী' 'অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা' যে দেবী অধিষ্ঠিতা তাঁকে সাবিত্রীর সহিত অভিন্ন ব'লে মানা হ'য়েছে। মন্ত্রশাস্ত্রে অব্যাক্ষিপ্ত মনে অভেদ-পুরস্কারে (২) সচ্চিদানন্দ নিত্যমুক্তস্বভাব আত্মার সহিত উপাসকের যে অভেদ-কল্পনা—দেবের সহিত দেবের যোজনা—তাহাই হইল জপতত্ত্বের মূল তত্ত্ব, জপের উপনিষদ্। শৈবাগমেও (৩) প্রকারান্তরে সেই তথ্যের নির্দেশ দেখি, জপের স্বভাবসিদ্ধতার দোহাই দিয়া যাহা অন্য প্রসঙ্গে ভাগবত-পুরাণে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। স্বামীজীও মন্ত্র 'স্বাভাবিক শব্দ' একথা প্রতিপাদন করার পর মন্তব্য ক'রেছেন :—(৭১ পৃঃ)

"এই 'স্বাভাবিক শব্দ'কে সকলেই যেন আমাদের নাগালের বাহিরে এক কল্পিত পরাকাষ্ঠা (theoretical possibility or limit) ভাবিয়াই ছাড়িয়া না দেন। 'নিরতিশয়' শ্রবণ-বা-উচ্চারণ-সামর্থ্যেই শব্দের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদেরও অর্জ্জনের বস্তু। তা'র সাধনই জপাদি। প্রধানতঃ বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রবণ যন্ত্রের অভ্যুদয় সাধন করিয়া এ সিদ্ধি অর্জ্জিত হয় না। যেমন গুণী তানসেনের সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধি শুধু গলার বা কসরৎ এর হিসাবে নয়। দেহ, প্রাণ ও মন—এ তিনটা লইয়া গোটা যন্ত্র। সুতরাং সাধনের উদ্দেশ্য এ তিনেরই সুষ্ঠুভাবে যোগ্যতা সম্পাদন। এর নিমিত্ত অনেক কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদের অনুশীলন আবশ্যক। শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তি, প্রেম বিশেষ করিয়া; কেন না 'যন্ত্র'টাকে শুদ্ধ, একতান, উন্মুখ, একাগ্র করিতে—সনাতনী গঙ্গাধারাকে আপন আধারে ধারণ করিতে—এ সবের তুল্য আর কি আছে?"

অবশ্য অতীতে সকল সময়ই যে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রেম দিয়াই জপ সম্পন্ন হ'য়েছিল তাহা সত্য না হ'তে পারে। পুরাণের ঐশ্বর্য্যকামী দৈত্যগণের তপশ্চরণের মত বামাচারী তন্ত্রে, মধ্যযুগের বৌদ্ধ সাধনার সাধনমালায় (অবশ্য সর্বজ্ঞতা, নির্বাণ, অর্হত্তত্ত্ব লাভের জন্যও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি অসনাতনী আর্য্য সমাজে জপকর্মে'র উপযোগ স্বীকৃত হ'য়েছে), মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ আদি উদ্দেশ্যে জপের বহুল প্রয়োগ ধর্ম্মসাহিত্যের পৃষ্ঠায় বিরল নয়। এইরূপ কর্ম কুকর্ম। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য উদ্দিষ্ট জপ কঠোরতা, সমাধি বা অভ্যাসের দ্বারা সাধ্য। স্বামীজীর এ প্রসঙ্গে উক্তির উদ্ধার করা চলে :—(১০-১১ পৃঃ)

"অঙ্গার লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। অঙ্গার হইবে আঙ্গিরস (প্রাণাগ্নি)। গীতা 'তপ'কে তিনভাবে বলিয়াছেন। প্রকারান্তরে তাই হইল বিদ্যা (মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র, ব্যবহারবিজ্ঞান বা আর্ট, যা'র অনুষ্ঠানেই কাপালিক প্রভৃতি তামস সাধনায় তাৎপর্য্য), শ্রদ্ধা (হৃদয়ের যোগ, দরদ, সত্যিকার interest, যা' রাজস প্রক্রিয়ার লক্ষণ), (আর) উপনিষদ্ (science, অন্তর্নিহিত তত্ত্বের জ্ঞান, যা' সাত্ত্বিকতার উপাদান)। বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী। সরস্বতী বহু দিন থেকে বালুকায় লুকাইয়াছেন। জপের বা অপর কোন অধ্যাত্মসাধনের রহস্যের সন্ধানী আমরা অনেক দিন থেকেই নই। কিন্তু সন্ধান তো চাই। প্রচলিত, অনুসৃত বিদ্যাও খণ্ডিত, কুণ্ঠিত, কৃপণ। সিদ্ধ বিদ্যা—correct technique কি মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায়? আর শ্রদ্ধা? প্রায় সবাই 'অশ্রদ্ধাবিনাঃ' হইয়াছি। বুদ্ধির যে permit এর কথা বলিয়াছি, সেটাও অনেক ক্ষেত্রে জাল, নকল। সাচ্চার কারবার প্রায় বন্ধ। ঐ তিনেরই উন্মেষ উৎকর্ষ হইতে থাকিবে, ঋদ্ধি বিবৃদ্ধি হইবে, যতক্ষণ পূর্ণতার পরাকাষ্ঠায় না পৌঁছিতেছি। অফুরান চড়াই-উৎরাই এর পথে অনন্তের যাত্রী তবে কি? তা নয়। কিছুটা চলার পর কৃপার সন্ধান মিলে, তখন পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। আগে প্রয়াস, পরে প্রসাদ—আগে race পরে grace।" (উদ্ধৃত সন্দর্ভে বন্ধনীর ভিতরকার অংশ সন্দর্ভটীর গ্রন্থানুসারে সম্পাদিত ও গীতায় প্রকরণের সামঞ্জস্যে বর্দ্ধিত টিপ্পনী)।

ইহাই উপনিষদের ভাষায় 'ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ' বা' শৈবাগমের 'শক্তিপাত' বা মহেশানুগ্রহ। শ্রদ্ধাই মূল, আর তার মূল্য হইল প্রাক্তন কর্ম ও বাসনার পরিপাক। একান্তিভক্তের (৪) চিন্তাধারায় সাধারণ দান, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, স্তব-স্তুতির মত জপ কামনাগন্ধহীন অনাবিল পরিণতির পরিপূর্ত্তিতে অবসিত হ'য়েছে। কোন কোন বৈদান্তিক কর্ম-সন্ন্যাসবাদী সম্প্রদায় উপাসনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদিকে—যাহা কর্মাঙ্গভূত 'জপ' ও প্রবুদ্ধ, অভীষ্ট জপ হ'তে স্বতন্ত্র—জ্ঞানরাজ্যে সার্থকতাহীন ব'লে মনে করেন। তাঁদের মতে কেবল বিদ্যাবিরহীর পক্ষে কামকৃত বা অকামকৃত, একবার বা পুনরায় আবর্ত্তিত, ত্রুটির জন্ম বেদাভ্যাস এবং অর্চনাদির স্থান আছে—(অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ৩৩১০ শ্লোকে মিতাক্ষরা টীকা দেখিতে পারেন)। পক্ষান্তরে মহাভারতের বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে [এবং তাহার শঙ্করভাষ্যে (এ কোন্ শঙ্করাচার্য্য ?)] ঐ জপে 'জন্তু'র অজ্ঞাননিবন্ধন জন্ম ও অবিদ্যাকার্য্য সংসার হ'তে মুক্ত হবার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। দার্শনিকের ভাষায় মন্ত্র 'নাদ' ও 'বিন্দু'র দুই সীমার অন্তরালে স্ববিভূতিতে অভ্যুদয়শীল প্রকাশমান অথচ মূর্ত্তির অতীত পঞ্চদেবতার উপাসনার সাধন—জপ হইল তাহার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। আগম-নিগমের, উপনিষদ্ ও তন্ত্রের সমন্বয়ভঙ্গীতে জপরাজ প্রণব-জপের সম্বন্ধে বলা চলে—'যন্ত্র হইতেছে ধনুঃ, মন্ত্র শর, তন্ত্র সন্ধানপটুতা এবং অন্ত্রে (?) কিনা অন্তস্তলে যে বস্তুটী রহিয়াছেন সেই বস্তুটীকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জানিবে।' (২৪৭ পৃঃ) জপের দেশ, কাল, ছন্দঃ ও বস্তুর কারণে বিঘ্নের নাশ না হইলে মন্ত্র সমর্থ হয় না। যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র ও অন্ত্রের (?) দ্বারা যথাক্রমে দেশ, কাল, ছন্দঃ ও বস্তুর বিঘ্ন দূরীভূত করিতে হয়—এইখানে উপযোগ হইতেছে জপবিদ্যার।

(১) সর্ববেদপবিত্রাণি বক্ষ্যাম্যহমতঃপরম্। যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ প্রীয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।...এতানি গীতানি পুণন্তি জন্তূন জাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেৎ। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে (৬।২৫ কারিকাংশ) প্রণবের ভাবনাকে 'যোগ' ব'লে বলা হ'য়েছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৩।১২।১) গায়ত্রীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং সেই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার' রূপে তা'র উচ্ছসিত প্রশংসা স্মরণীয়।

(২) 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে' শ্রুতির সিদ্ধান্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের (৫।৩৪।১১২—১১৪ ও ৫।৩৬।২৬) 'আত্মনেঽস্তু নমো মহ্যমবিচ্ছিন্নচিদাত্মনে।' 'মহ্যং তুভ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে' প্রভৃতি বিখ্যাত আনন্দোচ্ছাসময়ী (ecstatic) পঙ্‌ক্তি কয়টিতে এই সত্যের উপলব্ধি।

(৩) ভূয়োভূয়ঃ পরে ভাবে ভাবনা ভাব্যতে হি যা। জপঃ সোঽত্র স্বয়ংনাদো মন্ত্রাত্মা জপ ঈদৃশঃ॥

গ্রন্থের বিষয়ীভূত তত্ত্বের পরিপূরক ও পরিণতিরূপে উপরে আলোচিত 'জপ'পদার্থের স্বরূপনির্দেশ স্বামীজী-কৃত জপলক্ষণে দেখি—তাহা উপনিষদের ভঙ্গীতে ও ভাষায় উল্লিখিত হওয়ায় বড়ই মনোমদ ও প্রাণারাম হ'য়েছে। স্বামীজীর বিবৃতিতে পড়ি (২২৮ পৃঃ):—

"আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া চল এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল—অন্তরাত্মার আবেগপ্রসূত এই যে প্রার্থনা ও প্রার্থনার মন্ত্র সেইটিকে 'অভ্যারোহ' বলে। অভ্যারোহ শব্দের ব্যুৎপত্তি—'অভি' কি না 'অভিমুখীন' 'আরোহ' কিনা আরোহণ। সুতরাং 'অভ্যারোহ' শব্দটার মানে ascent of the spirit চেতনার আরোহণ। কোথা হইতে আরোহণ? আপন কল্পিত অসত্য, তমঃ এবং মৃত্যুর বন্ধন হইতে। এই অভ্যারোহ সংঘটিত হইবে কি প্রকারে? যে বৃত্তি আমাদিগকে সত্য, জ্যোতিঃ এবং আনন্দ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখে সেটীকে বলে পরাগ্‌বৃত্তি—যে বৃত্তি আমাদিগকে তাহার অভিমুখীন করিয়া দেয় সেটীকে বলে প্রত্যগ্‌বৃত্তি। এখন পরাগ্‌বৃত্তিকে নিবারিত করিয়া যাহা প্রত্যগ্‌বৃত্তি প্রবাহিত করিয়া দেয় তাহার নাম জপ।"

গ্রন্থে ইহাকে 'সমাবৃত্তি' ('সমভ্যাবৃত্তি' এই পাঠই ভাব ও ব্যুৎপত্তির অনুকূল), 'পরিণয়' ও উপনিষদের ভাষায় 'বেধ' নামেও বলা হ'য়েছে। মূলতঃ ঐকান্তিক সাধনার অঙ্গ প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণ ইহারই পরিপূরক। 'আত্মস্বরূপই হইতেছে পরম সম্পদ। এই পরম সম্পদের 'অভি' অভিমুখে (towards) ঋজু সুষম (সম্যক্) নিঃসংশয় যে গতি, তা'কে সমাবৃত্তি ('সমা বৃত্তি' নহে, তা হ'লে সূত্রে ব্যাকরণদোষ হয়) বলে (২২১ পৃঃ)। 'পরিণয়' কি না সকল দিক্ দিয়া লইয়া যাওয়া হইল ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (এখানে লৌকিক অর্থ বিবাহের আভাষও আছে)। এ অভ্যারোহটী ঘ'টে থাকে মুখ্যতঃ সাধকের আপন স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা এবং ঊর্দ্ধতন (৪) শক্তিচক্রের অনুগ্রহ (ধাতুঃ প্রসাদাৎ) এই দুয়ের সুসঙ্গত পরিণয়ে। এই পরিণয়টাই বিশেষভাবে শেখায় জপকে ছন্দোগ হ'তে 'আগে চল আগে চল' ব'লে। "আচ্ছা, এ যাত্রা কি আখেরে আমার না তোমার? যাবন্নস্তা নদীনাথে নৈকান্তিক-সমর্পণম্। মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছাসো বেতি জহ্নুনা। নদীনাথে ঐকান্তিক সমর্পণটী হবার আগে পর্য্যন্তই নদী ভাবে—আমার বুকের এ উচ্ছ্বাস কি আমার না তোমার? কিন্তু তাহা পূর্ণ সমর্পণে (?) (১২৩ পৃঃ) [২২৬ পৃঃ কারিকা ও বিবৃতিতে এই চিন্তাধারার একান্ত আশ্রয় লক্ষ্য করিবার জিনিষ।] এই উক্তি সাহিত্য ও দর্শন, উভয়ের দিক্ দিয়া উপভোগ্য। উপনিষদের ঋষি কর্ত্তৃক জপপ্রক্রিয়ার এই স্বরূপনিরূপণ (৫) বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্নপ্রায় হইয়াছিল—স্বামীজী তা'কে আবিষ্কার ক'রে হারানিধির সন্ধান দিয়েছেন। এখানে স্মরণীয় যে স্মৃতিকার বশিষ্ঠ ইহাদের মূলভূত মন্ত্রবর্গের মধ্যে কাহাকে ও 'ভাস' কাহাকেও বা 'দেবব্রত' 'অনৃতাৎ সত্যমুপৈমি' য এবাস্মি সোঽস্মি' (শুক্লযজুঃসংহিতা ১।৫, ২।২৮ দ্রষ্টব্য], নামে অভিহিত ক'রে উপনিষদের মূল বা আকরের নির্দেশের ইঙ্গিত ক'রেছেন। দীপ্তিশীল 'সৎ', উজ্জ্বল 'চিৎ' এবং মৃত্যুনিরোধী পরম-অমৃতের 'আনন্দে'র ত্রিধারা ব্রহ্মের স্বরূপ। জপে ইহাদের স্ফুরণ—'আবরণ-ভঙ্গীতে, স্বৈরাচারে ও বন্ধনের বিঘ্নকে (১০-১২ সূত্র) ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যখন জপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রেয়ঃকে তৃণ জ্ঞান ক'রে শ্রেয়ঃএর পথে চালিত হয়, তখনই ইহা সমর্থ পদবীতে উঠে।

সাধারণ বাঙ্গালার পাঠকের কাছে বিশেষ আদরের হইল স্বামীজীর বিবৃতি—তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব শৈলী যাহার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রকট। দৃষ্টান্তস্বরূপ জপের বাহিরের আচ্ছাদন বা ছন্দের বহিরঙ্গ বিবৃতিকে লওয়া যাক্ :—(২৩১ পৃঃ)

"ছন্দঃ হইতেছে সেই বস্তু যাহাতে এই বৈরূপ্য ও বৈগুণ্যের অভাব থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—নিখিল বিশ্বের মূলীভূত এই ছন্দঃ। অন্ধ আকস্মিকতা হইতে এই অপূর্ব মহাশ্চর্য্যরচনা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। এই বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে বেসুরা বেতালা বলিয়া কিছু নাই। এই বিশ্বের অটন, যিনি ভীষণ ও রুদ্র সেই মহানটরাজের নটন, হংসরূপী ভগবানের ভুবন-রূপে অকুণ্ঠ সঞ্চার। আমাদের বুদ্ধি এই অখণ্ড সমন্বয়ী ছন্দঃকে নিরন্তর অন্বেষণ করিয়া চলিতেছে। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ইহাই গতি।"

জপকে সক্রিয় শক্তি হইতে হইলে তাহার মূলে থাকিবে চৈতন্য। শিবকে চাই শক্তির স্ফুর্তির জন্য, চাই তাহার ভাব-বিভাব-অনুভাবের যোগে রসনিষ্পত্তি—চাই তাহার লীলার জন্য অনুকূল ক্ষেত্র, চাই সাধনপরিপাটী। ইহাদের অভাবে ছন্দঃ যথাক্রমে 'অন্ধ' (brute blind law) 'বন্ধ' ও 'মন্দ' (inefficient) হ'য়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সত্তঃ-প্রাচীন বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভেদ তুলনীয়। "মানুষ ছাড়া এই গঠন ও গতিকৌশলের বেত্তা এবং বোদ্ধা অপর কেহ কি আছে? পাদপ কি নিজেই জানে কি বিচিত্র ছন্দে তার বিকাশ ও পরিণতিটা ঘটিতেছে? জড় বিজ্ঞান এই প্রশ্নসমূহের 'হাঁ' উত্তর দিতে এখনও পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অভিব্যক্তির কোন এক বিশেষ স্তরে উঠিয়াই বিশ্বছন্দঃ যেন আলোর মুখ দেখিতে পায়, আত্ম-সংবিৎ লাভ করে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে জগতের আধাররূপে এবং প্রশাসন রূপে যে ছন্দঃ রহিয়াছে সেটা চেতনাছন্দঃ নয়, প্রাণচ্ছন্দঃও নয়। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনের মধ্যে সৎএর সন্ধান সেটা দেয় অথবা দিতে চায় বটে, কিন্তু চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান সেটা দেয় না। চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান দেয় না বলিয়া সেটা ছন্দঃ হইয়া ও একটা বিরাট্ জড় শৃঙ্খল মাত্র" (২৬৫পৃঃ)।

জপের সামর্থ্য প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়:—

'ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে শুনিতে পাই—

(৪) "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।' বৈষ্ণব সাধকের এই সাদর উক্তিতে বাসনা ও ধাতুপ্রসাদের সন্ধির সূচনা লক্ষ্য করিবার বস্তু।

(৫) অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ। স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি। স যত্র প্রস্তুয়াত্তদেতানি জপেৎ—অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি।... অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১৷৩৷২৮)। এখানে অন্ন স্তোত্রের কামনা হইতে জপের বৈলক্ষণ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (শিক্ষাবল্লী ৪র্থ অনুঃ) মেধাবৃদ্ধি-কামনায় বিশিষ্ট মন্ত্রের জপবিধানে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে (১৷৩৷৬) উদ্গীথের অক্ষরাশ্রয়ে উপাসনা প্রভৃতিতে এই আধ্যাত্মিক জপতত্ত্বের বস্তুতান্ত্রিক ভূমিকা। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্। এস্থলে সম্ এই উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া শ্রুতি কেবল মাত্র মিশ্রণ অথবা মিলিত হওয়ার কথাই বলেন নাই, কিন্তু কোন মহান্ লক্ষ্যের উদ্দেশে আমাদের বাক্য, মন এবং ক্রিয়াদিকে ছন্দোবদ্ধ এবং সংহত ভাবে শক্তিমান্ করিয়া তোলার কথাই বলিয়াছেন।" (২৬৭ পৃঃ) এই ভাবে মন্ত্র হইল অগ্নি ছন্দঃ তাহার সপ্ত অর্চিঃ। জপ হইল স্বাহাকার, জপ বষট্কার, জপই নমস্কার। জপের অভ্যন্তরে ধ্যান-ধারণার অন্তস্তত্ত্ব নিহিত। এ সকল তত্ত্বই ফুটিয়া উঠে জপের আশ্রয়ে। জপ তাই সর্বব্যাপী অকুণ্ঠশক্তি সাধনাসৌধ—জ্ঞানের বিভিন্ন ভূমিতে যোগের ক্রম-বিবর্দ্ধমান স্তরে দলে দলে আত্মার বিকাশের প্রতিচ্ছবি।

এতদূর যে আলোচনা তাহা মূল গ্রন্থের সূত্রাংশ (১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৫টি সূত্র) ও তাহার ভিত্তিভূত অবতরণিকার প্রথম তিনটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লইয়া। প্রকাশিত গ্রন্থের ইহাই এক অর্দ্ধ। গ্রন্থের প্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুতিরূপে প্রস্তাবনা, উপোদ্ঘাত ও উপক্রমণীর সংস্কৃত কারিকায় ও বিশদ বিবৃতিতে এবং 'জপরহস্য' নামে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রবন্ধে অপর অর্দ্ধ। গুরুতত্ত্ব, বৈদিক যুগের চিন্তায় ব্রহ্ম ও প্রাণের স্বরূপ ও মন্ত্রের সহিত তাহার সংযোগসাধন, প্রণবে তাহার প্রকৃত-মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক যুগের ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্ব্যূহ ও পঞ্চদেবতার তথ্য, অবতাররহস্য, আত্মা শক্তি ও তাহার ক্রমিক অভিব্যক্তি, উপাসনায় শক্তিতথ্য, মন্ত্রচৈতন্য, জপপ্রক্রিয়ায় ভূতশুদ্ধি, বিঘ্নাপসারণ প্রভৃতির 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনা এইরূপ কত কিছুর সুন্দর বিশ্লেষণ এই অপর অর্দ্ধে। দার্শনিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শ্রুতি-স্মৃতিতে স্বীকৃত প্রমাণ, ন্যায় ও প্রবচন মধ্যে মধ্যে গ্রন্থে উপন্যস্ত আছে। গ্রন্থকারকে স্থানে স্থানে বৈদগ্ধ্য, অস্ফুট উপমান (analogy) ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইলেও সাধারণতঃ তাঁর আলোচনা-রীতি সুগম ও স্পষ্ট, স্বামীজীর পূর্বেকার রচনাবলী হইতে অধিকতর সহজ ও মনোজ্ঞ। জপ-তত্ত্বের মূলে অচিন্ত্যভেদাভেদের অচিন্ত্য মূল শ্রুতিতে সন্ধান করিতে গিয়া জগৎসৃষ্টির দর্শন এবং স্পন্দের স্বরূপ নির্দ্ধারণে, (২৪১-২৬০ পৃঃ) তান্ত্রিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় ও 'জপকরণসম্পাত' লইয়া যে আলোচনা (১০২-১০৬ পৃঃ) এগুলিতে, 'আলো ও ছায়ার' সংযোগের মতন সমস্ত বক্তব্যটা যেন আব্ছায়া—তা ধরা কঠিন হইবে সাধারণ পাঠকের। আশা করা যায় অবশিষ্ট গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যথোচিত আলোকপাত হইবে। গ্রন্থে মনোঽভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের ও ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের রূপমহিমার বর্ণনা পূর্বেকার প্রতিধ্বনি (৬) বহন করিলেও চমৎকার। আর শক্তি মূর্ত্তি ভেদের আয়ুধপরিকরসহিত সাধকবিহিত পরিচয়ের যে একুশটি কারিকা (১০১ হইতে ১২১) তাহা উচ্চাঙ্গের রচনা, বিশেষ করিয়া কালীমূর্ত্তির শব্দচিত্রটি (৭)।

গ্রন্থসঙ্কলনে আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞানের দীপ্ত দৃষ্টিতে, ভঙ্গীতে এবং পরিভাষায় গ্রন্থে প্রতি সূত্র ও কারিকায় যে সকল মূল্যবান্ মন্তব্যের অবতারণা আছে তা' সুধী পাঠকের বিশেষ উপযোগী ও চিন্তার উদ্বোধক হ'য়েছে। এরূপ গ্রন্থের পাঠকের মধ্যে অনেকেরই প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিবেশ ও পরিবেষণে মনন ও বুদ্ধির পরিপাক ঘ'টেছে—তাঁদের অনুগ্রহ ও আগ্রহে জীবনবেদের রহস্যবোধপ্রবৃত্তি জনগণমনে জাগরূক হ'লে দেশের সমূহ উপকার হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের যে পার্থক্যের ইঙ্গিত করেছেন (৮২ পৃঃ) তা' তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের, প্রাচীন বিজ্ঞানের সালোক্য ও সাযুজ্যের ক্রমিক ধারায় বিবর্ত্তিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বামীজীর প্রতীচ্য ভাষায় ভাবনা ও Energy, Potential, Polarity, Harmony, Symmetry, Atropy, Entropy,

Quantum, Constancy, Sublimation, Momentum প্রভৃতি শব্দের বাঙ্গালায় ভাষান্তরীকরণ তাঁর মত ভাবুকের পক্ষে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য চিন্তাকে গাঁঠছড়ায় বাঁধার চেষ্টা ব'লে ধ'রলে ক্ষতি কি? এর ফলে শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যবধানই দূরীভূত হবে না, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবধানও ধীরে ধীরে স'রে যাবে—যা' মানবজাতির সমন্বয়সাধনে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বার্থগন্ধী প্রয়াসের উন্নততর পরিণতির পথে যোগক্ষেমের পরিপূর্ত্তির সন্ধান দেবে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও যোগসাধক শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ গুরুগণের উপদেশের সাফল্যসূচনা এই ভাবেই হবে।

জপও শাস্ত্রের কোঠায় পড়ে—সংস্কৃত ভাষায় তা'র সূত্র ও কারিকা রচনা সুষ্ঠু কল্পনা। শাস্ত্রব্যবসায়ীর আর্ষ্যভাষায় রচনার অধিকার নূতন দাবী নহে—এ' অধিকারের প্রবর্ত্তন নহে, এ' তার পুনরুজ্জীবন। এ দিকে স্বামীজী বিশেষ যোগ্যতা দেখিয়েছেন—যা' প্রকট হয়েছে নূতন শব্দ চালিয়ে নয়, প্রচলিত শব্দকে উচ্চতর ভাবের বাহন কর্‌বার যোগ্যতায়। তাঁর প্রযুক্ত ব্যাজ, ছন্দঃ, বেধ, ব্যাসঙ্গ, অভ্যাবৃত্তি, ভর্গঃ, পরিণয়, ব্যভিচারিত্ব (exception), বিষমতা, কাষ্ঠা প্রভৃতি শব্দরাজি শব্দার্থসম্বন্ধের ভিত্তিকে অব্যাহত রেখেছে। কি স্বল্পাক্ষর সূত্রে, কি তাহার মিতাক্ষর বিবৃতিতে ও পরিকর-শ্লোকে, কি দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ কারিকায় তাঁর রচনাশৈলী শিষ্টানুগামিনী বললে অত্যুক্তি হয় না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোথায়ও কোথায়ও তা'র প্রকাশপারিপাট্য উচ্চস্তরে উঠেছে যেমন তাঁর উপোদ্‌ঘাত প্রকরণের শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোকগুলিতে।

নিম্নে কয়েকটি অনবধানতা, অনুপাদেয়তা বা অযত্নকৃত ত্রুটির উল্লেখ করা হ'চ্ছে—১৪১ পৃঃ ১৫ শ্লোকে 'তদমৃতমদূহৃহং' এর পরিবর্ত্তে 'হ্যমৃতং তদদূহৃহং' পাঠ শোভন হয়। ১৪১ পৃঃ ১৬ শ্লোকে তৃতীয় চরণে 'সহসং' পাঠ ব্যাকরণ-দোষ-দুষ্ট। ১৪২ পৃঃ ২০ শ্লোকে 'ঋতং তৎ' না হইয়া 'নর্ত্তং তৎ' পাঠ ভাল হয়। ১৪৪ পৃঃ 'উভাত্মক' শব্দটি দুষ্ট। ১৬৯ পৃঃ ৮৭ শ্লোকে 'তরতমতয়া' একাধিক দোষে দুষ্ট; 'শক্তেস্তারতম্যেনৈবা' পাঠ সঙ্গত। ১৭২ পৃঃ ৯২ শ্লোকে দ্বিতীয় চরণে 'অধিকাক্ষর' দোষ হ'য়েছে ('শেতে সঃ পদ্মনাভোঽবতি' শুদ্ধ পাঠ)। ১৭৩ পৃঃ 'যতিততিকুশল' অপ্রতীতত্তা দোষে দুষ্ট। ১৮৮ পৃঃ 'কতিষতিততিভিঃ' পদে সমাসবিধান অবৈধ। ১৯৫ পৃঃ শ্লোকে দ্বিতীয় চরণে 'বিলোড্য কলয়সি'তে ছন্দঃপতন হ'য়েছে ('প্রথয়সি' পাঠ কল্পনীয়)। ২০৩ পৃঃ 'ক্রান্ত' শব্দ দৃষ্টিভেদ বুঝাইতে পঙ্গু ('ক্রান্তদর্শীর দৃষ্টি' বলা চলে, 'ক্রান্তদৃষ্টি' বহুব্রীহিও চলিতে পারে)। 'রসতম' (২২২ পৃঃ) পদের প্রয়োগ কোনরূপে রক্ষা করা চলে, কিন্তু 'রসতম'কে (২২৬ পৃঃ) বিশেষণরূপকে চলান চলে না (৮)। মুদ্রাকরের সংস্কৃত ভাষায় ছাপার দিক্‌ দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য গুরুতর প্রমাদ হয় নাই—ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

জপের আনুষ্ঠানিক অংশে পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দিক্‌ দিয়া জপ ও তাহার অনুরূপ কর্ম্মযোগের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হ'ত না। সূত্রাঙ্গের সংহতি, উপোদ্‌ঘাত ও উপক্রমণীর সূত্রক্রমের যথাস্থানে অন্তর্ভুক্তিতে জোরাল হ'ত ব'লে আমাদের মনে হয়। প্রতি খণ্ডে বিষয়সূচী, পারিভাষিক শব্দের অক্ষরানুক্রমে এক পরিশিষ্ট ও গ্রন্থের প্রতিখণ্ডে শেষ দিকে দেবনাগরী অক্ষরে সূত্রগুলির ক্রমিক বিন্যাস অত্যাবশ্যকীয়—এগুলির দিকে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'চ্ছে।

অবশ্য এগুলি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটির দিক্‌ দিয়া ত্রুটি। আসলে 'ব্রহ্মসূত্র' প্রমুখ গ্রন্থের আবেশে ও প্রেরণায় লেখা এ গ্রন্থে পাঠক উপদেশ ও সাধক অপূর্ব অনুপ্রেরণা পাবেন। এমন গ্রন্থ তাঁ'দের অবসরসহচর হ'য়ে 'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ' হ'বার পক্ষে জীবনের সমরক্ষেত্রে যোগ্যভাবে সন্নদ্ধ হ'তে উদ্‌বুদ্ধ ক'র্‌বে। গ্রন্থের অবশিষ্ট খণ্ডগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত হো'ক এ আমাদের ঐকান্তিক আকূতি। গ্রন্থের আলোচনা তখনই সার্থক হবে যখন সমগ্র গ্রন্থের সামঞ্জস্য ও সামরস্য আমাদের চোখের কাছে ফুট্‌তে থাক্‌বে। এ আলোচনা বস্তুগত্যা অসম্পূর্ণ—এ কেবল পরিচায়িকা বা প্ররোচনা—গ্রন্থ-পাঠকের জন্য দিগ্‌দর্শন মাত্র।

গ্রন্থখানি সাংসারিকের ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, শ্রান্ত মনকে শান্ত ক্রান্তদর্শীর দৃষ্টিকোণে সুখ-দুঃখ-মোহের বাঁধন হ'তে মুক্তি পাবার সন্ধান দেবে। শ্যাম ও শ্যামার সাধনার দেশে শ্যাম-শ্যামার অভেদদৃষ্টির অনুশীলনকল্পে এ সাধনগ্রন্থ সহায়ক হো'ক এবং গৃহে গৃহে বিরাজ করুক এমনতর প্রার্থনা 'স্বার্থমায়াতু শ্যামাচরণপঙ্কজে।'

(৬) কালিন্দীরোধসীশৌ ললিতসুরগিরাং বেণুগীতৈর্হরির্ধঃ
শৈলান্ বিদ্রাবয়ন্তিঃ প্রকটয়তি পরাং বাচমোঙ্কারযোনিম্।
সম্যক্ সন্ধানশূরো গময়তি নিধনং রাঘবো যো দশাস্যং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমূর্ত্তৌ মনসি বিহরতামত্র তৌ রামকৃষ্ণৌ॥ (১৭২পৃঃ)

(৭) নৈঃস্পন্দ্যে স্পন্দ আত্তশ্চিদমলগগনধ্বান্তঘোরাম্বুদঃ কিং
শশ্বন্মৌনং বিলোড্য ধ্বনিশতসততধ্মাতনাদস্ততঃ কিম্।
ধ্বান্তধ্বংসায় সান্দ্রা স্ফুরতি চ পরমা চিন্নভশ্চন্দ্রিকা কিং
মান্দ্যং জীমূতমন্দ্রে ভজতি ভবমৃতেস্তূর্য্যনাদস্ততঃ কিম্॥ (১১১পৃঃ)

(৮) বেদে (কি সংহিতায়, কি উপনিষদে) 'তর' 'তম' প্রত্যয়ের যোগ জাতি ও গুণবাচক শব্দেও দেখা যায়। 'বৃত্রতর', 'কবিতম', 'নৃতম', 'কণ্বতম' প্রভৃতি প্রয়োগ তা'র নিদর্শন। 'রসতম' শব্দটী ছান্দোগ্য উপনিষদের (১।১।৪) এক প্রসিদ্ধ সন্দর্ভে প্রযুক্ত হ'য়েছে। উত্তরযুগে 'ভাষায়' এগুলি, প্রযুক্ত হয় না; এ'কে রক্ষা কর্‌বার বুদ্ধি এবং পথ মিলে; কিন্তু তা করার কোন তাৎপর্য্য নেই।

[লেখা এবং ছবি সম্বন্ধে এই সংখ্যার নিয়মাবলী দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে]

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

সুখেন্দু দত্ত

নীলকর-প্রপীড়িত বাংলার নিখুঁত কাহিনী "নীলদর্পণ" নাটক লিখে দীনবন্ধু মিত্র নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় চাষীদের জন্য যা করে যান তার জন্যে বাংলা দেশ চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। একটা দাস-জাতির অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিগ্রহের করুণ ছবি এঁকেছেন তিনি নীলদর্পণে, নগ্ন করে ধরেছেন তার পরাধীনতার স্বরূপ। আর শুধু নীলদর্পণই নয়, দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকগুলোই তখন বাংলার সাহিত্য-জগতে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বিভিন্ন নাটক বাংলা সাহিত্যে সত্যি যুগান্তকারী রচনা। ধর্মের গোঁড়ামি ও সমাজের কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করে, পরাধীন সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বাস্তব এবং প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন দীনবন্ধু। রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনা-সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে তাঁর নাটকগুলো, বিশেষ করে নীলদর্পণ।

তাই দীনবন্ধুর কাছে বাংলার যে ঋণ, সে ঋণ ভুলবার নয়। অথচ এই পরম মানব-দরদী, সমাজ-সংস্কারক নাট্যকারের কথা আমরা আজকাল বলতে গেলে একেবারেই শুনতে পাই না। অজস্র দেশী ও বিদেশী মনীষীদের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপনে আমরা সব সময়েই ব্যস্ত, ভুলেও একবার মনে পড়ে না সেই মানুষটিকে যিনি একটা সমাজের মর্মবেদনাকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে।

নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালের চৈত্র মাসে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। ছোট যমুনা নদী গ্রামটাকে প্রায় চারি দিক থেকেই ঘিরেছিল বলে গ্রামের এই নাম। তৎকালীন পূর্ব্ব-বাংলা রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের কয়েক মাইল পূর্ব্বোত্তরে ছিল চৌবেড়িয়া গ্রামখানা।

দীনবন্ধুর বাবার নাম ছিল কালাচাঁদ মিত্র। খুবই গরীব ছিলেন তাঁরা। গ্রামের পাঠশালায় ছেলের লেখাপড়া শেষ হতেই তিনি ছেলেকে এক জমিদারী সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দেন। বেতন ছিল মাসে আট টাকা।

কালাচাঁদ মিত্র ছেলের নাম রেখেছিলেন গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র। বলা বাহুল্য, নামটা দীনবন্ধুর বড় পছন্দ ছিল না, এই নামের জন্ত অনেক দুর্গতিও তাঁকে ভোগ করতে হত। "গন্ধর্ব্ব" নামটা ছোট করে সবাই তাঁকে ডাকত "গন্ধ" বলে আর সমবয়সী বন্ধুরা "ধ্ গন্ধ" "দুর্গন্ধ" এই সব বলে তাঁকে ক্ষেপাত। ক্ষোভে-দুঃখে ছোট গন্ধর্ব্ব-নারায়ণ এক-এক সময় প্রায় কেঁদে ফেলতেন।

ছোট গন্ধর্ব্বনারায়ণ জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে ইংরাজী শিখবার জন্য তাঁর মন বড় ব্যাকুল ছিল। তিনি দেখলেন যে, তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা প্রায় সবাই পড়াশুনার জন্য কলকাতায় গেলেন, অথচ তাঁর ভাগ্যে তা জুটল না। শেষ পর্য্যন্ত এক দিন তিনি বাবার অমতেই জমিদারী সেরেস্তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তাঁর বয়স তখন বছর পনের ষোল মাত্র।

কলকাতায় এসে গন্ধর্ব্বনারায়ণ তাঁর এক কাকার বাড়ীতে উঠলেন। এখানে তাঁর খুবই কষ্টে দিন চলতে লাগল, এমন কি পালা করে রান্নার কাজও করতে হত তাঁকে। কিন্তু বালক গন্ধর্ব্বনারায়ণের ছিল অদম্য জ্ঞানপিপাসা। অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সমস্ত বাধাই তিনি অতিক্রম করলেন।

কলকাতায় গন্ধর্ব্বনারায়ণ হেয়ার স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হন। স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময়ই তিনি এবার তাঁর বহু দুর্গতির মূল বাবার দেওয়া নামটা নিলেন বদলে। নিজের পছন্দমত দীনবন্ধু নাম নিয়ে তিনি স্কুলের খাতায় এই নামই লেখান। হেয়ার স্কুলে তিনি ইংরাজী পড়তে আরম্ভ করেন। হেয়ার স্কুলে পড়বার সময় থেকেই দীনবন্ধু বাংলা কবিতা লেখা সুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের ওপর তখন ঈশ্বর গুপ্তের একাধিপত্য, বিখ্যাত 'প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনিই। তরুণেরা গুপ্তকবির কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সংগে আলাপ জমাবার জন্য ব্যগ্র হত। ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও সব সময়ে এদের উৎসাহ দেখাতেন। ফলে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন অল্প কালের মধ্যেই। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন।

দীনবন্ধুর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু তথ্য সরবরাহ করে গেছেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমি যত দূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব-চরিত্র' নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এ জন্ত ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর।" দীনবন্ধুর সেই প্রথম কবিতার দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতও করেছিলেন তিনি। কবিতাটার আরম্ভ এই রকম :

> মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
> দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া।

"মানব-চরিত্র" সম্বন্ধে দীর্ঘ সাতাশ বছর পরেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "অল্পে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত

বাহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণ গলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই।...ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।"

হেয়ার স্কুল থেকে দীনবন্ধু পাদরী লং সাহেবের ইংরাজী স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হন। পাদরী লং দীনবন্ধুকে খুবই ভালবাসতেন। পরবর্ত্তী কালে এই সদাশয় পাদরীর নামই দীনবন্ধুর নামের সংগে জড়িত হয়ে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ফিরেছিল।

লং সাহেবের স্কুল থেকে দীনবন্ধু এর পর আর একটা স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হলেন। এখানে তাঁর স্কুলের মাইনে ছিল দু'টাকা করে। অনেক কষ্টেই তাঁকে মাসে-মাসে এই টাকাটা জোগাড় করতে হত। দীনবন্ধু বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এখানে তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন এবং হিন্দু কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হন। হিন্দু কলেজ থেকেও তিনি যথাসময়ে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিলাভ করেন।

পড়া-শুনা করবার সংগে-সংগে দীনবন্ধু কিন্তু কবিতাও লিখে চলেছিলেন। 'প্রভাকরে' মাঝে-মাঝেই তাঁর কবিতা বেরু হতে থাকে। এই সব কবিতা তদানীন্তন অনুপ্রাশ ও শ্লেষবহুল রচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত। হাস্যরস-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর ছিল অপূর্ব্ব ক্ষমতা: তাঁর কবিতাগুলো পাঠক-সমাজে খুবই সমাদর লাভ করত। শুধু তাঁরই একটি কবিতার জন্ম একবার 'প্রভাকরে'র একটা বিশেষ সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ করতে হয় পর্য্যন্ত! হাস্যরসাত্মক এই কবিতাটির নাম ছিল "জামাই-ষষ্ঠী।"

তখনকার আমলের লেখকদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ক্রমে দীনবন্ধুই হয়ে উঠলেন গুপ্তকবির প্রধান শিষ্য। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রেরও সহযোগী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি।

ছাব্বিশ বছর বয়সে দীনবন্ধু ডাক-বিভাগে চাকরী নেন। সে সময় ডাক-বিভাগে অত্যন্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলে তিনি নাম কিনেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাক-বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারীও হতে পেরেছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল হইতেন, কালে ডাইরেক্টর জেনারল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শত বার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না।"

ডাক-বিভাগের কাজের জন্ম দীনবন্ধুকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ঘুরে বেড়াতে হত। তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্র এবং বিহারেরও অনেক জায়গা ঘুরেছিলেন। ডাকঘর দেখবার জন্ম তাঁকে গ্রামে-গ্রামে যেতে হত। গ্রামের লোকদের সংগে মিশবার ও আলাপ জমাবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাদের জীবনযাত্রা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন। বাস্তব ভিত্তির ওপর নাটক রচনার জন্ম এই সব মূল্যবান অভিজ্ঞতা পরে তাঁর খুবই কাজে লাগত। বাংলা সমাজে সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতার মূলও ছিল তাঁর এই গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। তাঁর বয়স তখন একত্রিশ বছর। "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্" নীলদর্পন বাংলা দেশে রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই প্রথম নাটকখানাই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ এবং সব চেয়ে শক্তিশালী নাটক। "নীলদর্পণ" দীনবন্ধু মিত্রের নিজের নেওয়া নামের সার্থকতা প্রমাণ করল।

এর আগের বছরই মাইকেল মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য রহস্য-সন্দর্ভ কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি তখন দিক্পাল। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একচ্ছত্রাধিপতি বঙ্কিমচন্দ্র। এবার দীনবন্ধু গিয়ে নটরাজের শূন্য সিংহাসন দখল করলেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এই তিন সাহিত্যরথীর দানে প্রাণবান হয়ে উঠতে লাগল। রসে ডুবে রইল বাংলা দেশ।

এক বছরের মধ্যেই নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ বের হয়। পাদরী লং সাহেবের অনুরোধে মধুসূদন দত্ত এই অনুবাদ করেন। লং সাহেব অনূদিত সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অনুবাদকের নাম গোপন রাখা হলেও শেষ পর্য্যন্ত মধুসূদনের নাম জানাজানি হয়ে যায়। তিনি গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হন, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের চাকরী থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

"নীলদর্পণ" নাটকের পর দীনবন্ধু লেখেন "নবীন তপস্বিনী।" এটা প্রচারের পর তাঁর যশের মাত্রা পূর্ণ হতে থাকে। এই নাটকখানা দীনবন্ধু তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

"নবীন তপস্বিনীর" পর দীনবন্ধুর লেখনী জন্ম দেয় "বিয়েপাগলা বুড়ো", "সধবার একাদশী" এবং "লীলাবতী"। "সধবার একাদশী" "বিয়েপাগলা বুড়োর" পরে বের হলেও দীনবন্ধু কিন্তু এটা আগে লিখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে এটার প্রকাশ প্রথমে বন্ধ থাকে। "বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে" এই কারণ দেখিয়ে তিনি দীনবন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন যে, এটার বিশেষ পরিবর্ত্তন ছাড়া যেন প্রচার না হয়। কিন্তু ভাষাগত অশ্লীলতা "সধবার একাদশীর" বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টির পক্ষে ছিল অপরিহার্য্য। নিমচাদের মাতলামীকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তো ভাষার শুচিতা রক্ষা করা চলে না! তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ তিনি শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারেননি।

এর পর বেশ কিছু কাল দীনবন্ধুর আর কোন লেখা বের হয় না। এই বিরতির পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছাপা হয় "সুরধুনী" কাব্য, "জামাই-বারিক" আর "দ্বাদশ কবিতা।"

দীনবন্ধু তাঁর সমস্ত নাটকই লিখে গেছেন "প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজী গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প" থেকে সার সংগ্রহ করে। নীলদর্পণের শোচনীয় দৃশ্য নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবিম্বমূলক চিত্র। একই কুঠি থেকে অল্প কালের মধ্য এতগুলো অত্যাচার না হলেও দীনবন্ধু অনেকগুলো প্রকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করে কতগুলো সম্ভাবিত ও সুসমঞ্জস ঘটনা দিয়ে বাস্তব ছবিটি এঁকেছেন। এ ছাড়া "নবীন তপস্বিনীর" বড়রাণী ছোটরাণীর ঘটনাও সত্য। "সধবার একাদশীর" প্রায় সমস্ত

নায়ক-নায়িকার চরিত্রই ছিল জীবিত ব্যক্তির, নাটকে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে অনেকগুলোই সত্য ঘটনা। "জামাই বারিকে"র দুঃস্থ স্ত্রীর কাহিনী সত্য। "বিয়ে পাগলা বুড়ো"ও জীবিত এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়।

১৮৭১ সালে "লুসাই যুদ্ধের" সময় ডাকের সুবন্দোবস্ত করবার জন্ত দীনবন্ধুকে যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে হয়েছিল। এই উপলক্ষে তিনি মণিপুর, কাছাড়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জায়গা সম্বন্ধে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে দীনবন্ধু লিখলেন তাঁর শেষ নাটক "কমলে-কামিনী"। এটা যখন প্রকাশ করা হয় তখন তিনি রোগশয্যায়।

সারা জীবন নানা জায়গা ঘুরে বেড়াবার কঠিন শ্রমের ফলে দীনবন্ধুর শরীর ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তিনি প্রায় আঠার বছর সরকারী চাকরীতে ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে চাকরীতে তাঁকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। এই সময় পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল এবং ডাইরেক্টর জেনারেলের মধ্যে মনোমালিন্ত সুরু হওয়ায় উলুখড় দীনবন্ধু পড়লেন বিপাকে। তিনি ছিলেন পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের পক্ষে। ফলে তাঁকে ডাক-বিভাগ থেকে বদলী করে রেলওয়েতে পাঠান হল, সেখান থেকে আবার হাবড়া ডিবিজনে। সারা জীবন সদাশয় সরকারের চাকরী করার পর শেষ জীবনে এই পেলেন তিনি পুরস্কার!

শেষ বয়সে দীনবন্ধু নানা রকম উৎকট রোগে ভুগতে সুরু করেন। প্রথমে তাঁকে বহুমূত্র রোগে আক্রমণ করে। রোগের সামান্ত উপশমের লক্ষণ দেখা যেতেই হঠাৎ আবার তাঁর শরীরের নানা জায়গায় একটার পর একটা ফোড়া হতে থাকে, এটা ছিল বহুমূত্র রোগেরই আনুষঙ্গিক। এর ফলে দীনবন্ধু একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

এই যন্ত্রণাদায়ক রোগেই দীনবন্ধু তার পর শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর, শনিবার। তাঁর বয়স তখন মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর। ১৮৭৩ সালের বাংলা দেশই শুধু জানল কি তারা হারাল। এর অল্পকাল আগেই মারা গিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন। এবার দীনবন্ধুকে হারিয়ে সারা বাংলা শোকে ডুবে গেল।

আগেই বলা হয়েছে যে, দীনবন্ধু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র এতটা শোকার্ত্ত হয়ে পড়েন যে, 'বঙ্গদর্শনে' দীনবন্ধু সম্বন্ধে কিছু লিখতে পর্য্যন্ত পারেন না। বাংলা দেশের পাঠককুল বিস্মিত হয়ে বঙ্কিমের এই নীরবতার কারণ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। পরে "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই নীরবতার কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন।

ব্যঙ্গ এবং হাস্যরসাত্মক রচনায় দীনবন্ধু ছিলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু নীলদর্পণে তিনিই আবার পাঠকদের চোখের জল ফেলতে বাধ্য করেছেন। তাঁর রচনা ছিল সেই যুগে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক রচনা। তবুও তাঁর বন্ধুরা বলতেন যে, তাঁর প্রকৃত হাস্যরস-পটুতার শতাংশের পরিচয়ও তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে 'আর হাসিতে পারি না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।" বন্ধুদের নিয়ে দীনবন্ধু নানা রকম পরিহাস করতেন সুযোগ পেলেই। "জামাই-বারিক" নাটকে জামাইদের নামের তালিকায় তিনি তাঁর বন্ধুদের কয়েক জনের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন!

অনেক মানুষ দেখা যায় যারা নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী। এই ধরণের লোকের পক্ষে পরিহাসপ্রিয় দীনবন্ধুই ছিলেন "সাক্ষাৎ যম"। দীনবন্ধুর সামনে আত্মশ্লাঘা সুরু করলে তাদের আর তিনি নিষ্কৃতি দিতেন না। তিনি অবশ্য প্রথমে তাদের কথার কোন প্রতিবাদ করতেন না, বরং সাধ্যমত সেই আগুনে বাতাস দিতেন। তার পর ব্যাপারটা একেবারে চরমে উঠলেই করতেন রঙ্গভঙ্গ। তখন আর বেচারীর মাথা তুলবারও উপায় থাকত না।

সাহিত্যিকেরা হচ্ছেন মানুষের মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান সৈনিক। যা-কিছু অন্যায় আর কুসংস্কারের বিকৃত বুদ্ধিতে যা-কিছু আচ্ছন্ন, সবার বিরুদ্ধেই দীনবন্ধু চালিয়েছিলেন তাঁর লেখনী। সমাজ-জীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যে, প্রকাশ পেয়েছিল মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা আর দরদ। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দান ভুলবার নয়।

নিগ্রো লোক-সঙ্গীত সঙ্কলন

প্রায় কুড়ি বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মিঃ জে, ম্যাসন ব্রাউয়ার, আমেরিকার এক জন ইংরেজী ভাষার নিগ্রো অধ্যাপক সম্প্রতি নিগ্রো লোক-সঙ্গীতের একটি প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপকটি অষ্টিন শহরে স্যামুয়েল হাউসটন কলেজের গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা। সাধারণ নিগ্রো অধিবাসীদের সরল জীবনযাত্রা থেকে মশলা সংগ্রহ করেছেন ও গান চয়ন করেছেন। নিগ্রোদের যারা সমালোচনা করে আর বলে, "অতীত ভুলে যাও, তোমাদের দাস-পরিচয় ভুলে যাও," তাদের প্রতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রাউয়ার বলেন,—অতীত সম্বন্ধে সরাসরি একটা রফাই হ'ল আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুরোপুরি মীমাংসা। আর তা ছাড়া, আমাদের নিগ্রোদের এমন একটা সাংস্কৃতিক বংশ-মর্য্যাদা আছে, যে জন্ত আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। ব্রাউয়ারের এই লোক-সঙ্গীতের গবেষণার কাজে সর্ব্বাধিক সাহায্য করেছেন U. S. Library of Congress in Washington D. C. এই লাইব্রেরীর তরফ থেকে অত্যন্ত প্রামাণ্য নিগ্রো লোক-সঙ্গীতের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে নিরত আছেন এখন তিনি।

সুভাষের স্বপ্ন

প্রথম দৃশ্য

[এলগিন রোডের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্র নিজের ঘরে পালঙ্কের উপর নিদ্রামগ্ন : ঘর অন্ধকার—কেবল জানালা দিয়ে এক ফালি ম্লান জ্যোৎস্না ঘরে পড়েছে। একটি ঘড়ি অনবরত ভাবে রাতের সেই গভীর নিশ্চুপতা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করছে মাত্র]

তুমিও ঘুমিয়ে পড়লে শেষ কালে—তুমিও ঘুমাচ্ছ—তোমার চোখেও ঘুম নামল—তবে কি আর কোন আশাই নেই? হা রে দুর্ভাগা!

সুভাষচন্দ্র [ঘুমের ঘোরে অস্পষ্ট স্বরে] কে—কে আপনি ক্লান্ত মানুষের বিশ্রাম রাতের ঘুম নষ্ট করছেন?

তুমিও ক্লান্ত সুভাষ? তোমার মুখেও ক্লান্তির কথা—বিশ্রামের কথা, রাতের ঘুমের কথা—তবে কি আমার ধারণা মিথ্যা? কিন্তু জানো সুভাষ, আজ দীর্ঘ দুই শত বৎসর আমার চোখে ঘুম নেই—ঘুম-ঘুম-ঘুম—সর্ব্বসন্তাপহারিণী ঘুম—কাজলা-রাতের ঘুম—বর্ষা-রাতের ঘুম—কুহেলী-রাতের ঘুম—মধু-মাধবী রাতের ঘুম—সে কি ভুলে গেছি সুভাষ—ভুলে গেছি? কিশোরীর চঞ্চল নয়নের মত চপল ঘুম রূপসীর সুর্ম্মা-আঁকা কালো চোখের মত গভীর ঘুম—মায়ের স্পর্শের মত সর্ব্বস্নিগ্ধকর নিবিড় ঘুম ভুলে গেছি সুভাষ, তা ভুলে গেছি। আর ক্লান্তি—ক্লান্তি তুমি কি এরি মধ্যে ক্লান্ত সুভাষ—কিন্তু আমার ত ক্লান্তি নেই, আমার আশারও ক্লান্তি নেই—বারে বারে আশার উদ্দীপনায় জ্বলে উঠি আবার ব্যর্থতার বেদনায়—নৈরাশ্যের নিষ্ঠুরতায় ভেঙ্গে পড়ি, কিন্তু তবুও আশা ছাড়ি না—ক্লান্ত হই না—রাতের পর রাত—হ্যাঁ, শিশুর স্বপ্ন-ভরা রাত, কুমারীর রঙীন আশা-ভরা সলজ্জ রাত, যুবতীর কামনাকীর্ণ নিলাজ উছল বিলাসী রাত—বিধবার বেদনা-ভরা রাত—আমার কাছে নিষ্ফল—আমি শুধু বেদনা-ভরা অপলক নয়নে জেগে থাকি নূতন সৈনিকের পদধ্বনির আশায়—নূতন বীরের শঙ্খধ্বনির প্রতীক্ষায়—কবে আমার এই দাসত্বের বেদনায় কলঙ্কের কালো রাত শেষ হয়ে মুক্তির অরুণ-রাঙা প্রভাত আসবে।

সুভাষচন্দ্র [তন্দ্রাঘোরে] কিন্তু তবু আপনি কে? যে দীর্ঘকাল ধরে মুক্তির প্রতীক্ষা করছেন—কে আপনাকে এত দিন বন্দী করে রেখেছে—কোন্ শয়তান?

আমি—আমি কি পরিচয় দেবো আজ—আমি জাতির কলঙ্ক হয়ে ইতিহাসের পাতায়-পাতায় দেশের ঘরে-ঘরে বিলাসী অত্যাচারী, ভীরু কাপুরুষ, এই বলেই প্রচারিত আজ—আমি সিরাজ।

সুভাষচন্দ্র [বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পালঙ্ক হইতে নামিয়া]—সিরাজ—নবাব—জাঁহাপনা—এ বান্দার কুর্নীশ নিন।

না—না—নবাব নই—জাঁহাপানা নই—সিরাজ হতভাগ্য অক্ষম সিরাজ—জাতির কলঙ্ক সিরাজ। আমাকে কুর্নীশ করো না সুভাষ।

সুভাষচন্দ্র। না জাঁহাপনা, আপনাকে শত কুর্নীশ। এ বান্দা আজ পর্য্যন্ত কোনও রাজশক্তির কাছে নত হয়নি কিন্তু আজ আপনাকে আমার নতি জানাচ্ছি। কালো রাতের কালিমা আপনার চোখে দুঃখ-দিনের দৈন্য আপনার বুকে সে তো থাকবেই জনাব! আপনিই দেশের শেষ প্রভাত—স্বাধীনতার শেষ সূর্য্য—আপনার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পরাধীনতার দীর্ঘ রজনী দেশের বুকে নেমে এসেছে। অক্ষম ত আপনি ছিলেন না জনাব, আপনি শেষ স্বাধীন অসির ঝঙ্কার, আপনি জাতির কলঙ্ক ন'ন, আপনি জাতির ব্যঞ্জনা, স্বার্থপর কুচক্রিগণের হীন ষড়যন্ত্রের ফলেই দেশের পতন হয়েছিল আর সে ষড়যন্ত্র হয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে। আপনি জাতির বেদনা—গভীর বেদনা—বর্ষ-বর্ষ-ব্যাপী পরাধীনতার পুঞ্জীভূত আর্ত্তনাদ—কোটি কোটি দেশবাসীর মর্ম্মবেদনার মূর্ত্ত মূর্ত্তি আপনি। দাসত্বের নাগপাশে জর্জ্জরিত হয়ে যখনই স্বাধীনতার কথা স্মরণ করি তখনই আপনার কথা মনে পড়ে জনাব। মনে পড়ে বাংলার সেই দুর্দ্দিনের কথা, সেই অমা-রাতের কথা—রাজ্যের ষড়যন্ত্রকারী প্রধান অমাত্যগণের কাছে স্বাধীনতাকামী এক অসহায় যুবার করুণ আবেদনের কথা—হিন্দু-মুসলমান সবার কাছেই তার মিনতির কথা—মনে পড়ে এক শাসকের কথা—যে তার রাজমুকুট তার মাথার মুকুট দেশের জনশক্তির কাছে স্থাপন করে ভিক্ষা করেছিল তার নিজের জন্য নয়, দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য। দেশকে স্বাধীন রাখবার জন্য যে রাজা তার রাজমুকুট পরিত্যাগ করতে পরাঙ্মুখ হয় না, সে ত কাপুরুষ নয় জনাব, সে-ই ত বীর, সে-ই ত দেশপ্রেমের মানব-রূপ—সেই ত দেশের গৌরব।

কিন্তু দেশ ত তা বোঝে না—বণিকরাজ ও বণিক-সভ্যতার ক্রীতদাস ইতিহাস ত আমাকে অত্যাচারী, বিলাসী, ভীরু, হীন, কাপুরুষ, লম্পট, নারীদেহলোভী বলে অঙ্কিত করেছে।

সুভাষচন্দ্র। তার প্রতিবাদও হয়েছে জাঁহাপনা—

হ্যাঁ হয়েছে, তাদের সর্ব্বাগ্রে ছিলে তুমি। বাংলার রাজধানীর বুকে ওরা মিথ্যার জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিল 'অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি' বলে—পাথরের মধ্যে ওরা বাংলার কলঙ্ক ভারতের কলঙ্ক সভ্য জাতির মিথ্যার মাপকাঠি হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলেছিল। সত্যের শাণিত অভিযানে তা সরে গেছে। কিন্তু সুভাষ, ওরা যদি সত্যই অসহায়ের উপর অত্যাচারকে ঘৃণা করে তবে জালিয়ানওয়ালাবাগের কোনও স্তম্ভ রাখে নাই কেন—যেখানে শত শত নিরীহ নরনারীকে কামানের মুখে হত্যা করা হয়েছিল? সেখানে কোনও হলওয়েল এলো না কেন—মানুষকে যেখানে কেঁচোর মত বুকে ভর দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল? সেই টিকটিকি গলিতে কোনও স্তম্ভ খাড়া করা হলো না কেন? হলওয়েল মনুমেণ্টকে শুধু অপসরণ করেই কি কাজ শেষ হবে? না সুভাষ, ওটাকে আজ জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আবার—কেবল ওর গায়ে নূতন বাক্য যোগ করতে হবে এই বলে—"এখানে ইংরাজের বীরত্ব ও সভ্যতা চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ হয়েছে।" শুধু হলওয়েল স্তম্ভই নয়—এখনও দেশের বুকে রাজধানীর মাঝে অমনি মিথ্যা কলঙ্কচিহ্ন বহু আছে। ঐ অক্টোরলনী মনুমেণ্ট। বিজয়ের দর্পে নেপালের রাজার শত শত নিরীহ নরনারী সমেত গোলার আঘাতে যখন নিশ্চিহ্ন করা হলো—সভ্যতার মাপকাঠিতে সেই হলো বীরত্ব! বীরের অভিধানে যাকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিতে হয় সেই হলো অবিস্মরণীয়, তারই জয়স্তম্ভ তোলা হলো। ওটাকে দেশবাসী আজও সহ্য করে আছে কেন—বীরের জাত স্বাধীন নেপাল আজও এর প্রতিবাদ করছে না। আমি জানি যে, আজ তোমরা আমার তিরস্কার করো না, আমার অসহায় অবস্থার জন্য বেদনা প্রকাশ করো, কিন্তু তবুও আমি জাতির কলঙ্ক—তার অক্ষম প্রতিপালক। যে সিংহাসনে স্বাধীন জাতি বসিয়েছিল, তার মর্য্যাদা আমি রক্ষা করতে পারিনি—তার সম্মান

আমি শুরু করেছি—অক্ষম কাপুরুষ বিলাসপ্রিয় আমার হাতেই স্বাধীন দেশের পতাকা শত্রুর পদদলিত হয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া আমি আমার ভাগ্যের সাথে-সাথেই তাই দেশলক্ষ্মীর অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুরু হয়েছে। চেয়ে দেখো সুভাষ, আজ দেশলক্ষ্মী ভারতলক্ষ্মীর কি অবস্থা! আলুলায়িতা-কুন্তলা দীনহীনা রোদনবিহ্বলা রিক্তা মাতার কি অবস্থা দেখ!

[সুভাষচন্দ্র দেখিলেন—অদূরে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা এক নারীমূর্ত্তি। সুগৌর চরণযুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ, রক্তাক্ত—পরিধানে ছিন্ন-বস্ত্র—অঙ্গে কোনও আভরণ নেই—কণ্ঠ নাগপাশে বদ্ধ, শ্বাস রুদ্ধ—আয়ত লোচনদ্বয় অশ্রুপাতে রক্তিম: সেই মূর্ত্তির সামনে নতজানু হইয়া—]

মহামাতা, মা—তোমার এই বন্ধন-দশা মোচন করিব মা—তোমাকে আবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করিব—তোমার কালিমা—তোমার অপমাননা দূর করিব মা—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ষড়ৈশ্বর্য্যভূষিতা হয়ে আবার তুমি বিশ্ব-সভাতে দাঁড়াবে মা।

[ভারত মাতার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সুভাষচন্দ্রের মস্তকে পড়িল]

না না, অশ্রু সংবরণ করো মা—আমরা দুর্ব্বল—আমরা অক্ষম—আমাদের সাহস দাও মা অন্তরে তুমি, তোমার অশ্রুধারা আমাদের বিহ্বল করে তুলেছে—আমাদের কর্ম্মশক্তি হীন করে তুলেছে—অসহায় শিশুর মতই আমরা রোদন করি। আজ আমাদের শক্তি দাও মা—বজ্রের মত শক্তি দাও, যার আঘাতে শত্রু পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। হিমালয়ের মত দৃঢ়তা দাও মা—বিপদের ব্যর্থতার শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও আমাদের স্বাধীনতা লাভের পণ যেন অটুট থাকে। শত্রুর দেখানো লোভে স্বার্থের সংঘাতেও আমরা যেন ব্রতচ্যুত না হই। জননী, তোমার অশ্রুর উষ্ণতা আমাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনাকে যেন চির-প্রজ্বলিত রাখে। আর যদি স্বাধীনতা লাভের মোহে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ি, তবে তোমার এই শতাব্দীর সঞ্চিত উষ্ণ নিশ্বাসে আমাদের সে মিথ্যা মোহ যেন উড়ে যায় মা—সেই উচ্চাসন রাজবেশ যেন ধূলায় লুণ্ঠিত হয় মা—সে মোহ যেন ভেঙ্গে যায় মা।

ওঠো সুভাষ, অত্যাচারী শাসকের আইনের নাগপাশে দেশমাতার কণ্ঠ আজ রুদ্ধ—নীরব অশ্রুপাত ছাড়া তাঁর আজ কিছু করবার অধিকার নেই। তাই বলি উঠো সুভাষ, জাগো—দেশকে জাগাও তোমার তূর্য্যধ্বনিতে। জাতির সুপ্তি ভঙ্গ করো, জাতিকে সংহত করো, পররাজ্যলোলুপ বিদেশীর হাত হতে দেশের বন্ধন মোচন করো। তোমার আশাতেই এত যুগ ধরে এ কষ্ট সহ্য করেছি। আজ সময় এসেছে, রণযাত্রা করো। কেবল মনে রেখো সুভাষ—এ ১৭৫৭ নয়। শত্রু তার চেয়েও বহু গুণে শক্তিশালী আজ। আর আমি মাত্র এক জন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হয়েছিলুম, কিন্তু আজ দেশে শত শত মীরজাফর সৃষ্টি হয়েছে। হায় এই মাত্ত সুভাষ, অক্ষমের হাতের দান হলেও এ স্বাধীন দেশের তরবারি। পরাধীনতার পঙ্কিল যুগে এ নির্ম্মিত হয়নি। আশীর্ব্বাদ করবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই—তবে কামনা করি, তোমার অভিযান সার্থক হোক—জয়ী হও।

[ঘর হইতে সিরাজের মূর্ত্তি অপসারিত হইয়া গেল: সুভাষচন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশলক্ষ্মীর চরণ দুটি ভাসিতে লাগিল: দূরের কাকলী নব প্রভাতের আগমনী গাহিতেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরিবেশ প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ]

ওঠো বীর জাগো, জাগো, সুপ্তি তোমার নয়নে কেন? ওঠো, সময় হয়েছে, বাঁধন ছেঁড়ার ব্রত পালন করো, এবার জাগো জাগো।

সুভাষচন্দ্র [তন্দ্রাঘোরে] কে আপনি?

চিনবে না আমায়, চিনবে না। তোমাদের ইতিহাস আমাকে চিনবার মত চরিত্র করে অঙ্কিত করেনি, বিকৃত করে আমাকে অত্যাচারী, শিশুহন্তা, নারীহন্তা বর্ব্বর বলে প্রচার করেছে। আমার সাধনাকে, আমার ব্রতকে তারা স্বীকার করেনি, আমার অভিযানকে ওরা বলেছে বিদ্রোহ, রাজ্যচ্যুত রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে ওরা বলেছে রাজদ্রোহ, হৃতসম্পত্তির পুনরুদ্ধারকে ওরা বলেছে অরাজকতা।

সুভাষচন্দ্র। তবু, তবু আপনি কে?

আমি, আমি নানা সাহেব।

সুভাষচন্দ্র। নানা সাহেব—১৮৫৭ সালের বীর যাঁর বুদ্ধিবলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উঠেছিল এক দিন—অত্যাচারী পররাজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল—পরাধীন জাতির চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন এনেছিলেন, পদদলিত জাতিকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি আপনি দিয়েছিলেন, বিক্ষিপ্ত জাতিকে সংহতির মন্ত্র আপনি শুনিয়েছিলেন—হে মহাত্মা, এ দীনের প্রণতি গ্রহণ করুন।

তোমার কথা হয়ত সত্য সুভাষ, এক দিন আমার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উঠেছিল। জাতির চক্ষে স্বাধীনতার স্বপ্ন হয়ত এনেছিলাম, কিন্তু জাতির প্রাণে আলোড়ন আনতে পারিনি। আমার স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ওরা তাই আমল দেয়নি—দেশ আমাকে স্বীকার করল না। অসন্তুষ্ট সিপাহীরা যখন বিদ্রোহ করেছিল, তখন স্বার্থের জন্যই আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিই, তাদের নেতৃত্ব করি—এই পরিচয়ই ত আমাকে দিয়েছে; কিন্তু তারা কি আমার মনের কথা ভাবেনি—বিদেশীর হাত থেকে দেশকে আবার দেশবাসীর হাতে তুলে দেওয়াই আমার লক্ষ্য ছিল, শত্রুর হাত হতে দেশকে উদ্ধার করাই আমার ব্রত ছিল। তবুও, তবুও সুভাষ, দেশ আমাকে স্বীকার করুক আর নাই করুক তাতে আমার কোনও ক্ষোভ নেই, কেবল আমি চাই দেশ হতে বিদেশীর কর্তৃত্ব লোপ হোক। আমাদের হাত থেকে যারা দেশ কেড়ে নিয়েছিল তাদের হাত থেকেই জোর করে আমরা দেশ উদ্ধার করব। ১৮৫৭ সালে যে সুযোগ এসেছিল তার চেয়ে বহু গুণে আজ আবার সুযোগ এসেছে। নেহি দেঙ্গে—নেহি দেঙ্গে—মেরে ঝাঁসি—নেহি দেঙ্গে—নেহি দেঙ্গে—ঐ শোন সুভাষ, দেশের অবমানিতা হৃতসম্পদা নারীশক্তির জাগরণ। [যোদ্ধৃবেশে অসি হস্তে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রবেশ: সুভাষচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া]

না না, দেবো না মা, কিছুই দেবো না—সবই আবার কেড়ে আনবো—তোমার ঝাঁসি, তোমার ভারত সবই আবার কেড়ে আনব। তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন তোমার মতই মনের বল অটুট

থাকে—শতাব্দীর ব্যবধানেও তোমার মত ওদের উপর ঘৃণা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে—তোমার মতই রুদ্র কণ্ঠে যেন বলতে পারি নেহি দেঙ্গে নেহি দেঙ্গে······

গা জিয়া মেঁ বু রহেগি যব তলক ইমান কি।
তকত লন্দন তব চলেগি, যেগ হিন্দুস্থান কি।

ঐ দেখ সুভাষ—স্বাধীন ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা আজ স্বয়ং তোমার কাছে উপস্থিত। [দূরে আধো-আলোকিত স্থানে বাহাদুর শাহের মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে]

সুভাষচন্দ্র। বন্দেগী শা-হান্‌শা, বান্দার হাজার হাজার কুর্নীশ নিন। কি আদেশ জাঁহাপনা।

আমরা ভুল করেছিলাম সুভাষ। আমরা কেবল সিপাহীদের জাগিয়েছিলাম—দেশবাসীর মনকে আকৃষ্ট করতে পারিনি। দেশ তাই শঙ্কিত হৃদয়ে, রুদ্ধশ্বাসে ভীত নেত্রে আমাদের কার্য্যকলাপের দিকে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল এ কেবল উচ্ছৃঙ্খল সিপাহীদের লুঠতরাজের অভিযান—অসন্তুষ্ট মুষ্টিমেয় সিপাহীদের উচ্চতর রাজকর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে বর্ণ-বিদ্বেষ—তাই তারা যোগ দেয়নি বরং কামনা করেছিল কবে তার অবসান হবে। আর আমরাও ভেবেছিলাম, শুধু এই সিপাহিগণের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হবে—তাই দেশের গণশক্তিকে উপেক্ষা করেছিলাম, সাহায্যের জন্য তাদের কাছে যাইনি—তাদের বলিনি যে এ হচ্ছে পরাধীনতা হতে মুক্তির অভিযান—এ যে স্বাধীনতার আন্দোলন। তা হলে দেশ হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিত।

শুধু তাই নয় সুভাষ, আমরা ধর্ম্মকে বড় সংকীর্ণ করে দেখেছিলাম—[বলিতে বলিতে তাঁতিয়া তোপীর প্রবেশ] হ্যাঁ, ধর্ম্মকে আমরা অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলাম—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভাবে বিচার করে। ছোট দুঃখকে বড় করে দেখেছিলাম বলেই বড় দুঃখ প্রতিকারহীন রয়ে গেল। তখন বুঝিনি যে মানুষের প্রধান ধর্ম্মই হচ্ছে তার জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা। দেশের স্বাধীনতা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-পার্শী-শিখ-খৃষ্টান উন্নত-অবনত সবার ধর্ম্মই নষ্ট হয়ে যায়—সবাই জাতিভ্রষ্ট হয়ে যায়—আর তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে স্বদেশপ্রেমের অনলে আত্মোৎসর্গ করা। তখন বুঝিনি যে, মানব জাতির শ্রেণী বিভাগ মাত্র দুইটি—স্বাধীন ও পরাধীন। আমরা দেশকে বোঝাতে পারিনি যে, বিদেশী শাসক চর্ব্বিভরা টোটা দিয়ে শুধু সিপাহীদের ধর্ম্মই নষ্ট করেনি—ঐ টোটা-ভরা বন্দুকের জোরে দেশবাসীর ধর্ম্মও নষ্ট করেছে। রণশক্তির সহিত গণশক্তির সংযোগ ঘটাতে পারিনি বলেই আমাদের অভিযান সফল হলো না—আমাদের প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলন না হয়ে সিপাহী বিদ্রোহ বলেই বর্ণিত হলো।

নানা সাহেব। ১৮৫৭ সাল আবার ফিরে এসেছে সুভাষ, তার চেয়ে বেশী সুযোগ এসেছে এবার—এ সুযোগ ছাড়া মূর্খতা। ওঠো, জাগো—সংগ্রামে অবতীর্ণ হও—উদাত্ত কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশকে আহ্বান করো, তাদের বলো, এ সংগ্রাম সবার মুক্তির জন্য, সবার স্বাধীনতার জন্য, ওঠো, জাগো, জাগো।

[বাহাদুর শাহ অগ্রসর হইয়া] এই নাও সুভাষ, সারা ভারত এক দিন ক্ষণিকের জন্যও এই তরবারিকে স্বাধীন দেশের সর্ব্বোচ্চ শক্তির প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিল—রাজ-তরবারি বলে সারা ভারত এক দিন একে অভিবাদন করেছিল—এই নাও।

[সুভাষচন্দ্র বাহাদুর শাহ প্রদত্ত তরবারি সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন : দূরের গৃহস্থ-গৃহে কোনও মঙ্গল সূচনাকে অভ্যর্থনা করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

[পরিবেশ প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ]

সুভাষ, সুভাষ—ওঠো, ওঠো, জাগো—সুকোমল শয্যা তোমার নয়, এ নিশ্চিন্ত আরাম তোমার নয়। আবার সুযোগ এসেছে—গ্রহণ করতেই হবে। ওঠো, ওঠো, জাগো।

সুভাষচন্দ্র। কে?

আমাকে চিনতে পারছ না! চেয়ে দেখ।

সুভাষচন্দ্র। [চক্ষু উন্মীলন করিয়া] যতীন মুখুজ্জে, বাঘা যতীন, শের-ই-হিন্দ, বিপ্লবের বজ্রাগ্নি, রুদ্ধ রোষের দাবানল—বুড়ীবালামের বীর—আমার স্বপ্ন—আমার সাধনা! আদেশ করুন, জাতীয় যজ্ঞের দধীচি—আদেশ করুন।

এই নাও অস্ত্র—এই-ই তোমার পথ—ভিক্ষার পথ ত তোমার নয় সুভাষ! বৎসরান্তে দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শোভাযাত্রা করে, সাড়ম্বরে সভাপতি হয়ে দর্শক, প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দের উচ্চতর করতালিধ্বনির মধ্যে কথার মালা গেঁথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা—প্রস্তাব গ্রহণ করে কাগজে কাগজে স্বাধীনতা দিবস যাপন করা—এই স্বপ্নালুতা কাব্যে চলে কিন্তু বাস্তব জগতে এর কোনও মূল্য আছে? তোমরা কি ভাব যে, শুধু তোমাদের এই বিরাট শোভাযাত্রা দেখেই ও সভামণ্ডপে তোমাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনেই ব্রিটিশ ভয় পেয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে? না, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-ভরা বক্ষে রাজপ্রতিনিধিগণের সাথে গোলটেবিল বৈঠক করে বা তাদের কাছে চরম পত্র প্রেরণ করেই স্বাধীনতা আসবে? বিনা রক্তদানে শুধু প্রায়োপবেশনের দ্বারাই তার সমাধান হবে? সংকোচ-ভরা চক্ষে আবেদন-নিবেদনের ডালি প্রেরণ করবার ভীরুতা তোমার কেন সুভাষ—এইই কি পথ না কি? রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রকে চন্দনের সুবাসে কি শান্ত করা যায়? না না, এ পথ নয়। পূর্ব্বপুরুষগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বুকের রক্তদানে। দুর্ব্বলের অসহায়তায়—চক্রীদের স্বার্থপরতায়—প্রসাদলোভী বিশ্বাসঘাতকগণের ষড়যন্ত্রে যে সম্পদ আমরা হারিয়েছি, তা ফিরিয়ে আনতে গেলে চাই বিরাট আহুতি। পররাজ্যলোলুপ নীচতার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল। উন্মুক্ত প্রান্তরে, উদার আকাশ-তলে, অনন্ত কালকে সাক্ষী রেখে, উজ্জ্বল অসি হস্তে তাকে সংগ্রামে আহ্বান করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র। কিন্তু দেশ ত বিপ্লববাদে আস্থাবান নয়—অহিংসার পথে চলে তারা আজ সংগ্রামে বিমুখ—অহিংসার মহাবলে অধ্যাত্ম শক্তি দিয়ে তারা জয়ী হবে বলে।

বিপ্লব কা'কে বলছ সুভাষ! এখানে-ওখানে দু'-একটা পটকা ছুঁড়ে বা দু'-চার জনকে গুপ্তহত্যা করাই বিপ্লব না কি? কু[illegible] হত্যাতেই তোমরা সিংহ-শিকারের গর্ব্ব করবে? বিপ্লব হবে—সক[illegible] সংহত হয়ে রাজশক্তিকে অস্ত্রের অগ্নিযুদ্ধে আহ্বান করা। আমাদের

বার্থতার পর থেকেই আকুল আগ্রহে চেয়ে আছি কবে আবার দেশ জাগবে, কবে বিপ্লবের মহাযজ্ঞে দেশবাসী সমবেত ভাবে আহুতি দেবে। আমরা অস্ত্র হাতে পাবার আগেই অতর্কিতে পরাজিত হয়েছিলাম—তাই বড় আশা করেছিলাম সূর্য্যর কাজে; কিন্তু দেখলুম সে-ও শেষ অবধি পারল না—ও যে কেবল চট্টগ্রামকেই একা দেখেছিল—যদি চট্টগ্রামের সাথে সাথে সারা ভারত জাগত তা হলে আজ হয়ত ইতিহাস পালটে যেত। কিন্তু আমাদের দলনীতি ও দলাদলির মোহ এক হতে দেবে না—তাই সূর্য্যও অস্ত গেল—তবু সে যাবার আগে আলোর ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

সুভাষচন্দ্র। কিন্তু আমি যে একা, দেশ ত আজ আমাকে চাইছে না, দেশের রাজনীতির চক্ষে আজ আমি বিদ্রোহী, বহিষ্কৃত। আমি কি করে আজ এই বিরাট যজ্ঞের ভার নিই? যে দেশ আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করতে ইতস্তত করছে সে কি অস্ত্রের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবে, না, আমার আহ্বানে নিয়মতান্ত্রিকতার নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে রণক্ষেত্রের অনিশ্চিত পরীক্ষার বিপদে যোগ দেবে! ওরা যে বলছে, চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত 'নয়—আর দেশও নীরবে তা স্বীকার করেছে।

কে বলে দেশ প্রস্তুত নয়—কে বলে চূড়ান্ত সংগ্রামে দেশ বিমুখ—নিদাঘ মধ্যাহ্নের নিষ্কম্প ভাব দেখে কে বলে অপরাহ্নে কালবৈশাখীর রুদ্র আহ্বানে বনভূমি সাড়া দেবে না—পূর্ণিমার শান্ত উছল সমুদ্র দেখে কে বলে সে প্রলয় তাণ্ডবে যোগ দিতে পারবে না। মুক্তি-সংগ্রামে দেশ আজ দৃঢ়সংকল্প—তাই সে অচঞ্চল ভাবে আহ্বানের প্রতীক্ষা করছে। দেশ প্রস্তুত নয় বলে যারা আজও চূড়ান্ত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, সংগ্রাম পরিচালনায় তারা অক্ষম বলেই এই যুক্তি। আর তুমি একা, তাই বা কি করে বুঝছে, দেশব্যাপী অবিচার ও অত্যাচারের ফলে অন্তরের রুদ্ধ রোষে সারা দেশ আজ বিক্ষুব্ধ—ব্রিটিশের প্রতি বিমুখ। ওরা কেবল প্রকৃত সুযোগের আশায়—প্রকৃত সংগ্রামের নেতার ডাক শুনবার অপেক্ষায় চুপ করে আছে। মা ভৈঃ মন্ত্রের বাণী নিয়ে তুমি ডাক দাও—দ্বিধাহীন দৃঢ় কণ্ঠে জানাও যে, আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম তোমার লক্ষ্য—অসার নেতৃত্ব ও গতানুগতিক লোক-দেখান সংগ্রামের বুলি তোমার কাম্য নয়; দেখবে দলে-দলে লোক তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। আর জানো সুভাষ, প্রদীপের পাদদেশেই আলোকিত ঘরের অন্ধকার জমাট বাঁধে—রাজশক্তির স্তম্ভ দেশরক্ষা বিভাগেই অসন্তোষ সব চেয়ে বেশী; তোমার প্রচার হবে তাদের মধ্যে, তোমার সহায় হবে তারাই। তুমি ডাক দাও, দেখবে কত বিষ্ণুগণেশ পিংলে, কত গুরুদিৎ সিং আজ ঐ ডাক শুনবার জন্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে; কত 'কোমাগোটামারু' কত 'তোষামারু' তোমার ঝাণ্ডা বহন করবার জন্ত বন্দরে অপেক্ষা করছে; কত 'ম্যাভেরিক' ও 'হেনরী' আসছে তোমার সাহায্যের জন্ত। আবার কত নব নব বার্লিন কমিটী গঠিত হবে বিদেশে—তুমি খালি আহ্বান করো। আর একটা কথা সুভাষ, বলবানের সাহায্য নিতে হবে, এতে লজ্জার কিছু নেই, আর সেই সাহায্য গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময় এই। মানবতার মূর্ত্তি হয়ে যারা বলছে যে ব্রিটিশের এই দুর্দ্দিনের সময় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা উচিত হবে না, কিন্তু ভারতের দুঃসময়ে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতার সুযোগে অরাজকতার দুর্দ্দিনে ব্রিটেন যখন ভারত গ্রাস করেছিল, তার স্বপক্ষে তারা কি বলতে পারে? তাই বলি, ওঠো সুভাষ, এ সুযোগ গ্রহণ করো। একে হারালে আবার বহু বর্ষ ধরে পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হবে। ব্রিটিশ যদি একবার এ অবস্থা সামলে নিতে পারে তবে ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের হাজার প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্য্যকালে বহু দিনের বহু কূটনীতির অবতারণা করে ভারতের সংহতি নষ্ট করে দেবে। আমাদের হৃত-সম্পত্তি আমরা সুযোগ মত আপন বাহুবলে অধিকার করে নেবো। পরস্বাপহারকের কাছ থেকে দৃঢ়বলে বজ্রমুষ্টিতে তা ছিনিয়ে আনব। ভিক্ষুকের মত করপুটাঞ্জলিবদ্ধ ভাবে অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করব না। তাই ওঠো সুভাষ—জাগো, জাগো, নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না—অস্ত্র গ্রহণ কর।

সুভাষচন্দ্র। 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু'। দাও তোমার অস্ত্র, যে অস্ত্র বীরের হাতে এক দিন শোভিত হয়েছিল—যে অস্ত্র এক দিন সারা ব্রিটিশ জাতিকে কাঁপিয়েছিল—যে অস্ত্র এক দিন সারা দেশের রক্তে দোলা দিয়েছিল। আর আঁশীর্ব্বাদ করো, তোমার অস্ত্রের অসম্মান যেন আমার হাতে না হয়।

[যতীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি সুভাষচন্দ্রের কাছে গিয়া লঘু ভাবে তাঁহার শিরস্পর্শ করিয়া] তোমার ব্রত সফল হোক। বৎস, জয়ী হও!

[ঘর হইতে যতীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল :

বিস্ময়াবিষ্ট সুভাষচন্দ্র সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন : দূরে রাত্ত-জাগা এক খেয়ালী যুবা অস্থির ভাবে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছে]

ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর ওরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ;
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ,
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা।

চতুর্থ দৃশ্য

[সিঙ্গাপুর স্কুয়ার পার্ক : আত্মসমর্পণকারী ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবৃন্দ]।

সমবেত সঙ্গীত

শুভ সুখ চৈন কি বর্ষা বরষে ভারত জাগ হৈ জাগা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য-হিমাচল নীলা যমুনা রঙ্গ
তেরে নিতি গুণ গায়ে
তুঝে সে জীবন পায়ে
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা
জয় হো জয় হো জয় হো
জয় হো জয় হো জয় হো।

[রাসবিহারী বসু দণ্ডায়মান হইয়া]

স্বাধীনতাকামী ভারতের মুক্তি সেনাগণ! অদৃষ্টচক্রে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার পর হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের যে অনির্ব্বাণ সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় আজ তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব এত দিন আমার উপর ন্যস্ত ছিল—বার্দ্ধক্যোচিত দুর্ব্বলতায় সে গুরু ভার আমি সগৌরবে বহন করিতে পারি নাই। তাই আজ আমি সে ভার অর্পণ করিতেছি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উপর। তাঁর সম্বন্ধে আজ আর বলিবার কিছুই নেই—কেবল আমি সদম্ভে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি নিজে দুর্ব্বল হইলেও আমার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন দুর্ব্বল হইবে না। আমি আপনাদের অনুমতি লইয়া আপনাদের পক্ষ হইতে সুভাষের হাতে ভারতীয় জাতীয় পতাকা প্রদান করিতেছি এবং এই নব-গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্ব-নায়কের পদে বরণ করিতেছি। জয় হিন্দ!

সুভাষচন্দ্র। [প্রথমে পতাকাটি মস্তকে স্পর্শ করিয়া পরে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া]

ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আজ আমার জীবনের সব চেয়ে গর্ব্বের দিন, আজ ঈশ্বর আমাকে এ-কথা ঘোষণা করবার অপূর্ব্ব সুযোগ ও সম্মান দিয়াছেন যে, ভারত স্বাধীন করবার জন্য সেনাদল গঠিত হইয়াছে। যে সিঙ্গাপুর এক দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, সেই সিঙ্গাপুরেই আজ আমাদের বাহিনী ব্যূহবদ্ধ। এই বাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষকেই ব্রিটিশের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবে তাহা নয়—এই সেনাদলকেই ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় বাহিনী গড়ে উঠবে—প্রত্যেক ভারতবাসীই এই বাহিনীর জন্য গর্ব্ব অনুভব করিবে।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বাংলা দেশে ব্রিটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর হইতেই ভারতীয় জনগণ এক শত বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতেছে। এই সময়ের ইতিহাস অসংখ্য অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও বীরত্বের আদর্শে পূর্ণ। নবাব সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, টিপুসুলতান, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দ্দার শ্যামসিং অতরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, দামরাওনের মহারাজা কুন্‌ওয়ার সিং, নানা সাহেব এবং আরও বহু বীরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্মিলিত ভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। শেষে ১৮৫৭ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহের অধীনে তাঁরা স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ সংগ্রাম করিলেন।

ঈশ্বরের নামে অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করছিলেন তাঁদের নামে এবং যে সব পরলোকগত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁদের নামে আমি ভারতীয় জনগণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হতে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করতে আহ্বান করছি এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আমরা তাঁদের ও তাঁদের মিত্রদের আহ্বান করছি। যত দিন ভারত-ভূমি থেকে ব্রিটিশ বহিষ্কৃত না হয় এবং যত দিন ভারতবাসী আবার স্বাধীন না হয়, তত দিন সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চরম বিজয়ের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সর্ব্বশক্তিমান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাহায্য চেয়ে ঘুরতে পারে, পরাধীন ক্রীতদাসের অবস্থায় পর্য্যবসিত দরিদ্র অভিভূত ভারতবাসীর কাছে পর্য্যন্ত তারা যখন সাহায্য চায়—তাহলে অবস্থার চাপে আমরা যদি বাইরের সাহায্য গ্রহণ করি সেটা নিশ্চয়ই দোষের হবে না।

আমি এই আশ্বাস দিলাম—আলোকে ও অন্ধকারে, দুঃখে ও সুখে, পরাজয়ে ও বিজয়ে আমি সর্ব্বদা তোমাদের সাথে থাকব। বর্ত্তমানে তোমাদের আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান ও মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিতে অসমর্থ। তোমরা আমাকে রক্ত দাও তার বদলে আমি স্বাধীনতা দেবো। স্বাধীনতা আমাদের মধ্যে কারা চোখে দেখতে পাবে এটা বড়ো কথা নয়, আমাদের ভারত যে স্বাধীন হবে—ভারতকে স্বাধীন করতে আমরা যে সর্ব্বস্ব দেবো, শুধু এই ত যথেষ্ট।

ইয়োরোপের অধিবাসীরা বলে সকল পথের শেষ হয়েছে রোমে—এখানে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত পথের অবসান হয়েছে ভারতের প্রধান নগরী দিল্লীতে—তাহার বুকের উপর অবস্থিত লাল কেল্লাতে। দিল্লীই আমাদের লক্ষ্য—আমরা বহু পথ ধরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হব। স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে আমাদের কে কত দিন বেঁচে থাকব জানি না, তবে জানি যে, জয়লাভ আমরা নিশ্চয়ই করব-ভারতের বুকে আমাদের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবই করব। দিল্লীর যে বিখ্যাত লাল কেল্লায় স্বাধীন ভারতের শেষ নৃপতির বিচারের প্রহসন হয়েছিল সেইখানেই আবার হবে স্বাধীন ভারতের বিচারশালা।

দূরে—বহু দূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া—ঐ পাহাড়-পর্ব্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ। ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি—ঐ দেশেই আবার আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ শোন, ভারত আমাদের ডাকিতেছে—ভারতের রাজধানী আমাদের ডাকিতেছে—আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—স্বজনেরা স্বজনদের ডাকিতেছে।

ওঠো, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র হাতে লও—দেখ তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথ-প্রদর্শকগণ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে—আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব—শত্রু-সেনার মধ্য দিয়া আমাদের পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথ দিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে গিয়া পৌঁছাইবে শেষ-শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী—দিল্লী চলো।

[ভারতবর্ষ হইতে আগত সমুদ্রবায়ু-স্রোতে সুভাষচন্দ্রের হস্তধৃত পতাকাটি খুলিয়া গেল এবং মেঘনির্ম্মুক্ত নীল আকাশের সূর্য্যকিরণে তাহার রঙ প্রতিফলিত হইতে লাগিল]

নেপথ্যে—কোরাস :—

অব দিল্লী চলো, দিল্লী চলো
দিল্লী চলেংগে।
রোকনে হাম কিসীকে রুকে হি
ন রুকেংগে।
ঝণ্ডা তিরংগা লাল কিল্লে পৈ উড়াংগে।

পঞ্চম দৃশ্য

[রেঙ্গুণ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য-শিবির; বিষণ্ণ সুভাষচন্দ্র একটি ছিন্ন জাতীয় পতাকার তলে দণ্ডায়মান]

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ও সৈন্যবৃন্দ।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আপনারা যেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন ও এখনও চালাইতেছেন—আজ গভীর বেদনার সঙ্গে আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রথম চেষ্টাই মাত্র। আমাদের আরও বহু চেষ্টা করিতে হইবে। আপনারা যে ভাবে মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছেন তা দেখে বিশ্বজন মুগ্ধ হয়েছে। আপনারা মুক্তহস্তে আপনাদের ধন-জন ও সম্পত্তি দান করিয়াছেন, সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে সত্যই দুর্লভ; কিন্তু আমাদের ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাই সাময়িক ভাবে ব্রহ্মযুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহা আমাদের প্রথম পর্ব্ব মাত্র, আরও অনেক যুদ্ধ আমাদের বাকী আছে সুতরাং প্রথম পর্ব্বে পরাজিত হওয়াতে হতোদ্যম হবার কোনও কারণ নেই। আমি চির আশাবাদী, সুতরাং অচিরেই যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে আমার এই অটুট বিশ্বাস বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। আপনারাও সেই আশা পোষণ করুন—এই আমার প্রার্থনা। আমরা পরাজিত হলেও এ কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে এমনি চরম আঘাত দিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি সব সময়েই বলে এসেছি—রাত্রের গভীরতম অন্ধকারের পরই উষার আলো দেখা দেয়। আমরা এমন গভীরতম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলেছি তাই প্রভাতের আর বিলম্ব নেই—ভারত স্বাধীন হবেই হবে—দিল্লীর লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হবেই হবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ!

[এক খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল: আলো কমিয়া যাওয়াতে সুভাষচন্দ্রের ম্লান মুখ করুণতর মনে হইতেছে।]

ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-তীর্থ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতীর শ্যামল তটে "দেবানন্দপুরের" মাঝ
ন্যাড়া বট অই পত্র-ঝরা এই ত শরৎ-তীর্থরাজ
অন্নপূর্ণা, অন্নদা যে, শিব শাহাজীর সমাধি-তল
গলায়দ'ড়ের! বাগান-মাঝে, কোথায় দামাল ছাত্র দল?

রাজলক্ষ্মীর দেউল হেথায়, সপ্তগ্রামের তীর্থ অই
এই আকাশেই শরৎ-শশীর প্রথম উদয় সে চাঁদ কই
নদীর তটে, বেণু-বনে, শরৎ-রাখাল বাজিয়ে বেণু
গাঁথলে কত কথার মালা, মাখিয়ে এই পথের রেণু

এরই পথের প্রথম পথিক বিশ্ব-পথের দাবীদার
নেতাজীরে করল সৃজন সব্যসাচী কল্পনার
সৌরভে আর গৌরবেতে বিরাজিত তীর্থরাজ
প্রণাম করি পুণ্য লভি ধন্য হলাম দেবতা আজ।

এই মাটীরই সত্য ছবি শ্রীকান্তের কল্পনা
ইন্দ্রনাথের দামালপনা সত্য কথা গল্প না
এই মাটীতেই খেলত দাদা কৈলাস আর বিশ্বনাথ
সাবিত্রী আর কিরণময়ীর ঝরল শত অশ্রুপাত।

দেবদাস আর রমা-রমেশ, এই দেশেরই ছেলে-মেয়ে
লেখনীতে করতে খেলা নিরালাতে যাদের নিয়ে
মরেও মহেশ আজ মরেনি, গফুর চলে সহর-মাঝ
ধন্য হলাম পরশে যার, এই ত শরৎ-তীর্থরাজ!

নীলকুঠীর নয়না

শ্রীতারানাথ রায়

সতের

আজ চড়ক-সংক্রান্তি। জমিদার-বাড়ীর সামনের মাঠটায় আজ সকাল থেকে ভিড় জমছে।

কাল বাংলার নতুন বছর। আজ গেল-বছরের প্রায়শ্চিত্ত। আজ গেল-বছরের সর্ব্বপাপ-তাপকে শাস্তি দিয়ে তাড়ান। সর্ব্ব-পাপ গ্লানিমুক্ত হয়ে কাল নব জীবনের হাল-খাতা।

শিকারপুর, কেশবপুর প্রভৃতি নীলকুঠীর শ্বেতাঙ্গ ও কালা সাহেবদের ইষ্টার সানডের উৎসবও আজ। কুঠীতে-কুঠীতে তাদের নয়া পোষাকের আনাগোনা—তাদের দেশী বরকন্দাজ-চৌকীদারদের রাঙ্গা উর্দী আর পাকান-পাকান শিরস্ত্রাণের ও ঘষা-মাজা চাপরাসের অক্লান্ত ছুটাছুটি। ওদের হুজুরদের ঐশ্বর্য্য—গম্ভীর চাল-চালন হাল্কা করে দিচ্ছিল মিসিবাবাদের হাল্কা হাসি আর নগ্ন চাপল্য।

বাংলার প্রত্যেক হাটে আর গাঁয়ের মাঠে চড়ক-গাছ পোঁতা হয়েছে। খুঁটির মাথায় খাটান হয়েছে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশ। তা থেকে ঝুলছে চার, ছয়, আট-গাছি দড়ি। সমস্ত জাতের দুঃখ-তাপ আর পাপের ক্ষালনের জন্ত প্রতি গ্রামের বাছা-বাছা মানুষ এক মাস সন্ন্যাস করেছে, সংযম করেছে। তৈল-সম্পর্কশূন্য কেশরাশি এক মাসের অযত্নে গেরুয়ামণ্ডিত বীরদের শিরে মহাদেবের জটা-জিহ্বা লক্-লক্ করে উড়ছে। ভোর থেকেই ঢাকের বিচিত্র বাদ্যের ছন্দে পল্লী-জোয়ানরা তাল রেখে চলছে।

জমিদার-বাড়ীর সামনের মাঠটায় সন্তস্নাত সন্ন্যাসীরা চড়ক-গাছ বয়ে নিয়ে এল। সহসা বিশ জোড়া ঢাকের গুরু বাদ্যের সাথে সন্ন্যাসীরা কেশ দুলিয়ে-দুলিয়ে শিবোনৃত্য শুরু করে দিল। মা কালীর মুখোস-পরা এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ভর হল। চার দিক থেকে নর-নারী এসে তাদের সন্তানদের আর কন্যা-বধূর কল্যাণ কামনায় সেখানে এসে মানত করে দাঁড়াল।

দেখা গেল, এক জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত তেজস্বী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দেউড়ীর গা ঘেঁসে বাঘ-ছাল বিছিয়ে আসন করলেন। সবাই মনে করল স্বয়ং মহাদেব—বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন। সন্ন্যাসীকে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে ধ্বনি করল—'তোমার চরণে সেবা লাগে—হর-হর-মহাদেও।' উৎসাহে সন্ন্যাসীকে ঘিরে গাজনের ঢাকীরা তাণ্ডব নৃত্যের সাথে তাদের জয়ডঙ্কার ধ্বনিতে চার দিক কাঁপিয়ে তুলল।

কালীনাথ তখন তাঁর বিশ্রাম-কক্ষের ছাপড় খাটটিতে অঙ্গ এলিয়ে দিয়েছেন। খানসামা এসে হাত-পা টিপে দিচ্ছে। খাটের সংলগ্ন একটা জলচৌকীতে বসে অতিক্লান্ত বাগচী দুই হাতে অবনত মাথাটি ধরে কি যেন চিন্তা করছে। কোথা থেকে একটা কাৎরানি শব্দও ভেসে আসছে।

কক্ষটি ছাদ থেকে মেজে পর্য্যন্ত বিচিত্র শিল্প-খচিত লাল শালু দিয়ে মোড়া, মেজে থেকে দেয়ালের কিছু দূর মেটে খেড়্রার বেষ্টনী। সাদা মেজেতে ছক-কাটা সতরঞ্চ। ওপরে চন্দ্রাতপ ঢাকে রক্তনাভী রংএর কাপড়ের ঝালপরা। চার দিকে রং-বেরংএর রঙিন হাতি তিন শেকলের হার গলায় পরে ব'সেছে, জানালার স্থান-স্থানে কাচের গেলাসে দেয়াল-বাতী। চন্দ্রাতপের কেন্দ্র থেকে ঝোলে অতি বিচিত্র কাচের ঝাড়-লণ্ঠন।

সেই ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে চেয়ে থাকেন কালীনাথ, আর গড়গড়ী টেনে যান। যে খানসামা হাত-পা টিপে দিচ্ছিল তার একটু অসাবধানতায় কাঁধের আঘাতের জায়গায় অসহ্য যন্ত্রণাতেই কর্ত্তা মশাই ভয়ঙ্কর ধমক দিয়ে ওঠেন। খানসামা হতচকিত হয়ে হাত জোড় করে কুণ্ঠিত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়ে। কালীনাথ সস্নেহে তার দিকে একটু চেয়ে বলে—যা, গোপালকে ডেকে দে ত।

সে ডেকে দেয়। গোপালচাঁদ লাঠিতে ভর করে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে ঠোঁটে-মাথায় দেয়।

—বিলিসী ঘুমুচ্ছে?

—আর মাঝে-মাঝে চমকে উঠে কাঁদতে চাচ্ছে, পারছে না।

—হুঁ—বদ্যি এলো বলে, তুই ভয় পাস্ নে। একটু-একটু করে দুধ খাওয়াবি।

ও আবার চরণধূলি নিয়ে দাঁড়িয়ে কর্ত্তা বাবুর মুখের দিকে চায়। চোখ দু'টো ছল-ছল করে—

—কী রে! তুই যার ছেলে সে কি মরে?

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায় সন্তান।

কার্ত্তিক সর্দ্দার এসে খবর দেয় গোমেশ সাহেব দেখা করবে বলে এসেছে।

—গোমেশ?

বাগচী এতক্ষণ মাথা উঁচু করেনি। গোমেশের নাম শুনে সে মাথা তোলে। কালীনাথ বলেন—ডেকে আন্।

কালা ফিরিঙ্গী গোমেশ ধীরে-ধীরে ঘরে ঢোকে। হাত তুলে নমস্কার করে একটা জলচৌকীতে বসে। কালীনাথ একটু সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করেন—কি ব্যাপার সাহেব?

গোমেশ বলে—গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে। তারা ডিকের খোঁজ করছে?

কালীনাথ বললে—সাবাড় করে ফেলে দাও বাঁদরকে হাউলের জলে—পাত্তাও পাবে না।

গোমেশ বলে—দেউড়ীতে সন্ন্যেসী বসেছে—এবার ফরাজী ফকির নয়!

কালীনাথ বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। খানসামাটা ফিরিঙ্গীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাগচী চক্ষু বিস্ফারিত করে কণ্ঠ প্রসারিত করে।

—ফরাজী ফকির! তুমি জানলে কী করে?

বাগচী দাঁড়িয়ে উঠে ওর বাহু আকর্ষণ করে বলে—তা হলে তুমি জান সে কোথায়?

চক্ষু মিট মিট করতে-করতে মাথা ঝুঁকিয়ে গোমেশ বলে—তা জানি বৈ কি বাগচী বাবু…

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাগচী জিজ্ঞেস করে—বল কোথায়? বল।

—দেউড়ীতে সন্ন্যেসী হয়ে বসেছে! তুমি ঘাঁটিও না ওকে কর্ত্তা বাবু। ডিকের খোঁজে এসেছে। নজর রাখো—খালি নজর রাখ।

গোমেশ আসনে গিয়ে বসে। তার চোখে একটা পৈশাচিক দীপ্তি। চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে ওঠে।

বাগচীও তার আসনে গিয়ে বসে। ব'সে দেখে ভাবে। কালীনাথও ভাবেন।

হঠাৎ গোমেশ বলে—ছোট টমসনকে আমায় একটু দেবে কর্ত্তা বাবু? ও কাঁটা দিয়ে কাঁটা আমি তুলব, তুলে তোমার দুষমণ তোমায় ফিরিয়ে দেব—হলফ ক'রে বলছি ফিরিয়ে দেব।

কালীনাথ আহত কাঁধটাতে হাত বুলিয়ে আদর করতে-করতে চোখ দু'টো বুজে মৃদু মাথা নাড়েন। বলেন—কার্ত্তিক!

খানসামা কার্ত্তিককে ডেকে আনে। মস্ত একটা পাকা লাঠি দোরের বাইরে রেখে কার্ত্তিক এসে কর্ত্তার পদধূলি নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করে। ঘরে যে কেউ আছে এ সে খেয়ালই করে না।

—সায়েবটাকে হাজির কর।

গোমেশ মনে-মনে প্রস্তুত হয়। কি যেন একটা ঘটতে পারে মনে করে বাগচীও প্রস্তুত হয়। খানসামা ঘরের কোণের একটা ছোট চৌকী এনে খাটের ধারে রাখে।

পাঁচ মিনিটও দেরী হয় না। উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ কক্ষে প্রবেশ করে। কার্ত্তিক পেছনে। কক্ষের মানুষগুলোকে দেখে নেয় টমসন। কালা খৃষ্টানটার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে।

কালীনাথ নিজে উঠে ওর হাত ধরে চৌকীতে বসান, কুশল প্রশ্ন করেন।

ও কথা বলে না। কেবল জিজ্ঞেস করে—আমাকে নিয়ে কী করতে চাও তোমরা?

—তোমায় কেশবপুরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতে চাই, গোমেশ সঙ্গে যাবে···

গোমেশ বলে—হাঁ টমসন, তোমার বাবা চিন্তিত হয়েছেন, আর··· গোমেশ একটু ক্রূর হাসি হেসে বলে—বিশেষ করে মেরী গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তোমার কুঠীতে।

—মেরী?

—হাঁ বন্ধু, মেরী। ইয়ংএর মেরী—ডিকের মেরী···হয়ত হতে পারে তোমারও মেরী।

দেখতে-দেখতে মানুষটার আকৃতি যেন পশু হয়ে যায়। গোমেশ প্রচণ্ড বাহুটা আন্দোলিত করে বলে—তোমার মেরী, বুঝলে টমসন,···নয়নাকে খুন করে আশ্রয় নিয়েছে তোমারই ঘরে··· দেখবে চল!

কিন্তু কালীনাথ খালি ফরসী টেনে যান চোখ বুঁজে। বাগচী অলক্ষ্যে মৃদু হেসে খৃষ্টানটার মূর্খামি উপভোগ করে।

ফরসী টানতে-টানতেই কালীনাথ গোমেশকে বলেন—সায়েবকে তুমি অনুগ্রহ করে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দিলে আনন্দিত হব। তাঁকে বলো, রাস্তে ফরাজীদের হাতে পড়েছিল, আমরা উদ্ধার করেছি।—সেলাম সাহেব!

গোমেশ কর্ত্তা বাবুকে নমস্কার করে। হো-হো করে উৎকট হাসিতে জমিদার-বাড়ী কম্পিত করে টমসনকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাগচী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেউড়ী দিয়ে যেতে বারণ করে দেয়। কার্ত্তিক তাদের অন্য পথ দেখিয়ে দেয়।

সন্ন্যাসীর চার দিকে ক্রমে ভীড় জমে। ধবল কান্তি সৌম্য সন্ন্যাসী হাত নেড়ে সবাইকে সরে যেতে বলে।

চড়ক-গাছের চার দিকে তখন গাজন-সন্ন্যেসীরা মাতন লাগিয়েছে। ছেলের দল ঢাকের তালে-তালে নাচছে, আর সং-এর পেছনে-পেছনে ছুটছে। মাঝে-মাঝে সন্ন্যাসীদের চীৎকার —'শিবের চরণে সেবা লাগে হর-হর-মহাদে-এ-ব!'

গোমেশ পথে মেরীর সঙ্গে ডিকের নৈশ অভিসারের কথা—ডিকের অপহরণের কথা বলে। কাতলামারীতে মাতোয়'লা নারীর সঙ্গে রীডের মাতামাতির কথা একটু বিস্তার করেই বলে। বলে—"যদি বল, মেরী তোমারই হবে—রীডের নয়।"

টমসন কথা বলে না। কাছে একটা অশথ-তলায় চৈৎ-সংক্রান্তির মেলা বসেছে। দলে-দলে নরনারী মেলায় চলেছে। দূর থেকে শত-শত ভেঁপুর আওয়াজ, টুমটুমির বাজনা শোনা যাচ্ছে। পথের ধারে একটা ঘোড়া। সাহেবের জন্যে বাগচী পাঠিয়েছে। সইস ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল, সাহেব দেখে সেলাম ঠুকে বললে, হুজুরের জন্যেই সে অপেক্ষা করছে। টমসন ঘোড়ার মুখে মৃদু-মৃদু চাপড় দিয়ে আদর করে। অশ্ব একটু মাথা ঝুঁকিয়ে যেন অভিবাদন করে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে না, এগিয়ে চলে। সইস ঘোড়া নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চলে। টমসন একটু দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ গোমেশকে বলে—মেরীকে চাই-ই! দু'শো টাকা ইনাম!

কালা খৃষ্টান এক-গাল হেসে ফেলে মুক্তো-দন্ত প্রকটিত করে বলে—কিন্তু তোমার অতিথি রীড কি স্বার্থত্যাগ করবে তার বন্ধু-পুত্রের জন্যে। বেশ, তুমি তৈরী থেকো।

টমসন তড়াক করে ঘোড়ায় চড়ে বসে। হাত নেড়ে গোমেশকে অভিনন্দিত করে মৃদুগতিতে এগিয়ে যায়। গোমেশ তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। একবার তেমনি করে হেসে উঠতে চায়, হাসে না। নিভৃত স্থানে গিয়ে বেশ বদল করে মুকুন্দ সেজে গাজন সন্ন্যেসীর দলে ভীড়ে যায়। [ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

[এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিখ্যাত সুপণ্ডিত ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোদয়ের একখানি মূল পত্র মুদ্রিত করিলাম। পত্রটি তৎকালীন মুর্শিদাবাদস্থ কালেক্টর আর রিচার্ডসন সাহেবকে লেখা। পত্রটি বীরভূম, রতন লাইব্রেরী হইতে প্রেরিত হয়। পত্রটি ইংরাজী ১৮৫৩ সালের ৫ই জানুয়ারী লিখিত হয়।]

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা—

কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত প্রস্তাব লেবাননের সংশোধন প্রস্তাব অনুযায়ী সংশোধিত আকারে গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিণ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিরতির প্রশ্ন আলোচনার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট চীন সহ সপ্ত শক্তির সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য উত্থাপিত আরব-এশিয়া প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। গৃহীত মার্কিণ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য চেষ্টা করিতে পারস্য, কানাডা এবং ভারতকে লইয়া যে যুদ্ধ-বিরতি কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা গত ৩রা জানুয়ারী রাজনৈতিক কমিটিকে জানান যে, চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনীর অস্ত্র সম্বরণ সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আরও চেষ্টা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় রাজনৈতিক কমিটি যুদ্ধ-বিরতি কমিটিকে আরও সময় দিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত করা হয় ৫ই জানুয়ারী (১৯৫১) তারিখে এবং উহার পূর্ব্বদিন ৪ঠা জানুয়ারী হইতে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে গত ১১ই জানুয়ারী (১৯৫১) তারিখে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ কোরিয়া সমস্যা সম্পর্কে একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যদিও আলোচনার প্রথমে পিকিং গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার এবং পিকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন প্রদান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইয়াছিল, তথাপি সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের পরিধি যে আরও বিস্তৃত হইতে দেওয়া উচিত নয়, সে-সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই একমত হন এবং কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন।

সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে পঞ্চ দফা-সম্বলিত কমনওয়েলথ পরিকল্পনা গত ১৪ই জানুয়ারী (১৯৫১) রাজনৈতিক কমিটিতে ৫০—৭ ভোটে গৃহীত হয়। রুশ-ব্লকের পাঁচটি রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদী চীন এবং আলভাডর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। ফিলিপাইন এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল। এই পরিকল্পনা পিকিং গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু ১৭ই জানুয়ারী তারিখে পিকিং গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিয়া এক পাল্টা প্রস্তাব প্রেরণ করেন। অতঃপর ১৮ই জানুয়ারী রাজনৈতিক কমিটিতে এই প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইলে পিকিং গবর্ণমেণ্টের উত্তর বিবেচনা করিবার জন্য বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্স আরও সময় চাহে। এই দিন মার্কিণ প্রতিনিধি যদিও কোন প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই, তথাপি তাঁহার বক্তৃতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়। কম্যুনিষ্ট চীনকে আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসার সুযোগ দিবার জন্য এক দল আরব ও এশিয়ান রাষ্ট্র নূতন ফরমূলার সন্ধান করিতে থাকেন। ২০শে জানুয়ারী মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারেন অষ্টিন কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী অভিহিত করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গত ২৪শে জানুয়ারী আরব ও এশিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীভুক্ত ১২টি দেশের প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক কমিটিতে দ্বিতীয় দফার সংশোধিত পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য মিলিত হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট চীনের মনোভাবের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি বার্ত্তা ভারতীয় প্রতিনিধি দলের দপ্তরে পৌঁছে। ইহাকে চীনের নূতন প্রস্তাব বলিয়াও অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই প্রস্তাবটি আশ্বাসজনক বিবেচিত হওয়ায় আরব ও এশিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীভুক্ত আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, লেবানন, পাকিস্থান, সৌদী আরব, সিরিয়া এবং ইয়েমেন এই বারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মুখে কার্য্যতঃ নিম্নলিখিত তিনটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়:

(১) কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী-সম্বলিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব।

(২) আরব ও এশিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীভুক্ত বারটি দেশের অবিলম্বে চীনের সহিত সপ্তশক্তি-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব।

(৩) যুদ্ধ-বিরতির নূতন চেষ্টা চরম ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ স্থগিত রাখিতে ইসরাইলের প্রস্তাব।

উল্লিখিত প্রস্তাবত্রয় ব্যতীত কানাডার পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ লেষ্টার পিয়ার্সন 'specific programme for a negotiated

peace" শীর্ষক একটি পরিকল্পনা গঠন করেন। কিন্তু তিনি উহা রাজনৈতিক কমিটিতে উত্থাপন করেন নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পাঁচ দফা-সম্বলিত যুদ্ধ-বিরতি পরিকল্পনা (কমনওয়েলথ সম্মেলনে রচিত), চীন কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যানের কারণ, চীনের পাল্টা প্রস্তাব এবং তাহার নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিলে সুদূর প্রাচ্যের প্রকৃত সমস্যা কি, কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির অন্তরায় কি এবং কোথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই পরিচয়ের আলোকেই কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী অভিহিত করিয়া গৃহীত প্রস্তাবের তাৎপর্য্য আলোচনা করা আবশ্যক।

কমনওয়েলথ পরিকল্পনায় কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত পাঁচটি দফা আছে :—(১) অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে, (২) যথোপযুক্ত কিস্তিতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণ, (৩) স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন, (৪) যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে মতৈক্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত প্রধান সমস্যা সম্পর্কে মীমাংসার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়ার প্রতিনিধি লইয়া একটি উপযুক্ত কমিটি গঠন। কম্যুনিষ্ট চীন এই পরিকল্পনাকে গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, ইহাতে সত্যই বিস্ময়ের বিষয় কিছু আছে কি? এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চীনের প্রধান আপত্তিটি চীনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ চৌ-এন-লাই স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন। এই পরিকল্পনায় প্রথমেই যুদ্ধ-বিরতি দাবী করা হইয়াছে। চীনের পররাষ্ট্র-সচিব মনে করেন যে, কোরিয়ায় মার্কিণ সামরিক পরিস্থিতির উন্নতির সুবিধার জন্যই যুদ্ধ-বিরতির দাবী করা হইয়াছে। ইহা শুধু শ্বাস ফেলিবার জন্য সময় ও সুবিধা দাবী, আর কিছুই নয়! যুদ্ধ-বিরতির সুযোগে কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দিক হইতে যে-সুবিধা হইবে তাহার চাপ দিয়া আলাপ-আলোচনার সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দাবী আরও বর্দ্ধিত করিতে এবং শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হইলে এমন প্রবল ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিবে যে তাহার জয়লাভ হইবে সুনিশ্চিত। পিকিং গবর্ণমেণ্টের এইরূপ সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ যথেষ্টই আছে। উপযুক্ত পর্য্যায় বা কিস্তিতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের কথা আছে বটে, কিন্তু কবে সৈন্য অপসারণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহা কিছুই বলা হয় নাই। প্রতি পর্য্যায় বা কিস্তিতে কি পরিমাণ বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা হইবে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে এই সর্ত্তের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জয়লাভ করিলেও মার্কিণ সৈন্য চিরকাল কোরিয়ায় থাকিবে না, থাকিতে পারে না! ধীরে ধীরে এক দিন সমস্ত সৈন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কোরিয়া হইতে সরাইয়া লইতে হইবে। কাজেই কোরিয়ায় মার্কিণ বাহিনী যে-বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব যে একটা ফাঁদ, এ কথা কম্যুনিষ্ট চীনের মনে হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুদূর প্রাচ্যের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে চতুঃশক্তির একটি কমিটি গঠনের কথা পরিকল্পনায় আছে বটে, কিন্তু আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই। সুদূর প্রাচ্যের প্রধান সমস্যা কি কি, তাহারই আলোকে এই আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

কোরিয়া সমস্যাকে বাদ দিলে সুদূর প্রাচ্যের প্রধান সমস্যা দুইটি : (১) ফরমোসায় কম্যুনিষ্ট চীনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং (২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে জাতীয়তাবাদী চীনের পরিবর্ত্তে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদান। ধরিয়া লওয়া গেল যে, কম্যুনিষ্ট চীন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবে রাজী হইল এবং উল্লিখিত দুইটি সমস্যা সমাধানের জন্য চতুঃশক্তির প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল। এই কমিটিতে থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ, কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়া। আলোচনার সময় ফরমোসাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ট্রাষ্টিশিপের অধীনে রাখিবার প্রস্তাব আমেরিকা করিতে পারে এবং আমেরিকার চাপে বৃটিশকেও তাহাতে রাজী হইতে হইবে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়া তাহাতে রাজী হইবে না। সুতরাং এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসন প্রদান ব্যাপারেও অনুরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এই অচল অবস্থার পরিণাম কি হইবে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই অবসরের সুযোগে নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না কি?

কম্যুনিষ্ট চীনের পাল্টা প্রস্তাবকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত নেহরু পর্য্যন্ত খুব বেশী অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এই পাল্টা প্রস্তাবের মূল কথা হইল দুইটি। প্রথমতঃ, আলোচনা শেষ হওয়ার পরে নয়, আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ঐক্য কোরিয়া গঠন, ফরমোসায় চীনের অধিকার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনের আসন গ্রহণ এই আলাপ-আলোচনার বিষয় করা হয় নাই। ঐক্য কোরিয়া গঠন কোরিয়াবাসীদের নিজেদের ব্যাপার। চীন উহাকে আলোচনার বিষয় না করিয়া সঙ্গত কাজই করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন লাভ কম্যুনিষ্ট চীনের মৌলিক অধিকার বলিয়া উহাও আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। সপ্ত-শক্তির সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট চীন স্বতঃই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যে পরিণত হইবে। ফরমোসায় চীনের অধিকার কায়রো ঘোষণায় ভিত্তিতেই দাবী করা হইয়াছে। কাজেই উহাও আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং কম্যুনিষ্ট চীনের প্রস্তাব অনুযায়ী আলোচনার বিষয় ফরমোসা এবং ফরমোসা প্রণালী হইতে মার্কিণ সৈন্য ও নৌবহর অপসারণ এবং সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য সমস্যা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কমিটি গঠন ব্যাপারে চীনের পাল্টা প্রস্তাবের সহিত কমনওয়েলথ প্রস্তাবের পার্থক্য এই যে, কমনওয়েলথ প্রস্তাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়া এই চারিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া কমিটি গঠনের কথা আছে, চীনের পাল্টা প্রস্তাবে বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চ এবং ভারত ও মিশর এই সাতটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া কমিটি গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীন প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই সপ্ত-শক্তির বৈঠক হইবে চীনে। পরে কম্যুনিষ্ট চীন তাহার নূতন প্রস্তাবে এই দাবী পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সমস্যা সহজ হয় নাই। কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহা চায় এবং কম্যুনিষ্ট চীন যাহা চায় উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত তাহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের উপর চাপ দিবার

ক্ষমতাও যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত তাহাও অনস্বীকার্য্য। সুতরাং, কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া উত্থাপিত মার্কিণ প্রস্তাব পাশ হওয়া অপ্রত্যাশিত কিছুই ছিল না।

আরব ও এশিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বারটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব যেমন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া ভোটে দেওয়া হইয়াছিল, তেমনি মার্কিণ প্রস্তাবও বিভক্ত করিয়া ভোটে দেওয়া হয়। সমগ্র মার্কিণ প্রস্তাবের অনুকূলে ৪৪টি, বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। আটটি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে। নিম্নলিখিত সাতটি রাষ্ট্র মার্কিণ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিল—ব্রহ্মদেশ, বাইলো রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভারত, পোল্যাণ্ড, ইউক্রেন এবং সোভিয়েট রাশিয়া। নিম্নলিখিত বারটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই :—আফগানিস্থান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, সুইডেন, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং যুগোশ্লাভিয়া। সৌদী আরব আগা-গোড়াই মার্কিণ প্রস্তাবের ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগ দানে বিরত ছিল। মার্কিণ প্রস্তাবের যে অংশে কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয় সেই অংশ সম্পর্কে আফগানিস্থান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, সুইডেন, ইয়েমেন এবং যুগোশ্লাভিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ষাটটি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে কাহারা মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিল উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আরব ও এশিয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বারটি রাষ্ট্রের উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রথম অংশের অনুকূলে ভোট দিয়াছিল প্রস্তাবক বারটি রাষ্ট্র, রুশ-গ্রুপের পাঁচটি রাষ্ট্র এবং যুগোশ্লোভিয়া। অর্থাৎ উক্ত প্রস্তাবের প্রথম অংশের অনুকূলে ১৮টি ভোটের বেশী হয় নাই। বৃটেন, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইথিওপিয়া, আর্জ্জেণ্টিনা, ডেনমার্ক, ইসরাইল, লুক্সেমবুর্গ এবং মেক্সিকো এই ১৪টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত ছিল। বারটি রাষ্ট্রের উল্লিখিত প্রস্তাবের প্রস্তাবকদের মধ্যে ইরাকও এক জন। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হওয়ার পর ইরাক মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দেয়। লেবাননের সংশোধন প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার অজুহাতে বৃটেনও মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। লেবাননের সংশোধন প্রস্তাবে এমন কি আছে, যাহার জন্য বৃটেন মার্কিণ প্রস্তাব সমর্থন করিল? লেবানন দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। একটি সংশোধন প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের মনোভাব সম্বন্ধে 'অগ্রাহ্য করিয়াছে' (has rejected) এই বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে 'গ্রহণ করে নাই' (has not accepted) এই বাক্যাংশ বসাইবার কথা ছিল। দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাবে শুভেচ্ছা কমিটির প্রচেষ্টা সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে মনে করিলে 'কলেকটিভ মেজার কমিটি'কে তাঁহাদের রিপোর্ট স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গ্ল্যাডউইন মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিবার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়াছেন, "আমরা শুভেচ্ছা কমিটির কাজের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি।" কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিবার পর আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুত রাও-ও এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কানাডার প্রতিনিধি মিঃ পিয়ার্সন বলিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রস্তাবে চীনকে খুব নরম ভাষায় তিরস্কৃত করা হইয়াছে, এই অজুহাতে কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে আলোচনার পথ রুদ্ধ হইবে, এই মর্ম্মে রাজনৈতিক কমিটিতে তিনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার খেলাপ করিয়া মার্কিণ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তিরস্কার মৃদু হইয়াছে, না কঠোর হইয়াছে তাহা বিচার করিবে কম্যুনিষ্ট চীন, তিরস্কারকারিগণ নহেন। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-সচিব চৌ-এন-লাই এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, অধিকন্তু উহাকে সম্পূর্ণরূপে আইনবিরোধী এবং অসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট চীন যদি এই প্রস্তাবকে চীনের জনগণের গবর্ণমেন্টের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া মনে করে তাহা হইলে দোষের হয় না। এমন যে হইবে তাহা বৃটেন এবং কানাডার পক্ষে পূর্ব্বেই অনুমান করা কঠিন ছিল না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপ অগ্রাহ্য করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু শুভেচ্ছা কমিটি গঠন করাই কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত ভারত শুভেচ্ছা কমিটির সদস্য হইতে অস্বীকৃত হইয়াছে, কানাডাও রাজী হয় নাই।

মার্কিণী চাপ—

কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিবার প্রস্তাবের পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের উপর যে নানা ভাবেই যথেষ্ট চাপ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এ সম্পর্কে গত মাসের আলোচনাতেও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করিতে চীন রাজী না হইলে তাহার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাইশটি সদস্যের নিকট পত্র দিয়াছে এবং ত্রিশটি দেশের রাজধানীতেও যথেষ্ট চাপ দিতেছে। উক্ত ২২টি দেশ লাটিন আমেরিকার ২২টি রাষ্ট্র হওয়াই সম্ভব এবং ত্রিশটি দেশ যে কাহারা তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। এই চাপের ফলেই যে মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোটাধিক্য ঘটিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। মার্কিণ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে যথেষ্ট চাপ দিয়াছে, এই অভিযোগ সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ সারাপকিন গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে রাজনৈতিক কমিটিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, এই চাপ দিবার ফলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রস্তাবের অনুকূলে ভোটাধিক্য লাভ করিয়াছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুত রাও গত ২৬শে জানুয়ারী নিউ ইয়র্কে এক বিবৃতি বলিয়াছিলেন যে, যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহার জন্য ভয় বা অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রাখিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি দল সংগ্রাম করিয়া যাইবেনই। মার্কিণ প্রোগ্রেসিভ পার্টি মার্কিণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইবার জন্য অভিনন্দিত করিয়া শ্রীযুত বি, এন, রাওকে যে পত্র দেন তাহাতে মার্কিণ চাপের কথা খোলাখুলিই বলা হইয়াছে। উক্ত পত্রে আরও বলা

হইয়াছে, "মার্কিণ প্রতিনিধি যে-চাপ দিয়াছেন তাহাতেই অনেক দেশ নিজেদের বিশ্বাস ও স্বার্থের প্রতিকূলে হইলেও মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। আমরা এই চাপের নিন্দা করিতেছি।" আমেরিকার চাপেই যে বৃটেন মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। গত ২৩শে জানুয়ারী মিঃ এট্‌লী বলিয়াছিলেন যে, পিকিং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বশেষ যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু সাত দিন পরেই বৃটিশ প্রতিনিধি মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। ইহাদের ডিগবাজী খাওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

লাটিন আমেরিকার ২২টি রাষ্ট্র এবং কানাডার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মার্কিণ নির্দ্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া তাহাদের আর উপায় নাই। বৃটেন এবং পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খাওয়াইয়া-পরাইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে অর্থনৈতিক পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। সর্ব্বোপরি কম্যুনিজমের জুজু হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কেহ নাই। তুরস্ক এবং পারস্যকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিতেছে। ইসরাইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে এবং আরও পাওয়ার সম্ভাবনা। ফিলিপাইন তো কার্য্যত মার্কিণ উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমেরিকার নিকট হইতে তৈল বাবদে প্রিমিয়াম সৌদী আরবের প্রধান আয়। এই সকল বিবেচনা করিলেই মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া কিম্বা ভোট দিতে বিরত থাকার তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হয় না।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর—

মার্কিণ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তাৎপর্য্য ও উহার পরিণতি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মিশরের প্রতিনিধি মহম্মদ ফৌজী বলিয়াছেন যে, সাফল্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী যে বারটি রাষ্ট্র আলাপ আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন-সংখ্যা ৬০ কোটি। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'দি পিপল্‌স্ ডেইলী' লিখিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে অথবা ভোট দিতে বিরত ছিল, এইরূপ দেশগুলির অধিবাসী-সংখ্যা ৪০ কোটি। বস্তুতঃ যে সাতটি রাষ্ট্র মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে তাহাদের জন-সংখ্যা ৫৭ কোটিরও অধিক এবং যে-আটটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই তাহাদের জন-সংখ্যা ২১ কোটিরও বেশী। চুয়াল্লিশটি দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দিলেও তাহাদের জনসংখ্যা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদাতা সাতটি দেশ এবং ভোট দানে বিরত আটটি দেশ এই মোট ১৫টি দেশের জন-সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্য চীনের জন-সংখ্যা আমরা ইহার মধ্যে ধরিতে পারি না। কারণ, চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব করিতে অধিকারী নহেন এবং কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে স্থান পান নাই। সুতরাং গণতান্ত্রিক দিক্ হইতে ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিতে রাজী নয়। তা ছাড়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণও করিতে পারে না।

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রাও ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) তারিখে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করা সাধারণ পরিষদের পক্ষে সনদে বর্ণিত ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক মার্কিণ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলেও উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের পক্ষে বাধ্যকর নহে। তাহা হইলে মার্কিণ প্রস্তাবের ফল কি দাঁড়াইবে? আমেরিকা যদি চাপ দিয়া প্রস্তাব পাশ করাইতে পারে তাহা হইলে চাপ দিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করাইতে পারিবে কি না, ইহাই প্রশ্ন। প্রথম কথা এই যে, মার্কিণ প্রস্তাব অনুমোদন করা সাধারণ পরিষদের পক্ষে ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা মার্কিণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, গুডেল্ফা কমিটি গঠিত হইলেও উহাতে কোন ফল হইবে না। সুতরাং তৃতীয় বিশ্ব সংগ্রাম অদূর ভবিষ্যতে যদি আরম্ভ না-ও হয়, তাহা হইলেও কোরিয়ার যুদ্ধ আরও দীর্ঘকালের জন্য যে স্থায়ী হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। উহাই যে পরিণামে বিশ্ব-সংগ্রামে পরিণত হইবে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

কোরিয়ার যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার মূলে মার্কিণ শিল্পপতিদের স্বার্থ আছে। কোরিয়ার যুদ্ধ তাঁহাদের লাভের হারকে বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং মার্কিণ রাজনীতির উপর তাঁহাদেরই একাধিপত্য। কোরিয়ার যুদ্ধ যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিক লাভের উৎস শুকাইয়া যাইবে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে আমেরিকা কেন হস্তক্ষেপ করিয়াছে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিতেছে কেন, তাহাও ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। চীন-সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১০ কোটি অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। আমেরিকা সহ পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৫০ কোটির বেশী নয়। পশ্চিমী রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর এই জনসংখ্যার অল্পতা সত্ত্বেও মার্কিণ কূটনৈতিক নীতি এ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিয়াছে। কারণ, পশ্চিম-ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি মার্কিণ সাহায্য ছাড়া এশিয়া এবং আফ্রিকায় তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ। কিন্তু জনবলের সমস্যার সমাধান ইহাতে হইবে না। তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরও সাধারণ মানুষ যুদ্ধায়োজনের বিরোধী। সম্প্রতি আমেরিকা, বৃটেন এবং অষ্ট্রেলিয়ায় একই সঙ্গে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের যে বাহুল্য দেখা দিয়াছে তাহাকে কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনার ফল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মঘটকারীরা তাহা স্বীকার করে না। ধর্ম্মঘটের বিরোধীরা অবশ্যই বলিবেন যে, কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনা থাকুক আর নাই-ই থাকুক ধর্ম্মঘটের ফলে কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে। কথাটা এক দিক হইতে খুবই ঠিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে যুদ্ধের অনুকূল নয়, এই তিনটি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দেশের শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের যাহা কিছু ধাক্কা তাহা সাধারণ মানুষকেই সামলাইতে হয়। যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু ত্যাগস্বীকার করা প্রয়োজন, তাহার সবটা বোঝাই সাধারণ মানুষের ঘাড়ে আসিয়া চাপে। এই জন্যই সাধারণ মানুষের মন সংগ্রামমুখী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির সমস্যা—

কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫১ সালের মধ্যেই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু আমেরিকার চেষ্টা সত্ত্বেও সুদূর প্রাচ্য কমিশনের (Far Eastern Commission) পক্ষে শান্তি-চুক্তির সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ হইবে না। এমন কি অসম্ভবও হইতে পারে। জাপানের বিরুদ্ধে ৪৭টি রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এ কথা স্মরণ করিলেও জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের জটিলতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। চীনে যদি কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইত এবং দক্ষিণ-কোরিয়ায় যদি মার্কিণ তাঁবেদারী গবর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে জাপানের গুরুত্ব আমেরিকার কাছে কিছু কম হইতে পারিত। চীনে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় জাপানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানের উত্তরস্থ সোভিয়েট-অধিকৃত সাখালীন দ্বীপকে ঘাঁটি করিয়া কম্যুনিষ্টরা জাপানের ক্ষমতা দখল করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে পারে, এইরূপ একটা আশঙ্কাও গত আগষ্ট মাসে (১৯৫০) দেখা দিয়াছিল। কিন্তু জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণ লইয়া যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে মার্কিণ পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে রাশিয়ার উত্তর এবং আমেরিকার প্রত্যুত্তর হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৫০) মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে মার্কিণ পরিকল্পনা রুশ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঃ মালিকের হাতে প্রদান করেন। ২০শে নবেম্বর (১৯৫০) মার্কিণ পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এক লিপি মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন ডিসেম্বর মাসের (১৯৫০) শেষ ভাগে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। মার্কিণ পরিকল্পনা এবং তৎসম্পর্কে রাশিয়ার উত্তরের মধ্যে যে-সকল প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেগুলিকে চারিটি অংশে বিভক্ত করা যায়: (১) জাপানের সহিত স্বতন্ত্র শান্তি-চুক্তি সম্পাদন, (২) জাপানের দ্বীপ-সমূহ, (৩) জাপানকে অস্ত্র-সজ্জিত করা এবং (৪) শান্তি-চুক্তির পরেও জাপানে মার্কিণ সামরিক, নৌ এবং বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত থাকা। শেষোক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে মার্কিণ পরিকল্পনায় যে-প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে রাশিয়ার রাজী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। এই জন্তই মার্কিণ পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে কোনও রাষ্ট্র একক অন্যান্তদের শান্তিচুক্তি প্রচেষ্টায় বাধা স্থাপন করিতে পারিবে না। ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, রাশিয়াকে বাদ দিয়াই অন্যান্ত তাঁবেদার রাষ্ট্র লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার সুবিধা মত সর্ত্তে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতে চায়। রাশিয়া অবশ্য ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের যুদ্ধ ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারীদের কেহই জাপানের সহিত পৃথক্ সন্ধি স্থাপন করিতে পারিবে না। আমেরিকা তাহার উত্তরে বলিয়াছে যে, ঐ ঘোষণা শুধু জয়লাভ না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই বলবৎ ছিল।

পার্ল হারবার আক্রমণের সময়ে যে-সকল দ্বীপ জাপানের অধিকারে ছিল সেগুলিকে মোটামুটি চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (১) ফরমোসা এবং পেস্কাডোরেস। এই দুইটি দ্বীপ জাপান চীনের নিকট হইতে দখল করে এবং শিমোনোসেকি সন্ধির সর্ত্তানুসারে এই দুইটি দ্বীপে জাপানের অধিকার স্বীকৃত হয়। জাপান শেষোক্ত দ্বীপটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রুকু দ্বীপ রাখে। কায়রো এবং পটসডাম ঘোষণায় এই দুইটি দ্বীপ চীন পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মার্কিণ পরিকল্পনায় রুকু দ্বীপ সম্বন্ধে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ট্রাষ্টিশিপের অধীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন থাকিবে। ফরমোসা দ্বীপ সম্পর্কে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় এই দ্বীপের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে। এই ব্যাপারেও কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে এবং কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হইলেও সৃষ্টি হইবে অচল অবস্থা। তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব উঠিবে। রাশিয়ার তাহাতে রাজী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আমেরিকা অতি সহজেই তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবে। (২) কুরাইলস্ এবং সাখালিন দ্বীপ। পটসডাম চুক্তিতে দক্ষিণ-সাখালিন এবং কুরাইলস দ্বীপ রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপান দক্ষিণ-সাখালিন রাশিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। এই দুইটি দ্বীপ সম্বন্ধে মার্কিণ পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে পক্ষগণ যেরূপ স্থির করিবেন সেইরূপই হইবে। (৩) ১৯১৯ সালে জাপান মার্শাল, কেরোলাইন, পেলিউ এবং মেরিয়ান দ্বীপের উপর ম্যাণ্ডেট অধিকার প্রাপ্ত হয়। (৪) বোনিন দ্বীপপুঞ্জ। উহা জাপানের অঙ্গীভূত। উক্ত তৃতীয় দফা দ্বীপ সম্বন্ধে কায়রো ঘোষণা নীরব। বোনিন দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করিয়াছে যে, উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ট্রাষ্টিশিপের অধীনে আমেরিকার শাসনাধীনে থাকিবে। কিন্তু কায়রো সিদ্ধান্তে রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধেই ঘোষণা করা হইয়াছে।

জাপানকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে সুদূর প্রাচ্য কমিশনের ১৩টি দেশের মধ্যে ভারত, চীন, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং রাশিয়া সম্মত হইবে, ইহা আশা করা যায় না। পাকিস্থান কি করিবে তাহা অবশ্য অনুমান করা কঠিন। তবে আমেরিকার নেতৃত্বে বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা এবং হল্যাণ্ড যে রাজী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার নোটের উত্তরে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীতে দায়িত্বহীন সামরিক যুগের অবসান যখন এখনও হয় নাই, তখন ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিভূত নিরাপত্তার জন্ত জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্ত রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ইহা খুবই সঙ্গত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেও এইরূপ ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের উত্তরে আরও বলা হইয়াছে যে, এইরূপ ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্ত দেশেরও সৈন্যবাহিনী

জাপানে রক্ষিত হইতে পারে। পটসডাম চুক্তিতে ইহা সিদ্ধান্ত করা হয় যে, শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর জাপান হইতে দখলকার সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে। আমেরিকার কথা এই যে, শান্তি-চুক্তির পর সামরিক দখলের অবসান হইবে এ-কথা ঠিকই, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য জাপানে সৈন্য রাখা হইবে। সোজাসুজি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানে ঘাঁটি প্রদানের ব্যাপারে বাধা দেওয়া যাইতে পারিলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে খিড়কী-পথে আমেরিকা জাপানে তাহার ঘাঁটিগুলি রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রধান সমস্যা এই যে, উল্লিখিত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাগুলি শান্তি-চুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। অবশ্য রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনকে বাদ দিয়া জাপানের সহিত আমেরিকা যে স্বতন্ত্র শান্তি-চুক্তি করিতে পারিবে না তাহা নয়। বরং আমেরিকার অভিপ্রায়ও তাহাই। এরূপ ক্ষেত্রে ভারত, ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্থান কি করিবে এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়। বস্তুতঃ, জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির প্রশ্ন এশিয়ায় যে-সকল সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে এশিয়াবাসীর দিক হইতেই তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। এদিকে মার্কিণ ডুলেস মিশন জাপানে যাইয়া শান্তি আলোচনার প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির আলোচনায় রাশিয়া যোগদান করিবে না, এবং কম্যুনিষ্ট চীনকে এই আলোচনায় যোগ দান করিতে দেওয়া হইবে না, এইরূপ একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনকে বাদ দিলেও অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সহিত শান্তি-চুক্তির সর্ত্তাবলী লইয়া আমেরিকার মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা মার্কিণ গবর্ণমেণ্টও উপেক্ষা করিতে পারে না। এই মতভেদের মীমাংসা করিয়া শান্তি-চুক্তির খসড়া রচনা করাই ডুলেস মিশনের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ-সমস্যা—

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর সুদূর প্রাচ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে, না জার্ম্মাণ-সমস্যার উপর, এ কথা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। ব্রুসাল্‌স্ সম্মেলনে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বটে এবং জার্ম্মাণীর অস্ত্র-সম্রাট আলফ্রেড ক্রুপকেও ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫১) মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণীর সমস্যার কোন সমাধান এখনও হয় নাই। উত্তর-আটলাণ্টিক সৈন্যবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার জেনারেল আইসেনহাওয়ার গত ১লা ফেব্রুয়ারী পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপকে কম্যুনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার সহিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সম্পর্ক যে গুরুত্বপূর্ণ তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার প্রশ্ন পশ্চিম-জার্ম্মাণীর দৃষ্টিতে যে-ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনুয়ের যে-সকল দাবী করিয়াছেন, তন্মধ্যে পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশের ইউনিটের সহিত জার্ম্মাণ ইউনিট সমান হইবে এবং জেনারেল আইসেনহাওয়ারের ষ্টাফে সমান সংখ্যক জার্ম্মাণ অফিসার থাকিবে, ইহাই তাঁহার প্রধান দাবী। তিনি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে কম্যুনিষ্টদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করিতে চান, কিন্তু জার্ম্মাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিতে রাজী নহেন। এক দিকে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মধ্যেও অস্ত্রসজ্জার বিরোধী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে শতকরা ২৮ জন অস্ত্র ধারণ করিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে অস্ত্রধারণে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা কমিয়া শতকরা ১৪ জন হইয়াছে। তা ছাড়া পশ্চিম-জার্ম্মাণী এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার বিরুদ্ধেও জনমত গড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলির সহিত সমান রাজনৈতিক মর্য্যাদা লাভ না করা পর্য্যন্ত পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা হইবে না, জেঃ আইসেনহাওয়ারের এই ঘোষণায় জার্ম্মাণরা সন্তুষ্টই হইয়াছে। কিন্তু বিভক্ত জার্ম্মাণীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশ্নের সমাধান তাহাতে হয় নাই। জার্ম্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। একটি সশস্ত্র পন্থা, আর একটি পন্থা সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের অর্থাৎ আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সের আপোষ মীমাংসা। আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা কতটুকু তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার বিষয়টিও সোভিয়েট রাশিয়া প্রসন্নমনে দেখিবে, এরূপ আশা করাও অসম্ভব। শুধু রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা হইবে, জেঃ আইসেনহাওয়ারের এই যুক্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ার আশঙ্কা একটুকুও কমিবে না।

রাশিয়া জার্ম্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার বিরোধী, এ-কথাও সত্য নয়। কিছু দিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং রূঢ় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের অংশ রাশিয়া দাবী করিয়াছিল। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাহাতে রাজী হয় নাই। অতঃপর গত অক্টোবর (১৯৫০) প্রাগে রাশিয়া এবং ইউরোপস্থ রাশিয়ার মিত্ররাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র-সচিবদের এক সম্মেলন হয় এবং ঐ সম্মেলনে জার্ম্মাণ-সমস্যা সমাধানের জন্য চারি দফা সম্বলিত একটি পরিকল্পনা গঠিত হয়। অতঃপর গত ৪ঠা নবেম্বর (১৯৫০) রাশিয়া জার্ম্মাণ-সমস্যা সমাধানের জন্য চতুঃশক্তি সম্মেলনে সমবেত হইবার জন্য বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের নিকট পত্র দেয়। ২২শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহারা এই পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। এই উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দায়িত্ব রাশিয়ার এবং রাশিয়াই পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, পটসডাম চুক্তির ভিত্তিতে শুধু জার্ম্মাণ-সমস্যা আলোচনা করিয়া কিছু লাভ হইবে না; কারণ, ঘটনাবলীর অগ্রগতির ফলে ঐ চুক্তির কোন সার্থকতা আর নাই। তাঁহারা ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করিবার দাবী করেন। রাশিয়া এই উত্তরের প্রত্যুত্তর দেয় ২রা জানুয়ারী (১৯৫১) তারিখে। তাহাতে রাশিয়া জানায় যে, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জার্ম্মাণ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। তবে জার্ম্মাণী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাও আলোচনা করিতে রাশিয়া রাজী আছে। রাশিয়ার এই নোটের যে উত্তর পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় প্রদান করেন, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাশিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান

করিয়াছে। ঐ প্রত্যুত্তরের ফলে বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রাথমিক সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। সম্মেলন হইলেও উহার সাফল্য সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই।

আরব লীগ—

কায়রোতে আরব লীগের অধিবেশনে উহার রাজনৈতিক কমিটিতে গত ২৬শে জানুয়ারী সিরিয়া আরব রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি আরব রাষ্ট্র অথবা আরব ফেডারেশন গঠনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে, ইহা স্বীকার করা কঠিন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে ছয়টি রাষ্ট্র একটি পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। জর্ডান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা চুক্তি হইয়াছিল তাহারই পরিবর্ত্তে এই চুক্তি করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী চুক্তিতে জর্ডান ও ইরাক যোগদান করে নাই। বর্ত্তমান চুক্তিতে ইরাক যোগদান করিয়াছে। এই চুক্তিতে জর্ডানের আপত্তির কারণ এই যে, সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলিকে সমান পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এই চুক্তি করা হইয়াছে। ইয়েমেন, সৌদী আরব এবং লেবানন সামরিক দিক হইতে দুর্ব্বল বলিয়া মিশর অথবা ইরাক উহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিবে।

ইসরাইলকে বাদ দিয়া মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তেমনি বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যই এই নিরাপত্তার প্রধান ভরসা। অবশ্য বৃটেন ও আমেরিকা এ সম্পর্কে উদাসীন তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। মধ্য-প্রাচ্য যাহাতে রাশিয়ার প্রভাবাধীনে যাইতে না পারে তাহার জন্য সর্ব্বদাই তাহারা সজাগ রহিয়াছে।

তিব্বতে কি হইতেছে—

তিব্বত অভিযান সম্পর্কে কোন সংবাদই আর এখন পাওয়া যাইতেছে না। প্রায় চারি মাস হইল তিব্বত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি অভিযাত্রী বাহিনী পূর্ব্ব-তিব্বতের খাম প্রদেশ দখল করিয়াছে। অতঃপর লারিগুও নামক সহরটির পশ্চিমে তাহারা আর অগ্রসর হয় নাই। এই সহরটি লাসা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিব্বত গবর্ণমেণ্টের বাহিনী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া অভিযান মন্থর-গতি লাভ করিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, গত নবেম্বর মাসে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক দলাই লামা স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করায় তিব্বতী জনগণের অপ্রিয়ভাজন রিজেন্সী শাসনের অবসান হইয়াছে। পিকিং গবর্ণমেণ্ট না কি দলাই লামার সহিত একটা আপোষ মীমাংসার জন্য এক প্রতিনিধি দল লাসায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। দলাই লামা স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিলেও স্বাধীন ভাবে তিনি কতটুকু কাজ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! তিনি নিজেই লাসা পরিত্যাগ করিয়া যাতুংএ আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। মন্ত্রীদের পরামর্শেই যে তিনি লাসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিষ্ট আক্রমণের ফলে তাঁহার ভারতে আগমনের পথ যাহাতে রুদ্ধ না হয় সেই জন্যই তাঁহাকে লাসা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মন্ত্রীরা দলাই লামার জন্য যত না হউক, নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালের গৃহবিবাদের সময় তাঁহারা যাঁহাদের উপর কঠোর অত্যাচার করিয়াছেন তাঁহারা উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, এই আশঙ্কা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যে তিব্বতী মন্ত্রী চামদোতে পূর্ব্ব অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি কম্যুনিষ্টদের হাতে বন্দী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি না কি দলাই লামার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, বাধাদানের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ হইবে না। পিকিংয়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আপোষ মীমাংসার জন্য এখন আর পিকিংএ যাইবার প্রয়োজনও নাই। তিব্বতে বসিয়াই আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। দলাই লামা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহার কোন উত্তর না কি এখনও পাওয়া যায় নাই। কম্যুনিষ্ট চীন কিন্তু তিব্বতে উহা অপেক্ষাও ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। হয়ত প্রচণ্ড শীত এবং আপোষের চেষ্টার জন্য অভিযানের অগ্রগতি বন্ধ রাখা হইয়াছে।

নেপালের অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট—

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৫১) নেপালের প্রধান মন্ত্রী শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব ঘোষণা করার পর নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা নেপাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নেপালে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৈরলা শ্রীযুত নেহরুর নিকট চারি দফা প্রস্তাব পেশ করেন এবং নেপাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন করার অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। শ্রীযুত কৈরলা নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব করেন:—(১) অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভার সাত জন জন-প্রতিনিধি মন্ত্রীর সকলেই কংগ্রেস মনোনীত হইবেন, (২) গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি তাঁহাদের হাতে থাকিবে, (৩) পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভা রাজার নিকট দায়ী থাকিবেন এবং (৪) শাসন-সংস্কার রাজা কর্ত্তৃক ঘোষিত হইবে। এই দাবীর ভিত্তিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট, নেপাল গবর্ণমেণ্ট এবং নেপাল কংগ্রেসের মধ্যে নয়া দিল্লীতে যে-আলোচনা আরম্ভ হয় তাহার ফল ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়। আলোচনায় স্থির হয় যে, নেপালের অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভা ১৪ জনের পরিবর্ত্তে ১০ জন লইয়া গঠিত হইবে, তন্মধ্যে ৫ জন হইবেন জন-প্রতিনিধি। দশ জন মন্ত্রীর মধ্যে এই পাঁচ জন জন-প্রতিনিধি মন্ত্রী হইবেন:—(১) শ্রীগণেশ মান সিংহ (জেলে আছেন), (২) শ্রী বি, পি, কৈরলা, (৩) জেনারেল সুবর্ণ সমশের, (নেপালী কংগ্রেস বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক), (৪) শ্রীভদ্রকালী মিশ্র এবং (৫) শ্রীভারত মান শর্ম্মা। রাণা-গোষ্ঠী হইতে এই ৫ জন মন্ত্রী হইবেন:—(১) জেনারেল মোহন সমশের (বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী), (২) জেনারেল কাইজার, (৩) জেনারেল বাবর, (৪) মেজর নৃপ জঙ্গ রাণা, এবং (৫) কর্ণেল যোগ্যবাহাদুর বুসনায়েট। দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে না কি এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, যানবাহন ও বনবিভাগ জন-প্রতিনিধি মন্ত্রীদের হাতে থাকিবে। শ্রী বি, পি, কৈরলা স্বরাষ্ট্র-সচিব এবং জেনারেল সুবর্ণ সমশের অর্থ-সচিব হইবেন, বলিয়া প্রকাশ। রাণা-গোষ্ঠীদের হাতে থাকিবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তর।

হইয়াছে তাহার উত্তরে আইন-সচিব বলেন, ইহা অত্যন্ত বিলম্বে বলা হইয়াছে। সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বলা যায়, কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মেরই একটি সুসংহত আইনগত কাঠামো ছিল। বৌদ্ধ অথবা শিখ-গুরুরা এই কাঠামো অপরিবর্ত্তিত রাখেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ভারতে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইলেও আইনের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৩০ সালে প্রিভি-কাউন্সিলের রায়ে বলা হইয়াছে যে, শিখেরা হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত। শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের ক্ষেত্রে হিন্দু কোডের প্রয়োগ এক ঐতিহাসিক পরিণতি। আইন-সচিব বলেন যে, হিন্দু কোড সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য হইবে অথবা মোটেই হইবে না। আমেদাবাদে এক মহিলাদের সভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতীয় সংসদের অধিবেশনে হিন্দু কোড বিলটি গৃহীত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু কোড বিলটি কিছু বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা নয়—বিরোধমূলক অনেক ধারাই এই বিলটি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সমাজ-সংস্কারক কোন কোন বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে মহিলাদের নিজেদেরই আন্দোলন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নেহরু বলেন যে, আজিকার এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন দেশ ইচ্ছা করিলেও পরিবর্ত্তনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। তিনি বলেন যে, কয়েক জন সদস্য বিলটির তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন। পুরাতন হিন্দু আদর্শের তুলনাহীনতা সম্পর্কে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, এই বিরোধিতার কোন যুক্তি তিনি খুঁজিয়া পান না। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন আছে। পরিবর্ত্তন মানিয়া না লইলে ধ্বংস অনিবার্য্য।

হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রবল জনমত রহিয়াছে। সুতরাং তাড়াহুড়া করিয়া হিন্দু কোড বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হইবার বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘোর আপত্তি আছে।

খাদ্য রেশন

ভারত সরকারের খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী সারা ভারতে রেশনের পরিমাণ চার ভাগের এক ভাগ হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ বৎসর খাদ্যের অবস্থা ভাল নয়, অবশ্য আগামী তিন মাসের মধ্যে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল না দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত হইয়াছেন। দেশের সমস্ত প্রদেশেই রেশনের পরিমাণ সমভাবে ১২ আউন্স হইতে হ্রাস হইয়া ৯ আউন্স হইয়াছে। শ্রীমুন্সী বলেন, দেশে বর্ত্তমানে যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইতেছে তাহার অধিকাংশই চাউল। দেশে মজুত গম ও জোয়ারের পরিমাণ খুবই কম। আগামী দুই মাসে যে পরিমাণ গম ও জোয়ার আমদানী হইবে তদ্দ্বারা ঘাটতি পূরণ সম্ভবপর নয়। কাজেই খাদ্যশস্যের পরিমাণ যদি হ্রাস করা না হয় তাহা হইলে মজুত খাদ্য শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে এবং জুলাই হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশে গুরুতর খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ

রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রদেশের সঙ্কটজনক খাদ্য-পরিস্থিতি, দিল্লী চুক্তির ফলাফল এবং উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা, কৃষি ও খাদ্যনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করেন। দিল্লী চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন, পশ্চিম-বঙ্গে আগত ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ১২ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। অনুরূপ ভাবে ১১ লক্ষ মুসলমান বাস্তুত্যাগীর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সাড়ে ৭ লক্ষ পশ্চিম-বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ নরনারীর পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ কাটজু পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্কটজনক খাদ্য-পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার খাদ্য সংগ্রহের কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ডাঃ কাটজু কৃষকদের আহ্বান করিয়া জানান যে, দেশ যে গুরুতর খাদ্যসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সমাধানকল্পে সমবায় প্রচেষ্টায় অধিকতর উদ্যোগ ও উৎসাহ লইয়া কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। অনধিকারীদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত যে বিল বর্ত্তমান অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইবে সে সম্পর্কে রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবন ও সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময় অস্বাভাবিক ও জটিল ইহাও ঠিক। অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা না করিয়া এই সকল দখলকারীদের স্থানচ্যুত করা হইলে তাহারা অসীম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইবে। সকল দিক্ হইতে বিবেচনার পর সরকার এ বিষয়ে এই অধিবেশনেই বিল উত্থাপন করিবেন।

চন্দননগরের হস্তান্তর

চন্দননগরের আইনতঃ ভারতে হস্তান্তর স্বীকৃতি পূর্ব্বক প্যারিসে ২রা ফেব্রুয়ারী ফরাসী ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রদূত সর্দ্দার হরদিৎ সিং মালিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চুক্তির প্রধান বিষয়গুলি হইল এই যে, ফ্রান্স পূর্ণ সার্ব্বভৌমত্ব সহ চন্দননগর সহরটি ভারতের হস্তে হস্তান্তরিত করিল। ফরাসী প্রজাবৃন্দ ও চন্দননগরের অধিবাসী ফরাসী ইউনিয়নের নাগরিকগণ এই চুক্তিটি বলবৎ হইলে পর সত্যই ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। তবে যাঁহারা ফরাসী নাগরিক থাকিতে চান তাঁহাদিগকে ছয় মাসের মধ্যে ঐ কথা জানাইতে হইবে। তাহা ছাড়া, ঐ সব ব্যক্তি তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি যে কোন ফরাসী রাজ্যে তাঁহারা স্থায়িভাবে বাস করিতে ইচ্ছুক, সেখানে স্থানান্তরিত করার জন্য উপযুক্ত ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে ভারত সরকার উহা স্থানান্তরিত করিবার অনুমতিও প্রদান করিবেন। চন্দননগরের যে সব সম্পত্তির মালিক গভর্ণমেণ্ট, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সে সবই ভারত সরকারকে হস্তান্তরিত করিবেন। চন্দননগরের শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে জনমতানুযায়ী ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এই কৃত কার্য্যের ফলে ভারত সরকার উহার যাবতীয় অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী হইবেন। বৈষয়িক ও টাকা-কড়ি সংক্রান্ত যে সব সমস্যা এই হস্তান্তরের ফলে দেখা দিবে তাহার

ব্যবস্থা ভারতের ও ফ্রান্সের একটি যুক্ত কমিশন করিবে। উক্ত কমিশনটি গঠিত হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশ সমূহ উভয় গভর্ণমেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ হইবে। সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্যাপূর্ণ পুস্তকাবলী ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ফরাসী গভর্ণমেন্ট অন্যত্র হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, তবে চন্দননগরের স্থানীয় প্রয়োজনে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ভারত সরকারের নিকটই থাকিবে। ভারত সরকার চন্দননগরে ফরাসী কৃষ্টির ধারা জনমতানুসারে বজায় রাখিতে সাহায্য করিবেন। ফরাসী গভর্ণমেন্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করিতে বা উহা বজায় রাখিতে চাহিলে তাহা করিতে দেওয়া হইবে। ভারতীয় ও ফরাসী পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক চুক্তি অনুমোদিত হইবার পর হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে। চুক্তির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন মতভেদের মীমাংসা কূটনৈতিক আলোচনা দ্বারা না হইলে তাহা আন্তর্জ্জাতিক আদালতে উত্থাপন করা যাইবে।

—

নেতাজীর জন্মোৎসব

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫৫তম জন্মোৎসব সারা ভারতে বিপুল উদ্দীপনার মধ্য ও নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন সভায় বহু বক্তা নেতাজীর প্রতি, দেশের জন্য তাঁহার মহান ত্যাগ-স্বীকার এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অপূর্ব্ব নেতৃত্বের জন্য অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির পরিচালনায় দেশবন্ধু পার্ক হইতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া হাজরা পার্কে গমন করে। কেন্দ্রীয় সংযোগ কমিটির উদ্যোগে অপরাহ্নে কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত দশ লক্ষাধিক জনতার এক বিরাট সভায় নেতাজীর অগ্রজ পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। অভিভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু বলেন—"আপনাদের নেতাজী আমার পুত্র নহেন কিন্তু পুত্রের চেয়েও তিনি আমার প্রিয়। সেই পুত্রাধিক প্রিয় আজ সমগ্র দেশেরই পরম প্রিয় হইয়াছেন—জাতির পরম গর্ব্বের বস্তু হইয়াছেন। নেতাজীর জন্মদিবস আজ সমগ্র জাতির জীবনপঞ্জিতে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। আজ হয়তো এই কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার জন্মক্ষণে সমগ্র জাতিরই জন্য জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। দেশের ইতিহাসে কি তাঁহার দান, কোথায় তাঁহার স্থান সে বিচার আমার নয়। আমি শুধু জানি যে, তিনি মহাভারতের যথা ক্ষত্রিয়—তিনি জাতির পৌরুষের প্রতীক। তিনি সারা জীবন এই মন্ত্রই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগুক সকল দেশ।" নেতাজী আমাদের ঐক্য, আস্থা ও ত্যাগস্বীকারের শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই শুধু আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে পারি। ভারতবাসীর প্রিয়তম নেতাজী ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের মূর্ত্ত বিগ্রহ ও স্বাধীনতা-যজ্ঞের অগ্নিহোত্রী ঋষিরূপে চিরদিন ভারতবাসীর অন্তরে বিরাজমান থাকিবেন।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বদেশী যুগের জননায়ক শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী আর ইহজগতে নাই। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ৮১ বৎসর বয়সে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অপূর্ব্ব তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী নেতা ছিলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হইলেও তাঁহার অভাব বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্যালকাটা উইকলী নোটসের' সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সভাপতি এবং বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র পাবনা জেলার হরিপুরের প্রসিদ্ধ চৌধুরী-পরিবারের সন্তান। বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরী ও বিখ্যাত শিকারী কে, এন, চৌধুরী যে-বংশ অলঙ্কৃত করেন, সেই বংশের অন্যতম কুলপ্রদীপ ছিলেন যোগেশচন্দ্র। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের যুগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মিরূপে তিনি বাঙ্গালীর নব জাগরণ আনয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন। নূতন বঙ্গ রচনায় যাঁহাদের দান অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিবে যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা। তিনি মৃত্যুকালে পত্নী শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবী ও একমাত্র পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীআর, চৌধুরী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীএ, ভি, ঠক্কর ভবনগরে ১৯শে জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। সমাজসেবা তিনি তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠক্কর বাপার মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

—

গভীর দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, উত্তর-বঙ্গের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় দীর্ঘকাল দুরারোগ্য রোগভোগের পর কলিকাতায় স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী ও সমাজসেবীর তিরোধান হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
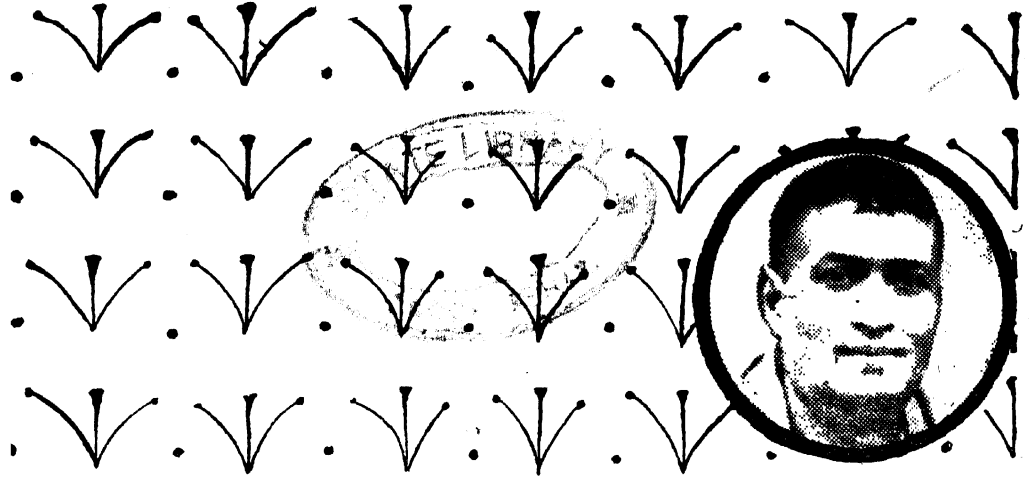
২৯শ বর্ষ ঃ ফাল্গুন ১৩৫৭] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [২য় খণ্ড ঃ ৫ম সংখ্যা

যু গ বা ণী

[বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন।]

নরেন্দ্র। এক দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন্দ্র বাবু ও গিরীশ বাবুকে আমার বিষয় বলছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না।'

মাষ্টার। হাঁ শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেক বার বলেছেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল; না?

নরেন্দ্র। সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে এই অবস্থাটি হ'ল। আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, আমার কি হ'ল! বুড়ো গোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, নরেন্দ্র কাঁদছে।

তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল।'—আমি বললাম, আমার কি হ'ল!

তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি।

এক দিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কৃষ্ণকে হৃদয় মধ্যে দেখতে পাস। আমি বললাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না।

(মাষ্টার ও নরেন্দ্রর হাস্য)

আর একটা দেখেছি, এক একটি জায়গা, জিনিষ বা মানুষ দেখলে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা। Amherst Streetএ যখন শরতের বাড়ীতে গেলাম, শরতকে একবারে বললাম, ঐ বাড়ী যেন আমার সব জানা! বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

আমি নিজের মতে কাজ করতাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বলতেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের Member হয়েছিলাম, জানেন তো?

মাষ্টার। হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র। তিনি জানিতেন, ওখানে মেয়ে মানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায়

না ; তাই নিন্দা করিতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না। এক দিন শুধু বললেন, রাখালকে ও' সব কথা কিছু বলিসনি, যে তুমি সমাজের Member হয়েছিস। ওরও, তা, হলে, হতে ইচ্ছা যাবে।

মাষ্টার। তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই

নরেন্দ্র। অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, আপনি দুঃখ কষ্ট পান নাই তাই ;—মানি দুঃখ কষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute Dependence on God. আচ্ছা, * * এত নম্র ও নিরহঙ্কার ; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয় ?

মাষ্টার। তিনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধে,—এ 'অহং' কার ?

নরেন্দ্র। এর মানে কি ?

মাষ্টার। অর্থাৎ রাধিকাকে এক জন সখী বলছেন, তোর অহঙ্কার হয়েছে—তাই কৃষ্ণকে অপমান করিলি। আর এক সখী তার উত্তর দিচ্ছিল, হাঁ, অহঙ্কার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ 'অহং' কার ? অর্থাৎ, কৃষ্ণ আমার পতি,—এই অহংকার ;—কৃষ্ণই এ 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই,—ঈশ্বরই এই অহঙ্কার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন ; অনেক কাজ করি'য় নেবেন এই জন্য।

নরেন্দ্র। কিন্তু আমি হাঁকডেকে বলে আমার দুঃখ নাই।

মাষ্টার। (সহাস্যে) তবে সখ করে হাঁকডাক করো। (উভয়ের হাস্য)

নরেন্দ্র। তিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'দ্বারে ঘা দিচ্ছে।'

মাষ্টার। অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্যামপুকুর বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে!' তুমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলে।

নরেন্দ্র। দেবেন্দ্র বাবু, রাম বাবু, এরা সব সংসার ত্যাগ করবে—খুব চেষ্টা করছে। রাম বাবু privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। দুই বছর পরে ? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হ'লে বুঝি ?

নরেন্দ্র। আর ও বাড়ীটা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ী কিনবে। মেয়ের বিয়ে-টিয়ে ওরা বুঝবে।

মাষ্টার। গোপালের বেশ অবস্থা ; না ?

নরেন্দ্র। কি অবস্থা !

মাষ্টার। এত ভাব, হরিনামে অশ্রু রোমাঞ্চ !

নরেন্দ্র। ভাব হলেই কি বড়লোক হয়ে গেল ! কালী, শরৎ, শশী, সারদা এরা—গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ ?

মাষ্টার। তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র। কি দেখেছেন ?

মাষ্টার। যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাইরে এসে এক দিন দেখলাম—গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারাণ্ডাটি আছে, তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল শুরকির রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হ'ল যেন,—গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র। আমি দেখি নাই।

মাষ্টার। আর মাঝে মাঝে বলতেন, ওর পরমহংস অবস্থা। তবে এ-ও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাকে মেয়েমানুষ ভক্তদের কাছে আনাগোণা করতে বারণ করেছিলেন। অনেক বার সাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র। আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,—ওর যদি পরমহংস অবস্থা তবে টাকা কেন ? আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নহে। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্ব্বদা আসবে।' তাই ত—বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকতে বলে ; আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না।

আমায় বলেছিলেন গোপাল সিদ্ধ—হঠাৎ সিদ্ধ ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হতো, ওকে দেখবার জন্য আমি কাঁদি নাই কেন ? কেউ কেউ ওকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কত বার বলেছেন, আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন!

আঁদ্রে জিদের জার্ণালের কয়েক পাতা

[গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের মৃত্যু হয়েছে। ১৮৬৯ সালের ২১শে নভেম্বর প্যারিসে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতামাতা খুব ধর্মভীরু লোক ছিলেন, ফলে বাল্য ও কৈশোর জিদকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে কাটাতে হয়। যৌবনে যখন তিনি স্বাধীন হলেন তখন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে ধর্মীয় অনুশাসন তাঁর মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তা থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। ফলে জিদের মধ্যে দুইটি লোক কাজ করতে থাকে। একটি স্বাভাবিক জিদ, আর একটি অস্বাভাবিক জিদ। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়। জিদের লেখার মধ্যে সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা ও আত্মোপলব্ধির সমস্যাই মূল কথা। তাঁকে মর‍্যালিষ্ট দার্শনিক বলা যায়। তিনি বলেন, অনুভূতির মধ্য দিয়ে সাত্যকারের জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়। অতীত জীবন থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে ফুটে উঠেছিলো স্বাধীনতার সুর। এতে অনেকে ভেবেছিলেন যে, তিনি নিকৃষ্টতম বৃত্তিসমূহের চরিতার্থতায় উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার মধ্যেও আত্মোন্নতি সাধনের ফল্গু-প্রবাহ বয়ে চলেছে। তিনি লিখেছেন, "আমার লেখাকে এচিলিসের বর্শার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এর প্রথম সংস্পর্শে যারা আহত হয়, দ্বিতীয় সংস্পর্শ তাদের নিরাময় করে। ১৯৩০ সালের ডায়রীতে তিনি লেখেন, "মানুষকে যা খাঁটি মানুষ হতে দেয় না, তার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে যে বাধা দেয়, তার সঙ্গে মানুষের বিরোধের বর্ণনাতেই আমার আনন্দ। প্রায়শঃই এই বাধা মানুষের নিজের মধ্য থেকেই আসে।" স্বাধীনতার জন্ম তাঁর উদ্বেগ তাঁকে নির্য্যাতিতের বন্ধু করে তোলে। মানবতার মূল সমস্যার তিনি সমাধান খুঁজেছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক তিনি বরাবর আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর ডায়রীতে বার বার লিখেছেন, কেহ যেন তাঁর লেখা পড়ে ভুল না বোঝে। প্রথম দিকে তিনি সোভিয়েট রুশিয়ার প্রশংসা ক'রে কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রুশিয়া ভ্রমণ করে আসার পর তিনি তাঁর মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন। যখন তাঁর বয়স ১৮।১৯ বছর তখন থেকেই তিনি ডায়রী লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯৩১ সালের ডায়রীতে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই লেখাগুলি তাঁর লেখা বই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে। শেষ দিকের ডায়রীগুলি প্রধানতঃ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ। ১৮৮৯ সালে ডায়রী লেখা আরম্ভ করলেও বহু পরে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভের পর তিনি তা প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর ইংরাজী অনুবাদ থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আঁদ্রে জিদের প্রথম দিকের লেখা ডায়রীর কয়েকটি পাতা এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। তর্জ্জমা করেছেন শ্রীহরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।]

নবেম্বর, ১৮৯০

এই ডায়রীতে ঐকান্তিকতার সঙ্গে কিছু লিখতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাকে আমার মস্তিষ্কের চিন্তার জটগুলি খুলে ফেলতে হবে। মাথায় যে সব চিন্তা ভিড় করে রয়েছে, সেগুলি থেকে মুক্ত হতে হলে এমন কয়েক ঘণ্টা সময় দরকার, যে সময় হাতে কোন কাজ থাকবে না, যে সময় সদ-সর্ব্বদা পুনর্জাগরিত ঔৎসুক্যগুলি নীরব থাকবে এবং যে সময় নিজেকে পুনরায় নূতন ক'রে আবিষ্কার করাই হবে আমার একমাত্র কাজ।

১০ই জুন, ১৮৯১

আমার কাছে এই বিশ্ব ঠিক যেন একখানি আয়না এবং এর মধ্যে যখন আমি আমার কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখি, তখন আমি বিস্মিত হই।

কোন লোক যদি অবিরাম কেবল একটি বস্তুর প্রার্থনা করে, তবে তা নিশ্চিত তার করায়ত্ত হয়। কিন্তু আমি চাই সব, ফলে পাই না কিছুই। প্রত্যেক বারই আমি দেখি যে, যখন প্রার্থিত বস্তু আমার কাছে এসেছে, তখন আমি ছুটে চলেছি অন্যের পিছনে।

২২শে জুলাই

মেটারলিঙ্ক তাঁর লেখা বই "দি সেভেন প্রিন্সেসেস" (১৮৯১) পড়ে শোনালেন। মেটারলিঙ্কের ক্ষমতা প্রশংসনীয়।

ছানগ্রোটোস

এই মাত্র "ওয়ার এণ্ড পীস" বইখানি শেষ করলাম। ভ্রমণে বার হবার দিন আরম্ভ করেছিলাম আর ভ্রমণের শেষ দিনে পড়াও শেষ হলো। পড়ার মধ্যে এমন ভাবে ডুবে যেতে এর আগে কখনো পারিনি। বস্তুতঃ আমি কখনো ভ্রমণ করিনি। সেদিন বিখ্যাত গ্রোটোসের মধ্যে বেড়াবার সময় চার পাশে তাকাতে পর্য্যন্ত পারিনি। আমি শোপেনহাওয়ারের কথা ভাবছিলাম। তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে আমার জন্ম অপেক্ষা করছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে গিয়ে পড়ার ব্যাঘাত হওয়ায় বিরক্তি বোধ হলো।

কিন্তু পরে এই সব দৃশ্য থেকে আমি কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৃশ্য নিজের মত করে রচনা করি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

একটি শব্দ বা একটি নাম পর্য্যন্ত মাথায় আসছে না। বড় একঘেয়ে লাগছে। অর্দ্ধেক দিন লক্ষ্যহীন ভাবে কয়েকটা অকিঞ্চিৎকর অনুভূতি নিয়ে সময় কাটালাম। মনের যেন জোর নেই আর তার জন্ম লজ্জা বোধও নেই।

৮ই অক্টোবর

মাসাধিক কাল কিছু লেখা হয়নি। নিজের কথা বলতে বিরক্তি বোধ হয়। সচেতন, ইচ্ছাকৃত ও কষ্টদায়ক আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের সময় ডায়রীর প্রয়োজন হয়। তখনই লোকে জানতে চায়, সে আছে কোথায়। কিন্তু এখন আমি যা বলবো, তা নিজের তন্ত্রীতে ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মনে, যখন কল্পনার উদয় হয়, তখন ডায়রী লিখতে খুব ভাল লাগে।

মনে এখন অনেক কল্পনার উদয় হয়েছে। এখন আর নিজের সম্বন্ধে লেখার কোন প্রয়োজন নেই।

৩১শে ডিসেম্বর

লেখবার সময় ঐকান্তিক হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। আমার কথা হচ্ছে, শব্দ যেন কল্পনার পূর্ব্বগামী না হয়। শব্দ কল্পনাকে অনুসরণ করবে। অদম্য এবং অবশ্যম্ভাবী শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। বাক্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য এবং সমগ্র কলা সম্বন্ধেও। শিল্পীর সমগ্র জীবন সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তার লিখন-শক্তি অদম্য হওয়া দরকার।

ঐকান্তিক না হওয়ার আশঙ্কা আমাকে কয়েক মাস যাবৎ মর্ম্ম-পীড়া দিচ্ছে আর এই জন্য আমার লেখা হচ্ছে না। ওঃ! কি করে সম্পূর্ণরূপে ঐকান্তিক হওয়া যায়……

আগষ্ট ১৮৯৩

কাহারও ব্যক্তিগত দুঃখ থাকা উচিত নয়, বরং অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

ইবসেনের 'ঘোষ্টস্' আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। নাটকখানি মাকে পড়ে শুনালাম। কিন্তু কেলেঙ্কারী নিয়ে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ না বাধিয়ে তাদের ধাক্কা দিয়ে চালিত করা যায়। আত্মা এবং দেহ উভয়ের জড়তার কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। সজ্ঘর্ষ হলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং নাড়া দেওয়া দরকার।

লারুক

"তেস্তেতিভ এমুরুস"এ আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, লেখক যে বই লেখেন, লেখার সময় সেই বই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থ রচনা আমাদের জীবনের গতিকে বদ্‌লে দেয়। আমাদের উপর আমাদের কাজের প্রতিক্রিয়া হয়। জর্জ্জ ইলিয়ট বলেছেন, আমরা যতখানি কাজ করি, আমাদের উপর সেই কাজের ঠিক ততটা প্রতিক্রিয়া হয়।

গ্যেটে! আমরা কি এখন বলবো যে ধর্ম্মভাব-জনিত কুণ্ঠা দমন করলে সুখী হওয়া যায়? না, এই কুণ্ঠা দমন করা সুখী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্য আরও কিছু করা দরকার। কিন্তু ধর্ম্মভীরুতা আমাদের সুখ থেকে দূরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট; এটা হচ্ছে নৈতিক ভীতি এবং কুসংস্কার থেকেই এর উৎপত্তি। আমরা প্রত্যেকে একটি ভুল বোঝার ঐক্যতান; সকলেই এক সুরে গাঁথা। তুমি যদি নিজেকে পৃথক্ মনে করে নিজের পথে চলো তাহলে তাতে নিজেরই বিরোধিতা করা হবে।

লরেন্সের বাড়ী

আজ রাত্রে এত ঝড় যে ঘুম ছেড়ে উঠতে হলো। এখনো পাঁচটা বাজেনি, বাইরে দুর্য্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টি পড়ছে। উপরের যে ঘরে আমি রয়েছি, তার জানলা আটটা। বাতাসে সব ক'টা জানলাকেই নাড়া দিচ্ছে। এখনি আমি উঠে গিয়ে সমুদ্র দেখবো। বাস্তবিকই ভীষণ রাত্রি! যে রকম বাড়ীতেই থাকা যাক না কেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হবে না। মনে হবে ঝড়ে হয়তো সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখনি হয়তো কোন বাড়ীর ছাদ উড়ে যাবে, আর সেই বাড়ীর পরিজনবর্গ অন্ধকারে উন্মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে থাকবে—তাদের চার পাশের দেওয়ালগুলির যে কোন মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা। আমি কল্পনায় দেখছি, নাটকের প্রথম অঙ্কে পিতা ঝড়ের বিরুদ্ধে দরজাটিকে চেপে রাখবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করছেন।

মন্তপিলার, ১০ই অক্টোবর

খৃষ্টধর্ম্ম সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু এমন লোকও আছে যাদের সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। এই সব লোককে অসুখী করে খৃষ্টধর্ম্মের সূত্রপাত হয়, নইলে তাদের উপর এর কোন ক্ষমতাই থাকবে না।

বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা

মানুষ! সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রাণী এবং এই জন্য প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরমুখাপেক্ষী। যে সব বস্তু দিয়ে তোমার শরীর গঠিত, তাদের প্রত্যেকটির উপর তোমাকে নির্ভর করতে হয়। এই আপাত প্রতীয়মান দাসত্বে নিরাশ হয়ো না, তুমি অনেকের কাছে ঋণী, কিন্তু নির্ভরতা দ্বারা তুমি সেই ঋণ পরিশোধ কর। স্বাধীনতা এক প্রকার দারিদ্র্য, অনেকে তোমাকে দাবী করে, অনেকে আবার তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়।

একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর জন্য তৈরী হয়নি। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে যৌক্তিকতা ও পরিণতি সেই কাজের মধ্যে থেকেই প্রমাণিত হবে। পুরস্কারের জন্য কোন কাজ করো না, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। অসদুদ্দেশ্য নিয়ে কলা-শিল্প কাজে হাত দিও না, অর্থের জন্য প্রেম করো না, জীবনের জন্য সংগ্রাম করো না। কলার জন্যই কলা, ভালর জন্যই ভাল, মন্দের জন্যই মন্দ, প্রেমের জন্যই প্রেম, সংগ্রামের জন্যই সংগ্রাম, জীবনের জন্যই জীবন—বাকী কাজ আমাদের না—সেটা প্রকৃতির। এই জগতে প্রত্যেকটি বস্তুই পরস্পর জড়িত এবং পরস্পরের অধীন, কিন্তু কোন বস্তুর যথার্থ মূল্য দেবার একমাত্র উপায়, কেবল সেই বস্তুর জন্যই সেই কাজ করা।

রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করো না, আর কখনো সংবাদপত্র পাঠ করো না। তবে কখনো কারও সঙ্গে রাজনীতি আলোচনার সুযোগ ত্যাগ করো না। এতে বিপাবলিক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবে না, তবে লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হবে।

কল্পনা (আমার ক্ষেত্রে) ভাব বা ধারণার পূর্ব্বগামী নয়। ভাব বা ধারণাই আমাকে উত্তেজিত করে। কিন্তু কল্পনাকে বাদ দিয়ে কেবল ভাব বা ধারণা দিয়ে কিছু সৃষ্টি করা যায় না। আজকাল বহু লেখক অতিশয় দ্রুত কল্পনা করেন এবং তার ফলে তাঁদের রচনা হয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। লেখবার সময় নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে যেতে হবে। কোন বই লেখবার ভাব সব সময় হঠাৎ হয় না, ধীরে ধীরে তার বিকাশ হয়। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং চাই অসীম ধৈর্য্য।

নিউ স্যাতেল, সেপ্টেম্বরের শেষ

মত্ততা যে প্রেরণা এনে দেয় এবং যুক্তি থেকে যে লেখা বার হয়, তা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। দু'টির মাঝামাঝি থাকা একান্ত দরকার। স্বপ্ন দেখার সময় চাই মত্ততা আর লেখার সময় যুক্তি।

নিউস্যাতেল, অক্টোবর ১৮৯৪

সত্য ঈশ্বরের আর ভাব মানুষের। কেউ কেউ ভাবকে সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। এ-কথা কি সত্য নয় যে, সত্য ভাব ধারণার পরবর্ত্তী এবং ভাব ধারণা থেকেই সত্যের উৎপত্তি?"—(লিবনিৎস, নূতন প্রবন্ধাবলী)।

১৩ই অক্টোবর, ১৮৯৪

"ঈশ্বর যে সব লোভ পাঠান, সেগুলি সবই মানবীয়। কিন্তু ন্যায়বান ঈশ্বর লোভ জয় করার ক্ষমতাও দেন।" চিন্তাই লোভ। এই লোভই ঈশ্বরের নিকট থেকে আমাদের কাছে আসে। ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে গেলে এই লোভ পথ আগলে দাঁড়ায়। এই লোভকে অবশ্যই জয় করতে হবে, কারণ ইহা জয় করা যায়। কিন্তু অন্যান্য লোভ (অর্থাৎ কামনা সমূহ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। এগুলি আসে পিছন থেকে এবং আমাদের ঈশ্বর-চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই সব কামনার সবগুলি জয় করা যায় বলে আমার মনে হয় না।

সত্য সবাইকে বলা যেতে পারে, কিন্তু ভাব প্রত্যেকের শক্তির অনুপাতে।

মানুষ যে সব সত্য প্রকাশ করেছে, তারই কাহিনী হল অতীতের ইতিহাস।

অপরের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রধান মহত্ব লাভ করা যায় না, কর্ত্তব্যানুরাগের মধ্য দিয়েই তা পাওয়া যায়।

১৮৯৬

"যত বড় হোক না কেন, এমন কোন অপরাধ নেই যা কোন দিন করতে পারি না বলে মনে হয়েছে। এক দিন নিকৃষ্টতম অপরাধও করতে পারি বলে মনে হয়েছে।"—গ্যেটে বলেছেন। বড় লোকে বড় অপরাধও করতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁরা তা করেন না। জ্ঞান এবং প্রেম তাঁদের অপরাধ অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। আর তাঁরা মনে করেন যে, অপরাধ অনুষ্ঠানে তাদের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

ঈশ্বর আছেন, ইহা প্রমাণ করবার চেষ্টা করা, ঈশ্বর নেই এ কথা প্রমাণের চেষ্টার মতই নিরর্থক।

আমাদের কথা বা প্রমাণের দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা বা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আমার মতে একটা কিছু যখন আছে, তখন সেটাই ঈশ্বর। তাকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিরর্থক। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

মানুষ যা চায়, তা না পেলে সেই অভাব ভুলবার জন্য মদ খায়। এ কথা ধনী এবং দরিদ্র উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য।

সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে কিছুই আশা করা যায় না।

মহম্মদ, সেন্ট পল, সেন্ট জন, রুশো, নীটশে, ডষ্টয়ভস্কি, ফ্লবার্ট প্রভৃতি সকলের স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল।

৫ই জানুয়ারী ১৯০২

প্রত্যেকেরই আত্মপ্রতারণার নিজস্ব উপায় আছে। নিজের যে একটা গুরুত্ব আছে এই বিশ্বাসটাই বড় কথা।

হেনরী আলবার্ট, লিঁও লুঁম, চার্লস অ্যানিন, মার্সেল দ্রুঁই এবং আমি খাবার টেবিলে বসে আলোচনা করছি। দলের মধ্যে আমার বড় বেখাপ্পা লাগে। আমি যখন একা থাকি, বেশ ভাল থাকি। খাবার পর খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা সুরু হয়। আলোচ্য বিষয়—নারীর প্রতি ফ্লেওবেয়ারের মনোভাব। আলোচনা চলবার সময় হেনরী আলবার্ট হঠাৎ বলে উঠে যে, ফ্লেওবেয়ার ও ফ্লবার্তের সিফিলিস ছিল। আমরা প্রতিবাদ করি, সে বলে নিশ্চয়ই। মার্সেল দ্রুঁই এবং আমি সন্ত ডুক্লুর বক্তৃতা পাঠ করেছি। তাতে বলা হয়েছে যে, যে কোন জনতার ভেতর প্রত্যেক দু'জনের মধ্যে এক জনের সিফিলিস আছে বলে ধরা যেতে পারে। দ্রুঁই ভাবে, "ভাগ্যে আমরা এখানে পাঁচ জন আছি!"

২২শে মার্চ্চ ১৯০৫

আঠারো বছর আগে ম্যাক্স আমাকে বলেছিল, "তুমি চোখ দিয়ে হাস।"

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি দিয়ে আমার হাসা উচিত?" সে বলল, "কেবল ওষ্ঠে, এই আমি যেমন হাসছি।"

আজ আমি ফ্লেওবেয়ারের ডায়রীতে পড়লাম, নেপোলিয়ানের হাসি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, নাটকীয় হাসি, যে হাসিতে কেবল দাঁত দেখা যায়, চোখ হাসে না।

১ই এপ্রিল, ১৯০৮

নুট হামসুনের "প্যান" পড়লাম। কেবল ফুলের তোড়া আর তার গন্ধ। মাংস নেই। সংলাপগুলি অত্যন্ত বেখাপ্পা এবং অকিঞ্চিৎকর। "হাঙ্গার" এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল, তাতে অন্ততঃ ত্রুটিগুলি কম চোখে পড়ে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯১০

ডোমিনিক দ্রুঁই তার ক্লাশের ছেলেদের লেখা একখানি ছোট নোট-বই নিয়ে এল। পড়তে খুব ভাল লাগলো। একটি ছেলে কতকগুলি প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নগুলি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত করে দিলাম:

(১) তোমার আদর্শ কি?
(২) তোমার প্রিয়তম বন্ধু কে?
(৩) তোমার চরিত্রের প্রধান গুণ কি?
(৪) তুমি কোন্ পেশা অবলম্বন করতে চাও?
(৫) তুমি কি ভাবে মরতে চাও?
(৬) তোমার প্রিয় বই কি?
(৭) কি রকম বাস্তব-জীবনের যোদ্ধা তুমি পছন্দ কর?
(৮) তুমি কোথায় থাকতে ভালবাস?
(৯) সুখ বলতে তুমি কি বোঝ?
(১০) অসুখ বলতে কি বোঝ?
(১১) কোন্ গুণ তুমি পছন্দ কর?

কয়েকটি ছেলে প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে।

প্রিয় পুস্তকের মধ্যে ডিটেকটিভ উপন্যাসই প্রথম স্থান পেয়েছে আর বৈমানিকরা পেয়েছে বীরের সম্মান।

চারটি ছেলে ১০নং প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে, বিবাহই অসুখের কারণ। বিবাহকে সুখের বলেছে মাত্র দু'জন ৯নং প্রশ্নের উত্তরে (এদের মধ্যে এক জন রুশ অপর জন ইহুদী)।

তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে এক জন লিখেছে: সংবেদনশীলতা আর এগার নম্বর প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে: শক্তি। তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আর এক জন লিখেছে: বন্ধুত্ব এবং এগার নম্বর প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে: বন্ধুর প্রতি ভালবাসা।

প্রথম নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটি ছেলে বলেছে: ফরাসীর পক্ষে সবই সম্ভব। পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে সে লিখেছে: ফরাসী পতাকার অধীনে।

পূর্ব্বোক্ত ইহুদী ছেলেটি চার নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলেছে: আমি দোকানদার হতে চাই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বত্রিশ

এই সেই যদু মল্লিক।

তুমি বড্ড হিসেবী লোক। অনেক হিসেব করে কাজ করো, তাই না? সেই বামুনের গরু, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে—

কি বললেন?

তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বরচিন্তায় নয়, বিষয়-চিন্তায়। কোন ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে কোন ব্যঞ্জনে হয়নি এ তুমি বুঝতে পারো না। কেউ যদি বলে দেয়, এ ব্যঞ্জনে নুন হয়নি, তখন এ্যাঁ-এ্যাঁ করে বলো, হয়নি না কি? তখন তোমার হুঁস হয়। কেউ না বলে দিলে—

আপনি বলে দিন।

তুমি সেই রামজীবনপুরের শিলের মত—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে—

ষোল আনা গরম করে দিন।

অসম্ভব। কথা দিয়ে কথা রাখো না কেন? বাড়িতে যে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে, তা হল কই? কত দিন কেটে গেল—

অনেক ঝঞ্ঝাট—নানান ঝামেলা।

তুমি পুরুষ-মানুষ তো বটে? তবে কথা রাখবে না কেন? পুরুষ-মানুষের এক কথা। কি, মানো?

তা মানি বৈ কি।

তা যদি মানো, সেই মান সম্বন্ধে যদি হুঁস থাকে, তবে তো মানুষই হয়ে যেতে। মান-হুঁস—মানুষ। আর পুরুষ কাকে বলে? পুরুষের সম্পদ কোথায়?

যদু মল্লিক তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

কথায়। হাতীর দাঁত, আর পুরুষের? পুরুষের বাত। এক কথার মালিক যে সেই পুরুষ।

এই সেই যদু মল্লিক।

এই যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে এক দিন বেড়াতে এসেছে রামকৃষ্ণ। বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে যদুর সঙ্গে। হঠাৎ দেয়ালে-টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধুর ভাবের ছবিখানি।

মা আর ছেলে। মার নধর বাহুর বেষ্টনীতে পবিত্র একটি শিশু, উষার আকাশে প্রথম উদয়-ভানু। মার দুটি বড়-বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। আর শিশুর মুখে সে যে কি নিষ্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন বুঝছে তেমন কি কেউ বুঝবে?

'ওরা কারা হে?'

এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।

তাই হবে বা। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ।

কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্য নেই। বলো না সত্যি করে। ওরা কে? ও তো দেখছি জ্যোতির্ময় দেবশিশু। আর ওর মা তো পুণ্যময়ী পবিত্রতা।

'মা মেরী আর তার ছেলে যীশুখৃষ্ট।'

একদৃষ্টে চেয়ে রইল রামকৃষ্ণ। দেখল যশোদা আর তার কোলে বালগোপাল।

সোজা শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'যীশুখৃষ্টের গল্প শোনাও আমাকে।'

এই সেই শম্ভু মল্লিক।

হাঁসপাতাল করা, ডিসপেনসারি করা, রাস্তা বানানো, কুয়ো কাটানো—এই সবে বড় ঝোঁক। এ সব কাজ অনাসক্ত হয়ে করতে পারো তো বুঝি। নইলে ও-সবের পিছনে তো শুধু নামের পিপাসা, ঢাকের বাদ্যি। কালীঘাটে এসে যদি শুধু দানই করতে থাকো তো কালীদর্শন হবে কখন? আগে যো-সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করে

নাও, তার পর দান যত করো আর না-করো। ঈশ্বর যদি তোমার কাছে এসে বলেন, কী বর চাও, তখন তুমি কী বলবে? বলবে, কতগুলি হাঁসপাতাল-ডিসপেনসারি করে দাও, না, স্থান দাও, আশ্রয় দাও তোমার পাদপদ্মে?

গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। ভাবে তাকে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। দেখেছিল সেবায়েৎ বলে। সেজো বাবুর পরে রসদদার এই শম্ভু মল্লিক।

বাগবাজার থেকে হেঁটে চলে আসে বাগানে। আসে সটান পায়ে হেঁটে। কেউ যদি বলে, অত রাস্তা, গাড়ি করে আস না কেন? যদি কোনো বিপদ হয়। শম্ভু মুখ লাল করে বলে, যার নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ!

'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ দেখি মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে।' শম্ভু মল্লিককে বলেছিল এক দিন রামকৃষ্ণ।

'আহা, তা আর জানি না?' সহাস্য সারল্যে বললে শম্ভু মল্লিক, 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।'

জানোই তো আমার বিদ্যেবুদ্ধি। তবে এবার একটু বাইবেল শোনাও দিকি।

শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শুনতে লাগল রামকৃষ্ণ। ভূমাভিমুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে এক দিন উন্মনার মত চলে এল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে। যদু মল্লিক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খুলে দিলে চাকররা। শিশুযুতা মাতৃচিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

'মা গো, তুই আমাকে এ কী দেখাচ্ছিস?'

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধুয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এত দিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মূলিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়—শুধু পীযুষপ্রেমময় যীশু। কৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ ঘর যেন গির্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধূপ দীপ মোমবাতি জেলে ব্যাকুলতার মূকমূর্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদরিরা। সামনে ক্লেশভার ক্লিষ্ট অথচ অক্লিষ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী পরম প্রেমিক? কে তুমি আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ?

সংসারদুঃখগহন থেকে জীবের উদ্ধারের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে ত্রাণ করতে এলে তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিমুখে। এলে যে যন্ত্রণার নিবারণে সেই যন্ত্রণাই ক্ষমা হয়ে প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উদ্ভাসিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এক গির্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গির্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভিড়। 'রাজার বেটা' না হোক, সব রাজার জাতের লোক। ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালী-ঘরের খাজাঞ্চি বসে আছে।

'মা গো, খৃষ্টানরা গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে ঢুকতে না দেয়! তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।'

গির্জার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষু মেলে তাকাল একবার ভিতরে।

সর্বতশ্চক্ষু রামকৃষ্ণের চোখে এখন "পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি"। দেখল সত্যি-সত্যিই এ কালী-ঘর। ভিতরে, বেদীতে, মা বসে আছেন। মা জগদম্বা। মা ভবতারিণী। সব্যে খড়্গমুণ্ডকরা, অসব্যে বরাভয়-দাত্রী—সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্যদায়িনী। আনন্দধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণর।

সর্বত্রই এই মার ভজন। সর্বস্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই—সর্বত্র কালী-ঘর।

যিনি যীশুখৃষ্ট তিনিই মোক্ষকরী শিবকরী মাহেশ্বরী।

তিন দিন থাকল এই খৃষ্টান ভাবে। চার দিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে এক জন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে দেরি হল না, বিদেশী, বিজাতি। কিন্তু সৌম্য আননে কী অপার সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গে দেবদ্যুতি। কে তুমি? তুমিই কি সেই পুরুষোত্তম যীশু? তুমিই কি সেই তমালশ্যামল বনমালী?

সেই দেবমানব আলিঙ্গন করল রামকৃষ্ণকে।

এক দেহে লীন হয়ে গেল দুজনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মাত্মবোধে।

'আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস—' এক দিন, ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর: 'সেইখানে যীশুর চেহারার কোনো বর্ণনা আছে?'

না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।

'আচ্ছা, যীশু কেমন দেখতে ছিল বল তো?'

কে জানে! তবে ইহুদি ছিলেন যখন তখন রং গৌর চোখ টানা আর নাক টিকলো ছিল নিশ্চয়ই।

'কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একটু চাপা। কেন দেখলাম কে জানে।'

ভাবে-দেখা মূর্তি কি বাস্তব মূর্তির অনুরূপ হয়? কিন্তু যীশুখৃষ্টের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।

'মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রহ্মজ্ঞানী সকলেই বলে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙ্গে কেউই তো মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। 'সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউই তোমাকে দেখে না।'

মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ধর্মে খৃষ্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় শামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা নয়, সঙ্গে আরো একটি ভাই—গিয়েছিল বরযাত্রী। সেই থেকেই মিশ্র সন্ন্যাসী। পরনে প্যান্ট কোট বটে, কিন্তু ভিতরে গেরুয়ার কৌপীন।

'ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কৃষ্ণ—' বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, 'পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেক ঘাটে খৃষ্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি।' মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কিছু দেখতে-টেকতে পাও?'

'শুধু আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশু এক।'

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সেক-হ্যাণ্ড করতে লাগলেন।

সবাইর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। তার পরে আবার নিরালায় ফিরে যাও নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে ফের শান্তিতে থাকো। রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু মিলে-মিশে একাকার। আবার সন্ধের সময় ফিরে যায় নিজের-নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।

গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। বেলুন উঠবে, বেজায় ভিড়। জায়গা নিয়েছে এক পাশে। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই দেখা, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে গেল। সমাধি হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

উলোর বামনদাস ঠিকই বলে। বলে, 'বাবা:, বাঘ যেমন মানুষ ধরে তেমনি ঈশ্বরী একে ধরে রয়েছেন।'

তেত্রিশ

মধুসূদন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এসেছে ব্যারিষ্টার হিসাবে। মথুর বাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে। বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলার জোগাড় হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে।

দপ্তরখানার পাশে বড় ঘর। সেই ঘরে বসেছে মাইকেল। বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।'

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অত বড় গণ্যমান্য লোক, দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি! হৃদয়কে বললে, 'তুই যা।'

হৃদয় গেলে হবে কেন? দ্বারিক বিশ্বাস আবার তাগিদ পাঠাল।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিল সামনে, রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমিও সঙ্গে চল। ইংরিজি-টিংরিজি জানি না—কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই—'

দুজনে এসে দাঁড়াল মাইকেলের মুখোমুখি। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিল নারায়ণ শাস্ত্রীকে। বললে, 'তুমিই কথা কও।'

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ চালাল।

মাইকেল বললে, 'বাংলাতেই কথা বলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে?'

মাইকেল পেট দেখাল। বললে, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে ?' চটে উঠল নারায়ণ শাস্ত্রী: 'পেটের জন্যে তুমি ধর্ম ছাড়লে ? তোমার বাপ-পিতেমোর ধর্ম ? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কী কথা কইব।' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'কিন্তু আপনি কিছু বলুন—' মাইকেল মিনতি করলে রামকৃষ্ণকে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আশ্চর্য, আমি কিছুই বলতে পারছি না। কে যেন আমার মুখ চেপে ধরছে।'

রামকৃষ্ণর চাইতে মাইকেল বয়সে বারো বছর বড়। তা হলে কি হয়, করজোড় করল মাইকেল। বললে, 'আমাকে কেন আপনার কৃপা হবে না ? আমি আপনার ভক্ত—'

'সে কথা নয়। আমি তো চাই কথা বলতে, কিন্তু বারে বারে কে যে আমার মুখ চেপে ধরছে, কথা কইতে দিচ্ছে না।'

মরমে মরে গেল মাইকেল। সে কি এত অভাজন ? এত পরিত্যাজ্য ?

বাজল বুঝি রামকৃষ্ণের। বললে, 'গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে।'

রামপ্রসাদী গান ধরল রামকৃষ্ণ। রক্তাক্ত ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ল। শান্তিতে চোখ বুজল মাইকেল।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ যাবার নয়। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনেকার দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে বাংলায় সে লিখলে: পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়া মূঢ়তা।

মথুরকে বামনি বলত, প্রতাপরুদ্র। কত কি করলেন প্রাণ ঢেলে। আলাদা ভাঁড়ার করে দিলেন সাধুসেবার জন্যে। গাড়ি পালকি যাকে যা দিতে বলেছে রামকৃষ্ণ, দিয়ে দিলেন। একবার সাধ হল ভালো জরির সাজ পরবে, আর রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথুর বাবু। জরির সাজ পরে গুড়গুড়ি বাগিয়ে নানারকম করে টানতে লাগল রামকৃষ্ণ—একবার এ পাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে নীচু থেকে। মনকে বোঝাল, মন, এরই নাম সাজ আর এরই নাম রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। অমনি খুলে ফেলল সাজ, ছুঁড়ে ফেলল গুড়গুড়ি।

'কামনা থাকতে, ভোগলালসা থাকতে মুক্তি নেই। আমি তারি জন্যে যা-যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম। বড়বাজারের রং-করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছে হল। খুব খেলুম। তার পর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা—তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছাড়িনি একটাও—'

মথুর বাবু এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। ডাক্তার-কবরেজরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী তো চলেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর এই বিষয়-আশয়ও শেষ হয়ে যাবে।

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ধরে পাশে বসাল রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে ? এত উতলা হবার আছে কী।

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন। বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই। কিন্তু, বাবা, তোমার সেবা আর করতে পাব না।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মথুর বাবু।

করুণায় মন বুঝি ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী দিব্যি ভালো হয়ে উঠেছেন।'

ফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন মথুর বাবু। দেখলেন, এ কি ইন্দ্রজাল, স্ত্রীর দেহে আর রোগ নেই।

'ইন্দ্রজাল নয়। ঐ রোগ এই দেহের মধ্যে টেনে এনেছি।' বললে রামকৃষ্ণ।

ছয় মাস ভুগল এক নাগাড়ে।

বর্ষা আসতেই মথুর বাবু ভাবিত হলেন। গঙ্গার জল এখন লোনা হয়ে উঠবে। আর, খাবার জল বলতে তো ঐ গঙ্গাজলই। নির্ঘাৎ তবে ফের পেটের অসুখ করবে রামকৃষ্ণের। এখানে থেকে তবে আর কাজ নেই। কয়েক দিন বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এস।

মন্দ কি। দেখে আসি একবার জন্মভূমি। আট বছর এই দেশ ছাড়া। দেখে আসি একবার সারদাকে।

'মা গো, তুমি যাবে কামারপুকুর ?' চন্দ্রমণিকে শুধোল রামকৃষ্ণ।

'না বাবা, গঙ্গাতীর আর ছাড়ব না। এইখানেই কাটিয়ে যাব বাকি জীবন। তুমি বামনিকে নিয়ে যাও।'

না-বলতেই প্রস্তুত বামনি।

আর কে যাবে সঙ্গে ?

কেন, হৃদয় ? দেশে-গাঁয়ে রটে গেছে, পাগল হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কাছা খুলে ফেলে আল্লা-আল্লা করছে। স্ত্রীবেশ ধরে গয়না-গাটি পরে ঢপ গাইছে। একবার চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসি।

মথুর বাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে সব গোছগাছ করে দিচ্ছেন। যাতে দেশে গিয়ে রামকৃষ্ণের তৃণমাত্র না অসুবিধে হয়। কামারপুকুরের সংসার তো শিবের সংসার। জানতেন তা দুজনে—তাই "ঘর-বসত" সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা যেমনটি করে দেয় সাজিয়ে-গুছিয়ে। প্রদীপের সলতেটি থেকে দাঁতের খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

গ্রামে আনন্দ-বাজার বসে গেল। ওরে, শুনেছিস, রামকৃষ্ণ এসেছে। সঙ্গে কে এক ভৈরবী। হাতে মস্ত ত্রিশূল। চল দেখবি চল।

জয়রামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠাল রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস। তুমি নইলে কে ওঁর সেবা করবে ? সঙ্গে মা আসেননি, কিন্তু উনিই তোমার শ্বশ্রূমাতা।

সত্যিকারের এই প্রথম স্বামিসন্দর্শন সারদার। চৌদ্দ পেরিয়ে সে এখন পনেরোয় পা দিয়েছে। সে এখন স্বভাবসুন্দরাঙ্গী কিশোরী। শুভাননা। সর্বকল্যাণকারিণী।

"কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ"-র সমাহার।

স্বামীকে প্রথম দেখেছে ছ-সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছু মনে পড়ে না। পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছে দিয়েছিল—এই একটু মনে পড়ে ঝাপসা-ঝাপসা। বিয়ের সময় লোকে বলেছিল, পাগলা-জামাই হয়েছে। শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, সবাই বলতে লাগল, 'ও মা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে একটা ভাঙড়ের হাতে পড়লি ?' এখন তো শুনি আরো কত কি কথা। কে জানে এখন গিয়ে না-জানি কি রকম দেখব!

বাড়ির মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে সারদা। কিন্তু হৃদয়ের চোখ এড়াবে এমন তার সাধ্য নেই। খুঁজে বার করে ফেলেছে সারদাকে। বলছে, 'এই দেখ তোমার জন্যে কত পদ্মফুল জোগাড় করে এনেছি।' সারদা তো লজ্জায় এতটুকু। 'দাঁড়াও, পদ্মফুল দিয়ে তোমার পাদপদ্মদুখানি পূজা করি।'

কিন্তু যাঁর পাদপদ্মের লোভে সারদা ছুটে এসেছে তিনি কোথায় ?

দূর থেকে দেখল রামকৃষ্ণকে। কী রূপ, কী রঙ! সৌন্দর্য যেন স্থির হয়ে বসে নেই, আনন্দে লীলা করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের বার হলেই মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে দেখে রামকৃষ্ণকে। সঙ্গে হৃদয়, ভূতির খালের দিকে বেড়াতে চলেছে এক দিন। মেয়েরা জল ভরছে খাল থেকে। আর জল-ভরা। চার পাশ থেকে দেখছে সবাই একদৃষ্টে। বলাবলি করছে, ওরে, ঐ ঠাকুর—ঐ রামকৃষ্ণ। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে পরস্পরকে।

'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—'

হৃদয় তো অবাক।

'ওরে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ! শিগগির আমায় ঘোমটা দিয়ে দে। নইলে আমি এক্ষুনি ন্যাংটা হব।'

'না মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে বললে, 'এখানে ন্যাংটা হলে লোকে কী বলবে!'

'নইলে যে পালাবে না মেয়েগুলো।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি। কেউ আর তোমার রূপ দেখবে না।' খালি-গায়ে চাদর ছিল রামকৃষ্ণের, তাই দিয়ে হৃদয় তার মুখ ঢেকে দিলে।

রাত থাকতেই ওঠে রামকৃষ্ণ। উঠেই ফরমাস করে সারদাকে আর লক্ষ্মীর মাকে; আজকে এই-এই সব খাব। এই-এই সব রেঁধো। সব জোগাড় করে রাঁধত দুজনে। এক দিন পাঁচফোড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে ?' শুনতে পেয়েছে রামকৃষ্ণ। বললে, সে কি গো, পাঁচফোড়ন নেই, এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে কেন? তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেসন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো আর পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও!' দুই জা তখন লজ্জা রাখবার জায়গা পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেক রকম সুর ধরে রামকৃষ্ণ। 'আঃ, আমার এ কি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব! কি খাব! রাম রাম!'

এক দিন খেতে বসেছে দুজনে—রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। রেঁধেছেও দুজনে—লক্ষ্মীর মা আর সারদা।

লক্ষ্মীর মা পাকা রাঁধুনি, তার রান্নায় তার বেশি। আর সারদা ছেলেমানুষ বউ, তার রান্না অখাদ্যি!

লক্ষ্মীর মা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে তুলে রামকৃষ্ণ বললে, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি।' আর সারদা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে ঠেকিয়ে বললে, 'আর এ যে রেঁধেছে সে ছিনাথ সেন।'

রামদাস ভালো চিকিৎসক আর শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে।

রামকৃষ্ণ বুঝি একটু ঠেস দিলে সারদাকে।

হৃদয় বললে, 'তা হোক। তবে তোমার এ হাতুড়ে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হল। এক পায়ে খাড়া। আর রামদাস বদ্যি? তার অনেক টাকা ভিজিট, সব সময়ে পাবেও না তাকে। লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে—সে তোমার সব সময়ের বান্ধব।'

'তা বটে, তা বটে।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। 'ও সব সময়ে আছে।'

বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন, ভুতির খালের দিক থেকে একা-একা ফিরছে রামকৃষ্ণ। পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। চেয়ে দেখল মস্ত একটা মাগুর মাছ। পুকুর থেকে রাস্তায় কখন উঠে এসেছে। পায়ে করে ঠেলে-ঠেলে এনে মাছটাকে রামকৃষ্ণ পুকুরে ছেড়ে দিলে। বললে, 'পালা, পালা! হৃদে দেখতে পেলে তোকে আর আস্ত রাখবে না।'

পরে বললে হৃদয়কে, 'ওরে এই এত বড় একটা মাগুর মাছ—হলদে রং—রাস্তায় উঠে এসেছিল পুকুর থেকে—'

'কই? কী করলে?' চার দিকে তাকাতে লাগল হৃদয়।

'পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'

'ও মামা, তুমি করলে কি গো! এত বড় মাছটা তুমি ছেড়ে দিলে! আঃ আনলে কি রকম ঝোল হত—'

জয়রামবাটিতে এক দিন ভোর-রাতে একটা বাছুর খুব চেঁচাচ্ছে। গরু দুইছে এ-সময়, মার কাছে বাছুরটাকে ঘেঁসতে দেওয়া হচ্ছে না। দূরে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। প্রবোধ মানছে না বাছুর, মার স্তন্যের জন্যে আর্তনাদ করছে।

'যাই মা যাই', ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারদা, করুণারূপিণী কিশোরী, বলছে, 'আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব—'

দ্রুত পায়ে এসে বাছুরের বন্ধন মুক্ত করে দিলে সারদা।

চৌত্রিশ

ও মামি, ও কী হচ্ছে?

সারদা হকচকিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীও।

বর্ণপরিচয় পড়ছিল দু'জনে। পিছন থেকে হুমকে উঠল হৃদয়: 'বই পড়া হচ্ছে?'

সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?'

লক্ষ্মীর বইও কাড়তে গেল, পারলে না। ঝিয়ারি মানুষ, তার সঙ্গে আঁটবে কে! সটান গেল সে পাঠশালায় পড়ে আসতে।

লুকিয়ে সারদাও আরেকখানা কিনে আনাল বর্ণপরিচয়। লক্ষ্মী শিখে এসে পড়াতে লাগল সারদাকে।

'কী হবে লিখে-পড়ে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তাও না।'

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভালো। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না। শাস্ত্রে অনেক কথাই তো আছে। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন না হলে, তার পাদপদ্মে ভক্তি না হলে, চিত্তশুদ্ধি না হলে—সবই বৃথা।

তোতাপুরী বলে দিয়েছিল, স্ত্রীকে কাছে-কাছে রাখবি। স্ত্রী কাছে রেখেও যার ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিবেক-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই আসল ব্রহ্মজ্ঞ।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ। শোনাতে লাগল ঈশ্বরের কথা।

'চাঁদা মামা সকল শিশুর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি ডাকো তো তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন।' কাছে বসিয়ে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণ: 'বই-শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই-শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।'

কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে। কি-কি জিনিস কিনবে তারই ফর্দ-সমেত চিঠি এসেছে। কিন্তু চিঠি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পর পাওয়া গেল চিঠি। তখন আনন্দ আর ধরে না। দেখ, দেখ, কি লিখেছে চিঠিতে। কি পাঠাতে হবে। পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়। ব্যস হয়ে গেল। এখন আর চিঠির কি দরকার! উড়েই যাক বা পুড়েই যাক কিছু আসে-যায় না। আসল খবর জানা হয়ে গিয়েছে। চিঠির ততক্ষণই দরকার, যতক্ষণ তত্ত্বের খবরটুকু জানা যায়নি। জানার পর শুধু পাবার চেষ্টা।

কৃপা হলেই পাবে। কিন্তু কৃপা পাবে কি করে? কৃ আর পা, দুয়ে মিলে কৃপা। করলেই পাবে। সুতরাং কাজ করো। কর্তব্য করো। 'শরীরং কেবলং কর্ম'।

'তুমি হবে আমার বিদ্যারূপিণী স্ত্রী।' সারদাকে বললে রামকৃষ্ণ।

বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমাত্র আপনার লোক, অনন্ত কালের আপনার। তারা পাণ্ডবদের মত। সুখ হোক দুঃখ হোক কখনো তাঁকে ভোলে না।

কিন্তু অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান, তবে ঈশ্বর অবিদ্যা করেছেন কেন?

তাঁর লীলা। মন্দটি না থাকলে ভালোটি বুঝবে কি করে? আবার খোসাটি আছে বলেই আম বাড়ে আর পাকে। আমটি তৈরি হলেই তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মাস্বাদ।

কিন্তু বামনির মোটেই ইচ্ছা নয় সারদার সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সে বলে এতে ব্রহ্মচর্যের হানি হবে।

সরলা সারদা ভয় পায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসে।

এক দিন রামকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ সাজাল বামনি। সাজাতেই ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

বামনি সারদাকে ডেকে আনল। বললে, 'কেমন হয়েছে?'

ভাবাবেশ দেখে ভয় পেল সারদা। কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে ছুটে পালাল।

বামনির এমন একটা ভাব, রামকৃষ্ণের যা কিছু দিব্যচেতনা সমস্ত তার জন্যে। অন্ধজনকে সেই যেন দৃষ্টিদান করেছে!

মহামায়ার কি লীলা, বামনির মধ্যে অহঙ্কার ঢুকে গেল। কি থেকে কী যে হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

চিনু শাঁখারি তখনো বেঁচে আছে। বুড়ো, অথর্ব। রামকৃষ্ণের কাছে এসেছে প্রসাদ নিতে। তার ভক্তি দেখে বামনি বেজায় খুশি। প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে চিনু, বামনি বললে, থাক, এ এঁটো আমি তুলব। চিনু তা মানতে রাজি নয়, কিন্তু বামনির রূঢ় নিষেধের কাছে তার আর হাত উঠল না।

কিন্তু হৃদয় এল চোটপাট করে। এ কী অনাচার!

গাঁয়ের বামুনের মেয়ে যারা সেখানে ছিল তারাও বামনির বিরুদ্ধে। এখানে চলবে না এ সব অনাসৃষ্টি।

'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব, তাতে কি?' বামনিও ফণা বিস্তার করলে।

'শাঁখারির এঁটো নেবে, থাকবে কোথা?' হৃদয় এল মুখ খিঁচিয়ে: 'বলি, কে তোমাকে জায়গা দেবে? শোবে কোথা?'

বামনি গর্জন করে উঠল: 'শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

এই থেকে লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই নীতিবাক্যের ভুল হয়ে গেল বামনির। আর হৃদয়ও কাঠ-গোঁয়ার, দিশ-পাশের জ্ঞান নেই। মুখের ঝগড়া না মারামারিতে এসে পৌঁছয়। বামনি বুঝি আসে এই ত্রিশূল উঁচিয়ে।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হৃদয় কি-একটা ছুঁড়ে মারলে বামনিকে। জোরে ছুটে এসে লাগল ঠিক কানের কাছাকাছি। রক্ত পড়তে লাগল। কাঁদতে বসল বামনি।

রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল। 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? ওরে, ও যে ভক্তিমতী যশোদা। এমন হলে যে লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে—'

এখন উপায় কি। রামকৃষ্ণই ঠিক করল উপায়। বামনিকে ভাব দিয়ে দিলে। ভয় পাবার ভাব। থেকে-থেকে উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাদের প্রসন্নময়ীকে সম্বোধন করে বলে, 'ওরে প্রসন্ন, আমার এ কী হল? আমি এখন কি করি, কোথা যাই। জগন্নাথ যাই না বৃন্দাবন যাই।'

এক দিন সত্যি-সত্যি কোথায় চলে গেল বামনি কেউ টের পেল না। ছ বৎসরের নিরন্তর-বাসের মায়া কেটে গেল এক মুহূর্তে।

চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই এখন কামারপুকুরে আসে রামকৃষ্ণ। সেবার এসে অসুখে পড়েছে। পেটের অসুখ। পথ্যি সাবু-বালি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাট চুকিয়ে শুতে গেছে মেয়েরা। ভাবে টলমল করতে-করতে দরজা খুলে বাইরে হঠাৎ বেরিয়ে এল রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মীর মাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সে কি গো, তোমরা যে সব শুতে গেলে! আমাকে খেতে দেবে না?'

সকলে তো হতবুদ্ধি। লক্ষ্মীর মা বললে, 'সে কি কথা? এই যে তুমি খেলে দুধ-বালি—'

'কই খেলুম! আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। কই খাওয়ালে!'

বুঝতে কারু বাকি রইল না, ভাবাবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের। কিন্তু উপায়? ঘরে তো কিছুই তেমন খাবার নেই। কি দেব এই পেট-রোগা মানুষকে?

'ঘরে তো তেমন কিছু নেই। শুধু মুড়ি আছে।' বললে লক্ষ্মীর মা। 'তা খাবে মুড়ি? তাই ছুটি খাও না। পেটের অসুখ করবে না তাতে।'

থালে করে মুড়ি আনল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'শুধু মুড়ি আমি খাব না।'

কিন্তু ঘরে আর কিছু নেই যে। তোমার এই পেটের অসুখে অন্য-কিছুই বা আর কি দেওয়া যায়? দোকান-পসার এখন বন্ধ। সাধ্য নেই সাবু-বালি কিনে এনে তোমাকে এখন জ্বাল দিয়ে দি।

ও আমি খাব না। অভিমানে মুখ ভার করে রইল রামকৃষ্ণ।

ভাইপো রামলালকে তখন বেরুতে হল বাজারে। ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানি, ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙালে। মিষ্টি কিনলে এক সের। বাড়িতে এসে মুড়ির থালার পাশে নামিয়ে রাখল মিষ্টির হাঁড়ি। রামকৃষ্ণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, আরো ছুটি মুড়ি দাও।

থালায় আরো মুড়ি ঢেলে দিলে লক্ষ্মীর মা। আনন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কী সর্বনাশ যে হবে কল্পনা করতেও ভয় পেল সকলে। মাসের অর্ধেক দিন সাবু-বালি খেয়ে যে কোনো-মতে বেঁচে আছে তার এই রাক্ষুসে খাওয়া! এত রাত্রে, পেটের এই অবস্থায়! ডাক্তার-বদ্যিতেও আর কুলোবে না।

ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাল সারদা। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মা।

কিন্তু পর দিন দিব্যি সুস্থ আছে রামকৃষ্ণ। দেহে কোনো রোগ-উদ্বেগ নেই। তার দেহে বসে ঐ খাওয়া কে খেয়েছে কে বলবে।

সেবারে এসে শ্বশুরবাড়ি গেছে। কি একটা ক্রিয়াকর্ম ছিল সেদিন, অনেক লোক-খাওয়ানো হয়েছে। রাতের খাওয়া চুকে গিয়েছে অনেক ক্ষণ, শুতে গিয়েছে সবাই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'আমি খাইনি না কি? ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। কিছু খেতে দাও—'

কি হবে! ঘরে যে এখন কিছুই নেই। মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

খুঁজে-পেতে দেখা গেল হাঁড়িতে কতগুলো পান্তা ভাত শুধু পড়ে আছে। ওমা, তাও কি দেওয়া যায় জামাইকে!

তবু, ভয়ে-ভয়ে, তাই বলতে গেল সারদা। বললে, 'হাঁড়িতে পান্তা ভাত ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তাই নিয়ে এস।' হুঙ্কার ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

তবু কুণ্ঠা যায় না সারদার। বললে, 'সঙ্গে তো আর কোনো তরকারি নেই।'

'আছে।' রামকৃষ্ণ আবার গর্জন করল। মাছ-চাটুই যে করেছিলে দেখ এক-আধটু পড়ে আছে কি না—'

সারদা ছুটে গেল রান্নাঘরে। দেখল বাটির এক

কোণে ছোট্ট একটি মৌরলা মাছ পড়ে আছে। আর তার আশে-পাশে একটুখানি কাই। তাই রাখলে ভাতের পাশে।

উল্লাস আর ধরে না রামকৃষ্ণের। ছোট্ট ঐ একটি মাছের সহযোগে এক রেক চালের ভাত খেয়ে ফেলল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সারদা। এ কি আহার না আহুতি!

এ নিছক পাগলামি। মনে-মনে আপশোষ করতে লাগল সারদার মা।

শুধু মনে-মনেই বা কেন? স্পষ্টাস্পষ্টিই দুঃখ করলে এক দিন। বললে, 'কী পাগল জামাইয়ের সঙ্গেই আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না—'

শুনতে পেল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'শাশুড়ি ঠাকরুণ, সে জন্যে দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে যে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে—'

'তা যা বলে গেছেন তাই ঠিক হয়েছে, মা।' শ্রীমা এক দিন তাই বললেন স্ত্রী-ভক্তদের। 'আমার নরেন বাবুরাম রাখাল শরৎ। আমার দুর্গাচরণ নাগ—'

ভক্ত মেয়েরা ঘিরে বসল শ্রীমাকে।

'মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা করালে নরেন, আমাকে নিয়ে গেল। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। মোট চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল নরেন। চারদিকে লোকারণ্য, ছেলেদের খাটা-খাটনির অন্ত নেই। হঠাৎ নরেন এসে আমাকে বললে, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, খানিক বাদে সত্যি-সত্যি তার হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল। সে কি কথা? এখন কি হবে। 'সেধে জ্বর নিলুম, মা। ছেলেগুলো প্রাণপণে খাটছে বটে, তবু কখন কি ভুলচুক করে বসবে আর আমি রেগে উঠে কখন থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি বিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।' হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি। ঝটকা মেরে যেমন তেমনি উঠে বসল নরেন।'

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

Paris, Feb. 20—Andre Gide, the "grand old man" of the French literary world, died at his home in Paris today.

He was 81.

Andre Gide had been in failing heath for several years. He was a Nobel Prize winner for literature and took his place with such men as Marcel Proust and Jules Romainsas a master of French Prose.—Statesman. Feb. 21. 1951.

সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে এই বয়োবৃদ্ধ লেখকের পরিচয় খুব বেশী নেই। আঁদ্রে জিদ ফরাসী দেশের জর্জ বার্ণার্ড শ। ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন—এ সংবাদ দুঃখের নয় আনন্দের। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জিদ জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস শহরে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯০ সালে প্রথম লেখনী ধারণ করেন। জিদের গভ প্রাউষ্টের সমতুল্য। ছন্দ এবং আলোচনায় Symbolist movement-এর এক জন প্রবর্ত্তক। তাঁর সাহিত্যিক রীতির কখনও পরিবর্ত্তন হয়নি, কিন্তু তাঁর রচনা-ধারার পরিবর্ত্তন হয়েছে দিনের পর দিন। তাঁর বিস্ময়কর জীবনে তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, কবি, নাট্যকার এবং সমালোচক হিসাবে ফরাসী সাহিত্যের এক জন দিক্‌পালরূপে সকলের নিকট পরিচিত। যুগে-যুগে তিনি পরিবর্ত্তন করেছেন তাঁর লেখার style, কিন্তু তাঁর নিজস্ব Literary fashion কখনও বদলায়নি।

তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিন এলো ১৯২০ সালে যখন তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্ম-জীবনী প্রকাশ করলেন। ১৯৩০ সালে তাঁর সকল গ্রন্থ পনেরো খণ্ডের এক গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়। তবুও ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি না কি রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং প্রায়ই বেতারে ভাষণ দিতেন। রাজনীতির দিক্ দিয়ে জিদ ছিলেন বামপন্থী। ১৯৩৬ সালে রাশিয়া থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে তিনি যখন "Retour de l'USSR" বইটি তিনি লিখলেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর বিপক্ষ দল থেকে প্রচুর নিন্দাবাদ শুনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পরাজয়ের তিক্ততা আগেই অনুমান করে-ছিলেন। এবং ফ্রেঞ্চ্ নর্থ অ্যাফ্রিকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ ভাগে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং পৃথিবীর সাহিত্য-মহলে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। আমরা তাঁর কাছে যে জন্যে ঋণী, তা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ফরাসী তর্জ্জমা। জিদ কবিগুরুর লেখার পরিচয় দেন ফরাসী সাহিত্যে। জিদের আত্মা অমর হোক—এই প্রার্থনা। আমরা এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আঁদ্রে জিদের একখানি সাম্প্রতিক আলোক-চিত্র মুদ্রিত করলাম।

খোবসশা-পাতাল

অ, আ, ই

অনেক আশা নিয়ে মন্দির থেকে ফিরেছিলেন কুমুদিনী।

তাঁর মনের মধ্যে তখনও ক্ষণে-ক্ষণে ভেসে ওঠে সেই মুখখানি। সেই কুমারী, যাকে তিনি ভাবী পুত্রবধূরূপে বরণ করবেন ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, আরও অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছেন সামান্য এই সময়ের মধ্যে। একটি মাত্র ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে বৌ আনবেন ঘরে। বৌ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে সকলে। তাঁর ঘর আলো করবে ঐ বৌ। বুঝে নেবে সংসারের সব-কিছু। ছেলেকে বশে আনবে। বৌ দেখে চোখ টাটাবে কারও-কারও। কুমুদিনীও নিশ্চিন্ত হয়ে যা হয় একটা স্থির করবেন। বৌয়ের হাতে সব তুলে দিয়ে বাকী দিনগুলি তীর্থদর্শনে অতিবাহিত করবেন। কিংবা কাশীবাসী হবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই মনে-মনে ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু কি কথা শুনলেন তিনি বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই! ছেলে সাজগোজ ক'রে বেরিয়েছে বসিরের সঙ্গে! অনন্তরাম এত দিনের লোক হয়েও পারলো না তার পথ রোধ করতে। ছেলের সঙ্গে না গিয়ে, একা-একা যেতে দিল তাকে। নিজের কপালের কথা ভাবতে ভাবতে কুমুদিনী হতাশার নিশ্বাস ফেলেন। অন্দরে গিয়ে রান্নাবাড়ীর দালানে বসে পড়েন ভাঙা-মনে। ভাল-মন্দ কত কি মনে হয় তাঁর।

ব্রাহ্মণী আসে উপবাস ভঙ্গের উপকরণ হাতে।

কষ্টিপাথরের পাত্রে ফল আর মিষ্টান্ন, এক বাটি মিছরির জল। কুমুদিনী তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিছরির জলটুকু এক নিমেষে নিঃশেষ ক'রে বলেন,—থাক, আর নয়। ও-সব রেখে দাও বামুন দিদি।

ব্রাহ্মণী সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। বলে,—সে কি কথা! তা হবে না, অমঙ্গল হবে ছেলের। নির্জলা উপোসের পর শুধু কি এক ফোঁটা মিছরির জল খেলেই চলে? নাও, নাও, খেয়ে নাও। দু'টুকরো ফল আর একটা মিষ্টি খাও।

কুমুদিনী যেন তার কথা এড়াতে পারেন না। বলেন,—তবে দাও। কিন্তু ছেলেটা গেল কম্‌নে এই অবেলায়!

কোথায় আবার? গরাণহাটায়।

হঠাৎ চলন্ত ফীটন থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে বসির। বলে,—এই গাড়োয়ান, বাঁধো হিঁয়া।

সঙ্গে-সঙ্গে থেমে যায় গাড়ী। পকেট থেকে একটা আধুলী গাড়োয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বলে বসির,—এসে গেছে, নামতে হবে যে।

শহরের ইদিকটা দিনের বেলায় যেন ঘুমিয়ে থাকে। রাত্রি না হ'লে তেমন যেন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। তবুও যা দু'-চার জন লোক-জনকে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের সব দেখলেই বোঝা যায় যে রাত্রি জাগরণে তারা ক্লান্ত আর অবসন্ন। রাস্তার দু'পাশের দোকান-পত্রে খদ্দের নেই এখন। শুধু যেন দোকান খোলাই সার। তবে, এখানে-সেখানে যে ক'টা মাংসের দোকান রয়েছে, ক্রেতার অভাব দেখা যাচ্ছে না। ঝুলন্ত পাঁটা সারি-সারি। মুণ্ডুগুলো সব লটকে পড়ে আছে দোকানের চাতালে। ক্রেতারা দাঁড়ি-পাল্লার দিকে চেয়ে আছে। দোকানে যেন রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। আর কয়েকটা কুকুর পাঁটার খুর-শিং নিয়ে পরস্পরে কামড়া-কামড়ি করছে। কোন-কোন খাঁটি হিন্দুর হোটেল থেকে পেঁয়াজ আর রশুনের গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। কারও ঘরের বারান্দায় পোষা-পাখী ডাকছে হয়তো। বিবিদের সব ময়না আর বুলবুলিরা কপচাচ্ছে একেক সময়ে। একটু কান পেতে শুনলে শোনা যাচ্ছে, হারমনিয়ম আর তবলার সুর আর বোল। সেই সঙ্গে কোন নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণ। কোন্ নবাগতা হয়তো তালিম নিচ্ছে দিনের অবসরে কে জানে।

বসির বললে,—এসো আমার সঙ্গে-সঙ্গে। কে কোথায় দেখবে আবার, চটপট এসো।

খানিকটা পথ যেতে না যেতেই বসির ঢুকলো এক বাড়ীর দরজায়। বসির যেন কেমন ব্যস্ত হয়ে আছে। কি এক কার্য্য উদ্ধারের আশায় চোখ-মুখ তার ব্যগ্র। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললো বসির। সিঁড়িটা প্রায় অন্ধকার ও নোংরা। কত দিনের সংস্কারের অভাবে মানুষের পদক্ষেপে বাসুকির ফণার মত যেন দুলে উঠলো। অতি সাবধানে সে বসিরের পিছু-পিছু উঠতে থাকে। ঠোক্কর খেতে-খেতে বেঁচে যায়। তাদের আসতে দেখে সভয়ে দৌড়ে পালায় কয়েকটা বেড়ালের ছানা।

সিঁড়ি শেষ হতেই চোখে পড়ে একখানা ঘর। সাজানো-গোছানো। কিছুটা রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যেন ঘরের ঘরণীর। দেওয়ালে সব আয়না। ব্র্যাকেটে বাতিদান। রঙিন ছবিতে নগ্ন নারীর নির্লজ্জ ভাবভঙ্গী। আদম আর ইভের সেই নিষিদ্ধ ফল-ভক্ষণের ছবি। কুঞ্জ-কাননে ফোয়ারার ধারে রূপবতী নারীরা সব এলিয়ে পড়েছে। ঘরের ফরাসে কয়েকটা তাকিয়া। অথচ ঘরে মানুষ আছে কি না সন্দেহ হয়।

বসির হাঁক দিলে,—কৈ গো বিবিজান! দেখতে পাচ্ছি না কেন, নেই না কি?

কৃষ্ণকিশোর এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে। গান শোনার আনন্দে বিভোর হয়েছিল। ঘর-দোর দেখেই যেন সাড় ফিরলো। বললে,—কোথায় এসেছি বসির?

কেউ কোথাও নেই না কি। সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কারও! এদিক-সেদিক তাকিয়ে বসির বললে,—তুমি ঐ ফরাসে গড়িয়ে পড়'। দেখি আমি কারও হদিস পাই না কি।

ইতিমধ্যে কে এক জন এসে ঘরের এক দরজায় দেখা দেয়। এক জন বয়োবৃদ্ধা নারী। বিপুল দেহের ভারে হাপুর মত আকৃতি।

কাঁচা-পাকা খয়ে চুলের একটা খোঁপা ঠিক মাথার তালুতে। নাকে একটা ঝুটো মুক্তোর নোলক। পান-খাওয়া পুরু ওষ্ঠাধর যেন মুখ থেকে ঝুলে পড়েছে। আসমানী রঙের কেঁসে-যাওয়া একখানা ঢাকাই কাপড় পরেছে। মুখখানা অস্বাভাবিক তৈলাক্ত। কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে বললে,—বসিরুদ্দিন না?

একটু নকল হেসে বসির বলে,—তাই তো মনে হচ্ছে মাসী। কিন্তুক বিবিজানকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তেনাকে ডাকো না একবারটি।

—ইটি আবার কে? শুধোয় মাসী।

মাসীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বসির এক চক্ষু মুদিত ক'রে ইশারায় কি একটা বললে। সঙ্গে-সঙ্গে মাসী দরজা থেকে অন্তর্হিত হ'ল। বসির ফরাসে ধপাস ক'রে বসে পড়লো। সে-ও এক পাশে আসন নিলে। বসির ব'সে ব'সে পা নাচাতে সুরু করলে। মুখে তার চাপা-হাসির রেখা।

ফরাসের একধারে ছিল একটা হারমনিয়াম, ডুগী-তবলা আর এক তাড়া ঘুঙুর। হারমনিয়ামের বড়া ধরে ফস ক'রে টেনে নেয় বসির। চাবিগুলো একে-একে খুলে বাঁ হাতে বাজাতে শুরু করলে দু' চোখ বন্ধ ক'রে। ঘরের স্তব্ধ আবহাওয়া ভঙ্গ হ'ল যেন এতক্ষণে। যন্ত্রচালিতের মত বসিরের বাঁ হাত খেলা শুরু করলে দ্রুত লয়ে হারমনিয়ামের বুকে। কি একটা গজল সুর ধরলে বসির। গান গাইলে না, শুধু বাজিয়ে চললো।

কৃষ্ণকিশোর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলো। ভয় আর উত্তেজনায় বুকটা তার দুরু-দুরু করছে। ঘরখানা কেমন যেন অদ্ভুত বিচিত্র মনে হচ্ছে। বিশেষতঃ দেওয়ালের ঐ ছবিগুলো।

—কে আমার বাজনায় হাত দিয়েছে? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো কে এক জন। মুখে তার হাসির মৃদু উদ্রেক। এইমাত্র সাজসজ্জা ক'রেছে দেখেই তা বোঝা যায়। ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা রঙ, টানা-টানা চোখে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পাৎলা ঠোঁট দু'টো আলতায় রাঙানো। টিকালো নাকে হীরের নাকছাবি। কাণে ঝুমকো। রুক্ষ চুলের খোঁপা পিঠে ঝুলে রয়েছে। গায়ে একটা ফিরোজা রঙের আঁটসাঁট নিমা। হলুদ রঙের সিল্কের সাড়ী, সাপের মত যেন জড়িয়েছে তার দেহে। পা মুড়ে বসলো সে ফরাসের মধ্যিখানে। বললে,—এমন অসময়ে কেউ আসে? এমন দিনের বেলায়!

বসির সে-কথার কোন উত্তর দেয় না। হারমনিয়াম বাজিয়ে যায়। ফিক-ফিক হাসে। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বলে,—এসেছে তোমার গান শুনতে। দু'টো মিঠে গান শুনিয়ে দাও দেখি। বাবুর মেজাজ তর্-র ক'রে দাও, বক্শিস নগদা-নগদি মিলবে। আমি তবলা ধরছি।

আবেদন শুনে বিবি সলাজ হাসে। শ্রোতাকে চোখ ফিরিয়ে দেখে বার কয়েক। বলে,—গলাটা ক'দিন ভেঙে গেছে। তেমন কি গাইতে পারবো?

বসির বললে,—ভাঙা গলার গান জমবে ভাল। আর দেরী নয়, চটপট ধ'রে ফেলো গহর।

ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো গহরজান। মুখে কেমন যেন তার অনিচ্ছা ভাব! বসির ঠেলে দেয় হারমনিয়াম। টেনে নেয় বাঁয়া আর তবলা। হাতুড়ীর ঘা মারতে সুরু করে, সুরে সুর মেলায়। মাসী একবার এসে দেখে যায় ব্যাপার কত দূর গড়িয়েছে। গহরজান খেয়ালের সুর ধরে মিহি গলায়। কথা নেই কোন, শুধু গুঞ্জন। বসির হঠাৎ হাতুড়ী রেখে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—লিমনেড, আইসক্রীমের পালা উঠিয়ে দিয়েছো না কি?

গহরজান বললে গান থামিয়ে,—বল না মাসীকে। জোগাড় ক'রে দেবে।

বসির এক লাফে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এ ঘর থেকে পাশের ঘরে যায়। মাসী সেখানে সবে তখন পানের বাটা পেড়ে বসেছে পান সাজতে নিজের জন্যে। বসির চুপি-চুপি বললে,—মাসী, একটা বোতল বের কর দিকিন। আর দু'টো সোডা।

মাসী হাত পাতলে সঙ্গে-সঙ্গে। বললে,—ফেলো কড়ি মাখো তেল। টাকা কৈ?

বসির বিরক্ত হয়ে বলে,—তোমার মাসী সেই পুরানো অভ্যেস আর গেল না। কেবল টাকা, টাকা আর টাকা। টাকা কি মারা যাবে! খাইয়ে আগে বেহুঁস করি বাবুটিকে, তার পর নাও না তোমার টাকা, কত নেবে তুমি। টাকা কি আর আমি দেবো? দেবে ঐ কাপ্তেন।

মুখ-বিবরে দু'টো পান আলগোছে পুরলে মাসী। বললে,—তবে র'স, দিচ্ছি বের করে। ঐ দেরাজটায় আছে। তৎক্ষণ তুমি দু'টো কাচের গেলাস পাড়ো না ঐ তাক থেকে। গেলাসও চাই তো?

—চাই না আবার। গেলাসই তো চাই। দু'টো নয় তিনটে। বসির তাক থেকে গেলাস পাড়ে আর বলে,—গহর খাবে না? তিনটে গেলাস চাই যে।

মাসী বললে,—এই দিন-দুপুরে মেয়েটাকে বেহেড ক'রে দিও না বসির। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। এখনও রাত্তির বাকী—

—আরে যাঃ! বসির বললে,—তুমিও যেমন মাসী। সামান্য এক-আধ গেলাসে বেহেড হওয়ার মেয়ে ও?

মাসী দেরাজ খুলতেই দেখা যায় একটা বোতল নয়। সারি-সারি নানা আকারের অনেকগুলি বোতল রয়েছে সেখানে। দেশী আর বিলেতী, সোডা আর লেমোনেড। একটা মাঝারি সাইজের বোতল বের ক'রে দিলে মাসী। হাতে নিয়ে বললে বসির,—চাবি কৈ?

মাসীর মুখে পানের পিক। মাসী বললে,—চাবি আবার তোমার কি হ'বে? তুমি তো দাঁতে বোতল খুলতে পারো। খুলে ফেলো না!

—ওঃক্, মেয়েমানুষ বটে একখানা তুমি! কথা শেষে সত্যিই বসির দাঁতের কামড়ে খুললে একটা বোতল নয়—সোডার বোতলটাও খুলে ফেললে এক কামড়ে। তার পর সমান অংশে ভাগ করলে তিন গেলাসে ঐ দুই বোতলের পানীয়। প্রথমে দুটি গেলাস ধরে নিয়ে গেল। একটা গহরজানের হারমনিয়ামের ওপরে বসিয়ে দিলে।

[৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

চন্দ্রনাথ বসু

১৮৪৪—১৯১০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিজের জীবনকথা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ-হিসাবে উহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। এই আত্মকথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

জন্ম : বংশ-পরিচয় : শিক্ষা

"সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র [৩১ আগষ্ট ১৮৪৪] হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺ সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺ কাশীনাথ বসু। ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল। পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই।

হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতাম। এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল-কলেজের ছুটি হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটি ফুরাইলে এক মাস দেড় মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাও এক রকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রামও দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্য-জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।...

পঞ্চম বর্ষে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে পর আমি পাঠশালায় প্রবেশ করি। আমাদের বাড়ীতেই পাঠশালা ছিল।...আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার পিতামহের চারি পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ, আমার পিতৃব্য, বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। ইংরেজী শিখাইবার জন্ত তিনি আমাকে হেদোর স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের বাসা শিমলার বাজারের প্রায় সম্মুখে। সুতরাং ঐ স্কুলের অত্যন্ত নিকটে ছিল বলিয়াই বোধ হয় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের স্কুল, হয়ত আমাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত। আমাদের মাষ্টার নস্ত লইতেন, তাঁহার হাতে একটি নস্য-দান থাকিত। আমি মনে করিতাম, উহাতে গোমাংস আছে, কবে জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিবে। আমার স্বর্গীয় পিতামহীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম। ছয় মাস মাত্র হেদোর স্কুলে রাখিয়া পিতা আমাকে ওরিয়েন্টল সেমিনরির শাখা-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ওরিয়েন্টল সেমিনরি স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত, তখন বড়ই প্রসিদ্ধ, এখন খর্ব্ব হইয়াও সুন্দর ভাবে পরিচালিত। তখন উহার দুই তিনটি শাখা ছিল—একটি কলিকাতায়, উহারই নিকটে, আর একটি ভবানীপুরে, আর একটি বেলঘরিয়ায়। মূল ও শাখা-স্কুল কয়টিতে বোধ হয় দেড় হাজার বালক শিক্ষা লাভ করিত। মূল স্কুলে ইংরাজী সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল। তজ্জন্ত উহার যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল, বোধ হয় কলিকাতার আর কোন স্কুল বা কালেজের সেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল না। অঙ্ক ও বাঙ্গালায় তত মনোযোগ ছিল না। এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা-স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। তাহার কারণ, হেড মাষ্টার মহাশয়কে দুই চারিটা কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি অর্থ জানিতেন না, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্ত চড় মারিয়াছিলেন। তখন আমার Pope's Iliad পড়া হইয়া গিয়াছিল। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ('বিবাহ বিভ্রাট'-প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্ত প্রতি দিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম—একটি কথাও কহিতাম না, কৈলাস বাবুকেও কিছু বলিতাম না। গানের গোড়াটা মনে আছে—'চতুরঙ্গের কিবা ছিরি মরি হায় হায়। পেট মোটা গলা সরু, বেটা যেন বামণের গরু।' তাহারা দিন কতক এইরূপ করিয়া আপনারাই পলাইয়া গেল। তখন স্কুলের স্থাপয়িতা গৌরমোহন আঢ্য লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় স্কুলের অধিকারী ও অধ্যক্ষ—জ্যেষ্ঠের কীর্ত্তি রক্ষণে বড়ই যত্নশীল। উচ্চশ্রেণীতে তিনি বড় বড় ইংরাজ ও ইউরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। প্রসিদ্ধ কাপ্তান রিচার্ডসন, হার্মান জেফ্রয়, কাপ্তান পামার, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি—এইরূপ লোকে উপরে অধ্যাপকতা করিতেন। আর নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকতার যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, সেরূপ বোধ হয় আর কোন স্কুলে কখন হয় নাই। বাঙ্গালী বালকের ইংরাজী উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় বলিয়া ওরিয়েন্টল সেমিনরির নিম্নতম শ্রেণীতে এক জন ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম হইতেই শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শিখিত এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও সুশাসনে থাকিত।

যখন জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই এক দিন পড়াইয়াছিলেন। এন্ট্রান্সের পাঠ্যের মধ্যে Rogers's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য-প্রণেতাদিগের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারি দিনের বেশী পড়া হয় নাই—তিনি বিলাতে [?] চলিয়া গেলেন। দুই দিনেই কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের তাঁহার মতন অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।

আমাদের একটি ক্লব ছিল—নাম ওরিয়েন্টল ডিবেটিং ক্লব। কেবল ছাত্রদিগের ক্লব। আমরা আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে প্রবন্ধ

লিখিয়া পাঠ করিতাম এবং আপনারাই তর্ক-বিতর্ক করিতাম। বার্ষিক অধিবেশনেও আমরাই প্রবন্ধ পাঠ করিতাম।...

ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, অঙ্কে ও বাঙ্গালায় এতই কাঁচা ছিলাম। উত্তীর্ণ হইবার পর স্থির হইল যে, আমাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, পিতৃদেব মাসে দশ টাকা করিয়া বেতন দিয়া আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু বিধাতা একটু অনুকূল হইলেন। Atkinson সাহেব তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ। তিনি উদারচেতা ছিলেন। হরেকৃষ্ণ বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে আট টাকা মূল্যের একটি ছাত্রবৃত্তি দিবেন। হরেকৃষ্ণ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সাশ্রুলোচনে ঐ কথা বলিলেন। ১৮৬১ সালের প্রারম্ভেই আমি প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৺ প্যারীচরণ সরকার আমাদিগকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। অতি অল্প অধ্যাপককেই তাঁহার ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি আমাদিগকে ইতিহাসের প্রশ্ন দিতেন, আমরা বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া লইয়া যাইতাম, তিনি সেই সত্তর আশী খানা উত্তর সাবধানে সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। Carnduff নামক এক জন অধ্যাপকও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লেখাইতেন। শুনিতে পাই, ঐরূপ লেখাইবার প্রথা এখন আর নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপক কাউয়েলের নিকট পড়িয়াছিলাম। তেমন অধ্যাপক বুঝি আর হয় না—পাণ্ডিত্য যেমন বহুবিষয়ব্যাপক তেমনি প্রগাঢ়, ছাত্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত। ১৮৬২ সালে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলাম, প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন রাসবিহারী। যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওরিয়েন্টল ডিবেটিং ক্লবের ন্যায় প্রেসিডেন্সী কালেজেও আমাদের একটি ক্লব ছিল। এই ক্লবেও আমরা আপনারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম, আপনারাই তর্ক-বিতর্ক করিতাম, বাহিরের লোক আনিতাম না। যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমরা Calcutta University Magazine নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামি, যিনি এখন নিজামের রাজ্যে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, উহার এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ পত্রে On the importance of the study of history নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে Englishman সম্পাদক লিখিয়াছিলেন —We trust this article is from a native pen, though we doubt it. আর বলিয়াছিলেন যে, উহাতে খুব originality of thought ছিল। এ কথা এত দিন কাহাকেও বলি নাই। এখন বলিতে হইল। কাগজখানি পনের মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহাও কেবল ৺ প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে হইয়াছিল। তিনি কাগজখানি আপনার প্রেসে ছাপাইয়া দিতেন।...

১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, রাসবিহারী এবং মৃত অধ্যাপক ব্লকমান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি বঙ্কিম বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পরীক্ষায় ব্লকম্যান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকমান আইন-ই-আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে? বঙ্কিম বাবু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—আমরা কেবল পরীক্ষা দিতে পারি। ১৮৬৬ সালে এম-এ [ইতিহাসে অনার্স] এবং ১৮৬৭ সালে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলাম। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

অন্নসংস্থানে

বি-এল পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে, আমিও তেমনই ছুটিয়াছিলাম। চাকরি করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না, তখন মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার হাওয়া ভাল নয়। মামলা মোকদ্দমা আমার ভালও লাগিত না। শীঘ্রই বুঝিলাম, অনেকে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈরসাধনার্থ অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থনাশ করে, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হয়, এবং সমাজে বিষম অশান্তি এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। মফঃস্বল হইতে আমার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইবার লোকও ছিল না। মোক্তারদিগের খোসামোদ করিতেও পারিতাম না। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। অধ্যাপকতা করিবার ইচ্ছা হইল। তখন উড্রো সাহেব শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি বড় সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন বিদায় গ্রহণ করণার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—'আমি যদি তোমার পিতা হইতাম তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।' তেমন করিয়া কথা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীরা এখন কহেন কি না জানি না। তিনি পাঁচ সাত দিন পরেই আমাকে কটক কলেজে দুই শত টাকা বেতনের একটি অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আমার একটি ডিপুটী মেজেষ্টরী পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তখন আপনিই বলিলেন—না, অধ্যাপকতা লইও না, ডিপুটী মেজেষ্টরীই লও। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় ডিপুটীগিরি করিতে যাই। ডিপুটীগিরি ভাল চাকরি বোধ হইল না। ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবা মাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন—জয়পুর কালেজের প্রিন্সিপাল নাই, কান্তি বাবু আপনাকে চান, যাইবেন কি? আমি যাইলাম। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর ভারতবর্ষে আর নাই। এক জন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ছাড়িয়া দিলে, জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর পৃথিবীতে আর নাই। জয়পুর মহারাজ জয়সিংহের স্থাপিত। উহার গঠন-প্রণালী বিদ্যাধর নামক এক জন বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত। বিদ্যাধরের গলী বলিয়া জয়পুরে এখনও একটি রাজপথ আছে। জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের

সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তি বাবুই জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ✓যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকাশুদ্ধ প্রায় দেড় শত বাঙ্গালী ভোজনে বসিয়াছিলাম। জয়পুরে থাকিলে অনেক টাকা করিতে পারিতাম। যেদিন সেখানে যাই তাহার পরদিনই কান্তি বাবু বলিয়াছিলেন—কালেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন-বিভাগে আনিব। কিন্তু দেখিলাম, রাজসভার হাওয়া বড় ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। সহরটাও দেখিলাম বড় শুষ্ক ও রুক্ষ-দর্শন। তিন দিকে তৃণশূন্য পাহাড়, সমতল স্থান তৃণশূন্য, বারিশূন্য, বালুকাময়। আমি বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল উদ্যানবিহারী, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' বঙ্গের বাঙ্গালী, জয়পুরের দৃশ্য আমার ভাল লাগে নাই। তিন মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলাম—বিধাতাকে বলিতে বলিতে আসিলাম, ঘরেই যেন আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়। বিধাতা কৃপা করিলেন। ছুটি ফুরাইবার অগ্রেই বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ খালি হইল। কয়েক জন ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌ট বলিলেন—চন্দ্রনাথ যদি প্রার্থনা করেন, আর কেহ এ কর্ম্ম পাইবে না। তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। তাঁহারা কিন্তু উপাধিধারীদের সংবাদ রাখিতেন। তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ সাহেবেরা এখন রাখেন কি? ১৮৭১ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কর্ম্ম পাই। পাইয়া ৭ বৎসর কয়েক মাসে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহোদর সদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতি অকালে স্বর্গারোহণ করায় ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে আমি বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হই। অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনই অপ্রীতিকর, পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিবার পর ইহাকে ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য ভাবিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারিতে [১৯০৪] অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

মাতৃভাষার সেবা

গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বাঙ্গালা শেখা হয় নাই। প্রেসিডেন্সী কালেজে প্রথম দুই বৎসর যাঁহার কাছে বাঙ্গালা পড়িয়াছিলাম তিনি বাঙ্গালী বটে, কিন্তু বাঙ্গালা জানিতেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আটক পড়িতে হয় নাই। বাঙ্গালার পরীক্ষা শব্দ-গত না হইয়া এত অর্থ-গত হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। ভালই পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গোড়া কাঁচা ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষ ফল পাই নাই। তিনিও সংস্কৃতে বেশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আমাদের পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং উহাতে তত মনোযোগী না হইয়া, পাঠ্য নয় এমন ইংরাজী পুস্তক বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটাও কতক ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এক দিকে যেমন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি-এ পাস করি নাই তখন ✓গিরিশচন্দ্র ঘোষের Bengalee কাগজে লিখিতাম। এম্-এ পাস করিয়াই On the Life and Character of Oliver Cromwell নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম! কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা [1879, No. 137, pp. XIX—XXIV] পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ ···]। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি প্রেস যে বাড়ীতে ছিল বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদক আমার ঋষিতুল্য বন্ধু পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই বাসায় থাকিতেন। তাঁহার অনুবাদকার্য্য তখন চলিতেছিল। প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই চারি জন তাঁহার নিকট যাইতাম এবং রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনাও হইত। শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।

যখন কালেজে পড়ি, তখন আমার দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না, আমি সত্য ধর্ম্ম খুঁজিতাম। তখন কেশব বাবুর ধর্ম্মান্দোলনের ধুম পড়িয়াছিল; অনেক যুবক তাঁহার চেলা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কালেজে আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েক জন উত্তমশীল চেলা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম—কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reed, Hamilton, Kant, Victor Cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর অগষ্ট কোমতের দুই একখানা গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল, কিন্তু কোমতের ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাঁহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম। মহামনা মহাপুরুষ বলিলেন,—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্যধর্ম্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন

ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিম বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিম বাবু চূড়ামণি মহাশয়কে এক দিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ, যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্ম্মের অন্তর্গত দেখিলাম, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে; যাহা এক অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে [১৫ এপ্রিল ১৮৭৮] Bethune Society নামক সভায় *High Education in India* নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ প্রণালী শীর্ষক একটি প্রবন্ধ [মাঘ ১২৯২] লিখিয়াছিলাম। উহা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—"আমিও জাতিভেদটাকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।" নবজীবনের ঐ প্রবন্ধটি মৎপ্রণীত 'ত্রিধারা' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলাতত্ত্বে, ফুল ও ফলে, ত্রিধারায়, হিন্দুত্বে, সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছি। কঃ পন্থাঃ শ্রীমান্ গোবিন্দলাল দত্তের সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। হিন্দু সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যোচিত, উহাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি নামক একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষৎ তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে ছিল এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু উহার সভাপতি ছিলেন। কি জন্য উহা পরিষৎ পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না। আমি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছি। সাধু ও অসাধু দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতা বর্দ্ধনার্থ সাধু ভাষাই অবলম্বনীয়, এই প্রবন্ধে এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একখানি জাত মাত্র মৃত মাসিক পত্র ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোথাও এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ দেখি নাই। উক্ত পত্রের প্রতিবাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অথচ বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তখনও যেমন অসাধু ভাষার ব্যবহার করিতেন এখনও তেমনই করিতেছেন। হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ প্রণালী সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল স্থানে এই সকল মতের প্রতিবাদ দেখিব মনে করিয়াছিলাম সে সকল স্থানে এ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ দেখি নাই। অথচ এই সকল মত গৃহীত হইবার লক্ষণ কোথাও দেখি না। 'বেতালে বহুরত্ন' সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিতে পারি না—আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।" *

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পরিষদের শৈশবাবস্থায় চন্দ্রনাথ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩০২ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরের মধ্যভাগে স্থায়ী সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত কমিশনার পদে উন্নীত হইয়া উড়িষ্যা গমন করিলে চন্দ্রনাথ বর্ষের বাকী ছয় মাস অস্থায়ী ভাবে সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর বৎসর ১৩০৩ সালে তিনি পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

মৃত্যু

১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় (২০ জুন ১৯১০), ৬৬ বৎসর বয়সে চন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক চন্দ্রনাথ যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইল উহা সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরী-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। শকুন্তলাতত্ত্ব। ১২৮৮ সাল (১১-১১-১৮৮১) পৃ, ১৫১।

"অভিজ্ঞানশকুন্তল শীর্ষক যে কয়টি প্রবন্ধ সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এই পুস্তকে অভিজ্ঞানশকুন্তলের কেবল মাত্র নাটকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বলে তাহা বুঝাই নাই।" —বিজ্ঞাপন।

২। পশুপতি-সম্বাদ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। চৈত্র ১২৯০ (২৫-৩-১৮৮৪)। পৃ. ৬২।

"সংশোধিত হইয়া [১২৯০ সালের] বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।" গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই; ইহা পরেশনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"উপন্যাসের আকারে ইতিহাস লিখিতে হইল। পদ্ধতি ঠিক নয়। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বঙ্গে এখন উপন্যাস বই আর কিছুই বড় একটা চলে না।"—বিজ্ঞাপন।

৩। ফুল ও ফল। বৈশাখ ১২৯২ (১৫-৫-১৮৮৫)। পৃ, ৮৪।

---

* 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১ সাল), পৃঃ ৬৮১—৯১। চন্দ্রনাথ 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' পুস্তকেও জীবনের অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

"গ্রন্থের সকল প্রবন্ধই বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কেবল আনুষঙ্গিক-কথা নামক প্রবন্ধটি প্রচার হইতে গৃহীত। পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছি।"

সূচী: ফুলের বৃন্ত (ধ্যান); ফুল (কোকিল); ফল (অদৃষ্ট); ফুল (ফুলের ভাষা: ১—মন্দাকিনী, ২—সুরধুনী, ৩—ভোগবতী); ফল (জীবন ও পরলোক, ইহলোক ও পরলোক, আনুষঙ্গিক কথা—ভালবাসা, পরলোক কোথায়?)

৪। গার্হস্থ্য পাঠ। চৈত্র ১২৯২ (ইং ১৮৮৬)। পৃ: ১০১।

"আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী সম্বন্ধে সকল প্রকারের কথা এ গ্রন্থে বলি নাই। যে সকল কথা বলিতে বাকি রহিল তাহা আর একখানি গ্রন্থে বলিব।"—অবতরণিকা।

সূচী: গৃহ পরিষ্কার রাখিবার কথা, গৃহসামগ্রীর কথা, রান্নাঘরের কথা, অন্নব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা, শয়ন করিবার কথা, গৃহকর্ম করিবার কথা, গার্হস্থ্য পাঠের তত্ত্বকথা।

৫। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি। ১২৯৪ সাল (১৫-৭-১৮৮৭)। পৃ: ৩৮।

সূচী: স্নান করিবার কথা, কাপড় পরিবার কথা, রান্নাঘরের কথা, অন্নব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা, শয়ন করিবার কথা।

৬। হিন্দু বিবাহ। পৌষ ১২৯৪ (২৭-১২-১৮৮৭)। পৃ: ৫৪।

"সাবিত্রী লাইব্রেরির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে...যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, নবজীবন হইতে তাহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। পুনর্মুদ্রাঙ্কনে প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।"—প্রকাশক

৭। ত্রিধারা। মাঘ ১২৯৭ (১-২-১৮৯১)। পৃ: ১৫১।

সূচী।—১ম ধারা: অনন্ত মুহূর্ত্ত, পাখিটি কোথায় গেল? ছায়া, বউ কথা কও, দুইটি হিন্দু পত্নী, সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

২য় ধারা: কেতাব কীট, ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা, জীবনের কথা।

৩য় ধারা: সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাঙ্গালির প্রকৃত কাজ, বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র, দেব-ধর্ম্মী মানব, পাপ-পুণ্য।

পরিশিষ্ট: জন্তু-ধর্ম্মী মানব।

৮। হিন্দুত্ব [হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস]। ইং ১৮৯২ (২৪শে ডিসেম্বর)। পৃ: ৪০৫।

৯। কঃ পন্থাঃ। ইং ১৮৯৮ (১ মে ১৮৯৯)। পৃ: ৬৮।

"সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইবার পর পরিবর্দ্ধিত হইল।"

১০। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি। ১৩০৬ সাল (১০-৭-১৮৯৯)। পৃ: ৫১।

১১। সাবিত্রীতত্ত্ব। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ (৫-৭-১৯০০)। পৃ: ২১৫।

১২। "বেতালে" বহু রহস্য। ইং ১৯০৩ (১২ জুন ?)। পৃ: ৪১।

"সাহিত্য সভার ১৩০৯ সালের ২৯এ চৈত্রের অধিবেশনে পঠিত।"

১৩। সংযম-শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান। ১৩১১ সাল (২০-১-১৯০৪)। পৃ: ১২৪।

সূচী: ১। সংযম, ২। সংযমের সূত্রপাত, ৩। শৈশবে সংযম, ৪। আহারে সংযমশিক্ষা, ৫। পরিধানে সংযমশিক্ষা, ৬। আমোদে সংযমশিক্ষা, ৭। ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, উল্লাসাদিতে সংযমশিক্ষা, ৮। সভাসমিতিতে সংযমশিক্ষা, ৯। উপসংহার, ১০। পরিশিষ্ট।

১৪। পৃথিবীর সুখ দুঃখ। ফাল্গুন ১৩১৫ (১৬-৩-১৯০৯)। পৃ: ১১৪ + ১৪।

"সাহিত্য পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

"গত বৎসর রোগশয্যায় পড়িয়া যখন এই পুস্তকের লিখিত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন স্থির করিয়াছিলাম, ইহার নাম দিব 'আমার শেষ কথা'। সেই জন্য এই পুস্তকের ভিতরে ঐ তিনটী শব্দ আছে।...১০৯ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার পুত্র প্রকাশনাথের লিখিত।"—পূর্ব্বভাষ।

চন্দ্রনাথ 'প্রথম নীতিপুস্তক', 'নূতন পাঠ' প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্র 'সবুজ পত্র' (আশ্বিন ১৩২৫) ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময়ে মতবিরোধ ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে আগাগোড়াই একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা 'আনন্দ মঠ' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

কলিকাতা
১লা কার্ত্তিক ১২৯১

সবিনয় নিবেদন—

আনন্দমঠ সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহারি একটু আলোচনা করিব। বোধ হয় তাহাতেই অনেকটা গোল মিটিয়া যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে বোধ হয় আনন্দমঠ আপনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন আমি ঠিক সেই চক্ষে দেখি নাই—বোধ হয় কোন গ্রন্থই দুই জন এক চক্ষে দেখে না। অতএব আপনি যে spiritএ আনন্দমঠ পড়িয়াছেন আমি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। অতএব বুঝিবার দোষে যদি কোন গোল থাকিয়া যায় তাহার প্রতীকারের চেষ্টা পরে করিব।

আনন্দমঠের কার্য্য সচরাচর সংসারধর্ম্মের কার্য্য নয়—আনন্দমঠের ছবি সংসারধর্ম্মের ছবি নয়। আনন্দমঠের কার্য্য একটি বিশেষ কার্য্য, সচরাচর বা every-day life-এ মানুষ যে কার্য্য করে না সেই কার্য্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা—এই কার্য্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য্য নাই—তাহারা যতক্ষণ আমাদের সামনে আছে ততক্ষণ তাহাদের সেই একমাত্র কার্য্য—সেই কার্য্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, ভাবনা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি

পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—সে কার্য্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটিমাত্র ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই। স্পার্টাবাসীরা এক উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করিত। তাই সমস্ত স্পার্টাবাসীকে একটিমাত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভেদ সব সেই-এক উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছিল। রোমের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সামরিক প্রাধান্য। অতএব প্রত্যেক রোমানকে সেই এক উদ্দেশ্যের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হইত—যেন সকল রোমানই এক ছাঁচে ঢালা। কার্থেজ যখন রোমের সহিত সাংঘাতিক সমরে নিযুক্ত তখন সমস্ত কার্থেজবাসী একটি ব্যক্তিস্বরূপ—একমন, একপ্রাণ, এক-নিশ্বাস, এক-উদ্দেশ্য। যেন সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। ইংরাজের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য—অতএব সকল ইংরাজই যেন একমাত্র বাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি—সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম-ময়—সকল হিন্দুই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ইউরোপের নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসী ক্রুজেডে যাইতেছে—যেন সেই লক্ষ লক্ষ লোক সব এক দেশের লোক—এক-মনা লোক—এক ছাঁচের লোক। ক্রমওয়েলের অসংখ্য Ironsides সবই এক ছাঁচে ঢালা—যেন তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। এক-ব্রতীরা যতই এক-ব্রত হইতে থাকে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ ততই লোপ হইতে থাকে। শেষে যখন সমস্ত এক-ব্রতীরা এক-ব্রতী হইয়া পড়ে তখন তাহারা একটি regiment-এর সৈন্যগণের ন্যায় একটি ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে—তখন নাম ও নম্বর ভিন্ন তাহাদিগকে চিনিবার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি এইরূপ বুঝি যে, আনন্দমঠের পাত্রগণকে যদি আপনার কেবলমাত্র নাম ও নম্বর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে এক-ব্রতীরা যথার্থই এক-ব্রতী হইয়াছে—বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য যথার্থই সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা—এক উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট অথবা এক-ব্রতী লোকদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা তাহারা নিজে করে না—কে যেন তাহাদিগকে সেই সব কার্য্য করায়। যে করায় সে হয় একটি idea নয় একটি ব্যক্তি। স্পার্টাবাসীরা যে সব কার্য্য করিত তাহা তাহারা নিজে করিত না, Lycurgus নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। ক্রমওয়েলের Ironside সৈন্যগণ যাহা করিত, তাহা তাহারা নিজে করিত না, ক্রমওয়েল নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। নেপোলিয়নের সৈন্য যাহা করিত তাহা নেপোলিয়ন নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। হিন্দুরা যেরূপ সংসারধর্ম্ম করে তাহা তাহারা নিজে করে না, মনু নামক জাদুকর তাহাদিগকে করান। আজিকালি জার্ম্মাণেরা যাহা করিতেছে তাহা তাহারা নিজে করিতেছে না, বিসমার্ক নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে। সকল মহৎ কর্ম্মই জাদুকরে করে, মানুষ নিজে করে না। বিশেষ যখন এক-ব্রতীরা একত্র হইয়া কোন মহৎ কর্ম্ম করে তখন তাহারা নিজে তাহা করে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করায়। অতএব আপনাকে যে বোধ হইয়াছে যে আনন্দমঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে, ইহাই আমার মতে আনন্দমঠের success-এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সত্যানন্দ যথার্থই ভেল্কী হানিবল, আলেক্জন্দার, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, মায়রাবো, পেরিক্লিস, লাইকরগস্, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, মনু—সকলেই তাই। আমারও সত্যানন্দকে 'ভেল্কী' বলিয়া মনে হইয়াছে এবং সেই জন্যই আমি বলি যে আনন্দমঠ অতি চমৎকার success.

তবে একটি কথা আছে। আনন্দমঠ এত successful বলিয়া আমার মনে হইলেও, আমার এমনটা বোধ হয় যে আনন্দমঠের ব্যাপারটা যেন কিছু সুদূরস্থাপিত ব্যাপার। এরূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, সে ব্যাপার মানুষের নিত্য সাংসারিক জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। যে কার্য্য মানুষ সর্ব্বদা করে না, বিশেষ বাঙ্গালি যাহা স্বপ্নেও মনে করে না, তাহা বাঙ্গালিকে কিছু ফাঁকা ফাঁকা রকম ঠেকিবারই কথা। কিন্তু আনন্দমঠের কবি ভয়ানক স্বদেশভক্ত এবং স্বদেশের উদ্ধার তাঁহার বড় সাধের চির-সঞ্চিত সুখ-স্বপ্ন। অতএব আনন্দমঠের ব্যাপার তাঁহার কাছে সুদূর-স্থাপিত বা devoid of human interest নয়। এবং আমরাও যখন তাঁহার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগ অনুভব করিব তখন আনন্দমঠের ব্যাপার আমাদিগকেও সুদূরস্থাপিত বা devoid of human interest বলিয়া বোধ হইবে না। এখনও আমি যখন বঙ্কিম বাবুর মনের ভাব কল্পনা করিয়া আনন্দমঠ পড়ি তখন আনন্দমঠে প্রভূত human interest দেখিতে পাই। তখন আনন্দমঠের কবি এবং আনন্দমঠ উভয়কেই বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ideal জিনিস বলিয়া আমার মনে হয়। অথচ human interest-এ পরিপূর্ণ। স্বদেশ কি human interest-এর জিনিস নয়?

শান্তি ব্যতীত আনন্দমঠ হয় না। স্ত্রী patriot এবং বীর না হইলে পুরুষ বীর এবং patriot হয় না। তাই শান্তির সৃষ্টি। অতএব শান্তি স্ত্রী—প্রকৃত স্ত্রী—যেমন দুর্গাবতী, জয়াবতী, মিরাবাই ইত্যাদি। তবে আনন্দমঠের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট। সে নির্দ্দিষ্টরূপে শান্তি শান্তিরূপে বই অন্যরূপে দেখা দিতে পারে না। তাই বলিয়া কি তাহাকে সে রূপে দেখিব না? সকলের সকল রূপই দেখিতে হয়, নইলে দেখাই হয় না, সংসারও বুঝা হয় না। পারিবারিক জীবন আনন্দমঠের উদ্দেশ্য হইলে, আনন্দমঠে শান্তিকেও নিমাইমণির মতন ঘরের জিনিস দেখিতাম এবং সন্ন্যাসিনী শান্তিতে যেরূপ অগাধ প্রেম, পতিভক্তি, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি এবং চপলতা, হাস্যময়ভাব, রসাধিক্য, sprightliness প্রভৃতি গুণ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে আনন্দমঠ পারিবারিক উপন্যাস হইলে তাহাতে শান্তিকে বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, মৃণালিনী, কমলমণি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রমণীর এক অদ্ভুত, অনুপম ঐন্দ্রজালিক সংযোগরূপে দেখিতাম। তবে আপনি যেমন বলিয়াছেন আমারও তেমনি বোধ হয় যে বঙ্কিম বাবু শান্তিকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যখন হস্তলিপি হইতে আমাকে আনন্দমঠ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন তখন আমিও তাঁহাকে একথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি শুনেন নাই। বোধ হয় তাঁহার মত আমার মতের সহিত মিলে নাই।…"

চন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যে চিন্তাশীল সাহিত্যরসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ-লেখকের সংখ্যা অল্প ; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব, বঙ্কিম এবং পরবর্ত্তী কালে রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহাদের মধ্যে ভূদেব-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুও এক জন। তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও সাবিত্রীতত্ত্ব' একদা শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে আনন্দ দিয়াছিল এবং ইঁহার 'সংযম-শিক্ষা' তরুণ বাঙালীদের নৈতিক আদর্শ দৃঢ় করিয়াছিল। 'সংযম-শিক্ষা'র চমৎকার রচনা-গুণে তিনি আজিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি তাঁহার 'পৃথিবীর সুখ দুঃখে' লিখিয়াছেন :—

"আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এই জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম এ দেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।"

ইহাতে কথঞ্চিৎ অত্যুক্তি ও অহমিকা প্রকাশ পাইলেও চন্দ্রনাথ সত্য সত্যই যে গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমালোচনা-সাহিত্যেই তাঁহার উৎকর্ষ সমধিক লক্ষিত হয়। হাল্‌কা নিন্দাধর্ম্মী 'পশুপতি-সম্বাদ' বেনামীতে লিখিয়া তিনি যদিও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের আদর্শচ্যুত হইয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, তথাপি রস-রচনাতেও যে তাঁহার হাত ছিল, 'পশুপতি-সম্বাদ' তাহাই প্রমাণ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" বক্তৃতায় সমালোচক চন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় সমালোচকদের সহিত তুলনা করিয়া গৌরবের আসন দিয়াছিলেন। আমরাও মনে করি সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য-সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু চিরদিন বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় থাকিবেন। তাঁহার সমালোচনা-শক্তির একটু নিদর্শন নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম :—

"সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুরই স্থিরতা নাই, সকলই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্ত্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত, পর মুহূর্ত্তে তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয়, নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র, তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য্য করা, কথা কওয়া বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহারই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে, তিনি যে অবস্থায় পতিত, সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন বা কথা কহিতেছেন, সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্র-বিশিষ্ট সেই চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ, কোন একটি জ্যামিতি-সূত্র হইতে যেমন অপরাপর জ্যামিতি-সূত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্যনিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকে তাহাই হইয়া থাকে। হ্যামলেটের কথা হ্যামলেটের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; ইয়াগোর কথা ইয়াগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; দুষ্মন্তের কথা দুষ্মন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; শার্ঙ্গরবের কথা শার্ঙ্গরবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; প্রিয়ম্বদার কথা প্রিয়ম্বদার ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই আকার-গত বা প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্য চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে-চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্য জাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে, তিনি সেই চরিত্রই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্বগুণবিশিষ্ট হইলেই হয় না। এক জন উন্নতচরিত্র ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদ্‌জনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই নাটককার কোন গুরুত্বগুণবিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার ছবি তুলিয়া দেন। সে ছবি স্বরূপ-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়! আমাদের মধ্যে এ কথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়।"—("শকুন্তলাতত্ত্ব" পৃঃ ১৪৭-৪৮)

মানুষের জাত-বিচার

মানুষ কত রকমের? অতি শীঘ্র এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে সকল মানুষকে চিনতে না পারলেও, মানুষের একটা জাত-বিচার হয়েছে। মনুষ্যজাতির এই জাতি-বিচারে ব্লুমেন্‌বেক্ সাহেব মনুষ্যগণকে পঞ্চ প্রধান জাতিতে বিভক্ত করেছেন। (১) কাকেশস: অর্থাৎ কাস্পিয় এবং কৃষ্ণহ্রদের মধ্যগত ককেশস নামক পার্ব্বতীয় জাতি। (২) মোগল, অর্থাৎ উত্তর-তাতারদেশীয় মোগল নামে খ্যাত জাতি। (৩) আমরিক, অর্থাৎ অমরিকা দেশজ জাতি। (৪) আফরিক, অর্থাৎ অফরিকা দেশসম্ভূত কাফরি জাতি। (৫) মালয়ীন, অর্থাৎ মালায় কিম্বা মালাক্কা দেশজাত মালাই জাতি। চীন ও জাপান দেশীয় ব্যক্তি-সকল, কালমুক জাতি, মোগল জাতি, প্রাচীন হন জাতি, লাপলণ্ডীয় জাতি, কামস্কাটক জাতি, উত্তর-অমরিকার এস্কুইমঃ জাতি এবং অন্য কতিপয় অপ্রসিদ্ধ জাতি-সকল মোগল জাতির অন্তঃপাতি।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

থকা—গুচ্ছ, স্তবক, থোবা, কাঁদি, থলুয়া, থুবা।
থমকান—ভয় পাওয়া, চমকান, ত্রস্ত হওয়া।
থর—শ্রেণী, পংক্তি, থাক, জালবিশেষ।
থরথর—অত্যন্ত কম্প, নড়ন, স্পন্দন।
থলী—থলিয়া, গুণ, ছালা-বিশেষ, থৈলী।
থলথলিয়া—লোলিত, ঝুলঝুলিয়া।
থাক—ছেদ, ফাঁক, তাগা, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি।
থানা—দস্যুরক্ষকাদির বাসস্থান।
থাপড়—চাপড়, করতল, থাবা, চড়।
থাবড়ান—চ্যাপটা করণ, দলন।
থাবা—করতল, চাপড়, চপেট, চড়।
থাম—স্তম্ভ, খম্বা, গৃহাদির খুঁটি।
থামন—জুড়ন, শান্ত হওন, ক্ষান্ত হওন।
থালা—ধাতুময় ভোজনপাত্র, কাটুয়া।
থু—থুক, থুথু, ছেপ, নিষ্ঠীবন, ছি ছি, শ্লেষ্মা।
থুতনি—চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ।
থেঁতলান—দলন, কুটন, পিটান।
থোক—সঞ্চয়, রাশি, পিণ্ড, একুন, সমুদয়।
থোপা—থোপনা, থোবা, ঝাঁকা।
দই—দধি, ঘনীভূত বিকৃত দুগ্ধ।
দংশ—দন্ত, হুল, ডাঁশ, সর্প।
দংশন—কামড়ান, দন্তাঘাত করণ।
দংষ্ট্র—দন্ত, রদন, দাঁত, দশন।
দংষ্ট্রা—বিষাণ, বৃহদ্দন্ত।
দংষ্ট্রী—কামড়ানিয়া, হিংস্রক, সর্পাদি।
দক্ষ—নিপুণ, চতুর, পারগ, তৎপর।
দক্ষিণ—ডাহিন, ডান।
দক্ষিণা—গুরুর বেতন, কর্ম্মের শেষাঙ্গ।
দক্ষিণায়ন—শ্রাবণাদি ছয় মাস।
দগ্ধ—পোড়া, জ্বলিত,।
দগ্ধিকা—ভাজা ধান্য, খই, লাজ।
দড়—দৃঢ়, শক্ত, কঠিন, কর্কশ, মড়ক।
দড়ী—রজ্জু, গুণ, রসী।
দণ্ড—ষষ্টিপল, যষ্টি, শাস্তি।
দণ্ডদাতা—শাস্তা, রাজা, বিচারকর্ত্তা।
দণ্ডবৎ—দণ্ডের ন্যায়, প্রণত।
দণ্ডান—দাঁড়ান, দণ্ডায়মান।
দণ্ডাশ্রম—সন্ন্যাসধর্ম্ম, বৈরাগ্য।
দণ্ড্য—দণ্ডার্হ, দণ্ডনীয়, নিগ্রহণীয়।
দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র, পালিতপুত্র।
দত্তা—বিবাহিতা, পাণিগ্রহীতা।
দদ্রু—কচ্ছুরোগ, কণ্ডুরোগ, দাদ।
দনুজ—দৈত্য, অসুর, সুরারি।
দন্তী—হস্তী, হাতী, গজ, বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট।
দন্তুর—দাঁতাল, বৃহদ্দন্তী, দংষ্ট্রী।
দপট—দর্প, অহঙ্কার, গর্ব্ব, মাৎসর্য্য।
দবন—মর্দ্দন, দলন, দমন, শাসন।
দবকন—চমকন, হটন, ভীত হওন।
দবিষ্ঠ—দূরবর্ত্তী, অতিশয় দূর।
দবীয়ান্—দূরতর, অধিক দূর, কনিষ্ঠ।
দম—শান্তি, অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, গর্ব্ব।
দমন—বশীকরণ, শাসন, আটকান।
দম্‌কান—বৈসন, অধঃপতন, হেলান।
দম্পতি—জায়াপতি, স্ত্রীপুরুষ উভয়।
দম্ভ—অহঙ্কার, গরিমা, দর্প, গর্ব্ব।
দম্য—দমনের যোগ্য, দমনার্হ।
দয়া—করুণা, কৃপা, পরদুঃখ-হরণেচ্ছা।
দয়াল—কৃপাবান, করুণাবিশিষ্ট।
দয়িত—অনুগৃহীত, প্রিয়, স্বামী।
দরিদ্র—অত্যন্ত ধনহীন, দীনহীন, দুঃখী।
দরী—পর্ব্বতের ছিদ্র, গহ্বর, কন্দর।
দর্প—আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার, বিক্রম।
দর্পণ—আর্শি, আদর্শ, মুকুর, আয়না।
দর্ব্বী—হাতা, চমস, চামচা, পানপাত্র।
দর্শন—দৃষ্টিপাত, বেদান্তাদি ষট্‌শাস্ত্র।
দর্শনী—ভেট, উপঢৌকন, উপায়ন।
দল—সমাজ, অনেকের ঐক্য, সমূহ।
দলক—অনবরত দৃষ্টিপাত, কাদাযুক্ত।
দলন—মর্দ্দন, মাড়ান, ছানন, বিদারণ।
দলুয়া—খাঁড়, গুড়, ভুরচিনি, অন্নপিণ্ড।
দশ—সংখ্যা-বিশেষ।
দশক—দশ গণ্ডা।
দশকণ্ঠ—দশকন্ধর, রাবণের এক নাম, দশানন।
দশকিয়া—গণিত শাস্ত্রবিশেষ।
দশা—অবস্থা, গতি, বয়স, দীপবর্ত্তি।
দস্তা—ধাতুবিশেষ।
দস্যু—দৌরাত্ম্যকারী, চোর, তস্কর।
দহ—আবর্ত্ত, গহরা, গম্ভীর, জলঘূর্ণন।
দহন—জ্বলন, দগ্ধ হওন, অগ্নি, পোড়া।
দা—কাতান, দাত্র, অস্ত্রবিশেষ।
দাউলিয়া—শস্যছেদক, তৃণকর্ত্তক।
দাওন—শস্য ছেদন, তৃণ কাটন।
দাঁড়—নৌকাদণ্ড, আড়বাড়ি, নিগ্রহ।
দাঁড়কাক—বৃহৎ কাক, বায়স, বলিভুক্।
দাঁড়া—মেরুদণ্ড, যষ্টি, শিরদাঁড়া।
দাঁড়ি—দাঢ়ি, ওষ্ঠের অধোভাগ, শ্মশ্রু।
দাঁড়ী—নৌকাবাহক, নাবিক।
দাঁড়ীপাল্লা—পরিমাণ যন্ত্র, তুল।

[ক্রমশ

[কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদনার জন্য লেখকদের সঙ্গে কি ধরণের পত্রালাপ চলতে পারে এই সংখ্যার পত্রগুচ্ছে তারই কয়েকটি নজীর দেওয়া হ'ল। বসুমতীতে প্রকাশিত লেখার জন্য সম্পাদকের সঙ্গে লেখকবৃন্দের পত্র আদান-প্রদান চলে। চিঠিগুলি শ্রীপ্রাণতোষ ঘটককে লিখিত—বিভিন্ন সময়ে।]

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি

২ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা
২০।৭।৪১

প্রাণাধিক প্রাণতোষ

তোমার পত্র পাইয়াছি।

আমার ছাত্রের লিখিত "ভারতীয় ভাস্কর্য্যে লক্ষ্মী-মূর্তি" প্রবন্ধটি নাতিদীর্ঘ—সাত পাতা ফুলস্কেপ সাইজ—মোট আন্দাজ ২০৫০ কথা আছে। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সাতটি লাইন ড্রয়িং বা রেখা-চিত্রে সুশোভিত। এই সাতটি লাইন ড্রয়িং অক্লেশে, অতি সহজে—সস্তা Zine block এ ছাপা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধ শারদীয়া বসুমতীর একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Fe ture Article হইতে পারে। প্রবন্ধটি আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। এটি নিশ্চিত ছাপা উচিত।

এই প্রবন্ধটি যদি শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিজে আর একটা প্রবন্ধ শারদীয়া সংখ্যার জন্য লিখিয়া দিব। তোমার উত্তর পাইলে আমার প্রবন্ধটি লিখিতে সুরু করিব।

শুভাকাঙ্খী
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের চিঠি

৭।৬।৪৮

প্রিয়তম প্রাণতোষ,

ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে সেদিন এসে আবার চ'লে গেলে কেন? আমি যে বৃষ্টির জন্য চায়ের দোকান থেকে বেরুতে পারছিলুম না। আমার উপরে আবার রাগ করনি তো?

আসছে দু'হপ্তার জন্যে দৈনিকের লেখা পাঠালুম। কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে যাবে, copyর কোণে লিখে দিয়েছি।

পুড়ভকিনের একখানি বই পেয়েছি। তিনখানি চমৎকার ও সচিত্র আর্টের বই (ইংরেজীতে) বিক্রয়ের জন্যে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছে। দেখতে চাও তো এসে দেখো। কিনতে চাও তো কিনো।

হেমেনদা।

২৭।৭।৪৮

প্রিয়তম প্রাণতোষ,

দুই বারের 'নাট্য-নৃত্য-চিত্র' পাঠালুম।

'মাসিক বসুমতী'র সিনেমা-সংক্রান্ত কাগজগুলি এখনো পাইনি। এই তিনখানি কেতাবও পাঠিয়ে দিও। ১। "Information Film Year Book" ২। "Documentary" ও ৩। "Acting"।

এবারের ফুটবল খেলার 'সিল্ড ফাইন্যাল' আসন্ন। মোহনবাগান যে বৎসর 'সিল্ড' পায়, সেবারের স্মরণীয় 'ফাইন্যালে' আমি হাজির ছিলুম। তার বৃত্তান্ত চিত্তোত্তেজক গল্পের চেয়েও আগ্রহবর্দ্ধক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, 'দৈনিক বসুমতী'র জন্য সে কাহিনী আমি লিখতে পারি—যথাসময়ে প্রকাশের জন্যে। আজকেই মতামত জানিও। ইতি

হেমেনদা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা। ৩১।৭।৫০

স্নেহাস্পদেষু

শারদীয়া বসুমতী'র জন্য একটি রচনা চাহিয়াছ। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। আশা করি তোমার মনঃপূত হইবে। যদি কোন কারণে ছাপিতে অনিচ্ছুক হও ত সত্বর আমাকে ফেরত পাঠাইও।

সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাটি আমাকে একবার পাঠাইয়া দিবে বলিয়াছিলে। কবে পাইব? বসুমতী সম্বন্ধে আমি আরও কিছু লিখিব, সেই জন্য কথাটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। যদি কোন বাধা থাকে, আমাকে অসঙ্কোচে জানাইও।

১৯০৪ নবেম্বর—১৯০৫ জানুয়ারি—এই তিন মাসের 'বসুমতী'র ফাইল দেখা প্রয়োজন। কবে দেখিতে যাইব।

ভবদীয়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
১১ই বৈশাখ ১৩৫৫

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার পত্র এবং শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের বিবৃতি যথাসময়ে আমার হস্তগত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন:—"সেই সময়বর্তী কালে বিডন উদ্যানে প্রথম বার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।" ইহা ঠিক নহে, বসুমতী প্রকাশের ৫ বৎসর পরে, ১৯০১ সালে প্রথম বার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। তবে "সাপ্তাহিক বসুমতীর ১ম বর্ষের উপহার হিসাবে অতুল গ্রন্থাবলী বিতরিত হইয়াছিল"—ইহা ঠিক। ১ম সংস্করণের অতুল-গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছি,

উহার প্রকাশ-কাল—"১৩০৩ সাল।" প্রকৃতপক্ষে ১৩০৩ সালেই (১৩০৪ নহে) বসুমতীর আবির্ভাব, এই কথাই আমার প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তুমি যে আমার ক্ষুদ্র রচনাটি এত যত্ন করিয়া পাঠ করিয়াছো ও সত্যনির্ণয়ের সহায়তা করিয়াছো, তজ্জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

২ বি, পশুপতি বোস লেন
বাগবাজার, কলিকাতা—৩
১৭·৮·৪৮

সবিনয় নিবেদন,

রোজই আমার ছবির কাজ চলছে, কাজেই প্রুফটি দেখবার সময় পাইনি, কিছু মনে করবেন না। প্রুফটি দেখে রেখেছি কাল রাত্রে, ভেবেছিলাম আজ নিজেই নিয়ে যাব, তার আগেই আপনার লোক এলো। তারই হাতে প্রুফ পাঠালাম।

এই সঙ্গে আমার 'রং-বেরং' ছবির বিজ্ঞাপনের একটি কপি পাঠালাম। দৈনিক বসুমতীতে প্রত্যহ যদি এমনি একটি বিজ্ঞাপন দিতে চাই—আগামী পূজো পর্য্যন্ত, তাহলে কত টাকা দিতে হবে যদি দয়া করে জানান তো বড় ভাল হয়। প্রত্যেক রবিবারে বিজ্ঞাপনের কপি বদলে নতুন কপি যাবে। প্রত্যহ জায়গা দিতে হবে চার ইঞ্চি। পাঁচ ইঞ্চিও দিলে যদি display ভাল হয়তো পাঁচ ইঞ্চিই দেবো।

আশা করি কুশলে আছেন। নিবেদন ইতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠি

প্রিয়বরেষু,

আমার ও আপনার বৌদির ৺বিজয়ার প্রীতি-নমস্কার জানবেন। আমার কবিতাটি আপনাদের ভালো লেগেছে জেনে সত্যি খুসি হলাম। কি অবস্থায় কবিতাটি লেখা তা বোধ হয় জানিয়েছিলাম।

বসুমতী আফিসে নিশ্চয়. এক দিন যাব। তবে আজকেই দিনটা ঠিক করে বলতে পারছি না। ফোনে আপনাকে আগে থাকতে জানাব। যাতে উপেনদাকে আপনি জানাতে পারেন।

মাসিক ও পূজার বসুমতী দুই-ই চমৎকার হয়েছে। শুধু পূজা বার্ষিকীর coverটি ছাপা আর একটু উজ্জ্বল হলে ভাল হত। উপেনদাকে আমার ৺বিজয়ার প্রণাম জানাবেন।

শুভার্থী
প্রেমেন্দ্র মিত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

প্রীতিভাজনেষু

প্রাণতোষ, আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমার প্রতিনিধি এসেছিলেন লেখার জন্য—তার কাছে বোধ হয় শুনেছ যে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া নিয়ে আক্রমণ করেছিল। ভাগ্যবশে প্রথম দিনই ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, নিউমোনিয়া ধরা পড়েছিল। তাই এ যুগে পেনিসিলিনের কল্যাণে কোন রকমে প্রত্যক্ষ আক্রমণ কাটিয়ে উঠেছি। সে দিন তোমার প্রতিনিধিকে বলেছিলাম দু'-তিন দিনের মধ্যেই লেখা পাঠিয়ে দেব। লেখা আরম্ভ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখছি, আক্রমণের প্রভাব পুরো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। শরীর এবং মস্তিষ্ক দুই-ই অক্ষমতা জ্ঞাপন করছে। অন্য দিকে বুকের সর্দি কাশির সঙ্গে বের হচ্ছে—তাতে মধ্যে মধ্যে রক্তচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। এই সব কারণে লেখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়ে—তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আশঙ্কা হচ্ছে—বহু কষ্টে দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে যে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম তাতে বাধা পড়ল। অনুগ্রহ করে আমার অবস্থা জ্ঞাপন করে বা অনিবার্য্য কারণে প্রকাশ করা সম্ভবপর হল না—একনই কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অব্যাহতি দিলে অত্যন্ত উপকৃত হব। অসুস্থতার বিজ্ঞপ্তিতে আমার লজ্জা আছে। মানুষের কাছে রোগের কথা জানিয়ে আর কত করুণা ভিক্ষা করব? তার চেয়ে নিজেরই লেখা বন্ধ করা ভাল। অর্দ্ধমৃতের লজ্জা আর বহন করতে পারছি না। ইতি

টালা — তোমাদের
৪।৬।৫০ — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকালিদাস নাগের চিঠি

আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা, ১০।৮।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই প্রাণতোষ, আশা করি ভানুসিংহ প্রবন্ধ (কাল বুধবার রাতে পাঠিয়েছি) পেয়েছ। অনেক কিছু দেবার ইচ্ছা থাকলেও সঠিক reference দেওয়া সম্ভব হলো না, কারণ সেকালের বই পুস্তিকা পত্রিকাদির সংগ্রহও তেমন নেই—নির্ঘণ্টও নেই। দোষ ত্রুটি তাই থাকতে বাধ্য। তুমি একটি appeal যদি শ্রাবণে ছাপো যে:

১। "বটতলা" সংস্করণ ও তৎকালীন অর্থাৎ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার আগেকার ছাপা পদাবলী গানের বই ইত্যাদি কেউ বসুমতী আফিসে সাময়িক ভাবে ধার দিলেও বাধিত হব।

২। যাত্রা ও থিয়েটারাদির (১৮৫৮ থেকে) মাইকেল দীনবন্ধুর যুগ—সংস্করণ—গিরীশ ঘোষ—আদি পর্ব্ব পর্য্যন্ত—

৩। গানের বহি—যত রকম সম্ভব। (পুরান স্বরলিপি সমেত) Dwarking & Co, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে দিলে খুব ভাল হয়।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীকালিদাস নাগ।

পু: আমার নাম করে Dr. Aswini Chowdhuryর (Sir Asutosh Chowdhryর পুত্র) সঙ্গে দেখা করলে প্রতিভা দেবীর 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' মিলবে (সঙ্গীত সংঘ)।

ডাঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর চিঠি

সিনেট হাউস
কলিকাতা, ১।১১।১৩৪৭

প্রিয়বরেষু

আমি মধ্যে বিশেষ কাজে পূর্ববঙ্গে যেতে বাধ্য হই—যাবার সময় সব প্রুফই ঠিক করে রেখে গিয়েছিলাম কিন্তু এসে শুনলাম বসুমতী আপিস থেকে যে লোকের প্রুফ নিতে আসবার কথা ছিল সে আমার বাড়িতে আসেনি। তাই Universityর লোকের হাতে এই চিঠি পাঠাই। প্রুফ সঙ্গে রইল।

আপনার কাছে আমার একটা বক্তব্য ছিল—আপনার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্বের অকপট সম্বন্ধ তাতে মনের কথাটা সম্পূর্ণ খুলেই আপনাকে বলি। যে-লেখাগুলি দিয়েছি তার মধ্যে আমার প্রাপ্যরূপে আমি এই হিসাব ধরেছি—

১। • • • • • •

২। আমার নিজের প্রবন্ধ (আপনার চিঠি অনুসারে)—১০০৲

৩। সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী ২০০৲

সুভাষ বাবুর চিঠি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আমি খুব কম করেই ধরলাম তার একমাত্র কারণ আপনাদের বসুমতীতে বের করাতেই আমার আনন্দ এবং তৃপ্তি। যে-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পত্র দিয়েছি এবং যে-পত্রিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের স্নেহ জানিয়ে গেছেন সেইখানেই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের এই বিশেষ মূল্যবান এবং দুর্লভ পত্র বের করাই আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা ছিল দুই বারে এই পত্রগুলি বেরোয়। কিন্তু আপনার পরামর্শানুসারে একবারেই পূজার সংখ্যাতেই বেরনোর ব্যবস্থা হল।

আমি নানা কারণে বিশেষ সাংসারিক দায়িত্বে জড়িত আছি সুতরাং যদি এই পত্রবাহকের হাতে আমার প্রাপ্য বাকি ২৫০৲ টাকা দেন (১০০+৫০৲ আমি এর-মধ্যে পেয়েছি) তাহলে বিশেষ উপকৃত হব। আপনাকে বারম্বার এ সব বিষয়ে বলতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হই কিন্তু বিশেষ কারণ না থাকলে আমি কখনোই লিখতাম না এ আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম।

যে bearer পাঠাচ্ছি সে বিশেষ বিশ্বস্ত পুরোনো ভৃত্য—বহু দিন Universityতে আছে—তার হাতে টাকা বা cheque নির্ভয়ে দেওয়া যায়। Stamped receipt আমি আজই আবার পাঠিয়ে দেব।

আপনার গ্রন্থের সমালোচনা-আমি গভীর প্রাণের অনুপ্রেরণায় করেছি—অকৃত্রিম সাহিত্যবোধের আনন্দ পেয়েছিলাম তাই পূর্ণ সত্য বলতে চেয়েছিলাম। আশা করি আপনার ভালো লেগেছে। আপনার সাপ্তাহিকে কি ওটা ছাপাবেন, না, চতুরঙ্গে ? যদি আপনার নূতন সাপ্তাহিকের জন্তে কবিতা দরকার হয় তো বাংলার পল্লী সম্বন্ধে সম্ভরচিত একটি কবিতা কাল পাঠাব।

এই পত্রের উত্তরের জন্তে বাহক অপেক্ষা করবে এবং আপনি তাকে যা দিবেন তা নিয়ে সে Universityতে আমার কাছে ফেরৎ আসবে।

প্রীতিনমস্কারান্তে
অমিয় চক্রবর্তী।

২৭ এ এলগিন রোড
কলিকাতা—২০
১।১১।৪৭

প্রিয়বরেষু,

আমি সঠিক বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি লেখা খুঁজছিলাম—তাই আপনাকে লিখতে দেরী হল। D পৃষ্ঠায় সব তথ্য পাবেন। কয়েক বছর আগে আমি ওদের special China supplementএ লিখেছিলাম। কাগজটা সঙ্গে পাঠালাম।

২। সুভাষ বাবুর পত্রাবলী চতুর্দিকে গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করেছে—বিশেষ করে কম্যুনিষ্টপন্থীদের মধ্যে। নেতাজির মন কত মুক্ত উদার ছিল, ফ্যাসিষ্টদের সম্বন্ধে উনি মোটেই অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না বসুমতীতে প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে তা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া দেশভক্ত অনেকের হৃদয় স্পর্শ করেছে তার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাই—একজন রাগ করে চিঠি লিখেছেন যে এই চিঠিগুলি অনেক আগে না ছাপানোর জন্ত আমি শাস্তি পাবার যোগ্য। কেন না এ চিঠিগুলি সমস্ত ভারতবর্ষের ধন, শুধু আমার নয়। এর থেকে বোঝা যায় শারদীয়া বসুমতীর অঞ্জলি সার্থক হয়েছে—নৈবেদ্য দেশমাতৃকার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁচেছে।

৩। পুলিন বাবুর চিঠি পাঠাই—আপনি পড়ে নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। বিশ্বভারতীয় Tagore Research Deptএ বসুমতীর পূজা সংখ্যার প্রয়োজন। বসুমতীর প্রতি আমার হৃদয়-মনের পক্ষপাত অনেকেই আবিষ্কার করেছেন।

৪। সুভাষ বাবুর চিঠির পাণ্ডুলিপি এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির পাণ্ডুলিপি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ফেরৎ দিতে বলেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব—বোধ হয় আপিসের কোনো বিভাগে রয়ে গেছে।

একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন—আপনার সুবিধা মতো একদিন যাবো।

আপনি আমার বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

টালীগঞ্জ প্রেস
টালীগঞ্জ, ৮।২।৪৭

প্রিয়বরেষু,

লেখাটা কিছুতেই হল না। কসরত করে হয়ত না সাধারণতঃ। কাল রবিবার ছুটি আছে, সোমবার বাস ষ্ট্রাইকের জন্তও বোধ হয় কাজ-কর্ম্ম বন্ধ থাকবে। আমি সোমবার কিম্বা দেরী হলে মঙ্গলবার ফিরবই। বরিশালে লেখাটা শেষ করব। ভরসা করছি বিশেষ অসুবিধা হবে না। সময় মত খেয়াল করে লেখাটা না দেওয়ার জন্ত লজ্জা বোধ করছি। আপনাদের ওপর এ সত্যই অত্যাচার করা। ভবিষ্যতে আর এ অপরাধে অপরাধী হব না। ইতি

প্রীতিকামী
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

টালীগঞ্জ প্রেস
টালীগঞ্জ

শ্রীযুত প্রাণতোষ ঘটক সমীপেষু—
প্রিয়বরেষু,

বরিশালে দেরী হয়ে গেল। সেখানে লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু সাধারণ সভা, কলেজের সভা এ সব বড় বড় সভা ছাড়াও কত যে সংঘ সমিতি ক্লাবের আসরে গিয়ে সাহিত্যের কথা বলতে হয়েছে। তা ছাড়া, প্রিন্সিপ্যাল থেকে অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ী কয়েক মিনিটের জন্ত পদার্পণের নিমন্ত্রণ রক্ষা।

আমার জন্ত কোন কাগজ আটকে থাকবে এত বড় স্পর্দ্ধা যেন কোন দিন না হয় প্রার্থনা করি। আপনাদের যে অসুবিধা ঘটালাম তার গুরুত্ব বুঝে কত দূর লজ্জিত হয়ে আছি প্রকাশ করতে পারি না। আমার আরও মুস্কিল হল বরিশাল থেকে ফিরে দু'দিন চেষ্টা করেও এক লাইন লিখতে পারিনি। কাল বিকালের দিকে খালের ধার দিয়ে হেঁটে গিয়ে নির্জ্জন যায়গায় বহুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। ফিরে এসে লিখতে বসি, এখন রাত প্রায় তিনটে।

ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অন্ততঃ একটা মাসের instalment আপনাদের হাতে বেশী থাকবেই। আশা করি কুশল। শ্রীতিকামী
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ মঙ্গল-বুধবার আসছি। আশা করি 'চিহ্ন' দপ্তরীর খপ্পরে গিয়েছে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর চিঠি

পটুয়াখালি
৫।৪।৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

"বসুমতী"র জন্ত নিচে দু'লাইন লিখে দিলুম। ভালো মনে হলে ব্যবহার করবেন ইতি।

ভবদীয়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কামাল পাশার তুরস্কের মতই "বসুমতী" রাতারাতি বদলে গিয়েছে। সে এবার হয়ে উঠেছে সত্যিকারের বসুমতী—আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যশালিনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

"যাযাবর" বা শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৮ এসপ্লেনেড ইষ্ট

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা নেই, আশা করি কুশলে আছেন। শীগ্‌গির এক দিন কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে জানাবেন।

আপনার বাবা মশায়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গভর্ণমেণ্ট কমিটিতে দেখা হয়। তিনি উদ্যোগ করে এক খণ্ড জয়ন্তী বসুমতী ও শারদীয়া বসুমতী পাঠিয়েছিলেন। দু'টিই একবার চোখ বুলিয়ে গেছি। জয়ন্তী বসুমতীটির মধ্যে সম্পাদনায় যে উৎকর্ষ চোখে পড়ল তার জন্তে আপনার প্রভূত সাধুবাদ প্রাপ্য। বন্ধু হিসেবে নয়,—এক জন পাঠক হিসেবেই। সে-জন্ত আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নমস্কারান্তে,
ভবদীয়
বিনয় মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা
১৮।১১।৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি আমার নতুন লিখতে আরম্ভ-করা বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি দেখতে চেয়েছিলেন। আজ বিকেলে যদি আপনার অবসর থাকে, তবে সাড়ে তিনটা-চারটের মধ্যে আমার আপিসে চলে আসুন না? আমরা কাছাকাছি কোথাও গিয়ে চা খাবো, লেখাটাও আপনাকে দেখাবো। যদি আসতে পারেন, পত্রবাহকের হাতে সম্মতি জানালে খুশী হবো।

আপনার
বিনয় মুখোপাধ্যায়
১।১২।৪৮

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক
সুহৃদবরেষু।

ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর চিঠি

প্রীতিভাজনেষু, ১২।১।৪১

আশা করি গান্ধী ঘাটের একটা ছবি রহমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছেন। যদি না করে থাকেন তবে লোক পাঠাবার সময় শ্রীযুত রহমানকে ফোন করে বলতে পারেন (Writers Bldgs এ ফোন করে Chief Architect Mr. Rahman বললে ঠিক ঠিক জুড়ে দেবে) যে ডাঃ আলীর সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেই সম্পর্কে আপনি লোক পাঠাচ্ছেন। তাহলে লোকটিকে রাইটারস্ বিলডিংএ ঢোকার জন্ত পাসের হাঙ্গামা আর পোয়াতে হবে। লোকটি যদি ছবি বাবদে গুণী হন তবেই ভালো হয়। রহমানের কাছ থেকে পছন্দ মাফিক ছবি বেছে নিয়ে আসতে পারবেন।

আমার মনে হয়, ঘাটের ছবিখানা কাগজের মধিখানে ছাপালে ভালো হবে। প্রবন্ধটা আশে-পাশে। বিবেচনা করে দেখবেন।

পলড়ি অজরামর। তাকে যে কোনো দিন খাড়া করে দিতে পারবেন। যদি আপনার ভবন্বর ভালো লেগে গিয়ে থাকে, এবং স্নীতি যদি থাকে, তবে মাসিক সাপ্তাহিক উভয়েই ছাপাতে পারেন—আপনার খুশী। আমি বান্না করেই খালাস। আপনি যদি দুই কিস্তিতে খেতে চান খাবেন। তবে কি না একদম্ না খেলে একটু দুঃখ হবে বৈ কি!

রায়োকোয়ানের শেষ প্রুফ আমাকে দেখানো যেতে পারে এই রকম ধারা একটা ভাসা-ভাসা প্রস্তাব হয়েছিল মনে পড়ছে।

যে সংখ্যায় গান্ধী-ঘাট বেরুবে তার একখানা যদি রহমানকে পাঠান তবে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন। আমরাও ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে ইডা সিডা পেতে পারি। এ-সংখ্যায় 'শ্রীমতীতে' তার একটা বাড়ীর প্ল্যান বেরিয়েছে—যদিও খুব ভালো হয়নি। রহমানের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে পাঠাব।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী।

তাজ (প্রথম ফটক থেকে গৃহীত)

—সুধীরকুমার গুপ্ত (হাজারীবাগ)

সাঁকো
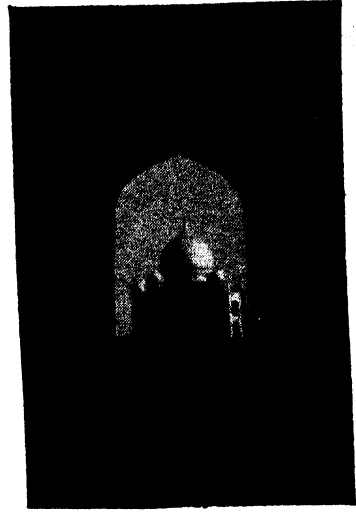
—বি, চক্রবর্ত্তী (রাজসাহী)

আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা

—বিষয়—

পোট্রেট

—ছবি পাঠানোর শেষ দিন—

১৮ই চৈত্র

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয়—১০৲ তৃতীয়—৫৲

সেনেট হল

—গৌরীশঙ্কর প্রসাদ (কলিকাতা)

ব্রহ্মপুত্রের তীরে

—বি, হাজারিকা (গৌহাটি)

সেই এক ছবি ?

—সুলেখা চৌধুরী (কলিকাতা)

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর
—সুনীলচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

।ভা। —বরুণকুমার ঘোষ (হাওড়া)
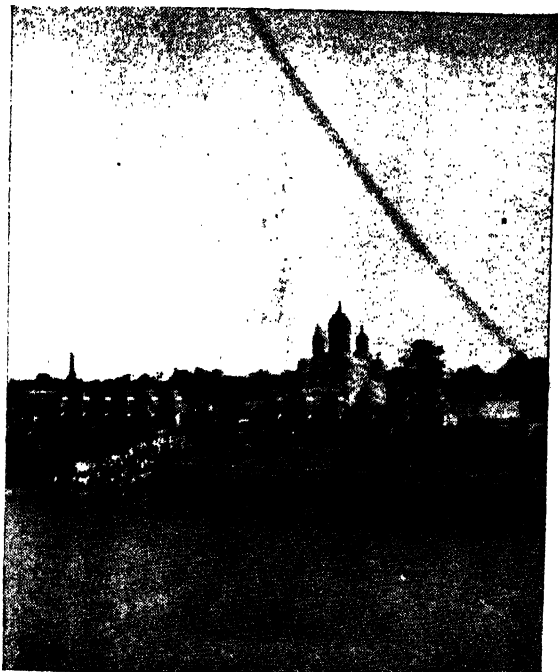
চিড়িয়াখানায় —সুনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা)

জি, পি, ও —জে, আর, সেনগুপ্ত (কলিকাতা)

চাষ —গণেশচন্দ্র দাস (কলিকাতা)

সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
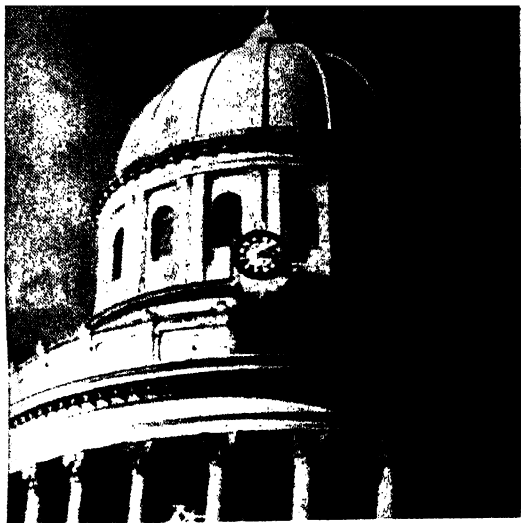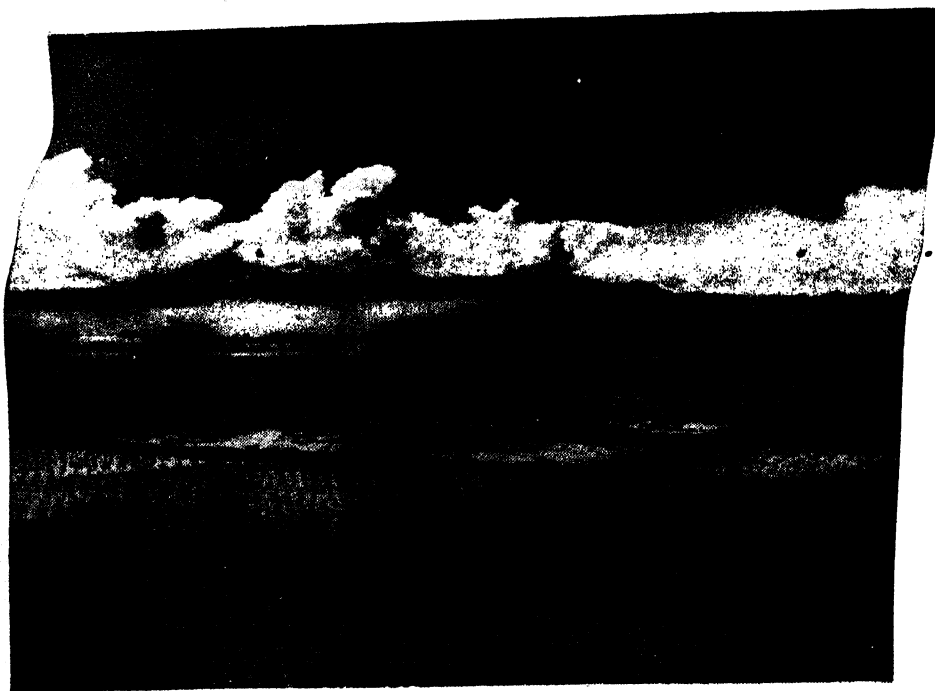
আকবর আলি (বা সাহা), সৈয়দ—বঙ্গভাষার গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—জেবল মুলুক সমারোকের পুথি।

অকবর মুহম্মদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'তমিম গোলাল-চৈতন্ত সিপাহে'র পুথি। এই গ্রন্থে তমিম গোলাল ও চৈতন্তের প্রেম-কাহিনী বর্ণিত আছে।

অকবর শাহ—'কৃষ্ণলীলা' বিষয়ক পদ-রচয়িতা।

অকমল-উদ্দীন—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—'হিদায়'। মৃত্যু—১৩৮৪ খৃঃ (৭৮৬ হিজরী)। এই গ্রন্থ ১৮৩৭ খৃঃ কলিকাতায় প্রকাশিত।

অকলঙ্ক, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব—দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ জৈন-দার্শনিক। জন্ম—মহীশূরে খৃষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথমার্ধে। টীকাগ্রন্থ—অষ্টশতী, (লঘীয়স্ত্রয়, ন্যায়বিনিশ্চয়, অকলঙ্কস্তোত্র, স্বরূপ-সম্বোধন, প্রায়শ্চিত্ত, দেবাগমস্তোত্রভাস, প্রমাণরত্নপ্রদীপ) তত্ত্বার্থ-বার্তিকব্যাখ্যানালঙ্কার। গ্রন্থ—'জৈনবর্ণাশ্রম (কন্নড়ভাষায়)।

অকিঞ্চন দাস—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। গ্রন্থ—সহজিয়া সম্প্রদায়ের "বিবর্ত-বিলাস" (১৩১৭ বঙ্গ) "ভক্তি-রসাত্মিকা"।

অকিঞ্চন দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ব-বিলাস।

অক্রূরচন্দ্র ধর—নাট্যকার। গ্রন্থ—সুখের সন্ধান (১৩২০ বঙ্গ)।

অক্রূরচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিক্ষাসোপান (ঢাকা, ১৮৮৩) ও জীবন (ঢাকা, ১৮৯৪)।

অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পাণ্ডব-বিলাপ নাটক (কলিকাতা, ১৮৮১ খৃঃ)।

অক্ষয়কুমার ঘোষ—ব্যঙ্গ-কবিতা রচয়িতা (কবিওয়ালা)। জন্ম—বর্ধমান জেলা।

অক্ষয়কুমার ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ-কাকলী (কবিতা)। (কলিকাতা, ১৯১৬ খৃঃ, পৃঃ ৭২)।

অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাতী ভূত (প্রহসন, কলিকাতা, ১৯০৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৩), চিন্তারেখা।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব, আমরা ও বিশ্বজগৎ (১৯৩২)।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—ভট্টাচার্য-পরিবার (উপন্যাস। কলিকাতা, ১৯০৩ খৃঃ, পৃঃ, ১৯০)।

অক্ষয়কুমার চৌধুরী—নাট্যকার। গ্রন্থ—দুর্গাবতী (ঐতিহাসিক নাটক। ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১০৪)।

অক্ষয়কুমার দত্ত—সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদক। জন্ম—চুপী (নবদ্বীপের নিকট), ১২২৭ বঙ্গাব্দ, ১লা শ্রাবণ; মৃত্যু—বালী, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। পিতা—পীতাম্বর দত্ত; মাতা—দয়াময়ী। শিক্ষা—খিদিরপুর মিশনারী বিদ্যালয়, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী। রচনা—ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকরে', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। সম্পাদনা—'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্র (১২৪৯ বঙ্গাব্দ); তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (সহ-সম্পাদক—১২৫০-৫২ বঙ্গাব্দ), সম্পাদক—১২৫২—৬২ বঙ্গাব্দ)। অতঃপর 'তত্ত্ববোধিনী'র কার্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত (১২৬২ বঙ্গাব্দ)। রচিত গ্রন্থ—ভূগোল (কলি, ১২৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫); চারুপাঠ (১ম ভাগ, ১২৫৮; ২য় ভাগ—১২৬১ ও ৩য় ভাগ—১২৭০ বঙ্গাব্দ), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, (১ম ভাগ,—১২৫৮ ও ২য় ভাগ, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ); বাষ্পীয় উপদেশ (রেলযাত্রীদের প্রতি উপদেশ। কলি, ১২৬১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০); ধর্মোন্নতি সংশোধনবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ খৃঃ, পৃঃ ২৬); পদার্থবিদ্যা (১২৬৩ বঙ্গাব্দ); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ, ১৮৭০ খৃঃ ও ২য় ভাগ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ), ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে বক্তৃতা (১৮৬৫ খৃঃ); ধর্মনীতি (১২৮৩ বঙ্গাব্দ); প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা (ভূমিকা ও টিপ্পনীসহ অক্ষয়কুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০১)।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ; কবিরত্ন। অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ। গ্রন্থ—নবসন্দর্ভ (ঢাকা, ১৯১৩ খৃঃ, (৪র্থ সং, পৃঃ ৭৭), পুণ্যগাথা (কলি, ১৯১৬ খৃঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৪) বঙ্কিমচন্দ্র, সন্দর্ভচন্দ্রিকা (কলিকাতা, ১৯১৪ খৃঃ, ষষ্ঠ সং, পৃ ২০৯), শকুন্তলা।

অক্ষয়কুমার দাস—গ্রন্থকার! গ্রন্থ—চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য (কবিতা; কলি, ১৯১৫ খৃঃ, পৃঃ ৯)।

অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাববিলাস অভিধান।

অক্ষয়কুমার দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিমন্যু-বধ যাত্রা (১২৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬০); তরণীসেন-বধ যাত্রা (কলি, ১৮৭৮ খৃঃ, পৃঃ ৫৬); দেবগণের গঙ্গাস্নান (প্রহসন, কলি, ১৯১০ খৃঃ, পৃঃ ১৪৩); মেঘনাদ-বধ নাটক (২য় সং, কলি, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ৯৪); সম্পাদিত গ্রন্থ—মহাজন-পদাবলী—হরিনাম সংকীর্তন। (কলি, গৌরাব্দ ৪১০, পৃঃ ৮২)।

অক্ষয়কুমার নন্দী—গ্রন্থকার ও পত্রিকা-সম্পাদক। গ্রন্থ—ইউরোপে তিন মাস; বিলাত-ভ্রমণ; সম্পাদিত মাসিকপত্র—মাতৃমন্দির (১৩৩০ বঙ্গাব্দ হইতে)।

অক্ষয়কুমার বড়াল—প্রসিদ্ধ কবি। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ, কলিকাতা, চোরবাগান-পল্লীর শ্রীনাথ রায় নামক গলিতে। মৃত্যু—১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ। পিতা কালিচরণ বড়াল। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল। পরে সওদাগরী অফিসে চাকরী। কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্য। প্রথম রচনা—রজনীর মৃত্যু (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ১২৮১ বঙ্গাব্দ), রচিত কাব্যগ্রন্থ—প্রদীপ (কাব্য, ১ম খণ্ড—১২৯০ বঙ্গাব্দ, চৈত্র); কনকাঞ্জলি (১২৯২ বঙ্গাব্দ); ভুল (১২৯৪ বঙ্গাব্দ); শঙ্খ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন); এষা (১৩১৯ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ। পত্নীবিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে রচিত)। পান্থ (১৩১১ ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, 'সাহিত্যে' প্রকাশিত)। 'চণ্ডীদাস' (চারি অঙ্ক) অপ্রকাশিত।

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—ঠাকুর মহাশয়ের সংসার (উপন্যাস। কলি ১৯০৬ খৃঃ, পৃঃ ৪২৭); গণক অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যক ব্যবহারোপযোগী হিসাব (১২৮৬ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ৯২)।

অক্ষয়কুমার বসু—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—নির্মলা, নিরুপমা।

অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—ভান্তারার নিকট নারায়ণপুর, হুগলী। গ্রন্থ—বঙ্গীয় সাহিত্য-সমালোচনা (১ম ভাগ, কলি, ১৮৯৫ খৃঃ); চাণক্যশ্লোক (মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ। কলি, ১৯০৯ খৃঃ, পৃঃ ৮৮) হিতোপদেশ (কলি, ১৯১৩ খৃঃ, পৃঃ ৬৬); সংস্কৃত অনুবাদ-শিক্ষা (কলি, ১৯১২ খৃঃ, পৃঃ ২২০)।

অক্ষয়কুমার মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গণিত বোধ (১ম সং, ১৮৭৬ খৃঃ, পৃঃ ৬৮—৪র্থ সং ১৮৮৯, পৃঃ পৃঃ ১২৪); Hindu History (B. C. 300 to 1200 A. D.), (ঢাকা, ১৯২০ খৃঃ, পৃঃ ৮৯০)।

অক্ষয়কুমার মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মরণে বরণ (নাটক। কলি, ১৯১৫ খৃঃ, পৃঃ ১২৮)।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৬৮, বঙ্গাব্দ, ১লা মাঘ, শুক্রবার, নদীয়া জেলায় নওয়াপাড়ার সিমলা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২৭এ মাঘ। পিতা—মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতা—সৌদামিনী দেবী। আদি নিবাস—রাজসাহী জেলায় গুড়নই গ্রামে। শিক্ষা—রাজসাহী এবং কুমারখালি। ১৮৭৮ খৃঃ রামপুর বোয়ালিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ বৃত্তিলাভ। রাজসাহী কলেজে এফ-এ, (২০৲ বৃত্তিলাভ), বি-এ পাস। অতঃপর বি, এল। ১৮৮৫ খৃঃ রাজসাহীতে ওকালতী করেন। প্রথমে ইনি কবিতা লিখিতেন রাজসাহীর হিন্দু পত্রিকায় এবং কুমারখালির গ্রামবার্তায়। গ্রন্থ—রাণী ভবানী; সিরাজউদ্দৌলা, সীতারাম, মীরকাশেম (জীবনী। ১৯১৬ খৃঃ, পৃঃ ৬৬), গৌড়লেখমালা (১ম সং, ১৯১২ খৃঃ); গৌড়রাজমালা (রমাপ্রসাদ চন্দ—সম্পাদিত। কলি ১৯১২ খৃঃ), ফিরিঙ্গী বণিক, অজ্ঞেয়বাদ (সমালোচনা); Gaur under the Hlndus', "Pal Kings of Bengal'; সম্পাদিত মাসিকপত্র—ঐতিহাসিক চিত্র (কলি, ১৮৯৯ খৃঃ হইতে আরম্ভ)। গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ—সাধনা, সাহিত্য, ভারতী ও Journal of the Asiatic Society প্রভৃতি পত্রিকায়। সি, আই, ই উপাধিলাভ এবং বহু বার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

অক্ষয়কুমার রায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—নাদির শাহ, (ঐতিহাসিক নাটক। ঢাকা, ১৯১৪ খৃঃ, পৃঃ ২০১)।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (সাংখ্য-বেদান্তমীমাংসা-তীর্থ)—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার সংগ্রহ (প্রমথনাথ তর্কভূষণ-সহ। কলি, ১৯১৩ খৃঃ, পৃঃ ২২৪); বেদান্ত-সংক্রান্ত বক্তৃতা (২য় বক্তৃতা। কলি, ১৯১৬ খৃঃ); উপদেশ-সাহস্রী (কলি, ১৩৩২ বঙ্গ, পৃঃ ৬৬৫); অনুবাদ গ্রন্থ—শঙ্করগ্রন্থাবলী (১৬ ভাগ, কলি, ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ বঙ্গ)

অক্ষয়কুমার সরকার—কবি। গ্রন্থ—তারক-সংহারকাব্য (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)।

অক্ষয়কুমার সাধু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুঝেই বাঃ চিনে (প্রহসন। কলি, ১৮৭১ খৃঃ, পৃঃ ৩৪)।

অক্ষয়কুমার সাহা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গের মহোৎসব (কবিতা-পুস্তক। ১৮৭৫ খৃঃ, পৃঃ ৩৪)।

অক্ষয়কুমার সেন—গ্রন্থকার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি (১ম সং, ১৯১৪ খৃঃ); শক্তি-পরিচয় (কবিতা। ১৮৭৮ খৃঃ)।

অক্ষয়কুমারী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস (কলি, ১১৩৪ বঙ্গাব্দ); বৈদিক যুগ (কলি, ১৯৩০ খৃঃ)।

অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সমাজ-রহস্য (কলি, ১৮৭২ খৃঃ, পৃঃ ৯১)।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সুপ্রসিদ্ধ লেখক, পত্রিকা-সম্পাদক ও সমালোচক। জন্ম—১২৫৩ বঙ্গাব্দ, চুঁচুড়া, হুগলী; মৃত্যু—১৩২৪ বঙ্গাব্দ। পিতা—রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর। শিক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৮৬৩ খৃঃ (হুগলী কলেজিয়েট স্কুল); এফ-এ। ১৮৬৫ খৃঃ; বি এ, ১৮৬৭ খৃঃ (হুগলী কলেজ); বি-এল, ১৮৬৫ খৃঃ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। বহরমপুর কোর্টে ওকালতী আরম্ভ এবং এই সময় বঙ্গদর্শনে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ। ১২৮০ বঙ্গাব্দ ১১ই কার্ত্তিক সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রকাশ। মাসিক 'নবজীবন' (কলি, ১২৯১) ও নববিভাকর-সাধারণী (কলি, ১২৯৩)।

গ্রন্থ—প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ (১২৮১ বঃ); শিক্ষানবীশের পদ্য (চুঁচুড়া, ১২৮১ বঃ); সমাজ-সমালোচনা (১ম ভাগ, চুঁচুড়া, ১২৮১ বঃ); কবিকঙ্কণ চণ্ডী (চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ, পৃঃ ৮০০); গোবিন্দদাস-কৃত পদাবলী, (চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ, পৃঃ ২৭২); চণ্ডীদাস-কৃত পদাবলী (চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ, পৃঃ ১৫১); বিদ্যাপতি-কৃত পদাবলী (চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ, পৃঃ ২২০); গোচারণের মাঠ (পদ্য। ১২৮৫-৮৭ বঃ); সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (১২৮৯ বঃ); হাতে হাতে ফল (১২৯১ বঃ); প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ (২য় ভাগ। ১২৯১ বঃ); পিতা পুত্র ('বঙ্গভাষার লেখক' ১ম ভাগের অন্তর্গত—আত্ম ও পিতৃজীবনী (১৩১১ বঃ), সনাতনী (কলি, ১৩১৭, পৃঃ ১৭৬); কবি হেমচন্দ্র (১৩১৮ বঃ); মোতিকুমারী (Haggard-এর 'Pearl Maiden' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ এবং কয়েকটি গল্প। ১৩২৪ বঃ); মহাপূজা (১৩২৮ বঃ); রূপক ও রহস্য (১৩৩০ বঃ); সাহিত্য-পাঠ (১৭৩১ বঃ)।

অক্ষয়চরণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোরম্য ইতিহাস (১৮৫৩ খৃঃ)।

অক্ষয়চৈতন্য, ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীসারদা দেবী (কলি, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩২৩); শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ (বেনারস, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০১); বাঙ্গালার দুই ঠাকুর।

অখণ্ডানন্দ মুনি—অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত। জন্ম—খৃঃ ১৫শ শতকে। গ্রন্থ—'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ' গ্রন্থের 'বিবরণ তত্ত্বদীপন' নামে টীকা।

অখণ্ডানন্দ, স্বামী—গঙ্গাধর মহারাজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর, যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্ম গ্রামে। ১৪শ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রীপরমহংসদেবের দর্শন সন্ন্যাসগ্রহণ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ নাম গ্রহণ। ইঁহার লিখিত প্রবন্ধ—'তিব্বতে তিন বৎসর'—উদ্বোধন পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

অখিলচন্দ্র নিয়োগী—শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০১ বঙ্গাব্দে ১ই কার্ত্তিক, রবিবার ময়মনসিংএর সাকুয়াইলে (টাঙ্গাইল)

পিতা—দীনবন্ধু নিয়োগী। শিক্ষা—আই-এস্-সি ও গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল। কর্মক্ষেত্র—(সাহিত্য ও শিল্প ও চিত্র পরিচালনা; শিশু-সংগঠন—সব পেয়েছির আসর (যুগান্তর পত্রিকা। ছদ্মনাম—স্বপনবুড়ো) বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অঘোরি গুপ্ত প্রকাশ সিং—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯২ খৃঃ, ঔরঙ্গবাদ (গয়া)। গ্রন্থ—নেলসন (হিন্দী); শান্তি ঔর সুখ (হিন্দী)।

অগ্নিদত্ত—তন্ত্র-রচয়িতা। গ্রন্থ—গোপালপঞ্জরকবচ।

অগ্নিবেশ—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—রামায়ণ রহস্য; 'রামায়ণ-শত-শ্লোকী'।

অগ্নিবেশ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'চরক-সংহিতা'; অঞ্জলিদান।

অগ্নিস্বামী—ভাষ্যকার। ভাষ্যগ্রন্থ—'সাট্যায়ণশ্রৌতসূত্রবৃত্তি; অগ্নিষ্টোমব্যাখ্যা।

অগ্রদাস—সাধু, ভক্ত ও কবি। জন্ম—১৬শ শতকের শেষে জয়পুরের গলতা নামক স্থানে। গ্রন্থ—শ্রীরামভজনমঞ্জরী; কুণ্ডলিয়া; হিতোপদেশভাষ্য; উপসনাবাবণী; ধ্যানমঞ্জরী; পদ; রামচরিত্র কে পদ (১৬৩২ খৃঃ)।

অঘোরনাথ (সাধু)—সাধু। গ্রন্থ—দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ (কলিকাতা, ১৮৩৮ শক, পৃঃ ৭)।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—নাট্যকার। গ্রন্থ—যাজ্ঞসেনী, রণচণ্ডী, বনদেবী, অম্বুধ্বজের হরিসাধনা, রাবণ-বধ, জয়দেব, ভক্তবীর, মহালক্ষ্মী, শ্রীপাদপদ্ম, নদের নিমাই, কল্কি অবতার, মগধ-বিজয়, পুত্র-পরিচয় বা (লবকুশের যুদ্ধ), মরু ও যজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, অনন্ত-মাহাত্ম্য, অদৃষ্ট, তরণীর যুদ্ধ, বিজয়-বসন্ত (সংমা), সতী, অকাল মৃগয়া, মহাসমর, সপ্তরথী, মিবার-কুমারী, সরমা, নহুষ উদ্ধার, লক্ষবলি, শান্তি, মহামিলন, শ্রীবৎস, বেহুলা, মনসা-মঙ্গল, প্রহ্লাদ-চরিত্র, শক্তিশেল, মদালসা-পরিণয়, বৃষকেতু, ধ্রুব-চরিত্র, চন্দ্রকেতু, সংসারচক্র, ধাত্রী পান্না, মথুরামিলন, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসমিলন।

অঘোরচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বালিবধ (১৮৭৭ খৃঃ, পৃঃ ৬৮); চাই বেলফুল (ঢাকা, ১৮৭৬ খৃঃ, পৃঃ ১২); লক্ষণের শক্তিশেল নাটক (কলি, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ৪৬); রামবনবাস নাটক (১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ৪৬); রাবণবধ নাটক (কলি, ১৮৮০ খৃঃ ৪৮); বউ কথা কও (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১২); জেলের পাঁচালি (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১২)। দু এক মজা (কলিঃ ১৮৭২ খৃঃ, পৃঃ ১০); একেই বলে পোল (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১২); মহন্ত এলোকেশী (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ২৪), মহন্তের খেদ (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১২); সীতাহরণ যাত্রা (কলি, ১৮৭৮ খৃঃ, পৃঃ ৬০); বিদ্যাসুন্দর টপ্পা, ৩য় ভাগ, (কলি, ১৮৭৫ খৃঃ); অজদরায় নাটক (কলি, ১৮৭৯ খৃঃ, পৃঃ ৪৪); ভীমবিক্রম বা কীচকবধ নাটক (কলি, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪২); মৃত্যুঞ্জয় ঔষধাবলী (কলি, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪০)।

অঘোরচন্দ্র সিংহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভৈষজ্য-প্রকাশ। (১ম ভাগ, [illegible], ১৮৮১ খৃঃ, পৃঃ ৯৯)।

অঘোরনাথ অধিকারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদার্থ-পরিচয়, ১ম সং, ১৯১২ খৃঃ; বিবিধ বিধান, ১সং, ১৯০৯ খৃঃ।

অঘোরনাথ কুমার—গ্রন্থকার। রচিত পুস্তক—শতনরী।

অঘোরনাথ গুপ্ত—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ ডিসেম্বর, শান্তিপুরে। মৃত্যু—১৮৮১ খৃঃ। গ্রন্থ—শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (তিন খণ্ড, কলি, ১৮৮৮ খৃঃ)।

অঘোরনাথ ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ডাহির সেনাপতি নাটক (১৮৭৭ খৃঃ, পৃঃ ৯৬); পৌরাণিক গল্প (১৩০৪ বঙ্গাব্দ); শক্তিমুক্তি (১৩১৮ বঙ্গাব্দ); সংযুক্তা-উপাখ্যান (১৮৯৯ খৃঃ)।

অঘোরনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রকৃত দীক্ষা (কলিকাতা ১৯০৫), সদ্‌গুরু ও শিষ্য (কলিকাতা ১৯০৫)।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ, বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগ্রামে। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ ২৯এ জানুয়ারি। শিক্ষা—ব্রাহ্মণগ্রামের পাঠশালা; প্রবেশিকা পরীক্ষা (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল—১৮৬৭ খৃঃ); এফ-এ—১৮৬৯ খৃঃ, Gilchrist পরীক্ষা—১৮৭১ খৃঃ; বি-এস-সি—(এডিনবারা, ১৮৭৫ খৃঃ—Coxter বৃত্তিলাভ, Hope prize লাভ)। ডি এস-সি (এডিনবারা, ১৮৭৭ খৃঃ); নিজাম রাজ্যে ১৮৭৮—১৮৮২ খৃঃ।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি (কলিকাতা, ১৮৬৮ খৃঃ পৃঃ ১৩৬); হরিদাস ঠাকুর (কলিকাতা, ১৮৯৬ খৃঃ, পৃঃ ১৫০); বিয়োগী বন্ধু (কলিকাতা, ১৮৭৬ খৃঃ, পৃঃ ১২); ভক্তচরিতামৃত (১৩০০ বঙ্গাব্দ); মেয়েলি ব্রত।

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান। গ্রন্থ—চারুচরিত (কলিকাতা, ১৮৫৭ খৃঃ); রামায়ণ (আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড, বর্ধমান, ১৮৬৬—৭১ খৃঃ), মহাভারত (শান্তিপর্ব। ৩য় ভাগ, বর্ধমান, ১৮৭৮ খৃঃ), সত্যবিয়োগ নাটক (১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ভ্রমবিলাস (বর্ধমান, ১৮৯১ খৃঃ, পৃঃ ১৩৩)।

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কংগ্রেস (১২৯৭ বঙ্গাব্দ); অপূর্ব-সংযোগ (কলিকাতা, ১৮৭৬ খৃঃ); অভিমন্যু-বধ কাব্য (কলিকাতা ১৮৬৮)!

অঘোরনাথ বসু-চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাসী যুবা (প্রহসন। ১৩০২ বঙ্গাব্দ)।

অঘোরনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্লোকমালা (কলিকাতা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৮)।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাবণ-বধ-কাব্য (কলিকাতা, ১৮৭৭ খৃঃ, পৃঃ ৪৬); সতীত্ব-রঞ্জিনী (কলিকাতা, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৫)।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—গীতিকার। গ্রন্থ—গীত-রত্নমালা, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)।

অঘোর শিবাচার্য—অদ্বৈতাচার্য (১০৮০ শক, ১১৪৮ খৃঃ)। গ্রন্থ—'মৃগেন্দ্র-সংহিতা' (স্মারগ্রন্থ); ক্রিয়াক্রমদ্যোতিনী; বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠাবিধি; শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাবিধি; তত্ত্বত্রয়নির্ণয়ব্যাখ্যা, তত্ত্ব-প্রকাশিকাবৃত্তি, শিবতত্ত্ব-প্রকাশিকাবৃত্তি, তত্ত্বসংগ্রহলঘুটীকা, নাদকারিকাবৃত্তি, পদ্ধতি (পদ্ধতি গ্রন্থ), সর্বজ্ঞানোত্তরবৃত্তি।

অঘোরানন্দ স্বামী—গ্রন্থকার। পূর্বনাম—শরৎচন্দ্র কুণ্ডু। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—তত্ত্বজ্ঞানামৃত (১৩৩৩ বঙ্গ)।

অচনাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণরাজ-সার্বভৌমত্রিশতী; কৃষ্ণরাজাষ্টোত্তরশতী।

অচল—১—গ্রন্থকার। পিতা—বামন দীক্ষিত। জন্ম—১৬১১ খৃঃ। ২—বৎসরাজের পুত্র। গ্রন্থ—শাঙ্খ্যায়নাহ্নিক।

অচল উপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাক্যবাদ (দর্শন)।

অচলদেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহারুদ্রপদ্ধতি।

অচল দ্বিবেদ (দ্বিবেদী)—গ্রন্থকার। পিতা—বৎসরাজ; মাতা—ভাগ্যবতী। গ্রন্থ—নির্ণয়দীপিকা।

অচলার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্যোতির্বিদশৃঙ্গার।

অচিন্তদেব—কবি। গ্রন্থ—সুভাষিতাবলী।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—উপন্যাসিক। জন্ম—১৩০১ বঙ্গাব্দে। এম-এ, বি-এল। কর্মক্ষেত্র—সেসন জজ, বাংলা সরকার, বর্তমানে আসানসোল।

গ্রন্থ—ডবল ডেকার; নবনীতা; উর্ণনাভ; আকস্মিক; টুটাফুটা; অন্তরঙ্গ; ইন্দ্রাণী, অনন্যা (১৩৪১), নেপথ্য, তৃতীয় নয়ন (১৩৪০), তুমি আর আমি (১৩৪০), প্যান, প্রচ্ছদপট, ঢেউয়ের পর ঢেউ (গল্প), কাক-জ্যোৎস্না, ইতি (গল্প), প্রথম প্রেম, অধিবাস, অকাল বসন্ত, ছিনিমিনি, জননী জন্মভূমিশ্চ, আসমুদ্র (১৩৪১), সঙ্কেতময়ী (গল্প), রুদ্রের আবির্ভাব। মুখোমুখি, দিগন্ত, অমাবস্যা (কবিতা), আকাশ-প্রদীপ (শিশু), ডাকাতের হাতে (শিশু), সবুজ নিশান (শিশু); কল্লোল যুগ (১৩৫৭), পাখনা (১৩৫৭), শ্রেষ্ঠ গল্প; আসমান জমিন; কাঠ-খড়-কেরাসিন; চাষা-ভুষা; যায় যদি যাক্ (১৩৫৭); হাড়ি মুচি ডোম।

অচ্যুত—টীকাকার। গ্রন্থ—অমরকোষ-টীকা।

অচ্যুত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'রস-সংগ্রহ-সিদ্ধান্ত' (আয়ুর্বেদগ্রন্থ)।

অচ্যুত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাগীরথী-চম্পূ; কাব্যমালা।

অচ্যুত—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—রত্নমালা।

অচ্যুত—কবি। গ্রন্থ—কৃষ্ণশতক।

অচ্যুত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর; গুরুবরপ্রার্থনা-পঞ্চরত্নস্তোত্র।

অচ্যুত চক্রবর্ত্তী—স্মৃতিগ্রন্থকার। পিতা—হরিদাস তর্কাচার্য। গ্রন্থ—শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্পনী; দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা; হারলতাটীকা বা সন্দর্ভ-সূতিকা।

অচ্যুতদাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোপীভক্তিরস; নামান্তর—কৃষ্ণলীলা।

অচ্যুতনাথ অধিকারী—অনুবাদক। গ্রন্থ—প্রকৃতি পাঠ (কলি, ১১২৫)।

অচ্যুত বলবন্ত কোহলহাটকর—মরাঠী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্বামী বিবেকানন্দ নাটক (মরাঠী)।

অচ্যুত যতি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সীতারামাষ্টক; বৃহৎস্তোত্র রত্নাকর।

অচ্যুতরঘুনাথভূপাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামায়ণসারসংগ্রহকার।

অচ্যুতশর্মা—দায়ভাগটীকাকার।

অচ্যুতসূরি—মাধবাচার্যকৃত 'শঙ্করবিজয়ে'র টীকাকার।

অচ্যুতানন্দ দাস—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে—উড়িষ্যার কটক জেলার নবমাল বা নেমাল নামক গ্রামে। পিতা—দীনবন্ধু খুঁটিয়া; মাতা—পদ্মাবতী। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চসখার অন্যতম। গ্রন্থ—শূন্যসংহিতা; অণাকার-সংহিতা, গুরুভক্তিগীতা; সাতখণ্ডীয়া হরিবংশ; অনন্ত গোপি; অচ্যুতানন্দ মালিকা।

অচ্যুতানন্দ রায়গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাবলহরী (রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। আজিমগঞ্জ, ১৮৭৬ খৃঃ)।

অজ্‌হুদ্দীন কাজি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুয়াকিয়া অজদিয়া মৃত্যু—১৩৫৫ খৃঃ (৭৫৬ হিঃ)।

অজয়কুমার সেন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৫৫ বঙ্গ। পিতা—রায় জলধর সেন বাহাদুর। গ্রন্থ—প্রজাপতির দৌত্য (গল্প)।

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য—কবি। অনুবাদ—রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কুমিল্লা, ১৩৩১ খৃঃ, পৃঃ ৬৫)।

অজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কবি। গ্রন্থ—শুক ও সারী (গান)।

অজয় দাশগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পলাশীর পরে; রেল কলোনী।

অজয় পাল—কোষকার। জন্ম—১১শ শতাব্দী। গ্রন্থ—নানার্থ-সংগ্রহ।

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়—উপন্যাসিক। গ্রন্থ—মেঘ ও জ্যোৎস্না হে ক্ষণিকের অতিথি।

অজিতকুমার গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেবীপূজা (১৩৪০)।

অজিতকুমার চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র কলিকাতায়। মৃত্যু—১৩২৫ বঙ্গ, ১৪ই পৌষ, রবিবার। পিতা—শ্রীচরণ চক্রবর্তী। ১৩১০ বঙ্গাব্দ শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। গ্রন্থ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, কাব্য-পরিক্রমা, বাতায়ন, ভক্তবাণী ১ম ও ২য় খণ্ড, খৃষ্ট। Modern Review, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতির প্রবন্ধ-লেখক। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত—"রাজা রামমোহন রায়" (১৩৪০)।

অজিতকুমার দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিশ্বাস করুন চাই না করুন।

অজিতকুমার ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

অজিত ঘোষ—কলাশিল্পবিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই মাঘ। পিতা—সার্জন ফকিরচাঁদ ঘোষ। শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ (১৮৯৩—১৯০১; ১৯০৩—১৯০৫), প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৯০১—১৯০৩; ১৯০৫-৬) এম-এ, বি-এল; এ্যাডভোকেট হাইকোর্ট—১৯১১। Rupam, Muslim Reveiw, Rooplekha, Indian Hist. Quaterly, পঞ্চপুষ্প, বিচিত্রা, বসুমতী প্রভৃতি পত্রের লেখক।

অজিত ঘোষ (মজুমদার)—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতায়। শিক্ষা—সরস্বতী ইনস্টিটিউসন ও বিদ্যাসাগর কলেজ। পিতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্পাদক—প্রবুদ্ধ ভারত (বাংলা); পঞ্চপুষ্প (সহ-সম্পাদক); বঙ্গীয় মহাকোষ (সহ)। আনন্দবাজার প্রবর্তক, পঞ্চপুষ্প, বিশ্বকোষ প্রভৃতির সাময়িক লেখক।

অজিতচন্দ্র—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দনমলয়গিরি (১২৭৬ বি-সং)

অজিত দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জনান্তিকে (প্রবন্ধ); ছড়ার বই।

অজিতদেব সূরি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যোগবিধি (১২৭৩ বি-সং)

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন—বঙ্গীয় পণ্ডিত ও কবি। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গাব্দ, নবদ্বীপে; মৃত্যু—১৩২৩ বঙ্গাব্দ ২৪এ মাঘ, কলিকাতায়। পিতা—রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; মাতা—ঈশ্বরী দেবী। মহামহোপাধ্যায় ও কবিভূষণ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—বকদূত; কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ; রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের টীকা; চৈতন্যশতক ও অমরার্থ-চন্দ্রিকা। সম্পাদক—'বিশ্বদূত' সাপ্তাহিক।

অজিতপ্রভসূরি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'শান্তিনাথ-চরিত' (সংস্কৃত। ১৩১৭ বি-সং)।

অটলবিহারী ঘোষ—তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১২৭১ বঙ্গাব্দ, ১২ ভাদ্র; মৃত্যু—১৩৪২, ২৭এ পৌষ, কলিকাতা চালতাবাগানস্থ স্বগৃহে। বি-এ ও এম্-এ, পরীক্ষা (প্রেসিডেন্সী কলেজ) ১৮৮৬ খৃঃ; বি-এল। স্যার জন উড্রফ সহযোগে—১১খানি তন্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অটলবিহারী দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রহ্লাদ-চরিত্র (কলি, ১৮৭৮ খৃঃ, পৃঃ ৪৩)।

অটলবিহারী নন্দী—ভক্ত ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পাগলামী অর্থাৎ শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী (বৃন্দাবন, ১৯০৫ খৃঃ); পাগল হরনাথ ২য় (১৯০৭ খৃঃ); ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

অন্নয়ার্য (শ্রীশৈল)—গ্রন্থকার। পিতা—শৈলবংশীয় শ্রীনিবাস আচার্য। কোশলবংশ্য রাজা বেঙ্কটের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—'তত্ত্বগুণাদর্শ' (শৈব ও বৈষ্ণবের মূল সূত্রগুলির তুলনামূলক আলোচনা)

অম্মাশাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মীনাক্ষি-পরিণয়।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—বাংলার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত। জন্ম—৯৮০ খৃঃ গৌড়দেশের 'বিক্রমমণিপুরে' কোন রাজবংশে। মৃত্যু—১০৫৩ খৃঃ স্নেথঙে। গ্রন্থ—বোধিমার্গ দীপপঞ্জীকা', 'একবীর-সাধননাম', 'প্রজ্ঞাপারমিতা পিণ্ডার্থপ্রদীপ', 'লোকাতীতসপ্তাঙ্গ-বিধি'।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বাগ্মী। জন্ম—১২০৪ বঙ্গাব্দ ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার, কলিকাতা সিমুলিয়া। মৃত্যু—১৩৫৩ বঙ্গাব্দে স্বগৃহে। পিতা—পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। শিক্ষা—হিন্দু বিদ্যালয়, ও সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—ভক্তের জয় ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ; নানান্ নিধি: পূজার গল্প, রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ; শ্রীপাদ-ঈশ্বরপুরীর জীবনী; তুলসী-মঞ্জরী (মূল ও অনুবাদ)। সম্পাদিত গ্রন্থ—কবিকুঞ্জ, লঘু-ভাগবত (পণ্ডিত 'বলাইচাঁদ গোস্বামী সহ)। শ্রীচৈতন্যভাগবত; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল; ভক্তিরত্নাবলী; বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী; রূপচিন্তামণি; সারঙ্গরঙ্গদাটীকা; লীলাশুকের ব্যাখ্যা; নরোত্তমঠাকুরের পদাবলী; নরোত্তমঠাকুরের প্রার্থনা; সাধন-সংগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত; মহাপ্রভুর উপদেশ; ভক্তবৃন্দের উপদেশ।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—আইন-গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'মহম্মদীয় আইন'। ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দু জাতির আর্থিক দুরবস্থা।

অতুলকৃষ্ণ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্বর-চিকিৎসা।

অতুলকৃষ্ণ দেবশর্মা—সম্পাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ—শব্দশক্তি-প্রকাশিকা (জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য প্রণীত। বেনারস, পৃঃ ৫৮৩)।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—নাট্যকার। সাহিত্যিক ও পত্রিকা-সম্পাদক। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গাব্দ, ৮ই অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গাব্দ ১লা আশ্বিন, কলিকাতা, ৩৩ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটে। শিক্ষা—নর্ম্যাল স্কুল, হেয়ার স্কুল ও আর্ট স্কুল।

গ্রন্থ—পাগলিনী (নাটক), আদর্শ সতী, রত্নাবলী বা অপ্সর-কানন; পিশাচিনী, ভীষ্মের শরশয্যা; পাণ্ডব-নির্বাসন; তুলসীলীলা (১৮৮৮ খৃঃ); নন্দবিদায় (১৮৮৮); গাধা ও তুমি (১৮৮৮); বক্কেশ্বর (প্রহসন, ১৮৮৯); গোপীগোষ্ঠ (১৮৮৯); ভাগের মা গঙ্গা পায় না (১৮৮৯); আনন্দকুমার (নন্দকুমারের ফাঁসি। ১৮৯০)। নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সঙ্গীত (১৮৯১); বিধবা কলেজ, চাবুক (১৮৯২); আমোদ-প্রমোদ (১৮৯৩); মা (ফুল্লরা। ১৮৯৪); বাপ্পারাও (১৯০৫)।

নাট্যকৃত গ্রন্থ—কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, দেবী-চৌধুরাণী, দুর্গেশনন্দিনী। অপেরাগ্রন্থ—শিরী ফরহাদ (১৯০৬); লুলিয়া; হিন্দাহাফেজ; তুফানী; ঠিকে ভুল (১৯১০); পাষাণে প্রেম (১৯১০); রংরাজ (১৯০১); শাহাজাদী (১৯০৯)। কলির হাট (পঞ্চরঙ্গ। ১৮৯২); বালিবধ; দমবাজ (১৯০১) রকমফের (১৯১১); জেনোবিয়া (১৯১১); মোহিনী মায়া (১৯১২); নন্দোৎসব-গীতিকা; প্রণয়-কানন বা প্রভাস; বুড়ো বাঁদর; বিজয়া; প্রেমকল্পতরু; আয়েষা (১৯০১); আসল ও নকল (১৯১২); প্রাণের টান (১৯১০); যুগল-মিলন; সপত্নী (ঐতিহাসিক নাটক); দুলালচাঁদ (গল্প); মায়া (গল্প); হতভাগিনী (গল্প)। সম্পাদিত পত্র—আন্দোলন (মাসিকপত্র), সাপ্তাহিক বসুমতী (অল্পদিন)।

অতুলকৃষ্ণ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গো-জাতির উন্নতি (১৮৯৩); মনসা-প্রসূন।

অতুলগোপাল রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উত্তরাখণ্ডে তীর্থ-পর্যটন (১৩৪০)।

অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেওয়ানী কার্য-শিক্ষা ও দলিলচন্দ্রিকা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—সাহিত্যিক ও সমালোচক। জন্ম—১২৯১ বঙ্গাব্দ ২১এ বৈশাখ, টাঙ্গাইলের (ময়মনসিং) অন্তর্গত বিন্নাকৈ গ্রামে। পিতা—স্বর্গগত উমেশচন্দ্র গুপ্ত। শিক্ষা—এন্ট্রান্স পরীক্ষা (১৯০১); এফ-এ (প্রেসিডেন্সী ১৯০৩); বি-এ (রংপুর ১৯০৫); বি-এল (রিপণ কলেজ)। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। সবুজপত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। গ্রন্থ—শিক্ষা ও সভ্যতা (১৩৩৪); কাব্যবিজ্ঞান (ভারতী-ভবন); পত্রাবলী (১৯৩১); নদীপথে (১৩৪৪); জমির মালিক (১৩৫১); সমাজ ও বিবাহ।

অতুলচন্দ্র ঘটক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আশুতোষের ছাত্রজীবন (কলিকাতা ১৯২৪)।

[ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়

এক

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু আজও স্বদেশে-বিদেশে অগণিত নর-নারী তাঁহাকে বরেণ্য মহাপুরুষ বলিয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছে। স্বামীজীর উননবতিতম জন্মতিথি (৩০শে জানুয়ারী ১৯৫১) উপলক্ষে তাঁহার মহান্ অবদানকে স্মরণ করিয়া আমরাও তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

স্বামীজীর জীবন-বেদ, জীবনাদর্শ, বাণী, ভাষণ, রচনা, অধ্যাত্ম-সাধনা এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য,—মুমূর্ষু জাতির মধ্যে আনিয়াছে প্রাণ-বন্যা, আশার আলোক-বর্তিকা জ্বালাইয়া জাতির চিত্ত হইতে দূর করিয়াছে নৈরাশ্য-তিমির, উদ্‌ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট জাতিকে দিয়াছে পথের সন্ধান। ঊনবিংশতি শতকের শেষ দশকে ও বিংশতি শতকের আরম্ভেই এই তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী তাঁহার স্বদেশবাসীর—বিশেষ করিয়া বাঙালীর চিন্তা-জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছেন, কাল-বৈশাখীর মতো দুর্বার উদ্দাম বেগে আসিয়া যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত কুসংস্কারের আবর্জনা-স্তূপের এক বৃহৎ অংশকে উড়াইয়া দিয়াছেন। নরের মধ্যে নারায়ণের অধিষ্ঠান, জীবের ভিতর শিবের প্রকাশ—হিন্দুধর্মের এই শাশ্বত সত্যকে তিনি বিস্মৃতির অতল তল হইতে উদ্ধার করিয়া অনুপম ভাব ও ভাষার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন। এই সত্যের ভিত্তিতে স্বামীজী মানব-সেবার এক নূতন আদর্শ তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, আর নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়া নর-নারায়ণ পূজার এক নব পদ্ধতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল পুণ্যশ্লোক ভারতবাসীর কর্মাবদানে নব্য ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে, বিবেকানন্দ তাঁহাদেরই এক জন। উত্তর কালে কত নর-নারী স্বদেশ-সেবার প্রেরণা পাইয়াছে তাঁহার জীবন হইতে। তিনি দীর্ঘায়ু হন নাই। মাত্র উনচল্লিশ বৎসরের জীবন; শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও ছাত্র-জীবনে কাটিয়া গেল একুশ বৎসর, আর বাকী মাত্র আঠার বৎসর হইল তাঁহার কর্মজীবন। যে বয়সে সাধারণতঃ মানুষের সাংসারিক জীবন এবং ভোগের জীবনের আরম্ভ হয়, সেই বয়সেই আরম্ভ হইয়াছিল স্বামীজীর ত্যাগ-তপস্যা ও সাধনার জীবন। তাঁহার কর্মজীবন ধর্মজীবন হইতে পৃথক্ নহে। কামনা-বাসনা-মুক্ত মন লইয়া ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম অনুষ্ঠিত হইত শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে। পতিত কাঙাল, দীন-দরিদ্র, অনাথ, আতুর, রিক্ত, সর্বহারা, ক্ষুধিত-তৃষিত, রুগ্ন-জীর্ণ এবং পাপী-তাপীর মধ্যেও স্বামীজী দর্শন পাইতেন নারায়ণের, তাঁহার অনুভূতি হইত নর-দেহে নারায়ণের অবস্থিতির। স্বামীজী বলিয়াছেন :—

"যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্টবিষ্টু ভেবো না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব, তফাৎ কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তি দেখিতেছি—আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের পূ করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি দুঃখ ভুগিতেছে সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আম রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করি পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাে ইহা বলিতেই হইবে; কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রে সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সে করিতে পারি।"—(ভারতে বিবেকানন্দ)

এই সম্পর্কে স্বামীজী অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, দু'টো পয়সা নে রে বেটা বলিয় গরীবকে উহা দিও না; বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে, গরীব হওয়াতে তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করি সমর্থ হইতেছ। যে প্রতিগ্রহ করে, সে ধন্য হয় না, দাতাই ধ হয়। তুমি যে তোমার দয়া-শক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া আপনাকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, তজ্জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। মানবকে সাহায্যরূপ ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নহে?"—(কর্মযোগ)

পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদের মধ্যে মানব-সেবার এরূপ আদর্শ কোথায় মিলিবে কি? মার্কস্‌বাদে আমরা শুনিতে পাই পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদের কথা, বুর্জোয়া শ্রেণীকে নির্মূল করিয়া প্রোলিটেরিয়েটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা। হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে লোক-সেবার যে আদর্শ ও বাণী দিয়া গিয়াছেন, উহার অনুরূপ আদর্শ ও বাণী মার্কস্‌ র "ক্যাপিটেল্" গ্রন্থে তো মিলিবেই না, বর্তমান যুগের লেনিনের কিম্বা ষ্টেলিনের কোন রচনায় এবং ভাষণেও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। যে মতবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসীর স্থান নাই, সেখানে ঐরূপ আদর্শ ও বাণীর সন্ধান মিলিবে কি করিয়া?

দুই

স্বামীজী বলিতেন যে, দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা ঈশ্বরোপাসনার একটি পদ্ধতিবিশেষ। প্রতিদিন কয়েক জন দীন-দরিদ্র, অনাথ-আতুর, অন্ধ বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে নিজ গৃহে সাদরে ডাকিয়া আনিয়া অশন-বসনাদি দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের পূজা করা আমাদের কর্তব্য। এই পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শুধু আদর্শ প্রচার করিয়াই স্বামীজী ক্ষান্ত হন নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সেই আদর্শকে রূপায়িত করিতেও চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা বহুলাংশে সফল হইয়াছিল। 'আপনি আচরি ধর্ম' তিনি পরকে শিখাইতেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর অন্যতম ভক্ত-শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বেলুড় মঠের যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম :—

"মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটী কাটিতে প্রতিবর্ষে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে ক ভালবাসিতেন।...স্বামীজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের

... লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।...

"স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন—তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" স্বামীজী যে "দরিদ্র-নারায়ণের" সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন,—"এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরল চিত্ত—এমন অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর কত্তে পার্ব্বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখনও কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয় মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই।"—(স্বামি-শিষ্য সংবাদ—উত্তরকাণ্ড)

এমনি দৃষ্টান্ত স্বামীজীর জীবনে আরও কত আছে। এই যে দীন-দরিদ্র পতিত-উৎপীড়িত—ইহারাই তো নারায়ণ,—ইহাদের সবাই নারায়ণের সেবা; এবং মনে-প্রাণে এই নর-নারায়ণের সেবা করিবার জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীকে আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে স্বামীজীর আর একটি বাণী উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, সেই দীন-দরিদ্র পতিত-উৎপীড়িতদের জন্য।—(পত্রাবলী—প্রথম ভাগ)

তিন

স্বামীজীর সংস্কার-মুক্ত তপোদীপ্ত উদার দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য ছিল না। বর্ণ-বিভাগের ভিত্তিতে তিনি মানুষকে উচ্চ কিংবা নীচ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে অস্পৃশ্যতারূপ দুর্নীতির এবং তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "ছুঁৎমার্গ"। অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গ হিন্দু ধর্মের মহান্ উদার আদর্শকে কি ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং হিন্দু সমাজের কিরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, তৎপ্রতি তিনি হিন্দু-ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে স্বামীজী আমেরিকা হইতে তাঁহার এক জন বাঙালী শিষ্যকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এ দেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করবার কয়টা সভা আছে? কয় জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারি দিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না দূর দূর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না! এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছ? এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।"—(পত্রাবলী—প্রথম ভাগ)

জাতিভেদ প্রথা হইতে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অশাস্ত্রীয় ও অন্যায়। ইহার দ্বারা বিরাট হিন্দু সমাজের অখণ্ডতা নষ্ট হইয়াছে। সমাজের তথাকথিত উচ্চ জাতির মধ্যে যাঁহারা 'ছুঁৎমার্গ'বাদী অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার সমর্থক, তাঁহারা স্বশ্রেণীর আভিজাত্য ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সর্বনাশা কুপ্রথাকে জাগাইয়া জীয়াইয়া রাখিতে সতত চেষ্টিত। প্রাচীন ভারতের উদার-চরিত সমদর্শী আর্য ঋষিগণের বর্ণ-বিভাগের মূলের যে গূঢ় তত্ত্ব নিহিত ছিল, তাহা এই শ্রেণীর স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রেণীগত ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার তাগিদে সেই তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তি জাতি ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে বিবেচনার মধ্যে কোন কালেই আনেন নাই। ফলে, হিন্দু জাতি ও হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হইয়াছে অপূরণীয়। জাতি-বিভাগের মূলে যে কি উদ্দেশ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভারতের এই জাতিবিভাগ প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ে দেখ তবে দেখবে এখানে বরাবরই নিম্ন জাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে, শেষে সকলে ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্যপ্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে উঠাতে হবে।"

যে সময়ের কথা এখন বলিতেছি, তখন মাদ্রাজে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সামাজিক অত্যাচার, দুর্ব্যবহার ও অবহেলার দরুণ অস্পৃশ্য শ্রেণীর পেরিয়ারা দলে-দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিতেছিল। এক দিন বেলুড় মঠে স্বামীজী সেই সম্পর্কে আলোচনা কালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই বলিয়াছিলেন :—

"এই দেখ, না—হিন্দুর সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না ব'লে। আমরা দিন-রাত কেবল তাদের বলছি—"ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে।" দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ্! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি। ইচ্ছা হয়—তোর

ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে, এখনই যাই—"কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল, দীন দরিদ্র আছিস্"—ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা কর্ত্তে পারলুম না। তবে আর কি হল? হায়, এরা দুনিয়াদারীর কিছুই জানে না, তাই দিন-রাত খেটেও অশনবসনের সংস্থান কর্ত্তে পাচ্ছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন; কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।"

হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর উপেক্ষিত, উৎপীড়িত, অন্নবস্ত্রহীন নিঃস্ব দুর্ভাগাদের দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা-দুর্দশায় স্বামীজীর প্রাণে কি যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত উক্তির মধ্যেই অভিব্যক্ত। ইহাদের জন্য তাঁহার বেদনাবোধ কত গভীর! প্রতিটি বাক্য যেন সমবেদনার অশ্রুজলে সিক্ত। স্বামীজী তাঁহার নিজের আর ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পান নাই বলিয়াই এমন আন্তরিকতার সহিত বলিতে পারিয়াছেন—"এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন; কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র।" স্বামীজীর এই বাক্যের ভিতর দিয়া যে মহাভাবের দ্যোতনা, উহা তাঁহার রচনায় ও ভাষণে আরও অনেক স্থলেই রহিয়াছে।

চার

এইরূপ আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর এইরূপ বাণী বহন করিয়া আনিতে পারে কেবল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে উচ্চাসন দিয়াছে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র। কিন্তু হিন্দুধর্মের মতো মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের তত্ত্বকথা আর কোন ধর্ম প্রচার করে নাই। মুসলমানের শরা-শরিয়ৎ মতে, মানব—'আস্‌রাফুল মখলুকাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টিসমূহের শ্রেষ্ঠতম জীব; খৃষ্টান ধর্মে মনুষ্যের সৃষ্টিতে ভগবন্মূর্তির চরম স্ফূর্তি—"God created man in his own image." আর মানুষ সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের আদর্শ আরও মহান্; সে ধর্মের মতে শুধু মনুষ্যের মধ্যে নয়, বিশ্বময় সর্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান;—"ঈশা বাস্যমিদং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মবাণী শুনিবার জন্য বিশ্বের মানব-সন্তানকে আহ্বান করিয়াছেন অমৃতের পুত্র বলিয়া—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"…।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের উপর যে অত্যাচার অবিচার ও দুর্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহার ফলে ঐ সমুদয় নিম্ন জাতি মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের স্তরে নামিয়া গিয়াছে। এই অবস্থা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপায়ও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিক্ষার দ্বারা ইহাদের উন্নত করিতে হইবে, এবং ইহারা যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া ও সংস্কারের আলোক পাইয়া ভবি ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারে, সেই আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং তজ্জন্য চেষ্টিত হইতে হই এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ধনি-দরিদ্র, বিদ্বান সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচ—সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন নারা সুতরাং শিক্ষার আলোক পাইলে প্রত্যেকের দৃষ্টিতে তাঁহার নি বাস্তব রূপ প্রকাশিত হইবে।

বস্তুতঃ পক্ষে সমাজের এই শ্রেণীর জনগণের জাগরণের উ যে ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং তাহারাই জাতীয় জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই সত্য স্বামীজী উপ করিতে পারিয়াছিলেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণকে লক্ষ্য ক তিনি বলিয়াছেন:—

"এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরীচিকা তো —উচ্চবর্ণেরা।……ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ ন হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগু অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গ পূর্বকালে অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এত দিন দেবা সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলী হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষা কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন-রাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়—! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখ; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটী জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।"—('পরিব্রাজক')

অর্দ্ধ শতকেরও পূর্বে যে বাণী ভারতে উচ্চারিত হইয়াছিল এই বাঙ্গালী তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে, সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সহস্র সহস্র কণ্ঠে। স্বামীজী নূতন ভারতের আবির্ভাব কামনা করিয়াছেন কৃষকের লাঙ্গল হইতে—শ্রমিকের কারখানা হইতে। বর্ণাভিমানী উচ্চবর্ণের গৃহ হইতে কিংবা বিলাসী ধনীর প্রাসাদ হইতে যে নূতন ভারতের আবির্ভাব হইতে পারে না,—তাহা জানিতেন এই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। জানিতেন বলিয়াই তিনি এই শ্রেণীর "রক্ত-মাংসহীন কঙ্কালকুল"কে

বলিয়াছিলেন, তাহারা যেন শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়। এই উত্তরাধিকারী যে কাহারা, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। লাঙ্গলধারী কুটিরবাসী কৃষক,—ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত ও কারখানার শ্রমিক,—জেলে, মালা, মুচি, মেথর, ভুনাওয়ালা, বাজারের মুদি প্রভৃতি হইল এই উত্তরাধিকারী। ইহাদের দেখাইয়া দিয়াই স্বামীজী বলিয়াছেন—"এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" এই উপেক্ষিত, নিপীড়িত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে যে "অটল জীবনীশক্তি" নিহিত রহিয়াছে, তাহাও মহাপুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ইহাদের শক্তির প্রতি দেশ ও জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিয়া যেন মানুষের অধিকার প্রদান করা হয় এবং আহারের ব্যবস্থা করিয়া যেন ইহাদের বাঁচাইয়া রাখা হয়। তাহা হইলে ইহারা পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে পারিবে, ত্রিভুবনে ইহাদের তেজ ধরিবে না এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম প্রকাশ পাইবে। "এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন" —এই মহাপুরুষবাণী যে সত্য, বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে তাহা তো আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

পাঁচ

ভারতের মুক্তি-সাধনে এবং নূতন ভারত গঠনে ত্যাগ ও সেবার যে গুরুত্ব রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে স্বামীজী দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিতে ভুলেন নাই। ত্যাগ-ধর্ম চর্য্যা ও সেবা-ব্রত পালনের মধ্য দিয়া লোক-সেবক আপনাকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারে। তাঁহার মতে ত্যাগ বলিতে কেবল স্বার্থত্যাগ নহে, ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগও ত্যাগ-ধর্মের অঙ্গীভূত। একটা জাতির উত্থান-পতন নির্ভর করে এই ত্যাগের উপর। মাদ্রাজে প্রদত্ত একটি ভাষণে ত্যাগের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কালে স্বামীজী বলিয়াছেন :—

…"জীবন-সংগ্রামে (অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামরূপ মতবাদের পোষকতায়) প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না, ত্যাগের জয় হইবে?…ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই (অর্থাৎ সহিষ্ণুতাই) জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছু দিনের জন্য পাপ-খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে; কিন্তু এই মহান্ জাতি—অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই) এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?"

স্বামীজী বলিতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিতে হইলে কিংবা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইতে হইলে মানুষকে সর্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া 'পরহিতায়' আত্মোৎসর্গের ব্রত পালন করিতে হইবে। ভারতের নানা স্থানে এমন বহু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিয়াছেন নিজের মুক্তির জন্য। নিজের মুক্তি তাঁহাদের চরম লক্ষ্য ও পরম কাম্য। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা ত্যাগের সর্কোচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারেন নাই। ত্যাগের পূর্ণতা প্রাপ্তি তখনই হইবে, যখন ত্যাগ-ধর্মী সাধক বিশ্বমানবের হিতসাধনের জন্য, জন্মভূমির মঙ্গলার্থ এবং নর-নারায়ণের সেবায় আপন মোক্ষলাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য কিংবা সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করিবেন।

স্বামীজী এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে মূর্ত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনুষ্ঠিত লোক-সেবার কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকমণ্ডলী অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, বন্যার্ত্ত, রুগ্ন, অনাথ-আতুর ও দুর্গত নর-নারীকে নারায়ণ-জ্ঞানে যে সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার সতীর্থগণের কর্মবিধানের ফল।

স্বামীজী ত্যাগ ও সেবাকে এইরূপ উচ্চাসন দিতেন যে, এই দুইটিকে তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে জনৈক সাংবাদিকের সহিত কথোপকথন কালে তিনি তাঁহার এই অভিমত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—এই দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা-আপনি উন্নত হইবে। এ দেশের 'ধর্মের নিশান' যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।"—(কথোপকথন)

[ক্রমশঃ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পোষ্টাফিস

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের যে প্রধান দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে তথায় উহার জন্য একটি বিশেষ পোষ্ট আফিস স্থাপন করা হইতেছে। এই ব্যাপারে মার্কিণ কর্তৃপক্ষও সহযোগিতা করিতেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তরের নূতন ঠিকানা হইবে—'ইউনাইটেড নেশনস, নিউইয়র্ক'। উক্ত পোষ্টাফিস পরিচালনার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ ডাক-টিকেট মুদ্রণের ব্যয় বহন করিবে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ১৯৫১ সালের জুলাই মাস হইতে উক্ত ডাক-টিকেট বিক্রয় সুরু হইবে।

প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

১১২৩ সাল। হংস বাবু তখন সস্ত্রীক ফিরে এসেছেন সবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে। ৭ই ডিসেম্বর শ্রীনিকেতনে বীরভূম-কর্মি-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায় সভাপতি। তাতে আমন্ত্রিত হয়ে হংস বাবু "বীরভূমে চরকা ও তাঁত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি তৎকালীন শ্রীনিকেতনের থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র 'ভূমিলক্ষ্মী'তে মুদ্রিত হয়। কবি সেটি পড়েন। লেখক সম্বন্ধে কৌতূহলও প্রকাশ করেছিলেন;— বোলপুর-ষ্টেশন অতিক্রম করবার মুখে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সময় কবিকে সেই কৌতূহল প্রকাশ করতে শোনেন ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ আস। কবি আস মশায়কে এক সময় একখানি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। সেইটি তিনি সহাস্যে সগর্বে সকলকে দেখাতেন। হংস বাবুকেও সেটি দেখিয়ে এক দিন গল্পচ্ছলে কবির কৌতূহলের কথা জানান। এর থেকে এ-ও জানা যাচ্ছে যে, বোলপুরের ষ্টেশন-মাষ্টারও একদা কবির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন। উপরোক্ত হংস বাবুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী শান্তিনিকেতন পাঠ-ভবনের ছাত্রী ছিল, শ্রীভবনে থাকত, ভালো আবৃত্তি করতে পারত, কবির সে স্নেহপাত্রী ছিল।

'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকাটি প্রথমে বীরভূম কৃষি সমিতির হাতে ছিল, পরে 'বিশ্বভারতী এর ভার গ্রহণ করেন।' আচার্য রবীন্দ্রনাথ কাগজটির নামকরণ ক'রে দেন এবং 'প্রথম সংখ্যার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে দেন।' (ভূমিলক্ষ্মী) নবপর্যায় 'ভূমিলক্ষ্মী'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রথমেই মুদ্রিত রয়েছে 'ভূমিলক্ষ্মী' নামক রবীন্দ্রনাথের রচনা। ছোট হলেও সেটি মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্যও। এজন্য এখানে সেটি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। "মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ সঙ্গ থেকে যতই দূরে চলে যাবে ততই তার মরণ-দশা ঘনিয়ে আসবে, ঐ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষ এত কাল বুদ্ধির জোরে ও ব্যবহারের নৈপুণ্যে যে লোকালয় গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটেনি: তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে কলের রাজত্ব প্রবল ও জটিল হয়ে উঠছে, তাতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কেবল ভেদ নয় বিরুদ্ধতা বেড়ে চলেছে। এর সাংঘাতিক ফল আমাদের অন্তরে বাহিরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ পাবেই। এই যন্ত্র-রাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ হচ্ছে এ কালের শহর। যে পল্লী প্রকৃতির সন্তান তারি প্রাণ শোষণ ক'রে শহরগুলো স্ফীত হয়ে উঠচে। এই শোষণ ব্যাপার মানুষের আত্মঘাতের প্রক্রিয়া।

"মানুষ বিনাশ হতে রক্ষা পেতে চায় যদি তবে, তাকে আবার সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। সেখানেই তার স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সৌন্দর্য। কিন্তু এত কাল এই ভূমিলক্ষ্মীর সদাব্রত যেখানে ছিল সেই তাঁর অতিথিশালা আজ ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশে যে সাধকেরা তাকে গড়ে তোলবার ভার নিয়েছেন ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় তাঁদের বাণী সার্থক হোক।"

'ভূমিলক্ষ্মী'র এই সংখ্যাতেই দরিদ্র-সাধারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য সংকলিত রয়েছে 'সম্পাদকীয়' অংশে। সম্পাদকীয় অংশটি এই:…"সম্প্রতি আচার্য রবীন্দ্রনাথ এই দরিদ্রদের কথা, তাদের সমস্যার কথা জাপানে এক বক্তৃতায় সুন্দর ভাবে বলেছিলেন। তিনি বলেন—"দরিদ্রেরা আমাদের সেবা করেছেন, আমাদের উচিত সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা। যেরূপে পারি তাঁহাদের এই দানের প্রতিদান দেওয়া, তাঁদের জীবন সৌন্দর্যালোকে উদ্ভাসিত করা, তাঁদের জীবনে সুখের আলোক-রেখা ফুটিয়ে তোলা— এইগুলিই হচ্ছে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কর্তব্য। জগতের যা-কিছু ভাল, যা-কিছু সুন্দর, সে যদি কেবল জনকতক ভাগ্যবানেরই সম্পত্তি হয়, তবে সভ্যতার বিনাশ এবং আমাদের এই যুগেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। শতাব্দের পর শতাব্দী ধরে দরিদ্রের উপর এই অত্যাচার আজ শেষ সীমায় পৌঁচেছে, সর্বত্রই অশান্তির সাড়া জেগেছে। সমগ্র জগৎ আজ ধনী নির্ধন, সুখী অসুখী, শ্রমিক ও বণিক এই দু'টি মাত্র দলে রূপান্তরিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই দলাদলি চলবে, ততদিন আমরা শান্তির তথা কল্যাণের মুখও দেখতে পাবো না।" বর্তমান জগতের দলাদলি, সংঘর্ষ ও অশান্তির মূল কারণ এবং তার প্রতিকার-পন্থার প্রধান দু'টি নির্দেশ বহন করছে ক্ষুদ্র একটি পত্রিকা এই 'ভূমিলক্ষ্মী'। যন্ত্ররাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ শহর ছেড়ে সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সেখানেই তার স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য। পল্লীসেবা এবং দরিদ্রের সেবাই বিশ্বশান্তির ভাবী বিধান,—কবির এই মহৎ বাণী দু'টিই গান্ধিজীরও জীবন-মন্ত্র। বীরভূমের একটি প্রতিষ্ঠান এবং তার মুখপত্রের (ভূমিলক্ষ্মী) সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কবির এই বাণী।

কবির পল্লীসেবা-প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতন, বীরভূমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও, তার পল্লীসেবা-বিভাগের শিক্ষা-শিবিরের মধ্য দিয়ে বাংলার এবং সর্ব-ভারতের থেকে সমাগত শিক্ষক ও সাধারণ কর্মীদের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে নীরবে দেশব্যাপী কাজ করেছে। বিশেষ ক'রে বীরভূমে শ্রীনিকেতনের সেবা-প্রচেষ্টার উল্লেখ ক'রে বীরভূমেরই স্বর্গীয় জনহিতৈষী নেতা অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত বীরভূম জেলাকর্মীয় সম্মেলনের ভাষণে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ১৩৩১ সনের চৈত্র সংখ্যা 'ভূমিলক্ষ্মী'র প্রথম প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: "শ্রীনিকেতনের কর্ম্মিগণ বীরভূমের বিপদে-আপদে সাহায্য করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। যখন কয়েক মাস পূর্বে কলেরার ব্যারাম সংক্রামক ভাবে বীরভূমের অধিকাংশ গ্রামকে বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, যখন জলাভাব বশতঃ বীরভূমের বহু স্থানে হাহাকার উঠিয়াছিল, যখন অগ্নিভয়ে (দাহের) অনেক গ্রাম ধ্বংসীভূত হইয়াছিল তখন শ্রীনিকেতনের কর্মিগণ জেলা বোর্ডের প্রথম ও প্রধান সহায় হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনে রাখিব। শ্রীনিকেতনের এই পল্লী-সংগঠন বিভাগের অধ্যাপকদিগের এবং প্রধানতঃ কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে আমরা এই জেলার যাবতীয় স্কুলের শিক্ষকদিগকে পল্লী সংগঠন কার্যে শিক্ষিত করিতে সমর্থ হইতেছি। ইতিপূর্বেই প্রায় ৩০ জন শিক্ষক শিক্ষালাভ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে পল্লী সংগঠন কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং জেলা বোর্ডের হেলথ অফিসারের ও তদধীন কর্মচারি বৃন্দের তত্ত্বাবধানে নূতন নূতন পল্লীতে সংগঠনের কার্যে আরম্ভ

হইতেছে।" অবিনাশ বাবু কাজের লোক ছিলেন। নিজ গ্রাম সুলতানপুরে নিজ ব্যয়ে একটি আদর্শ (গ্রীগ্রাম) উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের প্রথায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ ভাবে কারিগরী শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের যোগের প্রভাব যদি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার মধ্যে প্রতিবেশ বীরভূমের কোনো অঞ্চলে ভিতর থেকে কার্যকরী হয়ে থাকে, তবে সে এই সুলতানপুরেই।

বোলপুরের বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাঁধগড়ার নিশাপতি মাঝি ছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মীদলভুক্ত। কবির দর্শন ও স্নেহ তাঁরা লাভ করেছেন। সেকালে আশ্রমের বৈষয়িক কার্যে আইন-জীবীর কাজ করতেন বোলপুরের উকিল হরিপ্রসাদ বসু, একালে সে কাজ করছেন উকিল শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বিভূতি বাবুর দাদা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কবির জীবিত কালে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বিজ্ঞান-অধ্যাপক ও গবেষকের কাজ করেছেন। আশ্রমের অতি পুরোনো কর্মীদের মধ্যে এখনো বর্তমান রয়েছেন আদিত্যপুরে চিকিৎসক যোগেন্দ্র চক্রবর্তী, ভুবনডাঙায় মুন্সী শিবলাল, বাঁধগড়ায় নন্দলাল চন্দ্র ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন-মন্দিরের প্রাক্তন গায়ক শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য ছিলেন আদিত্যপুরের নিকটস্থ সর্পলেহনা গ্রামের অধিবাসী। কবির পুরোনো বাউল, কীর্তনাঙ্গ ও মার্গ সংগীত তিনি বিশেষ ভাবেই জানতেন। পুরোনো ছাত্র ছিলেন রায়পুরের প্রেমানন্দ সিংহ, নলহাটির শিবদাস রায় এবং সাময়িক ভাবে প্রথম 'ডে-স্কলার' হিসাবে সংগীত বিভাগের ছাত্র বোলপুরের সতীশ পাল এবং নন্দ ভকত। বোলপুরের শিক্ষক সমাজের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় আর আইন-আদালত সীমানার মানুষ মুন্সেফ দুর্গাদাস বসু এবং উকিল শ্রীযুক্ত ধূর্জটীদাস চক্রবর্তী মহাশয়দের কবি ও কবির সাহিত্যের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেছে স্থানীয় রবীন্দ্র-উৎসবগুলিতে তাঁদের ভাষণে। এ প্রসঙ্গে হস্তলিপি-গবেষক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্তের নামও করা যেতে পারে। তিনি কবির হস্তলিপিকলা নিয়েও আলোচনা করেছেন। কবির কাছে দীর্ঘ কালের মধ্যে আরো বহু লোক এসে থাকবেন, সকলের কথা সংগ্রহের সুযোগ হয়নি।

কবির কাছে দীক্ষা লাভ করেছেন এক জন মাত্র ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৩১৭ সনের ৭ই পৌষের উৎসবের সময় ছাতিমতলার বেদিতে বসে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদানের এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এখনো জ্ঞান বাবু শান্তিনিকেতনেই বর্তমান থেকে অবসর-জীবন যাপন করছেন। বংশানুক্রমিক বাস ছিল তাঁর বর্ধমান জিলায়। কিন্তু তাঁর পিতার ও দাদার ব্যবসায়-স্থল ছিল নলহাটি। সেখানে তাঁরা সপরিবারে বহু দিন বসবাস করেন। সুতরাং জ্ঞান বাবু এক অর্থে বীরভূমেরই লোক। জ্ঞান বাবুর পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে মহর্ষি-নিয়োজিত প্রথম 'আশ্রমধারী'। এ পদবীও মহর্ষিরই দেওয়া। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা কাব্যের কবি ও ঔষধ-ব্যবসায়ী নবীন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এঁর মাতুল। অঘোরনাথ লিখেছেন: "আমি মাতুল মহাশয়ের সহিত ...শে ঔষধের কারবার করিতাম।"—(শান্তিনিকেতন আশ্রম পৃঃ ৬২) পিতা পুত্র অঘোরনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের যুক্তভাবে রচিত সদ্যপ্রকাশিত "শান্তিনিকেতন আশ্রম" গ্রন্থখানি বহু পুরাতন তথ্যে সমৃদ্ধ। বোলপুরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আদি যোগসূত্রগুলির সন্ধান তাতে বিশদ ভাবেই পাওয়া যায়। তাতেই জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখছেন: "আমি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে এই আশ্রমে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করি। ছাতিমতলায় তাঁর পিতৃদেবের উপাসনা-বেদী হতে তিনি ১৩১৭ সালের ৭ই পৌষ তারিখে প্রাতে আমাকে দীক্ষিত করেন।" (পৃঃ ৭৪)

বোলপুর বা বীরভূমের সঙ্গে কবির কাজ বা সামাজিক যোগের সূত্র হয়ে যাঁরা সেকালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তার মধ্যে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় ও কালীমোহন ঘোষ সে যোগকে বিস্তৃত করেন; আধুনিক কালে এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ধীরানন্দ রায়, সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী, তারকচন্দ্র ধর, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আমোদিনী রায় প্রভৃতিই সাধারণের কাছে নানা দিক দিয়ে বেশি পরিচিত। এ ছাড়া শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক তিন শত পল্লী-পঞ্চায়েতের সঙ্গে, শিল্পভবন চারি পাশের বহু পল্লী-পরিবারের সঙ্গে, এবং কৃষি শিক্ষা ও সেবা বিভাগ ও মহিলা সমিতি বহু সাধারণ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে নিত্যই জড়িত আছেন। শ্রীনিকেতন সমবায়-স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি পল্লীবাসীর অর্থেই এক জন ডাক্তার ও এক জন কম্পাউণ্ডার, ঔষধ ও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা ক'রে এক-একটি পল্লীকেন্দ্রে কাজ করছেন। তার মধ্যে বিনুড়ি, সুরুল, বোলপুর, গোয়ালপাড়া, আলবাঁধা, আদিত্যপুর, লালদহ ও শীতলপুর প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব কেন্দ্রে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅধীর মজুমদার প্রভৃতি স্থানীয় কর্মীরা কবির জীবিত কাল থেকেই সেবা-কাজে নিযুক্ত আছেন। কবি কত দিন থেকে, কী উদ্দেশ্যে, এখানে কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁর কালে তিনি কতটুকু মূল্য বাইরে থেকে পেয়েছিলেন এবং নিজের ভিতর থেকে কোনখানটিতে কী অর্থে কাজের সার্থকতা দেখেছিলেন, এ সব কথার আভাস দেয়—তাঁর শ্রীনিকেতন শিল্প-ভাণ্ডার উদ্বোধনের মুদ্রিত অভিভাষণখানি। তার এক স্থলে তিনি বলছেন:

"আজ প্রায় চল্লিশ বছর হোলো শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্য-চর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।··· খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না কিন্তু বীজ বপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে, এটা অসম্ভব মনে হয়নি। বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজ বপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেক বার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়?······আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই

আনন্দ-প্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

"একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো এক জন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন, ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে এ আমি বিক্রি করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ যার দাম সকল দামের বেশি একে অকেজো ব'লে উপেক্ষা করব না কি? এই আনন্দ যদি গভীর ভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তাহলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবল মাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।" —(অভিভাষণ, শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন ১৩৪৫)

শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়ে কবি কর্তৃক এই জনসেবার কথা সকলেই জানেন। কবির নিজের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণেরই প্রয়োজনের ডাকে কিংবা তাদেরই কোনো-কিছুর সমাদর বা সম্মাননার জন্য যখন যেখানে যে-উপলক্ষে তিনি সাড়া দিয়েছেন, মাত্র তার কথাই এখানে বেছে-বেছে বেশি উল্লিখিত হল। এখানে বোলপুরের সংস্রবযুক্ত ছোট একটি ঘটনার কথাও বলি। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনগুপ্তের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কথায়-কথায় ভোলানাথ বাবু এই ঘটনার কথাটি বলেছিলেন। বোলপুর আদালতের মুন্সেফ হয়ে আসেন সুরেন্দ্র বাবু (পুরা নাম ও সময় তাঁর মনে নেই)। কিন্তু কর্মচক্রপাকে চার দিনের মধ্যেই তাঁর কেন্দ্র-পরিবর্তনের সরকারী আদেশ এসে পড়ে। বোলপুর ছেড়ে যাবার আগে এক দিন তিনি গুরুদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যান। ভোলানাথ বাবুর চেষ্টায় দর্শন মিলে, কিন্তু মাত্র চার মিনিটের সর্তে। কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কিছুটা অন্যমনস্ক ও বিরক্ত ভাবেই তাঁর আবির্ভাব হল। উত্তরায়ণের চাতালে এসে বসলেন। সকলে প্রণাম করলেন।

সুরেন বাবুর মেয়েটি ছিল অন্ধ। দেখে ততটা বোঝা যেত না। তারও খেয়াল ছিল, একটা মোটা বাঁধানো খাতায় খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের হস্তলিপি সংগ্রহ করা। আলাপ শেষ ক'রে উঠে আসবার সময় সে কথা বলা হল। গুরুদেব চেয়ে রইলেন। খাতা-হাতে মেয়েটি এগিয়ে গেল। কিছু লিখে দেওয়ার পর মেয়েটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায়-পিঠে তিনি হাত বুলোতে লাগলেন আর বললেন,—"চোখ না থাকার দুঃখ তোমার, কিন্তু মা, চোখ থাকার যে কত দুঃখ, তা তো তুমি জানো না—আমি জানি।" চার মিনিটকে চব্বিশ মিনিট ক'রে সকলকে বিদায় দিলেন। সকলে প্রণাম ক'রে উঠে এল।

স্থায়ী কাজের যোগ তো ছিলই; তা ছাড়াও নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে প্রতিবেশী অঞ্চলের নানা নেতা ও কর্মীদের সাক্ষাৎ পরিচয় ও মেলা-মেশা অভিজ্ঞতার বিনিময় থেকে যাতে কর্মের প্রসার ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়, এরূপ সব সাময়িক সম্মেলনাদি মাঝে মাঝে কবির বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে; পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে অন্য সব জায়গায় অনুষ্ঠিত অনুরূপ অনুষ্ঠানেও কবি এবং তাঁর কর্মীরা গিয়ে যোগ দিয়েছেন; এ সবই ঘটেছে বীরভূমের গ্রাম্যপরিবেশে। এর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। শহরের মধ্যে ছিল কবির সাহিত্যের আসর এবং সর্বপ্রকার সৃষ্টিকাজের প্রচার ও আলোচনার স্থান; কিন্তু তাঁর কাজের জায়গা ছিল গ্রামেই। অধ্যয়ন, উৎসব, ধ্যান-ধারণা, নাচ-গান ও জনসেবা,—সমাজকে গড়বার সর্ব দিক্‌কার আয়োজনই সেখানে ছিল। গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে মানুষকে সমবায়-জীবনে মিলিয়ে সৃষ্টিশীল ক'রে গড়ে তোলাই তিনি সমাজ-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। কেন গ্রাম এবং সমবায়-পন্থা কেন তাঁর নিকট এত প্রাধান্য পেয়েছিল, বহু স্থলেই তার আভাস আছে; সে কথা জানা যায় তাঁর স্থানীয় অনুষ্ঠানেরই একটি ভাষণ থেকেও। ১৩২১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত বর্ধমান বিভাগীয় সমবায়-সম্মেলনের প্রতি আশীর্বাণীতে তিনি বলেন: "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

"সেই আসন অনেক কাল প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা বহু কাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই। শ্রীহীন অনাদৃত দেশে যমরাজের শাসন দিনে দিনে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লীভূমির রিক্ত স্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহু দিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

ভাষণের কবি-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি বাঁধগড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নন্দলাল চন্দের নিকট প্রাপ্ত। নন্দ বাবু বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তৎকালীন সেক্রেটারী ছিলেন।

একটি দুঃখকর স্মৃতি আছে কবির খাতায় জমা, কিন্তু তার ঘটনা-স্থল ঘটনাচক্রে বীরভূম হলেও সে ঘটনার মন্তব্য বীরভূমের প্রতি প্রযোজ্য হয়নি, তার লক্ষ্যস্থল তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট। লিখছেন: "কিছু কাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলা-স্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিশের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবল মাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার

নাই; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে।"—(কালান্তর, ছোটো ও বড়ো, ১৩২৪)

*   *   *   *

রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে ধর্ম, মানুষ, ভাষা, নদী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, পাখী, ফুল-ফল, প্রান্তর, পল্লী, ঋতুবৈচিত্র্য ইত্যাদি এবং রবীন্দ্র-জীবন থেকে উৎসব, শিক্ষা, সংগীত, খেলাধূলা, সভা-সমিতি এবং নানান সামাজিক যোগের বিবরণ-সূত্রে বীরভূমের পরিবেশটির সঙ্গে সম্বন্ধটি দেখিয়ে প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা করা গেল। সূত্রগুলির সবই প্রায় কবির স্বহস্তে ইতস্তত ছড়ানো। সে সবই রয়েছে আমাদের হাতের কাছে। যেহেতু দেখা জিনিস, তা ব'লে যদি গুছিয়ে-সাজানো বিশেষ এই আলেখ্যটির মধ্যে একত্রে পাবার পরও সেই সূত্রগুলিকে বিশেষ মূল্যে দেখার আয়াসে বিমুখ থাকি, তবে কবির কথাটাই সে ক্ষেত্রে আবার স্মরণীয় হয়ে ওঠে। আমাদের এই কাছের জিনিস দেখে-না-দেখার পরিণামটির প্রতি সচেতন হবার মধ্যেই আছে কবির "একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশিরবিন্দু" ("স্ফুলিঙ্গ কাব্য" দ্রষ্টব্য) না দেখার নিবেদনটির প্রধান সার্থকতা।

শিশিরের কথা আগেই জেনে এসেছি, ঘরের পাশের বীরভূমের ধানের খবরটাও যে কবি রাখতেন, সে কথা শেষ পর্যন্ত তাঁর গোপন থাকেনি। 'বৌমা' প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিপত্র গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩০ সংখ্যক পত্রে কবি তাঁর আশেপাশের নানা খবরের সঙ্গে ধানের খবর দিয়ে লিখেছেন: "প্রথমে খুব বৃষ্টি হওয়াতে ফসলের আশা হচ্চে। মোটের উপর বাংলাদেশে এবার ফসলের অবস্থা ভালোই।" কিন্তু তবু মনে রয়ে গেল শেষাবধি সেই না-দেখা "একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু"—সেই দুর্লভের বেদনাই কবির সমস্ত বেদনার পরম বস্তু।

রাজকন্যা ছিল ঘুমিয়ে, রাজপুত্র এসে তাকে জাগিয়ে দিলে। এই নিয়েই তো রূপকথা। কেউ কাউকে জানত না, সেই অপরিচয়ই আকর্ষণকে তুলেছিল নিবিড় ক'রে। আকর্ষণই আবার পরস্পরকে রাখল চিরবিরহী ক'রে। বীরভূমে রবীন্দ্রনাথের এই হল মর্মকথা।

এক দিকে সরব সজন শান্তিনিকেতনের অসীম জ্ঞানগরিমা, তার শিল্পসৃষ্টির ঐশ্বর্যসম্ভার, বিপুল লোকসমাগম, বিশ্বযোগের বিচিত্র আয়োজন,—আর, তারি পাশে পড়ে আছে নীরব নিরালা বীরভূম। এর মধ্যে কী বস্তুই যে কবি পেয়েছিলেন, যার রূপের আভা, রসের ঝলক, সৃষ্টির পর্বে-পর্বে উছলে উঠে বিশ্বলোককে করে চিরব্যাকুল। সে কী রহস্য, কী স্বপ্ন, কী গুপ্তধন! আজো তো রয়েছে সেই পথ-ঘাট, কিন্তু কবির রচনারাজ্যে কী জাদু নিয়েই সে দেখা দেয়! দিনে দিনে লোকের কারখানা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই পরিবেশ। প্রকৃতির রহস্য যাচ্ছে আড়ালে প'ড়ে। উচ্চ আভিজাত্যের কাছে মুখঢাকা সেই প্রকৃতি দিন-দিন যাচ্ছে বিস্মৃত হয়ে। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে এর মানুষকেও গ্রহণ করেছিলেন অপার কৌতূহলে, পরম বেদনায়।

প্রতিবেশী পল্লীবাসীদের প্রতি কবির অন্তরের যোগ কিরূপ গভীর ছিল, তার পরিচয় বহন করে শান্তিনিকেতনের সীমাঘেঁষা দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভুবনডাঙার বাঁধ কাটানোর আবেদনটি। স্বহস্তে তিনি সেটি গ্রামবাসীদের লিখে দিয়েছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ গ্রামের অধিবাসী এবং অধিকাংশই তাদের গরিব ও চাষী-মজুর গৃহস্থশ্রেণীর। বাঁধটিই তাদের স্নান-পান ও চাষাবাদের একমাত্র ভরসা-স্থল। এটি একরূপ মজে যায়। বড়ো ক'রে কাটাবার দরকার হয়। তখন আশ্রম থেকে সাহায্য করা ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে কবি নিজে ঐ বাঁধ-সংস্কার-সমিতির সদস্যরূপে কতগুলি অংশও ক্রয় করেন। কবির সহযোগিতায় বাঁধটি প্রথম বার সেই সংস্কৃত হয়। বাঁধটি প্রথম খনিত হয় রায়পুরের জমিদার ভুবনসিংহের বদান্যতা থেকে। সংস্কারের কালে তাঁর নামেই রবীন্দ্রনাথ এর নাম দেন "ভুবন-সাগর"। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক ও ভুবনডাঙা-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই বাঁধ-সংস্কার সমিতির সভাপতি। তিনি কবির আবেদনপত্রটি নিয়ে কিছু দান সংগ্রহ করেন। কবির স্বহস্তলিখিত অপ্রকাশিত পত্রখানি এই: (অপ্রকাশিত)

ওঁ

যে সময়ে দাতার অভাব ছিল না ব'লে বাংলাদেশের গ্রামে জলের অভাব ছিল না সেই সময়ে ভুবনডাঙার জলাশয়ের সৃষ্টি। এরই জলসঞ্চয়ের উপর চারি দিকের পাঁচখানি গ্রামের তৃষ্ণা নিবারণ ও ফসল-ক্ষেতে জলসেচন নির্ভর করে। ক্রমশই এর জল এসেছে শুকিয়ে, জলাশয়ের পরিধি এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে, অসহায় গ্রামের লোকের দুঃখের অন্ত নেই। পঙ্কোদ্ধার ক'রে এই জলাশয়কে যথাসম্ভব ব্যবহারযোগ্য করবার চেষ্টায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঋণযোগে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের পক্ষে এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে সাহায্য করার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান করি। এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে প্রত্যহ তিন শত লোক এই কর্ম উপলক্ষ্যে অন্ন উপার্জন করতে পারচে, এমন অবস্থায় অতি সামান্য দানও মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৪৩ শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবেদন-পত্রখানির কবিহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি ভুবনডাঙানিবাসী বাঁধসমিতির উৎসাহী কর্মী জনাব রোস্তম সেখের নিকট সযত্নে রক্ষিত ছিল, তাঁর কাছ থেকেই এখানে সংগৃহীত হল।

ঘটনার স্মারকরূপে একটি স্তম্ভ ও বেদি স্থাপন ক'রে বাঁধ-প্রতিষ্ঠার দিন বেদিতে কবিকে দিয়ে একটি কৃষ্ণচূড়া ফুলের চারা রোপিত হয়। সেবার শান্তিনিকেতনের বৃক্ষরোপণ উৎসব এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে ভুবনডাঙা বাঁধের পাড়েই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাঁধ-প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কবি সেদিন যে ভাষণ দান করেন, ১৩৪৩ সনের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তা সংকলিত আছে। বাঁধটি এখন নির্জলা দেশ বীরভূমে জলের সূত্র হয়ে কবির শান্তিনিকেতন এবং বীরভূমের গ্রাম ভুবনডাঙার সংযোগ-সাধক। সেটি হালে আরেক বার আরো বড়ো ক'রে কাটানো হয়েছে। চার ভাগে এখন সেটি বিভক্ত; তার থেকেই শান্তিনিকেতনেরও জল সরবাহের পরিকল্পনা চলছে। তার দক্ষিণ তীরে শ্যামল পত্র ও

রক্তপরাগের কোমল পুষ্পস্তবকে শোভিত হয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটি আজো আছে কবির স্মৃতিবাহী।

বীরভূমে প্রতি দশ বছর অন্তরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জলাভাবই তার মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ বনোৎসবের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি তাঁকে অন্নহারাদের অন্নদানের জন্য জলাশয় খনন ও তা সংস্কারের কাজেও উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর বাঁধ-প্রতিষ্ঠার অভিভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে তিনি বলছেন: "আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা ব'লে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে-জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র পঙ্কবিলীন, যে করে আরোগ্য বিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত মলিন রুগ্ন উপবাসী।···জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্যলাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অম্লান অনাময় ক'রে রাখতে পারে না যে বর্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত।···যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সব চেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়।···অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহু কাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।"

এই বাঁধ-সংস্কারের পরই দুর্ভিক্ষ-কমিশন বাংলা-সরকারকে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পুষ্করিণীসমূহের সত্বর সংস্কারের জন্য আইন-প্রণয়নের অনুরোধ জানান। বীরভূমের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কবি-অনুরাগী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার 'ভুবনসাগর', বাঁধগড়ার 'মোহনপুকুর' ও ইসলামপুর প্রভৃতি সমবায় সেচ-সমিতির কার্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে আসেন। তিনি এ কাজে শ্রীনিকেতনের সহায়তা লাভ করতে থাকেন। বঙ্গীয় সরকার ইতিমধ্যে সেচ-আইন কার্যকরী করে তোলেন। সেই থেকে, অবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় প্রায় সহস্রাধিক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এইরূপ বাঁধ ও পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য আজ জাতীয় সরকার বহু পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ব্রতী। এই রাজ্যে বহু লক্ষ একর জমির ফসল জলাভাবে যা নষ্ট হচ্ছিল, সে দুর্দৈব থেকে আজ তাই দেশ রক্ষা পেয়েছে। বনোৎসব, স্বাস্থ্যসমবায়, জাতীয় কুটীর-শিল্প ও সেচ-পরিকল্পনা ইত্যাদির অতীত উদ্যোগের কথা মনে রাখলে অন্নে প্রাণে দেশকে সঞ্জীবিত রাখতে কবি যে এক দিন কী সাধনা করেছিলেন তার একটা ধারণা করতে পারব।

এ সব তো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু বহু পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের পল্লী অঞ্চলে যাতায়াত করতেন এবং পল্লীবাসী সাধারণ চাষাভূষা জীবনের খুঁটিনাটি খোঁজখবরও সাধ্যমতো রাখতেন। সে কথা আমরা একরূপ ভুলে গেছি। 'সমাজ' গ্রন্থের মধ্যে দেশীয় সমাজের নানা আলোচনা প্রসঙ্গে সে ঘটনার উল্লেখ ক'রে কবি লিখছেন: "আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষিজীবি গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন।" সে কহিল, "বাবু, একদিন ছিল যখন জমি-জমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমি-জমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল্ তো।" সে উত্তর করিল, আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়াগুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতী র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারি করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি। ছেলেরা বিলাতী জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।"

শুধু এই একটি নয়, আরো একটি ঘটনার উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর "স্বরাজসাধন" প্রবন্ধে (সবুজপত্র ১৩৩২ আশ্বিন):—"বাংলা দেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাঁদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসর-কালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাইনি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।" "এক জেলা এক ফসলের দেশ" হচ্ছে তার প্রতিবেশ এই বীরভূম। স্থানের নামোল্লেখ না ক'রে এমনি আর-এক স্থানে কবি গ্রামাঞ্চলের সেবা-কাজের সূত্রে ঘনিষ্ঠতার আরেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তাঁর "শিক্ষার মিলন" নামক প্রবন্ধে। এও যে বীরভূমেরই গ্রাম, লেখার মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে; না হয়, এমন 'কুয়োর অভাবে'র দেশ আর হবে কোথায়! লিখেছেন: "আমি এক দিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন।" তারা বললে, "কপাল"! আমি বললেম, "কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন?" তারা তখনই বললে, "আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে ক'রে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই, এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।"—(শিক্ষার মিলন, ১৩২৮)

পল্লী অঞ্চল এবং সাধারণ লোক-সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের সংযোগ-ইতিহাসে বীরভূম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। কারণ, জীবনের প্রারম্ভসীমায় তিনি মাত্র কিছু কাল বাস করেছিলেন শিলাইদহের জমিদারিতে। তার পরেই তাঁর সাধনার ক্রমপরিণতিসূত্র তাঁকে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে বিশ্বলোকে। সেখানকার কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়েই তাঁকে কাটাতে

হল আজীবন একরূপ বীরভূমেই। কর্মজড়িত হয়ে জীবন-মধ্যাহ্ন থেকে বহু দিনই কবি পল্লী এবং তার লোকসমাজের ঘনিষ্ঠতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তার পরে বেশি ক'রে জীবনের শেষাংশেই দেখা যাচ্ছে কবির মনে আবার ক্রমে সংসারের নিকট-সংস্পর্শের ক্ষুধা লেগে আসছে। এই রচনা-অন্তর্গত "পুনশ্চো"স্তর কাব্যের উদ্ধৃতি-বাহুল্য তার প্রমাণ। এ-ও দেখা যায়, 'পুনশ্চ' কাব্য রচনার বছর দুই আগেই লিখেছেন "ধানের শিষের শিশির-বিন্দু" কাব্য-কণিকাটি। কে বলতে পারে, এই কাব্যকণিকার ক্ষীণ ভাবসূত্রই কবির প্রয়াণ-পূর্বেকার মহাবাণী "ঐক্যতান" নামক কবিতাটির উদ্ভব-মুহূর্তে তলায়-তলায় বহমান থেকে বৃহত্তের মতো ক্ষুদ্রেরও আসঙ্গবেদনায় কবিচিত্তকে নিবিষ্ট করেছিল কি না। 'সেঁজুতি' কাব্যে উক্ত 'ঐক্যতান' কবিতাটিতে লিখছেন :

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আর বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক'।

সেই ফাঁকের মধ্যে তাঁর কাছাকাছি ঘরের কাছের ফাঁকও তিনি অনুভব করেছিলেন, "স্ফুলিঙ্গ"এর কাব্যকণিকায় তার ইঙ্গিত মাত্র পাই, বিস্তারিত কিছু জানবার সুযোগ তিনি দেননি ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক বাস্তবের কতটুকু তাঁর স্বর-সাধানায় বাঁশির সুরে ফুটেছে, এ কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন এক দিন লোকের মনে জাগবেই, আর তার সমাধানও নিশ্চয়ই আরো গভীর ও বিপুল সন্ধানের অপেক্ষা রাখবে।

শেষ

অতীশ দীপঙ্কর

সুনীতিকুমার পাঠক

অতীশ দীপঙ্করের নামটা আজ কারুর বোধ হয় অজানা নয়। কবির এই ছত্রগুলি পরিচিত :

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

পরবর্তী টীকাকারেরা কবির কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর এক জন লোকেরই নাম ছিল।

—(কুহু ও কেকার টীকা-অংশ দ্রষ্টব্য)

এই নামটুকু জানলেই দীপঙ্করের পরিচয় মিলে না। আজ বাঙালীর সামনে অতীত গৌরব বড় করে ধরার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে কতো বড় দুঃসাহসী জ্ঞানের তাপস ছিলেন তা ভাবলে আজো অবাক্ হতে হয়। তিনি জন্মেছিলেন রাজার ঘরে। বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন কল্যাণশ্রী। পুরাতন বিবরণে জানা যায়, তার রাণী ছিলেন প্রভাবতী দেবী। দীপঙ্কর এসেছিলেন এই রাজা-রাণীর ঘর আলো করে চাঁদের মতো, শৈশবের নাম ছিল তাই চন্দ্রগর্ভ।

বাল্যকালে দীপঙ্করের শিক্ষাগুরু ছিলেন জেতারি। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের ইতিহাস, ও তিব্বতের পুরাতন গ্রন্থ পাগ্ সাম্ জোন্ জাঙ্ থেকে জেতারির যে অল্প বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা পণ্ডিত গর্ভপাদ বরেন্দ্রভূমির রাজা সনাতনের রাজসভায় ছিলেন। পরে নানা রকম জ্ঞাতিকলহে জেতারি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তার পর বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে জ্ঞান লাভের পর কয়েকটি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন,—হেতুতত্ত্বোপদেশ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত) ধর্মধর্মিবিনিশ্চয়, বালাবতার তর্ক।

জেতারির নিকট থেকে বিদ্যালাভের পর কিশোর দীপঙ্কর কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলপাদ যোগাচার্য স্থবিরের কাছে বিদ্যা গ্রহণ করেন। পণ্ডিতদের মতে কৃষ্ণাগিরি বিহার বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের কন্হেরি নামক স্থানে না কি অবস্থিত ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে রাহুলপাদের কাছে নানা ধরণের অধ্যাত্ম যোগ শিক্ষার পর তিনি ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন। ঐ সময় ওদন্তপুরীর আচার্য্য ছিলেন মহাসাংঘিক শীলরক্ষিত। তিনি যখন শুনলেন যে রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ রাহুলপাদের নিকট যোগশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করে গুহ্যজ্ঞানবজ্র উপাধি নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন, তখন তিনি আরো যত্ন করে হীনযান ও মহাযান উভয় শাস্ত্রই শিক্ষা দিলেন।

ঐতিহাসিক বুষ্টোনের (Buston) বিবরণ থেকে জানা যায়, ওদন্তপুরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাল-সম্রাট্ দেবপাল। ঐতিহাসিক তারনাথ তা স্বীকার করেন না। যাই হোক বাংলা পালরাজাদের সময়েই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়েছিল। প্রায় বার বছর ধরে পড়াশুনার পর বিক্রমপুরের রাজকুমার উপাধি লাভ করলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এই সময়ে দীপঙ্করের জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল তাঁর রাজ্যত্যাগ শুধু নয় সকল রকম ভোগলালসা বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করা। রাজার কুমার হলেন পথের ভিক্ষুক—সন্ন্যাসী। কী কঠোর জ্ঞানের সাধনায় তরুণ তাপস জীবন উৎসর্গ করলেন!

বাঙলা দেশের ছেলে দীপঙ্কর ছুটে চললেন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রাঘাত মাথায় নিয়ে সাগর পেরিয়ে সুবর্ণ দ্বীপে। তখনকার দিনে ব্রহ্মদেশ থ্যাটন, যবদ্বীপ ও অন্যান্য পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে সুবর্ণ দ্বীপ বলা হোত। ঐ সুবর্ণ দ্বীপে ছিলেন সে সময় মস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রকীর্ত্তি। প্রায় বার বছর ধরে নানা শাস্ত্র তাঁর কাছে পড়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তাম্রদ্বীপ বা সিংহলে অবতরণ করেন। সেখানে কিছু দিন জ্ঞানচর্চার পরে ফিরে এলেন বাণীর বরপুত্র দীপঙ্কর।

বাঙলা দেশের রাজা তাঁকে সম্মান জানালেন। মহীপাল তখন বাংলার সিংহাসনে। তিনি তাঁকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করলেন। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়টি মগধের কাছে গঙ্গার ধারে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক তারনাথের মতে দেবপাল ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়ে দীপঙ্কর বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন রত্নাকর।

এর কিছু কাল পরেই দীপঙ্করের তিব্বতের পথে ঐতিহাসিক অভিযান। এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সংক্ষেপে সে সময়কার তিব্বতের কথা বলা দরকার। শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হলেও তিব্বতের উপর দিয়ে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ধর্মচর্চায় নানা বাধা পড়েছিল। নবম শতাব্দী যখন র‍্যালপাচান (Ralpachan) বা (Augustus of Tibet) তিব্বতের অগাষ্টাসের সময়ে কয়েক জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন এবং কিছু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

কিন্তু দশম শতক তিব্বতের ধর্মজগতে এক অন্ধকারময় যুগ। পরে একাদশ শতকের গোড়াতেই এক ধর্মপ্রবণ লোক দেশের ধর্মসংস্কারে মন দেন। সে সময়ে তিব্বতের লামা যিনি শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি হলেন যে-শে-হোদ্ (Ye-ses-hod)। তিনি প্রথমে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে দূত পাঠিয়ে দীপঙ্করের সংবাদ নেন। পরে (Tsang) সাং দেশের অন্তর্গত (Tag-tshal) টাগ-শাল দেশের অধিবাসী র‍্যা-সোন্-গ্রু-সেংগীকে (Rgya-tson-gru senge) দীপঙ্করকে আমন্ত্রণের জন্য ভারতে প্রেরণ করেন। সেংগী প্রচুর রাজকীয় উপঢৌকন নিয়ে যখন দীপঙ্করের কাছে এলেন তখন দীপঙ্কর জানালেন যে, তিনি তখন তিব্বতে যাবার কোন প্রয়োজন দেখেননি, কেন না তাঁর অর্থের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই উত্তরে জানালেন :

Then it seems to me that my going to Tibet would be due to two causes : first, the desire of amassing gold, and second, the wish of gaining sainthood by the loving others ; but I must say that I have no necessity for gold nor any anxiety for the second at present.

এই ছোট উত্তরটির ভিতর দিয়ে দীপঙ্করের দৃঢ় চরিত্র ও প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে তিব্বতের রাজা বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। দীপঙ্করের জন্যে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু তিব্বতের রাজা ঐ সময়ে নেপাল-সীমান্তের গারলোগ দেশের রাজার সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আর সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে ঐ রাজার হাতে বন্দী হন। রাজা সেই কারাগারে থেকেও দীপঙ্করের কথা ভুলতে পারলেন না। তিনি নিজে বন্দী হলেও তিব্বতের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী চান চাব (Chan Chub)এর হাত দিয়ে দীপঙ্করকে তাঁর জীবনের শেষ আবেদন জানান।

(Tshul-Khrim-gyalwa) শুল-খ্রীম-গ্যাল্‌বা নামে তিব্বতের দূত বয়ে নিয়ে এলেন সেই লিপি। বিক্রমশিলায় এসে তিনি সেংগীর সংগে মিলিত হন। দু'জনে আবার দীপঙ্করকে আমন্ত্রণ জানান। শেষে দীপঙ্কর বন্দী রাজার পরম আগ্রহ দেখে যাবার জন্যে স্বীকার না করে থাকতে পারলেন না। তিব্বতের পথে চললেন। তাঁর সংগে চললেন বিনয়ধর পণ্ডিত, গ্যাসোন, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ, আর পশ্চিম-ভারতের জনৈক মহারাজ ভূমিসংঘ।

দীপঙ্কর তিব্বতে যাবার পথে নেপালে প্রবেশ করেন। এবং নেপালের অনেকেই তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিব্বতের পথে যাত্রা করেন। পুরাতন তিব্বতী বিবরণে এই অভিযানের কথাকে যে কতো গৌরবময় করে লেখা হয়েছে তা সেই সকল বিবরণ পড়লে জানা যায়। তিব্বতে গিয়ে সেখানকার ধর্মের বিকৃত অবস্থা দেখে তিনি সত্বর সংস্কারের কাজে লেগে পড়লেন। তিনি এক নূতন শাখা গড়লেন। তাদের মধ্যে ক-দম্-পা (pKah-gDams-pa) দলই অগ্রণী হয়ে উঠেছিল। শুধু দল গড়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তিব্বতের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র বিষয়ে কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা করলেন আর পুরাতন গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করলেন।

তিব্বতের বড় বড় পণ্ডিতেরা বাণীর এই তরুণ সাধকের বিদ্যাবত্তা ও অসামান্য প্রতিভার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। দলে-দলে অতীশের অনুগামী হয়ে ধর্মসংস্কারের কাজে লেগে গেল। সার্থক হোল বাণীর একনিষ্ঠ সাধকের সাধনা, প্রচারিত হোল রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী রাজকুমারের কথা, আর দিকে-দিকে ঘোষিত হোল বাঙালীর জয়গান।

দন্ত-পরিচয়

দাঁত না থাকলে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না—কথাটির প্রচলন অনেক দিন থেকে। কিন্তু দাঁত বা দন্ত কত রকমের হয় বলতে পারেন? আপনার চোখের সামনে এইবার আয়না ধরুন আর দাঁতগুলোকে দেখুন একবার। অবশ্য একবার দেখলেই আপনি ধরতে পারবেন না কোন্ দাঁতের কি নাম। দাঁত তিন রকমের। প্রথম, মুখপুরোবর্ত্তী খাদ্য-বস্তুর ছেদনার্থে প্রয়োজনীয় একাগ্রবিশিষ্ট দাঁতের নাম 'ছেদন-দন্ত'। দ্বিতীয়, ছেদন-দন্তের পার্শ্ববর্ত্তী অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দন্তের নাম 'গজদন্ত' অথবা 'শ্বদন্ত'। তৃতীয়, উভয় পার্শ্বস্থিত স্থূল, অসম-পৃষ্ঠ, চর্বণ-কর্ম-নিষ্পাদক দন্তের নাম 'চর্বণ-দন্ত' অথবা 'মাড়িয়দন্ত'।

মাইকেল আরজিবাষেভ

চব্বিশ

আশ্বস্ত হয়ে উঠে সীনা তাকাতেই দেখল নদীর জলে চাঁদের আলো আগের মতোই ঝলমল করছে ; ওর মুখের ওপর নত হয়ে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে স্যানিন্। ওর একটা হাত সীনার দেহ বেষ্টন করে রয়েছে।

স্যানিন্-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত না করেই ও পড়ে রইল ; ধীরে-ধীরে ওর চোখ ভরে এলো অশ্রু।—যা আর ফিরিয়ে পাবে না কোনো দিন তার জন্যই ওর এই কান্না। নিজের প্রতি আতঙ্ক ও ভয়, এবং স্যানিন্-এর জন্য মমতা,—সব মিলে এসে ওর চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দিল। স্যানিন্ ওকে তুলে ধরে বসিয়ে দিল। স্যানিন্ ওর ঘাড়ে চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিচ্ছিল, সীনা যেন স্বপ্নের ও-পার থেকে স্যানিন্-এর স্পর্শ পাচ্ছিল।

"এ কি করলাম ?"—প্রশ্ন করল নিজেকে। স্যানিন্-এর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "কি করব আমি এখন ?"

"দেখা যাক্।"—বলল স্যানিন্।

স্যানিন্-এর কাছে থেকে ও সরে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্যানিন্-এর দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশ থেকে ও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

এর পরে এই শক্তিমান্ পুরুষ—যে এক মুহূর্তের মধ্যেই ওর নিবিড় আত্মীয় হয়ে উঠেছে, সে ওকে নিয়ে কী করবে!—রোমাঞ্চিত পুলকে সীনা নিজেকে প্রশ্ন করল।

তার পর, স্যানিন্ যখন গিয়ে হাল ধরল, সীনা নিজের থেকেই গিয়ে ওর কোল ঘেঁষে ওর গায়ে হেলান দিয়ে বসল ; বুকের দু'পাশে স্যানিন্-এর পেশীবহুল হাত ওঠা-নামা করছিল দাঁড় বাইবার তালে-তালে।

পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে যখন শহরের কাছে মাঠের ও-পাশে ওদের নৌকা এসে ভিড়ল।

"পৌঁছে দেব আপনাকে ?"

"না, আমি একাই যাবো।"

স্যানিন্ ওকে আড়কোলা করে তুলে তীরে নিয়ে এলো। মেয়েটিকে বেশ লাগছে ওর, এ জন্য সীনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মনে-মনে। "কী সুন্দর তুমি!"—স্যানিন্ ওকে আবার জড়িয়ে ধরল ; দু'জোড়া অধরোষ্ঠ এসে মিশল এক দীর্ঘ চুম্বনে।

অনেকক্ষণ অবধি ও তাকিয়ে রইল সীনার গতির দিকে।

সীনার চলে যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল স্যানিন্। একটা বাঁকে মোড় ফিরবার পর আর যখন সীনাকে দেখা গেল না, স্যানিন্ গিয়ে উঠল নৌকায়। মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ও দাঁড়ালো। আনন্দের এক প্রাণ-খোলা ধ্বনি বেরিয়ে এলো ওর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে।

সকালের আলোয় তা'র প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল নদীর জলে, উচ্চ তীরভূমিতে, নদীর দু'পাশের ছায়ানিবিড় বনে।

পঁচিশ

ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন সীনার চোখের কোণায়। ডুবোভা শংকিত হয়ে ওকে কারণ জিজ্ঞাসা করল।

কুমারী মেয়ে যখন এক রাত্রিতেই নারী হয়ে ওঠে, প্রথম মিথ্যা-ভাষণের দ্বারা এই রূপান্তর হয় ঘোষিত।

সীনা বল্‌ল, "গত রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারিনি ওখানে।"

সকাল বেলার আহার শেষ করে সীনা চেয়ারে বসে ভাবছিল নিজের কথা। নিজের স্খলিত চরিত্রের কথা ভেবে ওর আর অনুতাপের পরিসীমা ছিল না; যে বড়ো-মুখ নিয়ে ও এত দিন সবাইএর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ত সেই বড়ো-মুখ আর ওর রইল না!

উচ্ছাসের প্রথম পর্ব্ব কেটে যাবার পর কিছুটা সুস্থির হোল ও। যা হবার তো হয়েই গেছে! আর বেঁচে থেকে লাভ কি!

ও লক্ষ্য করেনি কখন স্তানিন্ ওদের ঘরে এসে ঢুকেছে।

"সুপ্রভাত!"—হাত বাড়িয়ে দিল স্তানিন্।

ও প্রত্যভিবাদন করল।

স্তানিন্ বল্‌ল, "বাইরে বাগানে চলুন, একটু কথা বল্‌বো।"

যন্ত্রচালিতবৎ সীনা বেরিয়ে এলো।

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে ওরা দু'জন পাশাপাশি বস্‌ল। নিজের হাতের মুঠোয় চাঁপার কলির মতো সীনার হাতের আঙুল-গুলো ধরে, বলতে সুরু করল স্তানিন্:

"আমি ঠিক করে উঠতে পারছি না আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনি পছন্দ করছেন কি না; হয়ত মনে করছেন কালকে রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু না এসে তো পারলাম না। আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি, যেন আপনি আমায় নিতান্ত ঘৃণা এবং অবহেলা না করেন। বলুন···আমি আর কি করতে পারতাম? কি ক'রে নিজেকে সংবরণ করতাম? একটা মুহূর্ত্তে মনে হোল আমাদের দু'জনের ভিতরের বাধা সব সরে গেছে; আর সেই মুহূর্ত্তটি যদি ফস্‌কে যেতে দিতাম, আর কোনো দিনই তা ফিরে পেতাম না। কী সুন্দর আপনি, আপনার তারুণ্য কী কমনীয়···"

বোবা হয়ে গেল সীনা। কান দুটো হয়ে উঠল লজ্জারুণ; দীর্ঘায়ত আঁখিপল্লব দ্রুত আন্দোলিত হয়ে উঠল।

"আজকে আপনাকে বড্ড মনমরা দেখাচ্ছে, অথচ কালকে কী সুন্দরই না হয়ে উঠেছিল সব!" স্তানিন্ বলল, "মানুষ নিজের সুখের দাম স্থির করেছে বলেই না দুঃখও রয়ে গিয়েছে! যদি আমাদের বেঁচে থাকবার ধরণ-ধারণ অন্য রকম হোত, তাহলে কালকের রাত আমাদের জীবনে চিরকালের জন্য অপূর্ব্ব এবং অমূল্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে পারত।"

"হাঁ, যদি···" সীনা বলল যন্ত্রবৎ। খুসীর আভায় ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল,—কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। পর-মুহূর্ত্তেই, ওর চোখের সামনে যেন ও দেখতে পেল ওর সারা ভবিষ্যৎ—ক্ষোভ ও লজ্জায় কলঙ্কিত। এমন একটা ভয়াবহ ছবি ওর চোখে ভেসে উঠতেই সমস্ত শরীর ওর ঘৃণায় রী-রী করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে, তীব্র সুরে ও বলে উঠল, "যান চলে! রেহাই দিন আমায়!"

স্তানিন্ অনুকম্পা বোধ করল ওর জন্য। একবার ভাবল ওকে বলি: চলে এসো আমার কাছে, আমিই তোমাকে আড়াল করে রাখব দুর্ণাম আর অপবাদ থেকে। কিন্তু এ পন্থাটা বড়ো হীন। তাই নিজের মনে বলল স্তানিন্, "কী করা যায়! জীবনের প্রবাহ যে পথে চল্‌বার সে পথেই চলুক।" মুখে বল্‌ল, আমি জানি আপনি ইউরাই স্বারোগিনা-এর প্রেমে পড়েছেন। বোধ হয় সেই জন্যই আপনি এতটা বিচলিত হয়েছেন?"

দু'হাত একসঙ্গে মুঠো ক'রে সীনা বল্‌ল, "আমি কারোর প্রেমে পড়িনি।"

"আমার ওপর রেগে থাকবেন না যেন," বলল স্তানিন্, "আপনার সৌন্দর্য্য একটুও ম্লান হয়নি। যে আনন্দ আপনি আমায় দিয়েছেন, যাকে ভালোবাসবেন তাকেও সেই আনন্দই দেবেন;—না, না, আরো বেশিই দেবেন। আমার অন্তরের থেকেই বলছি, 'আপনি সুখী হোন'; গত রাত্রের স্মৃতি থাকুক আমার কাছে চির-উজ্জ্বল হয়ে। গুড বাই···বিদায়···যদি কোনো দিন আমাকে প্রয়োজন হয় আপনার, ডেকে পাঠাবেন। যদি পারতাম··· আপনার জন্য আমার জীবন অবধি আমি দিতে পারতাম।"

সকরুণ হয়ে উঠল সীনার মন। নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

স্তানিন্ চলে যাবার পর এক বার নিজেকে প্রশ্ন করল সীনা, "ইউরাইকে বলব সব?" পরক্ষণেই জবাবও পেলো: না, না; এ সব আর ভাবব না। কতগুলি বিষয় আছে যা ভুলতে পারাই সব চেয়ে ভালো।

ছাব্বিশ

পরের দিন ইউরাই ঘুম ভাঙতেই শরীরটা অসুস্থ বোধ করল। গত কাল সারা রাত ধরে ওরা তর্ক করেছিল। তর্ক এবং ভদ্‌কার নেশা—এই দু'টোয় মিলে ওর শরীর ও মনকে যেন হাতুড়ী-পেটা করে দিয়েছিল।

কখন ওরা তর্ক করতে-করতে সকাল হয়ে গিয়েছিল। আইভানক কখন বেরিয়ে গিয়ে স্তানিন্‌কে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল, ওর ভালো করে মনে পড়ে না। স্তানিন্ এসে কী রকম যেন অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করছিল ইউরাই-এর কাছে।

সীনার কথা মনে পড়ল। নিজেকে বলল, "কাল যদি ওর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতাম, তাহলে খুবই অন্যায় হোত।···কিন্তু কি করব এখন ওর বিষয়ে? ওকে হাত করে, ভোগ ক'রে, পরে পরিত্যাগ করব? না, আমি তো তা করতে পারি না! আমার মন যে বড় নরম! তাহলে? বিয়ে করব ওকে?"

বিয়ে!—শব্দটাই ইউরাই-এর কাছে অতি-সাধারণ বলে মনে হোল। ওর মতো জটিল মনোভাব-সম্পন্ন লোক কখনোই বিয়ের মতো একটা স্থূল শারীরিক যোগাযোগ বরদাস্ত করতে পারে না।···কিন্তু ওকে তো আমি ভালোবাসি!···তাহলে কেন আমি ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে চলে যাব? আমার নিজের সুখ-শান্তি কেন নষ্ট করে দেব? অসম্ভব!"

ওর নিজের লেখা একখানা খাতা খুলে ও পড়ে গেল:

"এই পৃথিবীতে ভালোও নেই, মন্দও নেই।

"কেউ বলে: যা স্বাভাবিক তাই ভালো এবং মানুষের কামনা-ভাবনায় দোষের নেই কিছু।

"কিন্তু এ কথা প্রমাদপূর্ণ। কারণ, সব কিছুই তো স্বাভাবিক। অন্ধকার এবং শূন্যর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সবারই গোড়ার কথা এক।

"অন্যেরা বলে: ঈশ্বর যা দেন তাই শুধু ভালো। কিন্তু তাও তা ঠিক নয়। কারণ, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকত, তাহলে তো সব কিছুরই উৎস তিনি, এমন কি, মহাপাপও তাঁরই থেকে এসেছে।

"অপর এক দল বলে: অন্যের কল্যাণ সাধন করাই ভালো।

"কিন্তু তা কি করে হয়? এক জনের কাছে যা ভালো, অন্যের কাছে তা মন্দ।

"দাস চায় তার মুক্তি, তার প্রভু চায় ওর দাসত্ব থাক বজায়। ধনী চায় তার ধন রক্ষা করতে, আর দরিদ্র চায় ধনীর সর্ব্বনাশ। অত্যাচারিত চায় মুক্তি, জয়ী চায় তার জয়কে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে। অনাদৃত চায় ভালোবাসা; জীবিত চায় না মরতে। মানুষ চায় পশু-জগৎকে ধ্বংস করতে, পশু চায় মানুষের বিনাশ। সৃষ্টির আদি কাল থেকে অনন্ত কাল অবধি চলবে এই ব্যাপার। নিজস্ব সুখ-সুবিধা ভোগ করবার বিশেষ কোনো অধিকার কোনো মানুষেরই নেই।

"ঘৃণার চেয়ে প্রেম-দয়ার মূল্য বেশি বলে মনে করা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু তো এ কথাটাও মিথ্যা; কেন না, যদি প্রতিদান কিছু থাকত, তাহলে দয়া এবং নিঃস্বার্থপরতা সব সময়েই শ্রেয়:;—কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে জীবন থেকে সুখসম্ভোগ আদায় করার চেষ্টা করাই ভালো।"

কী আশ্চর্য্য সত্যবাণী ও নিজেই লিখেছিল! ভাবল ইউরাই। দুঃখের ভেতরও বেশ খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করল ও নিজের জন্য।

জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল বাগানের দিকে; হলদে বিবর্ণ পাতায় আকীর্ণ হয়ে আছে বাগানটা। সর্ব্বত্রই যেন মৃত্যুর—ধ্বংসের আহ্বান শুনতে পেল ইউরাই। কিন্তু কী নিঃশব্দ এই মৃত্যুর সমারোহ! ইউরাই রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে-ফুলে উঠল।

"ঋতুচক্রে আবর্ত্তন করছে পৃথিবী; একঘেয়ে, বিরক্তিকর এই জন্ম-মৃত্যুর পৌনঃপুনিক আসা-যাওয়া! কী করব আমি বছরের পর বছর?—ঠিক এখন যা করছি, তখনও তাই। তার পর আসবে এক দিন জরা, আসবে মৃত্যু।"

জীবনে নেই কোনো বিশেষ আকর্ষণ: বীরের জীবন তো এ-ই। একঘেয়ে জীবনের প্রান্তে নিরানন্দ মৃত্যু। "আগুনের মতো জ্বলে ওঠা, তার পর নিঃশেষ হয়ে যাওয়া; ভয়হীন বেদনাহীন। সত্যিকার জীবন তো তা-ই!"

"আমার ভাগ্যেও তো তা-ই অপেক্ষা করছে!"—উচ্চারিত হোল ওর মুখ থেকে।

নকল বীর্য্যের মুখোস খসে পড়তে বিলম্ব হোল না ওর। বীর্য্যের জায়গায় দেখা দিল অসহায় একটা অবসন্ন মনোভাব:

"কেন আমি জীবন উৎসর্গ করব চাষী-মজদুরের উন্নতির জন্য,—যাতে আগামী হাজার বছর পরে যেন তাদের না থাকে কোনো রুটির দৈন্য, না থাকে যৌন-পরিতৃপ্তির কোনো অন্তরায়? গোল্লায় যাক যতো শ্রমিক আর অ-শ্রমিক!"

"আঃ, কেউ যদি আমাকে গুলী করে আমাকে এই দুঃখের-কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করতো!…ননসেন্স! কেন অন্যে গুলী মারবে? আমি নিজেই তো পারি। আমি কি এতই কাপুরুষ যে, আমি নিজেই আমার এই দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটাতে পারি না! দু'দিন আগে বা পরে—মরতে তো হবেই! তবে…"

ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে, নাড়তে-চাড়তে ও বলল, "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখাই যাক না। সত্যি তো না…"

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ইউরাই। রাশি-রাশি ঝরা পাতা ছড়িয়ে আছে সেখানে। করুণ একটা সুর গুন্-গুন্ করতে করতে ও লাথি মেরে মেরে পাতাগুলি এদিকে-সেদিকে সরিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

লালিয়া আস্‌ছিল বাগান থেকে। ফূর্ত্তিভরে বলল ইউরাইকে, "কি গাইছ? মনে হচ্ছে যেন তোমার নিজের যৌবন-বিসর্জ্জনের গান।"

ছাই-ভস্ম বোকো না!" উষ্মা প্রকাশ করে ইউরাই বলল।

একটা অনিবার্য্য ঘটনা যেন এগিয়ে আস্‌ছে, যাকে রোধ করা ওর ক্ষমতাতীত। আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুর মতো ও ইতস্ততঃ ঘুরে করতে লাগল নির্জ্জন একটি জায়গার সন্ধান। নদীর দিকে একবার গেল, আবার ফিরে এলো বাগানের ভেতর।

চার দিকের হলদে পাতার প্রাচুর্য্যের মাঝে সবুজ পাতায় ভরা একটি ওক্ গাছের তলায় এসে ও দাঁড়ালো।

"এই তো শেষ!…"

"না, না, কী ননসেন্স! আমার সারা জীবন পড়ে রয়েছে আমার সামনে। মোটে চব্বিশ বছর আমার বয়স। এখনই কি?… তা হলে?…"

অকস্মাৎ সীনার মুখ ভেসে উঠল ওর মনে! বনের ভেতরে সেই রাতের বিসদৃশ ঘটনার পর আর ওর কাছে মুখ দেখানো চলে না। কিন্তু, বেঁচে থাক্‌লে দেখা-সাক্ষাৎ তো হবেই ওদের!…এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো।

ওর জীবন থেকে সীনা চিরকালের জন্যই সরে গেছে! ভবিষ্যৎ এখন একটা তুহিন, নিরাবলম্ব, ধূসর, প্রেমহীন, আশাহীন অজস্র দিনের মিছিল মাত্র।

"খেতে আসুন।"—সাদা পোষাক-পরিহিতা বাড়ীর ঝিটা এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছে।

"খাওয়া! সেই একঘেয়ে অভ্যাসের পুনরাবর্ত্তন!"—না, আর দেরী করা চলে না।

চোরের মতো পা টিপে-টিপে ও সরে গেল ওক্ গাছের পেছনে, যেন দাসীটির চোখে না পড়ে। আশ্চর্য্য দ্রুততায় ও নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো।

"টিপ্ হয়নি!" বাঁচবার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল ইউরাই।

চীৎকার করে ঝিটা বাড়ীর ভেতর ছুটে গেল।

মনে হোল ইউরাই-এর: ওর চার দিকে কতো লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কে যেন ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে ওর মাথায়। ভ্রুর ওপর একটা হলদে পাতা পড়েছে। অজস্র প্রশ্ন। কে যেন কাঁদছে: ইউরা, ইউরা! ওঃ! কেন এ করলে?"

"লালিয়া নিশ্চয়!" ইউরাই ভাবল। চোখ মেলে তাকালো ও। অসহ্য কষ্টে ও হাত-পা নেড়ে উচ্চারণ করল, "ডাক্তার ডাকো শীগ্‌গির!"

প্রচণ্ড ভয়ে ও বুঝলো, কিছুতেই কিছু হবে না, বাঁচা চলবে না। অজস্র হলদে পাতা এসে পড়ছে ওর চোখে, ভ্রুর ওপর,

মুখে, গালে; মাথা হয়ে উঠছে অসম্ভব ভারী। ঘাড় উঁচু করে একবার শেষ প্রয়াস করে ও ভালো করে সব দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু হলুদে পাতার আর বিরাম নেই, স্তূপীকৃত হয়ে উঠল ওর শরীরের ওপর। তার পর আর কি ঘটল ওর, তা ইউরাই কোনো কালেই জানলো না।

সাতাশ

ইউরাই ম্বারোগীশকে যারা জানত, আর যারা জানত না, যারা তাকে ভালোবাসত অথবা অশ্রদ্ধা করত, এমন কি যারা ওর কথা ভাবেওনি কোনো দিন,—সবাই ওর মৃত্যুতে দুঃখিত হোল।

ওর আত্মহত্যার কারণ কেউ-ই বের করতে পারল না। আত্মহত্যা জিনিষটা বেশ খানিকটা মনোরম; চোখের জল, ফুল এবং হৃদয়দ্রাবী বক্তৃতাতেই এর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হয়ে থাকে। ওর নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ-ই শবসংকারে যোগ দেয়নি; লালিয়ার মানসিক অবস্থা শোভাযাত্রায় যোগ দেবার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না, ওর বাবা হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একমাত্র রিয়াজানজেফই পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল এবং সংকার সংক্রান্ত যা-কিছু বন্দোবস্ত করবার সব ও-ই করল।

প্রচুর ফুল দিয়ে কফিনবাহী গাড়ীটা সাজানো হোল। প্রচুর ফুলে চার পাশ-ঢাকা ইউরাই-এর মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

সারা রাত ধরে সীনা কেঁদেছে আর ভেবেছে। স্যানিন-এর সঙ্গে সেই রাত্রের ব্যাপার ঘটবার পর থেকে ওর প্রতিটি কথা ত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতই মনে করতে লাগল, ততই একটা অবর্ণনীয় ক্রোধ ও ঘৃণায় ও স্যানিনকে অভিসিঞ্চিত করল। ওর নিজের পদস্খলনকে এবং এই পদস্খলনের সহায়ক এবং কারণ হিসাবে স্যানিনকেও ও ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করতে লাগল। দুঃস্বপ্নের মতো সেই রাত্রির ঘটনার স্মৃতি ওকে অহরহ পীড়িত করে তুলছিল।

স্যানিন-এর সঙ্গে দেখা হতেই ও তার দিকে অপরিসীম ঘৃণা ও বিরক্তি নিয়ে তাকালো। ভালো করে কথাও বলল না, দিল না কোনো প্রত্যুত্তর স্যানিন-এর সোৎসাহ করমর্দ্দনের।

ওর মনের ভাব বুঝতে স্যানিন্-এর দেরী হয়নি। এর পর থেকে ওরা পরস্পরের কাছে অপরিচিতই থেকে যাবে, ওদের কাছাকাছি হবার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, ইউরাই-এর মৃত্যু তা তিরোহিত করে দিয়েছে। নিজের ঠোঁট কামড়ে স্যানিন্ একটু ভাবল, তার পর গিয়ে মিশল নিজের দলে,—শবশোভাযাত্রার ভেতর।

"দেখছ পীটরকে, কি রকম চেঁচাচ্ছে!"—আইভানফ্‌কে বলল।

শোক-সঙ্গীত গাইতে-গাইতে যেখানে শবাধারবাহীরা চলছিল, পীটরও ছিল সেখানে; রয়ে রয়ে ওর সুউচ্চ গলা গানের শব্দ ছাপিয়ে দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

"কী রোগা-পট্‌কা লোক, কিন্তু গলায় জোরখানা বলিহারী যাই।"—আইভানফ মন্তব্য করল।

"আমার ধারণা"—স্যানিন বলল, "পিস্তল থেকে গুলী বেরোবার সেকেণ্ড তিনেক আগেও ইউরাই আত্মহত্যা করবে বলে স্থিরনিশ্চিত হতে পারেনি। যে রকম ভাবে বেঁচেছিল, মরলও সেই রকমই!"

"মোটের ওপর, শেষ অবধি একটা আস্তানা করে নিলো তো নিজের জন্য!" আইভানফ্‌ টিপ্পনী কাটল।

কালো মাটি ইউরাইকে গ্রহণ করলো।

মাটির ভেতর যখন কফিনটা একেবারে নেমে গেল, সীনার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো একটা হৃদয়ভেদী তীব্র আর্ত্তনাদ। ও আর পারল না নিজেকে সংযত রাখতে। যার কাছে আর কোনো দিনই নিজের যৌবন ও সৌন্দর্য্যের ডালি তুলে ধরা যাবে না, মৃত্যু চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটালো যার সঙ্গে,—তার প্রতি যে প্রেমও সঞ্চিত করেছিল নিজের অন্তরে এত দিন ধরে, এখন আর আর তা লোকের অগোচর রাখবার কোনো প্রয়াসই করল না।

ওকে ধরাধরি করে সরিয়ে নেওয়া হোল। মাটি চাপা পড়ল কফিনের ওপর। একটা ফার-গাছের চারা পুঁতে দেওয়া হোল সমাধির ওপর।

শ্যাফরফ্ প্রস্তাব করল, "বন্ধুগণ, আসুন আমরা সবাই মিলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এ ভাবে চলে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ কিছু বলুন।"

"স্যানিন্‌কে বলুন না।"—আইভানফ্ বলল।

"স্যানিন্, কোথায় স্যানিন্?" শ্যাফরফ্ ডাকল ওকে, "আসুন ভ্লাডিমির পেট্রোভিচ্, আপনি কিছু বলবেন?"

বিমর্ষ ভাবে স্যানিন্ বলল, "আপনি নিজেই কিছু বলুন। সীনার কান্নার দিকে ওর কান ছিল।

"আমি যদি পারতাম, তা হলে নিশ্চয়ই বলতাম। সত্যিই··· কী ভালো লোকই তিনি ছিলেন···তাই না? সামান্য কিছু বলুন না আপনি?" শ্যাফরফ্ আবার অনুরোধ করল।

কঠোর দৃষ্টিতে স্যানিন্ ওর দিকে তাকালো। প্রায় রাগ করেই যেন বলল, "বলবার কি আছে? পৃথিবী থেকে আরেকটি মূর্খ কমে গেল। এই তো!"

উপস্থিত সকলেই পরিষ্কার শুনল শব্দ কয়টা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সবাই। জবাবের ভাষাও জোগালো না কারো মুখে।

শুধু ডুবোভা চেঁচিয়ে বলল, "কী নোংরা!"

কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে স্যানিন প্রশ্ন করল, "কেন?"

মুঠো-করা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি যেন ডুবোভা বলতে যাচ্ছিল, অন্য কয়েকটি মেয়ে ওকে ঘিরে ধরে নিবৃত্ত করল। জনতা গেল ভেঙে। এখানে-সেখানে শোনা যাচ্ছিল প্রতিবাদের চীৎকার। শ্যাফরফ্ ছুটে আসছিল, কি ভেবে আর এগোলো না। রিয়াজানজেফ্ এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ক্রোধ আর বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

চিন্তা-নিমগ্ন স্যানিন তাকিয়ে দেখল চশমাপরা এক জন কে যেন ওকে কি বলছে। আইভানফ্ ওকে নিয়ে কবরখানার বাইরে চলে এলো। ঘটনাটা এত বিশ্রী হয়ে উঠবে তা আইভানফ্ আশংকা করেনি, তবে এই সর্বজনীন শস্তা ভাবালুতার বিরুদ্ধে স্যানিন্ কিছু বলুক এই আশা সে করেছিল। সত্যিই ও দুঃখিত হয়েছিল। মুখে বলল:

"চুলোয় যাক আহাম্মকগুলো।" পাছে স্যানিন্-এর ওপর কোনো অত্যাচার হয়, এই ভয়ে ও আগে থেকেই সাবধান করতে গিয়ে বিস্মিত হোল স্যানিন্-এর বিমর্ষ চোখের দৃষ্টি দেখে।

ওর পরিচয় জানত না এ-রকম এক দল ছেলে-মেয়ের একটা জটলায় ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্যাফরফ্ ওদের কি-সব বলছিল;

স্তানিন্‌কে দেখে স্তাফরফ্‌ এগিয়ে এলো। স্তানিন্‌ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে-ও দাঁড়িয়ে গেল।

স্তানিন্‌ বলল, "কি চাই ?"

"কিছু না, কিছু না;—"স্তাফরফ্‌ জবাব দিল, "কিন্তু আমার সতীর্থরা সবাই তাদের অসন্তোষ···"

বাধা দিয়ে স্তানিন্‌ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আপনাদের অসন্তোষ আমি থোড়াই কেয়ার করি!···আপনিই আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যা ভেবেছি তাই বলেছি; এখন আপনারা চাইছেন অসন্তোষ প্রকাশ করতে! আপনাদের ভাবপ্রবণতা একটু কম থাকলে আমি আপনাদের বোঝাতে পারতাম যে, আমি কোনো অন্যায় কথা বলিনি। স্তারোগিশ একটি নীরেট মুখ্য ছিল। মরলও মুখ্যর মতো। কিন্তু আপনাদের মগজ তো ভর্তি হয়ে আছে ধোঁয়ায় আর জঞ্জালে; আমার কথা বুঝবার মতো ঘিলু আপনাদের মাথায় নেই। সরে পড়ুন বলছি!"

ভিড় ঠেলে ও এগিয়ে গেল।

"ঠেলছেন কেন মশাই?" স্তাফরফ্‌ বলল।

কে আরেক জন বলে উঠল, "অভদ্র···" কথাটা ও শেষই করতে পারল না।

"লোককে কী ভয়ই তুমি পাইয়ে দিতে পারো!" পথে যেতে যেতে আইভানফ্‌ বলল ওকে, "আস্ত একটি বিভীষিকা তুমি।"

"স্বাধীনতা, মুক্তি, এই সব কথা বলে যদি এই উন্মাদের দল তোমাকে কখনো বিরক্ত করতে আসে, আশা করি তুমি তাদের সঙ্গে আরো কঠিন ব্যবহার করবে। রসাতলে যাক্‌ ওরা!" স্তানিন বলল।

"চীয়ার আপ, বন্ধু!" আইভানফ্‌ ঠাট্টার আমেজ নিয়ে বলল, "কি এখন করব, জানো? কিছু বীয়ার কিনে এনে ইউগাই স্বারোগিশ-এর আত্মার কল্যাণের জন্য পান করি চলো।"

"যা ইচ্ছা করো।" স্তানিন্‌ জানালো।

"আমরা ফিরে আসতে আসতে সবাই চলে যাবে। তখন কবরের পাশে বসে পান করে একসঙ্গেই মৃতকে সম্মান এবং নিজেদের আনন্দ দেওয়া হবে।

"বেশ, তাই হবে।"

ওরা তাই করল।

আটাশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরবার পথে স্তানিন্‌ ওকে বলল, "শোনো—"

"কি?"

"আমার সঙ্গে রেল-ষ্টেশনে চলো। আমি চলে যাচ্ছি।"

আইভানফ্‌ দাঁড়িয়ে গেল।

"কেন?"

"এখানে আর ভালো লাগছে না!"

"কেউ ভয় দেখিয়েছে তোমাকে?"

"আমাকে? না, আমার ইচ্ছে হোল, তাই যাচ্ছি।"

"কিন্তু একটা কারণ থাকবে তো?"

"প্রিয় বন্ধু, কোনো বাজে প্রশ্ন কোরো না। আমি যেতে চাইছি, ব্যস, ঐ যথেষ্ট। যতক্ষণ অবধি চারপাশের লোকজনকে চেনা না যায় ততক্ষণই তাদেরকে ভালো লাগে। এই ধর, যেমন সীনা কার্সাভিনা, সেমে··· কিংবা লীডা; এরা গড্ডলিকার বাইরেই তো ছিল। কিন্তু এখন আর এদের আমি সহ্য করতে পারছি না। যতক্ষণ পেরেছি, সহ্য করেছি; কিন্তু আর নয়।"

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আইভানফ্‌, ওর মুখের দিকে। বলল, "তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় নেবে না?"

"না হে! এরাই তো সব চেয়ে বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।"

"মালপত্র নেবে তো?"

"এমন কিছু নেইও আমার। তুমি যদি আমাদের বাড়ীর বাগানটায় দাঁড়াও একটু, আমি ঘরে গিয়ে আমার থলেটা জানালা গলিয়ে তোমাকে ছুঁড়ে দেবো। তা নইলে, হেন-তেন হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সবাইকে। কী-ই বা বলব বাড়ীতে?"

"ও,—" বলল আইভানফ্‌, "চলে যাচ্ছ, ভালো লাগছে না।··· কি করবো?"

"চলো আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"তা দিয়ে দরকার কি? পরে ঠিক করে নিলেই হবে।"

"আমার হাতে তো টাকা-পয়সা নেই?"

স্তানিন্‌ হেসে বলল, "আমারও নেই।"

"না, না, তুমি বরং একাই যাও, কয়েক দিনের ভেতরেই কলেজ খুলবে, পুরোনো গর্তে গিয়ে ঢুকতে হবে।"

দু'জন ঋজু ভাবে তাকালো দু'জনের মুখের দিকে। আইভানফ্‌ মুখ নামিয়ে নিল।

স্তানিন্‌ বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে নিজের যাবার পথে শুনতে পেল, বারান্দায় লীডা ও নোভিকফ্‌ কথা বলছে:

"কিন্তু, তুমি আমার কাছে কি চাও?"—লীডার গলা।

"আমি চাই না কিছুই। কিন্তু এটা আমার ভালো লাগছে না যে তুমি আমার জন্য নিজেকে বলি দিচ্ছ এই রকম ভাবছ তুমি। কিন্তু আসলে—"

"হাঁ, তা জানি; আমি ত্যাগস্বীকার করিনি, তুমিই করেছ। হাঁ, তুমিই! আর কি চাই?"

নোভিকফ্‌ বিরক্ত হচ্ছিল। "আমার কথা তুমি বুঝছ না!" ও বলল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুতরাং ত্যাগস্বীকারের কথাই ওঠে না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, আমাদের মধ্যে যে-ই হোক্‌ এক জন ত্যাগস্বীকার করছে, তাহলে কি করে আমরা একসঙ্গে থাকব? আমার কথা বুঝবার চেষ্টা করো। মাত্র একটা সর্তেই আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি,—তা হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে কেউ-ই যেন ত্যাগস্বীকার করেছি এ-কথা না ভাবি। হয় আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব, তা হলেই হবে আমাদের মিলন স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত; আর তা যদি আমরা না পারি—"

লীডা হঠাৎ কাঁদতে সুরু করল।

"কি হোল ?" নোভিকভ বিরক্ত হোল। "আমি তোমাকে বুঝতে পারি না। আমি এমন কি বললাম যে তুমি অসন্তুষ্ট হলে ? ও-রকম কেঁদো না।..."

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লীডা।

ভ্রূ কুঁচকে স্তানিন্ নিজের ঘরে ঢুকল। ভাবল: "এত দূর গড়িয়েছে! ডুবে মরলেই বোধ হয় লীডা ভালো করত।"

থলেটা ছুঁড়ে দিয়ে ও নিজেও জানালা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাগানে।

ষ্টেশনের হোটেলে ওরা পরস্পরের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করল।

"মধুময় হোক তোমার যাত্রা।" আইভানফ, গ্লাশ তুলে বলল।

স্তানিন উত্তর দিল: "আমার যাত্রা চিরকালই এক। জীবনের কাছে আমি চাইও না কিছু, প্রত্যাশাও করি না কিছু। আর ভাগ্যের কথা যদি বলো, শেষ অবধি তারও অবশিষ্ট থাকে না বিশেষ কিছু। শেষ অবধি আছে বার্দ্ধক্য আর মৃত্যু। এই সব।"

গাড়ীতে উঠল গিয়ে স্তানিন।

"গুড বাই—"

গুড বাই—"

দু'জনকে দু'জনে চুমো খেলো।

হুইস্‌ল্ দিয়ে গাড়ী নড়ে উঠল।

আইভানফ, বলল, "তোমাকে বেশ লেগেছিল। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে মাত্র তোমাকেই পেয়েছিলাম।"

"আর তুমিই একমাত্র লোক, যে আমার কথা ভেবেছে কোনো দিন।"—স্তানিন্ হেসে বলল।

গাড়ী চলে গেল।

গার্ডের গাড়ীর পেছনকার লাল আলোটাও যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আইভানফ, বাড়ীর দিকে মুখ ফেরালো।

উনত্রিশ

গাড়ীর ভেতর আলোগুলি মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। তামাকের আর ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় যাত্রীদের আব্‌ছা-আব্‌ছা দেখাচ্ছে; পশুর পালের মতো ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে-বসে আছে সকলে। গুটি-তিনেক চাষী কথা বলাবলি করছিল:

"দিন-কাল বড় খারাপ যাচ্ছে, কি বলো ?"

স্তানিন্-এর পাশের চাষীটি বলল, "এর বেশি খারাপ আর কি হতে পারে ?...কর্ত্তারা তো নিজেদের নিয়েই আছেন। আমাদের জন্ম ভাববার ফুরসৎ কোথায় ? তোমরা যাই বলো বাপু, কিন্তু এ কথা ঠিক যে জান-প্রাণ নিয়ে লড়াই যখন, তখন জোর যার মুলুক তারই হয়।"

"তা হলে বক্-বক্ করো কেন ?" ওদের বক্তব্য বিষয়টা আঁচ করে নিয়ে স্তানিন্ বলল।

হাত নেড়ে বুড়ো চাষী ওকে প্রশ্ন করল, "কি আর আমরা করতে পারি ?"

স্তানিন্ উঠে গিয়ে জায়গা বদল করল। এই সব চাষীদের ও ভালো করেই জানে। ওদের ওপর যারা জুলুম করে, তাদের না পারে প্রতিরোধ করতে, না পারে ধ্বংস করতে; পশুর মতো করে জীবন যাপন। লক্ষ কোটি হতভাগ্য যে ভাবে জীবন কাটিয়েছে এরাও তেমনি কাটায় জীবন অমানুষের মতো—দৈব অনুগ্রহের ওপর ভরসা ক'রে।

রাত্রি গভীর হোল। স্তানিন্-এর সামনের বেঞ্চে বসেছিল এক জন ব্যাপারী সস্ত্রীক। বৌকে ধম্‌কাচ্ছিল লোকটা, "গরু কোথাকার দেখাচ্ছি মজা!"

স্তানিন্-এর তন্দ্রা এসেছিল; হঠাৎ বৌটির চাপা আর্ত্তনাদে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপারীটা বৌ-এর বুকের কাছ থেকে চট করে হাত সরিয়ে নিল। ও যে একটা গর্হিত শারীরিক অত্যাচার করছিল ওর স্ত্রীর ওপর, তা বুঝতে স্তানিন্-এর বিলম্ব হয়নি।

"জানোয়ার কোথাকার!" স্তানিন্ রেগে বলল।

লোকটা একটু ভীত হোল, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত বের করে হাস্‌তে লাগল।

বিরক্ত হয়ে স্তানিন্ উঠে গেল। গাড়ীর করিডর দিয়ে চলে চলে ও গিয়ে দাঁড়ালো একবারে শেষ কামরাটার পেছনে।

"কি হীনই না মানুষ!"

কামরাগুলোর থেকে আস্‌ছিল বহু লোকের অস্বাস্থ্যকর অবস্থিতি জনিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কলুষিত হাওয়া; কামরার নিষ্প্রভ আলোয় ঘুমন্ত নর-নারীর মুখগুলিতে একটা পাণ্ডুর প্রাণহীনতার লক্ষণ।

পূর্ব্ব দিগন্তে উষার আভাষ। রাত্রিশেষের আকাশে লেগেছে ধূসর-নীলাভ রং। প্রান্তরের ওপারে দিক্‌চক্রবালে নূতন দিনের আশ্বাস। ফুটবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে, দ্বিধাহীন স্তানিন্ দিল লাফ।

বজ্র-গর্জ্জনের আওয়াজ করে ট্রেণ ওকে পেছনে ফেলে চলে গেল।

নরম মাটি থেকে ও উঠে দাঁড়ালো।

আনন্দময় এক চীৎকার করে ও বলে উঠল, "এই তো ভালো।"

সীমাহীন বিরাট পৃথিবী ওর চার দিকে; সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কী মুক্ত এই পরিবেশ! ফুস্‌ফুস বিস্তারিত করে স্তানিন্ নিশ্বাস গ্রহণ করল। উজ্জ্বল চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল চার দিকে।

তার পর সুরু করল চল্‌তে পূব দিকে মুখ করে।

সূর্য্যের সোনালী রশ্মিগুলি আকাশে নীলাভ রেখা এঁকে দিচ্ছে; আকাশটাকে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের গম্বুজের তলা।

সূর্য্যের প্রথম কিরণ ওর চোখের ওপর পড়তেই ওর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। মনে হোল: ও যেন চিরকাল এই সামনেই চল্‌বে সামনে,—সূর্য্যের সান্নিধ্যের দিকে।

অনুবাদক—নির্ম্মলকুমার ঘোষ।

শেষ

নতুন চীনের নারী

ললিত হাজরা

গত ৫০০০ বৎসর ধরে চীনের উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া সামন্ততন্ত্রের চাপে চীনা রমণীরা তাদের স্বামী, ভাই, বাবার মত ক্রমাগতই অধঃপতনের পথে নেমে এসেছে। এই আর্থিক অবিচার ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সুবিধা মত মনগড়া বিধিতে মেয়েদের অবস্থা আরও ভয়াবহ ক'রে তোলা হয়েছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মতই চীনের মেয়েরা অন্ততঃ এক বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিলেন ক্রীতদাসী। প্রথমে বাপ-মায়ের—যৌবন থেকে স্বামীর। মার খাওয়া অথবা মারের চোটে জীবন হারানোই ছিল এদের একমাত্র ধর্ম। বাজারের পণ্যের মত মেয়েরা দরে বিক্রী হতো। মাঞ্চুবংশের পতনের পরে চীনা মেয়েদের দাস-জীবনের অবসান হয় নাই। চীনের বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেন্ প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে নিজ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে পারেন নাই। নারী জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি তাঁর কর্ম-সূচির অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বিপ্লবী নারী সুঙ চিঙ লিঙকে পত্নীরূপে লাভ করলেও ডাঃ সেনকে চক্রান্ত ক'রে প্রতিক্রিয়াশীলেরা কোন প্রগতিমূলক কাজ করতে দেয় নাই। বিপ্লবী বীরের মৃত্যুর পর চীনা ভূস্বামী ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল চিয়াং রাষ্ট্রের শাসন-ভার নিজের হাতে নিলেন। চিয়াং যে শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ ছিলেন সে শ্রেণী কোন দিনই নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ত দূরের কথা, তাকে মনুষ্য-সমাজের জীব বলে গ্রাহ্য করে নাই। জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবহ চিয়াং নারী সমাজের প্রতি চীনের সামন্তপ্রথার নির্মম ব্যবহারের কোন পরিবর্তনই আবশ্যক মনে করেন নাই। অতীতের সব অত্যাচার ও চিয়াং-এর নয়া অত্যাচার জোর কদমেই চলে এসেছে। চিয়াং-পত্নী সুশিক্ষিতা ও পাশ্চাত্য আবহাওয়ার মধ্যে গঠিত হয়েও নিজ দেশের অবহেলিতা নারীকুলের দুর্দশা মোচনের জন্যে একটা কথা পর্য্যন্ত বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেশের লোককে অশিক্ষিত রেখে দেশের শাসন-ভার নিজ হাতে রাখা ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। সামন্তবাদ স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বত্র দাসত্বের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছিল ও দাঁড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এসেছে যে চীনের প্রাচীন প্রাচীরকে শক্ত ক'রে রাখতে। ইউরোপে সামন্তবাদের যুগে নারী জাতির যে অবস্থা ছিল এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে আজও সেই অবস্থা রয়েছে। ইউরোপে সামন্তবাদের অবসান ঘটেছে বহু আগে জনসাধারণের চাপে আর এশিয়ায় জনসাধারণের চাপ সামন্তবাদের অবসান ঘটাবার যে চেষ্টা করছে তাতে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা ভীত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছেন। নিজ দেশে যা চালাতে তাদের আপত্তি এশিয়ায় সেটাকে জিইয়ে রাখতে তাদের কি ঐকান্তিক প্রয়াসই না দেখা যাচ্ছে! যখনই এশিয়ার কোটি-কোটি নর-নারী সামন্তবাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করছে অমনি তাকে "সাম্যবাদ কর্তৃক গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন" এই নামে ঘোষণা ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল দালালদের এই আন্দোলন সমূলে বিনাশ করার জন্যে গোলা, বারুদ, কামান, বিমান, ডলার সাহায্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ সামন্তবাদ ধ্বংস হলে শোষণের পথ চিরতরে রুদ্ধ হবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দরদ এইখানে।

আগেই বলা হয়েছে যে, চিয়াং-শাসিত চীনে মেয়েদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এইবার আমাদের দেখতে হবে চিয়াংশাসিত চীনে মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল। চিয়াং-শাসিত চীনের কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করা নরকতুল্য ছিল। অবর্ণনীয় অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম হতো আর মৃত্যু হতো আরও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে। আর মেয়ে হলে ত' কথাই ছিল না। দারিদ্র্যের তাড়নায় বাপ-মায়েরা গরু, ভেড়া, ছাগলের মত তাঁদের কন্যাদের বাজারে বিক্রয় করতে বাধ্য হতেন। এমন কি পুত্র-সন্তানদেরও দারিদ্র্যের তাড়নায় বাপ-মায়েরা জমিদারদের কাছে বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় করেছে। বাকী খাজনার দায়েই হোক আর কৃষকের খাদ্যাভাবের সুযোগ নিয়ে শিশু-কন্যার বদলে কিছু খাদ্য দিয়েছেন জমিদার ও জোতদারেরা। এরা হয়েছে ক্রীতদাসী। প্রত্যেকটি জমিদার-জোতদারের ঘরে এই ধরণের ডজন খানেক ক্রীতদাসী ছিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা—বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চীনে ক্রীতদাস প্রথা বর্তমান ছিল। গণতন্ত্রপ্রিয় মার্কিণ সরকার ও তার দালাল চিয়াং নির্বিকার চিত্তে এই বর্বরোচিত প্রথার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছিল। এই সব মেয়েদের যৌবন উপস্থিত হলে জমিদার-জোতদার তাদের প্রথম রিপু চরিতার্থ করেছে। শুধু তাই নয়—এরা এই মেয়েদের বিক্রয় করেছে বেশ কিছু টাকা নিয়ে। কাদের কাছে বিক্রয় করেছেন শুনবেন? বেশ্যার দালাল ও হোটেলওয়ালাদের কাছে। হোটেলওয়ালাদের ছিল এক-একটি নিজস্ব গণিকালয়। এত বড় অত্যাচার মেয়েরা চোখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আদালতের শরণাপন্ন হয়ে যে নিষ্কৃতি পাবে সে উপায়ও ছিল না। হয়ত, আমাদের দেশের কৃষকের মত তারা এক বৎসর আগে পর্য্যন্ত বলত :—"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই। ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষে নাই।" পাষণ্ড জমিদার-জোতদারের হাতে পড়লে আর কারও রক্ষা ছিল না। ক্রীতদাসীদের বে-চাল দেখলেই মালিকেরা এদের প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করত। নরহত্যার দায়ে যদি কখনও এরা অভিযুক্ত হতো তাহলে এরা সসম্মানে মুক্তি পেয়ে যেত। আদালতের বিচারকেরা ছিল আসামীদের পুত্র, ভাই অথবা আত্মীয়-স্বজন।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মেয়ের বিয়ের সময়ে মেয়ের বাপকে সর্বস্ব খুইয়ে দিতে হয় যৌতুক। আমাদের দেশেও এ প্রথা বিদ্যমান। সুতরাং এর বিশ্লেষণ নিরর্থক। আমাদের দেশের মতই বহু বাপকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়েছে।

বাক্‌দত্তা বিবাহ অতি সাধারণ ব্যাপার। সাধারণতঃ ৬ বৎসর থেকে ১২ বৎসর বয়সের মেয়েদের বড়লোকদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মায়েরা ভাবতেন যে, বড়লোকের যে কোন ছেলের সঙ্গে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব মেয়েরা হতো বড়লোকের বাড়ীর ক্রীতদাসী। পরিণামে এদেরও আশ্রয় হতো গণিকালয়ে। হয়ত প্রশ্ন হবে এ-সব জানা সত্ত্বেও বাপ-মায়েরা কেন মেয়েদের তাঁরা যমালয়ে পাঠাতেন? কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুঃস্থ পিতা-মাতা বড়লোকের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করার আশায় এই কাজ করতেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রীতি হলো

এই। মানুষ বার বার প্রতারিত হয়েও শিক্ষালাভ করে না—আর প্রতারকেরা প্রতারণা করেও ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করতে পারে না। ফল এই হয় যে, প্রতারিতের দল ভবিষ্যতে প্রতারকদের সমুচিত শিক্ষা দেয়।

অবস্থাপন্ন লোকেদের সমাজে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম বা দ্বিতীয় পত্নী বন্ধ্যা অথবা পুত্র-সন্তান প্রসব করতে অক্ষম হলে পতিদেব বাজারের পণ্যের মত নগদ মূল্য দিয়ে মেয়ে কিনে আনত। খরিদ-করা মেয়ে পুত্র-সন্তান প্রসব করলেই তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যেত। তখন তাকে আশ্রয় নিতে হতো গণিকালয়ে। এ-ছাড়া তার গত্যন্তরও ছিল না।

বিধবা-বিবাহ সমাজে ঘৃণ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হতো। একটি উদ্ভট প্রথার কথা বলা যাক্। বাক্‌দত্তা বালিকার ভাবী স্বামী মারা গেলেও বাক্‌দত্তা বালিকাকে বৈধব্য বরণ ক'রে নিতে হতো। শুধু ভাবী স্বামীর আত্মার মুক্তিলাভের জন্যে তাকে বিয়ে করতে হতো স্বামীর কবরের নিকট প্রোথিত স্মৃতি-ফলককে। তার পর চলত একটানা বৈধব্য জীবন।

পত্নী কর্তৃক পতিত্যাগ শোনা না গেলেও পতিদেবতা কর্তৃক পত্নী ত্যাগ হামেশাই হয়ে থাকে। পতি কর্তৃক পত্নী পরিত্যক্ত হওয়ার অর্থ সমাজ কর্তৃক নারী-নির্য্যাতন। পতি-পরিত্যক্ত পত্নীর স্থান সমাজে ছিল না। কিন্তু দুশ্চরিত্র স্বামী কর্তৃক সতী স্ত্রী যে পরিত্যক্ত হলো, সমাজ তার প্রতিবিধান করতে পারত না। সমাজ ত এ-হেন ব্যক্তিদের নিজস্ব সম্পদ ছিল। এরাই ছিল সমাজের কর্তা—দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। ঠিক আমাদের দেশের মতই আর কি।

পিতারই হোক আর স্বামীরই হোক, কারো সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন দিন অধিকার ছিল না। যে মেয়ে যত বেশী নিরক্ষর হতো আর সমাজের সব-কিছু অত্যাচার নির্ব্বিবাদে মুখ বুজে সহ্য করতে পারত সেই মেয়েই সতী সাবিত্রী বলে পরিগণিত হতো। সহজ কথায় যারা নিজের জীবন-মৃত্যুর সব দায়িত্ব স্বামী দেবতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত, তারাই ছিল চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আদর্শ নারী। ঠিক আমাদের দেশের মতই। সন্তান লালন-পালনের প্রাথমিক জ্ঞান তাদের ছিল না। মেয়েদের চিকিৎসাও হতো না। মেয়েদের চিকিৎসা করে অর্থব্যয়ের কোন কথা চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-জীবনের অভিধানে ছিল না। গ্রামের ধাত্রীই হলো যথেষ্ট। অবশ্য এরা এক-একটি কশাই-বিশারদ ছিল বললে ঠিক হয়। এদেরই দূষিত হস্তের দৌলতে বহু হতভাগ্য প্রসূতি ও নব জাতককে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বনায় যারা বেঁচে গিয়েছে তাদের সারা জীবন বহুবিধ রোগে ভুগতে হয়েছে।

এইবার দেখা যাক নারী-শ্রমিকদের অবস্থা। সংসারের ব্যয় সংকুলানের জন্যে বহু মা-মেয়েকে যেতে হয়েছে কারখানায়। স্বদেশসেবায় প্রণোদিত হয়ে নয়—অভাবের তাড়নায় এই পথ তাদের বেছে নিতে হয়েছিল। যেমন সমাজে তেমনি কারখানাতেও মেয়ে-শ্রমিক হয়েছিল সস্তা মাল। অত্যন্ত সস্তা দরে এদের শ্রম কিনে নেওয়া হতো। আর শোষণও চলত বেশী। দিনে ১৫ ঘণ্টা এদের কারখানায় কাজ করতে হতো, আর মজুরী মিলত এক জন দক্ষ শ্রমিকের মজুরীর ৩ ভাগের ২ ভাগ। দক্ষ শ্রমিকের মজুরী যে বেশ মোটা রকমের ছিল, তা যেন ভাববেন না। সাংহাই-এর কারখানায় এক জন দক্ষ শ্রমিক যা দৈনন্দিন মজুরী পেত তাতে তাদের নিজেদেরই দু'বেলা পেট পূরে খাওয়া চলত না। কোন রকমে বেঁচে থাকার মত মজুরী তারা পেত। সুতরাং এই মজুরীর ⅔ ভাগের অর্থ যে কি তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। কোন নারী-শ্রমিকের অন্তঃসত্ত্বার কোন রকম আভাষ পেলেই তাকে কারখানা থেকে বিতাড়িত করা হতো। জীবিকা হারাবার ভয়ে মেয়েরা জোর করে তাদের গর্ভাবস্থাকে চেপে রাখত। ফলে, কেহই জানতে পারতো না নারী-শ্রমিকের গর্ভের কথা। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন আগে ছুটি নিয়ে সন্তান প্রসব করত। তার পর আবার কাজে যোগদান। সারা দিনই দাঁড়িয়ে কাজ। বিশ্রাম নাই। অবস্থা যে ভয়াবহ ছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হচ্ছে না।

মালিকের অমানুষিক নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না। চিয়াং সরকারের কাছে গোলমালের সংবাদ গেলেই ঝাঁকের মত পুলিশ বাহিনী এসে প্রতিবাদকারীদের মেরে ঠাণ্ডা করে দিত। খবর পাঠাবারও প্রয়োজন হতো না। প্রত্যেক কারখানায় চিয়াং-এর গুপ্তচর থাকত। এরাই সব সংবাদ রাখত ও সরবরাহ করত। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার চিয়াং সরকার কেড়ে নিয়েছিল।

নারী-শ্রমিকদের যে-কোন শাস্তি কারখানার মালিকেরা দিতে পারত। শাস্তির বহরটাও ছিল উদ্ভট। সেলে পূরে রাখত অথবা এমন এক খাঁচায় পূরে রাখত, যেখানে তারা না পারত বসতে, না সোজা হয়ে দাড়াতে, না শুতে। অতি নগণ্য অপরাধে এই শাস্তি হতো। মজুরী বাড়াবার কথা বললেই তার গায়ে "কম্যুনিষ্ট" লেবেল এঁটে দিয়ে পাঠান হতো চিয়াং এর বন্দি-শিবিরে। সে বন্দি-শিবির থেকে জীবন্ত অবস্থায় আর কেউ ফিরে আসতে পারে নাই।

মার্কিণ শয়তানেরা প্রকাশ্য রাজপথ থেকে সুন্দরী তরুণীদের জোর করে তুলে নিয়ে যেত। তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে ছেড়ে দিত। চিয়াং এদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারত না। মার্শাল-পরিকল্পনা মত সাহায্য দিয়ে মার্কিণ শয়তানেরা চীনের মা-বোনদের শ্লীলতা হানি করতে কুণ্ঠিত হয় নেই। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী কোন সুঙ, (Shen Tsung)কে দু'জন মার্কিণ সৈন্য পিকিং-এর প্রধান রাজপথের উপর বলাৎকার করেছিল। হ্যাংকো শহরের এক রঙ্গমঞ্চে যখন নৃত্য চলছিল তখন মার্কিণ দুরাত্মারা রঙ্গালয়ের যাবতীয় আলো নিবিয়ে দিয়ে চল্লিশ জন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। চিয়াংএর নাকের ডগার উপরে এই কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু পাষণ্ড চিয়াং ক্ষমতার লোভে নিজের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারল না। এমন কি, এর বিরুদ্ধে একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারল না। মাত্র এক বৎসর আগে পর্য্যন্ত এই ছিল চীনের নারী-সমাজের অবস্থা।

অতীতের নির্মম ব্যবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। এইবার আমাদের দেখতে হবে, এক বৎসরের মধ্যে চীনা নারী-সমাজের

উন্নতি হয়েছে কি না। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে নয়া চীনের জন্ম হয়েছে। এই দিনে স্থাপিত হয়েছে চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র। এই দিনে চীনের কোটি কোটি নিষ্পেষিত নর-নারী বহু শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই দিনে চীনের বুক থেকে বিতাড়িত হয়েছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং গোষ্ঠীর দস্যুরা। এখানকার মানুষেরা হয়েছে সুখী ও স্বাধীন। পেয়েছে নতুন জীবনের আস্বাদ। দেখেছে নতুন জীবনের অগ্রগতির পথ। দেখিয়েছে এশিয়ার মুক্তিকামী জনতাকে সংগ্রামী জীবনের সাফল্যমণ্ডিত পরিণতি। কোন্ মন্ত্রবলে এত দিনের অধঃপতিত জাতি দাসত্বের শৃংখল টুকরো-টুকরো করে পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নিল? এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব না হলেও ক্ষুদ্রাকারে দিতে হবে। সাম্যবাদ আজ চীনকে আগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মাও-সে-তুং, চু-তে সারা জীবন ধরে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী, জাপানী ফাসিস্ত ও কুয়োমিনটাঙী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চীনের শোষিত জনতাকে জীবন-মরণ যুদ্ধে জয়ী করেছেন। মাও, চু-তে নিজেদের এদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন—এদের ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ জড়িত করে ফেলেছেন। চীনের মহান্ বিপ্লবী ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের "ত্রিনীতি" এঁরা আজ কার্য্যকরী করতে চলেছেন। মানুষে-মানুষে পার্থক্য ঘুচিয়েছেন, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণের অবসান ঘটিয়েছেন, সম্প্রদায় কর্তৃক সম্প্রদায়ের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য চক্রান্ত সমূলে ধ্বংস করেছেন—সমাজ কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছেন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এত কাণ্ড নয়া চীনে ঘটেছে। এই-ই শেষ—এ ধরণের আত্মসন্তুষ্টি তাঁদের আবৃত করে রাখতে পারে নাই। এই হলো তাঁদের নয়া মানব-সমাজ গঠনের সুরু।

প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে চীনের মেয়েরা চীনের সংগ্রামী পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তীব্র লড়াই চালিয়েছে। আত্মদান করেছে। সংগ্রামের শেষে দেশের শাসন-ভার গ্রহণে নেতৃত্ব করেছেন। প্রথমেই দেখা যাক—জনমুক্তি সংগ্রামে কি ভাবে লড়াই চালিয়েছেন। প্রত্যেকের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। মোটামুটি কয়েক জনের অল্প-বিস্তর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমেই ধরা যাক—সাই চ্যাঙ্গ (Tsai Chang)এর কথা। ইনি হলেন চীনা নারী-আন্দোলনের প্রধান নেতা। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক জন সদস্য ও নিখিল চীন গণতান্ত্রিক নারীসঙ্ঘের (All China Federation of Democratic Women) চেয়ারম্যান। হোনান প্রদেশের একটি দেউলিয়া জমিদার-পরিবারে ১৯০০ সালে সাই চ্যাঙ্গ-এর জন্ম হয়। সংসারের আর্থিক দুর্গতির জন্যে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি পাঠশালে যেতে পারেন নাই। তাঁর মা নিজের পোষাক ও বাড়ীর আসবাবপত্র বিক্রী করে (পুরানো জমিদারের সব গেলেও আভিজাত্যের শেষ সম্বল পোষাক ও আসবাবপত্র বিক্রী করা তাঁদের ধাতে সহ্য হয় না। নেহাৎ নিঃসম্বল না হলে আভিজাত্যের শেষ সম্বল বিক্রী করে না) মেয়ের স্কুলের বেতন জোগাড় করলেন। ১৬ বৎসর বয়সে হোনান নর্ম্যাল স্কুল থেকে চ্যাঙ্গ গ্রাজুয়েট হন। তাঁর অদ্ভুত মেধায় সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। মাও-সে-তুং ও চ্যাঙ্গের দাদা সাই হো শেঙ্গ (Tsai Ho Sheng) প্রতিষ্ঠিত, নিউ পিপলস্ সোসাইটীতে যোগদান করেন। এ হলো ১৯১৮ সাল। ১৯১৯ সালে মাও ও চ্যাঙের ভাই ফ্রান্সে ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে উপযুক্ত ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এক সমিতি গঠন করেন। সাই চ্যাঙ্গ ও তাঁর এক জন বন্ধু হোনান থেকে যাতে মেয়েরা ফ্রান্সে গিয়ে আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন তার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং এক দল তরুণীও সংগ্রহ করলেন। আজ এ-কাজ সহজসাধ্য হলেও সেদিন তা ছিল না। বাড়ী থেকে রাজপথে নামাই ছিল মহা অপরাধ, তার আবার বিদেশ যাত্রা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানেই একাধিপত্য বিস্তার করে আছে সেখানেই মেয়েদের এই অবস্থা। তিনি ও তাঁর কয়েক জন বান্ধবী ফ্রান্সে যান এবং বহু কষ্টসাধ্য করে জীবিকা অর্জন করে পড়া-শুনা করতে লাগলেন। ১৯২৩ সালে তিনি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে তিনি মস্কো যান ও তথায় মাস কয়েক শিক্ষা লাভ করেন। মস্কোতে তিনি বেশী দিন থাকতে পেলেন না। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেশে ফিরে বৈপ্লবিক কাজে যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। ১৯২৫—২৮ সাল পর্য্যন্ত নানচ্যাঙ, সাংহাই ও কিয়াংসি অঞ্চলে নারী-আন্দোলন করতে লাগলেন। তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "লঙ্ মার্চ" (Long March)এ যোগ দিয়েছিলেন। ইয়েনানে এসে এখানকার অনগ্রসর মেয়েদের মধ্যে নিজ দলের আদর্শ প্রচার করলেন। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা-সঙ্ঘের কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালে এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় বুডাপেষ্ট শহরে এবং এই সম্মেলনে তিনি চীনা মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি চীনা জনগণের গণ-পরিষদে নারী-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তেং ইঙ্গ চাও-এর কথা আলোচনা করা যাক। ১৯০৩ সালে কোয়াংসী প্রদেশের ক্যানিং শহরে এক দেউলিয়া জমিদার-পরিবারে জন্ম হয়। শৈশবেই পিতার মৃত্যু হয়। মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কোন রকমে অতি কষ্টে জীবিকা অর্জন করতেন। শৈশব অবস্থা থেকেই চাও সামাজিক বৈষম্য ঘৃণা করতে শিখেছিলেন আর ভবিষ্যতে এক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। ১৯১৯ সালের "মে ফোর্থ" (May Fourth) আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি তিয়েনৎসিনের হোপেই নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। এইখানে চৌ এন লাইএর সাথে তাঁর পরিচয় হয় ও পরে তাঁর সাথে বিবাহ হয়। চৌ এন লাই চীনা লোকায়ত্ত গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী। ১৯২০ সালে এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর তিনি পিপিং (বর্ত্তমান পিকিং) ও তিয়েনৎসিনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এখানে তিনি "প্রগতি নারী-সংঘ" (Society of Progressive Women) নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন এবং চীনা মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৫ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে তিনি

যোগদান করেন। ১৯২৫ সালের শেষের দিকে মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী কার্য্য চালাবার জন্যে তাঁকে ক্যাণ্টনে পাঠান হয়। এখানে এসে সুঙ, চিং লিঙ, (মাদাম সান ইয়াৎ-সেন) ও হো সিয়াং (Ho Hsiang) এর সাথে পরিচয় হয়। এই বৎসরেই ক্যাণ্টনে চৌ এন্ লাইএর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২৭—৩২ সাল পর্য্যন্ত সাংহাই শহরে যখন কম্যুনিষ্ট-নিধন যজ্ঞ হয়, তখন তিনি এখানে আত্মগোপন করে পার্টির কাজ চালিয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি লঙ মার্চে যোগ দিয়ে ইয়েনামে উপস্থিত হন। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ-এর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী ও চিয়াং-এর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে তা ব্যর্থ হয়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের অবসানে চুংকিং শহরে কুয়োমিনটাঙ-কম্যুনিষ্ট মিলনের যে মার্কিণী অভিনয় হয় তাতে তিনি কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সৈ মেঙ চী (Sai Meng Chi) এক জন পুরাতন ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী। আজীবন তিনি চিয়াং-শাসিত চীনে আত্মগোপন করে দলের কাজ চালিয়েছেন। ১৯৩২ সালে চিয়াং-এর দালালেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাঁর কাছ থেকে দলের গোপন তথ্য জেনে নেবার আশায় তাঁর উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার। এমন প্রহার করে যে, তার পা দু'খানা ও একখানা বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে যায়। প্রহার করে যখন কোন গোপন তথ্য বেফাঁস হলো না তখন পশুর দল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তখন তারা তাঁর নাকের ফুটায়, চোখে ও কানের ফুটায় লঙ্কা-গোলা জল ঢেলে দেয়। এত করেও যখন কিছু হলো না তখন তাঁকে অমানুষিক প্রহার করে রক্তাক্ত করা হয় ও জেলে পূরে রাখা হয়। তাঁর নির্য্যাতন ভোগ সার্থক হয়েছে। তাঁর দলের সাফল্যে তিনি সব কিছু ভুলে গিয়েছেন। সরকারী শাসন পরিষদের অধীনস্থ জনগণের পর্য্যবেক্ষক সমিতির (People's Supervisory Committee) এক জন সদস্যা নিযুক্ত হয়েছেন। আর নাম বাড়িয়ে প্রয়োজন নাই।

এইবার আমরা কয়েক জন বীরাঙ্গনার অপূর্ব সাহসিকতার কথা আলোচনা করব। চীনা মেয়েদের সাহায্য না পেলে মুক্তি-ফৌজের এত শীঘ্র সাফল্য লাভ হতো বলে মনে হয় না। প্রতিরোধ আন্দোলনে ও জনযুদ্ধে চীনা মেয়েরা যে নীতি করায়ত্ত করেছিলেন তার প্রতিটি নীতি তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। উত্তর-কিয়াংসু অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। ইয়াংসী নদী অতিক্রমের সময়ে এখানকার মেয়েরা যা করেছিলেন চীনের গৌরবময় ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখানকার তিন লক্ষ মেয়ে মুক্তি-ফৌজের জন্তে বানিয়েছিলেন ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৫১৪ জোড়া "নদীপারের" জুতা আর সৈন্যদের আহারের জন্তে তৈরী করেছিলেন ১ কোটি ৫ লক্ষ ২১ হাজার ২১০ কোটি আহার্য্য বস্তু। নিজেদের গৃহস্থালীর কাজ করেও তাঁরা রাত্রি জেগে চাঁদের আলোয় এ কাজ করেছিলেন।

সক্রিয় সংগ্রামের মধ্যেও তাঁরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। এমন কি, সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েদের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে বীরত্বের কথা স্মরণ রেখেও এ কথা বলা যায়। ইয়াংসী নদী অতিক্রম করার সময়ে মেয়ে-মাঝিদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন এই সময়ে নদীর উপরে উঠে যান। মেয়ে-মাঝিরা এ সতর্ক-বাণী শুনতে রাজী হয় নেই। মুক্তি-ফৌজকে ইয়াংসী নদী পার করে দেবার জন্তে তাঁরা জিদ্ ধরেন। ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরে মুক্তি-ফৌজের যে বাহিনী প্রথম অবতরণ করে সে নৌকার মাঝি কে ছিলেন জানেন? এক জন মেয়ে। শত্রুর প্রবল ও অগ্নিবর্ষী কামানকে অগ্রাহ্য করে মুক্তি-ফৌজকে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়ে দিলেন সামন্তবাদের অতি ঘৃণ্য প্রথায় কাঠে পা মোড়ানো মেয়ে ইয়ে তাহ-সাও (Yeh Tah-sao)। তখন তাঁর বয়স ৪০ বৎসর। পৃথিবীর বহু আক্রমণকারী ইয়াংসী নদীতে প্রাণ হারিয়েছে। মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত চিয়াং বাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণে ইয়াংসীর জল সমুদ্রের ঢেউএর মত উত্তর কূল তোলপাড় করে তুলেছে—এই ভয়াল গোলাবর্ষণ ও ঢেউ-এর মধ্যে কাঠের তৈরী ছোট নৌকা করে সৈন্য নামিয়ে দিলেন ইয়ে তাহ-সাও। গোটা চীনে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

চীনের মুক্তি-ফৌজের প্রথম ফিল্ড আর্মি'র (First Field Army) রাজনৈতিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আছেন নী চেঙ। ১৯২৬ সালের বিপ্লবে তিনি ছিলেন অন্যতম নায়িকা। দশ বৎসরের গৃহযুদ্ধে, জাপবিরোধী যুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ সৈনিক হিসাবে তিনি সম্মুখ সমরে লড়াই করেছেন। কখনও তিনি পিছিয়ে আসেন নাই।

লি শিউ চেঙ, (Li Hsiu Cheng) এক জন নিরক্ষর গেঁয়ো মেয়ে। জাপবিরোধী যুদ্ধের সময়ে তিনি চীনের সাম্যবাদী দলে নাম লেখান। জাপবিরোধী যুদ্ধে জাপ ফ্যাশিষ্টদের "সাবাড় করা যুদ্ধে" বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব করেন।—গুপ্তচরের কাজও তিনি ভাল ভাবেই জানেন। অষ্টম রুট আর্মির (Eighth Route Army) জন্তে শত্রুর দুর্বল স্থান অনুসন্ধানে বহু বার জাপানীদের পশ্চাদ্‌ভাগে নিজ জীবন বিপন্ন করে ঢুকেছিলেন। এ কাজের জন্তে রাত্রে তাঁকে একাকী পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাঁকে এই কাজে নিজ জীবন বিপন্ন করতে হয়েছিল। তাঁর একমাত্র পুত্রকে মুক্তিফৌজে দান করেছিলেন।

বহু শতাব্দীর সামন্তবাদের রথচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে মহাচীনের নারী জাতি আজ মুক্ত হয়েছেন। বহু যুগের যে সামাজিক প্রথা নারী জাতিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই অর্গলবদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর থেকে তাঁরা আজ মুক্ত নীলাকাশের তলে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নয়া চীন সংগঠনে নিজেদের বুদ্ধি, শক্তি সব-কিছুই প্রয়োগ করেছেন। নয়া গণতান্ত্রিক চীনের শাসন-বিধিতে বলা হয়েছে :—"যুগ যুগ ধরে যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা নারী জাতিকে দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে চীনের লোকায়ত্ত সরকার তার উচ্ছেদ সাধন করবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে নারী জাতি পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার উপভোগ করবে। নারী ও পুরুষের বিবাহের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।" চীনের শাসন-বিধিতে যা বলা হয়েছিল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে কথা প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা আমাদের দেখা বিশেষ প্রয়োজন।

নারী-পুরুষের রাষ্ট্রীয় জীবনে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না দেখা যাক্। চীনের মেয়েরা আজ গণ-রিপাবলিকের সর্বোচ্চ শাসন পরিষদে নিজেদের নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গণ-সরকারে আছেন মোট ছয় জন সহ-সভাপতি। তন্মধ্যে এক জন হচ্ছেন মহিলা। ইনি হলেন মাদাম সান্ ইয়াৎ সেন্। (মাদাম চিয়াং কাইশেকের ইনি দিদি)। কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের শাসন পরিষদে আছেন দু'জন মহিলা। এঁরা হলেন ম্যাদাম লি আও চুং কাই। ইনি ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বৈপ্লবিক পার্টির এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। অন্য জন হলেন সাই চ্যাং (Tsai Chang)। ইনি আবার চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য। গণ-সরকারের উপর তলার পরিচয় পাওয়া গেল। গোটা দেশের শাসন ব্যাপারে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়।

শহর ছাড়া পল্লী অঞ্চলে এক ব্যাপক বিপ্লব চলেছে। চীনে যে ভূমির মালিকানা স্বত্বের আমূল পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকারের নতুন ব্যবস্থাও হচ্ছে। চীনের মেয়েরা স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব থেকে যুগ-যুগান্ত ধরে বঞ্চিত থেকেছিল, কিন্তু নতুন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে মেয়েদের মধ্যে ভূমি বণ্টিত হ'য়েছে। পুরুষেরা যে সর্তে ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করেছেন, মেয়েরাও সেই একই সর্তে মালিকানা স্বত্ব লাভ করেছেন। যে সরকারের কাছ থেকে তাঁরা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করেছেন সেই সরকারের মঙ্গলার্থে নারী জাতি প্রবল উৎসাহ নিয়ে ফসল বাড়ানো আন্দোলনে নেমেছেন। জাতীয় আর্থিক পুনর্গঠনে সরকার যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানে মেয়েরা সাড়া দিয়েছেন প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে। উত্তর-চীনেই শতকরা ৮০ জন নারী-কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত হয়েছেন। চীনের তুলা-শিল্পের দুর্দিন দেখে মেয়েরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যাপক ভাবে তুলা উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছেন। যুগ-যুগান্ত ধরে মেয়েদের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ভাত-কাপড়ের জন্যে তারা তাদের স্বামী, পুত্র অথবা পিতা-মাতার উপরে নির্ভরশীল, অবশ্য যে দেশে মেয়েদের স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না তাদের এ ছাড়া আর গতিই বা কি? সামন্তবাদ-শাসিত সমাজে মেয়েদের এই ভাবে সর্বত্রই পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। আমাদের দেশেই এর নজীর আছে। সুতরাং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্যে আমাদের অন্যত্র যেতে হবে না। কিন্তু আজ মেয়েদের এ ধারণা দূর হয়েছে। তাঁরা ভাবতে শিখেছেন যে, আর্থিক দিক্ দিয়ে তাঁরা অনাবশ্যক কারও উপর পরগাছা হয়ে থাকবেন না। তাঁরা বেঁচে থাকার মত সংস্থান ত নিজেরাই করে নেবেন, উপরন্তু জাতীয় সরকারের আর্থিক পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন।

শিক্ষা ও কৃষ্টির দিক্ দিয়ে নয়া চীনের মেয়েরা আজ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। স্বাধীনতাই শুধু পায় নেই—পেয়েছে শিক্ষালাভের অধিকার। যুগ-যুগান্ত ধরে সমাজে মেয়েদের অন্ধ করে রাখা হয়েছিল। অবশ্য যারা বিত্তশালী ঘরের মেয়ে তাঁরাই পেতেন শিক্ষা। আর সমাজের শতকরা ৯৮ জন নারী উচ্চশিক্ষা ত দূরের কথা—চীনা বর্ণমালা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারত না। সামন্তবাদ-শাসিত সমাজে মেয়েদের শিক্ষা না দেওয়াই চিরন্তন রীতি। এখানেই বা তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? গণ-রিপাবলিক অতীতের সঞ্চিত আবর্জনা-স্তূপ পরিষ্কার করতে কাজে নেমেই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। নতুন নতুন বিদ্যায়তন যেখানে সম্ভব সেখানেই দ্রুতগতিতে খোলা হচ্ছে আর মেয়েরাও দলে দলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন। মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধাগণ সান্ধ্য বিদ্যালয়ে যোগদান করে লিখতে ও পড়তে শিখছেন। সান্ধ্য বিদ্যালয়গুলো মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধাদের জন্যেই খোলা হয়েছে। মাঞ্চুরিয়াতেই এ কাজটা অতি দ্রুত আগিয়ে চলেছে। মাঞ্চুরিয়ার দশটি জেলাতেই গত এক বৎসরে ১৭ হাজার ৭ শত ১৬টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর এর ছাত্র-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪ শত ৪৬ জন। ১ শত ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে আর ছাত্র-সংখ্যাও হয়েছে ৫১ হাজার ৪ শত ৮১ জন। ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার কলেজে ছাত্র হয়েছে ১০ হাজারেরও অধিক। অবশ্য ৪ কোটি জনসংখ্যার জন্যে এই মুষ্টিমেয় বিদ্যায়তন কিছুই নয়—এ কথা নয়া চীনের গণ-রিপাবলিকের নেতারা ঘোষণা করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। তাঁরা এখানেই থেমে যান নাই। তবে তাঁবেদার মাঞ্চুকুয়ো শাসনে দেশে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে দেশকে টেনে তুলতে তাঁরা মাত্র এক ধাপ আগিয়েছেন। হারবিন শহরে তিন বৎসর আগে ছিল মাত্র একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর তাতে ছিল মাত্র ৫ শত ছাত্রী। আর আজ সেখানে হয়েছে সাতটি বিদ্যালয় আর মোট ছাত্র-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হলো ছাত্রী। আজ সর্বত্রই সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রের শতকরা ৪০ জন হলো ছাত্রী আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রের শতকরা ২২ জন হলো ছাত্রী। উত্তর-চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ইষ্ট সায়েন্স ইনষ্টিটিউট Science ও রিকনস্ট্রাকসন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Reconstruction University) মোট ছাত্রের শতকরা ৩০ জন হলো ছাত্রী।

বহু বিবাহ, রক্ষিতা, বেশ্যাবৃত্তি, নারী-বিক্রয়, পুত্র-কন্যার অনিচ্ছাসত্ত্বে বিবাহ—এই ছিল চীনের সামাজিক প্রথা। নারী-নিগ্রহ ছিল চীনের পুরুষ-শাসিত সমাজের একমাত্র বিধান। যে জাতি নারী জাতির প্রতি যত বেশী অবমাননা করেছে, ধ্বংসও হয়েছে সে তত তাড়াতাড়ি। ইতিহাসের পাতা খুললে এর নজীর পাওয়া যায়। নয়া চীনে এই জঘন্যতম প্রথাকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। ভূমি-প্রথার সংস্কার সাধন, নারী-পুরুষ শ্রমিকের সমান বেতন—এই সব প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। আর্থিক দুর্গতি ও বৈষম্য যখন বিদূরিত হয় তখন যাবতীয় জঘন্য প্রথারও অবসান ঘটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। যুবক-যুবতীর সম্মতিক্রমে স্বাধীন বিবাহের প্রচলন হয়ে গিয়েছে। ফলে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী জাতি পুরুষের গলগ্রহ এই বর্বরোচিত চিন্তার অবসান ঘটেছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বলপূর্বক বিবাহ দিয়ে মাতা-পিতা যে সব তরুণ-তরুণীর জীবনে এক স্থায়ী অশান্তির সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন আজ বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বাধীনতা পেয়ে তারা নতুন করে ঘর বাঁধবার সুযোগ লাভ করেছে।

নারী-সংঘ (Women's Union) এই অসুখী পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে।

পণপ্রথার অবসান ঘটেছে। বিবাহে জাঁকজমক করে খরচ করাটা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। অতি সাদাসিদে বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে। আর এটা হয়েছে আইনের সাহায্যে। নয়া সরকার বিবাহের আইন যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে বলা হয়েছে : বিবাহে মাত্র দু'জন সাক্ষী থাকবে। স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই বিবাহ রেজিষ্টার্ড হবে এবং স্থানীয় সরকারই বিবাহেচ্ছু তরুণ-তরুণীকে বিবাহের সার্টিফিকেট দেবেন।

কারখানায় নারী-শ্রমিকদের জন্তে নয়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষ-শ্রমিকদের মজুরীর হার একই করা হয়েছে। এই জন্তে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার উল্লেখ প্রয়োজন :

(১) একই কাজের জন্তে নারী-পুরুষের সমান মজুরী।

(২) অদক্ষ নারী অথবা পুরুষ-শ্রমিকের নিয়তম মজুরী এই-রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে যে, বেতন যে হারে দিতে হবে তাতে ২ জন লোকের সংস্থান হবে।

(৩) বাড়তি খাটুনীর উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। রাত্রির কাজে অথবা নারী-শ্রমিকের ক্ষমতার বাহিরে কোন কাজে নারী-শ্রমিক নিযুক্ত করা চলবে না। ৮ ঘণ্টার অধিক নারী-শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

(৪) অন্তঃসত্বা নারী-শ্রমিককে প্রসবের আগে পুরা মজুরীতে দেড় মাস ছুটি দিতে হবে। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ গর্ভপাত হয়, তাহলে পুরা মজুরীতে কিছু কম ছুটি দিতে হবে।

(৫) শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্তে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সরকার দায়ী। শুধু তাই নয়—সরকারী বা বেসরকারী কোন কারখানা হতে শ্রমিককে ছাঁটাই করা চলবে না। সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নকে তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

(৬) পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের জেনারেল ও টেকনিক্যাল শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে ট্রেড, ইউনিয়নের। শিক্ষা দেবার জন্তে প্রয়োজন শিক্ষায়তন, ব্ল্যাকবোর্ড, আলো ইত্যাদি কারখানার কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে।

কারখানা ব্যবস্থাপনায় মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। শিচিয়াচুয়াং তাসিন টেক্সটাইল মিলের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ৮ জন হলেন মহিলা। মাঞ্চুরিয়ার ১ নং ও ২ নং মিলের যাবতীয় ডিরেক্টর সহকারী ডিরেক্টর ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সকলেই মহিলা। দু'টো কেমিক্যাল কারখানার ডিরেক্টর হলেন মহিলা।

সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্র (রাষ্ট্রীক ও আর্থিক) ঝিমিয়ে-পড়া জাতিকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্র তারা আপোষ করে লাভ করে নাই। সুদীর্ঘ কাল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মরণ-পণ লড়াই করে তারা আজ নয়া অধিকার অর্জন করেছে। দানে নয়—আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ সাফল্য তারা অর্জন ক'রেছে। মাও সে-তুং-এর কথা : "The Chinese people have stood up" আজ ভাবিয়ে তুলেছে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের।

আপনি কি জানেন ?

১। বাঙলা দেশে সর্ব্ব-প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন জনৈক ইংরেজ। কোন্ সালে ? কোথায় ? কি তাঁর নাম ?

২। বাঙলা হরফ খুব বেশী দিনের নয়। বাঙলা হরফ স্বহস্তে প্রথম নির্ম্মাণ করেন কে ?

৩। হালহেড সাহেব প্রথম বাঙলা অভিধান রচনা করেন। বাঙালীর মধ্যে, সর্ব্বপ্রথমে, ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় মিলিয়ে এক অভিধান প্রস্তুত করেন যে বাঙালী তিনি কে ?

৪। বাঙলা দেশেরই এক জন কবি। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে নিজের ইচ্ছামৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গাবক্ষে দেহ রক্ষা করেন। এই কবির নাম কেউ ভুলতে পারে না।

৫। বাঙলার বাল্মীকি ও ব্যাস কাদের আখ্যা দেওয়া যায় ?

৬। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের ভেতর উল্লিখিত ও বহু-পরিচিত এক জনের নাম, যিনি এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, তিনি কে বলতে পারেন ?

৭। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভারের মধ্যে একখানি গ্রন্থ উৎসর্গ করেন নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে। বইটির নাম স্মরণ করতে পারেন ?

৮। "বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই।" এই কথাগুলি কে কোথায় উক্তি করেন ?

৯। আদেশ উপদেশের ছলে অনেক মহাপুরুষ বাঙালীকে অনেক কথাই বলেছেন। বাঙালী জাতিকে এক জন পরামর্শ দিয়েছিলেন, "একটা নতুন কিছু করো।" এই পরামর্শ-দাতাটি কে ?

১০। "বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে তাঁর দেশে ফিরিয়া আসুন।" বিজ্ঞানের জন্ম ভারতবর্ষে। এই কথাটিতে তার প্রমাণ বর্ত্তমান। এই উক্তি কে করলেন ?

[উত্তর ৬৬১ পৃষ্ঠায়]

৭।৬৩।১—৬

সূর্য দেবতা—সাড়ে চার ঋকে। মিত্রাবরুণ দেবতা—দেড়খানি ঋকে।
বশিষ্ঠ ঋষি ত্রিষ্টুভ্ ছন্দঃ।

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ
সাধারণঃ সূর্য্যো মানুষাণাম্।
চক্ষুঃমিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্
চর্মে'ব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি । ১

উদ্বেতি প্রসবীতা জনানাং
মহান্ কেতুরর্ণব সূর্যস্য
সমানং চক্রং পর্য্যাবিবৃৎসন্
যদেতশো বহতি ধূর্ষু যুক্তঃ । ২ ।

বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ
রেভৈরুদেত্যনুমদ্যমানঃ ।
এষ মে দেবঃ সবিতা চচ্ছন্দ
যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম । ৩

দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি
দূরে অর্থস্তরণি ভ্রাজমানঃ ।
নূনং জনাঃ সূর্য্যেণ প্রসূতা
অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি । ৪ ।

যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ
শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম
নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ । ৫

নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্
ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু ।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ । ৬ ।

মানবের কাছে সাধারণ সেই দেবতা—
ঐ সূর্য
ঊর্দ্ধে উদিত হচ্ছেন।
কী প্রদীপ্ত তাঁর ঐশ্বর্য্য!
মিত্র এবং বরুণের ইনিই প্রকাশক-নেত্র।
এঁর বিচার-নেত্রে,
তমসার খণ্ডগুলি—
যেন চর্ম্মের শোভা। ১।

ঊর্দ্ধে উদিত হচ্ছেন সেই সূর্য—।
জাতমাত্রের তিনি প্রসবিতা,—কর্ম্মে এবং চেষ্টায়;
তিনি জলদায়ী।
মহান্ এক জ্ঞানের যেন অশান্ত প্রতীক্।
একরূপী একখানি চক্র,—
সেই চক্রকে আবর্ত্তিত করবার লিপ্সা নিয়ে
উদিত হচ্ছেন সূর্য।
ঐ দেখ
চক্রধূরিতে লগ্ন হয়ে
সূর্যকে বহন করে ছুটেছে
হরিৎবর্ণ অশ্বগ্রাম—এতশ্॥ ২॥

উদিত হচ্ছেন সূর্য
ঊষাদেবীদের দীপ্ত অঙ্কে।
গান গেয়ে চলেছে উদ্গানকারীরা
আনন্দের অনুমাদনায়।
আমার এই দেবতা—
এই জননলিঙ্গ সবিতা—
ছন্দিত করেছেন নিখিলতাকে;
এঁর তেজঃমন্দিরের স্বাধীনতা
খর্ব্ব হয় না হিংসায়। ৩॥

অন্তরীক্ষের কণ্ঠমণি
ঐ সূর্য
বিশাল নয়নে শুধু দেখছেন,
তিনি উদিত হচ্ছেন।
বহুদূর বহুদূর চলে গেছে তাঁর বেদনার প্রার্থনা—
তূর্ণ তীর্ণতার দীপ্তিময়ী ঐ মূর্ত্তি।
বিপুল নৈশ্চিত্যে আমরা জানি—
ঐ সূর্যেরি বিভাসিত প্রেরণায়
মানব সাধন করে—
কর্ম্মের মধ্যে যা কিছু রয়েছে মহৎ
যা কিছু রয়েছে বৃহৎ। ৪॥

আমাদের প্রাচীন অমৃত-দেবেরা
যে অন্তরীক্ষলোকে সৃষ্টি করে রেখেছেন
সূর্যের চলার পথ,
সেই পথ-রেখা গ্রহণ করেই
সূর্য চলেছেন
শ্যেনের মত॥
হে মিত্রাবরুণ, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
তোমাদের দু'জনের কাছে পৌঁছে যাবে
আমাদের পূজা
বহন ক'রে নমস্কার
বহন ক'রে হব্য॥ ৫॥

হে মিত্র, হে বরুণ, হে অর্য্যমা,
আমাদের আত্মার জন্যে
আমাদের পৌত্রাদির জন্যে
তোমরা দাও—তোমাদের বরণীয়তা;
শুভপথ সুগম কর বিশ্বের;
সকলকে রক্ষা করুক
তোমাদের সদা-স্বস্তি॥ ৬॥

সামবেদি-সন্ধ্যা—রূপান্তর

[আপোমার্জ্জন]

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ
স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণে বাজ্য-মাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-
স্তা ন উর্জ্জে দধাতনঃ।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-
স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো
যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চা-ভীদ্ধাত্তপসো অধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ৬ ।

ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি
সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্‌-বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ৭ ।

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৮ ।

মঙ্গল কর হে মোদের মরুদেশোদ্ভব জল,
মঙ্গল কর হে মোদের জলময়দেশোদ্ভব জল।
মঙ্গল কর হে মোদের সমুদ্রোদ্ভব জল;
মঙ্গল কর হে মোদের কূপোদ্ভব জল। ১ ।

শুদ্ধ কর হে মোদের সর্ব্বপাপ হ'তে—
যেমন স্বেদাক্ত হয় বৃক্ষচ্ছায়ায় স্বেদমুক্ত;
সদ্যস্নাত হয় স্নানের দ্বারা মলমুক্ত;
হবি হয় সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ। ২ ।

মঙ্গলবিধায়ক হে জল সকল!
আমাদের করো—অন্নবিধান।
আমাদের করো—সেই মহান্ ও
রমণীয় দর্শনের অধিকারী। ৩।

তোমাদের শিবতম রসের
আমাদের করো অধিকারী—
হিতৈষিণী মাতৃগণ যেমন
স্তন্যভাগী করেন সন্তানকে। ৪ ।

সকল জগৎ তৃপ্ত হচ্ছে তোমাদের রসে;—
সেই রস—আমাদের হোক্ পর্য্যাপ্ত।
সেই রসে—আমাদের হোক্ অধিকার। ৫ ।

যিনি ঋত-সত্য—প্রলয় কালে—
একমাত্র তিনিই ছিলেন বর্ত্তমান;
সকল জগৎ ছিল তমোময়।
প্রলয়ের অবসানে—
প্রারব্ধ হেতু—আরম্ভ হ'ল সৃষ্টি;—
উৎপন্ন হ'ল অর্ণব সমুদ্র।
অর্ণব সমুদ্র হ'তে উদ্ভূত হ'লেন—
জগৎসৃষ্টিক্ষম ব্রহ্মা;—
যিনি সৃষ্টি করলেন—সূর্য্য এবং চন্দ্রমা;
দিবা, রাত্রি এবং সংবৎসর;
দিবালোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গ। ৬। ৭। ৮

মন্ত্র ১। জলদেবতা—উষ্ণিক্ ছন্দ
যাজ্ঞবল্ক্যধৃত। অথর্ব্ববেদে ১।১।৬।৪।
এবং ১১।১।২।২।এ উল্লিখিত। পাঠান্তর—
২য় পঙ্‌ক্তি এবং ৪র্থ পঙ্‌ক্তি—যথাক্রমে,
"শমুনঃ সন্তনূপ্যাঃ" এবং "শমুনঃ সন্তকূপ্যাঃ"।

মন্ত্র ২। জলদেবতা—কোকিলনামা ঋষি—
অনুষ্টুপ্ ছন্দ। শুক্ল যজুঃ ২০।২০।

মন্ত্র ৩-৫। জলদেবতা—সিন্ধুদ্বীপনামা ঋষি—
গায়ত্রী ছন্দ। সাম উত্তরার্চ্চিক ১।২।১। ঋক্ ৭।৬।৫।

মন্ত্র ৬-৮। ভাববৃত্ত (পাঠান্তরে ভাববৃত্তি)
দেবতা—অঘমর্ষণনামা ঋষি—
অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ ৮।৮।৪৮।

নানা প্রেম

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পণ্ডিচেরী)

কেড্‌ম্যানের

১

হে তরুণী নাহি জানি তুমি কি সুন্দর,
শুধু জানি তব ওই দুটি ওষ্ঠাধর
ওই আঁখি, ও চিবুক, ওই দু'টি বুক,
সুপুষ্ট দুইটি উরু পরশ-উন্মুখ
দুর্ণিবার আকর্ষণে চুম্বকের সম
আকর্ষণ করে মোরে সকল সংযম
মিথ্যা করি হে নব-যৌবনা ; বক্ষমাঝে
দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এক অহরহ সাজে—
ওই তনুলতা ধরি' দৃঢ় আলিঙ্গনে
উচ্ছ্বসিয়া উদ্বেলিয়া সোহাগে চুম্বনে
যৌবন-সরণী, অণু-পরমাণু হ'তে
ও-দেহের, দানবীয় মত্ততার স্রোতে
পান করি—অমৃত কি ?—অথবা গরল,
চতুর্দিকে বাজি' ওঠে ধরার শৃঙ্খল !

২

জানি আমি হে রমণী এ নহেক প্রেম,
কামের এ নগ্ন রূপ ; নিকষে কষিত হেম
রেখা তার পড়ে নাই এই চিত্তলোকে,
বিচ্ছুরিয়া যায় নাই উর্দ্ধের আলোকে
এ-পুলক, বক্ষে মত্ত শোণিতের দোল
নহে নহে দেবতার ; দানবের রোল
বুভুক্ষিত প্রেতাত্মার তোলে ক্ষুধারাশি
অন্ধ কোন্‌ গুহা হ'তে ; নন্দনের বাঁশি
নাহি ওঠে বাজি' তুলি' আনন্দ-রাগিণী
অন্তরের গোপন মন্দিরে ; রিণি-ঝিণি
নাহি শুনি স্বপ্ন-ঘেরা নূপুর-গুঞ্জন
নৃত্যপরা অপ্সরীর ; শুধু প্রাণ মন
রাক্ষসী ক্ষুধার মাঝে গর্জে মহাদাপে,
উর্দ্ধ আজি অন্ধ-আঁখি মর্ত্ত্যের প্রতাপে !

৩

মর্ত্ত্যের প্রতাপ এই, পশুর মিলন,
অতি অতি আদিমের যৌন-আকর্ষণ
পুরুষ নারীর এই নহে তুচ্ছ নহে,
সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র এ-কামনা বহে
আপন অন্তরে ; এ-মন্ত্রের উদ্বোধনে
পৃথ্বী হ'য়ে আছে জয়ী চিত্তের স্পন্দনে
যুগ হতে যুগান্তর ; এ-মন্ত্র পরশে
মৃত্যু মানে পরাজয় ; অদম্য হরষে
একের পশ্চাতে পুনঃ আসে শত শত
মরণেরে ব্যর্থ করি' ; জীবনের ব্রত
চিরন্তন হ'য়ে আছে লীলায় খেলায়
কালের স্রোতের এই চপল বেলায়,—
অতি আদিমের এই যৌন-আকর্ষণ
শাশ্বত করিছে মর্ত্ত্যে নশ্বর জীবন।

ভারতচন্দ্রের

১

বিকশি' বক্ষ চপল চক্ষে চরণে নৃত্য রে।
করিয়া নিত্য পুলক-চিত্তে বিতরে বিত্ত কে॥
নয়নে লাস্য আননে হাস্য উজলে জীবনে রে।
সকল বিশ্ব হবে গো নিঃস্ব কাহার বিহনে রে॥
আঁখির পুলকে অমিয়া ছলকি' চপলা চমকি' যায়।
অলস গমনে লগনে লগনে মরাল পড়িছে পায়॥
পেলব তনুয়া গঠিত কি দিয়া ? কোমল কুসুমে বুঝি।
মরি কি বেদনা নেহারি উরজে উপমা মিলে না খুঁজি'॥
চিকুর-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জি' যায়।
অংসে উরসে হরষে পরশে তনু-ফুল-মধু খায়॥
বক্ষ বিকাশি' কক্ষ প্রকাশি' দানিছে বেদনা কে।
ভুবনে জনম পুরুষ-জীবন রমণী-ললনা সে॥

২

নিতম্ব-ভারে ঢলিয়া পড়ে
কহ দেখি জনা কেমন রে॥
কুন্তল যার দীঘল কিন।
কথা কহে সে যে বাজায়ে বীণ্‌॥
গমন তাহার নূপুর-তানে।
আঁখি হ'তে সদা তড়িৎ হানে॥
পদনখে চাঁদ গড়ায়ে যায়।
ওষ্ঠে অধরে কমল ভায়॥
নয়নে নয়ন রাখিতে গেলে।
রোম-কূপে-কূপে দামিনী খেলে॥
অঙ্গে লাবণি নাহি রে সীমা।
বক্ষে দু'খানি লহরী ভীমা॥
লহরী সে-ভীমা শিহরি' কাঁপে।
পুরুষ দেখিলে বসন ঝাঁপে॥
কটিদেশ যার মোহন ক্ষীণ্‌।
ললনা সে নহে ছলনাহীন॥

৩

মলয়-সমীরে বিটপি-শরীর মুরছি' মুরছি' যায়।
কোকিল-কোকিলা-কাকলি গগনে পবনে কুহরি গায়॥
এমন জোছনা হৃদয় গলে না কেমন ললনা সে।
পাষাণে গড়িয়া নিল কি হরিয়া—এমনি ছলনা রে॥
এসো গো ষোড়শী মোহিনী রূপসী গজেন্দ্রগামিনী প্রিয়া।
নূপুর-রণনা বিকাশি' ঝণনা থেকো না ছলনা নিয়া॥

নয়নে লাস্য বিকশি' হাস্য উজলি' মোহন মুখ।
এসো গো সাধিবো কাঁদিবো ধরিবো চরণ পাতিয়া বুক।
এমন জোছনা রবে না রবে না জীবন-শয়ন-সঙ্গী।
এমন বিরহে অভাগা কি রহে করিলে কুটিল ভঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের

১

শোনো শোনো কহি বালা
ভিন্ দেশ হ'তে দু'টি আঁখি ভরি'
এনেছি স্বপন-মালা।
সেই স্বপনের গাঁথিয়া মালিকা
দোলাবো তোমার বুকে জ্যোতিঃ-শিখা,
পৃথিবীর তুমি কুসুম-কলিকা
ফুটিবে আকাশ ভরি,'
গগনের যত সীমার ওপার
সৌরভ তব নিবে বাসা তার,
তব বুক হ'তে ধরণীর ভার
কোথা যে যাইবে সরি'।
তখন নয়নে কৃষ্ণ তারায়
নিবিড় স্নিগ্ধ পল্লব-ছায়
কপোল কপাল বক্ষ গ্রীবায়
নীলিমার সুর লাগি'
খসায়ে ধূলির মর-অঞ্চল
আকাশের গায়ে শ্বেত শতদল
জাগাবে তোমারে প্রেম-ছল্-ছল্
অমরার অনুরাগী—
শোনো শোনো কহি বালা
আমি ভিন্ দেশ হ'তে আঁখি দু'টি ভরি'
এনেছি স্বপন-মালা।

২

শোনো ধরণীর মেয়ে
আন্ জগতের আলোর দেয়ালি
এনেছি এ-প্রাণ ছেয়ে।
সেই দেয়ালির মুকুট গড়ায়ে
মাথায় তোমার দিবো লো পরায়ে,
ধরণীর ধূলি-সরণি পারায়ে
চলিবে অশোক পথে,
তনুর তনিমা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
অশরীরী সুর আসিবে ভিড়িয়া
আলোর বাঁশরি ফিরিয়া ফিরিয়া
বাজিবে স্বপন-রথে।
তটিনীর কলো ছলো ছলো গান,
বনে উপবনে মধু কুহুতান,
গগন-পবন নব অবদান
ছাবে ও শ্রবণ আঁখি,
একটি চরম পরম পাওয়ায়
দিবস রজনী কি যে গান গায়
শুনিবে প্রাণের গহন মায়ায়
কিছু নাহি রবে বাকি—
শোনো ধরণীর মেয়ে
আমি আন্ জগতের আলোর দেয়ালি
এনেছি এ-প্রাণ ছেয়ে।

৩

শোনো শোনো ভাবী প্রিয়া
কোন্ গোলোকের মাধুরী ভরিয়া
এনেছি এ-মোর হিয়া।
সেই মাধুরীর গড়িয়া ভূষণ
সারা দেহে তব দিবো আভরণ,
কোথা কিছু নাহি রবে অশোভন
ধরণীর ধূলি আঁকা,
কুন্তল হ'তে দু'টি পদতল
শরতের মতো আলো-ঝলমল্
বাঁশরির মতো সুর-ছলছল্'
উদিবে অমিয়া-মাখা।
একটি মধুর বাণীর আড়াল
মধুময় করি' রাখিবে সকাল
সন্ধ্যা দুপুর সারা নিশা কাল
আপনারে নিভৃতে,
তারা-সমাকুল আকাশের গায়
যে-সুরে মাতিয়া যামিনী হারায়
দেখিবে তেমনি প্রাণ মন কায়
হারা এক মহাগীতে—
শোনো শোনো ভাবী প্রিয়া
আমি কোন্ গোলোকের মাধুরী ভরিয়া
এনেছি এ-মোর হিয়া।

চণ্ডীদাসের

১

কহিতে যদি শরম লাগে কোয়ো না তবে মেয়ে
রহুক তাহা গোপন বুকে ঢাকা,
বুঝেছি আমি বুঝেছি তা যে আঁখির পানে চেয়ে
দেখেছি সে যে কপোল 'পরে আঁকা;
দেখেছি তব হাসিতে তারি গোপন সমারোহ,
চোখের পাতে তাহারি আলো লাগিয়া অহরহ
মরম তলে ছেয়েছে জানি মোহনতম মোহ
সকল তনু হয়েছে মধুমাখা,—
কহিতে যদি শরম লাগে কোয়ো না তবে মেয়ে
রহুক তাহা গোপন বুকে ঢাকা।

২

চাহিতে যদি শরম লাগে চেয়ো না তবে মেয়ে
আঁখির পাতে আঁখিয়া থাক্ ঢাকা,
বুঝেছি আমি বুঝেছি তা যে গ্রীবার পানে চেয়ে
প্রভাত-অরুণিমায় হ'ল আঁকা;

দেখেছি তব অধর-তটে কাঁপন মৃদু মৃদু,
প্রাণের বাটি ভরেছে জানি মধুরতম সীধু,
সকল তনু ঘিরিয়া আজি জড়ায় জ্যোতিঃ বিধু,
মনের সুখ পেয়েছে যেন পাখা,—
চাহিতে যদি শরম লাগে চেয়ো না তবে মেয়ে
আঁখির পাতে আঁখিরা থাক্ ঢাকা।

৩

গাহিতে যদি শরম লাগে গেয়ো না তবে মেয়ে
গোপন প্রাণে রাগিণী থাক্ ঢাকা,
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব চলার পানে চেয়ে
সে-গীতি সুরে চলার ছাঁদ আঁকা;
শুনেছি তারি গোপন বাণী চুলের সুরভিতে,
শুনেছি তারি সুরের রেশ কাঁকন-সঙ্গীতে,
তাহারি রেশ ফিরিছে আজি দেহের চারি ভিতে
সকল দিশি করিয়া যাদুমাখা,—
গাহিতে যদি শরম লাগে গেয়ো না তবে মেয়ে
গোপন প্রাণে রাগিণী থাক ঢাকা।

৪

আসিতে কাছে শরম যদি এসো না কাছে মেয়ে
মরম পুটে প্রণয় থাক ঢাকা,
নভের পটে সে-প্রেমসুধা যাবে গো যাবে ছেয়ে
আহরি' নিবো মেলিয়া মন-পাখা।
গানের পথে তোমার হিয়া আসিবে মম প্রাণে,
নীরব সুরে সোহাগ-বীণা বাজাবে কানে কানে,
আরেক গীতি অলোক-লোকে জাগিবে গানে গানে
এ-চিত হবে তোমার "তুমি" মাখা;—
আসিতে কাছে শরম যদি এসো না কাছে মেয়ে
মরম-পুটে প্রণয় থাক ঢাকা।

কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তাঁর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কাজ থাকবে কি অসম্পূর্ণ? দেবানন্দপুর, হুগলীর যে গ্রামের নাম শরৎচন্দ্র স্বয়ং পরিচিত করেছেন বাঙলায়, সেই স্থানের অর্দ্ধ-সমাপ্ত এই স্মৃতি-মন্দির। সাহায্যের অভাবে কি এই অবস্থায় থাকবে? শরৎ-স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে এই বৎসরে যে সভার আয়োজন হয় তাঁরই উদ্যোগিবৃন্দ।

বাম দিক হইতে:—ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, এম·এ· এম· বি (সদস্য হুগলী জেলা বোর্ড), শ্রীপ্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (ভাইস্-চেয়ারম্যান, হুগলী জেলা বোর্ড), শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, শ্রীবিমল মৈত্র, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম· এ· (প্রধান অতিথি), ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম· এ·, বি· এল·, পি· এচ· ডি· (সভাপতি), শ্রীমতী মায়া দেবী (উত্তরপাড়া), শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত, এম· এ· বি· এল· (সম্পাদক, দেবানন্দপুর শরৎ-স্মৃতি সমিতি), শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি)।

আদিম ললিত-কলা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

মানব জাতির মধ্যে প্রথম যে কবে ললিত-কলার উন্মেষ হয় তা ঠিক জানা যায় না। তবে অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিকেরই মতে মানব জাতির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই হয়েছে তার ললিত-কলার উন্মেষ। মনোবৈজ্ঞানিকের মতে ললিত-কলা হলো মানব জাতির সহজাত প্রবৃত্তিবিশেষ; যেমন কীট, পতঙ্গ বা পক্ষী জাতির নীড় বাঁধার প্রবৃত্তি। মানুষ যখন একেবারে যাযাবর-জীবন যাপন করত, যখন সে গৃহ নির্ম্মাণের কলা-কৌশল জানত না; যখন সে লজ্জা নিবারণ পর্য্যন্ত করতে শেখেনি, তার বহু পূর্ব্বে সে চিত্র ও মূর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ললিত-কলার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সঠিক বয়স জানা যায় না! বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন,—খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'সহস্র বছর পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। এটি পাওয়া গেছে পেলিওলিথিক স্তরের উপরি স্তরে (In upper palaeolithic, strata)। নৃতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন, যে জাতির মানুষ এই মূর্ত্তি রচনা করে তাদের বংশ আজ ভূপৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয়েছে।

লিবেটন উপত্যকায় প্রাপ্ত একখানি উৎকীর্ণ বুসম্যান চিত্র

আদিম জাতিদের ললিত-কলার বিকাশ মানুষের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগোয়নি। এক-এক আদিম জাতির ললিত-কলা এক পথ ধরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'ইউনিফরমিটী (uniformity) বলে আদিম ললিত-কলায় কিছু পাওয়া যায় না। সমস্ত আদিম ললিত-কলার পেছনেই মানুষের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা ও আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা এ দু'টো জিনিষ ওতঃপ্রোত হয়েছিল, কিন্তু "The moulding anvil, that shaped the primitive art in different places is not the same in everywhere." কোথাও তাদের কলার সম্যক্ স্ফুরণ ঘটেছে ধর্ম্মের তাগিদে, কোথাও প্রকৃতির প্রভাবে, আবার কোথাও কুসংস্কারের আওতায়।

মানুষের চিত্রকলার প্রথম উন্মেষ কি করে হয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারই অনুকরণে আনমনে মাটিতে আঁচড় কাটতে-কাটতে আদি মানবের প্রথম চিত্রের সূচনা হয়। অপর পক্ষ বলেন, আদি মানব সাপ, জল, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতির কৃপা লাভের জন্য তাদের পূজো করত। তাদের উদ্দেশ্যে তারা নানা রকম চিহ্ন আঁকত; ঐ অভ্যাস থেকেই মানুষের প্রথম চিত্রকলার সৃষ্টি হয়।

আদি মানব যাযাবর-জীবন যাপন করত। তার পর সে মাটি কর্ষণ করে চাষ করতে শিখলে। চাষ করতে শেখার পর থেকেই সে এক জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করতে সুরু করলে। তখনও সে কিন্তু বাসগৃহ নির্ম্মাণ করতে শেখেনি। তাই সে স্বাভাবিক পর্ব্বতগুহার মধ্যে বসবাস করিতে লাগল। মানুষ বহু কাল ধরে গুহাগর্ভে বাস করে। প্রথম প্রথম সে গুহার বাইরেই ছবি আঁকত। গুহার ভেতর অন্ধকার, কাজেই তার ভেতর ছবি এঁকে কোন লাভও ছিল না, আর তা আঁকাও যেত না। গুহাশ্রয়কে শোভিত করার অভ্যাস থেকেই আদি মানবের কলানুরাগ বিকশিত হয়ে উঠেছে।

আদি মানব পলিমাটীর রং দিয়ে নিজেদের গায়ে নানা রকম অলঙ্করণ আঁকত। চর্ব্বি দিয়ে তারা এই সব রং গুলত। তার পর মানুষ এক দিন চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখল। ঐ আগুন দিয়ে সে চর্ব্বির প্রদীপ জ্বালায়। এর পর মানুষ প্রদীপের আলোয় গুহাগর্ভের গায় পলিমাটীর রং দিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করে। আদি মানবের আঁকা হলেও সে চিত্রগুলি উচ্চস্তরের কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। বাইসন, ম্যামথ, সে যুগের ঘোড়া, রেণডিয়ার প্রভৃতির চিত্রই বেশি মেলে। দু'-একখানি মানুষের যুদ্ধ, বাইসানের যুদ্ধ প্রভৃতির ছবিও পাওয়া গেছে। এই সব গুহা-চিত্র দশ থেকে পনেরো হাজার বছর আগে আঁকা হয়, কিন্তু এখনও ছবিগুলি বেশ আছে। সর্ব্ব-বিধ্বংসী কাল এখনও ছবিগুলি নির্ম্মম হাতে মুছে দিতে পারেনি। মানুষের ছবি যা পাওয়া যায়, সেগুলির কিন্তু একটিও স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত নয়।

রাস্থার নব্য-প্রস্তর যুগের আদিমানবের একটি শিল্প নিদর্শন। এ ছবিখানি লাল ও সবুজ রংয়ে আঁকা

সে যুগের মানুষের প্রধান উপজীবিকা শিকার ছিল বলেই তাদের অধিকাংশ ছবিতেই হয় শিকারের জীবজন্তু নয় শিকারের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। স্ত্রীলোকের ছবির সংখ্যা অত্যন্ত অল্পই মেলে। এই সব ছবি থেকে সেকালের জীব-জন্তু ও মানুষের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। সেকালের ম্যামথের গায় ছিল খুব বড়-বড় লোম, দাঁত দু'টি ছিল খুব বড় ও পাকান; সেকালের রেণডিয়ারের এক জোড়া করে বড় সিং ও এক জোড়া করে ছোট সিং থাকত; সেকালের ঘোড়া ও বাইসনের দেহের তুলনায় মুখ ছিল অনেক ছোট; সেকালের মানুষ বল্লম ও তীরধনুকের ব্যবহার জানত। কোন-কোন ছবির রেখাগুলি পাথরের অস্ত্র দিয়ে বেশ গভীর করে কেটে তার মধ্যে রং ভরে দেওয়ার জন্যে ছবির রেখাগুলি এখনও অত্যন্ত বলিষ্ঠ আছে। তবে খোলা যায়গায় আঁকা ছবির অধিকাংশই রোদ, বৃষ্টি ও তুষারে নষ্ট হয়ে গেছে।
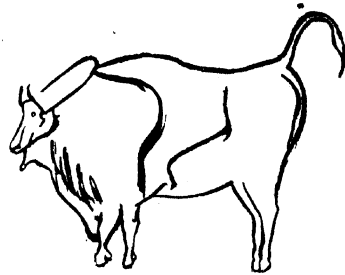
স্পেনের গুহা-গর্ভে আঁকা একটি বহুবর্ণ বাইসনের চিত্র—কমলা, লাল, হলদে ও খয়েরের রংয়ে এখানি আঁকা

প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের চিত্রকলা

প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের যে সব চিত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি অন্যূন খিঃ পূঃ খৃষ্টের জন্মের দশ থেকে বিশ হাজার বছর আগে আঁকা। এ সব ছবির অধিকাংশই পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ। আপার পেলিওলিথিক স্তরেই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যে সব মানুষ এই শিল্প সৃষ্টি করে তাদের নাম 'হোমো অরিগ্‌নেসেন্‌সিস্' (Homo Aurignacensis) মধ্য-পেলিওলিথিক স্তরেও কিছু কিছু শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি আর এক জাতের মানুষ দ্বারা রচিত হয়। তাদের নাম 'হোমো মুষ্টেরিএন্‌সিস্' (Homo Mousteriensis)। এদের কলা-বোধ একটু অনুন্নত ধরণের ছিল। এদের মস্তিষ্কের ও দেহের অপরাংশের অস্থি দেখে বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করেছেন—এরা আরও নিচু স্তরের মানুষ ছিল।

ফ্রান্সের একটি গুহা-গর্ভে প্রাপ্ত বিশ হাজার বছর আগের আদিম মানুষের আঁকা চিত্র। এটি আদি-মানব তার একটি পাথরের যন্ত্রের ওপর এঁকেছে

আপার পেলিওলিথিক স্তরের যে সব শিল্প-নিদর্শন পাওয়া যায়, তার মধ্যে "ভেনাস্-অব-উইলেন্‌ডর্ফ" (Venus of Willendorf) দ্বিতীয় চিত্র নামক চুণা পাথরে উৎকীর্ণ একটি স্থূলকায়া নারীর মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটি থেকে নারীদেহের আবয়বিক বৈশিষ্ট্য, কেশ-বিন্যাস সবই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, কিন্তু মূর্ত্তিটিতে 'ডিটেল' (detail) কিছুই নেই। এতে মনে হয়, আদিম শিল্পীরা সমগ্র ভাবেই বিষয়-বস্তুটি পর্য্যবেক্ষণ করত। পুঙ্খানুপুঙ্খতার প্রতি খুব বেশি দৃষ্টি দিত না। এ মূর্ত্তিটির কোন অংশই নষ্ট হয়নি, একেবারে অবিকৃত অবস্থায় আছে। এ ছাড়া ফ্রান্সে আটটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মানবী মূর্ত্তি একটি অস্থিনির্ম্মিত মূর্ত্তি ও ছয়টি 'সোপ্-ষ্টোন্' (soap-stone) বা কোমল পাথরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত একটি নারীমূর্ত্তি এত সুন্দর যে সেটি দেখে আধুনিক কালের অতিমার্জ্জিত রুচির কোন শিল্পীর হাতের কাজ বলে ভ্রম হয়। ফ্রান্সের কতকগুলি গুহাগর্ভে ভারি চমৎকার কতকগুলি বহুবর্ণ বাইসন, রেণডিয়ার প্রভৃতি জীবজন্তুর ছবি পাওয়া গেছে। এগুলি যেমন স্বাভাবিক তেমনি চিত্তাকর্ষক। এর পরবর্ত্তী কালের কতকগুলি উৎকীর্ণ চিত্রাবলী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে জীবজন্তুর ছবিই বেশি। এগুলি অল্প রেখার ভেতর দিয়ে বেশ দৃঢ় ভাবেই ফুটে উঠেছে। ১৯৩৫ সালে আল্টামিরা গুহার মধ্যে একটি উল্লম্ফনশীল ঘোড়ার চিত্র পাওয়া গেছে। চিত্রখানিতে ঘোড়াটির গতি-ভঙ্গিমা বেশ স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠেছে।

বুসম্যান শিল্পী অঙ্কিত সারস-দম্পতীর একখানি সুন্দর চিত্র—এখানি শ্বেত, গৈরিক ও পিঙ্গল বর্ণে আঁকা

ছবিখানির 'য়্যানাটমি' (anatomy) ও 'প্রোপোরশ্যান' (proportion) দুই-ই বেশ নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, এখানি সেই অন্ধকার যুগের ছবি হলেও এতে স্থূলত্ব বা perspectiveয়ের বেশ স্পষ্ট একটা আভাষ পাওয়া যায়।

স্পেনের ক্যাষ্টেল্লন্ (Castellon) অঞ্চলের গুহাগর্ভে আঁকা একখানি যুদ্ধের চিত্র পাওয়া গেছে। চিত্রখানি লাল রংয়ে আঁকা। এতে শিল্পী কয়েকটি খুব বলিষ্ঠ রেখার সাহায্যে দেখিয়েছেন সাতটি তীরন্দাজ তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করছে। তীরন্দাজগুলি এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে যে সহসা দেখলে মনে হয়, তারা পাহাড়ের নিচে অর্থাৎ কোন উপত্যকায় যুদ্ধ করছে; শিল্পী পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের দেখে সে ছবি এঁকেছে। কয়েকখানি একক শিকারীর ছবি পাওয়া গেছে, সেগুলিও অনবদ্য সুন্দর। যেমন অপূর্ব্ব তার গতি-ভঙ্গিমা, তেমনি তার 'য়্যানাটমি' ও 'প্রোপোরশ্যান'। বুসম্যান ছাড়া অপর কোন আদিম জাতির মধ্যেই এত উচ্চ স্তরের কলা-নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের আদিম চিত্রকলার অধিকাংশই আজ জলের নিচে মগ্ন হয়ে রয়েছে।

মহেঞ্জোদাড়োর ভূগর্ভে প্রাপ্ত পাথরের ওপর আঁকা একটা শিকারের দৃশ্য

আফ্রিকার আদিম চিত্রকলা

আফ্রিকার য়্যাটলাস অঞ্চলের পর্ব্বতগাত্রে আদি মানবের অনেক উৎকীর্ণ-চিত্র আঁকা আছে। উৎকীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রকৃতির এত কালের প্রভাবেও তাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেনি। এগুলি নিওলিথিক্ যুগের শিল্পীদের আঁকা। এ ছবিগুলি দেখতে খুব সুদৃশ্য নয়। মধ্য-সাহারার অহাগ্‌গার (Ahaggar) অঞ্চলে একখানি বহু-বর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে। ছবিখানি আদিম চিত্র হলেও এমন প্রাণবন্ত ও তাতে এমন এক মধুর কমনীয়তা ফুটে উঠেছে যে, আদিম কেন, আধুনিক কালের সুসংস্কৃত মানুষও তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। একটি পুরুষের সামনে লজ্জা ও দ্বিধাজড়িত ভঙ্গিমায় একটি পরী দাঁড়িয়ে। পুরুষটি নারীটিকে সযত্নে ধনুর্ব্বিদ্যায় পাঠ দিচ্ছে। উত্তর-আফ্রিকার কলা-নিদর্শনের মধ্যে ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না।

মানবের প্রাচীনতম ভাস্কর্য্য নিদর্শন। ইউরোপের প্রাচীন প্রস্তর-স্তরে প্রাপ্ত "উইলেন্‌ডর্ফে'র ভেনাস"

আফ্রিকার বুসম্যান্ জাতির চিত্রকলা ও নিগ্রো জাতির ভাস্কর্য্য আজ পাশ্চাত্যের শিল্পি-মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক ব্যালফোর (Balfour), ক্রবার (Kroeber) সেলিগ্‌ম্যান (Seligman) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা বুসম্যান চিত্র-শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিভা ও দৃষ্টি-ভঙ্গিমার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এরা হুবহু স্বভাব-অনুকারী ছবি আঁকত। এদের আশ্চর্য্য রকম সরল

প্রকাশ-ভঙ্গী, দৃঢ় রেখার ব্যঞ্জনা, স্বাভাবিক গতিভঙ্গিমা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'পারস্পেক্‌টিভ' (Perspective) সম্বন্ধেও এদের বেশ জ্ঞান ছিল। মিস্ হেক্লেন্ টঙ্গু এদের অনেক ছবি নকল করে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উল্লম্ফনশীল হরিণের ছবি পাওয়া গেছে, সেটি ভারি সুন্দর। থাবা বোসিগো অঞ্চলে শ্বেত, পীত, পিঙ্গল ও গৈরিক রংয়ে বুসম্যান শিল্পীর আঁকা একখানি সারস-দম্পতির চিত্র পাওয়া গেছে। এ ছবিখানি দেখে বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রেজোরফ্রাই বলেছেন—"বর্ণ-সম্পাত ও অঙ্কনের কোমলতা দেখে, চিত্রখানিকে আধুনিক জাপানী চিত্রকলার নিদর্শন বলে ভ্রম হয়।"

আধুনিক ভাস্কর-শিল্পীরা নিগ্রো জাতির ভাস্কর্য্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। আজকের দিনের পাশ্চাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর-শিল্পী লিও আন্দ্রে, জেকব এপ্‌স্টীন্, ফ্রাঙ্ক ডবসন্ প্রভৃতি ভাস্কর বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে নিগ্রো ভাস্কর্য্য অনুশীলন করছেন। এই নিগ্রোরা পাথর-খোদাই করে, কাঠ-খোদাই করে ও ব্রোঞ্জ দিয়ে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে গেছে।

এশিয়া ও অন্যান্য দেশের আদিম ললিত-কলা

ইউরোপ ও আফ্রিকার আদিম ললিত-কলার চেয়ে এশিয়া মহাদেশের আদিম ললিত-কলায় আদিমতা বা 'primitiveness'য়ের ছাপ বেশি পরিস্ফুট। সম্প্রতি মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ভূগর্ভ খনন করে যে সব স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও উৎকীর্ণ চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি খৃষ্টের জন্মের সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগে রচিত হয়। মহেঞ্জোদাড়োয় একখানি শিকারের ছবি পাওয়া গেছে তা ভারি চমৎকার।

জাপানের নিওলিথিক স্তরের ঐ যুগের আদি মানুষের অনেকগুলি ছোট-ছোট মানুষের ছবি আঁকা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই মূর্ত্তিগুলির আবয়বিক গঠন দেখে বোঝা যায়, সমস্তগুলিই নারীর চিত্র। মেডিটারেনিয়ান্ অঞ্চলের নোতুন-প্রস্তরযুগের মৃন্ময় মূর্ত্তির সঙ্গে এ মূর্ত্তিগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। চীন দেশের কতকগুলি সমাধিক্ষেত্রে কতকগুলি মূর্ত্তি অঙ্কিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। তাতে ঐ অঞ্চলের মানবের অঙ্কনের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে নৃতাত্ত্বিকরা সম্প্রতি সাইবেরিয়ার কোন কোন অঞ্চলের ভূগর্ভে খোদাই করে ছবি আঁকা অস্ত্রের বাঁট, বাজাবার ঢাকের চামড়ার ওপরে আঁকা ছবি প্রভৃতি পেয়েছেন। এগুলি ঘোড়া, রেণডিয়ার প্রভৃতির ছবি। ছবির আবয়বিক আকার দেখে বোঝা যায়, শিল্পী কোন বস্তুর ছবি এঁকেছে, তবে এতে বিশেষ উন্নত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। এগুলি অবশ্য নিওলিথিক ও তার পরের যুগের আঁকা চিত্র। পাথরের ফলকের ওপর ও পাহাড়ের গায় খোদাই-করা অনেক ছবি পাওয়া গেছে; কিন্তু পেলিওলিথিক যুগের সাইবেরিয়ার আদি মানবের কোন শিল্প-নিদর্শনই পাওয়া যায়নি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, সাইবেরিয়ায় প্রাক্-মানব ও আদি মানবের অস্থি সুসংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, আন-পেলিওলিথিক যুগের মানুষের সংস্কৃতির নিদর্শনও অমনি অবস্থায় পাওয়া উচিত। তাই এখন ঐ অঞ্চলে খনন-কার্য্য চলেছে।

'প্রিমিটিভ আর্ট' বললেই প্রাক্-মানব বা আদি মানবের ললিত-কলা বোঝায় না। এই বিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর অনেক অংশে আদিম মানব আছে। জাতির সংস্কৃতির মান থেকেই আদিমতার মান নির্দ্ধারণ করা হয়। আজকের এসিয়াতেও কয়টি আদিম জাতি আছে। সাইবেরিয়া ও ইন্দোচীনের কয়েক জায়গার অধিবাসী, ভারতের নীলগিরি অঞ্চলের টোডা ও আসামের নাগা জাতিরা এখনও সম্পূর্ণ আদিম অবস্থাতেই আছে। আদিম ললিত-কলার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সরল ও অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গী। এক জন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"Characteristic features of primitive art, are boldness, naivity, erudity and above all unsophisticated mode of expression."

উত্তর

[৬৫২ পৃষ্ঠার পর]

১। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, হুগলীতে, মিঃ এণ্ড্রুস।
২। স্যার চার্ল্‌স উইল্‌কিন্‌স্।
৩। স্বর্গীয় রামকমল সেন।
৪। সাধক রামপ্রসাদ।
৫। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস।
৬। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৭। তাসের দেশ।
৮। 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত।
৯। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১০। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মন্দিরের জন্মকথা

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

(সহকারী গ্রন্থাগারিক : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : বিশ্বভারতী)
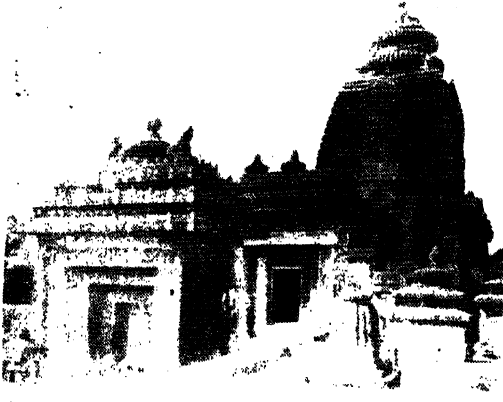
ভুবনেশ্বরের একটি মন্দির

ভারতীয় স্থাপত্য-ইতিহাসে দেবমন্দিরের স্থান ও দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মন্দির-স্থাপত্যই(১) প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের জীবন্ত নিদর্শন। সামাজিক কারণে প্রয়োজনীয় স্থাপত্যের (যথা, রাজপ্রাসাদ ; সাধারণের-ব্যবহৃত গৃহাদি ; সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি) নিদর্শন খুব অল্প-সংখ্যকই পাওয়া গিয়াছে। সে কারণ ধর্ম্ম-মন্দিরের কথাই প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস।

কবে কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ অজ্ঞাত স্থপতিবীরের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক পরিচালনার মধ্যে মন্দিরের জন্মকথা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা আজিও জানা যায় নাই। উপরোক্ত প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে নানা মুনি নানা মত দিয়াছেন কিন্তু কেহই কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই।

সাধারণ ভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, দেবতার মূর্ত্তি ও দেবালয় বা মন্দির পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে মূর্ত্তির সন্ধান হইতে অনুমান করা যায় যে, সে যুগেও কোন-না-কোন আকারে দেবালয়েরও অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারো খনন কালে তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল একটি বহু তলাবিশিষ্ট মন্দিরের অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করেন। "The temples stand on elevated ground and are distinguished by the relative smallness of their chambers and the exceptional thickness of their walls—a feature which suggests that they were several stories in height."(২) স্যার জন মার্শালের উপরোক্ত কয়েক লাইন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগেও পরিপূর্ণ আকারে মন্দির-স্থাপত্য বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নরম-সিনের প্রস্তরখণ্ড হইতে জানা যায় যে, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে প্রাচীন নিনাভে নগরীতেও ভারতীয় মন্দিরের ন্যায় অনুরূপ স্থাপত্যধারা প্রচলিত ছিল।

গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে মূর্ত্তি ও মন্দিরের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মিলিন্দ পাঞহ ও সূত্র গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধের পূর্ব্বেও মন্দির নির্ম্মিত হইত। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের দেবতার মূর্ত্তি-পূজা ও দেবালয়-গমন বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। উপনিষদে আছে যে,(৩) সুরদেবী নামক জনৈক স্থপতি তাহার প্রভুর অনুমোদনের জন্য একটি মন্দিরের ছোট প্রতিকৃতি (model) নির্ম্মাণ করেন এবং পরে তদনুযায়ী মন্দির পাটলিপুত্র নগরে নির্ম্মিত হয়। ঘোসুণ্ডি শিলালিপি(৪) হইতে সুঙ্গ রাজত্বকালে মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রীযুক্ত কে পি জায়সওয়াল মহাশয়ের মতে—It is the earliest monumental proof of the fact that temples were erected to Vasudeva and to his brother, and that the followers of the cult included even Bramhins. এই শিলালিপিখানি ২০০-১৫০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে লিখিত। উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট অনুমেয় যে, সুপ্রাচীন প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগেও পরিপূর্ণ মন্দির-স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র গুপ্তযুগ হইতে 'যে মন্দির-স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—এই ধারণা অতীব ভ্রান্তিমূলক।

মন্দিরের জন্মকথা আলোচনার প্রারম্ভে মন্দিরের বিভিন্ন পুরাতন নাম সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু জানা উচিত। রামায়ণ, মহাভারত, সূত্র ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মন্দিরের অপর নাম—দেবালয়, দেবায়তন, দেবকুল ও দেবগৃহ প্রভৃতি ছিল বলিয়া জানা যায়। বাস্তুশাস্ত্রে মন্দিরের অপর নাম "প্রাসাদ" কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে মন্দির অর্থে "বিমান" ও "হর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অধুনা প্রচলিত "মন্দির" শব্দটি প্রাচীন শাস্ত্রে কদাপি ব্যবহৃত হইত। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ত্তমান মন্দির বুঝাইতে—প্রাসাদ, হর্ম্ম, বিমান, সৌধ, দেবকুল, দেবায়তন, দেবগৃহ, দেবালয় প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে আকার-প্রকারে বিশেষ প্রভেদ ছিল।

রামায়ণ, মহাভারত ও জাতক থেকে জানা যায় যে, যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার পূর্ব্ব থেকে "প্রাসাদ" অর্থে শিখর-সমন্বিত বহু তলা-বিশিষ্ট গৃহকে বুঝাইত, কিন্তু উহা দেবতার কি মানবের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইত তাহা সঠিক জানা যায় না। রামায়ণে "চৈত্য প্রাসাদ" অর্থে ধর্ম্মমন্দিরকে বুঝাইত ; বাস্তুশাস্ত্রের প্রথম পর্ব্বেও

---

(১) এখানে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মন্দির অর্থে "মন্দির-স্থাপত্য" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) Sir John Marshall—The Times—Feb, 1926.

(৩) Katha-kosha. Translated by C. H. Twany, P, 150.

(৪) Epigraphica Indica. vol xvi P. 25.

"প্রাসাদ" শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-ভারতে বহু তলা-বিশিষ্ট মন্দির (প্রাসাদ) খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

উত্তর-ভারতের মন্দিরের চূড়ায়—আমলক শীলা—মন্দির-স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অমরাবতী, মথুরা ও বেশনগরে প্রাপ্ত আমলক শীলাযুক্ত মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কাল থেকে এই আমলক শীলা ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র চুল্লভগগেও আমলক শীলার উল্লেখ দেখা যায়।

দক্ষিণ-ভারতের শিল্পশাস্ত্রে ব্যবহৃত "বিমান" শব্দটি মন্দিরের অপর নাম। বিমান শব্দটি ব্যবহারের জন্য কাহারও কাহারও মতে কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ হইতে পরবর্ত্তী মন্দির রূপ গ্রহণ করে। সমরাঙ্গনসূত্রাধারে মন্দিরের জন্মকথা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—"আদিতে ব্রহ্মা ভগবানদের ভ্রমণের জন্য পাঁচটি বিমান প্রস্তুত করেন এবং দেশ ও নগর সজ্জিত করিবার জন্য অনুরূপ ছাঁচের প্রস্তর ও মৃন্ময়-নির্ম্মিত গৃহাদি (প্রাসাদ) তৈয়ারী হয়। কিন্তু প্রাচীন কালে রথ বা বিমান এবং গৃহাদি উভয়ই কাষ্ঠ ও বংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, সে কারণ কে কাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত বলা সহজসাধ্য নয়। তবে সাধারণ জ্ঞানে এইটুকু বোঝা যায় যে, প্রথমে গৃহ ও পরে রথ বা বিমান তৈয়ারী হয়। সুতরাং দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। আবার যদি রথের আকারেই মন্দির-স্থাপত্য গড়িয়া ওঠে তবে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরের ছাঁচ এক প্রকার না হইয়া বিভিন্ন কেন? সুতরাং রথের আকারে মন্দির-স্থাপত্য প্রভাবান্বিত, এ সত্য গ্রহণযোগ্য নহে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্য হইতে মন্দিরের উৎপত্তি। কিন্তু এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত; কারণ, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও মন্দির নির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধগণই হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। প্রাক্-বৌদ্ধযুগেও স্তূপের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে হিন্দু-মন্দিরের প্রভাবে উহা তদনুরূপ আকার গ্রহণ করে। শতপথব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে, আর্য্যদিগের নির্ম্মিত স্তূপ চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ও অসুরদিগের স্তূপ গোলাকৃতি ছিল। বৌদ্ধরা অসুরদিগের অনুযায়ী গোলাকৃতি স্তূপ ব্যবহার করিতেন। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র শেষকৃত্যের (funeral) সহিত স্তূপের ব্যবহার দেখা যায়। এখনও গয়ায় শ্রাদ্ধের সময় বালির স্তূপ তৈয়ারী করা হয়।

কেরলা ও টের নামক স্থানের মন্দির দুইটি দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধচৈত্য হইতে দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দির জন্মলাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটা রমন্না প্রমাণ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্যের উপর চৈত্যের কোন প্রভাব নাই। প্রাক্-বৌদ্ধযুগের মন্দির ও টোডা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদের কুঁড়ে আকৃতি ঘরের নিদর্শন হইতে দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।(৫) কিন্তু হয়শীর্ষ পাঞ্চরাত্র নামক পুস্তক থেকে জানা যায়—অতি প্রাচীন কাল হতে দক্ষিণ-ভারতে—সুকনাসিকা—নামে এক বিশেষ ছাঁচ (type) প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্যের উপর উত্তর-ভারতের প্রভাব বিশেষ বৈশিষ্ট। ভারত, মথুরা ও বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত পাথরের গাত্রে অঙ্কিত মন্দির-সমূহের প্রতিমূর্ত্তির প্রভাবেই পরবর্ত্তী কালে কেরলা, টের ও মহাবল্লীপুরমের রথগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

চৈত্যের সহিত চিতাভস্মের যোগাযোগ অনুমেয়। সুপ্রাচীন কাল হইতে চিতাভস্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু উহার উপর মন্দির বা বৃক্ষরোপণ করা ভারতে প্রচলিত। রামায়ণে চৈত্য প্রাসাদের উল্লেখ আছে। চিতাভস্মের উপর যে সকল বৃক্ষরোপণ করা হইত তাহাকে "চৈত্য-বৃক্ষ" বলা হইত এবং তাহাদের বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করা হইত। বিখ্যাত পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বিবরণ হতে জানা যায় যে, অনুরূপ চৈত্য-বৃক্ষ নষ্টের শাস্তি ছিল—প্রাণদণ্ড। বাংলা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বাংলায় চিতাভস্মের উপর মন্দির নির্ম্মাণের যে প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহার সহিত বৌদ্ধ-চৈত্যের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা আদৌ আশ্চর্য্য নয়। পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত বিখ্যাত রাজবাড়ীর মঠ ঐরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন। সুতরাং স্তূপের ন্যায় খুব সম্ভবতঃ চৈত্যও ভারতের তদানীন্তন প্রচলিত স্থাপত্য-ধারার অনুকরণ মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায় যে, ভারতের মন্দির-স্থাপত্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বিমান বা রথ অথবা বৌদ্ধ-চৈত্য ও স্তূপের নিকট আদৌ ঋণী নহে বরং হিসাবের ফল উল্টাই দাঁড়াইল। চুল্লভগ্‌গ থেকে জানা যায়—প্রাসাদের ব্যবহার প্রাক্-বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরে বৌদ্ধরা উহা গ্রহণ করে। ভারতের একটি শিলাখণ্ডে অঙ্কিত প্রাসাদের নিদর্শন দেখা যায়(৬)। পরবর্ত্তী কালে এই প্রাসাদ বা উচ্চ বাসগৃহের নিদর্শনেই হিন্দুদিগের মন্দির রূপ গ্রহণ করে। উত্তর-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতেও বসত বাটীর অনুকরণে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য শুরু হয়। দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্যে (বিমান—গোপুরম্) প্রাসাদের অনুকরণে মন্দিরের উচ্চতা হ্রাস করা হয় নাই, কিন্তু উত্তর-ভারতীয় মন্দিরের (দক্ষিণ-ভারতের তুলনায়) এই উচ্চতা হ্রাস বিশেষ লক্ষ্যণীয়(৭)। ময়মতমের অনুযায়ী বিমান অর্থে "শালা" ব্যবহৃত হইত এবং এই শালা শব্দে চূড়াযুক্ত উচ্চ প্রাসাদ জাতীয় বসত বাটীকে বুঝাইত। বাংলা দেশের চালা ঘর আকৃতি মন্দির হইতে বুঝা যায় যে, জলবায়ু অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানের বসত বাটী সমূহের অনুকরণে মন্দির-স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছে(৮) এবং কালে কালে ধর্ম্ম বিষয়ের নানা জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-স্থাপত্যের প্রকারভেদ ও বৃদ্ধি হইয়াছে।

---

(৫) "The hut-shaped temple was super imposed upon the dolmen shaped and the result is the modern South Indian temples."—An essay on the origin of the South India temple by N. Venkata Ramanya. Madras.

(৬) History of India and Indonesian Art. Coomarswamy. fig. 43.

(৭) "Nagara shrine really represents a piling up of many superimposed storeys or roofs, much compressed. The key to this origin is the Amalaka. Thus the Nagara and Dravida towers both originate in the same way."—Coomarswamy. History of India and Indonesian Art.

(৮) Hut type Temple of Bengal.—Bimal Kumar Dutta. Hindusthan Standard. 23. 4. 50.

পৃথিবীর পরিণাম

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

সিডনীর এক ভবিষ্যদ্বক্তা সদ্য জানিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই পৃথিবী টলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে হারে মেরু-তুষারের ওজন বাড়ছে হু-হু করে তাতে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে বাধ্য হবেই এবং আজ এই মুহূর্তে যারা মনের আনন্দে হাসছেন, বেড়াচ্ছেন, পর-মুহূর্তে তাদের শীতল সমাধি লাভ দিবা-রাত্রির মতই সুনিশ্চিত অর্থাৎ তখন বাড়ীর পাশের দীঘিটাই উভয়-মেরুতে পরিণত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বক্তাই প্রথম ও শেষ নন, যিনি পৃথিবীর আশু ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যবে থেকে পৃথিবীর ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয়ে আসছে তখন থেকেই চলে আসছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পালা। আর শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু এতে ভবিষ্যদ্বাদীরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি এবং তাঁদের বাণী শ্রবণের শ্রোতারও অভাব হয়নি কখনো। সহস্র বছর আগে এমনি ধারা পৃথিবী ধ্বংসের ধুয়ো তুলেছিলেন গীর্জার অভিভাবকরা, যার ফলে অনেক রাজা-মহারাজা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নয়, মধ্য-ইউরোপের বাসিন্দারা স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু নিজেদের সব পুড়িয়ে ফেলেছিল শেষের সেই ভয়ংকর দিনটি আসন্ন ভেবে। বর্তমান শতাব্দীতেও কয়েক জন ঝানু ভবিষ্যদ্বক্তার নামোল্লেখ করা যায়—যারা পৃথিবী ধ্বংসের সঠিক দিন-তারিখ ঘোষণা করেছেন। এঁদের ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা, এতে কারুরই মর্যাদা হানি বা ভক্তদের নিকট জনপ্রিয়তারও হ্রাস হয়নি কিছুমাত্র।

ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রত্যেকেই নিজেদের অলৌকিক শক্তি অথবা দৈবনির্দেশ উপলব্ধির ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের সঙ্গে আধুনিক কালের ভবিষ্যদ্বক্তাদের তফাৎ এই যে, আধুনিকরা এ ব্যাপারে কিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন।

পৃথিবীর হুমড়ি-খেয়ে পড়ার থিয়োরী খুব বেশী দিনের পুরোনো নয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক রুমানিয়ান ইন্‌জিনীয়র ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ডেনমার্কের সরকারকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে জানান যে, উত্তর-মেরু অঞ্চলের বরফের গভীরতা যেমন বাড়ছে তাতে তার ভারে পৃথিবীটা এক দিকে কাত হয়ে পড়বে। এমন কি তিনি চল্লিশ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিলেন, যার দ্বারা মেরু অঞ্চলের এই মহা তুষার-চলকে উত্তরগামী করে গ্রীণল্যাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাহলেই একমাত্র এই মহা সর্বনাশের হাত থেকে গোটা পৃথিবীটাকে বাঁচানো সহজ হবে।

সরল বিশ্বাসী মানুষ আর ধর্মান্ধরা মাথা ঘামাতে পারেন এই সমস্তই ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাণী নিয়ে, যারা পৃথিবীর অন্তিম ক্ষণের ঠিকুজী-কুলজী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মনে করেন নিজেদের। কিন্তু আসল সত্য হোল, মানুষ নিজে যেমন জানে না কখন এবং কেমন করে তার মৃত্যু ঘটবে তেমনি পৃথিবীটাও কবে এবং কেমন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সে সম্বন্ধেও সে গাঢ় তিমিরে। প্রত্যেকেই যাকে বলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছেন। বৈজ্ঞানিকরাও এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন কিন্তু তাঁদের কেহই কোটি কোটি বছরের আগে যে মহা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে, এ-কথা মানতে রাজী নন। সে যাই হোক, পৃথিবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুবই রোমাঞ্চকর এবং সম্ভবতঃ নিরর্থক নয়—হয়ত তার দ্বারা আমরা মহা সর্বনাশের এই শেষ দিবসটিকে ঠেকিয়ে রাখার অথবা বিলম্বিত করার একটা কোন উপায় বের করতে পারি।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্বন্ধে কম পক্ষে ডজন খানেক থিয়োরী প্রচলিত। কেহ কেহ এই গ্রহটি ধ্বংসের কথা বলেন আবার কেহ কেহ শুধু মনুষ্য জাতির বিলুপ্তির ইংগিত করেন এবং সে-ক্ষেত্রেও এমন কোন সরলতম প্রাণী বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে যারা কালক্রমে নানা বিবর্তনের পর্যায় অতিক্রম করে মনুষ্য সদৃশ জীবে পরিণত হতে পারে।

পৃথিবীটাকে এক দিকে কাত করে ফেলার থিয়োরীটাও বেমালুম উপেক্ষা করা যায়। কারণ, মেরু অঞ্চলে বরফের ওজন বাড়ছে (বাড়ছে কি না প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই) এ-কথা ধরে নিলেও সমগ্র পৃথিবীর ওজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য, সন্দেহ নেই। তাহলে বলা যায়, একটি মাছি দশ নম্বরী ফুটবলের উপর বসে ফুটবলটাকে কাত করে ফেলবে এবং এমনি ধারা হাস্যকর কথাটা নয় কি? আবার তুষার-যুগ আসতে পারে, এমন আশংকাও অনেকে করেছেন এবং কালক্রমে এমন একটা দিন আসবে যে-দিন তুষার আর বরফে সমস্ত ভূমণ্ডলটাই গ্রাস করে ফেলবে। এ-ক্ষেত্রেও সেই আশংকাজনক দিনটির জন্য আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রাণ নিয়ে বসে থাকতে হবে কোটি কোটি বছর।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ

রাজা-রাণী

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

[রাজা আর রাণী। যে রাজত্বে কোন দিন সূর্য্য অস্তমিত হত না, সেই ইংলণ্ডেশ্বর-দম্পতির দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে রাজা-রাণীর দিন-পঞ্জী এই রচনাটি।]

বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে সময় সময় নীতিগত বৈষম্য দেখা দিলেও আসল কাজের সময় উভয়ের ঐক্য যে জোরদার হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রাণী এলিজাবেথের প্রতি আমেরিকানদের যথেষ্ট অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। বড়দিন উপলক্ষে রাজা ষষ্ঠ জর্জ যে বেতার বক্তৃতা দেন, লক্ষ লক্ষ আমেরিকান আগ্রহের সহিত তাহা শোনে।

রাজা তাঁর বেতার-বাণীতে বলেন, "খৃষ্টমাস আনন্দের দিন। কিন্তু পৃথিবীতে যুদ্ধের যে কৃষ্ণমেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আনন্দ অনুভব করা কঠিন। আমাদের দেশবাসীর প্রতি আবার রণক্ষেত্রে প্রাণবলি দেবার ডাক এসেছে। বাঁচার মত বাঁচতে হলে চাই প্রেম, ঘৃণা নয়; চাই সৃষ্টি, ধ্বংস নয়। তবে কি সুদিন, কি দুর্দ্দিন, সব সময়েই খৃষ্টমাস আনন্দ ও আশার বাণী বহন করে আনে।"

তের বছর আগে অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের পর রাজা ষষ্ঠ জর্জ যখন প্রথম খৃষ্টমাসের বাণী দেন, তখন তাঁর বক্তৃতা শুনে কেউ এ কথা ভাবতে পারেনি যে, এই লোকই এক দিন পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনবেন।

ষষ্ঠ জর্জের ন্যায় জনপ্রিয় রাজা বৃটেন এর আগে পায়নি। তিনি ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক জন সভ্য। রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্ত্তা হিসাবে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর মন্ত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ক'রে থাকেন।

কিন্তু বড়দিনের সময় জর্জ আর কারও নন। এই সময়টি তিনি তাঁর পরিবারের লোক-জনদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। এ কথা তিনি এক বার নিজ মুখে স্বীকার পর্য্যন্ত করেছেন। খৃষ্টমাসের সময় তিনি যে রাজা, এ কথা ভুলে গিয়ে তাঁর পরিবারভুক্ত সকলকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকেন।

গত বড়দিনের সময় নরফোকে স্যাণ্ড্রিংহামের প্রাসাদে রাজা জর্জের চার পুরুষের লোকজন সমবেত হয়। ৮৩ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা রাণীমাতা মেরী, রাণী এলিজাবেথ, রাজকুমারী মার্গারেট, রাজকুমারী এলিজাবেথের দু'বছরের ছেলে চার্লস ও চার মাসের মেয়ে আনে—এই চার পুরুষ একত্রিত হন স্যাণ্ড্রিংহামের প্রাসাদে।

রাজা জর্জের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের। রাণী এলিজাবেথের প্রগাঢ় প্রেম রাজা জর্জের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রাজা হিসাবে জর্জ যে সাফল্য লাভ করেছেন, তার মূলে আছে রাণী এলিজাবেথের সাহায্য ও তাঁর ঐকান্তিক প্রেম। রাণী এলিজাবেথ না থাকলে রাজা জর্জ ঠিক পুরোপুরি রাজা হতে পারতেন কি না সন্দেহ।

জর্জের পুরো নাম আলবার্ট ফ্রেডারিক আর্থার জর্জ। ১৮৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স্যাণ্ড্রিংহামে ইয়র্ক কটেজে তাঁর জন্ম হয়। প্রথমে তিনি হন প্রিন্স আলবার্ট, পরে হন ডিউক অফ ইয়র্ক এবং রাজা হবার সময় জর্জ নাম গ্রহণ করেন। শৈশবে আলবার্টের খেলার সাথী ছিল তাঁর তিন ভাই—এডোয়ার্ড (ডিউক অফ উইণ্ডসর), হেনরী (ডিউক অফ গ্লষ্টর) ও জর্জ (৺ডিউক অফ কেণ্ট) এবং এক বোন (প্রিন্সেস রয়্যাল)। এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হবার ফলে তাঁর প্রকৃতি একটু কুনো ধরণের হয়ে পড়ে।

বর্ত্তমান ডিউক অফ উইণ্ডসরের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। বাল্যে ও কৈশোরে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই কলহ হতো এবং শেষ পর্য্যন্ত সে কলহ মারামারিতে পরিণত হতো। এডোয়ার্ড জর্জের লাজুক প্রকৃতির সুযোগ

রাণী এলিজাবেথ

(কেশের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করুন)

নিয়ে প্রায়ই তাকে বিদ্রূপ করতেন এবং তার পরিণাম ছিল ঘুষোঘুষি।

আলবার্টের পিতা রাজা পঞ্চম জর্জের নৌবিদ্যা শিক্ষার প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। তাঁর সন্তানদেরও তিনি নৌবাহিনীতে প্রেরণ করেন। প্রিন্স আলবার্ট অসবোর্ণ ও ডার্টমাউথের নৌবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময় তিনি কলিংউড জাহাজে কাজ করেন। যুদ্ধের পর ক্র্যানওয়েলে রাজকীয় নৌঘাঁটীতে বিমান চালনা শিক্ষা করে তিনি পাইলটের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। ইহার পর তিনি অর্থনীতি অধ্যয়নের জন্য কেম্‌ব্রিজে ভর্ত্তি হন।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ খুব শিকারপ্রিয়। শিকার পেলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর রাজত্ব যদি রসাতলে যায়, তবুও তিনি শিকার ফেলে আসতে পারেন না। তিনি খুব ভাল টেনিস খেলতে পারেন। গলফ এবং ক্রিকেট খেলতেও তিনি জানেন। গত আগষ্ট মাসে যখন তাঁর নাতনী হয়, তখন তিনি শিকারে বেরিয়েছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে আনতে এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

আলবার্টের রাজত্ব লাভ এক অদ্ভুত ঘটনা। তাঁর রাজা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, যদি না এডোয়ার্ড (বর্ত্তমানে ডিউক অফ উইণ্ডসর) প্রেমে পড়ে সিংহাসন ত্যাগ করতেন। সিংহাসনে বসার অল্প দিন পরেই এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। সিংহাসনে বসে আলবার্টের বা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রধান প্রতিবন্ধক হয় তাঁর লাজুকতা ও জিহবার জড়তা। তাঁর এই ত্রুটি বা অযোগ্যতা দূর করার জন্য রাণী এলিজাবেথ ও অষ্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞ লায়নেল লোগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

রাণী এলিজাবেথ না থাকলে জর্জ্জের অবস্থা যে কি হত তা বলা যায় না। তিনি সম্পূর্ণরূপে রাণী এলিজাবেথের উপর নির্ভরশীল। ১৯২৩ সালে ২৬শে এপ্রিল তাঁদের বিবাহ হয়। এলিজাবেথের বয়স যখন পাঁচ তখন আলবার্ট তার প্রেমে পড়েন। আলবার্টের বয়স তখন এগার। এর পনের বছর পরে উভয়ের দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের পর প্রেম ঘনীভূত হয়। কিন্তু লাজুক প্রকৃতির জন্য আলবার্ট এলিজাবেথের কাছে নিজে বিবাহের প্রস্তাব করতে না পেরে এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেন। উত্তরে এলিজাবেথ বলেন—"না, আলবার্টকে নিজে এসে বলতে হবে।" আলবার্টের সঙ্গে প্রণয় হবার আগে আর এক জনের সঙ্গে এলিজাবেথের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং আলবার্টের সঙ্গে প্রেম না হলে তার সঙ্গেই এলিজাবেথের বিয়ে হতো।

বিয়ে হবার পর এলিজাবেথকে রাজকুমার আলবার্টের সঙ্গে অনেক সফরে বাহির হতে হয়। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল নূতন কারখানার উদ্বোধন। এক বৃহৎ সুখী-পরিবারে এলিজাবেথের জন্ম হয়। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শিষ্টাচার শিক্ষা তাঁর আপনা থেকেই হয়েছিল এবং তাঁর প্রকৃতিও হয়েছিল অমায়িক। সর্ব্বদাই তাঁর মুখে হাসি লেগে আছে। তিনি চতুর্দ্দশ আর্ল অফ ষ্ট্রাথমোরের নবম সন্তান। তাঁর মা ছিলেন এক গ্রাম্য পাদ্রীর মেয়ে। তিনি মেয়েকে রান্না, সেলাই, বোনা প্রভৃতি সাংসারিক কাজ এবং নাচ-গানও শিখিয়েছিলেন। এলিজাবেথ ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন এবং জার্ম্মাণ ভাষাও মোটামুটি শিখে নেন।

যৌবনে রাণী

এলিজাবেথ সরল প্রকৃতির ও সদা হাস্যময়ী হলেও তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা এত বেশী যে, তাঁর মেয়েরা পর্য্যন্ত কোন-কিছুর দরকার হলে মাকে না বলে বাবাকে বলাই সুবিধাজনক বলে মনে করে।

জর্জ্জ মেয়েদের খুবই ভালবাসেন। এলিজাবেথ ও মার্গারেটের যে বয়স হয়েছে, এ-কথা তিনি মানতে চান না। এলিজাবেথের যে দু'টি সন্তান হয়েছে, এ যেন তাঁর বিশ্বাস হয় না। এখন বড় মেয়ে এলিজাবেথ আলাদা বাড়ীতে বাস করে, তার আলাদা সংসার—এ সবই রাজা জর্জ্জের অদ্ভুত লাগে। কন্যার প্রতি তাঁর স্নেহ যে কত গভীর তা এ থেকেই বোঝা যায়।

রাজা হবার পর জর্জ্জকে বেশ সাবধানে চলতে হয়। তাঁকে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সেই নিয়মের বাইরে কিছু করবার অধিকার তাঁর নেই। তবে যুদ্ধের পর থেকে তিনি সরকারী ব্যাপারে খানিকটা প্রভাব-বিস্তার করেছেন। ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দল সরকার গঠন করে। মিঃ এটলি রাজার কাছে মন্ত্রীদের নামের যে তালিকা নিয়ে যান, তাতে আর্ণেষ্ট বেভিনকে অর্থ সচিবের এবং হিউ ডাল্টনকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ

সর্ব্বাধুনিক ছবি

দেওয়া হয়েছিল। তালিকা দেখে রাজা জর্জ্জ মিঃ এটলিকে জিজ্ঞাসা করেন, "কা'কে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব'লে মনে করেন?" মিঃ এটলি উত্তরে বলেন, "আর্নেষ্ট বেভিন।" তখন রাজা বলেন, "তবে তাকেই পররাষ্ট্র-সচিব করুন।" শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে তাই করতে হয়।

নিয়ম অনুযায়ী রাজাকে দল-নিরপেক্ষ হতে হবে। কোন দলের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা চলে না। তবে এ-কথা ঠিক যে, তিনি যদি সাধারণ নাগরিক হতেন, তা'হলে রক্ষণশীল দলকেই ভোট দিতেন। তা বলে এটলির সঙ্গে তাঁর কোন অসদ্ভাব নেই। এটলি সপ্তাহে দু'বার তাঁর কাছে আসেন। কেবল তফাৎ এই যে, চার্চ্চিলকে তিনি আদর করে উইনষ্টন বলে ডাকেন আর এটলিকে তিনি মিঃ এটলি বলে সম্বোধন করেন।

বর্ত্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি মাত্র লোক তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি হলেন, স্বাস্থ্য-সচিব মিঃ এনুরিন বিভান। প্রাসাদের অনুষ্ঠানে যে পোষাক পরে যোগ দেবার নিয়ম, বিভান তা কিছুতেই পরবেন না। তিনি বলেন, ওয়েলসের খনি-শ্রমিকরা তাঁকে পোষাক প'রবার জন্য লণ্ডনে পাঠায়নি। কেবল মাত্র একবার রাজার সঙ্গে বিভানের অমায়িক আলোচনা হয়েছে। বিভান একবার সাহস ক'রে রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার তোত্‌লামি সারলো কি ক'রে? আমার তোত্‌লামি আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও সারাতে পারিনি।" রাজা এই প্রশ্নে খুব খুশী হয়ে উত্তর দেন।

রাজা জর্জ্জ দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করেন। তিনি যেখানেই যান, সরকারী কাগজপত্রপূর্ণ চামড়ার ব্যাগ তাঁর সঙ্গে যাবে। কখনও কখনও তিনি শুয়ে শুয়েও সরকারী কাগজ-পত্র দেখেন। যুদ্ধের সময় স্নানের কক্ষেও তাঁর কাছে সরকারী কাগজ-পত্র পাঠান হ'ত। খৃষ্টমাসের সময় স্যাণ্ড্রিংহামে বিমানযোগে তাঁর কাছে সরকারী চিঠিপত্রের বাক্স পাঠান হয় এবং তিনি নিজে তাঁর ঘড়ির চেনের সঙ্গে আটকানো নিরেট সোনার চাবি দিয়ে সেই সব বাক্স খুলে চিঠিপত্র দেখেন। প্রাতরাশের পর প্রাইভেট সেক্রেটারী সার আলানের সাহায্যে তিনি চিঠিপত্র দেখেন। ব্যক্তিগত চিঠিগুলি তিনি নিজে খোলেন। প্রতিদিন তিনি প্রায় পঞ্চাশ-খানি করে চিঠি দেখেন। সংবাদপত্রে রাজ-পরিবারের যে সব ফটো ছাপা হয়, সেগুলি তিনি পরীক্ষা করেন। ফটো তোলার ব্যাপারে তিনি খুব হুঁসিয়ার। কি ভাবে ও কি সাজে তাঁকে ঠিক মানাবে সে বিষয়ে তিনি খুব সচেতন। মন্ত্রীদের লিপি, তারবার্ত্তা ও দূতগণের প্রেরিত গোপনীয় সংবাদ তিনি প্রাপ্তির দু'ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ফেলেন। নিজের বক্তৃতাগুলি তিনি খুব যত্ন সহকারে খসড়া করেন এবং তা ক্রমাগত পাঠ করে দুরস্ত করে নেন। রাণী এলিজাবেথকেও তিনি বক্তৃতা শুনিয়ে দেখান যে, ঠিক হল কি না।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দেখা-সাক্ষাৎ আরম্ভ হয়। বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। অন্ততঃ একবারও তাঁকে বাইরে কিছু পরিদর্শন করতে যেতে হয়। তিনি ৫১টি সামরিক দলের নেতা। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, নেপালী বাহিনীর অবৈতনিক প্রধান সেনাপতির পদ। এই সব সামরিক দল পরিদর্শনের সময় তিনি কাউকে খাতির করেন না। টুপির উপর দু'টি ব্যাজ পরার জন্য তিনি একবার ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারিকে পর্য্যন্ত তিরস্কার করেছিলেন।

বৈকালিক চা-পানের পর রাজা জর্জ্জ আরও সরকারী কাগজ-পত্র এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করেন। খুব পড়াশুনা ক'রে তিনি তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। মন্ত্রীদের চেয়ে অন্ততঃ একটি বিষয়ও বেশী জেনে তিনি তাঁদের তাক্ লাগাতে চান। একবার তিনি এক মন্ত্রীকে বলেছিলেন, "মন্ত্রীরা আসেন এবং যান, কিন্তু রাজা চিরদিনই থাকেন।"

সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের ব্যাপারে রাণীও খুব উৎসাহী। যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর মেয়েদের উইণ্ডসরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সাঁজোয়া গাড়ীতে চেপে লণ্ডনে ঘুরে বেড়াতেন। রাজা তাঁকে তিনটি নারী-বাহিনীর প্রধান অধিনায়িকা নিযুক্ত করেন।

সকালে এক জন পরিচারক রাজা জর্জ্জের ঘুম ভাঙ্গায়। নিদ্রা-ভঙ্গের পর জর্জ্জ নিজেই দাড়ি কামান। সকাল সাড়ে ৮টায় প্রাতরাশের পর রাজা 'টাইমস' কাগজখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠা পাঠ করেন। রাজা ও রাণী এক টেবিলে বসে মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করেন। খাদ্য সম্বন্ধে রাজা ও রাণীর বিশেষ কোন রুচি নেই। তাঁরা প্রায় একই ধরণের খাদ্য রোজ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ন সাড়ে ৪টায় বৈকালিক চা-পান। রাণী ও রাজকুমারী মার্গারেট তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। রাজকুমারী এলিজাবেথ সপ্তাহে দু'বার রাজার সঙ্গে চা-পান করেন। রাণী চায়ের সঙ্গে কেক খেতেন, এখন আর খান না। প্রাতরাশও তিনি ত্যাগ করেছেন অতিরিক্ত স্থূল হওয়ার জন্য। বর্ত্তমানে রাণীর ওজন ১৬০ পাউণ্ড। ওজন কমাবার জন্য তিনি খাওয়া কমাচ্ছেন। রাত্রি সাড়ে ৮টায় নৈশ ভোজন করেন রাজদম্পতী। সপ্তাহে দুবার তাঁরা অতিথিদের আমন্ত্রণ করেন এবং রাণী নিজে খাদ্য-তালিকা ঠিক ক'রে দেন। নৈশ আহারের পর আর কোন সরকারী কাগজপত্র না থাকলে রাজা জর্জ্জ টেলিভিসন অথবা রেডিও শোনেন। রাজদম্পতী অপেরা বা কন্সার্ট পছন্দ করেন না। তাঁরা নিয়মিত ভাবে তাস খেলেন। ছুটির সময় বালমোরাল প্রাসাদে তাঁরা রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত অতিথিদের নিয়ে আনন্দ করেন। এ সময় রাণীর আর জ্ঞান থাকে না। অতিথিরা মধ্যে মধ্যে তাঁকে স্কার্ট তুলে নেচে বেড়াতে দেখে বিস্মিত হন।

রাজা জর্জ্জ বুদ্ধিজীবিদের পরিহার ক'রে চলেন, কারণ তাঁর নিজের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ নয়। সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর জর্জ্জ সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এক রকম ত্যাগ করেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তাঁর খুব নজর। তিনি বছরে বারটি স্যুট কেনেন এবং ভ্রমণে বার হলে আরও বেশী স্যুটের দরকার। দক্ষিণ-আফ্রিকা পরিভ্রমণের সময় তিনি আরও বারটি স্যুট কিনেছিলেন। তাঁর দর্জ্জির নাম বেনসন এণ্ড ক্লেগ। রাণী এলিজাবেথও খুব পোষাকপ্রিয়। তিনি অধিকাংশ সময়েই অবসরপ্রাপ্ত অভিনেত্রীর ন্যায় পোষাক পরে থাকেন। জর্জ্জ নিজ খরচের জন্য বছরে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা পান। ১৯৩৭ সালে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট হয়। তার পর থেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও রাজার প্রাপ্য আয় বৃদ্ধি পায়নি।

ছোটদের আসর
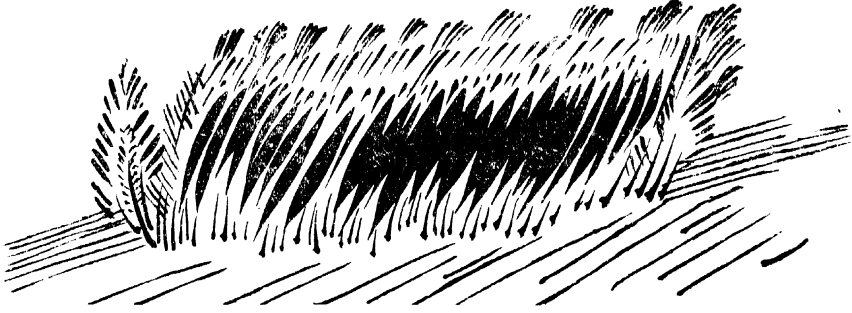
কেন এমন হয় ?

[একটি বিদেশী গল্প অনুসরণে]

সুখেন্দু দত্ত

লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড অঞ্চলটা হচ্ছে সেখানকার যত গরীবদের আড্ডা। কারখানার মজুর আর কম মাইনের কেরাণীরাই সব থাকে এখানে। অভাব আর অনটন হচ্ছে মানুষগুলোর জীবনের নিত্যসঙ্গী। তাদের চারি দিকে শুধু অভাবের কান্না আর দারিদ্র্যের অপমান। ভাল করে খাওয়া জোটে না, পরবার জোটে না, শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সব সময় ঘরে আগুনটুকু জ্বালিয়ে রাখবার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। এমনি ভাবে জীবনটাকে একটা বোঝার মতই বয়ে চলে তারা।

এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে এই ইষ্ট এণ্ডেই একটা জীর্ণ কুটীরে বসেছিল মা আর ছেলে। শীতে কাঁপছিল তারা দু'জনেই। বাইরে কন্‌কনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সজোরে। কিন্তু শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘরে চুল্লী জ্বালিয়ে রাখার মত সামান্য কয়লাও ছিল না তাদের ঘরে।

আর থাকবেই বা কোথা থেকে? ছেলেটির বাবা তিন মাস যাবৎ বেকার। এক কয়লার খনির মজুর ছিলেন তিনি। কিন্তু সে বছর কয়লার বাজারে মন্দা দেখা দিল। কারণটা অবশ্য আর কিছুই নয়। খনিগুলোতে সে বছর এত কয়লা তোলা হয়েছিল যে, বাজারে কয়লার দাম গেল পড়ে। মালিকেরা তখন আবার দাম চড়াবার জন্য খনি থেকে কয়লা কাটা বন্ধ রাখবার হুকুম দিলেন। ফলে বহু খনি-শ্রমিক বেকার হল, অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেল তাদের ঘরে-ঘরে। ছেলেটির বাবার ভাগ্যেও ঘটেছিল এই একই ব্যাপার। লণ্ডনের সেই শীতের রাত্রেও তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কোন রকম একটা কাজ জোটাবার আশায়।

হঠাৎ জানালা দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা এসে লাগল। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ছোট ছেলেটি তার মাকে জিজ্ঞেস করল: আচ্ছা মা, সবার ঘরেই তো দেখি চুল্লী জ্বলছে। তবে আমাদের ঘরে জ্বালাও না কেন?

মা জবাব দিলেন: কি করব বাবা, চুল্লী জ্বালাবার কয়লা পাব কোথায়? ঘরে যে এক টুকরো কয়লাও নেই আমাদের।

—সবার থাকে, আমাদের কেন নেই মা?

—আমরা যে বড্ড গরীব, বাছা!

—কেন আমরা গরীব, মা?

—বাঃ, তোমার বাবার কাজ নেই যে!

—কেন নেই?

—নেই কেন? ওরা বলছে, এ বছর খনি থেকে এত কয়লা তোলা হয়ে গেছে যে, কয়লার পাহাড় জমে উঠেছে একেবারে। এত কয়লার তো আর দরকার নেই, কিনবার লোকও নেই। এ ভাবে চললে শেষ পর্য্যন্ত কয়লার পাহাড়গুলোকে নদীর জলেই ফেলে দিতে হবে। কারণ অত কয়লা দিয়ে আর কি হবে, কিনবে কে? সেই জন্যই খনিতে কয়লা-কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে, ফলে তোমার বাবাও বেকার হয়ে পড়েছেন।

—এটা কেমন হল মা? ফেলে দেবার মত এতই যদি বেশী হয়ে থাকে কয়লা, তাহলে আমরা পাচ্ছি না কেন? বেশী কয়লা তোলা হয়ে গেছে বলছ, তাই বাবার চাকরীও গেল। কিন্তু কৈ, আমরা তো কয়লার অভাবে চুল্লীটা জ্বালিয়ে একটু আগুনও পোয়াতে পারছি না?

মা এবার বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাই তো, কি বোঝাবেন তিনি ছেলেকে? কেন এটা হয়? অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বললেন: কি জানি বাছা! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, অত-শত বুঝি না। বড় হয়ে বই পড়ে পণ্ডিত হলেই সব জানতে পারবে এখন তুমি। এখন তো ঘুমোও।

ছেলেটি মায়ের কথা শুনল, কিন্তু খুশী হতে পারল না। বড় হয়ে জানতে পারবে, এখন কেউ-ই বলতে পারে না? বাবাও না? কিন্তু কেন? কেন?

ভাবতে ভাবতে মায়ের কোলে মাথা রেখে ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। বাইরে বাতাসের বেগও তখন অনেকটা কমে গেছে, যেন লক্ষ্মী ছেলেটির মত চুপ করে আছে।

আচ্ছা বল তো, ছেলেটার মা না হয় "মুখ্যু-সুখ্যু" মানুষ ছিলেন বলে কিছু বোঝাতে পারলেন না তাঁর ছেলেকে। কিন্তু তোমরা বলতে পার কি, কেন এমন হয়?

মাতৃভাষা-প্রেমিক গান্ধীজী

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

বাঙ্গালী কবি গেয়ে গেছেন—

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?"

মাতৃভাষায় কথা বলতে না পারলে মানুষ স্বস্তি পায় না, নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু পরাধীন

ভারতে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ইংরেজী ভাষার প্রচলন ছিল সমধিক। ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারা আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন বলে মনে করা হত এবং শিক্ষিতাভিমানী ভারতীয়েরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজীরই ব্যবহার করতেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রথা আদৌ পছন্দ করতেন না এবং ভারতীয়দের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করতেন।

১৯১৫ সালের প্রথম দিকে গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সার্থক ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি ভারতীয়দের স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এসেছেন; তাই সর্ব্বত্র তাঁর নাম, সকলের মুখেই এই ভারতীয় ব্যারিষ্টারের কাহিনী। বোম্বাই বন্দরে যখন জাহাজ থেকে তিনি অবতরণ করলেন তখন একদল সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক জন পার্শী সাংবাদিক। সকলের আগে গান্ধীজীর মতামত সংগ্রহ করবার অত্যুৎসাহে তিনি ভিড় ঠেলে গান্ধীজীর সামনে দাঁড়ালেন এবং ইংরেজীতে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন।

গান্ধীজী কিন্তু পার্শী সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে বললেন, "ভাই, তুমি এক জন ভারতীয়, আমিও এক জন ভারতীয়। তোমার মাতৃভাষা গুজরাতী, আমার মাতৃভাষাও তাই। তা'হলে তুমি তোমার প্রশ্নগুলি কেন ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি মনে কর যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাস করার ফলে আমি আমার দেশের ভাষা ভুলে গেছি? অথবা, আমি ব্যারিষ্টার বলে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বললেই আমার প্রতি বেশী সম্মান দেখান হবে?"

সাংবাদিকটি বড় লজ্জিত হলেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা গুজরাতীতেই চালালেন। পরের দিন তাঁর সংবাদপত্রে তিনি এই ঘটনাটির প্রতি পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় ব্যারিষ্টারের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের কাহিনী পড়ে সকলে মুগ্ধ হল এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে কয়েক দিন পর্য্যন্ত গান্ধীজীর প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীঅমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন একটি স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা।······

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন সেই সভায়।···

আনন্দ-উৎসব হয়ে যাবার পর এবার পুরস্কার দেবার পালা। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পড়া-শোনায় যারা ভাল তাদের নাম ডাকতে লাগলেন। সবাই একে একে পুরস্কার নিয়ে গেল। এর পর তিনি পড়া-শোনায় এবং শান্তশিষ্টতায় সেই স্কুলের সব থেকে ভাল ছেলে টমাসকে একটি বিশেষ পুরস্কার দিলেন।

ছেলেটি চলে যাবার পর হঠাৎ সভাপতি মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন। সবাই অবাক্, এখনও তাঁর বক্তৃতা দেবার সময় আসেনি।···কাজেই সকলে একটা অদ্ভুত কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সভাপতি মহাশয় চারি দিকে একবার চেয়ে নিয়ে, মৃদু হেসে বললেন—এই স্কুলের সব থেকে যে ভাল ছেলে তাকে পুরস্কার দিয়েছেন স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ। আমিও একটি পুরস্কার দেব। তবে ভাল ছেলেটিকে নয়—সব থেকে দুষ্ট ছেলেকে। ছাত্রদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে একটি পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছেলে সভাপতি মহাশয়ের আসনে এসে হাজির। ভদ্রলোক ছেলেটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন।

তোমরা হয়ত ভেবে অবাক হচ্ছ এমন অদ্ভুত লোক কেউ আবার আছে না কি?

হ্যাঁ, এমন অদ্ভুত লোক এক জন ছিলেন। যাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি লেখা মনে হত অদ্ভুত, বিশ্রী। কিন্তু শেষে তাঁর সেই অদ্ভুত কথাগুলি কঠোর বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। এই অদ্ভুত লোকটিকে জানতে কার না ইচ্ছে হয়? জান এই অদ্ভুত লোকটির নাম—জর্জ্জ বার্ণাড শ'।

অরবিন্দ কে

সন্ধ্যারাণী ঘোষ

হে শিল্পী, তোমায় প্রণাম। হে ন্যায়াধীশ, তোমায় প্রণাম, হে গম্ভীর, তোমায় প্রণাম। আমি তোমাকে দেখিনি শুধু শুনেছি তোমার অমোঘ বাণী। তোমার বাণী শুনে মনে হয়েছে তোমার মাঝে আবির্ভাব হয়েছে পরম পুরুষের, নিশ্চেতন যুগান্ধকার চূর্ণ করে আজ নবারুণের উদয় হবে। হে প্রভাতীর সূচনা, তোমায় প্রণাম।

ওগো নৈর্ব্যক্তিক, তোমাকে যে অপ্রকাশ রাখতেই ভাল লাগে। শুনতে পাচ্ছি, হিমালয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে এক সৌম্য কান্তি যুগদেবতা বলছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত···প্রাপ্য বরান্ নিবোধত······।

হে জীবানন্দ, তোমায় প্রণাম।

ইতিহাসের পাতায় দেখেছি, আদিম যুগের অধ্যায়ে তোমার নাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে লিখিত আছে। তার তপস্যা, তার তেজোময়তা আজও ভারতকে আত্মবিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করছে প্রহরীর মত। হে সাগ্নিক, তোমায় প্রণাম।

হে যাজ্ঞিক, হে ঋত্বিক্, হে ত্যাগী, হে যোগী—তোমার ধ্যান-গম্ভীর মুখ হতে যেন শুনতে পাচ্ছি তোমার আশীর্ব্বাণী···

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ শিবাস্তে সন্তু মানবাঃ।
শিবাস্তে সন্তু সঙ্কল্পাঃ শিবা বৈ সন্তু তে ক্রিয়াঃ।

তোমাদের সকল পথ কল্যাণযুক্ত হোক, সকল মানবের সঙ্গে তোমাদের কল্যাণ যোগ হোক, তোমাদের সকল সঙ্কল্প কল্যাণময় হোক, তোমাদের সকল সাধনা কল্যাণে সার্থক হোক।

দেখছি যেন তোমার আশীর্ব্বাণী মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, পাপী-পুণ্যবান, সক্ষম-অক্ষম, ভোগী-যোগী, শিশু-বৃদ্ধ আজ সবাই মেতেছে তোমারই উৎসারিত দৈবী বাণীতে। হে ধাতা, তোমায় প্রণাম।

'হও অহিংস'

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

"শ্রীগৌরাঙ্গ থাকিয়া উড়িষ্যায়—
ভীরু কাপুরুষ করেছেন জাতিটায়।
ভগবৎপ্রেমে মাতাইয়া সারা দেশ
ক্ষাত্র শক্তি করেছেন নিঃশেষ।"
এ কথা প্রচার করিছে বারম্বার
বুদ্ধিমন্ত উড়িষ্যা সরকার।
জাতীয়তাবাদী প্রাদেশিকতার চাঁই
তাহাদের হাতে কারো নিস্তার নাই।
হয় ত বলিবে—বলিতে নিপুণ ঝুটা,
জগন্নাথই জাতিকে করেছে ঠুঁটা।
করেছেন জড়, নির্জীব জবু-থবু
উত্থানের আর আশাই নাহিক কভু।
আমিষ-বিহীন 'পখাল প্রসাদ' বাঁটি
জাতি ও দেশকে করে দিয়েছেন মাটি।
'হও অহিংস' গান্ধীর উপদেশ,
বীর জাতিটাকে করিয়া দিয়াছে মেষ।
অপপ্রচারী এ সব কাণ্ডজ্ঞে হাতী
কি করে কি বলে ভুয়া দম্ভেতে মাতি!
যীশু প্রেমের ধর্ম্ম, অমৃত বৎ
কই তো মানবে করিতে পারেনি সৎ?
ক্ষমার মন্ত্রে কই তো হয়নি হংস,
বাড়াইছে শুধু বধ্যমঞ্চ ক্রুশ।
জাতির প্রকৃতি বদল হবার নয়
দেবতা গড়ালে বেঁকিয়া বানর হয়।

আমাদের রবি

প্রভাত বসু

আমি যদি জন্ম নিতেম বিশ্বকবির কালে
পরাণখানি ভরত' আমার ছন্দে-সুরে-তালে।
শান্তিনিকেতনের মাঠে ছায়ায় ঘেরা পল্লীবাটে
কাটত জীবন গান গেয়ে আর কাব্য হাতে নিয়ে।
সন্ধ্যাবেলা 'উদয়নে' জমত সভা কবির সনে,
ধন্য হ'ত জীবন আমার কাব্য-সুধা পিয়ে।
গুরুদেবের আশীষ-টীকা আঁকা রইত ভালে—
আমি যদি জন্ম নিতেম বিশ্বকবির কালে।
সোনার তরী বেয়ে যেতাম দূর 'মহুয়া' বনে
'পূরবী'তে বাজত 'সানাই' দিনশেষের সনে।
'কল্পনা'তে কোন্ 'মানসী' সঙ্গোপনে রইত বসি'
পলাতকা হিয়ার কানে কইত বনবাণী'।
'পত্রপুটে' 'গীতাঞ্জলি' অর্ঘ্য দিয়া যেতাম চলি
মর্মে নিয়ে 'ক্ষণিকা'রি মধুর স্মৃতিখানি।
'খেয়া'ঘাটের কথা তখন রইত না আর মনে—
সোনার তরী বেয়ে যেতাম দূর মহুয়া বনে।
এমনি করে হাজার হাজার বছর কেটে যাবে,
কবির স্মৃতি আজো যেমন তেমনি পূজা পাবে।
শুধু পঁচিশ বৈশাখেতে ধরার কোলে আসন পেতে
সোনার তপন আসবে না আর নেমে মাটির 'পরে।
মানসলোকে জন্ম কবির মর্মবাণী এই সুগভীর
রইবে লেখা ইতিহাসে চিরকালের তরে।
হাজার কেন—লক্ষ বছর যখন কেটে যাবে
কবির স্মৃতি আজো যেমন তেমনি পূজা পাবে।

সূর্য্য সেন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মাষ্টার-দা, মাষ্টার-দা, লুকিয়ে কোথা রও?
স্বাধীন দেশে আজকে এসে হঠাৎ উদয় হও?
আজ তোমায় সেলাম দেবে যত পুলিশ-সেনা।
তোমার গলায় মালা হবে লাখ টাকাতে কেনা।

পিছু-পিছু ছুটবে তোমার বিচারকের দল।
তোমার আঁখির প্রসাদ লাগি জুড়বে করতল।
দেখে যেন আজ দেখুক এসে মির্জ্জাফরের দশা।
দেশের লোক তোমার কথায় করছে ওঠা-বসা।

দেশ করিতে স্বাধীন তুমি লুঠলে অস্ত্রখানা
চট্টগ্রামের সে-কাহিনী সবার আছে জানা।
জালালাবাদ পাহাড় থেকে লড়লে পুলিশ সনে
সূর্য্য সেনের দলের হাতে তারা প্রমাদ গণে।

চারটি বছর ঘোল খাওয়ালে ঝানু গোরার দলে।
আজকে দেশের স্বাধীনতা এলো কি তার ফলে?
ফাঁসির কাঠেও গাইলে তুমি মরণ-জয়ের গান।
আমরা জানি তুমি অমর, উদার, মহাপ্রাণ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ

শ্রীপরীরাণী সেন

'উচ্চশিক্ষিতা' বলতে বি-এ ও এম্-এ ডিগ্রী-প্রাপ্তা, 'শিক্ষিতা' বলতে ম্যাট্রিক্ ও আই-এ উত্তীর্ণা, আর 'মধ্যম শিক্ষিতা' বলতে ম্যাট্রিকের নিম্ন-সীমা অবধি পড়া মেয়েদের এখানে ধরে নেওয়া হবে। আমাদের সমাজ সাবেক যুগের ন্যায় এখন ঠিক অতটা অচলায়তন নেই, আবার বর্তমান যুগের সঙ্গে সর্বাংশে সামঞ্জস্য-বিধান করে সচল ও সহনশীল হয়েও উঠতে পারেনি ; বস্তুতঃ সমাজ-চেতনা সত্যই এখনো পূর্ণ ভাবে জাগ্রত হয়নি। তাই দেখতে পাই, কোন কোন দিকে আমাদের সমাজের অগ্রগতি যেমন অতীব আশাপ্রদ, কোন কোন দিকে এর বিস্ময়কর জড়ত্বও দস্তুরমত ভয়াবহ। ইংরিজীতে যাকে বলে transition period, আমাদের সমাজের এখনো চলেছে সেই পর্ব ; আর এ পর্বটি পার হতে গেলে, এক দিকে টানতে থাকে উৎসাহের জোয়ার, আর অন্য দিকে টানতে থাকে অতীতের প্রতি সম্মোহের ভাঁটা। নারীর ক্ষেত্রে সমাজ-চেতনার এরূপ উত্থান-পতন উৎকট আকারে এখনো প্রত্যক্ষ করা যায় গ্রামাঞ্চলে, সহরে অবশ্য নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণটাই উল্লেখযোগ্য।

মেয়েদের শিক্ষায়, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক'-বছর আগেও বাপ-মায়ের মনে যে আতঙ্ক ছিল, তা আজ-কাল উঠে যাওয়ার মধ্যে—অন্ততঃ সহরে তো বটেই ; বরং এ আগ্রহই এখন প্রবল হয়েছে যে, যে-কোন প্রকারে মেয়েদের যতটা সম্ভব সুশিক্ষিতা করে তুলতেই হবে। শিক্ষারই প্রতি আকর্ষণ হেতু মেয়েদের শিক্ষিতা করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে যতটা, বোধ হয় তার চেয়ে বেশী আগ্রহ হলো এজন্য যে, শিক্ষিতা করে তুলতে পারলে তাদের বিয়ে দেওয়া হবে সহজতর। আবার ইদানীং অনেক গরীব বাপ-মা মেয়েদের শিক্ষিতা করে তুলে, তাদের চাকুরি দ্বারা সংসারে আর্থিক সাহায্য পাবার আশাও করে থাকেন। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে শিক্ষিতা মেয়েদের সুযোগ-সম্ভাবনা কি সব দিকেই বেড়ে যায়? মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় না, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে।

সত্য কথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, বিয়ের বাজারে বাপ-মা, এমন কি, অধিকাংশ যুবকও উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের কতকটা নিষিদ্ধ পণ্যের মত জ্ঞান করেন। তরুণদের এ মনোভাব ঐ সব মেয়েদের প্রতি ঘৃণা থেকে সঞ্জাত নয় ; মধ্যবিত্ত ও গরীবের ঘরে সম বা উচ্চতর শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে পর্যন্ত এরা তেমন খাপ খাওয়াতে পারবে না, এ ধারণাই তাদের উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের এড়িয়ে চলবার একটি প্রধান কারণ। তাছাড়া, ২২।২৪ বছর বা ততোধিক বয়স্কা মেয়েদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও দেহের বাঁধ যে অনেকখানি শিথিল হয়ে যায়, এটাও ওদের এড়িয়ে চলবার আর একটা সত্যিকারের কারণ। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে কতকটা নির্ভরতার সঙ্গেই বলা চলে যে, খুব অল্পসংখ্যক পরিবারে ছাড়া, উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সমাজ এখনো মোটেই স্বাগত করতে চায় না। এদিক দিয়ে বিয়ের বেলায় শিক্ষিতা মেয়েরা সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ লাভ করে থাকে ; মধ্যম-শিক্ষিতা মেয়েরাও বহু ক্ষেত্রে সহজে ভালো ঘর-বর পেয়ে যায়।

উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে যে-সব সমালোচনা হয়ে থাকে তার মধ্যে কতগুলো হলো—তাদের সাংসারিক কাজকর্মে নিপুণতার এবং বহু ক্ষেত্রে ইচ্ছার অভাব, সজ্জা ও প্রসাধন-প্রিয়তা, অত্যধিক স্বাধীন মতামত, অনেকেরই স্বাস্থ্যহীনতা, সংসারে পাঁচ জনের সঙ্গে এমন কি অনেক স্থলে স্বামীর সঙ্গেও বনিয়ে চলবার অক্ষমতা প্রভৃতি। এগুলোই প্রধানতঃ তাদের ভালো ঘর-বর লাভের অন্তরায় হয়ে থাকে।

সমাজ যখন অধিক শিক্ষিতাদের সবটুকু অভিনন্দন জানাতে চায় না, সে-ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া মেয়েদের ডিগ্রীলাভের পথে খুব বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত ; কারণ ভবিষ্যতের আসল লক্ষ্যস্থলটুকুতে ফাঁকির অঙ্ক বসে গিয়ে জীবন অশান্তিময় হয়ে না যায়। বাপ-মা'র দায়িত্ব এখানে অনেক, তাই তাঁদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির স্বচ্ছতা অতীব প্রয়োজন। তাঁদের ভালো করে বুঝতে হবে যে, বাঙালী সমাজের এখনো পূর্ণ জাগরণ হয়নি, আর তার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অতি-প্রধান একটি হলো দেশের বর্ণনাতীত আর্থিক দুরবস্থা।

যেখানে পাত্রের বিয়ে প্রাচীন রীতিতে ঘটে থাকে, অর্থাৎ যেখানে তা সর্বাংশে বা প্রধানতঃ অভিভাবকের মতসাপেক্ষ ব্যাপার, সেখানে উল্লিখিত বাধাগুলোর প্রায় সব ক'টাই উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের

অল্প-বিস্তর বিপক্ষেই যায়। এখনো বোধ হয় শতকরা পঁচাত্তরটি বিয়েতে বাপ-মায়ের মতামতই জয়ী হয়ে থাকে। বিয়েতে স্বাধীন মতাবলম্বী সুশিক্ষিত যুবকগণ অবশ্য এ-সব বাধার সবগুলোকে গুরুত্ব দেয় না বা কোন-কোনটিকে মোটেই আমল দেয় না। প্রকৃতপক্ষে এ-সব ব্যাপার তরুণদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির ও মনোবলের উপর কতকটা নির্ভরশীল। তবে স্বাস্থ্যহীনা ও বিগতযৌবনা মেয়েদের ঘরে আনতে প্রায় সব যুবকই আপত্তি করে এবং বর্ণিত অপরাপর অন্তরায়গুলোর অত্যাধিক্যযুক্তা তরুণীকেও তারা এড়িয়ে চলতে চায়।

এক জন গ্রাজুয়েট বা এম-এ পাশ তরুণী দু'বেলা রান্না করা, মশলা পেষা···প্রভৃতি সাংসারিক অত্যাবশ্যক কাজে দিবাভাগের অধিকাংশ সময় ব্যয় করবে—এটা আশা করা শুধু বুড়ো বাপ-মা'র পক্ষে নয়, অধিকাংশ যুবকের পক্ষেও কঠিন। ধনীর গৃহে স্ত্রীরূপে বা পুত্রবধূরূপে এরা হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে পারে, কিন্তু হেঁসেল-সর্বস্ব মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে এরা সর্বক্ষেত্রে না হলেও প্রায়-সর্বক্ষেত্রে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না বলে পরিবারে দারুণ অশান্তির মূল-হেতু হয়ে দাঁড়ায়।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, উচ্চশিক্ষিতাদের মধ্যে শতকরা অত্যন্ত বড় একটা অংশ বয়োধিক্যহেতু, বেশী পড়াশুনোর জন্য ও ঘন ঘন পরীক্ষার চাপে স্বাস্থ্য, কোমলতা ও কমনীয়তা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। অবশ্য সেটা তাদের কোন দোষ নয়। কিন্তু শিক্ষিতা ও মধ্যম-শিক্ষিতাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যে অপেক্ষাকৃত ভালো থাকে, এ কথাও সবাই নিশ্চয় মেনে নেবেন। মুষ্টিমেয় ধনীদের কথা আলাদা, কিন্তু প্রায় সাড়ে পনেরো আনা বাঙালী যেহেতু মধ্যবিত্ত ও গরীব, তাই সে সব পরিবারে চাই স্বাস্থ্যবতী, শ্রমশীল ও সন্তানপালনক্ষম বধূ এবং দরিদ্র স্বামীর সর্বতোভাবে সহধর্মিণী হবার যোগ্যতাসম্পন্না স্ত্রী। এরূপ স্থলে স্ত্রী বা বধূর স্বাস্থ্যহীনতা, কর্মকুণ্ঠা, রুচি-বিকার, অতি-আধুনিকতা, প্রগতিবাদের বুলির অতি উৎকট অনুরক্তি ও নানা বল্পনাবিলাস···একটুও অভিনন্দিত হতে পারে না—তা উচ্চশিক্ষিতা, শিক্ষিতা, অল্পশিক্ষিতা যে শ্রেণীর তরুণীই তারা হোক। অভাব-অশান্তি-প্রপীড়িত ও শ্রম-সর্বস্ব এক-একটি বাঙালী পরিবারে নানা দায়-দায়িত্বের পারাবার সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে হলে, এরূপ ফুটো নৌকোযোগে কখনো তা সম্ভব হয় না বলেই বেশীর ভাগ স্থলে ভরাডুবি হতে দেখা যায়। এ সব দিকে সুবিচার ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করে বলতে গেলে বলা উচিত হবে যে, উচ্চশিক্ষিতাদের চেয়ে নিম্নতর শিক্ষিতা মেয়েরাই মাতা, স্ত্রী ও পুত্রবধূ হিসেবে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্না হয়ে থাকে; মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে প্রথমোক্তারা প্রায়শঃই 'মিসফিট্' বলে উপেক্ষিতা হয়। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, মার্জিতরুচি পরিচ্ছন্ন অভ্যাস ও প্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা স্বামীর তৃপ্তিসাধনের একচেটিয়া সুখ্যাতি একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীরাই দাবী করতে পারে না; কারণ, এ সব দিকে এ-যুগে সর্বশ্রেণীর মেয়েরাই মোটামুটি সচেতন।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার নালিশ, ছোট-বড় বহু ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে মত-সংঘর্ষ, উচ্চশিক্ষার অহঙ্কারে বা তার অনিবার্য পরিণতি-স্বরূপ মনের অনেকখানি বহির্মুখী ভাব, স্বামীর দুর্দৈবের দিনে অন্তরের দিক থেকে ষোল আনা দরদ দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে না পারার গ্লানি, পাঁচ জনের মনোরঞ্জন দ্বারা সংসারে সামঞ্জস্য, সুতরাং শান্তি বজায় রাখার অক্ষমতা—এ সব নিন্দাত্মক ব্যর্থতা সম্পূর্ণ অমূলক ভাবে ডিগ্রীধারিণী তরুণীদের প্রতি আরোপিত হয় না; বিশেষতঃ ঐ সব বিষয়ে যখন অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতাদের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা যায়।

মানুষ হিসেবে ভালো-মন্দ হওয়া কতকটা পিতৃকুলের পারিবারিক আবহাওয়ার এবং কতকটা তাদের নিজ নিজ জন্মগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাই সুশিক্ষিতা ও কম শিক্ষিতা উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আশাতীত ভালো বা আশাতীত মন্দ নারী দেখতে পাওয়া যায়। সে-সব বাদ দিয়ে বললে এটুকু বোধ হয় সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তা বধূ, মাতা, স্ত্রীগণই দরিদ্র বাঙালীর বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার জীর্ণ সংসারগুলোর বিভিন্ন দিকে অধিকতর সুখ-শান্তি বহন করে আনতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত। আমাদের ঘর-সংসারের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ও পুরুষদের জন্য গড়া বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাও উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতার জন্য পরোক্ষ ভাবে অনেকখানি দায়ী, উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরাই সবটুকু নয়। নানা দোষ-দুষ্ট শিক্ষার যেরূপ যন্ত্রের মধ্যে তাদের ফেলে নিষ্পেষিতা করা হয়, তারা তদনুযায়ী স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই নবজন্ম লাভ করে এবং তা বহু ক্ষেত্রে হয় অপূর্ব, অদ্ভুত! তাই কুখ্যাত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার সকলের আগে। এ স্থলে University Commission Report এর প্রাসঙ্গিক অংশ স্ত্রী শিক্ষা সংস্কারের দিকে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করছে; দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে কি হয়। পাত্র-পাত্রীর শিক্ষার তারতম্য বিচার করে বলতে গেলে বলা যায়, সম-শিক্ষিত বা ঈষৎ কম শিক্ষিত যুবকেরা যদি বি-এ, এম-এ পাশ করা মেয়েদের ঘরে আনতে ভয় পায়, সেটাকে তেমন অযৌক্তিক কিছু বলা চলে না। শুধু বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা নয়, সমাজের উদারতার অভাবও নিশ্চয় উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য দস্তরমত দায়ী; শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি এ-যুগের বধূদের প্রতি ব্যবহারগত ও সম্পর্কগত উভয় দিক দিয়ে কালোপযোগী পরিবর্তিত মনোভাব না নিয়ে চললে, তাঁরাও ওদের কাছ থেকে আশানুযায়ী শ্রদ্ধা ও প্রেম ন্যায্যতঃ আশা করতে পারেন না।

মনে হয়, উচ্চশিক্ষিতা (ও শিক্ষিতা) স্ত্রীর সবটুকু স্বপক্ষে বলবার এ ক'টি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য: আর্থিক দিকে স্বামীর অপারগতার দুঃসহ সংকটের দিনে সুশিক্ষিতা স্ত্রী সাময়িক উপার্জনের দ্বারা কার্যকরী ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক-একটা সংসারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর, নানা পরিচ্ছন্ন অভ্যাস আর উন্নত মনোবৃত্তির ভিতর দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানের দিকে উচ্চশিক্ষিতা (ও শিক্ষিতা) মায়ের মূল্য অপরিসীম। এরা উচ্চশিক্ষার আলোকে বর্ধিত হবার সুযোগ লাভ করায় সামাজিক বহু কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে; তাই বিবাহিত জীবনে গৃহিণী হিসেবে এঁরা পারিবারিক কলুষিত নানা কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে অর্ধপঙ্গু সমাজকে সুস্থ সজীব করে তুলতে পারেন। তাছাড়া,

পড়া শেষ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দৃষ্টি ভরে আবার দুই ফোঁটা জল। এবার আমি চাইতেই মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বিছানা থেকে উঠে ধীরে ধীরে আপনার ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমার মনটাও যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তে লিখছিলাম। আজ ভাবি, দুঃখের আকর্ষণী ক্ষমতা আছে বলেই মায়ের দুঃখের ছায়া আমার মনে লেগেছিল। আমিও আর মনস্থির করে বসে লিখতে পারলাম না। গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙ্গলো—দেখলাম মা আমার পড়ার টেবিল আতি-পাতি করে কি যেন খুঁজছেন। বুঝতে আমার দেরী হল না। আমিও নীরবে উঠে খাতাখানা মা'র দিকে এগিয়ে ধরলাম। মা একটিও কথা না বলে খাতাখানা নিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলে কোচিং ক্লাশ থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে হাসি-মুখেই ভাই-বোনদের সাথে চায়ের টেবিলে বসলাম। মা নিজেই খাবার পরিবেশন করছিলেন। ভাই-বোনেরা কোন মতে খাওয়া শেষ করে পালিয়ে গেল খেলতে। এ সময়ে টেবিলের অলস গল্প-গাথা কোন দিনই তাদের আটকে রাখতে পারে না। আমিও খাওয়া শেষ করে 'উঠবো' 'উঠবো' ভাবছি এমন সময় মা পাশের ঘর থেকে খাতাখানি এনে আমার হাতে দিয়ে সহজ ভাবেই প্রশ্ন করলেন,—"হ্যাঁ রে পলা, অনিমেশটা কে রে?" মা'র প্রশ্ন শুনে আমি আঁৎকে উঠলাম। মা'র হাতে খাতাখানি তুলে দেবার সময় ও-কথা আমার মনেই পড়েনি। চুপ করে ভাবতে লাগলাম মাকে কেমন করে বোঝাই তোমার কথা। তুমি যে কে, সে-কথা আমিই কি ভাল করে জানি? আমার নীরবতায় মা'র মনে সন্দেহ গাঢ়তর হল—তাগাদা দিলেন, "চুপ করে আছিস যে?" নীরবতা ভাঙ্গতেই হল—"ও কেউ নয়—এমনি একটা নামকে উদ্দেশ্য করে লিখেছি।"

স্বভাবতঃই মা প্রশ্ন করলেন, "মেয়েদের নামের কি অভাব আছে যে, একটা ছেলের নাম না হলে চলছিল না?"

বুঝলাম আমার কথা মা'র মনঃপূত হয়নি। সন্দেহও ঘোচেনি। 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'। কিন্তু অনিমেশ! ঘর কি সত্যিই কোন দিন পুড়েছিল? মায়ের সূক্ষ্ম আত্মসম্মানবোধ আমার গর্ব্বের বস্তু। কিন্তু মায়ের শিক্ষা-দীক্ষাতেই তো আমি মানুষ। মায়ের চুলচেরা আভিজাত্যের মাঝেই তো আমি বড় হয়ে উঠেছি। মায়ের ঐ সাবধানী চোখ দু'টির পাহারাতেই আমার প্রতিটি দিন কেটেছে। তবু মায়ের মনে আমার সম্বন্ধে এ অবিশ্বাস জন্মাল কি করে? নারী-জন্মের দুঃখ-দৈন্য-অসহায়তার কথা অনেক অনেক পড়েছি—জেনেছি এবং দেখেছি। বিনা দোষে দোষীর ভাগী হওয়ার ইতিবৃত্তও আমার জানা আছে। কিন্তু আমার মায়ের মত মায়ের কাছ থেকেও বিনা দোষে দোষীর ভাগী হতে আমার প্রাণ কান্নায় ভরে উঠছে। তবু প্রতিবাদের যোগ্য ভাষা তো কই আমার মুখে জোগাল না! যা কিছু বলেই বোঝাতে যাই না কেন—তাতে তোমার-আমার সম্পর্ক তো মাকে বোঝাতে পারবো না? তুমি দেহধারী—মায়ের এ দৃঢ় বিশ্বাস আমি ঘোচাব কি করে? তাই নীরবেই—নীরবেই মায়ের কল্পিত অনুযোগ আমি মাথা পেতে নিলাম। আমার নীরবতা, মায়ের সন্দেহ গাঢ়তর করলো বটে—কিন্তু অপ্রিয় কিছু আর অবশ্যম্ভাবিরূপে দেখা দিলো না।

অনিমেশ! আমাদের যে বিচ্ছেদ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়েছে—তার দুঃখ আমি রাখবো কোথায়? বিলাপ করে বিদায় নিয়ে হয়ত ভবিষ্যতে মনটা শান্তি পেত—কিন্তু অতটা ছোট আমি হতে পারবো না। তাই নীরবেই বিদায় নিলাম। ইতি—'পলাশ'।

ভিক্টর হিউগোর ছোট গল্প

জ্যোতি রায়

বিখ্যাত ফরাসী ভিক্টর হিউগোর মত কবি এত নিবিড় ভাবে শিশুদের ভালবাসাতে পারেননি। তিনি একটি বই লিখেছিলেন, তাঁর ছোট্ট নাতনী জিনীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রীতি স্মরণীয় করে রাখতে। সুন্দরী···তেজী···ভরপুর দুষ্ট, মেয়ে জিনীর কাছে তার দাদু ছিলেন যেন আজ্ঞাবাহী দাসের মত।

এক জন ভারিক্কে সিনেট সভার সদস্য তার সাথে রাষ্ট্রগত আলোচনার জন্য এক দিন বাসায় গিয়ে দেখলেন, বুড়ো তার নাতনীটাকে জড়িয়ে আছেন আর তার ছোট ভাই জর্জ চড়ে আছে তার পিঠের উপর।

—এখন থাক্ দাদু। উঠে বসে আমাদের সুন্দর একটি গল্প শোনাও, বরং। ক্লান্ত হয়ে উঠল সে।

—ছোট গল্প তৈরী করা খুব কঠিন নাতনী!···দাদু উত্তর দিলেন।

—তোমার পক্ষে অবশ্যই নয়। বহু গল্পই তো তুমি লিখেছ··· এমনি একটা গল্প চাই যা তোমার লেখার মধ্যে আজো নাই···। ঘাড় নেড়ে বলল জিনী।

জিনী আর জর্জ তার পায়ের কাছে জড়াজড়ি করে বসল··· গল্প বলতে সুরু করলেন হুগো···সং পিঁপড়ে আর দুর্বিনীত রাজা···

—কোন জায়গায় দুর্দান্ত এক রাজা ছিলেন···তার আমলে সাধারণ মানুষ সবাই ছিলেন দুঃখী; অত্যাচারিত। তবু দেশের লোক তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারত না, কারণ তার ছিল অগাধ অর্থ ও এক দল পরাক্রমশালী সৈন্য। যে কোন আক্রমণ থেকে বাঁচাত তারাই তাকে।

প্রতিদিন ভোরে এই দুর্দান্ত রাজার ঘুম ভাঙ্গত গত রাত্রির চেয়ে অধিকতর দুর্বিনীত হয়ে। অবশেষে রাজার অত্যাচারের কাহিনী একটি সাধু-প্রকৃতির পিঁপড়ের কানে গেল। এই ছোট্ট পিঁপড়েটি সত্যিই অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির ছিল। তবে সবারি চরিত্র যে এমনি তা বলা যায় না, তবু এই পিঁপড়েটি ঐ ভাবেই ছোট কাল থেকে গড়ে উঠেছিল। সে ক্ষুধার্ত্ত না হলে কোন মানুষকে দংশন করত না, করলেও যাতে কেউ বিশেষ জ্বালা না পায় সে দিকে সব সময়ই নজর ছিল তার।

—রাজার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টকর তা আমি জানি। তবু চেষ্টা থেকে বিরত হব না আমি!···মনে মনে ঠিক করলো সে।

সে রাত্রে রাজা ঘুমন্ত অবস্থায় সূঁচ-বিদ্ধ যন্ত্রণা অনুভব করলেন।

—কি হল!···যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বললেন তিনি।

—একটি ছোট্ট পিঁপড়ে তোমার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

—হুম্···পিঁপড়ে! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমি দেখে নিচ্ছি। শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে চাদর-বালিশ উল্টে ফেললেন তিনি। পিঁপড়েটি রাজার ঘন শ্মশ্রুর মধ্যে লুকিয়ে থাকায় খুঁজে পাওয়া গেল না। পিঁপড়েটা ভীত হয়েছে বিশ্বাস করে রাজা

আবার শয্যা নিলেন। যে মুহূর্তে বালিশের উপর মাথা রেখেছেন অমনি সে আবার কামড় দিল।

—শয়তান, তুই আবার ফিরেছিস্, সামান্য ধূলোর মত তোর অস্তিত্ব, অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাকেও কামড় দিতে সাধ? সে রাতে একটুকু ঘুম হল না তার।

অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজে ঘুম ভেঙ্গে গেল সকালে···সমস্ত রাজপ্রাসাদ উপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। বিরাট মাইক্রোসকোপ দিয়ে বিশ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি শোবার ঘরের সর্ব্বত্র সব কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ছোট পিঁপড়েটিকে তবুও খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তখন রাজার কোটের বন্ধনীর ভিতরে আত্মগোপন করেছিল।

একটানা ঘুমের আশায় তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করলেন সে রাত্রিতে রাজা।

—আবার···ওই! যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

—সেই পিঁপড়ে···উত্তর এল।

—কি চাস তুই···?

—চাই, তুমি আমার আদেশ পালন কর···দেশবাসীকে সুখী কর।

আমার সৈন্যরা কোথায়? কোথায় সেনাপতি···মন্ত্রী··· ওদের জলদি আসতে বল।···হাঁকলেন তিনি।

সবাই শয়নকক্ষে ভিড় করে দাঁড়াল···ছিঁড়ে ফেলল বিছানার চাদর···টুকরো টুকরো করে ফেলল দেওয়ালের গায়ে সাঁটা কাগজ, খুঁড়ে ফেলল ওরা প্রাসাদের বারান্দা। ছোট পিঁপড়ে রাজার চুলের ভিতরে থাকল লুকিয়ে···অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা হলেও ছোট পিঁপড়ে বার-বার দংশন করতে লাগল তাঁকে। সারা রাত বিনিদ্র কাটালেন তিনি। পরের দিন সকালে অবিলম্বে পিঁপড়ের কুল সমূলে উচ্ছেদ করবার ফতোয়া জারী করলেন রাজা। তাতেও অব্যাহতি হল না তাঁর। শরীর হল কাল ও নীল বর্ণ···ছোট্ট একটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করবার প্রয়াস হল ব্যর্থ। ঘুমের অভাবে শরীর হল সাদাটে ও শীর্ণ। অবশেষে মৃত্যুই হোত তাঁর, যদি না আপোষ করতেন তিনি তাঁর এই ছোট্ট প্রতিদ্বন্দ্বীটির সাথে।

এক দিন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বললেন তিনি:

—রাজী হলাম, যা বলবি তাই করতে প্রস্তুত আমি।

—প্রজাদের সুখী কর। এটুকুই তো চাই আমি। উত্তর দিল সে।

—কি করব বল? রাজা শুধালেন।

—এই মুহূর্ত্তে দেশ ত্যাগ করো।

—আমি কি আমার ধন-রত্নও সাথে নিতে পারব না? কাতরে উঠলেন তিনি···

—না। কঠোর আদেশ এল বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর।

তবু ততটা কঠোর হল না সে। পকেটভর্ত্তি ধন-রত্ন নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। দেশের জনসাধারণ—সাধারণের নির্বাচিত সরকার গড়ে তুললেন। সুখ উথলে উঠল তাদের, সত্যিই।

জিনী ও জর্জ অদ্ভুত গল্পটি শুনে প্রচুর আনন্দ পেল। তারা তাদের বুড়ো দাদুকে মনে করেছিল সেই শয়তান রাজা। কারণ, হিউগোর আশে-পাশে একটি শান্ত-প্রকৃতির পিঁপড়েও ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হুগো এমন ভঙ্গীতে গল্পটি বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর নাতী-নাতনী হেসে লুটোপুটি দিচ্ছিল।

রাজীব এই সময় বলিল : আসুন সামন্ত মশাই, চিঠিখানা লিখুন—আমি বলে যাই।

সামন্ত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরশুরাম বাঘের মত ফুঁসিয়া সামন্তর সামনে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল : হুঁসিয়ার নায়েব, বা কেড়েছ কি গলার নলিটা চেপে পাট-কাটির মত পুট করে ভেঙে দিয়েছি। চুপ-চাপ নিকতি থাকো।

নর-ব্যাঘ্রের মত সেই ভীষণ মূর্তিটির দিকে একটিবার তাকাইয়া কম্পিত পদে সাতকড়ি সামন্ত ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া হংসপুচ্ছের কলমটি লইতে হাত বাড়াইল।

বাইশ

বাশুলীর কাছারী-বাড়ীর বৃহৎ ব্যাপারে সারা রাত্রি ধরিয়া গ্রামের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল কাছারী-বাড়ীর প্রকাণ্ড দেউড়ীর সামনে। গাড়ীর পর গাড়ী, লোকের পর লোক আসিতেছে স্রোতের মত নানাবিধ দ্রব্যজাত বহন করিয়া। পল্লীবাসীরা এই আকস্মিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত, চমৎকৃত—এ যেন এক অলৌকিক রহস্য, ভৌতিক ব্যাপার!

ভিতরে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই—অথচ বহুসংখ্যক লোক সেখানে কর্মব্যস্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছে। কর্মী দল ভিন্ন ভিতরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সমগ্র কাছারী-বাড়ীর এলাকা পরিবেষ্টন করিয়া বাশুলীর বিখ্যাত পাইকরা লাঠি ও শড়কি লইয়া পাহারা দিতেছে।

অর্দ্ধ রাত্রে যথাযথ ব্যবস্থার পর চণ্ডী স্বামীর সহিত এই প্রথম পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। অবশ্য ইহার পূর্বেই কবিরাজ-বাড়ীতে খবর পাঠানো হইয়াছিল যে, গোবিন্দ চণ্ডীকে লইয়া শ্যামাপুরে আসিয়াছে এবং কাছারী-বাড়ীর কাজ সারিয়া সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে রাত্রিবাস করিবে। কিন্তু তজ্জন্য কবিরাজ মহাশয় যেন ব্যস্ত না হন, এবং তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য কষ্ট করিয়া কাছারী-বাড়ীতে আসিবারও প্রয়োজন নাই—কাজগুলির ব্যবস্থার পর তাহারাই যাইবে, তবে অধিক রাত্রি হইতে পারে।

গৌরীকেই এই সংবাদ লইয়া যাইতে হয়। করালী কবিরাজ মহাশয় তাহার মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলে গৌরী সহাস্যে বলে : জেঠা মশাই, চণ্ডীর অংশেই যে আপনার চণ্ডী জন্মেছেন। বিয়ে হলো কেমন কাণ্ড করে ভাবুন ত? বিয়ের পর গ্রামশুদ্ধ সবাইকে অবাক্ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেন। সেখানেও কি কাণ্ডই না করলেন! তার পর ফিরে আসার ব্যাপারটাও দেখুন? রাত দুপুরে সমস্ত গ্রামখানাকে জাগিয়ে দিয়ে রণচণ্ডীর মতন রণবাদ্য বাজিয়ে ঢুকলেন গ্রামে! কিন্তু বাপের বাড়ীতে ঢু'টিতে আসবেন ঠিক চোরের মত চুপিসাড়ে—কেউ জানতেও পারবে না।

কবিরাজ মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন : বিয়ের পর মেয়ে-জামাইয়ের এই প্রথম শুভাগমন হচ্ছে আমার বাড়ীতে, মা! কিন্তু এমনি অসময়ে আর এমন একটা ব্যাপার মাথায় করে ওঁরা আসছেন যে, সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ফুরসৎও পেলাম না!

গৌরী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলে : মেয়ে-জামাই বাড়ী এলে আদর-যত্ন সবাই করে, জাঁক করে পাড়ায় জানিয়ে আনন্দ পায়—কেমন ঘরে মেয়ে পড়েছে, জামাই কত গুণের, কেমন কুটুম্ব পেয়েছেন। কিন্তু আপনার অদৃষ্টে জেঠা মশাই, আগে থেকেই সব জানাজানি হয়ে গেছে। বিশখানা গাঁয়ের লোক কাল কাছারী-বাড়ীর ময়দানে জমায়েত হয়ে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের জয়জয়কার করবে।

ঠিক এই সময় দেউড়ীর সামনে দুইখানি শকট আসিয়া দাঁড়ায়। কবিরাজ মহাশয় গৌরীর সহিত বাহিরে আসিয়া দেখেন, প্রত্যেক শকটের ভিতরে ও ছাদের উপরে নানাবিধ সামগ্রী-সম্ভার। উভয় শকটের সঙ্গে এক জন করিয়া পরিচারক—তাহাদের তত্ত্বাবধানে দ্রব্যগুলি আসিয়াছে। গাড়ী থামিতেই সেই দুই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর সবিনয়ে জানাইল যে, তাহারা বাশুলীর গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে আসিয়াছে; বড়রাণীর সঙ্গে রাণীমা এই সব সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকেন।

গৌরী তখন সহাস্যে বলে : বুঝতে পারছেন না জেঠা মশাই, চণ্ডী শ্বশুরবাড়ী থেকে এই প্রথম বাপের বাড়ী এসেছে কি না, তাই রাণীমা তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। আপনি দুঃখ করছিলেন, এখন পাড়ার সবাইকে ডেকে [illegible]-বাড়ীর তত্ত্ব-তাবাস দেখান।

প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন রাণী মাধুরী দেবী [illegible] ব্যবস্থা করিয়া। বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহার্য ও আহার্য নানাবিধ বস্তুর বিপুল সমন্বয়। শুধু কবিরাজ-বাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া নহে—গ্রাম সম্পর্কে যাহাদের সহিত এই পরিবারটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, গৌরীর নিকট সন্ধান লইয়া তাঁহাদেরও মর্য্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাধুরী দেবী বিবিধ বিধানে।

তৎক্ষণাৎ একটা সাড়া পড়িয়া যায়। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে [illegible] বাড়ীর বিপুল উপঢৌকন পুঞ্জীকৃত করা হয় এবং প্রতিবেশীদের ডাকিয়া আনিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন কবিরাজ-গৃহিণী। কবিরাজ মহাশয় সাদরে পরিচারক ও শকট-চালকদের আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট করেন। জিনিসপত্র নামাইয়া দিয়া শকট দুইখানি কাছারী-বাড়ীতে চলিয়া যায়। এই শকটেই পাইক-পরিবৃত অবস্থায় কাছারীর নায়েব সাতকড়ি সামন্ত ও মুহুরীদের বাশুলীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা থাকে।

কাছারী-বাড়ীতে সদলবলে চণ্ডীর উপস্থিতির কিছু পরেই গৌরীর তত্ত্বাবধানে এই সব ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

এদিক্কার কাজ-কর্মের বন্দোবস্ত করিয়া চণ্ডী যখন গোবিন্দকে লইয়া পিত্রালয়ে প্রবেশ করে, তখন কাছারী-বাড়ীর পেটা-ঘড়ি হইতে পর-পর দুইটি তীব্র ধ্বনি রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জানাইয়া দিল—রাত্রি দুই ঘটিকা অতিক্রম করিতেছে।

প্রত্যূষে কৌতূহলী গ্রামবাসীরা কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কাছারী-বাড়ীর দেউড়ীর উপর মঞ্চ বাঁধিয়া নহবত বসিয়াছে। বৃহৎ দেউড়ী পত্র-পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইয়া মনোরম শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে 'সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব' 'বন্দে মাতরম্' ও 'স্বাগতম্' লেখাগুলি লতাপুষ্পের অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানটির পরিচয় দিতেছে। সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ব্যাপিয়া বিশাল মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে; উপরে আগাগোড়া রঙ্গীন সামিয়ানা; তাহার নিচে শুভ্র চাঁদোয়া

প্রসারিত। এক দিকে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত। কাছারী-বাড়ীর অন্য দিকে প্রাঙ্গণ-সমন্বিত স্বতন্ত্র বিভাগটি সারা রাত্রিব্যাপী সংস্কারের পর সেবাশ্রমের উপযোগী আসবাব-পত্রে কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে—তাহা এখনো বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। এই অংশের পুষ্পপত্রাচ্ছন্ন দ্বারদেশে প্রলম্বিত দুই খণ্ড সুদৃশ্য আবরণী-বস্ত্র রেশমী-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। ঠিক দুই ঘটিকার সময় এই রজ্জু-বন্ধন উন্মোচন করিয়া সেবাশ্রমের অভ্যন্তর প্রদর্শিত হইবে। এই গ্রামনিবাসিনী এক অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলার উপর এই সম্মানজনক কাজটির ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনিই স্বহস্তে সেবাশ্রমের দ্বারের আবরণ উন্মোচন করিবেন। এই উপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন এই বর্ষীয়সী মহিলার স্বামী—এই অঞ্চলের সর্বাধিক বর্ষীয়ান কুলপুরোহিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয়। রাজপথের পার্শ্বে [illegible] প্রকাণ্ড দেউড়ী কাছারী-বাড়ী এবং সেবাশ্রমের একই [illegible] হইলেও বাড়ির মধ্যে সেবাশ্রমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র [illegible] প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। উভয় ভবনের মাঝখানে [illegible] কাঠের ঘনসন্নিবদ্ধ সারি সারি সুদৃঢ় স্তম্ভের সঙ্গে এমন ভাবে [illegible] বেষ্টনী রচিত হইয়াছে যে, এ-পথে বায়ু চলাচলেরও [illegible] নাই। নারী ও শিশুদের জন্যই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা বলিয়া [illegible] অবলম্বিত হইয়াছে। ওদিকে বাড়ির মধ্যে সন্নিহিত [illegible] পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢোল সোহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শ্যামাপুরের কাছারী-বাড়ীর সান্নিধ্যে এক সেবাশ্রম খোলা হইয়াছে। সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের নারী ও শিশুগণ এই সেবাশ্রমে আসিয়া বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাইবেন। [illegible] সুপ্রসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সকল [illegible] নারীদিগকে গৃহচিকিৎসার সহিত সেবা-শুশ্রূষা, শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী কল্য রবিবার বেলা ঠিক দুই ঘটিকার সময় শ্যামাপুর কাছারী-বাড়ীর ময়দানে প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণকে সেবাশ্রমের বৃত্তান্ত শুনিবার এবং স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

এই ঘোষণা সমগ্র অঞ্চলে এক নূতন চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। ঠিক স্থানীয় থানার চৌকিদারগণ ঢেঁড়া পিটিয়া শ্যামাপুর ও সন্নিহিত কতিপয় গ্রামে প্রচার করিয়াছিল যে, মহকুমার মহকুমা হাকিম হোরেস সাহেব ঐ রবিবার দুই ঘটিকার সময় শ্যামাপুর কাছারী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক সভা করিবেন, এই সভায় শ্যামাপুর মিসনারী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে হাকিম বাহাদুর প্রকাশ্য ভাবে তদন্ত করিবেন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, হাকিম সংক্রান্ত ঘোষণা এ অঞ্চলের বাসীন্দাদের মধ্যে একটা কৌতূহল-মিশ্রিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কিন্তু আশপাশের লোকেই সাগ্রহে যখন এই তদন্ত ব্যাপার লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকে, সেই সময় দ্বিতীয় ঘোষণা সকলকে অবাক্ করিয়া দেয়। তাহারা স্থির করিতে পারে না—ঠিক যে সময় যে স্থানে হাকিমের সভা করিবার কথা, সেইখানেই সেই সময় সেবাশ্রম-উদ্বোধনের সভা কি করিয়া হইবে? একই সময় একই জায়গায় কেমন করিয়া দুইটি সভা বসিবে? জনসাধারণের মধ্যে এই সভা লইয়া এক নূতন কৌতূহল ও সেই সঙ্গে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফলে, বহু দূরবর্তী লোকেরাও শ্যামাপুরের কাছারী-বাড়ীর উদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শ্যামাপুরের পথগুলিতে জনস্রোত প্রবাহিত হয়।

কবিরাজ মহাশয় এ-দিন কন্যা-জামাতার সমভিব্যাহারী কর্মিবৃন্দের সকলকেই তাঁহার আলয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। কাজের দোহাই দিয়া কর্তৃপক্ষরা আপত্তি তুলিলেও তাহা উপেক্ষিত হয় এবং চণ্ডী ব্যবস্থা করিয়া দেয় যে, পর্যায়ক্রমে এক এক দল ভোজন করিয়া যাইবে।

সকাল হইতেই চণ্ডীকে সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সামন্ত কর্তৃক লিখিত পত্র লইয়া কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শ্যামাপুর ষ্টেশনে পাঠানো হয়—যাহাতে সামন্ত মহাশয়ের শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানি উভয় পরিবারের পরিজনবর্গকে লইয়া শ্যামাপুর ষ্টেশনে নামিতে না পারিয়া বাগুলীতে নীত হয়। ষ্টেশনে শ্রীমানি সামন্তর পত্র পাইয়াও শ্যামাপুরে নামিবার জন্য রীতিমত বিদ্রোহী হইয়াছিল—কিন্তু বাগুলী ষ্টেটের জবরদস্ত কর্মীদের দাপটে শেষ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি ভগিনীপতি সামন্তের অনুরোধপত্রের নির্দেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়।

প্রত্যূষেই পল্লীর তরুণ কর্মীরা গৌরীকে সুপারিশ ধরিয়া চণ্ডীকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিল। নায়েব সাতকড়ি সামন্ত এবং তাহার শ্যালক শ্রীপতি শ্রীমানির ঔদ্ধত্যে ইহারা যেরূপ মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল, চণ্ডীর এই বিস্ময়কর তৎপরতায় ততোধিক উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠে—কি বলিয়া যে তাহাদের অন্তরের উল্লাস ব্যক্ত করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। চণ্ডী তাহাদিগকে গোবিন্দনারায়ণ, ডাক্তার রায় ও রাজীবের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া এই অনুষ্ঠানে টানিয়া লইল। সঙ্গে-সঙ্গে কে কি কাজ করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

সামন্তর শ্যালক শ্রীমানির সম্বন্ধে ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে চণ্ডী স্থানীয় কতিপয় কর্মীকে লইয়া আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। শ্যামাপুর গ্রামে যান-বাহনের মধ্যে ষ্টেশনের কাছে যে দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ী ও একখানি মাত্র পালকী থাকে, সকালেই সেগুলি সেদিনের জন্য ভাড়া করিয়া ফেলা হইল। কর্মীরা প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু চণ্ডীর যুক্তিতে তাহারা চমৎকৃত হইল। চণ্ডী বলিল: ভোটের সময় যে-ভাবে গাড়ী-পালকী পাঠাইয়া এক-এক গ্রামের মেয়েদের আনা ও পাঠানো হয়, ঠিক সেই ভাবেই সভায় তাহাদের আমি আনাইতে চাই। এই গাড়ী-পাল্কী সারা দিন ধরিয়া এই কাজ করিবে। এমন কি, যদি দেখি—বাড়ীতে কোন মেয়ে বা তাদের ছেলেপুলে অনেক দিন ধরে ভুগছে, চিকিৎসা হচ্ছে না—আমাদের নূতন সেবাশ্রমে চিকিৎসার জন্যে তাদের খুব যত্ন করে আনবে। একটু দূরের গ্রামেও এমন দু'-চার জন প্রাচীন ব্যক্তি আছেন, সভায় যোগ দেবার আগ্রহ তাঁদের আছে—অথচ দূর থেকে হেঁটে আসবার সামর্থ নেই; তাঁদের আমি আনতে চাই। কাজেই একটা তালিকা করে ফেল—এ রকম কতগুলি প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তি এ অঞ্চলে আছেন। এমনি, মেয়েদেরও একটা তালিকা হবে। এঁদের জন্যেই গাড়ীর বরাদ্দ থাকবে—বাড়ী থেকে সভায় এনে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হবে। পালকীখানা খাটবে রোগীদের আনবার জন্যে।

কর্মীরা একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল: সেবাশ্রমের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের আনলে অসুবিধা হবে না?

ঈষৎ হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমার সব কাজই যে সৃষ্টিছাড়া। কথার সঙ্গেই কাজ করতে আমি ভালবাসি। 'ভোগের আগে প্রসাদ' বলে একটা কথা আছে; অবস্থা বুঝে এ ব্যবস্থাও চলে। সেবাশ্রম মানেই সেখানে চলেছে সেবার পর্ব। দরজা খুলে সেটা না দেখিয়ে, খালি ঘর আর ঘরের সাজ-সজ্জা দেখে লোকের মন কি ভরে? তোমাদের কাজ হবে খুঁজে-খুঁজে রোগী ধরে আনা; তার পর তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা—সে ভার আছে রাজীবের উপরে। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। রোগীর পালকী এলেই তার পরের ব্যবস্থা সে-ই করবে।

কর্মীদের সঙ্গে গাড়ী-পাল্কীর চালক ও বাহকদের স্নানাহারের পাট সর্বাগ্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমাধা করাইয়া চণ্ডী তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। গাড়ী ও পাল্কী লইয়া স্থানীয় কতিপয় কর্মী গ্রামান্তরে যাত্রা করে।

বেলা প্রায় একটার সময় শ্যামাপুর ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া থামিল। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে মহকুমা হাকিম হেরিস, মিস্ খৃষ্টকুমারী ও মিষ্টার আলম প্লাটফরমে অবতরণ করিবার পূর্বেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া চাপরাশি ছুটিয়া আসিয়া কামরার দরজা খুলিয়া দিল।

হেরিশ গর্বিত ভঙ্গিতে প্লাটফরমে নামিয়া সামনের দিকে তাকাইতেই দেখিল, স্থানীয় দারোগা সত্যেন সান্যাল থানার জমাদার ও দুই জন কনষ্টবল লইয়া দ্রুতপদে তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গোড়া হইতেই ইনেসপেক্টর সান্যাল হেরিশ সাহেবের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, শ্যামাপুর মিসনারী বিদ্যালয়ের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাটিকে অকারণ পুনরায় জাঁকাইয়া তুলিবার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায়। ফলে, সাহেব তদন্ত-ভার স্বহস্তে লইয়া সরকারী গোয়েন্দা মিষ্টার আলমকেই এ কার্যে বাহাল করে। সাহেবের সেরেস্তা হইতে সান্যালের উপর এই মর্মে এক নির্দেশ আসিয়াছিল যে, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েব সাহায্যপ্রার্থী হইলে দারোগা যেন তাহাকে প্রয়োজন ও সম্ভব মত সাহায্য করেন। কিন্তু থানার দারোগার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবার মত কোন কারণ না ঘটায় কাছারীর নায়েব থানার ত্রিসীমায়ও আসে নাই। এ দিন সকালে দারোগা সান্যাল সবিস্ময়ে শুনিল যে, যে সময় হাকিম কাছারী-বাড়ীতে তাঁহার এজলাস বসাইয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই সময়েই কাছারীতে সেবাশ্রমের উদ্বোধন সম্পর্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে—এই মর্মে এক সংবাদ চতুর্দিকে ঘটা করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এই সংবাদে কৌতূহলী হইয়া দারোগা সান্যাল জনৈক মুহুরীকে কাছারী-বাড়ীতে পাঠাইলে সে ব্যক্তিও তাঁহাকে জানায় যে, হাকিম সাহেবের সভা করিবার ব্যাপার চাপা পড়িয়া গিয়াছে—ভিতরে প্রকাণ্ড মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা খাটাইয়া সেবাশ্রমের উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে; কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই, বহুসংখ্যক পাইক ফটকে পাহারা দিতেছে। একটার সময় ফটক খোলা হইবে। শ্যামাপুরে চণ্ডীবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার কথা সত্যেন সান্যালের অবিদিত ছিল না; এই সংবাদ শুনিয়া সম্ভবত মনে মনে সে খুব হাসিয়াছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অকুস্থলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার উপর হাকিমের সেরেস্তা হইতে শেষ আদেশ আসিয়াছিল—নির্দিষ্ট দিনে বেলা পৌনে একটার সময় থানার কনেষ্টবল ও চৌকিদারদিগকে লইয়া সে যেন ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। সেই নির্দেশ বহন করিয়া সত্যেন সান্যাল থানার জমাদার, চার জন কনেষ্টবল এবং এক ডজন চৌকিদার লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে।

দারোগাকে দেখিয়াই হেরিশ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: মিছিল কোথায়? বাহিরে ত কোন বন্দোবস্ত তার দেখছি না?

হাকিমকে যে ষ্টেশন হইতে মিছিল করিয়া কাছারী-বাড়ীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, এ কথা দারোগা শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশে লিখিত পত্রে ইহার কোন উল্লেখ ছিল না। একটা যে ওলট-পালট ব্যবস্থা কিছু হইয়াছে, দারোগা তাহা সকালের রিপোর্ট শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া শুধু জানাইল: মিছিলের কথা ত আমি জানি না—থানার কনেষ্টবল ও চৌকিদারদের নিয়ে ষ্টেশনে থাকবার জন্যই আমাকে লেখা হয়েছিল। আমি আমার কর্তব্যের ত্রুটি করিনি।

এ জবাব শুনিয়া হেরিস ক্ষেপিয়া উঠিল; হুমকি দিবার মত ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল: মিছিলের কথা তুমি শোননি? কাছারীর নায়েব মিষ্টার সামন্ত কোথায়?

সংযত কণ্ঠে দারোগা উত্তর দিল: আমি তাঁকে দেখিনি, তবে বাহিরে থাকতে পারেন।

সাহেবের জ্বলন্ত দৃষ্টি তখনও দারোগার মুখে নিবদ্ধ, সে বেচারী তখন কষ্টে মুখের হাসি চাপিতে সচেষ্ট, সাহেবের চোখের অগ্নি-ঝলকে সেই প্রচ্ছন্ন হাসি যাহাতে ফুটিয়া না উঠে!

'বাইরেই চলো—দেখি।' হুঙ্কারের সুরে কথাগুলি বলিয়াই হেরিস পিছনে স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মানা ভগিনী খৃষ্টকুমারীর মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইল। খৃষ্টকুমারী তখন দুই চোখের দৃষ্টি যত দূর সম্ভব তীব্র করিয়া অদূরবর্তী লাল কাঁকরের পরিচিত রাস্তাটির পানে চাহিয়াছিল—কিন্তু সেখানে মিছিল নামক বস্তুটির কোন নিদর্শনই তাহার ব্যগ্র দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল না। কেবল দেখা গেল, ষ্টেশনের করগেটের সেডের মধ্যে শীর্ণ দেহের উপরে কৃষ্ণবর্ণের মলিন জীর্ণ কোর্তা পরিয়া ও মাথায় ক্যাঁকাশে লাল রঙের পাগড়ী বাঁধিয়া কতকগুলি মূর্তি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে; প্রত্যেকের কোমরে সরকারী চাপরাশ চামড়ার বেল্টের অভাবে দড়ি দিয়া বাঁধা, হাতে এক একগাছা লাঠি। কোথায় ধ্বজা-পতাকা লইয়া সমস্বরে হাকিম সাহেব ও তাহার ভগিনীর নামে সমুদ্র গর্জনের মত বিপুল জয়ধ্বনি তুলিয়া সহস্র লোকের একটা সারিবদ্ধ শোভাযাত্রার বিরাট দৃশ্য ট্রেণে বসিয়া সারা পথ কল্পনা করিয়াছে খৃষ্টকুমারী, কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিবা মাত্র সেই কল্পনা এমন ভাবে পাল্টাইয়া গেল! ইহার পর আরো কিছু লজ্জাকর দুর্ভোগ আছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে?

নীরবেই একটা নম্র ইঙ্গিত করিয়া ভগিনীকে লইয়া মহকুমার মহামান্য হাকিম প্লাটফরম্ হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতেই কনেষ্টবল ও চৌকিদাররা নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। হাকিম তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাছারীর সেই অতি বিনীত ও রাজভক্ত নায়েবটিকে খুঁজিতেছিল, সেই সঙ্গে তাহার সেরেস্তার কর্মচারী মিষ্টার শ্রীমানিকেও!

মিষ্টার আলম এই সময় হাকিমের একান্ত কাছে আসিয়া বলিল: এ কি কাণ্ড স্যার! কেউ নেই?

হেরিসের কণ্ঠ হইতে সরোষে দু'টি মাত্র শব্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হইল: ননসেন্স! স্কাউন্‌ড্রেল!

দারোগা সান্যাল জিজ্ঞাসা করিল: তাহলে এখন কি করা যায়—কাছারীতে যাওয়া হবে?

তেমনই তীব্র স্বরে হেরিস বলিয়া উঠিল: সার্টেন্‌লি! গাড়ী কোথায়?

তাই ত! গাড়ীর কথা ত দারোগা ভাবে নাই। মিছিল যখন আসে নাই, গাড়ীর ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হয় নাই। কিন্তু ট্রেণ আসিলে ষ্টেশনের হাতার উপরে আসিয়া যে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী ধরিবার জন্য উমেদারী করিত, তাহাদের ত দেখা যাইতেছে না আজ—কোথায় অদৃশ্য হইল তাহারা? ইতিমধ্যেই কি প্যাসেঞ্জার লইয়া চলিয়া গিয়াছে? দারোগা এক জন চৌকীদারকে ডাকিয়া গাড়ী দুইখানির আস্তাবলে গিয়া খোঁজ লইতে বলিল। যদি গাড়ী আজ বাহির করিয়া না থাকে, এখনই যেন ঘোড়া জুতিয়া লইয়া আসে। মেমসাহেবের জন্য পাল্কীর কথাও বলিয়া দিল দারোগা।

দারোগার কথা হেরিস, পুষ্টকুমারী ও আলম—তিন জনেই শুনিল। ক্রোধে হেরিসের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, লজ্জায় ও অপমানে পুষ্টকুমারীর কালো মুখখানার উপরে একটা কালচে ছায়া পড়িল, আর মিষ্টার আলম বিরক্তির সুরে দারোগাকে বলিল: গাড়ীরও একটা ব্যবস্থা করে রাখেননি?

দারোগা সান্যাল উত্তর দিল: কাছারীর নায়েব ত পনেরো দিন ধরে মিছিলের ব্যবস্থা করছিলেন। তিনিই যখন হাকিম সাহেবকে আনিয়েছেন, ব্যবস্থা তাঁরই করবার কথা। তিনি যে এষ্টেটের তহশীলদার, মনে করলে জুড়ি-গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারতেন। আর আমাকে এখানকার বেতো ঘোড়া-জোতা ছ্যাকড়া গাড়ী রাখতে হোত। তা ছাড়া গাড়ীর কথা আমাকে বলাই হয়নি।

খানিক পরেই চৌকিদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল: গাড়ী পাল্কী সব কাছারী-বাড়ীতে সমস্ত দিনের জন্যে ভাড়া করে নিয়ে গেছে। আস্তাবলে খালি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হেরিস জিজ্ঞাসা করিল: কাছারী-বাড়ীতে নিয়ে গেছে মানে? ওরা কি জানে না—আমরা এই ট্রেণেই আসছি?

দারোগা বলিল: কাছারী-বাড়ীতেও না কি আজ সেবাশ্রম খোলা হবে—সেই উপলক্ষে সেখানে মিটিং আছে। বোধ হয় সেই জন্যেই—

এ-কথা শুনিবা মাত্র হেরিস অগ্নিমূর্তি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বোকার মতন আপনি এ-সব কি বলছেন? আমি সেখানে গিয়ে সভা করব এ-কথা সবাই জানে—কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে যে আমার সভার ওপরে সেখানে আর একটা সভা করবে?

সান্যাল ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল: এ-রকম একটা খবর আমি শুনেছি মাত্র, শোনা কথাই আমি বলেছি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হেরিস বলিল: শুনেই চুপ করে ছিলেন কেন? সেখানে গিয়ে খবর নেওয়া কি আপনার উচিত ছিল না?

দৃঢ় স্বরে এবার দারোগা বলিল: না। আমি আপনার হুকুম মত চৌকীদারদের যোগাড় করতেই ব্যস্ত ছিলাম। আমার উপরে এই আদেশ থাকায় এর দিকেই জোর দিয়েছিলাম। কাছারীতে বিরুদ্ধ ধরণের তেমন কিছু ঘটলে নায়েবের কাছ থেকেই খবর আসত। কাছারীর নায়েব কোন সাহায্য চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করব—আমাকে এই কথাই জানানো হয়েছিল। আমার কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

সরোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল এই স্পষ্টবক্তা দারোগাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া অতঃপর হেরিস কিছুটা সংযত কণ্ঠেই বলিল: তাহলে কাছারীতে যাবার কোন বন্দোবস্ত নেই! কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

দারোগাও অবিচলিত কণ্ঠে বলিল: এ অবস্থায় [illegible] হেঁটেই যেতে হয়।

তাই চলুন। এখান থেকে ডিস্‌ট্যান্স—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হেরিস দারোগার মুখের দিকে চাহিল।

দারোগা বলিল: মাইল খানেক হবে।

অল রাইট—চলুন।

এক নিশ্বাসে কথাটা বলিয়া হেরিস সেডের ভিতর হইতে [illegible] নামিল। পুষ্টকুমারীর মুখ তখন ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়াছে—পথে পদার্পণ করিতেই তাহার বুকখানা বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল, কিন্তু উপায় নাই। কল্পিত মিছিল যখন মিলিল না, [illegible] কতিপয় কনেষ্টবল ও চৌকিদার লইয়াই তাহাকে [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিনী মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযান করিতেই হইবে। [illegible] সকলে অন্তত জানিতে পারিবে ত, এখন সে [illegible] সাহেবের ভগিনী!

দিবা দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া সদলবলে [illegible] কাছারী-বাড়ীর সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া [illegible] পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আশ্চর্য! সেখানে [illegible] করিয়া এজলাসের মত হাকিমি মেজাজে তাহার লোকের [illegible] লইবার কথা, সেখানেই কি না সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব চলিয়াছে বিপুল ঘটা করিয়া! তোরণ-সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে [illegible] পাহারা দিতেছিল; আগন্তুকগণকে তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিয়া হেরিস রুদ্ধ রোষে [illegible] ফুলিতে দেখিল—সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ—পল্লী-অঞ্চলে কোন সভায় একসঙ্গে এত লোকের সমাগম হইতে পারে, ইহা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার! দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতেই হেরিস সবিস্ময়ে দেখিল—পাটাতনের উপরে উপবিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ষীয়ান্ নর-নারী, প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠবে ও মুখমণ্ডলে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। অশীতিপর সৌম্য মূর্তি এক বৃদ্ধ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাম পার্শ্বে যে মহিলাটি প্রসন্নমুখে বসিয়া আছেন, তিনিও বর্ষীয়সী। তাঁহাদের গলায় বিশেষ [illegible] ফুলের মালা দুলিতেছে। পাটাতনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া এক আশ্চর্য তরুণী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছে—মণ্ডপে সমবেত দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। হেরিস ও-দেশে পঠদ্দশায় এমন কতিপয় ইংলিশ ও আইরিশ মহিলা দেখিয়াছে—যাহাদের অটুট স্বাস্থ্য, দেহসৌষ্ঠব, রূপ ও সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা চলে না—এ-দেশে আসিয়া এই প্রথম পল্লী অঞ্চলের এই সভায় এমন এক আশ্চর্য নারীকে সে বক্তৃতা দিতে দেখিল, ও-দেশের

এই অসাধারণ তরুণীদের সম্পর্কে যাহাকে সমতুল্য বলিলেও অন্যায় হয়—শ্রেষ্ঠতম বলাই সঙ্গত। ক্ষণকাল হেরিস স্তম্ভিত ভাবে একই স্থানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া শুধু তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় এক জন স্বেচ্ছাসেবক নিকটে আসিয়া হেরিস ও তাহার সঙ্গীদিগকে পাটাতনের দিকে যাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিল। নিকটে কোথায়ও বসিবার মত স্থান না থাকায় হেরিসকে অগ্রসর হইতে হইল। এই সময় পিছন হইতে খৃষ্টকুমারী চুপি-চুপি তাহাকে বলিল : ঐ মেয়েটিই নোটোরিয়াস চণ্ডী।

ভগিনীর কথায় হেরিসের চোখ দু'টি সহসা প্রখর হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তাহারা পাটাতনের কাছে আসিয়াছিল। হেরিস দেখিল, সেখানে কয়েকখানি আসন খালি রহিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকরা সযত্নে হেরিস, খৃষ্টকুমারী, আলম ও দারোগা সান্যালকে এই আসনগুলিতে বসাইয়া দিল। আলম এই সময় চাপা গলায় বলিল : এরা ষ্টেশনে আমাদের জন্যে গাড়ী রাখেনি, কিন্তু এখানে বসবার আসন রিজার্ভ করে রেখেছে!

সুসজ্জিত সভামণ্ডপ, সভার গাম্ভীর্য্য, বিপুল জনসমাগম ও শ্রোতৃদের গাম্ভীর্যময় পরিস্থিতি দেখিয়া হেরিস স্তব্ধ ভাবে বসিয়া চণ্ডীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। চণ্ডী তখন বলিতেছিল : সভা করতে হয় কাজ কি ভাবে চলবে তার ব্যবস্থার জন্য। গাড়ী তৈরী করবার জন্য কারখানার প্রয়োজন, গাড়ী তৈরী হয়ে এলে তার পরে চলা। এ সভায় এ অঞ্চলের যাঁরা এসেছেন, তাঁরা জানেন—আমাদের সমাজের, আমাদের সংসারের প্রত্যেককে সুস্থ হতে হবে আগে, তার পরে চাই শিক্ষা; মূর্খ হয়ে যেন কেউ না থাকে। সুস্থ হতে হলে স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে হবে। দু'টো ব্যবস্থাই আমরা করেছি এখানে। বিদ্যাপীঠে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হবে। যারা অসুস্থ, যারা দেহে-মনে ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের এখানে এনে চিকিৎসা ও পথ্য দিয়ে সারিয়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে, চিকিৎসা করতে জানেন, এমন সব মহিলা এখানে থেকে মেয়েদের শিখিয়ে দেবেন—কেমন করে শরীরকে নীরোগ করা যায়, ছেলে-পুলেদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বাড়ীতে হঠাৎ কোন আপদ-বিপদ হলে ভয়ে অস্থির না হয়ে নিজে তার প্রতিকার করতে পারেন—এই সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্যে কোন খরচ লাগবে না। কি ভাবে রোগের সেবা হয়, কেমন করে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হয়, সেগুলো এই সেবাশ্রমেই বায়স্কোপের ছবির ভিতর দিয়ে প্রথমে দেখানো হবে, তার পর হাতে-কলমে শেখানো হবে। আজকের এই সভায় যিনি সভাপতির আসনে বসে আমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছেন—তাঁর দিকে আপনারা চেয়ে দেখুন, এ বছর ইনি নব্বই বছরে পদার্পণ করেছেন; কিন্তু এখনো সোজা হয়ে চলেন, চোখে চশমা নেন না—এখনো এমন জোর-গলায় চণ্ডীপাঠ করেন, ভাগবত পড়েন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনান যে, অমনি আমাদের চোখের সামনে পুরাণের মুনি-ঋষিদের ছবি ফুটে ওঠে। ইনি এ অঞ্চলের পুরোহিত, সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, মাথার মণি—ভট্টাচার্য মশাই! যেমন ইনি, তেমনি এঁর সহধর্মিণী, এঁরও বয়স আশী পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনো নিজের হাতে স্বামীদেবতার ভোগ রাঁধেন, সংসারের কাজ করেন। এই জন্যেই সেবাশ্রমের উদ্বোধন সভায় শ্রেষ্ঠ স্থানে এঁদের দু'জনকে বসিয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। এখন আমরা অনুরোধ করছি—সেবাশ্রমের দরজা এঁরা খুলে দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করুন।

বিপুল উল্লাসে শ্রোতৃবৃন্দ চণ্ডীর কথার সমর্থন করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতঃপর উঠিয়া শাস্ত্রীয় বাণী আবৃত্তি করিয়া সেবাশ্রমের উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন : যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে অনুদার বা পক্ষপাতী বলিয়া দোষী করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রাচীন আদর্শ প্রচারের দিন আজ এসেছে এবং আশা হয়েছে এই জন্য যে, আমাদের দেশমাতা চণ্ডী দেবীর মত কন্যাকে দান করেছেন আমাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যে।

ইহার পর সেবাশ্রমের দ্বারপথে আস্তৃত আবরণ-রজ্জু ভট্টাচার্য্য-দম্পতি শঙ্খধ্বনির সঙ্গে উন্মোচন করিলে বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই সময় সুসজ্জিতা কুমারীরা লাজ ও ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া চলিল। পাটাতনে উপবিষ্ট সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

বৃহৎ হলঘরে এক একখানি চৌকি আশ্রয় করিয়া পাশাপাশি শুভ্র শয্যা। ইতিমধ্যে কতকগুলি শয্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং রুগ্না নারী ও শিশুদের চিকিৎসা চলিয়াছে। সুবেশধারিণী ধাত্রীরা তাহাদের পরিচর্যা করিতেছে। ডাক্তার রায়ের প্রচেষ্টায় এত শীঘ্র এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সেবাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রণালী ডাক্তার রায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

হেরিস যে মনোভাব লইয়া শ্যামাপুরে আসিয়াছিল, প্রচণ্ড ক্রোধ তাহাতে ইন্ধন যোগাইলেও, সেবাশ্রমের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনারাজি তাহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

সেবাশ্রম পরিদর্শনের পর গোবিন্দনারায়ণ, হেরিস, খৃষ্টকুমারী, আলম ও সত্যেন সান্যালকে অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডী ও তাহার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিল। এই সময় খৃষ্টকুমারী গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিল : আপনার স্ত্রী বিয়ের আগে থেকেই আমাকে ভালো ভাবেই চেনেন।

খৃষ্টকুমারীর কথার পিঠেই মিষ্টার আলম সহসা বলিয়া ফেলিল : সেই চেনাচিনিটা আজ ভালো ভাবে সবাইকে জানাবার জন্যেই উনি এসেছিলেন। কিন্তু সেবাশ্রমের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আপনার স্ত্রী চণ্ডী দেবী আজ 'এস্কেপ' করলেন মিষ্টার গাঙ্গুলী!

কথাটা শুনিবা মাত্র চণ্ডী মুখখানা কঠিন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : বেশ ত, আমরা যখন সেবাশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছি—ওর পিছনে লুকিয়ে নেই, চেনাচিনিটা হোয়েই যাক না ভালো করে।

মিঃ আলম মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল : ব্যস্ত হবেন না, আজ আর জল ঘোলা করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। ও ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবীই রইল।

স্বেচ্ছাসেবকরা হাকিম সাহেব ও তার সঙ্গীদের চা পানের জন্য অনুরোধ করল; কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়াই হেরিস সদলবলে মণ্ডপ ত্যাগ করিল।

উপসংহার

সেবাশ্রমের কাজ ইহার পর সুষ্ঠু ভাবে চালু হইল বটে, কিন্তু চণ্ডীর জীবনে উপর্য্যুপরি এমন কতিপয় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়িল যে, রক্ত-মাংসের দেহবিশিষ্ট কোন মানুষের পক্ষে যে অবস্থায় দৃঢ় থাকা কঠিন। যে ট্রেণে হেরিস ফিরিতেছিল, সেই ট্রেণেই শ্রীপতি শ্রীমানি বাগুলী হইতে সদরে যাইতেছিল। শ্যামাপুর ষ্টেশনের প্লাটফরমে হাকিম সাহেবকে দেখিতে পাইয়াছিল সে। হেরিস তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যায় এবং সকল বৃত্তান্ত তাহার মুখে শুনিয়া চণ্ডী দেবীকে জব্দ করিবার জন্য হেরিস সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলে, চণ্ডীকেও অকুতোভয়ে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নিজের দায়িত্বে পিত্রালয়ে থাকিয়া সে এই সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দনারায়ণকে বাগুলীতে পাঠাইয়া দেয় এবং শ্বশুরের নিকট তাহার ছুটিও মঞ্জুর করিয়া লয়। চণ্ডীর ইচ্ছা ছিল, তরলাদের সভার উৎসবে স্বয়ং যোগ দিবে। কিন্তু নিজে শ্যামাপুরে আটকাইয়া পড়ায় সে ভার দেয় স্বামীর উপরে। কিন্তু তরলার প্ররোচনায় গোবিন্দ নারী-সমিতির উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া চক্রান্ত-চালিত চক্রব্যূহ মধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে, নির্গম পথটি পুঁথি-পড়া বিদ্যার আলোকে বাহির করা সম্ভব ছিল না। ফলে, ধৃষ্টকুমারী—তথা তাহার ভ্রাতা হেরিসের সহিত বোঝাপড়া করিবার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীকে আবার নূতন করিয়া আর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। চণ্ডীর অন্তর্নিহিত আশা—তরলার স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়া তরলার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবে। পক্ষান্তরে, তরলার ক্ষুব্ধ অন্তরে এই কামনা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, নিজের স্বামী বিপথগামী হইলে চণ্ডী তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, কি ভাবে তাহার অনুসরণ করে সে অভিজ্ঞান সে সংগ্রহ করিবে বাস্তবের পথে। একই সঙ্গে এই জটিল সমস্যাগুলির সমাধান-সম্পর্কে কি নূতন পথ গ্রহণ করিতে হয় মনস্বিনী চণ্ডীকে—তাহাদের আখ্যায়িকা আর এক বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়-বস্তু।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

বাসা

দেবব্রত ভৌমিক

'কি হোল, ঘর পেলে?' ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল মালতী।

গায়ের ঘামে-ভেজা জামাটা খুলে ব্রাকেটে টাঙ্গাতে-টাঙ্গাতে সোমনাথ প্রশ্নটা শুনল। উত্তর দিল না। চেয়ারের অভাবে একটা বাক্সের উপর বসে অর্দ্ধ-ছিন্ন একটা মাসিক পত্রিকা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।

'কি হোল?' প্রশ্নটা আবার পুনরাবৃত্তি করল মালতী।

হাওয়া খেতে-খেতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পরম নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে সোমনাথ উত্তর দিল, 'হবে আর কি, যা হবার তাই-ই।'

—'তার মানে?'

—'মানে?...মানে, ঘর পেলাম না।'

—'পেলে না!' মালতী যেন সোমনাথের কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না।

—'না।' সোমনাথ সমানই নির্বিকার।

—কেন, ঘর খালি ওখানে নেই? ছোট মামা কি মিথ্যে খবর দিয়েছেন?"

—'উহুঁ।' মাথা নাড়ল সোমনাথ। 'পাগল হয়েছো, সাক্ষাৎ তোমার মামা না!'

—'তবে?' মালতী পরিহাসে কান দিল না।

—'ঘর খালি ঠিকই আছে। তবে সে-ঘর তোমার ঐ অলক্ত-রঞ্জিত পদচিহ্ন বহন করার জন্য নয়। অবশ্য দুঃখ করার কিছু নেই; তার জন্য আমিই রয়েছি। এই মাথা পাতছি...এখন, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্!' সুর করে কথাটা বলে সোমনাথ নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথা নত করে।

মালতী পরিহাস গ্রাহ্য করে না। বিরক্ত সুরে বলে, 'তোমার ঠাট্টা রাখ এখন। ঘর পেলে না কেন তাই বল।'

—'পেলাম না নয়, নিলাম না।'

—'তার মানে?'

—'মানে এই যে, দু'খানি পায়রা-খোপের ভাড়া মাসিক পঞ্চাশটি টাকা, এবং শুভ গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে পরম মহিমান্বিত বাড়ীওয়ালা মহাপ্রভুকে দেয় অতি সামান্য উপঢৌকন, অর্থাৎ সাদা কথায়, এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা সেলামি। তাই সদর্পে তাদের জানিয়ে দিয়ে এলাম যে, ও-রকম পচা বাড়ীতে সোমনাথ চাটুজ্জে আর তার প্রিয়তমা মহিষী মালতী চ্যাটার্জি থাকে না। বুঝলে?'

—'এক হাজার টাকা সেলামি!' কথাটা যেন মালতীর বিশ্বাস হয় না।

অভিনয়ের ঢংয়ে হাত নেড়ে সোমনাথ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ প্রিয়ে, সামান্য এক সহস্র মুদ্রা।'

'—হুঁ।' মালতী গম্ভীর হয়ে যায়।

সোমনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'কি ভাবছ? টাকাটা তুমিই দিয়ে দেবে কি না, তাই ভাবছ না কি?'

মালতী কোন উত্তর দেয় না। সোমনাথের পরিহাসোজ্জ্বল মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকায়। তার পর মুখ নামিয়ে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খেতে বসতে কথাটা আবার তুললেন সোমনাথের বড়ো দাদার স্ত্রী। মাছের মাথা শুদ্ধ ঝোলটা সযত্নে পাতে ঢেলে দিতে দিতে ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা না কি এখান থেকে চলে যাচ্ছো, ভাই?'

—'কে বললে?' সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

—'ঠাকুরঝিই বলছিল।'

—'কে, মালতী?' মুখের মাঝে মাছের মাথাটাকে কায়দায় আনতে আনতে সোমনাথ বলল, 'ওর যেমন কথা! বাসা পাচ্ছি কোথায় এখন?'

—'হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম।' ওর সুরেই সুর মিলিয়ে বললেন বড়ো শালার স্ত্রী, 'বাসা এখন পাচ্ছোই বা কোথায়। আর তা' ছাড়া, গরীবের বাড়ী দু'-চার দিন থেকে গেলেই বা, জলে তো আর পড়ে নেই।'

শশব্যস্তে সোমনাথ উত্তর দিল, 'এই দেখুন, ও-কথা আমি বলেছি কখনো? আর তা' ছাড়া, আপনাদের কাছে থাকবো না তো থাকবো কোথায়? আপনারা কি আমাদের পর হলেন না কি!'

—'তাই-ই তো ভাই। কিন্তু ঠাকুরঝি যে ঘর-ঘর করে পাগল হয়ে উঠেছে।'

—'ওর কথা ছেড়ে দিন। ওর কি আর কথার কোন দাম আছে? এখনো ছেলেমানুষীই গেল না।' কথাটা বলে মুখভঙ্গীতে একটা পরম ক্ষোভের ভাব ফুটিয়ে তোলে সোমনাথ। অবশ্য আশে-পাশে একবার তাকিয়েও নেয়, মালতীকে কোথাও দেখা যায় কি না দেখে।

মালতীকে তখন যদিও কোথাও দেখা যায়নি, তবুও সে যে ধারে-কাছেই কোথাও ছিল, আর সোমনাথের সমস্ত ক্ষেদোক্তিই শুনেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেই দিনই রাত্রে।

পিছন-ফিরে-শোওয়া মালতীর উদ্ধত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়েই সোমনাথ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। আর, সত্যিই একটু ভয়ও পেয়ে যায়। বরাবরই ও মনে মনে মালতীকে বেশ-একটু ভয় করে চলে। প্রেমজ বিবাহ ওদের নয়। তাই প্রাক্-বৈবাহিক জীবনেই পরস্পর পরস্পরের মনকে জেনে নেবার, বুঝে নেবার সুযোগ পায়নি। বিয়ের পরও সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর কেটে গেছে, তবু আজো মালতী সোমনাথের কাছে সমানই দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেছে। পিওর ম্যাথামেটিকস্ নিয়ে এম, এস-সি, পাশ করেছিল সোমনাথ, ফার্ষ্ট ক্লাশই পেয়েছিল; ফার্ষ্ট হতে পারেনি, হয়েছিল সেকেণ্ড। অঙ্ক কষতো ও জলের মতো, সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব আর প্রফেসর-মহলে ওর ক্লিয়ার ব্রেণের খ্যাতিও নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু অঙ্ক ওর কাছে যতো ক্লিয়ার হোক না কেন, মালতীকে ও কখনো বিশেষ ক্লিয়ার বলে ভাবতে পারেনি। বড়ো লোকের মেয়ে, আদরে-আদরেই ও মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছু চাইবার আগেই হাতের কাছে পেয়ে এসেছে, তাই নিজের মনকে অপরের কাছে স্পষ্ট করে মেলে ধরতে ও অভ্যস্ত হয়নি। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী গিয়েও ওর সে-অভ্যাস বদলায়নি এতটুকু। কি যে ও চায়, আর কি যে ও চায় না, এ-কথা শ্বশুরবাড়ীর কাউকে, এমন কি স্বামীকেও ও নিজে কখনো বলেনি। গণিতবিদ্ সোমনাথও তার ক্লিয়ার ব্রেণ নিয়ে ওর মনের আদি-অন্ত কিছু খুঁজে পায়নি; খেয়ালী বলেই ওকে ঠিক করে রেখেছে। আর, মালতী শুধু খেয়ালীই নয়, একগুঁয়েও। যা ও ধরবে, তা ও করবেই। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে সোমনাথ ওর মনকে না বুঝলেও, ওর খেয়াল আর একগুঁয়েমিকে বুঝেছে বিশেষ করেই; তার পরিচয় পেয়েছে ও বহু বারই। তাই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মালতী যখন ঘরে বসে ওর সাথে একটিও কথা না বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল, তখন সোমনাথ মনে মনে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। গলার স্বর যত দূর সম্ভব কোমল আর অসহায় করে আস্তে আস্তে ডাকে, 'মালতী! এই শোন।'

মালতী উত্তর দেয় না। কথাটা যে ও শুনতে পেয়েছে, তার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

সোমনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে; কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। তার পর ধীরে-ধীরে সাহস সঞ্চয় করে পিছন ফিরে শোওয়া মালতীর গায়ের উপর একটা হাত রাখে। মৃদু আকর্ষণে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'এদিকে ফেরো; শোন একটা কথা।'

সজোরে একটা ঝট্কা মেরে মালতী ওর হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কথা বলে না, মুখে একটা অস্ফুট বিরক্তির শব্দ করে। তার পর ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে শয্যার এক কোণে আগের মতোই আবার পিছন ফিরে উদ্ধত ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে।

সোমনাথ আর কোন কথা বলতেই সাহস করে না। চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মালতী এর পর থেকে ওর সাথে সম্পূর্ণ অসহযোগ করেই চলল। সোমনাথ অবশ্য মাঝে মাঝে কথা বলতে গেছে, কিন্তু মালতী ওর কোন কথারই উত্তর দেয়নি, কথা যে শুনতে পেয়েছে, এমন ভাবই দেখায়নি। একই শয্যায় দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে সারা রাত, কিন্তু পরস্পরের মাঝে কোন কথাই হয়নি। সোমনাথের দিকে পিছন ফিরে মালতী এমনই ভঙ্গীতে শুয়ে রয়েছে, যেন ঘরে ও ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতিই ওর জানা নেই। মাঝে-মাঝে সোমনাথের মনে হয়েছে, পায়ে ধরে দেখবে না কি একবার, বিয়ের পর প্রথম-প্রথম ও রাগ করলে যেমন করতো। কিন্তু সাহস পায় না; যা ও চটেছে, হয়তো লাথিই মেরে বসবে।

সম্পূর্ণ তিনটি দিন মালতী সোমনাথকে এমনি ভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। তার পর চতুর্থ দিন নিজে থেকেই কথা বলল। অবশ্য যে-কথা ও বলল, তা সন্ধির চুক্তিপত্রের কথা নয়, বৃহত্তর দ্বন্দ্বেরই পূর্ব্ব-ঘোষণা।

রাত্রে শোয়ার পর সোমনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে অস্বাভাবিক কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভেবেছ?'

—'এ্যাঁ…আমি?' প্রশ্নের ধরণ আর কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতায় সোমনাথ হতভম্ব হয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে বলে।

—'হ্যাঁ, তুমি কি ভেবেছ?' নিষ্করুণ কাঠিন্যেই প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে মালতী।

—'আমি…আমি কি ভাববো! এই…ভেবেছি যে তুমি আমার উপর খুব চটে গেছ!' প্রশ্নটাকে একটু হালকা করে দিতে চাইল সোমনাথ।

কিন্তু মালতী নরম হলো না। সমানই গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল, 'সে-কথা নয়, বাসার কথা। এখানেই কি চিরকাল থাকবে না কি?'

—'থাকলেই হয়। মন্দ কি।'

—'হ্যাঁ, শ্বশুরবাড়ী সারা জন্ম বসে থাকা তোমার কাছে অবশ্য ভালই, তবে আমার কাছে ভাল নয়। তা-ও যদি মা-বাবা বেঁচে থাকতেন।'

—'মা-বাবা বেঁচে নেই, তার কি হয়েছে; ওঁরা কি কোন অযত্ন করছেন না কি?'

—'না, এখনো করছেন না, তবে বেশী দিন থাকলে করবেন।'

—'তাই না কি?'

—'হ্যাঁ, তাই-ই। পয়সা দেবে না, কড়ি দেবে না, দাদের পরে

বসে থাকলে অপমানই লোকে করে। আর তা'ছাড়া, নিজেদেরও তো একটা লজ্জা-সংযম থাকা উচিত।'

স্তম্ভিত হয়ে উঠল সোমনাথ মালতীর কথা শুনে। মালতী এ-কি বলছে! এতো সঙ্কীর্ণ মন ওঁর! সোমনাথ যেন ভাবতেও পারে না। নিঃশব্দে চুপ করে শুয়ে রইল ও। কোন উত্তর দিল না।

সোমনাথকে নিরুত্তর দেখে মালতীর রাগ যেন আরো বেড়ে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেই আবার বলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি যদি অন্য বাসা ঠিক না করো, তাহ'লে আমিই এখান থেকে চলে যাবো। তার পরে তুমি যা-খুশী করো, শ্বশুর-বাড়ীতেই সারা জীবন কাটিও।'

সোমনাথ শুনল সব। বলল না কিছু। আর কি-ই-বা বলবে। ওর যেন সমস্ত কথা হারিয়ে-হারিয়ে যায়, জলের মতো পিওর ম্যাথামেটিকসের অঙ্ক-কষতে-পারা ওর ক্লিয়ার ব্রেণ যেন গুলিয়ে-গুলিয়ে ওঠে।

মালতী এতো হীন, এমন সঙ্কীর্ণমনা! সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের দাম্পত্য-জীবনে মালতীর অনেক পরিচয়ই সোমনাথ পেয়েছে; অনেক খেয়াল, অনেক একগুঁয়েমিই ওর সয়েছে। কিন্তু ওর মন যে এতোখানি নীচ এতোখানি সঙ্কীর্ণ, এ-কথা সোমনাথ কখনো ভাবতেও পারেনি। তাই আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ওর এই নোতুন-পাওয়া পরিচয়ে ও সত্যিই আন্তরিক ভাবে আঘাত পেল। মাথার মধ্যে বারে বারে শুধু একটি কথাই ঘুরতে লাগল, মালতী এতো হীন, এমন সঙ্কীর্ণমনা!

সোমনাথ চুপ করেই রইল, কোন প্রতিবাদই করল না।

মালতীও আর কোন কথা বলল না। আগের মতোই আবার পিছন ফিরে শুয়ে রইল।

পাকিস্থান হবার কথা হতেই অনেকে সোমনাথকে পরামর্শ দিয়েছিল খুলনার বাড়ী-ঘর বিক্রি করে এখানে চলে আসতে। কিন্তু কথাটা কানে তোলেনি সোমনাথ। অনেকের মতো ও-ও আশা করছিল যে, খুলনা পশ্চিমবঙ্গের ভাগেই পড়বে। আর তা'ছাড়া, এসো বললেই তো আর আসা যায় না? ঘর-বাড়ী, চাকরী-বাকরী ছেড়ে হুট্ করে এখানে এসে করবেই বা কি। বিদ্বজ্জনেরা অনেকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' ত্যাগ করার পরামর্শটা অবশ্য অর্দ্ধ ছিল না, ছিল সর্ব্ব অর্থাৎ সব-কিছুই। যাই হোক, সোমনাথের পাণ্ডিত্যের গর্ব কোন দিনই বিশেষ ছিল না, তাই শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশকেও ও নির্বিচারেই লঙ্ঘন করেছিল। অবশ্য তার ফলটাও পেয়েছিল হাতে-হাতেই। বাউণ্ডারি কমিশনের রায় বেরোতে দেখা গেল যে, সমস্ত আশা-ভরসাই ওদের ব্যর্থ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা টানা হয়েছে খুলনার বাইরে দিয়েই। তখনও অবশ্য সোমনাথ আসতে চায়নি। বলেছে, 'আমাদের আর কি? সামান্য প্রজা আমরা, উলুখড় মাত্র; যার হোক তার হোক অধীনে থাকলেই হলো।' মালতীও সেদিন ওর মতেই সায় দিয়েছে। কিন্তু, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ বাধলে উলুখড়দের জীবনই যে সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে সব চেয়ে বেশী, এ-সত্যের নিদর্শন যখন চারি ধারেই মিলতে লাগল, দেশ উজাড় করে দলে-দলে লোক যখন সব-কিছু ফেলে রেখেই পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ এলাকায় পালাতে লাগল, তখন সত্যিই ওর বিশ্বাসের ভিত্তি একটু-একটু করে টলে উঠেছিল। তার পরে এখান-ওখান থেকে বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা যে-হারে ওকে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ আর ভৎর্সনাপূর্ণ চিঠি লিখতে সুরু করল, তা'তে শেষ পর্য্যন্ত ওর আস্থার মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। ওরাও অবশেষে চলে এলো কোলকাতায়। প্রায় নিঃসম্বল হয়েই আসতে হয়েছিল। বাড়ীর অবস্থা অবশ্য সোমনাথের মন্দ ছিল না, তবে নগদ টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না, ছিল জমি-জমা। সে সব বিক্রি করার চেষ্টাও ও করেনি। আর করলেও বা কিনতো কে। যাই হোক, ভাগ্যটা ওর ভালই বলতে হয়, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজের অফিসে একটা চাকরী পেয়ে গেল। মাইনেটা অবশ্য বিশেষ সুবিধার নয়, তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যা পাওয়া যায় তাই-ই ভাল, তাকেই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। চাকরীটা পাওয়ার পর সোমনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। ভেবেছিল, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর, ভাবনার বিশেষ কিছু ছিলও না, অন্ততঃ সোমনাথ খুঁজে পায়নি। মালতীর বাপের বাড়ী ভবানীপুরে, সেইখানেই উঠেছিল ওরা। শ্বশুর-শাশুড়ী বছর কয়েক আগে মারা গিয়েছেন, বাড়ীর মালিক বর্ত্তমানে শালারা। আর্থিক অবস্থাটা ওদের ভালই; বড় শালা সুকুমার বাবু যুদ্ধের বাজারে প্রকাশ্যে সিমেণ্টের ও পরোক্ষে, অর্থাৎ কালোবাজারে চাল-আটার ব্যবসা করে ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছেন একটা বিশেষ মোটা অঙ্ক। আদর-অভ্যর্থনাও ওদের কিছু কম করেননি তারা। ওদের নিজেদের প্রকাণ্ড তিন তলা বাড়ী পড়ে রয়েছে, জায়গার প্রাচুর্য্য খুব একটা না থাকিলেও অভাব বিশেষ নেই। সোমনাথ আর মালতীর জন্য আলাদা একখানা ঘরও ছেড়ে দিয়েছিলেন ওরা। বলেছিলেন, 'এ-বাড়ী তো তোমাদেরও, থাকো না যতো দিন তোমদের খুশী।' সোমনাথ অবশ্য মাসে-মাসে ভাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নিতে রাজি হননি ওরা। সুকুমার বাবুকে কথাটা বলতে তিনি তো হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন ওকে। পরিহাস করে বলেছিলেন, 'বলো কি হে, একে তো শালাই হয়ে আছি, আবার বাড়ীওয়ালাও বানাতে চাও?' সোমনাথ উত্তর দিয়েছিল, 'তাতে আর হয়েছে কি, লোকে বলে বাড়ীওয়ালা শালা, আমি না হয় বলব শালা-বাড়ীওয়ালা। এই তো?' সুকুমার বাবু হেসেছিলেন। কিন্তু সোমনাথের কাছ থেকে টাকা নিতে রাজি হননি।

যাই হোক, টাকা তারা নিন আর নাই-ই নিন, তা'তে সোমনাথের আসে-যাচ্ছিল না কিছুই। মান-অপমানের সূক্ষ্মবোধ ওর কোন দিনই বিশেষ ছিল না। পান থেকে চুণ খসলেই যে-সম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগে, তা'কে ও সম্ভ্রমবোধ বলতো না, বলতো সঙ্কীর্ণতা। আর, এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও ওর কখনো করেনি। সংসারে চিরকাল ভেসে-ভেসেই এসেছে, সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, এ-সব গুরুতর ব্যাপারের মাঝে পারতঃপক্ষে ও মাথা গলায়নি। মা-বাবা যতো দিন মাথার উপর ছিলেন, ততো দিন তাঁরাই তাঁদের নিরাপদ পক্ষপুটের আড়ালে ওকে ঢেকে রেখেছিলেন। তার পর সে-ভার তাঁরা সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন মালতীর হাতে। মালতী বলিষ্ঠ হাতেই সে-দান

গ্রহণ করেছিল। আর, সোমনাথও নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিল। অন্তহীন সমুদ্রের মাঝে ও-যেন পালছাড়া একটা তরণী, আর মালতী তার হাল, দিক্-দর্শন ; দিক নির্ণয়ের আর গতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার তারই উপর।

এখানে ওঠার কথাও মালতীই আগে তুলেছিল। দাদার চিঠি পেয়ে সোমনাথকে ডেকে বলেছিল, 'চলো ওখানেই আগে ওঠা যাক। তার পরে দেখা যাবে।'

সোমনাথই বরং মনস্থির করে উঠতে পারেনি। তাই বলেছিল, 'কিন্তু ওখানে ওঠাটা কি ঠিক হবে?'

—'কেন, বেঠিকটাই বা হবে কিসে?' মালতী বিরক্তই হয়েছিল ওর কথা শুনে।

তবু সোমনাথ আবার বলেছিল, 'মানে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী···ওদের বিরক্ত করা হবে তো।'

'বিরক্ত আবার কিসের? এতো করে দাদা যেতে লিখেছেন, না গেলে সত্যিই অসন্তুষ্ট হবেন।' মালতী সোমনাথের সব আপত্তিই উড়িয়ে দিয়েছিল।

—'বেশ, তাই ই চল।' অগত্যা সোমনাথ ওর মতেই সায় দিয়েছিল।

এখানে এসেও প্রথম-প্রথম মালতীরও ভালই লাগছিল। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ীর ঘর-সংসার ফেলে ও বাপের বাড়ী বিশেষ আসতে পায়নি। বছর আড়াই আগে একবার এসেছিল, তার পরেই এই এলো। তাই, বহু দিন পরে নিজের কুমারী-জীবনের স্মৃতি-জড়ান পরিবেশের মাঝে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে প্রথম-প্রথম ও বেশ একটু উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছিল। চেনা-শোনা এর-ওর বাড়ীতে ঘুরে-ঘুরে, আর কৈশোরের বান্ধবীদের সাথে দেখা করে-করেই কাটাল কিছু দিন। বৌদিদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে ন'টার শোতে সিনেমাও দেখে বেড়ালো কয়েক দিন। তার পরেই আস্তে-আস্তে ওর সমস্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনাই থিতিয়ে আসতে লাগল। অবশ্য তখনও ও ভাবেনি এ-বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা। বিয়ের পর এই দীর্ঘ, পাঁচটি বছরেও ও মা হতে পারেনি। তাই ওর বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয় ছোট ছেলে-মেয়ে পেলেই ওর সবটুকু স্নেহই তাদের উজাড় করে ঢেলে দিতো। আর, এ-বাড়ীতে ছোট ছেলে-মেয়ের অভাবও নেই ; বৌদিরা সকলেই সন্তানবতী। তাই, বাচ্চাদের নিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে ওর খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সোমনাথ তো সারা দিন অফিসেই থাকে, আর ছুটির দিনগুলোও ওর প্রায় বাইরে-বাইরেই কাটে। আর মালতী সারা দিন বাচ্চাদের নিয়েই কাটায় ; ওদের খাওয়ায়, সাজায় ; ওদের সাথে খেলা করে, আর গল্প বলে-বলে ঘুম পাড়ায়।

বলাকা পাখায় ভর করে না গেলেও, দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু মালতীর মনে দিনের পর দিন কি একটা অস্বস্তি জেগে উঠছিল, কিসের যেন একটা অভাব-বোধ ওর মনকে অনবরত পীড়িত করছিল। কি এই অস্বস্তি, কিসের এই অভাববোধ, তা' ওর নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কর্ম্মহীন দীর্ঘ দ্বিপ্রহরে জনবিরল পথের পানে চোখ মেলে কখনো মালতী ভাবতে চেয়েছে, কিসের এই অভাব-বোধ, কি চায় ওর মন?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে, সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, তার পরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে রাজপথে। মালতী তখনও বসে আছে জানলায়, একই ভাবে। আর ভেবেছে, কি চায় ওর মন, কি পেলে ও সুখী হবে?

ভেবেছে, কিন্তু বোঝেনি। নিজের মন ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

বড়োলোকের বাড়ী, ঝি-চাকরের অভাব নেই, আর বৌদিরাও কিছু অলস-প্রকৃতির নয়। তাই মালতীর কাজ ছিল না কিছুই। সারা দিন ওর বসে-বসে, শুয়ে-শুয়েই কাটতো। কখনো বা সখ করে কোন কাজে হাত দিতে গেছে, কিন্তু বৌদিরা কেউ-না-কেউ তখনই বাধা দিয়ে উঠেছেন। বলেছেন, 'এ কি ঠাকুরঝি, তুমি কেন খাটছ।' বলেই ঝি-চাকর কাউকে ডাক দিয়েছেন। হাতের কাজ ফেলে তারা কেউ না আসতে পারলে, হয়তো মালতী বলেছে, 'আমিই করি না।' কিন্তু বৌদিরা সে-কথায় কান দেননি। প্রায় জোর করেই ওর হাতের কাজ কেড়ে নিতে-নিতে বলেছেন, 'তা কি হয় ; আমরা থাকতে তুমি খাটবে কেন?' অগত্যা মালতীকে উঠে আসতে হয়েছে।

এতে অবশ্য মনে করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও বিশেষ একটা উৎসব উপলক্ষে যেদিন বৌদিরা সারা দিন খাটলেন, আর মালতী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল, সেদিন বিকেলে সারা দিনের পরিশ্রমের শেষে বৌদিরা যখন গা ধুয়ে আসেন, তখন তাদের মুখের স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তির পানে তাকিয়ে মালতী আর স্থির থাকতে পারেনি। সেই দিনই ও প্রথম সোমনাথকে বলেছিল, 'একটা বাসা-টাসা দেখো। এখানে আর কতো দিন থাকা যায়।'

সোমনাথ উত্তর দিয়েছিল, 'হুঁ।' তা'তে অবশ্য হ্যাঁ না কিছুই বোঝা যায়নি। এর পর যতোই দিন যেতে লাগল মালতীর স্বতন্ত্র বাসার তাগিদ যেন ততোই বেড়ে বলতে লাগল। সোমনাথকে প্রায় অস্থির করে তুলল। সোমনাথও যে একেবারেই নিশ্চেষ্ট ছিল, তা' নয়। মাঝে-মাঝে এর-ওর কাছে খবর নিয়ে ঘরও দেখে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সুবিধা মত জুটছিল না কিছুই। আর মালতী দিনের পর দিন ক্রমেই বেশী অস্থির হয়ে উঠছিল।

এমনই সময় এই ব্যাপারটা ঘটল। একে ঘর খোঁজার বিষয়ে সোমনাথের দিক থেকে গরজ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না, তার উপর বৌদিদের কাছে ওকে উপহাস করায় মালতী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। যতোখানি কঠিন ও হতে পারে, তাই-ই ও হলো, যা মুখে এলো তাই-ই বলল।

এতো দিন পরে আজ সোমনাথ প্রথম সমস্ত ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেখল। যে ভাবে মোড় ঘুরেছিল, তা'তে বিষয়টা সত্যিই আর উপেক্ষণীয় ছিল না। মালতী সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিক আর যাই-ই করুক, তা' নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি, বাদ-প্রতিবাদ করার মতো প্রবৃত্তি সোমনাথের হয় না। চিরকালই ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঝগড়া-ঝাটিকে বিশেষ ভয় করেই চলে। আর, তা'ছাড়া এটা পারিবারিক ব্যাপার, এখানে একবার অশান্তি উপস্থিত হলে তার জের বহু দূরই গড়াবে, সহজে মিটবে না সে-অশান্তি। তার চেয়ে মালতী যদি অন্য কোথাও যেয়ে খুশী হয়। তাই-ই হোক।

পরদিনই স্ত্রীর অসুখের অজুহাতে সোমনাথ অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি নিল। অবশ্য একটা মিথ্যে কথা বলতে হলো বলে প্রথমে ওর মন একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু উপায়ই বা আর কি আছে, ঘর খোঁজার জন্ত ছুটি চাইলে হয়তো চিরকালের জন্যই ছুটি দিয়ে দিতেন কর্তৃপক্ষ। আর কিছুই থাক না থাক, কেরাণী বাবুদের চিরকালের ছুটির অস্ত্র স্ত্রীর অসুখের মর্য্যাদা অফিসিয়াল ব্যাপারে এখনো একটু-আধটু আছে। তাই, অনন্যশরণ হয়ে তারই শরণ নিতে হলো। যাই হোক, খেয়ে না খেয়ে প্রাণপণে ঘর খুঁজতে সুরু করল সোমনাথ। সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ, কাশীপুর থেকে কাঁকনাড়া। খুঁজতে বাদ রাখল না কোথাও। খবরের কাগজে, ল্যাম্পপোষ্টে যেখানেই ঘর-ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখল, বাসে-ট্রামে, রেষ্টুরেন্টে যেখানেই ঘর খালির খবর শুনল, সাড়ে ছ'আনা দিয়ে সগু-কেনা ষ্ট্রীট ডাইরেক্টারির সাথে কনসাল্ট করে তখনই সেখানে যেয়ে হাজির হলো। কিন্তু, হা হতোহস্মি; মাথা গোঁজার মতো একটা ছাদওয়ালা পায়রার খোপও জুটল না কোথাও। হিন্দুশাস্ত্র-কথিত পরম ব্রহ্মের মতোই সোমনাথের অভিষ্ট দু'খানা ঘর আর আলাদা কল-জলওয়ালা খুব বেশী-না-ভাড়ার ফ্লাট অদৃশ্যই রয়ে গেল, এতো হাঁটাহাঁটি, এতো খোঁজাখুঁজি সত্বেও সোমনাথের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এলো না। এতো দিনে ও বুঝতে পারল যে, 'এই শহর শহর নয়, মর্ত্ত্যের স্বর্গ' কোলকাতা মহানগরীতে ভিড়ের মাঝে একটা ছুঁচ হারিয়ে ফেলে, তা আবার খুঁজে বের করার চেয়ে একখানা ঘর বের করা ঢের বেশী কঠিন কাজ।

মালতীর শপথের এক সপ্তাহ ফুরিয়েও গিয়েছিল। অবশ্য ও বাড়ী ছেড়ে পথে বার হয়নি, আর সোমনাথকেও পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে ওকে খুঁজে বেড়াতে হয়নি। কিন্তু, ও যে-রকম গুম্ হয়ে থাকে, তা'তে সোমনাথ সত্যিই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কখন যে ও কি করে বসে তার কিছুরই ঠিক নেই। কিন্তু ভেবে-ভেবে মাথা গরম করা, আর পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে পা ব্যথা করা ছাড়া করার মতো আর কিছুই ওর নেই। ঘর খুঁজে পাওয়া সম্বন্ধে ও প্রায় হতাশই হয়ে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতোই মিলে গেল ঘর দু'খানা। অবশ্য ঠিক কোলকাতার বুকেই হলো না, তবে শহরতলী আর শহরে পার্থক্যই বা কতোটুকু। আগে যতোটুকুও ছিল রেফিউজিদের উত্তমে এখন তো তা-ও লুপ্তপ্রায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে অনেক খুঁজে-পেতে ঘর দেখতে হাজির হয়েছিল সোমনাথ। দেখে অবশ্য খুশী হতে পারেনি। ছোট্ট নোংরা গলিটার মাঝে প্রকাণ্ড ভাঙা-চোরা বেমানান বাড়ীটা। বাইরে থেকে দেখেই ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কতো কাল যে বাড়ীটা সারানো হয়নি তার ঠিক নেই, চারি দিকেই নোণা ধরেছে, চূণ-বালি খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে আছে। দেয়ালের গা দিয়ে এদিকে-ওদিকে কতকগুলো গাছ গজিয়ে উঠেছে, দু'-চারটে তো বেশ বড়োই হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না যে কেউ এ-বাড়ীতে বাস করে। বাস যে কেউ করতো, তা-ও নয়। তবে, পাকিস্থান হবার পর বাড়ী ভাড়া নিতে এসে ঘর দেখার প্রথা প্রায় উঠেই গিয়েছে; দেখতে বড়ো একটা কেউ চায়ও না, চার পাশে চারটা দেওয়াল আর মাথার উপর একটু ছাদ, এই পেলেই সন্তুষ্ট। বাড়ীটা সেকেলে আমলের, তৈরী যারা করেছিলেন, বসতবাড়ী হিসাবেই করেছিলেন, ভাড়া দেবার মতলব তাদের ছিল না। তাই ফ্লাট হিসাবে একে ভাগ করা একটু কষ্টকরই ছিল। কিন্তু বর্তমান মালিক সারা বাড়ী জুড়েই আলাদা-আলাদা করে ভাড়াটে বসিয়েছেন। দু'খানি করে ছোট-ছোট পায়রার খোপের মতো ঘর, আর সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় চাটাই দিয়ে ঘেরা এক-এক ফালি রান্নার জায়গা। কল-জলের অবশ্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই, সারা বাড়ীতে একটিই সার্ব্বজনীন কল। কিন্তু এরই ভাড়া মাসে তিরিশ টাকা। তবে একটা সুবিধা এই যে, সেলামি-টেলামি কিছু দিতে হবে না।

ঘর দেখে সোমনাথ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও মালতী হয়। সোমনাথকে বলে, 'চলো, কালই ওখানে যাই।'

—'ওই বাড়ীতে?···কিন্তু, ঘরগুলো বিশেষ সুবিধার নয়।' সোমনাথ ক্ষীণ প্রতিবাদ করে।

মালতী ওর প্রতিবাদে কান দেয় না। বলে, 'তা কি হয়েছে? ওখানে কি আর চিরকাল থাকবো, ভাল বাসা পরে দেখে নিলেই হবে।'

—'আচ্ছা।' সোমনাথ আর প্রতিবাদ করে না।

প্রতিবাদ করেন দাদা-বৌদিরা।

বৌদি অভিমান ভরে বলেন, 'ঠাকুরঝি, আমাদের ছেড়ে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ,—কেন, আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?'

মালতী বৌদিকে জড়িয়ে ধরে আদরে-আদরে অস্থির করে দিতে-দিতে বলে, 'বা রে, বেশ তো তুমি। নিজের বাড়ী যাবো না কোন দিন?'

—'এটা কি তোমার পরের বাড়ী না কি?'

—'আহা, তা হবে কেন। পরের বাড়ী হলে কি আর এতো দিন থাকতাম।' মালতী প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যায়।

শুনতে পেয়ে দাদাও ডেকে বললেন, 'কি রে, তোরা না কি বাসা ঠিক করেছিস?'

—'হুঁ।' উত্তর দেয় মালতী।

—'কেন, এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?' বৌদির মতোই প্রশ্ন করেন দাদা। পুরুষ মানুষ, তাই কণ্ঠস্বরে বৌদির মতো অভিমানের সুরটা বিশেষ স্পষ্ট হয় না। তবু বুঝতে মালতীর অসুবিধা হয় না।

—'না, তা নয়। তবে এক দিন তো যেতেই হবে। আর তা'ছাড়া, তোমরা এতো ভাবছো কেন, কাছেই তো রইলাম, হরদম আসবো।' খানিকটা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতেই বলে মালতী।

'না গেলেই কি নয়?' তবুও দাদা জিজ্ঞেস করেন।

এ-প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না মালতী। মৌন নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তবে এ-মৌনতা যে সম্মতির লক্ষণ নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না দাদার। অস্ফুট আহত কণ্ঠে বলেন, 'ওঃ, আচ্ছা।'

মালতী মুখ নীচু করেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কোন কথাই বলে না।

কথা না বললেও সহজ ওর অটুটই থাকে। পরদিনই নোতুন বাসায় এসে ওঠে ওরা।

গাড়ী নিয়ে সুকুমার বাবু নিজেই ওদের পৌঁছে দেন। আর ঘরের মাঝে পা দিয়েই নাক কুঁচকে মালতীকে বলেন, 'এ-কি বাড়ী রে! এখানে কি করে থাকবি?'

মালতী সহাস্য মুখেই জবাব দেয়, 'কেন, এই তো বেশ।'

মালতী হাসলেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাঁর বাড়ীতে মালতীর কিই-বা এমন অসুবিধা হচ্ছিল, যার জন্য সাত-তাড়াতাড়ি এই এঁদো-পচা বাড়ীতে এসে উঠতে হলো? সুকুমার বাবু কিছুতেই ওর এই খেয়ালের অর্থ বুঝে উঠতে পারেন না! খানিকক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকার পর অপ্রসন্ন মুখেই বিদায় নেন। যাবার সময় বলে যান, 'কর, তোদের যা খুশী।'

মুখে কিছু না বললেও, তিনি যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এ-কথা বুঝতে সোমনাথের অন্ততঃ কোন অসুবিধাই হয় না। সুকুমার বাবুর সামনে আসতেও ওর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। তাই যতোক্ষণ সুকুমার বাবু থাকেন ও পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়, কাজের অজুহাতে অন্য ঘরে গিয়ে বসে থাকে। সত্যিই ওর লজ্জা করতে থাকে। না-জানি ওঁরা কি ভাবছেন, হয়তো ওকেও সঙ্কীর্ণমনা বলে মনে করছেন। যতোই ও ভাবতে থাকে ততোই মালতীর উপর আন্তরিক ভাবেই বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে!

সুকুমার বাবু চলে যাওয়ার পর সোমনাথ সেই যে ঘরের কোণে একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে বসল, আর একবারও নড়ল না।

মালতীই কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘর-গোছানোয় মেতে উঠল। সোমনাথকে কোন সাহায্যেই ডাকল না। চড়ুই পাখীর মতো ও লঘু দ্রুত পায়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়; হাঁটে না, যেন ভেসে-ভেসে যায়। একবার এ-ঘরে আসে, একবার ও-ঘরে যায়; এক মুহূর্ত্তও স্থির হয়ে থাকে না। ভারি-ভারি বাক্স-পেটরাগুলো টানা-হ্যাঁচড়া করে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নেয়, ও-ঘর থেকে এ-ঘরে আনে। জিনিষ-পত্রগুলো এক-একবার এক-এক জায়গায় রাখে, আবার পছন্দ না হওয়ায়, সেখানে থেকে সরিয়ে অন্য ভাবে সাজায়। ওর উৎসাহের যেন আজ শেষ নেই।

—'দেখো তো, সব ঠিক আছে কি না?'

ভাবতে-ভাবতে সোমনাথ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। মালতীর প্রশ্নে চমক ভাঙলো।

—'দেখো না, কেমন সাজিয়েছি।' সাজানো-গোছানো শেষ করে মালতী নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে সব-কিছু দেখতে-দেখতে সোমনাথকে জিজ্ঞেস করল।

সোমনাথ কোন উত্তর দেবার আগে নিজেই আবার বলল, 'নাঃ, কিছু ভুল হয়নি। ঠিকই আছে সব।'

—'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' ওর সুরেই সুর মিলিয়ে সায় দিল সোমনাথ।

খুশী-খুশী চোখে মালতী ওর মুখের দিকে চাইল। বলল, 'এ-ঘরটা হোল, এখন ওটা সাজিয়ে ফেলতে পারলেই আজকের মতো ছুটি।'

কথাটা শেষ করে আবার নিখুঁত পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মালতী।

এতোক্ষণে সোমনাথ ভাল করে চাইল ওর পানে। কি আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে আজ! চেহারাটা ওর এমনিই সুন্দর। ছিপছিপে দীর্ঘছন্দ দেহ, ওভাল-কাট লম্বাটে ধাঁচের মুখে টানা-টানা বড়ো-বড়ো চোখ, পাতলা রক্তিম অধর, আর মাথায় একমাথা ঘন-কালো চুলের রাশ। রূপ ওর প্রথম-দর্শনেই মুগ্ধ হবার মতো। তার উপর কোমরে আঁচল জড়ানোয় ওকে যেন আরো লম্বা-লম্বা, রোগা-রোগা দেখাচ্ছে। বয়সটা যেন ওর হঠাৎ কমে গেছে কয়েক বছর। এতোক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করায় এই শরৎ কালের সকালেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কানের পাশে আর কপালের উপর ঘামে-ভেজা চূর্ণকুন্তল লেপটে রয়েছে।

সোমনাথ অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোমরের আঁচল খুলে মুখটা মুছতে-মুছতে সোমনাথের দিকে ফিরে তাকাল মালতী। মৃদু হেসে বলল, 'কি দেখছ এতো?'

—'দেখছি?...তোমায়। সত্যি আশ্চর্য্য লাগছে তোমায় আজ।'

—'তাই না কি?' সলজ্জ হেসে মালতী বলে। 'তুমি চুপটি করে এখানে বসে থাকো, আমি এক্ষুনি ও-ঘরটা সাজিয়ে ফেলছি।'

মালতী চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল, সোমনাথ একটা হাত ধরে ওকে থামিয়ে দিল।

—'ওটা আজ না-ই বা করলে।' মালতীর ঘামা-ঘামা শ্রমক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সোমনাথ বাধা দিতে চাইল।

'—না, ফেলে রাখলে কোন কাজই হয় না; আজই সেরে ফেলি।'

—'আচ্ছা, তুমি বসো, আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।'

—'না, না, না।' ব্যগ্র দৃঢ় কণ্ঠে মালতী বলে ওঠে, 'না, তোমাকে সাজাতে হবে না। আমার ঘর আমিই সাজাবো, এতে আমি কাউকে হাত দিতে দেবো না।'

সোমনাথ আর আটকে রাখল না ওকে। শুধু বলল, 'ঘেমে উঠেছ, একটু জিরিয়ে নিলে পারতে না।'

—'না, সময় কোথায় আমার? এখনো কতো কাজ বাকি।'

খসে-পড়া আঁচলটা আবার কোমরে জড়িয়ে নিল মালতী। সারা পিঠ জুড়ে এলিয়ে-পড়া চুলের রাশি আলগা খোঁপায় বেঁধে নিল। তার পর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

সোমনাথ সেইখানেই বসে রইল চুপচাপ। ও-ঘর থেকে জিনিস-পত্র নাড়ার শব্দ ভেসে আসতে লাগল, আর তার সাথে-সাথে ভেসে আসতে লাগল মালতীর গুন-গুন গানের সুর।—'বাকি কিছুই আমি রাখবো না। রাখবো না কিছুই...'

কতো দিন মালতী গান গায়নি! তিন মাস, ছ' মাস—বাড়ী ছেড়ে আসার পর থেকে, সোমনাথের মনে পড়ে। এতোদিন পর মালতীর ঐ গুন-গুনানি কানে যেতে হঠাৎ ভারি ভাল লাগতে লাগল সোমনাথের। মালতীর সমস্ত দোষ, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সবই ও ভুলে যেতে চাইল। স্বতন্ত্র সংসার পেয়ে মালতী খুশী হয়েছে। তাই-ই যদিও হয়, হোক না।

কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায় ? হয়তো মনে হয়, ভুললাম। কিন্তু ভোলা হয়তো বা সত্যিই যায় না।

ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। আর, তার প্রয়োজনও মিটে গেছে। যথারীতিই অফিসে হাজিরা দেয় সোমনাথ। কাজটা সেদিন একটু বেশীই ছিল। তাই নিয়ম মাফিক দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর আরো এক ঘণ্টা অফিসের অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আটকা থাকতে হয়।

বাড়ী যখন ফিরে আসে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারা দিনের খাটুনির পর তখন দাঁড়িয়ে থাকার মতো সামর্থ্যও ওর অবশিষ্ট ছিল না। তাই কোন রকমে দু'মুঠো ভাত খেয়ে নিয়েই শয্যায় আশ্রয় নেয় সোমনাথ। অপরিসীম ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙ্গে আসে। কিন্তু ঘুম আসে না। গ্রীষ্মকালের এখনো অনেক দেরী, সবে বসন্ত কাল চলছে। তবু, এখনই এই চার হাত-বাই-পাঁচ হাত ঘরটার মাঝে অস্বাভাবিক গরম বোধ হয়। বাতাস আছে কি নেই বোঝা শক্ত। আর, বাতাসেরই বা দোষ কি, তারও তো একটা আসা-যাওয়ার পথ চাই। ঘরটার চারি দিকে চারটা দেওয়ালে এক দরজা ছাড়া, দ্বিতীয় ছিদ্র নেই। তাই বাইরের বাতাস ঘরে আসে না, আর ঘরের বাতাস বাইরে যাবার পথ পায় না।

শুয়ে-শুয়ে ঘামতে-ঘামতে সোমনাথের মনে পড়ে যায় ওর শ্বশুর-বাড়ীর ঘরখানার কথা। তিনতলার উপর চারি দিক খোলা একখানা ঘর, চার পাশে উন্মুক্ত চারটা জানলার অবারিত পথে মিষ্টি হাওয়ার দাক্ষিণ্য।

ভাবতে-ভাবতে সোমনাথ কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো মালতীর ধাক্কায়।

রাত তখন অনেক হয়েছে। ঘরের মাঝে নিবিড় অন্ধকার। মালতী ওকে ধাক্কা দিচ্ছিল আর ডাকছিল। 'এই ওঠো.…ওঠো…'

সোমনাথ ধড়মড় করে উঠে বসে। প্রশ্ন করে, 'কি, কি হয়েছে ?'

মালতী তখনও ওকে জড়িয়ে ধরে আছে। কাঁপা-কাঁপা ভয়-ভরা গলায় বলল, 'কি যেন একটা আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল।'

—'তাই না কি ? যা বাড়ী, সাপ-খোপ না হয়।'

—'সাপ!' মালতী একেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সাপের কথায় আরো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। গলার সুর কাঁপতে থাকে ওর।

—'ছাড়ো আমায়।'

—'না'। মালতী আঁকড়ে ধরে থাকে ওকে।

—'ছাড়ো, আলোটা জেলে দেখি।' বিরক্ত স্বরে সোমনাথ বলে মালতী এবার ছেড়ে দেয় ওকে। অন্ধকারের মধ্যে লাইটের সুইচ্‌টা হাতড়ে-হাতড়ে বের করে আলোটা জ্বালতেই এক ঝাঁক আরশুলা ফরফর করে উড়তে সুরু করে। আর প্রকাণ্ড আকারের দু'টো ইঁদুর প্রায় ওর গায়ের উপর দিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়।

এতক্ষণে বোঝা যায় মালতীর ভয়ের কারণ। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ায় সোমনাথের শরীরটা খারাপ লাগতে থাকে, আর সমস্তটা বিরক্তিই মালতীর উপর গিয়ে পড়ে। মালতীকে লক্ষ্য করে ও তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'দিলে তো আমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে। সারা দিনের খাটুনির পর একটু শুয়েছি…

মালতী বেশ একটু লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। তাই মৃদু স্বরে বলল, 'আমি কি ভেবেছি ইঁদুর! হঠাৎ গায়ের উপর এসে পড়ল।'

—'পড়বে না,' অপরিসীম বিরক্তি-ভরা গলায় সোমনাথ বলল, 'এখানে কি মানুষ থাকে না কি! তোমার খেয়ালের জন্যেই তো এলাম এই আস্তাকুঁড়ে মরতে।'

—'খেয়াল!'

—'হ্যাঁ, খেয়াল ছাড়া কি; খেয়াল আর তোমার সঙ্কীর্ণ হীন মন।' অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েই সোমনাথ বলে ফেলে কথাটা। আর, পর মুহূর্তেই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মালতী না জানি এবার কি করে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, মালতীর তরফ থেকে কোন উত্তরই এলো না। এক মুহূর্ত ও বড়ো-বড়ো চোখ তুলে সোমনাথের মুখের দিকে চাইল। নীরবে তার পরেই মুখ নামিয়ে নিল।

কয়েক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করার পর সোমনাথ অবাক হয়েই মালতীর নত মুখের দিকে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও স্তম্ভিত হয়ে উঠল। একশো পাওয়ারের বাল্‌বটার পরিষ্কার আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেল, মালতীর আয়ত সুন্দর চোখ দু'টি চকচক করে উঠেছে; আস্তে আস্তে দু'ফোঁটা জল ওর চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে আসে, উজ্জ্বল আলোয় মুক্তাবিন্দুর মতো ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে।

নত মুখেই অস্ফুট স্বরে মালতী বলে, 'তুমি,…তুমিও এই ভেবেছ!'

এতোক্ষণে এতো দিন পরে সব কিছুই সোমনাথের কাছে যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

নীলাঞ্জন

শক্তিপদ রাজ . রু

"নার্স, নার্স"—

কে যেন ডাকছে। চমকে ওঠে কল্যাণী। বেড নম্বর বিয়াল্লিশ কি যেন প্রয়োজনে তাকে ডাকছে। কাতর করুণ কণ্ঠে ও-ডাক শুনে-শুনে কল্যাণী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবুও এগিয়ে যেতে হয়।

"একটু জল!"

উঠে খাবার সামর্থ্য তার নাই, কল্যাণী বাধ্য হয়েই জলটা অল্প-অল্প করে ঢেলে দিতে থাকে, হঠাৎ…কি যেন হয়ে যায় বুঝতে পারে না, অভ্যস্ত হাতটা কেঁপে যায়, জলের গ্লাস হতে বেশ খানিকটা জল চল্‌কে পড়ে রোগীর গায়ে!

…বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত সরে আসে কল্যাণী!…এ কি!

প্রথমে চিনতে পারেনি, রোগক্লিষ্ট দেহটা যেন নড়ে ওঠে, তার চোখ দু'টো যেন কল্যাণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে অতীতের যবনিকা ভেদ করবার চেষ্টা করে।

নীরবে সরে আসে কল্যাণী।···মনে তার চিন্তার দোলা। চারি দিক্ নীরব নিস্তব্ধ! দূরে আকাশ-সীমায় মহানগরীর বুক হতে একটা লাল আভা দিগন্ত বিস্তার করে রয়েছে! আশে-পাশে সব নীরব!···

কল্যাণী ধীরে-ধীরে-ঘর হতে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে আসে!

···কয়েক বৎসর আগেকার কথা।

সহরতলীর এই হাসপাতালে চাকরী নিয়েছিল একটি মেয়ে। প্রথম যেদিন সে এখানে এলো চাকরী করতে, তাকে মুগ্ধ করেছিল এর পরিবেশ, এর শ্যামল ঐশ্বর্য্য, ইট-কাঠের নগরের বাসিন্দা একটি মেয়ের মনকে নাড়া দিয়েছিল! চারি দিকে ফাঁকা মাঠ, আশে-পাশে ডোবা, ছোট-বড় পুকুর, চারি পাশে তার মাথা তুলে রয়েছে তাল নারিকেল আমরুল গাছের সবুজ সমারোহ। ও-পাশের বড় ছাতিম গাছটা মাথা তুলে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরু এক গলি কাঁকরের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলো ভীরু চকিত চাহনি মিলে একটি মেয়ে···

আজকের কল্যাণী তাকে চেনে না, তার অতীতকে বিস্মৃতির অতলেই নিমগ্ন রাখতে চায়, ভুলতে চায় সে!

বাইরে রাত্রির শান্ত-নিথর রূপ, আকাশ-ভরা তারার মাঝে আজও হাতছানি দিয়ে মাঝে-মাঝে সেই অতীতের স্মৃতি-মধুর দিনগুলোকে ডেকে আনবার লোভ সামলাতে পারত না, সে যেন একটা টিনের তোরঙ্গে রাখা এক বর্ষীয়সী নারীর কৈশোরের পুতুল-খেলার স্মৃতিচিহ্ন। মলিন জীর্ণ পুতুলের বর বৌ-সাজা ছেঁড়া শাড়ীর কাপোতে আজও মাখান রয়েছে কোন শিশু-গৃহিণীর হাতের ছোঁয়া, ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি-সৌরভ!

• • • •

রাত্রি হয়ে গেছে, মৌলালীর মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে এগিয়ে চলে কল্যাণী, কেমন যেন একটা থমথমে আবহাওয়া তার মন ভরিয়ে তোলে। দাঙ্গার আতঙ্ক তখনও মুক্ত যায়নি! ও-পাশটা তখনও রাত্রির দিকে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, দু'-এক জন লোক সন্তর্পণে পথ চলে। মাঝে-মাঝে এক-একটা ট্রাম পূর্ণগতিতে এগিয়ে যায় জনহীন রাস্তাটার বুক চিরে।

একা এগোতে সাহস হয় না কল্যাণীর, বাড়ী না গিয়ে রাত্রে হাসপাতালের কোয়াটারে ফিরে আসবে কি না ভাবতে থাকে, অথচ বাড়ী যাবারও দরকার। হঠাৎ একটি ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখে ফিরে চায়। ভদ্রলোকও সেই দিকেই যাবেন! হঠাৎ তিনি কল্যাণীর ডাকে ফিরে চাইলেন।

"আপনি ঐ দিকেই যাবেন?"

—"হ্যা, কেন বলুন ত?"

এগিয়ে আসে কল্যাণী, দু'চোখ দিয়ে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করতে থাকে। রাতের অস্পষ্ট আলোতে যেটুকু দেখে তাতে অবিশ্বাসের কিছু পায় না কল্যাণী। একটা ছোট ঢোক গিলে বলে ফেলে কথাটা: —"আমি একটু জোড়াগির্জার কাছে যেতাম, আমাদের বাসা ঐ দিকে কি না—"

তার চোখে-মুখের ব্যাকুলতা ভদ্রলোকেরও নজর এড়ায় না! দু'জনে এগিয়ে চলে জনহীন রাস্তাটা দিয়ে।

চারি দিক নীরব, মাঝে-মাঝে দু'-একটা প্রাইভেট কার বেগে অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে যায়। জনহীনতা এবং নিথর নীরবতা কেমন যেন কল্যাণীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। হঠাৎ একটা পাশের গলি থেকে দু'-চার জন লোককে বার হয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ায় তারা; মানুষের রক্তের নেশা তখনও মেটেনি, উন্মত্ত মানুষ হয়ত আবার তাদের রক্তের দাগে জায়গাটা রাঙিয়ে দেবে! পরদিন সকালের কাগজে এক কোণে হয়ত লেখা থাকবে, কোন অপরিচিত এক নারী এবং পুরুষের অপমৃত্যুর সংবাদ! আশে-পাশের দেবদারুর গাছে চলেছে রাতের বাতাসের শিহরণ, কল্যাণী কেন জানে না ভদ্রলোকের কাছে খুব কাছে—এসে দাঁড়ায়! পায়ের তলা ঘামতে সুরু হয়েছে, ভদ্রলোকের হাতটা নিজের হাতে কখন এসেছিল জানে না।

গলির ভিতর আবার লোকগুলো চলে গেল। জনহীন রাস্তাটায় আবার নেমে আসে নির্জনতা! কল্যাণী যখন নিজেকে ফিরে পায় দেখে অপরিচিত ভদ্রলোকটির খুব কাছে দাঁড়িয়ে—তার হাতটা ওর হাতে আবদ্ধ।

···"চলুন,—ও কিছু নয়!"

এক ঝিলিক গ্যাসের আলোয় দেখা যায় কল্যাণীর মুখে ফুটে উঠেছে নিশ্চিন্ততা এবং তৃপ্তির হাসি!

—"খুব ভয় পেয়েছিলেন, না?"

উত্তর দেয় না কল্যাণী, নীরবে মুখ নামিয়ে হাসে সলজ্জ হাসি!

সেদিন বাড়ী পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোককে এক দিন আসবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে সে রাত্রের মত বিদায় দেয় কল্যাণী।

মা জিজ্ঞাসা করেন, "কে রে কল্যাণী?"

"আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার! আসছিলেন এদিকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।"—মাকে অম্লান বদনে মিথ্যা কথাটা বলে কল্যাণী!

···একটি সন্ধ্যার নিবিড় আলাপই কল্যাণীর মনে রেখাপাত করে, শত কাযের মাঝে ও কেমন যেন একটু আমেজ নিয়ে আসে সেই হারানো সন্ধ্যার স্মৃতি! আতঙ্কের মাঝে নিঃশেষে নিজেকে অন্য এক জন পুরুষের হাতে সঁপে দিয়েছিল, আপন করে নিয়েছিল তাকে! এই তৃপ্তির মোহই তার কাঙ্গাল মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

হঠাৎ সেদিন বৈকাল বেলায় হাসপাতালের দিকে সুনীল বাবুকে আসতে দেখে চমকে ওঠে কল্যাণী। সেই রাতের ভদ্রলোক! কেমন যেন অজানা আনন্দে সারা মন ভরে ওঠে তার।

সামনে ছোট বাবুকে দেখতে পেয়েই তাঁর কাছেই কয়েক ঘণ্টার ছুটি চেয়ে বসে!

"কি দরকার?"

—"একটু বাড়ীতে যাবো, কায আছে!"···অত্যন্ত অভ্যস্তের মতই মিথ্যা কথাগুলো বলে যায় কল্যাণী!

জীবনের অনাস্বাদিত অধ্যায় আজ তার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এত দিন কল্যাণীর জীবন কেটেছিল বহু অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে! তার জীবন-ইতিহাস মধ্যবিত্ত সর্বহারা শ্রেণীর ঠুনকো ঠাটকে বজায় রাখবার দুর্বার সাধনায় ঘেরা! ছোট ভাই-বোন, বিধবা

মা—তাদের দায়িত্ব তারই উপর। আজ ছোট বোনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, ছোট ভাইও বড় হয়ে উঠেছে, এত দিনের পর আজ নিশ্চিন্ত মন নিয়ে যেদিন বাইরের জগতকে দেখতে চাইল, সেই দিন হঠাৎ সুনীল এলো তাঁর জীবনে!

···মাঝে মাঝে কল্যাণীর বড় ভালো লাগে এই গোপন আনাগোনা! বাড়ী এবং হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষ দু'জনকেই এড়িয়ে চলে তার নোতুন জীবনের অভিযান!

···বসন্ত এসেছে! পত্রহীন শিমুল গাছের মরা ডালে লাল রং-এর সমারোহ, ছাতিম গাছটা বুড়ো মহাকালের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ বেশ হারিয়ে রিক্ত কোন সন্ন্যাসীর মত! মিহি কচি কদবেলের পাতায় ভরে গেছে গাছটা, জামরুল গাছের ঘন পাতার অন্তরালে মাঝে-মাঝে ডাক দেয় কোকিল-দোয়েলের দল। রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

ছাতের উপর তখনও পায়চারী করে কল্যাণী, সারা মনে একটা চাঞ্চল্য। এই কর্ম্মক্লান্ত হাসপাতালের পরিবেশ তার মনকে তিক্ত করে তুলেছে! সুনীল আজ তিন দিন আসেনি! কে জানে, হয়ত শরীর খারাপ।

"মিস্ সেন!"

ডাক শুনে ফিরে চায়—কি একটা ইমার্জ্জেন্সি কেস এসেছে এখুনি অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে! বিরক্ত হয়ে ওঠে মনে-মনে, সব পরিবেশ—মাধুর্য্য কোন্ দিকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, নীচে নেমে যেতে হলো।

কয়েক দিন পর আসে সুনীল; কি একটা কাযে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল তাকে। অভিযোগ করে কল্যাণী—"একটু খবর দিতে পারেন না?"

"কেন?"

"জানি না···" মুখটা নামিয়ে নেয় কল্যাণী।

আকাশের এক কোণে দেখা দেয় একখানা কালো মেঘ। গ্রীষ্মের প্রথম দিক, বোধ হয় ঝড়-বৃষ্টি উঠবে। মহানগরীর কর্ম্ম-কোলাহলময় রাস্তায় চলেছে জনতা—ট্রাম-বাসের ভিড়। দূর নভোমণ্ডলের বিক্ষুব্ধতার দিকে নজর দেবার অবসর কারুর নাই। এক-এক ঝলক বিদ্যুতের আভা দিগন্ত ঝলসে তোলে।

"চলুন, বাড়ী ফিরি!"

সুনীল জবাব দেয়,—"তাই ত, যাবার ত উপায় নাই। এত সকাল-সকাল ফিরে গিয়েই বা কি করবে!"

দু'জনে ছবি দেখতেই ঢোকে গ্লোবে। জনহীন হয়ে রয়েছে হলটা, কি ছবি তাও দেখে ঢোকেনি, নিরিবিলিতে একটু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যেই দু'জনে এসেছে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে অপরিচিত গানের সুর, চোখের সামনে পর্দায় জীবন্ত নর-নারীর ছবি···সব-কিছু মিলে অন্ত জগতের কি যেন এক নোতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের চারি পাশে···

এত কাছাকাছি এত সময় তারা বসেনি ইতিপূর্বে, কল্যাণীর কেশের অস্পষ্ট সুবাস···অন্ধকারে ওর ডাগর চোখের তারার না-বলা ভাষা···একটু পরশ···সুনীলের মন উন্মাদ করে তোলে। কল্যাণীও মন হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

ছবি কখন শেষ হয়ে গেছে জানে না, বাইরে আসে তারা। আকাশে তখন বৈশাখের উন্মাদ বর্ষণ!···কালো জমাট আকাশে··· বর্ষণধারা আলোর সংস্পর্শে এসে ধূসর পাংশু বর্ণে আকাশ-তল ভরে রয়েছে। রাস্তায় বৃষ্টির জল! গাড়ী-বারান্দায়···নিউ মার্কেট সামনে যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে।

অসহায় দৃষ্টিতে কল্যাণী চায় সুনীলের দিকে। বৃষ্টি ছাড়তে এখনও দেরী হবে।

সুনীল-কল্যাণীর মনে আজ অজানা আনন্দের আবেশ। কল্যাণীর জীবনে এই প্রথম পুরুষের সান্নিধ্য!

বর্ষণমুখর রাতে···বৃষ্টির ধারাপাতের মধ্যে তাদের ট্যাক্সিটা এগিয়ে আসে সহর ছাড়িয়ে সহরতলীর দিকে। মাঝে-মাঝে গাড়ীর দোলানিতে দু'জনেই নিবিড়তর হয়ে আসে। কল্যাণীর হাতখান সুনীলের হাতে। কল্যাণীর সারা মনে আজ যেন সব-পাওয়ার নেশা, তার কপালে ফুটে ওঠে কার উষ্ণ নিশ্বাসের আভা! জেলির মত চটচটে নরম ওষ্ঠে কার উষ্ণ পরশ! আবেশে চোখ বুজে আসে, আজ তার কোন সত্তাই যেন নেই, আর এক জনের কামনার পাশে তা মিলিয়ে গেছে।

"কল্যাণী!"

মুখ তুলে চায় মাত্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে সুনীলের দিকে! নীরবে নিজেকে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

সকালের রোদ উঠেছে, মুক্ত আকাশ ছেয়ে গেছে সোনা রং-এর রোদে, বৃষ্টিতে গাছের ধুলো-বালি মুছে গিয়ে সকালের আলোতে আরও ঝলমল করে উঠেছে তারা। বিছানায় পড়ে-পড়েই বাইরের দিকে চেয়ে থাকে কল্যাণী, মনে কেমন যেন একটা গানের সুর। পাশের বিছানাতেই কমল একটু দেরীতে ওঠে, সে কল্যাণীকে গুন্-গুন্ করতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে যায়,—"কি রে কল্যাণী, গান গাইছিস সাত সকালে, ব্যাপার কি বল ত?"

কল্যাণী একটু থতমথ খেয়ে যায়,—"এমনিই।"

পরিবর্ত্তনটা কমলের চোখ এড়ায় না। কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছে সে তার কাছে।

কোন্ দিকে এতগুলো দিন কেটে গেল কল্পনাই করতে পারে না কল্যাণী। বর্ষা এসে গেলো, খানা-ডোবা নীচু জমি সব জলে একাকার হয়ে উঠেছে, ইটের তৈরী রাস্তাটার দু'পাশের নালায় জল জমে জন্ম নিয়েছে জলকচু কালকাসিন্দে গাছের, রাত্রিতে বর্ষার রিমিঝিমি সুর ভেদ করে আসে তাল গাছ-ঘেরা ডোবার বুকে হতে অজস্র ব্যাঙ-এর একটানা শব্দ "গোঁ-গোঁ-গ্যাঙ।" কোথায় তাল গাছের মাথায় কাঁদছে হয়ত একটা শকুন-শিশু। ঝিল্লী-মুখর বর্ষা রাত্রির অতলে একা ভাবে কল্যাণী তার আগামী ভবিষ্যতের আশা-আলোর জালবোনা দিনের কথা। মাঝে-মাঝে কামিনী ফুলের মৃদু গন্ধ ভিজে আবহাওয়াতে ভেসে আসে। বালিশটাকে আরও নিবিড় করে কপোল স্পর্শ দিয়ে ভরিয়ে তোলে কল্যাণী···কার যেন নিবিড় উষ্ণ পরশ সে অনুভব করে ওরই মধ্যে।

কমল প্রায়ই দেখে কল্যাণী কোথায় যেন যায় বৈকালে। ঘণ্টা কয়েক ছুটি যেটুকু মাঝে-মাঝে পাওয়া যায়—কেউ যায় আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে, কেউ যায় শিয়ালদহে কোথায় শাড়ী-ছিট কিনতে। কল্যাণী বলে, সে যায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী

সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। **ক্যালকেমিকোর** প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।

মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল

কিনিবার সময়
আসল জিনিষ
দেখিয়া লইবেন

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯

ফোর্টের পাশের গঙ্গার ধারে দু'জনে বসে রয়েছে—কল্যাণী আর সুনীল। ও-পারে সূর্যের শেষ আভা মিলিয়ে গেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার, দু'-একটা তারা দেখা দেয় আকাশ-কোলে। গঙ্গার বুকে ঢেউ তুলে, ছোট ষ্টীমারগুলো যাতায়াত করে। কল্যাণী নীরবে বসে রয়েছে। ও-পাশে ছোট একটা জাহাজে আন্দামান হতে আমদানী বড়-বড় কাঠের গুঁড়িগুলো নামান হচ্ছে, তাদের কোলাহল ভেসে আসে রাতের অন্ধকারে।

কল্যাণীর মনে আজ রাঙ্গা আশার জালবোনা, তাকে আর হাসপাতালের পরিবেশে আবদ্ধ থাকতে হবে না, কর্মক্লান্তির মাঝে তারা গড়ে তুলবে একটি স্বপ্ন-নীড়, দু'জনের সাধনা দিয়ে গড়ে তুলবে, সার্থক করবে তাকে!

"ওঠা যাক, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে।"

রিক্সা নিয়ে আসছে তারা, হঠাৎ সুনীল একটু বিস্মিত হয়ে যায়, কল্যাণী মাথায় কাপড়খানা তুলে বসে!···

"বেশ কিন্তু মানাচ্ছে তোমাকে।"

মুখ তুলে হাসে কল্যাণী, বলে ওঠে—"রাস্তার লোক আর কিছু ভাববে না আমাদিকে দেখে!"

আরও একটু কাছে সরে আসে কল্যাণী!

···কোয়ার্টারে ফিরেই দেখে, কমল যেন কি আবিষ্কার করে বসেছে! তাকে টেনে নিয়ে যায় ছাদের এক কোণে,—"কি ব্যাপার বল ত তোর?"

—"মানে?" বিস্মিত হয়ে যায় কল্যাণী!

"মাথায় কাপড় দিয়ে কার সঙ্গে রিক্সায় আসছিলি?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত চমকে ওঠে কল্যাণী, তবে কি কমল দেখে ফেলেছে তাদিকে! আবেগভরে তার হাতখানা ধরে ফেলে সে—"কমল, কাউকে কিছু বলিস্ না ভাই!"

হেসে ফেলে কমল—"তাহলে সত্যিই মরেছ?"

···আজ কমলের কাছে কিছুই গোপন করে না কল্যাণী, এত দিন যা চেপে রেখেছিল আজ মনের নিকটতম এক জনকে সবই বলে বসে। মনটা যেন অনেক পরিষ্কার হয়ে যায় তার···নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবার আনন্দ আজ সে আনন্দ হতে যে বঞ্চিত, তেমনি এক জনের কাছে জানাতে মহা গৌরবই বোধ করে কল্যাণী!

তারা বিয়ে করবে, এই হাসপাতালের পরিবেশ হতে দূরে থাকবে কল্যাণী—তার পরিশ্রম দিয়ে আনন্দের জোয়ারে ভরিয়ে তুলবে তার ছোট গৃহাঙ্গন! সুনীল মত দিয়েছে।

রাত্রি কত জানে না, আজ ঘুম আসে না চোখে! আকাশের বুকে এক ফালি চাঁদ···তার অমলিন হাসি বিছিয়ে দিয়েছে ঘাসে পাতায় ধরণীর ধূলিকণায়! নারিকেল গাছের আড়ালে যেন পথ-ভোলা শিশু চাঁদের হাতছানি! উঁচু ছাদের উপর হতে দেখে ঘুমন্ত বিরাট পরিবেশে একা যেন সেই জেগে আছে, কোন মহারাত্রি প্রহর গণনা করতে!

একটা এ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে আসছে এই দিকে, ঘণ্টাটা বেজে চলেছে, নীচে নেমে যায় কল্যাণী! জরুরী ডাক! ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছোট বাবুও ঘুম-চোখে চশমাটা হাতেই ছুটে আসেন।

একটি মেয়ে বিষ খেয়েছে! চেষ্টা করলে হয়ত এখনও বাঁচাতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কল্যাণী ষ্টমাক-পাম্প রেডি করে ফেলে, অন্যান্য যন্ত্রপাতিও! অচেতন দেহটা নিয়ে আসে টেবিলের উপর।

প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করে তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়, মেয়েটি চোখ খুলেছে। তাকে বেডে নিয়ে যাওয়া হলো।

ক্লান্তিতে চোখ ছেয়ে আসে কল্যাণীর, কিন্তু ঘুমোবার উপায় নাই, র' চা খানিকটা ফ্ল্যাস্ক হতে ঢেলে খেয়ে নিয়ে আবার ওয়ার্ডে গেল। মেয়েটি একটু সুস্থ হয়েছে। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে কল্যাণী।

বয়স খুব বেশী নয়। সুন্দরী ছিল এক কালে আজও তা বোঝা যায়। চোখে-মুখে একটা কারুণ্য মাখান। এগিয়ে যায় কল্যাণী তার দিকে! মেয়েটিও তার দিকে চোখ তোলে।

—'কেন এ-কাজ করেছিলেন?'

চুপ করে থাকে মেয়েটি, কোন উত্তর দেয় না। কল্যাণী তার চুলে হাত বোলাতে থাকে।

মেয়েটি বলে ওঠে—'কেন বাঁচালেন আমায়?'

—"বেঘোরে প্রাণটা হারাবেন?"

"—প্রাণটা ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার যা হারিয়েছে তা কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?"

মেয়েটির কথায় একটা ব্যথা ফুটে ওঠে। কল্যাণী চুপ করে যায়। মেয়েটি কাঁদছে। তাকে কাঁদতে দেয়, চোখের জলে হয়ত মনের জ্বালা খানিকটা নিবতে পারে।

কল্যাণী শুনে যায়,···ওর স্বামী আবার না কি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই অপমান সহ্য করতে পারেনি, তার ভালবাসায় এই পরিণতি তার মন ভেঙ্গে দিয়েছে—তাই সে এই কাজ করেছিল।

"সব হারিয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাইনি বোন, আমি চাইনি! আর চাইনি বলেই মরতে বসেছিলাম! কেন তোমরা বাধা দিলে?"

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে কল্যাণী, এই দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা ওর জানা নাই!

রাত্রি শেষ হয়ে আসে!

নাইট ডিউটি সেরে আসে কল্যাণী, সারা দেহে-মনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। ওই ক্রন্দনরতা মেয়েটির কথা ভুলতে পারে না, বার-বার তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ওরই ব্যাকুল কাঁদন-ভরা চোখ দু'টো, সব হারিয়ে কি করে বেঁচে থাকবে সে জীবনের দুর্বিষহ বোঝা বয়ে? তার জীবনে যদি এমনি দুর্ঘটনা আসে, কি করবে! চমকে ওঠে কথাটা ভাবতেই।

···সেদিন সুনীলের সঙ্গে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে। কি কি শাড়ী—অন্যান্য সব জিনিষপত্র তার দরকার কিনতে হবে! দেখতে দেখতে বেশ একটা ছোট-খাট বোঝা হয়ে উঠল। দাম দিতে গিয়ে সুনীল পকেট হতে ব্যাগটা বার করে ওর হাতেই দেয়।

···সারা মন জুড়ে ওদের নোতুন বাসা বোনার কল্পনা, দেশের বাড়ীতে এখন যাবে না, বিয়ে করেই কলকাতাতেই থাকবে; তার পর দেশে এক বার বেড়াতে যাবে।

—"তোমার মা আসবেন না?"

—"আসবেন বৈ কি, বিয়ে কদ্দি, বাসাতে এসে তোমায় দেখে যাবেন।"

—"মায়ের কি মত নাই ?"

—"বাঃ রে, ছেলে বিয়ে করবে, মায়ের অমত কেন থাকবে ? চল, অনেক রাত হয়েছে।"

দু'জনে এগিয়ে আসে।

ওদের সমস্ত কিছুরই ঠিক-ঠাক। সামনের মাসেই বিয়ে হচ্ছে। কমলকে সংবাদটা জানাতে ভোলে না। হঠাৎ একটা প্যাকেটের মধ্য হতে পড়ে যায় ব্যাগটা। একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায় কল্যাণী—কথায়-কথায় কখন ভুলে ব্যাগটা ওর সঙ্গে চলে এসেছিল জানে না, হয়ত বাড়ী গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে সুনীল। মনে-মনে হাসে কল্যাণী—খুঁজুক একটু, যেমন বেকুব লোক !"

ব্যাগটা খুলে দেখতে থাকে, কয়েকখানা নোট···একটা চিঠি ওর কলকাতার বাসার ঠিকানায় এসেছে,···যাক্, কাল তাহলে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে আর এক চোট বকুনিও দিয়ে আসবে ওর এই ভুলের জন্য।

ক'দিন থেকেই বড় ডাক্তার বাবু দেখছিলেন কল্যাণীর এই অমনোযোগিতা ! ডিউটিতে কখন কখনও থাকেই না, কাজ যা করে তা-ও ভুলে ভর্ত্তি ! কাল দু'টো পেসেন্টের 'ষ্টিচ' কাটতে হবে ওর খেয়ালই নাই, একটা অপারেশান কেস, তাকে পার্গেটিভ দিতে ও ভুলে গেছে।

বেশ এক চোট কড়া কথা শুনিয়ে দেন তিনি ! কল্যাণীও সকাল বেলাতেই এমনি ব্যবহার আশা করেনি, সামান্য ভুলের জন্য সকলের সামনে তাকে বলে বসেন বড় বাবু—"পোষায় চাকরী করবেন, না পোষায় চলে যান, অন্য নার্স আসবে।"

কল্যাণীও আজ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, সে ত চলেই যাবে, কিন্তু এ অপমান সহ্য করবে না, সটান এক টুকরো কাগজে কি লিখে দিয়ে কোয়ার্টারে উঠে যায় কল্যাণী। বড় বাবু বিস্মিত হয়ে যান ! এ কি। এক কথায় চাকরীতে ইস্তফা দিতে চায় কল্যাণী ! এ ভাবে তাকে কিছু বলতে চাননি তিনি।

"মিস্ সেন—মিস্ সেন !"

কল্যাণী চলে গেল, কোন কথাই শুনলে না। কমল, অন্যান্য নার্সরাও এসে পড়েছে, তারাও দেখে ব্যাপারটা !

···খবরটা বলবার জন্যই আজ কল্যাণী সুনীলের বাসার দিকে পা বাড়ায়। আজ হতেই সে চলে আসবে, বিয়ের পর দরকার হয় অন্য চাকরী খুঁজে নেবে।

বেলা প্রায় নটা বাজে, কর্মব্যস্ততা সুরু হয়েছে চারি দিকে। গলির মধ্যে বাড়ীখানার দিকে এগিয়ে আসে কল্যাণী, আজ সুনীলকে সব কথা বলে সে খানিকটা হাল্কা হতে চায়। এক জনও আপন তার আছে যে সব বিপদ হতে তাকে উদ্ধার করতে পারবে।

কড়া নাড়তেই একটি ছেলে বার হয়ে আসে।

সুনীল বাবুর নাম করতেই তাকে সে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসায়।

কল্যাণী বসে রয়েছে, হঠাৎ কা'কে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল। একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে, সুনীল বাবুর কথা শুনে সে বলে ওঠে, 'তিনি ত কি একটা কাজে সকালেই বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন বলে যাননি। যদি কিছু বলবার থাকে আমাকেই বলতে পারেন !"

—"আপনি ?"

সামনে সাপ দেখলেও এত বিস্মিত হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠত না কল্যাণী। পায়ের নীচে হতে মাটি যেন সরে যাচ্ছে, মাথাটা ঘুরপাক দিতে থাকে, দু'হাতে চেয়ারের হাতলটা ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে কল্যাণী। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটি সুনীল বাবুর স্ত্রী ! মেয়েটিও বিস্মিত হয়ে গেছে, কল্যাণীর এই পরিবর্ত্তনে। কল্যাণী একটা মনিব্যাগ বার করে দেয় মেয়েটির হাতে।

"কাল সন্ধ্যা বেলায় এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, ভিতরে নাম-ঠিকানা দেখে ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম, আচ্ছা আসি।"

বৌটি জিজ্ঞাসা করে—"আপনার নাম ?"

"নাম বললে চিনতে পারবেন না তিনি।"

বার হয়ে আসে কোন রকমে, পা দু'টো টলছে, মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা ! দিনের আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেছে তার চোখে।

···কল্যাণী যেন স্বপ্ন দেখছে। কোন এক আলো-ঝলমল দেশ, জাফরাণী রংএর আকাশ-কোলে শীর্ণ শুভ্র মেঘের ভেলায় কার আনাগোনা। একটা মুখ ! সুনীল !···না—না ! বিশ্বাসঘাতক নরকের কীট সে !

চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই রাত্রের ঘটনা—একটি মেয়ে বিষ খেয়েছিল—তার সব-হারানোর কান্না ! আজও ভুলতে পারেনি সে।

আবার কি তার জন্য ফুলের মত নিষ্পাপ ওই বৌটিও মরণের পথযাত্রী হবে ?

কখন যে হাসপাতালের কাছে চলে এসেছিল জানে না। নীরবে প্রবেশ করে।

বড় ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন প্রথম থেকেই। হঠাৎ কল্যাণীকে উস্কো-খুস্কো বেশে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চান। আজ তার সব দর্প চূর্ণ হয়েছে, কাজ ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে সে পারবে না, তাকে কাজের মধ্যেই নিজেকে সব ভুলিয়ে রাখতে হবে, তাই ফিরে এসেছে আজ সব হারিয়ে।

"আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছিলাম ডাঃ গুপ্ত ! I am very sorry ! আপনি আমায় মাপ করুন !"

"এ কি !" ডাঃ গুপ্ত কোন দিন এমনি ভাবে সদা হাস্যময়ী এই মেয়েটিকে ভেঙ্গে পড়তে দেখেননি ! কান্নায় ফুলে-ফুলে ওঠে কল্যাণীর দেহ !

'কি হয়েছে মিস্ সেন, ছিঃ ! কি এমন অন্যায় করেছেন আপনি ? That's nothing !'

কল্যাণীর এই কান্নার কারণ ডাঃ গুপ্তের চোখে পড়ে না। পড়ে মাত্র এক জনের—সে কমল !

সারাটা দিন কোন্ দিকে কেটে যায় কল্যাণী বুঝতে পারে না ! দিনের আলো কখন নারকেল গাছের পাশ দিয়ে আলতো ভাবে লুটিয়ে পড়ল তা-ও তার চোখে আজ ধরা দিল না ! জামরুল সুপারী বন হতে কখন দোয়েলের মধু-গান ফুরিয়ে গেল তার হিসাবও আজ কল্যাণী রাখেনি ! অশ্রুবিজড়িত বিশুষ্ক আঁখি-তারার পরতে ওর নেমে এল রাত্রের নিবিড় অন্ধকার !

"কল্যাণী—কল্যাণী !"

কমলের ডাকে মুখ তুলে চাইল সে।

"মন খারাপ করিস না !"

কথা কয় না কমল! কি যেন ভাবছে—এ ভাবনার সীমা শেষ নাই! রাত্রি ঘনিয়ে এল! তাল-নারকেল গাছের মাথায় চকচকে চাঁদের আলো আজ চোখে ওর জ্বালা ধরিয়ে দেয়! ঘৃণা দিয়ে তার প্রেমকে তিক্ত করে তুলতে চায় না কল্যাণী। সুনীল মিথ্যাবাদী, কিন্তু কল্যাণীর প্রেম মিথ্যা নয়, গন্ধমদির রাতের বাতাসের মতই তা ক্ষণস্থায়ী হলেও সুন্দর এবং সত্যি।

এই সত্য নিয়েই বেঁচে থাকবে কল্যাণীকে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের মাঝে!

আজও আসে তেমনি রাত্রি, বাতাপি ফুলের গন্ধমদির চাঁদের হাতছানি-মাখা কত রাত্রি, কল্যাণীর জীবনে তার কোন দাম আর নাই!

আশে-পাশে এসেছে অনেক পরিবর্ত্তন।

সহরতলীর শ্যামল রূপ বদলে যাচ্ছে মহানগরীর করাল গ্রাসে। ইট-কাঠের প্রাসাদ এগিয়ে আসছে এই দিকে। সমস্ত ছোট-বড় পুকুর বুজে গেছে!• বর্ষার রাতে ব্যাঙএর ডাক আর কানে আসে না। মজা পুকুরের উপর সবুজ কচুরীপানার বুকে ভেলভেট রংএর ফুলগুলো জলার কচু ফুলের হলদে হাসিকে ভালোবাসা আসেনি। ওরা সবাই কোন্ অদৃশ্য জগতে মিশিয়ে গেছে।

বাতাপি ফুলের গন্ধ—রাস্তায় মোটরের পেট্রল-পোড়া তীব্র গন্ধে বিকৃত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়ে গেছে মহাশূন্যে কল্যাণীর সেই স্বপ্নমাখা চাঁদনী রাত! সব হারিয়ে গেছে অতীতের বুকে, আজ তার কোন দামই নাই।

কল্যাণী তাই ওই বেড-নাম্বার বিয়াল্লিশকে দেখে প্রথম চমকে উঠেছিল! কিন্তু কি ওর দাম আছে আজ? আজ কি আবার কল্যাণী পারবে ওই রোগক্লিষ্ট সুনীল ঘোষকে ভালবাসতে, মিথ্যা নীড়-রচনার স্বপ্ন দেখতে? অসম্ভব!

ও তার কেউ-ই নয়!—হাসপাতালের পেসেণ্ট, বেড-নাম্বার বিয়াল্লিশ!

তবু কেন জানে না কল্যাণী···তার চোখ হতে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু! বাতাসে যেন বাতাপি ফুলের ভিজে গন্ধ আজও ভেসে আসছে, আজও যেন চাঁদের চোখে কোন আবছা হাসির আভা!···

সম্মোহন

(সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী)

হৃষীকেশ হালদার

সহরতলী বেহালা। দুর্য্যোগ-ভরা রাত। অবিরাম বর্ষণ, মেঘের গর্জ্জন আর ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া বাড়ী, এধারে-ওধারে বিচ্ছিন্ন গাছের সারি—সবই যেন প্রেতায়িত ছায়ার মতো মনে হয়। পথ জনহীন। যাত্রীশূন্য শেষ ট্রামখানা সবেগে ডিপোর দিকে চলে গেলো মাঝের ষ্টপেজগুলোকে উপেক্ষা করেই। এমন সময় দূরে দেখা গেলো এক দীর্ঘায়ত ছায়ামূর্ত্তি অস্পষ্ট আবছায়ার মতো। ধীরে ধীরে সে মূর্ত্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমশঃ সে এগিয়ে আসছে ধীর-মন্থর গতিতে। সারা দেহে তার নেই কোন স্পন্দন—ঠিক যেন একটা প্রস্তর-মূর্ত্তি। শুধু দীর্ঘ পা দু'টো টেনে টেনে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রকাণ্ড একটা বাগান-বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সেই ছায়ামূর্ত্তি। বিদ্যুতের চমকে মুহূর্ত্তের জন্যে ফুটে উঠলো একটা জিঘাংসা-ভরা মুখ—চুলগুলো তার এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। বড় বড় চোখ দু'টো থেকে ফুটে উঠছে এক অমানুষিক দৃষ্টি। ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হাত দু'খানায় লৌহবলয়ের সঙ্গে ঝুলছে ছিন্ন লৌহশৃঙ্খল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠে মিলিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সেই ছায়ামূর্ত্তির বীভৎস রূপ। অন্ধকারে শুধু জেগে থাকে একটা আবছা দীর্ঘ মূর্ত্তি মাত্র।

বাগান-বাড়ীর ভেতরে বৈঠকখানা-ঘরে বসে তখন নিজেদের মধ্যে কথা কইছিলো মলয়া আর বিভাস—দু'টি ভাই-বোন। বিভাস যেন এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলো না। মাত্র কয়েক দিন আগেও সে ছিলো অতি দরিদ্র—ষাট-সত্তর টাকা মাইনের সামান্য এক জন কেরাণী মাত্র। আর আজ সে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক!

মামা তার অবশ্য এক জন ছিলেন; কিন্তু কোন দিন তিনি বিভাসদের খোঁজ-খবর করেননি। মায়ের মুখে বিভাস শুধু শুনেছিলো—তিনি না কি মস্ত ধনী। কলকাতার ধারে বেহালায় তাঁর বাড়ী। শুধু এই পর্য্যন্তই। নিজে সে মানুষ হয়েছে অসহ দারিদ্র্যের মধ্যে—যেখানে কল্পনাবিলাসের কোন স্থান ছিলো না। বাঙালী হয়েও বাংলা দেশের মাটী স্পর্শ করলো বিভাস এই প্রথম। বাবা চাকরী করতেন দিল্লীতে—মাইনে যা পেতেন, তাতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনগুলো চলে যেতো। কিন্তু বিভাস আর মলয়ার অতি শৈশবেই যখন তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেন, তখন বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেননি। সেই স্বল্প সঞ্চয়ের পুঁজি ভেঙে-ভেঙে মা যে কি করে বিভাস আর মলয়াকে মানুষ করেছিলেন, সে সব কথা আজ যেন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। ক্রমে বিভাস বড় হলো—সঙ্গে সঙ্গে মলয়াও। বিভাস অনেক চেষ্টায় চাকরীও জোটালো একটা। মনে হলো, এইবার বুঝি মায়ের দুঃখ ঘুচবে। সার্থক হয়ে উঠবে তাঁর স্বপ্ন আর সাধনা বিভাস আর মলয়ার মাঝ দিয়েই।

কিন্তু হায় রে দুরাশা! মানুষ অনেক আশা করে তাদের প্রাসাদ গড়ে তোলে; ভগবান এক মুহূর্ত্তের ঝঞ্ঝায় ধূলিসাৎ করে দেন সে সুখ-স্বপ্ন—ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সেই তাসের প্রাসাদ। বিভাসের চাকরী পাবার অল্প দিনের মধ্যেই মা তাদের মায়া কাটিয়ে পরলোকের পথে পাড়ি দিলেন। যাবার আগে মরণোন্মুখ

মাতৃহৃদয়ের সেই আকুতি, তাঁর সেই শেষ কথা ক'টি বিভাস আজো ভুলতে পারেনি।

—তোদের দেখবার যে আর কেউ রইলো না বাবা, মা বিভাসের হাত দু'টি ধরে কি কাতর স্বরেই না বলেছিলেন: "এত বড় পৃথিবীতে আজ তোরা একা,—একেবারে একা। এত ঐশ্বর্য্যের মালিক তোদের মামা, কিন্তু তিনি বেঁচে থেকেও আমাদের কাছে না থাকারই সমান। বেঁচে আছি কি না একটা চিঠি লিখেও খোঁজ নেন না। অথচ তিনি চিরদিন এমন ছিলেন না।"

—সত্যি মা, আমারও ভারী আশ্চর্য্য মনে হয়। বিভাস উত্তর দিয়েছিলো: তোমার মুখেই শুনেছি মামার ছেলেপুলে কিছুই নেই, তিনি বিয়ে পর্য্যন্ত করেননি। তাঁরও আপনার বলতে শুধু আমরাই। তবু কেন যে তিনি আমাদের কোন খবর রাখেন না······

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলেছিলেন: সবই ভাগ্য বাবা! এমন এক দিন ছিলো, যখন প্রতি সপ্তায় একখানা চিঠি না পেলে তোদের মামা রাগ করতেন। তার পর কি যে হলো তাঁর···! তিনি হঠাৎ আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। উনি শেষ পর্য্যন্ত এক দিন দাদার সঙ্গে দেখা করতে সেই বেহালায় ছুটেছিলেন; কিন্তু দাদা আদর-আপ্যায়ন করা দূরে থাক, একবার দেখা পর্য্যন্ত করেননি। চিঠি লিখলে কোন উত্তরও আর দিতেন না। অথচ কি যে আমাদের অপরাধ তাও তো বুঝে উঠতে পারলাম না কখনো!

মরণ কালে মায়ের এই বিলাপ বিভাস এখনো ভুলতে পারেনি। নিজে সে কখনো মামাকে দেখেনি পর্য্যন্ত। অথচ সেই মামার বিপুল সম্পত্তিরই মালিক আজ বিভাস! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন আশ্চর্য্য লাগে! হঠাৎ এক দিন একখানা এটর্নীর টেলিগ্রাম—

আপনার মামা বীভৎস ভাবে খুন হয়েছেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক আপনিই। অবিলম্বে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করুন।

—নিখিল দত্ত, এটর্নী-এট-ল

টেলিগ্রাম পেয়ে কালবিলম্ব না করে বিভাস চলে এসেছে কলকাতায়। মাত্র আজই সে পৌঁছেছে এখানে—সঙ্গে সঙ্গে এটর্নী তাকে মামার এই বাগান-বাড়ীর চাবী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। সমস্ত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ বুঝে নিতে সে পারেনি; তবে এটর্নী দত্ত বলেছেন, মোট সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক লাখ টাকার কম নয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আবুহোসেনী কাণ্ড! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না কিছুতেই। রাত পোয়ালে আবুহোসেনের মত পাগলা গারদে যেতে না হোক্, এ স্বপ্ন ভাঙ্গার আশঙ্কা বিভাস মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না অনেক চেষ্টা করেও। মলয়া কিন্তু বিভাসের মত এতটা বিস্মিত হয়নি, তাই সে বিভাসের এই মানসিক চঞ্চলতাকে লঘু করবার জন্যে রীতিমত তর্ক জুড়ে দিয়েছিলো।

ঘরের মধ্যে মলয়া আর বিভাস যখন নিজেদের ভাগ্য-বিবর্ত্তনের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত; ঠিক সেই সময়েই ছায়ামূর্ত্তিটির আবির্ভাব ঘটলো তাদের বাগান-বাড়ীর সামনে। এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলো সে—তার পর লাফ দিয়ে উঠে বসলো বাগান-বাড়ীর অনুচ্চ প্রাচীরের ওপর। দুদিকে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে সে বসে রইলো বেশ কিছুক্ষণ—তার পর মার্জ্জারের মতো ঝুপ্ করে লাফ দিয়ে পড়লো বাগানের ভেতর।

এদিকে বিভাস আর মলয়ার মধ্যে তর্ক বেশ জমে উঠেছে। বিভাস তার এই সম্পত্তি প্রাপ্তির মধ্যে কোথায় একটা যেন রহস্যের সন্ধান পাচ্ছে। কোথায় যেন কি একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, কি একটা গোলমাল আছে এর মধ্যে—এই তার ধারণা। মলয়া সে কথা মানতে চায় না কিছুতেই।

বিভাস বলে—মামার এটর্নী মামার মৃত্যুর পরই যে আমাদের টেলিগ্রাম করলেন, তিনি আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায়?

মলয়া উত্তর দেয়—হয়তো মামাই তাঁকে ঠিকানা দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর জীবিত কালে। তিনি তো জানতেন, তাঁর মৃত্যুর পর একদিন আমাদের খোঁজ পড়বেই। আমরা ছাড়া দুনিয়াতে তাঁর আর কেউ নেই, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এর মধ্যে সন্দেহ করবার কি আছে?

—কিন্তু মামাই বা আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায়? বিভাস আবার তর্ক তোলে—বাবা বেঁচে থাকতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক উঠে গিয়েছিলো, এমন কি চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিলো না। বাবা মারা যাবার পর আমরা যে বাড়ীতে উঠে এসেছি, সেখানের ঠিকানা তিনি জানবেন কি করে?

—বেশ তো বাপু, মলয়া এবার একটু ঝাঁঝালো সুরেই বলে: কাল সকালে সে কথা এটর্নীকে জিজ্ঞাসা করলেই তো চলবে। তার জন্যে মিথ্যে মাথা খারাপ করার দরকার কি?

বিভাস মৃদু হেসে বলে: তোর দেখছি এই বিপুল সম্পত্তির আভাষ পেয়েই মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে মলয়া—নইলে এমন করে ঝাঁঝিয়ে কথা বলতে পারতিস্ না কখনো। কিন্তু আমি বলে রাখছি, দেখিস তুই, আমার সন্দেহ একেবারে মিথ্যে নয়। আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় কি একটা গলদ আছে। তাছাড়া মামা কেন খুন হলেন, কে খুন করলে, তার কিছুই এখনো জানা যায়নি।

—সে কাজ পুলিশের, আমাদের নয়। মলয়া উত্তর দিলে: তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা করা মিছে! তাছাড়া···

মলয়া আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার চোখ পড়লো জানলার খড়খড়ির দিকে। তার পাখীগুলো বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে আছে, আর তার মধ্যে দিয়ে ঘরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাইরের দিকে। সেই আলোয় দেখা যায় একখানা বীভৎস মুখের কিছু-কিছু অংশ আর জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ। অমন করে এত রাতে কে উঁকি মারছে জানলা দিয়ে? এই কিছু দিন আগে মামা এই বাড়ীতেই খুন হয়েছেন, একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার। ভয়ে সে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জানলার খড়খড়িটা বন্ধ হয়ে যায়।

মলয়ার চীৎকারে বিভাস সচমকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে চায় জানলার দিকে। ঝপ্ করে একটা শব্দ—খড়খড়িটা হঠাৎ

বন্ধ হয়ে যেতে দেখলো বিভাস। কে উঁকি মারছিলো এত রাতে এই জানলা দিয়ে? সাহসের অভাব ছিলো না কোন দিন বিভাসের। খালি বাড়ী মনে করে হয়তো কোন ছিঁচকে চোর চুরি করতে এসেছে এই রাত্রে। ঝড়-জলের রাত চোর-ডাকাতদের পক্ষে যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ! যেই হোক, তাকে ধরা চাই-ই। বিভাস ছুটে গেলো সদর দরজার দিকে।

এক মুহূর্ত্তেই মধ্যে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে মলয়াও অনুসরণ করলো তাকে। যাবার সময় টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা টর্চ্চ নিতেও সে ভুললো না। অন্ধকারে বাগানের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে ওই বিচিত্র আগন্তুক, তাহলে তাকে ধরবার জন্যে টর্চ্চটার সাহায্য হবে অপরিহার্য্য।

দরজা খুলতেই বিভাস মুখোমুখি হলো এক দীর্ঘ মূর্ত্তির; মাথায় সে অনেকটা লম্বা বিভাসের চেয়ে। বিভাসের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে একটুও সঙ্কুচিত হলো না সেই দীর্ঘদেহী; বরং তার গলা থেকে এক বিচিত্র ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা গেলো—যেন কোন জন্তুর শিকারপ্রাপ্তির উল্লাস-ধ্বনি! পরমুহূর্ত্তেই আবার সে গর্জ্জন করে উঠলো। অমন গর্জ্জন-ধ্বনি যে কোন মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পারে, এ কথা বিভাসের জানা ছিলো না। তবে এ আগন্তুক কে? কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেলো—না রইলো তার চীৎকার করার শক্তি, না রইলো পালিয়ে যাবার ক্ষমতা। শুধু বিস্ফারিত চোখে সে চেয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে।

গর্জ্জন করতে করতে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তি হাত দু'টো ধীরে ধীরে এগিয়ে আনলো বিভাসের গলার দিকে। বিভাস আতঙ্কে দু'পা পিছু হটে গেলো—আগন্তুকও এগিয়ে এলো সামনের দিকে। তার পর হঠাৎ টিপে ধরলো বিভাসের গলা। বিভাস ভয়ে চীৎকার করে উঠলো—কিন্তু প্রতিরোধ করবার মত সাহস বা শক্তি, কিছুই তার ছিলো না।

মলয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এসে পড়েছিলো বিভাসের পিছনে। ব্যাপার কি ঘটছে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে টর্চ্চটা হঠাৎ জ্বেলে তার আলোয় দেখতে গেলো সামনের দিকে। টর্চ্চটা জ্বলতেই অকস্মাৎ তার আলো প্রতিফলিত হলো আগন্তুকের চোখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে বিভাসের গলা ছেড়ে দু'হাতে চোখে চাপা দিয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী সে আর্ত্তনাদ! রাতের নিস্তব্ধতা খান্‌-খান্‌ করে, ঝিম্‌-ঝিম্‌ বর্ষণের শব্দকে ছাপিয়ে সে আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হলো বাতাসের বুকে। তার পরই ছুটে পালিয়ে গেল সেই দীর্ঘদেহী—এবার আর পাঁচীল টপ্‌কে নয়—ফটক খুলেই।

আগন্তুক বিভাসের গলা ছেড়ে দিতেই বিভাস জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়লো সেইখানেই। মলয়া তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ব্যগ্র কণ্ঠে ডেকে উঠলো—দাদা, দাদা!

বিভাসের বাগান-বাড়ীর ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী। বাড়ীখানার বর্ত্তমান মালিক দেবব্রত। বাপ-মা গত হয়েছেন অনেক দিন। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে সে নিজে আর বহু কালের চাকর গোবিন্দ। গোবিন্দকে চাকরও বলা যায়, আবার এ বাড়ীর কর্ত্তাও বলা যায়। ছেলেবেলা থেকে দেবব্রতকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে সে। সুতরাং সে এখনো দেবব্রতকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই মনে করে। কারণে-অকারণে তার ওপর খবরদারী করতেও ছাড়ে না। সত্যিই সে দেবব্রতকে ভালোবাসে নিজের সন্তানের মতো। তাদের মধ্যে তাই প্রভু-ভৃত্যের ব্যবধান গড়ে উঠতে পারেনি। দেবব্রত পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে ডাক্তারী পড়ে, ফুটবল হকি ক্রিকেট ম্যাচ দেখে বেড়ায়; আর সংসারের সব দায়িত্ব বয়ে বেড়ায় গোবিন্দ। সেই একাধারে তার পাচক, ভৃত্য, বাজার-সরকার—সব কিছু।

যে রাত্রে বিভাসের মামার বাগান-বাড়ীতে ওই দীর্ঘদেহী আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটলো, সেই রাত্রে দেবব্রত একটা পূর্ণাবয়ব কঙ্কাল সামনে রেখে গ্রের অ্যানাটমী খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে মানবদেহের রহস্যভেদের বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলো। বাদলার রাতে মনটা পড়াশোনায় বসছিলো না কিছুতেই। সারা দিনটা শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। রাত দুপুরেই কি ছাই বিরাম আছে! একঘেয়ে ঝিম্‌-ঝিমুনি কতক্ষণ ভালো লাগে। সকাল থেকে কোথাও বেরোবার জো নেই। ঘড়িটায় ঢং-ঢং করে দশটা বাজলো। বইটা বন্ধ করে উঠতে গেলো দেবব্রত। এমন সময় পাশের বাগান-বাড়ী থেকে একটা নারীকণ্ঠের ক্ষীণ স্বর। চম্‌কে উঠলো সে। ও-বাড়ীটা তো খালিই পড়ে আছে। তবে? শোনার ভুল নয় তো? কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। নাঃ, বোধ হয় উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা। শোনার ভুল। কিন্তু ও-কি? আবার কার চীৎকার—এবার যে পুরুষ-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ! তাড়াতাড়ি সে জানলাটা খুলে ফেললো। এবার যা তার চোখে পড়লো, তাতে বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। হঠাৎ একটা করুণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, একটা দীর্ঘদেহী মূর্ত্তি ছুটে পালাচ্ছে ফটক খুলে—অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু শোনা যায় কোমল নারীকণ্ঠের ডাক—দাদা, দাদা!......সে আহ্বান কি ব্যাকুলতায়, কি উদ্বেগে ভরা।

তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেবব্রত ডাকলো: গোবিন্দ...গোবিন্দ......

গোবিন্দ চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। বললে: ডাকছো দাদা বাবু?

—পাশের বাগান-বাড়ীতে একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছিস্‌? শীগ্‌গির আয় আমার সঙ্গে, দেখি ব্যাপারটা কী। দেবব্রত ব্যস্ত ভাবে কথা শেষ করেই ঘরের বার হতে যায়।

এবার বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড়ো-বড়ো করে দরজা আগলে দাঁড়ায় গোবিন্দ। বলে: তুমি কি ক্ষেপেছ দাদা বাবু? ও-বাড়ীতে আছে কে যে আর্ত্তনাদ করবে? ও-সব অপদেবতার কাণ্ড। অপঘাতে মলে অমন সব হয়। যদি শুনেই থাক কিছু, কান দিও না। দোহাই তোমার!...বলেই সে কার উদ্দেশে হাত যোড় করে নমস্কার জানায়।

গোবিন্দর প্রলাপ শোনবার মত সময় ছিলো না দেবব্রতের। সে প্রায় জোর করেই দরজার সামনে থেকে গোবিন্দকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। তাকে চলে যেতে দেখে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে গোবিন্দ। বা আর হাতযোড় করে কার উদ্দেশে

প্রণাম করে আর বলে : দোহাই বাবা অপদেবতা, আমার দাদা বাবুটির ঘাড়ে ভর করো না বাবা। ছেলেমানুষ, দু'পাতা ইঞ্জিরী পড়ে মাথা বিগড়ে গেছে।

তার পর নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে ধীরে ধীরে দেবব্রতের পথই অনুসরণ করে—কারণ নিজের প্রাণের চেয়েও সে যে তার প্রিয়!

বাগান-বাড়ীতে পৌঁছে দেবব্রত দেখে ফটকের ধারে বিভাসের শায়িত দেহ। তার মাথাটাকে কোলে নিয়ে এক রকম কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবেই বসে আছে মলয়া। হঠাৎ দেবব্রতর আবির্ভাবে সে আবার বিপদের আশঙ্কা করে চেঁচিয়ে ওঠে : কে? কে?

দেবব্রত আশ্বাস দিয়ে বলে : আমি পাশের বাড়ীতে থাকি। একটা আর্ত্তনাদ শুনে দেখতে এলাম, ব্যাপারটা কী! আপনারা কে? কোথা থেকে কখন এ-বাড়ীতে এলেন?

মলয়া বলে : আমি এই বাড়ীর মালিকের ভাগ্নী। এটর্ণীর চিঠি পেয়ে মাত্র আজই এসেছি। সব কথা পরে শুনবেন। আপাততঃ যদি দাদাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতে সাহায্য করেন······

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেবব্রত বিভাসের অচেতন দেহ তুলে নিয়ে যায় বাড়ীর ভেতর। মলয়ার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব। বলে : এক জন ডাক্তারের দরকার এখন বড্ড বেশী, অথচ এখানে কোথায় যে কী আছে তার কিছুই জানি না!···

—আপাততঃ প্রাথমিক শুশ্রূষাটুকু আমিই করতে পারবো। দেবব্রত বলে : কারণ আমি নিজেই এক জন মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট। তার পর কাল সকালে দরকার হয়তো এক জন ডাক্তার ডেকে আনলেই চলবে। যত দূর মনে হয়, মেণ্টাল শকটাই এঁকে অজ্ঞান করেছে, শারীরিক আঘাত নয়।

এমন সময় বাইরে শোনা যায় গোবিন্দর ভীত-কম্পিত কণ্ঠের ডাক : দাদা বাবু!

দেবব্রত উত্তর দেয় : ভেতরে চলে আয় গোবিন্দ। কোন ভয় নেই, আমি এখানে আছি।

গোবিন্দ কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে আসে। তার পর দেবব্রতকে দেখে প্রশ্ন করে—এঁরা কারা?

—এঁরা মুখুজ্যে মশায়ের ভাগ্নে-ভাগ্নী। এখন এঁরাই এই বাড়ীর মালিক। দেবব্রত উত্তর দেয় : আজই এঁরা এখানে এসেছেন।

—তবে চীৎকার করলে কে? আবার প্রশ্ন করে গোবিন্দ।

—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিলো, বুঝলে হাঁদারাম! ব্যঙ্গভরে গোবিন্দর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবব্রত মলয়াকে বলে : জানেন, গোবিন্দ তো ভয়েই মরে, বলে অপদেবতা আছে ও-বাড়ীতে!

দেবব্রতের কথা শুনে এত দুঃখেও হাসি আসে মলয়ার। গোবিন্দর সাহস কিন্তু তখন ফিরে এসেছে। সে দু'হাত মুষ্টি-বদ্ধ করে বলে : বলো কি! ডাকাত! ওঃ, একটু আগে যদি জানতে পারতাম!······

—তাহলে কি করতিস্ শুনি!···দেবব্রত হাসিমুখে প্রশ্ন করে।

—এই এক চড়ে ডাকাতের মুণ্ডুটা ধড় থেকে তফাৎ করে দিতাম না? আমার বাবা খালি-হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে, ঠাকুরদা···

—থাম্ বাপু! ভারী বীরপুরুষ—কাঁপুনি দেখেই বীরত্ব বোঝা গেছে!···দেবব্রত হাসতে হাসতে বাধা দেয় গোবিন্দর উচ্ছ্বাসে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। রাতের সঙ্গে দুর্য্যোগেরও ঘটেছে পরিসমাপ্তি। বিভাসের শুশ্রূষা উপলক্ষ করে দেবব্রত রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে বাগান-বাড়ীতেই। শেষ রাত্রে কখন যে সে বিভাসের শয্যায় মাথা রেখে বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেই বুঝতে পারেনি। ঘুম ভাঙলো তার মলয়ার ডাকে।

অত ভোরেই সদ্যস্নাতা মলয়া পরিপাটী করে নিজের বেশ করেছে। লালপাড় শাড়ী আর এলো চুলে, তাকে যেন স্বর্গ থেকে হঠাৎ নেমে আসা অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী বলে মনে হয়। হাতে তার একটা ট্রেতে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর খানকয়েক বিস্কুট।

মৃদু হেসে মলয়া বলে : এখন এই চা'টুকুর সদ্গতি করুন দেখি। ঘরে তো আর কিছু নেই যে দেবো। কাল সারাটা রাত যে দুর্ভোগ ভুগলেন আমাদের জন্যে!······

—বলেন কি? এই যদি দুর্ভোগ হয়, তবে তো মানুষের কর্ত্তব্য মাত্রই দুর্ভোগ বলতে হয়। দেবব্রত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলে : কিন্তু ওই হতভাগাটাকে তো তুলে দিতে হবে এবার।

দেবব্রত দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলো। গোবিন্দ দরজার পাশে উবু হয়ে বসে হাঁটুতে মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মলয়া গোবিন্দকে ডেকে তুলে তাকেও এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিলে।

গোবিন্দ চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে মলয়ার অপরূপ রূপের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তার পর গদগদ কণ্ঠে বললো : আহা, দিদিমণি রূপেও যেমন, গুণেও তেমনি, যেন লক্ষ্মী ঠাকরোণ। আমাদের বাউণ্ডুলে আইবুড়ো কার্ত্তিক দাদা বাবুটির গলায় যদি এমনি একটি মা-লক্ষ্মীকে ঝুলিয়ে দিতে পারতুম তাহলে সারা দিন টো-টো করে ঘোরা আর বাউণ্ডুলেপনা সেরে যেতো এক দিনেই! ·········

গোবিন্দর কথার মধ্যে হয়তো বিশেষ কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিলো না, ছিলো শুধু একটা বহু দিনের সঞ্চিত পুরোনো ক্ষোভের অভিব্যক্তি—কিন্তু গোবিন্দর কথায় মলয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। দেবব্রতও কম অপ্রতিভ হয়নি। সে ধমক দিয়ে বলে উঠলো : বুড়ো হয়ে মরতে চললো, তবু কথার যদি একটা বাঁধুনি থাকে। যাকে বলে একেবারে······

মলয়া প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে : দেখুন তো, কি ভুলই হয়ে গেছে। সারা রাত আপনারা ভিজে কাপড়েই কাটালেন। ভিজে কাপড়-চোপড় গায়েই শুকোলো, তবু সকলেরই মনের অবস্থা এমন যে, একবার ওগুলো বদলাবার কথা কারো মনেও এলো না!

ঘরের মধ্যে কথাবার্ত্তার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো বিভাসের। কাল মাঝ-রাতে একবার অচেতনতার ঘোর কাটিয়ে সে কিছুক্ষণের জন্যে সেই যে চোখ মেলে চেয়েছিলো, তার পরই অঘোরে নিদ্রা। ঘুম ভেঙে উঠে ক্ষীণ স্বরে বিভাস ডাকলো : মলয়া!······

মলয়া তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেবব্রত আর গোবিন্দকে দেখিয়ে বিভাস প্রশ্ন করে : এঁরা কারা ?

মলয়া বিভাস আর দেবব্রতর পরিচয় করিয়ে দেয়।

দেবব্রত বলে : এবার কিন্তু এক জন ডাক্তারের সাহায্য সত্যিই দরকার। বাড়ী গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে এক জন ডাক্তার ডেকে আনছি। আপনারা কিন্তু তৈরী থাকবেন।

ডাঃ সেনের চেম্বার। খুব সকালেই সেখানে জমে উঠেছে রীতিমত রোগীর ভীড়। এ অঞ্চলে ডাঃ সৌম্যেন সেনের মত পশার আর কারো নেই। এমন অমায়িক সদাশয় ভদ্রলোকও দেখা যায় খুব কম। লোকে বলে তিনি গরীবের মা-বাপ। ভোর হতে না হতেই ডাঃ সেন রোগী দেখতে সুরু করেন—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁর আর বিশ্রাম নেই। কিন্তু কিছু কাল যাবৎ সন্ধ্যার পর কোন দিনই তিনি হাজার টাকা দিলেও রোগী দেখতে যান না—এমন কি কারো সঙ্গে দেখা করেন না পর্য্যন্ত। তখন তাঁর সিরিয়াস কেসগুলোর ভার থাকে তাঁর সহকারীর ওপর। লোকে বলে, সে সময় তিনি না কি শুধু পড়াশোনা করেন—নতুন নতুন ঔষধ নিয়ে গবেষণা করেন। কথাটা অবশ্য তাঁর বাড়ীর লোকের কাছেই সকলের শোনা।

দেবব্রত যখন ডাঃ সেনের চেম্বারে তার বেবী অষ্টিনখানা নিয়ে পৌঁছলো, তখনো ডাঃ সেন ওপর থেকে নামেননি। সাধারণতঃ খুব ভোরেই তিনি রোগী দেখতে সুরু করেন। তাঁর দেরী দেখে ইতিমধ্যেই রোগীদের মধ্যে মৃদু স্বরে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। দেবব্রত ওয়েটিং রুমের এক ধার ঘেঁষে বসলো।

ডাঃ সেন ধীরগতিতে প্রবেশ করলেন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের আবরণ। দু'-এক জন রোগীর সঙ্গে যৎসামান্য আলাপ করে তিনি দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি তার দরকার।

দেবব্রত ধীরে ধীরে গত রাত্রের দুর্ঘটনার কথা বলে চললো। কথাগুলো বলার সময় বিস্মিত ভাবে লক্ষ্য করলো সে, বার বার ডাঃ সেন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে দু'-একটা হুঁ-হাঁ করা ছাড়া কোন মন্তব্যই করছেন না তিনি। কি একটা চাঞ্চল্য যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে। বার বার জামার হাতার কলার টেনে মণিবন্ধ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন তিনি। এত বড় এক জন প্রথিতযশা চিকিৎসকের এই অদ্ভুত চাঞ্চল্য সত্যিই যেন কেমন বিস্ময়কর।

দেবব্রতর কথা শেষ হলে ডাঃ সেন ধরা-গলায় বললেন : শরীরটা আজ আমার তেমন ভালো নয়। ভেবেছিলাম, কোথাও বেরোব না। কিন্তু আপনার রোগীর বিষয়ে যা বললেন, তাতে তাঁকে একবার এখনি দেখা দরকার। ড্রাইভারকে গাড়ীটা বার করতে বলে এই ক'জন রোগীকে ততক্ষণ বিদায় করি।

দেবব্রত জানালো, সে গাড়ী নিয়েই এসেছে; সুতরাং ডাক্তার সেনকে আর তাঁর গাড়ী বার করতে হবে না।

দেবব্রত গাড়ী নিয়ে এসেছে শুনে ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে তখনি বেরিয়ে পড়লেন অপেক্ষমান রোগীদের একটু অপেক্ষা করতে বলে। ডাক্তারের এই অহেতুক ব্যস্ততায় অবাক হয়ে গেলো দেবব্রত।

দেবব্রত বাগান-বাড়ী থেকে বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পরেই এটর্নী নিখিল দত্ত তাঁর নতুন মক্কেলদের খোঁজ-খবর নিতে এলেন। সঙ্গে তাঁর আর এক জন ভদ্রলোক। বয়েস তাঁর পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেলেও স্বাস্থ্য বেশ অটুট। মুখখানি হাসিতে ভরা।

এটর্নী দত্ত আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মলয়া আর বিভাসের। উনি না কি মৃত মামার একান্ত আত্মীয়। মামা নিতান্ত উইল করে গেছেন বলেই বিভাস এই সম্পত্তির মালিক, নইলে মামার এই খুড়তুতো ভাই-ই সব সম্পত্তির মালিক হতেন। এমন কি, ভগবান না করুন, বিভাস যদি নিঃসন্তান অবস্থায় গতায়ু হয়, তবে ইনিই সব সম্পত্তি পাবেন।

মামার যে এক জন খুড়তুতো ভাই আছে, এ কথা এই প্রথম শুনলো মলয়া আর বিভাস। যাই হোক, স্বজনহীন দুনিয়ায় তবু তাদের এক জন আত্মীয়ের সন্ধান তো মিললো!

এটর্নী দত্ত আর তাঁর সঙ্গী গত রাত্রের দুর্ঘটনার কথা শুনে চমকে উঠলেন। অনেক দুঃখও প্রকাশ করলেন। এটর্নী তো তাদের এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাস করবারই পরামর্শ দিলেন। মামার খুড়তুতো ভাইটি তো স্পষ্টই বললেন, যত দিন অন্য কোথাও বাস করবার মতো ব্যবস্থা না হয়, তত দিন অন্ততঃ তাঁর বাড়ীতেই বাস করা উচিত বিভাস আর মলয়ার। বিভাস তখনো রীতিমত অসুস্থ। কথা কইতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তবু সে বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলে এঁদের প্রস্তাব। তাকে হত্যা করবার দুরভিসন্ধি যদি কারো থাকে, তবে অন্য জায়গায় গেলেই যে সে চেষ্টা বন্ধ হবে, এ কথা জোর করে বলা যায় না। মিছিমিছি স্থান পরিবর্ত্তন করে লাভ কি ?

মামার খুড়তুতো ভাই অতঃপর বিদায় হলেন এটর্নীর সঙ্গে। যাবার আগে, আবার তিনি আসবেন, মাঝে-মাঝে বিভাস আর মলয়ার খোঁজ-খবর নেবেন বলে জানিয়ে গেলেন। বিভাস একটু সুস্থ হলে তিনি তাদের তাঁর নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাতেও ভুললেন না।

ডাঃ সেনকে নিয়ে দেবব্রতর গাড়ী যখন বিভাসের বাগান-বাড়ীতে পৌঁছল, এটর্নী দত্ত মশাই তখন মাতুলের খুড়তুতো ভাই চিরঞ্জীবকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাগান-বাড়ীতে পা দিয়েছেন। গাড়ী থেকে নেমেই ডাঃ সেন একেবারে এটর্নী দত্ত আর চিরঞ্জীবের মুখোমুখি পড়ে গেলেন। দেবব্রত তখন পিছন ফিরে গাড়ীর দরজা বন্ধ করছে।

ডাঃ সেন চিরঞ্জীবকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ-চোখে ফুটে উঠলো একটা বিস্ময় আর হিংস্র ভাব—দৃষ্টি তাঁর মর্ম্মভেদী, কঠিন।

চিরঞ্জীবও এক মুহূর্ত্ত বিমূঢ়ের মত ডাঃ সেনের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পরই হঠাৎ সহাস্যে ডাঃ সেনের চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, আরে, ডাক্তার যে! ভাল আছেন ?

মানুষের কোমল মিষ্টি কণ্ঠ আর হাসি-হাসি মুখের সঙ্গে চোখের দৃষ্টির যে এত অমিল হতে পারে, এ কথা এটর্নী দত্ত কখনও ভাবতেও পারেননি এর আগে। চিরঞ্জীবের মুখ যখন হাসছে, কণ্ঠ যখন বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে কথা উচ্চারণ করছে, তার বড়-বড় চোখ দুটো

যেন ঠিক তখনই শাণিত ছুরির মতো ডাক্তারের মর্মভেদ করবার চেষ্টা করছে। আশ্চর্য্য! ভারী আশ্চর্য্য!······

দেবব্রত ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের। চিরঞ্জীবের কথার কোন উত্তর দিলেন না ডাঃ সেন। চিরঞ্জীব ডাক্তারের নীরবতা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই আবার বললেন: রোগী দেখতে বোধ হয়! বেশ, বেশ! আপনার রোগী এখন ভালই আছে, এই মাত্র দেখে আসছি আমরা। যান, ভেতরে যান।

ডাঃ সেন এবারও কোন কথা না বলে যেন চিন্তিত ভাবে মাথা নীচু করে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বিভাস জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলো। মলয়া দেবব্রত আর ডাক্তারকে নিয়ে প্রবেশ করলো ঘরে। ওদের পায়ের শব্দে পাশ ফিরে চাইলো বিভাস।

ডাক্তার নীরবে রোগীকে পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। তার পর আশ্বস্ত স্বরে বললেন: ব্যাপারটা আপনাদের যত গুরুতর মনে হচ্ছে, ততটা কিছুই নয়। স্বাস্থ্য এঁর বেশ ভালই, কাজেই খুব সহজেই সামলে যাবেন। আপাততঃ একটা ইঞ্জেকসন দিলেই অনেকখানি তাজা হয়ে উঠবেন।

ডাক্তার তাঁর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জটা বার করে একটা ইঞ্জেকসন করলেন বিভাসকে: তার পর তার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, বললেন: কিন্তু একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। এ অবস্থায় এতটুকু উত্তেজনা ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যতটা সম্ভব লোক-জনের সঙ্গে কম দেখা-শোনা করলেই ভাল হয়। এইমাত্র দেখলাম দু'জন লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁরা নিশ্চয়ই রোগীর সঙ্গে অনেক আলাপ করে গেছেন। আমার চিকিৎসায় থাকতে হলে কিন্তু চাই পূর্ণ বিশ্রাম। মাঝে মাঝে খোলা হাওয়ায় মোটারে একটু বেড়াতে পারেন, এই পর্য্যন্ত।

দেবব্রত বিস্মিত ভাবে বললে: কিন্তু ওঁদের সঙ্গে আপনার বিলক্ষণ আলাপ, এমন কি রীতিমত বন্ধুত্ব আছে বলেই মনে হলো।

—তা থাকতে পারে। ডাক্তার বললেন: কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধবের ঠাঁই নেই। চিকিৎসার জন্যে যা দরকার, তা করতেই হবে। ওঁকে বাইরের লোকের সঙ্গে অন্ততঃ কয়েক দিন মিশতে দেবেন না।

শেষের দিকে ডাক্তারের কণ্ঠ যেন কঠিন অনুজ্ঞায় ভরে উঠলো। ডাক্তার বিদায় নিলেন।

[ক্রমশঃ।

ছত্রধারিণী

শ্রীগণেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সাকী বলা চলে মেয়েটিকে। হাতের পেয়ালায় মদের ঝিলিমিলি, টানা-টানা ভ্রূ। ওষ্ঠরেখায় প্রশান্ত হাসির মিলিয়ে-যাওয়া রেশটুকু শীতের সায়াহ্নে পশ্চিম-দিগন্তরেখায় রক্তিম-ধূসরের বর্ণালী মত ভাসছে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিল, বাম কোণে ধূসর বর্ণের গুটানো ছাতার খানিকটা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

চিত্রখানি বিচারের চড়াই-উৎরাই ডিঙ্গিয়ে গণ-চিত্তে স্থায়ী মর্য্যাদা নিয়েছে 'ছত্রধারিণী'। চিত্রকররা সমাহিত দৃষ্টিতে দূর থেকেই পরখ করে। আর বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের মত দর্শক দলের অন্তহীন উচ্ছ্বাস বইছে ছবিখানিকে ঘিরে। ঔৎসুক্য, বিতর্ক আর প্রশংসার সীমাহীন আসক্তির মধ্যে একটা কৈফিয়ৎ আসে—কে সে-রমণী প্রশ্ন।

তরুণী চিত্রকর ডেনিস্ লেল্যাণ্ডের প্রেয়সী। ঘরণী-গৃহিণী পর্য্যায় নয়—জড়িমাবিহীন কণ্ঠে ধ্বনিত হলো দু'-এক জনের। প্রায়ান্ধকারে লুপ্ত ডেনিসের ব্যক্তিগত জীবন। পড়া-শুনা, ছবি আঁকা আর স্কেচ করায় কেটেছে কয়েকটি বৎসর তার ফরাসী দেশে। ক্যাণী আর তার প্রথম পরিচয় ঘটে আর্লেসে। ক্যাণী সন্ধান দিল তার ভাব-রাজ্যে নূতনত্বের; স্বকীয় প্রতিভার দ্যুতি ডেনিসের চোখ ঝলসিয়ে দিল ক্যাণীর আবির্ভাবে।

পরিচয় অনেক আগেই অন্তরঙ্গতার গণ্ডিতে স্থায়ী আসন পেয়েছিল সাহচর্য্যের আকারে। তবু এ দু'টি প্রাণে এক দিনও আকাঙ্ক্ষা জাগেনি প্রেমের ঘরোয়া মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করার জন্য। ভালবাসা ছিল এদের উদাসীন হৃদয়ের আকাশচারী কল্পনার মত। কিন্তু, উভয়েই বুঝেছিল, তারা একে অন্যের কাছে অপরিহার্য্য।

ভাসমান মেঘখণ্ডের দিকে চেয়েছিল ডেনিস আর্লেসে ক্যাণীর হোটেলের খোলা জানালা দিয়ে। শার্সিতে তাল ঠুকে বিমনা সুরে বলে উঠলো, "বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।" কথা বলে ক্যাণীর দিকে ফিরে চাইলো না।

"তা হ'লে বর্ষণটা সুস্থ হবে না, কেমন!" বলা মাত্র উভয়েই বুঝলো তাদের কেহই বৃষ্টির চিন্তায় মগ্ন নয়। ভাবরাজ্যে অন্য কিছুর বুঝাপড়া চলছে।

"তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো?"

"হ্যাঁ, আমার ত তাই বোধ হচ্ছে।" উত্তর করে ক্যাণী মুকুরে ডেনিসের সমস্ত হৃদয়টা যেন দেখলো; তাই যখন পর-মুহূর্ত্তে সে তার হাত তুলে চুম্বন এঁকে দিল তখন বিস্ময় উপচে পড়লো না তার চোখে-মুখে। বরঞ্চ নিত্যকার ঘটনার মত সে হাসিমুখে অপর হাত বাড়িয়ে দিল ডেনিসের দিকে। সে-মুহূর্ত্ত থেকে অভিষিক্ত হলো সে সচিব-সখী-নিভৃতচারিণীরূপে।

বাড়ী ফিরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডেনিস বসলো ছবি আঁকতে। ক্যাণীর হৃদয়-বিমোহন ছবিতে আত্মনিয়োগ করলো সে। ক্যাণীর আবেগ-বিহ্বল সাহচর্য্য তার প্রাণে এনে দিলো সৃষ্টির অনুরণন। চিত্রকলাতে সে-ই হবে নূতনের জয়যাত্রা-সূচনাকারী। কল্পনায় খেই হারিয়ে ফেলে ডেনিস্।

ছবিখানি শেষ হলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে চেয়ে থাকে ক্যাণী। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলে, "এটা কী আমারই প্রতিচ্ছবি?"

"তুমি কি তা মনে করো না? হয়তো এখন তোমার অনুরূপ না-ও হতে পারে এ ছবি। তবু এ তোমারই ছবি।

আমি এঁকেছি তোমাকে আমার মানসীরূপে, ভালবাসার সামগ্রী হিসাবে।" কথা শেষ করেই খানিকটা ভয় এলো ডেনিসের মনে। ফ্যানী তখনো একাগ্র মনে ছবি দেখছে। একটু পরে বললো, "তোমার ভালবাসা আজ আমাকে নূতন রূপ দিল। আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসবো—তোমার প্রতিভা, তোমার শিল্প এবং তোমাকে নিয়ে যত কিছুই হোক না কেন—তুমি আমার।"

"ওগো, কি ঘটবে? বলো না।" ভয়ে শিউরে উঠে ডেনিস্।

"কি হবে তা জানি না। তবে তোমার সাফল্য নিশ্চিত।" মন্দ বলার মত কিছুই ঘটলো না। সমালোচক-দর্শক সকলের দৃষ্টিতে প্রতিভার ছাপ নিয়ে ছবিখানি উৎরে গেলো। ডেনিস সাফল্যের মদির পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিল। ফ্যানী প্রকাশ্যে এ আতিশয্যে যোগ দিল না। তাদের ঘনিষ্ঠতা যাতে বাইরে রটে না যায়, সে জন্ম উভয়েই সাবধান ছিল যথেষ্ট। ফ্যানীই যে তার কল্পনাতে এনেছে প্রেরণা, এ-কথা দু'জন অন্তরঙ্গ ছাড়া কেউ জানতো না। এমন কি, সে খোলার পর কয়েক দিন প্রদর্শনীতেও যায় নাই। শুধু পত্রিকাতে ছবিখানির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস দেখেছে। চার-পাঁচ দিন পর গোপনে এক বার ছবিখানি দেখার সাধ সে কিছুতেই দমন করতে পারলো না।

জনতার চাপ এড়াতে বেশ আগেই সে বেরিয়ে পড়লো। প্রদর্শনীতে গিয়ে সোজাসুজি তার ছবিখানির সামনে না গিয়ে খানিক দূরে একখানা চেয়ারে বসে রইলো। একে-একে দর্শক আসে, ছবি দেখে চলে যায়। বসে-বসে ফ্যানী সবই দেখতে লাগলো, কানে আসতে লাগলো প্রশংসার গুঞ্জন।

কত সময় এ-ভাবে কেটে গেল বলা কঠিন, সহসা তার কানে এলো আলোচনার একটুখানি উচ্ছ্বাস। সচকিত হয়ে বসলো ফ্যানী।

একটি তরুণ আর তার একটি তরুণী এসে দাঁড়ালো ছবিটির সামনে। তরুণী গ্যালারীতে ঢুকেই চোখের পলকে ফ্যানীকে দেখে নিল।

অধিকাংশ দর্শককে সে তীব্র উদাসীনতার মধ্যে অবলোকন করেছে। কিন্তু, এ নূতন দুই দর্শক তার চিন্তামুখর চিত্তে দিয়েছে ঘা, কারণ এরা সোজাসুজি 'ছত্রধারিণীর' পাশে যায়নি।

"অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব!" তরুণটির বলার সাথে সাথেই তরুণীটি বললো, "হ্যাঁ, চমৎকার বলার মত বই কি! তবে কি না, ছবিখানির বিষয়বস্তু কি? পৃথিবীর এত সব থাকতে এ ভাবে তুলি ধরাতে শিল্পীর আগ্রহ কেন? চেয়ে দেখো ত ছবিখানির দিকে—কোন মানুষের মুখে এ ভাবের ক্লান্তিমাখা কোমলতাপূর্ণ ছলনা দেখেছো, আত্মগরিমার অবাস্তব বিজ্ঞাপন? সে যে শিল্পীর সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক, এ কথা সবাইকে জানাবার জন্ম তার ঐকান্তিকতা কত!"

তরুণটি বললো, "না না, তুমি নেহাৎ অসঙ্গত কথা বলছো। কৈ, ছবি থেকে ত তাকে এ বলার কোন প্রমাণ নেই।"

"না, আমি ত আর তার বাস্তব-জীবন নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি তাকে শিল্পীর চোখে যাচাই করছি। কারণ, তার মৃত্যুর পর হয়তো তার পরিচিতরা চিন্তা করবে নিজ-নিজ স্বাধীন ভাবে। কিন্তু, এ ছবিখানির শ্রেষ্ঠতার মধ্য দিয়ে সজীব থাকবে ও ধরার বুকে, নীচতা-কপটতা গোপনকারিণী বলে।"

তরুণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ছবিখানির দিকে মনোনিবেশ করলো। "এসো, ফেরা যাক্। এখনো ত অনেক কাজ। আবার রাতের খাবার আগে ফেরা চাই, নৈলে বাবা অস্থির হয়ে পড়বেন।"—তরুণী বললো।

ওরা চলে গেলেও অনেকক্ষণ অনড় ভাবে বসে রইলো ফ্যানী। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে যখন দেখলো 'ছত্রধারিণীর' পাশে আর কেউ নেই, তখন ছবিখানির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম।

এদিকে ষ্টুডিওতে প্রতীক্ষারত ডেনিস উচাটন আরম্ভ করেছে। তার ফিরে আসা মাত্রই রুদ্ধ-মুখ উৎসের খোলে-যাওয়া প্রবাহের মত কথার ফোয়ারা ছোটালো সে—"তাহলে তুমি গিয়েছিলে! কেমন দেখলে? আলো উজ্জ্বল কেমন? ভাল যায়গাতে টাঙানো রয়েছে ত? লোকের ভিড় কেমন?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চললো ডেনিস্ "আমার প্রাণে এসেছে নূতনের সাড়া। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মত ভাষা আমার নেই; তুমি আমাকে প্রেরণা দিবে ত? বলো পাশে থাকবে?"

"তুমি···তুমি আমাকে এতটুকুও ভালোবাসনি।" করুণ সুরে বলে ফ্যানী—"না, তুমি মোটেই চাও না আমায়।" তাকে বিস্মিত করে কেঁদে উঠে ফ্যানী।

তার পর ফোঁপানির ভিতর দিয়ে বলে যায় সে কানে-আসা সব কাহিনী।

"গাধা, ইতর। পৃথিবীটাতে বোকার রাজত্ব চলছে!"—ফেটে পড়ে ডেনিস্।

"কিন্তু, বোকারাই সত্যি কথা বলে।" চোখ মুছে উত্তর করে ফ্যানী,—"আমি নিজে বিচার করে এসেছি ছবিখানি। হ্যাঁ, আমি—আমি নিজে দেখেছি।" তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো।—"কদর্য্য নীচতা পরিস্ফুট এতে।"

"কোথায়?" গর্জ্জে উঠে সে, কোথায় দেখলে এ সব, ঐ ভংগীতে? আমাদের উভয়ের চিন্তায় যুগপৎ এসেছে এ-কল্পনা। দোহাই তোমার, বল এমন কি কদর্য্যতা ফুটে উঠেছে?"

মুখে, ভংগীতে সব কিছুতেই ছলনার ছাপ। তোমার চোখে তা ধরা পড়ার কথা নয়, কারণ তুমি আমাকে চেয়েছো ঐ দৃষ্টিতে। তুমি এক দিনের তরেও আমায় ভালবাসোনি। ওগো, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমি ত তোমাকে নিয়েই তুষ্ট, তোমার প্রতিভা···। ভেঙ্গে পড়ে ফ্যানী।

"বলিহারী! আমি ভালবাসি কি না, সেটা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু, তুমি যদি একবারও সেই গাধাগুলোর বিচার-শক্তির কথা চিন্তা করতে···"

"কিন্তু নগ্ন সত্যটা আমার চোখেও ধরা পড়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেরও।"

কষ্টে আত্মদমন করে ডেনিস্। "দেখ ফ্যানী, আমি ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছি।"

"তা আমি বুঝেছি। তুমি যা কল্পনাতেও আনোনি, তুলির টানে তা-ই সজীব হয়ে উঠেছে। এতে তোমার রাগের কথা—হয় তোমার প্রেম মিথ্যা, না হয় আমাদের কল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়নি। এর একটি সত্যি।"

মুখে বিস্ময়ের ছোঁয়াচ দেখে ফ্যানী বুঝলো কথাটা ডেনিসের মনে লেগেছে।

"রাগ করো না গো! বড় বড় শিল্পীদেরও প্রথমে হার হয়েছে। নূতন ভাবে কাজ করে আমরা গর্ব্ব করার মত সৃষ্টি করবো, কেমন?"

"কিন্তু, ছবিখানি সত্যিকার গর্ব্বের চিহ্ন।" স্তিমিত কণ্ঠে বলে ডেনিস্।

"দেখ, খামখেয়ালী করো না। তোমার পরবর্ত্তী সৃষ্টি বরং সম্পূর্ণ হবে। এটা ফিরিয়ে আনো।"

"তা হয় না, ফ্যানী তা হয় না। পৃথিবীটা রসাতলে গেলেও এ হবার নয়।"

"কিন্তু, তুমি ত বলেছো ভালবাসা ছাড়া তুমি বাঁচবে না?"

"তা ত সত্যি। কিন্তু এ সৃষ্টিছাড়া খেয়াল মিটাতে আমি পারবো না।" ডেনিস্ নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলো না।

"কিন্তু আমি ভুল করিনি। আর এত দিন আমার কথাই তুমি আগাগোড়া মেনে চলেছো।"

"সাবাস্! আমি এত দিন ঠুলি পরে ছিলাম, তাই ভুল শোধরাবার ক্ষমতা ছিল না। আমি গাধা ছাড়া কিছু নই! তোমার শিল্পানুরাগের মূলে অহমিকা, আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছু নেই। কলা-বিদ্যার কী জানো তুমি? আত্মতুষ্টি উপকরণ হিসাবে তুমি আমার প্রতিভাকে দেখেছ; এ ছাড়া কানা কড়ির মূল্য দেওনি।

"তুমি আমায় অপমানের তলে ডুবিয়ে দিয়েছো।"

"তোমাকে মহাকালের বুকে স্মরণীয় করেছি।"

চোখে চোখে চেয়ে রইলো দু'জন। ধীরে ধীরে একখানা কাল পর্দ্দা নেমে এলো দু'জনের মাঝখানে। চেতনা ফিরে পেলো ফ্যানী প্রথম।

"দেখ, কথা-কাটাকাটির দরকার কি!" শান্ত-কণ্ঠে বলে সে, "সোজা কথা, তুমি ছবিখানি ফিরিয়ে আনবে কি না বলো।"

তার দিকে পিছন দিয়ে ভাঙা-গলায় উত্তর দেয় ডেনিস্—"তুমি সরে যাও।"

"তাহলে চিরদিনের মত সরে যাচ্ছি।" স্তব্ধতায় রাজত্ব চলছে ভিতরে? দোর খোলারই শব্দ কানে এলো ডেনিসের।

"ফ্যানী!"

"বলো?"

"আমার ভালবাসাটা কি বড় নয়? তুমি ছাড়া আমার কি আছে?"

"তাহলে ফিরিয়ে আনবে, কথা দাও।"

"জাহান্নামে যাও।". দড়াম করে ফ্যানীর মুখের পর দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজার ফাঁকে আটকে যায় ফ্যানীর কাপড়।

তরুণ-তরুণী গ্যালারি ত্যাগ করার পর সময় কাটাবার আর কোন ছল খুঁজে পেলো না। কোলাহল-মুখর রাজপথ তাদের কাছে নিস্তব্ধ বনানীর মায়া এনে দিল।

দেখে-আসা ছবি নিয়ে চললো তাদের আলোচনা। "বাস্তবিকই, 'ছত্রধারিণী' বিষয়ে তোমার মন্তব্য সব খাপছাড়া, কোন মানেই হয় না। ছবিখানি এখনো আমার চোখে ভাসছে। রহস্যের অন্তহীন আবরণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে ছবিখানি। শিল্পী একে বাস্তবের চেয়ে মনোরম-চিত্তাকর্ষক করে এঁকেছে। আমার বোধ হচ্ছে— এ তার প্রেয়সীর প্রতিচ্ছবি।" একটানে বলে যায় তরুণটি।

দুষ্টুমির হাসি তুলে তরুণীটি বলে, "আমিও তা দেখেছি। কিন্তু যে মেয়েটির ছবি নিয়ে এত মাতামাতি—নিজেই সে কথাবার্ত্তা সব শুনা যায় এমন দূরে বসেছিল। আমার ধারণা, রোজ এ ভাবে বসে সে প্রশংসার খতিয়ান করে। কাজেই আমার বিরূপ উক্তি তাকে দমিয়ে দিবে।"

মৃদু হেসে তরুণ বলে, "কাজটা সঙ্গত হয়নি। যদি মেয়েটি কথাগুলা বিশ্বাস করে, তা'হলে সে ও তার প্রেমাস্পদের মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে।"

"হলই বা। একটুতেই যদি উনি লজ্জাবতী লতার মত মুয়ে পড়েন, তাহলে এটা তার মুক্তির পথ হবে।"

"আমি ঠিক ও-কথা ভাবছি না। শিল্পীর অবস্থাটা কি হবে তাই চিন্তার বিষয়।"

"না গো, তা আর ভাবতে হবে না। শিল্পীরা দুনিয়ায় সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না! তাদের প্রেম চঞ্চল। যতটুকু ভালবাসে সে শুধু শিল্পের খাতিরে।" তরুণটির কাঁধে নাড়া দিয়ে বলে, "তুমি যে শিল্পী নও—এতেই আমার আনন্দ।"

"ঠিক না কি?" চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে তরুণীর মুখের 'পরে।

"সত্যি বলছি।" হেসে উত্তর দেয় তরুণী।*

---

* রাশিয়ান গল্পের ছায়া নিয়ে ডেস্মণ্ড মেকআর্থার "লেডি উইথ দি আমব্রেলা" গল্পের অনুবাদ।

গর্ডন ক্রেগ

প্রসাদ রায়

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধ'রে যে দুই জন শিল্পীর অসাধারণ মনীষা পাশ্চাত্য নাট্য-জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তাঁরা হচ্ছেন জর্জ্জ বার্ণার্ড স এবং গর্ডন ক্রেগ। প্রথম ব্যক্তি এখন স্বর্গত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহলোকে বিদ্যমান থাকলেও চরম বার্দ্ধক্যের জন্যে নীরব ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন। প্রথম ব্যক্তি জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে-দেখেই মাথার চুল পাকিয়ে ফেললেন; কিন্তু তা হচ্ছে দিবা-স্বপ্ন।

দু'জনেই নাট্য-জগতের ধুরন্ধর ব'লে বিখ্যাত। দু'জনেই দু'জনকে দুই চক্ষে দেখতে পারতেন না। এবং দু'জনেই জাতে আইরিস। বার্ণার্ড স ছিলেন ক্রেগের মা এবং বিলাতের অমর অভিনেত্রী এলেন টেরির বন্ধু। শোনা যায়, সে বন্ধুত্ব ছিল এতটা ঘনিষ্ঠ যে, এলেন টেরি বার্ণার্ড সয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু যে নারী বারে বারে বিধবা হয়েও বারে বারে সধবা হতে চায়, বুদ্ধিমান বার্ণার্ড স তাকে বিবাহ করা সঙ্গত মনে করেননি।

প্রথমে গর্ডন ক্রেগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি। ক্রেগ হচ্ছেন এলেন টেরির অন্যতম স্বামী চার্লস এডওয়ার্ড গডউইনের পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন স্থপতি ও রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পরিকল্পক। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সেই তিনি প্রথম দেখা দেন রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের লিসিয়াম থিয়েটারে গিয়ে তেরো বৎসর কাল (১৮৮৫—১৮৯৭ খৃঃ) ধ'রে সেখানেই অভিনয় করেন। সাধারণতঃ তিনি অভিনয় করতেন অপ্রধান ভূমিকাতেই।

বার্ণার্ড স যখন 'স্যাটারডে রিভিউয়ে'র নাট্য-সমালোচক, তখন তিনি তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন একাধিক বার। এই সময় থেকেই বার্ণার্ড সয়ের সঙ্গে তাঁর কলহ। তখন তিনি অভিনেতা মাত্র, নিন্দা সহ্য করতে বাধ্য হন নীরবেই। কিন্তু পরে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়ে তিনিও একাধিক বার বার্ণার্ড সকে করেন পাল্টা আক্রমণ। হেনরী আর্ভিংয়ের জীবনচরিতে স'য়ের নাটক নিয়ে আলোচনা ক'রে বলেন, বার্ণার্ড স হচ্ছেন এক জন মাঝারী দরের নাট্যকার মাত্র। এবং এলেন টেরির জীবনী লেখবার সময়ে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেন, বার্ণার্ড স জেনে-শুনে মিথ্যা কথা বলতে ওস্তাদ! প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, এ বিষয়ে এইচ, জি, ওয়েলসও তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি এক বার বলেছিলেন, "স লোকটা কি মিথ্যুক! সে নিজেকে নিরামিষাশী ব'লে রটনা করে, অথচ আমি তাকে স্বচক্ষে আমিষ খেতে দেখেছি!"

তেরো বৎসর পর ক্রেগের আর নট-জীবন ভালো লাগল না। কিন্তু নট-জীবন ত্যাগ করেও তিনি রঙ্গালয়কে ভুলতে পারলেন না। একান্তে ব'সে চিন্তা করতে লাগলেন, কি উপায়ে আধুনিক নাট্যকলার বিবিধ সমস্যার সমাধান করা যায়? ভবিষ্যতের রঙ্গালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত কি রকম? এমনি সব প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে তিনি কাটাতে লাগলেন দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর। সঙ্গে-সঙ্গে ধরলেন তুলি, নিজের কল্পিত রঙ্গালয়ের আদর্শ সামনে রেখে করতে লাগলেন দৃশ্যের পর দৃশ্য-পরিকল্পনা। তাঁর আঁকা প্রত্যেক পটই প্রমাণিত করে একাধারে তিনি ভালো পটুয়া এবং ভালো কবি। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ভিতরে তিনি পরে পরে সাতটি নাট্যাভিনয়ে স্বাধীন ভাবে মঞ্চাধ্যক্ষ এবং সাজ-পোষাক ও দৃশ্য-পরিকল্পকের কর্ত্তব্য পালন করেন। কিন্তু বিলাতী জনসাধারণের ভিতর থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না।

এইবারে ক্রেগ তুলির সঙ্গে ধরলেন কলম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম পুস্তক The Art of the Theatre এবং ক্রেগ প্রমাণিত করলেন চিন্তাশীলতায় ও রচনাকার্য্যেও তিনি কম অসাধারণ নন। তার পর ক্রেগ "Towards a New Theatre" নামে আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। ক্রেগের দ্বারা সম্পাদিত 'Mask' নামে একখানি পত্রিকাও দেখেছি। তার মধ্যে থাকত ক্রেগের নিজস্ব মতামত।

ক্রেগের কিছু-কিছু মত এখানে উদ্ধার করছি: "থিয়েটারের বলতে বুঝায় না অভিনয় বা নাটক—বুঝায় না দৃশ্যপট কি নৃত্যও। কিন্তু ঐ সব জিনিষ যে সকল উপাদান দিয়ে গঠিত, তার প্রত্যেকটিই আছে নাট্যকলার মধ্যে। ক্রিয়া—অভিনয়ের যা আত্মা; বাক্য—নাটকের যা দেহ; রেখা ও বর্ণ—দৃশ্যপটের যা প্রাণ; ছন্দ—নৃত্যের যা সার। চিত্রকরের কাছে যেমন সব বর্ণই এবং গায়কের কাছে যেমন সব সুরই সমান দরকারি, তেমনি ওগুলিরও কোন একটিও অন্যটির চেয়ে বেশী দরকারি নয়।

যেখানে কর্ত্তৃত্ব করে একাধিক মস্তিষ্ক, সেখানে কলাসম্মত কোন কাজ হওয়া অসম্ভব। রঙ্গালয়ে কোন কলাসম্মত কাজ না হওয়ার জন্যে ঐ একটি মাত্র কারণই যথেষ্ট, অবশ্য অন্যান্য কারণেরও অভাব

কলিকাতায় তুষার-নৃত্য
—রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) গৃহীত
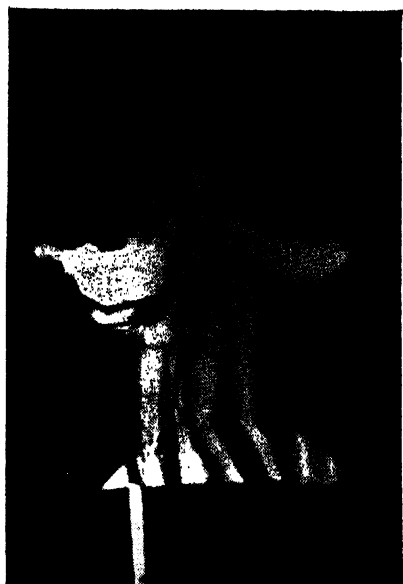
নেই। রঙ্গালয়ের কর্ত্তা হবেন মাত্র এমন এক ব্যক্তি, যিনি উদ্ভাবনায় ও মহলা দিতে সক্ষম; দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাক পরিকল্পনায় পারগ; প্রয়োজন হ'লে গানে সুর দিতে সুপটু; আবশ্যকীয় এবং আলোকপাতের উপযোগী যন্ত্রাদি উদ্ভাবনায় সমর্থ।

এক হিসাবে নাট্যকলার মধ্যে ক্রিয়াকেই সব চেয়ে দামী বলা চলে। রেখার সঙ্গে চিত্রের যে সম্পর্ক, সুরের সঙ্গে গানের যে সম্পর্ক, নাট্যকলার সঙ্গে ক্রিয়ারও সেই সম্পর্ক। ক্রিয়া, গতি ও নৃত্যের ভিতর থেকেই নাট্যকলার উৎপত্তি।"

গত যুগে ইতালীর—এবং অনেকের মতে পৃথিবীর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ইলিনোরা ডিউস বলেছিলেন: "রঙ্গালয়কে রক্ষা করতে হ'লে নিশ্চয়ই ধ্বংস করতে হবে রঙ্গালয়কে এবং নট-নটীদের সমর্পণ করতে হবে মহামারীর কবলে!"

এই উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যাবে গর্ডন ক্রেগের কণ্ঠে: "যাদের সাহায্যে দূষিত মঞ্চ-বাস্তবতা সমৃদ্ধি লাভ করে, দূর ক'রে দাও সেই অভিনেতাদের। বাস্তবতার সঙ্গে আমরা যখন ললিত-কলার সংযোগ স্থাপন করতে চাইব, তখন বিশৃঙ্খলা আনবার জন্তে সেখানে যেন কোন জীবন্ত মূর্ত্তি উপস্থিত না থাকে।......অভিনেতাদের দূর করতেই হবে এবং তাদের স্থান গ্রহণ করবে অসাধারণ যন্ত্রপুত্রক বা পুতুলনাচের পুতুল।"

ক্রেগ বলেন: "অভিনয়, আর্ট নয়। সুতরাং অভিনেতাকে আর্টিষ্ট বলাই ভুল। আর্টের মধ্যে দৈবের স্থান নেই।......কেবল পরিকল্পনার দ্বারাই আর্টের আগমন সম্ভবপর হয়। কাজে-কাজেই কলাসম্মত অনুষ্ঠানে আমরা কেবল সেই সব উপাদান নিয়েই কাজ করি, যা আমাদের হিসাবের মধ্যে আসে। মানুষ এ-সব উপাদানের মধ্যে গণ্য হ'তে পারে না।......নটের দেহের ক্রিয়া, তার মুখের ভাব ও কণ্ঠের ধ্বনি, এ সবই তার আবেগের আক্রমণে পরিবর্ত্তিত হয়। আবেগ তার হস্ত-পদকে যথেচ্ছ ভাবে চালিত করে, তার মুখের ভাবকে অভিভূত করে এবং ভেঙে দেয় তার কণ্ঠস্বরকে। আর্টের মধ্যে এমন দৈবের স্থান নেই। সুতরাং নট আমাদের যা দেয় তাকে আর্ট বলা চলে না, তা হচ্ছে দৈব-ঘটিত আত্মস্বীকারের ধারা।"

গর্ডন ক্রেগ রঙ্গালয় থেকে কেবল অভিনেতা নয়, নাট্যকার ও দৃশ্য দেখাবার জন্তে আঁকা পৃষ্ঠপটও (backdrop) দূর ক'রে দিতে চান!

কিন্তু এ সব হচ্ছে তাঁর মানসিক সিদ্ধান্ত (theory) মাত্র। তিনি মুখে যা বলেছেন, কাজে কোন দিনই তা করেননি, কারণ তা করা অসম্ভব। মুখে তিনি বলেছেন: "রঙ্গালয়ের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের সামনে তুলে ধরবে। রঙ্গালয় দৃশ্যপটের মেলা দেখাবার, বা কাব্য পাঠ করবার বা ধর্ম্মোপদেশ দেবার জায়গা নয়; এ হবে এমন এক ঠাঁই যেখানে প্রকাশ পাবে জীবনের নিখিল সৌন্দর্য্য। কেবল পৃথিবীর বাইরেকার সৌন্দর্য্য নয়, জীবনের ভিতরকার অর্থ ও সৌন্দর্য্য। এখানে কেবল বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে তথ্য দেখানো হবে না, দেখানো হবে আধ্যাত্মিক উপায়ে সমগ্র কল্পনা-জগৎকে।"

কলম চালিয়ে কথাগুলি কাগজের উপরে লিখে ফেলা খুবই সহজ এবং পাঠ করবার সময়েও চমৎকার ব'লে মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওদের মূল্য যে কত অল্প, ক্রেগ নিজেই তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন। থাকবে না নাট্যকার, থাকবে না অভিনেতা, থাকবে না আঁকা দৃশ্যপট! রঙ্গালয় হবে পুতুলের খেলা-ঘর! ক্রেগও নিজের জীবনে সফল করতে পারেননি এমন বেয়াড়া দিবা-স্বপ্ন। আঁকা দৃশ্যপট বর্জ্জন ক'রে তিনি দৃশ্য-সংস্থান করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে কাজ করতে হয়েছে নাট্যকার ও জীবন্ত অভিনেতাদের নিয়েই।

ক্রেগ কেবল লেখনী ও তুলিকা চালনাই করেননি, রোমান্সের নায়ক হবার সুযোগও পেয়েছেন। পৃথিবীবিখ্যাত নর্ত্তকী ইসাডোরা ডানকান ছিলেন তাঁর প্রণয়িনী। শিল্পি-জীবনের দিবা-স্বপ্ন এখানে সার্থকতা লাভ করেছিল যৌবন-স্বপ্নে। বাস্তবতায়। ইসাডোরা ছিলেন বিচিত্র নারী। শিল্পী পেলেই তিনি দেহ দান করতে ইতস্তত করতেন না। তাঁর মত ছিল অদ্ভুত। তিনি বলতেন, পুরুষ ও নারী দু'জনেই যদি শিল্পী হন, তবে তাঁদের সহবাসের ফলে জন্মলাভ করে অসাধারণ প্রতিভাবান সন্তান।

ক্রেগের গ্রন্থ য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশেষ এক আন্দোলন উপস্থিত করে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁর মতামতের মূল্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান হ'লেও এটা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, আধুনিক নাট্যজগতের বিভিন্ন বিভাগে তিনি এনে দিয়েছেন নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত এবং বিশেষ চিন্তার খোরাক।

স্বদেশ ইংলণ্ডে ক্রেগ তেমন কলকে পাননি বটে, কিন্তু ইসাডোরা ডানকান তাঁর বাণী বহন ক'রে যান ইতালীতে। অভিনেত্রী ইলিনোরা ডিউসের শিল্পিপ্রাণ সে বাণী শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল। তিনি ইবসেনের একখানি নাটকে দৃশ্য-সংস্থান করবার জন্তে ক্রেগকে আমন্ত্রণ করলেন ইতালীতে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এক কারণে। ক্রেগ ইতালীয় ভাষা জানেন না এবং ইলিনোরা জানেন না ইংরেজী ভাষা। কিন্তু ইসাডোরা দোভাষী হয়ে সে মুস্কিল আসান করলেন। ক্রেগ দৃশ্য-পরিকল্পনায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর দৃশ্য-সংস্থান ছবিতেই মানায় চমৎকার। রঙ্গমঞ্চের উপরে তার উপযোগিতা খুব বেশী নয়। তার ভিতরে অভিনেতারা আবির্ভূত হ'লেই বাধা দেখা যায় পদে-পদে। এই নিয়ে ইলিনোরার সঙ্গে খিটিমিটি হ'তে লাগল। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ইলিনোরা এক জায়গায় চেয়েছিলেন একটি ছোট জানলা। ক্রেগ নিজের মনের খেয়ালে সেখানে বসিয়ে দিলেন অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড এক গবাক্ষ।

ইলিনোরা বললেন, "আমি চাই ছোট জানলা।"

ক্রেগ ইসাডোরার দিকে তাকিয়ে গর্জ্জন ক'রে বললেন, "ওকে বল যে, আমি কোন ঘৃণ্য স্ত্রীলোককেই আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেব না।"

বুদ্ধিমতী ইসাডোরা এ উক্তির তর্জ্জমা করলেন এই ব'লে, "ইলিনোরা, ক্রেগ বলছেন, আপনার মতামতের উপরে তাঁর খুব শ্রদ্ধা আছে।"

দৃশ্য-সংস্থানের কাজ সাজ হ'ল। কিন্তু মাত্র এক রাত্রি অভিনয়ের পরেই ইলিনোরার উৎসাহের আগুন নিবে গেল। সে-রকম দৃশ্য-সংস্থানের মধ্যে নাটক ও অভিনয় জমানো অসম্ভব। পরিত্যক্ত হ'ল ক্রেগের পরিকল্পনা।

তার পর ক্রেগের বাণী বহন ক'রে ইসাডোরা গেলেন রুশিয়ায়। সেখানকার পৃথিবীবিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের পরিচালক

অভিনেতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ষ্টানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে ক্রেগ সম্বন্ধে একটি কৌতুককর বিবরণ প্রদান করেছেন।

ইসাডোরা তাঁকে বললেন, "নাট্য-জগতে গর্ডন ক্রেগ হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী। কেবল ইংলণ্ডই তাঁর স্বদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবী হচ্ছে তাঁর স্বদেশ। আপনার আর্ট থিয়েটারই তাঁর প্রতিভার যোগ্য স্থান।"

ক্রেগ তখন সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীব্যাপী কোলাহল, সুতরাং ষ্টানিসলাভস্কির কাছেও তিনি ছিলেন না অপরিচিত ব্যক্তি। ক্রেগকে তিনি রুসিয়ায় আসবার জন্তে আমন্ত্রণ করলেন।

এক দুর্দ্দান্ত শীতার্ত্ত দিন। চারি দিকে তুষার-বৃষ্টি। ক্রেগ মস্কো সহরে এসে হাজির, পরনে তাঁর গ্রীষ্মকালের হালকা পোষাক এবং পকেটে নেই তাঁর একটি মাত্র পয়সা!

ষ্টানিসলাভস্কি তাঁর হোটেলে গিয়ে দেখেন, সেই রক্ত-জমানো শীতেও কনকনে ঠাণ্ডা জলে ভরা স্নানের টবের ভিতরে ক্রেগ ব'সে আছেন পৃথিবীর প্রথম মানুষের মত উলঙ্গ দেহে। সেই অবস্থাতেই দু'জনের মধ্যে চলল দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ-আলোচনা। নিউমোনিয়ার আক্রমণ থেকে ক্রেগকে রক্ষা করবার জন্তে থিয়েটারের সাজঘর থেকে নিয়ে আসা হ'ল উপযোগী পোষাক।

ক্রেগ হলেন "হ্যামলেট" নাট্যাভিনয়ের দৃশ্য-পরিকল্পক ও পরিচালক এবং তাঁর সহকারিরূপে কাজ করতে লাগলেন ষ্টানিসলাভস্কি প্রভৃতি। এক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল ক্রেগের পরিকল্পনা। তিনি স্থির করলেন, বিশেষ কৌশলে পর্দ্দার পর পর্দ্দা সাজিয়ে দেখাবেন ঘর, বাড়ী, রাস্তা প্রভৃতি। অভিনয়ের সময়ে থাকবে না বিরাম ও যবনিকা।

"হ্যামলেটে"র অভিনয় বিফল হয়নি বটে, কিন্তু ষ্টানিসলাভস্কি আর কোন নাট্যাভিনয়ে ক্রেগের পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, গর্ডন ক্রেগের কাছ থেকে রুসিয়ার নাট্য-পরিচালকরা নূতন নূতন শিক্ষা লাভ করেছেন বটে, কিন্তু পরিকল্পনা কার্য্যকরী ক'রে তোলবার উপাদান রঙ্গালয়ের মধ্যে দুর্লভ।

পর্দ্দার সাহায্যে দৃশ্য-রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন গর্ডন ক্রেগই। এই পদ্ধতিতে কাজ করা হয় এখন পৃথিবীর নানা দেশের রঙ্গালয়ে। কিন্তু সে কথা শুনলে ক্রেগ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "পর্দ্দা হচ্ছে আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আর কেউ তা ব্যবহার করলে তাকে ভাবচৌর্য্যের জন্তে অপরাধী মনে করব।"

বার্ণার্ড স বলেন, "য়ুরোপের শিল্প-জগতে যদি কোন আবদেরে ছেলে থাকে, তবে সে হচ্ছে গর্ডন ক্রেগ। স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের নিজস্ব রঙ্গালয় ছিল, তিনি সেখানে যা খুসি করতে পারতেন। ক্রেগও চায় এমনি একটি নিজস্ব রঙ্গালয়। কিন্তু তা হবার উপায় নেই।"

ক্রেগকে কেউ কেউ আধ-পাগলা মানুষ ব'লেও বর্ণনা করতে ছাড়েনি। নিন্দাই কর আর গালিই দাও, ক্রেগ কিন্তু অটল। নিজের পদ্ধতির সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই তিনি ব'সে ব'সে গড়েন মেঘের প্রাসাদ। স্থায়ী না হ'লেও তার মধ্যে পাওয়া যায় সৌন্দর্য্যের সঙ্কেত।

সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্কেতের সঙ্গে নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে বুদ্ধিমানের মত কাজ করে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন বহু নাট্য-পরিচালক ও দৃশ্য-পরিকল্পক।

—নিয়মাবলী—

(১) কোন লেখা কিংবা কোন ছবি প্রকাশের জন্ত কারও মারফৎ অনুরোধ না জানিয়ে সরাসরি বিচারের আশায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(২) প্রত্যেক লেখা এবং ছবির সঙ্গে যথোপযুক্ত ডাক-টিকিট না থাকলে সে-সব লেখা এবং ছবি সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ হয় না বা সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হয় না।

(৩) লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। চিঠির সঙ্গে নয়, লেখার শেষেও স্পষ্টাক্ষরে নাম এবং ঠিকানা দিতে হবে। হস্তাক্ষর যত ভাল হবে ততই ভাল। লেখা অপাঠ্য হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু হস্তাক্ষর অপাঠ্য হ'লে কোন লাভ নেই।

(৪) লেখা কিংবা ছবি পাঠাবার আগে কোন পত্রালাপ চলতে পারে না। যে কেউ যে কোন প্রকাশযোগ্য লেখা এবং ছবি পাঠাতে পারেন। সব সময়ে সেগুলির যথার্থ বিচার হবে।

(৫) মাসিক বসুমতীতে বিভাগ আছে অনেকগুলি। সেগুলি লক্ষ্য রেখে খামের ওপর যে বিভাগের জন্ত লেখা পাঠানো হ'ল সেই বিভাগের নাম লিখতে হবে। যেমন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ, বিজ্ঞান-জগৎ, সাহিত্য-পরিচয়, ছোটদের আসর ইত্যাদি। আলোকচিত্রের জন্ত খামের উপর আলোকচিত্র বিভাগের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(৬) কোন ধারাবাহিক রচনা প্রকাশের জন্ত আগে পত্রালাপ করতে হবে। যে বিষয়ের (Subject) লেখা একবার ছাপা হয়ে গেছে সেই বিষয়ের এক ধরণের লেখা যেন কেউ পাঠাবেন না। সাময়িক কোন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে লেখা পাঠালে বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

(৭) গ্রাহক-গ্রাহিকারা লেখা এবং ছবি পাঠালে গ্রাঃ নং উল্লেখ করতে যেন ভুলবেন না।

(৮) লেখা কিংবা ছবি ছাপতে হলে ডাক মারফৎ পাঠানোই সমীচীন। সাক্ষাৎ অপেক্ষা পত্রালাপ বাঞ্ছনীয়। লেখক এবং শিল্পিগণকে তাঁদের লেখা এবং ছবি সম্বন্ধে উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্মরণ রাখতে হবে, এই নিয়মগুলি কোন খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীদের জন্ত নয়।

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির—

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটি চিঠি

বিশ্বভারতী
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
২৪।২।১১৫১

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

রবীন্দ্রনাথের 'ঐ দেখো মা, আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এল আলো' কবিতাটি রচনার ইতিহাস মাঘ-সংখ্যা (১৩৫৭) বসুমতীতে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিকট পিতামহ ৺শিবরতন মিত্র মহাশয় বালকদের 'হস্তলিপি' পুস্তক রচনা কালে তাঁর সুন্দর হস্তলিপির জন্য অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে 'ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো' কবিতাটি মাত্র ৮ লাইন রচনা করে পিতামহের হাতে দেন। (আনুমানিক ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ)। পরে উক্ত কবিতাটি কবি বর্দ্ধিতাকারে অন্যত্র প্রকাশ করেছিলেন। কবিতাটি সৃষ্টির এই হল ইতিহাস।"

বস্তুত পূর্ণ কবিতাটি তৎপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল—১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত সপ্তম ভাগ রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থে 'শিশু' দ্রষ্টব্য। ইতি

নিবেদক—শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—(দ্বিতীয় সংস্করণ) অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম-এ প্রণীত। ৪, পঞ্চানন তলা লেন, কলিকাতা—৩৪, হইতে শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। ৭৬২ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১০৲।

মঙ্গলকাব্য বাঙলা-সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ। এই মঙ্গলকাব্য ভারতীয় দেশজ-সাহিত্যগুলির ভিতরে বাঙলা-সাহিত্যকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দেশজ-সাহিত্যগুলি প্রধানতঃ ধর্মের আওতায়ই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে যে দোঁহা-গান পাইতেছি প্রায় সমসাময়িক কালে এবং পরবর্তী কালে অনুরূপ দোঁহা-সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচুর পাওয়া যায় ; আমাদের যেমন বৈষ্ণব-কবিতা রহিয়াছে, ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে দেশজ-ভাষাগুলির ভিতরে অনুরূপ বৈষ্ণব-কবিতা রহিয়াছে ; আমাদের ভাষায় যেমন রামায়ণ-মহাভারত গড়িয়া উঠিয়াছে অন্যত্রও অনুরূপ ভাবে রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ; এমন কি আমাদের নাথ-সাহিত্যের অনুরূপ সাহিত্যও অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যে দুর্লভ নহে ; কিন্তু বাঙলায় মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ কাব্য শুধু দু'-একখানি কাব্য নহে—ঐ জাতীয় কাব্যের বিপুল সমৃদ্ধি বাঙলা-সাহিত্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বাঙলা-সাহিত্যে শিবায়ন এবং ধর্মমঙ্গলের সংখ্যাও কম না হইলেও মোটামুটি ভাবে বিচার করিলে দেখি, শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই মঙ্গলকাব্যের সমৃদ্ধি, ধর্মমঙ্গলের ভিতরেও শক্তির প্রভাব গৌণ নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূর্তিতে এই শক্তি-দেবীগণ পূজিতা হইলেও বাঙলা দেশের ন্যায় অন্যত্র কোথাও এই শক্তি-গণকে লইয়া এমন বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই। বাঙলার এই বিশিষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে তাই 'বিশেষ' ভাবেই আলোচনার প্রয়োজন ছিল ; এ বিষয়ে আলোচনার অধিকারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই বিষয়টিকেই পৃথক্ ভাবে নির্বাচিত করিয়া ধারাবাহিক ক্রমে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার আলোচনা করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই বিষয়ে 'অধিকারী' বলিবার কারণ রহিয়াছে ; গ্রন্থ মধ্যেই তাঁহার সেই অধিকারের পরিচয় আছে। বাঙলার মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা করিতে হইলে কতগুলি তথ্য সংগ্রহই যথেষ্ট নহে, তথ্য-সঞ্চয়ের সহিত লেখকের একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টি চাই। কতগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এ-জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সুসম্পূর্ণ আলোচনা চলে না। লক্ষ্য রাখিতে হইবে মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলার যথার্থ জাতীয়-সাহিত্য ; সুতরাং বাঙলার পরিপূর্ণ জাতীয় জীবনের পটভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া আমরা মঙ্গলকাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি কাহারই ঠিক-ঠিক বিচার করিতে পারি না। লেখক এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই সত্য-প্রবুদ্ধ দৃষ্টি লইয়াই প্রথম হইতে কাজে অগ্রসর হইয়াছেন ; বিষয়ের ভিতরে তাঁহার এই প্রবেশ-পদ্ধতিই আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে।

বাঙলা-সাহিত্যের পরিচয় জানিতে হইলে প্রথম হইতেই বেদ-পুরাণ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটির একটা প্রবণতা আমাদের সহজাত ; কিন্তু বহু কালের পুরাতন বেদ-পুরাণের পরে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে ছোটখাটো বহু বেদ-পুরাণ বহু বিচিত্র প্রাকৃত জনকে লইয়া প্রাকৃত ভাষাতেই রচিত হইতেছিল তাহার সন্ধান না লইয়া আমরা বাঙালীর সাহিত্যকে বুঝিতে পারিব কি করিয়া ? পরিশ্রমী এবং চিন্তাশীল লেখক এই মধ্যযুগের সাহিত্যগুলির উপাদান, তাই মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনের আলোহীন অবজ্ঞাত আনাচ কানাচ হইতেও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙলার বাহিরে—মানব-জীবনের বৃহত্তর পরিধির ভিতরেও সমজাতীয় উপাদান কোথায় কি পাওয়া যায় তাহার সংগ্রহ করিয়া তিনি পরিচিত তথ্যের উপরে নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বাঙলায় জাতীয় জীবন বলিতেই বা আমরা কি বুঝি ?

মধ্যযুগের বাঙলা দেশই বা কি—কি তাহার ভৌগোলিক আয়তন এবং প্রকৃতি? মধ্যযুগের বাঙালীই বা কাহারা—কি তাহাদের জাতি: সমাজ-বন্ধন—ধর্ম, সংস্কৃতি? শুধু বর্ত্তমান যুগে রচিত রাষ্ট্রনৈতিক কারণে অঙ্কিত মানচিত্রের সাহায্যে অথবা শুধু মাত্র স্মার্ত রঘুনন্দনের পুঁথির ভিতরে আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইব না। বহু বিচিত্র এই মধ্যযুগের বাঙলা দেশ—কত তাহার আঞ্চলিক বিভাগ! কত জাতি—কত সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে অঞ্চলে অঞ্চলে—কালে কালে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাবধানে পদক্ষেপ করিতে হইবে। এই সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সতর্ক-সঞ্চরণ লেখকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

গ্রন্থ-মধ্যে প্রথমে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় লেখক মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করিয়াছেন; তাহার পরে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে বাঙলা-সাহিত্যের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল এবং অন্যান্য শিবের গীতি, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ক্রমে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আর একটি অধ্যায়ে তিনি এই প্রসিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত মঙ্গলকাব্য ব্যতীত আরও যে সকল কালিকা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, সূর্য-মঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বাঙলা মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে ভাল আলোচনার একটি বিশেষ অসুবিধার কথা লেখক নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন; তাহা হইল মঙ্গলকাব্যগুলির প্রামাণিক সংস্করণের অভাব। লেখক তাহার তথ্যের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া মুদ্রিত পুস্তকের যাহার পাঠের উপরে গায়ক, নকলকারক, সম্পাদক, প্রকাশক সকলেরই স্থূল বা সূক্ষ্ম হস্তাবলেপের সম্ভাবনা বর্ত্তমান) উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া অপ্রকাশিত পুঁথির উপরে বেশী নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু এ-বিষয়েও আমাদের অভিজ্ঞতা খুব সুখপ্রদ বা আশাপ্রদ নহে; প্রাচীন দুই-তিনখানি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি, পাঠান্তর স্তূপীকৃত হইয়া গ্রন্থান্তর রচনার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা হইবার জন্য আগে মঙ্গলকাব্যগুলির সুষ্ঠু সম্পাদনার প্রয়োজন। গ্রন্থকার তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া নিজে এ-বিষয়ে অগ্রবর্তী হইলে, বাঙলা-সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। অন্ততঃ আমরা আমাদের এই দাবী জানাইয়া রাখিতেছি।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' সুবৃহৎ গ্রন্থ; ইহার ভিতরে তথ্য-সংগ্রহ, যুক্তি-তর্ক এবং বিচার-মন্তব্যও তাই অনেক। কোথাও কোনও তথ্যঘটিত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে, লেখকের সকল সিদ্ধান্তও যদি সর্বজনগ্রাহ্য না হয় তাহাও গ্রন্থের পক্ষে কিছু অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করি না। লেখক যে পূর্ব-সংস্কারবর্জিত স্বাধীন অথচ ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তথ্য-সংগ্রহে যে পরিশ্রম ও ধৈর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাঠক-সমাজ হইতে অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করে।—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শরৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই শরৎচন্দ্রের যুগ। বাঙলা গল্প-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এক যুগন্ধর—যাঁর সৃষ্টিকুশলতার বিস্ময়কর আবেদন বাঙলার পাঠক-সমাজকে বিমুগ্ধ করে। রুশ সাহিত্যে যেমনটি ঋষি লিও টলষ্টয়, বাঙলা সাহিত্যে ঠিক সেই ধরণের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র। শরৎ-সাহিত্যে ব্যক্তির পরিচয়ের চেয়ে এক জাতি-সমষ্টির আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়। 'পল্লী সমাজে' যেমন বাঙলার সমস্যা-সঙ্কুল পল্লীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, 'পথের দাবী'তে তেমনি রয়েছে বাঙলার বৈপ্লবিক ছায়ারূপ। 'রামের সুমতি' কেবল মাত্র রাম আর শ্যামের কাহিনীতেই সমাপ্ত নয়, বাঙলার ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল রূপও সেখানে বিদ্যমান। লেখক হিসাবে বোধ করি বঙ্গদেশবাসীর কাছে শরৎচন্দ্র যত প্রিয়, ততটা আর কেউ নয়। তার কারণ, শরৎ-সাহিত্যে বাঙালী তার আত্ম-পরিচয় দেখতে পায়। দরদী লেখকের সুনিপুণ লিখন-ভঙ্গীতে কোন ভেজাল নেই, নেই কোন ভাব আর ভাষার চমক। বাঙলার নারী-সমাজ—যাদের সমস্যার অন্ত নেই, দরিদ্র বাঙালী জাতি—যাদের শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই—তারাই হল শরৎ-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা। তাদের সত্যিকার রূপ আছে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে। এ দেশের বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বিনষ্ট হতে দেখা গেছে, শরৎচন্দ্র তাঁদের একমাত্র ব্যতিক্রম—যাঁর চোখ দু'টো সদা-সর্ব্বদা আপন দেশের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল, দেশান্তরে দৃক্‌পাতের সময় পায়নি। শরৎচন্দ্রের বিপুল সাহিত্য-সম্ভার বাঙলা দেশের মানুষ আর মাটির কথাতেই

পরিপূর্ণ. যে জন্ত বাঙালী এই লেখককে এত বেশী ভালবেসেছে। তাঁর বিয়োগ-ব্যথা পদে-পদে অনুভব করেছে।

সেই শরৎচন্দ্রের পরিচয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন বাঙলা সাহিত্যের পাকা জহরী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারকারী ব্রজেন্দ্রনাথ বহু পরিশ্রমে বাঙলার আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখকের সাহিত্য এবং আত্মপরিচয় দান ক'রে চলেছেন। 'শরৎ-পরিচয়' রচনা ক'রে তিনি বাঙলা ও বাঙালীর কাছে এক অমূল্য ইতিহাস হাজির করলেন। শরৎ-পরিচয়ে আছে শরৎচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবন-পঞ্জী, সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য, ব্রহ্মপ্রবাস কথা, রচনাবলীর সন, তারিখ, সাল, রাজনৈতিক মতামত এবং কতকগুলি অমূল্য পত্রাবলী। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পাঠে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁদের প্রত্যেকে যে এই বইখানি সংগ্রহ করবেন সে-কথা আর বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটি কথা না জানিয়ে পারলাম না, মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত একখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, সেই "আগামী"-এর নাম কোথাও দেখতে পেলাম না। উপন্যাসটি সাত-আট সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছিল এবং শেষ হয়নি। বইখানির ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট 'রঞ্জনের' অভিনবত্বের দাবী করে।

বাংলার লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হলে বাঙালী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। বাঙালী ও বাঙলার আত্মার কথা ছড়িয়ে আছে তার সাহিত্যে। সেই সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙলার ভাবধারা। বাঙালীকে চিনতে হলে, বাঙলাকে চিনতে হলে সাহিত্যের ভেতরেই তার সঙ্গে পরিচয় হবে।

বাঙলার এই সাহিত্যের স্রষ্টাদের মধ্যে অনেককেই আমরা ভুলতে বসেছি। অনেকের কাছে শিবনাথ শাস্ত্রী বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামটা অজানা না হলেও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে বহু পাঠক মোটেই ওয়াকিবহাল নন। বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই সব সাহিত্যস্রষ্টাদের জমার হিসেবের পাতাটা অমনোযোগে এমন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, এ যুগের পাঠকদের তা চোখ এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ঘটছে পদে-পদে। 'বাংলার লেখক' গ্রন্থে গ্রন্থকার সেই সব সাহিত্যরথীদের সাহিত্যকীর্ত্তির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে বাংলার মনীষার প্রতিনিধিস্থানীয় যে কয় জনের কথা আলোচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন,—শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপরোক্ত সপ্তরথীর সাহিত্য-প্রতিভার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করেননি লেখক। তার উদ্দেশ্যও তা' নয়। জীবনী লিখতেও তিনি বসেননি।—প্রতিভাধর উক্ত সাহিত্যিকদের রচনা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টুকু করিয়ে দিয়েই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁদের রচনার উপর তাঁদের সমাজের, দেশের, অবস্থা পরিবর্ত্তনের ছায়াপাত হয়েছে যেখানে,—তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর যেটুকু অংশ তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, শুধু সেইটুকু শুনিয়েই সরে গেছেন লেখক। এই বইটি পাঠ ক'রে পাঠক-সাধারণের শুধু যে উপরোক্ত মনীষীদের সাহিত্য পাঠের স্পৃহা জন্মায় তাই নয়, গ্রন্থটি উক্ত মনীষীদের সাহিত্যরস উপভোগে পাঠক-সাধারণকে অনেকখানি সাহায্যও করবে। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থের মুদ্রণ, বাঁধাই, কাগজ পরিপাটি। শিবনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশচন্দ্র প্রথম চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সুমুদ্রিত প্রতিকৃতি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

নবীন যাত্রা (উপন্যাস)—মনোজ বসু। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য ৩ টাকা।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর চরিত্র-চিত্রণ এবং ঘটনা-বিন্যাস রোমান্টিক আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত। তাঁর লেখন-ভঙ্গি অত্যন্ত সরল এবং সরস মাধুর্য্যমণ্ডিত। বস্তু অপেক্ষা আদর্শের দিকেই তাঁর ঝোঁক এবং বাস্তবতাকে আদর্শের পথে রূপান্তরিত করাই তাঁর লক্ষ্য।

সাধারণত উচ্চ এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীরাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা এবং পটভূমিকা মধ্য-বাঙলার (যশোহর খুলনা) গ্রামাঞ্চল।

আলোচ্য 'নবীন যাত্রা' এমনি এক গ্রামাঞ্চলের কাহিনী। গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের বিধবা ইন্দ্রাণী দেবী মানবিক উদারতার উচ্চ আদর্শের সুরে বাঁধা। বহু দিন সহরবাসের পর স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি গ্রামে ফিরেছেন। গ্রামের শ্যামল সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাই গ্রামকে শিক্ষা দীক্ষায় আদর্শস্থানীয় করে তুলতে বদ্ধপরিকর। সেই গ্রামের অপর অংশে নির্মল নামে বোমা-বন্দুকের যুগের এক জন দেশভক্ত গঠনমূলক বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে নিজের চেষ্টায়। নানা ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্মল এবং ইন্দ্রাণী দেবীর মধ্যে বিরোধ ও পরিশেষে বিরোধের সমন্বয় সাধন করেছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে হচ্ছে এই যে বর্ত্তমানে দেশ যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে, গ্রামের অধিবাসীরা আজও তার স্বাদ পায়নি। তাদের সেই স্বাদ পাওয়াতে হলে গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। সব দিক্ বিচার করে 'নবীন যাত্রা'কে মনোজ বাবুর রসোত্তীর্ণ উপন্যাস বলা চলে অনায়াসেই। সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সচ্ছন্দ গতি, কোথাও হোঁচট খেতে হয় না পুস্তকের ছাপা বাঁধাই এবং সাজসজ্জা আকর্ষণীয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প—(ছোটদের গ্রন্থাবলী)
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর সেরা গল্প (ছোটদের গ্রন্থাবলী)।
প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ৩ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গল্প-পুস্তকে প্রেমেন বাবু নিছক গল্প বলিয়াছেন। অনাবশ্যক এবং অবান্তর বিষয়-বস্তুর আমদানী করিয়া অযথা গল্পের

ভারী এবং প্রয়াস-পাঠ্য করেন নাই। প্রেমেন বাবুর কয়েকটি গল্পকে বিদেশী বিশ্ববিখ্যাত কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সহিত তুলনা করা যায়। এই পুস্তক সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন। পুস্তকখানি দ্বিধাহীন চিত্তে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিতে পারা যায়। পুস্তকে এমন কোনো-কিছুর অবতারণা কোথাও নাই, যাহাতে অভিভাবকদের মনে ছোটদের জন্য কোনো সঙ্কোচ বোধ হইতে পারে। পুস্তকের চিত্রগুলিও যথাযথ হইয়াছে। ছাপা এবং বাঁধাই নয়নমনোহর।

শিবরাম বাবুরও কথা-সাহিত্যিক হিসাবে নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। শিবরাম বাবুর লেখার প্রধান গুণ—তাঁহার বিচিত্র এবং রস-ভরপুর ভাষার বিন্যাস। গল্প বলিবার টেকনিকে শিবরাম বাবুর একটি নিজস্ব ধারা আছে—যাহা পাঠক-মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। শিবরাম বাবুর লেখায় হাস্যরসই প্রধান। কৌতুক এবং হাস্যরস পরিবেশনের মধ্যে শিবরাম বাবু অপরূপ একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন পাঠক-মনে। আলোচ্য পুস্তকের গল্পগুলিতেও ইহার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রেমেন বাবু এবং শিবরাম বাবু দুই জনেই গল্প লিখেন নিছক গল্প বলিবার জন্যই। ছোট গল্পের রস পরিবেশনে, তাঁহারা মানব-মনের চিরন্তন শিশুটির কথা কখনও ভুলিয়া যান নাই। এই দুই লেখকের গল্পগুলি পাঠকের সহজ রসানুভূতিকে কোন প্রকার বাধারও সৃষ্টি করে না। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই—এক কথায় অপূর্ব্ব।

যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। প্রকাশক অভিযান পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম চার টাকা।

জীবনের পথে মানুষ নিরলস যাত্রী। শৈশবে সেই যে চলার শুরু সে-চলা শেষ হয় সেই শেষ দিনটিতে। এই যাত্রাপথের দু'ধারে থেকে মানুষ সঞ্চয় করে অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা তাকে পথ নির্দ্দেশ করে। 'যাত্রী' হচ্ছে একটি মানুষের সেই যাত্রার কথা। প্রত্যেকটি সার্থক আত্মজীবনই হচ্ছে এই যাত্রার কথা। কাজেই আলোচ্য গ্রন্থটি আসলে লেখক অর্থাৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। হাঁটি-হাঁটি পাঁ-পা থেকেই সুরু হয়েছে 'যাত্রী'র যাত্রা। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীর সেই স্বর্ণযুগের কথার স্মৃতি দিয়েই সুরু হয়েছে। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে ঠাকুরবাড়ীর আরও অনেকের প্রভাব কেমন ভাবে পড়েছে লেখকের মন; ঠাকুরবাড়ীর সে যুগের সেই আবহাওয়া লেখকের মনকে প্রসারিত করেছে। সেই সঙ্গে সে যুগের বাংলার মনীষীদের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গেও পরিচয়। তার পরে ক্রমে এল বঙ্গভঙ্গের যুগ। যাত্রা আরো এগোয়। আসে সন্ত্রাসবাদের যুগ, গান্ধীজীর অহিংসবাদের যুগ। যাত্রী আরো এগোয়। পথ চলতে-চলতে ক্রমে যাত্রীর পরিচয় ঘটে সোশ্যালিজম্-এর সঙ্গে।—এই পরিচয়টুকুর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে।

পড়তে পড়তে বাঙলার ফেলে-আসা দিনগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সেদিনের সাহিত্যিক, মনীষী, শিল্পী, দেশপ্রেমিক সবাইএর সঙ্গেই কিছু-কিছু পরিচয় হয়। এবং সেদিনের রাজনীতি, সমাজনীতি, ও আদর্শের সঙ্গেও। সৌম্যেন্দ্রনাথের ভাষার সাবলীল ছন্দোময় গতি কোথাও ক্লান্তি আনে না। ছবির পর ছবি, ঘটনার পর ঘটনা, মানুষের পর মানুষ ভিড় করে আছে গ্রন্থটিতে। লেখক শুধু চোখ মেলে তাদের দেখেই ক্ষান্ত হননি, যাচাই কোরে বাছাই কোরে চয়ন করেছেন সেই ভিড় থেকে দু'টি-একটিকে। অর্থাৎ লেখক শুধু ছবি, ঘটনা আর মানুষ দেখাননি, সমালোচনাও করেছেন তাদের। ছাপা বাঁধাই এবং কাগজ ভাল। আর্ট পেপারে দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পিতামাতার কয়েকটি ছবিও আছে। আত্মজীবনীর পঙ্‌ক্তিতে 'যাত্রী'র স্থানটি বেশ মর্য্যাদাসম্পন্ন সন্দেহ নেই।

হে ভগবান!

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই।...শ্রীকান্তটা আর একবার প'ড়ে দেখো। হয় ত তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক্ মিথ্যে। তার পরে আমার বিদ্যে-সিদ্যে কিছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছু দিনের জন্যে জ্বর ক'রে দাও তা হ'লে দু'-বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস ক'রেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশী দিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না।

—শরৎচন্দ্র

আকাশ-পাতাল

[৬০৮ পৃষ্ঠার পর]

আরেকটা ঐ কাপ্তেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে,—নাও, তেষ্টা মেটাও। প্রেফ, লিমনেড দিয়েছি।

আর কৃষ্ণকিশোর একান্ত অজ্ঞের মত, অত্যন্ত মূর্খের মত, নিজের অজ্ঞাতে মুখে তুললে ঐ গেলাস! কেমন যেন বিস্বাদ লাগলো। তাহলে, কৈ, লেমোনেডের মিষ্টতা! এমন তিক্ত কেন? তবুও ভয় আর উত্তেজনায় তৃষ্ণার্ত তার কণ্ঠ, মূর্খের মত দু'-তিন চুমুকে নিঃশেষ করে ফেললে ঐ গেলাস। গলা থেকে বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত কোহলের প্রতিক্রিয়ায় জ্বলতে শুরু করলো। মুখে তবুও কিছু বললে না। গন্ধটাও বিশ্রী লাগলো যেন। তবুও তৃষিত কণ্ঠ, জল, জল চায় শুধু।

বসির এবার এলো নিজের গেলাস হাতে নিয়ে। বসলো ফরাসে। অতি ধীরে-ধীরে তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগলো একেক চুমুক। যেন অনেক দিন খায়নি এমনি একটা ভাব। গহরজান বসিরকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো একবার সহাস্যে। তার পর গান ধরলো মিহি সুরে কৃষ্ণকিশোরের চোখে চোখ রেখে। খেয়ালের সুর থেকে এ কোন সুরে চলে গেল গহরজান। খাঁটি উর্দ্দু থেকে সোজা বাঙলায়। খেয়াল থেকে টপ্পায়! গহরজানের চোখে যেন কিসের এক আবেদনের আবেশ। গহরজান এক পলকে দেখেই বুঝে নিয়েছে নতুন আগন্তুককে। সে যে কে তার পরিচয় না জানলেও বুঝেছে, এ পথে সে এসেছে এই প্রথম। গহরজান বুঝতে পেরেছে, খদ্দেরটি শুক্ত-কুম্ভ নয়। বেশ শাঁসালো আর জাঁকালো। গহরজান তার চোখে চোখ রেখে গাইতে লাগলো :

তবে কি সুখ হ'ত।
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত। * * *

পাঠক-পাঠিকা, বল' দেখি এ গান কার রচনা? গহরজান যে-গান ধরেছে এত মিষ্টি-করুণ সুরে সেটির রচনাকার কে? নিধু বাবু? বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগে যেমন রচনাকারের বিভ্রাট, কোনটি যে কার সে সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত ধারণার কোন অবকাশ নেই, বাঙলা গানের প্রথম যুগেও ঠিক সেই বিভ্রাট হতে দেখা যায়। একের রচনা অন্যের নামে পরিচিত হয়েছে। যে-গান রামনিধি গুপ্তের নয় সেই প্রকারের বহু সুরচিত গীত নিধুর নামে প্রচলিত। বস্তুতঃ নিধুর সমসাময়িক সুঠাম, সুকণ্ঠ শ্রীধর কথক ঐ গানের স্রষ্টা। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ শ্রীধরের জন্ম।

বসির তার শূন্য গেলাস রেখে দেয় এক পাশে। তবলায় এসে বসে। ঠেকা দেয় গানের তালে-তালে। কৃষ্ণকিশোর কেমন যেন এলিয়ে পড়ে একটা তাকিয়ে টেনে নিয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গে কিসের এক উত্তেজনা। চোখের দৃষ্টিতে যেন নেই কোন স্থিরতা। কেমন যেন চাঞ্চল্য আর অধৈর্য্য। গহরজানের অপরূপ মুখশ্রী দেখেই সে বিমুগ্ধ। একেক বার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এক জন নারী, পূর্ণযৌবনা রমণী, এত কাছাকাছি বসে আছে তার। এই আবহাওয়ায় এই সুমধুর গান—সম্মোহনের মত আকৃষ্ট করেছে তাকে। তবুও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছে এক জনকে। তিনি এখন হয়তো ভাতের থালা নিয়ে বসে আছেন প্রতীক্ষায়।

কুমুদিনী? তিনি তখন সিন্দুক খুলে কোষ্ঠী বের করতে বসেছেন। জ্যোতিষীর কাছে খবর চলে গেছে। পাইকের হাতে পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন নায়েব মশাই। লিখেছেন কয়েক ছত্র। মহাশয়, পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন। স্বয়ং মা-ঠাকুরাণী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন। পত্রবাহক আপনার পাথেয় লইয়া যাইতেছে।

রাশি রাশি কোষ্ঠী আছে সিন্দুকে।

কর্ত্তারা সব এক জন পণ্ডিতের বিচারেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাই একেক জনের একাধিক কোষ্ঠী আছে সিন্দুকে। ভদ্রেশ্বর আর মূলোজোড়ের পণ্ডিতদের বিচার আছে। কাশীর পণ্ডিতরাও কেউ কেউ আছেন। এমন কি, ভৃগুর অকাট্য বিচার আছে। তবে, এ সবের অধিকাংশই যথাযথ মেলেনি। অনেক মিলিয়ে দেখেছেন কুমুদিনী। কর্ত্তাদের সব যে-সময়ে যাওয়ার কোন কথা ছিল না সেই অসময়ে তাঁরা সব চলে গেছেন পরপারে।

তবুও বিয়ের কথায় কোষ্ঠী-বিচার হবে না?

রাশিতে রাশিতে না মিললে বিয়ে হবে কিসের মিলে। রাশির মিল না হলে কথাই উঠতে পারে না বিয়ের। কুমুদিনী তাই সিন্দুক থেকে ছেলের কোষ্ঠী বের ক'রে জ্যোতিষীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আর একেক বার ঘড়ি-ঘরে অতীত সময়ের সশব্দ ইঙ্গিত শুনে চমকে-চমকে উঠছেন। ছেলেটা গেছে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে, ফিরছে না এখনও?

খাস-মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু অনন্তরামের অবাধ যাওয়া-আসা এখানে। কর্ত্তার আমলের লোক, তার প্রতি আর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ হয় না। আর সে'ও এমন কিছু জরুরী দরকার না হলে আসে না। অনন্তরাম দরজার বাইরে থেকে বললে,—একটা ছোঁড়া এসেছে। দেখা করতে চাইছে বৌঠান-তোমার সঙ্গে।

কুমুদিনী কথাটা শুনেই কোষ্ঠী রেখে ঘরের বাইরে এলেন। অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে বললেন,—কে বল' তো অনন্ত?

—কে আবার! তোমার ছেলের বন্ধু এক জন। জেতে ফিরিঙ্গী। অনন্তরামের কথায় যেন বিরক্তি। বিতৃষ্ণার সুর।

—ফিরিঙ্গী! ছেলের বন্ধু? সে আবার কে? কুমুদিনীর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি যে সব-কিছু জানবে এমন কিছু মানে আছে তার? তা একবার যেয়ে সাক্ষাৎ কর। বাড়ীতে নেই শুনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। একেবারে নাছোড়বান্দা।

রহস্যের জাল দেখতে পেলেন যেন কুমুদিনী। বললেন,—চল যাচ্ছি। আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

বৈঠকখানার তক্তাপোষের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়েছিল নর্মাণ অরুণেন্দ্র। সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ টো-টো করে ঘুরেছে কলকাতার শহরে। কোথায় কোথায় গেছে যেন। জাফরির ফাঁক থেকে একবার দেখলেন কুমুদিনী ছেলের বন্ধুকে। দেখে যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এ আবার কে?

নর্মাণ অরুণেন্দ্র বার্ডসাই খাচ্ছিল। দেখছিল ঘরের ইদিক-সিদিক। দেখছিল দেওয়ালের ছবিগুলো। কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্ব-পুরুষদের। একটা খাঁকী পাজামা পরেছিল নর্মাণ অরুণেন্দ্র। গায়ে একটা চকলেট রঙের ভেলভেটের কোট। মাথায় একটা টুপী ফেল্টের। কুমুদিনীকে সামনে দেখতে পেয়েই তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে বললে নিজের মনে:

A mother is a mother still
—The holiest thing alive.

কুমুদিনী অবাক চোখে চেয়ে রইলেন।

বুঝলেন না কিছু। উত্তর করলেন না কোন কথার। নর্মাণ অরুণেন্দ্রই বললে,—ছেলে কোথায়?

কুমুদিনী বললেন,—জানি না তো।

নর্মাণ অরুণেন্দ্র সাগ্রহে দেখে কুমুদিনীকে। দেখে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। বলে,—Mother, I want money.

কুমুদিনী শুধু বললেন,—আমি তো ইংরিজী জানি না।

হেসে ফেললো নর্মাণ অরুণেন্দ্র। হাসতে হাসতে বললে,—আমি টাকা চাই। At least two hundred rupees. দুই শত টাকা চাই আমার।

—কেন? কুমুদিনী বললেন। আমি তো তোমাকে চিনি না।

—তোমার ছেলে আমাকে জানে! আমরা একটা দল বানিয়েছি। টাকা চাই শুধু।

কুমুদিনী বললেন,—কিসের দল?

নর্মাণ অরুণেন্দ্র খানিক চুপ ক'রে রইলো। বললে,—For the Freedom of India. Freedom of Mother Earth. দেশের স্বাধীনতার জন্যে দল। আর কিছু জিগেস করো না Mother. করলেও আমি বলবো না। বলা নিষেধ আছে।

আবার যেন এক রহস্যের জাল দেখতে পেলেন কুমুদিনী। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন বক্তার মুখের দিকে। কি দেখলেন। নর্মাণ অরুণেন্দ্রর চোখের তারা দু'টো আগুনের বিন্দুর মত জ্বলছে কি? কুমুদিনী চেয়ে রইলেন শুধু। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না যেন। ছেলে বাড়ীতে নেই, তার ওপর এ আবার কে এলো। এসে এমন ভিক্ষার পাত্র তুলে ধরলো। সরাসরি বললো, দাও টাকা দাও। টাকা চাই। টাকা চাই। টাকা চাই না?

বই ছাপাতে হবে। গুপ্ত ছাপাখানা চাই। এখানে-সেখানে যেতে হবে, পাথেয় চাই। প্রচার করতে হবে, তার উপকরণ চাই। অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, শত্রুর বিনাশ চাই। আর এই সব কিছুর জন্যে চাই আর কিছু নয়, শুধু টাকা, টাকা আর টাকা চাই।

কুমুদিনী শেষ পর্য্যন্ত বললেন,—অপেক্ষা কর'। নগদ টাকা আমার হাতে নেই। ছেলের হাতে টাকা। তারই এই সম্পত্তি। তবুও তুমি অপেক্ষা কর। কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনলাম না!

আবার হেসে ফেললো নর্মাণ অরুণেন্দ্র। বললে,—এই তো প্রথম দেখলে আমাকে। একবার দেখে কেউ কাকেও চিনেছে!

কথা বলার আদব-কায়দা দেখে কিছু আর বলেন না কুমুদিনী। নতুন এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে চলেন। নর্মাণ অরুণেন্দ্র তক্তাপোষে বসে পড়ে আবার। অপেক্ষা করে দানের প্রত্যাশায়। কুমুদিনী যেতে যেতে ভাবেন, কিন্তু ছেলের কি কূল-কিনারা হল। গেলো কোথায় সে এই অবেলায়!

বসির তখন তাকে মাত্র এক গেলাস পান করিয়েই খুশী হয়নি। তার পর আরও একটা গেলাস জল কি এক ধরণের পানীয় খাইয়েছে। তাকিয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে কৃষ্ণকিশোর। আর বসির গহরকে ইশারায় কি একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে চলে গেছে পাশের ঘরে। মাসীর সঙ্গে গল্প করতে গেছে। গহরজান হারমনিয়াম সরিয়ে রেখে কাপ্তেনের গা ঘেঁষে বসেছে। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাসী এসে একটা রেকাবী বসিয়ে দিয়ে যায় ফরাসের ওপর। রেকাবীতে চিংড়ীর কাটলেট আর ফুলুরী ভাজা। গহরজান রেকাবী ধরে তার মুখের কাছে। তার হুঁস নেই—চোখে কিছু দেখতে পায় না। জ্ঞানহীনের মত তাকিয়া ধ'রে পড়ে থাকে।

গহরজান খাইয়ে দেয় অবশেষে। ক্ষুধার তাড়নায় সে হাঁ করে। দোকানের তৈরী ভেজাল-দেওয়া কাটলেট খায় চিংড়ী মাছের। গহরজান আরও একটু কাছে সরে যায়। একেবারে তার নিশ্বাসের আওতায়। গহরজানের ঠিক বুকের ওপর তার নিশ্বাসের বাতাস লাগে। গহরজানের একটা হাত সাপের মত তাকে বেষ্টন করে। সাড় ফিরে আসে ক্ষণেকের জন্যে, চোখ মেলে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। খানিকের জন্যে চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ঘোর নামে। বলে,—বসির?

গহরজান চুপি-চুপি বলে তাকে বক্ষে চেপে ধ'রে,—বসির আছে। ভয় কি তোমার?

তন্দ্রাতুরের মত সে মাথা এলিয়ে দেয়। খুব নরম আর কোমল মাংসপিণ্ডের 'পরে বোধ করি ঘুমিয়েই পড়ে। ঘুম নয়, নেশাচ্ছন্নতায় সম্বিৎ হারায় হয়তো। আর বসির মাসীর সঙ্গে গল্প করে পাশের ঘরে। ফুলুরী চিবোয় আর মাসীর ঘটনা এবং দুর্ঘটনা-বহুল জীবনী শোনে। সূর্য্য তখন ঠিক শহর কলকাতার মাথার ওপর। ভরা-দুপুর এখন।

অরুণেন্দ্র বসেছিল ভিক্ষার অপেক্ষায়। আরেকটা বার্ডসাই ধরিয়ে খাচ্ছিলো আপন মনে। অনন্তরাম এসে বিরক্তি সহকারে বললে,—এই নাও, মা দিলেন।

দান দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না নর্মাণ অরুণেন্দ্র। চোখ ঝলসে যায়, হাত পেতে নেয় সাগ্রহে। বলে,—Many, many thanks. I will be ever grateful to her.

কুমুদিনী নিজের অঙ্গের একখানা গয়না পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাল্কা ওজনের একটা গয়না। এক গাছা হাঙর-মুখো ফাঁপা বালা। নর্মাণ অরুণেন্দ্র আর কোন দিকে দৃকপাত না ক'রে বেরিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ। খুশীর জোয়ার নামে যেন তার মনে।

মন্মথ অরুণেন্দ্র যেন ঠিক ঝড়ের মত আসে আর ঝড়ের মত চলে যায়। কিন্তু ছেলে আসে না কেন এখনও! প্রতি মুহূর্তে যার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান, তার জন্য কেন তবে মন ছটফট করে কুমুদিনীর? যার সঙ্গে বেশ কয়েক দিন ধ'রে সেই কোন বাক্যালাপ, সে এলো কি না এলো তাতে কি যায়-আসে? ছেলের বন্ধুকে দেখে কুমুদিনী আরও যেন কোন হদিস খুঁজে পান না। দেখতে পান, কি এক অজানা রহস্যের ইঙ্গিত ঐ ফিরিঙ্গী ছেলেটির মুখাবয়বে। তার কথা আর ভিক্ষা প্রার্থনায় বুঝতে পারেন জটিল সমস্যায় জড়িয়ে আছে তারা। কুমুদিনী ফিরে-ফিরে ঘড়ির দিকে দেখেন। দেখেন বেলা কত হল? দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না। নানা রকম চিন্তার দল তাঁর আন-চান করে। বসিরের সঙ্গে গেছে শুনে কত কি ভাবতে থাকেন আকাশ-পাতাল। আর মনে মনে কামনা করেন, তাঁর এই শরীরের বিনাশ হোক। এত লোকের মৃত্যু হচ্ছে, তাঁকে কেন যম দয়া করছেন না? মনে করেন, তিনি চলে গেলেই সকল জ্বালার অবসান হবে। তিনি বেঁচে আছেন, সেই জন্যেই তো এত-কিছু চিন্তা আর ভাবনা!

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। বিধির নিয়মই না কি এই।

আবার দরজার পাশে এসে উপস্থিত হয় অনন্তরাম। বলে,—জ্যোতিষী এসেছেন। তোমার খবর পেয়েই নাওয়া-খাওয়া ফেলে এসে হাজির হয়েছেন। কি বলব তাকে?

কুমুদিনী বললেন,—বল, আমি নীচে নামছি এখুনি। বিশেষ কথা আছে। কিন্তু অনন্ত, ছেলেটা তো এখনও ফিরছে না। গেছে বসিরের সঙ্গে, আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে।

অনন্তরাম বিশ্রী সুরে বললে,—গেছে তো আর কি হবে? বড্ড যে গান-বাজনায় টান! কেউ জাহান্নমে গেলে তুমি তাকে মোড় ঘোরাতে পারবে? তোমার সাধ্যি আছে?

জাহান্নমে সত্যিই কি সে যেতে চেয়েছে? গেছে তো শুধু ঐ বসিরের কথায়। বসির এসে না নিয়ে গেলে জানতো সে কোথায় গরাণহাটা? কোথায় পার্ব্বণী দিয়ে গান শুনতে পাওয়া যায়? শহর কলকাতার কোথায় কি আছে সে কোত্থেকে জানবে যদি না ঐ বসিরুদ্দিন—

অনন্তরাম আরও বললে,—শুনলাম গেছেন আবার খালি হাতে নয়। নায়েবের কাছ থেকে পঞ্চাশটে টাকাও নিয়ে গেছেন।

—অ্যাঁ! কথাটি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কুমুদিনী। বললেন,—সে কি কথা অনন্ত!

—তবে কি আর বলছি তোমায়। আমি তো আর জানতুম না, নায়েব এই মাত্তর বললে আমার কানে-কানে। বললে, অনন্তরাম অদৃশ্য কুমুদিনীর উদ্দেশে।

মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না কুমুদিনীর। ক্রুরতার একটা কাঠিন্য ফুটে উঠলো তাঁর চোখে। নিরাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ঘরের একখানা ছবিতে। অশ্বারোহীর বেশে কৃষ্ণচরণের তৈলচিত্রে! স্বামীর প্রতি তাঁর যেন পরম অভিমান হয়। অসহ্য এক জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত দেখেই স্বগত করেন নিজের মনে,—এই করতে রেখে যাওয়া হয়েছে আমায়?

অনন্তরাম আবার কথা বলে,—তা হ'লে তুমি এসো, জ্যোতিষী বার-বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।

হাতের কাছেই বের ক'রে রেখে দিয়েছিলেন কুমুদিনী। ছেলের কোষ্ঠীখানা। হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রুদ্র তপস্বিনীর মত তাঁর আকৃতি হয়েছে, অযত্নে বিস্রস্ত রুক্ষ চুল উড়ছে কপালের দুই তীরে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে সহসা দৃঢ়তা। বজ্রচালিতের মত কুমুদিনী চলতে শুরু করলেন। চললেন ওপরতলা থেকে নীচেয়, সেখান থেকে সদরের দিকে।

জ্যোতিষীর বাসা এই কাছাকাছি কোথায়।

ডাক পাঠাতেই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্বয়ং মা ঠাকরুণের ডাক পড়েছে তাই আর মুহূর্ত বিলম্ব করেননি। যেমন অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় চলে এসেছেন। জ্যোতিষীর নাম কাঙালী। বাসার দরজার মাথায় লেখা আছে আলকাতরার রঙে শ্রীকাঙালী জ্যোতির্বিদ্যাবিনোদ, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ হুগলী, ষাঁড়েশ্বরতলা নিবাসী ৺রাধাহরি তর্কচূড়ামণির প্রপৌত্র।

বংশানুক্রমিক ব্যবসা রক্ষা ক'রে আসছে কাঙালী। পূর্ব্বপুরুষ জ্যোতির্বিদ্যা চর্চ্চায় জীবন যাপন করতেন, কাঙালীও সেই ধারা বহন ক'রে চলেছে। কাঙালীর পূর্ব্বপুরুষের দেহের রঙ ছিল ঐ আলকাতরার মতই, কাঙালীও ঠিক সেই রূপ পেয়েছে। অন্ধকারে থাকলে কাঙালীকে না কি চিনবার জো নেই। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায় কাঙালী। কাঙালীর শরীরে চোখ আর দাঁতগুলো শুধু সাদা—একেবারে শাঁকালুর মতই সাদা।

জাফরির পেছন থেকে বললেন কুমুদিনী,—একটি পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটার কুষ্ঠীর সঙ্গে মিল হয় কি না একটি বার তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

কাঙালী এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় যেন। ভেবেছিল, কি না কি দরকার। শুনে বললে,—যথাজ্ঞা। সে আর এমন বেশী কথা কি? পাত্রীর গৃহের সন্ধানটা—

কুমুদিনী বললেন,—এই কাগজে লিখে রেখেছি। আর এই ছেলের কুষ্ঠী। আমাকে কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফলাফলটা জানাতে হবে।

কাঙালী বললে,—সে আর এমন বেশী কথা কি? অবশ্যই জানাবো।

এক জন দাসী কাঙালীর হাতে দিয়ে যায় পাত্রীর পিত্রালয়ের ঠিকানা আর পাত্রের কোষ্ঠীপত্রখানা।

কুমুদিনী বললেন,—আর একটা কথা বলছিলাম। ছেলেটার সময়টা এখন কেমন, একটু যদি দেখো তো ভাল হয়।

কাঙালী কোষ্ঠী খুলতে শুরু করে। চোখ বুলোতে শুরু করে কোষ্ঠীর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। কিয়ৎক্ষণের নীরবতার পরে বললে,—হ্যাঁ, বিবাহের যোগ রয়েছে বটে এই সময়ে। সময়টা এখন ভালই, তবে কি না সঙ্গদোষে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাঠে বিঘ্ন হবে, আর, আর গৃহে অশান্তির একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন।

জ্যোতিষীর কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি মনে হয় কুমুদিনীর। সঙ্গ-দোষ; বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা; পাঠে বিঘ্ন; গৃহে অশান্তি—সব কিছুই তো ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আর এই সব ঘটনায় কিছু-কিছু

[illegible]ন পেয়েই তো ছেলের বিবাহের জন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন [illegible]মুদিনী। চার হাত এক ক'রে দিলে হয়তো এই অবশ্যম্ভাবী [illegible]রিণতি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। মনটা ছেলের ঘরে [illegible]াধা পড়তে পারে।

গরাণহাটার সেই ঘরখানা তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। [illegible]রজা আর জানলাগুলো নিঃশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়েছে গহরজান। [illegible]নের বেলায় রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। পাশের ঘরে গিয়ে [illegible]সিরের সঙ্গে কি কয়েকটা কথার আদান-প্রদান ক'রে আবার [illegible]রে এসেছে সেই ঘরে। কি এক জোরালো পানীয়ের প্রতিক্রিয়ায় [illegible]ষ্ণকিশোর তখন অজ্ঞানের মত প'ড়ে রয়েছে ফরাসের 'পরে।

বসির চুপি-চুপি বলেছে গহরজানকে,—আমি আমার কর্ত্তব্য [illegible]ালন করেছি গহর। এখন তুমি চেষ্টা ক'রে দেখো ছেলেটার [illegible]ন যদি বাঁধতে পারো। অগাধ টাকার একা মালিক, রাণীর [illegible]হালে থাকবে তুমি।

কথাগুলি শুনে গহরজান শুধু একবার হেসেছে। চটুল হাসি। [illegible]খে আর বলেনি কিছু। নিঃসাড়ে চলে এসে বন্ধ ক'রে দিয়েছে [illegible]রের দরজা আর জানলাগুলো। তার পর একখানা হাত-পাখা হাতে নিয়ে বসেছে ঐ অজ্ঞানটার কাছ ঘেঁসে। বাজনাগুলো সরিয়ে রেখে দিয়েছে এক পাশে। হাত-পাখা চালাতে চালাতে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হাতের আঙটি আর জামার বোতাম ক'টা দেখেছে পরখ ক'রে। দেখে গহরজানের চোখে ফুটে উঠেছে কত সুখস্বপ্ন, মনে কত কল্পকথা। তার পর অন্ধকার ঘরে ঐ বেহুঁস ছেলেটার শরীর নিয়ে যেন খেলা করতে শুরু করে দিয়েছে গহর। নিজের অঙ্গের বসন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। গহরজান যেন সম্মোহিত করছে ফণিনীর মতো!

একেক বার চেতনা ফিরে আসতে কৃষ্ণকিশোর নেশার ঘোরে দেখেছে যে, সে যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা ফরাস নয়, একটা কোমল দেহ। পরিপূর্ণ যৌবনের একটি নারী-মূর্ত্তি। তার পর গহরজান—

মাসীর সঙ্গে আর কাঁহাতক গল্প করা যায়। কুলুৰী আর গোটা দুই কাটলেট চিবিয়ে বাসর লাল-চোখে ঘরের কোলের বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যস বারাণ্ডায় রেলিঙ ছিল তাই রক্ষে, নয়তো টলতে টলতে বসির ঠিক রাস্তায় আছড়ে পড়ে যেতো। ওপর থেকে নীচের রাস্তা দেখে বসির। দেখে দোকান-পত্র, লোক-জন, আর এদিক-সেদিকের বাড়ী-ঘর। বহু রাতের বেলায় দেখেছে এই বিচিত্র শহরাঞ্চল; স্ফূর্ত্তি আর উল্লাসে গুলজার। জোরালো আলোর ভ্রম হয়েছে দিন না রাত? আর এখন? এখন যেন জেগেও ঘুমিয়ে আছে অঞ্চলটা। মানুষগুলোর সব ঘুম-ভাঙ্গা চোখ। শরীর যেন সব ক্লান্ত, অবসন্ন। মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে পেঁয়াজ আর রসুনের উগ্র গন্ধ। কে কোথায় জন্তুর মাংস রাঁধছে হয়তো। কোপ্তা কিংবা কাবাব বানাচ্ছে।

মাসী এসে পাশ নেয় বসিরের। পাশে এসে দাঁড়ায় রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে। পানের পিক ফেললে মাসী ওপর থেকে। পচাৎ ক'রে পড়লো এক জনের ফর্সা জামা-কাপড়ে। কোথায় লজ্জা পাবে, না মাসী হাসতে শুরু করলো খিল-খিল ক'রে। এক হাতে বসিরের কনুইটা ধ'রে বললে,—দ্যাখ, বসির, খেল খেললুম কেমন। ব'লেই হাসতে শুরু করলে মাসী। হাসি যেন আর থামে না।

যার গায়ে পড়লো সে তো হতবাক্।

বার কয়েক দেখলো শুধু সে। মাসীকে দেখে বোধ করি আর কিছু বলতে পারলে না। মাসী তখনও হাসছে। বসির শুধু বললে,—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মাসী। লোকটাকে—

বসিরের তখন মুখ থেকে কথা আর সরছে না। কি একটা উগ্র আর কড়া মদের নেশায় বিভোর হয়ে আছে বসির।

মাসী হাসি থামিয়ে বললে—একটা ব্যবসার গোপনীয় কথা। বললে,—বসির, দেখিস্ যেন ফসকে বেরিয়ে না যায়। মেয়েটাকে যাতে বাঁধা রাখে সেই বন্দোবস্ত করিস্। দেখে তো মনে হ'ল বুনেদী ঘরের—

বসির বিরক্ত হয়ে থ্যাক ক'রে উঠলো যেন। বললে,—থোৎ মাসী! তোমার কেবল ঐ ব্যবসাদারী কথা? মনটা আমার ভাল লাগছে না, একটা ছেলেকে অহেতুক কোথায় এনে তুললুম'!

মাসী ধমক খেয়ে কথার মাঝ পথে হঠাৎ থেমে গেলো। ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেল বসিরের কথা শুনে।

মাঝে-মাঝে গরম বাতাসের একেকটা বেগ বইছে।

ভরা-দুপুরের শেষ। রৌদ্রের প্রখর তাপ, রাস্তা প্রায় জনহীন। ক্বচিৎ কা'কেও দেখা যায়।

—এই মাসী?

মাসী কোন উত্তর দেয় না। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ডাক শোনা যায়।—মাসী খাবার দে।

মাসী নিরুত্তর। ফিরেও তাকায় না। যে ডাকছে সে ডেকেই যায়। বলে,—মাসী, গহর টোকে ডাকছে। এই মাসী।

—আমরণ! মাসী এতক্ষণে একটা কথা বলে।

বসির এবার হাসে। যে ডাকছে তার কাছে যায় টলতে টলতে ডাক থামে না,—মাসী, খাবার দে।

কোন মানুষ নয়। পশুও নয়। একটা পাখী। গহরের পেয়ারের একটা কাকাতুয়া। বারাণ্ডার এক দিকে একটা দাঁড়ে বসেছিল ঝুঁটি ফুলিয়ে। মাসীকে দেখে কথা বলতে শুরু করেছিল হয়তো সত্যিই ক্ষুধায় কাতর হয়েছে।

গহরজানের আর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে বসির ঘরে এ[illegible] একখানা মাদুর বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়লো হাতে মাথা রেখে।

একটা নধরকান্তি বিড়াল বসিরের কাছাকাছি এসে বসলে দু'-চার বার ডাকলো মিউ-মিউ ক'রে। বসির তাকে ঠেলা মে[illegible] সরিয়ে দিতে চায়। সরছে না দেখে শেষ পর্য্যন্ত মারলো এক লাথি মিউ-মিউ করতে করতে বিড়ালটা লাথির ঘায়ে সরে গেলো।

মাসী ঘরে এসে বললে,—আহা হা হা, মরে যেতো যদি তুমি কি বল' তো? ও তোমার কি পাতের ভাত খেয়েছে লাথি মারলে এমনি ধারা!

বসির বললে,—কুকুর আর বিল্লী, আদর দিয়েছো কি মা[illegible] উঠেছে।

মাসী বিড়ালটাকে কোলে তুলে নেয় সাদরে। মুখে তার চুমু খায় কয়েকটা। বলে,—এ তোমার যেমন-তেমন বেড়াল নয়। জা[illegible] বেড়াল! কোথাকার মহারাজা দিয়েছে গহরকে। গহর তা[illegible]

দেবে তোমাকে ঠিক ক'রে। চল্ ডালিম, তোকে চান করিয়ে আনি।

বিড়ালটির নাম ডালিম। গহরজান রেখেছে। ডালিমের রূপ অসাধারণ। গহরজানের সদাক্ষণের সঙ্গী। দুধে আর মাছে তাই ডালিম হৃষ্টপুষ্ট।

দেখতে দেখতে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢ'লে পড়েছে কখন সকলের অজ্ঞাতে। রশ্মিজালে নেই তেমন আর তীব্র দাহিকা। শহর কলকাতার আকাশ-চাচা প্রাসাদের শীর্ষদেশে কে যেন মুঠো-মুঠো ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্য্যের শেষ রৌদ্রালোকের রক্তিম বর্ণ অস্তাচলে। প্রতিবিম্বের ছায়া সারা আকাশে। এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে বৈশাখের অপরাহ্ণে। দূরে গাছের ডাল আর পাতা হেলছে-দুলছে। শহরবাসী যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণে একটু হাওয়ার কাঁপনে।

বসিরের ঘুম ভাঙ্গায় গহরজান। বলে,—আর কত ঘুমোবে? ঘরে ফিরতে চাইছে যে তোমার সাকরেদ।

বসির ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। দেখলো গহরজানের আলুথালু বেশ। নেশার ঘোর তখনও কাটেনি বসিরের। গহরজান বললে, হাসতে হাসতে,—এই দেখো বসির। আর এই দেখো।

দু'টো হাতই দেখালে গহরজান। এক হাতের আঙুলে দেখালে কৃষ্ণকিশোরের হাতের একটা আঙটি, হীরে আর পান্নার একটা মারকুইস। আর এক হাতের তালুতে দেখালে ক'খানা দশ টাকার নোট।

বসির বললে,—আদায় করেছিস্ তো?

গহরজান ওপরে নীচে মাথা দোলালে। বললে,—হ্যাঁ, রূপ দেখে ভুলে গিয়ে নিজেই দিয়েছে। বলছে যে, ভুলবে না আমাকে, আসবে ফাঁক পেলেই।

—এই তো চাই! বলে আর উঠে দাঁড়ায় বসির। বলে,—আমার দালালী? যাওয়া-আসার গাড়ী ভাড়া?

কেমন খুশী হয়ে একখানা দশ টাকার নোটই দিয়ে দেয় গহরজান। বলে,—যাও, যাও, সাকরেদকে এখন ঘরে নিয়ে যাও। বলছে, মা কোথায়? মায়ের কাছে যাবো।

—তাই না কি? বলে বসির,—যাই তবে।

মার ঘরে তখন মা নেই। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাস-মহল থেকে আবার নেমে এসেছেন সদরের দরজায়।

ঝাকরির আড়ালে থেকে কথা বলছেন জ্যোতিষীর সঙ্গে। কাঙালী পাত্রীর পিত্রালয় থেকে ফিরে এসেছে। সুসংবাদ। মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির কোষ্ঠীর মিল হয়েছে, যাকে বলে একবারে রাজ-যোটক। কাঙালী বলেছে,—মিল একেবারে অত্যদ্ভুত হয়েছে। সে দিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। তবে, তবে পাত্রীর বিবাহের কিছু পরেই একটা অপঘাতের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন।

কুমুদিনী বলছেন,—অপঘাত! সে আবার কি? যোটকের মিল যখন হয়েছে তখন আর কোন কথা নেই।

কাঙালী বলেছে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। মিল যখন হয়েছে।

কুমুদিনী বললেন,—মৃত্যুযোগ দেখতে পেলেন?

কাঙালী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে,—তা তো কিছু দেখলাম না। অপঘাত মানে হয়তো চলতে-ফিরতে একটু ঘা খেতে পারে। এমনও হয়তো।

কুমুদিনী বললেন, দৃঢ় কণ্ঠে,—যাই হোক। আপনি তাদের কাছে গিয়ে পাকা কথা দিয়ে আসবেন। ওখানেই বিয়ে দেবো আমি আমার ছেলের। আর বলবেন যে, একটি কপর্দ্দকও চাই না আমার। মেয়েটিকে চাই শুধু। সব আমরা দেবো আমাদের বৌকে। আমি কুলগুরুর কাছে বিবাহের দিন স্থির করতে লোক পাঠাচ্ছি। এই বোশেখেই আমি বিয়ে দেবো।

কথা বলছেন, কিন্তু কথায় যেন মন নেই কুমুদিনীর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো আর এখনও ফিরলো না ছেলে। গেল কোন্ চুলোয়?

দাসী ছিল পাশে। বললেন কুমুদিনী,—নায়েবকে বল' জ্যোতিষীকে টাকা দেবে। গোটা কুড়ি টাকা যেন দেন। অনেক পরিশ্রম করেছেন জ্যোতিষী। তেতে-পুড়ে গেছেন এই রোদ্দুরে।

মায়ের মন। ভেবেছেন, চার হাত এক ক'রে দিয়েই নিস্তার পাবেন। বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনেই চলে যাবেন মন যেখানে যেতে চায়। কাশী, বৃন্দাবন যেখানে দু'চোখ যায়। কুমুদিনী ধীরে-ধীরে অন্দরের দিকে চলেন। ওপরে আর না উঠে পুকুরের দিকে চলেন। মনের মধ্যে তাঁর শুধু ছেলের মুখখানা ভেসে ওঠে না, ছেলের সেই ফিরিঙ্গী বন্ধুটিরও চেহারা যেন দেখতে পান। কে ঐ ছেলেটি?

এমন সময় পেছন থেকে দাসী এসে বলে,—ছেলে ফিরেছে। নাটমন্দিরে গিয়ে শালগ্রামশিলে নিয়ে বল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। পুরোহিত তোমাকে ডাকতে বললেন মিত্রি। ছেলে না কি মদ খেয়েছে।

কথাগুলি শুনেই সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে কুমুদিনীর। তাঁর কানে যেন বজ্রপাতের শব্দ পৌঁছেছে। জিজ্ঞাসু চোখে দেখতে দেখতে হত-চকিতের মত সেইখানেই বসে পড়েন। মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে যান। দাসী কুমুদিনীর মাথাটি ধরে শুইয়ে দেয় সেইখানে। নিজের কোলে মাথা তুলে নিয়ে চেঁচাতে শুরু করে,—ওগো, কে কোথায় আছো! এসে দেখে যাও মা-ঠাকুরণের কি হ'ল!

দাসী প্রায় কাঁদতে থাকে। সেই নাট-মন্দিরে আর এই অন্দরের এইখানে যেন কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। শহরের আর সব গৃহের তুলসী-তলায় শঙ্খের ধ্বনি হচ্ছে। শহর কলকাতায় তখন অতি ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা অবতীর্ণ হচ্ছেন, চুমকি দেওয়া আঁচল বিছিয়ে।

বসির ফটকের কাছে ছেলেকে নামিয়ে দিয়েই পিঠটান দিয়েছে। ঠিকানা বলে দিয়েই সরে পড়েছে। আর ছেলেটা নেশার উত্তেজনায় বাড়ীতে এসেই সোজা নাটমন্দিরে উঠে পড়েছে। শালগ্রামশিলা নিয়ে বল্ খেলতে শুরু করে দিয়েছে। কুমুদিনী শোনা মাত্র জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন। অনন্তরাম শুধু ব্যাপার দেখে-শুনে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে শিশুর মত।

দিকে দিকে তখন শাঁখের ধ্বনি হচ্ছে ঐক্যবাদনের সুরে। চুমকি-দেওয়া আঁচল বিছিয়ে দিনের শেষ-সন্ধ্যা অবতীর্ণ হচ্ছেন কলকাতার শহরে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারানাথ রায়

আঠার

ডিকের অন্তর্ধানের পর চার দিন চলে গেছে। একবার হার্দ্দি থানার দারোগা রমণ মল্লিক এসে আবুরি কুঠীও দেখে গেছে, কাতলামারীর কুঠীও দেখে গেছে। ইয়ং রামনগর কুঠী থেকে ফিরে এসেছে। পির আলির মারফত কালীনাথ রায় তাকে বলে পাঠিয়েছিলেন, বন্ধুদের যদি প্রয়োজন বোধ করে যং সাহেব, তাহ'লে তাকে এই খুনী মামলা থেকে বাঁচাতে তিনি চেষ্টা করতে পারেন। ইয়ং নেটিভ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মাথা নীচু করতে সম্মত হয়নি।

মেরীকে রীড ইয়ংএর ঘরে অবশ্য রেখে গেছল, কিন্তু ইয়ংকে দেখে মেরী ক্রোধে আর ঘৃণায় তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। হেতু জানতে চাইলে, মেরী নেপথ্যে বলেছে, ডাকু খুনের সঙ্গে তার সাথ নেই। ইয়ং নারীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, অকৃত্রিম স্কচ রক্ত তার ধমনীতে খরতর বইছে, তার মত তুচ্ছ নারী সে শোণিতের গতি রোধ করতে পারে না। মেরীও তার খাস বিলিতী জনক-জননীর দেমাক দেখিয়ে ইয়ং-এর অহমিকাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। সে জানিয়েছে স্পষ্ট, তার বাংলা মুলুকে আসবার হেতু তার মত বুড়ো পশুর প্রেম নয়, হেতু মাত্র তার মত নেটিভ লুণ্ঠনকারীর ধন-দৌলত। মেরী তাকে দেখিয়ে দিয়েছে, শিকারপুরের গোরস্থানেই তার শেষ পরিণতি, আর সেই গোরস্থানের প্রেতের অঙ্গ থেকে প্রতি টুকরো সোনা-দানা আর প্রতিটি পাই খুঁটে নিয়ে 'হোমে' এক ধনী জমিদারণী সাজাই মেরীদের চরম লক্ষ্য।

ইয়ং উত্তরে টিটকিরী দিয়ে বলেছে, আর লক্ষ্য বাংলা মুলুকের যত নেটিভ ব্যাষ্টার্ড।

এ ইঙ্গিতের জবাব দিতে নিশ্চয় পারত মেরী। জবাব না দিয়ে সে হয় আপনার ঘরে গিয়ে খিল দিত, না হয় সরাসরি বেরিয়ে পড়ত কুঠী-বাগিচায়। সেখানে খালি নির্দ্দোষ সবুজ ঘাসগুলোর উপর ক্ষুরের ঠোকর মেরে মেরে মনের ঝাল মিটাতে চাইত।

দারোগা রমণ মল্লিক যখন তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিল তখন মেরীর ইচ্ছা হয়েছিল সব কথা খুলে তাকে বলে দেয়। ইয়ং বলেছিল, বলেছিল—বল, যা জান বলে ফেল! ইচ্ছে হয়েছিল বলতে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেছল ডিকের ঈষৎ উত্তপ্ত লাল ঠোঁট দু'টো একটু যখন কেঁপে উঠেছিল, হয়ত তখন সে বেঁচে আছে, হয়ত ওরাংওটাংটা তাকে এখনও মেরে ফেলে দেয়নি, হয়ত রীড তাকে উদ্ধার করতে পারবে। পারবে বলেই ত তার হাত ছুঁয়ে বলেছে। ডিক যদি ফিরে আসে, তাকে সে রীডের হেফাজতে লুকিয়ে রাখবে। তার পর? তার পর প্রতিশোধ নেবে ডিক নিজেই। আর ইয়ং-এর 'বিধবা' পাবে মৃত কুঠিয়াল ম্যানেজারের যথাসর্ব্বস্ব। সে ফিরে যাবে 'হোমে'। সে হবে ল্যাণ্ডলেডী। কিন্তু একটু মনে গোলমাল বাধে, 'ল্যাণ্ডলেডীর' বৈঠকখানা তখন শোভা করবে কে? ডিক, না রীড? রীড, না ডিক? সে তখন দেখা যাবে, এখন অন্ততঃ সে কিছু জানে না! হার্দ্দি থানার দারোগাকে মেরী বলেছিল—সে কিছু জানে না।

ইয়ং রমণের কাছে ইঙ্গিত পেল নাজির আসছে তদন্ত করতে অকুস্থলে। খোদ নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হুজুর জেমস, তাঁরই খাস নাজির মহম্মদ মুসলিমকে তদন্ত করতে পাঠাচ্ছেন।

হার্দ্দি থানার দারোগা রমণ মল্লিক হরকরার মারফত কেষ্টনগরে ডিকের গুমের কথা এত্তেলা করেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কুঠীতে ছিলেন না, কাজেই মানুষ গুমই হোক, আর খুনের আসামীই হোক, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে হুজুরের সদরে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। যখন তিনি ফিরলেন, তার উপর যখন কেশব নগরের কুঠিয়াল মহামান্য টমসনের ও তারই সঙ্গে সদরের গোয়েন্দা রবার্ট রীডের নোটটুকু পেলেন, তখন নাজির মিঞাকে সাজতে আদেশ দিলেন।

কেষ্টনগর থেকে কাতলামারী পঞ্চাশ মাইল। নৌকা-পথে নাজির আসছেন। হার্দ্দি থানার দারোগা রমণকেও হাজির থাকতে হবে, সঙ্গে হাজির থাকবে জগমন্ত জমাদার। সাত গাঁয়ের চৌকিদার দফাদারদের রীতিমত প্রস্তুত থাকতে হবে মিঞা সাহেবের জন্ত ভেট নিয়ে।

নাজিরের নৌকা মাথাভাঙ্গার মহিষকুণ্ডির চর পেরিয়ে যখন কাতলামারীর ঘাটের দিকে এগিয়ে এল, তখন চরের লম্বা লম্বা ঝাউবনে বেশ আঁধার ঘনিয়েছে। মাঝিরা তীর বয়ে গুণ টেনে চলেছে। তাদের পা ঘেঁসে জলে নেমে যাচ্ছে দু'-চারটে বিষধর। সন্ধ্যার পাথারের ওপার থেকে কে যেন খল-খল করে হেসে উঠছে। একটা নেড়া খেজুর-গাছের মাথায় অজ্ঞাত কোন্ শিশু কেঁদে উঠছে। জনমনিষশূন্য বুড়ীমা-তলার অন্ধকারে বসে একটা দীপ মিট-মিট করে চেয়ে দেখছে। বুড়ীমা সাক্ষাৎ জাগ্রত। মুসলমানেরাও মানে, ফরাজীরাও হাত তুলে সেলাম করে। নৌকোর ছৈয়ে বসে বুড়ো মাঝির পো হাল ধরেছিল, সে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। নাজীর মুখ বের করে, জানতে চায় ব্যাপার কি?

মাঝির পো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বুড়ীমা তলায় পিদীমের আলোয় ওর হাড়গুলো চক-চক করছে। একটা পুরো··· হাঁ পুরো। দাঁতগুলো জ্বল্জ্বল করছে···কঙ্কাল তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে রয়েছে তাদের নৌকোর দিকে।

দাঁড়ীরা দাঁড় ছেড়ে ফিরে তাকায়, গুণীরা গুণ ফেলে দিয়ে বসে পড়ে। খরস্রোতে নৌকো গলুই পাক খেয়ে ঘুরে যায়। একটা বিকট পৈশাচিক অট্টহাসি বুড়ীমা-তলা কাঁপিয়ে তোলে। মাথাভাঙ্গার ওপার থেকে সে বিকট হাসির প্রতিধ্বনি করে অশরীরী কারা। ওপারে দেখা যায় কাল কাল এক দল ছায়া কা'কে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের 'বোল হরি হরি বোল' ধ্বনি এপারে ভেসে এসে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ছায়ামূর্ত্তিগুলো দুলকি চালে চলতে চলতে আঁধারে মিলিয়ে যায়।

নাজীর মিঞা দু'হাতে চোখ আবৃত করে খোদার নাম করে। রমণ মল্লিকের নৌকো উজান বয়ে এগিয়ে আসে। গাঁয়ের চৌকীদার দল প্রথম প্রহরের জোর-ডাক দিতে দিতে এসে হাজির হয়। নাজীরের নৌকোর বুড়ো মাঝি এবার হাল ধরে নৌকো ফিরায়, দাঁড়ীরা আবার কষে দাঁড় বায়, গুণীরা আবার উঠে পড়ে ঝুঁকে ঝুঁকে গুণ টেনে কাতলামারীর ঘাটে এসে গুণ গুটাতে থাকে।

সে-রাতে কাতলামারীর অতিথি-বাংলোয় নাজিরকে অভ্যর্থনা করা হল। বাংলার বাইরে একটুখানি ক্রোটনের কেয়ারী-ঘেরা ফুলবাগিচা। খানা খাবার পর নাজির মিঞা বিশ্রাম করছেন সে-রাতের মত। বাংলার বারান্দায় চৌকীদারেরা নীল উর্দ্দী আর নীল পাগড়ী পরে চাপা-গলায় ঘর-সংসারের গল্প জুড়ে দিয়েছে।

রাত তখন অনেক। বারান্দায় চৌকীদারেরা জেগে জেগে সবে মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। চৈত্রের গরমের সাথে থানার গরমে নাজিরের ঘুম হচ্ছে না। চাঁদের রোশনাই খোলা দরজা দিয়ে এসে মেঝের পড়েছে, বাগিচা থেকে ফুলেরই গন্ধ যেন ভেসে আসছে। নাজির দেখে গুল নয়—বিবি! ধড়মড় করে উঠে বসে। নারী দ্রুত শয্যা পাশে এগিয়ে এসে তার কানে নরম ঠোঁট ঠেকিয়ে বলে—চুপ! নাজির বুড়ো, বিবির স্পর্শ ত বুড়ো নয়। একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ মৃদু শিহরণ জাগিয়ে নেতিয়ে পড়ে।

নারী খালি বলে—ইয়ং! খালি বলে, ডিককে খুঁজে বের কর হাজারো রুপেয়া। করতলে টাকার তোড়া ওর হাতে। ওর ঠোঁটে—টুকটুকে লাল করমচা। নারী পাশে বসে তার বুড়ো হাত দু'খানি যখন ধরে তুলতুলে হাতে, মিঞার হাত তখন কাঁপতে থাকে, মেরুদণ্ডে যেন এক ঝাঁক সুড়সুড়ে পিঁপড়ে চলে বেড়ায়। মেরী তোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলে—নাও! স্বভাব-লোলুপ কর দু'খানি নীরবে পাতে নাজির। মেরী তোড়া তুলে দিয়ে ওর বুড়ো হাতে হাত রেখে বলে—ইয়ং বদমাস্, হটিয়ে দেবে কি না তোমার পীরের নাম নিয়ে আমায় ছুঁয়ে শপথ কর।

নাজির নরম হাত দু'খানি চেপে ধরে চরিতার্থ হয়ে বলে—জি হাঁ!

মেরী সন্তর্পণে নেমে যায়। বুড়ো নাজিরের মনও সন্তর্পণে তার সঙ্গে চলে যায়। টাকার তোড়া নিয়ে সে তার ক্যাম্বিসের ব্যাগে লুকিয়ে রেখে নিত্য-সাথী ছোট একখানি মাদুর আর বদনা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে গম্ভীর ভাবে কেশে ওঠে। সে শব্দে সজাগ চৌকীদার দু'-এক জন উঠে বসে। নাজির তাদের সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করে। বাংলার বাইরে একটা বাঁধান বক, সেখানে গিয়ে ছোট মাদুর খানি বিছিয়ে ফেলে। চৌকীদার দৌড়ে বদনায় জল ভর্ত্তি করে এনে দেয়। নাজির হাত-পা ধোয়—নামাজে বসবে। অত্যন্ত ধার্ম্মিক সে, খোদা মালেকই তার জান, তাই পাঁচ ওক্ত নমাজ সে পড়ে। বকের নীচে নিজ নিজ কালা পাগড়ী বিছিয়ে চৌকীদার দু'জনও নামাজে বসে। নামাজ হয়ে গেলে নাজির জিজ্ঞেস করে, করাজী!

ওরা বলে—জি!

—বিলকুল?

—বিলকুল।

নাজির বলে—খবর দে, কাতলামারী থেকে আবুরী পর্য্যন্ত কড়া নজর। সমুন্দীরা কেউ যেন সরে না যায়। বুঝলি?

ওরা নিমিষে বুঝে ফেলে। নিমিষে কানে কানে খবর চালু হয়ে যায়। জাফ্‌রা চৌকীদার কর্ত্তা বাবুর কাছে হলফ করে বলেছিল যে, করাজীদের সাত-পাঁচে সে নেই, চৌকীদার-বৌ ধমকেও দিয়েছিল সোয়ামীকে, তাই গেল সন্ধ্যায় সে ফিরে গেছল তার ঘরে। পিঠের আঘাত তাকে আর উঠতে দেয়নি। অকর্ম্মণ্য চৌকীদারকে আজ চৌকী দিতে হয় অহরহঃ বৌকে।

তেমনি পাহারা দিচ্ছিল সেদিন রাতে। এমন সময় করাজী নাজিরের নির্দ্দেশ দিয়ে গেল শিবু শেখ, সিরাজ শেখ, নবুই শেখ, খুদী আর কাওরাজ শেখ। বৌ প্রমাদ গণে বলেছিল—অধমী মানুষটাকে কি তোমরা বাঁচতে দেবে না?

ভোর হতেই সদল বলে নাজির কাতলামারী কুঠীতে গিয়ে হাজির হল। কুঠী ঘেরাও করল চৌকীদারেরা। হার্দ্দি থানার রমণ মল্লিক আর জমাদার জগমন্ত হাঁক-ডাক করে এক কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

কুঠীর ম্যানেজার ইয়ংকে তলব দিতেই খান বিলি তলব তুচ্ছ করল। পীর আলিকে পাঠিয়ে জানাল, বিলিতি সাহেবকে তলব দেবার ধৃষ্টতা নেটিভ নাজির যেন না দেখায়।

কিন্তু খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজির সে, কর্ত্তব্য তাকে করতে হবে। হুজুরও তিতুরও হুকুম করল। শিকারপুর নীলকুঠীয়ালরা মুসলমান বাদসাহী খতম করবার জন্যে গোরা ফৌজ আনিয়েছে। সদরে সে দেখে এসেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট শ সাহেব কুঠিতে পল্টনের সাহেব ষ্টুয়াটের হামেশা যাতায়াত। মাত্র তুচ্ছ নাজির, তবু হুজুরতের প্রতি তারও কর্ত্তব্য আছে। শিকারপুরের ঘাঁটির কথা হুজুরতের ভাগনে নসিরদ্দি সাহেব জানতেই হবে। আর এই ফুরসতে যে কয়টা ফিরিঙ্গী আর কাফের পারা যায়, বেঁধে নিয়ে যেতেই হবে।

নাজির দারোগাকে হুকুম দিলেন হাজির করতে ডিকের জেনানাদের। চৌকীদার ওদের আনতে গেল। ডাক পড়ল নবাই শেখ।

ডিকের কামিলা নবাই বসলে—সে দেখেছে সেড্ল' কোঠের সামনে দাঁড়িয়েছিল গং সাহেব। ডিকের চাকর সিরাজও তা বলে। শিবু শেখ বলে, ২৭শে চত্রির বিহানে ডিক সাহেব কুঠীতে ছিল—সাঁজের বেলা দেখতে পায়নি। কাওরাজ বলে—দলে পীর আলি সাহেবকে দেখেছে, আর দেখেছে গোরা বিবি খায়েল হয়ে রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। খুদী সেখের আখের চাষ, রাতের হাঙ্গামা সে চোখে দেখেছে। দুই সাহেব আর দুই হিন্দু বাবু ছিল ঘোড়ায় চড়ে, সামনে ছিল আর কতকগুলো লোক, একটা লাস ধরাধরি করে নিয়ে কাতলামারীর দিকে যাচ্ছিল। রহিমও জবানবন্দী দিল রহিম কাতলামারীর চাকর হলে কি হবে, হুজুরতের দুষমন সে হতে পারে না। সে বলল স্বচক্ষে দেখেছে ডিক সাহেবকে তাঁবুতে এনে ফেলে গং সাহেব বুট-পায়ে লাফিয়ে উঠেছিল তার বুকে, বলেছিল চিল্লাই কর। খুদি রয়কবাজ বলেছিল বাগা খতম ডিককে তাঁবুতে ফেলে গং রামনগরে চলে গেছল।

নাজির আর তার মুহুরী জবানবন্দী নেয়, টিপ-সই নেয় এই করতেই বেলা দুই প্রহর গড়িয়ে গেল। ঠিক হল, থানা শেষে তল্লাসী হবে লাসের জন্যে।

জগমন্তকে পাঠিয়ে রমণ দারোগা ইতিমধ্যে রায় মশাইকে সব খবর দিয়ে জানাল, নয়নাকে চাই। বিলাসী উত্থান-শক্তিহীন রায় মশাই গোপালকে বললেন—যা মাকে নিয়ে! বাগচীকে বললেন—হুঁসিয়ার হয়ে থেক। একটা পাল্কীতে চড়িয়ে তাকে নাজিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মেরী তার ঘর থেকে মুখ বের করে দেখল পাল্কী থেকে নামছে—নয়না! তাকে না সে নিজের হাতে গুলী করেছে—পড়ে যেতে দেখেছে—তবু কাঁটা কাঁটাই আছে? মাথা তার খারাপ হয়ে যায়। রীড বলেছে—বেসামাল না হতে। কিন্তু নয়না যে মরেনি? এ কী করে সহ্য করা যায়! উত্তেজিতা নারী ছটফট করে। পাশের ঘরে চিন্তাকুল ইয়ং বসে খালি একটা গ্লাসে সরাব ঢালা সবে শেষ করে বোতলটা ধীরে নামিয়েছে। ঝড়ের মত মেরী ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

—ইয়ং! ডিয়ার! মাপ কর। তুমি যা বলবে তাই করব!

ইয়ং গ্লাসটা ঠোঁটে তুলে একবার ওর মুখের দিকে চায়। একটু নেশা যে না হয় তা নয়। তবু একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে টিটকিরী দিয়ে জিজ্ঞেস করে—তোমার ডিক?

মেরী অন্তরে অন্তরে সয়ে নেয় শ্লেষ। ইয়ংকে বলে—সে যদি মরে আমি ত মরতে পারি নে—তুমি কি আমায়···

ইয়ং রূঢ় কণ্ঠে বলে—ঘৃণা করি!

মেরী দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। দলিতফণা ফণিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়ায়। বলে—তোমায়ও আমি ঘৃণা করি! নেটিভ ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে তুমি থাক! তোমার ডাইনী সখী—ডিকের গোরা, ঐ ত এসে নামল, যাও আদর-অভ্যর্থনা করে ঘরে তোল!

ইয়ং দাঁড়িয়ে পড়ে—গোরা?

ভাবে সড়কী মেরেছে তাকে নিজের হাতে, তবু এসেছে? তবু মরেনি? একটু কেঁপে উঠে ইয়ং। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে, একটা কঙ্কাল রূপসীকে পাল্কী থেকে ধরে নামাচ্ছে কয় জন নেটিভ। তারও মগজে আগুন জ্বলে ওঠে। ও তার মৃত্যুদূত! ও নাগিনী তার যৌবন ব্যর্থ করেছে—আর এ নাগিনী তাকে করেছে প্রতারিত। ডিকের আনন্দ বিলাসী—আর মেরীর আনন্দ ডিক। দুই আনন্দ তাকে খতম করতে হবে।

নাজির খানা খেতে গেছে। ইয়ং তরতর নেমে আসে বন্দুক হাতে। পেছনে মেরী ছুটে আসে। এসে পাল্কীর সামনে থমকে দাঁড়ায়।

আলুলায়িতকুন্তলা নারী। যে চোখ ইংরেজ আর ফিরিঙ্গী মহলকে পাগল করে তুলেছিল, সে চোখ দু'টো কোটরগত। দৃষ্টি উদাস। তার চির-সরস ঠোঁট দু'টি চির লোভনীয় ছিল। আজ সে ঠোঁট-জোড়ায় রস নেই। কালকেলো ছোঁড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে দু'টিতে নামছে, তার মুখের উপর মুখ রেখে। আর শুকনো জিভখানি দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে তোলবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে বারম্বার।

ইয়ং বন্দুক উঁচিয়ে গোপালকে ধাক্কা দিয়ে বলে, হট্ যাও! গোপাল চেনে তাকে ভাল করেই! এই ফিরিঙ্গীটাই না সড়কী মেরেছিল তার মাকে। সে রুগ্না মাকে বুকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে নাজির বাংলোয় নিয়ে যেতে থাকে।

—ছোড় দেও, নিগার!

সুমুন্ধী চোখও রাঙায়, গালও দেয়! বাংলোর বারান্দায় মাকে নিয়ে সন্তর্পণে শোয়ায়। ইয়ং তার পিঠে চেপে ধরে বন্দুকের নল—বলে, হট্ যাও!

ক্ষিপ্র উল্লম্ফনে গোপাল এক নিমিষে পদাঘাতে বন্দুকটা দূরে ছিটকে ফেলে দিতেই গুটা আওয়াজ হয়ে যায়। তুচ্ছ জঞ্জালটাকে দু'হাতে খুঁটে তুলে পাঁচ গজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে রুগ্না মার দিকে নজর দিতে গিয়ে দেখে, সুযোগ পেয়ে একটা মরাটে সাদা পেত্নী ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিলাসীর উপর। ক্ষিপ্ত মার্জ্জারের থাবা দিয়ে সে আঁচড়ে দিচ্ছে নয়নার মুখ আর ঠোঁট কামড়ে চেঁচাচ্ছে—হেলো উইচ। হেলো উইচ।

হেলো উইচ.। ঝিমিয়ে মনে পড়ে যায় গোপালের সেই রাতের কথা। হেলো উইচ—সাদা বোরখা-পরা রাতের পেত্নীকে এবার সে দিনে-দুপুরে ধরে ফেলেছে।

সহসা বন্দুকের আওয়াজ শুনে চৌকীদাররা ছুটে এসেছে। ইয়ং উঠে এসে গোপালের বজ্র-কবল থেকে মেরীকে মুক্ত করবার নিষ্ফল চেষ্টা করতে গিয়ে বিরাশী সিক্কা খেয়ে টলতে টলতে বসে পড়েছে, তার নাক-মুখ দিকে গল-গল করে রক্ত পড়ছে।

এত উত্তেজনায় নয়নার ঝিমিয়ে-পড়া মনটাও যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়েছে। বীর সন্তানের বিক্রমকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে রোগক্লিষ্ট মুখখানি উদ্ভাসিত হয়েছে। সে যেন বল পেয়েছে। কম্পিত স্কন্ধ উঁচু করে সে দেখছে গোপালকে—মাত্র গোপালকে। দেখছে গোপালের সারা অঙ্গ-আবৃত করে রেখেছে দুর্জ্জয় দেবতা, তার ভট্টচাজ্। সে আঁচল খোঁজে—খোঁজে বাংলার অঞ্চলের নিধিদের অক্ষয় বর্ম—নোয়া আর কাঠের লাল সিঁদুরের কৌটোটুকু। চেপে ধরে আঁচল, মৃদু মৃদু হাতছানি দিয়ে ডাকে অস্ফুট কণ্ঠে—আয়! আয়!

পিশাচিনীর হাত সে ছাড়ে না। হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসে মায়ের কাছে। তার মাথা ঠুকে দেয় পাকা মেঝেয় বিলাসীর পায়ের কাছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মৃতা নারী! মেরীর মাথাটা ধরে আঘাতে হাত বুলিয়ে দেয়। তার বুকে টেনে নিয়ে এক নারী আর এক নারীকে তার অন্তরের স্পন্দন শুনাতে চায়। মেরী চুপটি করে নয়নার বুকে কান পেতে তা শোনে। বিলাসী চোখ বুঁজে অন্তরে অন্তরে কি যেন অনুভব করে! হয়ত অনুভব করে নীল নরকে মেরী আর গোরা আনন্দ অভিন্ন। নিমীলিত নয়ন দু'টি গড়িয়ে টস-টস করে অশ্রু ঝরে মেরীর ছোট্ট মাথাটা ভিজিয়ে দেয়। কাতলামারীর কুঠীর বাংলোয় মশ্বিতদেহা সফেদ আর শ্যামার অন্তরের সম্মিলন হয়ে যায়।

মেরী ধীরে ওঠে। সে কাঁদে। একবার ফিরে চায় উদাস করুণ নেত্রে নয়নার দিকে। তার পর দুই হাতে মুখ আবৃত করে কাঁদতে কাঁদতে সে চলে যায়। গোপাল মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে মেরীকে। ঠকবগে শ্মশান-কালীর মুখখানিই ত তার মায়ের মুখ। তেমনি ঢলঢল হাসি-হাসি। বিলাসী নিশ্চিন্তে আবার শুয়ে পড়ে।

জগমন্ত সুযোগ পেয়ে ইয়ংকে বেঁধে ফেলেছে। গুরুতর খানার পর জিরিয়ে উঠে পান চিবুতে চিবুতে নাজির যখন এসে পৌছল বাংলোয়, জগমন্ত গংকে তার কাছে হাজির করল। সাদা-পাকা দাড়ী আন্দোলিত করে মনে মনে ঠিকই করে ফেলল হজরতের চর, মহম্মদ সলিম, একে হজরতের দরবারে ভেট পাঠাতে হবে। নিশীথ রাতে বিবির বকশিসের কথা মনে পড়তেই ভাবল, কাজ সহজেই হাসিল হয়ে গেল দেখছি, সে নিমকহারাম মোটেই নয়।

জবরদস্ত নাজির সে, এক রকম জিলার দণ্ডমুণ্ডেরই কর্ত্তা, তা কাছে ফাঁকিটি চলবে না। ডিকের লাসের জন্য রীতিমত কাতলামারী তোলপাড় করতে হবে। হার্ম্মি থানার দারোগা সদলবলে প্রস্তুত। সড়কি, বল্লম নিয়ে চৌকীদাররা প্রস্তুত। ইয়ংকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে জগমন্তও প্রস্তুত।

তল্লাসী সুরু হল জোর—ডিকের লাস বের করতেই হবে। কুঠীবাড়ীর মেজেগুলো অক্ষত রইল না। বাগান-বাগিচা কিছুই বাদ

গেল না। খুদী বললে, এ তাঁবুতে লাস এনে ফেলা হয়, গং সাহেব চিহ্নাই করতে চায়, পীর আলি আর সে বাধা দেয়। তাঁবু উল্টে-পাল্টে জমিনের বুক চিরে সন্ধান, নিষ্ফল। তাঁবুর প্রায় তিন রশি দূরে গোয়াল-বাড়ী। মস্ত গোয়াল-বাড়ী, ৫০ জোড়া নীল চাষের বলদ থাকে। রাখাল ছেলেদের পিঠমোড়া করে বেঁধে জলবিছুটি লাগালেও তারা কাঁদল মাত্র, ছটফট করল মাত্র, কিন্তু কি মিথ্যে বললে ওরা সন্তুষ্ট হবে, তা ঠাহর করতে পারল না। উত্তর-পূব কোণে একটা বাঁশ-বাড়ী। বাঁশ-বাড়ী একটা জায়গা দেখে নাজির বল্লমের ঘা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখল মাটি হালে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। কামিলাদের চাবুক মেরে মাটি উঠিয়ে ফেলা হল। এক মানুষ গর্ত্ত করা হল। একটা মরা টিকটিকি পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।

বেলা পড়ে আসে। নাজির হুকুম দিল, সন্ধ্যার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। ফরাজী ইজ্জতুল্লা নাজিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় নেপথ্যে বলে গেল চোলাই ঘর !

পশ্চিম দিক তখনও সোণালী হয়নি। চোলাই ঘর কাতলামারী কুঠীর শেষ সীমা। নাজির বললে—ওদিকটা দেখা হয়নি। সদলবলে সবাই চলে। নজর করে দেখে নাজির। রমণ মল্লিককেও নজর করে দেখতে বলে। একটা জায়গায় মেঝে অসমান; সন্ত গোময় এনে স্তূপ করা হয়েছে। বল্লমের ঘা দিতে নিরেট আওয়াজ হল না। একটা কেমন যেন ভাপসা গন্ধে ওদিকটা ভরপূর। খোকন হাড়ির দল গোময় স্তূপ সরিয়ে খুঁড়ে ফেলে। কোদালি উঠিয়ে গামছা নাকের উপর দিয়ে বাঁধে। নাজিরের জোর হুকুম—চালাও ! চালাও ! যত খোঁড়ে তত দুর্গন্ধ বেড়ে চলে। কিন্তু বেশী খুঁড়তে হয় না, দুই হাত নীচে মাটি রক্তে ভিজে কাদা হয়ে গেছে। ঝুড়ি বোঝাই করে হাড়িরা রক্ত-মাখা কাদা তুলে আনে।

হাড়িদের গায়ে মাথায় হাত বুলায় নাজির মিঞা। পাওয়া যায় এক টুকরো চামড়া—চামড়ার গায়ে লালচে কটা চুল। ইজ্জতুল্লা সনাক্ত করে ডিক সাহেবের চুল। ডিককে ক্ষৌরী করত দোকড়ী প্রামাণিক, সে এসে বলল, হ্যাঁ ডিক সাহেবের চুল লালচেই ছিল।

আরও খোঁড়া হয়। সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত মাটি বেশী নরম। গর্ত্ত পাশে দুই হাত, লম্বায় সাড়ে চার হাত। নাজির বলল—কচি কলাপাতা ভিজিয়ে মুছে নিয়ে আয়। পাতার উপর চামড়ার টুকরো নিয়ে গোরা আনন্দের কাছে নিয়ে গেল হাদ্দি থানার দারোগা স্বয়ং।

গোপাল বসে আছে মায়ের কাছে। মাথায় হাত বুলাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, এ মা না কী ? এ মানুষ না দেবতা ? ওর কান্নায় গা শিউরে ওঠে—নিঁদ ভেঙে যায়—যে শুয়ে থাকে সে উঠে বসে, যে উঠে বসে সে ছুটে চলে। সে অভিভূত হয়ে মায়ের মুখ পানে চেয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

রমণ মল্লিক এসে হাজির করে কলাপাতায় সেই চামড়ার টুকরো। গোপালের হাতে দিয়ে বলে, নয়নাকে দেখা। গোপালের উপস্থিতির আবেশ মাদকতায় বিলাসী একটা আরাম-দোলনায় দুলছিল, হঠাৎ বিপরীত ধাক্কা এসে তার দোলনীর তাল কেটে দিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে চমকে উঠে সে গোপালের হাত চেপে ধরল।

মল্লিক দারোগা কলাপাতাটা খুলে দেখায় রক্ত-মাখা চামড়ার টুকরো—বলে, চেনো ? নাজিরও এসে পড়ে—জিজ্ঞেস করে, সনাক্ত করতে পার ? নয়না ঘাড় কাৎ করে। একটা আতঙ্কে ওর চোখ দু'টো কপালে উঠিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—হ্যাঁ, ডিক সাহেব। তার প্রায় শুকিয়ে যাওয়া কাঁধের বল্লমের ক্ষত নতুন করে টাটিয়ে ওঠে। সূর্য্যও অস্ত যায়। কাতলামারীর কুঠীও আতঙ্কে ছম-ছম করে।

নাজিরের তল্লাসী শেষ হয়ে যায়। কাতলামারীর ম্যানেজার ইয়ং; ফরাসী ফিরিঙ্গী পীর আলি, কুঠীর দেওয়ান নিমাই নন্দী, কুঠীর আমিন সার্থক বিশ্বাস, খোঁড়া মুহুরী পেঁচো ওরফে পঞ্চানন আরও কতকগুলো কাকের লাঠিয়ালকে গ্রেপ্তার করে হজরত তিতুর সাকরেদ জিলা নদীয়ার নাজির, মহম্মদ সলিম যখন সদলবলে হাউলে নদীর ঘাটে গিয়ে সাতখানা মহাজনী নৌকো বোঝাই বন্দী নিয়ে সদরে যাত্রা করল, তখন তীরে দাঁড়িয়ে এক জোড়া শেয়াল তারস্বরে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাল। বুড়ীমা অশথতলার ক্ষুদ্র দীপশিখায় মলিনোজ্জ্বল উত্তত-হস্ত কঙ্কাল। তেমনি করে অঙ্গুলী সঙ্কেতে পথ নির্দ্দেশ করে দিল। আর মহিষকুণ্ডীর ঝাউ-বনে বায়ু-হিন্দোলের চঞ্চলতা সহসা স্তব্ধ করে দিয়ে অশরীরী অট্টহাসি তেমনি বিদ্রূপ হাসি হেসে গেল—এবার একটু জোরে, এবার একটু কাছে। ওরা দেখল, নৌকোর সঙ্গে তীর বয়ে বয়ে একটা বিকট অট্টহাসি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে—কুব্জপৃষ্ঠ, দ্ব্যঙ্গ-দেহের বৈশিষ্ট্য দু'খানি বিরাট হাত—সে হাত একবার উঠছে মাথার উপরে, আবার হাঁটুর নীচে পড়ে দুলতে দুলতে চলেছে।

[ক্রমশঃ।

পোষাকে কিবা আসে যায়

সিসিল বি, ডিমিলের নাম শুনেছেন ? আধুনিক ছায়া-চিত্র-জগতে তিনি প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক বলতে পারেন। একবার মিঃ ডিমিল তাঁর এক ছবির সামান্য একটি অংশ অভিনয়ে এক নায়িকার জন্য পনেরো গজ রয়াল ব্রোকেড কিনতে নির্দ্দেশ দেন, যাতে নায়িকাকে অনেক বেশী সুশ্রী দেখায়। সেই ব্রোকেডের প্রতি গজের মূল্য দু'শো ষ্টার্লিং। এখন প্রায় তিন হাজার টাকা।

ইুডিওর পোষাক-বিশেষজ্ঞ এসে বলেন,—দু'শো ষ্টার্লিংএর পরিবর্ত্তে দু' ষ্টার্লিংএর মূল্যের প্রতি গজের ব্রোকেড দিলে ক্ষতি কি ? দর্শকরা কি বুঝবে এই দামের পার্থক্য ?

"না"—বললেন ডিমিল।—"তারা বুঝবে না বটে। কিন্তু আমার চিত্র-তারকা, সে তো বুঝবে। তুমি কি ভাবতে পারো, এক জন তারকা তিন হাজার ষ্টার্লিং দামের পোষাক পরেছে, অথচ ভাল অভিনয় করছে না।" বিশেষজ্ঞ এই কথা শুনে নীরবতা অবলম্বন করেন এবং ঐ রয়াল ব্রোকেডই আনিয়ে দেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিশ্বশান্তি ও ষ্ট্যালিন—

মঃ ষ্ট্যালিন এবং 'প্রাভদা' পত্রিকার প্রতিনিধির মধ্যে সাক্ষাৎকারের বিবরণ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) রাত্রে মস্কো বেতারে ঘোষিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে দুই বৎসর পরে তিনি এই বিবৃতি দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে-বিবৃতি দেন তাহা ১৯৪৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী মস্কো বেতারে ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ বিবৃতিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া এক যুক্ত ঘোষণার জন্ম তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এই শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্ম প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) তাঁহার সহিত মঃ ষ্ট্যালিনের দ্বৈত আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মঃ ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও শান্তি একটুকুও নিকটবর্ত্তী হয় নাই। বরং ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে, তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কায় সকলের মনই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে মঃ ষ্ট্যালিন যখন শান্তি-প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন উত্তর-আটলাণ্টিক ব্লক গঠনের কাজ শেষ পর্য্যায়ে উপনীত হয়। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল। ইহার পর হইতে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ নূতন তীব্রতা লাভ করে এবং ইউরোপে উহা পশ্চিম-জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠনের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠে। কিন্তু ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া। এই রকম সময়ে দুই বৎসর পরে মঃ ষ্ট্যালিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অন্ততঃ বর্ত্তমানে যুদ্ধ অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করা যায় না।" রাশিয়াকে ভাবী আক্রমণকারী বলিয়া ধরিয়া লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে যুদ্ধায়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মঃ ষ্ট্যালিনের এই উক্তির মধ্যেই উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে কি?

মঃ ষ্ট্যালিন অবশ্য 'যুদ্ধ হইবে না' এইরূপ কোন সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারেন নাই। এইরূপ কোন আশ্বাস দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবও নয়। কারণ, অপর কেহ যদি বিশ্বসংগ্রাম সুরু করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে একা রাশিয়ার পক্ষে তাহা নিরোধ করা কিরূপে সম্ভব, এই প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতঃ, মার্কিণ রাষ্ট্র বিভাগের মিঃ ডুলেস এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথমে আক্রান্ত না হইলে রাশিয়া তাহার সৈন্য বাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপে অভিযান চালাইবার নির্দ্দেশ দিতে সাহস করিবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক-সদস্য মিঃ এডেল্ম্যান বলিয়াছেন, "Russia will need another twenty five years before she can effect-turly challenge the joint power of Britain and America in war potential." অর্থাৎ 'আরও ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে রাশিয়া কার্য্যকরী ভাবে বৃটিশ ও মার্কিণ যৌথ সামরিক শক্তির সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না।' গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ কমন্স সভায় বৃটিশ শ্রম-সচিব মিঃ বিভানও বলিয়াছেন যে, রাশিয়া বর্ত্তমানে আক্রমণ করিবে, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রাশিয়ার সামরিক শক্তির দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, উহা (narrowness of her industrial base) তাহার সঙ্কীর্ণ শিল্পনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিণ ফরেন রিলেশন কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর সামরিক শক্তির যে তুলনা-মূলক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ শক্তিগোষ্ঠীর শক্তি সোভিয়েট ব্লকের শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এই সকল মন্তব্য বিবেচনা করিলে দেখা যায়, রাশিয়ার দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। সুতরাং রাশিয়ার পক্ষে শান্তি রক্ষা সম্পর্কে আশ্বাস দেওয়া কিরূপে সম্ভব? রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থা যদি আত্মরক্ষা-মূলক হয়, তাহা হইলে আটলাণ্টিক শক্তিগোষ্ঠীর এই অস্ত্র-সজ্জা কি তাৎপর্য্যপূর্ণই নয়?

অস্ত্র-সজ্জা সমর্থনের যুক্তিস্বরূপ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, রাশিয়া ইতিপূর্ব্বেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, গত যুদ্ধের পর রাশিয়া তাহার বিপুল সৈন্য বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেয় নাই। মঃ ষ্ট্যালিন মিঃ এটলীর এই যুক্তির যে উত্তর দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। এ সম্পর্কে 'প্রাভদা'র প্রতিনিধি তাঁহাকে যে প্রশ্ন করেন তাহার উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন বলেন যে, মিঃ এটলীর উক্তিকে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর কলঙ্ক আরোপ বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, "আর্থিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে মিঃ এটলীর যদি সম্যক্ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া সহ কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই অসামরিক

শিল্পের উন্নয়ন, কোটি কোটি রুবল ব্যয় করিয়া ভল্গা, ডন এবং আমু নদীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ন্যায় বৃহৎ পরিকল্পনা, কোটি কোটি রুবল ব্যয় করিয়া ব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্য হ্রাস করিয়া জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নয়ন একসঙ্গে করা সম্ভব নয়।" জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলে যুদ্ধসজ্জা যে সম্ভব নয়, ইহা সাধারণ মানুষেও বুঝিতে পারে। অ-সামরিক শিল্পের উন্নতির জন্য রাশিয়া যাহা করিতেছে বলিয়া মঃ ষ্ট্যালিন দাবী করিয়াছেন তাহাতে যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও রাশিয়া তাহার সামরিক শক্তিকে কিরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা বিবেচনা করা উপেক্ষার বিষয় নহে। প্রথমতঃ, মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর তিনটি পর্য্যায়ে রুশ সৈন্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ১৯৪৫ সালে এবং তৃতীয় পর্য্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ১৯৪৭ সালের মে হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সকল বিষয় সকলেরই জানা কথা। রাশিয়ার সমস্তই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়, এ কথা আমরা বহু বার শুনিয়াছি। তথাপি যুদ্ধের পর সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া যদি কাহারও সন্দেহ থাকে এবং কেহ যদি মনে করেন যে, রাশিয়া তাহার সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে মার্কিণ ফরেন রিলেশান কমিটির হিসাব বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। উক্ত হিসাবে প্রকাশ যে, চীনকে বাদ দিয়া সোভিয়েট ব্লকের সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা ৫০ লক্ষ এবং আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির সশস্ত্র সৈন্য-সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। সুতরাং সৈন্য-সংখ্যার দিক্ দিয়া সোভিয়েট ব্লক আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ শক্তিবর্গ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য চীনা সৈন্য বাহিনীর সাহায্যও রাশিয়া পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে শুধু সৈন্য-সংখ্যা দ্বারাই সামরিক শক্তি নির্দ্ধারিত হয় না। নৌশক্তি, বিমান-শক্তি, ট্যাঙ্ক, আর্ম্মার্ড কার, চলাচল-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সম্পদ, যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ-শিল্প প্রভৃতি দ্বারাই সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল দিক দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক যে সোভিয়েট ব্লক অপেক্ষা বহু গুণে শক্তিশালী, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি?

রাশিয়াই যদি সম্ভাব্য আক্রমণকারী হয়, তাহা হইলে আটলাণ্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব্বেই রাশিয়া কেন সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ দখল করে নাই? ঐ সময় সমস্ত ইউরোপ দখল করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ ছিল, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে কেন রাশিয়া তাহার বিরোধী শক্তিবর্গকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ ও সময় দিতেছে? রাশিয়ার সামরিক শক্তি যদি ইউরোপকে দখল করিতে সমর্থ হয়, তবে কোরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিতেছে না কেন? এই প্রশ্ন মার্কিণ সামরিক সমালোচক ম্যাক্স ওয়ার্ণারকে কম বিস্মিত করে নাই। তিনি বলিয়াছেন, "We can not imagine Hitler having the military superiority the Soviet Vnion now has and not attacking; we can not imagine Hitler not rushing to the rescue of a weak ally under serious military threat, as North Korea is." অর্থাৎ 'সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্ত্তমানে যেরূপ সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে এইরূপ সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন হইয়াও আক্রমণ করিতেন না, এরূপ হিটলার আমরা কল্পনা করিতে পারি না। উত্তর-কোরিয়া যেরূপ সামরিক দিক হইতে বিপন্ন হইয়াছে ঐরূপ বিপন্ন দুর্ব্বল মিত্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন না, এরূপ হিটলার আমরা কল্পনা করিতে পারি না।' রাশিয়াই যে ভাবী সম্ভাব্য আক্রমণকারী, উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে কেন ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের এই সমরায়োজন? মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর দোষারোপ করিয়াই এবং তাহার শান্তিপূর্ণ নীতির নিন্দা করিয়াই মিঃ এটলীর পক্ষে বৃটেনের পক্ষে অস্ত্রসজ্জা সমর্থন করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার চারি দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ঘাঁটি-বেষ্টনী প্রস্তুত করিতেছে তাহাও মনে না পড়িয়া পারে না। বিলাতের 'পিপল' (The People) পত্রিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে রক্ষামূলক বেষ্টনী গঠন করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাটকীয় তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এডিনবার্গ হইতে প্রকাশিত 'স্কটম্যান' পত্রিকা লিখিয়াছেন, "বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া এমন একটি বিমানঘাঁটির বেষ্টনী রচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছে যাহা আকস্মিক আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবে, অথচ লৌহ-যবনিকার এত নিকটবর্ত্তী হইবে যে, সোভিয়েট শক্তি-কেন্দ্রগুলির উপর ব্যাপক আক্রমণ চালান সম্ভব হইবে।" উক্ত পত্রিকা আরও লিখিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী যখন ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন তখন এই বিষয় সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা আরও বলিয়াছেন যে, আমেরিকা ইতিপূর্ব্বে বৃটেন এবং সুদূর প্রাচ্যে কতগুলি ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে এবং শীঘ্রই লিবিয়া ও সৌদী আরবে আরও ঘাঁটি পাওয়া সম্ভব হইবে। 'পিপল' পত্রিকা সাইপ্রাসে ঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে রাশিয়ার সহিত বৃটেনের যে চুক্তি হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর বিচার রাশিয়া অবশ্যই করিবে এবং হয়ত প্রতিবাদও জানাইবে। কিন্তু এই সকল সমরায়োজন যে বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু কেন এই আয়োজন? পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে সোভিয়েট কম্যুনিজম একটা ভয়ানক বিপদ। যত দিন সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্ব থাকিবে তত দিন এই বিপদকে নির্ম্মূল করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ সোভিয়েট কম্যুনিজম লাল ফৌজ পাঠাইয়া কোন দেশ দখল করিবে, ইহাও কেহ কল্পনা করেন না। কিন্তু রাশিয়ার আদর্শ প্রত্যেক দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত জনগণের উপর যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এ কথাও অনস্বীকার্য্য। যত দিন সোভিয়েট রাশিয়া থাকিবে তত দিন তাহার আদর্শও বিভিন্ন দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিবে, এই আশঙ্কা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র আজ পর্য্যন্তও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ হয় নাই, ভবিষ্যতেও যে হইবে তাহারও ভরসা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কম্যুনিজম নিরোধের একমাত্র সহজ উপায় সোভিয়েট কম্যুনিজমের বিলোপ। সোভিয়েট রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিলে

সোভিয়েট কম্যুনিজম বিলোপের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সোভিয়েট রাশিয়া নিজে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু যদি কোন রকমে সোভিয়েট রাশিয়াকে যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া আনা যায়, তাহা হইলেই শুধু কম্যুনিষ্ট বিপদের প্রধান উৎসমুখ বন্ধ করা সম্ভব হইতে পারে। ঠাণ্ডা-যুদ্ধ এবং ব্যাপক সমরায়োজন রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য কৌশলপূর্ণ উস্কানী ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব কি ?

'প্রাভদা' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি প্রসঙ্গে মঃ ষ্ট্যালিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধঃপতনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশ্ব-সংগ্রাম ঘটাইবার উপায়ে পরিণত হইয়াছে। তিনি উহাকে আর বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। উহাকে তিনি "an organization for the American, an organization acting on behalf of the requirements of American aggressors." অর্থাৎ উহা আমেরিকার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান, মার্কিণ আক্রমণকারীদের প্রয়োজন মিটাইবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ১০টি দেশ এবং লাটিন আমেরিকার ২০টি দেশ তাঁহার দৃষ্টিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আক্রমণাত্মক ভাবসম্পন্ন অন্তঃকেন্দ্র! লাটিন আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্রের উপর আমেরিকার অপ্রতিহত প্রভাবের কথা কাহারও অজানা নাই। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলির পক্ষেও আমেরিকার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ডলারের মালার বন্ধনে আরও অনেক দেশ আমেরিকার অভিপ্রায় অনুযায়ীই চলিতে বাধ্য। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে মার্কিণ প্রতিষ্ঠান বলিতে কোন বাধা নাই। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার নৈতিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় অশ্বেতকায়দের উপর নিপীড়ন বন্ধ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্মত হয় নাই। কাশ্মীরে পাকিস্থান যে আক্রমণকারী তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পাকিস্থানকে আক্রমণকারী ঘোষণা করে নাই। কিন্তু উত্তর-কোরিয়ার বক্তব্য না শুনিয়াই অতি তাড়াতাড়ি বিনা প্রমাণে তাহাকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য আসন দেওয়া হইতেছে না শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির জন্যই। সর্ব্বোপরি কম্যুনিষ্ট চীনকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লীগ অব নেশান্‌সের নিন্দনীয় পথেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে,' মঃ ষ্ট্যালিনের এই উক্তির মধ্যে পৃথিবীর বহু লোকের আশঙ্কা প্রতিফলিত হইয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি স্পষ্ট ভাবেই চীনের শান্তি-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্যে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবে।" কোরিয়া যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা আজকাল বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, কার্য্যতঃ সেখানে একটা সাময়িক অচল অবস্থা চলিতেছে। এই যুদ্ধের চতুর্থ পর্য্যায় কি ভাবে আরম্ভ হইবে এবং কবে আরম্ভ হইবে তাহা এখন কিছুই অনুমান করা যাইতেছে না। কোরিয়ার যুদ্ধই শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে পরিণত হইবে কি না তাহা পূর্ব্বের মতই এখনও অনিশ্চিতই রহিয়াছে। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা সে সম্পর্কে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "যদি যুদ্ধকামীরা দেশবাসীকে মিথ্যা দ্বারা ভুলাইয়া এবং প্রতারণা দ্বারা বিশ্বযুদ্ধে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।" তাঁহার এই উক্তি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কাহারা এই যুদ্ধকামী তাহাও মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা লক্ষপতি এবং কোটিপতি! অন্য দেশ শোষণ করিয়া অতিলাভ করিবার উপায় হিসাবেই যুদ্ধ তাঁহাদের কাম্য। প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্টের উপর ইহাদের অমিত প্রভাব। তাঁহার উক্ত মন্তব্য মিথ্যা প্রচারকার্য্য কি না তাহা প্রত্যেক দেশের জনসাধারণই ভাল করিয়া জানে। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না। কারণ, যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোঝা তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের উপর সাধারণ মানুষের যে কোন প্রভাবই নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি ভারতে শান্তি-কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের প্রচেষ্টা কিরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব রাজাজীর দৃষ্টিতে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হওয়া জনস্বার্থের প্রতিকূল বলিয়াই মনে হইয়াছে। উক্ত শান্তি-কংগ্রেস আহ্বানের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের প্রেরণা রহিয়াছে সত্য। কিন্তু অ-কম্যুনিষ্টরাই বা শান্তির জন্য কি করিতেছেন? আসল কথা, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে পৃথিবীর অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টই উহার সমর্থক। উহা ব্যতীত আর কোন পথ তাহাদের কাছে শান্তির পথ বলিয়া মনে হয় না। রাশিয়ার শান্তি-প্রচেষ্টা তাঁহাদের দৃষ্টিতে অশান্তির পথ মাত্র। 'শান্তিতে' শান্তিতেও তফাৎ আছে বৈ কি!

যুগোশ্লাভিয়া—

'প্রাভদা'র প্রতিনিধির নিকট মঃ ষ্ট্যালিনের বিবৃতি যে দিন ঘোষিত হয় সেই দিনই মার্শাল টিটো এক ঘোষণায় বলেন যে, যুগোশ্লাভিয়া তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবেই। এই ঘোষণার সঙ্গে তিনি এই অভিযোগও উপস্থিত করেন যে, চীন এবং কোরিয়ার ভ্রান্ত নীতির জন্য রাশিয়াই দায়ী। যুগোশ্লাভিয়া তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, হঠাৎ এইরূপ ঘোষণা করিবার প্রয়োজন কেন হইয়া পড়িল তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিছু দিন পূর্ব্বে টিটো মন্ত্রিসভার অনেক মন্ত্রী যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন তখন তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, আগামী বসন্তকালে বা গ্রীষ্মকালে যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। মার্শাল টিটোও সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তিনি করেন না। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরিয়াই মার্কিণ সংবাদপত্র সমূহে এইরূপ জোর প্রচার-কার্য্য চলিতেছে যে, হাঙ্গেরী, রুমানীয়া এবং বুলগেরিয়ার সহযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের জন্য রাশিয়া আয়োজন করিতেছে। নিউলন দিবসের বক্তৃতায় মিঃ ডিউই

এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমূহ কি করিবে? একিসনও যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) মিঃ একিসন বলিয়াছেন—"United States reaction to an attack on Yugoslavia would be the same as its response to Red aggressin in Korea." অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উহার প্রতিক্রিয়া কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট আক্রমণের প্রতিক্রিয়ার অনুরূপই হইবে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মঃ সফোক্লিস ভেনিজেলস মিঃ ওয়াল্টের কারের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, বল্কান রাজ্যগুলির ভিতর দিয়া কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া এবং তুরস্ককে সাহায্য করার আশ্বাস বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্প্রতি প্যারীতে মার্কিণ ডিপ্লোম্যাটদের যে সম্মেলন হইয়া গেল, তৎসম্পর্কে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিণ অফিসারগণ একমত হইয়া এই রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন যে, যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের জন্ত রুশ তাঁবেদার দেশগুলিতে সামরিক প্রস্তুতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকিলেও এই আশঙ্কা সম্বন্ধে একটা প্রচার-কার্য্য বেশ জোরের সহিতই চলিতেছে। এ কথা হয়ত সত্য যে, পূর্ব্ব-ইউরোপের সোভিয়েট-মিত্রদেশগুলিতে সশস্ত্র সৈন্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫০) মার্শাল টিটো বলিয়াছিলেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী কমিনফর্ম্ম দেশগুলির সৈন্ত সংখ্যা সাত লক্ষ। এই সকল দেশে রুশ সৈন্তও অবস্থান করিতেছে এবং রাশিয়া হইতে অস্ত্র-শস্ত্রও এই সকল দেশে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্তবলও বড় কম নয়। মিঃ ভিট্রের হিসাব মত যুগোশ্লাভিয়ায় ত্রিশ ডিভিশন সৈন্ত আছে। তবে কেন যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার ধূয়া উঠিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে কোরিয়া যুদ্ধের সম্পর্ক থাকা যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতির কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে কোরিয়া যুদ্ধের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিবে। হয়ত কোরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া কোনটাই রক্ষা করা হইবে না। কারণ, এখন পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভিয়া রক্ষা করিবার কোন দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নাই। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া যদি রাশিয়ার দিকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে যুগোশ্লাভ সৈন্তবাহিনী যে শুধু রাশিয়ার সামরিক শক্তিকেই বর্দ্ধিত করিবে তাহা নয়, রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়ার খনিজ সম্পদও লাভ করিবে। ইটালী, গ্রীস এবং তুরস্কও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ভূমধ্যসাগর দিয়া চলাচল-ব্যবস্থারও বিপদাশঙ্কা আছে। অথচ পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির এমন সৈন্তবল নাই যে, যুগোশ্লাভিয়াকে সাহায্য করিবার জন্ত প্রেরিত হইতে পারে। মার্কিণ সৈন্ত ইউরোপে পৌঁছিতেও বিলম্ব হইবে। এইরূপ অবস্থায় একমাত্র পথ খোলা থাকিবে রাশিয়ার উপর পরমাণু বোমা বর্ষণ করা। যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে আটলাণ্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ রাষ্ট্র-সমূহ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, এইরূপ ধারণা যদি সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না ইহাই বোধ হয় মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা। কিন্তু আসল কথা এই যে, মার্শাল টিটোর সঙ্গে একটা সামরিক সাহায্য চুক্তির পূর্ব্বাভাষরূপেই যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার ধূয়া তোলা হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়াকে হঠাৎ আটলাণ্টিক চুক্তির 'অন্তর্ভুক্ত করা খুব ভাল দেখাইবে না। মার্শাল টিটোও হয়ত সোজাসুজি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীতে যোগদান করিতে লজ্জাবোধ করিবেন। কিন্তু আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে লজ্জিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

প্যারী সম্মেলন—

অবশেষে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয়ের সম্মেলনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে গত ৫ই মার্চ্চ (১৯৫১) প্যারীতে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার কোন ভরসাই এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। প্রাগে কমিনফর্ম্ম সম্মেলনের পর রাশিয়া গত ৩রা নবেম্বর (১৯৫০) জার্ম্মাণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বানের জন্ত বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করে। কিন্তু এই সম্মেলন আহ্বান করিতে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অসম্মত না হইলেও তাহারা রাশিয়াকে জানায় যে, শুধু জার্ম্মাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন ফল হইবে না, অশান্তির সমস্ত কারণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। রাশিয়া তাহাদের এই প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় আলোচনার কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের জন্ত সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মার্কিণ ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত ডাঃ জেসাপ প্যারী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ডাঃ জেসাপ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত গত ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৫১) আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জোনেস্তার বুশ ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমাগুলি সমগ্র রাশিয়াকে ধ্বংস করিতে সমর্থ। পরমাণু বোমা দ্বারা রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা সম্ভব কি না, রাশিয়ারও পরমাণু বোমা আছে কি না এই প্রশ্ন বাদ দিলেও, প্রধান কথা এই যে, সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের প্রাক্কালে এই সকল উক্তি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কাজে সাহায্য করিবে কি?

সম্মেলনে আলোচনার জন্ত রাশিয়ার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত তিন দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে: (১) জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্রীকরণ এবং পুনরস্ত্রসজ্জা নিরোধ সম্পর্কে পটসডাম চুক্তি প্রতিপালন করা, (২) ইউরোপের অবস্থার উন্নয়ন এবং বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সশস্ত্র সৈন্ত-সংখ্যা হ্রাস, (৩) জার্ম্মাণীর সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে বিবেচনা এবং উহার পরিণতি-স্বরূপ জার্ম্মাণী হইতে দখলকার সৈন্ত অপসারণ। পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে সম্মেলনের জন্ত নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী প্রস্তাব করা হয়: (১) বর্ত্তমানে ইউরোপে আন্তর্জাতিক উত্তেজনামূলক অবস্থা

উদ্ভব হওয়ার কারণ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ও উহা সুদৃঢ় করার উপায় পরীক্ষা, (২) স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক অষ্ট্রীয়ার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন, (৩) জার্ম্মাণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত সমস্যাবলী। এই দুইটি প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কি না, তাহা লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিবার স্থান পাইব না। পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রস্তাবে জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্রকরণ সংক্রান্ত কোন কথা নাই। কিন্তু রাশিয়া উহার উপরেই বেশী জোর দিবে। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্তের অভিজ্ঞতা রাশিয়া ভুলিতে পারে না। আবার পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গরূপে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার নীতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহাও আশা করা অসম্ভব। অষ্ট্রীয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক দিকে যুগোশ্লাভিয়া আর এক দিকে জার্ম্মাণীর সহিত অষ্ট্রীয়া সংযুক্ত রহিয়াছে। কাজেই অষ্ট্রীয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন অনেক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিবে। কিন্তু এই সম্মেলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিবে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে এবং পররাষ্ট্র-ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় কর্তৃক স্বাধীনতা দানের ঘোষণা।

বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের জন্য কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে যেদিন সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলন আরম্ভ হইল তাহার পরদিনকেই বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন করিবার, পররাষ্ট্র-দপ্তর খুলিবার, কম্যুনিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দিবার ঘোষণা করিবার সুসময় বলিয়া মনে করিল কেন, তাহা কি সত্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? পশ্চিম-জার্ম্মাণী এই অধিকারের পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণীর প্রাক্‌যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে কাঁচা মাল সংগ্রহ ও ব্যবহার করিবার অধিকার দান করিয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে এই অধিকার দান উহাকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার পূর্ব্বাভাষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘোষণা যে জার্ম্মাণী সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত মীমাংসার পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিবে, পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যই পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে তাহারা অস্ত্রসজ্জিত করিতে চান। কিন্তু রাশিয়া আক্রমণ করিবে, এমন কোন আশঙ্কাই এখনও দেখা যাইতেছে না। বৃটেন ও আমেরিকার সামরিক বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে রাশিয়ার সামরিক গঠনকার্য্য আরম্ভ করার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। তাহা হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? শুধু কি রুশ-আক্রমণ-ভীতিই ইহার কারণ? আর কোন উদ্দেশ্য নাই? বি-বি-সির সমালোচক মিঃ ষ্টীফেন কিং হল 'তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম' শীর্ষক বিষয়ে বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "পশ্চিম-ইউরোপ যখনই সুদৃঢ় হইবে তখনই আমরা সমগ্র জার্ম্মাণীকে গণতান্ত্রিক শিবির-ভুক্ত করিব এবং উহাই হইবে লাল সাম্রাজ্যবাদ অবসানের প্রারম্ভ।" পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহার এই উক্তির মধ্যেই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সোস্তাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতা ডাঃ সুমাখের (Dr. Schumacher) বলিয়াছেন, "এখন যাহা পশ্চিম-পোল্যাণ্ড তাহা পুনরায় জয় করাই হইবে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর প্রথম লক্ষ্য। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে ভিশ্চুলার পূর্ব্ব পাড়েই সংগ্রাম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।" হিটলার যাহা করিতে পারেন নাই তাহা সম্পন্ন করিবার আশাই কি পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার মূলে বিদ্যমান রহে নাই?

মুসলিম ঐক্য-সম্মেলন—

গত ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৫১) প্রথম ভাগে করাচীতে প্যালেষ্টাইনের গ্রাণ্ড মুফ্‌তির সভাপতিত্বে মোতামার-ই-আলাম-ই-ইস্‌লামীর (মুসলিম ঐক্য-সম্মেলন) যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহার গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং চারি দিন ধরিয়া উহার অধিবেশন চলিয়াছিল। চল্লিশটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। মহামান্য আগা খাঁও এই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভাপতি প্যালেষ্টাইনের গ্রাণ্ড মুফ্‌তি তাঁহার অভিভাষণে পাকিস্থানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন, "সমগ্র মুসলিম জগৎ পৃথিবীর এই নব-সৃষ্ট বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের উপর তাহাদের সমগ্র আশা-ভরসা নিবদ্ধ রাখিয়াছে।" অধিবেশনের উপসংহার বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, পাকিস্থান পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই সর্ব্বাধিক প্রিয় এবং সকল ব্যাপারেই তাহারা পাকিস্থানকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সম্মেলন পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে।

এই সম্মেলনে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাবের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিরিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ মুস্তাফা সাবাই। প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, কাশ্মীর শুধু পাকিস্থানেরই সমস্যা নয়, ইহা সমগ্র মুসলিম জগতেরই সমস্যা। তিনি এই দাবী করেন যে, এই সম্মেলনে যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্র-সমূহের গবর্ণমেণ্টগুলির প্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জনগণের প্রতিনিধি। পাকিস্থানের ন্যায়সঙ্গত দাবী সমর্থন করিবার জন্য সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট সমূহকে তিনি অনুরোধ করেন। সম্মেলনে গৃহীত কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ভৌগোলিক এবং জাতিগত দিক হইতে জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্য মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থানের অংশবিশেষ এবং পাকিস্থান ও কাশ্মীরের জনগণ যে-বন্ধনে আবদ্ধ তাহা ছিন্ন করিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই, ইহাই এই সম্মেলনের সুদৃঢ় এবং অবিচলিত বিশ্বাস।" কাশ্মীর সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাবে কাশ্মীরে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাধীন ভাবে গণভোট গ্রহণ সম্বন্ধে কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য ফলপ্রদ পন্থা গ্রহণ করিতে নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

এই সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাব উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির অনুরূপ। উহাতে বলা হইয়াছে যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে।

একটি প্রস্তাবে আরবী ভাষাকে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে-সকল বিভেদ এবং অনৈক্য আছে তাহা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য আর একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই সম্মেলনকে আমরা প্রহসন বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে এ কথা সত্য। আরব রাষ্ট্রগুলি ইজরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। আফগানিস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্বন্ধও মধুর নয়। কিন্তু এ কথাও উপেক্ষা করা যায় না যে, সমগ্র মধ্য ও নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলি সমস্তই ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। এই ইস্‌লামিক রাষ্ট্রসমুদ্রে ইজরাইল রাষ্ট্র ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের মত। ভারতেও ইস্‌লামী রাষ্ট্র পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এই যে প্যান ইসলামের বীজ ছড়াইতেছে উহাই এক দিন উত্তর-আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র-গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইরাণের প্রধান মন্ত্রী নিহত—

গত ৭ই মার্চ্চ (১৯৫১) ইরাণের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আলী রাজমারা মসজিদ-প্রাঙ্গণে আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডের মূলে কোন ব্যাপক ষড়যন্ত্র আছে কি না তাহা বুঝা যাইতেছে না। ইরাণের আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্বরূপ ইহা হইতে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। প্রধান মন্ত্রীর আততায়ী আবদুল্লা রাস্তেগার এবং তাহার সঙ্গী দুই জন লোককে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। আততায়ী বলিয়া ধৃত লোকটি পুলিশের নিকট বলিয়াছে—"তোমরা কেন আমার দেশকে বিদেশীর নিকট বিক্রয় করিয়া আমাকে আমার কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করিয়াছ?" এই লোক একটি ধর্ম্মান্ধ ক্ষুদ্র দলের সদস্য। ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করাই এই দলের উদ্দেশ্য।

জেনারেল আলী রাজমারা গত ৯ মাস ধরিয়া পারস্যের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শাসনকার্য্য চালাইতেছিলেন। তিনি ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-চুক্তির সমর্থক ছিলেন। তাঁহার আততায়ী যে-দলের সদস্য সেই দলটি উক্ত চুক্তির বিরোধী এবং পারস্যের তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পক্ষপাতী।

নেপালে নূতন যুগ—

নেপালাধিপতি ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে নেপালের জনগণের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা কত দূর পূর্ণ হইবে তাহা বলা কঠিন। নেপালাধিপতির নেপাল ত্যাগ এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে নেপালের যে ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তাহার যে মীমাংসা হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে নেপালাধিপতি উল্লিখিত গণ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ঘোষণা করেন। নেপালের জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতা না পাইলেও নেপালাধিপতি যে তাঁহার শত বৎসরের হৃত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছেন, এই ঘোষণা হইতে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার ঘোষণার মূল কথা এই যে, নেপাল নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী শাসিত হইবে। এই শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণ সহ একটি মন্ত্রিসভা শাসনকার্য্য পরিচালনায় নেপালাধিপতিকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার ঘোষণায় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভা যৌথ ভাবে তাঁহার নিকট দায়ী থাকিবে। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের পূর্ব্বেই গণ-পরিষদ আহ্বান করা হইবে। কিন্তু নেপালাধিপতির ঘোষণার মধ্যে তাহার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাইলাম না। বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, যাবতীয় রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং যাহারা সম্প্রতি সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি ১লা মার্চ্চের মধ্যে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করিতে রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নেপাল কংগ্রেসের এক অংশ এই আপোষ মীমাংসায় রাজী হন নাই। তাহাদের দখলে যে-সকল অঞ্চল রহিয়াছে তাহার দখল তাঁহারা ছাড়িতে রাজী নহেন। নূতন নেপাল গবর্ণমেণ্টের ইহা একটা খুব কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিবে।

মন্ত্রীদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে দপ্তর বণ্টন করা হইয়াছে: (১) প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—পররাষ্ট্র, (২) শ্রীযুত বি, পি, কৈরলা—স্বরাষ্ট্র, (৩) শ্রীযুত সুবর্ণ সমশের—অর্থ, (৪) বাবর সমশের—দেশরক্ষা, (৫) গণেশ মান সিং—শ্রমশিল্প, (৬) ভদ্রকালী মিশ্র—যানবাহন ও বাণিজ্য, (৭) ভারত মান শর্ম্মা—খাদ্য ও কৃষি, (৮) কর্ণেল চূড়ারাজ সমশের—অরণ্য, (৯) শ্রীযজ্ঞ-বাহাদুর বাসুরাইত—জনস্বাস্থ্য, (১০) শ্রীনৃপজঙ্গ রাণা—শিক্ষা। এই দশ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫ জন রাণা-বংশীয় এবং ৫ জন জন-প্রতিনিধি। উভয় পক্ষের সমসংখ্যক মন্ত্রী মন্ত্রিসভার আভ্যন্তরীণ বিরোধকে প্রবল করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, পররাষ্ট্র এবং দেশরক্ষা এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর রাণা-বংশীয়েরাই পাইয়াছেন। এই দুইটি ব্যাপারে জন-প্রতিনিধি মন্ত্রীদের কোন দায়িত্বই নাই। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানে জন-প্রতিনিধি মন্ত্রীরা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন তাহা বলা কঠিন। গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারে রাণা-বংশীয়েরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

নূতন নেপাল গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে চারিটি সমস্যা খুব কঠিন হইয়াই দেখা দিবে। প্রথমতঃ, যে সকল বিদ্রোহী আপোষ মানিয়া লন নাই এবং দখলী অঞ্চল ছাড়িতে রাজী নহেন, তাঁহারা। দ্বিতীয়তঃ, কিরাত-বিদ্রোহ। তৃতীয়তঃ, রাণাদের উদ্যোগে গঠিত অর্দ্ধফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠান বীর গোর্খা দল। চতুর্থতঃ, কম্যুনিষ্ট ভীতি। ভারতীয় সৈন্য ও নেপালী সৈন্য মিলিয়া বিদ্রোহী কংগ্রেসীদিগকে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিরাত-বিদ্রোহের মূলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাত রহিয়াছে এ কথা স্বীকার করা কঠিন। কিরাতগণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে গৃহীত ঐক্য-প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। উহাতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের মধ্যে যে দুর্নীতি, অনাচার ও বিভেদ দেখা দিয়াছে তাহা কেবল মাত্র কতকগুলি গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা দূর হইবে না। ঐক্য প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত পথে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে চালিত করিতে হইবে, নচেৎ সুফল হইবে না। আজকাল মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আর কেহই নিষ্ঠার সহিত মান্য করেন না। ফলে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার মনোবৃত্তি ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই কংগ্রেসকর্ম্মীরা স্বার্থান্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। দেশ ও দেশের সেবা করা এখন নিজ-নিজ কার্য্যোদ্ধারের পন্থাস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেজন্য আমাদের আশঙ্কা হয় যে, যত দিন কংগ্রেসকর্ম্মিগণ নিঃস্বার্থ ভাবে নিজকে দেশসেবায় নিয়োজিত না করিবেন তত দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের গৃহীত 'ঐক্য'-প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়া সুদূর-পরাহত হইবে। ঐক্য-প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসত্যাগী দলের নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও উত্তর প্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনা অনুসারে যে-সব প্রস্তাব করেন, সেই সব বিষয়ও ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন। এই সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সহিত কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্টের নেতা আচার্য্য কৃপালনীর যে আলোচনা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও কমিটি আলোচনা করেন। মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত টি, প্রকাশমকে বিশেষ ভাবে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া উল্লেখ করিয়া এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় তাঁহার কাজে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটিতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। তবে শ্রীপ্রকাশমের বয়স ৮১ বৎসর বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করার সিদ্ধান্ত সমীচীনই হইয়াছে। নব প্রবর্ত্তিত সদস্য হইবার এক টাকার চাঁদার প্রথায় অবিলম্বে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য করার কার্য্য আরম্ভ করার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্দ্দেশ দেবার প্রস্তাবটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা হইল ৩ কোটি ৪ লক্ষ। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের সম্প্রতি যে সংশোধন করা হইয়াছে তদনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীসি, রাজাগোপালাচারীকে কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও কেন্দ্রীয় পরিচয়-পত্র পরীক্ষা কমিটির সদস্য মনোনয়নের ভার প্রদান করিয়াছেন। যোগ্য, কর্ম্মঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের স্কন্ধেই নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য কংগ্রেসের পূর্ব্ব-গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করিবে—ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব ও প্রচারের উপর নহে।

পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

ভারত সরকার পাকিস্তানী টাকার মূল্যের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ে সম্মত হইয়া পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ভারত পাকিস্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই ভারতই আন্তর্জ্জাতিক মনিটারী ফাণ্ডের বৈঠকে পাকিস্তানী টাকার মূল্য গ্রহণের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। ভারত সরকারের এই কার্য্যে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক মনিটারী ফাণ্ডের পরবর্ত্তী অধিবেশনে ভারতের মর্য্যাদা যে কত হেয় প্রতিপন্ন হইবে তাহা চিন্তা করিলেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব ও বর্ত্তমান অর্থ-সচিব পাকিস্তানের মুদ্রার বিষয়ে বিবেচনা না করিয়াই ভারতের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের হঠকারিতা ও ভুলের মাশুল ভারত অধোবদনে পরিশোধ করিল। ভারত সরকার যদি পাকিস্তানী টাকার মূল্যের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ে সম্মত না হইয়া মাঝামাঝি ভাবে পুনরায় ভারতীয় টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন তাহা হইলে ভারতবাসীর চক্ষে ভারত সরকারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই থাকিত। উহার ফলে জনসাধারণের অবস্থাও উন্নত হইত কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কেবল মাত্র ধনিক সম্প্রদায়ই লাভবান হইবেন।

নিম্নে পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির বিবরণ দেওয়া হইল—

১নং ধারা—এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৫১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত। (২) ১নং তপশীলে বর্ণিত পণ্যগুলি এক দেশ হইতে অন্য দেশে আমদানী ও রপ্তানী করিতে দুই গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন। (৩) যে সকল পণ্য আমদানী-রপ্তানী করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন সেগুলির ক্ষেত্রে দুই গভর্ণমেণ্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে সম্মত হইয়াছেন। (৪) যে সকল পণ্যের রপ্তানী-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া, সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থলে সরবরাহ পৌঁছাইয়া

দিলেই চুক্তি পালন করা হইল বলিয়া ধরা হইবে। (৫) খাত্তশস্তের ক্ষেত্রে সরবরাহের পরিমাণ সময় ও সর্ত্ত ৩নং তপশীলের বিধান মত হইবে। (৬) কাঁচা তুলা সম্পর্কে বর্ত্তমানে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের রপ্তানীর কোন নির্দ্দিষ্ট তালিকা নাই; সুতরাং ভারত যে কোন পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে। ইতিমধ্যে রপ্তানী কোটা নির্দ্ধারিত হইলেও ভারতে রপ্তানীর বরাদ্দ ১৯৫১-৫২ সালে ৪০০,০০০ গাঁইটের কম হইবে না।

২নং ধারা—দুই গভর্ণমেণ্ট ২নং তপশীলে বর্ণিত পণ্যগুলির চলাচলের ক্ষেত্রে কোন আমদানী-রপ্তানী বাধা-নিষেধ আরোপ করিবেন না।

৩নং ধারা—১নং তপশীলভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা না হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই গভর্ণমেণ্ট রপ্তানী-মূল্যের উপর কোন সার চার্জ্জ দাবী করিবেন না।

৪নং ধারা—১নং ও ২নং তপশীলে বর্ণিত পণ্যগুলি ভারত অথবা পাকিস্তানে উৎপাদিত অথবা প্রস্তুত হওয়া চাই।

৫নং ধারা—দুই গভর্ণমেণ্ট আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা দিবেন তাহা ষ্টার্লিং অথবা সুলভ মুদ্রা এলাকাভুক্ত অন্যান্য দেশের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষা কম হইবে না। ষ্ট্যার্লিং অথবা সুলভ মুদ্রা এলাকার চলতি অথবা ভবিষ্যৎ লাইসেন্স ভারত ও পাকিস্তানে বৈধ হইবে।

৭নং ধারা—চুক্তি পালনের সুবিধার জন্য দুই গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে কার্য্যক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

১নং তপশীলভুক্ত কোন আমদানীকৃত মাল পুনরায় রপ্তানী করা চলিবে না।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শাক-সবজী, ফল, ডিম, পান, মশলা, হাঁস, মুরগী, দুগ্ধ, বাঁশ, রেড়ীর তৈল, সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতির ব্যবসা চলিবে। ভারত প্রধানতঃ কয়লা, ইস্পাত, বস্ত্র, সুতা ও সিমেণ্ট সরবরাহ করিবে। পাকিস্তানের ষ্টেট-ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের অনুমোদিত ব্যক্তিদের পাকিস্তানী ১০০৲ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ১৪৪৲ টাকার হারে ভারতীয় টাকা বিনিময় করিবেন। এইরূপে পাকিস্তানী ষ্টেট-ব্যাঙ্ক ভারতে অনুমোদিত ব্যক্তিদের নিকট পাকিস্তানী টাকা বিনিময় করিবেন। ভারত সরকারও মুদ্রা-বিনিময় বিষয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

ভারত সরকারের বাজেট

ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত চিন্তামন দেশমুখ ভারত সরকারের ১৯৫১-৫২ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রধান হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে ভাবে কর ধার্য্য আছে, তাহাতে আগামী বৎসরে ৩৬১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং ব্যয় হইবে ৩৭৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ফলে ঘাটতি হইবে ৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং নিম্নলিখিত কর বৃদ্ধি ও নূতন কর ধার্য্য হইয়াছে।

কর্পোরেশন ট্যাক্স আড়াই আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া পৌণে ৩ আনা করা হইয়াছে। কর্পোরেশন ট্যাক্স ব্যতীত অপর সকল আয়কর [illegible] উপর শতকরা ৫ টাকা সার চার্জ্জ ধরা হইবে। ইহা হইতে ৬ কোটি টাকা আয় হইবে। নির্দ্দিষ্ট চুক্তি বহির্ভূত অন্যান্য তপশীলভুক্ত আমদানী দ্রব্যের উপর সার চার্জ্জ শতকরা ৫ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে। খোসা ছাড়ান চীনা-বাদাম রপ্তানীতে টন প্রতি ৮০ টাকা রপ্তানী শুল্ক লওয়া হইবে। সকল বীয়ার স্পিরিট ও মদের আমদানী শুল্কের উপর সার চার্জ্জ শতকরা ১ শত টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দেড় শত টাকা করা হইবে। পেট্রলের উপর শুল্ক শতকরা ৫ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে। গোল মরিচ ও সুতার ছাঁটের উপর রপ্তানী-শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাতে ১ কোটি টাকা আয় হইবে। ১৯৪৯ সালে সূতী বস্ত্রের উপর রপ্তানী শুল্ক প্রত্যাহার করা হয় এবং প্রধানতঃ ভারতীয় মিলের মোটা ও মাঝারী কাপড়ের উপর তাহা সীমাবদ্ধ করা হয়। ঐ রপ্তানী-শুল্কের পরিমাণ পণ্যের মূল্যানুপাতে শতকরা ৫৲ টাকা হইবে এবং তাহাতে আড়াই কোটি টাকা আয় হইবে। কেরোসিনের উপর শুল্ক শতকরা ৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। তামাকের শুল্কের পরিবর্ত্তনের ফলে ১৩ কোটি টাকা আয় হইবে। দিল্লী রাষ্ট্রে বিক্রয়কর প্রবর্ত্তনের ফলে ১ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। যে সকল সিগারেটের খুচরা মূল্য ১০টিতে ২ আনার অধিক সে সকলের উপর ১ পয়সা করিয়া সার চার্জ্জ ধরা হইবে। যে সকল সিগারেটের খুচরা মূল্য ১০ টিতে ।/১০ আনার অধিক তাহাতে সার চার্জ্জ দুই পয়সা করিয়া লাগিবে। এই সকল ট্যাক্সের জন্য মোট ৩১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

ভারত সরকারের বাজেট পাঠ করিয়া ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্র জনসাধারণের উপর কর ধার্য্য করিয়াই আমাদের জাতীয় সরকার রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা না হইলে বাজেটে গরীবের নিত্য-ব্যবহার্য্য তামাক বিড়ি এবং বস্ত্রের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া ১৩ কোটি টাকা তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? অথচ ধনীদের জন্য আয়করের সার চার্জ্জ মাত্র ৬ কোটি বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বাজেটে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহারা পার্লামেণ্টে বড় বড় বক্তৃতা করিতে পারেন কিংবা সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে পারেন তাঁহাদের উপর ট্যাক্সের চাপ কম দেওয়া হইয়াছে এবং মৌন মূক এবং নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপটা অত্যধিক পড়িয়াছে।

রেলওয়ে বাজেট

রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার পার্লামেণ্টে ১৯৫১-৫২ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ইহাতে ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া প্রতি মাইলে এক পাই, মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া ১'৫ পাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া দুই পাই ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া তিন পাই বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে আনুমানিক প্রায় ১১ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। এই ১১ কোটি টাকা ধরিলে ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে আনুমানিক ১১'৮৫ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের আনুমানিক উদ্বৃত্ত ১৪'২৫ কোটি টাকা। ইহাতে আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে মোট ২৬৬'৪০ কোটি টাকা আয় হইবে। অর্থাৎ বাজেটের আনুমানিক হিসাবের [illegible] কোটি টাকা অধিক আয় হইবে। প্রথমে অনুমান

করা হইয়াছিল যে, কার্য্য পরিচালনার ব্যয় দাঁড়াইবে ১৬৬'৫১ কোটি টাকা ; কিন্তু এই ব্যয় এখন ১৮০'৩১ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। রেলওয়ে মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সর্ব্বসম্মত অনুমোদনক্রমে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আগামী বৎসরে মাদ্রাজ ও সাউথ মারাহাট্টা রেলওয়ে, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং মহীশূর রেলওয়ের আমদানী বৃদ্ধি করিয়া এবং বর্ত্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া যাত্রিবাহী কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ করা হইয়াছে। সচিব মহোদয় বুঝাইয়া দেন যে, রেলওয়ে পরিচালনার অর্থনীতি আলোচনা করিলেও যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৯৩৮ সালের মূল্য-সূচী ১৮০ ধরিলে দেখা যাইবে যে, মূল্যমান বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানের মূল্য-সূচী ৪৮০তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়ের বেতন বিলেও ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। জ্বালানীর দামও বাড়িয়া ১৯৩৮ সালের ১৮০র স্থলে এখন ৪৭১তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মালের ভাড়া মাত্র শতকরা ৭৩ ভাগ এবং যাত্রীভাড়া মাত্র শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া দেখা হইতেছে। বিবিধ রেলওয়ের একত্রীকরণ ও পুনর্বিন্যাসের যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইলেও ব্যয় সংক্ষেপ হইবে, কিন্তু এই সকল কাজের ফলে যে অর্থের সাশ্রয় হইবে, তাহাতেও কুলাইবে না—কাজেই মালের ভাড়া ও যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধি না করিয়া পারা যায় না।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া আদৌ বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই দুর্দ্দিনে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি হইলে যাত্রীদের অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। রেল-সচিব ভাড়া বৃদ্ধিরও যে হার দিয়াছেন তাহা অত্যধিক। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, রেল রাষ্ট্রীয় সম্পদ—উহার উদ্দেশ্য সমাজ-কল্যাণ, অর্থোপার্জ্জন নহে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের দুর্দ্দশা আর না বাড়াইয়া সরকারের পক্ষ হইতে জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার চেষ্টা করাই সমীচীন।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-সচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৫১-৫২ সালের সরকারী আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতে সরকারের আয় হইবে ৩৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৩৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ইহার ফলে বৎসরের শেষে রাজস্ব খাতে ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে এবং উহার সহিত রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে ঘাটতি ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা যোগ হইয়া ঘাটতির মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। প্রারম্ভিক তহবিলের ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এই ঘাটতি পূরণে ব্যয় করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিয়াই যাইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য মোটরযান কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, এবং তাহাতে রাজস্ব খাতে দেড় কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার ফলে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া কিঞ্চিদধিক ৩ কোটি টাকা এবং বৎসর শেষের ঘাটতি ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। ১৯৫০-৫১ সালের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর রাজস্ব খাতে বৎসরের শেষে মোট ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। বৎসরের সূচনায় অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ঐ বৎসর ৩৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল কিন্তু বৎসর শেষে আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায়। সেই পরিমাণে ব্যয়ের পরিমাণও অনুমিত ৩৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। রাজস্ব খাতে এই যে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাধিক ব্যয় হইয়াছে "ভারতে অতিরিক্ত ব্যয়" শীর্ষক দফায় ৯২ লক্ষ টাকা। খাদ্য দপ্তরের হিসাবে গম ও গমজাত দ্রব্য বিক্রয়ে দৈবক্রমে লোকসান হওয়ায় এই টাকা দিয়া ঐ ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে। অর্থসচিব তাঁহার বক্তৃতায় দেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকার আলোচনাক্রমে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি এবং পাক-ভারত বাণিজ্যে অচল অবস্থার ফলে পাট ও বস্ত্র-শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের কথা উল্লেখ করেন। ঐ বৎসরে আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতের খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা পরিকল্পনা কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাও বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন।

অর্থ-সচিব পশ্চিমবঙ্গের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীর পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব নয় ; বরঞ্চ তাঁহারা হতাশই হইয়াছেন। দেশ বিভাগের পর হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের যে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহা নিরসনকল্পে বাজেটে কোন আশার বাণী নাই। দেশবাসী যে দিনান্তে কিরূপে দুই মুঠা ভাত খাইতে পাইবে এবং পরনে একখানি বস্ত্র পাইবে তাহার আশ্বাস বাজেটের কোথায়ও পাওয়া যায় না। গত তিন বৎসরে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ কোন কাজই হয় নাই। জনকল্যাণকর পরিকল্পনায় ব্যয়ও সঙ্কোচ করা হইয়াছে। প্রগতিমূলক পরিকল্পনার জন্য আগামী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৪৮'৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব্বেই বিক্রয়-করের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন এবং আমোদ-করের হারও বাড়াইয়াছেন। সে জন্য সরকার আর কোন নূতন কর ধার্য্য করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু মোটর গাড়ীর উপর করের হার বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত দেড় কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে যে মোটরবিহারী ধনীদের উপরই কর ধার্য্য হইল তাহা নহে, দরিদ্র মোটর-বাসের যাত্রীদের স্কন্ধেও আরও বোঝা চাপানো হইল।

বস্ত্র-সঙ্কট

বাজারে কাপড় পাওয়া যাইতেছে না। সরকারী ব্যবস্থা মতে যে দোকানগুলিতে কাপড় পাওয়া যায় তাহাও সকলের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। ফলে বস্ত্রাভাবে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি বস্ত্র-সঙ্কটের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে বলেন যে, নানা কারণে

কাপড়ের সরবরাহ কম হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায় কাপড় বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে কেন, তাহার উত্তর-প্রসঙ্গে সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, কাপড় যখন প্রচুর জমিয়া গিয়াছিল তখনই উহা রপ্তানী করা আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের বস্ত্রনীতি অনুযায়ী মিল-সমূহে উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বাজারে অবাধ বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারে যে কাপড় পাওয়া যায় তাহা এই অবাধ বিক্রয়ের মারফতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কোন সম্পর্ক নাই। এক-তৃতীয়াংশ হইতেই বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় বলেন, ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৮ হাজার গাঁইট বস্ত্র বরাদ্দ করেন। বস্ত্র অথবা সূতা উৎপাদনের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের কোন ক্ষমতা নাই। ভারত সরকার প্রদেশকে কত পরিমাণ কাপড় ও সূতা প্রদান করিবেন তাহা ঠিক করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। ভারত সরকার যে বস্ত্র বরাদ্দ করিবেন তাহা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করাই তাঁহাদের কাজ। মাসে যে ১৮ হাজার গাঁইট বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অবাধে বিক্রয়ের জন্য বাদ দিলে যে ১২ হাজার গাঁইট থাকে তাহা হইতেও সময় সময় কাপড়ের অভাবের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত কাটিয়া লওয়া হয়। তিনি বলেন যে, বস্ত্র বণ্টনের যদি কোন গলদ থাকে তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকার নিশ্চয়ই দায়ী হইবেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের সরবরাহ এত কম যে, উহার দ্বারা চাহিদা মিটিতে পারে না। তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও শিল্লাঞ্চলে এবং মফঃস্বলে যাহাতে জনসাধারণ কিছু পরিমাণ কাপড় পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বস্ত্র-সঙ্কটের সাফাই গাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি রীতিমত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় পশ্চিম বাঙ্গালার কাপড়ের ক্ষুধা মিটিতে পারে না।" সত্যই তো, লোকেরা ভারী বেহায়া—কাপড় না পাইলেও চুপ করিয়া না থাকিয়া হৈ-চৈ করে কেন? অবশ্য বিরক্ত হইলেও সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় এক গঠনমূলক প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের ছেলেরা যেমন প্যান্ট পরিয়া কাপড় বাঁচাইয়াছে, সেই আদর্শ অনুসারে প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট পরা আরো বাড়ানো যায় কি না, তাহা চিন্তা করা দরকার।" মন্ত্রী মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কের তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

অপরাধ-নিবারণী আটক বিল

অপরাধ-নিবারণী আটক আইনের আয়ুষ্কাল অন্ততঃ পক্ষে আরও এক বৎসর বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন হইলে আইনের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীসি. রাজাগোপালাচারী ভারতীয় পার্লামেন্টে এক সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। বিলের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা এই যে, রাজবন্দীদের বিষয় যে উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হইবে সেই বোর্ডের উপদেশ সরকারের অবশ্য পালনীয় হইবে। আর একটি সুবিধা এই যে, প্রত্যেকের বিষয়ই উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হইবে। সরকার ইচ্ছা করিলে কোন কোন মামলার বিষয় পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী বোর্ডের নিকট প্রেরণ না করিতেও পারেন। এই বিলটি ——— করিবার হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। তবে দুষ্ট লোকে বলে যে, বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করিবার জন্যই এই বিলের সংশোধন প্রয়োজন হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বরাষ্ট্র-সচিব কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়াছেন কিন্তু দুর্নীতি ও চোরা-কারবার দমনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কথা বলেন নাই; অথচ দুর্নীতি ও চোরা-কারবার দমনের উপরই দেশের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটী

সিনেটের এক অধিবেশনে মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটীর রিপোর্টের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ১৯৪১ সালে সার বি, এল, মিত্রের নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিটী গঠিত হয়। সিনেট বিপুল ভোটাধিক্যে সিণ্ডিকেটের সকল সুপারিশ অনুমোদন করেন। উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের পর সদস্যদের অধিকাংশ সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও অপর ৪ জন মাত্র বিরোধিতা করেন। তদন্ত কমিটীর উপর যবনিকা পাত হইল বটে, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, বিশ্বের শিক্ষা-ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অনেক উচ্চে। উহার সুনাম ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সকলেরই উৎসাহ ও চেষ্টা থাকা উচিত।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ মীমাংসার জন্য স্বস্তি-পরিষদে যে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল ভারত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। স্বস্তি-পরিষদে পুনরায় কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবি, এন, রাও বলেন যে, ভারত সরকার ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। শ্রীযুক্ত রাও বলেন যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে ইতিমধ্যে মীমাংসার পথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী ইতিপূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাশ্মীর কমিশন যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কমিশন ভারতকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্বস্তি পরিষদ কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যান করার সামিল হইবে। শ্রীযুক্ত রাও স্বস্তি-পরিষদের সভাপতি কিন্তু কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে ভারত অন্যতম সংশ্লিষ্ট পক্ষ হওয়ায় বৈঠকের প্রারম্ভেই তিনি সভাপতির আসন পরিত্যাগ করেন এবং পরিষদের বিধান অনুযায়ী তাঁহার স্থলে নেদারল্যাণ্ডসের প্রতিনিধি ডি, জে, ভন, বলুসেক সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীবেনেগল নরসিংহ রাও স্বস্তি-পরিষদের অধিবেশনে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ বে-আইনী ভাবে অধিকার করিয়া রাখা ও সেখানে পাকিস্তান কর্ত্তৃক অবৈধ সৈন্যবাহিনী ও কর্ত্তৃপক্ষ স্থাপনই কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ হইতেছে। তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত বিরোধের এই মূল কারণ দূর করা না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই।

...পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণের প্রস্তাব যে ভারত প্রত্যাখ্যান করিবে তাহা আদৌ অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্বস্তি পরিষদের কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছিল যে, পাকিস্তানকে পূর্ব্বেই হানাদারদের ও তাহার নিজস্ব সেনাবাহিনীকে সরাইয়া লইতে হইবে, তাহার পর ভারত নিজের সৈন্যবাহিনী হ্রাস করিয়া অবাধে গণভোট লইবার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। কিন্তু ডিক্সন সাহেব ভারত ও পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সেনাবাহিনী সরাইয়া লইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভারত ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেও তাঁহারা কাশ্মীর সমস্যা যদি জাতিসঙ্ঘ হইতে তুলিয়া না আনেন, কাশ্মীরের বিদেশী-অধিকৃত অংশ যদি উদ্ধারের চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে কাশ্মীরে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ হইবে না এবং কাশ্মীর সমস্যাও মিটিবে না।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খান পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটাইবার এক চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর 'চীফ অফ ষ্টাফ' মেজর জেনারেল আকবর খানকে নাশকতামূলক কার্য্য করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ব্রিগেডিয়ার এম, এ, লতিফ, 'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ফৈয়জ আহমদ ফৈয়জ এবং মেজর জেনারেল আকবর খানের পত্নীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মিঃ লিয়াকাৎ আলি খান বলিয়াছেন যে, এই ষড়যন্ত্র সাফল্য লাভ করিলে পাকিস্তানের ভিত্তি টলিয়া যাইত। সশস্ত্র বাহিনীর সংহতি রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাহারা সজাগ ও সতর্ক থাকিবার ফলেই এই ষড়যন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

পাকিস্তানের এই বিস্ময়কর সংবাদ শুনিয়া সাধারণ লোকের মনে যে প্রশ্ন সব চেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে তাহা এই—পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট উচ্ছেদ করিবার জন্য সমরনায়কদের এই চক্রান্তের কারণ কি? অনেকে বলিতেছেন যে, ইহা পাক-প্রধান মন্ত্রীর এক রাজনৈতিক চাল। কারণ সম্প্রতি তিনি কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা ও মুসলিম লীগের ভিতরে ও বাহিরে প্রকাণ্ড দলাদলির ব্যাপারে বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের মূলে কোন কিছু সত্য আছে কি না, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই প্রমাণ করিবে।

চন্দননগরের অস্থায়ী এডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিশন

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, চন্দননগরের ভারতীয় এডমিনিষ্ট্রেটার নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া চন্দননগরের অস্থায়ী এডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিশন গঠন করিয়াছেন।

শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীব্রজবরণ ঘোষ, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ দাশ, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আশা করি, ইঁহাদের পরিচালনায় চন্দননগরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতায় বেলিয়াঘাটা গুঁড়া থার্ড লেনস্থিত প্রাতঃস্মরণীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র স্বদেশবৎসল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একত্রিংশ জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ঈশান স্কলার ও বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। সভায় পশ্চিম-বঙ্গের মৎস্য ও কৃষি-সচিব শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর পৌরোহিত্য করেন। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কুমারী উৎপলা সভাপতি মহাশয়কে মাল্যভূষিত করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রামচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি মাননীয় নস্কর মহাশয় বলেন, রামচন্দ্র বাঙ্গালার কৃতী সন্তান। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতীর উন্নতি বিধানে তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সেই সময় অনেক গ্রন্থ বাজারে দুষ্প্রাপ্য ছিল, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সেই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র বিভ্রাট, কাগজের দুর্ম্মূল্য ইত্যাদি সত্ত্বেও সাধারণের উপকারার্থে অনেক পুস্তক বসুমতীতে এখনও পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। 'বসুমতীর' এই মহান্ কার্য্যের পশ্চাতে রহিয়াছে রামচন্দ্রের কর্ম্ম-নৈপুণ্য ও আদর্শ। তাঁহার মাতা স্বর্গীয়া ইন্দুপ্রভা দেবী যে ভাবে এই হাসপাতালের উন্নতির কার্য্যে লিপ্তা ছিলেন তাহা চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাধারণের সেবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ভুলিবার নহে। বেলিয়াঘাটাবাসিগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারবর্গ যে

কৃপাদৃষ্টি লইয়া এই গ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাহার জন্ম গ্রামবাসিগণ চিরকাল তাঁহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

রামচন্দ্র অকালে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই জন্মতিথি অনুষ্ঠান বেদনায় ভারাক্রান্ত। তথাপি তাঁহার এই পুণ্য জন্মদিন উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেছি।

আহিরীটোলা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়

কলিকাতার উত্তরাংশে আহিরীটোলা পল্লীতে বালিকাদিগের জন্ম একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ২নং পল্লীর একমাত্র বালিকা M. E. স্কুল। ডাক্তার মানিকচন্দ্র চন্দ্র এম-বি এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্ম ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রীর নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী ১৯৫১ কলিকাতার স্কুলসমূহের মাননীয়া ইন্‌স্পেকট্রেস্ মহোদয়া বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন। সর্বসাধারণের সুবিধার্থ বিদ্যালয়ের বেতন যথাসম্ভব স্বল্প করা হইয়াছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই অভিজ্ঞ ও উচ্চ-শিক্ষিত। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পল্লীর একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। স্যার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, পৌর প্রতিষ্ঠান এবং সদাশয় গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দানে নবজাত শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবেন।

ডাঃ মানিকচন্দ্র চন্দ্রের স্বর্গতা সহধর্ম্মিণী

শোক-সংবাদ

গত ২৩শে জানুয়ারী চন্দননগরের সুপরিচিত নিয়োগী-পরিবারের ৺আশুতোষ নিয়োগী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগীর অকাল মৃত্যুতে সমগ্র চন্দননগর শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। চন্দননগরের ক্রীড়া-মহলে, এই যুবকের ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি সকল বিষয়ে অদ্ভূত পারদর্শিতা সুবিদিত ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং উদার সরল স্বভাব তাঁহাকে সকলেরই প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীমানের এই আকস্মিক পরলোক গমনে তাঁহার শোকাতুরা জননী ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ভারত সরকারের যোগাযোগ দপ্তরের সহ... লাল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত সরকার এক জন সুযোগ্য কর্ম্মীকে হারাইলেন। তাঁহার অকাল বিয়োগে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও আলিপুর আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম আর ইহলোকে নাই। তিনি বহু কাল যাবৎ কংগ্রেস-সেবী এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর আলিপুর বার এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ কানাই ছোট ঠাকুর বংশের কৃতী সন্তান কলিকাতার খ্যাতনামা লৌহ-ব্যবসায়ী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১২৭০ সালে হাওড়া জেলার কানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতা ৺কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত লৌহ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী যুগে তিনি বহু বিপ্লবীকে আর্থিক সাহায্য ও আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং বহু দেশসেবককে নানা ভাবে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি অনাথ ও দুঃস্থের বসবাস ও চিকিৎসার জন্ম দান করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র—বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ফরাসী ও অন্যান্য অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, বহু পৌত্র-পৌত্রী ও বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি ও পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২৯শ বর্ষ : চৈত্র ১৩৫৭] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [২য় খণ্ড : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

যুগবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, শুধু জানলে হবে না,—ধারণা করা চাই। বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না। একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে। তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে। আর, এক আছে উন্মনা সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়। ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্ত্তে নেউল থাকে গর্ত্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ নেজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যত বার গর্ত্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—তত বারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে। বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।

মণি। সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি নিয়ে থাকলে দুই-ই হয়। দরকার হয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হলে একাধারে দুই-ই হতে পারে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পঁয়ত্রিশ

এক গলা ঘোমটা টেনে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বা বসে তখনো ঘোমটা খোলে না।

কি করে শলতেটি রাখতে হয় প্রদীপে—তা থেকে সুরু করে—কি করে চলতে হয় ট্রেনে-নৌকায় সব তাকে শেখায় রামকৃষ্ণ। গৃহস্থালীর ছোটখাটো ব্যাপার, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির কাঁটাখোঁচা। নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজ থেকে সুরু করে শাকপাতাড় কচুঘেঁচু। বাড়ির কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তার ফিরিস্তি। শুধু নিজের বাড়িতেই বা কেন? ধরো আর কারু বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তখন সেখানেই বা কেমনধারা চলবে-ফিরবে, জেনে রাখো। আমি না-হয় টাকা ছুঁই না, কিন্তু তোমার হাতে তো টাকা আসবে, করতে হবে কত দেবতা-অতিথির সেবা, কত ভক্ত-বন্ধুর পরিচর্যা—সূক্ষ্ম করে হিসেব রাখবে মনে-মনে। গরমিল-গোঁজামিলের ধার ধারবে না।

শুধু তাই? তার পর ঈশ্বরসংবাদ আছে না? শুধু কি সংসারের রান্না-ভাঁড়ারের খবর নিয়ে ক্ষান্ত হবে, নেবে না সেই সমস্তসাক্ষী ভগবানের সম্ভাষণ?

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়, যেখানে তার ডিম রয়েছে। বড়-লোকের বাড়িতে ঝি কাজ করছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে নিজের দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের বলে, আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে-মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। তেমনি সংসারে কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে ফেলে রাখবে।

আর, ঈশ্বরও শুধু এই মনটিই দেখেন। এক-লব্য মাটির দ্রোণ সামনে রেখে বাণ-চালনা শিখেছিল। তার মনের একাগ্রতায়ই সে-মাটির মূর্তি গুরু হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মন বিষয়ে ফেলে রাখো, ভিজে-দেশলাই হয়ে উঠবে। যতই কেননা ঘষো, জ্বলবে না কিছুতেই।

পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে মাঠে ঘুনি পাতে দেখনি? ঘুনির ভেতর চিক চিক করে জল যায় দেখে ছোট-ছোট মাছগুলোর ভারি ফুর্তি, খেলতে-খেলতে তারাও ঢুকে যায় ভেতরে। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে অনায়াসে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর মাছের সঙ্গে খেলা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। আর বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না, সেইখানেই আটকে থাকে। পরে মারা পড়ে। তেমনি সংসারের বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে ঢোকে আর মায়া-মোহে জড়িয়ে পড়ে পথ খুঁজে পায় না। 'গতায়াতের পথ আছে রে তবু মীন পলাতে নারে।'

কিন্তু এমন মাছও আছে যে, ঘুনির কাছে গিয়ে ঐ দেখে লাফিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

তাকাও এবার অন্য দিকে। আকাশের দিকে। "যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ।" যিনি সমস্ত দিক থেকে জগৎকে প্রকাশিত করছেন তিনিই আকাশ।

যিনি সামর্থ্যবান তাঁরই নাম ঈশ্বর। সর্বদা ও সর্বত্র আছেন তাই তিনি ভব। সর্বসংহারক বলে শর্ব। রোদন করান বলে রুদ্র। পরমৈশ্বর্যবান বলে ঈশান। কল্যাণকর্তা বলে শিব। পশু ও পাশের ঈশ্বর বলে পশুপতি। সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ হয়ে আছেন বলে পুরুষ। সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ামক বলে অন্তর্যামী। ভজনের যোগ্য বলে ভগবান। আর তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম বা আদি-নাম "শেষ।"

তাঁকে প্রণিপাত করো। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও।

কিন্তু, জানো তো, তিনি আমাদের কাছে কোনো দূরের জিনিস বা দুষ্প্রাপ্য জিনিস নন। তিনি আমাদের বাপ-মা। পালন করেন বলে তিনি আমাদের বাপ, আর সন্তানের সুখ আর উন্নতি কামনা করেন বলে মা।

স্ত্রী-সঙ্গে বসে এমনি সেই অসঙ্গের আলাপ।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী আর জ্বলদবহ্নিসমান পুরুষ—রাখবে না পাশাপাশি। কিন্তু নারী এখানে ঘৃত নয়, সম্মুখে জ্বলছে যে অর্চিষ্মান অগ্নি সে তারই দাহিকা। যে ভাস্বর সূর্য সে তারই দীধিতি। "দেবতা সা ন মানুষী।"

সেই কোপনি-ধারী সাধুর গল্প জানো না?

গুরু বলেছে সাধুকে, নির্জনে গিয়ে সাধন করো। বনের কোণে কুঁড়ে বেঁধে সাধন-ভজনে মন দিয়েছে সাধু। কিন্তু কোত্থেকে জুটল এসে ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুর আর-কিছুই করে না, স্নান করে ভিজে কৌপীন যখন শুকোতে দেয় সাধু, তখন এসে কেটে দেয়। ভিক্ষেয় বেরিয়ে সাধু জনে-জনে নালিশ করে। আপনাকে রোজ-রোজ কে কৌপীন দেবে? একটা বেড়াল পুষুন। উপদেশ দিলে কেউ-কেউ। ভালো কথা—সাধু তখুনি এক বেড়ালের বাচ্চা জোগাড় করলে। বেড়ালের ভয়ে পালাল ইঁদুর। কিন্তু বেড়ালের জন্যে রোজ-রোজ দুধ ভিক্ষে করে আনা কঠিন হয়ে উঠল। বারো মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটা গরু পুষুন। বেড়ালও খাবে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন। তাই সই। দুধালো গরু আনলে সাধু। এখন থেকে ঘরে-ঘরে খড়-বিচালি ভিক্ষে করতে লাগল। নিত্যি-নিত্যি কে আপনাকে খড় জোগাবে? আপনার কুটিরের কাছে পতিত জমি পড়ে আছে, তাই চষে খড় লাগান। মন্দ কি, হাল-বলদ নিয়ে এসে পতিত জমিতে লাঙল চালাল সাধু। এখন তবে গোলাবাড়ি করতে হয়, নইলে ফসল রাখবে কোথায়? সাধু তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় গুরু এসে উপস্থিত। চার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গুরু প্রশ্ন করলেন, এ সব কী? সাধু অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এক কোপনির জন্যে এত কষ্ট! আর সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র, চাকরি-বাকরি, ঘর-বাড়ি, জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা, লোক-লৌকিকতা—যন্ত্রণার কি অন্ত আছে?

তাই তো চৈতন্যদেব বলেছেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

তবে তাদের উপায়?

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, উপায় তুমি।

হ্যাঁ, তুমি। তুমিই সমস্ত জীবের জননী। তুমি সংসারসারভূতা সুরেশ্বরী।

কিন্তু এ সব কথায় সারদার ষোল আনা সুখ কই? তাকে যে পাড়ার সকলে 'পাগলার বউ' বলে খেপায়। স্বামিনিন্দা সহ্য করতে পারে না কিশোরী। পাছে বাড়িতে থাকলে পাড়া-বেড়ানো মেয়েদের মুখে স্বামিনিন্দা শুনতে হয়, সারদা চুপি-চুপি ভানু পিসির বাড়িতে চলে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে নিরিবিলি।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে এই ভানু পিসি। কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে এক টানা। সারদার উপরে বড় টান। তার পর রামকৃষ্ণ যখন আসে শ্বশুরবাড়ি, তখন আর-আর মেয়েরা তাকে 'খ্যাপা জামাই' বলে খেপালেও সে কিছুই বলতে পারে না, মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

খ্যাপা যখন তখন মুখের আর আগল কি। এমন সব কথা বলে রামকৃষ্ণ, হাসতে-হাসতে মেয়েদের পেট ছিঁড়ে যায়, লজ্জায় পালাবার পথ পায় না।

'বেশ হল, আগড়াগুলো সব উড়ে গেল।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এবার বোসো তবে তোমরা গোল হয়ে! কথা হবে।'

খ্যাপা বাতাস না এলে কি আর আতপের দিন স্নিগ্ধ হয়?

এক দিন ভানু পিসিকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার নাম কি?'

'মানগরবিণী।'

সারদাকে নির্দেশ করল রামকৃষ্ণ। 'এ তোমার কি হয়? কি বলে ডাকে?'

'পিসি বলে।'

'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানু পিসি।' বলেই গান ধরল রামকৃষ্ণ: 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

মুখুজ্জেদের পাগলা-জামাইয়ের কাছে ভানু পিসি যায়, এতে তার গৌর-দাদার বড় আপত্তি। কথা

বলছে কথা বলছে, হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ—'ঐ গৌরদাদা এল।' অমনি ভয়ে পুঁটলি পাকিয়ে যায় ভানু পিসি দেখে রামকৃষ্ণ হাসে আর বলে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'আপনার কাছে আসি বলে আমার অনেক সইতে হয়।' ম্লান মুখে বললে ভানু পিসি।

'বেশ তো, যখন] গৌরদাদা শাসতে আসবে তখন দু হাত তুলে নাচবি আর বলবি—ভজ মন গৌর নিতাই। গৌরদাদা ভাববে তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস, আর তোকে কিছু বলবে না।'

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে ফিরছে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ভানুর সঙ্গে দেখা। বললে, 'আমাকে খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?'

অমনি পান সাজতে ছুটল ভানু পিসি। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখে, রামকৃষ্ণ অনেক দূর চলে গিয়েছে। ভানু পিসি পিছু-পিছু ছুটতে লাগল। কিন্তু মেয়েমানুষ কত দূর ছুটবে? তা ছাড়া রামকৃষ্ণ চলেছে জোর কদমে, যেমন তার অভ্যেস। পিছন থেকে নাম ধরে ডাকে এমনও সাহস নেই। তবু থামছে না ভানু পিসি, গোঁ-ভরে ছুটে চলেছে। দু-একখানা গ্রাম বুঝি পার হয়ে গেল, তবু নিবৃত্তি নেই। হঠাৎ, কেন কে জানে, রামকৃষ্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভানু পিসিকে দেখে চক্ষুস্থির।

'এ কি, তুই এত দূর এসেছিস?'

'আপনি যে তখন পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।' আনন্দে পরিপূর্ণ ভানু পিসি।

ততোধিক আনন্দ রামকৃষ্ণের। বললে, 'তোর হবে—তোর হবে।' বলে হাতে পান নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'কী হবে বল দিকি?'

ভানু পিসি চোখ নামাল। তার সে কী জানে।

'তোর আজ ঠেঙানি হবে। মেয়েমানুষ হয়ে এত দূর এলি, এখন বাড়ি ফিরে গেলে গোবেড়েন খাবি। এক কাজ কর। কুমোরবাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যা। তা হলে সবাই ভাববে কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।'

সেই থেকে ভক্তদের পান খাইয়ে এসেছে ভানু পিসি। বলেছে, ঠাকুরের প্রসাদী পান। ঠাকুর বলে গেছেন, তুমি আমাকে পান খাওয়াবে নিত্যি। ভক্তসেবাই আমার ঠাকুরসেবা।

... ... যা—সেও আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। নির্জনে বসল গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায়।

ভানু পিসি বিদ্রূপে ঝলসে উঠল: 'কি গো, তখন না বলতে, খ্যাপা জামাই! কি আকাটের হাতে মেয়ে দিলুম—সারদার কত কষ্ট। এখন কেন?' এখন কেন সেই খ্যাপা জামাইয়ের পট পুজো করছ?'

শ্যামাসুন্দরীর বাক্য স্তব্ধ। চক্ষু নিষ্পলক। মেনকাও এক দিন বসেছিল শিবের আরাধনায়।

কামারপুকুর থেকে একবার শিওড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, হৃদের বাড়িতে। দিদি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে এক মহা ফ্যাসাদ। দিদি কতগুলো ফুল জোগাড় করেছে, বলছে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করব।

কোনো বারণ শোনে না। ভোলে না ছদ্মবেশে। বলে, গরিবের ঘরে কাঙালের ঠাকুর এসেছ, তোমাকে ছাড়ব না কিছুতেই। জলে পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দেব।

একটা শুধু বর দাও। যেন কাশীতে গিয়ে প্রাণ যায়।

তথাস্তু। সজ্ঞানে কাশীতেই প্রাণত্যাগ করল হেমাঙ্গিনী।

'কিন্তু আমার কেন ঘুম আসে না বলতে পারো?' মধ্যরাত্রের অন্ধকারে বায়ুরোগগ্রস্ত ভানু পিসি কেঁদে ওঠে।

'ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ তো আছে।' কে যেন বলে ওঠে অন্ধকারে।

'কি ওষুধ?'

'সেই যে ভজ-মন-গৌরনিতাই।'

মনে পড়ে যায় ভানু পিসির। অন্ধকারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। দু হাত তুলে নাচ সুরু করে আর বলে, ভজ মন গৌরনিতাই। বলে, ঠাকুর, তুমি দেখ আর আমি নাচি।'

ছত্রিশ

তুমি দেখ আর আমি নাচি।

তুমি করাও আমি করি। কর্ম না করলে দর্শন হবে কি করে? পানা না ঠেললে জল দেখব কি করে?

তুমি আছ, শুধু এ জেনে কি বসে থাকলে চলবে? কাঠে আগুন আছে, শুধু এ জেনে কি ভাত

রান্না হবে? পুকুরপাড়ে বসে থাকলেই কি মাছ পাব?

কর্ম করো। কর্মই ফল। খেলাই আসল, হার-জিৎ কিছু নয়। কর্মেই কৃপা। কর্মেই ভক্তি। কর্ম করতে-করতেই কর্মত্যাগ। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে আরেক হাতে কাজ করছ, শেষকালে এক দিন দু'হাতেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে।

যদি একবার ভক্তি লাভ হয় তবে বিষয়কর্ম বিস্বাদ হয়ে যাবে। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

তাই তুমি দেখ আর আমি নাচি।

কামারপুকুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হয় দক্ষিণেশ্বরে। চল রে হৃদু, মার কাছে যাই।

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়ল রামকৃষ্ণ।

ওখানে কি?

দেখছিস না, মাঠময় কেমন কাঁটাফুল ফুটে আছে। জানিস না ঐ কাঁটাফুল মহাদেবের পছন্দ। ঐ কাঁটাফুলে পুজো করলে শূলপাণি প্রসন্ন হন।

কিন্তু মাঠময় তো শুধু বিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। হৃদয় ধমকে উঠল।

বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের। সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল শিবপূজায়।

এ ভালো হচ্ছে না মামা। কলকাতায় যাবার এই একখানা মাত্র আজ ট্রেন। সারা রাত আজ আর ট্রেন নেই। যদি ঐ দুপুরের গাড়ি এখন ধরতে না পারি, তবে সারা দিন-রাত ষ্টেশনে পড়ে থাকতে হবে।

কে শোনে কার কথা! রামকৃষ্ণ শিবধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল।

শুচি-অশুচি জ্ঞান নেই—এ কেমনতরো উন্মাদ! ভীষণ বিরক্ত হল হৃদয়। 'এখন গাড়ি যদি ফসকে যায় উপায় কি হবে?

হঠাৎ হৃদয়ের সেই সাধুর কথা মনে পড়ে গেল, সেই জ্ঞানোন্মাদ সাধু। উলঙ্গ, গায়ে-মাথায় ধুলো, বড়-বড় নখচুলদাড়ি, কাঁধে মড়ার কাঁথার মত একটা ছেঁড়া কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় এমন স্তব পড়লে যে মন্দিরটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রসাদ পেতে কাঙালীরা যেখানে বসেছে পাত পেড়ে সেখানে গিয়ে বসলে। তাড়িয়ে দিলে কাঙালীরা, চেহারায়-পোষাকে সে কাঙালীদের চেয়েও অধম। তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু উপবাসী রইল না। যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে সেখান থেকে কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করে এঁটো ভাত খেতে লাগল—

মামা বললে, ওরে হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়, এ জ্ঞানোন্মাদ।

তাই শুনে হৃদয় দেখতে ছুটল। বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাধু, হৃদয় তার পিছু নিলে। বললে, মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব কিছু বলে দিয়ে যান—

পাগলের দৃক্‌পাতও নেই। হৃদয়ও নাছোড়-বান্দা। সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে, আর মুখে সেই এক বুলি। ভগবানকে কেমন করে পাব, কবে পাব, কোথায় পাব?

হঠাৎ রুখে দাঁড়াল পাগল। পথের ধারে নর্দমা ছিল তারই জল দেখিয়ে বললে, 'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে তখন পাবি।'

তখন? এ কি একটা মনের মতন কথা হল? নিশ্চয়ই আরো অনেক তর্ক-তত্ত্ব আছে। হৃদয় ফের পিছু নিল। বললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন।'

তবে রে? মাটি থেকে একটা ইট তুলে নিল পাগল। হৃদয়কে মারতে তাড়া করলে। হৃদয় ছুটে পালাল, দেখতেও পেলনা কোন দিকে চলে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ।

মামারও এখন দেখি সেই অবস্থা। নইলে মাঠময় বিষ্ঠার মধ্যে বসে শিবপূজা।

শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে পারলে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাবেনা। ঐ দ্বন্দ্ব-বোধের ঊর্ধ্বেই তো সেই ভূমা-ভূমি। 'শুচি-অশুচির লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মায়ে পাবি।'

পুজো শেষ করে ইষ্টিশানে পৌঁছে দেখে—যা ভেবেছিল হৃদয়—কলকাতার ট্রেন চলে গিয়েছে। দিনে-রাতে আর ট্রেন নেই।

'তখন বলেছিলাম না?' হৃদয় খিঁচিয়ে উঠল: 'এখন কি করবে কোথায় থাকবে, দেখ। চেনাশোনা

আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই এখানে যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায় দুটি পেট ভরে।'

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর। আত্মস্থেবাত্মনা তুষ্ট। স্থিতি-গতি উদ্ধৃতি-বিরতি সব সমান।

ইষ্টিশানের অফিসে খোঁজ নিতে গেল হৃদয়। বাঁধাধরা ট্রেন আর নেই বটে তবে একটা সুবিধে হতে পারে। বললে ষ্টেশন-মাষ্টার। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে খানিক পরেই—ঊর্ধ্বতন এক কর্মচারীর স্পেশাল—দেখি তার মধ্যে কোনো এক ফাঁকে জায়গা করে দিতে পারি কিনা। গাড়ি কলকাতায়ই যাচ্ছে। ভয় নেই।

সাধারণ যাত্রীর অধিকার নেই সেই গাড়িতে। কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের মধ্যে কি ভাব চলে এল কে জানে, মামা-ভাগ্নেকে একটা নিরালা কামরায় চড়িয়ে দিলে নির্ভাবনায়।

হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শুনল মথুর বাবু আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন বলে ধুয়ো তুলেছেন। তাঁদের সাধ রামকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাক। যাবে?

মন্দ কি। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকাশিত। এত সাধু ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী যেখানে গিয়ে ঈশ্বরভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছে তার মাহাত্ম্য কে অস্বীকার করবে? মাটি খুঁড়লে সব জায়গায়ই জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেখানে পাতকো-ডোবা পুকুর-পুষ্করিণী আছে সেখানে জল সহজে মেলে, সেখানে আর খুঁড়তে হয় না মেহনৎ করে। যেখানে-সেখানেই রান্না করা যায় বটে কিন্তু রান্নাঘরে বেশি সুবিধে।

আমি গেলে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু হৃদয়রাম।

নিশ্চয়ই যাবে। স-শ লোক চলেছে একসঙ্গে—দস্তুরমত একটা কাহিনী বলতে পারো। থার্ড ক্লাশ তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাশ একখানি গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। যে কোনো ষ্টেশনে ইচ্ছেমত কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গাড়ির শেষ গন্তব্য কাশীধাম।

কা শীতলা গঙ্গা? কাশীতলা গঙ্গা। সেই কাশী।

মাঘ মাস, ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তীর্থভ্রমণে বেরুল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করলে। বললে, 'মা গো, তোকে আরেক বেশে আরেক দেশে দেখে আসি। বেদে যার কথা তন্ত্রেও তার কথা পুরাণেও তারই কথা। সবই তুই। তোর শুধু ভোল ফিরিয়ে মন ভোলানো।'

হলধারী কবেই পূজকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে, এখন অক্ষয় বসেছে মন্দিরে। যে খুশি তোর পূজো করুক, আমি এখন পরিত্যক্তকর্মা পরমাত্মা।

বৈদ্যনাথধামে নামল প্রথম তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রের দিকে। কোন এক গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছে, দেখল গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই মাথায় তেল নেই এক ফোঁটা। চলতে-চলতে থেমে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, কোন বৈদ্যনাথকে দেখতে চলেছি? কত দূরে?

বৈদ্যনাথকে তোরা চিনবি না। দেখে নে একবার এই অনাথের নাথকে।

'তুমি তো মার দেওয়ান।' রামকৃষ্ণ বললে মথুরকে, 'এদেরকে এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে খাইয়ে দাও এক দিন।'

মথুর বাবু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারবো না।'

করুণায় কোমল রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বললে, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। তুই যা তোর দলবল নিয়ে। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের ছেড়ে যাব না কিছুতেই।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুর বাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন, পাটাও। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন এক দিন।

গ্রামবাসীর আনন্দেই রামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো, তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ?

সাত দিন দেরি হয়ে গেল কাশী যেতে। তা হোক। তবু মা, তুই আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। আমাকে করুণা-কোমলতা দে। আমাকে রসে-বশে রাখ। আমি চিনি খাব, চিনি হব কেন? একটুখানি অহং আমার রেখে দে। সোনার একটু

কণা, আগুনের একটি ফিনকি। ওটুকু অহং না থাকলে বিলাস করব কি করে? তুমি-আমি আস্বাদন করব কি করে? কি করে ভক্তের রাজা হব?

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কাশী। 'কাশী সর্ব-প্রকাশিকা।' 'যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

নৌকো করে ঢুকতে হল কাশীতে। ভাবনেত্রে রামকৃষ্ণ দেখল কাশী স্বর্ণময়ী। ইটকাঠমাটিপাথর কিছুই নেই। আগাগোড়া স্বুবর্ণমণ্ডিত। তার মানে অক্ষয় নিত্যধাম এই কাশীধাম—জ্যোতির্ময় সব ভাব আর ভক্তি একে কনকান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু ক দিন পরেই বললে হৃদয়কে, 'ওরে এখানেও যা সেখানেও তাই। সেখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগুলিও তেমনি। এখানে তবে আর কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই।'

পরে ভক্তদের তাই বলতেন ঠাকুর, 'ওরে যার হেথায় আছে—তার সেথায় আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই।'

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।" যা এখানে তাই সেখানে যা সেখানে তাই এখানে। "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

কেদারঘাটের পাশে দুখানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন মথুর বাবু। কাশীতে এসেও তাঁর রাজসিকতার অন্ত নেই। মাথায় রূপোর ছাতা, সঙ্গে আসাবরদার—চলেছেন যেন কোন রাজারাজড়া। বাইরে ঐশ্বর্যের জেল্লা কিন্তু অন্তরে দীনবন্ধুর দাক্ষিণ্য।

রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যায় রামকৃষ্ণ। সেদিনও তেমনি যাচ্ছে। মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশান। সেখান দিয়ে যাবার সময় দেখল চিতায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় দিক-পাশ আচ্ছন্ন। দেখেই উৎফুল্ল হয়ে নৌকোর বাইরে চলে এল রামকৃষ্ণ, দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেল। টলে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি, ধরতে এল মাঝি-মাল্লারা। কাউকে ধরতে হল না। রামকৃষ্ণ নিজেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। মুখে দিব্য দীপ্তির প্রসাদ।

কি দেখলাম জানিস? ধ্যান ভাঙবার পর বললে রামকৃষ্ণ। দেখলাম প্রকাণ্ড এক সিতগাত্র পুরুষ শ্মশানে প্রত্যেক শবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেককে তুলে নিচ্ছে হাতে করে আর তার কানে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শবের অন্য পাশে বসে আছে শক্তিময়ী মহাকালী—একে-একে জীবের সকল সংস্কার-বন্ধন খুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্বাণের দ্বার খুলে দিয়ে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। যা বহু জন্মের যোগসাধনায় পাওয়া যায় তা শুধু কাশীতে মরে বিশ্বনাথের থেকে আদায় করে নিচ্ছে।

কাশীতে মৃত্যু মানেই নির্বাণপদবী।

কাশীতে এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী। মাকে শ্মশানে পোড়াতে এসে যে আর ঘরে ফিরল না, সেই শ্মশানেই থেকে গেল।

কাশীতে একবার পদ্মাসনে গঙ্গার উপর বসে ছিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী। নৌকো করে এক ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। দৃশ্য দেখে তার চোখ তো চড়ক গাছ। নৌকোয় তুলে নিল সাধুকে। কত আলাপ-বিলাপ সুরু করল, কিন্তু সাধু মৌনী।

কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল ম্যাজিস্ট্রেটের। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তা দেখতে চাইলে। কেন চাইলে কে জানে। হঠাৎ সাধুর হাত ফসকে জলের মধ্যে পড়ে গেল তরোয়াল। এখন উপায়? ভীষণ চটে উঠল ম্যাজিস্ট্রেট। খুব বকতে লাগল সাধুকে। ঠিক করল পারে গিয়েই পুলিশে দেবে।

পারে এসে নৌকো লাগতেই জলের মধ্যে হাত ডোবাল সাধু। একখানি নয় তিন-তিনখানি তরোয়াল উঠে এল জলের থেকে। তোমার কোনটা? ম্যাজিস্ট্রেট তো অবাক। এইটে তোমার। যেখানা তার ঠিক তা বেছে দিয়ে দিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে। বাকি দু'খানা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

আরেক বার উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাতীরে বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে থাকা অপরাধ। বারে-বারে আইন লঙ্ঘন করছে সাধু, একেবারে হাজতে ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু কতক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে গঙ্গাতীরে তেমনি উলঙ্গ হয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে। এ কি, ঘুস খেয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিলে নাকি হাজত থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট ছুটল অমনি হাজত দেখতে। এ কি! হাজতের মধ্যেই তো বসে

আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। অমনি আবার ছুটল গঙ্গা-তীরে। গঙ্গাতীরেই তো ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে উলঙ্গ হয়ে।

তাকে খালাস দিয়ে দিল। কারাগারের দেয়াল যাকে আবদ্ধ করতে পারে না, বসন তাকে কি করে আবৃত করবে?

সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সাক্ষাৎ শ্বেত-শিখা। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছে।

শরীরে কোনো হুঁস নেই। তপ্ত বালিতে পা রাখা যায় না, তারই উপর সুখে শুয়ে আছে। যদি বৃষ্টি পড়ে তেমনি শুয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে।

এক দিন নিজ হাতে পায়েস রেঁধে খাইয়ে এল রামকৃষ্ণ। মৌনাবলম্বন করে রয়েছে, তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক, ইসারা-ইঙ্গিতে আলাপ করতে লাগল দুজনে। যেন এক দেশের মানুষ। একই ভাষাভাষী। যেন কত আগের চেনা।

রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করল ইসারায়: 'ঈশ্বর এক না অনেক?'

ইসারায়ই উত্তর দিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ তবে বহু। আমি তুমি জীব জগৎ সমস্ত।'

স্বর এক। শুধু রাগরাগিণীর নানা নাম। সদ্বস্তু এক, তার বর্ণনা বিচিত্র। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

'বুঝলি?' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ, 'একেই বলে ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা।'

সাঁইত্রিশ

কাশীর থেকে প্রয়াগ। পুণ্য সঙ্গমে স্নান আর তিন রাত্রি বাস চাই প্রয়াগে।

মথুর বাবুরা সেখানে মাথা মুড়লে। রামকৃষ্ণ বললে, আমার দরকার নেই।

আমার শরীর কাশীক্ষেত্র। ত্রিভুবনজননী গঙ্গা আমার জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার গয়া। গুরুচরণধ্যানযোগ আমার প্রয়াগ। আর যিনি সকলজনমনসাক্ষী তিনি আমার অন্তরাত্মা। "দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি।" আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার তীর্থান্তর কী!

প্রয়াগ থেকে ফের সকলে ফিরল বারাণসী 'বিরিঞ্চি-বিরচিতা বারাণসী'।

এক দিন চৌষট্টি-যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়, কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'ওরে হৃদু, ও আমাদের সেই বামনি না?'

সত্যিই তো, সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী। কী আশ্চর্য, এখানে কোথায় আছ?

আছি এ পাড়ায়, মোক্ষদার বাড়িতে। মোক্ষদা আমার মূর্তিমতী প্রণতি।

'তুমি আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন চলো।'

'চলো।'

গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। বললে, মা, তোকে ছেড়ে এখন যমুনায় চলেছি। সেই মুবারিকায়কালিমাময়ী সদাসিতা যমুনা। মা গো, তুই দুর্গা, গঙ্গা, গগনবাসিনী। তুই পাষাণভেদিনী খড়্গহস্তা। জন্মপ্রবাহহরণী পারায়ণপরায়ণা। আর যমুনা মধুবনচারিণী রাসেশ্বরী। অশেষনায়িকা কৃষ্ণকান্তা। দুজনেই মা, মহানন্দা মোক্ষদাত্রী। দুজনেই প্রাণদা প্রাণনীয়া।

নিধুবনের কাছে বাড়ি ভাড়া করলেন মথুর। কিন্তু চার দিকে চোখ চেয়ে এ সব কী দেখছে রামকৃষ্ণ! দেখছে না কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বলছে, 'কৃষ্ণ রে, সবই তো রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বাঁকাবিহারীর মূর্তি দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। ছুটল আলিঙ্গন করতে। গোবর্ধন দেখে আবার ভাবাবেশ। ভাবাবেশে উঠল গিয়ে একেবারে গিরিচূড়ায়। আর নামে না। তখন ব্রজবাসীদের পাঠিয়ে নামিয়ে আনলেন মথুর বাবু।

সন্ধের দিকে যমুনাতীরে বেড়ায় আর কলিন্দ-নন্দিনীর গুণগান করে। যমুনার চড়ার উপর দিয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখালেরা। দেখেই কৃষ্ণের উদ্দীপনা উপস্থিত। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলতে-বলতে ছুটল তাদের পিছু-পিছু। ওরে তোরাই আমার সেই লীলামানুষবিগ্রহ নারায়ণ।

কালীয়দমনের ঘাটে এসে আবার ভাবাবেশ। স্নান করবে কিন্তু শরীরে বশ নেই। ছোট ছেলেটিকে যেমন করে নাওয়ায় তেমনি করে নাইয়ে দিলে হৃদয়।

এইখানেই গঙ্গামায়ার সঙ্গে দেখা।

ষাট বছর প্রায় বয়স, নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গামায়ী। ললিতা সখী হয়ে রাধিকার সেবাচর্যা করে। প্রেমরূপা যে ভক্তি করে তার সাধন-মোদন।

দুজন দুজনকে চিনে ফেলল। রামকৃষ্ণ বললে, তুমি ললিতা-সখী। গঙ্গামায়ী বললে, তুমি রাসেশ্বরী রাধিকা। তুমি আমার দুলালী, রাজদুলালী।

রামকৃষ্ণকে গঙ্গামায়ী দুলালী বলে ডাকে। কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া।

গঙ্গামায়ীকে পেয়ে সব ভুল হয়ে যায় রামকৃষ্ণের। কখন বা খাওয়া-দাওয়া, কখন বা বাড়ি ফিরে যাওয়া। কোথায় বাড়ি, কি বা আহার। ভোক্তাও নেই ভোজ্যও নেই চলেছে তবু ভোজনের আস্বাদ।

এক দিন বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যায় হৃদয়। কোনো-কোনো দিন গঙ্গামায়ীই খাইয়ে দেয় রান্না করে।

থেকে-থেকে ভাব হয় গঙ্গামায়ীর। সে ভাব দেখবার জন্যে ভিড় জমে চার দিকে।

এক দিন হল কি, ভাবাবেশে গঙ্গামায়ী হৃদয়ের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

'এ তো বড় বিপদ হল দেখছি।' হৃদয় ঝটকা মারল, কড়া গলায় বললে রামকৃষ্ণকে, 'তুমি চলো এখান থেকে। একেবারে সটান দক্ষিণেশ্বর। বিন্দেবনে আর কাজ নেই।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক করল আর ফিরবে না। গঙ্গামায়ীর আশ্রয়ে থেকে যাবে ব্রজধামে। শ্রীমতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে।

মথুর বাবু ভাবনায় পড়লেন। ডাকতে বসলেন মহামায়াকে। মা গো, আমার দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাহীন হয়ে যাবে?

হৃদয় ধমকে উঠল, 'তোমার এত পেটের অসুখ, তোমাকে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখব। আমি সেবা করব।' বললে গঙ্গামায়ী।

কিন্তু খাবে কি? শোবে কোথায়?

'সেদ্ধ চালের ভাত খাব। শোব এই গঙ্গামায়ীর ঘরেই। গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে, আমারটা এদিকে হবে। ভাবনা কি।'

'ওসব চলবে না চালাকি।' হৃদয় রামকৃষ্ণের হাত ধরে টানতে লাগল: 'ওঠো। চলো।'

আরেক হাত ধরে টানতে লাগল গঙ্গামায়ী। বললে, 'না, দেব না। কিছুতেই যেতে দেব না।'

দুজনের টানাটানিতে রামকৃষ্ণ নাজেহাল। এক দিকে রাধিকা অন্য দিকে কালী। এক দিকে মহাভাব অন্য দিকে মহামায়া।

সেই টানাটানিতে মার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। মার কথা মানে চন্দ্রমণির কথা। মা সেই কালীবাড়ির নবতে বসে আছেন একলাটি। বসে আছেন রামকৃষ্ণের পথ চেয়ে।

মন স্থির করতে আর দেরি হল না রামকৃষ্ণের। বললে, 'না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। আমাকে মা ডাকছেন।'

মা সকল তীর্থের ঊর্ধ্বে। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

ওরে সংসারে বাপ-মা পরম গুরু, যথাসাধ্য ওঁদের সেবা করতে হয়। যে চরম দরিদ্র, যার শ্রাদ্ধ করবারও ক্ষমতা নেই সে অন্তত: বনে গিয়ে তাঁদের কথা মনে করে কাঁদবে। কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। মা বারণ করলেও ধ্রুব বনে গিয়েছিল তপস্যা করতে। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রাচার্যকে অমান্য করেছে। আর কৃষ্ণকামিনী গোপিনীরা মানেনি তাদের পতির আধিপত্য।

মা কি কম জিনিস গা? শচী বললেন, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না। তবে জানো তো, সংসারে আমি যদি থাকি, তবে আমার দেহ আর থাকবে না। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি মা, যখনই মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকব।' তবে শচীমাতা অনুমতি দিলেন।

আর, নারদের কথা জানো না? মা তাঁর যত দিন বেঁচে ছিল সে তপস্যায় যেতে পারেনি। সে নইলে মার সেবা করবে কে? মার দেহত্যাগ হল তবে বেরুল হরিসাধনে।

'টানাটানিতে মার কথা মনে পড়ে গেল। অমনি বদলে গেল সমস্ত। ভাবলুম, মা বুড়ো হয়েছেন,

মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেইখানেই ঈশ্বরচিন্তা করি নিশ্চিন্ত হয়ে।'

হাজরার মা রামলালকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে, রামলালের খুড়ো-মশায় যেন হাজরাকে একবার পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে।

ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'বুড়ো মা, যাও, একবার দেখা দিয়ে এস।'

কিছুতেই গেল না হাজরা। তার মা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল।

নরেন বললে, 'এবারে হাজরা দেশে যাবে।'

'এখন দেশে যাবে, চ্যামনা—শালা। দূর—দূর—'

আচ্ছা, নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এক দিন জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'হ্যাঁ, মা গুরু। ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। মাকেই ধ্যান করবি।'

মা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া নির্দোষা সর্বদুঃখহা। পরমা মায়া পরমা ক্ষমা পরমা শান্তি। মার মত এমন ধ্যানের মূর্তি আর কী আছে?

গিরিশ ঘোষ বসল এসে ঠাকুরের পদচ্ছায়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে কামারপুকুরের সেই মাগুর মাছটাকে আপনি পায়ে ঠেলে-ঠেলে জলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছটা নিরাশ্রয় হয়ে চলে এসেছিল মাটিতে। আপনি তাকে স্বধামে পাঠিয়ে দিলেন। তেমনি যদি পাপার্ত জীব আপনার পায়ে এসে পড়ে, আপনি তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাবেন না মোক্ষধামে?

আমি পাপ মানি না। পাপী বলে বিশ্বাস করি না কাউকে। আমার যেমন সাধুরূপী নারায়ণ তেমনি আবার ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ—

মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল গিরিশ ঘোষ।

'গাড়ি করে যাচ্ছি, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। শোন, বলি তোকে, কাঁদতে হবে। মল্লিকের মা জিগগেস করলে, ওদের কি কোনো মতেই উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা। বললুম, হ্যাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদা চাই। তাই তোকে বলি, তুই কেঁদে-কেঁদে মাকে একবার ডাক মনের থেকে। যতই তোর পাপ হোক, যতই তুই ক্লেদে-আবর্জনায় ডুবে থাক, মাকে ডাকলে মা এসে তোকে মুক্ত করে দেবেনই—'

তেমনি গিরিশ গেল আবার শ্রীমার পদাশ্রয়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে জয়রামবাটিতে একটা বাছুরের কান্না শুনে আপনি তার বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাকে তার অমৃতলাভের অধিকার। তেমনি, মা, কত বাসনা-কামনার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। স্বহস্তে খুলে দিন শৃঙ্খল। বুঝতে দিন পরমার্থের আস্বাদ।

'ঠাকুর বলতেন বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না। তুমি তো সম্পূর্ণ বেল। তুমি তো ভৈরব। তোমার তবে আর ভয় কি।'

গিরিশ ঘোষ স্তব করতে বসল।

"জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

[ক্রমশঃ।

বছর-গণনা

এক বছরে কতগুলি দিন এবং রাত্রি হয় অনেকেই বলতে পারবেন। ৩৬৫ দিন আর ৩৬৫ রাত। দিন এবং রাত্রি মিলেও ঐ ৩৬৫ হবে। এই এক বছরে কত ঘণ্টা এখন বলুন তো? চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন হ'লে '৮৭৬০ ঘণ্টায় ৩৬৫ দিন। এখন বলুন কত সেকেণ্ডে এক বছর হয়? আপনি এখন অঙ্ক কষবেন, তার আগেই বলে দিচ্ছি ৩১,৫৩৬,০০০ সেকেণ্ডে।

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

কেমন যেন একটা থমথমে আবহাওয়া।

মানুষের বসতি আছে কি না ভ্রম হয়। তবুও ঝুলানো লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। কাছারী-ঘরে জ্বলছে প্রদীপ। বেলা-শেষের বৈশাখী বাতাস চলেছে এলোমেলো। লণ্ঠনগুলো দুলছে ধীরে ধীরে। জাবেদার, পাইক আর আমলারা সব জটলা পাকিয়ে ফিসফাস কথা কইছে। এই কিছুক্ষণ আগে যে আশাতীত ঘটনাটি তাদের চোখের সমুখে ঘটে গেলো সেই গুরুতর বিষয়টি সম্বন্ধে যে যার মন্তব্য ব্যক্ত করছে। কাছারী-ঘরে খাতার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমলাদের আসনগুলো শূন্য; দপ্তর ছড়ানো পড়ে রয়েছে। যক্ষপুরীর মত বাড়ীখানা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। যেন নীরবে দেখছে, দেখছে এই অঘটনের পরবর্ত্তী দৃশ্যপট। বহু শতাব্দীর সাক্ষী এই প্রাসাদ; দেখেছে অনেক। অতীতকে দেখেছে, অভিজ্ঞের মত দেখছে এই বর্ত্তমানকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে। বৃদ্ধের যুবার প্রতি যে-দৃষ্টি।

এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

নাট-মন্দিরে ধৌতকার্য্য শুরু করেছে পুরোহিতের সাঙ্গোপাঙ্গরা। মন্দির অপবিত্র হয়েছে শুধু নয়, অধিষ্ঠিত দেবতা পর্য্যন্ত অপবিত্রীকৃত হয়েছেন। পুরোহিতের ক্রুদ্ধ চক্ষু; ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি পদচারণা করছেন নাট-মন্দিরে। এই মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত! মনে মনে শাস্ত্র মন্থন করতে শুরু করেছেন। স্বীয় সঞ্চিত পুঁথির রাশি নামিয়েছেন মন্দিরের তেকাটা থেকে। দেখেছেন একেকখানি,—দেবস্তোত্র, মন্ত্র আর পূজা-পদ্ধতি। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের কোন কিছু নেই, পুণ্যার্জ্জনের সকল কিছু আছে। আছে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর শ্রাদ্ধাদিকার্য্যকথা। পাপক্ষালনের কোন কথা নেই?

কপালের বলিরেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠছে মধ্যে মধ্যে। পুরোহিতের মুখাবয়ব রক্তিমাকৃতি হয়ে আছে। তসরের বসন বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। কোঁচা আর কাচার ঠিক থাকছে না। উপবীত দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলে জড়িয়ে মধ্যে মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন কিসের কে জানে! পুরুষোত্তম, নারায়ণ, শালগ্রাম-নারায়ণের?

কলসপূর্ণ গঙ্গাবারি বহন ক'রে আনছিল এক জন ব্রাহ্মণ, এক অনুচর। এক জন মুণ্ডিত-মস্তক। পুরোহিত চোখের সামনে তাকে পেয়েই সহসা শুধোলেন,—ঘটনাটির প্রারম্ভ কোথায়?

সেইখানে কলসের জল ঢেলে দেয় ব্রাহ্মণ। ধৌত-কার্য্য করে। সবিনয় নিবেদন করে সে। বলে,—অনুমান করছি, বৎস মদ্যপান করে। অহো, ঐ বিধবা নারীর কি দুর্ভাগ্য!

—ভাগ্য-বিপর্য্যয়! স্বগত করলেন পুরোহিত। সহসা কি মনে হতে বললেন,—তোমাকে একটি কাজ করতে হচ্ছে।

—আজ্ঞা করুন। বললে ব্রাহ্মণ। নতমস্তকে।

কি যেন চিন্তা করেন পুরোহিত। ভ্রূযুগলে স্মরণের তীক্ষ্ণ চিহ্ন দেখা যায়। পদচারণায় বিরত হয়ে বললেন,—একটি বার শিরোমণি পণ্ডিতের গৃহে যাও। আমার নাম লয়ে বল, ভবিষ্যোত্তর-পুরাণখানা একবার বিশেষ প্রয়োজন। এইক্ষণেই চাই। দেখিও, পথে অন্ধকার। সাবধানে পথ চলিও।

অনুচরটি সেইক্ষণেই যাত্রা করে শিরোমণির উদ্দেশে। যাওয়ার সময় দেখে একবার পিছন ফিরে। দেখে ঐ অতীত দিনের মূক সাক্ষীকে। ইটের ঐ ইমারতকে।

আস্তাবলে জুড়ির একটি চিঁহি-চিঁহি রব করলো। কয়েকটা ডাঁস জ্বালাচ্ছে তাকে! তাই ডাকলো বার কয়েক।

ঝি আর বউড়ির দল তখন তাদের অন্দরের আস্তানায় দস্তরমত ফাজলামি শুরু ক'রে দিয়েছে। নিজের নিজের খেয়াল মাফিক বলছে যা-খুশী তাই। তাদের মা ঠাকরুণের জন্য কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করছে। কেউ বা তাদের হুজুরের এই বেলেল্লাগিরি দেখে হাসাহাসি করছে। টীকা-টিপ্পনী কাটছে।

আর কুমুদিনী তাঁর খাস-মহলে অশ্রুসিক্ত চোখে বসে আছেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কোন রকমে ওপরে উঠেছেন কাঁপতে কাঁপতে। জানলার বাইরে তারকা-খচিত আকাশে চোখ মেলে বসে আছেন চুপচাপ। দর-দর বেগে অশ্রু ঝরছে দু'চোখ থেকে। যেন তাঁর অশ্রুনদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে কি এক প্রচণ্ড ঝটিকায়! সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দুঃখ এবং ক্রোধ দু'য়ের সমান অনুভূতি; চক্ষে জল আর বক্ষে জ্বালা ধরছে যেন। এমনি বসে আছেন মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত। কয়েক ঘণ্টা।

নিদ্রা না নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ঐ এক দিনের কাপ্তেন। অনন্তরাম বসেছিল মাথার কাছে। কপালে জলের ছিটে দিচ্ছিল। ওডিকোলন-দেওয়া জল।

প্রথম নারীসঙ্গলাভ আর সুরার উত্তেজনায় আত্ম-বিহ্বলতা। দুনিয়ার যা-কিছু পবিত্র তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা। অর্থ আর ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার; সাবালকত্ব প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা। আর মনের গহনে ঐ মুখখানা গহরজানের। একটা আংটি দিয়েছে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে, যদি জাগে আরও মূল্যবান, আরও সৌখীন অলঙ্কারে মুড়ে দেয় ঐ রূপোপজীবিনীকে যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণ খুশী হয়। ওড়নার আড়াল থেকে দেখায় হাসিভরা মুখ। যদিও চিনতে পারতো রূপের পসারিণীকে!

প্রথম কৌমার্য্য-ভঙ্গের খুশীভরা মনে আরও কত কি মনে হয়েছিল। গাড়ী থেকে নেমে তাই নাট-মন্দিরে গিয়ে সিংহাসন থেকে শালগ্রামকে পেড়ে খেলা শুরু করে দিয়েছিল। কি বিচিত্র খেয়ালে!

চোখে জল পড়তেই চোখ চেয়ে তাকায়, শুশ্রূষাকারী, বলে—কি কেলেঙ্কারীটা করলি বল্ তো!

আচ্ছন্ন চোখ দু'টো কুঁচের মত রাঙা। অনন্তরাম যে কি বলছে বুঝতে পারে যেন। চেয়ে থাকে ক্যাল-ক্যাল চোখে।

হঠাৎ কোথায় যেন কামান-গর্জ্জন শুরু হ'ল। গুরু-গুরু ধ্বনি। কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকলো। বিদ্যুতের কয়েকটা রেখা ছুটোছুটি শুরু করলো। কোথা থেকে এত দলিত কজ্জল-রাশির মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ এসে জমতে শুরু করলো। রণদুন্দুভি-ধ্বনি আর বিদ্যুল্লতার খেলা। বৈশাখের প্রথম বারি-বর্ষণের সঙ্কেত কি ঠিক এই রজনীতেই? আকাশের এত তারা লুকালো কোথায়?

পুরোহিতের অনুচরটি তখন পথিমধ্যে। উত্তরীয়ের আবরণে ঢেকে ফেলেছে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ। ক্ষণ-প্রকাশ বিজলীর দেখায় গতি তার দ্রুত হয়। পথের ধূলিরাশি উড়ছে। কয়েক বিন্দু জলও যেন তীরবেগে পড়লো না?

কুমুদিনী তাঁর খাস-মহলে এই ঝড়বৃষ্টির অনেক আগে থেকেই অশ্রুপাত করছেন। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে চেয়ে রয়েছেন আর দর-দর বেগে কাঁদছেন। নীরব কান্না। এক জন দাসী একটা জলন্ত প্রদীপ বসিয়ে দিয়ে যেতে আসে। ঘরে এক পাষাণ-মূর্ত্তির সহসা যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল। কুমুদিনী বললেন,—দাসী, আস্তাবল থেকে গাড়ী বের করতে বল। অনন্তরামকে ডেকে দাও।

দাসী পুরানো আমলের। সাহস ভরে বললে,—এই দুর্য্যোগে, এতের বেলায়, কোথায় আবার যেতে যাবে!

কুমুদিনী বলেন,—যা বলছি শোন।

দাসী আবার বলে,—কিন্তুক, ভীষণ যে বিষ্টি নামছে!

কুমুদিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। স্থিরদৃষ্টিতে একবার দেখেন শুধু। সেই কঠোর দৃষ্টির সম্মুখে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারে না দাসী। ঘরের বাইরে চলে যায় কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে।

দূরে কোথায় একটা বিকট বজ্রপাতের শব্দ হয় সজোরে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কামান গর্জ্জনের মত শোনায় যেন। ঝম-ঝম বৃষ্টি ঝরে আকাশে। খোলা জানলা দিয়ে জলের রেণু ভেসে আসে কুমুদিনীর চোখে-মুখে। জানলাটা তবুও বন্ধ করেন না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিজলীর আলোয় দেখা যায় গাছপালা চলাচলি করছে পরস্পরে। দমকা বাতাস বইছে ঝড়ের বেগে।

কোথায় কোন্ ঘরের খোলা-জানলা পড়ছে। জলদের নব-জল-সম্পাতে গ্রীষ্মানলের কঠোর জ্বালায় প্রতপ্ত শহর যেন ধীরে-ধীরে শীতল হচ্ছে। আমলা থেকে বিনি মাইনের তাঁবেদারগুলো পর্য্যন্ত এই দুর্য্যোগ দেখে গুম মেরে আছে। মালিকের কীর্ত্তি আর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দেখে দুঃখের ছায়া নেমেছে সকলের মনে। যাঁরা বহু দিনের মানুষ, যাঁরা সব এই বংশের ঊর্দ্ধতনদের স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা অদ্যকার এই বিশেষ অঘটনের জন্য যেন দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন। বিগতদের মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁদের। তাঁরা আফশোষ করছেন।

শিরোমণি তর্করত্নের নিবাস সন্নিকটে নয়।

অনুচরের প্রত্যাবর্ত্তনে তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। পথে অবিরাম বৃষ্টিধারা, তথাপি সে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করে না। উত্তরীয়ে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ আবৃত ক'রে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করেই পথ চলে। বিপরীত বাতাসের দুরন্ত-বেগ গতি তার রুদ্ধ ক'রে দেয়। তবুও সে বারেক থামে না।

পুরোহিত তার সিক্ত বসন দেখে কয়েক বার হায় হায় করেন। গ্রন্থখানি স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে বলেন,—যাও, বাস পরিবর্ত্তন কর।

প্রদীপের আলোয় গিয়ে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ উন্মুক্ত করেন পুরোহিত। শালগ্রাম অপবিত্রকরণের কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিধান আছে কি না দেখেন সাগ্রহে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় আঁখিপাত করেন। অবশেষে কি এক সমাধান দেখে সোল্লাসে হাসেন আপন মনে। একবার নয়, বার বার দেখেন সেই একটি পৃষ্ঠা।

—এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি পুরুত ঠাকুর?

পুরোহিতের পিছনে কে কথা বলেন অতি গম্ভীর স্বরে। পুরোহিত ফিরে দেখেন, এক রুদ্র তপস্বিনী। রুক্ষ কেশরাশি, তাঁর চক্ষুর তলদেশে দুশ্চিন্তার চিহ্নস্বরূপ যেন মসীর প্রলেপ। দেহের শুভ্র গৌরবর্ণ মনে হয় পাংশু ও রক্তহীন। শ্বেত বসনের আবরণে নিষ্ঠা ও পবিত্রতার মূর্ত্তিমান প্রকাশ। প্রদীপের আলোয় দৃষ্টিগোচর হয় তাঁর সজল, রক্তাভ চক্ষুর্দ্বয়।

পুরোহিতের মুখের হাসিও বিলুপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে। বলেন,—অবোধ বালক, কিসের রোষে এই দুষ্কার্য্য সাধন করলো কে জানে! এ অপরাধের কোন দণ্ড নাই, কোন শাস্তি নাই। একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত অবলোকন করলাম, শালগ্রামশিলাবারি পান। আজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

কুমুদিনীর শ্বেত বসন। প্রদীপের আলোয় দেখায় যেন শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি। স্থির, নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। শুধু কপালের পাশে স্পন্দিত হচ্ছে রুক্ষ কেশ। ঝড়ো-হাওয়া বইছে শন্-শন্।

পুরোহিত বললেন,—মা, ক্রোধ সংবরণ কর। অতীতকে বিস্মৃত হও। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। লাগাম আল্‌গা হলে শ্রীমানের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাতৃজাতির কর্ত্তব্য পালন কর।

পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন। এই নারায়ণের সেবা তাঁদের বংশানু-ক্রমিক। দেখেছেন এ বাড়ীর হালচাল। জ্রর চুলে তাঁর পাক ধরেছে। চোখের দৃষ্টি এখন ক্ষীণ। কথার সুরে উপদেশের স্বর। কুমুদিনী তাঁর কথাগুলি শুনলেন কি শুনলেন না। রক্তাভ চোখ দু'টো শুধু দেখতে পাওয়া যায়, এখনকার মেঘের মতই সজল যেন। আলো-আঁধারিতে হীরের মত জলছে। পড়ন্ত দু'ফোঁটা জল মুছলেন কুমুদিনী পরনের কাপড়ে। বললেন,—আমাকে মার্জ্জনা করবেন। যার ভবিষ্যৎ সে দেখবে। আমি চললাম এখনি। এই বোশেখেই সে সাবালক হচ্ছে, আর চিন্তা নেই।

হাতের পুরাণখানা পড়ে যেতে যেতে রয়ে যায়। পুরোহিত যেন বাতাসের বেগে কম্পমান। দন্তহীন মুখ। শিহরিত কথার সুর। বললেন,—মা অভিরুচি। মুহূর্ত্তের জন্যে—

কুমুদিনী আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন না। সিংহাসনভ্রষ্ট শালগ্রামকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। প্রণামের শেষে নাট-মন্দিরের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। গাড়ী আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ভিজে গেছে এতক্ষণে। চললেন সেই দিকে, মাথায় অঝোর বর্ষার ধারা। আর ঘন ঘন বজ্রপাত জলদগম্ভীর শব্দে।

গাড়ীতে যখন উঠে বসেছেন, তখন প্রায় ছুটতে ছুটতে অনন্তরাম এসে হাজির হ'ল একখানা টোকা মাথায়। বললে,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?

দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—অনন্ত, চললাম। ঠাকুরঝির ওখানে আমি থাকবো। তুমি সব দেখো-শুনো। আমার খোরাকীর টাকাটা যেন পাঠিয়ে দেয়, কাছারীতে একবার জানিয়ে দিও। এক সিন্দুক আমার গয়না রইলো। বৌমা এলে পাবে।

সত্যিই আবদুল রাশ আলগা করলে।

গাড়ী চলতে শুরু করলে ফটকের দিকে। আকাশ যেন কাঁদতে শুরু করলে নূতন উদ্যমে। বৃষ্টির বেগও যেন এই সময়টায় বর্দ্ধিত হ'ল উত্তরোত্তর। গাড়ী ফটকের বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় বাঁক নিতেই গাড়ীর দরজা থেকে দেখলেন কুমুদিনী। দেখলেন, যেন লক্ষ হাতছানিতে ডাকছে ঐ প্রাসাদ। আকাশের মতই যেন কাঁদছে লক্ষ চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে।

আবদুল যেন জানতো কুমুদিনী যাবেন কোথায়, সেও গাড়ী ছোটালে সেই দিকে যে-দিকে হেমনলিনীর শ্বশুরালয়।

যার জন্তে এত কাণ্ড সে তখন সবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। চিনতে পারছে মানুষ। ঘুমের জড়তা কেটে গেছে। কেটেছে মদের ঘোর। উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। কৃতকর্ম্মের কাহিনীর কিছু-কিছু মনে পড়ছে যেন। মনে পড়ছে কি এক ভীষণ অন্যায় করেছে; কি এক অসম্ভব কল্পনাতীত অন্যায়। যার প্রায়শ্চিত্ত খুঁজছে পুরোহিত সে এখনও জানে না। জানে না, কে এক জন এই মাত্র চলে গেলেন। ত্যাগ করলেন এই গৃহ হয়তো চিরদিনের মত।

টাটকা বর্ষায় কতকগুলো ভেক বাগানে না পুকুরের তীরে কোর্-কোর্ ডাকতে লেগেছে। খেয়ালী বৈশাখী ঝড়-বৃষ্টি; রুদ্রতা অসীম, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বর্ষণ ক্ষান্ত হবে হয়তো। বাতাসের বেগে ভেসে যাচ্ছে অঞ্জনঘন মেঘপুঞ্জ। বৃষ্টির বেগ যেন নেই তেমন আর তীব্র।

মা কোথায় ? কেমন যেন আত্ম-সমর্পণের উদ্রেক হয়। অন্যায় করলে দোষী যেমনটি করে। যেতে চায় মায়ের কাছে। তাঁর পায়ের কাছে। খাস-মহল শূন্য। কৃষ্ণকিশোর গিয়ে দেখলো, খাস-মহল যার দখলে ছিল তিনি সেখানে নেই। প্রদীপটা শুধু জ্বলছে। মাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে চলেছিল রান্না-বাড়ীতে, সিঁড়ির মুখে বিনোদার সঙ্গে দেখা হ'ল। দেখা হতেই বললে বিনোদা,—এখন থেকে তো হুজুরের পোয়া বারো। মেজাজের যা খুশী হবে তাই করবে। আমরা সব হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই পালন করবো। দেখো হুজুর, আমাদের নিয়ে যেন বল খেলো না। দোহাই !

বিনোদা যে এত কথা কেন বলছে হুজুরের কিছুই বোধগম্য হয় না।—মা কোথায় রে ?

—কোথায় আবার ! তোমার কীর্ত্তি-কলাপ দেখে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিনোদা কথার সঙ্গে একটু হাসে বা।

—কোথায় গেছেন ? কীর্ত্তিমান শুধোয় সবিস্ময়ে। বলে,—আঃ, বল্ না কোথায় গেছেন ?

—বিরক্তি দেখো একবার। ইস্ ! কোথায় গেছেন তা কি আমাকে ডেকে বলে গেছেন ! বিনোদা কথার শেষে আর থাকে না সেখানে। খাস-মহলের তালায় চাবি দিতে যায়।

নবযৌবনা বর্ষার মেঘমল্লার রাগিণী বাজলো না বেশীক্ষণ। উতলা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রাশি-রাশি মেঘ। হিমকণাবাহী বাতাস, শহর যেন কিছুটা স্নিগ্ধ শান্ত হ'ল ধারা-স্নানে। ঝড়ে উড়ে গেছে হয়তো বাসা, কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে নিস্তব্ধ কোথায়।

বর্ষার জল পড়েছে। আর টুপ-টুপ ফুটেছে পাপড়ি ছড়িয়ে। মাঝে মাঝে বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে। বাগানের যেদিকে বেলা, যুঁইয়ের এলাকা সেই দিক থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট সুরভি। অন্ধকারে সেখানে যেন শুভ্র তারা ফুটেছে অসংখ্য। বৃষ্টির জলে এখন সদ্যস্নাত।

এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না কুমুদিনীকে। রান্না-বাড়ীতেও নয়।

কোন ব্রতব্রত কিংবা কোন পুণ্যকর্ম্মের জন্ত হয়তো নাট-মন্দিরে আছেন। এমনও হয়তো কোন কোন দিন, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নাট-মন্দিরেই থাকেন কুমুদিনী। এমন কত পূর্ণিমা আর অমবস্যায়। কত ব্রত আর পার্ব্বণের লগ্নে। মা মন্দিরে আছেন মনে ক'রে নাট-মন্দিরের দিকে এগোয় কৃষ্ণকিশোর। দেখে পুরোহিতের সাঙ্গোপাঙ্গরা মুছতে শুরু করেছে নাট-মন্দির। ধৌতকার্য্যের পর।

মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর পাশে বসেছিলেন পুরোহিত।

নারায়ণের বসন-ভূষণ আর শয্যা পরিবর্ত্তন ক'রে সবে মাত্র বসেছিলেন। বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন হয়তো। নাট-মন্দিরের সিঁড়িতে আবার সেই মূর্ত্তিমানকে দেখে সাবধানতা অবলম্বনের জন্ত আসন ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন। চক্ষের দৃষ্টি তেমন আর নেই, দেখার ভুল হয়নি তো। চোখ দু'টোকে কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন একবার। নাঃ, সেই মূর্ত্তিমান। সেই অবোধ, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধিই আসছে এই দিকে। পুরোহিত ত্বরায় অগ্রসর হলেন আগন্তুকের সম্মুখে। বললেন,—এখন আবার কোন অভিলাষে !

—মা আছেন এখানে ? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

খানিক হাসেন পুরোহিত। কেমন এক বিচিত্র হাসি। তাচ্ছিল্য না অবজ্ঞায় ঠিক বোঝা যায় না। বলেন,—না। এসেছিলেন এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে। চলে গেলেন।

—কোথায় ? কোন্ দিকে গেলেন ? কৃষ্ণকিশোরের মুখে দেখা দেয় ব্যাকুল ব্যস্ততা। কথার সুরেও তাই।

পুরোহিত আবার হাসলেন। ঠিক সেই রকম হাসি। বললেন,—গন্তব্য ব্যক্ত করা হয়নি আমাদিগের সমীপে। গৃহ ত্যাগ করলেন এই মাত্র জ্ঞাত আছি।

পুরোহিতের কথাবার্তায় কেমন এক তাচ্ছিল্য না অবজ্ঞার রেশ শুনতে পেয়ে মনে মনে বিরূপ হয় এই বেতনভোগীর প্রতি। তবুও মনের ভাব চেপে রেখে বলে,—কেন গেলেন ?

—কেন ? আবার হাসলেন পুরোহিত। গভীর অর্থপূর্ণ হাসি। বললেন,—কেন, তাও কি আবার মুখে ব্যক্ত করতে হবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর।

পুরোহিতের ওষ্ঠের হাসি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। বলেন,—মদ্যপায়ী সন্তানের অপকীর্ত্তির জন্য। নেশার বশীভূত হয়ে ছেলে যে গর্হিত কর্ম্ম করলেন সেই লজ্জায়।

কথাগুলি শুনতে শুনতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। শালগ্রামশিলার সিংহাসনচ্যুতির কথা স্মরণ হয়। সন্ধ্যার অতীত কাহিনী ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। আর কোন বাক্যব্যয় করে না। অনুশোচনার উদয় হয় কি মনে ? ফুল, চন্দন, আর ধূপ-ধুনার মিশ্রিত এক পবিত্র সুগন্ধে নিজেকে অত্যন্ত হীন আর হেয় মনে হয় যেন সেখানে। ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হবে এমন সময় পুরোহিত আবার বলেন,—একটি নিবেদন ছিল। অন্যায় করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

কৃষ্ণকিশোর ফিরে দাঁড়ায়। বলে,—কি করতে হবে আমাকে ?

পুরোহিতের রুষ্ট কণ্ঠস্বর। বলেন,—প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত।

এক জন নমস্য ব্যক্তি। কৃষ্ণকিশোর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। কথাটি আর বলে না। পুরোহিত কাঁপতে কাঁপতে বলেন,—আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় যে বিধানে, সেই বিধানটি পালন করতে হবে। আমি শালগ্রামশিলাবারি আনয়ন করছি। পাত্রের সবটুকু জল নিঃশেষে পান করতে হবে।

কথার শেষে মন্দিরের দিকে চললেন পুরোহিত। পাপিষ্ঠ সলজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুরোহিতের গতিবিধি লক্ষ্য করে অনুতপ্ত হৃদয়ে। এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সচ্ছন্দে শান্তি না মঙ্গলস্তোত্র পড়তে শুরু করেছে মূল সংস্কৃতে।—তাবদেব মনুষ্যাণাং সংসারঃ স্বস্তিদায়কঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যান্য সহকর্ম্মীরা কেমন যেন স্তব্ধ ও গম্ভীর বদনে ঘোরা-ফেরা করছে নাট-মন্দিরের এদিক-সেদিকে। যেন তারা মূক না বধির। যেন তাদের মুখে কোন কথা নেই।

পুরোহিত রূপার একটি পঞ্চপাত্র বহে আনেন। জলপূর্ণ। বলেন,—পানের পূর্ব্বে গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর এক শত আট বার। পূর্ব্বে পরিধানের বস্ত্র পরিবর্ত্তন কর। পাত্রের জলটুকু নিঃশেষে পান কর তৎপর। গায়ত্রীর মন্ত্র স্মরণ আছে তো ?

রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কৃষ্ণকিশোরের। বাষ্পরুদ্ধ না কি ! বলে,—হ্যাঁ ঘরে পৌঁছে দিতে বলুন কাকেও। আমি সেইখানে আছি।

আমলা থেকে বিনি-মাইনের তাঁবেদারগুলো পর্য্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে দেখে যেন এই পরবর্ত্তী দৃশ্যপট। দেখে রুদ্ধশ্বাসে। কি প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে কে জানে, কিন্তু ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলেই বাঁচোয়া। আবার যদি নিজমূর্ত্তি ধারণ ক[রে] হুজুর।

ঘড়ি-ঘরের সজোর ঘণ্টা হঠাৎ পড়তে শুরু হয় কাকেও কে[ান] রকম নিশানা না জানিয়েই। সময়ের অদমনীয় বাদ্যধ্বনি প[রম] উপেক্ষায় বেজে যায় একটির পর একটি। দর্শকবৃন্দ প্রথম শব্দ শুনেই চমকে ওঠে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসে জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলো শুধু দুলে যায়। দুলতে থাকে তাদের আলো। যেন মনে হ[য়] কখন বা নিবে যাবে হয়তো।

অনন্তরামের চোখ দু'টো কেমন রাঙা হয়ে আছে যেন।

গরদের হাত-কোঁচানো ধুতি একখানা এগিয়ে দেয় অনন্তরাম একটিও কথা বলে না। শুধু তার নাকে না মুখে শব্দ হয় কোঁস-কোঁস। মনিব দেখে একবার ভৃত্যের মুখখানা। একখানা পশমের নক্সা-তোলা আসন পেতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্তরাম। দরজার বাইরে পুরোহিতের এক জন অনুচর দণ্ডায়মান, সেই মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ। দু'হাতে দু'টি রৌপ্য পাত্র ধরে অপেক্ষা করছিল। এক পাত্রে গঙ্গোদক আর অপর পাত্রে শালগ্রামশিলা-বারি। আসন পেতে দিতেই ভেতরে এসে ব্রাহ্মণটি গঙ্গাজল ঢেলে বসিয়ে দেয় পাত্র দু'টি।

ব্রাহ্মণ চলে যেতেই অনন্তরাম বাইরে থেকে বললে,—আমাকেও টাকা চুকিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে যাই আমি।

আসনে বসেই তার কথাগুলি শুনতে পায়। কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। বহু দিন পরে এই রকম পবিত্র এক অনুষ্ঠানে বসে মনটা যেন হু-হু ক'রে ওঠে মা'র জন্যে।

অনন্তরাম দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে একটা জানলার ধারে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ালো। লুকিয়ে দেখে, সত্যিই কিছু করছে, না করছে না। আসনে বসেছে, না এই আয়োজনই সার হয়েছে। আসনে দেখেই সরে যায় তৎক্ষণাৎ। সে শূদ্র, তাকে যে দেখতে নেই ব্রাহ্মণের পূজাহ্নিক। সেখানে তার ছায়াতেও অস্পৃশ্যতা। অনন্তরাম অদৃশ্য হয় ঠিক ছায়ার মতই।

নেশার ঘোরে একটা কিছু অন্যায় আর অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহার এমন কিছু নতুন নয়, এই বংশের রক্ত যার গায়ে আছে তাদের কাছে। নেহাৎ পিতা আর খুল্লতাতরা দু'জনেই ছিলেন এক ভিন্ন ধরণের মানুষ। বয়সের সঙ্গে জেনে ফেলেছিলেন যেন কি ন্যায় আর অন্যায়, কি উচিত আর উচিত নয়। সংসারে ব্যতিক্রম থাকেই, তেনারা দুই ভাই ছিলেন এই ব্যতিক্রম। একেবারে যাকে বলে বংশছাড়া তাই। আর তাই তাঁদের অবর্ত্তমানেও এখনও বেঁচে আছে এই বিশাল সম্পত্তি। কোন স্থাবর আর অস্থাবর বন্ধক পড়েনি তেজারতের সিন্দুকে। যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে।

নয় তো এ পরিবারে এখনও এমন কেউ-কেউ আছেন, যাঁরা সত্যিই দিলদরিয়া। উদার-চরিত। বছরের সব দিনই এক রকম, কিন্তু বছরের একটা সময় মরশুম আসে যেন তাঁদের। বাবুদের তখন আর গৃহে মন বসে না। যার যার

মোসাহেবদের ডাক পড়ে। সদলবলে বাবুরা তীর্থযাত্রার মত যাত্রা করেন জমিদারীর কোন্ এক নিভৃত পল্লীতে। যেখানটা বাবুদের খাস-দখলে।

মোসাহেবরা শুধু সঙ্গ লাভ করে না। যার যার সখের চাকর যার যার বাক্স-বিছানা বহন করে। আর যায় কতকগুলো বন্দুক নানান জাতের। ছররা আর টোটা। বাবুরা তখন আর দেশী পোষাক পরেন না। দামী দামী স্যুট পরেন। ব্রিচেস্ পরেন। তামাকের স্বাদ ভুলে গিয়ে পাইপ ধরেন দাঁতে। বেশ ...-কতকের ঢঙে, ইহলোকের সকল সম্পর্ক যেন ভুলে গিয়ে তাঁরা যাত্রা করেন হাসতে হাসতে।

কি যেন নাম সেই জায়গাটার?

হ্যাঁ, চর-বসন্তপুর। যেখানে না কি শুনতে পাওয়া যায়, চিরদিন বসন্ত বিরাজ করে। চর-বসন্তপুর চিরসবুজ। বঙ্গোপসাগরের কোন এক মোহানার কাছাকাছি এই চর-বসন্তপুর। কাঁচা বাঁশের বন, যেদিকে তাকাবে সেদিকে। জলাভূমিতে পাটের ফসল অনাদরের। শীতের দিনে কুয়াশায় ঢেকে যায় চর-বসন্তপুর। বাঁশের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়তে শুরু হয় অবিরত। কুয়াশা জল হয় আর পড়ে। বঙ্গোপসাগরের দমকা হাওয়ার ছিটেফোঁটা আসে সেদিকে, সারা চর-বসন্তপুরে যেন তুফান বইতে শুরু হয় তখন।

ঠিক এই শীতের সময় চর-বসন্তপুরে উড়ে আসে ঝাঁক ঝাঁক মরাল। চর-বসন্তপুরে এসে আশ্রয় নেয় সপরিবারে। আর কত, তার সংখ্যা গণনা হয়! বোধ হয় কয়েক সহস্র। কেউ জানতে পারে না এই মরালযূথের উড়ে আসার দিন, ক্ষণ, লগ্ন। এলেও কেউ জানতে পারে না। দলে দলে আসে তারা, এসে চর-বসন্তপুরের তীরে চুপটি ক'রে বসে থাকে। দেখতেও বিচিত্র, ছাই রঙের শরীর, লাল রঙের ঠোঁট। কুয়াশার সঙ্গে যেন তাদের রঙ মিশে যায়। শুধু চক্ষুর রঙ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে না। তাজা রক্তের মত লেগে থাকে কুয়াশার বুকে।

কাকদ্বীপ। লক্ষ্মীকান্তপুর। কুলপী। মাতলা আর জামীরা নদী। বঙ্গোপসাগরের মোহনা। পোর্ট ক্যানিং-এর রাস্তা ধরে বাবুরা শীতের দিনে যাত্রা করেন। চর-বসন্তপুরের কুয়াশায় তাঁবু পড়ে বাবুদের। আর ঐ হংসবলাকারা বাবুদের বন্দুকের শব্দে ভয়ে আর ত্রাসে পাখা ঝাপটাতে শুরু করে কুয়াসা কাঁপিয়ে। চর-বসন্তপুরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসতে থাকে। হংস মেরে মাংস খান বাবুরা। সুরা আর মাংস। আর, আর বলতে লজ্জা হয়, চর-বসন্তপুরের নিরীহ বসতি আছে দু'-চার ঘর, তাদের নিটোল-দেহ সমর্থ মেয়েদের কয়েক রাতের মত কয়েক জনকে এসে থাকতে হয় তাঁবুতে। আপত্তি করলে চলবে না। আসতেই হবে। খুশী রাখতে হবে শিকারীদের। নাচতে হবে, গাইতে হবে। কত অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক ঘটনায় যোগদান করতে হবে।

কৃষ্ণকিশোর সেই চর-বসন্তপুরের নামই শুনেছে এত দিন। দেখেনি কখনও। সবে এই প্রথম দেখলো নারী আর আস্বাদ পেয়েছে সুরার। চর-বসন্তপুরের কাহিনী শুনেছে কারও কারও কাছে, যেন এক কল্পনার স্বর্গরাজ্য।

পিসীমা তো শুনেই হতবাক্।

যেন বিশ্বাস করতেই পারেন না হেমনলিনী। ঘটনার আদ্যো-পান্ত শুনে মুখ থেকে যেন আর কথা সরে না। শুধু বলেন,—বৌঠান, আমি নিজে মরছি সোয়ামী আর ছেলে দু'টোর জ্বালায়। তোমার আবার এ জ্বালা এলো কোথা থেকে! দাদারা আমার কি ধরণের মানুষ ছিলেন! তাঁদের ছেলে হয়ে?

কুমুদিনীও সেই কথাটাই ভাবছেন তো। তাঁদের ছেলে হয়ে এ কি দুর্মতি! হেমনলিনী বার বার শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। পারেন না নয়, যেন বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর অত আদরের, কত স্নেহের পাত্র সে, শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় হেমনলিনী নিজের ছেলেদের চেয়ে পৃথক্ কেউ কখনও মনে করেননি। তবে, ত্রি-মকারের উপাসক এক-আধ জন তিনি দেখেছেন, সেই জন্যেই হয়তো কুমুদিনীর মত অশ্রুবর্ষণ করছেন না, অবিচলিতের মত শুনছেন।

জহর আর পান্না সেই কখন যে বেরিয়েছে বেলা থাকতে। এখনও ফিরে আসেনি। একেবারে যে আসবে না তা নয়, আসবে হয়তো। এমন অবস্থায় আসবে যখন আর এসে দাঁড়াতে পারবে না? এসে সোজা যাবে নিজেদের বিছানায়। রাতের খাওয়াটা হয়তো খেয়েই আসবে বাইরে কোথাও থেকে। ঘরের খাবার ফেলা যাবে। আর তাদের জন্মদাতা পিতা, হেমনলিনীর পতি পরম গুরু, কুমুদিনীর ঠাকুর-জামাই, তিনি হয়তো কেন, সত্যি সত্যিই আর ফিরবেন না এই রাতটার মত। সিমলের কাছাকাছি কোথায় কার কাছে থাকবেন, ফিরবেন রাত ফুরিয়ে ফর্সা হলে আকাশ।

হেমনলিনী বললেন,—এই বোশেখেই বে দিয়ে দাও মেয়েটার সঙ্গে। রূপ আছে যখন বলছো, তখন তাই দেখেই ভুলে থাকবে।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেখে ছেলের সঙ্গে যে-মেয়েটির সম্বন্ধ করছেন কুমুদিনী, তারই বিস্তারিত বৃত্তান্ত বলেছেন ননদিনীকে। শুনে একমত হয়েছেন হেমনলিনী। সেই কথাই বলাবলি করছেন দু'জনে মুখোমুখি বসে। এখানে ঘড়ি-ঘর নেই, কিন্তু ঘড়ি তো আছে। হেমনলিনীর ঘরের এক কোণে মেঝেবের দামী টেবিল-ঘড়ি রয়েছে। ঢুং-ঠাং শব্দে বাজতে শুরু করেছে।

কুমুদিনী বললেন,—রাত কত হল ঠাকুরঝি!

হেমনলিনী বলেন,—অনেক, প্রায় বারোটা। তুমি কিছু মুখে দেবে না বৌঠান, তা কখনও হয়?

কুমুদিনী কোন্ মুখে আর খাবেন। বলেন,—না ঠাকুরঝি, তুমি আর খেতে বল না আমাকে। তুমি খেয়ে এসো, রাত ঢের হয়েছে।

—আমি তো খেয়ে আসবো। তোমারও খাবার নে আসবে সেই সঙ্গে। খেয়ে-দেয়ে দুই বোনে শুয়ে পড়বো'খন। একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলেন পিসীমা। আবার বলেন,—তোমার ভাবনা কি বৌঠান? আমি যখন রয়েছি, তোমার কোন চিন্তা নেই। কথা বলতে বলতে হেম ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বলেন যেতে যেতে,—কি কথা শোনালে বৌঠান? শালগ্রাম নিয়ে বল খেললে ছেলে তাই বলি ছেলে আর আসে না কেন এদিকে। এ পাপে প্রায়শ্চিত্তির আছে! ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা—

বাইরে নিশুতি রাত। আর এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া। হতাশার শ্বাস ফেলছে যেন এই যক্ষপুরী।

কেন কে জানে, ঘুম আসছে না চোখে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে পুরোহিতের আদেশে অদ্ভুত, ফিরে এলো না কুমুদিনী। শূন্য জুড়ী। ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। শোচনা আর লজ্জা; কুমুদিনীর না-বলে চলে যাওয়া; লোকজনের রোষদৃষ্টি—দুঃখের এক চাপা আবেগে ঘুম আসছে না চোখে। সুখ আর দুঃখের নিঃস্বার্থ সমব্যথী টম শুধু এই বিনিদ্রায় একমাত্র সঙ্গী। দরজা আগলে যেন বসে আছে টম। সোঁ-সোঁ বাতাস বইছে বাইরে। ঘষা কাচের লণ্ঠনে আলোর দীপ্তি নাচছে থরো-থরো।

আর থেকে-থেকে একটি অনিন্দ্য মুখবিম্ব, সকল কিছুকে ছাপিয়ে উঁকি মারছে যেন ঐ আকাশের অন্ধকারে। তার আয়ত চোখে ইসারা আর ওষ্ঠাধরে চটুল হাসি যেন। কে সেই কুঁচবরণ, যার মেঘবরণ চুল! সে কি গহরজান, গহরজান, গহরজান?

[ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

'৩২ সালের গাড়ী

শ্রীমতী—দেবী নিজে তাঁর গাড়ী চালিয়েছেন শহরের রাস্তায়। কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে চালাচ্ছেন গাড়ী। সন্ধ্যার অবসর, কোন কাজ নেই, তাই তাঁর সখের গাড়ীখানায় বেরিয়ে পড়েছেন শহর কলকাতায়। খানিক দূর যেতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, রাস্তায় যেন লোকজনের ভিড় জমেছে। প্রথমে তাঁর মনে হল, হয়তো তাঁরই দেখার ভুল হয়েছে, রাস্তায় লোকজন এমন তো সব সময়েই। আরও কিছু দূর এগোলেন। দেখলেন সেখানেও অনেক নরনারীর জমায়েৎ। ভাবলেন, হয়তো তাঁরই ভুল। কলকাতার অনেক পাড়ায় এ ধরণের নারী ও পুরুষের সহযাত্রা হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী—দেবী বিরক্ত হয়ে গাড়ীর বাঁশী বাজাতে বাজাতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হলেন। যথা পূর্ব্বং তথা পরং, সে রাস্তায় দেখলেন জনসমাগম আরও বেশী। কাতারে কাতারে লোক। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে গাড়ী থামিয়ে এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা বলুন তো, রাস্তায় এত ভিড় কিসের?

লোকটি তো শ্রীমতী—দেবীর কথা শুনেই হতবাক্। খানিক সবিস্ময়ে দেখে লোকটি বললে,—জানেন না এখন ভূমিকম্প হচ্ছে? আপনি কোথা থেকে আসছেন এখন?

শ্রীমতী—দেবী তক্ষুনি গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। বললেন,—ইস্, আমি বুঝতেই পারিনি। আমার গাড়ীখানা সেই ১৯৩২ সালের কি না। অসম্ভব কাঁপে সব সময়ে। ইস্!

ছাপার ভুল

ভদ্রলোক যে কি কুক্ষণে তাঁর গৃহের পাশে কয়েক কাঠা জায়গা ফেলে রেখেছিলেন! পাড়ার বারোয়ারী পূজো, পুরস্কার বিতরণ, সভা-সমিতি, শোকসভা, খেলাধুলার জন্য এক দিনও খালি থাকে না। প্রত্যহ বিকেলের দিকে একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। সেই সঙ্গে মাইক্রোফোন। ভদ্রলোক তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অথচ কাকেও মানা করতে পারেন না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবার অজুহাতে পাড়া-প্রতিবেশী হয়তো তাঁকে বয়কট করে দেবে। ড্রাইং ক্লিনিং, সেলুনের দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। এই সব নানা অসুবিধার কথা ভেবে তিনি মনে-মনে আপত্তি করলেও মুখে কিছু বলতে পারেন না। সব দিক ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন যে, এই জায়গায়—তাঁর গৃহের এই লাগোয়া জায়গায় কোন রকম সভা বা শোকসভা করতে হলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে কেউ কিছু করবার ব্যবস্থা করলে আইনমত দণ্ডনীয় হবে।

মনের কথা সকলকে জানিয়ে দিলেন। তার পর থেকে যারাই আসতো অনুমতি নিতে, অধিকাংশকেই তিনি ফিরিয়ে দিতেন। এমন সময় পাড়ার এক জন ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক কর্ম্মীর মৃত্যু হল। সঙ্গে সঙ্গে উত্যোগী প্রতিবেশী এসে ঐ ভদ্রলোককে পাকড়াও করলেন। অনেক কাকুতি-মিনতির পর দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার দেখে তিনি বললেন,—আচ্ছা, আসছে ১৮ তারিখে আপনারা সভার ব্যবস্থা করুন। ঐ দিন আমি কলকাতার বাইরে চলে যাবো। ঝামেলা আর পোয়াতে হবে না।

যেদিন এই পাকা কথা জানালেন সেদিন ৭ তারিখ। উদ্যোক্তারা খুশী হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। সেদিনই শহরের সংবাদপত্রে সভা-সমিতির স্তম্ভে প্রকাশিত হওয়ার জন্য জানিয়ে দেওয়া হল স্থান, তারিখ সময় প্রভৃতি। পরের দিন কাগজে ছাপার অক্ষরে শহরবাসী দেখলে অমুক রাজনৈতিক কর্ম্মীর মৃত্যুতে অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে শোকসভার আয়োজন হয়েছে।

ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন পরের দিন। গত কল্য ৭ তারিখ গেছে; সবে মাত্র এসেছে ৮ তারিখ। ভদ্রলোক এখনও দশ দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু বিকেল হতে না হতেই দেখলেন লাগোয়া জমিতে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ভিড় যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভদ্রলোক তো অবাক্! বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। বললেন, কিসের জন্যে ভিড় জমিয়েছেন আপনারা? কি চাই?

সমবেত জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো যেন। কেউ কেউ বললে,—কাগজে দেখলাম এই বিকেলেই এখানে এক রাজনৈতিক কর্ম্মীর মৃত্যুতে শোকসভা হবে।

ভদ্রলোক চটেই অস্থির। বললেন,—সে তো সেই ১৮ তারিখে মশাই। আর এই মাত্র ৮ তারিখেই এসে হাজির হয়েছেন? ভেগে পড়ুন, ভেগে পড়ুন।

তখন সমবেত জনগণ একখানা খবরের কাগজ এনে দেখিয়ে দিলে। বললে,—এই দেখুন, কাগজে বেরিয়েছে ৮ তারিখেই এই সভা। ৮ তারিখ কবে মশাই?

ভদ্রলোক বললেন,—দেখি কি কাগজ?

দেখলেন দৈনিক বসুমতী। ১৮ তারিখের ১ সংখ্যাটা নেই!

জীবন—শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন। কবির কীর্তিকে ভালবেসে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতেই ষ্ট্র্যাটফোর্ডের অতুল সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ এক দিনেই সম্ভব হয়নি। এর সূচনা হয়েছিল বহু যুগ পূর্ব্বে। ষ্ট্র্যাটফোর্ডের উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে হলে ফিরে যেতে হয় ৭ম শতাব্দীর শেষ দশকে। ৬৯১ খৃষ্টাব্দে মার্সিয়ার রাজা এথেলরেড 'ষ্ট্র্যাটফোর্ড মঠ' আর সেই সঙ্গে মঠ-সংলগ্ন তিন হাজার একর জমি দান করলেন ওয়ারসেষ্টারের তৃতীয় বিশপ এগউইনকে। বিশপ-পরম্পরায় চলতে লাগলো ষ্ট্র্যাটফোর্ডের শাসন। ওয়ারসেষ্টারের বিশপেরা তাদের "ষ্ট্র্যাটফোর্ড সম্পত্তি" নিয়ে গর্ববোধ করতো। অল্পকালের মধ্যেই মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে উঠলো 'পুরাতন ষ্ট্র্যাটফোর্ড'।

ষ্ট্র্যাটফোর্ডের সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে Domesday Surveyর রেকর্ডে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড তখনও ওয়ারসেষ্টারের বিশপের জমিদারীবিশেষ। চাষী আর দিন মজুর এখানে বসবাস করতো তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে।

প্রথম উইলিয়ামের রাজত্বকালে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের প্রকৃত আয়তন ছিল প্রায় দু'হাজার একর। চাষ-আবাদের দিক থেকে বেশ উন্নত ছিল অঞ্চলটি। গ্রামের চারি দিকেই ছিল আবাদযোগ্য জমি, পতিত জমি বিশেষ ছিল না। প্রতিটি পরিবারই চাষ করতো। গম, যব প্রভৃতির চাষই ছিল প্রধান।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও দেখা যায় কৃষিই ছিল এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। তবে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিল্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁতি, দর্জি, মুচি, ছুতার, কামারের ব্যবসায় ফেঁপে উঠতে লাগলো। ওয়ারসেষ্টারের বিশপেরাও এদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। ১৩শ শতকের প্রথম দিকে এখানকার বিশেষ আকর্ষণ ছিল বার্ষিক মেলা। বিশপেরা এর জন্তে অর্থ মঞ্জুর করতেন। এই শতকের একেবারে শেষ দিকে সহরের নানা দিক থেকে উন্নতি হতে লাগলো।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ষ্ট্র্যাটফোর্ডে গড়ে উঠলো নগর-শাসন সমিতি। স্বায়ত্তশাসন পত্তনের সূচনা হল। তবে এ সমিতি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত ছিল না। সমিতির গির্জা, সভাকক্ষ ও দরিদ্র আশ্রম স্থাপিত হল।

নগর সমিতি ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করলেন গ্রামার স্কুল। ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানই ছিল এর উদ্দেশ্য। উত্তরকালে এই স্কুলেই সেক্সপীয়ার শিক্ষালাভ করেন, অবশ্য তখন এর কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের উন্নতির মূলে স্যর হিউগ ক্লপটনের দান রয়েছে অনেকখানি। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি ষ্ট্র্যাটফোর্ডে পদার্পণ করেন। তিন বছর পরেই ইনি চ্যাপেল ষ্ট্রীট ও চ্যাপেল লেনের সংযোগ-স্থলে মনোরম "নিউ প্লেস" ভবনটি নির্মাণ করেন। কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পরে এই 'নিউ প্লেস' সেক্সপীয়ারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ক্রয় করার অব্যবহিত পরেই কবি সপরিবারে এখানে চলে আসেন।

অ্যাভন নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ক্লপটনের অক্ষয় কীর্তি। চৌদ্দটি খিলান দিয়ে তৈরী পাথরের সেতু ও দীর্ঘ পাকা সড়ক জনগণের একটা বড় রকমের অভাব পূর্ণ করলো। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেল্যাণ্ড ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্র্যাটফোর্ড পরিদর্শনে এসে এই সেতু-নির্মাতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে লিখেছেন, "হিউগ ক্লপটনের পূর্বে এই নদীতে ছোটখাটো রকমের একটা কাঠের সাঁকো ছিল বটে, কিন্তু পাকা রাস্তা কিছু ছিল না। ফলে লোকে ষ্ট্র্যাটফোর্ডে আসতে চাইতো না।" গির্জার সংস্কার সাধনে অর্থব্যয় করতেও ক্লপটন কার্পণ্য করেননি। এমনি ভাবে ক্লপটনের ঔদার্যের স্বাক্ষর রয়ে গেছে সেক্সপীয়ারের জন্মভূমিতে।

ষোড়শ শতাব্দীর অর্দ্ধেক উত্তীর্ণ হওয়ার পর সহরের শাসন-ব্যবস্থার আর এক ধাপ উন্নতি হল। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সহরের বিশিষ্ট অধিবাসীরা রাজা ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের কাছে সমিতিটিকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে পরিণত করার দাবী পেশ করলেন। তিন বৎসর পর রাজা স্বায়ত্তশাসন দিলেন। পর-বৎসরই নগর সমিতিকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজা হল। বেলিফ বা মেয়র, অল্ডারম্যান ও সাধারণ পরিষদ নিয়ে গঠিত হল পরিচালকমণ্ডলী এবং কতকগুলি কঠোর আইন-কানুন প্রবর্তন করা হ'ল। কারও নৈতিক অধঃপতনের সংবাদ পেলে তাকে ডেকে পাঠিয়ে বিশেষ ভাবে তদন্ত করা হত। অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সে প্রায়শ্চিত্ত করতে না চাইলে তাকে সহর ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হত। একবার কোন এক ভদ্র-লোকের পরিচারিকা না জানিয়ে হঠাৎ বাড়ী থেকে চলে যায়। অল্ডারম্যানের আদেশে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তাকে মাস কয়েক কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছিল। মিউনিসি-প্যাল পরিষদের নেতার অনুমতি না নিয়ে কেউ বাইরের লোককে বাড়ীতে স্থান দিতে পারতো না। রাস্তায় অবাধে কুকুর ছেড়ে রাখা চলতো না। প্রত্যেক অধিবাসীকে মাসে অন্ততঃ একবার গির্জায় যেতে হত। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে ২০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড হত। এমনি ভাবে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের নতুন সহর-পরিষদ সে যুগের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন।

সেক্সপীয়ারের পিতা জন সেক্সপীয়ার এই শাসন পরিষদের এক জন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কর্পোরেশনের নিম্নতম পদ থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে এর সর্বোচ্চ পদ চীফ অল্ডারম্যান পর্যন্ত হয়েছিলেন।

ব্যবসায়ের দিক থেকে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের বেশ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে। মধ্যযুগের মফঃস্বল সহর হিসাবে এর লোকসংখ্যাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় এখানে প্রায় দু'হাজার লোকের বসতি। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে একবার মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয়। এতে লোকসংখ্যা হ্রাস পেলেও আশপাশের গাঁ থেকে নতুন নতুন লোক আসায় মোট গড়পড়তা সংখ্যা ঠিক বজায় ছিল।

ষ্ট্র্যাটফোর্ডে তখন কৃষি ছাড়া ভেড়া ও পশমের ব্যবসায়ও কম লাভের ছিল না। তাই অনেকেই আবার কৃষিকার্য ছেড়ে এই সকল ব্যবসায়ে মন দিয়েছিল। এই রকম নানা কারণে অন্যান্য স্থানের ধনীরা ষ্ট্র্যাটফোর্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কভেণ্ট্রি থেকে যেমন এসেছিলেন উইলিয়াম বটের মত ধনী, স্নিটারফিল্ড থেকে তেমনই এসেছিলেন জন সেক্সপীয়ার।

জন সেক্সপীয়ার ১৫৫২ সালে ষ্ট্র্যাটফোর্ডের হেনলী ষ্ট্রীটে বসবাস আরম্ভ করেন। এঁর পিতা রিচার্ড স্নিটারফিল্ডে কৃষিকার্য ক'রে

কালাতিপাত করতেন। স্নিটারফিল্ড ষ্ট্রাটফোর্ডের চার মাইল উত্তর-পূর্ব একটি গ্রাম। হেনলী ষ্ট্রীটের বাসভবনে এসে জন দস্তানার কারবার শুরু করেন। এ ছাড়া জন ভেড়া, চামড়া, পশম প্রভৃতি দ্রব্যেরও ব্যবসায় করতেন। বোধ করি ব্যবসায়ে তাঁর মুনাফা ভালই হয়েছিল, কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ষ্ট্রাটফোর্ডে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জনের পুত্র উইলিয়াম সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল। সেক্সপীয়ারের জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে ষ্ট্রাটফোর্ড-অ্যাভনে। প্রথম জীবন ষ্ট্রাটফোর্ডে অবস্থানের পর তিনি সম্ভবতঃ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন গমন করেন এবং সম্ভবতঃ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে অতিবাহিত করার পর পুনরায় ষ্ট্রাটফোর্ডে ফিরে আসেন।

মাত্র সাত বৎসর বয়সে গ্রামার স্কুলে কবির শিক্ষালাভ শুরু হয়। তবে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় লণ্ডনে। এখানে তিনি বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে মানব-জীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

কিন্তু অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে লণ্ডনে সেক্সপীয়ারের যে নতুন জীবনের বিকাশ দেখি, তার প্রথম বীজ উপ্ত হয়েছিল ষ্ট্রাটফোর্ডেই। জন সেক্সপীয়ারের অসাধারণ নাট্যপ্রীতি পুত্রের মধ্যে সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল। জন নগর-সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা কালে প্রায়ই অভিনয়ের আয়োজন করতেন। উইলিয়াম শৈশব কাল থেকেই এই সকল নাট্যাভিনয় দেখতেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মধ্যে নাট্যপ্রীতি জাগে। অভিনেতা হওয়ার ও নাটক রচনার বাতিক তাঁকে পেয়ে বসে এবং এই দিক দিয়ে নিজের ভাগ্যকে যাচাই ক'রে নেওয়ার জন্য তিনি ১৫৮৬ সালে ষ্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে পাড়ি দেন।

সম্ভবতঃ ১৫৮২ সালে টেম্পল গ্র্যাফটন-নিবাসী অ্যান হ্যাথওয়ের সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। টেম্পল গ্র্যাফটন ও ষ্ট্রাটফোর্ডের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৫ মাইল।

লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সেক্সপীয়ার ষ্ট্রাটফোর্ডের 'নিউ প্লেস' ভবনে বাস করতে থাকেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই তিনি বাস করেন।

সেক্সপীয়ার সেদিন তাঁর 'নিউ প্লেসে' দুই বন্ধুকে উৎসব আয়োজনের মধ্যে আপ্যায়িত করছিলেন। উৎসবের আসরেই অকস্মাৎ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতা থেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করতে পারলেন না। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে মহাকবি লোকান্তরে প্রস্থান করলেন। ২৫শে এপ্রিল তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। ষ্ট্রাটফোর্ড হারাল এক মহামূল্য রত্ন।

গির্জার ঘণ্টা করুণ আর্তনাদ ক'রে উঠলো। বেলিফ আর অল্ডারম্যানেরা শোকবিহ্বল অন্তরে যোগ দিলেন শবযাত্রায়, সমাধিতে নিবেদন করা হল শ্রদ্ধার্ঘ আর শবানুগমনকারীদের জন্য ভোজেরও আয়োজন করা হল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই কবির লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। কিন্তু অনেকেই জানলো না যে, তাদের ঐ নিকটতম সাথী ও আত্মীয়টি ইতিমধ্যেই অতুল যশ অর্জন ক'রে শুধু যে নিজেই অমৃতত্ব লাভ করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাদের লীলাক্ষেত্র মধ্যযুগের সেই নগণ্য সহর ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনকে পৃথিবীর চোখে চিরদিনের জন্য মৃত্যুহীন প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন।

আপনি কি জানেন ?

১। সর্বপ্রথম পৃথিবীর নিখুঁত মানচিত্র কে কবে অঙ্কিত করলেন ?

২। ব্রিটেনে সম্প্রতি যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়, সেটি "ফেষ্টিভ্যাল অফ ব্রিটেন" নামে খ্যাত। তার প্রথম পত্তন কোন্ সালে ? কে তার উদ্বোধন করেছিলেন ?

৩। সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নাট্যশালা কোথায় ?

৪। বর্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্রের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রথম স্থির করেন যে, সূর্য্যই গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্র। এই পণ্ডিতের নাম চিরদিন স্মরণীয়। কে বলতে পারেন ?

৫। ইলবিলা কে ছিলেন ?

৬। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদনের জন্য পৈশাচী ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ অনূদিত হয়। ভারতবাসীর কাছে সে গ্রন্থ অতি পরিচিত। গ্রন্থটি কি ?

৭। সংস্কৃত মৎ, গ্রীক মদাপোস্, ল্যাটীন মাজিও, গথিক মিতে ইংরেজী মাদ্, চিক্ত মিসৃক্তে এবং পারস্য ভাষায় মসৃত শব্দটি যথার্থ কি বলতে পারেন ?

৮। ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের পরিমাণ কত ?

(উত্তর ৮৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[আত্মস্মৃতি এই পর্য্যায়ে প্রতি সংখ্যায় এক জন খ্যাতনামার আত্মকাহিনী প্রকাশিত হবে।]

ক্ষুদ্র তৃণকুসুম তাহার অকিঞ্চিৎকর সুরভি ও রূপ লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ফুটিয়া উঠে। তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনেরও একটা ইতিহাস আছে, কিন্তু তাহা শুনিবার বা শোনাইবার মত নহে। ঝড়-বৃষ্টির আঘাত, মেঘ-রৌদ্রের খেলা, মন্দানিলের স্পর্শ, মৌমাছি ও প্রজাপতির সঙ্গ তাহার বুকে যে অনুভূতি জাগাইল, সে যদি তাহা শুনাইত তাহা হইলে হয়ত সমানধর্মা কোনো না কোনো শ্রোতার ভাল লাগিত। সেই হিসাবে আমার এই তুচ্ছ জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও হয় ত কাহারো ভাল লাগিতে পারে।

আমি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করি, তাহা ছোট হইলেও নগণ্য নহে। পুরাণ ও কাব্যকাহিনী উহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য এই গ্রামেরই ইতিহাস। শ্রীমন্ত সদাগরের বাড়ী এই গ্রামেই। সতী বেহুলা এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে মিথিলার গৌরব দান করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের ইহা জন্মভূমি—বৈষ্ণব, শাক্ত উভয়েরই তীর্থস্থান। মঙ্গলচণ্ডী মাতার মহাপীঠ এই উজানি সম্বন্ধে 'কণ্ঠ' মহাশয় গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যা করে পাপ
খণ্ডিবারে করতে হয় না যজ্ঞ যাগ,
মকরেতে দিলে এই নদীতে ঝাঁপ
শত জন্মের পাপ হত হয় তখনি।"

এত দেবতা-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র গ্রাম সারা বাঙলায় বিরল। আমরা মনে করিতাম সর্বদা দেব-দেবীর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছি—আমরা তাঁদের আশ্রিত, আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই—তাই লিখিয়াছিলাম—

এ পথেতে আবার আমার আসতে যদি হয়,
যেখানেতে ছিলাম দিয়ো সেইখানে আশ্রয়।
যেথায় জেনেছিলাম আমি, তুমিই কর্তা গৃহস্বামী,
তুমি ভিন্ন করতে হয় না অন্য কারো ভয়।

এই গ্রামের উত্তরে আমাদের বাড়ী—অজয় দূরে প্রবাহিত ছিল কিন্তু বৎসর বৎসর ভাঙনে সরিয়া আসে এবং সুন্দর বাড়ীটিকে গ্রাস করে। দরিদ্রের বাড়ী হইলেও বড় সুন্দর, বড় শোভার, বড় শান্তির বাড়ী ছিল—

বাড়ী আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে থাকে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা,
দূরে গ্রামের ঘর দেখা যায় তরু-লতার ফাঁকে।
মাধবী আর মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস-নিশি ভোর।
দোয়েল পাপিয়ার, গীতে কানন ছায়
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

এই বাড়ীরই একটি চালা-ঘরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে আমি ভূমিষ্ঠ হই।

আমার পিতৃভূমি শ্রীখণ্ড, আমার মাতুলালয় কোগ্রাম 'উজানি'। মাতামহ নিঃসন্তান ছিলেন, তাই আমি এ গ্রামেই বাস করি।

আমার মাতামহীর মত মহীয়সী মহিলা কম দেখিয়াছি, তিনি যেমন তেজস্বিনী তেমনি দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ ও সঞ্চিত স্বর্ণের খ্যাতি খুবই ছিল তবে আমি তাহার বিশেষ পরিচয় পাই নাই। লোচনদাস তাঁর মাতামহী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে।"

আমি যদি তাঁহার মত বড় কবি হইতাম, তাহা হইলে আমার মাতামহী সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করিতে পারিতাম।

বাড়ীতে একমাত্র পুত্র-সন্তান বলিয়া দিদিমা ও মাসিমাদের অত্যধিক আদরে আমি পল্লীগ্রামে যাহাকে "সোহাগে ছেলে" বলে তাহাই হইয়াছিলাম। ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত মাটিতে পা দিই নাই, তাঁহাদের কোলে-কোলে ফিরিতাম। যাহা চাইতাম, তাই তাঁহারা দিতেন। কত ভাল ভাল জিনিষ ভাঙিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য খেলনা ও পুতুলে একটি আলমারি পূর্ণ ছিল, আমার দৈনিক আবদারে ও উৎপাতে উহা প্রায় শূন্য হইয়াছিল। আমার কোনো অন্যায় খোট মা সহ্য করিতেন না, সুবিধা পাইলেই বেদম প্রহার করিতেন কিন্তু সে সুবিধা পাওয়া কঠিন ছিল। আমি অহোরাত্র দিদিমা ও মাসিমাদের কাছে থাকিতাম, সেখানে আমার গায়ে হাত দেওয়া সহজ ছিল না। মাসিমারা আমাকে কোলে করিয়া সূর্য্যোদয় দেখাইতেন। "সূয্যি মামা সূয্যি মামা, রোদ কর গো", পল্লীবালকদের কাছে শুনিতাম ও বলিতাম—উহাই আমার বাল্যের গায়ত্রী। রাত্রে চাঁদা মামাকে আমার কপালে টিপ দিয়া যাইবার জন্য ডাকিতেন। 'চন্দ্র সূর্য্য' এই দুই আত্মীয়ের সঙ্গে আমার খুব অল্প বয়সেই আলাপ হয়। আমি অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে কথা কহিতে শিখি, অনেকে ভয় করিয়াছিলেন আমি বোবা হইব—হইলে নেহাৎ মন্দ হইত না—কিন্তু সেটা আর ঘটিয়া উঠিল না।

কত রকমে যে দিদিমা আমার কল্যাণের জন্য বৃথা অর্থব্যয় করিতেন তাহা বলিতে পারি না। আমি দীর্ঘজীবী, বিদ্বান, যশস্বী ও ধনী হইব, এই সব উৎকট ভবিষ্যৎবাণী করিয়া যে কোনো গণক ও ভিখারী পয়সা আদায় করিত। দেবতার স্নানজলে ও দেব-অঙ্গনের ধূলিতে আমার সারা দেহ অভিষিক্ত থাকিত। আমার জন্য তিনি বহু লোকের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন, ক্রয় করিতেন।

আমাদের বাড়ীতে সর্বদাই ভগবৎকথা হইত। আমি ভক্তির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত। সমস্ত গ্রামে তখন একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল। শিশুকালে 'শ্রীবৎস-চিন্তার' উপাখ্যান মায়ের 'রাজেশ্বরী দিদির' মুখে শুনিয়াছিলাম—উহা আমার শিশু-হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছিল—আমার সমস্ত জীবনে উহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তখন যে সব উপাখ্যান শুনিতাম তাহা সম্যক্ বুঝিবার বয়স আমার নয়, কিন্তু ইহা মনের মধ্যে যে ছবি ফুটাইয়া তুলিত, ভাবের যে ঝিলিমিলি মনকে অনুরঞ্জিত করিত তাহার মূল্য ঢের বেশী। বুঝার চেয়ে সে না-বুঝার আনন্দ আরও অধিক। এখন যাহা কথা তখন তাহা ছিল সুর—

রবির আলো যাই তুলে যাই কেন্দ্র উষার যাহারে।'

বাড়ীর পুণ্য পরিস্থিতি ও গ্রামের ভক্তিমতী ও ভক্তদের চরণ-ধূলাই আমাকে শিশুকাল হইতে শ্রীভগবানে বিশ্বাসী ও তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দিয়াছে।

আমার মাতাঠাকুরাণী অসাধারণ রূপবতী, গুণবতী ও ভক্তিমতী আদর্শ হিন্দু-মহিলা ছিলেন। বাবা ছিলেন তেজস্বী সরল সবল প্রকৃতির লোক। ভক্তির কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না, তিনি নিত্য শিবপূজা করিতেন—চাদ সদাগরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। কাশ্মীর রাজষ্টেটে তিনি সুদীর্ঘকাল সুপারিনটেনডেণ্টের পদে যশ ও যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া স্পেশেল পেন্‌সেন পান। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি হিন্দী ইংরাজী উর্দ্দু পুস্তু মাতৃভাষার ন্যায় বলিতে পারিতেন।

মাকে আমি বড় ভক্তি করিতাম—তাই লিখিয়াছিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম আমি এমন স্নেহ এই মমতা।
জনম জনম মা হয়েছ জনম জনম হবেও মা
ডাকবে আমায় ভক্ত তোমার তোমার কাজল তোমার চুমা।

তিনি বাবার সঙ্গে দুর্গম অমরনাথ ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন, কত দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য আমার ও আমার পত্নীর জন্য পাঠাইতেন। সময় সময় ভাবি—সত্যই

এত জীবনের স্নেহ-প্রীতিধারা দেখি বুকে ব্যথা বাজে
যতনে পালিত এ তৃণ-কুসুম লাগিল না কোনো কাজে।
সুরভিত করি দেব-মন্দির সাজাল না পূজা-থালা,
রহিল কাঠের কৌটায় ভরা ক্ষীণ কর্পূর মালা।
হলো নাক' পাঠ হলো নাক' গীত বারেক হলো না খোলা
স্নেহের ডোরেতে জড়ানো এ পুঁথি 'তাকে'ই রহিল তোলা।

এক শুভ দিনে বৃদ্ধ বিশু ঘোষাল মহাশয় আমার হাতে-খড়ি দেন। কোগ্রামের পাঠশালায় আমার বিদ্যারম্ভ। খুব বুদ্ধিমান বালক ছিলাম না, পাঠে মনোযোগীও ছিলাম না, দুর্ব্বল হইলেও দুরন্ত ছিলাম, তজ্জন্য ঘরে ও পাঠশালে প্রহার খাইয়াছি। একবার দেহে রক্তপাতও হইয়াছিল। "ঝুল ঝাপ্পুর" খেলিতে গিয়া দুই বার গাছ হইতে পতন ও মূর্চ্ছা হয়। দিদিমাকে বহু দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয় করাইয়াছি। একবার তো যমরাজের সঙ্গে চোখাচোখী করিয়াই ফিরিয়াছি। আমার নানা দোষ সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় ভালবাসিতেন এবং 'বয়সে বুদ্ধি খুলবে' এই আশ্বাস দিতেন। বোধ হয় আমার মাতামহী ঠাকুরাণীকে তুষ্ট করিবার জন্য। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া আমার উপনয়নের পর ১১ কি ১২ বৎসর বয়সে ৪ঠা আষাঢ় প্রথম কলিকাতা যাই। দিদিমা সঙ্গে যান। আমার মাতার জ্ঞাতি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক মাতুল মহাশয় আমাকে Mr. D. N. Dasএর Century Schoolএ ভর্ত্তি করিয়া দেন।

পাঠশালায় বহু কষ্ট, বহু অসুবিধা ছিল কিন্তু বীণাপাণির মন্দিরের এই প্রথম সোপান আমার বড় ভাল লাগিত। কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিত, কত বৃহৎ বৃহৎ সম্ভাবনা মনে উঁকি মারিত—

রুই মাছ এসে ঠোকর দিত পুঁটী মাছের বঁড়সীতে।

কলিকাতায় আমি ১২।১৩ বৎসর স্কুল এবং কলেজে পড়ি। ১১০৫ সালে বি-এ পাস করিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক" পাই। আইন পড়িতে রিপন কলেজে ভর্ত্তিও হই কিন্তু পড়া আর হয় নাই।

কলেজে আমি হুইনাস্ সাহেব, অধ্যাপক ললিতকুমার, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি মনীষিগণের প্রশংসা ও স্নেহ লাভ করি। এই ছাত্রাবস্থাতেই কবিবর করুণানিধান, যতীন্দ্রচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সহিত মিশিবার সুযোগ হয়। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতির দর্শন লাভেরও সৌভাগ্য ঘটে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁহার গৃহ-পরিজনের স্নেহ-ভালবাসা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ লাভ।

আমি ১১০৬ সালে ২২শে অক্টোবর কাশিমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউসনে অস্থায়ী দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগদান করি। আমি মাত্র দুই মাসের জন্য গিয়াছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি স্থায়িভাবে দ্বিতীয় শিক্ষক হইলাম এবং এক বৎসর না যাইতেই প্রধান শিক্ষক হই। একে আমার বয়স কম, তাহাতে আবার দেখিতে বালকের মত বলিয়া লোকে প্রথমে বলাবলি করিত "মহারাজা এক 'কালদমনের' বালককে হেড-মাষ্টার করেছেন। চৈতন্যপুরের জমিদার কন্দর্প-নারায়ণ চৌধুরী রসিক লোক ছিলেন, তিনি আমাকে প্রথম দর্শনেই বড় স্নেহ করিতেন এবং আমার মাতামহের বন্ধু ছিলেন বলিয়া আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়া শিক্ষকবৃন্দ ও অন্য সকলকে বলেন—"কি হে, তোমরা যে বলছিলে কাল্ দমনের বালক? এ যে খাসা ছন্‌ছনে ছেলে, মহারাজা এইবার কলমে আম গাছ আজ্জিয়েছেন, খুব ভাল ফল হবে।" বৃদ্ধের এ আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছিল।

আমি এই স্কুলেই একাধিক্রমে একত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল কার্য্য করিয়া ১১৩৮ সালের ১লা জুলাই অবসর গ্রহণ করি। আমার মত চঞ্চলচিত্ত, একটা খামখেয়ালী লোককে এক স্থানে এত দীর্ঘকাল রাখা অবিকল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ সহনশীল ও স্নেহশীল মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার মত স্বভাব আমার নয়—মহারাজ বাহাদুরকে বহু ভাবে উত্যক্ত করিতাম, তিনি পিতার ন্যায় গভীর স্নেহে আমার সব উপদ্রব সহ্য করিতেন। সুদীর্ঘকাল সমভাবে পরীক্ষার ভাল ফল, ছাত্রগণের কৃতিত্ব এবং বিদ্যালয়ের সুযশ মহারাজকে প্রীত করিত। নামজাদা পরিদর্শকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য তিনি আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। মহারাজা আমার কবিতা ভালবাসিতেন, হাস্যমুখে বহু গুণী লোকের সমক্ষে দু'-একটি ছত্র আবৃত্তি করিতেন। আমার কোনো অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই, কোনো আবদার অপূর্ণ রাখেন নাই, কোনো প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। সেখানকার ছাত্রগণের ব্যবহার অতুলনীয়। এমন গুরুভক্ত, একান্ত বাধ্য, প্রতিভাবান ছাত্রদল পাওয়া যে-কোনো শিক্ষকেরই সৌভাগ্য। দীর্ঘকাল মধ্যে এক দিনও কোনো ছাত্রের অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত পাই নাই। আমার বা স্কুলের অপযশ হইতে পারে এমন কার্য্য কোনো ছাত্র কখনো করে নাই। যাহারা বুদ্ধিমান ছিল না, যাহাদের বেশী দিন অধ্যয়নের সুবিধা হয় নাই, তাহাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যথা অনুভব করিতাম। উগ্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান ছাত্রদলের সম্বন্ধে অনেকের কাছে ঔদ্ধত্যের কথা শুনি, কিন্তু আমি এমন সরল, এমন তেজস্বী, এমন বিনয়ী ও ভক্তিমান আদর্শ ছাত্রের দল কোথাও দেখি নাই। আমার শাসন কঠিন-কঠোর ছিল।

আমি যে নিয়মানুবর্তিতা চাহিতাম—পাইতাম ততোধিক। তাহাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইতাম।

এত উৎকৃষ্ট এত প্রথিতযশা ছাত্র ঐ সময়ে স্কুল হইতে বাহির হইয়াছে যে, তাহাদের সংখ্যা কম নহে। তাহারা অতি উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাহাদের সেই বালকসুলভ সরলতা, বিশ্বাস ও ভক্তি আমাকে চঞ্চল করে। শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আমার হিতৈষী, অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সমপ্রাণ সুহকর্মী ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত বিভূতীপ শিরোমণির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে আমি বহু বন্ধু, বহু নিত্য-আশীর্ব্বাদক লাভ করিয়াছি।

অনেক কাব্যগ্রন্থই আমি মাধরুণে লিখি। যে ঘরে আমি থাকিতাম সে ঘরেই চারিটি ছাত্র উচ্চ স্বরে পাঠ করিত, কিন্তু তাহাতে আমার কবিতা লেখার কোনো বিঘ্নই হইত না—ইহা দেখিয়া আমার জনৈক ইংরাজ বন্ধু হাস্য করিয়া বলেন—"A privacy of glorious light is thine."

এইবার আমার কাব্য-জীবনের কথা বলি। আমি খুব কম বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। সুরপুরে আমার প্রথম প্রবেশ শঙ্খরব ও হুলুধ্বনির মধ্য দিয়া। বাল্যকালে ঐ দু'টি ধ্বনিই আমাকে আকৃষ্ট করে। ভোরে উঠিয়া গৃহ-পরিজনেরা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিতেন। তাহাতে একটি সুর ছিল তাহা বড় ভাল লাগিত। ভোরের টহল-গানে মনে এক আনন্দের সঞ্চার করিত। যাত্রা গান, কথকতা, পাঁচালী যেন মনে সুরের জাল বুনিত।

আমার প্রথম কবিতা পুস্তক 'শতদল' ১১০৬ কি ৭ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুসরণে সেখানি লিখিত। আমি চারি কপি বই একান্ত সঙ্কোচে ও শঙ্কায় চারি জন মনীষীকে উপহার পাঠাই। রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, ডাঃ দীনেশচন্দ্র ও অধ্যাপক ললিতকুমারকে। বইখানি ক্ষুদ্র, লেখক ততোধিক ক্ষুদ্র, অনেকে কোনো উত্তর দেন নাই। প্রথম প্রশংসা আসিল রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে। তিনি লিখিয়াছেন—'শতদলে'র এক একটি কবিতা এক একটি মধুক্রমের ন্যায় রসপূর্ণ, স্থানে স্থানে মৌমাছির হুলেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমি পত্র পাইয়া উল্লসিত হইলাম—মনে বেশ একটু অহঙ্কার আসিল—সমস্ত অবজ্ঞা ও অবহেলা ভুলিয়া গেলাম—আমাকে পায় কে? তার পরই আসিল আমার অধ্যাপক ললিতকুমারের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

ইহার পর-বৎসর বাহির হইল 'বনতুলসী'। বইখানির কেহ কেহ বেশ সুখ্যাতি করিল। সম্ভবতঃ ইহার দুই বৎসর পর আমার 'উজানি' প্রকাশিত হয়—কাব্যখানি আশাতিরিক্ত প্রশংসা অর্জন করিল। স্বর্গীয় মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার 'Hindu Review' নামক পত্রিকায় প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা করেন। অনামা কবির কবি নামে দাবীর চিঠি হিসাবে তাঁর দীর্ঘ সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

It is a very recent publication by a young Bengali poet Babu Kumudranjan Mallick. Bengalee literature is very rich in poetry. Babu Kumudranjan has I think very clearly established his right to an honoured place in this Temple of Fame. He has not given us many poems, but the few that he has given, have in them not merely a high promise but a very great fulfilment also in the realm of the poetic art. Poetry has been defined in our literature as রসাত্মকং বাক্যং—words the very soul of which are the human emotions. Judged by this definition Babu Kumudranjan's booklet deserves a very high place in our poetical literature. And the superiority of his poems lies especially in their homeliness and simplicity. He shows almost with a master's hand the simple grandeur of the inner soul of the unlettered Bengalee cultivator.

Almost each one of the picture that he has painted with such exquisite delicacy in this simple booklet is a revelation to me. Babu Kumadranjan has rendered a very signal service to his country and his generation by giving us these lovely studies of the beauty and grandeur of our village life and its associations, for it is these that must really form the plinth and foundations of our new and revived national life.

Ujanee is the name of a village in the Burdwan District. In naming his book after the village the author wants us evidently to know and love his village and all its simple folks. In fact he says in the short preface that most of the incidents related here are drawn from life "It is the petty history of our petty village. These are commonplace pictures of commonplace lives." The young poet says all this in a spirit of humility but nevertheless they are true. And to my mind this very commonplace character of the scenes and incidents that he has depicted with such exquisite skill, makes this book far more enjoyable and valuable than even the most attractive picture of our city flirtations.

In reading these poems one has the same sensation that the city-man living all his days in the close and dusty sheets of his town feels when after long months, he goes out for a week-end to the green fields and the wide waters and scents the mango blossoms and hears the chirping of the birds and the chorus of rushing streams. I do not want the author to write many books, for I believe that he who writes much must

write lies. But I do desire to see him as one of the greatest post of the New Renaissence in Bengal.

'উজানি' সম্বন্ধে 'প্রবাসী'ও খুব দীর্ঘ সমালোচনায় অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ আমার প্রত্যেক কাব্যেরই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়াছেন। একবার লিখিয়াছেন—"তোমার যে কবিতা যখন পড়ি, বিপুল আনন্দ পাই। তোমার কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অম্লান শোভায় চিরদিন বিরাজ করিবে।"

এই সকল প্রশংসা তখন খুবই ভাল লাগিত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, মহাকালের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে আমার কোনো কবিতাই টিকিবে কি না সন্দেহ।

'উজানি'র পর, 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'নূপুর', 'বারাবতী', 'অজয় ও স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, স্নেহ করিয়াছেন, কত পত্র দিয়াছেন, কত অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোৎস্নানাথের শুভবিবাহে যে আশীর্ব্বাদী কবিতা দেন, তাহা তাঁহার গভীর স্নেহের পরিচায়ক।

বর্ত্তমান সাহিত্যরথিগণের অধিকাংশই আমাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন। তাহা কেবল মৌখিক নহে একান্ত আন্তরিক, তাঁহাদের বচনে ব্যবহারে নিত্য তাহার প্রমাণ পাই—এ হিসাবে আমাকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। মোহিতলাল ও সজনীকান্তের কর্কশ ও দুর্ম্মুখ বলিয়া খ্যাতি আছে—কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহাদিগের নিকট পাইয়াছি কেবল ভক্তি, ভালবাসা এবং অকপট সৌহৃদ্য।

আমি এক জন নগণ্য পল্লীবাসী কিন্তু কতকগুলি আমার গোপন কথা আছে যাহা বলিবার সুযোগ হয় নাই, এখন না বলিলে আর বলিবার অবসর বোধ হয় হইবে না।

আমি জাম্মাণীর কাইজারকে অতিরিক্ত ভক্তি করিতাম, তাঁহার পরাজয়ে আমি এক মাস ধরে শয্যাগত ছিলাম। দ্বিতীয় জার্ম্মাণ যুদ্ধে আমি হিটলারের একান্ত অনুরাগী, তাঁহার পরাজয়ে আমি অবসন্ন হইয়াছিলাম, শ্বাসভঙ্গের উপক্রম হইয়াছিল—এ সবের কোনো কারণ বা যুক্তি নাই, স্বার্থেরও কোনো গন্ধ নাই।

নুরেনবার্গে সমরনায়কগণের বিচার ও ফাঁসি যেমন ঘৃণ্য তেমনি লোমহর্ষণকর। 'কাইটেলে'র পরিবর্ত্তে আমাকে ফাঁসি দিলে আমি আনন্দে সে দণ্ড গ্রহণ করিতাম; ইহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে—ইহাতে একটু অসরলতা নাই।

নন্দকুমারের ফাঁসি ও জোয়ান অফ আর্ককে অগ্নিতে দাহন ইংরাজ জাতির মহা পাপ ও মহা কলঙ্ক, উহা ঐ জাতিকে অভিশপ্ত করিয়াছে।

ইংরাজ জাতির দু'টি মেয়েকে আমি ভালবাসিয়াছি—একটি Wordsworth এর Lucy Grey আর অপরটি Dickens এর Little Nell.

আমার ধারণা ভারতবর্ষে বৃটিশদের মাত্র দুইটি স্থায়ী প্রতিনিধি থাকিবে, এক David Hare আর দ্বিতীয় Annie Besant.

ইংরাজদের মৃত কবি কিপলিং আর জীবিত বাক্য ও কর্ম্মবীর চার্চিলকে ভালবাসি; বৃটিশ সাম্রাজ্যের দু'টি Deep mouthed watch dog [illegible]। তীব্র অভিযোক্তা সার এলিজা ইম্পের প্রস্তর-মূর্ত্তি শুনিয়াছি হাইকোর্ট-ভবনে আছে—উহা আপত্তি ও লজ্জাজনক—এখনো কেন যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইল না তাহাই জিজ্ঞাস্য।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালকে আমার বড় ভাল লাগে, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা বা কার্য্যকুশলতার জন্য নহে। তিনি বালকসুলভ সরল স্বভাবের অধিকারী বলিয়া। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেলের মৃত্যুতে তাঁহার শিশুর মত ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কান্না আমাকে মোহিত করে—মুগ্ধ করে। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর এ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার মনে করি।

ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়—এ কথা আমি বাল্যকাল হইতে বিশ্বাস করি। ভারতবর্ষে হিন্দু হইয়া জন্মানো আমি বহু পুণ্যের ফল মনে করি। বহু দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম—

লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হই গো হিন্দু।

সোমনাথ সম্বন্ধে আমার মর্ম্মবেদনা আমি চক্ষের জলেও প্রকাশ করিতে পারি নে। তাঁহার কথা বলিতে আমি আত্মহারা হই। আমার দৃঢ় ধারণা, সোমনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দেশের গৌরবময় যুগের আরম্ভ হইবে। সমস্ত অশান্তি দূরীভূত হইবে ভারত অপরাজেয় হইবে।

কবিতা লেখা আমার সখ বা জীবিকা নহে. উহা আমার জীবন। উহাদের মধ্যেই আমার জীবনধারা প্রবাহিত। কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না—রূপ-গন্ধহীন হলেও উহারা বেদ-অজয়ের ফুল—আপনিই ফোটে, আমি গড়ি না—আর ও-সব ফুলই পল্লী-জননীর পূজার ফুল।

আমার পরিহাস-প্রিয় বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করেন আমি কিসের আশায় অজয়-কূলে বন্যাবিধ্বস্ত কুটীরে থাকি? আমি হাসিয়া বলি, 'আমি বড় দুরাকাঙ্ক্ষ। এই অজয়ের তীরে এক কবির গৃহে একছত্র কবিতা লিখিয়া দিতে ভগবান এসেছিলেন—আমিও অজয়-তীরে বাস করি, যা হোক কবিতাও লিখি, তার উপর আবার দীনও বটি—আমার কুটীরে দীনবন্ধুর আসার সম্ভাবনা ত কম নয়? এই লোভেই অজয়কে ছাড়তে পারি নে।

আমরা পল্লীবাসী; অপার্থিবকে লইয়াই আমাদের বড় কারবার—অজয়-কূলে দাঁড়িয়ে দেখি—

দগ্ধপণে হায় মরাল সম কয় যে দিনগুলি,
চক্রবালের অন্তরালে—শুভ্র পাল তুলি।
ইচ্ছা করে শুধাই ডাকি'
এ পথে আর ফিরবে না কি?
ভালবাসা—আলোর পাখী ভুল কর তুমি।

তারা আর ফেরে না—আমার আশাও অপূর্ণ রয়েই যায়। এদিকে যাবার সময় হয়ে আসছে। অনাগতের অমৃত ঢেউ আমার অন্তর-কোণে এসে লাগছে। আমার এখন মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা—ভগবানকে বলি—

সকল শক্তি ক্রমশঃ পেতেছে ক্ষয়,
এ ক্ষয়ে আমার আনন্দ উপজয়।
মোর দেহ-প্রাণ তোমার পূজায় লাগে
চরণ-সেবায় পূজনে অনুরাগে।
চাঁদের মতন আলো দিতে দিতে ক্ষয়,
ক্ষয়ী আমি ধীরে হইতেছি অক্ষয়।
আমার যা কিছু সবটুকু চন্দন,
সব দিয়ে আমি করি তব বন্দন।

ডিউক অফ উইণ্ডসরের পত্র

[ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ এ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভালবাসা সেই ত্যাগের প্রেরণা দিয়েছিল বলেই কি এ-যুগের রাজপুত্র রত্ন-সিংহাসন থেকে নেমে মানুষের মন-সিংহাসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন লাভ করেছেন? এই ছোট দলিলের মধ্যেই সেই ঐতিহাসিক মহিমার স্বাক্ষর আছে।]

সিংহাসন ত্যাগের দলিলনামা

আমি গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড ও সমুদ্রপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজা ও ভারতেশ্বর সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড এতদ্বারা আমার অলঙ্ঘ্য সংকল্পের কথা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ও আমার বংশধরগণ সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার এমত অভিপ্রায় যে এই মুহূর্তে সিংহাসন ত্যাগের দলিল যেন কার্যকরী করা হয়।

প্রমাণ স্বরূপ অদ্য উনিশ শো' ছত্রিশ সালের দশই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোল্লেখিত সাক্ষিগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

বেলভেডিয়ার দুর্গ — এডোয়ার্ড আর (এস)

অ্যালবার্ট

হেনরী

জর্জের

সম্মুখে স্বাক্ষরিত

[ডিউক অফ উইণ্ডসর যে দলিলনামায় সিংহাসন ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেন তাতে সাক্ষী হিসেবে সই করেছিলেন তাঁর তিন ভাই।]

লর্ড ওয়েলেসলীর পত্র

[কোম্পানী আমলে দেশীয় সংবাদপত্রে সংবাদ মন্তব্যাদি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্পর্কে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের ঘোষণার পরেও দেখা যায়, কতকগুলি পত্রিকা এ-বিষয়ে কোম্পানীর আদেশ যথাযথ পালন করিতেছেন না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০১ সালের ২২ মে, নূতন পত্রযোগে নিম্নলিখিত আদেশ জারী করেন।]

ফোর্ট উইলিয়াম,

পাবলিক ডিপার্টমেন্ট

২২ মে, ১৮০১

"কতকগুলি সংবাদ এবং মন্তব্য প্রকাশে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও সংবাদপত্রগুলি তাহাদের প্রকাশের পূর্ব্বে সরকারের চীফ সেক্রেটারীর অনুমোদন গ্রহণ করেন নাই। এখন হইতে এই নির্দ্দেশ দান করা হইতেছে যে, সরকারের চীফ সেক্রেটারীর, কিংবা তাঁহার অবর্তমানে সরকারের সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারীর অনুমোদন ব্যতীত কোনো সংবাদ, মন্তব্য এবং অন্যান্য কোনো কিছু প্রকাশ করা চলিবে না। এই সঙ্গে সংবাদপত্রগুলিকে ইহাও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কোনো দিন বেলা তিনটার পর সংবাদপত্রে প্রকাশের অনুমোদনের জন্য কোন কিছু সরকারী দপ্তরে প্রেরিত হইলে, পরদিনের পূর্ব্বে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে না।"

এই সময় বিবিধ প্রকার সামরিক সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার কারণেও কোম্পানী সরকার বিব্রত হইয়া পড়েন।
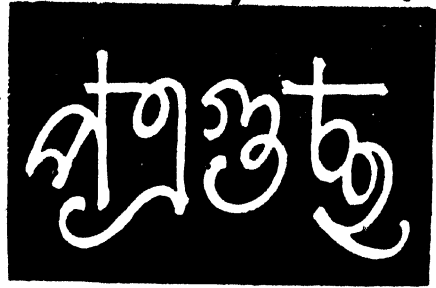
'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকাকে এ-বিষয়ে অধিকতর দোষী বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং সেই কারণে ১৮০১, ৪ঠা আগষ্ট উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে সামরিক বিভাগ হইতে পত্রযোগে জানানো হয় যে "সামরিক সংবাদাদি, গভর্ণর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতির সামরিক হুকুমনামা প্রভৃতি যেন কোনো ক্রমে প্রকাশিত করা না হয়। সরকারের সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত সামরিক সংবাদ সম্পর্কে এই আদেশের ব্যতিক্রম করা চলিবে।"

১৮০৭ সাল পর্য্যন্ত প্রায়ই নানা ভাবে নানা নির্দ্দেশ দান সরকারী মহল হইতে করা হইত। ১৮০৭ সালে সাধারণ সভা-সমিতিতে সরকারী কার্য্য এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের সমালোচনা সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষ অবহিত হইয়া উঠেন। কোর্ট উইলিয়ামের পাবলিক ডিপার্টমেন্ট হইতে এ-বিষয়ে ১৮০৭ সালের ১ই এপ্রিল নিম্নলিখিত নির্দ্দেশনামা জারি করা হইল। মাননীয় কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর ১৮০৬ সালের ২৩এ জুলাই-এর জেনারেল লেটার্স হইতে এই নূতন নির্দ্দেশনামার উদ্ভব হয়। গভর্ণর জেনারেলের নিকট এই আদেশ-পত্র প্রেরিত হয়:—

"এই পত্রযোগে আমরা এই নির্দ্দেশ এবং আদেশনামা জারী করিতেছি যে, সেরিফের মারফৎ সরকারী হুকুম না লইয়া কেহ কোনো প্রকার সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন না। সরকারী কর্ম্মচারী, বণিক সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী সংঘ, এবং দেশের জনসাধারণ সকলের সম্পর্কেই এ আদেশ সমভাবে প্রযুক্ত হইল। এ আদেশের কোনো ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা আমাদের সাতিশয় বিরক্তির কারণ হইবে: আমরা ইহাও নির্দ্দেশ দিতেছি যে, সভা আহ্বানের অনুমতি গ্রহণের সময় সভাতে আলোচিত হইবে এমন সকল বিষয়ের খসড়াও আপনার নিকট সভা আহ্বায়কদের দাখিল করিতে হইবে। সাধারণ সভাতে কি আলোচনা করিতে দেওয়া হইতে পারে, এবং কোন্ বিষয় সভাতে আলোচনার উপযুক্ত নহে, তাহা আপনার বিচার-বুদ্ধি এবং নির্দ্দেশের উপরই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিবে। সেরিফ, কিংবা অন্য যে ব্যক্তি সভাতে সভাপতিত্ব করিবেন, তিনিও কোনো ক্রমেই এমন কোন বিষয় সভাতে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হইতে দিবেন না, যাহার জন্য আপনার পূর্ব্ব-সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই, কিংবা যাহার আলোচনাতে আপনার আপত্তি আছে। আমরা এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখি যে, আমাদের ভারতস্থ সরকার আমাদের কর্ম্মচারীদের কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয় বাসিন্দাদের ন্যায়সঙ্গত সভা আহ্বানে এবং বিধিসঙ্গত বিষয়াদি আলোচনায় কোনো প্রকার অযথা বাধার সৃষ্টি করিবেন না।

মাননীয় গভর্ণর জেনারেলের অনুমত্যানুসারে এই পত্র প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইল।"

মেটকাফের পত্র

[১৮০৮ খৃঃ অব্দে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মেটকাফ লাহোরে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিখ জাতির বিষয় ইংরাজেরা কিছুই জানিতেন না। মেটকাফ পথেই পাঞ্জাব-কেশরী রণজিতের পত্রে অবগত হইলেন যে, কাসুরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। ১০ই সেপ্টেম্বর মেটকাফ কাসুরে পৌছিলেন। তৎপর দিবস রণজিতের প্রধান অমাত্য দুই সহস্র সৈন্য সহ মেটকাফের তাঁবুতে আসিয়া তাঁহাকে রণজিতের দরবারে লইয়া গেলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর মেটকাফ গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট লিখিলেন।]

"রণজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমাকে গ্রহণার্থ যে ছাউনি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সুপ্রশস্ত ছাউনির বাহিরে মহারাজ আমাকে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ আমাদিগের সন্তোষার্থ দরবারে চেয়ারের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সকল চেয়ার কতক তাঁহার নিজের ছিল, কতক আমাদের তাম্বু হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং আমাদের দৌত্যের লোকেরা সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ উপলক্ষে সাধারণতঃ যে সময় ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অধিকতর সময় ব্যাপিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। রাজা নিজে অধিক কথা বলিলেন না। তিনি নিজে যে দুই-চারিটি কথা বলিলেন, তন্মধ্যে দুইটা কথাই এই স্থানে উল্লেখের উপযুক্ত বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ তিনি লর্ড বাইকাউণ্ট লেকের মৃত্যুর কথা সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় এক জন সৈনিক পুরুষ বড় সহজে মিলিবে না। তিনি ভদ্রতা, বিনয়, কোমলতা, সহৃদয়তা এবং সাংগ্রামিক দক্ষতা প্রভৃতি সদ্গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। দ্বিতীয় কথাটি মহারাজ তাঁহার এক জন পরিষদের কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পরিষদ বলিলেন যে, ইংরাজগণ কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না। এই কথা শ্রবণে মহারাজ বলিলেন, তিনি বিলক্ষণ জানেন ইংরাজদিগের কথা "সর্ব্বব্যাপী"। ইহার পর পরস্পর উপহার প্রদত্ত ও গৃহীত হইল এবং সায়ংকালে এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার তাঁবুতে কামানধ্বনি হইল।"

রণজিৎ সিংহের পত্র

[মেটকাফ মনে করিলেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ হয়ত সত্বরই ইংরাজদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইবেন। কিন্তু ইহার পর-দিবসই মেটকাফ রণজিতের পত্রপ্রাপ্তে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।]

"পূর্ব্বে কখনও আমাকে কোন ঘটনা উপলক্ষে এক স্থানে এত দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হয় নাই। আমি কেবল মহামান্য কোম্পানী বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের বন্ধুতার অনুরোধেই এখানে এত দিন বিলম্ব করিয়াছি। কিন্তু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমাদের পরস্পরের সে বন্ধুতা লর্ড লেকের আগমনের সময় হইতে ক্রমেই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় আমার তাম্বু এত দিন এখানে ছিল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, আমার হৃদয়ের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন এবং আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

যদিও ঈদৃশ অল্পকাল স্থায়ী দর্শন-সম্ভাষণ দ্বারা বন্ধুতার শৃংখলাবদ্ধ হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তথাপি রাজকার্য্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুতরাং কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি সত্বরই সসৈন্যে গমন করিব। আমাদের জাতীয় লোকেরা শুক্লপক্ষের প্রথম দিবসকে শুভ যাত্রা বলিয়া মনে করেন। অতএব আমার এই পত্রের মর্ম্ম গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে জ্ঞাত করিবেন। আমি গমনার্থ উৎকণ্ঠিত আছি।"

লর্ড হেষ্টিংস্‌এর পত্র

[১৮১০ খৃঃ উইলিয়ম পামার সৈনিক বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া উইলিয়ম পামার কোম্পানী নামে হায়দ্রাবাদে এক বাণিজ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইঁহারা কার্পাস কাঠ এবং টাকা কর্জ্জের ব্যবসাও করিতেন। রামবোল্ড নামে এক জন ইংরেজ বন্ধু সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইলেন। হায়দ্রাবাদের তৎকালীন নিজামও পামার কোম্পানীর নিকট হইতে অত্যধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিতেন। তাহাতে নিজামের রাজ্যে নিদারুণ আর্থিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তৎকালীন রেসিডেণ্ট সরল হৃদয় মেটকাফ এই অন্যায় প্রশ্রয় দিতে সম্মত ছিলেন না। তাহাতে রামবোলড ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়া গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংসকে পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংস বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া মেটকাফকে নিম্নরূপ পত্র লিখিলেন।]

"আপনি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নিজামের নিমিত্ত আপনার প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহণার্থ জামিন হইবেন। এইরূপ প্রস্তাবে আমার সম্মতি প্রদানের পূর্ব্বে অনেকানেক বিষয় স্থির করিতে হইবে। অল্প কয়েক দিন হইল, স্বয়ং কোম্পানীর ছয় টাকা হারের সুদের দেনা পরিশোধার্থ চারি টাকা হারের সুদে দেনা করিবার উপকারিতা সম্বন্ধে আমার নিকট প্রস্তাব হইয়াছিল। আমি সে প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছি। যে সময় ঋণদাতাদিগের অন্যত্র মূলধন খাটাইবার সম্ভব থাকে না, তখন তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া ঋণ পরিশোধ করা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য।"

মেটকাফের পত্র

[গবর্ণর জেনেরেলের এই পত্রপ্রাপ্তির পর, মেটকাফ আবার গবর্ণর জেনেরেলের নিকট লিখিলেন]

"গবর্ণমেণ্ট পামার কোম্পানীর নিকট নিজামের ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ হইয়াছেন। আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট পামার কোম্পানীর নিকট আপন প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। নিজামের গবর্ণমেণ্টে অর্থাভাবে অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। ঈদৃশ অবস্থা প্রযুক্ত রাজ্যের রাজস্বও হ্রাস হইতেছে। প্রচলিত অবস্থা যে কেবল রাজস্ব হ্রাস নিবারণে অনুপযোগী, তাহা নহে। এই অবস্থা হইতে ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর দুরবস্থা সমুপস্থিত হইবে। নিজামের রাজকার্য্যে সুশৃংখলা প্রদান করিতে হইলে, নিজামের গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে এখন প্রাপ্য রাজস্বের দাবী পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ, দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশেষ আশা

হইতেছে যে, নিজাম, পামার কোম্পানীর সঙ্গে আপন প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। তাহা হইলে ক্রমেই পামার কোম্পানীর পাওনা টাকা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং অবশেষে পামার কোম্পানীর দাবী, নিজামের পরিশোধ করিবার ক্ষমতা অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে।

"নিজামের সঙ্গে পামার কোম্পানীর এই প্রকার কোন চুক্তি হয় নাই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে নিজামের ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকার থাকিবে না। ঈদৃশ চুক্তি থাকিলে পামার কোম্পানী ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিতেন এবং তদ্রূপ অবস্থায় আমিও পামার কোম্পানীর সম্মতি ভিন্ন এইরূপ প্রস্তাব করিতে সমর্থ হইতাম না। আমার প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পামার কোম্পানীর আপত্তি করিবার সাধ্য থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। তাঁহারা অনেক বার আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, নিজামের আপন ঘরাও তহবিল হইতে টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, তিনি এক দিনের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন, এবং এই উপায় অবলম্বন দ্বারা ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের (পামার কোম্পানীর) কোন প্রকার আপত্তি করিবার কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকার নাই। এখন পামার কোম্পানী আমার প্রস্তাবে কেবল এই বলিয়াই আপত্তি করেন যে, তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, নিজাম নিজের তহবিল হইতে কখনও টাকা দিতে সম্মত হইবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের কারবার দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার আশা ছিল। ঋণ আদায় সম্বন্ধে যে আমার প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের সদৃশ কোন প্রকার বন্দোবস্ত অবলম্বিত হইবে, তদ্রূপ আশঙ্কা তাহাদিগের কখনও ছিল না।"

হেষ্টিংসের পত্র

[গবর্ণর জেনেরেল মেটকাফের এই পত্রপ্রাপ্তির পর রামবোলড প্রভৃতির স্বার্থের অনুরোধে মেটকাফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন এবং অধিকন্তু বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি মেটকাফকে লিখিলেন]

কলিকাতা, ২৭শে আগষ্ট ১৮২১

"আমার প্রিয় মহাশয়,—সার উইলিয়ম রামবোলডের যে পত্র অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম, আপনি পামার কোম্পানীর কারবার সম্বন্ধে মনে মনে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন,—এইরূপ সংস্কার দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এবং রাজা চণ্ডুলালকে আপনি পদচ্যুত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ প্রবাদ হাইদ্রাবাদ সহরে প্রচার-নিবন্ধন পামার কোম্পানীর কারবারের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। পামার কোম্পানীর কারবারের সম্বন্ধে আপনার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইয়া থাকিলে, তদ্রূপ ভাব নিশ্চয়ই আপনার বৃথা কল্পনার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনি যখন বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার মনে প্রকৃত বিদ্বেষের ভাব থাকিলে যদ্রূপ অনিষ্ট হইত, যে সকল অবস্থা হইতে বণিক্‌দিগের (Shroffs) মনে ঈদৃশ সংস্কার হইয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারাও পামার কোম্পানীর তদ্রূপ অনিষ্ট হইতেছে, তখন আমার ন্যায় আপনাকেও নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্টানুভব করিতে হইবে।

"আমি আপনার নিকট অকপটে বলিতেছি,—আপনার কিছু অবিদিত নাই যে, নিজামের ঋণ পরিশোধার্থ কোন প্রস্তাব এখানে প্রেরিত হইলেই কৌনসিলে তাহা লইয়া ঘোর তর্ক-বিতর্ক হয়। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে গোপনে আমার মতামত গ্রহণ না করিয়া, আপনি যে একেবারে প্রকাশ্য ভাবে (Officially) এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমার প্রতি আপনার অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। আপনি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারেন যে, আমার কোন বিশেষ কর্ত্তব্যজ্ঞান কিংবা কোন বিশেষ রাজনৈতিক অভিপ্রায় নিবন্ধন যদি আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানে অসমর্থ হইয়া পড়ি, তবে এই বিষয় সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক কোর্ট অব ডিরেকটরের মনে বৃথা সংস্কার হইবার যে সকল সম্ভব রহিয়াছে, তাহা নহে, এইরূপ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ কতকটা সংস্কার এখনও তাঁহাদিগের আছে।

"আমি মনে করি যে, নিজামের ঋণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূ হইবার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন, সে প্রস্তাব কোর্ট অব ডিরেক্টরের ঈদৃশ ঘটনা সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ এবং ন্যায়ানুগত সুবিধার বিরুদ্ধ। কিন্তু এই প্রস্তাব এইরূপ অসঙ্গত হইলেও এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারে তর্ক-বিতর্ক হইবার সম্ভব রহিয়াছে।

"উপরোক্ত বিষয় অপেক্ষা আরও একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমাকে লিখিতে হইল। রাজা চণ্ডুলালের সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচার হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আপনি সময়ে সময়ে যদ্রূপ নীচ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া আমি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আমি একটি দিবসও বিলম্ব না করিয়া আপনাকে লিখিতেছি যে, রাজা চণ্ডুলালকে সমর্থন করিব বলিয়া আমি স্বয়ং প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমর্থন-প্রাপ্ত হইবার ভরসা না থাকিলে তিনি আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন না। গবর্ণর জেনারেল এবং কৌনসিল তাঁহাকে সমর্থন করিবেন বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব রাজা চণ্ডুলালকে এই প্রকার সমর্থ করিবার নিমিত্ত যখন আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইল—আপনার কোন কার্য্য দ্বারা এই অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা হইলে, আপনার সে সকল কার্য্য যে গবর্ণমেণ্ট নিজের কার্য্য বলিয়া শুদ্ধ কেবল অস্বীকার করিবেন, তাহা নহে, আপনার তদ্রূপ কার্য্য-কলাপ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে রহিত করিবেন।

আপনার অত্যন্ত বাধ্য এবং বিনীত দাস
হেষ্টিংস্।

মেটকাফের পত্র

[কর্ণেল জন্ ম্যালকম, মারকুইস ওয়েলেস্‌লির এক জন বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ের সহিতই ম্যালকমের সংস্রব ছিল। জন্ ম্যালকম্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। এই সম্বন্ধে ম্যালকমের মতের সঙ্গে মেটকাফের ঐক্য ছিল না।

মেটকাফের বাল্য-শিক্ষক ইটন কলেজের অধ্যাপক গুডাল সাহেবকে তিনি নিম্ন চিঠিখানি লিখেন]

"মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ম্যালকমের বক্তৃতা (১৮২৩ খৃঃ) আমার ভাল লাগিয়াছে। এই বিষয়ে আমি কোন দৃঢ় মত পোষণ করি না। যে পক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের কেবল উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার সকল বিষয়ে ঐক্য হয় না। আর যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে বিপদাশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গেও আমার ঐক্য হয় না। আমি মনে করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে এখন কিছু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক লাভ হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান আমাদের রাজত্বের চিরস্থায়িত্বের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু চরমে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে।

"ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের এইমাত্র প্রকৃত বিপদাশঙ্কা যে, এতদ্দ্বারা ভারতবাসিগণ কালে আমাদের অধীনতার শৃংখল হইতে নির্মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন। গবর্ণমেন্টের যে এতদ্দ্বারা একটু অসুবিধা হয়, তাহা আমি অতি ক্ষুদ্র অসুবিধা বলিয়া মনে করি। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের বিশেষ উপকারিতা রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা সুশিক্ষা এবং জ্ঞান বিস্তার হইবে। সুতরাং কোন প্রকার সাময়িক এবং স্বার্থপর অভিপ্রায়ের অনুরোধে সুশিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের পথ অবরোধ করা যার পর নাই অন্যায়। আমি দেশের রাজা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতাম।"

মেটকাফের পত্র

[কলিকাতাবাসিগণ সার চার্লস্ মেটকাফকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা (Liberator of the Indian Press) সম্বোধনে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। সার চার্লস্ মেটকাফ জনসাধারণের সেই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিলেন]

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে, এই দেশীয় লোকের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার হইবে এবং জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা ইংরাজ-রাজত্বের ভাবী অমঙ্গল হইবার সম্ভব রহিয়াছে—এই যদি তাঁহাদিগের (মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের বিরোধীদিগের) আপত্তি হয়, আমি তাঁহাদিগের এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা ইংরাজ-রাজত্ব বিনষ্ট হইলেও, আমাদিগকে কর্ত্তব্যানুরোধে এই দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞান-শিক্ষার ফল প্রদান করিতে হইবে। যদি ভারতবাসী লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব সংরক্ষণ করিতে হয়, তবে ভারত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের একমাত্র অভিসম্পাত (curse) স্বরূপ মনে করিতে হইবে, এবং তদ্রূপ অবস্থায় এই সাম্রাজ্য শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হইলেই মঙ্গল। কিন্তু আমার অনুভব হয় যে, অজ্ঞানতা হইতেই রাজ্য বিনাশের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আশঙ্কা রহিয়াছে। জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা ইংরাজ-রাজত্ব আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। জ্ঞানবিস্তার দ্বারা কুসংস্কার দূরীভূত হইবে, লোকের মনের কঠিন ভাব বিগলিত হইবে এবং আমাদের শাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে যুক্তিমূলক বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে।

"জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা রাজা-প্রজা, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ করিবে। পরস্পরের মধ্যে এখন যে অনৈক্যের ভাব রহিয়াছে, তাহা ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

"ভবিষ্যতে এই রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যেরূপ অভিপ্রায়ই হউক না, যত দিন এ রাজ্যের ভার আমাদিগের হস্তে থাকিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সাধ্যানুসারে দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার এবং জ্ঞানোন্নতি সাধনই আমাদের কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে কেবল এই দেশের রাজস্ব আদায় এবং কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রদান করিতে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে,—আমরা বিবিধ মহান্ এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনার্থ এ দেশে প্রেরিত হইয়াছি। এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিল্প এবং দর্শন ইত্যাদি বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা সমুন্নত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এই কর্ত্তব্য সাধনের সম্ভব নাই।"

লর্ড বিশপ ডানিয়েল উইলসনের পত্র

[১৮২৩ খৃঃ অব্দে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন প্রণেতা জন আডামের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার লর্ড বিশপ ডানিয়াল উইলসন সাহেব মেটকাফের বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন।]

মঙ্গলবার, ৮ ঘটিকা

"প্রিয় সার চার্লস্,

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় অভিনন্দন উপলক্ষে আপনার প্রত্যুত্তর আমাকে যেরূপ সন্তোষ প্রদান করিয়াছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি করুন। আপনাকে আমি এখন যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, লর্ড উইলিয়মের লেখনী হইতে ঈদৃশ প্রত্যুত্তর বাহির হইলে তাঁহাকেও উহাই বলিতাম। আপনার প্রত্যুত্তরের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের করুণা স্বীকার—যে উদ্দেশ্যে ভারত সাম্রাজ্য আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত সমুল্লেখ—জ্ঞান-বিস্তারের আবশ্যকতা—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কোন প্রকার অপব্যবহার না হয়, তজ্জন্য সতর্ক করা—জন আডামের সমর্থন—এই সমুদয় বিষয় আমি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি।

"আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমাকে গোঁড় রাজপক্ষ (Rank Tory) বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সভ্যতা, উন্নতি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদায়ক বিষয়ের দিকে প্রেমের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

"আপনি যদি গবর্ণর জেনারেলের পদাভিষিক্ত থাকেন, তবে আপনার অধীনে আমি বোধ হয় বিশেষ সুবিধা সহকারে কাজ করিতে পারিব।"

মুখভঙ্গী

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

(প্রথম পুরস্কার)
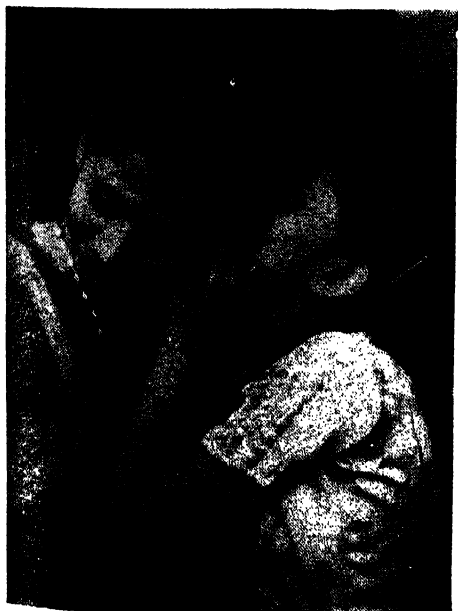
কানে কানে কি বলছে বলুন তো ?

(উত্তর পরের পৃষ্ঠায়)

—নমিতা রায়

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

॥ উত্তর ॥

[মেয়েটি তার দিদিকে বলছে যে, এই নববর্ষে তাকে যেন এক বছরের জন্য মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা ক'রে দেওয়া হয়।]

জল-কল্লোল

— নিখিল মুখোপাধ্যায়
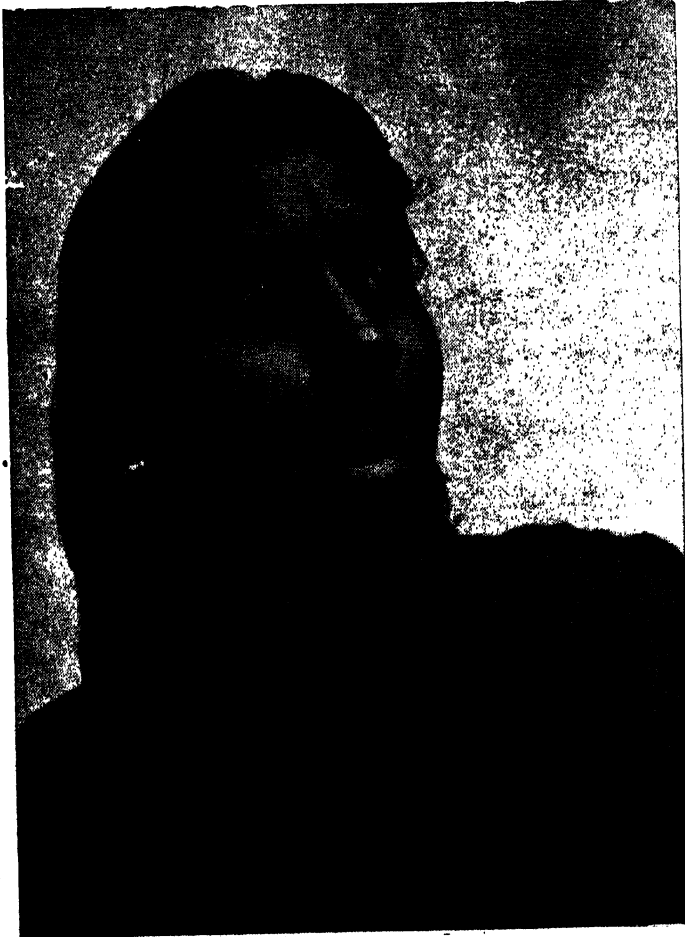
মুখভঙ্গী

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

(তৃতীয় পুরস্কার)
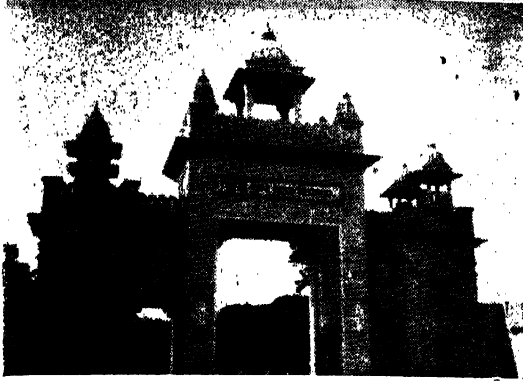
কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

—বি, চক্রবর্ত্তী (রাজসাহী)

—জেনে রাখুন—

[ছবি পাঠাবার সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা এবং ছবির বিষয়বস্তু স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। ছবি ফেরৎ নেওয়ার জন্য যথাযোগ্য ডাকটিকিট দিতে হবে। নেগেটিভ পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।]

প্রকৃতি

—জয়দেব গুপ্ত

—— আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা ——

বিষয়

সূর্য্যোদয়

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲

তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

॥ ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ১৮ই বৈশাখ ॥

বৈদ্যুতিক

—অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় (বজবজ)

মুসলিম স্থপতি

—সুনীলকুমার গুপ্ত

জেন অস্টিনের
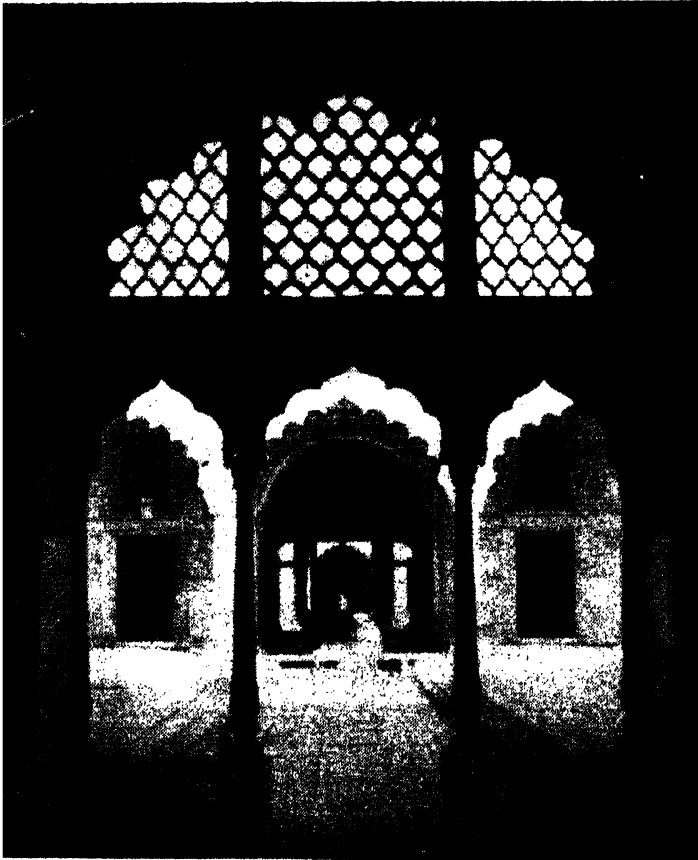
['জগতের সমস্ত মহিলার মধ্যে আমিই সর্বাধিক বিদ্যাহীনা যিনি লেখিকা হওয়ায় সাহসিনী হয়েছিলেন—পরিণত বয়সে লিখেছিলেন জেন অস্টিন। বস্তুতঃ ইস্কুলে পড়া তাঁর ন'বছরের পর আর ঘটেনি। বাকী সব কিছু বিদ্যালাভ গৃহে তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে। অথচ কিশোরী বয়স থেকেই জেনের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক। বন্ধুদের আনন্দের জন্ত তিনি পরিহাস-বিজড়িত গল্প-কবিতা রচনা করতেন। সতেরো শ' পঁচাত্তর সালে জন্ম অস্টিনের। বাপ শাস্ত্র অধ্যয়নরত মানুষ, মা আনন্দময়ী সুগৃহিণী। দুই জনেরই চরিত্রের গুণপণা কন্যায় বর্তে ছিল। ভাই-বোনদের সঙ্গে জেন বাস করতেন তাঁদের পল্লীগৃহে। পল্লী ছিল তাঁর প্রিয়। সহরের ধূলা আর ঝকঝকে আলো তাঁর মনকে সহজেই ক্লান্ত করে তুলত। তরুণ বয়সে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা এসেছিল তাঁরও জীবনে, কিন্তু নানা কারণে প্রেম তাঁর জীবনকে গার্হস্থ্যে সার্থক করেনি। সাহিত্যিক হবার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর সার্থক হয়নি। কিন্তু যেদিন সে এসেছিল, সেদিন মানুষের কাছ থেকে তিনি দুই হাত ভরে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। আর সে সম্মান তাঁকে দিয়েছিল "প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস"। এইটিই তাঁর সর্বাধিক প্রিয় রচনা। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে শ্রীমতী অস্টিন দেহত্যাগ করেন। বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মন জেন অস্টিন অবশ্যই জয় করবেন তাঁর দরদ ও আঙ্গিক-পূর্ণ এই রচনায়।—অনুবাদক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাৎসরিক মোটা আয় যার বাঁধা তেমন একলা মানুষের যে একটি স্ত্রীর অভাব থাকবে এ কথা সবাই বলে।

তেমন কোন মানুষ যখন পাড়ায় এসে বাস সুরু করে, তার মনোবাঞ্ছা যা-ই থাক না কেন, পাড়ার পাঁচটি পরিবার মনে করে যে, মানুষটি তাদেরই সম্পত্তি অর্থাৎ তাদেরই কারুর না কারুর অনূঢ়া মেয়ের বর হবে সে।

স্ত্রী এক দিন বললেন—'ওগো শুনছ, নেদারফিল্ড পার্কে না কি শেষ অবধি ভাড়াটে এলো।'

বেনেট মাথা নেড়ে জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ গো, মিসেস্ লং এসেছিলেন এখুনি। তার মুখেই শুনলাম।'

স্বামীর সাড়া পাওয়া গেল না দেখে অধীর কণ্ঠে বললেন বেনেট গিন্নী, 'কিন্তু কে ভাড়া নিল তা জিজ্ঞেস করলে না তো?'

'বলতে ইচ্ছে হয় বলো না। আমার শুনতে আপত্তি নেই।'

ঐটুকু সাড়াই যথেষ্ট। 'উত্তর ইংল্যাণ্ডের এক অল্পবয়সী ছেলে না কি ভাড়া নিয়েছে বাড়ীটা। মস্ত সম্পত্তির মালিক। গত সোমবার চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে দেখতে এসে ভারী পছন্দ হয়ে যায়। তখুনি কথাবার্তা সব ঠিকঠাক। পর্বের আগেই না কি এসে উঠবে এখানে। চাকর-বাকর ত শুনছি আগামী হপ্তায় এসে পড়ছে সব।'

'লোকটির নাম শুনেছ কিছু?'

'বিংলে।'

'একলা না স্বামি-স্ত্রী দু'জনে।'

'ওমা, একলা মানুষ। বছরে চার-পাঁচ হাজার বাঁধা আয়। আমাদের মেয়েগুলোর একটা কিছু হিল্লে হবে মনে হয়।'

'সে কি? তার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধ কি?'

'কি যে তুমি বলো বুঝি না বাপু। আমার একটি মেয়ে আমি ওর হাতে দেবই।'

'সেই ইচ্ছেতেই বুঝি এখানে এসে বাসা করল ছোকরা?'

'তার আবার ইচ্ছে কি গো। না, তুমি যে কি সব ছাই-ভস্ম বলো। আমি ভাবছি এমনও ত হতে পারে, ছেলেটি আমারই কোন মেয়ের সঙ্গে ভালবাসায় পড়বে। তুমি বাপু সে এলেই একবার গিয়ে আলাপ করে আসবে।'

'আমার সে হয়ে উঠবে না। বরং তোমরাই এক দিন গিয়ে আলাপ করে এসো। তার চেয়ে মেয়েদেরই একলা পাঠিয়ো বরং, তাতে ফল হবে আরো ভালো। নইলে তুমি সঙ্গে গেলে, সে আর তোমার মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

'কি যে বলো তুমি। ছিল বটে এক দিন যখন রূপের দম্ভ আমিও করতাম। কিন্তু এখন আর নয়। পাঁচটি সোমত্থ বয়সের মেয়ে যার, তার কি আর নিজের রূপের হিসেব-নিকেশ করা মানায় না ভালো দেখায়।'

'সে সত্যি, যে সব মায়েদের রূপ নেই, তাদের। তোমার বেলা তা খাটে না।'

'কিন্তু তুমি বাপু একবার তাড়াতাড়ি গিয়ে আলাপ করে আসবে।'

'আমার কাজ-কর্মের ভীড়ে সে হয়ে উঠবে না, আমি বলেই রাখছি।'

'মেয়েদের দিকটা একবার ভাবো তুমি বাপ হয়ে। যে মেয়ে তার হাতে পড়বে, তার সৌভাগ্যটা একবার ভেবে দেখো। স্যার উইলিয়াম লেডি লুক্স ঐ একই কারণে যাবেন। অথচ তাঁরা নতুন প্রতিবেশীদের খবরই রাখেন না। না, না, তুমি না গেলে আমাদের যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

'তোমার এত লজ্জা কিসের বলো ত? বলছি তোমায় দেখে সে খুব খুসী হবে। তা ছাড়া তোমার হাতে আমি একখানা হাত-চিঠিতে লিখে দেবো'খন যে, আমার যে কোন একটি মেয়েকে সে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে। অবশ্য আমার উপদেশ, যেন সে লিজিকেই ভালো করে বিবেচনা করে দেখে।'

'অমন কাজও কোরো না। লিজি আমার অন্য মেয়ের চেয়ে কিসে ভালো শুনি? জেন আমার রূপে তার চেয়ে ঢের ভাল। তোমার আদুরে লিজির চেয়ে লিডিয়া আমার ঢের হাসি-খুশী মেয়ে। তোমার ঐ বাপ-সোহাগী মেয়ে লিজি।'

'লিজিই যা কিছু আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে। আর বাকী সব মেয়ে তোমার বোকা-বোকা। তাদের সম্বন্ধে লোককে বলা চলে না।'

'কি করে নিজের মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি অমন কথা বলতে পারো বলো ত? আমায় রাগিয়ে তুমি ভারী মজা পাও, না? আমার দুর্বল স্নায়ুর উপর তোমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই।'

'সে কি? তোমার ঐ স্নায়ু আমার কত দিনের সুহৃদ। কম পক্ষে কুড়ি বছর আমি তাদের নিয়ে ঘর করছি।'

'কিন্তু আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না।'

'ও কিছু নয়। এ পাড়ায় আরো কত চার-হাজারী জামাই আসবে, তুমি সব দেখবে গো দেখবে।'

'অমন বিশ জন এলেই বা আমার কি? তুমি ত আর তাদের কাছে ঘেঁসবে না।'

'আচ্ছা, বেশ। কুড়ি জন হোক, আমি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা করে আসব।'

মানুষটির কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে গুরু-লঘুর এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ যে, তেইশ বছর ঘর করার পরও স্ত্রী আজো তাকে সম্পূর্ণ জানতে পারেননি। আর গৃহিণীর মেজাজের স্থিরতা নেই। খুচরো খবর আর অল্প বুদ্ধিতে তাই নিয়ে নাড়া-চাড়া করে তাঁর দিন কাটে। যখন মেজাজ ভাল থাকে না, তখন স্নায়ুচ্যুতি ঘটে। অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর একমাত্র কামনা-বাসনা মেয়েগুলিকে ভালো ঘর-বরে দেবেন। সেই নিয়ে যত খবরাখবর, তাই তাঁর মনের খোরাক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিংলের সঙ্গে গোড়ার দিকে যারা গিয়ে আলাপ করলেন বেনেট তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যাবার পুরো ইচ্ছে নিয়েই তিনি স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে নিরাশ করে এসেছিলেন এ ক'দিন। যেদিন সকালে দেখা-শুনা হোলো সেদিন সন্ধ্যা-বেলাতেও স্ত্রী এ সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারেননি। সন্ধ্যা-বেলা মেজো মেয়ে লিজি একটা টুপি নিয়ে টুকিটাকি করছিল, এমন সময় তাকেই লক্ষ্য করে পিতা বললেন—'সুন্দর হয়েছে, বিংলে পছন্দ করবে নিশ্চয়ই।'

স্ত্রী সন্তপ্ত কণ্ঠে বললেন—'তার ভালো লাগা না লাগা আমরা জানব কি করে, আমাদের ত আর যাওয়াই ঘটে উঠবে না।'

এলিজাবেথ মাকে বললে—'কেন মা! এখানে-ওখানে দেখা ত হবেই। তা ছাড়া মিসেস্ লং ত নিজে বলেছেন আমাদের পরিচিত করিয়ে দেবেন।'

মিসেস্ লংকে আমি বিশ্বাস করি না। ওর নিজেরই দু'টি মেয়ে রয়েছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। এমন স্বার্থপর মেয়েমানুষ কে দেখেছে?'

'আমারও বিশ্বাস তাই'—বললেন বেনেট—'তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। এ বোধোদয় হয়েছে তোমার দেখে খুসী হলাম।'

কি জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে গৃহিণী এক মেয়েকে ভর্ৎসনা করতে সুরু করলেন—'অমন করে কাশছিস কেন তুই? আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যেন! একটু মায়া হয় না তোদের আমার ওপর?'

'কিটি কি আর ইচ্ছে করে কাশছে। ওর সবই একটু বে-টাইম।' বললেন বেনেট।

কিটি রাগত স্বরে বোনকে বললে—'নাচ কবে হবে লিজি?'

'এসে ত পড়ল।'

মা বললেন—'তবেই হয়েছে। মিসেস্ লং তার আগের দিনও এসে পৌঁছবেন না। সুতরাং নিজেই চিনবেন না তাকে, আমাদের আর পরিচিত করিয়ে দেবেন কেমন করে?'

'সে ত আরো ভালো হল। বরং তুমিই না হয় তার সঙ্গে বিংলের পরিচয় করিয়ে দিও।'

'সে কি করে হয়? তুমি আর আমায় জ্বালিও না বাপু!'

'সে কথা সত্যি। এক পক্ষকালের পরিচয়ে মানুষ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানা সম্ভব। যাই হোক, তুমি নিজে যদি সাহসী না হও, অন্য কাউকে সে দায়িত্ব নিতেই হবে। মিসেস্ লং তার ভাইঝিদের জন্য চেষ্টা ত করবেনই। যাই হোক, তোমার জায়গায় আমিই না হয় সে দায়িত্ব নিলাম।'

'কি তুমি বলছ বাবা? কি বলছ?'

'এতে এত ভাবনার কি আছে তোমাদের? তুমিই বলো ত মা মেরী। তুমি ত অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তুমিই বলো মা।'

মেরী কি বলবে ভাবছিল, এমন সময় বেনেট আবার বললেন—'আচ্ছা, মেরী ততক্ষণ ভাবুক। আমরা বেংলের কথায় ফিরে আসি।'

'আমি আর শুনতে পারি না বাপু তোমার কথা।'

'সে কি গো। আগে আমায় তোমার বলা উচিত ছিল। অন্ততঃ এ কথা জানলে আমি সকালে তার কাছে ছুটোছুটি করতাম না। যাক্, আলাপ যখন হয়ে গেছে, তখন তার বোঝাও বইতে হবে আমাদের।'

এই আকস্মিক ঘোষণায় মেয়েদের মহলে যে কী বিস্ময়ের বন্যা বইল তা অনুমেয়। বিশেষ করে গৃহিণীর আনন্দের আর পরিসীমা রইল না। তিনি এমন ভাব দেখালেন, যেন এই রকমটাই তিনি আশা করছিলেন ক'দিন থেকে।

'আমি জানতাম যে তুমি যাবেই। তোমায় আমি বোঝাতে পারব এ বিশ্বাস আমার বরাবরই ছিল। নিজের মেয়েদের ভালো-মন্দ বাপ হয়ে তুমি ত বুঝবেই। এমন খুশী হয়েছি সত্যি। আর সকাল বেলা দেখা করে এসে দিব্যি চুপ-চাপ আছ, ভারী মজার লোক কিন্তু তুমি?'

স্ত্রীর আনন্দ দেখে বেনেট কক্ষত্যাগ করলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন—'মা কিটি, এবার যত খুসী কাশতে পারো তুমি, জানো।'

'অমন বাপ পেয়েছ তোমরা, এর জন্তে নিজেদের ভাগ্যবতী মনে করা উচিত তোমাদের। ওঁর প্রতি কি করে যে তোমরা কৃতজ্ঞতা দেখাবে তাই ভাবি আমি। আমাদের এই বয়সে আর নতুন করে আলাপ-পরিচয় করা যে কত কষ্ট তা বুঝবে না তোমরা, কিন্তু তাও আমাদের করতেই হবে। লিডিয়া, মা, তুমি সব থেকে কনিষ্ঠা, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে নাচতে চাইবেই।'

লিডিয়া সাহসের সঙ্গে বললে—'তাতে আমি ভয় পাই না। সবার ছোট বটে, কিন্তু আমি দিদিদের চেয়েও লম্বা মাথায়।'

বাকী সন্ধ্যাটুকু বিংলের আলোচনাতেই কাটল। কবে নাগাদ সে লোকটি এসে পরিচয়ের প্রত্যুত্তর দেবেন। কবে তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ মেয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিসেস্ বেনেট স্বামীকে কত রকম করে প্রশ্ন করলেন মানুষটির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কিছু জানবার জন্তে। কত তীক্ষ্ণ সোজা প্রশ্ন। কত অনুমান। কত পূর্ব-সিদ্ধান্ত। কিন্তু স্বামী তার উত্তরে এমন রহস্তময় রইলেন যে অবশেষে লেডি থুকাসের শোনা গল্পের উপরেই তাদের নির্ভর করে থাকতে হোল। মানুষটি না কি অতি সুপুরুষ। অতি সুভাষ। আগামী নাচের উৎসবে সে না কি সদলে আসবে। এর চেয়ে আনন্দের সন্দেশ আর কিছু নেই। যে লোক নৃত্যপ্রিয়, সে সহজেই প্রেমিক। সুতরাং আশা হোল।

'নেদারফিল্ড পার্কে কোন একটি মেয়েকে গৃহিণী করতে পারলে ভারী সুখী হব। আর বাকী মেয়েগুলিকেও অমনি ভাবে ঘর করতে দেখলে।' বললেন স্বামীকে বেনেট-গৃহিণী।

কয়েক দিনের মধ্যে বিংলে এক দিন এসে লাইব্রেরী-ঘরে বেনেটের সঙ্গে মিনিট দশেক কাটিয়ে গেলেন। এ-বাড়ীর মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্য্যের কথা আগেই শোনা ছিল তার। তাই মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার উচ্চাশা নিয়েই এসেছিল সে। কিন্তু কন্যাগুলির পিতার সঙ্গেই পরিচিত হয়ে সেদিন ফিরতে হল তাকে। বরং মেয়েরাই ভাগ্যবতী বলতে হবে। উপরের জানলা থেকে তারা দেখলে কৃষ্ণকায় ঘোটক থেকে নামল একটি নীল কোট-পরিহিত লোক। কিন্তু ঐ অবধি।

এর পর আমন্ত্রণ-লিপি গেল। মিসেস্ বেনেট সেই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উদ্যোগ-পর্ব সারছেন, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিংলে পরদিনই সহরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, সুতরাং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ কি রকম মানুষ! এসে বসতে না বসতেই যদি সহরে যাবার তাড়া পড়ে অনবরত। মিস্ বেনেট মনে মনে আশঙ্কা করলেন, হয়ত বা লোকটি কোন জায়গায় স্থায়ী ভাবে বাস করতে পারে না। কিন্তু লেডি লুকাস তার ভুল ভাঙলেন। বিংলে সহরে গেছে, সেখান থেকে সদলে ফিরে নৃত্যোৎসবে যোগ দেবার জন্তে। তার সঙ্গে না কি আসবে বারোটি সুন্দরী মহিলা সহ সাত জন পুরুষ। এতগুলি মেয়ে আসার কথায় মেয়েরা সকলেই মর্মাহত হয়েছিল, কিন্তু যখন শোনা গেল যে, লণ্ডন থেকে তার সঙ্গে এসেছে মাত্র ছ'টি মেয়ে, তখন তারা অনেক আশ্বস্ত হোল। মেয়েগুলির মধ্যে পাঁচটি বিংলের ভগিনী আর একটি দূর-সম্পর্কীয় বোন। নাচ-ঘরে যখন তাঁরা উপস্থিত হলেন তখন বিংলের সঙ্গে তার দু'টি ভগিনী, বড় বোনের স্বামী আর একটি যুবক।

সুশ্রী সজ্জন নিরহংকার মানুষটি। বোন দু'টিও চমৎকার। ভগিনীপতি লোকটিও সুন্দর। কিন্তু নাচ-ঘরে প্রবেশের পরই যে দীর্ঘাঙ্গ সুদর্শন তরুণ যুবকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হোল বিংলের বন্ধু। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সারা ঘরে কানাকানি হোল যে, এই লোকটির বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ দশ হাজার। উপস্থিত পুরুষদের মতে যুবকটি রূপবান, কিন্তু মেয়েদের চোখে তাকে বিংলের চেয়েও সুন্দরতর ঠেকল। উৎসবের প্রথমার্দ্ধে এই লোকটিকে নিয়েই গুঞ্জন চলল অবিরাম। কিন্তু তার আচরণে শেষের দিকে সকলেই বেশ বিরক্ত বোধ করলেন। সবাই দেখলেন যে, লোকটির ভিতরে একটি অহঙ্কারী মানুষ সদম্ভে আত্মঘোষণা করে চলেছে, কিছুতেই তার তুষ্টি নেই, সে যেন সব কিছুরই উপরে। তখন আর দশ-হাজারী সম্পত্তির জৌলুষ তাকে বন্ধু বিংলের চেয়ে প্রিয়তর করতে পারলে না সমাজে।

বিংলে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠল এখানে। তার উন্মুক্ত হৃদয়ের স্বতঃপ্রবাহে, তার নৃত্য-বিলাসে সবাই খুসী হোল। এত তাড়াতাড়ি নাচ-ঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার ক্ষোভের অন্ত রইল না। যাবার সময় সে নিজের বাড়ীতে এক দিন নাচের মজলিসের কথাও উল্লেখ করলে। দুই বন্ধুর এই আপাত-বৈষম্য অতি সহজেই চোখে পড়ল সকলের। বন্ধু ডারসি সারা সন্ধ্যায় দু'বার নাচলে, তাও বিংলের দুই বোনের সঙ্গে। অন্ত কোন মহিলার সঙ্গে আলাপিত হতে অবধি সে সম্মত হোল না। বাক্যালাপ যা-কিছু হোল তাও ঐ পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই। তার এই দাম্ভিকতায় মানুষটির প্রতি এক তিক্ততা বোধ হোল সকলের মনে, সে যেন আর কোন সভায় না আসে এ রকম মত শোনা গেল। তাঁরই এক মেয়েকে অবহেলা করার অপরাধে মিসেস্ বেনেটের আক্রোশ অতি প্রবল আকার ধারণ করল।

পুরুষদের সংখ্যাল্পতার দরুণ এলিজাবেথকে দু'টি নাচের সময় বিশ্রাম নিতে হোল। এই রকম একবার বসে সে দুই বন্ধুর কথাবার্তার টুকরো শুনতে পেল। বিংলে বন্ধুকে নাচে যোগ দেবার জন্তে পীড়াপীড়ি করে বললে—'এসো ডারসি। এ ভাবে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে আনাড়ির মতো, সে হবে না। তার চেয়ে নাচে যোগ দাও।'

'সে হবে না' বললে ডারসি—'তুমি জানো, পার্টনারের সঙ্গে পরিচয় না। থাকলে আমার নাচতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া এ রকম সমাজে সে ব্যবস্থা অচল হবে। তোমার দু'টি বোনই ব্যস্ত হয়ে আছে, আর এ ঘরে তৃতীয় কোন মহিলা চোখে পড়ছে না যার সঙ্গে নাচা শাস্তি মনে হবে না?'

'তোমার বাড়াবাড়ির সীমা নেই। খুব কম নাচের মজলিসেই

এতগুলি সুন্দরী মেয়ের সাক্ষাৎ মেলে। কতগুলিকে অপূর্ব সুন্দরী ঠেকছে আমার চোখে।'

'এ ঘরের একমাত্র তিলোত্তমাটির সঙ্গেই ত তুমি নাচছিলে'—বলে ডারসি বেনেটদের বড়ো মেয়েটির দিকে দেখালে।

'সত্যি, অমন সুন্দরী আগে আমার চোখে পড়েনি কখনো। কিন্তু তোমার পিছনেই তার যে বোনটি বসে আছে সেও কম নয়। বলো ত আমার পার্টনারকে বলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

'কি যে বলছ'—একবার মুখ ঘুরিয়ে এক ঝলকে এলিজাবেথের চোখে চোখ রেখে শীতল ভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললে ডারসি—'মন্দ বলছি না, কিন্তু আমার মন টলছে না দেখে। তা ছাড়া যে মেয়েকে অন্ত সব পুরুষ অবহেলা করল, তার প্রতি মমতা দেখাবার মত সুখ মেজাজ এখন আমার নেই। যাক্, আমার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে, সুন্দরী সঙ্গিনীর হাস্য-সুধা পান করো গে যাও।'

বিংলে বন্ধুর সদুপদেশ অমান্য করলে না। বন্ধুও অন্ত দিকে পা বাড়াল। সেইখানে বসে এলিজাবেথের মন লোকটির প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু স্বভাবত কৌতুকপ্রিয় এলিজাবেথ এই কাহিনী পরম সোল্লাসে বিবৃত করতে ছাড়লে না তার বান্ধবী-মহলে।

বেনেট-পরিবারের পক্ষে এই মধু-সন্ধ্যাটি অতি আনন্দের স্মৃতি হয়ে রইল। বিংলে ও তার ভগিনীদের দ্বারা বড়ো মেয়েটির প্রশংসা-স্তুতি মিসেস্ বেনেটের কর্ণে মধুবর্ষণ করল। বিংলে নিজে তার সঙ্গে দু'বার নেচেছে। জেন নিজেও স্বভাবানুযায়ী এই সৌভাগ্যে মৌন আনন্দে মগ্ন হয়েছিল। জেনের খুসীতে খুসী হয়ে উঠেছিল এলিজাবেথ। এখানকার মহিলা সমাজের সর্বাপেক্ষা বিদুষী ও মার্জিত-রুচি মেয়ে হিসাবে নিজেকে পরিচিতা করিয়ে দেওয়াতে মেরীরও হর্ষের সীমা ছিল না। আর ক্যাথারিন ও লিডিয়া, তাদেরও আনন্দ এই যে, বল-নাচে তারাও জুড়ি পেয়েছিল। তার বেশী কিছু চাইবার আকাঙ্ক্ষা আজও উপগত হয়নি তাদের মনে। রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরে দেখে মিঃ বেনেট তখনো জেগে। আজকের সন্ধ্যায় মেয়েদের ও মায়ের মনে যে প্রকাণ্ড আশা-কল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল, তার কতখানি সফল হয়েছে সে সম্বন্ধে জানার কৌতূহল তারও কম ছিল না। তাই একখানি বই নিয়ে তিনি অপেক্ষা করে বসেছিলেন। নবাগতের সঙ্গে পরিচয়ে স্ত্রীর যে গভীর আশাভঙ্গ হবে এমনি প্রত্যাশা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু স্ত্রীর কথায় তিনি অন্য সুর শুনলেন।

'সত্যি, কি সুন্দর ছেলেটি! আমার ত খুব ভাল লেগেছে। নিজেও যেমন সুপুরুষ, বোন দু'টিও তেমনি সুশ্রী সুন্দরী। পোষাকে-আসাকে নিখুঁত। বড় বোনটির গাউনে যে ফিতেটি ছিল…'

বেনেট ও-সব সৌখীনতার কথা জানতে চান না। বাধ্য হয়ে স্ত্রী গল্পের স্রোতের মোড় ফেরালেন। তখন অতি কটু কণ্ঠে কিছুটা আতিশয্যে রাঙিয়ে তিনি ডারসির দাম্ভিকতার উল্লেখ করলেন—'ও-রকম লোকের প্রীতি-দৃষ্টি না পেয়ে লিজির আমাদের কোন ক্ষতিই হয়নি। এমন আত্মাভিমানী লোক যে সহ্য হয় না। ঘরের মধ্যে ঘুরছে-ফিরছে, মনে করছে নিজেকে মস্ত। বলে কি না নাচের জুড়ি হবে তেমন সুন্দরী নয়। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, সেই আসরে তুমি যদি থাকতে, রীতিমত একটা শিক্ষা দিতে পারতে তাকে। কোন প্রীতি নেই আমার তার উপর।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই বোন—জেন আর এলিজাবেথ যখন একলা হোল, এতক্ষণ অতি সাবধানী মৌনতার পর জেন তার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করল বোনের কাছে।

'চমৎকার মানুষটি! যেমন ভদ্র তেমনি বিজ্ঞ ও সুরসিক এমন সহজ শালীনতা-ব্যবহার আমার আগে কখনো চোখে পড়েনি অতি সংবংশের ছেলে!'

এলিজাবেথ তার সঙ্গে জুড়ে বললে—'আর তেমনি সুদর্শন অতগুলি গুণের সঙ্গে এইটি যুক্ত হয়ে তবে পূর্ণ হোল বর্ণনা।'

'সত্যি, দু'বার করে আমায় নাচের সঙ্গিনী করায় আমি ভারি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। এতখানি আশা করতে পারিনি আমি।'

'তাই না কি? আমি কিন্তু আশা করেছিলাম তোমার হয়ে তোমাতে-আমাতে একটা মূল তফাৎ কি জান, সম্মান তোমায় চকিত করে, আমায় করে না। তোমায় দ্বিতীয় বার অনুরোধ করার চেয়ে স্বাভাবিক অন্য কিছু আমি ভাবতেও পারি না। তোমার তুল্য রূপময়ী মেয়ে সেখানে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। তার সাহসের প্রশংসা করি আমি। ঐ রকম পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হলে আমি খুসীই হবো। ওর চেয়ে ঢের নিরেস লোকের প্রীতিকামী হয়েছ ত তুমি আগে।'

'কি যে বলিস তুই লিজি।'

'সত্যিই ত। তুমি এত ভালো যে সকলেই তোমার কাছে ভালো। লোকের দোষের দিকটা তোমার চোখেই পড়ে না কখনো। আমি তোমার মুখে কখনো ত কারুর নিন্দে শুনিনি আজ অবধি।'

'অবিবেচকের মত ঝপ করে নিন্দা করা উচিত নয় আমার মতে। কিন্তু তাই বলে সত্য প্রকাশ করতেও আমি পিছ-পা নই।'

'তা সত্যি। আর সেইটুকুই হোল তোমার চরিত্রের মাধুর্য। তোমার মত নির্মল মন যাদের, তারা লোকের শুদিকটাই উজ্জ্বল ভাবে দেখতে পায়, অথচ তাদের কুদিকটা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ থাকে। সেই জন্যে মিঃ বিংলের সঙ্গে তুমি তার বোনেদেরও ভালবেসেছ। কিন্তু তাদের সৌজন্য ভাইয়ের ধারে-কাছেও ঘেঁসে না।'

'প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ করলে তোমারও ভাল লাগত। শুনলাম, মিস্ বিংলে দাদার কাছেই থাকবে। আমার ত মনে হয়, প্রতিবেশী হিসাবে ভাই-বোন চমৎকার হবে।'

এলিজাবেথ এতক্ষণেও যেন পূর্ণ আস্থা রাখতে পারলে না জেনের কথায়। বিংলের বোনেরা আচারে-আচরণে-সজ্জায় চমৎকার সন্দেহ নেই। প্রয়োজন অনুসারে সরস হয়ে ওঠে, যখন মিষ্টতার দরকার হয় তখন অতি স্নিগ্ধ। তবু তাদের মধ্যে দম্ভ ও আত্মচেতনতা প্রবল। সুন্দরী দুই বোনই সহরের সেরা স্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন, কুড়ি হাজার পাউণ্ড সম্পত্তির অধিকারিণী, খরচে হাত দরাজ দু'জনেরই, সমাজের সেরা সমাজে তাদের গতিবিধি। নিজেদের মণ্ডলীর বাইরে অন্ত লোকেদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা নীচু। উত্তর ইংল্যাণ্ডের যে অভিজাত-পরিবারের নীল রক্ত তাদের ধমনীতে প্রবাহিত সেই আভিজাত্যের স্মৃতিই তাদের কাছে বর্তমানের স্বচ্ছলতার চেয়ে প্রিয়তর।

পিতার কাছ থেকে বিংলে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি। পিতার ইচ্ছা ছিল কিছু ভূসম্পত্তি করা, কিন্তু জীবদ্দশায় তা ঘটে ওঠেনি। বিংলের ইচ্ছাও তাই, কিন্তু এখানকার এই উদ্যান-প্রাসাদে তার এমন ভাবে মন বসে গেছে যে, তার পরিচিত জনের ধারণা, সেও তার জীবনে হয়ত বা এখান থেকে নড়বে না। জমিদারী ক্রয় করার দায়িত্ব হয়ত তোলা রইল পরবর্তী বংশধরদের জন্য।

বিংলে ও ডারসির মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন আছে অক্ষুণ্ণ যদিও দু'জনের চরিত্রে অমিল যথেষ্ট। বিংলের মুক্ত স্বভাব ও স্নিগ্ধ মেজাজ তাকে ডারসির প্রীতিভাজন করেছিল। যদিও ডারসির নিজের চরিত্রে এ সকলের কোন প্রকাশই নেই, এবং না থাকার জন্য নিজের উপর তার কোন অসন্তোষও নেই। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনা-শক্তিতে নিপুণতা থাকলেও বিংলে চতুরতায় ডারসির সমকক্ষ ছিল না। তা ভিন্ন ডারসির চরিত্রের দাম্ভিকতায় ও রুক্ষতায় সে কোন সমাজেই আদৃত হোত না। বরং তারই সাহচর্যে থাকায় বিংলে সর্বদা প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠার সুযোগ পেত।

এই দু'টি আত্মীয় ও বন্ধু সেদিনকার নৃত্য-সভায় কি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল, তার মধ্যেই তাদের বৈশিষ্ট পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এমন মনোরম পরিবেশ ও সুন্দরী নারীদের সমাবেশ বিংলে আগে দেখেনি। সে সমাজে সকলেই তার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করেছে, কোন কৃত্রিমতা বা জড়তার সেখানে স্পর্শ ছিল না। মিস্ বেনেটের অপেক্ষা কোন রূপবতী মেয়ে তার মনশ্চক্ষে কোন দিন ধরা দেয়নি। অপর দিকে ডারসির চোখে সে একটা জনারণ্য মাত্র, যেখানে ফ্যাশানের বালাই নেই, সৌন্দর্য ও রুচিরও নয়। কেউ-ই তাকে সমাদর করেনি বা তার প্রতি মনোযোগ দেয়নি, সেও কারুর প্রতি আসক্তি অনুভব করেনি। মিস্ বেনেট সম্বন্ধে ডারসির ধারণা যে, মেয়েটির রূপ আছে বটে কিন্তু সে হাসে বড় বেশী।

বিংলের বোন দু'টিও মিস বেনেট সম্বন্ধে তাদের রায়দান করলে এই বলে যে, মেয়েটি ভারী সুন্দরী আর মিষ্টি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করায় কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং জেন মোটামুটি সকলের মতে প্রিয়দর্শিনী প্রমাণিত হলে, বিংলে তার সম্বন্ধে আপনার অভিরুচি মত অগ্রসর হতে আর কোন প্রতিবন্ধক দেখলে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেনেট-পরিবারের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ পরিবার এ অঞ্চলে লুকাসরা। পরিবারের কর্তা স্যার উইলিয়াম-পূর্বে মেরীটন সহরে ব্যবসাদি করে কিছু ধনশালী হয়েছিলেন। তিনি যখন মেয়র হন, তখন সম্রাটকে এক মানপত্রে অভিনন্দিত করে নাইট উপাধির দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। এই নূতন রাজকীয় সম্মান তার জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অত বড় খেতাব নিয়ে মেরীটনের মত সামান্য সহরে নগণ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা তাঁর কাছে অসহ্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তখন সহর ও ব্যবসা দুই পরিত্যাগ করে তিনি এই অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকেন সপরিবারে। কিন্তু রাজসম্মান তার চরিত্রের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা সঞ্জাত করতে পারেনি বরং স্বভাব-সুলভ সজ্জনতায় ও পরোপকার-স্পৃহার দ্বারা তিনি এখানকার সকল লোকের মধ্যে প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছেন।

স্যার উইলিয়ামের পত্নী গুণবতী মহিলা বটে কিন্তু মিসেস্ বেনেটের মত সাংসারিক জীবনে চতুরা নন। তাঁদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততির মধ্যে সাতাশ বছরের বড়ো মেয়েটি এলিজাবেথের প্রিয়সখী।

সুতরাং এই দু'টি পরিবারের মেয়ে-মহলে যে পূর্ব-রাত্রের নৃত্য-সভার বিষয় গভীর আলোচনা ও হৃদয়-বিনিময় হবে এ খুবই স্বাভাবিক।

মিসেস্ বেনেট লুকাস-পরিবারের একটি মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন—'কালকের আসরে তুমিই ত প্রথম ভাগ্যবতী চার্লোট! তুমিই ত বিংলের প্রথম জুড়ি হয়েছিলে, না?'

'তা বটে। কিন্তু তার ভালো লেগেছিল দ্বিতীয় জুটিকে।'

'তুমি জেনের কথা বলছ তাকে দু'বার সঙ্গিনী করার জন্য? হ্যাঁ, মনে হয় বটে যে, তারই প্রতি বিংলের আনুরক্তি প্রবল, আমারও দৃঢ় ধারণা তাই, আর সেই রকমই যেন শুনেছিলাম কার কাছে, মিঃ রবিনসন সম্বন্ধে কি যেন সব কানাকানি—'

'ওঃ, বুঝেছি। আমিও ত সে কথা আড়ি পেতে শুনেছি অনেকটা। আপনাকে বলিনি বুঝি? মিঃ রবিনসন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে এখানকার সমাজ। এখানকার মেয়েদের মধ্যে কাকে তার সর্বোত্তমা মনে হয়? শেষ প্রশ্নটির জবাব ত তক্ষুনি দিলেন তিনি—এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতেই পারে না যে, বেনেট-পরিবারের বড়ো মেয়েটিই সব চেয়ে সুন্দরী।'

'খুবই স্বস্তির কথা। মনে হয় বটে যে সবই ঠিকঠাক যাবে, কিন্তু না, হয়ত বা শেষ অবধি সব-কিছুই মরীচিকা হয়ে দাঁড়াবে।'

চার্লোটি বলল—'জানিস এলিজা, তোর চেয়ে আমি যা শুনেছি তার দাম অনেক বেশী। মিঃ ডারসির কথা শোনার চেয়ে তার বন্ধুর কথা শোনা ঢের মূল্যবান। আহা, এলিজা—কোন রকমে চলনসই।'

'না মা। ঐ রকম অপ্রিয় মানুষের অসদ্ব্যবহারের কথা আর তুমি ওকে মনে করিও না। ঐ রকম কোন যুবক এলিজাবেথের অনুরাগভাজন হলে এ ভাগ্যেরই বিড়ম্বনা মাত্র। আমায় মিসেস্ লঙ্, বলছিলেন কাল রাত্রে যে, আধ ঘণ্টা মিঃ ডারসির পাশে বসেও তিনি তাঁর একটি কথাও শুনতে পাননি।'

'সে কি?' জেন বললে—'আমি দেখেছি মিঃ ডারসি ত সঙ্গে কথা কইছেন।'

'সে যখন মিসেস্ লঙ্, সেধে জিজ্ঞাসা করলেন যে, নেদারফি কেমন লাগছে। তখন আর জবাব না দিয়ে উপায় ছিল না কিন্তু এই ভাবে পরিচিত হওয়ায় যেন বেশ ক্রুদ্ধ হয়েছিল মনে হোল।'

'আমায় ত মিস্ বিংলে বলছিলেন যে, ঐ মানুষটি এ মিতভাষী। খুব পরিচিত সমাজ ভিন্ন বেশী কথা বলেন কিন্তু সেখানে তিনি অতি সুজন।'

'ও-সব কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না, মা। যে মিসেস্ লঙ্-এর সঙ্গে কথা কননি তার কারণও আমি ব করতে পারি। লোকটির দন্তে-দন্তেই শরীর জরজর। ও

শুনেছিল কোন রকমে যে, মিসেস্ লঙ-এর নিজের গাড়ী নেই। ভাড়া-গাড়ীতে এসেছিলেন নাচের মজলিসে।'

'না-ই কথা কন মিসেস্ লঙ-এর সঙ্গে। কিন্তু এলিজার সঙ্গে তার নাচা উচিত ছিল।'

'মা ফোঁস করে বললেন—'আমি যদি হতাম, কখনো আর ভবিষ্যতে তার সঙ্গে নাচতাম না।'

'আমিও ত তোমায় কথা দিচ্ছি মা যে, ঐ লোকের সঙ্গে জীবনে কখনো নাচব না।'

চার্লোটি বললে—'জানেন, সত্যি বলতে কি, লোকের দর্প দেখলে যেমন রাগ হয়, মিঃ ডারসির অহমিকায় আমার তেমন রাগ হয়নি; কেন না, তার কারণ আছে। এ কথা ত ঠিক যে, অত বড়ো বংশ-গৌরব, অত টাকা, অমন সুপুরুষ চেহারা সব মিলে তাকে নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছে। আমার ত মনে হয়, দাম্ভিক হওয়ার অধিকার তারই আছে।'

'খুবই খাঁটি কথা।' বললে এলিজাবেথ—'আমি ওঁর দম্ভ মেনে নিতে পারতাম যদি আমার দাম্ভিকতায় তিনি আঘাত না দিতেন।'

মেরী তার মত দিলে এই আলোচনায়—'আমার ধারণায় অহংকার মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা। আমাদের সকলের মধ্যেই এ দুর্বলতা বর্ত্তমান। অধিকাংশ লোকই নিজের বিশেষ বিশেষ কোন গুণপনা—তা সে বাস্তবই হোক বা কাল্পনিকই হোক—নিয়ে আত্মমগ্ন হয়। কিন্তু শুধু দম্ভে আর আত্মগরিমায় কিছু প্রভেদ আছেই। দাম্ভিক না হয়েও মানুষ অহংকারী হতে পারে। অহংকার মানুষের নিজের সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ, আর দাম্ভিক লোক অপরকে নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করার জন্য অপচেষ্টা করে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দু'টি পরিবারের মধ্যে ধীরে ধীরে আদান-প্রদানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠতে থাকে। বেনেট-পরিবারের অন্য সকলকে বাদ দিয়েও কেবল জেনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে ইচ্ছা হয় বিংলের দুই বোনেরই। এলিজাবেথের কিন্তু সন্দেহ ঘুচতে চায় না, বড় বোনের প্রতি তাদের প্রীতি-ভাব সত্ত্বেও সে তাদের স্নিগ্ধতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। জেনের প্রতি তাদের এই কোমলতা তাদের ভাইয়ের হৃদয়-দৌর্বল্যের দ্বারাই প্রভাবিত, এতে সন্দেহ নেই। যত বার দেখা হয়, জেনের প্রতি মুগ্ধতার লক্ষণ দেখা দেয় বিংলের দৃষ্টিতে ও আচরণে। প্রথম দর্শনেই যে অনুরাগ সঞ্জাত হয়েছিল জেনের হৃদয়ে, তার ফলে প্রতি মুহূর্তে সে যে প্রেমিকের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য নীরবে প্রস্তুত হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় তার আচরণে। অনুরাগ ধীরে ধীরে প্রেমে মুকুলিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এলিজাবেথ জানে যে, তার বোনের এই হৃদয়-পরিবর্তনের কথা সহজে লোক-লোচনে ধরা পড়বে না। অনুভূতির সংযত প্রকাশে এবং সদা হাস্যময়ী স্নিগ্ধতায় তার সত্য স্বরূপটি রক্ষিত হবে। নিজের এই আবিষ্কার এলিজাবেথ প্রিয়সখী চার্লোটির কাছে গোপন রাখলে না।

'পৃথিবীর কাছে গোপন করে চলার মধ্যে আনন্দ আছে সন্দেহ নেই'—বললে চার্লোটি—'কিন্তু এত রক্ষণশীলতায় মেয়েদের অসুবিধাও আছে। যে মেয়ে নিজের হৃদয়ের ভাব অত কঠোর ভাবে গুপ্ত করে রাখবে, তার পক্ষে প্রিয় মানুষটিকে নির্দিষ্ট করাও দুরূহ হয়ে উঠবে। তখন আর নিজের দিক থেকে কোন সান্ত্বনার অবকাশ থাকবে না। সব প্রীতির মধ্যেই কোথাও এমন কোন আত্মমগ্নতা বা কৃতজ্ঞতার ভাব থাকেই যা বিনা যত্নে বর্দ্ধিত হতে পারে না। প্রথম অনুরাগ যখন হৃদয়ে উপগত হয়, তখন বিশেষ সমাদর খুবই স্বাভাবিক।' কিন্তু এ কথা ঠিক যে, অপর পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে ভালবাসায় অগ্রসর হওয়া কোন নর-নারীর পক্ষেই সহজ নয় বা কাম্য নয়। আমার মতে মেয়েদের দিক থেকে সাড়া বেশী দেওয়ার প্রয়োজন। বিংলে তোমার বোনকে পছন্দ করে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে যদি না সাহায্য করে তবে সে পছন্দ কোনো দিনই আরো গভীরতর স্তরে পৌঁছতে পারবে না।'

'কিন্তু সেদিক থেকে বোন আমার নীরব নয়। তার প্রতি আমার বোনের যে গভীর শ্রদ্ধা প্রীতি আমি আবিষ্কার করতে পারি, তা মিঃ বিংলেরও করা উচিত।'

'কিন্তু তুমি যেমন ভাবে জেনকে জান, তার ত তেমন জানা নয়।'

'যে মেয়ে কোন পুরুষের প্রতি পক্ষপাতী এবং তার আচরণে সে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশশীল, তখন পুরুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা উচিত নয় কি?'

'কিন্তু তা সম্ভব আরো গভীর পরিচয়ে। বিংলে ও জেনের মধ্যে বহু বার সাক্ষাৎ ঘটলেও, নিভৃত সান্নিধ্য লাভ তাদের ভাগ্যে কমই ঘটেছে। দেখা যত হয় সবই ত সামাজিক উৎসবে, সেখানে ত আর বিশ্রম্ভালাপের অবসর ঘটে না যথা ইচ্ছা। বরং পরিচয় আর নিগূঢ় হলে, তারা আরো অবসরের সুযোগ পাবে এবং তখন হৃদয় জানাজানির আর শেষ থাকবে না। জেনের উচিত, যতটুকু সময় পাচ্ছে তারই সদ্ব্যবহার করে কাজ গুছিয়ে নেওয়া।'

এলিজাবেথ জানায়—'তোমার কথা সব সত্যি তাদের বেলা জানো, যাদের একমাত্র পরিকল্পনা হোল বড়-ঘরের বৌ হওয়ার। আমার যদি ইচ্ছা হত যে আমি ধনবান স্বামী লাভ করব, তবে তোমার উপদেশ মত আমি চলতাম। কিন্তু জেন ত তেমন মেয়ে নয়। তার মনোবাঞ্ছাও তেমন নয়। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে কত দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত সে সম্বন্ধেই সে এখনো স্থির-মতি হতে পারেনি। মাত্র এক পক্ষকালের পরিচয়। এইটুকু সময়ের খুঁটিনাটির মধ্যে কতটুকুই বা জানতে পেরেছে সে।'

'না, না তা কেন। শুধু যদি ভোজ-সভায় মিলন ঘটে থাকে, তবে জেন এত দিনে জেনেছে মানুষটির ক্ষুধা-তৃষ্ণার পরিমাণ কেমন। কিন্তু তা ত নয়, আরো যে চারটি সন্ধ্যা তারা একত্রে কাটাতে পেরেছে, তা কি জানাজানির পক্ষে কম হোল?'

চার্লোটি আরো বললে—'জানো এলিজাবেথ, আমার মনে হয়, বিবাহিত জীবনের সুখ একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। প্রাক্-বিবাহ জীবনে যথেষ্ট জানাজানি ও ভালবাসা সত্ত্বেও বিয়ের পর এমন বহু জিনিষ ঘটতে পারে যাতে বিবাহিত জীবন বিষাক্ত বোধ হয়। আমার মতে যাকে বিয়ে করব, যার সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ দিন কাটাব, তাকে যত কম আগে জানা থাকে ততই ভাল।'

এলিজাবেথ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—'তুমি আমায় হাসালে সখী। তুমি নিজে জান, তোমার এ তথ্য ঠিক নয়। আর নিজের জীবনে তুমি সে রকম পথ নেবেও না।'

বোনের প্রেম নিয়ে মাথা যতই তার ঘেমে উঠুক, নিজের অজান্তেই এলিজাবেথ তার নিজের ব্যাপারেও আশ্চর্য ভাবে জড়িয়ে যেতে লাগল। তার বান্ধবীরাও তার সম্বন্ধে কৌতূহলী হচ্ছে এ কথা এক দিন সেও জানতে পারলে। ডারসি প্রথম দিন তাকে সুন্দরী আখ্যা দিতে নারাজ হয়েছিল। পরে যেদিন দেখা হোল, সেদিন ডারসি তাকে ভালো করে দেখলে সমালোচনা করার জন্য। তার পর যে মুহূর্তে নিজের বন্ধু-সমাজে ডারসি এ কথা উচ্চারণ করলে যে, মেয়েটির মুখের গড়নটি সুন্দর, তখুনি সে যেন আবিষ্কার করলে যে, শুধু তাই নয়, মেয়েটির গভীর দু'টি কালো চোখের দৃষ্টি তার মুখখানিকে শুধু লালিত্য দেয়নি পরন্তু বুদ্ধিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করে রেখেছে। যে দেহ-বল্লরীকে সে সুঠাম বলতে স্বীকৃত হয়নি, তার লঘুতা ও কমনীয় কান্তি তার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। যুগের ফ্যাসানের সঙ্গে যদিও মেয়েটির নিবিড় পরিচয় নেই, কিন্তু তার মধ্যে এমন কৌতুকময়তা এবং লীলা আছে যা মনকে টেনে রাখতে পারে। ডারসির মনের এই বিবর্তনের কোন হদিসই পায়নি এলিজাবেথ। সে জানত যে, ঐ মানুষটি কারুরই প্রিয়ভাজন হতে পারেনি, আর প্রথম দিন সে তাকে নৃত্যসঙ্গিনী করতে সম্মত হয়নি রূপবতী নয় বলে।

ডারসি ধীরে ধীরে এই মেয়েটির সম্বন্ধে আরো গভীর ভাবে জানার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। সোজা তার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ খুঁজে সে এলিজাবেথের চক্রে বসে তার সঙ্গে কথায় যোগ দেবার ছল খুঁজতে লাগল। আর তার সেই প্রয়াস এলিজাবেথের দৃষ্টিকে এড়াতে পারলে না।

এক দিন স্যার উইলিয়াম এক মস্ত পার্টি দিয়েছেন। এলিজাবেথ ও মেরীর গানের পর নাচ সুরু হোল। স্যার উইলিয়াম ডারসির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করছিলেন।

'সহরে আপনার বাড়ী আছে, না মিঃ ডারসি?'

ডারসি নত হয়ে সায় দিলে।

'আমারও ইচ্ছে ছিল সহরে গিয়ে বাস করার। অভিজাত সমাজ আমিও পছন্দ করি খুবই, কিন্তু আমার খুব সন্দেহ ছিল যে, লেডি লুকাসের পক্ষে সে সমাজ সহনযোগ্য হবে কি না। তাই—'

কিছু একটা প্রত্যুত্তর আশা করছিলেন, কিন্তু ডারসি তাকে নিরাশ করল। সে কোন জবাব দিল না।

সেই মুহূর্তে এলিজাবেথ সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে স্যার উইলিয়াম একটু বীরত্ব দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। এলিজাবেথকে ডেকে তিনি বললেন—'এলিজাবেথ, মা, তুমি কই নাচে যোগ দাওনি ত? মিঃ ডারসি, এই মেয়েটি আপনার যোগ্য জুড়ি হতে পারে নাচে। এমন রূপবতী মেয়েকে নাচের সঙ্গিনী লাভ করে আপনি নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাববেন নিশ্চয়ই।'

ডারসি যথেষ্ট বিস্মিত হলেও এলিজাবেথের সঙ্গে এমন ভাবে অকল্পনীয় সুযোগ পাবে এই ভরসায় হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু এলিজাবেথ সরে দাঁড়াল। আত্মসংবরণ করে সে বললে—'আমার নাচের একটুও ইচ্ছে নেই। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে ভাববেন না দয়া করে যে, আমি কারুর সঙ্গিনী হবার লোভে ঘুরছি।'

ডারসি নিজে অনুনয় করলেন, কিন্তু তার মিনতি বিফল হোল। স্যার উইলিয়ামের কথাও রাখলে না এলিজাবেথ।

ডারসি আপন-মনে কি সব চিন্তা করতে লাগল এলোমেলো, এমন সময় বিংলের বোন তার পথে এসে দাঁড়াল।

'কি ভাবছেন, বলব না কি?'

'তা কি করে সম্ভব?'

'এই রকম সমাজে, এই ভাবে আর কত সন্ধ্যা কাটাতে হবে তাই ভাবছেন আপনি। সত্যি, আমারও মত তাই। এ রকম বিরক্ত বোধ আগে কখনো করিনি। কি বলরব? এই সব নারী-পুরুষের মধ্যে কি অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে আছে অথচ, সকলেই আত্ম-মহিমায় মহা উল্লসিত। আপনি কি বলেন?'

'আপনি ভুল করলেন। আমি মোটেই সে কথা ভাবছি না। একটি সুন্দর মুখে এক জোড়া তরুণ নয়ন কি অপূর্ব শোভা সংযোগ করতে পারে তাই ভাবছিলাম আমি।'

মেয়েটি ডারসির মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। ঐ পুরুষটি যার চিন্তায় অমন বিভোর হয়েছেন তার নামটি জানবার কৌতূহলে সে উতলা হয়ে উঠল।

'মিস এলিজাবেথ বেনেট'—বললে ডারসি।

'মিস্ বেনেট? আমি ত অবাক হয়ে যাচ্ছি! কত দিন হোল সে আপনার এমন প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে? কবে সে সুদিন আসবে যখন আমি আপনার সুখ-কামনা করতে পারব?'

'ঐ প্রশ্নই যে আপনি আমাকে করবেন তা আমি জানতাম। আশাও করছিলাম। মেয়েদের কল্পনা পক্ষীরাজের বলগায় বাঁধা। সে মুগ্ধতা থেকে পৌঁছে যায় প্রেমে এবং প্রেম থেকে পাণি-পীড়নে। আমি জানি, আপনি আমার সৌভাগ্য কামনা করবেন।'

'এ ত অতি সাধু প্রস্তাব। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি অন্ততঃ এ বিবাহে আপনার পরম লাভ হবে একটি মনোরমা শাশুড়ী।'

পরম নিস্পৃহ ভাবে ডারসি এই মেয়েটির বাক্য-সুধা পান করতে লাগল। আর ডারসির ভঙ্গী বিশ্লেষণ করে মেয়েটি যখন নিশ্চিন্ত হোল যে, কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটেনি, তখন তার সরস বাক্যস্রোত অবিশ্রান্ত বাজতে লাগল ডারসির কানে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ:—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

আমাদের ইংরেজি শিক্ষা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

[ইংরেজি ভাষা বাধ্য হয়ে আমাদের রপ্ত করতে হয়েছিল এক দিন—যখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়েছিল ইংরেজ। প্রায় দু'শো বছর তারা কর্ত্তৃত্ব চালিয়ে এখন আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে সেই রাজদণ্ড। আমরা না কি এখন স্বাধীন হয়েছি, নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করছি। যাই হোক, স্বাধীনতার রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে সরে গেছে ইংরেজ। কিন্তু তাদের ভাষা, যে-ভাষা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ভাষারূপে গণ্য হয় সর্ব্বত্র, সেই ভাষা এখনও যেন আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই ইংরেজি ভাষা, যার প্রচার সারা দুনিয়ার 'পরে বিস্তৃত, তাকে আমরা এখন বর্জ্জন করব কি না সে-এক সমস্যার কথা। এই সমস্যাটির সমাধান আলোচনা-সাপেক্ষ। বাঙলার কয়েক জন অতি পরিচিত শিক্ষাবিদ্ এই সমস্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় আপন আপন বক্তব্য একে একে ব্যক্ত করবেন।]

খুব বেশি কাল নহে, বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তখন মনের মধ্যে এই একটা সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, হিন্দুশাস্ত্র যত প্রকার পাপের যত প্রায়শ্চিত্ত-বিধি লিখিয়া যান না কেন, কোন বাঙালী-সন্তানের পক্ষে ইংরেজি লিখিতে গিয়া ভুল করিলে যে পাপ হয় সে পাপের আর কোনও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বুঝি বা তাঁহারাও লিখিয়া যাইতে পারিতেন না। সুতরাং পাঠ্যাবস্থায় বাঙলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিতে যত দিনই যত ভুল করি না কেন, ইংরেজিতে যেদিন কোন ভুল করিয়াছি সেদিন দেহতাপ এবং মনস্তাপ উভয়ই প্রায় অপ্রমেয় ছিল। আজ বুঝিতেছি, ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কাছে কোন দিনই সহজগ্রাহ্য সত্যরূপে দেখা দেয় নাই, একটি ভয়-ভাবনা-সংস্কারমিশ্রিত স্বপ্নবৎ ছিল। শুধু শহর কেন, দেশ-গাঁয়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া গেলেও সকাল-সন্ধ্যায় 'কর পণ নরগণে'র সঙ্গে সঙ্গেই 'বি-এল্-এ ব্লে, সি-এল্-এ ক্লে'র উদাত্ত-অনুদাত্ত, স্বরিত এবং প্লুত ধ্বনি কুসুম-কোমল কিশোর-কণ্ঠ হইতে প্রত্যহই উৎক্ষাত হইতে শোনা যাইত। কিন্তু হায়, সেই যে জীবনের প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঙলা দেশের অগণিত নরগণ কেবলই জীবন-পণ করিয়া 'বি-এল্-এ ব্লে, সি-এল্-এ ক্লে'র সাধনা করিল, তাহার ফল কি হইল? বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপমান যন্ত্রের পারদ যে ক্রমে শতকরা দশ-বারতেও স্থির হইতে চাহিতেছে না, তাহার প্রবণতা যে ক্রমনিম্নাভিমুখী।

বলিতেছিলাম বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারের কথা। এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন আমরা উচ্চ ইংরেজি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ি। বিভাগীয় বিদ্যালয়-পরিদর্শক আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্কুল-পরিদর্শন বিষয়ে উক্ত পরিদর্শক মহাশয়ের একটা ভীতিপ্রদ 'ঝানু'ত্বের কথা ইতিমধ্যেই আমাদের বিদ্যালয়ে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিমণ্ডলে একটা আলোড়নাত্মক কম্পন তুলিয়াছিল; বিপদের মধ্যে আবার ইহাই প্রধান বিপদরূপে গণ্য হইল যে, বিদ্যালয়-পরিদর্শন কালে উক্ত পরিদর্শক মহাশয় ভাষা ব্যবহার বিষয়ে বড় কঠোররূপে নিষ্ঠাবান্; তিনি যে শুধু ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন তাহাই নহে, তিনি উচ্চারণের বিশুদ্ধি এবং অনর্গলতার জন্যে মুখের স্নায়ুমণ্ডল এবং বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিটি অংশকে এমন অবিশ্রান্ত রকমে দ্রুত পরিবর্তিত করিয়া চলেন যে তাহা একটি গ্রামের পক্ষে মানুষের আদিম ভয় ও বিস্ময়-বৃত্তি জাগ্রত করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব শিক্ষক এবং পরিচালক মহলে ভয়-ভাবনা নেহাৎ কম নহে। সৌভাগ্য বশতঃ সেদিন গ্রামে এক জন বিখ্যাত ইংরেজির অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন; অতএব গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সেই পরিদর্শকের সম্মুখে সেই অধ্যাপকবর্যকেই পরিস্থিত করাইলেন। আমাদের ভীতি-বিহ্বলতাও একটু দুই-'ঝানু'র মিলন দর্শনের কৌতূহলে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

তাহার পরে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার আর কোনও বিশদ বর্ণনা না দিয়া সংক্ষেপে এইটুকু বলিতে পারি, বিদ্যালয়-পরিদর্শন ব্যপদেশে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরে বসিয়া উক্ত দুই মহারথীর যখন তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, তখন মুহূর্তের জন্য আমরা বহু দিন-সঞ্চিত সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা-বোধকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া উক্ত ঘরখানিকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম, এবং যখন দেখিতে লাগিলাম যে 'অতটুকু যন্ত্র হইতে এত শব্দ হয়'—এবং তাহাও অনর্গল ইংরেজি, তখন কূপস্তর বহির্বিশ্বের তন্দ্রা কি হইয়াছিল না হইয়াছিল জানি না, কিন্তু আমাদের মনে যে সীমাহীন পরম বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা একটা গভীর কৌতুকের সহিত এখনও স্মরণ করি। ইহারই সহিত আরও স্মরণ করিতেছি, আমাদের জিলার প্রধান শহরটিতে একবার অধ্যাপক জে, আর, ব্যানার্জির ইংরেজি বক্তৃতা হইবে শুনিতে পাইয়া আমরা কতিপয় ছাত্র প্রায় চাল-চিঁড়া বাঁধিয়াই শহরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

প্রারম্ভেই এত কথা একটু হয়ত অবান্তর মনে হইতে পারে। ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে আমার এই শৈশব সংস্কার এবং অভিজ্ঞতা যদি বিশেষ করিয়া আমারই হয় তবে কথাগুলি অবান্তরই বটে, কিন্তু ইহ যদি কেবল মাত্র আমার না হইয়া মদ্বিধ বহু বাঙালী জীবেরই হয়, তবে এ-সকল কথার গভীর-তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজ রাজত্ব বাঙলা দেশে—তথা ভারতবর্ষে আস্তে আস্তে কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালী এক দিন দেখিতে পাইল, তাহার সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, ঊর্দ্ধে-অধে যে দিকে সে তাকায় সেই দিকেই প্রয়োজন ইংরেজির, ব্যবসা-চাকুরী, আইন-আদালত, সভা-সমিতি, স্কুল-কলেজ সর্ব্বত্রই চাহিদা শুধু ইংরেজির;

অতএব সে মরিয়া হইয়া ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এই প্রাণ-পণ ইংরেজি শিক্ষার সহিত কি ব্যক্তিগত ভাবে—কি জাতিগত ভাবে মানুষকে গড়িয়া তুলিবার কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু দেখা যায়, কতগুলি ফলের আঁটিকে আমরা ছাই-মাটির ভিতরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া রাখি—তাহাদের দ্বারা বিশেষ কিছু গড়িয়া তুলিব এমন আকাঙ্ক্ষা লইয়া নয়, তবু আকস্মিক ভাবে উর্বর জমিতে তাহারা অঙ্কুরিত হইয়া শিকড় গজাইয়া বহুমূলা হইয়া গড়িয়া ওঠে। অথবা পতিত জমিতে কাঠ-খড়ি জন্মাইবার জন্য যে বীজ পুঁতিয়া দিই তাহাই আমাদের অজ্ঞাতে—এমন কি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অপূর্ব ফল ফলাইয়া বসে। বাঙালীর উপরে ইংরেজি শিক্ষার ফল ফলিয়াছিল অনেকটা সেই রকম। তখনকার বাঙলার পতিত জমিতে আপিসের 'বাবু'-জাতীয় এক প্রকার আগাছা জন্মাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল বিদেশী শাসকগণের, সেই 'বাবু'র চাষের জন্যই ইংরেজির বীজ খানিকটা হেলাশ্রদ্ধায়ই ছড়াইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু কে-ই বা জানিত, বাঙলা দেশের পতিত জলাভূমিগুলির ভিতরে নিহিত ছিল এত উর্বরা শক্তি! কোনও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ব্যতীতও বাঙলার জীবনে এই ইংরেজি শিক্ষা বিচিত্র ফল-পুষ্প প্রসব করিল—হয়ত মালী বা মালিকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সুতরাং আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে চিত্ত-সমৃদ্ধির প্রয়োজন যুক্ত হইয়া ইংরেজি আমাদের নিকট একটা অলৌকিক মহিমাই লাভ করিয়া বসিল।

আর আমাদের দেশের একটা মজা এই, একবার যাহা কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ভিতরে অলৌকিক মহিমা লাভ করিয়া বসে তাহাকে আমরা পাইয়া বসি না, অচিরাৎ তাহাই আমাদিগকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ ভাবে পাইয়া বসে। যুক্তি-বিচারের দ্বারা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করিতে আমরা অভ্যস্ত কম; সুতরাং বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অতি অনায়াসে আমাদের ভিতরে রূপান্তরিত হয় অন্ধ-সংস্কারে। আমার সন্দেহ হয়, ইংরেজি শিক্ষা এখন আমাদের ভিতরে যুক্তি-প্রয়োজন-নিরপেক্ষ ভাবে অনেকখানি সংস্কারের রূপেই আসিয়া দেখা দিয়াছে। আর মনোবিজ্ঞানের আলোতে দেখা যায়, মানুষের বিচার-বুদ্ধি অপেক্ষা তাহার সংস্কার অনেক বেশী প্রতাপশালী; সুতরাং বর্তমান জাতীয়-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি শিক্ষা-পদ্ধতির অপরিবর্তিত গতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বুদ্ধি-বিচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ সংস্কারের প্রবল তর্জন-গর্জনেই ঢাকা পড়িয়া যায়!

শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা মত গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ সত্য হোক আর না হোক, একবার যখন বুঝিয়া ফেলিয়াছি যে, সমস্ত জাতি এক দিন যখন তাহার জীবনী-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার হস্ত-পদ শীতল হইয়া আসিতেছিল, নাড়ীর গতি মন্থর হইয়া উঠিতেছিল, তখন দেশী আয়ুর্বেদোক্ত 'কস্তুরীঘটিত চতুর্ভুজ' তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই,—তাহাকে পুনর্জীবন দান করিয়া স্বাস্থ্যের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে ইংরেজি ইনজেকসন, তখন আর এ-জাতিকে ছাড়াছাড়ি নাই। এখন যদি সে তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইয়া থাকে, তাহার দেহযন্ত্র যদি আর এই জাতীয় ঔষধ গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুকও হয় তাহাতেও বিচলিত হইবার কিছু নাই। একবার যখন ইংরেজি ইনজেকসনের অমোঘ শক্তির হাতে হাতে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তখন বাঙালী বৎসগণকে জোর-জার করিয়া ধরিয়া-বাঁধিয়া সকাল-সন্ধ্যায় গৃহে ফেলিয়া এবং মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ে ফেলিয়া নয়ন মুদিয়া এই ইংরেজি ইনজেকসন্ কার্য চালাইয়া যাইতে থাক। ফলে যদি দেখা যায়, এই ইন্‌জেকশনের অমোঘ শক্তিকেই আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারই ফলে বছর বছর কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীগণের অপঘাত মৃত্যুর হার শতকরা নব্বইকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের হতভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানিজনোচিত ঔদাস্য গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় কি?

এই যে অপঘাত মৃত্যুর কথাটা বলিলাম, ইহা নেহাৎই একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করি নাই, আমার বিশ্বাস, কথাটার ভিতরে আক্ষরিক সত্যও রহিয়াছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হারের কথাই বলিতেছি। এক দিক হইতে বলা যাইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-ফেলের মূল্যের মানই বাজারে দিন দিন এমন ভাবে নামিয়া যাইতেছে যে, এই পাশ-ফেল ব্যাপারগুলিকে এখন আর অত বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাজার-দরের বাহিরে জিনিসটির আর একটি দিক আছে। একটি জাতির নবোদ্গত অসংখ্য দেহ-মন—যাহা অস্ফুট কোরকের মতই জীবনের অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিকাশোন্মুখ—তাহাদের এমন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের কিশোর-কোমল কপালে এমন করিয়া অকৃতকার্যতার 'মার্কা' বসাইয়া দিবার অধিকার কাহারও আছে কি না, তাহাই স্থির হইয়া ভাবিবার বিষয়। একটা জাতির শতকরা আশী-নব্বইটি ছেলেই যে জীবনযাত্রার প্রারম্ভে এমন করিয়া প্রকাশ্যে ধিক্কৃত হইবে তাহাকে আমরা ঔদাস্যের হাই তুলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। তাহাদিগকে এমন করিয়া পাইকিরি কৃষ্ণ চিহ্নিত করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখিতে হইবে; দোষটা সম্পূর্ণই কি এই হতভাগ্যদের, অথবা যে পদ্ধতিতে তাহাদিগকে শ্বেত-কৃষ্ণ বর্ণে চিহ্নিত করা হইতেছে, সেই পদ্ধতিরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পাশ-ফেলের হার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কতগুলি তথ্য আগে জানিয়া লওয়া দরকার; নতুবা ইংরেজি-শিক্ষার প্রসঙ্গে এই পাশ-ফেলের প্রশ্নটার অবতারণা কেন করা হইতেছে তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক পাশ-ফেলের হার প্রদেশের শিক্ষার অবনতির সূচনা করিতেছে তাহাতে বাধা নাই। কিন্তু শিক্ষার এই অবনতি কেন? এ-প্রশ্নের জবাবে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি; তাহার ভিতরে মুখ্য যে কথা বলি তাহা এই, বাঙলা দেশের ছাত্রদের মানসিক অবস্থাই দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে। এই মূল কথাটির আশে-পাশে অবশ্য ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি সূচনা করিয়া আমরা আরও কতগুলি কারণ স্বীকার করিয়া লই; তাহা হইল এই যে, প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলনের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ছাত্রদের মন স্বাভাবিক ভাবেই একটু একটু করিয়া পাঠ-বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। তার পরে আবার সাম্প্রদায়িকতার বিপর্যয়, দেশ-বিভাগের বিপর্যয়, তৎসঙ্গে আর্থিক, সামাজিক সর্বপ্রকারের বিপর্যয় একত্রিত হইয়া চারি দিকে এমন একটি প্রতিবেশ গড়িয়া তুলিতেছে যাহার ভিতরে নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কোনটাই ঠিক ঠিক চলিতেছে না। স্কুল-কলেজগুলিও ক্রমাবনতির দিকে···ছাত্র-সমাজ

ততোধিক অবনতির দিকে—শিক্ষাতেও তাই দেখা দিয়াছে দারুণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির। বাঙলা দেশের ছাত্র-সমাজের মস্তকস্থিত ধাতুর ক্রমাবনতি ঘটিয়াই বর্ত্তমানের এই সঙ্কটকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এ-রকম একটা কথা যদি সত্য না-ও হয় তবেও এ-কথা সত্য যে, বাঙলা দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং আর্থিক ক্রম-বিপর্যয় সকল ছাত্র-সমাজের ভিতরে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শিক্ষার পক্ষে একান্তই প্রতিকূল। মুখ্যতঃ এই কারণেই বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষায় সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

এই কথাগুলিকে মোটামুটি ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও কতগুলি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বঙ্গ-বিভাগের চরম বিপর্যয়ের সহিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রম-দুরবস্থাকে কার্য-কারণরূপে যুক্ত করিয়া লইতে পারিলে সমস্যাটা অনেক সহজ হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভিতরের তথ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, শিক্ষার অবস্থায় এই দুর্গতি এক দিনে হঠাৎ ঘটে নাই; জিনিসটি ঘটিতেছে বহু দিন পূর্ব হইতে—আমাদিগকে সহসা একটা ঝাঁকুনি দিয়া সজাগ করিবার মতন তাহার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে সম্প্রতি মাত্র। গত বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের হার যাহা দেখা গিয়াছে পাঁচ বৎসর পূর্বে এই হার যে একেবারেই অন্যরূপ ছিল তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই; সত্যকার পাশের হার বহু বৎসর যাবৎই অনুরূপ ভাবে শোচনীয় ছিল; শুধু কর্তৃপক্ষের অপরিসীম দাক্ষিণ্যে নিরন্তর রিপুকার্যের ফলে সত্যটি তাহার নির্মমরূপে আর দেখা দিত না—বর্ত্তমান অবস্থায় জিনিসটি কতটা আমাদের ধাতসহ হইবে এইটুকু বিবেচনা করিয়াই সত্যটিকে একটি চলনসই রূপান্তরিত অবস্থায় সর্ব-সাধারণ্যে প্রকাশ করা হইত। বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদেরও তাই তেমন কোন আপত্তি, ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা ছিল না, কাজ চলিয়া গেলেই হয়। কিন্তু সহসা এখন যে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছি তাহার কারণ, সত্যটিকে যেরূপে ইদানিং দু'-এক বৎসর প্রকাশিত করা হইতেছে তাহাতে আর কাজ চলিতেছে না।

এই যে বহু বৎসর হইতে ছাত্রদের পাশের হার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, যত ছেলে ফেল করে তাহার শতকরা আশীটিরও অধিক ছেলে এক ইংরেজি ভাষায় ফেল করে। এই জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। ছাত্রদের মানসিক শক্তির অবনতির প্রবণতা—তাহা যে-কারণেই হোক—এক ইংরেজির সংস্পর্শেই দিন দিন এমন উৎকট ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে কেন? অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রদের মানসিক অবনতির পরিমাণটা যখন অনুরূপ ভাবে শোচনীয় নহে, তখন মনে করিতে হইবে, ছাত্রদের মানসিক অবনতিই এই অকৃতকার্যতার একমাত্র বা মুখ্য কারণ নহে; ইহার মুখ্য কারণ ইংরেজি শিক্ষার সম্বন্ধে বাঙালী ছাত্র-সাধারণের একটা বিরূপতা এবং তজ্জনিত বিমুখতা।

এই বিরূপতা এবং বিমুখতার কারণ কি? বাঙলা দেশের ছাত্রগণ কিছু দিন ধরিয়া দেশ হইতে ইংরেজ তাড়াইবার কথা শুনিয়াছেও অনেক, বলিয়াছেও অনেক; কিন্তু ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যকে তাড়াইবার কথা কেহ কোনও দিন বলেও নাই, শোনেও নাই। কোনওরূপ বিরুদ্ধ প্রচারের অভাবেও যদি দেশবাসিগণের মনে এই বিরূপতা ও বিমুখতা দেখা দিয়া থাকে তবে তাহার কারণগুলিকে অতি স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, এই বিমুখতার কারণ মুখ্যতঃ দুইটি। প্রথমটি হইল একটি নব-জাগ্রত জাতীয়তা বোধ, এই জাতীয়তা বোধের একটি অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল, সেই প্রেরণা আমাদিগকে সর্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে চাহিয়াছে। শুধু রাজার নিকটে নহে, সারস্বত-মন্দিরেও যে ইংরেজি এখন পর্যন্তও সুয়োরাণীর আদর লইয়া গর্বান্বিতা এবং আমাদের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য দুঃখিনী দুয়োরাণীর অবজ্ঞা লইয়াই 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া'য় অবস্থিতা, এ-জিনিসটিকে বিবিধ কারণে কোনওরূপে বরদাস্ত করিয়া গেলেও আমাদের অন্তরাত্মা বোধ হয় ইহাতে খুশি হইতে পারে নাই। আমাদের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা স্ব-ভাষা এবং স্ব-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছি; কিন্তু আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা কোথাওই চরিতার্থতা লাভ করে নাই।

কিন্তু এই প্রথম কারণটি স্বতন্ত্র ভাবে এখন পর্যন্তও আমাদের জীবনে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার প্রভাব সে বিস্তারিত করিয়াছে পরোক্ষে, দ্বিতীয় কারণটির সহিত যুক্ত হইয়া। সেই দ্বিতীয় কারণটি হইতেছে, একটি ছাত্রজীবনে যে মূল্য দিয়া যেটুকু ইংরেজি বিদ্যা লাভ করা যায় সে-সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান। গড়পড়তা ছাত্রদের কথা বিচার করা যাক, কারণ ইহারাই ছাত্র-সংখ্যার শতকরা আশী ভাগেরও বেশি।

এই গড়-পড়তা ছাত্রদের ভিতরে একটি ছাত্রকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, অক্ষর-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত সে তাহার শিক্ষা-কাজের জন্য মোট দৈহিক ও মানসিক যে সাধনা ও পরিশ্রম করে তাহার বার আনারও অধিক ব্যয়িত হইয়া যায় ইংরেজি শিক্ষার জন্য; কিন্তু সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল এই ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কায়ক্লেশের পরেও সে যাহা পুরস্কার লাভ করে তাহা এই যে, তাহার পরীক্ষার খাতায় ইংরেজির নম্বরদৃষ্টে প্রকাশ্য দিবালোকের মতন স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে সে একটি কিছুই না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আজ-কাল সাভিমানে এবং প্রচুর রসিকতার ঝাঁজমিশ্রিত সানন্দে এই কথার সাক্ষ্য দিবেন যে, আজকালকার বি, এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে শতকরা নব্বইটিরও অধিক সংখ্যকে এক পৃষ্ঠায় একটি ইংরেজি পত্র লিখিতে অন্ততঃ পাঁচটি বানান ভুল, পাঁচটি ব্যাকরণগত বা বিশিষ্ট প্রয়োগ-রীতিগত ভুল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু নিকরুণ সত্য হইল এই যে, এই ভদ্রসন্তানগণ তাঁহাদের জীবনের বিনিদ্র রজনীর যে প্রহরগুলি অতিবাহিত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই এই ইংরেজিকে লইয়া। এই জাতীয় ছাত্র সকলকেই যদি 'গোবরগণেশ' মার্কা বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইত তাহা হইলে সমস্যা অনেক সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু দেখা যায়, ইহাদের সকলেই কিছু 'গোবরগণেশ' মার্কার নহে; তাহাদের দেহ-মনের সহিত নিবিড় কোন যোগ রহিয়াছে এমন কোনও অধীতব্য বিদ্যা-বিষয়ে তাহারাও তাহাদের যথেষ্ট 'পদার্থত্বে'র পরিচয় দেয়; ইংরেজির সহিত তাহার দেহ-মনের কোনও যোগ নাই, বরঞ্চ সর্বদাই একটা অপরিচয়ের অনাত্মীয়তা তাহার দেহ-মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিয়াছে; এই কারণেই ইংরেজিকে অবলম্বন করিয়া শত গলদঘর্ম হইয়াও সে তাহার 'পদার্থত্ব' প্রমাণ করিতে পারিতেছে না।

দেড় শত বর্ষকাল ইংরেজ যেমন আমাদের দেহরাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছে, ইংরেজিও তেমনই আমাদের মনোরাজ্য শাসন

করিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু তথাপি ইংরেজির সহিত আমাদের নাড়ীর কোন সহজ যোগ স্থাপিত হয় নাই। শৈশব হইতে যে ইংরেজি শব্দগুলির সহিত আমাদের পরিচয় বাস্তব জীবনে তাহাদের অর্থের সহিত পরিচয় আমাদের অত্যল্প, সুতরাং আমাদের স্বাভাবিক অধিকার—আমাদের পরিমিত শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা আমরা তাহাকে অধিগত করিতে পারি না ; প্রথমাবধিই কৃত্রিম উপায়ে শুধু মাত্র পুঁথির উপরে নির্ভর করিয়া অতিরিক্ত শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা তাহাকে আমাদের লাভ করিতে হয়। সুতরাং বাঙালী ছাত্রের জন্য এখন পর্যন্তও আশৈশব ইংরেজিপ্রাধান যে শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার ভিতরে প্রথমাবধিই রহিয়াছে একটা কৃত্রিম উপায় এবং অতিরিক্ত শক্তি-প্রয়োগ। এই কৃত্রিম উপায় এবং শক্তি-সামর্থ্যের ব্যয়বাহুল্যকে এখনও আমরা কায়েম করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি কেন? এক দিন ছিল যখন বাঙলা দেশে শিক্ষা এবং ইংরেজি বিত্তালাভ একেবারে সমার্থক ছিল; সেই সমার্থকতা তৎকালীন আমাদের জীবনযাত্রার পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা এমন দৃঢ় ভাবেই সমর্থিত ছিল যে তখন আমরা ইহাকে একরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই গ্রহণ করিয়াছি : সুতরাং শিক্ষালাভের জন্য সেদিন আমরা যতটুকু কায়িক, বাচিক ও মানসিক মূল্য দিতে রাজি ছিলাম তাহার সবটা নিঃশেষে ব্যয় করিয়াও ইংরেজি বিত্তায় অধিকার লাভকে আমরা বরিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছি। আমরা অভিজ্ঞ মুখ হইতে এমন বাণী লাভ করিয়াছি যে, ভাল করিয়া ইংরেজি শিখিতে হইলে ইংরেজিতে রীতিমত স্বপ্ন দেখার অভ্যাস করিতে হইবে। একটি বাঙালী-সন্তানের পক্ষে ঘুমের ঘোরেও (যখন সচেতন ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাহার অত্যল্প) ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা যতই অসাধ্য হউক না কেন, সেই অসাধ্যকে সাধন করিতেও আমরা প্রাণপাত করিয়াছি। কিন্তু আজিকার দিনে প্রশ্ন হইল এই, একটা জাতীয় বাল-শক্তি এবং যুব-শক্তির এতখানি ব্যয়বাহুল্যের বিনিময়ে ইংরেজি বিত্তাকে লাভ করিবার সেই প্রাচীন প্রয়োজন অথবা কোন নবীন প্রয়োজন উপস্থিত রহিয়াছে কি? যদি যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিয়া থাকে তবে আমরা নিরস্ত এবং নির্বাক্ হইলাম ; আর তাহা না হইলে জাতীয় জীবনের এতখানি প্রাণ-শক্তির এমনতর অপচয়ের জন্য সমস্ত জাতির নিকটে দায়ী হইবে কাহারা? ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসে বাঙলা দেশের ছাত্র-সমাজ বৎসরে যে সময় এবং শক্তি ব্যয় করে তাহা অন্য যে-কোনও শিক্ষা বা অন্যজাতীয় গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইলে বাঙালী তাহা দ্বারা মহত্তর, অথবা অন্ততঃ অধিকতর কার্যকরী ফল লাভ করিতে পারিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।

জানি, আধুনিক কালেও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিলাম তাহার জবাব আসিবে বহু দিক হইতে এবং বেশ জোর-গলায়। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়তা-বোধ, আমাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি সকলেরই পিছনে এই ইংরেজি শিক্ষা অবস্থান করিয়া কি ভাবে যে কি কি কাজ করিতেছে তাহার লম্বা ফিরিস্তি আসিবে ; এবং বর্ত্তমান কালেও এই ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে কোন দিন কোন শিথিলতা প্রকাশ পাইলে সমস্ত জাতীয় জীবনের বনিয়াদই যে আবার সহসা শিথিল হইয়া যাইবার কি সম্ভাবনা রহিয়াছে সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে। কিন্তু এত সব পক্ষসমর্থনের ভিতর দিয়া আমাদের নিকটে যে কথাটা আসল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় তাহা এই যে, আমরা যে বহু পূর্ব্বে বাঙালীর পক্ষে শিক্ষা ও ইংরাজি শিক্ষাকে একেবারে সমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই দৃঢ়মূল সংস্কারটিকে এখন পর্যন্তও আমরা ত্যাগ করিতে পারি নাই। একটি লোক ইংরেজি জানে না অথচ সে শিক্ষিত, এমন একটি জিনিসের মনে মনে কল্পনাই করিতে পারি না। একটি লোক আমাদের বিশ্ববিত্তালয়ের একটি সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে অথচ সে ইংরেজি জানে না, এ জিনিসটি এখন পর্যন্তও আমাদের নিকটে সোনার-পিতলা বাটি! বর্ত্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা ষ্ট্যালিন ইংরেজি জানেন না এ কথাটা মাঝে-মাঝে আমাদের বাঙালী-মনে একটা আকস্মিক আঘাত হানিয়া অবিশ্বাস জাগাইয়া দেয়!

শিক্ষার মূল কথাই হইল, সুনিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের দ্বারা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি-সমূহকে উদ্বোধিত করা। এই শক্তির উদ্বোধ আমাদিগকে শুধু ব্যাবহারিক জীবনে টিকিয়া থাকার সংগ্রামেরই শক্তি দান করিবে না ; চিত্তের সম্যক্ পরিস্ফুরণের দ্বারা ইহা আমাদের চরিত্রকেও দৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবে। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার উপরে একটা অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার ফলে শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্য চিত্তের সর্বাঙ্গীণ স্ফুরণের প্রথম হইতে বাধা পড়িতেছে। একটি বাঙালী-শিশুর চিত্তবৃত্তির বিকাশ সেই ভাষার মাধ্যমেই সহজ এবং স্বাভাবিক, যে ভাষাকে সে লাভ করে তাহার মাতৃস্তন্য পানের সহিত—অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আনন্দে। কিন্তু আমরা শিক্ষার নাম করিয়া তখন হইতেই একটি দ্বিভাষার আবরণের দ্বারা তাহার চিত্তের সহজ বিকাশকে বাধা দিতে লাগিলাম। ফলে গিয়া কি দাঁড়ায়? তাহার আত্ম-বিকাশের সময় এবং সামর্থ্য অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়া যায় শুধু এই বাধা অতিক্রমের চেষ্টায়—চিত্তের স্ফুরণ তাহার কখন কি করিয়া ঘটিবে? যাহারা অনেক সামর্থ্য লইয়া জন্মায় তাহারা বহু মূল্য দানে কাতলা মাছের মতন জাল ফাড়িয়া বাহির হইয়া আসে, এবং ভাষার বাধাকে একবার অতিক্রম করিয়া লইতে পারিলে তাহার পরে ভবিষ্যতে উন্নতি করিতেও পারে। কিন্তু বাদ-বাকি বৃহত্তর দলটিকে আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে হয় না, ঘন ফাঁসের জালে কানে আটকাইয়া আরম্ভ-পথেই তাহাদের প্রায় যাত্রা শেষ। তার পরে এক ধার হইতে চলিতে থাকে খালি আপ্রাণ 'ঘষ্টানো' আর সস্তা বাজারের সর্বপ্রকারের অপথ্য-কুপথ্য গলাধঃকরণ ; শেষ পর্যন্ত তাহাতেও যদি সুরাহা হইবার সম্ভাবনা না দেখা যায়, তবে কিঞ্চিৎ অসদুপায় অবলম্বন ছাড়া আর গত্যন্তরই বা কি। ভরসা ছিল বিশ্ববিত্তালয়ের ঝাঁকে-ঝাঁকে যাচিত-অযাচিত 'কৃপা'-বর্ষণ ; তাহাও যদি সহসা বন্ধ হইয়া গেল তবেই ত বাঙালীর শিক্ষাক্ষেত্রে 'গুরুতর পরিস্থিতি'র উদ্ভব!

ভাষা শুধু মানুষের মনের দূত নয়, ভাষা মানুষের মনের বাহন। মানুষ যে ভাষায় চিন্তা করে সেই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি তাহার চিন্তাকেও শক্তিশালী করিয়া তোলে, ভাষার স্পষ্টতা এবং পরিচ্ছন্নতা চিন্তার স্বরূপ ও পরিচ্ছন্নতার প্রধান সহায়। আমরা শিক্ষার ভিতর দিয়া বোধশক্তির জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই বাঙালী ছাত্রগণকে যে ভাষার মাধ্যমে

তাহার বোধশক্তিতে জাগ্রত করিতে বাধ্য করি, সে ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি বা পরিচ্ছন্নতাকে অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; বাদ-বাকি অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বোধবৃত্তিকে আমরা একটা অসম্যক্‌গৃহীত ভাষার ধাঁধার ভিতরে পঙ্গু করিয়া রাখি। এই বোধবৃত্তির পঙ্গুত্ব শিক্ষাক্ষেত্রের সব ক্ষেত্রেই তাহাকে দুর্বল করিয়া রাখে; ফলে তাহার যে শুধু ইংরেজি বিদ্যার ব্যুৎপত্তি ঘটে না তাহা নহে, সব বিদ্যার ক্ষেত্রেই সে কেমন নিস্তেজ ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। আমরা যদি একেবারে গোড়া হইতেই প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে 'পাকা-পোক্ত' করিয়া তুলিবার দুর্নিবার আগ্রহ না লইয়া অন্ততঃ কয়েকটি বৎসরের জন্যও একটু ধৈর্য ধরিতে পারিতাম—প্রথম কয়েকটি বৎসর যে ভাষাকে সে তাহার জীবনের প্রাণ-রস-সংগ্রহের সহিত 'অপৃথগ্‌ যত্নে' লাভ করিয়াছিল সেই ভাষার ভিতর দিয়া তাহার চিন্তা-শক্তিকে—আত্মপ্রকাশ শক্তিকে খানিকটা বাড়াইয়া তুলিবার সুযোগ দিতাম্‌ তাহাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের কোনও সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বলা যাইতে পারে, আগেকার দিনে—বিশেষ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে বাঙালী ত বেশ ইংরেজি শিখিয়া আসিয়াছে, অনেকেই ত ইংরেজি বিদ্যায় বেশ কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছেন—এবং শুধু তাহাই নহে, সেই ইংরেজি বিদ্যার দ্বারা আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকেও নানা ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। আজকের দিনেই বা তাহা হইলে এই ইংরেজি ভাষাকে বাঙালী শিক্ষার্থী-সমাজের সম্মুখে এমন একটা প্রচণ্ড বাধারূপে দাঁড় করাইতেছি কেন? এ-কথার জবাবে বলা যাইতে পারে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল সমগ্র বাঙালী জাতি তাহাকে অন্ন-জল আলো-হাওয়ার ন্যায় অপরিহার্যরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে নাই; মুষ্টিমেয় বাবু গড়িয়া তুলিবার সুপরিকল্পনায় যে শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন দ্বিতীয় স্তরে তাহা তথাকথিত একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রচলিত হইয়া জাতীয় জীবনে অনেকখানি একটা শোভাবর্ধক বিলাস সামগ্রীরূপেই বিরাজ করিতেছিল। বড়-বড় ঘরের ছেলেদের খাস-বিলেতি শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া প্রথম হইতে নিখুঁত ভাবে ইংরেজি শিখাইবার একটা বনেদি রেওয়াজ সেদিন পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। পাছে বাঙালী সঙ্গ-সাহচর্যে ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধিতায় কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা ঘটে, সেই জন্য সুকুমারমতি ছেলে-মেয়েদের জীবনের বিশেষ একটা অংশ এ দেশের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ স্থানে যাহাতে ইউরোপীয় সঙ্গ-সাহচর্যেই কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত কাটিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে খুব বিরল ছিল না। কিন্তু কালের আবর্তনে আমরা জাতীয় জীবনের এখন যে একটা স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছি তাহাতে শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নূতন রূপ এবং নূতন ধর্মের দাবী লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। আজ যে শিক্ষা আমাদের অন্ন-জল আলো-হাওয়ার তুল্য সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে; আজ যে লেখা-পড়া শিখিতে চাহে শুধু 'বড় ঘরে'র ছেলেরা নয়, শুধু মাত্র 'ভদ্রলোকে'র ছেলেরা নয়, আজ যে সমান ভাবে লেখা-পড়া শিখিতে চাহিতেছে চাষা-ভূষা শ্রমিক-মজুরের ছেলেও; শিক্ষায় প্রয়োজন তাই আজ দেখা দিয়াছে একটা জাতীয় প্রয়োজনরূপে, শিক্ষার সমস্যাও আজ তাই জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। আজ যখন শিক্ষার কথা ভাবিব, তখন সমাজের বিশেষ ভাবে ভাগ্যবান্‌ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা ভাবিলে চলিবে না,—দেশের সর্ব-সম্প্রদায়ের লোকের কথা ভাবিতে হইবে।

এখনও আমরা শিক্ষার কথা যখন ভাবি তখন এই মুষ্টিমেয় বিশেষ সম্প্রদায়টির দ্বারা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকি। বড় ঘরের কয়টি ছেলের বড় বড় কয়টি চাকুরী কিসের দ্বারা লাভ হইতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে সে প্রশ্নটাকে আমরা এখন পর্যন্তও কিছুতেই বাদ দিতে পারিতেছি না। তাহার জন্য অগণিত 'সামান্য লোকে'র ছেলে-মেয়েগুলিকে যদি অযথা ভারেও ভারাক্রান্ত করিতে হয় তাহাতেও আখেরে জাতির লাভ ছাড়া লোকসান হইবে না বলিয়া বিশ্বাস যে এখনও আমরা পোষণ করি। আমরা ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে একটা কথা প্রায়ই খুব জোরের সঙ্গে বলিতে শুনি; তাহা হইল এই, ইংরেজি ভাল করিয়া না শিখিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা চলিব কি করিয়া? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভিতরে যাহাদিগকে চলিতে হয় তাহারা সংখ্যায় ক'জন; সমস্ত জাতির তুলনায় তাহাদের হারটা কিরূপ? হাজার-করা এক জন হইবে কি? তাহাও নহে। সেই সংখ্যাটির মুখের দিকে তাকাইয়া আমরা বাকি সংখ্যাটির উপরে অবিচার করিতে চাই কোন্‌ বিচারে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিশেষ চাহিদা মিটাইবার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেই ত চলিয়া যাইতে পারে? কালিদাসের রঘুবংশের ভিতরে মায়া-সিংহটি রাজা দিলীপকে বলিয়াছিল—

> অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্‌
> বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্‌।

এই উক্তিটি কি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমভাবে আমাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নহে?

বলা হইবে, ইংরেজি-শিক্ষা আজকার দিনেও যে আমাদের পূর্বের ন্যায় একেবারে সমভাবেই গ্রহণীয় তাহা কোনও মুষ্টিমেয় সংখ্যার কোনও বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে, ইহার প্রয়োজন বৃহত্তর জাতির পক্ষেই এবং সর্বসাধারণের প্রয়োজনেই। তাহা হইলে এক এক করিয়া ভাল ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হয়, আজকার দিনেও ইংরেজি-শিক্ষার প্রয়োজন কি কি। এ-সম্বন্ধে বাঙলা দেশের বায়ুমণ্ডলে যে-সকল কথা এখনও ছড়াইয়া আছে, একটি একটি করিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বক্তব্যকেও নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে, বহু দিনের বহু কারণ একসঙ্গে জড়িত হইয়া ইংরেজি ভাষা এখন প্রায় একটা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বহু দেশ এবং জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারি। এই অবস্থায় ইংরেজি-বিমুখতা আমাদিগকে আস্তে আস্তে কূপ-মণ্ডূক করিয়া তুলিবে।

ইহার জবাবে বক্তব্য এই, একটা জাতীয় জীবনে বাহিরের সহিত যোগাযোগের প্রয়োজন যথেষ্ট হইলেও সেই যোগাযোগের দিকেই একটি জাতির সবটুকু লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত

নহে। দেশের ভিতর হইতে আমরা কিছু গড়িয়া উঠিতে পারি আর নাই পারি, পরের সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থাটা সর্বাগ্রে এবং সুষ্ঠুতম ভাবে ঠিক করিয়া লই, ইহা কোন সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে। ইংরেজির প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, বাহিরের সমস্যাটাই এমন ভাবে আমাদের মন জুড়িয়া বসে যে, তাহার খাতিরে ঘরের সমস্যাটাকে ভুলিয়া থাকিতে আমাদের তেমন আপত্তি নাই। বাহিরের সহিত যোগাযোগের প্রয়োজনটা যত বড় প্রয়োজন হোক না কেন, তাহার খাতিরে দেশবাসী পনরো আনারও অধিক লোকের সম্মুখে একটা কৃত্রিম বাধার বেড়াজাল বিস্তার করিয়া শিক্ষার মৌলিক নীতিকেই ক্ষুণ্ণ করিবার কোনও যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিটা বাহির হইতে আর একটু বেশি ঘরের দিকে সংহরণ করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করি। শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতিকে প্রথমে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিতে হইবে; সেই গড়িয়া উঠার প্রশ্নটাকে মুখ্য করিয়া তুলিয়া বাহিরের সহিত যোগাযোগের প্রশ্নটাকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। দুইটি প্রয়োজনকেই যতটা অবিরোধে সিদ্ধ হইবার আমরা ব্যবস্থা করিতে পারিব, আমাদের ততই মঙ্গল। একটার খাতিরে অপরটিকে খানিকটা ত্যাগ করিবার প্রশ্ন অনিবার্য হইয়া উঠিলে আমরা ঘরের জন্য বাহিরকে খানিকটা ত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু বাহিরের জন্য ঘরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাকে আমরা জাতীয় অপরাধ বলিয়াই মনে করি।

এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের প্রশ্নটা বাদ দিলেও দেখিতে পাই, ইহা এমন একটা অন্তর্নিহিত গুণ-শক্তির চরমোৎকর্ষ বহন করে যে ইহার নিরন্তর সংস্পর্শ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্যই অপরিহার্য্য। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের এই অন্তর্নিহিত গুণ-শক্তির উৎকর্ষের কথা আমরা এতটুকুও অস্বীকার করিতে চাহি না; প্রায় দেড় শত বর্ষ ধরিয়া ইংরেজি সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের উপরে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। এ কথা হয়ত অনেকাংশেই সত্য যে, "সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, ইংরেজি সাহিত্যের সহিত বাঙালা সাহিত্যের এই যোগকে একেবারে আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষপাতী কেহই নহে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে, সেই যোগ-রক্ষার জন্য দেশ শুদ্ধ সব মানুষকে ধরিয়া-বাঁধিয়া এমন করিয়া ইংরেজি শিখাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে কি না। আমরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী না করিয়া তুলিয়াও আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে পারি। সাহিত্যিক রুচি ও প্রবণতা-সম্পন্ন সকল ছেলে-মেয়েই যাহাতে ইংরেজি সাহিত্যকে অধ্যয়ন ও গ্রহণ করিতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা সকলেরই কাম্য। ইহাদের মারফতেই ইংরেজি সাহিত্য—ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত চিন্তারাশি আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ইংরেজি প্রভাবের 'স্বর্ণযুগ' উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাঙলা দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। তখন আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা কত ছিল? সাহিত্যে রুচি-প্রবণতাযুক্ত মুষ্টিমেয় লোকই এই প্রভাবকে গ্রহণ করিয়া জাতির ভিতরে তাহাকে বিকীর্ণ করিয়াছেন। বাদ-বাকি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঘাড়ে সেক্সপিয়ার, কীটস্, শেলি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ব্রাউনিং-এর দুর্বহ বোঝা তাহা হইলে আমরা এমন করিয়া জোর পূর্বক চাপাইয়া না দিলেও পারি। যাহাদের সাহিত্যিক রুচি-প্রবণতা রহিয়াছে তাহারা নূতন সাহিত্য শিখিতে আনন্দই লাভ করে; এই আনন্দ তাহার ভাষা-শিক্ষার সমস্ত পরিশ্রমকে লাঘব করিয়া দেয়। সুতরাং যাহারা সাহিত্যের চর্চায় আনন্দ পায় তাহাদিগকে ইংরেজি পড়িবার বৈকল্পিক সুযোগ দান করা হউক, তাহাতেই আমাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার এই বৈকল্পিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হয়ত মস্ত-বড় একটি আপত্তি তোলা হইবে। সাহিত্যিক রুচি-প্রবণতা থাক আর নাই থাক, মনের অনুশীলনের জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজন; মানুষের কল্পনা-শক্তির স্ফুরণ এবং রসবোধের খানিকটা জাগরণ তাহার মনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অপরিহার্য। এই জন্যই রুচি-প্রবণতা নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের জন্যই কিছু ইংরেজি সাহিত্য চর্চার বিধান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, বাঙলা সাহিত্য এখন যে স্তরে উন্নীত হইয়াছে সেই স্তরে শিক্ষার ভিতরে এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যসিদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইতে পারে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' হইতে কাব্য-মধু পরিবেশন না করিয়া সাধারণ গৌড়জনকে মধুসূদন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত মধুচক্র হইতে কিছু মধু আনিয়া পরিবেশন করিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কোন হানি ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে এইটুকু কর্তব্যের দায়িত্ব বাঙলা সাহিত্যই গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। একটি সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত বিদেশী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিতে হইলে সেই জাতির সব লোককেই বসিয়া সেই ভাষা শিক্ষা করিতে হয় এমন দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি আমাদের দেশ ব্যতীত অন্যত্র সুলভ নহে। ইংরেজি ব্যতীত পৃথিবীতে আর সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত ভাষা নাই, এমন কথা আমরা জোর করিয়া বলিলেও স্বয়ং ইংরেজগণ এ কথা বলিবেন না। অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা অন্য কোনও সাহিত্যেরই কোনও 'বাধ্যতা-মূলক' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন নাই; এগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রচুর সুযোগ দিয়াছেন এবং অনুবাদের ভিতর দিয়া সমস্ত জিনিসটাকেই নিজের ভাষায় নিজের দেশে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুনিয়ার এমন কোনও ভাষা ও সাহিত্য নাই যাহা হইতে প্রচুর অনুবাদ ইংরেজি ভাষায় নাই; এমন করিয়াই সমস্ত জাতিটি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত নিত্য যোগ স্থাপন করিয়া আছে। আর আমরা করিতেছি কি। বাহিরের পৃথিবীর সহিত আমাদের সমস্তটা যোগই একমাত্র ইংরেজির মারফতে। শুধু যে ইউরোপকেই পাইয়াছি ইংরেজির মারফতে

তাহা নহে, এসিয়া, আফ্রিকার সহিত পরিচয়ও একমাত্র ইংরেজির মারফতে। প্রতিবেশীর সকল কথা জানি ইংরেজির মাধ্যমে। প্রতিবেশী কেন? ঘরের কথাও ত জানি ইংরেজির মাধ্যমে! সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ভারতীয় অন্যান্য দেশজ ভাষায় রচিত সাহিত্য—তাহার সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় তাহাও এই ইংরেজির মারফতেই। বলিতে লজ্জা নাই, এক যুগে বাঙলা বলিয়া যে একটি সাহিত্য রহিয়াছে তাহার বহু সম্পদ সম্বন্ধেও আমরা সম্যক্ অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলাম ইংরেজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদে এবং প্রবন্ধে। ইউরোপীয় সাহিত্যকে যে ইংরেজির মারফতে গ্রহণ করি তাহার না হয় মুখরক্ষার জন্য টানিয়া-বুনিয়া এই একটা যৌক্তিকতা দাঁড় করাইতে পারি যে, ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষার অনুবাদ করিলে মূলের সহিত অনেকটা অধিক যোগরক্ষা করা যায়; কিন্তু পারস্যসুফী কবিদের সমগ্র রসাস্বাদনই যে ইংরেজি তর্জমা পড়িয়া করিতে হয়, দুর্বলতা এবং অক্ষমতা ব্যতীত তাহার অন্য কোনও কারণ আছে কি? যে সংস্কৃতের সহিত আমাদের যোগ একেবারে অস্থিমজ্জাগত—তাহার সকল সুধাকেও যে ইংরেজির মারফৎ নয়ন মুদিয়া বসিয়া পান করিতেছি তাহার গভীর তাৎপর্যটা কি? ভারতবর্ষের হিন্দী সাহিত্যের ছিটা-ফোঁটা যাহা কিছু জানি তাহাও যে ইংরেজির মারফৎ ছাড়া জানি না, ইহারই বা তাৎপর্য কি? তাৎপর্য আমাদের দাসত্ব—দেহে ও মনে—আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে।

কূপমণ্ডূকতার হাত হইতে আমরা যদি সত্য সত্যই রক্ষা পাইতে চাই তাহা হইলে এক দিকে পৃথিবীর ভাল ভাল ভাষা ও সাহিত্যগুলির পঠন-পাঠন এবং নিজেদের ভাষার ভিতর দিয়া তাহাদের ভিতরকার ভাল ভাল জিনিসগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। ইংরেজিরও ভাল ভাল জিনিস সব আমরা অনুবাদ করিয়া লইতে পারি; তাহাতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদও বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বাড়িবে। এই সব কাজের জন্য যাঁহারা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবেন, অসীম কৌতূহল ও আনন্দ তাহাদের ভাষা-শিক্ষার সমস্ত শ্রমকে লাঘব করিয়া দিবে। সকলেরই কিছু এই অনুবাদ লাভে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, তাঁহারা যত্নপূর্বক অতি ভাল করিয়া ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিবেন, কিন্তু জনসাধারণের কাজ অনুবাদের মারফতেই হইতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে একবার নূতন করিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া হীরা মালিনীর মালঞ্চে ফুল ফুটাইতে হইলে নিত্যকালের জন্য এই সুন্দরকে তাহার মালঞ্চে বসাইয়া রাখিয়া নিত্যনূতন ফুল ফুটাইবার চেষ্টা অপচেষ্টা। মালঞ্চের গাছগুলি যদি তাহার আত্ম-মাটি হইতে নিত্যনূতন রস-সংগ্রহের চেষ্টা না করে তবে অপরের উৎসাহ-প্রেরণা তাহাকে আর কত কাল উজ্জীবিত করিয়া রাখিবে? নিজেদের সাহিত্যে শিল্পে নিত্য-নূতন ফুলের বাহার জাগাইয়া তুলিতে হইলে নিজেদের মাটি-জল-আলো-হাওয়া হইতে প্রাণ-শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। আত্ম-শক্তি ও আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা না করিয়া শুধু সুন্দরের মুখের দিকে প্রাণপণ করিয়া চাহিয়া থাকিলেই আমাদের নিত্যনূতন কিছু বাড়-বাড়ন্ত ঘটিবে না।

কিন্তু সাহিত্যের কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল: জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি হইবে? সেখানে যে ইংরেজি ছাড়া এক পদও অগ্রসর হইবার জো নাই। নূতন গ্রন্থরচনা এবং অনুবাদের ভিতর দিয়া এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্গগঙ্গাকেও ভাষা-স্রোতস্বিনীর খাতে বহাইয়া দিতে না পারিলে আমাদের শিক্ষা দোষমুক্ত হইয়া উঠিবে না। এ-কথার সারবত্তা এবং সম্ভাবনাকে আজকের দিনে কেহই হয়ত অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু বিজ্ঞজনে বলিবেন,—'ধীরে রজনী, ধীরে।' এ-বিষয়েও আমরা এত ধীরে চলার পক্ষপাতি নই। আস্তে-সুস্থে চলিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের আর চলাই হয় না। এ-সব ব্যাপারে তাই বহুনিন্দিত ভাব-প্রবণতা এবং হুজুকেরও অনেকখানি প্রয়োজন রহিয়াছে। একটা জাতীয় সঙ্কল্পরূপে গ্রহণ করিয়া এ-ব্যাপারে যদি আমরা একটা বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিতে অগ্রসর হইতে না পারি, তবে এত বড় একটা কঠিন কাজকে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কিছুতেই সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিব না। এ ক্ষেত্রেও যাঁহারা বিশেষ অনুরাগী হইবেন তাঁহারা যতটা সম্ভব মূলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ সাধনের ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু অবিশেষের পথে কোন কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি না হয় তাহাও দেখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজের ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদকেও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

উপরে আমরা যত আলোচনা করিলাম তাহার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতরে আশু কি সংস্কার সম্ভব হইতে পারে? আমাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুগণকে দোভাষার অভিশাপ হইতে আশু মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বি, এ পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা যাহাকে 'বাধ্যতামূলক' বলি, সে ভাবে একটি পত্র রাখা যাইতে পারে সাধারণ ভাবে ইংরেজি শিখিবার জন্য। উচিত হোক, অনুচিত হোক, আমরা চাই না চাই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খানিকটা ইংরেজি জ্ঞান অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজি লেখা-পড়ার সহিত এইরূপ একটা সাধারণ পরিচয়ের ব্যাবহারিক প্রয়োজন আরও দশ-পনর বৎসর পর্যন্ত থাকিবেই। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে বি, এ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ভিতরে যে সাহিত্য শিক্ষা সেখানে বাঙলা সাহিত্যকেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু ম্যাট্রিক হইতে তদূর্দ্ধ সর্ব্ব স্তরেই ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষ অধ্যয়ন বৈকল্পিক বিষয়রূপে স্থান পাইতে পারে। প্রয়োজন, রুচি ও প্রবণতা অনুসারে ছাত্রগণ নিজের ইচ্ছা মত ইংরেজির চর্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, এই ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের শিক্ষার যে শোচনীয় সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার একটা বড় সমাধান হইতে পারে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থ-শ্রমকে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীগণ যদি এই ভাবে মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার মাধ্যমে অন্যান্য শিক্ষায় সার্থক করিয়া তুলিতে পারে—তাহাতে জাতির অপরিসীম কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের কোন আশঙ্কা দেখিতেছি না।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের বাণী

স্বামী সিদ্ধানন্দ

সাধন-ভজন

একটা শুদ্ধ ভাব নিয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। ভাবের জোর না থাকলে দশ জনের কথায় সংশয় আসতে পারে। কারো ...াব নষ্ট করতে নেই। গুরুমুখে যে মন্ত্র পাবে তাতে কখনো সংশয় ...রবে না। সাধন করলে তাতে বস্তুলাভ হবেই।

সাধন-ভজন খুব গোপনে ও নির্জ্জনে করতে হয়। তাতে দিন-...ন শক্তি বাড়ে। উপলব্ধির কথা সবাইকে কখনো বলে বেড়াবে ...। এ সব গুপ্ত না থাকলে পোক্ত হয় না। তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) সাধন-ভজন মনে, বনে ও কোণে করতে ...লতেন। লোক দেখানো ভাব তিনি আদৌ দেখতে পারতেন না। ...াতে বস্তুলাভ তো হয়ই না, বরং হানি হয়।

মেয়েদের ব্যাপারে সাধক সব সময় এড়িয়ে চলবে। যেখানে ময়ে লোক, সেখান থেকে দূরে থাকবে। সাধন-ভজনের দ্বারা ...রীর-মন শুদ্ধ করতে হ'লে মেয়েদের হাওয়া (বাতাস) যেন গায়ে ...া লাগে। মেয়ে সাধকদেরও তেমনি পুরুষদের সংস্রব হতে সর্ব্বদা ...ফাতে থাকা উচিত।

সাধন-ভজন-পথে থাকতে হ'লে মনকে বেশী ছড়িয়ে রাখতে ...নই। এ জন্য মাঝে-মাঝে নির্জ্জনে সাধন-ভজন করতে হয়। বেশী ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কী দরকার? গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে সাধন করে যাও। অভ্যাসে সব হয়।

এখনকার লোকেরা সব আলসে হয়ে পড়েছে; সাধন-ভজনের নামে ভয় পায়। এ সব তম-গুণের লক্ষণ। অভ্যাসের দ্বারা তম-গুণ নষ্ট হয়। তখন নামে রুচি আসে এবং সাধন-ভজন করবার জন্য মন ছটফট করে। লক্ষ্য ঠিক হ'লেই তাঁকে পাওয়া যায়।

সাধন-ভজন করে না বলেই মানুষ মায়ার বিপাকে কষ্ট পায়। তাঁর দিকে গতি করলে (এগিয়ে গেলে) মায়া আর কষ্ট দিতে পারে না।

যে সাধন-ভজনকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে—কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না, ভগবান তাকে অবশ্যই কৃপা করবেন। তাঁকে ধরে থাকলে তাঁর কৃপা হবেই। তিনি কৃপাময়—দয়াময়। তাঁর কৃপা তো সব সময়ই রয়েছে। ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলতেন—"তাঁর কৃপা-বাতাস তো সর্ব্বদাই বইছে; তোরা পাল তুলে দে।"

ভোগেচ্ছা প্রবল হলেই রোগ। ভোগীর কাছে সাধন-ভজন, বিস্বাদ বলে মনে হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা গুটিয়ে আনলে মন সুস্থ হয়। সুস্থ মনে সাধন-ভজন করলে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়। তখন সংসার আর বাধা দিতে পারে না।

মন-মুখ এক করাই হচ্ছে সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য। মনে ভাবছ এক আর মুখে বলছ হরি-হরি—তা হবে না। সাধন-পথে মন-মুখ দুই এক না করলে অভীষ্ট লাভ হয় না। দেখ ভাবের ঘরে চুরি কোরো না। ঠাকুর এ ভাব আদৌ দেখতে পারতেন না। কপটের ধর্ম্ম হয় না। তিনি কপটতা হতে বহু দূরে। শিশুর মত সরল হও। হৃদয় পবিত্র কর। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর মনের ময়লা ধুয়ে দেবার জন্য। মন-মুখ এক করে প্রার্থনা কর—তাঁর জন্য কাঁদ। তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন। তিনি কৃপা না করে থাকতে পারেন না। কৃপাময় তিনি।

যখন আপদ-বিপদ থাকে না—ঝঞ্ঝাট কম থাকে—দিনগুলো অনেকটা নিশ্চিন্তে কাটে—সে সময়টা একটু গরজ করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গ করে নিতে পারলে মহালাভ হয়। মনটা ঠাণ্ডা থাকলে সাধন-ভজনে চিত্তের প্রসাদ লাভ হয় এবং একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দও অনুভব করা যায়। তুলসীদাস বলেছেন—দুঃখের সময় অনেকেই হরিনাম করে, কিন্তু সুখের সময় তাঁর নাম করলে আর কোনো দুঃখ থাকে কি?

সাধন-ভজন করলে সংসার আপনা হতেই সরে যায়। সংসারে থেকে সাধন-ভজন করলে সংসার ভয়ের এবং দুঃখের হয় না। সাধন-ভজন করে না বলেই সংসারে এত ভয় ও দুঃখ ভোগ।

যে সব আদর্শ গুণের অধিকারী হবার জন্যে মানুষ সারা জীবন চেষ্টা করছে, সাধন-ভজনের দ্বারা সেগুলি সহজেই লাভ হয়। যথার্থ সাধক তখন বড় জিনিষ—ঈশ্বর লাভের দিকে অগ্রসর হয়—যা লাভ হ'লে মানুষ এ জীবনেই সর্ব্বগুণান্বিত হয়। তখন চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। তাঁকে জানলে সবই জানা হ'য়ে যায়—তাঁকে লাভ করলে সবই পাওয়া হয়।

সাধন অবস্থায় 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এইটিই ঠিক ভাব। কারণ জগতের দিকে তাকালেই হয়তো জড়িয়ে পড়তে পারে। মোহ, সংশয়, বাসনা—কত কি এসে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র আছেন, আর সবই মায়া—স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এইরূপ একমুখী ভাবে থাকাই যথার্থ পথ।

ঠিক ঠিক সাধক কি করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। এক লক্ষ্য হলেই তাঁকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে শ্রুবা স্মৃতির কথা আছে। সাধন-ভজন করলে শাস্ত্রের সব জিনিষ একে একে উপলব্ধি হতে থাকে। শাস্ত্রে তখনই ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য আশ্রয় করে সাধন-পথে এগিয়ে যেতে হয়।

সাধন-পথে যদি অনেক দেব-দেবীর দর্শন হয় ও তাঁদের ভাল লাগে—তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তাঁদেরকে ইষ্টেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলে জানবে। তাঁরা ইষ্টেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এক ইষ্টই নানা রূপে নানা ভাবে লীলা করছেন। ইষ্ট যেন ভুল না হয়। সাধন-ভজন করতে করতে মন একবার উঠে গেলে তাঁতেই (ইষ্টে) সমাহিত হয়। তখন কোনো দ্বন্দ্ব বা ভেদবুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বত্রই ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন হয়। এরূপ অবস্থা সাধন-সাপেক্ষ।

সাধন-ভজন ছাড়া এ জীবনে কিছুই হবার উপায় নেই—যে যতই বলুক না কেন। সাধুসঙ্গ, তীর্থ ভ্রমণ, শাস্ত্রপাঠ—এ সবই সাধন-ভজনের জন্য। এ সমস্ততে উদ্দীপনা আসে। এ সব কিন্তু মূল নয়—মূলকে ধরবার উপায় মাত্র। আমরা মূল ভুলে কেবল এ সব নিয়েই বিচার করি আর কথা বলি। মূল না ধরলে সবই বিফলে যাবে। খুব সাধন-ভজন কর। শাস্ত্র বলেন, ভগবানকেও তপস্যা করে ভগবান্ হতে হয়েছে। এ সব কি মিথ্যা কথা?

কর্ম্ম (সাধন-ভজন) ছাড়া তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানবার বা বুঝবার কোনো রাস্তা নেই। ফাঁকি দিয়ে কখনো ধর্ম্ম লাভ হয় না। জীবন-পণ করে খাটলে তবে বস্তু লাভ হয়।

কোনটা কর্ম্ম কোনটা অকর্ম্ম এ সব যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝে বা জেনে বিশেষ লাভ হয় না—অযথা পণ্ডশ্রমই হয়। সাধন-ভজন করলে নিজে নিজেই সব বুঝা যায়। কর্ম্ম অর্থাৎ সাধন-ভজন দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয়। কর্ম্মই কর্ম্মকে জানিয়ে দেয়।

যে প্রীতির সঙ্গে পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ও স্মরণ-মনন করে—অর্থাৎ ভালবেসে লাগে বলে করে, তার খুব তাড়াতাড়ি হবে। কেন না, তার ভেতর ইষ্টে স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। গোপীদের এই ভাব ছিল—"অহেতুকী ভালবাসা"।

কিছু দিন নিষ্ঠার সাথে গুরুর দেওয়া মন্ত্রের সাধন করলে মনে দানা বাঁধে। তখন বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সাধন করে যে বিশ্বাস আসে সেটিই ঠিক বিশ্বাস। মনে একবার দানা বেঁধে গেলে দেহ ও মনে শান্তি আসে। সূতো দিয়ে যেমন মিছরির দানা বাঁধে, সাধন-ভজন করে তেমনি মনে দানা বাঁধে। তখন ভাব গাঢ় ও দৃঢ় হয়—কর্ম্মশক্তি খুব বেড়ে যায়। সব কাজেই আনন্দ ও বল (শক্তি) পাওয়া যায়। এত সহজে সাধন-ভজন ছাড়া, এমনটি আর অন্য কিছুতেই হয় না।

নামে রুচি হলেই অনেকখানি সাধন হল। নাম করতে করতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। অনুরাগ হলে তাঁকে পাবার পথ খুলে যায়। এ যুগে নামই তাঁকে পাবার উপায়। ভগবানে অনুরাগ হলেই চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে এবং বিষয়-বাসনা স্বার্থপরতা প্রভৃতি আপনা আপনিই কমতে থাকে। তাঁর ওপর টান হলেই সংসারের টান নিজে নিজেই ঢিলে হয়ে যায়—এমনি তাঁর মহিমা!

ভোগের বাসনা যতক্ষণ মনের ভেতর খেলা করবে, ততক্ষণ ধর্ম্ম-জগতে কিছুই লাভ হবার যো (উপায়) নেই। সাধন-ভজন করলে সে সমস্ত বাসনা নিজে নিজেই দমে যায়। তখন তারা আর বিশেষ মাথা তুলতে পারে না। মন শুদ্ধ হবার সাথে সাথে সেই প্রবৃত্তি নিজে নিজে নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে খুব বিচার করে ভোগের ইচ্ছাকে ঘৃণ্য ও অসার মনে করে সমূলে মন থেকে উঠিয়ে দিতে হয়। তার পর সাধন-ভজন করতে থাকলে হু-হু করে এগিয়ে যাওয়া যায়। এ বিষয়ে বৌদ্ধদের ভাবটা খুব ভাল। তারা ভোগ-বাসনাকে তন্ন তন্ন করে মন থেকে শূন্য করবার চেষ্টা করে। ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) অবশ্য ভোগ-বাসনার কারণকে সংক্ষেপ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন—'কাম-কাঞ্চন ত্যাগ'। তিনি পরে বলেছিলেন—কাম ত্যাগ করলেই হয়ে গেল। এইটিই ঠিক কথা। কাম-ভাবকে ত্যাগ করতে পারলেই পনের আনা কাজ হয়ে যায়। বাকী সব তখন আর জোর করতে পারে না। এ সব বিচার বিবেক আর অভ্যাস-সাপেক্ষ। সাধন-ভজন না করলে এ সব কিছুই হবার যো নেই—সে কথাও বলে দিচ্ছি।

সাধন-ভজন করলে ভেতরের ঈশ্বরীয় গুণ প্রকাশ পায় এবং তাঁকে একটু একটু করে জানা যায়।

খুব উঁচু আদর্শ ধরে ক্রমে ক্রমে সাধন-পথে এগুনো উচিত। নইলে যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়ে থাকতে হবে।

ইষ্টের প্রতি মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে সাধন। প্রথম প্রথম মন বসতে চাইবে না। নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে আছে, এক দিকে আনতে চাইলে সে হঠাৎ রাজী হবে কেন? অভ্যাসযোগ ও মন একাগ্র হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও ইষ্টের স্বরূপ ভক্তের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়।

সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠবার সময় যেমন ধাপে-ধাপে মুখ উঁচু করে ছাদের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠতে হয়, তেমনি মনও খুব উঁচু করে নীচের দিকে না তাকিয়ে কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য করে ধাপে-ধাপে উঁচুতে উঠে যেতে হয়। নীচের দিকে (কাম-কাঞ্চনে) নজর থাকলে সাধকের পড়ে যাবার খুব সম্ভাবনা। যেমন গিরিশ বাবু (মহাকবি নাট্যসম্রাট্) বিল্বমঙ্গলে সাধকের চরিত্রে দেখিয়েছেন।

কিছু দিন নিয়ম করে নিষ্ঠার সাথে সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরে নির্ভরতা আসতে থাকে। ভগবানের ওপর নির্ভর করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। তাঁতে নির্ভরতা কি অমনি আসে? কত সাধুসঙ্গ, ধ্যান-জপ করলে তবে ভগবানে নির্ভরতা আসে। তার জন্য কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করেছিলেন বলে বেঁচে গেছলেন।

মন-মুখ এক কর। কেবল মুখেই বলছ—ভগবান চাই, ভগবান একটু দয়া করলে না। কিন্তু প্রাণের ভেতর তাঁর অভাব অনুভব কর না এবং তাঁকে ঠিক ঠিক চাও না। যদি তাঁকে ভালবাস, তবে বিষয় কামড়ে পড়ে রয়েছ কেন? কি চাও সেইটে ভাল করে লক্ষ্য করে আগে দেখ। তাঁর কাছে ভাবের ঘরে চুরি করলে কোন কালেই মুক্তি হবে না। অন্তর হ'তে তাঁর জন্য যদি অভাব বোধ হয় এবং তাঁকে পাবার জন্য যদি সাধন-ভজন কর তবে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা হবে।

সাধন-রাজ্যে ভাবের ঘরে চুরি চলে না। মন-মুখ এক করে সাধন-ভজন করতে হয়। সেটি যার হয়নি সে ভগবান হতে অনেক দূরে আছে। প্রাণে একটা জিনিষ চাইছ আর মুখে লোক দেখানো 'হরি হরি'—সারা জীবন করলেও কিছুই হবে না। ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) যেমন বলতেন,—'নোঙ্গর মাটিতে ফেলে সারা রাত্রি নৌকোয় দাঁড়টানা হচ্ছে।'

যদি ভগবানের জন্য প্রাণে ঠিক ঠিক ক্ষিদে ও পিপাসা জাগে, তবে তাঁর দয়া হবে। তাঁর কাছে ভণ্ডামী চলবে না, তিনি অন্তর দেখেন। তিনি যে প্রত্যেক জীবের অন্তরে দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে সবই দেখছেন।

জীব যদি সাধন-ভজন করে এবং ঠিক ঠিক তাঁকে চায় তবে সে নিশ্চয়ই তাঁকে পায়। ঠাকুর এ কথা দিব্যি করে বলে গেছেন। তিনি বলতেন—'মাইরি বলছি, যে চায় সেই পায়।' আমরা তো তাঁকে সত্যি সত্যি চাই না—আমরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করি। তাই তো এত দুঃখভোগ।

মনের অনেক ভেল্কি আছে। সাধন-ভজনের দ্বারা একটু চিত্ত স্থির হলেই খুব কিছু একটা হয়ে যায় না। অনেক গুপ্ত সংস্কার মনে থাকে। সে সব হঠাৎ এক দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সাধকের তখন সামাল-সামাল অবস্থা হয়। সে জন্যে আগে থেকেই তৈরী থাকতে হয়। মনকে বিশ্বাস করা যায় না, কখন যে কোন অধঃপাতে নিয়ে যাবে তা বোঝা কঠিন।

নিয়মিত জপ-ধ্যানের দ্বারা মনকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলেছেন যে, মনকে দৃঢ়ভূমি করতে হয়।

সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব কিছুই ভগবানে অর্পণ করলে, কর্মফল আর আবদ্ধ করতে পারে না। এমন কি নিজেকেও তাঁর পায়ে বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতে হয়। এই করতে করতেই তাঁতে আত্মসমর্পণ হয়। নিরন্তর অভ্যাস আর সাধন-ভজন না করলে এ সব উপলব্ধি হয় না। শুধু কথায় কথা শুনতেই বেশ। কর্ম্ম না করলে ধর্ম্ম হবে কোত্থেকে?

সাধুরা দস্যু রত্নাকরকে কাঁধে করে নিয়ে সাধন-পথে এগিয়ে দেননি। তাঁকে নিজে নিজেই কঠোর সাধনা করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। সাধু কেবল সদুপদেশ দিয়ে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেন—দিগ্‌দর্শন করান মাত্র। সাধককে কিন্তু নিজে পায়ে হেঁটে সেই রাস্তা ধরে এগুতে হবে? তা যদি না পার যেখানকার ঘুঁটি সেখানেই পড়ে থাকবে—যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে হবে।

ঠাকুর সবাইকে এগিয়ে যেতে বলতেন। এগিয়ে না গেলে কি রত্ন পাওয়া যায়? সারা জীবন সাধন-ভজন না করে কেবল অলস ভাবে বসে থাকলে কি ভগবান লাভ হয়? তিনি কাজ করিয়ে তবে মজুরী দেন। অলস গোঁফ-খেজুরের মত দিন কাটালে কি সেই পরমানন্দের কণামাত্রও লাভ হয়? ঠাকুর গাইতেন—"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে, সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাব কি তাকে ধরতে পারে?"

সৎ কাজ না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ধ্যান-ধারণা করবে কি করে? আর ধ্যান-ধারণা সাধন-ভজন করতে করতে তবে তো এগুতে পারা যাবে। এ কথা যে বুঝে চলতে পারে সে ভাগ্যবান বৈ কি? এই দেখ, আমাদের গুরুভাইরা (স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি) ঠাকুরকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) দর্শন করে ও সেবা করে তাঁর কৃপা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তা বলে কি তাঁরা ধ্যান-ধারণা, সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাঁদেরকে কি কঠোর তপস্যা করতে হয়নি? তাঁরা তো বলতে পারতেন যে, ঠাকুর সকলকেই কৃপা ঢেলে গেছেন, ভজন-সাধন করবার আর কি দরকার! কিন্তু তাঁরা ঠাকুরের কৃপায় বুঝেছিলেন যে, অনন্তের সাধন-পথও অনন্ত, জীবনও অনন্তকাল ধরে চলেছে—এই দেহ নাশ হয়ে গেলেও সব কাজ ফুরিয়ে গেল না। আমরা সবাই অনন্তধামের যাত্রী।

ভগবানের দুয়ারে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। তুমি দেখা দাও আর না দাও তোমাকে ছাড়ছি নে (নেহি ছোড়েঙ্গে) এই ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে ভগবান আপ্‌সে (নিজেই) দেখা দিবেন। ভক্তের ঠেলায় ভগবান অস্থির। এই জন্য শাস্ত্র বলেছেন—'ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান—এই তিনের সম্বন্ধ সমান।' ঠাকুর বলতেন, খানদানী চাষার মত লেগে থাকতে। কিছু কাল সাধনা করে কিছু অনুভব না করলে সাধন-ভজন ছেড়ে দিবে না। সাধন-রাজ্যের ব্যাপারই এই রকম। লেগে থাকলে কালে অনুভূতি হবেই। ঠাকুর আমাদের বলতেন,—"এক ডুব দিয়ে যদি রত্ন না মেলে তবে রত্নাকরকে রত্নশূন্য ভাবতে নেই।" বার বার চেষ্টা করতে হয়।

ঈশ্বর অনন্ত—অনাদি। তাঁর ভাবও অনন্ত। পরাবিদ্যা বা পরাজ্ঞানের ইতি নেই। এখানকার বিদ্যার একটা সীমা আছে—এত দূর পর্য্যন্ত শিখলে-পড়লে বিদ্যাশিক্ষার এক রকম চূড়ান্ত হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্ব-পথের শিক্ষার কি ইতি (সীমা) আছে? আগে আগে আমার মনে হত যে, খুব ভজন-সাধন করে স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে আছেন—তাঁর নাগাল পাব। এগিয়ে গিয়ে দেখি, যে যায়গায় স্বামীজী ছিলেন সেই যায়গা থেকে তিনি আরও সাধন করে বহু এগিয়ে পড়েছেন। তাঁর সব সাধন হয়ে গেছে বলে তিনি চুপ করে অলস ভাবে বসে থাকেননি। এ যে অনন্তের সাধন ব্যাপার। অনন্তের রাজত্বে যাঁরা ঠিক রাজভক্ত প্রজা তাঁরা কি অলস হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন? সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁরা ক্রমেই এগিয়ে যান।

সবাই তো শুধু ভক্ত, কিন্তু ভক্ত হওয়া বড় শক্ত—একজামিনে (পরীক্ষায়) দাঁড়াতে পারে না। এখনকার সব কেমন ভক্ত? ভেতরে ঠন্‌-ঠন্ (অর্থাৎ সার বস্তু কিছুই নেই)। একটু ল্যাজে পা পড়লে অমনি অভিমানে ফোঁস্ করে ওঠে। সাধন-ভজন না করলে কি রাগ-অভিমান যায়? এখনকার ভক্তরা কেবল বচনে আর ভোজনে দড়। ভেতরে ফাঁপা—টুসকির ভর সয় না; অনুরাগ ও ব্যাকুলতা কোথায়?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কত উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন—"হে অর্জ্জুন, এই হ'ল আদর্শ। এই ভাবে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধন করে সংসারের মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তুমি একটা পথ বেছে নিয়ে মোহ থেকে নিষ্কৃতি পাও। যোগী হও, না হয় নিষ্কাম কর্ম্ম কর। তাও না পারলে সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত হও, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর এবং আমাতে তন্ময় হয়ে যাও। তাহ'লে আমি তোমায় মুক্ত করতে সমর্থ হব।" দেখ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও সাধন-ভজন না থাকলে ভক্তকে কৃপা করতে পারছেন না। কত জন্মের সাধনা ছিল বলেই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সখা হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাঁদের দিয়ে কত কর্ম্ম করিয়ে নিয়েছিলেন। এতেও যদি জীবের ভুল না ভাঙ্গে তাহলে আমরা আর কি করবো? এটি অতি সত্য কথা যে, সাধন-ভজন ছাড়া কিছুই হবার যো নেই। আমাদের ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) স্বয়ং ভগবান হয়েও কত কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে তপস্যা করে গেলেন।

উপন্যাসের সম্বন্ধে

"উপন্যাস, যৌবন যার আছে তাকে শিক্ষা দেয় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এমন এক সুখের জন্যে, যার কোন অস্তিত্বই নেই।"

—অলিভার গোল্ডস্মিথ।

"ইংলণ্ডে এমনিতেই উপন্যাসের প্রতি যেন এক বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায়। অখ্যাত এক রাজনীতিকের আত্মচরিত, সাধারণ এক জন গৃহস্থের জীবনী ভীষণ ভাবে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অথচ এক গোছা উপন্যাস একসঙ্গে সমালোচনা ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন সমালোচকরা। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ইংরেজরা কলাশিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন বোধ করে তথ্যবহুল কেতাবের।"

—সমারসেট মম।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বাগবাজার প্রিয়নাথ মুখার্জ্জির প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর। প্রাতঃকাল। প্রতিবেশী ও সম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দ বেষ্টিত স্বামীজী। ক্ষণপরে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় সম্পাদক বাল্যবন্ধু শ্রীব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়ের প্রবেশ। পরে ভক্ত নট ও নাট্যকার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবলরাম বসু, গুরুভ্রাতাগণ প্রভৃতি]

১ম প্রতিবেশী। (দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠে সখেদে) এবার মধ্য-ভারতের দুর্ভিক্ষে সরকারী হিসাবে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেছে।

সম্পাদক সেন। সংখ্যায় আরও অনেক বাড়বে। It is a paradox that with her plenty India starves. মা অন্নপূর্ণার সন্তান হয়ে ক্ষুধায় একমুঠো অন্ন না পেয়ে মরে যায়!

২য় প্রতিবেশী। পোকা-মাকড়ের মত বেঁচে থাকার চেয়ে কি মরে যাওয়া ভাল নয়, মহারাজ?

স্বামীজী। (বিষাদ ভাবে) তা বটে! কিন্তু Famine is the harsh crit c in the Government, ও দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতো। ফরাসী বিদ্রোহ, রাশিয়ার জারের রাজ-ক্ষমতা লোপ প্রভৃতি ঐতিহাসিক সাক্ষী আছে। তারা অন্যায় অত্যাচার পশুর মত মুখ বুজে সহ্য করে না। এ রকম জঘন্য মরণ তারা চায় না—ঘৃণা করে। তারা মারে ও মরে। যারা পরাধীন—তারা মনুষ্যত্বহীন। তোরা মরেও নেই, বেঁচেও নেই, আধ-মরার দল। তোরা স্রোতের মুখে শেওলা। তোদের কাছে অতীত মৃত, বর্ত্তমান অস্পষ্ট, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তোদের ধর্ম্ম নেই, স্বর্গ নেই, আছে কেবল নরকের তীব্র জ্বালা। নিজের আত্মাকে জাগা, অপরকে জাগাবার সাহায্য কর।

৩য় প্রতিবেশী। এই পবিত্র আর্য্য দেশে আবার কি স্বাধীনতা-সূর্য্য উঠবে না, মহারাজ? এই পূব গগনে আবার কি পূর্ব্বের মত সোনার আলো ফুটবে না?

স্বামীজী। (দৃঢ়কণ্ঠে) আলবাৎ হবে! এ দেশের ওপর মহাপুরুষদের শুভ দৃষ্টি আছে। গোটা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই Whiteman's burden ফেলে শর্ম্মাদের সরে পড়তে হবে। তোরা must overcome the gloomy mental hurdle; কেবল মনে-প্রাণে বলতে হবে—'আমি অমর, আমি স্বাধীন, আমি মরণবিজয়ী'। নরকের ভয় দূর করে, মেরুদণ্ড সোজা করে বল—'আমি অমৃতস্য পুত্র'!

মোটা লাঠি হস্তে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবেশান্তে—নমস্কার, মহারাজ!

স্বামীজী। (সহাস্যে) আয়ে ভবানী ভাই হে, আয় কাছে বস। কেমন আছিস?

উপাধ্যায়। আছি আর কই দাদা। বেঁচে থেকে কেবল কর্ম্মফল ভুগছি। তুমি তো ফিরিঙ্গিদের দেশটা তাতিয়ে মাতিয়ে দিয়ে এলে। Cultural Ambassadorরূপে ওদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়ালে। আর আমাদের এই মড়ার দেশটা কি চিরকালই ঠুঁটো জগন্নাথজী সেজে বসে থাকবে?

স্বামীজী। কেন, তুই তো ভাই বেশ কাজ চালাচ্ছিস। তোর 'সন্ধ্যা' কাগজে কলমের খোঁচায় কর্ত্তারা বেসামাল হয়ে পড়ছে। এই রকম অগ্নিবাণে ওদের আক্কেল গুড়ুম হবার যো হয়েছে। পুরো দমে কাজ চালাও। পাগলা ঘণ্টি বাজাতে হবে এখন, ঢিমে-তেতালা ভাবে নয়। পরনির্ভরশীল জাত—চিরদিন পঙ্গু ও দুর্ব্বল। প্রাণকীটকে তোয়াজ করে কেবল বেঁচে থাকার অভিনয়ের মোহ জয় করে, আত্মার ও মানবতার বিকাশ ও জাগরণের জন্য আমরণ কঠোর তপস্যা চাই।

সম্পাদক সেন। মহারাজ, ঐ বিদেশী জাতটা আমাদের মানসিক মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সর্ব্বনাশা বিষ সেঁদিয়ে দিয়েছে তার ফলে হিন্দু-মুসলমানে মিল নেই, তার দৌলতে ওরা শাসন ও শোষণ চালিয়ে সবাইকে জড়ভরতে পরিণত করেছে মনে ভয় হয় যে, এই বহু প্রাচীন আর্য্য জাতি কি নিশ্চিহ্ন হবে?

স্বামীজী। মা ভৈঃ। এ জাতির কখনই আত্মিক মৃত্যু হতে পারে না—হবে না। কত অবতার, কত সাধু-মহাত্মা এই দেশে জন্ম নিয়েছেন। গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি কত প্রাচীন জাতি কালের স্রোতে অতলে তলিয়ে গেল, এ সভ্যতা বেঁচে রইল। এরই জোরে ওদের কাছে আমরা গুরুপূজার দাবী করব। প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব থাকে ও সেই মত চলে। আমাদের ভাব হোল জগতের মঙ্গল করা, তাই কালজয়ী হয়েছে। অন্য কোন জাত বলতে পেরেছে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'! ঘরে-ঘরে আগুন ছড়াতে হবে। বদ্ধ গণ্ডী ভেঙ্গে সবাই বাইরে মুক্ত বাতাস নিতে আসুক।

সম্পাদক সেন। সত্য কথা, মহারাজ। ওদেশে প্রজাশক্তির দাপটে রাজশক্তি খর্ব্ব, ভয়ে তটস্থ। কিন্তু এ পোড়া দেশে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়। কর্ত্তাদের গুণে প্রেস-আইন অস্ত্রে মুখ বন্ধ করে দেয়, আমাদের সব চাল ভণ্ডুল করে দেয়। তাজা জোয়ান ছেলেদের মাথাগুলো নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে।

উপাধ্যায়। তাদের বিনা দোষে জেলে পুরে তিলে তিলে পচিয়ে মারে। Out-heroding Herod. আর যে সব দেশওয়ালী ঐ ফিরিঙ্গিদের তালে তাল দেয়, তাদের কত তোয়াজ করে—খেতাব দেয়। একটা পাহারাওয়ালার ক্ষমতা আছে আমাদের দেশের বড়লোককে হাতে হাতকড়া লাগানোর।

স্বামীজী। তুই কি বলবি ভাই যে, পশুশক্তি অজেয় আর আত্মিক শক্তি বলহীন? তোর গুণে যে অজেয় পাশুপত অস্ত্র আছে,

তা ভুলিস কেন ? তরোয়ালের চেয়ে কলম শক্তিশালী। একটা লোক মারতে পারে তরোয়াল, কিন্তু হাজার হাজার ঘায়েল হয় কলমের খোঁচায়! ভলটেয়ার, রুশো, টলষ্টয় প্রভৃতির কলমের ঠেলায় গোটা জগতের মোহনিদ্রা কি টুটে যায়নি ? চুটিয়ে মরদের মত সম্পাদকের পবিত্র কর্ত্তব্য করে পশুশক্তির দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দে। চিরবিশ্বাসী কুন্তার মত জান কবুল করে দুঃখিনী জননীর মান রক্ষা কর।

সেন। স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার। কর্তারা এ সত্যকে ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত।

স্বামীজী (বিরক্ত ভাবে), ধামা সরিয়ে দিতে হবে। যেমন ওরা স্বার্থের পথে কাঁটা সরায় with hectic haste. সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, চক্ষুলজ্জা নেই। মেঘ কখনও সূর্য্যকে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে ? স্বাধীনতা হাটে-বাজারে ফলপাকড়ের মত কেনা-বেচা হয় না। রক্ত-পঙ্কেই স্বাধীনতার স্বর্ণপদ্ম ফোটে। আবেদন-নিবেদনে স্বাধীনতা মেলে না। রক্ত-কর্দ্দমের পুণ্য পথেই স্বাধীনতার উজ্জ্বল রথ আসে। সৈনিকের পবিত্র নিষ্ঠাব্রত নিয়ে স্বাধীনতার মশাল জ্বালিয়ে একা চলতে হবে—সঙ্গী কেউ হোল কি না, বা কেউ পিছিয়ে মরল কি না দেখবার ফুরসৎ নেই।

উপাধ্যায়। তাই তো বলছি যে, এই সব খাঁটি কথা দরদী বন্ধুর মত দেশবাসীকে বেদান্তকেশরী ছাড়া আর কে বলবার উপযুক্ত পাত্র আছে ?

স্বামীজী। তাঁর ইচ্ছা হলে লাখ-লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে এক মুহূর্ত্তে। তা ছাড়া, এ দেশটার জমি এখনও তৈরী হয়নি। মিটিং-ফিটিং-এ বিশেষ কিছুই হবে না। লেকচার শুনে লোকে বলে—'বেশ বললে, ভাই'! ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। বাঙ্গালী বাক্যবাগীশ—এ অপবাদ ঘোচাতে হবে। গোড়াপত্তন করতে হবে। কতকগুলো ত্যাগীর সৃষ্টি করতে হবে, যারা সংসারের হাতছানিতে পেছন ফিরে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবন বরণ করে দেশের কাজে আত্মলোপ করবে। আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাই বদ্ধ জীবের লক্ষণ। আবার ও-দেশে যাবার আগে এই—সারতে হবে। বাণীর বরপুত্র বেঁচে থাক তোর কলম। আত্মদাতার দুরন্ত বীর্য্যে প্রাণধর্ম্মে ফেটে পড়—যাতে অপরে বদ্ধ গণ্ডী ছেড়ে মুক্তির আস্বাদ পেয়ে ধন্য হয়।

৪র্থ প্রতি। মহারাজ! ও-দেশের লোকেরা অবাধে রাজনীতি-চর্চ্চা করতে পারে ?

স্বামীজী। হ্যাঁ। রাজনীতি চর্চ্চা ওখানে 'টাবু' নয়—বাণীর স্বাধীনতা আছে। একটা চলিত কথা আছে—ওটারলুর যুদ্ধ ইটন কলেজের ময়দানে জয়যুক্ত হয়। ছাত্রেরাও দেশের ভাল-মন্দ বিচার করে। এ দেশে ওটা যেন পাগলা ষাঁড়ের চোখের সামনে লাল কাপড়।

২য় প্রতি। ঠিক কথা। আচ্ছা মহারাজ, কোন দেশটা ভাল, ইংলণ্ড না আমেরিকা ?

স্বামীজী। ইংলণ্ডটা যেন conservative dyed to the wool. অতি গোঁড়া জাত, সহজে কোন নোতুন ভাব নিতে রাজী নয়। কিন্তু যদি একবার ঐ ভাবের মর্ম্ম ধরতে পারে তাহলে ছিনে-জোঁকের মত আঁকড়ে ধরবে। আর আমেরিকানরা নোতুন ভাব আয়ত্ত করতে সদাই উৎসুক। ওরা উদার মন ও অতিথিবৎসল। ভোগের শীর্ষ সীমায় আছে বলেই ওরা বেশ সহজে বেদান্তের গভীর ভাব ধরতে পেরেছে। তোরা এখন ও ভাব ধরতে পারবিনি। সব তমঃতে ডুবে আছিস। পুঁথিপত্তর কোশা-কুসি সব গঙ্গার জলে টান মেরে ফেলে দিয়ে মহাবীরের পূজোয় লাগ।

উপাধ্যায়। এবার ম'লে কি পশ্চিমে জন্ম নিতে হবে ? যাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা কাঁচা মাংস খেত, গাছের ছাল কেটে পরত, গায়ে উল্কি দিত ? সত্যই কি ওরা শান্তিতে আছে ?

স্বামীজী। ওরা খুব কাঙ্গাল—কিন্তু শান্তিহারা। গোটা ইউরোপটা আগ্নেয়গিরির চূড়ার ওপর বসে আছে, সামান্য আগুনের ফুলকিতে পুড়ে ছাই হবে। Fully cut off from moral mooring—নৈতিক বন্ধশূন্য জাত। জড়শক্তির পূজারী। পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গতে ওস্তাদ।

সেন। সেটা আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

স্বামীজী। কিন্তু যুগের চাকা পালটে যাচ্ছে। ও-দেশের শ্রমিকরা মাথা চাড়া দিয়ে তাদের ন্যায্য দাবী জানাচ্ছে। Refusing to pull out chest-nut from the fire for others, অলস ধনী-দল গরীব-পিটারের রক্তশোষণ করে বাড়ী করে, গাড়ী চড়ে। It is moral leprosy—নৈতিক শুচিতা নেই। এরা মুনাফা-শিকারীর দল—সমাজের শকুনি। এ অনিয়ম চলবে না। চিরকাল পায়ের তলায় কেউ পড়ে থাকবে না। ও-দেশের ঢেউটা এ-দেশেও ভাঙ্গবে। গণদেবতা জেগেছে। ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে ওদের ভাই বলে কোল দিতে হবে।

প্রতিবেশী। ও-দেশে তো রাজা খুব ভাল ভাবে প্রজার সঙ্গে ব্যবহার করে—এ দেশে স্বৈরাচারী শাসন কেন ?

স্বামীজী। এ দেশটা যে ওদের জমিদারী। তাই জাঁদরেল গোছের নায়েব-গোমস্তা পাঠিয়ে শাসনের নামে শোষণ করে। ওরা হেনজিষ্ট হোরসার বংশধর, রাহাজানি করে লুটপাট করাই ওদের ধর্ম্ম। রোমান, কেল্ট, স্যাকসন, নর্ম্মাণ প্রভৃতি নানা জাতির রক্ত ওদের দেহে আছে। শক্তিমানের কাছে নরম। ওদের পলিসী হোল—ভেদনীতি দ্বারা রাজ্য চালান। একবার একটা দলকে কোল দেবে, পরে লাথি মেরে ফেলে অন্য দলকে বড় করবে। এ দেশেও হিন্দু-মুসলমানকে ঐ ভাবে চালাচ্ছে। তাই এখানে এসেছে জালিয়াৎ ক্লাইভ ও জাঁদরেল ডালহৌসী প্রভৃতি। তাই ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী।

প্রতিবেশী। আয়ারল্যাণ্ডের বুকে বসে কি ভীষণ দণ্ডনীতি চালালে—পরে দেশটা দু'খণ্ডে ভাগ করলে। আমেরিকাতে অন্যায় ভাবে ট্যাক্স বসিয়ে কত জুলুম করে প্রভুত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হেরে পালিয়ে এল। ওরা এ দেশের কাঁচা মাল ও-দেশে চালান দিয়ে পাকা মাল তৈরী করে এখানে চড়া দামে বিক্রী করলে।

স্বামীজী। স্বাধীন না হলে তোদের হাড়ির হাল হতে হবে। কুম্ভকর্ণের ঘুম কবে ভাঙ্গবে ? কলিকাল শয়তানের রাজত্ব, যে যত শয়তানি করতে পারবে তার তত জাগতিক উন্নতি হবে।

যুবা। মহারাজ, তাহলে ও-দেশটার উন্নতির মূল কারণ হোল—

স্বামীজী। আয়ান—বিজ্ঞান। গতিশীলতার মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ না করলে বিপদের আবর্ত্তে হাবুডুবু খেতে হবে। Move with the time. তোরা ডাক্তারী, ওকালতী পড়া ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক হবার জন্ত উঠে-পড়ে লাগ। Ring down the curtain over the past, নোতুন যুগের তালে পা ফেলে চলার সাধনা না করে, সেই পুরানো রাস্তায় আমলের চালে চললে পস্তাতে হবে। এ দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান মানবের বন্ধু না হতে পারে, আবার মানবকে দানব রূপ দিতে পারে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি বিপদে শুধু কপাল চাপড়ে বিধির বিধান বলে চুপ করে থেকে, বা দিন-রাত কীর্ত্তন করে বা শীতলা মাতার পূজা চড়িয়েই খালাস হবে না। অনাবৃষ্টি হলে ও-দেশে চাষী বিজ্ঞান-বলে বৃষ্টি তৈরী করে ফসল ফলায়। প্যারীতে গত বিজ্ঞান-সভায় এক জন বাঙ্গালী যুবা বিজ্ঞানে নোতুন সত্য প্রচার করে সমস্ত সভ্য জগতকে তাক লাগাতে আনন্দে আমার বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠেছিল। বিজ্ঞানের পবিত্র আলো জলে উঠুক ভারতের ঘরে-ঘরে। পূর্ণ হবে আবার ধন-ধান্যে সোনার ভারত। She is the cradle of a hoary civilisation, জার্ম্মাণী অনেক বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ওর দাপটে এক দিন ধরা কাঁপবে।

যুবা। কিন্তু মহারাজ, সরকার বিজ্ঞান শেখাবার কোনই চেষ্টা ক'রে দেয় না যে ?

স্বামীজী। তোদের কানা করে রাখলেই তো ওদের ষোল আনা লাভ। Economic strangulation থেকে মুক্ত না হলে উপায় নেই। অর্থনৈতিক মুক্তি চাই। আমাদের দেশের অনেক ধনী টাকা খরচ করে অনেক স্কুল, হাসপাতাল গড়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মশায়ও নিজের চেষ্টায় কত পরোপকার ব্রত করে গেলেন। শিক্ষার ধারা বদলাতেই হবে। ডিগ্রির মোহে ছেলেরা গোলামের জাত তৈরী হচ্ছে। Sheer wastage of human materials to be sealed off. অকেজো অর্থকরী বর্ত্তমান শিক্ষায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আর্য্য ভারত কি জ্ঞান-দীপ জেলে সারা জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেননি ? কোটি কোটি ভগ্ন জীর্ণ জর্জ্জরিত বুক সাহসের ভাষায় ভরাতে হবে। নিরীহ অত্যাচারিত শোষিত কোটি কোটি ভাইদের বাঁচা। আর তাদের বন্ধ্যা বঞ্চিত জীবনে জ্ঞানের আলো ছড়া। বৈষম্য ও স্তরভেদ প্রথা ভেঙ্গে ফেল। অকল্যাণের স্রোত বন্ধ কর। এ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দশ জনও নয়। যারা নীচে পড়ে আছে তাদের না ওপরে তুললে নিজেদের নীচে যেতে হবে। চাই গভীর আদর্শনিষ্ঠা, চাই অটুট কর্ম্মশক্তি, চাই স্বার্থবলি। গ্রন্থকীট শান্ত সুবোধ ছেলের আর দরকার নেই, দামাল বজ্জাত বেপরোয়া ভাবের ছেলের দল উঠুক। মড়ার দেশটা জেগে উঠুক। Twist the lion's tail to quit India soon,—কসে সিংহিটার ল্যাজ মলে সাগর-পারে তাড়া। My India in chains—উঃ ! মায়ের শেকল ভাঙতে মরণ-মালা গলে দুলিয়ে আয় রে শহীদের দল ! পলাশী যুদ্ধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে হবে। খাল কেটে কুমীর আনবার ফল ভুগতে হবে। মিরজাফরের দল ধ্বংস হোক।

সম্পাদক সেন। (সহাস্যে) মহারাজ, ওরা এক দিন আপনাকে অতিথিশালায় নিয়ে যাবে।

স্বামীজী। হিম্মৎ হবে ওদের ? তেমন বুকের ছাতি আছে ! একটা বিবেকানন্দের বদলে তেত্রিশ কোটি বিবেকানন্দ গজিয়ে উঠবে। আর জগৎ দেখবে যে এক দিনেই এই তেত্রিশ কোটি মড়ার দল জেগে উঠেছে। পশুশক্তি টেক্কা মারবে আত্মিক শক্তির ওপর ? ওরা কূটনীতিতে খুব ওস্তাদ। কিন্তু ভবানী ভাই, তোকে যে ওরা এক দিন ঠুকবে। (হাস্য)

উপাধ্যায়। শক্তির দাপটে ঠুকতে পারে, কিন্তু তার বেশী কিছুই করতে পারবে না। হাজার বছর ধরে রাবণ রাজার মত মুণ্ডকাটা তপস্যা করলেও ঐ ফিরিঙ্গিরা এই ব্রাহ্মণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। কলা দেখিয়ে ড্যাঙডাঙিয়ে সগার পারে সটকাব। এখন উঠি। অনেক প্রেরণা পেয়েছি। কালকের কাগজে ঝড়ের বাণীর সুর শোনাতে হবে। কেষ্ট ঠাকুরকে আসরে নামাতে হবে।

স্বামীজী। দোহাই তোর, যেন কদম্বমূলে ননীচোরার কোমল সুর বাজাসনি।

উপাধ্যায়। ক্ষেপেছ দাদা ! হাজার ফণা কালিয় নাগের বিষের জ্বালায় জলে কি কখনও মিহি সুরে টপ্পা ধরা সম্ভব ? পশুর মত বেঁচে থাকা অশুচি। চললুম। নমস্কার ! [প্রস্থান।

স্বামীজী। (স্বগত) ব্রাহ্মণের খোলে ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজের কি পবিত্র যুগ্ম ধারা ! অগ্নিমন্ত্রে বলী হয়ে অমর্ত্তের তীর্থে গেল। যেন ক্রুদ্ধ এট্না প্রলয় করতে জেগেছে। মাতৃ মহাযজ্ঞের পবিত্র অম্লান হোমশিখা ! আশ্চর্য্য, এই মেরুদণ্ড-হীন দেশে শিরদাঁড়া খাড়া করে চলেছে। (প্রকাশ্যে) ওরে নাকঘসার দল, আর কত দিন বিদেশী বুটের তলায় মাথা পেতে দিয়ে ধূলো চাটবি ? আর কত দিন ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত কাল কাটাবি ? অপদার্থ, ভীরু, সম্মানহীন ক্লৈব ও আস্তিক দুঃখ-কষ্টে কেবল ভগবানকে ডাকতে জানে—যে বুড়ে মড়াকে ঘৃণা করে ও তার মুখে মুতে দিতেও আসে না। তোদের ঘুম-ঘোর কেটে যাক্, নির্ভীক সৈনিক হ, ক্ষত্রিয় তেজে গোটা মানুষ হ। মনে রাখিস, টিকিওয়ালা পুরুত, দাড়িওয়ালা মোল্লা, আর জোব্বা পরা পাদরীর হাতেই স্বর্গের সোনার চাবী নেই। আত্মশক্তি জাগা। Religion is never taught but caught. কাল-বোশেখের কালো মেঘে সারা আকাশটা থমথম করছে। পরে পাগলা ঝোড়ো হাওয়ায় আঁধি নেমে সব লণ্ড-ভণ্ড করে দেবে। Face the music of the life squarely. মরণকে এড়িয়ে গেলেই মরণ রেহাই দেয় না। বীরের মত আলিঙ্গন করতে গেলে শক্তিদেবী জয়মাল্য দেন।

(গো-রক্ষণী সভার জনৈক প্রচারকের প্রবেশ ও
গো-মাতার ছবি স্বামীজীকে দিয়া বসিল)

সম্পাদক সেন। মহারাজ, আসল কাজের কথা আর হবে না। অনেক মাল লুটে নিয়েছি। পতাকা বইবার শক্তি দেবেন। মাঝে-মাঝে এসে বিরক্ত করবো।

স্বামীজী। যখন খুসী। দুর্গম পথের দুঃসাহসিক যাত্রী—মা ভৈঃ। পাষাণ-পুরীর শক্ত বেড়া ভাঙবার শক্তি হোক। মুক্তি [illegible] । [[illegible]

(প্রচারককে) আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য ?

প্রচারক। আজ্ঞে মহারাজ, নিষ্ঠুর কশাইদের হাত থেকে অবলা গো-মাতার রক্ষা করবার ব্রত নিয়েছি। তাই সোদপুরে একটা গো-শালা তৈরীও হয়েছে। ঐ পিঁজরা-পোলে গো-মাতারা সুখে আছেন। অনেক ধনী এই পুণ্য কাজে অনেক টাকা দান করেছেন। আরও টাকার দরকার, তাই আপনার মত সাধুর দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসেছি।

স্বামীজী। খুব ভাল করছেন। কিন্তু এবার যে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল, তাদের সাহায্য করতে কত টাকা আপনারা পাঠান ?

প্রচারক। আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোল কেবল গো-মাতার সুখ-সুবিধা দেখা। যারা দুর্ভিক্ষে মরেছে তারা ঘোর পাপী। গত জন্মের কুকর্মের ফলে ঐ ভাবে মরেছে। শাস্ত্র বলে, পাপীকে সাহায্য করা পাপ।

স্বামীজী। (উত্তেজিত ভাবে) বটে ? 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়' —এ মহাবাক্যের কোন দাম নেই ? মানুষ বড় না পশু বড় ? জৈব ও জান্তব সত্তার পুজোটাই বড় হবে ? জ্যোতির্ময় সত্তার বিকাশে চেষ্টা করাও হবে পাপ ? মানুষকে ছেঁটে ফেলে জীব-জন্তুকে রক্ষা করাই যাদের উদ্দেশ্য, সেই সমিতির চিহ্ন যত শীঘ্র লোপ পায় ততই সমাজের ও জাতির পক্ষে মঙ্গল। অষ্টম আশ্চর্য্য—খোদার চিড়িয়াখানার অদ্ভুত সৃষ্টি !

[গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দের সহিত নাট্যকার গিরিশ ঘোষ ও জমিদার বলরাম বসুর প্রবেশ]

স্বামীজী। (স্নিগ্ধ স্বরে) স্বাগতম্। সুস্বাগতম্। নোতুন খবর কিছু আছে ?

তুরীয়ানন্দ। (একটি চেক ও কাপড়ের তৈরী থলিতে টাকা দিয়া) চেকটি দিয়েছে তোমার শিষ্যা মিস্ মূলার। তার বাবার কাছে মাসোহারা পেয়েছিল। দুর্ভিক্ষের তহবিলে দান করেছে।

স্বামীজী। তাহ'লে এ মাসের খরচ চালাবে কিসে ?

তুরীয়ানন্দ। নিবেদিতার মত এক বেলা আলো চাল ও কাঁচকলা খেয়ে কাটাবে। আর ঐ থলির মধ্যে যে টাকা ও রেজকিগুলো আছে তা নিবেদিতা বাড়ী-বাড়ী ঘুরে চাঁদা আদায় করেছে। আরও পাঠাবে।

স্বামীজী। (সাহ্লাদে) ধন্য, ধন্য। ভাখ, আসল ভোগী কেমন সহজে ত্যাগী হতে পারে। বেশী দিন ভোগে ডুবে থাকলে মনটা মরে যায়, মনুষ্যত্ব হারায়। পশুতেই ভোগ করে আনন্দ পায়। (শিষ্য সারদার প্রবেশ) ওরে ! এই চেক্ ও টাকা এখুনি দুর্ভিক্ষের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে হবে।

শিষ্য। যো হুকুম, মহারাজ।

গিরিশ বাবু ও বলরাম বাবু। একটু দাঁড়াও, ভাই। এই সঙ্গে আমাদের এগুলো পাঠিও।

গৃহস্বামী ও উপস্থিত ভদ্রগণ সকলেই যথাসাধ্য দিলেন। ঐ বাড়ীর দুইটি কিশোর সলজ্জ ভাবে স্বামীজীর নিকট দুইটি টাকা দিয়া বলিল—মহারাজ। দিদির ও আমার টাকা পাঠাবেন কি ?

স্বামীজী। (উহাদের ক্রোড়ে বসাইয়া মিষ্ট ভাবে) তোরা এ টাকা পেলি কোথায় ?

বালিকা। ভাল পড়া বললে, কিম্বা ভাল স্তব ঠাকুরকে শোনালে বাবা ও মা কিছু দিতেন। তাই জমিয়ে টাকা গেঁথেছি।

স্বামীজী। বাঃ, বেশ শিক্ষা। আচ্ছা, তোরা এ টাকা দিয়ে কি করতিস। বল না, লজ্জা কি ?

বালক। দিদিভাই, মহারাজের কাছে তোর কথা বলি ?

বালিকা। (কৃত্রিম কোপে) খোকন, ভাল হবে না কিন্তু।

স্বামীজী। (সানন্দে) আচ্ছা, তুই এ কানে বল, আর তুই এ কানে বল।

বালক। দিদিভায়ের ইচ্ছা ছিল, ঠাকুরের জন্মতিথিতে ভাল মিষ্টি দিয়ে এক জন গরীবকে খাওয়াবে।

বালিকা। আর খোকনের ইচ্ছা ছিল যে আপনার নামে ভাল মিষ্টি কিনে গরীব বন্ধুর বাড়ীতে দেবে।

স্বামীজী। সরলের জন্যই স্বর্গদ্বার অবারিত। কত সরল, পাকা ঝানু সংসারীর বুদ্ধি নেই। তোদের দু'টাকা দু'লাখের কাজ করবে। (গৃহকর্ত্তাকে)—বড় তৃপ্তি পেলাম, মুখার্জ্জি। বড় হয়েও যেন এ রকম বড় মন বজায় থাকে। ভারতের ঘরে-ঘরে এ রকম রত্ন জন্মাক। (কিশোরকে) আচ্ছা, তোমরা এখন বাড়ী যাও—পরে স্তব শুনব। (প্রণামান্তে প্রস্থান) (শিষ্যকে) এ দু'টো টাকাও নে। যা। [প্রস্থান।

প্রচারক। তাহ'লে মহারাজ, আমাদেরও কিছু খয়রাৎ করেন। অনেক বড়লোকও আছেন। গো-মাতা রক্ষা করা প্রত্যেক হিন্দুর পবিত্র ধর্ম।

স্বামীজী। (ব্যঙ্গ স্বরে) গো-মাতার এমন সব কৃতী সন্তান থাকতে বেশী ভাববার কি আছে ? (হাস্য) আমরা সন্ন্যাসী-ফকির মানুষ, নিজের টাকা-পয়সা কিছুই নেই। যদি কখনও হাতে টাকা আসে তাহ'লে আগে সেটা মানুষের সেবায় ব্যয় করবো। যারা গরুকে ল্যাঙড়া-ফজলি-রাবড়ি খাইয়ে ধর্মের জয়ঢাক বাজাতে ব্যস্ত আর নিজের জাত-ভাইকে একমুঠো দানা দিতে কাতর, তাদের মুখদর্শন করাও পাপ। এরাও মানুষ বলে গর্ব্ব করে! ফুঃ।

[প্রচারকের প্রস্থান।

আজ বিকালে বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে গিয়ে রক্ষাকালীর পুজো করতে হবে। আর মায়ের চরণামৃত নিয়ে সমস্ত প্লেগ-অঞ্চলে ছড়াতে হবে। দেখবি, সব আপদ-বিপদ বাপ-বাপ বলে পালাতে পথ পাবে না।

গুরুভ্রাতা। (সহাস্যে) এদিকে তুমি এতো বেদান্তবাদী, আবার এদিকে মায়ের ওপর কত অগাধ বিশ্বাস !

স্বামীজী। সব ছাড়তে পারা যায়, কিন্তু গুরুকে কি ভোলা যায় ? ওরে, মা যে কি, তা আমরা বুঝতে পারিনি। স্বয়ং আদ্যাশক্তি গুপ্ত ভাবে সংসারী সেজে নরলীলা করছেন। পরমহংস-দেবের ষোড়শী পূজার কত অর্থ। (সুর করিয়া) কি ভাবনা তার শ্যামা যদি ফিরে চায়। অনন্ত লীলাময়ী, অনন্ত শক্তিরূপিণী।

গুরুভ্রাতা। ঠিক কথা। ঠাকুর এক দিন লাটুকে বলেন—'তুই যার ধ্যান করছিস সে এখন নহবতে রুটি বেলছে।'

(মহাকালী পাঠশালার তপস্বিনী মাতার পত্রবাহকের প্রবেশ)

পত্রবাহক। (স্বামীজীকে পত্র দিয়া সবিনয়ে) মহারাজ, মাতাজী আপনাকে এই পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছেন, যেন আপনি

এক দিন তাঁর বালিকা-বিদ্যালয় দর্শন করতে যান। তাঁর বয়স বেশী হয়েছে তাই স্বয়ং না আসতে পারায় দুঃখিত। আমাদের মেয়েদের কি লেখাপড়া শেখা উচিত নয়? Burning problem—Social revolution চাই।

— স্বামীজী। নারী মহাশক্তির অংশ। তারা পুরুষের কাম মেটাবার যন্ত্রও নয়, আর খেলার পুতুল নয়, but makers of a nation. যে হাতে দোলনা দোলায় সেই হাতে রাজ্য গড়ে। India is at the cross road in her destiny. জাতির এই ভাঙ্গা-গড়ার সন্ধিক্ষণে ওরাই বেশী কাজ করবে। সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকে পঙ্গু করে রাখা মারত্মক ভুল। নারী আপনাতে আপনিই বড়। ওরা প্রকৃতিতে সহজ ও সরল। হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে, কাঁথা সেলাই করে, পুরুষের অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে ফুটলাইটে নিয়ে যায়। ও-দেশে দেখলুম, নারী নিজের মর্য্যাদা আদায় করতে শিখেছে। নরের সঙ্গে সমাজে সমান অধিকার দাবী ক'রে জোরাল আন্দোলন চালিয়েছে। যে সংসারে নারীর সম্মান নেই, সেখানে মা লক্ষ্মীও নেই। (পত্রবাহককে) মাতাজীর স্কুল খুব শীগ্‌গির দেখতে যাব। তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন। আমারও মনে ইচ্ছা আছে, কতকগুলি খাঁটি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর দল গড়ে তুলতে— যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনসাধারণকে আর্য্য ভারতের আদর্শ শিক্ষা দেবে। The soul of India lives in villages। কৃত্রিম সহরে সভ্যতায় কুবেরের ঘটা করে পূজো হয়। ভারতের প্রাণ-ভ্রমরা এখনও বেঁচে আছে গ্রামের মণিকোটায়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির চর্চ্চা বজায় আছে সেখানে। জ্ঞানের আলো না গেলে মানুষ পশু স্তরে নেমে যায়। মরা জাতকে তুলতে হলে নানা দিক দিয়ে তাকে ঘা মেরে জাগাতে হবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

গিরিশ। (গৃহকর্ত্তার মূক ইঙ্গিতে) কিন্তু তোমাকে ওঠাতে হলে আমাদের পেট দেখাতে হবে। (হাস্য) জঠরাগ্নির জ্বালায় সকলেই কাতর।

স্বামীজী। আমি তো এঁদের ধরে রাখিনি।

বলরাম। তোমার কথার বাহুতে এঁরা জানতেই পারেননি বেলা কত গড়িয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। মহারাজ! যোয়ানরা তো আপনার কথায় মেতে উঠবেই, কিন্তু বুড়োর ঠাণ্ডা রক্তও তেতে ওঠে। সংসার-চিন্তা ভুলে কেবল এই পবিত্র তীর্থে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

গৃহস্বামী। আপনারা অন্য সময় আসবেন। এখন ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন।

প্রতিবেশী। ঠিক কথা। মহারাজ, আমাদের প্রণাম নিন।

[সকলের প্রস্থান।

গিরিশ। মায়া দেবী দু'বার হেরে গেছেন। নাগ মশায়কে বাঁধতে গিয়ে উনি পাতলা হয়ে যান, আর তোমার বেলায় মোটা হতে হিমসিম খেয়ে ছেড়ে দেন। (হাস্য)

গুরুভ্রাতা। তাই বটে। এখন উদর-দেবীর পূজাতে চল।

স্বামীজী। (মৃদু স্বরে গান) ডমরু হরকর বাজে বাজে। ত্রিশূলধর অঙ্গ ভস্মভূষণ, ব্যালমালা গলে বিরাজে।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বেলুড় মঠের জমিতে বীজ বপনকারী কর্ম্মরত শ্রমিক দল। মধ্যাহ্ন কাল। জনৈক শ্রমিক কলিকাতে তামাক সাজিল ও ধরাইয়া সেবনান্তে অন্যকে দিল।]

২য় শ্রমিক। (নিবে যাওয়া আধপোড়া বিড়ি কানে গুঁজিয়া নিড়ানি রাখিয়া হাতের তালুর-সাহায্যে কলিকাতে দম দিয়া অন্যকে দিল) বিড়ি খেলে নেশা জমে না। কাশী করে।

৩য় শ্রমিক। (চারি দিক সভয়ে দেখিয়া, এক টান দিয়া অপরকে দিল) যা বলেছিস, ভাই। ওরে, আর সুখে কাজ নেই। এখুনি কেউ এসে পড়বে।

৪র্থ শ্রমিক। আমরা কি মনিষ্যি নয়? একটা ছিলিম খেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

১ম। ওরে, কাজ না হলে বুড়ো বাবা যে বকাবকি করবে।

২য়। ওরা কি বোঝবে না যে প্যাটের ভাতের লেগে মোরা জানটা রগড়ে নিঙ্গড়ে কাজ করি।

(সাধুর প্রবেশ)

সাধু। কই, কাজ তো কিছুই এগোয়নি। কেবল তামাক খাচ্ছ আর গপ্পো করছ।

১ম। না, মহারাজ! এই দেখেন, কত কাজ করা হয়েছে।

সাধু। জান তো, সাধুর পয়সা ফাঁকি দিয়ে নিলে পাপ হয়?

২য়। তা আর জানতে বাকী নেই। অধম্মের কড়ি হজম করা শক্ত।

৩য়। আর জম্মের পাপের ফলে এ জম্মটা ভুগে মরছি। আবার পাপের বোঝা বাড়াব?

৪র্থ। জেনে-শুনে পাপ করলে নরকে পচে মরতে হবে।

সাধু। (সহাস্যে) এদিকে জ্ঞান তো দেখছি খুব টনটনে, কিন্তু আসল কাজের বেলায় ঢলঢলে। ঐ স্বামীজী মহারাজ এদিকে আসছেন।

১ম। তবেই কাজের গয়া হবে।

২য়। হ—গপ্পো জুড়ে সব কাজ বন্ধ করাবেন।

(খেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে স্বামীজীর প্রবেশ)

স্বামীজী। (সহাস্যে)—তোরা সব কেমন আছিস রে?

সাধু। মহারাজ, ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

স্বামীজী। কেন, ঐ তো কাজের চিহ্ন রয়েছে। ওদের পেছনে বেশী টিক্-টিক্ করতে নেই। এটা মনে রাখবি যে গণচেতনা জেগেছে। গণ-নারায়ণের পূজা করাই যুগধর্ম্ম হবে। কালে গণ-চালিত রাষ্ট্র হবে। ও-দেশেও শ্রমিক আন্দোলন চলছে। বড়লোকের তাঁবেদারী করতে আর ওরা রাজী নয়। ওদের ন্যায্য দাবী সমাজকে মানতেই হবে। এটা মধ্যযুগীয় ধর্ম্মযুগ নয়, এটা ডেমোক্রেসীর যুগ। জড়বাদী স্বার্থপর জগৎ অনেক বাধা দেবে, কিন্তু কাল-ধর্ম্মই জয়ী হবে। আচ্ছা, তুই এখন যা, আমি এদের কাজ দেখছি।

সাধু। (স্বগত)—তবেই কাজ এগিয়েছে! [প্রস্থান।

স্বামীজী শ্রমিকদের নিকটে বসিলেন—সভয়ে উহারা দূরে যাইল। 'আপনি সাধু, ভাবতা, মোদের ছুঁয়ো না। মোরা যে ছোটলোক!' স্বামীজীও নিকটে গমন করিলেন।

স্বামীজী। তোরা সরে যাচ্ছিস কেন? তোরাও মানুষ—আমিও মানুষ। সবাই সেই এক ভগবানের ছেলে। তাঁর কাছে ছোট-বড় নেই। কেউ ডাকছে রাম, কেউ রহিম, কেউ যিশু বলছে। নে, তামাক খা।

১ম। এই তো খেলাম।

স্বামীজী। তবু এটা টান না একবার। বেশ ভাল তামাক।

২য়। (টানিয়া) হ্যাঁ রে ভাই, কি খসবো! এমনটি জন্মেও খাইনি।

৩য়, ৪র্থ। (ধূমপানান্তে)—সত্যি ভাই, আমাদের দা'কাটা নয়। বড়লোকের বড় কথা।

স্বামীজী। ছাখ,, আজ বাড়ী যাবার সময় সবাই কিছু তামাক নিয়ে যাবি। (১মকে) হ্যাঁ রে, তোর ক'টা ছাওয়াল?

১ম। তা, এঁজ্ঞে, গণ্ডা দুয়েক! কেউ লায়েক হয়নি। তাই গতর ভাঙ্গিয়ে মানুষ করছি, পরে ওরা দেখবে।

স্বামীজী। বটে? (২য়কে) হ্যাঁ রে, তোর ক'টা বাচ্ছা রে?

২য়। তা হাতের পাঁচটি।

স্বামীজী। কেউ লায়েক হয়েছে? বাইরে থেকে পয়সা এনে সংসারে দেয়?

২য়। একটা ছেলে মিলে কাজ পেয়েছে। যা পায় তা বেশীর ভাগ তাড়ি খেয়ে নষ্ট করে। মেজাজ দেখিয়ে বলে—'মোর রক্ত জল-করা পয়সায় একটু ফুর্ত্তি করবো না'?

৩য়। তুইও তো তাড়ি খেয়ে বৌটাকে মারিস।

স্বামীজী। সে কি রে, এই মেহনতের পয়সা নেশা-ভাঙ্গে নষ্ট করিস? আবার বৌকে মারিস?

২য়। (কুণ্ঠিত ভাবে) রোজ খাই না। মাঝে-মাঝে না খেলে শরীলটার যুৎ হয় না। আর ঐ সময়ই জ্ঞান-গম্যি থাকে না।

৩য়। বদ অব্যেশ করায় বাপ।

৪র্থ। স্বভাব যায় না মলে। বস্তির সবাই নেশা করে।

৩য়। (অদূরে বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়া, সভয়ে) ওঁনারা সব হাসছেন।

স্বামীজী। (স্বামীজীর ইঙ্গিতে উহারা প্রস্থান করিলে)—ঐ ছাখ,, সব চলে গেছে।

৪র্থ। (অদূরে মঠের সাধুরা দল লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া)—আবার সাধুরাও এসেছেন যে।

স্বামীজী। (ইঙ্গিতে চলিয়া যাইবার আদেশ দিয়া)—ঐ ছাখ,, ওরাও চলে গেল। কেউ আসবে না। (৪র্থকে) এই বর্ষাকালে তোদের ভারি কষ্ট, নয়?

৪র্থ। সবই পোড়া অদেষ্টের জন্য! আকাশ যেদিন কেরপা করে নামেন, তখন চোখের দু'পাতা এক করা দায় হয়ে ওঠে! ফুটো চাল থেকে জল পড়ে ঘর থৈ-থৈ করে। ক্যাঁথা, বালিশ সামলাতেই ঐ চালায় ছুটোছুটি করতে হয়।

স্বামীজী। (কোমল ভাবে)—আহা! (স্বগত) এরা psychologically raped—অবোলা, অবলা নিরীহ পশুর মত অস হায় ভাবে পড়ে মার খায়। হাড়ে হাড়ে নিজেদের দুর্ব্বল জ্ঞান করে।

(সাধুর প্রবেশ)

সাধু। আপনাকে দর্শন করতে অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক এসেছেন।

স্বামীজী। আমার এখন ফুরসৎ হবে না। বসতে বল।

[সাধুর প্রস্থান।

('৪র্থকে) তোর ডাঁ্যারার ভাড়া কত রে? বাড়ীওয়ালাকে সারাতে বলিস না কেন?

৪র্থ।' দিন দশ আনা দিতে হয়। মেরামতের কথা বললে মাসী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে—'নবাব-পুত্তুর! হয় ঐ ভাবে থাক, নয় উঠে যা। এ ঘর খালি থাকবে না'।

(সাধুর পুনঃ প্রবেশ)

সাধু। আরও অনেক বড়লোক এসেছেন—কত মিষ্টি, কত মেওয়া এনেছেন। তাঁরা এখানেই এসে প্রণাম করতে প্রস্তুত আছেন।

স্বামীজী। কেতাত্থ হোলেম তাদের আগমনে। এখানে ওদের আসবার দরকার নেই। ওরা নিজেদের আলাদা জাত বলে মনে ভাবে। গরীবদের ঘৃণা করে। টাকার জোরে দুনিয়াটা গ্রাহ্য করে না। একবারও ভাবে না, এরাও সেই পরম জ্যোতির সন্তান। ছাখ, এরা কত সরল। এরা পাহাড়ী সাপের জাত, অনেক দিন ঘুমাচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গেছে, ঘোর কাটেনি। কখনও ল্যাজটা, কখনও পেটটা, কখনও গলাটা নড়ছে। যেদিন খাবারের জন্য ছুটবে সেদিন বড়-বড় গরু-মোষকে গিলে খাবে। চিরকাল ওরা পরের গোয়ালে ধোঁয়া দেবে না। শুনতে পাচ্ছিস ঐ রব—'লাঙ্গল যার জমি তার।' কাস্তে-হাতুড়ির দিন আগত। সাম্যবাদের জয়ধ্বনি জগতে ছড়াবে। সাবধান! মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মে ওপরের ভারী জিনিষ নীচে মাটিতে লুটোয়। অন্তঃসারশূন্য অলস ধনীদের সুদিন গত। আত্মীয়বোধে এই সব সর্ব্বহারাদের সেবা করে নিজেদের মানব-জন্ম সার্থক কর। বুঝলি?

সাধু। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাহলে ভদ্রলোকদের কি বলব, মহারাজ?

স্বামীজী। আজে-বাজে লোক এসে কেবল বকাবে। আচ্ছা চল, আমিই যাচ্ছি। (শ্রমিকদের)—ছাখ, আজ তোদের এখানে নেমন্তন্ন আছে। তোদের কথা মত কোন তরকারী, ডালে নুণ দেওয়া হয়নি। খাবি তো? আমার কথা রাখবিনি?

শ্রমিক। স্বামীজী বাবা, তোর কথায় জান দিতে পারি। কি বলিস, ভাই?

সকলে। নিশ্চয়। খাঁটি কথা।

২য়। কিন্তু আজ কাজ হোল না, মজুরিও পুরো মিলবে না। রেতে বাল-বাচ্ছারা খাবে কি?

স্বামীজী। কোন ভাবনা নেই। তোরা পুরো মজুরি পাবি। (সাধুকে) এদের জন্য ভাল আম রাবড়ি মিষ্টি কিনে আন। (শ্রমিকদের) তোরা ততক্ষণ কাজ চালা। আমি তোদের খাবারের ব্যবস্থা করি গে। বেশী দেরী হবে না। [সাধুসহ প্রস্থান।

১ম শ্রমিক। মানুষ নয়—নিশ্চয়ই কোন ভাবতা!

২য়। হ, ঠিক যেন পাগলা ভোলা।

৩য়। কাঙ্গালের বাপ-মা। এবার কাজে মন দে!

সাধু। (প্রবেশান্তে)—স্বামীজী তোমাদের খেতে ডাকছেন। এস। [সকলের প্রস্থান।

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

শিল্পের বিশ্বজনীনতা বা Universal appeal রবীন্দ্রনাথ প্রাণ-মনে স্বীকার করিতেন। সাহিত্যে এবং সঙ্গীতের উৎকর্ষতার জন্য তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হইতে দান গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই! তাঁহার ভাষায়—

"মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চার দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয়, তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়—তাতেই চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীরে থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা, তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে, তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন,—যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে, সেই মেঘকে তিরস্কার করে আপন সীমা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোন দিন প্রাণবান্ হয়ে উঠবে না। যে কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে কোনো লোক যদি যথার্থ ভাবে আপন করে স্বীকার করতে পারে, তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো-বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ-শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।"

সুন্দরের এবং সঙ্গীতের জাত নাই—সর্বত্র হইতেই তাহাকে গ্রহণ করা যায়! ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্যানময় মূর্ত্তিটির তপস্যা ভাঙিতে পশ্চিমের সুরের স্পর্শ আনিতে হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষার ন্যায় তাহার সঙ্গীতের প্রভাবেই আধুনিক ভারতীয় গানের জন্ম। কিন্তু আকারগত পার্থক্যের জন্যে আজও পাশ্চাত্য সঙ্গীত দূর-আত্মীয়! বাংলা গানে পাশ্চাত্য সুরকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন সর্বপ্রথম 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়!' তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার সমবেত কণ্ঠপ্রচেষ্টা বা কোরাস বিলাতী গান হইতে গ্রহণ করা। বহু গানের বহিরঙ্গে দেশী সুর হইলেও মূল রীতিটি বিলাতী তাঁহার; "যখন সঘন গগনে গরজে" গানটি ঈমন রাগিণীর, কিন্তু রীতি বা style ইংরাজী; তাঁহার বহু গানে সম্পূর্ণ ইংরাজী সুরও ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন—পুরানো প্রেমকো নহি যাও ভূঁইয়া হো (Auld Lang Syne) কেমনে তুই রে যমুনা পুলিন (Ye Banks and Bracs) কিসের নগর আর নবীন যে নাই (Robin Adair) ভাঙিল স্বপন (It was a dream) প্রভৃতি তাঁহার ভাষায়—"ইংরাজী গানে সংযমের ভাব আছে যাহা হিন্দু গানে নাই। ইংরাজী গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর, হিন্দু গান আনন্দাধিক্য হেতু পীড়াজনক। একটি উন্মীলনোন্মুখ ও অপরটি অর্দ্ধ নিমীলিত। একটি জাগরণ অপরটি তন্দ্রা; একটি আনন্দ অপরটি ভোগ; একটি দিবা অপরটি সন্ধ্যা; একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীন গতি, স্বাবলম্বী সুকুমারী ইংরাজ মহিলা, অপরটি যেন গৃহ-প্রাঙ্গণে শশাঙ্কগতি গৃহপ্রবেশোন্মত্তা ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ; একটি যেন প্রভাতের আকাশে উড্ডীন স্বরসুধা পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল; একটি আশাময়ী ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখী, অপরটি যেন সভয়া বিনম্রনয়না অপরাজিতা; একটি হাস্য অপরটি বিলাপ।"

প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত বিদেশীর নিকট অপরিচিত রহিয়াছে তাহার স্বরলিপি প্রবর্ত্তনের অভাবে। বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞগণ এই বিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন—Regarding the notation of India and the formation of scales, little is known owing to the absence of written music. Nor are the ancient Hindoo airs known to Europeans from the impossibility of setting them down according to our system of notations."

Willard. N. Augustus ভারতীয় এবং তাঁহাদের সঙ্গীতের তালের বৈষম্যের কথা বলিয়াছেন—"A great difference prevails between the music of Europe and that of the Oriental nations in respect to time, in which branch it resembles more the rhythm of the Greeks and other ancient nations, than the measures peculiar to the modern music of Europe."

"Few of the ancient Hindu airs are known to Europeans, and it has been found impossible to set them to music according to the modern system of notation, as we have neither staves, nor musical characters whereby sounds may be accurately expressed."

স্যার উইলিয়ম জোন্স ভারতবর্ষের প্রাচীন স্বরলিপি প্রথার কিন্তু উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপে পিথাগোরাস গ্রীসে প্রথম স্বরলিপি বা Notationএর প্রবর্ত্তনা করেন। সেই প্রথায় তখন সুরের নামই চিহ্নিত করা হইত মাত্র। রোমান অধিকারে পোপ প্রথম গ্রেগরী স্বরলিপি সংশোধনে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রোমেও ভারতীয় প্রণালীতে তিনটি সপ্তকের ব্যবহার করা হইত; খাদ সুরের জন্য বড় অক্ষর এবং উচ্চ সুরের জন্য ক্ষুদ্র অক্ষর ব্যবহৃত হইত। একাদশ শতাব্দীতে গিডো আধুনিক স্বরলিপির ধারা প্রবর্ত্তন করেন।

ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রথায় প্রাচীন ভারতীয় গানকে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। এই বিষয়ে Willard সাহেব বলিয়াছেন—"The scale is named after the do, re, mi, manner:—Sha, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni; the octave being named after the first of the scale. The Hindoos have quarter tones, a fact which renders it still more difficult to express their music by our system."

আমাদের দেশেও সঙ্গীতগুণিগণ বহু দিন হইতেই ইংরাজী এবং আমাদের গানের তুলনামূলক আলোচনা করিতেছেন। গত শতাব্দীতে উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলোচনায় বলিতেছেন—"Western Musicians have gone against the natural tones and have introduced an unnatural

scale. This is a motive for creating such, a scale—Having failed to produce psychic effect in their music they have introoduced (what they call) harmony in their music.

"Harmony, they say, is simultaneous productions of several notes. In order to make easy handling of piano, organ, or such other instruments they have divided the octaves into 12 equal intervals (temperament) which they call tempered scale and thereby deviated from the natural path (scale)."

রবীন্দ্রনাথের গান তথা বাংলা দেশের গানকে ইউরোপে যিনি পরিচিত করেন, তিনি এক জন ওলন্দাজ—Dr. Arnold Bake; তিনিও আমাদের গানের তালের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The music moreover does not bear harmonization. The only accompaniment is a purely rhythmic one (তাল) which consists of snapping the fingers at stated places, this snapping being sometimes supplemented or replaced by drumbeats (তবলা) Tagore's subtle yet vigorous rhythm is often accentuated by the singer himself who accompanies the song with sweeping movements of the hand punctuated by snaps of the fingers."

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 'উইলর্ড' সাহেব Encyclopaedia Britannicaয় Treatise on the Hindu Musicএ পাশ্চাত্য এবং দেশী (ভারতীয়) সঙ্গীতের সমালোচনায় বলিতেছেন—"Indeed so wide is the difference between the nature of the European and Oriental Music that I conceive a great many of the latter would baffle the attempts of the most expert countrapuntist to set a harmony to them by the existing rules of the science."

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক Pictro Blasarna তাঁহার 'Theory of sound in its relation to Music' প্রবন্ধে বলিতেছেন—"While harmonics were unobserved by the Europeans till the latter half of the last century (1850) it was a matter of common knowledge to the Hindus of east as far back as the 6th century. Magha makes a passing reference to it in his Sishupal Badha which is a poem merely of general interest, in which poet proves that in the days of Magha general readers of poetic literature were expected in to be familiar with the phenomena."

বিশ্ববিখ্যাত জার্মাণ অধ্যাপক Prof. Helmholtz সঙ্গীত সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—"Music far from a distraction is studies, would as doctors and scientists have definitely proved, impart a soothing and quietening influence on the nerve-centres and as such increase the working capacity of a brain worker. Eminent men in all spheres of life can cherish a love for music. For instance, Prof. Einstein, discoverer of the General Theory of Relativity, is a famous violinist. Romain Rolland, the famous novelist and winner of Nobel Prize, is a noted pianist and musical critic. Paderewesky, the ex-prime Minister of Poland, is perhaps the finest pianist in Europe."

ইউরোপীয় গানের সঙ্গে আমাদের বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গানের আর একটি পার্থক্য—Contrary to European vocal music, when singing an upward movement, Jlissando, it is first note that should be accented."

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার Harmony. কিন্তু আমাদের কাছে তাহা কেবল গণ্ডগোলে পর্য্যবসিত। এক জন ভারতীয় সঙ্গীতবিদের চোখে এই Harmonyর রূপটি এই—"Now let us see what is harmony and how it has improved the Western Music. European musicians say that simultaneous production of notes, C, E and G is their major chord. Let us see what their major chord is and whether there is any emotional effect. Let one of us bellow these three notes simultaneously and let one of us try to imitate the sound so produced. I think none of us will be able to produce it. The reas n is that the notes do not blend together as colours do. Mix red and yellow and they will produce orange colour and red and blue together will give purple colour. Mixture of blue and yellow will make up green colour. In the case of notes they stand separate, whenever we try to imitate harmony we can produce one of them only. Let us see how they produce harmony in their vocal music.

"Let one of us bellow the note 'C' and let two of us bellow 'E' and 'G' in separate harmoniums simultaneously and let them produce the notes they bellow, simultaneously from their mouth, say for five seconds. What we hear is western harmony, and I ask you gentlemen

present to say whether the mixed sound is harmony or a noise? I should say it is a noise.

"Our Idea of true harmony is Unision between any notes on same or on different octaves and not even Unision of sombadi সম্বাদী (paraphonia) notes."

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে Harmony প্রচলনের বিষয়ে উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহা চলিবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়—না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়। কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্ত ভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয় যে, যে-দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্য বস্তু, ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে। তবে কি না ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে।"

Helmholtz সাহেবের সঙ্গীত সম্বন্ধের উক্তি অনুসারে—"Strings in vibrating do not only swing as a whole but have also several secondary motions, each of which produce a sound proper to itself. A string which struck vibrates first in its entire length, secondly in two segments, thirdly in three, fourthly in four and so on. The sound proceeding from them are blended into one note. The lowest note is the loudest and is called the fundamental of prime tone, and the others are called overtones, upper partial tones or harmonics.

কথা-প্রধান গান অর্থাৎ যেখানে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ না করিয়া কাব্যের ভাবে মূল বক্তব্যটি ব্যক্ত হয়—সেখানে Universal appeal বা সর্বজনীন আবেদনের অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান—তাহার ভাবরূপ সুন্দর কথার মধ্যে, বাংলা ভাষার অনভিজ্ঞের পক্ষে তাহার রসগ্রহণ সব সময়ে সেই কারণে সম্ভব নয়!

Dr. Arnold Bake বলিতেছেন রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে—"The text is of great importance in Tagore's songs where text and music seem to mingle. To obtain the true effect, therefore, the Bengali words are essential." ডক্টর বাকে সঙ্কলিত '26 songs of Rabindranath' বইতে যে গানগুলির স্বরলিপি করিয়াছেন—সেইগুলির রীতিও পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। তাহাদের মধ্যে—(১) সে কোন পাগল (২) কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় (৩) ছুটির বাঁশী বাজলো ঐ (৪) নাই নাই ভয় (৫) সকাল বেলায় আলোয় বাজে (৬) আপনি আমার কোন্‌খানে (৭) আকাশে তোর তেমনি (৮) বাঁশী আমি বাজাইনি (৯) ওগো সুন্দর (১০) চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে—প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ।

বাংলা দেশে ইংরাজী গানের প্রচলন ও তাহার সুরের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে আমরা প্রথম যে নামটি স্মরণ করিব—তাহা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম। সে যুগে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতিভা সত্যই বিস্ময়। বাংলা দেশের সঙ্গীতে শৌরীন্দ্রমোহন Renaissance এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য, উভয় ধারার সঙ্গীতের পরম গুণী ঠাকুর মহাশয় বাংলা দেশে সঙ্গীতে ইংরাজী সুরের এবং style এর প্রবর্ত্তনা করিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বের সর্বত্রে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরগুণিরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় গুণী সমাজে ইংরাজী গানের প্রথম পরিচয় করিয়া দেওয়ার গৌরবও তাঁরারই; তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতেই বিলাতী গানের বাংলা রূপের জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়াছেন—"তাঁর বড় ছেলে প্রমোদকুমারও পাকা ইউরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। তিনিই প্রথম কালোয়াতী গানকে স্বরলিপিতে বসিয়ে খুব নাম করলেন। গুরুদাস—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র—সে-ও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতো।"

বাংলা দেশে ইউরোপীয় ধারায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলনে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন, তাঁহার সভা-গায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যুগে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার পরেই যে নামটি স্মরণীয়—তিনি রবীন্দ্রনাথের সুরগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞান সম্বন্ধে সেই সময়ের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুযোগটি তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ:—"ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইউরোপীয় সঙ্গীত জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার নূতন স্বরলিপি উদ্ভাবনে আমি দোষ দিই না। কিন্তু আপনি ইউরোপীয় সঙ্গীত ভালরূপে না জানিলেও, ইউরোপীয় স্বরলিপির গুণ বহু কাল জানিয়াছিলেন। তবু আপনি তাহা প্রচারের জন্য যত্নবান কখন হন নাই। ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। আমার শিষ্যেরা যাহারা ইউরোপীয় স্বরলিপি শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা কেহই কোন বাঙলা স্বরলিপি ছোঁয় না।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক! বিলাতী সুরে পিয়ানো বাজাইয়া একদা তাঁহারা যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সেই সঙ্গে বাংলা গানে প্রথম পাশ্চাত্য গীতি-রীতির সুর।

বহু দিন হইতে তাহার পূর্বেই বিলাতী রীতিতে Orchestra প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক! প্রমোদকুমার ঠাকুর এবং দক্ষিণাচরণ সেন Blue Ribbon Orchestra গঠন করিয়া যন্ত্রসঙ্গীতে ইংরাজী সুরের ভঙ্গী প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদেরই পথ অনুসরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতেও অর্কেষ্ট্রা দল গঠন হয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের

গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের অর্কেষ্ট্রার অংশগ্রহণকারী। তাঁহাদেরই যত্নে এবং আগ্রহে ভারতীয় সুরে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতেরও উন্নতি হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজনায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন: হারমোনিয়মকেও আমাদের গানে পরিচিতও তিনিই করেন। তাঁহার পিয়ানোর সুরে তিনি ও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ গান রচনা করিতেন। "এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ-পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরী হইবা মাত্র, সেটি আরও কয়েক বার বাজাইয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতাম। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত।" এই ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে বাল্মীকি-প্রতিভা এবং কাল-মৃগয়ার গানগুলি। এইগুলিতে বিলাতী সুরভঙ্গি সুস্পষ্ট—(১) ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয় (২) এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার (৩) এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে (৪) সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় (৫) সমুখেতে বহিছে তটিনী প্রভৃতি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিলাতী গানের রীতিমতো চর্চা হইত। পিয়ানোতে বিলাতী সুর বাজিত, গানে ইংরাজী, আইরিশ, স্কচ সুর যোজনা করা হইত, ইংরাজী গান গাওয়া হইত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁহার বাল্যস্মৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"কবি সতের বৎসর বয়সে যখন বিলাত যান, তখন থেকে তাঁর ইংরিজী গানে হাতে-খড়ি। Won't you tell me, Mollie darling, এবং Darling, you are growing old—এই দুই সেকেলে গানের সুর বহু যুগের ওপার হতে আমার কানে ভেসে আসছে। তার পরে যখন আমার পিয়ানো বাজাবার বয়স হল, তখন If, come into the garden Maud, Good night Good night beloved, Good bye Sweetheart Good bye—প্রভৃতি কত রকম ইংরেজী গানই তাঁর সঙ্গে বাজিয়েছি। Tom Moore-এর Irish Melodies ও আমাদের পুরনো বন্ধু তার কতকগুলি সুরে বাঙলা কথাও বসানো হয়েছিল।"

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী সুরের গানের তিনটি ভাগ করিব। প্রথম যুগে কৈশোর-যৌবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে রচিত তাঁহার এই ধারার গান। বাল্মীকি-প্রতিভা এবং কাল-মৃগয়া গীতিনাট্যের বহু গানে ইংরাজী, স্কচ, এবং আইরিশ সুর অবলম্বন করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে—

ইংরাজী সুরের অনুরূপে—(১) Nancy Lee

কালী কালী কালী বলো রে আজ

(২) The British Grenadiers

তুই আমার কাছে আয়, আমি তোরে সাজিয়ে দিই

(৩) Drink to me only

কত বার ভেবেছিনু

স্কচ, সুরের অনুরূপে—(১) Robin Adir

সকলি ফুরালো যামিনী পোহাইল

(২) Ye banks and bracs of Bonie Doon

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়

(৩) Auld Lang Syne

পুরানো সে দিনের কথা"

আইরিশ সুরের অনুরূপে—

(১) Go where glory waits thee

—মানা না মানিলি তবুও চলিলি কি জানি

—মরি ও কাহার বাছা

—ওহে দয়াময়

বাল্মীকি-প্রতিভা এবং কাল-মৃগয়া গীতিনাট্যের গানগুলি গাহিবার রীতিটি বিলাতী ভঙ্গীর। "আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্র-বিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। তখন এই কবিতায় সুরগুলি শুনি নাই, তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলির সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলিতি গান স্বজন-সমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। * * * এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল।"

Dr. Arnold Bake রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে শেষ বয়সে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিলাতী সুর পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার ভাষায়—"রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে আলোচনা করলে ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় যে, এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্পর্শের সংযোগ ফল সন্তোষজনক হয়নি। এর আবহাওয়ায় রচিত গানের মধ্যে তাঁর অন্যান্য গানের আধ্যাত্মিক গভীরতা ও সৌষ্ঠবের অভাব অনুভূত হয়। তথাপি এই, পাশ্চাত্য সংস্পর্শ চমৎকার ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে অন্য দিক দিয়ে—রচনার রীতিতে সুসামঞ্জস্য ও রূপের উৎকর্ষ সাধনে এই প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং এই প্রভাবকে Negative মনে করা যায় না। শুধু সুর-সৃষ্টির দিক দিয়ে এর ফল তেমন আশানুরূপ হয়নি।"

ইংরাজী সুর প্রভাবান্বিত বাংলা গান বলিয়া রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর দ্বিতীয় যুগের গানগুলিকে নির্দ্দেশ করা যায়। এইগুলি বাংলা ভাষায় ভারতীয় মিশ্র রাগিণী-সম্মত সুরে রচিত হইলেও রীতিতে এবং সুরেও য়ুরোপীয় ভাববিশিষ্ট।

(১) আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা (২) মোর মরণে তোমার হবে জয় (৩) নয় নয় এ মধুর খেলা—তোমায় আমায় সারা জীবন (৪) সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি (৫) ধরা দিয়েছি গো, আমি আকাশের পাখী (৬) তোমার বীণায় গান ছিল—প্রভৃতি। 'জাগরণে যায় বিভাবরী, 'অলকে কুসুম না দিও' প্রভৃতি গানে দ্বিতীয়াংশে সঞ্চারীতে Abrupt voice change একটি পাশ্চাত্য গীতিভঙ্গিমা।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় ধারায় এই পর্য্যায়ের গানে European Christian Church Musicএর গম্ভীর উদাত্ত ভাবভঙ্গিটি গ্রহণ করা হইয়াছে। Church Serviceএর গম্ভীর স্বরের উঠা-পড়া এবং উঁচু-নীচু সুর-পরিবর্তনের রীতিটি এই গানগুলিতে সুস্পষ্ট—(১) তোমার হল শুরু, আমার হল সারা (২) আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ (৩) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর (৪) সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি (৫) আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চল যাই, প্রভৃতি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—"এ বড় সামান্য কায়দার কথা নয়। কথার বাঁধুনি কোথাও সুর থেকে বেরিয়ে গেল না। পাশ্চাত্য চার্চ মিউজিকের সুর নিয়েও এমনি স্বচ্ছন্দে খেলা করার নমুনা আছে তাঁর অফুরন্ত গানের ভাণ্ডারে। সেই গির্জে সঙ্গীতের ভঙ্গী নিয়ে রচনা করেছেন…"

ভারতীয় সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল পার্থক্য মেলডি এবং হার্মনির। আমাদের সঙ্গীত Melodious অর্থাৎ এক স্বরের রূপ-প্রকাশক; য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বরসংগতি বা Harmony বাহিরের আকারের পার্থক্যটিই একমাত্র নয়, রসের অন্তররূপেও প্রভেদ আছে। য়ুরোপীয় গান স্বয়ং নানা রসের রূপ প্রদর্শন করে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে একমাত্র 'গীতিরস' ব্যতীত অন্য কোন রসেরই স্বীকার করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এই রসবৈচিত্র্যটি তাঁহার গানেও গ্রহণ করিয়াছিলেন, কৌতুকের গান (কাঁটা বনবিহারিণী সুরকানা দেবী) অশ্রুর গান (মম দুঃখের সাধন যবে) ক্রোধের গান (কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা; শঙ্করা) বীররসের গান (ভাঙ্গ, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও) আবেগের গান (শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে) প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়। তাঁহার ভাষায়—

"য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু আর রাগ-রাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমাদের একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্র তান সহস্র ধারায় উচ্ছসিত হইতেছে, একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে, অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে, কিন্তু নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক রাগিণীর গান চলিতেছে—সেই গানের তান-লয়টিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের যন্ত্রসংগীতের সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন সেই এক—তাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চির ধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি, আর চির নিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া মন রাখিয়া আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব। য়ুরোপীয় সংগীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউখেলার মধ্যে তাহার তাল-মানের যোগ আছে, মানুষের হাসি-কান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।" কবি সেই ভাবগুলি সুরের সঙ্গে আনয়ন করিয়াছেন।

আরও এক শ্রেণীর গানে বিলাতী সুর-ভঙ্গিমা অনুসৃত হইয়াছে সমবেত কণ্ঠপ্রচেষ্টা, বা কোরাসের রীতিতে। বিলাতী গানের ধরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত এবং হাসির গানে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশপ্রেমের গানে পাশ্চাত্য রীতিতে কোরাস অংশের সুর প্রবর্তনা করেন। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'—গানের কোরাস অংশ—'জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয়, জয় হে' এবং মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে—গানের কোরাস অংশ—

'জয় তপস্বীরাজ হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে'—প্রভৃতি গানের ভঙ্গী পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত। সমবেত কণ্ঠের উপযোগী 'আনন্দ সংগীত' রবীন্দ্রনাথের অনেক আছে, এইগুলিতে কেবল কোরাস অংশ নয়, বিলাতী নানা ভঙ্গীই গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে যথার্থ Harmony-র অনুকৃতি এই গানগুলিতে বিশেষ নাই; এই ধারার গান—(১) আমাদের শান্তিনিকেতন (২) মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ (৩) কাঁটা বনবিহারিণী সুরকানা দেবী (৪) আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই (৫) আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন ওগো কর্ণধার (৬) আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে—প্রভৃতি।

উদ্দীপনা বা বীররসের গানও আমাদের বিলাতী সুর হইতে গৃহীত। কবি বলিতেছেন—"কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তূরী, ভেরী, দামামা, শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেন-না, আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা, সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিস নয়। * * * এই জন্যেই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।"

এই শ্রেণীর উদ্দীপনার গান বা বীররসমণ্ডিত গান রবীন্দ্রনাথের—(১) হা রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে (২) গগনে গগনে ধায় হাঁকি (৩) যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে (৪) ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও (৫) আমরা চাষ করি আনন্দে (৬) আমরা নূতন যৌবনেরই দূত (৭) ওরে আয় রে তবে মাত্ রে সবে (৮) সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান—প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথর পাশ্চাত্য সুরের গানের মধ্যে যে সুরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সর্বজনপ্রসিদ্ধ, সেইটির নাম—'ইটালিয়ান ঝিঁঝিট'। স্বদেশী ঝিঁঝিটকে বিদেশী ভঙ্গীতে গাহিলে যাহা হয়, সুরটি তাহাই নির্দেশ করিতেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই হাতে ইহা আবিষ্কৃত,—তাঁহার গানটি—

প্রেমের কথা আর বোল না, আর বোলো না,
আর বোলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা।

তাঁহাদের পারিবারিক সঙ্গীত ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ঐই ইটালিয়ান ঝিঁঝিটের সুরে রবীন্দ্রনাথের নিজের গান—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী।
তোমায় দেখেছি শারদ-প্রাতে,
তোমায় দেখেছি মাধুবী রাতে
ওগো বিদেশিনী।

শুধু 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিট'ই নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—

স্কচ, ভূপালী—পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়
স্কচ, কেদারা—ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়
আইরিশ বেলাওল—ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে প্রভৃতি

এগুলির বাণী অর্থাৎ গানের কথা রচনা রবীন্দ্রনাথের।

ভারতীয় সঙ্গীতে Harmonyর প্রচলন কবি প্রথম যুগে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য অর্জন হয় নাই। প্রথম জীবনে কবি, শ্রীমতী ইন্দিরা এবং শ্রীমতী সরলা দেবীর সহায়তায় পাশ্চাত্য রীতিতে গানে Chord, Polytonality প্রভৃতি প্রবর্ত্তনে আগ্রহী হইয়াছিলেন, এই ভাবেই সৃষ্টি তাঁহার এই গানগুলি—(১) এস এস বসন্ত ধরাতলে (২) সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে (৩) শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল (৪) দে লো সখি দে পরাইয়ে দে গলে সাধের বকুল ফুলহার এবং (৫) সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে—প্রভৃতি।

হার্মনি যদিও কবি আমাদের গানে প্রচলন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যে তাহা সম্ভব তাহার আশ্বাস দিয়াছেন—"হার্মনি অতি মাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছু দিন পর্য্যন্ত ভালো। গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রস গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের নিকট সুর-জগতের একটা বিরাট দিক্ খুলিয়া যাইবে। সেই সম্বন্ধে কবির নিজের ধারণা চিরকালই উন্নত ছিল—"য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মর্ম্মস্থলে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহিরের হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক্ দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কি বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি বলিতে গেলে, রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক্, প্রাচুর্য্যের দিক, তাহা জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলার দিক, তাহা অবিরাম গতি-চাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক; আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশ নীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে, কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি, তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানব-জীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণ রাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা ও নব বসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্য বিস্মৃত বিহ্বলতা।"

শিক্ষা-সহায়ক পুস্তক ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ভারতবর্ষে কত ?

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদির প্রয়োজন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মিঃ উইলিয়াম কলিংস্ শীঘ্রই ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণে আসিবেন বলিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিঃ কলিংস্ এই সকল এলাকায় দুই মাস কাটাইবেন এবং নয়াদিল্লী, বোম্বাই, রেঙ্গুন ও জাকার্ত্তার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন। ঐ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পাঠ্য পুস্তক, কারিগরি-বিদ্যা সংক্রান্ত পুঁথি, বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সহায়ক দ্রব্যাদি এবং রেডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি শিক্ষার সহায়ক নানাবিধ বস্তুর প্রয়োজন কতটা আছে, মিঃ কলিংস্ তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

ঐ সকল দেশে রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত অপরাপর প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্য দানের যে পরিকল্পনা আছে, তাহার সহিত এই শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত কাজের যোগাযোগ সংস্থাপন করাও মিঃ কলিংস্-এর কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

প্যারীতে অবস্থিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরে মিঃ কলিংস তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদির রিপোর্ট দাখিল করিবেন। হালে প্রচলিত উপহার টিকিট ও উপহার কুপনের সাহায্যে অথবা অন্য পন্থায় এই সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি পাঠানো হইবে, তাহা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য আমেরিকা হইতে বিদেশে পুস্তক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পাঠানো বন্ধ হইয়া যায় এবং 'উপহার-কুপনের' সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের পন্থা আবিষ্কৃত হয়। দশ ডলার মূল্যের একটি কুপন বিদেশে পাঠাইয়া দিলে, ইহার সাহায্যেই সেখানকার ছাত্রগণ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পুঁথি-পুস্তকাদি কিনিতে পারেন।

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ সেণ্ট মূল্যের এক-একটি 'উপহার-টিকিট' বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ঐ রকম ৪০খানা টিকিট বিক্রয় হইলে তাহার বদলে একখানা দশ ডলার মূল্যের 'উপহার-কুপন' পাওয়া যাইবে।—মার্কিণবার্ত্তা।

আমাদের প্রেসিডেন্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের নতুন ভারতের 'রাষ্ট্র সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গত উনিশ শ' পঞ্চাশের ছাব্বিশে জানুয়ারী বিশেষ ঘটা করে। এর যে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে অনেক চিন্তা ক'রে, সে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যায় এর রাষ্ট্রিক রূপ আমরা জেনেছি পার্লামেণ্টারী ডেমক্র্যাসী বলে। গণতন্ত্রসম্মত পার্লামেণ্টারী হওয়ায় এর যে সরকার আছে কেন্দ্রে তার পরিচয় হচ্ছে ইংরেজদের মত ক্যাবিনেট গোছের। 'ক্যাবিনেট', 'পার্লামেণ্টারী' এ কথাগুলো আমাদের শাসনতন্ত্রে আমদানী করা হয়েছে ইংরেজি শাসনতন্ত্র থেকে আর এরাই আমাদের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সরকারী পরিচয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি আমাদের রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্রী যেটা মার্কিণ রাষ্ট্রের পরিচয় বহে নিয়ে আসছে। আবার ইংরিজি মতে এক জন শাসনতান্ত্রিক ওপরওয়ালা (constitutional head) রাখার ব্যবস্থা হয়েছে যাঁকে প্রজাতন্ত্রের 'প্রেসিডেন্ট' বা রাষ্ট্রপাল বলে খ্যাত করা হবে মার্কিণ ফেডারাল নীতির অনুকরণে। এ রকম ব্যবস্থা কতকটা দেখা যায় ফরাসী রাষ্ট্রের ব্যাপারেও। কাজেই এই প্রেসিডেন্ট যিনি এত বড় একটা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের 'কনষ্টিটিউশনাল হেড' তাঁর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও মর্য্যাদা যে কি ধরণের হবে, সে বিষয়ে অনেকের ধারণা একটু অস্পষ্ট রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বাহান্ন ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মকর্ত্তা হিসেবে থাকবেন এক জন প্রেসিডেণ্ট। যে রাষ্ট্রের কর্ত্তা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সে রাষ্ট্রটা আসলে কি রকমের হবে সেটার বিষয় প্রথমে আমাদের একটু ধোঁকা লেগে যায়। কারণ প্রেসিডেন্ট-ওয়ালা রাষ্ট্র বলতে আমরা সাধারণতঃ মার্কিণ রাষ্ট্রের সঙ্গেই পরিচিত বেশী করে। তা ছাড়া আমাদের প্রজাতন্ত্রকে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' নামেও পরিচিত করা হয়েছে। আমাদের সন্দেহ দূরে চলে যাবে যদি আমাদের সরকারের দিকে একটু চেয়ে দেখি। প্রেসিডেন্ট উপরে থাকলেও এ সরকার কিন্তু মার্কিণ-মার্কা 'প্রেসিডেন্সিয়াল' নয়, বৃটিশ ছাঁচে 'পার্লামেণ্টারী'। পার্লামেণ্টারী যদি হল তবে এর উপরে কোন শাসনতান্ত্রিক 'মনার্ক' না রেখে প্রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হল কেন, এ প্রশ্ন এবারে ওঠে। এর উত্তর আমরা পেয়েছি গণ-পরিষদের বিশেষ শাখা খসড়া সভার (Drafting Committee) চেয়ারম্যান আম্বেদকরের কাছে। তিনি বলেছিলেন, "Beyond identity of names there is nothing common between the form of government prevalent in America and the form of government proposed under the draft constitution." তা হলেই দেখা যাচ্ছে, মার্কিণ অনুকরণে প্রেসিডেন্ট নামটাই শুধু রাখা হয়েছে। তফাৎটা বেশী। মিল ঐ 'identity of names' ছাড়া আর বিশেষ নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্ট মার্কিণ প্রেসিডেন্ট থেকে কতটা তফাৎ তার একটু ধারণা করে নেওয়া দরকার। আমাদের সরকার 'পার্লামেণ্টারী' আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার 'প্রেসিডেন্সিয়াল'। [illegible]

ও প্রতিপত্তির অধিকারী, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সেখানকার কার্য্যকরী বিভাগের কর্ত্তা, 'executive head'। তিনি সারা দেশকে শাসন করেন। ভারতের প্রেসিডেন্ট শাসন করেন না। তিনি সারা দেশ ও জাতির মুখ্য প্রতিনিধিত্বের সর্ব্বোচ্চ প্রতীক, 'the symbol of the Nation,' 'the ceremonial Head. সারা ভারতীয় রাষ্ট্রের তিনি প্রধান, ভারত সরকারের নন। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট সারা যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রধান, তার সরকারেরও কর্ত্তা। তিনি রাজত্বও করেন, শাসনও করেন। ভারত-প্রেসিডেন্ট দু'টোর একটাও করেন না। কেবল সর্ব্বোচ্চ শক্তি ও একতার আধার মাত্র যাঁর নামে যাবতীয় সরকারী কাজ চালান হয় মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা। এ বিষয়ে তাঁর কতকটা ফরাসী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিল আছে। সে প্রেসিডেন্টও রাজত্ব বা শাসন কিছুই করেন না, পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রের মাথা মাত্র। বৃটিশ রাজেরই এক রকম প্রতিমূর্ত্তি প্রেসিডেন্ট নামে। ভারতের প্রেসিডেন্টও অনেকটা তাই। ভারতীয় ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মাধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পুরোপুরি ক্ষমতার অধিকারী। তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কাজের সুবিধের জন্যে তিনি জন কয়েক সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন এক-এক জনকে এক-এক বিভাগের ভার দিয়ে। এ সব সেক্রেটারীরা তাঁকে পরামর্শ দেন। কিন্তু সে পরামর্শ গ্রাহ্য করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য নন বরং সেক্রেটারীদের কার্য্যকাল তাঁর খুসীর উপর নির্ভর করছে। ভারতীয় প্রেসিডেন্ট তাঁর কাজের সুবিধের জন্যে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্যবাধকতার মধ্যে জড়িত। মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ তাঁকে করতেই হবে! আমাদের প্রেসিডেন্ট কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন না, যতক্ষণ সে মন্ত্রী আইন সভার সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে বলীয়ান আছেন।

ভারতের রাষ্ট্র গঠনের দিক থেকে কতগুলো রাষ্ট্রের একটা ইউনিয়ন বটে, কিন্তু এর শাসনতান্ত্রিক গঠন ঠিক 'ইউনিটারী' বা ঠিক 'ফেডারাল' নয়। এ বিষয়ে আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণেতারা বৃটিশ অভিজ্ঞতারই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাই আমাদের শাসনতন্ত্রকে অনেকটা তার অনুকরণেই করা হয়েছে। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে তাই 'পার্লামেণ্টারী' ও 'ক্যাবিনেট' চরিত্রে গড়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'প্রেসিডেন্সিয়াল' রাষ্ট্রের সঙ্গে 'পার্লামেণ্টারী' সরকারের অভিনব সংমিশ্রণের জন্যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র একটা বৈচিত্র্য পেয়েছে। তাই কোন সমালোচক একে "quasi-Federal parliamentary democracy" বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের যিনি শাসনতান্ত্রিক প্রধান হয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান নিয়ে থাকবেন তাঁর নামে আর কাজেও এই অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যাবে মার্কিণী আর ইংরিজি প্রথার মিশ্রণের ফলে। ভারতীয় প্রেসিডেন্টের নামটার দিকে না চেয়ে যদি আমরা তাঁর সত্তা, মর্য্যাদা ও ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য দি, তা হলে দেখব তিনি আমাদের রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রপুরুষ সেই হিসাবে, যে হিসাবে বৃটিশ রাজা হচ্ছেন বৃটেন রাষ্ট্রের 'কনষ্টিটিউশনাল হেড'। ইংরিজি শাসনতন্ত্রে রাজার যে অস্তিত্ব ও ক্ষমতা, আমাদের শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের প্রায় অনুরূপ অস্তিত্ব ও ক্ষমতা। গণ-পরিষদে যুগ্ম সম্পাদক এস মুখার্জ্জি মহোদয়ের মতে 'The President occupies the same position as the king under the English constitution." বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ক্যাবিনেট

সরকারের নিয়মে মাথার উপর একটি নিরপেক্ষ মূর্ত্তি থাকবেন যাঁর স্থিতি সূচনা করবে জাতীয় ঐক্যের এবং যাঁর ক্ষমতা সব সময়ই প্রযুজ্য হয়ে চলবে সরকারী কাজের সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে রাষ্ট্র ও জাতির উন্নতি ও মঙ্গলবিধানের দিকে। এই নিরপেক্ষ মূর্ত্তি হচ্ছেন সেখানে রাজা, আর তাঁরই এক রকম অনুকরণে আমাদের থাকবেন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু সেখানে যেমন রাজার ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব সেখানকার আইন সভার কমিটি ক্যাবিনেটের প্রভাব ও অনুমোদন ছাড়া অপ্রকাশ্য, আমাদের প্রেসিডেণ্টের অস্তিত্ব তেমন একটা মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। কারণ প্রেসিডেণ্ট বললেই বুঝতে হবে মন্ত্রীদের পরামর্শে চালিত প্রেসিডেণ্ট।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদটা নির্ব্বাচিত, ইংলণ্ডের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার অধিকার নয়। এখানে ইংরেজদের নীতির সঙ্গে মেলে না, মেলে মার্কিণ নীতির সঙ্গে। আমাদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হবেন 'সিঙ্গ্‌ল্ ট্রান্সফারেবল' ভোট প্রয়োগে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রথায়। তিনি নির্ব্বাচিত হবেন, কিন্তু সরাসরি দেশের জনসাধারণ তাঁকে নির্ব্বাচন করতে পারবে না। তাঁকে নির্ব্বাচন করবে একটা নির্ব্বাচক-গোষ্ঠী যাকে বলা হয় 'ইলেক্টোরাল কলেজ' (electoral college), যদিও এর সভ্যরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। এ 'ইলেক্টোরাল কলেজ' আবার গঠিত হবে কেন্দ্রীয় আইন সভার দুটো কক্ষের নির্ব্বাচিত সভ্যদের ও সংগঠনকারী রাষ্ট্রগুলোর নিম্নকক্ষের নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা। নির্ব্বাচিত হবার পর প্রেসিডেণ্ট একটা শপথ নেবেন এই মর্ম্মে যে, তিনি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাজ নির্ব্বাহ করবেন এবং সব সময়ে চেষ্টা দেবেন "to preserve, protect and defend the constitution and the Law", আর আত্মনিয়োগ করবেন ভারতের জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান ও সেবায়। শপথ নিয়ে তিনি গদীতে বসবেন পাঁচ বছরের জন্তে। পাঁচ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও তিনি আবার নির্ব্বাচিত হতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট হতে গেলে যে সব গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তা' এখানে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ, প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীকে পাকা ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বয়স হওয়া চাই কম করে পঁয়ত্রিশ বছর, আর শেষতঃ তাঁকে হতে হবে আইন সভার নিম্নকক্ষের সদস্য। প্রেসিডেণ্ট হয়ে যাবার পর আর তাঁকে সদস্য থাকতে হবে না। প্রেসিডেণ্ট একবার হতে পারলে যে তাঁকে আর সরান যাবে না এ কথা বলা ভুল। শাসনতন্ত্রের একষট্টি ধারায় বলা আছে, তাঁকে পদচ্যুত করা যেতে পারে যদি তিনি প্রমাণিত হন অযোগ্য বলে। অবশ্য এ বিষয়ে কোন রকম প্রস্তাব আসতে পারে আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছ থেকে নয়, আইন সভার কোন কক্ষের অধিকাংশ সভ্যদের লিখিত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টের অবস্থা এমন ভাবে স্থির করা হয়েছে যে, তাঁর কাজ ও অস্তিত্ব বুঝতে গেলে বুঝতে হবে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁকে সংশ্লিষ্ট ভাবে। কারণ প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতটা এত বেশী যে, মন্ত্রীদের মন্ত্রণা ছাড়া প্রেসিডেণ্ট একেবারেই অস্তিত্ববিহীন বললে চলে। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের সম্বন্ধ কী রকম? শাসনতন্ত্রের চুয়াত্তর ধারার প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রেসিডেণ্টের কার্য্য সম্পাদনে তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে এক জন প্রধান মন্ত্রীর অধিনায়কত্বে একটা মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) থাকবে। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা যুক্ত ভাবে দায়িত্বশীল থাকবেন আইন সভার নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ দি পিপল্‌স্'এর কাছে। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে মন্ত্রিসভা ও আইন সভার এ রকম সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজা ও ক্যাবিনেট আর 'হাউস অফ কমন্সের' যে সম্বন্ধ আছে তার অনুকরণেই প্রায় বলা যেতে পারে। আমাদের শাসনতন্ত্রেও এটা এমন কিছু নতুন নয়। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশের ভারত শাসন আইনে গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে মন্ত্রিসভা ও 'লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্লি'র যে সম্পর্ক ছিল এ তারই এক রকম পুনরাবৃত্তি। মন্ত্রিসভা গঠনে প্রেসিডেণ্টের হাত আছে প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে। নিয়ম হচ্ছে, প্রেসিডেণ্ট প্রধান মন্ত্রীকে ডাকবেন তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে। প্রধান মন্ত্রী এমন সভ্যদের ডেকে সেটা গড়বেন যাঁরা সাধারণতঃ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একদলীয় লোক হবেন আর যাঁরা আইন সভার কোন কক্ষের সভ্য থাকবেন অন্ততঃ ছ'মাস ধরে। তার পর প্রধান মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সভ্যদের নাম প্রেসিডেণ্টের কাছে প্রকাশ করলে প্রেসিডেণ্ট তাঁদের অনুমোদন ক'রে এক-এক জনকে এক একটা বিভাগের ভার দিয়ে নিযুক্ত করবেন। প্রধান মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা তাই নির্ব্বাচিত নন (অবশ্য তাঁরা আইন সভার সদস্য হিসেবে নির্ব্বাচিত), প্রেসিডেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত। প্রেসিডেণ্টকে একটা মস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তিনি মন্ত্রীদের যত দিন তাঁর খুসী তত দিন মন্ত্রীর গদীতে বহাল রাখবেন। কিন্তু এ ক্ষমতার সমর্থন শুধু আইনেই, কাজে বিশেষ নয়। কারণ এ ক্ষমতা কার্য্যকরী করতে গেলে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্য্যাদায় বাধা পাবার সম্ভাবনা বেশী। আসলে মন্ত্রীরা একটা দলীয় প্রতিনিধি যে দলের নেতৃত্ব করছেন প্রধান মন্ত্রী। তাঁর কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্বের গুরুত্ব দলের উপর এত বেশী যে, তাঁকে উপেক্ষা করবার সাহস প্রেসিডেণ্টকে করতে হবে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই। কাজেই কোন মন্ত্রীকে পদ থেকে তাড়াতে গেলে কাজটা শুধু সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই করা হবে না, তার টানটা যেয়ে পড়বে 'হাউস অফ দি পিপলসে'ও যার সঙ্গে তাঁর দলের রয়েছে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর। প্রেসিডেণ্টকে মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে এ নিয়মটাও কার্য্যকরী হবে একই বিবেচনায়। আইনের মতে তাঁকে পরামর্শ নিতে হবে। নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে যদি তিনি বাধ্য না থাকেন তবে কার্য্যতঃ তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে হয়ত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে নিজের মান রাখতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কা[illegible] বিপজ্জনক। তাতে নাড়ানাড়ি পড়তে পারে একেবারে গি[illegible] 'হাউস অফ দি পিপল্‌স্' মারফৎ দেশের জনসাধারণের মধ্যেও। মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন 'a centra[l] impartial figure' যাঁর লক্ষ্য থাকবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে তাঁদে[র] মতামতকে এমন ভাবে সঙ্গতি দিয়ে রাখা, যাতে কোন রক[ম] মতবৈধের অবকাশ না মেলে। সে রকম ভয় সাধারণতঃ দে[খা] দিতে পারে যখন মন্ত্রিসভায় একটা ফাটল ধরে দলীয় স্বার্থের মত[ভেদের] যুদ্ধের ফলে। সে ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টকে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে হ[বে] উপযুক্ত প্রধান মন্ত্রীকে এমন ভাবে মতে নিয়ে আসতে যাতে [illegible]

দল-যুদ্ধ একটা সংঘাত এড়িয়ে মীমাংসায় পৌঁছয়। হয়ত সে রকম মীমাংসা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে যদি দলাদলিটা একটু বিকৃত আকার নেয়। তখন সব দলগুলোকে একটা সামঞ্জস্যে আনতে গেলে প্রেসিডেণ্টকে একটা সর্ব্বদলীয় বা 'কোয়েলিশন' মন্ত্রিসভা সাজান ছাড়া আর সহজ উপায় থাকবে না। তখন সে সভার উপযুক্ত প্রধান মন্ত্রী বেছে নিয়ে সমস্যার সমাধান আনা প্রেসিডেণ্টের যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয়। প্রেসিডেণ্টের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিপরীত পক্ষকে সরকারী মতে এনে কোন রকম বিপজ্জনক অবস্থাকে কৌশলে এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজে বার করা। ফ্রান্সের অনেক প্রেসিডেণ্টকে এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হয়েছে। কোন কোন প্রেসিডেণ্টকে আবার দেখা গেছে, সমস্যার জটিলতা থেকে বেরোতে না পেরে শেষে নিজের মান বাঁচাতে বিদ্রোহের সামনেও পড়েছেন। জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের দু'-এক জন প্রেসিডেণ্টের কথা এখানে মনে পড়ে।

আমাদের শাসনতন্ত্র প্রেসিডেণ্টকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করেছে। রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা এত বেশী যে পৃথিবীর আর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বাদে, আর কারুর এত ক্ষমতা আছে কি না সন্দেহ। ক্ষমতাগুলো কি কি তার একটা তালিকা যদি আমরা এখন করতে বসি তা হলে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতে হবে। শুধু প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলোর উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে তিনি কতটা ক্ষমতাশালী। তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ভারতীয় নাগরিক। 'কনষ্টিটিউশন্যাল হেড' হিসেবে তিনি এক দিকে যেমন প্রজাতন্ত্রের 'এক্সিকিউটিভ হেড', দেশের আভ্যন্তরীণ গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে অন্য দিকে তেমনি দেশরক্ষার অধিকর্ত্তা হিসেবে এর সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief)। এক্সিকিউটিভ বিভাগের যা কিছু সব সাধিত হবে প্রেসিডেণ্টের নামে। রাষ্ট্রের বড় বড় পদে নিয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন তিনি। পররাষ্ট্র সম্বন্ধ স্থাপন এবং দূত আদান-প্রদান তাঁর কর্ত্তৃত্বেই হয়ে থাকে।

প্রেসিডেণ্টের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সঙ্গে। তাঁদের নিয়োগ করেন ও পদে বহাল রাখেন প্রেসিডেণ্ট। কেন্দ্রীয় আইন সভা বলতে আমরা বুঝব তাঁকে আর 'কাউন্সিল অফ ষ্টেট' ও 'হাউস অফ-দি পিপলস্' নামে দু'টো কক্ষকে। উপরের কক্ষের সদস্যদের মধ্যে বার জন সদস্য তাঁর মনোনীত। আইন সভা বসবার আগে তাঁর ভাষণ নিয়ে কাজে বসাতে হবে। তিনি ইচ্ছে করলে আইন সভায় কোন মর্ম্মে বাণী পাঠাতে পারেন যার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। যখন আইনসভার কোন অধিবেশন থাকে না তখন তিনি বিশেষ ক্ষমতায় কোন মর্ম্মে 'অর্ডিন্যান্স' জারী করতে পারেন। আইন সভা বসান, ভেঙ্গে দেওয়া বা মুলতুবী রাখা তাঁর ইচ্ছের উপর হয়ে থাকে। মতানৈক্য ঘটলে দু'টো কক্ষের একটা যুক্ত বৈঠক তিনি বসাতে পারেন মীমাংসার জন্যে। তাঁর মঞ্জুর ছাড়া কোন বিল আইনে পাশ হতে পারবে না। বিরাট তর্ক-বিতর্ক পর্য্যায় পার হয়ে এসেও কোন বিল প্রত্যাখ্যাত হতে পারে তাঁর কাছে আবার বিবেচনার জন্যে।

বিচার বিভাগেও তাঁর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকরা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত। তাঁরা তত দিন পদে বসে থাকবেন যত দিন প্রেসিডেণ্ট বুঝবেন তাঁরা সচ্চরিত্রের ও কাজে সুদক্ষ। তবে বিচারকদের পদচ্যুতির প্রশ্ন উঠলে তিনি কাউকে পদচ্যুত করতে পারেন যদি আইন সভার দু'টো কক্ষই অভিমত দেয় সেই মর্ম্মে। হাইকোর্টগুলোরও বিচারপতি নিয়োগ ও বদলি তাঁর আদেশেই হয়ে থাকে। গুরু অপরাধে দোষী আসামীকে একেবারে মুক্তি দেবার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের আছে।

রাষ্ট্রের বড় বড় চাকরীগুলোতে প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তৃত্ব মেনে চলতেই হবে। সরকারী চাকুরেরা তাঁর যত দিন খুসী তত দিন চাকরী করতে পারবেন। রাষ্ট্রের সরকারী চাকরী নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে 'ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয়েছে তার চেয়ারম্যান প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তারা প্রেসিডেণ্টের মনোনীত। এই কমিশনের দাখিল করা বিবরণাদি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে আইন সভার অনুমোদনাদি সাধিত হয় তাঁরই কর্ত্তৃত্বে। রাষ্ট্রের এ্যাড্‌ভোকেট জেনারাল, অডিটার জেনারাল প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীরা প্রেসিডেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত।

সংগঠনকারী রাষ্ট্রগুলো—যাদের নিয়ে তৈরী হয়েছে ভারতীয় ইউনিয়ন—সেগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রের সম্বন্ধ কি রকম তা ভাল ভাবে বুঝতে গেলে দেখতে হবে সেখানে প্রেসিডেণ্টের প্রভাব কতটা। রাষ্ট্রের রাজ্যপাল বা গভর্ণরকে নিযুক্ত করেন প্রেসিডেণ্ট। গভর্ণররা রাষ্ট্র শাসন করবেন প্রেসিডেণ্টের হয়ে আর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন পাঁচ বছর প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছে অনুযায়ী। রাষ্ট্রীয় আইন সভার কার্য্যকলাপেও তাঁর যথেষ্ট হাত আছে। বিশেষ কতগুলো বিল আইনে পাশ হবার আগে তাঁর মঞ্জুর পাওয়া চাই। যদি কখন প্রেসিডেণ্ট বোঝেন, কোন রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলতে পারছে না কোন গুরুতর কারণে, তখন তিনি বিশেষ জরুরী অবস্থা ঘোষণা ক'রে সে রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালন ভার নিজের হাতে নিতে পারেন নিজের দায়িত্বে সেখানকার মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে।

বর্ত্তমান সরকারী অবস্থা বিবেচনা ক'রে প্রেসিডেণ্টকে কতগুলো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এ সব ক্ষমতা ছাড়াও। সাধারণতন্ত্রের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের সুব্যবস্থার জন্যে প্রেসিডেণ্ট একটা নির্ব্বাচনী কমিশন গঠন করবেন যার কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ ও তাঁদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে দেবেন তিনি। এটা অবশ্য সাধারণ ক্ষমতাগুলোর মধ্যেই পড়বে। তাছাড়া রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ ব্যাপারে হিন্দী ও ইংরিজি ভাষা কি ভাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্দ্ধারণ করবেন তিনি। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কতটা শক্তি পেল না পেল তা বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্যে প্রেসিডেণ্ট আসছে পঞ্চান্ন আর ষাট সালে দু'টো কমিশন বসাবেন।

প্রেসিডেণ্টের বিষয় আলোচনা করবার সময় আমাদের জেনে রাখতে হবে আমাদের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট কে, আর তাঁর শাসনতান্ত্রিক পরিচিতি কি রকম। বলা বাহুল্য, আমাদের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মহামাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। প্রেসিডেণ্ট বলে তিনি পরিচিত আর সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সম্মান ও পদমর্য্যাদার অধিকারী তিনি এই হিসেবে যে, যত দিন না পর্য্যন্ত সাধারণ নির্ব্বাচনে শাসনতান্ত্রিক মতে কেউ নির্ব্বাচিত হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট, তত দিন তাঁকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হয়েছে অন্তর্বর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গণ-পরিষদের সভ্যদের দ্বারা। তাই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বলেই পরিচিত হবেন তিনি। তাঁর পরবর্ত্তী প্রেসিডেণ্টরা, আশা করা যায়, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ঠিক জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদেরই নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট হবেন।

জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন :

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠ উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়—যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গাইতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।

কবির এই প্রার্থনার মধ্যে সাহিত্যে তাঁহার আদর্শের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'হাসির গান' ও ব্যঙ্গ-কবিতা, সামাজিক প্রহসন ও সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক—সর্ব্বত্রই দ্বিজেন্দ্রলালের লক্ষ্য এক : কেমন করিয়া এ জাতি আবার মানুষ হইবে।

জাতির জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে হইলে এক দিকে যেমন জাতির সম্মুখে উন্নত আদর্শের যোগান দিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই যে সকল দুষ্ট ব্যাধি জাতির জীবনকে মৃত্যুমুখী করিয়াছে, তীব্র কশাঘাতে জাতিকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহাকে সেই সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে কবির ব্যঙ্গ-রচনা এবং কাল্পনিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে তাঁহার নাট্যসৃষ্টি—উভয়েরই উদ্দেশ্য মূলতঃ এক।

হিন্দু সমাজের কোন প্রকার গ্লানি দ্বিজেন্দ্রলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সাধারণতঃ হাসি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক তাঁহার আক্রমণের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু 'একঘরে' প্রবন্ধে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাজের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ যখন তাঁহাকে 'প্রায়শ্চিত্তে'র বিধান দিলেন, অন্যায়-অসহিষ্ণু তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল তখন এই অনুশাসন নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে পারিলেন না। প্রত্যুত্তরে 'একঘরে' প্রবন্ধে তিনি তাঁহাদিগকে 'শতশেলময়ী, দাবানলের স্ফুলিঙ্গময়ী, নরকের জ্বালাময়ী ভাষায়' আক্রমণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন : 'এই জ্বালাময়, গহ্বরময়, কীটদষ্ট সমাজে যাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত? ···বরং আমরা আপনাদের সমাজে এত দিন যে ছিলাম ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, রাজী আছি। যে সমাজে পদে-পদে ভীরুতা, সত্যের গ্লানি, নির্ম্মমতা, যে সমাজে পদে-পদে মিছা কথা, বিবেকের বেশ্যাবৃত্তি, সে সমাজ হইতে এত দিন বাহির হইয়া আসি নাই কেন, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন ত' রাজী আছি।'(১) এস্থলে দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষার সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই, এ কথা সত্য। হয়ত ইহা বয়সের ধর্ম্ম। কিন্তু তাঁহার অভিযোগের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য্য। এবং ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, একই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন : 'আমরাও হিন্দু ; বিলাত গিয়াছি বলিয়া, হিন্দুর পৌরাণিকী প্রথার প্রতি পূর্ণব্যক্ত ঘৃণা থাকিলেও হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা যায় নাই। আমরা যেমন এখানে হিন্দুর আচরণ ও প্রথায় দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাই, বিজাতীয় কেহ হিন্দুর নিন্দা করিলে যথাসাধ্য হিন্দুকে অন্য জাতির শ্লেষ ও বিদ্রূপের হুল হইতে রক্ষা করি, কারণ তাহাতে আমাদেরও গায়ে লাগে। আর-আপনাকে আপনার সমাজের বিষয় যাহা বলিলাম তাহা বিদ্বেষে নহে, শত্রুভাবে নহে, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায় ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ, সেই ক্রোধে বলিতেছি।'

এবং 'একঘরে' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু আঘাতই করেন নাই ; তিনি পুরাতন জীর্ণ সমাজের সংস্কার করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন : 'একঘরে করিতে চাহেন, আসুন আজ যে সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু, তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন, আজ বলি, যে শঠতা করিবে, মিছা কথা কহিবে, তাহাকে একঘরে করিব ; যে স্ত্রী ছাড়িয়া বেশ্যাবৃত্তি করিবে তাহাকে একঘরে করিব, যে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবে, তাহাকে করিব ; যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহাকে একঘরে করিব। আসুন যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে, তাহাদিগকে একঘরে করি, পীড়নের হেতু করি। সে একঘরেতে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন হইবে। সে একঘরের অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না ; কারণ তাহার অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্তি। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম।'(২)

সংহতিই জীবন ; বিভেদ মৃত্যু। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন : 'বিলেত-ফেরতারা মূর্খ হইলেও তাদের একঘরে করিয়া আপনাদের সমাজ বলবান হইবে না। কোন জাতি কোন কালে নিজের মধ্যে বিচ্ছেদের নীতি অবলম্বন করিয়া বড় হয় নাই। বরং সম্মিলনের নীতিতেই বড় হইয়াছিল। গ্রীস এই গৃহবিবাদে ডুবিল, ভারত এই গৃহবিবাদে উচ্ছন্ন হইল।(৩) রোম যে বড় হইয়াছিল তাহা দেশীয়কে জাতিচ্যুত করিয়া নহে, বিজাতিকে স্বজাতি করিয়া লইয়া। বৃটেনও বড় হইয়াছে বিচ্ছিন্নতায় নহে, মিলনে। জাতিতে কেন, পৃথিবীর চারি দিকেই সংযোগই উন্নতি, বল, সভ্যতা, জীবন ; বিচ্ছিন্নতা—অবনতি, ব্যাধি, বর্ব্বরতা, মৃত্যু।'

দ্বিজেন্দ্রলাল নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনি 'একঘরে' প্রবন্ধে বিলেত-ফেরতার পক্ষে ওকালতী করিলেও এই সম্প্রদায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার সমালোচনার চাবুক হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এই প্রসঙ্গে 'হাসির গানে'র 'আমরা বিলেত-ফের্ত্তা ক' ভাই' বিশেষ

---

(১) 'মেবার পতনে' মহাবৎ খাঁর উক্তি : "প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা বলছিলেন না, পিতা? হাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো। কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয় ; এত দিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।" তুলনেয়।—মেবার পতন : তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

(২) 'বঙ্গনারী'র দেবেন্দ্রের মুখেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাই। দেবেন্দ্র বলিতেছেন : "না হয় একঘরে হব। তাতে আজকাল আর অপমান নাই—তাতে গৌরব! যেখানে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই।"—বঙ্গনারী : দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

(৩) উত্তরকালে একাধিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই রূঢ় সত্যের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটিকায়ও দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত ফেরতা সম্প্রদায়ের 'নিকৃষ্ট শ্রেণীর' একখানি ছবি আঁকিয়াছেন এবং একই প্রহসনে তিনি বিকৃত স্ত্রীশিক্ষার যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, আংশিক অতিরঞ্জিত হইলেও তাহার মূল সত্য অনস্বীকার্য্য।

উকিল, ব্যারিষ্টার ('আষাঢ়ে'র 'অদল বদলে'র 'উকিল বনাম ব্যারিষ্টার' ও 'প্রায়শ্চিত্তে'র চম্পটি), ডাক্তার ('ত্র্যহস্পর্শের' ভূদেব), পণ্ডিতমণ্ডলী ('আষাঢ়ের' 'ভট্টপল্লী'তে 'বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি'), বড়লোক 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা'র নবকৃষ্ণ), সংবাদপত্র সম্পাদক (ঐ শ্রীমান নন্দদুলাল দত্ত), কৃত্রিম দেশনায়ক ('হাসির গানে'র বিখ্যাত নন্দলাল), কৃপণ ('পুনর্জ্জন্মে'র যাদব)—কেহই দ্বিজেন্দ্রলালের কশাঘাত এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু কবির ব্যঙ্গচিত্র চরমে পৌছিয়াছে তাঁহার 'কল্কি অবতারে'। এই প্রহসনে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ভণ্ডামী 'অপক্ষপাতিতার সহিত' চিত্রিত হইয়াছে এবং 'পণ্ডিত', 'গোঁড়া', 'নব্যহিন্দু,' 'ব্রাহ্ম,' 'বিলেত-ফেরত' —এই পঞ্চ দেবতার কেহই নিজ প্রাপ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই।

এই ত গেল দ্বিজেন্দ্রলালের এক রূপ: যেখানে ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতা সেইখানেই তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রাণ আছে, আন্তরিকতা আছে, সেখানে তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। কৃত্রিম দেশনায়কের দল, যাহারা—

কেউ হ্যাটে কোটে গায়ে এঁটে
সাহেবগুলোয় তেজে গালি পাড়ছে;
রেশমি চাদর উড়িয়ে দিয়ে, তেড়ি কেটে,
কেউ বা জোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে,
অথবা কেউ বা খাসা নিজের থলি ভরে' নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা;
কেউ বা খাসা দু'পয়সা বেশ করে' নিল
বিদেশীয়ে দিয়ে 'দেশী' ছাপ্পা,

তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন:

কার্পেটমোড়া ত্রিতল কক্ষে বসে' থেকে,
'মা মা' বলে নাকি সুরে কান্না,
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে,
মা সে সৌখীন ভক্তি চান না।

* * * *

হায় রে মূঢ় ইংরেজদিগে গালি দিয়ে
দেশের প্রতি দেখায় না বা ভক্তি;
দেশভক্তি নয় ক' ছেলেখেলাটি এ,
সেথানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।

—আলেখ্য: চতুর্দ্দশ চিত্র, নেতা।

কিন্তু প্রকৃত দেশসেবক, যিনি হয়ত কখন বক্তৃতা দেন নাই বা কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই, কিন্তু

নির্জ্জনে, নীরবে, নিভৃতে, নিতান্ত
গাঁওয়ারী জাপানী ধরণে,
আজন্ম অর্জ্জিত ধনরাশি আপনার
[illegible]

জননীর সেই সুসন্তানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অবধি নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন:

ব্যঙ্গ করি আমি?—ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু—সকলে?
কভু না। আসলে ভক্তি করি আমি।
ঘৃণা করি শুধু—নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনী;
তাই বলে' আমি ত অন্ধ না;
যেখানে দেবতা, ভক্তিপুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।

—আলেখ্য: পঞ্চদশ চিত্র, ভক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মার্জ্জনী ধরিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রশ্নের অতীত। 'মেবার পতনে' সগরসিংহ ধর্ম্মত্যাগী পুত্র মহাবৎ খাঁকে বলিতেছেন, "কোরাণ পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম তাহাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা, প্রপিতামহের; ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়বার আগে সে ধর্ম্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? মূর্খ অনক্ষর হ'য়ে এত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল? যে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয় যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া—যে দয়া শুধু মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে;—সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ!—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জান না।" —(মেবার পতন: তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)। বৃদ্ধ সগরসিংহের এই উচ্ছ্বসিত উক্তির মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের মর্ম্মকথা ধ্বনিত হইয়াছে। বালক অরুণ সিংহ যখন এই সগরসিংহকেই তাঁহার নব জীবন লাভের পূর্ব্বে ভর্ৎসনা করিতেছে, "ছিঃ দাদা-মহাশয়। রামায়ণ পড়েন নি?"—(মেবার পতন: দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) তখনকার এই ছোটখাটো কথাটিও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক।

কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরও কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন চাই। 'বঙ্গনারী'র সদানন্দের ভাষায়, 'সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যদি একেবারে নির্ভুল হ'ত, তাহ'লে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না, এ প্রথার মধ্যে কেবল ধর্ম্মের পুণ্যরশ্মি নাই। এর মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে, তাদের উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে।' —(বঙ্গনারী: প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) অবশ্য সদানন্দের এই উক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; তিনি ব্যবহারিক ধর্ম্মের 'আগাছা' সম্বন্ধেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল আগাছার মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিবাহে পণপ্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৪) এই উভয়বিধ কুপ্রথা আমাদের পারিবারিক জীবন

(৪) প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ আর সমাজে প্রচলিত নাই। কিন্তু পণপ্রথা রহিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কোন কোন স্থলে বুদ্ধিমান অভিভাবক পণের পরিবর্ত্তে বিবাহের খরচ বাবদ যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ দু'-এক হাজা

কতখানি বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, এই নাটকের দেবেন্দ্রের পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পণপ্রথা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা-মাতার কর্ত্তব্য কি, সদানন্দের মুখে সে সম্বন্ধেও দ্বিজেন্দ্রলালের নির্দ্দেশ শুনিতে পাই : 'যেখানে ভালো বরে বিবাহ দেওয়ার সঙ্গতি আছে, সেখানে বালিকা বিধবাই হউক আর বালিকা কুমারীই হউক, বিবাহ দাও। আর যেখানে আর্থিক অসামর্থ্য, সেখানে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কারো বিবাহ দিও না। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও'। (৫) —বঙ্গনারী : প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

'বঙ্গনারী'তে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন কয়েকটি সামাজিক সমস্যার বিচার করিয়াছেন, তাঁহার কল্পনার তুলিতে আঁকা বিনয়, সদানন্দ, ও কেদারের চরিত্রে তিনি তেমনই দেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শ চরিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। বিনয় কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আত্ম-ত্যাগের আদর্শ। সদানন্দ (এই চরিত্রটি সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মতবাদের বাহক) সর্ব্ব অবস্থায় সংহতচিত্ত; আর কেদার? 'পায়ে চটিজুতো, পরনে সাদা ধুতি—শরীরে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, মুখে সারল্যের জ্যোতি'।—কেদারের জীবন শুধুই পরের কাজ করিবার জন্য। 'এ জিনিষ ভারতের নিজস্ব।' এবং 'আগে এই রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচায্যি বাঙলার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজী শিক্ষার সভ্যতাতে তা ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে গিয়েছে।' তাই সদানন্দ বলিতেছেন, "না কেদার! সভ্য হ'য়ো না। বড় খাঁটি জিনিষ আছ।"—(পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) এবং বর্ত্তমানের এই সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া বড় ক্ষোভেই দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন :

হে সভ্যতা! সর্ব্বনাশটি করেছ ত আমাদিগের,
এসেছি বিকিয়ে ধর্ম্মহাটে ;
পায়ে ধরি, দূরে থেকো—বেচারীদের টেনে এনে
ফেলো না ক তোমার হাড়িকাঠে।
—আলেখ্য : ত্রয়োদশ চিত্র।

'বঙ্গনারীর' ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের অপর সামাজিক নাটক 'পরপারে'ও আদর্শ চরিত্রের দীপ্ত প্রভায় সমুজ্জ্বল। বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর মূর্ত্ত ত্যাগ; সরযূ—যোগিনী, দুঃখিনী, দুঃখে আনন্দময়ী, কল্যাণরূপিণী সরযূ আদর্শ গৃহলক্ষ্মী এবং বাংলার এই সরযূদের স্মরণ করিয়াই 'বঙ্গনারীর' বিনোদিনী বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর দুর্দ্দিনে যে এখনও সে মুখ তুলে চাইতে পাচ্ছে, তা এই নারী জাতির ধর্ম্মের বলে।" —(দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)।

'পরপারে'র মহিমের অধঃপতনের ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই সহজ সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, যেখানে মাতৃভক্তির অভাব, সেখানেই অধঃপতনের পথ প্রশস্ত। মহিমের এক দিন সবই ছিল যেদিন সে ছিল 'মা বলে অজ্ঞান'। তাহার অধঃপতন তখনই আরম্ভ হইল যখন সে প্রবৃত্তির বেদীমূলে মাতৃভক্তি বলি দিল। এ সম্পর্কে সরযূর মন্তব্য কঠোর হইলেও সম্পূর্ণ সত্য : সরযূ বলিতেছে, "তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পার জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নাই। (৬)—পরপারে : দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

দেশপ্রীতি দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম। 'ভারত আমার, ভারত আমার, যেথায় মানব মেলিল নেত্র' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সঙ্গীত তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির নিদর্শন এবং দেশপ্রীতিই তাঁহাকে ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রেরণা যোগাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিতে 'দেশশুদ্ধ মাটি আর আকাশ' নয়। 'জন্মভূমি মানুষ; সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে।' —(সিংহল বিজয় : দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) কিন্তু জন্মভূমিরও ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকে সদানন্দ ও বিশ্বেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে দুর্গাদাস, কাশেম, দিলির, অজয়, মানসী, কল্যাণী ইরা, মেহের, হেলেন প্রভৃতি চরিত্র বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে এই মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবেও তিনি বাছিয়া নিয়াছেন ভারতীয় নারীর আদর্শ, সীতা চরিত্র, 'নির্ম্মল প্রভাত-যূথিকার মত, নক্ষত্রের মত পবিত্র, নিয়ত পতিমাত্র ধ্যান'; মহর্ষি গৌতম,

যার সংস্পর্শ কুহকে
বারাঙ্গনা সতী হয়; দস্যু সাধু হয়;
পঙ্কিল পবিত্র হয়; কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয়; গর্ব্বী নত করে শির।
যে, স্পর্শমণির মত, পথের কর্দ্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে; পাবকের মত
ভস্ম করে আবিল দুর্গন্ধ; পুণ্যতোয়া
জাহ্নবীর মত, ধৌত করে আবর্জ্জনা।

এবং সর্ব্বোপরি ভীষ্ম, যিনি বিশ্বে এক অপূর্ব্ব ত্যাগের সঙ্গীত শুনাইয়াছেন, যে ত্যাগ 'নিবদ্ধ নহে শুষ্ক তপস্যায়, শাস্ত্রের বিচারে, কিম্বা ধর্ম্মের প্রচারে', যাহা 'প্রসারিত জগতের হিতে কর্ম্মপথ দিয়া' —'পুণ্যশ্লোক! মহাভাগ!' যোগীশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম!

'পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ আর

টাকা দাবী করেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পক্ষে এই উদারতা কতখানি সান্ত্বনাপ্রদ, ভুক্তভোগী মাত্রই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

(৫) কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইহা আদর্শবাদীর অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সদানন্দ বিবাহ জিনিষটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। যাঁহারা অনন্যোপায় উপরোক্ত ব্যবস্থা শুধু তাঁহাদের জন্য। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন যে, 'কন্যার বিবাহের প্রশ্নে জন্মান্তরবাদ আর আধ্যাত্মিকতা না এনে—এটা বোঝা উচিত যে, পুত্র-কন্যা হাওয়া খেয়ে বাঁচে না; তাদের ভবিষ্যৎ আহারের উপায় তাদের পিতা-মাতারই ক'রে দিতে হবে।...মেয়ের বিয়ে দেওয়া এক রকম মেয়ের চাকরী ক'রে দেওয়া।'...বঙ্গনারী : দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

(৬) 'ভীষ্ম' নাটকে ব্যাসের উক্তি স্মরণীয় :

ব্রাহ্মণের চেয়ে বড় জননী; ঋষির
চেয়ে বড় জননী;—স্বর্গের চেয়ে বড়।
—ভীষ্ম : চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্তকে বন্দী নন্দকে হত্যা করিতে উত্তেজিত করিতে যাইয়া কূটবুদ্ধি চাণক্যও মাতৃত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটি জন্মস্থান স্বর্গ; একটির দেবতা সয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর।' —(মেবার পতন : তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যের ভিতর দিয়া আনিয়াছেন ত্যাগের রাজ্যের বাণী। তিনি শিক্ষা দিতেছেন : 'সকল ধর্ম্মের মূল—ত্যাগ পরহিতে', 'নিজ সুখ বলিদান দেবতার পদে।' মানুষ সেই দেবতা। নর-দেবতার সেবার আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে

লভিতে পরম সুখ।

* * *

বিবেকের জয়ধ্বনি, আত্মার সন্তোষ,
মানুষের আশীর্ব্বাদ। সেই মহা সুখ,
ত্যাগের পরম শান্তি—নিকটে যাহার
স্বার্থের সিদ্ধির সুখ পাণ্ডু হয়ে' যায়
সূর্য্যোদয়ে চন্দ্র সম।

—ভীষ্ম : প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

তপোনিরত মহর্ষি ব্যাস আরাধ্য দেবতা শঙ্করের নিকট ঠিক এই প্রার্থনাই জানাইয়াছেন :

যেন পারি দেব,
সাধিতে মানব-হিত তপস্যার বলে।

—ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

মানুষের মনুষ্যত্বে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধা অপরিসীম। 'সিংহল বিজয়ে' কুবেণী যখন রাণীত্বের গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, "আমি ওর [লীলার] মৃত্যুদণ্ড দিয়াছি। আমি রাজ্ঞী।" বিজিত গুপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি তার চেয়েও বড়। আমি মানুষ!"—(সিংহল বিজয়। চতুর্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য) মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, সে মানুষ এবং মানুষ 'মানুষ হ'লে হইবে তাহার ঈশ্বরের চেয়ে বড়।'—(ভীষ্ম : পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) পরহিতে আত্মদানে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ; ইহাই মানুষকে তাহার ঈশ্বরের চেয়ে বড়' করিয়া তোলে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, 'এমন হৃদয় নাই, যেখানে উচ্চ প্রবৃত্তির একটি তারও উঁচু সুরে বাঁধা নাই। এক দিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলি প্রহত হ'য়ে সহসা বেজে ওঠে, তখনই এক মুহূর্ত্তে, সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে দেয়।'—(মেবার পতন : তৃতীয়, চতুর্থ দৃশ্য) মানবের সহজাত মহত্ত্বে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহার যজ্ঞেশ্বর ও সগরসিংহের জীবনে নাটকীয় পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। তাঁর শান্তাও ওস্তাদজির একটি কথায় জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।—(পরপারে : তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য দ্রষ্টব্য)।

দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকের আখ্যানবস্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, কিন্তু মুসলমান সাম্রাজ্যবাদের সহিত হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্ঘর্ষের কাহিনীর ভিতর দিয়াও তিনি প্রচার করিয়াছেন মৈত্রীর বাণী এবং তাঁহার মুসলমান-চরিত্রের ভিতর যদি কাবলেস খাঁ আছে ত' তাহার পার্শ্বেই রহিয়াছে দিলির খাঁ এবং হিন্দু জাতির মধ্যে যদি দুর্গাদাস রহিয়াছে ত' সেখানে শ্যামসিংহের অভাব নাই।

'একঘরে' প্রবন্ধের ন্যায় তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুর জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতার প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার 'নুরজাহান' নাটকে মহারাণা কর্ণ সাজাহানকে বলিতেছেন, "যখন মনে হয় যে মহাবৎ খাঁর মত ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে' জাতির মধ্যে আলিঙ্গন করে' নিতে পারি না, তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে নিজের করে' নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গলে' খসে' পড়ে। আমাদের এই মহাবৎ খাঁকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি—আর আপনারা আপনার করে নিয়েছেন। তাই আপনারা উঠছেন, আর আমরা পড়ছি।" —(নুরজাহান : চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) এবং এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হিন্দুর জাতীয় জীবনে কত বড় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবেশন গুণে বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করি 'মেবার পতনে'। এই নাটকে বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব হইতে জাত্যভিমান বড় হইল এবং কল্যাণীর প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণ ও কল্যাণীর নির্ব্বাসন মহাবৎ খাঁকে মেবার যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মেবারকে মহাশ্মশানে পরিণত করিল। কিন্তু এই সকল স্থলে বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল শুধুই হিন্দুর কথা ভাবেন নাই, তিনি ভাবিয়াছেন বৃহত্তর ভারতের কথা, হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভারতের কথা। তাই তাঁহার 'দুর্গাদাস' নাটকে শুনিতে পাই দিলির খাঁ ঔরংজীবকে উপদেশ দিতেছেন, "এখনও হিন্দু-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু-মুসলমান এক হোক, একসঙ্গে দামামা ও শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিভেদ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট! সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেউ কখন দেখে নাই।" (৭) (দুর্গাদাস : পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

দ্বিজেন্দ্রলালের মৈত্রীর রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ নাই, যাহা কিছু প্রভেদ তাহা মনুষ্যত্বে ও মনুষ্যত্বের অভাবে। তাঁহার মেহেরউন্নিসা রাজপুত শক্তসিংহের সহিত মুসলমান-কন্যা দৌলতের পরিণয় সম্পাদন করিয়াছেন এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি সম্রাট আকবরকে বলিতেছেন, "সম্রাট! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না। ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক, নীতি এক। মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা, সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাঁকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কর্চ্ছে, হিংসা কর্চ্ছে, বিবাদ কর্চ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তারা ভিন্ন নয়। শক্তসিংহ মানুষ, দৌলতউন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?—(প্রতাপসিংহ : তৃতীয়

(৭) হায় রে কবির স্বপ্ন! আজিও ভারত অতীতের জের টানিয়া চলিয়াছে। তাই ভ্রাতৃবিরোধের ফলে স্বাধীন ভারত আজ দ্বিধা-বিভক্ত।

অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) 'মেবার পতনে' মানসীর কণ্ঠেও অনুরূপ বাণী শুনিতে পাই : "ধর্ম্ম কল্যাণী ! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সর্ব্ব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন জানি না।···বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্য্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়ে নি। তার উপর মহাবৎ খাঁ অধার্ম্মিক নন। তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজবাজিতে পাপী হয়ে' গেলেন ?"—মেবার পতন : দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য যেমন কৃত্রিম, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পার্থক্যও তেমনই কৃত্রিম। তাঁহার 'সীতা' নাটকে রামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের আদেশে রাজা শূদ্রকের 'প্রাণদণ্ড' দানের জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অপরাধ শূদ্র হইয়া তিনি 'তপস্যা, বেদপাঠ' প্রভৃতি 'অশাস্ত্রীয় কাজ' করিয়াছেন, তখন শূদ্রক বলিতেছেন :

শুনিবে নববিধান তবে রাম আমার নিকটে ?—
কার সৃষ্টি বিপ্র-ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্রভেদ নরোত্তম !
কার সৃষ্টি মনুষ্য ও পশুভেদ ?—কোন্‌টি প্রথম ?
কোন্ সৃষ্টিকর্ত্তা বড় ?—ব্রহ্মা না ব্রহ্মার স্রষ্টা নর ?
—বেদকর্ত্তা বিপ্র ? না বিপ্রের কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর ?

* * * *

শূদ্রেও সম্ভব সমবিদ্যাবুদ্ধিন্যায়ধর্ম্মমতি ;
ব্রাহ্মণ হইতে পারে শূদ্রের অধম হেয় অতি।
তথাপি সে শূদ্র শূদ্র, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ আজীবন—
আজীবন কেন ? বংশপরম্পরা।—মহাত্মন্ !
এ নিয়ম স্বাভাবিক !—এ নিয়ম লাঞ্ছনা বিধির।
মহারাজ ! রচিয়াছে যে ক্ষমতা বিপ্র, প্রকৃতির
বিধি তুচ্ছ করি', তাহা হ'য়ে যাবে ধূলায় বিলীন
ঊর্দ্ধভিত্তি নিম্নচূড় মন্দিরের মত এক দিন। (৮)

—সীতা : তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ মানসীর মুখে তাঁহার মর্ম্মবাণী প্রচার করিয়াছেন : 'তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর।···বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না। যোগ্য অযোগ্যের বিচার করে না। সে সে সেবা করেই সুখী।'—(মেবার পতন : পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য) 'যে যত কুৎসিত তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য। যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র।'—(ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) 'পাষাণী' নাটকে গৌতমের জীবনে এই প্রেমধর্ম্মের অগ্নিপরীক্ষা। ইন্দ্রকে তাঁহার পারিবারিক জীবনের সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়াও গৌতম পীড়িতাবস্থায় তাঁহার সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিয়া বলিয়াছেন, "যাও দেবরাজ, বিশ্বপতির ক্ষমাভিক্ষা কর। তিনি তোমার আমার উভয়ের কর্ত্তা, যাঁ'র কাছে ছোট বড় সব সমান। ক্ষমা ? আমি তোমাকে পূর্ণ অন্তঃকরণে মার্জ্জনা করেছি। দেবরাজ ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর কি দিব ? আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও, সুখী হও !"—(পাষাণী : চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) অনুতপ্তা অহল্যাকে বুকে তুলিয়া লইয়াও তিনি বলিতেছেন :

এস অভাগিনী।

* * * *

এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরী !
এস বাণবিদ্ধ সম পিঞ্জরের পাখী,
হৃদয়-পিঞ্জরে ফিরে এস।

—পাষাণী : পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

'প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশ। ···সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃউচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর।'—মেবার পতন : দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্তবিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র ; চন্দ্রমা প্রেমে হাসে।
প্রেমে বহে বারিধারা, প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে, প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

—সীতা : পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাট্যসাহিত্যে এই প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। 'মেবার পতনে'র শেষ অঙ্কে মেবার-বিজয়ী মহাবৎ খাঁ মেবারগত-প্রাণা সত্যবতীর নিকট আবার তাঁহার ছোট ভাইটি মহীপৎ। ঐ নাটকের শেষ দৃশ্যে মেবারের মহাশ্মশানে আলিঙ্গনবদ্ধ দাঁড়াইয়া মেবারের রাণা অমর সিংহ ও মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। তাঁহারা আর পরস্পরের শত্রু নহেন, তাহারা দুইটি ভাই। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভিত্তি ভ্রাতৃবিরোধ ; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সুকৌশলে চন্দ্রগুপ্তকে ভ্রাতৃহত্যার নিষ্ঠুরতা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত উৎপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব ; সর্ব্বোপরি নন্দ তাঁহার মায়ের অপমান করিয়াছেন। প্রতিশোধের সুযোগ উপস্থিত, জয় সুনিশ্চিত ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন—নন্দের বিরুদ্ধে, তাঁহার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ! চাণক্যের উত্তেজনাপূর্ণ বাণী তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল না ; তিনি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন মায়ের আদেশে। তার পর ? নন্দকে আক্রমণ করিতে যাইয়া তরবারি তুলিতে তাঁহার হাত কাঁপিল এবং পরাভূত নন্দ মৃত্যুভয়ে প্রাণভিক্ষা চাহিলে 'চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া' তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার বক্ষে এস, ছোট ভাইটি আমার !" ভ্রাতৃস্নেহ জয়ী হইল। অতঃপর যখন নন্দের প্রাণদণ্ড হইল তখন তাহা ব্রাহ্মণের বিচারে ও রাজমাতার আদেশে ; চন্দ্রগুপ্ত মার্জ্জনা-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

---

(৮) নাটকান্তরে ব্রাহ্মণের অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া চাণক্য বলিতেছেন, "জাতির সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়বে ? শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক বড় হবে ? তা কি সয় ? সয় না। তাই এই পতন।"—চন্দ্রগুপ্ত : প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁহার 'সীতা' নাটকে। হিন্দুর আরাধ্যা দেবী চিরদুঃখিনী সীতার যে কঠিন শেষ লাঞ্ছনার সহিত হিন্দুসন্তানের আজন্ম পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালের দরদী মন তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাই তিনি নির্ভীক চিত্তে শ্রীরামের সহিত নির্ব্বাসিতা সীতার মিলন ঘটাইয়া অযোধ্যাপতিকে সীতার প্রতি দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষার নিষ্ঠুর আদেশের গ্লানি হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, 'রামায়ণে'র মূল কাহিনীর গুরুতর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আর্টের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। সুতরাং 'সীতা' নাটকে রামসীতার মিলন ক্ষণিকের; সহসা প্রাকৃতিক বিপ্লব সীতাকে শ্রীরামের নিকট হইতে পার্থিব জীবনে চিরদিনের জন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল 'রামায়ণে'র কাহিনীর মূল সূত্র রক্ষা করিয়া তাহার ভিতর যতটুকু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। বাল্মীকির নিকট বশিষ্ঠের পরাজয়, শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠের আদেশ, "লও জানকীরে, মহীপতি!"—(সীতা: পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) প্রেমের জয় ঘোষণা করিতেছে।

যে যুগে বিশ্বময় হিংসার রাজত্ব, সে যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল আনিয়াছেন আন্তর্জাতিক মহামিলনের বাণী। তিনি বলিতেছেন, 'জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।'—(মেবার পতন: পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য) সাম্রাজ্যলিপ্সু সেলুকস যখন ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার কন্যা হেলেন বলিতেছেন, "বাবা, আপনি ভারতজয় কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন কেন? অর্দ্ধেক এসিয়া আপনার সাম্রাজ্য, পৃথিবীময় আপনার যশ। সিন্ধুর পরপারে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব কর্চ্ছে। তা' আপনার এত চক্ষুশূল হয় কেন?"—(চন্দ্রগুপ্ত: তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) অতঃপর এই মহীয়সী নারী যখন চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় পরিণয়ে সম্মত হইলেন, তখন তাঁহার এই সম্মতিদানের পশ্চাতে রহিয়াছে মানবের কল্যাণ-কামনা। তিনি এ সম্বন্ধে পিতা সেলুকসকে বলিতেছেন, "আমি মানবের মহাহিতে আত্মবলিদান দিয়েছি, সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষ-বহ্নি নিজের শোণিতে নির্ব্বাণ ক'রেছি। দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যে পড়ে' তাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পেতে নিয়েছি।"—(ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) হউক না এ বিবাহ প্রণয়হীন, 'এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্ম্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এ বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে এক মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল, বিদ্বেষে বারিপ্রপাতের উপর সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল, দুই মহাদেশ এক হ'য়ে গেল।' হেলেনের কল্পনায় এই বিবাহের ফলে 'ঐ প্লেটো আর কপিল একসঙ্গে গান ধ'রে দিয়েছে, সোলান আর মনু গলা-ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়েছে। হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে!' মহান্ আদর্শের বেদীমূলে আত্মত্যাগের অমৃতসিঞ্চনে তাঁহার অন্তরের সর্ব্ব গ্লানি ধুইয়া-মুছিয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ বিশ্বপ্রেম, এবং এই বিশ্বপ্রেম মূর্ত্ত হইয়াছে তাঁহার মানসী চরিত্রে, যিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা ও কুষ্ঠাশ্রমে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে আহতের সেবায়—তাঁহার প্রতিদিবসের কার্য্যে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। (১) কিন্তু আদর্শবাদী হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তবকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি জানেন, কখন কখন যুদ্ধেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। মানসীর ভাষায়, 'অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্ত যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য্য হয়।'—(মেবার পতন, প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য) কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন আক্রান্ত দেশকে বাঁচাতে, দেশে অগ্নিদাহ, মড়ক, লুণ্ঠন নিবারণ কর্ত্তে, শান্তির শুভ্র বৈজয়ন্তী রক্ষা কর্ত্তে—কেড়ে নিতে নয়।' দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস করিতেন, বিশ্বনিয়ন্তার ন্যায়ের বিধানে অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার হেলেন ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন, চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হইবে এবং তিনি 'বন্দী হইবেন', কারণ তিনি 'অন্যায় কর্চ্ছেন।'—(চন্দ্রগুপ্ত: তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) সেলুকসের পরাজয়ের পরও তিনি বলিতেছেন, "গ্রীক হেরেছে, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হ'য়েছে।—বাবা! যে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যায়—সে বাহিরের শত্রু হৌক্ বা সেই রাজ্যেরই প্রজা হৌক্—সে মহাপাতকী। শত শত মাতাকে পুত্রহীনা, বালিকাকে পিতৃহীনা, সতীকে পতিহীনা করা—দেশে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা—শুধু একটা বিজয় গৌরবের উদ্দেশ্যে, একটা উদ্দাম প্রকৃতির তাড়নায়, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্ত—এর চেয়ে মহাপাপ আছে?"—চন্দ্রগুপ্ত: পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) 'রাণা প্রতাপে' ইরার কণ্ঠেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাই। ইরা শক্তসিংহকে বলিতেছেন, "পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী।...তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা আর মোগল শত্রু বলে নয়। তাই এই বলে'(১০) যে, মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।—রাণাপ্রতাপ: দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

জাতির জীবনে অধঃপতনের দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিকারের পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতির এই অধঃপতন 'বহু দিন পূর্ব্বে হ'তে আরম্ভ হয়েছে।' আজিকার পতন 'সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।' জাতির পতন সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে 'যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আঁধারের হাত ধরে' চলেছে। যেদিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে।...যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই

---

(১) 'মেবার পতনে' দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি মহীয়সী নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন: কল্যাণী পতিভক্তির, সত্যবতী দেশপ্রীতির এবং মানসী বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। জাতির প্রতি ধর্ম্মত্যাগী স্বামীর নৃশংস আচরণে যখন পতিভক্তি ম্লান হইয়া আসে, জাতির কৃতঘ্নতায় যখন দেশব্রতীর ব্রত নিষ্ফল হয়, তখন তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা থাকে মনুষ্যত্বের আরাধনায়। তাই কল্যাণী ও সত্যবতীর শেষ শিক্ষা মানসীর নিকট।—(মেবার পতন: পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য দ্রষ্টব্য)

(১০) দ্বিজেন্দ্রলালের সহানুভূতি সর্ব্বত্রই আর্ত্তের প্রতি, ব্যথিতের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি। এই প্রসঙ্গে ধনগর্ব্বিত অর্থী এবং গরীব চাষী ও তাঁতি ভাইদের উদ্দেশ্যে তাঁহার উক্তি স্মরণীয়।—(আলেখ্য, ষোড়শী চিত্র)

এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে।'—(মেবার পতন : পঞ্চম অঙ্ক : সপ্তম দৃশ্য) কিন্তু অন্ধকার যতই গাঢ় হউক, জাতির জীবনে ইহাই শেষ কথা নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস করিতেন, 'এ জাতি আবার মানুষ হবে।' কিন্তু 'নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী' হইয়া 'অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ' কোলে করিয়া চির জীবন হাহাকার করিলে এ মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিবে না। ইহার জন্ম চাই ঐকান্তিকী সাধনা। এ জাতি মানুষ হবে সেই দিন যেদিন দেশবাসী 'অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে। যেদিন তাদের অন্তরে অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে; যেদিন তারা যা' উচিত, যা' কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই ক'রে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারু ভ্রূকুটীর দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নবধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।··· সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গ'ড়ে আসবে।'—(মেবার পতন : পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য) তাই মেবারের মহাশ্মশানের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীন দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

কিসের দুঃখ করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ'। (১১)

(১১) প্রায় দুই শত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারত আজ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ভুলিয়া আজ প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্মরণ রাখিতে হইবে, মনুষ্যত্বের অগ্নিপরীক্ষা তাহার সম্মুখে।

সম্রাজ্ঞীদের খেয়াল-খুশী

ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথের নাম সকলেই শুনেছেন। পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর বিলাসিতার কথা কিন্তু ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অসম্ভব বিলাসী। প্রতিদিন একেকটি নতুন পোষাক প'রে তিনি ঘরের বাইরে বেরোতেন। রাজত্ব যখন তাঁর শেষ হয়, তখন তাঁর দেরাজ খুলে দেখা যায় সর্ব্বসমেত ২,০০০ রকমের পোষাক রয়েছে।

* * * *

এ্যান বোলিন, রাজা অষ্টম হেনরীর দ্বিতীয়া স্ত্রী। তিনি না কি সময় নেই অসময় নেই, হাতে দস্তানা প'রে থাকতেন। এর কারণ কি? অতিরিক্ত শীতে ঠাণ্ডা লাগার ভয়? না, খুব কম লোক জানতেন যে, এ্যানের না কি এক হাতে ছ'টি আঙুল ছিল।

* * * *

রাশিয়ার ক্যাথারিন দি গ্রেট, অবসর সময় অতিবাহিত করতেন অদ্ভুত এক খেয়ালে। তাঁর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে না দিলে তিনি অবসর-বিনোদন করতে পারতেন না। তিনি না কি আবার প্রাতর্ভোজনের সময় এক পেয়ালা কফি খেয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। পর-পর পুরো ছ'টি পেয়ালা কফি একসঙ্গে পান করতেন। যদিও তাঁর সব চেয়ে প্রিয় ছিল, জলের সঙ্গে এক রকমের জামের সিরাপ মেশানো পানীয়।

* * * *

রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা আবার অদ্ভুত-প্রকৃতির নারী ছিলেন। তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ কুমড়োর সঙ্গে পেঁয়াজ।

* * * *

রাশিয়ার মহারাণী এ্যান একবার ঘোষণা করলেন যে, এক জন রাজপুত্র না কি মোরগের প্রকৃতি পেয়েছে। তার সামান্য কোন দোষ দেখেই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে তিনি একটি বড় ঝুড়ি তৈরী করতে আদেশ দেন। সেই ঝুড়ির ভেতরে ছিল খড় আর একটা খড়ের তৈরী বাসার মধ্যে কিছু ডিম। রাজপুত্রকে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত, এই ঝুড়ির ভেতরের বাসায় বসে মুরগীর ডাক ডাকতে ডাকতে। তাও সকলের অলক্ষ্যে নয়, রাজপ্রাসাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই শাস্তিদান চলতো।

* * * *

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আবার শত্রুর ভয়ে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ এবং সতর্ক থাকতেন। এমন কি পাছে কোন শত্রু তাঁর কোন লেখা ব্লটিং কাগজের ছাপ থেকে পড়ে ফেলে, সেই ভয়ে তিনি আবার বিশেষ এক ধরণের কালো রঙের ব্লটিং সব সময়ে ব্যবহার করতেন। এবং ব্যবহার শেষ হলেই সেই ব্লটিং আবার নষ্ট ক'রে ফেলতেন।

* * * *

অষ্ট্রীয়ার রাণী এলিজাবেথ, প্রায়ই নিদ্রা যাওয়ার সময় ভিজে তোয়ালে তাঁর কোমরে জড়িয়ে তবে ঘুমোতেন। তিনি না কি বিশ্বাস করতেন, এই পদ্ধতিতে তার শরীর থাকবে সুঠাম ও ছিপছিপে।

* * * *

ইউজীন, ফরাসীর তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রী কখনও এক জোড়া জুতো দু'বার ব্যবহার করতেন না। অর্থাৎ এক জোড়া পরতেন মাত্র একবার। তার পরেই সেই জোড়াটি বাতিল ক'রে আবার নতুন এক জোড়া।

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

মনুষ্যত্বের আদর্শ বা লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট আছে। কী বিশদ্ উপায়ে নানা সময়ে নানা স্তর-অনুযায়ী পাঠ ও আচরণের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, মানুষ-গড়ার সেই শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধেও লেখায় বক্তৃতায় অনেক কথা অনেক সময় তিনি বলেছেন। সেগুলি থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার দান ও সাধনার বৈশিষ্ট্য জানা যায়। সেগুলি তত্ত্বকথার অন্তর্গত। বর্তমান আলোচনার বিষয় কয়েকটি বাস্তব ঘটনা, যে-উপলক্ষে কবির কাছ থেকে ছাত্রশিক্ষা এবং জনশিক্ষারও কিছু কিছু সমস্যা এবং সমাধান-পথের নির্দেশ মিলে। ঘটনাগুলি বলতে গিয়ে মতের কথা যেটুকু বলতে হয় ততটুকুই বলা হয়েছে। মোটামুটি কালপারম্পর্য রক্ষা করেই আলোচনা ধারা অনুসৃত।

মনুষ্যত্বের পরিপন্থী বিজাতীয় শিক্ষার উদাহরণস্থলে কবি বলেছেন—"আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালক-বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে,···আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েক জন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, Mamma, Look, lot of Babus are coming. বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে? এদের বাপ-মা এদেরকে স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে।" শিক্ষায় এ এক রকমের বিপদ, আরেক রকমের বিপদ—স্থলবিশেষে পারিবারিক কু-পরিবেশ। কবির মত হচ্ছে,—"ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।" (১৩১৩)

কবি কাল্পনিক মত নিয়ে বসে থাকেননি। তিনি এ রকম একটি শিক্ষার জায়গা গড়ে তুলেছিলেন। ১৩১৮ সালে 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে কবি বলছেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশ বর্ষ জড়িত হইয়াছে।" এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে কবির 'ধর্মশিক্ষা' প্রসঙ্গে। এই সেই জায়গা, "যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ-বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবল মাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গল-কর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীর ভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও [illegible] আত্মার মহিমা স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্ক সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ-সংগীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবল মাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্ব গৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালক-বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের ও চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।" (১৩১৮)

১৩১৯ সনে বিদেশ ভ্রমণকালে কবি হথাকার শিক্ষালয়গুলি পরিদর্শন ক'রে শিক্ষাবিধির অভিজ্ঞতা নিয়ে চ্যালফোর্ড থেকে লিখছেন,—"যেমন করিয়া হোক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।······স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" এই সঙ্গেই অতঃপর তিনি বলেছেন,—"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকেই চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।" কবি-উল্লিখিত এ গুরু শুধু পাঠ্যবিষয়ের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নন, তিনি হবেন মনুষ্যত্ব আদর্শেরও গুরু, ছাত্রদের মনের মানুষ।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা শিক্ষক ছাত্রের বনিবনাও নিয়ে। ছাত্রবিদ্রোহ অনেক স্থলে ঘটে থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে একবার এক জন য়ুরোপীয় অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। "জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক (ওটেন সাহেব) ছাত্রদের ক্লাসে ভারতীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো অপমানসূচক কথা বলেন, ছাত্রেরা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে ও তাঁহাকে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য বলে। অধ্যাপক তাহা না করায়, সিঁড়ির পথে নামিবার সময় কয়েক জন ছাত্র মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। এই লইয়া কলিকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।"—(রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় সং, ১ম খণ্ড) এ ঘটনায় ছাত্রাবস্থার সুভাষচন্দ্র (নেতাজি) ছিলেন অগ্রণী। জাতীয়তাবোধের অগ্নিতেজ তাঁকে এতই উদ্দীপ্ত করেছিল। পরিণত বয়সের বিরাট আন্দোলনের স্রষ্টা নেতাজির আত্মপ্রকাশের বিশেষ ভূমিকা ছিল এই ছোটো ঘটনাটি। দেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন এ ব্যাপারে নাড়া দিয়েছিল। ছাত্রদের কড়া শাসন করবার প্রস্তাব করেন কোনো মিশনরি কলেজের কর্তা। "বিচার-সভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন।" এ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি বলেন—"ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধি কাল।···এই সময়েই অল্প মাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে, এবং আভাস মাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংশ্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়। এই বয়ঃসন্ধিকালে

ছাত্রেরা মাঝে মাঝে এক একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেন না তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।" অনেক সময় নানা দিক দিয়ে শিক্ষকের অতিমাত্র উচ্চতাবোধের বিকৃত মনোবৃত্তি ও আচরণ ছেলেদের আত্মমর্যাদা-বোধকে আহত করে; ক্রমে তাই থেকে জাগে বিদ্বেষ বিরোধ। কবির বিশ্লেষণে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরোধসৃষ্টির মূলে ছিল ইংরেজ শিক্ষকের জাতি-গরিমা। শিক্ষকের মনের মধ্যে এই উচ্চতাবোধটি মূলগত থাকায় শিক্ষক ছাত্রদের কাছে টানতে পারেননি; ছেলেরাও প্রতিক্রিয়ায় উগ্র হয়ে উঠেছিল। এই উচ্চ মনোভাব নিয়ে কেমন করে শিক্ষক দূরে সরে যায় এবং তারা সে থেকে কী বিপত্তি ঘটায়, অন্য পক্ষে আভাসমাত্র প্রীতি দিয়ে যে কেমন করে অনেক শিক্ষক ছেলেদের মন কেড়ে নিয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হয়, ছেলেদেরও জীবন তারা তাতে সুধাময় করে তোলে, তার দু'টি পরস্পরবিরুদ্ধ উদাহরণস্থলে কবি তাঁর নিজের আশ্রমের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,—এক সময় এক জন ইংরেজ শিক্ষক সেখানে ছিলেন, "তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন।" ছেলেরা 'তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল।" হেডমাষ্টারের শাসনেও কোনো কাজ দেয়নি, শেষে সেই শিক্ষককেই ছাড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু কবি পরে আবার দু'জন ইংরেজ শিক্ষক পান, যাঁদের পেয়ে তিনি বলেছেন, "আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে।" নাম ধ'রে নির্দিষ্ট করা না থাকলেও বুঝতে বাধা হয় না যে, এ দু'য়ের এক জন পিয়ার্সন, অন্য জন এণ্ড্রুজ। (১৩২২)

"শিক্ষাবিধি" রচনায় কবি ১৩১১ সনে বলেছেন: গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না।" চব্বিশ বৎসর পরেও "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধে কবি যে মত ব্যক্ত করেন, তাতেও শিক্ষার প্রধান মাধ্যম বলে নির্দেশ করেছেন আত্মীয়ভাবকেই।

"গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পর-সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম বলে জেনেছি।…যে গুরুর অন্তরে ছেলে-মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।……যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোন দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব ব'লে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' তবে নির্ভয়ে সে তার কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না।" (১১৩৬)

ছাত্রদের বয়সের দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে ব্যবহারে ধৈর্য্য ও সহানুভূতি নিয়ে যেমন শিক্ষককে তাদের অন্তর স্পর্শ করে চলতে হয়, পড়াশুনার দিক দিয়েও ছাত্রদের মনোবিকাশের ছন্দ লক্ষ্য ক'রে শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া দরকার। যে শিক্ষক সে-ছন্দ ধরতে পারেন না, তাঁরও শিক্ষাদানে ঘটে আরেকর কম অনর্থ। স্থলবিশেষে শিক্ষকের অবিবেচনাপ্রসূত রূঢ়তা ছাত্রদের ক্ষিপ্ত করে দেয়। ব্যক্তির প্রতি বিমুখতা থেকে সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত শিক্ষা এবং সব-কিছুর উপরই ডেকে আনে ছাত্রদের বিতৃষ্ণা। তাদের "মানসিক জোয়ার-ভাঁটা"র নিয়ম না ধ'রে বাঁধা-ধরা ভাবে সকলকে পাইকিরী এক শিক্ষা দিয়ে গেলে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থী চিত্তে জন্মায় অসাড়তা। শিক্ষা সবটাই হয় ব্যর্থ। "মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনা বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে।" কবি তাঁর আশ্রমের শিক্ষকদের নিয়ে এই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার চর্চা করেছিলেন; পরে লক্ষ্য করেন, বিলাতেও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ চলছে। কবি লিখেছেন,—"ছেলেদের পক্ষে এগার বছর বয়সটি এঁদের মতে বুদ্ধিবিকাশের বিশেষ প্রতিকূল সময়। মেয়েদের পক্ষে জাতি বা দেশ অনুসারে এই বয়সটি বারো, তেরো বা চৌদ্দ।" ঋতু অনুসারে দেহের সঙ্গে মনেরও তারতম্য ঘটে। কবির আশ্রমে ঋতু-উৎসবগুলিও শিক্ষাধারার একটি বিশেষ অঙ্গ ব'লে পরিগণিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আশ্রমের হাসপাতালে ছেলেদের সপ্তাহে প্রতি বুধবার নিয়মিত দেহের ওজন নেওয়া হয়। "বিশেষকালে মনোবৃত্তির বিশেষ একটা শক্তি খর্ব হয়ে বিশেষ অন্য কোনো শক্তির বলবৃদ্ধি হয় কি না তা হিসেব করে দেখা"র কথা কবি বলেছেন। কবি আরো বলেন,—"কী জ্ঞান সাহিত্যশিক্ষা, গণিতশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ বিশেষ চাতুর্মাস্য আছে কি না—একই ঋতুতে একসঙ্গে নানা বিচিত্র বিষয় শিক্ষা মনের পক্ষে অজীর্ণজনক ও ক্লান্তিকর কি না তা ভেবে দেখা দরকার।" একই দিনে ঘণ্টাক্রমে পর-পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পঠনপ্রণালীর সার্থকতা সম্বন্ধেও কবি সন্দিহান। কবি বলেন,—"একই বিষয়ের বিচিত্র দিক আছে—সাহিত্যের গদ্য আছে, পদ্য আছে, প্রবন্ধ রচনা আছে, আবৃত্তি আছে, তাছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসকেও এক শ্রেণীভুক্ত করে রাখা চলে। এমনি করেই বৈচিত্র্যের দ্বারা, মনকে পূর্ণ করা সম্ভব।" অর্থাৎ কবি কতকটা এ স্থলে, এক-এক দিন, এক একটি মাত্র বিষয়চর্চার পক্ষপাতী। বিচিত্র ভাগে তিনি শুধু তারই অনুশীলন ক'রে দেখবার প্রস্তাব তুলেছেন। এক দিনে একাধিক বিষয় না পড়ানোই শ্রেয়। এটি প্রচলিত ধারার থেকে খুবই একটি অভিনব পন্থার ইঙ্গিত। শিক্ষায় এগুলি খুঁটিনাটি বিস্তারিত কার্যক্রমের দিক। (১৩২৬)

শিক্ষার্থীকে বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরবশ ক'রে তোলে, এমন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সাবধান করতে গিয়ে কবি নিজের বালক কালের ইংরেজি শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। তৎকালে জনৈক ইংরেজি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি "ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে পয়লা দোসরা তেসরা শ্রেণীবিভাগ করে একটা ফর্দ লিখিয়ে দিয়ে তাই তাদের মুখস্থ" করান। তাতে যে বিদ্যা হয়, কবি বলেন "নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না।' অথচ

এদিকে আবার "এই ভরসা না থাকিলে মৌলিক কিছুতেই থাকিতে পারে না।" "এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি কাটিবে।" স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির বিকাশই কবির শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম লক্ষ্য। (১৩২৬)

পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা যেমন এক দিকে ত্রুটিপূর্ণ তেমনি পরমুখাপেক্ষী জ্ঞানও সমানই ত্রুটিপূর্ণ। এলাহাবাদের ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় 'রিভার' শব্দের সংজ্ঞা। বালকটি নির্ভুল উত্তর দেয়, কিন্তু সে নদী দেখেছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গা-যমুনার তীরবাসী হয়েও সে জানায়, নদী সে দেখেনি। এ ঘটনাটি ধরে কবি বলেন, এরূপ একপেশে পুঁথিগত শিক্ষায় সত্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। এর ফল দাঁড়ায় কূপমণ্ডুকতা। এই একপেশে প্রণালীর শিক্ষা থেকে শেষে এও দেখা যায়,—নিজের দেশকে একপেশে জ্ঞানে অন্ধভক্তিতে খুব মহৎ বা অজ্ঞানজাত অবজ্ঞায় খুব তুচ্ছ করে জেনে শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্মেছে তার সম্বন্ধে আত্যন্তিক অভিমান বা অবহেলা। পুঁথিগত দূরের জিনিসের জ্ঞান দরকার, কিন্তু কাছের জিনিসেরও পরিচয় সম্যক্‌রূপে না ঘটলে কোনো জ্ঞানই সহজ ও সুগম হয় না। এই আলোচনা-ক্রমেই কবি বলেন, "আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে।··· ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।···সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না।···ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টান এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে।" ১৩২৬ সালের এই মন্তব্যটির মধ্যে কবির বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষটি মিলে। এখানে পূর্বোক্ত একটি কথা মনে পড়ে, ১৩১১ সালে বিদেশ থেকে কবি লিখেছিলেন, —"যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর-মুক্ত করিতেই হইবে।" তা থেকে বোঝা যায় এই বিদ্যাসমবায় তথা বিশ্বভারতীর প্রেরণা কবির মনে বহু পূর্ব থেকেই দেখা দিয়েছিল। ১৩২৮ সনের ১৫ অগষ্ট "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে কবি তাঁর এই বিদ্যাসমবায়ের পরিণত ধারাটিকেই ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে তৎসম্পর্কিত কাজের ভূমিকায় আহ্বান জানান। ঐ বছরই ৮ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়"টি "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে।

জ্ঞান প্রচারের পক্ষে বিদ্যালয়ের মতো লাইব্রেরীও একটি প্রধান পথ। মফঃস্বলের ভিতর স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীটিকে কবি ভারতের অন্যতম লাইব্রেরীরূপে দাঁড় করিয়েছেন। শুধু বড়োদের নয়, সেখানে শিশুদেরও পাঠের বিস্তৃত সুযোগ দিতে তিনি যত্নবান ছিলেন। লাইব্রেরীর কর্তব্য আলোচনাসূত্রে তিনি লিখেছেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা।···লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া,—গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।" (১৩৩৫)

কবি জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেছিলেন, "ধ্যানচর্চাও শিক্ষা ব্যাপারের একটি অঙ্গ।" মনকে সংযত ও একাগ্র করবার চর্চাই এর মূলে। এই মনঃসংযম ও একাগ্রতা শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রধান আবশ্যক। সুতরাং পার্শ্বপন্থা হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্যানের উপযোগিতা উপেক্ষা করবার নয়। "ধ্যানী জাপান" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে জাপানের অভিজ্ঞতা কবি বিশদ্ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। (১৩৩৬)

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কবির মত জানা যায়, "স্ত্রীশিক্ষা" নামক প্রবন্ধটিতে। আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষার প্রতিই সকলের বেশি আগ্রহ এবং আয়োজনও রয়েছে সেই দিকেই বেশি। স্কুল-কলেজ স্থাপন ক'রে সেখানে ছেলেদের মতো সমান ভাবে মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টা দেশে কমই দেখা গেছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত, চিত্র সেলাই এবং খেলাধুলার সর্বমুখী আয়োজন ক'রে শান্তিনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করেন। এই প্রচেষ্টার বড়ো অনুষ্ঠান তাঁর "শ্রীভবন"। শান্তি-নিকেতনে সহশিক্ষা প্রচলিত। কী আদর্শে তিনি মেয়েদের গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব সেই মতটি পরিস্ফুট ক'রে বলেন 'শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে" প্রাপ্ত একখানি চিঠির উত্তরে। তার উপসংহারে ভারতীয় সনাতন আদর্শটিরই সমর্থন ক'রে তিনি বলেন: "মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এই জন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানব-সমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু, সংস্কার যত দূর পর্যন্তই যাক, সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার "সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তার অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।" (১৩২২)

এ পর্যন্ত আলোচনা চলে এসেছে কম-বেশি ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সমাজ লক্ষ্য করে। "শিক্ষা" গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়,—শিক্ষিত শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত বিশাল জনসমাজের সেবা ও শিক্ষার অভাবের দিকে কবির মনন-ধারাটি একাগ্ররূপে প্রাধান্য লাভ করেছে "পল্লীসেবা" ভাষণে। মানুষে-মানুষে মেলবার অন্তরায় ঘটায় শিক্ষার ব্যবধানে। জনতা শিক্ষিত না হলে দুর্গতির মূল দেশের মাটি থেকে উঠবার নয়। কবি বলেছেন,—"ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান,—তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়,—এমন কি, যে কামনা যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা-পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে

ঠিক মতো সাড়া চলেনি।···তাদের যা আছে সেটা আমাদের নয়।··· আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়।" কবি বলেন,—"এই করে কি আমরা বাঁচব?" দেশের এই অধিকাংশ পল্লীবাসী জনতার দিকে কবির দৃষ্টি গিয়েছিল বহু আগে থেকেই। "রাশিয়ার চিঠি"তে কবি লিখেছেন, "আমার মনে আছে পাবনা কনফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো এক জন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে।···বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে।···ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি, যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পসল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি।" রাশিয়া-ভ্রমণের থেকে কবির জনশিক্ষা ও জনসেবার ব্যাপক আয়োজন সম্বন্ধে মনে সাহস ও ভাবনার প্রসার দেখা দেয়। রাশিয়ায় যাবার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই, শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে; "পল্লীর প্রাণ উদ্বোধনের যজ্ঞ" স্বরূপ জনসেবার কাজ নিয়ে কবি গড়েছিলেন "শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান।" তার নানা বিভাগীয় কাজের মধ্যে পল্লীশিক্ষা বিস্তার ছিল অন্যতম। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সে বছরই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে তিনি বলেন,—"কখনও আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। তাদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা ক'রে যেন তাদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়:—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।" (১৩৩৭)

এর পরে "শিক্ষার বিকিরণে" কবি জনশিক্ষার কথা বলেছেন, কয়েকটি ঘটনাযোগে। চাষীরা একবার কবিকে গ্রামে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়, অধিকাংশই ছিল তাদের মুসলমান। কবির সম্মানে চলেছিল যাত্রাগান। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলেবুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।" পালাটা আধ্যাত্মিক বিষয়ক। "রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে; শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ ক'রে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।" কবি বলেন, "এ রকম জনশিক্ষার ধারা আমাদের দেশে চলে আসছে আবশ্যিক নয় স্বেচ্ছিক ভাবে।" "সে অনেক কালের। তার স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সর্বদেহে।" দেশে যখন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হল, আনুষাঙ্গিক নানা দুর্গতি সংক্রমণের সঙ্গে জনশিক্ষার অবলুপ্তিও ঘটল শোচনীয় ভাবে। কবি যা দেখেছেন, সেটি ছিল ভাঙন-ধরা অবস্থার মধ্যেও পূর্বধারার জনশিক্ষার একটি ছবি। দেশের শোচনীয় পরিণতির ছবি দেখিয়েছেন কবি দু'টি ঘটনায়। বলেছেন,—"দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের নিকট-সংশ্রবে। গরমের সময় একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে।" নিদারুণ জলাভাব হেতু মেয়েরা বহু দূরের নদী থেকে বহু কষ্টে বয়ে আনত জল!" "সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল মিশ্রিত।" অগ্নিদাহে ওলাউঠায় গ্রামের দুঃখের সীমা থাকত না। মানুষের এ দুঃখ দৈহিক। আবার তার আরেক রকমের দুঃখের ঘটনাও কবি বর্ণনা করেছেন। দিনকর্ম শেষে হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মনের তাগিদে একটানা সুরে তারস্বরে একপদের আবৃত্তি ক'রে চলেছে গ্রামের কীর্তন। তার ভিতরে কবি দেখতে পেয়েছেন, লোকের অদম্য মনের ক্ষুধা, কিন্তু খোরাকের একান্ত অভাব। জোগান নেই কোনো নূতন খাদ্যর। পল্লীবাসী সাধারণের এই দৈহিক মানসিক সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্গতিই কবিকে পীড়িত করেছে। আরেকটি ঘটনা এই পল্লীবাস-কালেই কবির গোচরে আসে। বলেছেন,—"সাধু-সাধকদের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে।···তাদের কাছেই শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গ-পথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্য-প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলুপতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব, যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধিকে সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।" শিক্ষার অভাব এবং কুশিক্ষার প্রশ্রয় পরস্পর সাহায্যসূত্রে উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে লোকসাধারণের মধ্যে অলিতে-গলিতে যে নৈতিক সামাজিক দুর্গতি দিনের পর দিন অবাধে বিস্তারিত ক'রে চলেছে, তার থেকে ত্রাণ পাবার উপায় সুশিক্ষাবিস্তার। "সেই "শিক্ষার বিকিরণ" করতে হবে দেশে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপক পন্থায়;—সে পন্থা মাতৃভাষা। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধেও কবি বলেন, ঐ পন্থাতেই তা সর্বজনমনে প্রবেশের অনেকটা সুযোগ পাবে। কবি এই প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব শিক্ষাদান-প্রণালীর উল্লেখ করে বলেছেন,—"একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে।" এ সঙ্গে কবির মন্তব্য হচ্ছে, "বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়।" কবির আবেদন—"মাতৃভাষার অপমান দূর হোক।" (১৩৪০)

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে 'মাতৃভাষার অপমান' তিনিই অনেকটা দূর করেন। আজ এদেশে শিক্ষার বাহন বাংলা। গুরুদেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদবী বিতরণের সভায় এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষেও বক্তৃতা দেন বাংলায়। "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" শীর্ষক বক্তৃতার মধ্যে এক স্থলে তিনি বলেছেন, "আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে

রাখলেন একটি চিহ্নের মতো।" (১১৩৩) ১৩৩২ সনের "শিক্ষার বাহন" নামক বিখ্যাত ভাষণে কবি যে আকাঙ্ক্ষাটিকে সজোরে দেশের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এত দিনে আমরা তার বাস্তব পরিণতি দেখতে পাচ্ছি।

শিক্ষার ব্যবহারিক আদর্শ ও প্রণালী নিয়ে নানা দিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবির নির্দেশ পাওয়া যায় "শিক্ষা" গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে "আলোচনা" অধ্যায়টিতে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী কর্মীর পক্ষেই আলোচনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক কথাটিই তার বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রের কথা। শান্তিনিকেতনে কবির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষাপ্রণালীতে দৈনন্দিন আশ্রম-জীবন পরিচালিত হয়েছে, তারই ভিত্তিতে কথাগুলি বলা হয়েছে ব'লে, বিশেষ ভাবেই তার মূল্য আছে। তার কোনো দু'-একটি কথা পৃথক্‌ভাবে এখানে উদ্‌বৃত্ত করে না দিয়ে গোটাটাই পড়ে দেখবার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। এই সঙ্গেই ঐ "শিক্ষা" গ্রন্থেরই আধুনিক সংস্করণের প্রথম খণ্ডস্থিত "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধ এবং "শ্রীভবন, ও "পাঠভবন"-নিয়ম সংক্রান্ত পৃথক্ দু'টি পুস্তিকাও সমানই দ্রষ্টব্য। আরো একটি পুস্তিকা সকলের পড়ে নেওয়া ভালো, তার নাম "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।"

ইতিমধ্যে কবি "শিক্ষা ও সংস্কৃতি" নামক রচনায় কয়েকটি কাজের কথা বলেছেন, শিক্ষার তা শেষ পর্য্যায়ের বিষয়। শিক্ষা-বিধি নিয়ে আলোচনা করবার কথা বিশেষ ভাবেই ভাবছেন, এমন সময় আমেরিকার একটি কাগজে স্বীয় চিন্তাটির অভিব্যক্তি কবি দেখতে পেলেন। আধুনিক শিক্ষায় সংস্কৃতির অভাব লক্ষ্য ক'রে আমেরিকান লেখক বলেছেন, চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্ত দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?" কবি বলেন,—"সংস্কৃতিবান মানুষ শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে আনন্দ পায়।" দেশবাসীর ভাববার মতো একটি কঠিন সতর্কবাণী এই উপলক্ষে কবি উচ্চারণ করে বলেছেন,—"সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখতে পাই।...তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়ুজনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে।... সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ পূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ ক'রে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক্, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।" এই বিষের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কবির মতে "পরীক্ষা পাসের জন্য পড়া মুখস্থ করা নয়," তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে "মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া।"

সংস্কৃতি হচ্ছে সুশিক্ষার ফলশ্রুতি; সার জিনিস। "সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে, এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।"

এই সংস্কৃতিবান শিক্ষার্থীরই বাস্তব উদাহরণস্বরূপে কবি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আচরণ উল্লেখ ক'রে বলেছেন,—"একদিন দেখেছিলেম শান্তিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল, আমাদের ছাত্রেরা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে; সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন, তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না, আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য ব'লে জ্ঞান করত; সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে; এ সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম ক'রে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখিনি। আশা করি তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিক মতো যাচাই করতে জানে।" (১৩৪২)

বর্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সাধনার একটি রূপধারণা মিলেছে ১৩১৮ সনের "ধর্মশিক্ষা" প্রসঙ্গে। এখানে উপসংহার অংশে দেখা যাচ্ছে সেই শিক্ষারই পরিণত ফলস্বরূপ সুগঠিত এক দল মানুষের রূপ। এমনি মানুষ গড়বার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবির যা-কিছু শিক্ষাবিধির উৎপত্তি। মানুষের এই সংস্কৃতিজাত আচরণই হয়েছে কবির কাছে 'একই কালে ধর্মাচরণের সামিল। গোড়াকার ঐ "ধর্মশিক্ষা"তে ধর্ম বলতে যে-জিনিস কবি লোকের সামনে ধরেছেন, তা এই সংস্কৃতিরই নামান্তর, এটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। উপরের চিত্রটি কবির শিক্ষারও যেমন সার্থকতার মাপকাঠি, তেমনি তাঁর ধর্ম্মেরও। এই মাপকাঠির নিরিখেই কবির শিক্ষা ও ধর্ম চিরদিন বিচার্য। ছাত্রছাত্রী-সমাজের বিশেষ ক'রে, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই চিত্রটি বিশেষ ভাবেই এ জন্য মনের সম্মুখে ধরে রাখবার মতো। প্রত্যেকেরই জানা চাই শিক্ষা থেকে পেতে হবে সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিবান বা শিক্ষিত বলা যাবে তাকে তখনই,—যখন, এমনি ভিতরের স্বভাবের থেকে আপনি এসে তার শিক্ষা লাগবে মানুষের সেবা-কাজে।

[ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়

ছয়

স্বামীজী ত্যাগ ও সেবাকে যে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে ধর্মের পতাকা উত্তোলিত রাখিতে হইবে এবং কোন অবস্থায়ই উহাকে অবনমিত হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্মের পথেই ভারতের মুক্তি। ধর্মের পথকে শাশ্বত পথ জানিয়া মুক্তিতীর্থযাত্রীকে তিনি সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দও ওই একই পথের কথা বলিয়াছেন। ইহারও পরে মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাইয়াছি। মহাত্মাজী ভারতের মুক্তি-সাধনায় ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন। জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও কিংবা সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়িয়াও তিনি সেই সত্য-পথ হইতে ক্ষণেকের জন্য ভ্রষ্ট হন নাই। গান্ধীজী সাধনায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন সেই পথ ধরিয়া।

স্বদেশী যুগে দেশনায়ক অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

..."আমরা ভারতবাসী, আর্য জাতির বংশধর, আর্যশিক্ষা ও আর্যনীতির অধিকারী। এই আর্যভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য-চরিত্রের লক্ষণ। মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য জাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে ধর্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য-শিক্ষা ও নীতিহারা। আমরা আর্য জাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশ মাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের কর্তব্য। জাতি-রক্ষার উপায় আর্য-চরিত্রের পুনর্গঠন।"...

এই বাণী অরবিন্দ আমাদের দিয়াছেন প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার সম্পাদিত বাঙলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে।— (১৩১৬ সাল ৭ই ভাদ্র, ১৯০৯, আগষ্ট, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'আমাদের ধর্ম' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে গৃহীত) তিনি তখন এক বৎসরের কারাবাস—তাঁহার ভাষায় 'আশ্রম-বাস' অন্তে বাহির হইয়া আসিয়া কর্মক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন।

কারামুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরে উত্তরপাড়া (হুগলী) 'ধর্মরক্ষিণী সভার' উদ্যোগে আহূত এক বিরাট জনসভায় অরবিন্দ যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন,—কারাবাস-কালে তাঁহার ভগবদ্দর্শন এবং ভগবানের নিকট হইতে দুইটি আদেশ-বাণী প্রাপ্তির কথা। দ্বিতীয় আদেশ-বাণীতে শ্রীভগবান অরবিন্দকে জাতির অভ্যুত্থান এবং সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

..."When you go forth, speak to your nation always this word, that it is for the Sanatan Dharma that they arise, it is for the world and not for themselves that they arise. I am giving them freedom for the service of the world. When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. To magnify the religion means to magnify the country."—"Shri Aurobindo Speeches."

এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করিতেছি স্বদেশভক্ত ও স্বজাতিবৎসল কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত "ভারত আমার" জাতীয় সঙ্গীতটি। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কবি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যে "তীর্থক্ষেত্র" হইতে মানব পাইয়াছে "দর্শন উপনিষদে দীক্ষা" এবং "কর্ম-ভক্তি ধর্ম শিক্ষা," তাহা যে "মহিমার" "জন্মভূমি" এবং "ধর্ম-ধ্যানের" "ধাত্রী"। এই আশার বাণীও আমরা শুনিয়াছি—

"ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।"

—সেই জাতির কখনও বিলোপ হইবে না এবং সেই দেশের কখনও ধ্বংস হইবে না। আরও শুনিয়াছি—

"এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণার দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।"

এই মহাদেশ ও মহাজাতির অতীত মহিমার স্মৃতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কবি গাহিয়াছেন :—

"আর্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র?"

* * *

"যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ;
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।"

সাত

ভারতীয় মহাজন মহাপুরুষ এবং সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে। আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের জন্য তাঁহারা গুরু-কৃপার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমর্পণ-যোগ অভ্যাস করেন গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া; এবং পরে ভাগবত সমর্পণের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন গুরুর মাধ্যমে। তাঁহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের সেতু হইলেন গুরু। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন এবং এই পথেরই পথিক ছিলেন। সুতরাং স্বামীজীর জীবন-বেদ ও জীবন-দর্শনের পরিচয় পাইতে হইলে এবং সাধনার তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার আচার্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাদ দিলে চলিবে না। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের পাণ্ডব-সেনাপতি

ভক্ত অর্জুনকে বুঝিতে হইলে সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া তাহা সম্ভব হইবে না। স্বামীজী নিজেও নানা প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুদেবের অপার করুণা ও কৃপার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শক্তির উৎস হইলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরের ওই পূজারী ব্রাহ্মণ, তিনি জীবন-দর্শনের প্রাণবাণী শুনিয়াছেন ওই ঠাকুরের মুখে, আর জীবন-বেদের শিক্ষা পাইয়াছেন সেই আচার্যের চরণ-তলে বসিয়া। সুতরাং জাতি-গঠনে স্বামীজীর দানকে আমরা নিঃসন্দেহে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দান বলিয়া স্বীকার করিব। সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা ও কৃপা না পাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত নব জন্ম লাভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হইতে পারিতেন না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে ভারতের মুক্তি ও অভ্যুত্থানের কার্য আরব্ধ হইয়াছে,—ইহাই হইল অরবিন্দের—দেশনায়ক অরবিন্দের অভিমত। ঠাকুর সম্পর্কে অরবিন্দ বলিয়াছেন :—

..."In Bengal there came a flood of religious truth. Certain men were born, men whom the educated world would not have recognised if that belief, if that God within them had not been there to open their eyes, men whose lives were very different from what our education, our Western education, taught us to admire. One of them, the man who had the greatest influence and has done the most to regenerate Bengal, could not read and write a single word. He was a man who had been what they call absolutely useless to the world. But he had this one divine faculty in him, that he had more than faith and had realised God. He was a man who lived what many would call the life of a mad man, a man without intellectual training, a man without any outward sign of culture or civilisation, a man who lived on the alms of others, such a man as the English-educated Indian would ordinarily talk of as one useless to society. He will say, "This man is ignorant. What does he know? What can he teach me who have received from the West all that it can teach?" But God knew what he was doing. He sent that man to Bengal and set him in the temple of Dakshineshwar in Calcutta, and from North and South and East and West, the educated men, men who were the pride of the university, who had studied all that Europe can teach, came to fall at the feet of this ascetic. The work of salvation, the work of raising India was begun."—"Shri Aurobindo Speeches."

এই উদ্ধৃতি দিয়াছি অরবিন্দের একটি রাজনীতিক ভাষণ হইতে। ১৯০৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী বোম্বে নগরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় এই ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল। ভাষণের বিষয় ছিল—'Present Situation' (বর্তমান পরিস্থিতি) এবং সেই ভাষণে তিনি বাঙলার জাগরণ ও নিগৃহীত বাঙলার তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ হইলেন ভারতের মুক্তির ত্রিধারা। নূতন ভারতের নব বেদের ত্রয়ী—এই ত্রি-মহামানবের সাধনা, শিক্ষা ও বাণী। প্রতীচ্যের ঋষি রোমাঁ রোলাঁর ভবিষ্যদ্বাণী :—

..."পাশ্চাত্যের যাঁহারা প্রাচ্যকে শান্ত, নিশ্চল ও কর্মপ্রেরণাহীনরূপে অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিবেন যে, ভারতবর্ষ অবিলম্বে কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তিতে আমাদের অতিক্রম করিয়া যাইবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)-এর সাধনা ভারতবর্ষকে যদি ক্ষণকালের জন্ত ধ্যান-স্নিগ্ধ ছায়াতলে সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে তাহা অগ্রগমনের প্রাক্কালে প্রস্তুতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।"...

আট

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের জীবনের সমস্ত দিক পরিক্রমা করা লেখকের সীমাবদ্ধ শক্তিতে সম্ভব নহে। তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান সমাপ্ত করিব। স্বদেশের প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং স্বজাতির জন্ত প্রীতি কত গভীর ছিল, ইহার নিদর্শন মিলিবে তাঁহার রচনা, ভাষণ ও বাণী হইতে এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়া। স্বামীজীর দৃষ্টিতে জন্মভূমি জননী,—জন্মভূমি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তাঁহার জীবন ভারত ও ভারতবাসীর নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবায় নিবেদিত। ভারতের দীন-দরিদ্র, অন্ধ-আতুর, অনাথ-কাঙাল, দুঃখী-দুর্গত, নিঃস্ব-নিরাশ্রয়, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানি-মূর্খ—প্রত্যেক সন্তানই তাঁহার রক্ত, তাঁহার ভাই। মাতৃভূমির ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁহার নিকট তীর্থরজের ন্যায় পবিত্র। ভারতভূমির অতীত কীর্তি, গৌরব ও মহিমা স্মরণে স্বামীজী গর্ব বোধ করিতেন,—ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্গতি, দারিদ্র্য-দুর্দশা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত। নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অন্যায় অবিচারে এবং মানবতা-বিরোধী হৃদয়হীন আচরণে তিনি প্রাণে দারুণ আঘাত পাইতেন। স্বামীজীর দেশাত্মবোধ এবং স্বদেশবাসীর জন্য বেদনাবোধ ছিল এমনই সত্য ও গভীর!

স্বামীজী বলিতেন যে, স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইলে হৃদয়বান, কর্মকুশল ও দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। যেদিন স্বদেশের চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িবে, গরীয়সী জন্মভূমির পবিত্র প্রতিমূর্তি ভিন্ন আর কিছুই তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে না, দেশমাতৃকার কল্যাণকল্পে প্রিয়-পরিজন, বিষয়-বিত্ত, সুখ-স্বস্তি, স্বার্থ মান সর্বস্ব প্রসন্ন চিত্তে ত্যাগ করিতে পারিবে, সেদিন তুমি প্রকৃত দেশভক্ত হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ বলিয়া জানিও।

তাঁহার মতে দেশের মুক্তি—জাতির অভ্যুত্থান শুধু পুরুষের দ্বারা হইতে পারে না। পুরুষ জাতির জাগরণ ও উন্নয়নের সঙ্গে নারী জাতির জাগৃতি ও উন্নতির কার্য যুগপৎ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় নারীর দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াই বলিয়াছিলেন :—

"দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস্। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই কতকগুলি বেদ-বেদান্ত মুখস্থ করে?"

আদর্শ ও যোগ্যা নারীর অভাবে যে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে, স্বামীজী তাহা অনুভব করিতেন। সুতরাং তিনি চাহিয়াছিলেন তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্যে এমন নারী গড়িয়া তুলিতে—যাঁহারা হইবেন ধর্মশীলা ভক্তিমতী বিদুষী, আর হইবেন নির্ভীক বীর-ললনা এবং ভাবী বীর-সন্তানের জননী। স্বামীজী দেহরক্ষার বৎসর চারেক পূর্বে হিমালয়ের একটি উপত্যকায় কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। তথায় মাদ্রাজের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের জনৈক প্রতিনিধির সহিত তাঁহার "ভারতীয় নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হয়। স্বামীজীর উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তি সকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাই ও মীরাবাই-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা, স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর-রমণী হইবে—ভগবানের পাদপদ্ম-স্পর্শে যে বীর্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।"

নারী জাতির শক্তিতে স্বামীজীর বিশ্বাস এরূপ দৃঢ় ছিল যে, তিনি মনে করিতেন—"পাঁচ শত পুরুষের দ্বারা ভারত-জয় যদি পঞ্চাশ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে, তবে সমান সংখ্যক নারীর দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।" ..."With five hundred men, he (the Swami) would say, the conquest of India might take fifty years; with as many women, not more than a few weeks."—"The Master as I saw Him" by Sister Nivedita.

আদর্শ নারী গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য স্বামীজী একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেই সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ স্বামীজীর ভক্ত-শিষ্য স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" গ্রন্থে গ্রথিত আছে। স্ত্রীমঠ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, কি আদর্শে ইহা পরিচালিত হইবে এবং মঠের শিক্ষার্থিনীদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে—তৎসমুদয়ের বর্ণনাও উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভগিনী নিবেদিতার লেখা হইতেও জানা যায়—স্বামীজীর জীবনের দুইটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল; তন্মধ্যে একটি—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যমণ্ডলীর জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা, এবং অপরটি নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা। ..."His own life had two definite personal purposes, of which one had been the establishment of a home for the Order of Ram Krishna, while the other was the initiation of some endeavour towards the education of woman."

নয়

ভগিনী নিবেদিতা এক জন পাশ্চাত্য-দেশীয়া বিদুষী ধর্মশীলা মহিলা। তাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের জন্মস্থান—পবিত্র ভারতভূমিকে এই মহীয়সী নারী তাঁহার স্বদেশরূপে বরণ করিয়া নিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ দেবভূমির সেবা ও কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আচার্যদেব তাঁহার কাছ হইতে কি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা দীক্ষা-দান কালে গুরু-দত্ত নাম 'নিবেদিতা' হইতেই প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সেবায় জীবন নিবেদিত করিয়া তিনি 'নিবেদিতা' নামকে সার্থক করিয়া রাখিয়াছেন। গুরুদেবে তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস এমনই অকৃত্রিম ও অবিচলিত ছিল যে, তিনি নিজের পৃথক্ সত্তা পর্যন্ত বিলোপ করিয়া দিয়াছিলেন। "Nivedita of Ram Krishna-Vivekananda"—এই আত্মপরিচয়ের সূত্রে নিবেদিতা স্বীয় নামকে ভক্তির অক্ষয় ডোরে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন—গুরু এবং গুরুর-গুরু মহাগুরুর পুণ্যপূত নামের সঙ্গে।

এই ভারত-বরেণ্যা মহিলা তাঁহার আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত ও অতুলনীয়। সেই চিত্রলেখায় আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব,—জননী জন্মভূমির একনিষ্ঠ ভক্ত-সন্তান বিবেকানন্দের অনবদ্য বাস্তব রূপ।

'There was one thing, however deep in the Master's Nature, that he himself did not know how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout those years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed. He neither used the ward 'nationality' nor proclaimed an era of 'nation-making.'-'Man-making', he said, was his own task. But he was born a lover and the queen of his adoration was his Motherland. Like some delicately-poised bell, thrilled and vibrated by every sound that falls upon it, was his heart to all that concerned her. Not a sob was heard within her shores that did not find in him a responsive echo.

There was no cry of fear, no tremor of weakness, no shrinking from mortification, that he had not known and understood.*

অর্থাৎ—গুরুদেবের প্রকৃতিতে এমন একটি ভাব গভীররূপে নিহিত ছিল যে, উহার সামঞ্জস্য বিধান কি করিয়া করিতে হইবে তাহা তিনি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই ভাবই তাঁহার স্বদেশানুরাগ এবং স্বদেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায় মর্মজ্বালার অনুভূতি। যে কতিপয় বর্ষ আমি প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম, সে সময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, মাতৃভূমির চিন্তা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এক জন সত্যিকার খাঁটি কর্মী। তিনি কখনও 'জাতীয়তা' শব্দটি ব্যবহার করিতেন না, কিম্বা জাতি-গঠনের যুগ ঘোষণা করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, 'মানুষ-গঠনই' তাঁহার নিজস্ব কর্ম। কিন্তু গুরুদেব প্রেমিক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মাতৃভূমি ছিল তাঁহার আরাধ্যা দেবী। ভারসাম্য সমন্বিত ও সূক্ষ্ম ভাবে লম্বমান ঘণ্টিকা যেমন প্রত্যেক শব্দ-পতনে কম্পিত ও আন্দোলিত হয়, তেমনই মাতৃভূমির সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা তদনুরূপ হইত। মাতৃভূমির কোন স্থান হইতে যদি একটি মাত্র তপ্ত শ্বাসও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত, তবে তিনি তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইতেন। ভারতবর্ষে এমন একটি ভীতিজনিত আর্তনাদ, দুর্বলতা-প্রসূত কম্পন এবং বেদনা-সঞ্জাত সঙ্কোচন ছিল না, যাহা তাঁহার অজ্ঞাত এবং অননুভূত ছিল।

পরিশেষে, মহামানবের পুণ্য জন্ম-তিথিতে স্মরণ করিতেছি তাঁহার সেই অবিস্মরণীয় বাণী—যাহা একদা পরাধীন ভারতে মুক্তি-সাধনার বহু সাধককে আত্মবলিদানে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই বাণী কোন একটি বিশেষ কালের জন্য নহে, উহা নিত্য কালের;—সেই বাণী শাশ্বতী বাণী। স্বাধীন ভারতেও তাহা দেব-বাণীর মতো দেশভক্ত নর-নারীকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দান করিবে। বন্ধনমুক্ত ভারতবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠে উদ্গীত হউক সে মহাপুরুষ-বাণী:—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

বিজ্ঞাপন চাই

বিজ্ঞাপন এখনও বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছে অবহেলার বস্তু হয়ে আছে। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ব্যবসায়ী করতে চান ব্যবসা, অথচ ব্যবসায় বিজ্ঞাপন করতে একেবারেই নারাজ। ও-দেশে কিন্তু ব্যবসার আগে ওরা যেটা করে সেটা বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের এত বেশী প্রভাব হয়েছে যে, ও-দেশের সমব্যবসায়ীদের দস্তুর মত চিন্তায় ফেলেছে। সম্প্রতি ও-দেশের রেল কোম্পানীর মালিকরা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে, বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন যে ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে তাতে রেল কোম্পানীকে পাততাড়ি গোটাতে হবে অতি শীঘ্র।

ও-দেশের কাগজে পর্য্যন্ত রেল কোম্পানীর এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কার্টুন ছবি ছাপা হচ্ছে। একখানি কার্টুন তো রীতিমত সাড়া তুলেছে। কার্টুনটি হচ্ছে ট্রেণ চলাচলের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। ছবিটির তলায় নামকরণ করা হয়েছে—"Why Don't Trains Fly?" কিন্তু শত চেষ্টাতেও মানুষ আকাশে উড়তে যদিও বা পারে, ট্রেণ কখনওই পারবে না এই সব নানা দিক ভেবে-চিন্তে ট্রেণ কোম্পানীরাও বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে। বিজ্ঞাপনে ট্রেণের হাজার উপকারিতা আর সুখ-সুবিধার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ট্রেণের দুর্দ্দান্ত গতিও বিজ্ঞাপনে জাহির করে যাত্রীদের আকর্ষণ করা হচ্ছে। আবার অপপ্রচার সম্বন্ধে বাঙালী যেমন ওয়াকিবহাল নয়, তেমনি ও-দেশে অপপ্রচারের প্রতি সরকার এবং জনসাধারণের চোখ সদা জাগ্রত! সম্প্রতি এক ধরণের cold cure, যাতে না কি cure কেউ না হয়ে cold হয়ে যাচ্ছিল, সেই ওষুধের বিজ্ঞাপন জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। যাতে সস্তা বিজ্ঞাপনের মোহে দেশবাসী বিভ্রান্ত না হয় সে জন্য কড়া নজর রাখা হয় সব সময়ে। আবার অত্যধিক ধূমপানে দেশবাসীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেতে দেখে সিগারেট কোম্পানীর মালিকদের ডেকেও ধমক দেওয়া হয়েছে, যাতে অধিক বিজ্ঞাপন না করে তারা।

আমরা এখনও বুঝতে পারিনি বিজ্ঞাপনের কি অসাধারণ প্রয়োজন। মিথ্যা বিজ্ঞাপন (Fake Advts) ওদের দেশ সরকার বন্ধ ক'রে দেয়, আর আমরা এখনও স্রেফ মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেখতেই অভ্যস্ত। কেন না, পাঁজী রোজই দেখতে হয় আমাদের, যদিও পাঁজীর প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই মিথ্যা। আমরা বিজ্ঞাপনের মূল্য বুঝি না, তাই বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত বস্তুটা যে আসলে কি, তাও এখনও বুঝতে পারি না। ফলে আমরা আর আমাদের ব্যবসায়ী দেশবাসীর কাছে অজানা থেকে যাই।

কিন্তু ব্যবসা কখনও কাকেও না জানিয়ে কেউ করতে পারে, এমন কথা পৃথিবীর কোন অভিধানেই দেখতে পাওয়া যায় না। চোরা ব্যবসা নয়, আসল ব্যবসা করতে হলেই ব্যবসার নাম জানাতে হয়! আর সেই জ্ঞাপন ঢাক পিটিয়ে জানাবার দিন বহু দিন গত হয়েছে, এখন যে-দিন এসেছে সে-দিনে জানাবার একমাত্র মারফৎ হ'ল বিজ্ঞাপন।

বাঙালী ব্যবসায়ীরা অস্বীকার করতে পারবেন উপরিউক্ত কথাগুলো?

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

কোন স্বাধীন রাষ্ট্র বিজ্ঞান গবেষণাকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না এ কথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, কারণ রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞান গবেষণার সহায়তা অপরিহার্য। পাশ্চাত্য স্বাধীন রাষ্ট্রে—বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার ও তার ফলে তাদের বহুমুখী উন্নতি লক্ষ্য করে এ কথাটা আজ আরো বেশী করে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ এত দিন পরাধীন থাকায় এখানকার বিজ্ঞান গবেষণার যথাযথ পরিচালনায় ভারতবাসীর বিশেষ কিছু হাত ছিল না। পূর্ব্বে যা-কিছু বিজ্ঞান-চর্চ্চা হয়েছে তার পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার ছিল বিদেশীর হাতে। তার ফলে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণাগার নির্ম্মাণ, জাতীয় কল্যাণে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ, উৎসাহী ও দক্ষ কর্ম্মী সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে আমাদের দেশ বহু পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে সমস্ত বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছে সে কৃতিত্বের কথাও স্মরণীয় বস্তু। পদার্থবিজ্ঞানে সার সি. ভি. রমণ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ ভাবা; রসায়নে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র; উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, ডাঃ সাহানী; গণিতশাস্ত্রে রামানুজম্‌ ভারতবর্ষেরই সন্তান। আজ ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন হয়েছে—দেশের শুভাশুভ নির্দ্ধারণের ভার আজ দেশবাসীর হস্তে। কাজেই বিজ্ঞান গবেষণার যে দিক্‌টা আজ অবহেলিত ছিল সেদিকে অবিলম্বে ভারত সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। কিন্তু স্বাধীনতার প্রারম্ভেই নানা দুর্য্যোগ দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। দেশ-বিভাগ ও শরণার্থী আগমনের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পেয়েছে প্রচণ্ড আলোড়ন। এই সঙ্কট অতিক্রম করে ভারতবর্ষকে সম্মুখের দিকে পদক্ষেপ করতে হয়েছে অতি সাবধানে। অর্থাভাবে সংগঠনমূলক বহু পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছে অথবা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখতে হয়েছে। জাতীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি করেছেন আবার কোনও ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয়ও দিয়েছেন। মোটের উপর বিগত ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে দেশে বিজ্ঞানের যেটুকু প্রসার হয়েছে তা আশানুরূপ না হলেও একেবারে নগণ্য বলা যায় না।

আণবিক শক্তি গবেষণা

আজ পৃথিবীর বিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞানচর্চ্চার যে দিক্‌টার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েছে সেটি হচ্ছে আণবিক শক্তি। এ কথা আজ সকলের কাছে সুপরিজ্ঞাত যে, প্রচণ্ড আণবিক শক্তিকে দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারলে দেশবাসীর বহু অভাব অনটন দূর হবে। তাই ভারত সরকারের উদ্যোগে আণবিক শক্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ এইচ. জে. ভাবার সভাপতিত্বে একটি আণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়েছে। ডাঃ ভাবা বলেছেন যে, আণবিক শক্তি উৎপাদনের বিশিষ্ট উপকরণ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ভারতে সুলভ। কাজেই এই উপকরণকে ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ আণবিক শক্তি উৎপাদন করে দেশবাসীর জীবন ধারণের মান উন্নত করা যেতে পারে।

সলিল-শক্তির প্রয়োগ

ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ। এই বিরাট মহাদেশের বুকের উপর দিয়ে বহু খরস্রোতা নদী বয়ে গেছে—যার সলিল-শক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাযে লাগিয়ে দেশের বহু উন্নতিবিধান সম্ভব। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ভারতের নদীগুলি দিয়ে বছরে প্রায় ১৩০ কোটি একর ফিট পরিমাণ জল বয়ে যায় এবং এই জল থেকে ৩ কোটি কিলোওয়াটের বেশী শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। এই বিরাট সলিল-শক্তি ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ ১৬০টি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং তার ভেতর ৪৬টির কায ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এইগুলি সম্পূর্ণ হলে মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে শুধু যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে তা নয়, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে, সেচের সুব্যবস্থা হয়ে বহু অনাবাদী জমি শস্যশালী হবে, পুরাতন জলপথগুলির সংস্কার সাধন হয়ে নতুন জলপথ সৃষ্টি হবে। এই ধরণের প্রধান কয়েকটি পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল।

(১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা এটি। এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হলে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার ৭৫০ লক্ষ একর জমিতে নিয়ত জলপ্রবাহের সুবিধা হবে এবং ৩০০,০০০ কিলোওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হবে। এই জলপ্রবাহের ফলে শস্য উৎপাদনে কৃষকদের বছরে ছয় কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দামোদরের বন্যাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এর ফলে। পরিকল্পনাটির জন্য ব্যয় করা হবে ৫৫ কোটি টাকা।

(২) কোশী পরিকল্পনা—উত্তর-বিহারের কোশী নদীর উপরে এই পরিকল্পনাটি জলসেচন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌচলাচল সুবিধা ও

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাযে ব্যবহৃত হবে। পরিকল্পনাটির দ্বারা নেপালের ছাত্রাগঞ্জে ৭৫০ ফিট একটি বাঁধ প্রস্তুত হবে। এর দ্বারা ১১০ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় করে রাখা যাবে ও ১০ লক্ষ কিলোওয়াটের বেশী সস্তা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। এই পরিকল্পনাটির জন্য খরচ হবে ৯০ কোটি টাকা এবং সময় লাগবে দশ বৎসর।

(৩) ভাকরা বাঁধ পরিকল্পনা—পরিকল্পনাটি করা হয়েছে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর উপর ৪০০ ফিট উঁচু একটি বাঁধ করবার জন্যে। এই জলসেচন ব্যবস্থার ফলে প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে চাষবাসের খুব সুবিধা হবে এবং ১৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হবে। এতে খরচ হবে কিঞ্চিদধিক ৭০ কোটি টাকা।

(৪) নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা নিয়ে ১৪০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ১২ কোটি টাকা। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা মিলে এবং তৎসহ অন্যান্য ছোটখাট পরিকল্পনাগুলোতে সর্ব্বসমেত খরচ হিসাব করা হয়েছে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা।

(৫) হিরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনা—উড়িষ্যা প্রদেশে এইটাই সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। মহানদীর উপর এই বাঁধ দেওয়ার ফলে ১০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের সুবিধা হবে এবং ৩৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সহায়তা হবে। এই পরিকল্পনাতে খরচের আনুমানিক হিসাব ৫০ কোটি টাকা।

(৬) রামপদ সাগর বাঁধ পরিকল্পনা—মাদ্রাজের এই বাঁধ পরিকল্পনাটির দ্বারা ৪০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের সুবিধা হবে। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন হবে ১২০,০০০ কিলোওয়াট। এই পরিকল্পনার ব্যয় ৮৫ কোটি টাকা এবং সময় লাগবে ১২ বছর।

এই সব প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে ছোট-ছোট বাঁধ ও অন্যান্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের ময়ূরাক্ষী বাঁধ এবং বরোদার সবরমতী জল-সেচন পরিকল্পনার জন্য খরচ হবে দু'কোটি টাকা। বিহারের গন্ধক উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য তিন কোটি টাকা খরচ হবে। হায়দরাবাদ-মাদ্রাজ সীমান্তে তুঙ্গভদ্রা বাঁধ পরিকল্পনা, মাদ্রাজের নিজস্ব ভবানী, কিষ্ট-না পরিকল্পনাতেও খরচ হবে চার কোটি টাকা। উত্তর-প্রদেশের রামগঙ্গা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ১৪ কোটি টাকা।

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের দেশে খাদ্য-ঘাটতি দেখা গেছে। এই খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার বহুবিধ চেষ্টা করেছেন এবং খাদ্য সম্পর্কে ১৯৫১ সালের ভেতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার আশ্বাস স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্যাকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সমাধান করবার চেষ্টা না করলে বিশেষ কিছুই সুবিধা হবে না এ কথা সরকার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি, জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি ব্যাপারে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে। চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাগারে সঙ্কর চাউল উৎপাদনের ব্যাপক চেষ্টা চলেছে এবং ইতিমধ্যেই দেড় হাজার সঙ্কর ধান সংগৃহীত হয়েছে। ভারতের চাউল উৎপাদন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে চীন, জাপান ও রাশিয়া থেকে স্বল্প সময়ে উৎপাদনক্ষম ধান আমদানী করে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ধানের সাথে তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে তিন শ্রেণী চীনা ধান এ দেশের উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

উক্ত গবেষণাগারে যবক্ষারজানজাত বিভিন্ন শ্রেণীর সারের উৎপাদিকা শক্তিও পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এমোনিয়াম নাইট্রেট ও ইউরিয়ার উৎপাদিকা শক্তি আশাপ্রদ হলেও এমোনিয়াম সালফেটের উৎপাদিকা শক্তিই সর্ব্বাধিক। প্রতি একর জমির জন্য উক্ত তিন শ্রেণীর সারের মধ্যে যে কোন একটা অন্যূন ২০ পাউণ্ড আবশ্যক হয়। রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য সিনড্রিতে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানায় প্রতিদিন এক হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হবে। এ ছাড়া ত্রিবাঙ্কুর কৃত্রিম সারের সরকারী কারখানায় বছরে ৫০ হাজার টন উৎপন্ন হচ্ছে। মহীশূরে আর একটি সার তৈরীর কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। জমির পক্ষে বোরণও একটি উৎকৃষ্ট সার এবং এমোনিয়াম সালফেট ছাড়াও একে ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া, পচা উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত সার ব্যবহারেও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে গোদুগ্ধের স্থান যে কত উচ্চে তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। ভারতে দুগ্ধবতী গাভীরও অভাব নেই—অথচ বেশীর ভাগ ভারতবাসীর ভাগ্যে গোদুগ্ধ জোটে না। ভারতের দুগ্ধোৎপাদন শিল্পের প্রধান সমস্যা দুগ্ধকৃচ্ছ্রতা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙ্গালোরস্থিত দুগ্ধোৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা-মন্দিরে যে গবেষণা চলছিল তাতে সুফল পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধী ও গির শ্রেণীর পশু উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং যথাযথ ভাবে ষণ্ড নির্ব্বাচন দ্বারা পশু প্রজননের ফলে দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সব জীবাণু অবস্থানের ফলে দুধ নষ্ট হয় তাদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে দুগ্ধ-পচন নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ, দুগ্ধে ভেজাল—বিশেষতঃ ঘৃতে বনস্পতি ভেজাল নিবারণকল্পে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিশ্লেষণের কাজও সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, অপরিষ্কার পাত্রে দুগ্ধ রাখলে সহজে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পাত্র পরিষ্কার রাখা ও জীবাণুশূন্য করার উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পাত্র পরিষ্কার করলে পাত্র জীবাণু-শূন্য হয়।

গরুর খাদ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ব্বাচন করলে গোদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইজ্জৎনগরস্থ ভারতীয় পশু গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, চীনা-বাদামের ছোবড়া গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বিচালী ও গমের ভূসী থেকে চীনা-বাদামের ছোবড়ায় অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও তন্তু থাকে। দেখা গেছে যে, ঐ ছোবড়া খাওয়ালে গরুর কোন অনিষ্টই হয় না; বরং প্রাপ্তবয়স্ক ষণ্ডের ওজন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া সমপরিমাণ গমের ভূসী, অল্প পরিমাণ সরিষার খইল ও লবণের সাথে মিশিয়ে দিলে ঐ খাদ্য গরু, বাছুর, ষণ্ড ও বলদে তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে।

পাট-শিল্প

দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ পাকীস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বেশীর ভাগ পাট উৎপাদনকারী স্থান ভারতের বাইরে চলে গিয়েছে, অথচ প্রায় সমস্ত চটকলই পশ্চিম-বঙ্গ অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নে অবস্থিত। এই পাট-সমস্যা দূরীকরণের নিমিত্ত ভারতীয় কেন্দ্রিক পাট সমিতির উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, তিসির খড় পাটের অনুকল্পরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রতি মণ খড়ে শতকরা ২০ ভাগ তন্তু পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কলিকাতার বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে পাটের উপর রঞ্জন-রশ্মির প্রয়োগের ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা চলেছে।

তুঁত চাষের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনীত মাটি কেন্দ্রীয় গুটিপোকা গবেষণা কেন্দ্রে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, দেরাদুনের মাটি তুঁত চাষের পক্ষে উপযোগী। রাঁচীর মাটিতে যথাযথ ভাবে সার দিলে তাও ভাল তুঁত চাষের পক্ষে উপযোগী হবে।

যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা

দেশে শিল্প সংগঠন ও বৈষয়িক উন্নতির সাথে যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। গত তিন বৎসরে এদিক থেকেও বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। কোর্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিট্যুট অফ সায়ান্স কর্ত্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিত হচ্ছে এবং ইন্‌ষ্টিট্যুটের সভাপতি গবেষণা-কার্য্য সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "A device for the control of road traffic lights by the application of the switching technique used in telephony had been worked out in the communication Engineering Department of the Institute. The department of internal Combustion Engineering had worked out the design of a type of electric generator driven directly from the oscillatory piston masses of internal Combustion engines. A new line of investigation of gas turbine research had been undertaken in the department with the funds provided by the Government of India. The Government of India in the ministry of Education had agreed in principle to the two-year programme of development of the Aeronautical Engineering at a capital cost of Rs. 11.4 lakhs and an ultimate recurring expenditure of Rs. 2 lakhs."

ভারতের বিভিন্ন রেলপথের এঞ্জিন এত দিন বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। ফলে প্রচুর অর্থ বিদেশীর করায়ত্ত হচ্ছিল। ভবিষ্যতে যাতে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিদেশ থেকে আর এঞ্জিন না আমদানী করতে হয় সেজন্য মিহিজামস্থ চিত্তরঞ্জনে একটি এঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

দেশরক্ষার ব্যবস্থা

স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই, দেশরক্ষার জন্য যে সব জিনিষ প্রয়োজন সেই সব বিষয় গবেষণা চালাবার জন্য দেশরক্ষা দপ্তরে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে এবং এক জন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাও নিয়োগ করা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টও একটি নীতি নির্দ্ধারণ বোর্ড এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন।

সম্প্রতি দিল্লীস্থ জাতীয় পদার্থবিদ্যা পরীক্ষা ভবনে দেশরক্ষা সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার খোলা হয়েছে। সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত ডিরেক্টারের অধীনে শীঘ্রই একটি সমর-বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও রয়েছে।

স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসারদের নির্ব্বাচন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য ইউনিয়ান পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ছাড়াও প্রার্থীদের মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই সম্পর্কে একটি মনস্তত্ত্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে।

সামরিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক গত অক্টোবর মাসে পুণার সন্নিকটে খড়ক ভাস্‌লা নামক স্থানে জাতীয় সামরিক শিক্ষালয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে আনুমানিক ৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই শিক্ষালয়ে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসারদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে। নির্ম্মাণের কাজে প্রায় চার বছর সময় লাগবে বলে আজ দেড় বছর হল দেরাদুনে একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষালয় খোলা হয়েছে। বিমানবাহিনীর জন্যও অনুরূপ স্কুলের স্থাপনা হয়েছে। রাডার ছাড়া আধুনিক বিমানবাহিনীর কল্পনা করা যায় না। সে জন্য একটি রাডার স্কুলও ভারতে খোলা হয়েছে; রাডার সংক্রান্ত আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বহু সংখ্যক যান্ত্রিককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যান্য বিভিন্ন গবেষণা কার্য্য

সর্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতির জন্য বিজ্ঞান-চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর অধীনে একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর প্রথম থেকেই কাজ করছে। এই দপ্তরের প্রায় সব কাযই বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই পরিষদ ২০টিরও অধিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবর্ত্তন করেছেন ও বিভিন্ন গবেষণা কার্য্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিন শতাধিক গবেষণা করেছেন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য প্রায় ১৫০টি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি মৃত্তিকা সংরক্ষণ, রোগ নির্ণয়, গমের রোগ নিরোধ, ফল ও শাকসব্জী সংরক্ষণ প্রভৃতি ৪৬টি নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা চালাবার অনুমতি দিয়েছেন। এই সব গবেষণা কার্য্যে মোট ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। তা ছাড়া ৭৫টি চলতি পরিকল্পনার কার্য্যকালও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হবে মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণাগারে

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ১০ শ্রেণীর সামুদ্রিক আগাছা মানুষ ও গরুর খাদ্য অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ঐ সব সামুদ্রিক আগাছা মান্দ্রাজের চতুর্দ্দিকে পাওয়া যায়।

শিবপুর বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সম্প্রতি কৃত্রিম পেট্রল ও অন্যান্য নানাবিধ মূল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। যে যন্ত্রে এ সব দ্রব্য উৎপন্ন হবে তা কলেজেই তৈরী করা হচ্ছে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ১১টি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপনের জন্য পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে পাঁচটিতে ইতিমধ্যে কাষ আরম্ভ হয়েছে। এদের ভেতর দিল্লীতে জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার, পুণায় জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার, কোলকাতার উপকণ্ঠ যাদবপুরে জাতীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার, ধানবাদস্থ জাতীয় জ্বালানী এবং লক্ষ্ণৌতে ভেষজ গবেষণাগার অন্যতম। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ নতুন পদ্ধতিগুলি শিল্পক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশান নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনেরও প্রস্তাব সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে।

তুষার, হিমাবহ প্রভৃতির পর্য্যালোচনা ও ভারতের নদীগুলির উপর তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ, হিমালয় অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক, জৈবিক, উদ্ভিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়েছে। এই গবেষণাগারের স্থান নির্ব্বাচনের জন্য এখন অনুসন্ধান চলছে।

ইভ্যান পেত্রোভিচ পাভলফ

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

রাশিয়ান বিজ্ঞানী পাভলফ ১৮৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন সেণ্ট পিটারসবার্গে এবং ১৮৮৩ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে রাশিয়ার মিলিটারী মেডিক্যাল এ্যাকাডেমীতে পরের বছরেই শারীরবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তার পর কয়েক বছর পরে ১৮৯০ সালে তিনি সাইবেরিয়ায় ফারমাকোলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন কিন্তু তবুও তাঁকে মিলিটারী এ্যাকাডেমীতে শিক্ষকরূপে থাকতেও অনুমতি দেওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি পরের বছরেই সেণ্ট পিটারসবার্গে নব প্রতিষ্ঠিত Institute for Experimental Medicine এ শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি সেখানেই শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

প্রথম জীবনে তিনি হৃৎপিণ্ডে রক্ত-চলাচল এবং রক্তরোধ নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের পাচন-যন্ত্র, পরিপাকগ্রন্থি ও তাহার কার্য, গ্যাস্‌ট্রিক জুসের ক্ষরণ এবং theory of reflex নিয়ে গবেষণা করেন।

পাভলফের গবেষণা-প্রণালী বহু ছাত্রকে আকৃষ্ট করে এবং সেই জন্যে তাঁকে গবেষণায় সাহায্য করতে বহু ছাত্র সহকারিরূপে কাজ করে তাঁর সঙ্গে, যার ফলে তিনি নানা দিকে গবেষণা করতে সুযোগ পান।

বহু দিন ধরে তাঁর গবেষণা শুধুমাত্র রাশিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, যার প্রধান কারণ হোলো তাঁর সমস্ত গবেষণা শুধু মাত্র রুশ ভাষায় লিখিত হয়। ১৮৯৯ সালে তাঁর "The activity of the digestive glands" বইটি জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা জগতে শারীরবিদ্‌রূপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তিনি যে কয়খানি বই লেখেন তার মধ্যে "Experiments as up-to date, uniform methods of medical research" (১৯০০), "Conditional reflexes" এবং "Results of Physiology" বইগুলি অন্যতম।

পরিপাক সম্পর্কে তাঁর অমূল্য গবেষণার জন্যে ১৯০৪ সালে তাঁকে চিকিৎসা-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভ্য হন এবং ১৯১৫ সালে সম্মানসূচক কোপলে পদক এবং ১৯২৮ সালে লণ্ডনের F. R. C. P উপাধি পান।

১৯৩৬ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী নিমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয় রাশিয়ায়।

আসনের নীচে জায়গা

কথায় বলে—"যদি হও সুজন তো তেঁতুল-পাতায় ন'জন।" সুজন না হোন, অন্ততঃ একটু বুদ্ধিমান হলেই যে অল্প জায়গাতেই অনেক-কিছু গুছিয়ে রাখা চলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। ছবির ঐ মহিলাটি তাঁর মোটর গাড়ীতে বেরিয়েছেন দেশ-ভ্রমণে। এটা-ওটা-সেটা খুচরো জিনিষ প্রচুর। রাখবেন কোথায়? কেমন জায়গা করে নিয়েছেন তিনি সীটের তলায় দেখুন

সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অতুলচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ ১৩ই নভেম্বর, কোন্নগরে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ। পিতা—সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গ্রন্থ—Deathless Ditties; অবরুদ্ধা (Captive Ladies-এর অনুবাদ); প্রসন্নরাঘব নাটক (১৩৪১ বঙ্গাব্দ—সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ)।

অতুলচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৃহশিক্ষা; নদীবক্ষে।

অতুলচন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিকদম্ব (১৮৭৭ খৃঃ,ঢাকা।)

অতুলচন্দ্র মল্লিক—পত্রিকা-সম্পাদক। সাময়িক পত্র—'রচনা-রত্নাবলী' (১২৬৭ বঙ্গাব্দ)।

অতুলচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রবালপ্রসূন; মহাব্রত (কবিতা—১৩১২-১৩)।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩ই মার্চ ১৮৮২ খৃঃ। গ্রন্থ—পতিবিরহ, কালীর গুপ্তকথা, নচিকেতা (১৩২৩); শাক্যসিংহ; অর্ধকালী (১৯১১); ভগীরথ (১৯১১); অরুন্ধতী (১৯১৩); ধ্রুব (১৯১১)। ছেলেদের চণ্ডী (১৯১০); গয়াকাহিনী (১৯১৪); Sarvananda (১৯১১); দেবীমাহাত্ম্য (১৯১১); A Voice from the Chandimandap (১৯১১); রাম-প্রসাদ (কলিঃ ১৩৩০)।

অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রামের সাধন-পুরে। গ্রন্থ—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, ১ম খণ্ড, (১৩১৬); কায়স্থ-দর্পণ; স্বর্ণপ্রতিমা; প্রেমময়ী; শান্তি; রাধাবাঈ।

অতুলচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ফুলের মালা ১৪ ভাগ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (পত্রিকা)। সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (ঢাকা, ১৩৪৩, পৃঃ ১২৬)

অতুলচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিকিৎসাগার।

অতুলপ্রসাদ সেন—কবি ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ ২০ অক্টোবর ঢাকা শহরে। মৃত্যু—১৯৩৪ খৃঃ ২৬এ আগষ্ট। পিতা—ডাঃ রামপ্রসাদ সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ঢাকা স্কুল); ব্যারিষ্টার (১৮৯৪ খৃঃ); ব্যবহারজীবি লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টে। কাব্যগ্রন্থ—কাকলী; কয়েকটি গান; গীতিকুঞ্জ। সম্পাদক—"উত্তরা" মাসিকপত্র।

অতুলবিহারী গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইহলোক ও পরলোক।

অতুল সুর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—টাকার বাজার (১৩৫৪)।

অতুল্য ঘোষ—রাজনীতিজ্ঞ। গ্রন্থ—নোয়াখালিতে গান্ধীজী।

অদ্বয়ানন্দ—টীকাকার। ১৫শ শতকে জীবিত ছিলেন। টীকাগ্রন্থ—"ব্রহ্মবিদ্যাভরণ", ইহা 'শঙ্করকৃত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে'র টীকা।

অদ্বয়ানন্দনাথ—তন্ত্রগ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালরাত্রিপদ্ধতি।

অদ্বয়ারণ্যযোগী—বৈদান্তিক। গ্রন্থ—প্রমাণমঞ্জরীটিপ্পন; প্রমাণ-মঞ্জরীব্যাখ্যা; বৈশিষ্ট্যরামায়ণ-চন্দ্রিকা।

অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১২৩৪ বঙ্গ ২৩এ চৈত্র বিক্রমপুরে। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গ ৪ঠা পৌষ।

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য—পত্রিকা সম্পাদক। জন্ম—১৮১৩ খৃঃ কলিকাতা আমড়াতলায়। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃঃ। পিতা—গোলোকচাঁদ আঢ্য। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৪১ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ); সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র (১২৬২ বঙ্গাব্দ)।

অদ্বৈতরাম ভিক্ষু—কবি। নামান্তর—অদ্বৈত ভট্ট, অদ্বৈত ভিক্ষু। কাব্যগ্রন্থ—রাঘবোল্লাস (ইহা রামায়ণের ঘটনা লইয়া রচিত)।

অদ্বৈতানন্দ—জৈন গ্রন্থকার। নামান্তর—চিদ্বিলাস। জন্ম—১২শ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে। পিতা—কৌণ্ডিল্য গোত্রীয় প্রেমনাথ। মাতা—পার্বতী দেবী। গ্রন্থ—জাতকসিদ্ধান্তমঞ্জরী, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, শান্তিবিবরণ, গুরুপ্রদীপ।

অদ্ভুতাচার্য—বাঙলা ভাষায় রামায়ণ রচয়িতা। প্রকৃত নাম—নিত্যানন্দ। পিতা—শ্রীনিবাস। জন্ম—পাবনা জেলায় সোনাবাজু পরগণার অমৃতকুণ্ড গ্রামে। গ্রন্থ—রামায়ণ।

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রধান ১৬ জন শিষ্যের অন্যতম। পূর্ব নাম—শ্রীরাক্তুরাম, ওরফে—লাটু। জন্ম—বিহার প্রদেশের ছাপরা জেলায়। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ ২৪এ এপ্রিল কাশীতে। ইঁহার উক্তিসমূহ 'সৎকথা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থ—সৎকথা, ১ম, ২য় খণ্ড (কলি ১৩২৭-৩১ বঙ্গ, পৃ ২৫৭)।

অধরচন্দ্র তারণ—গ্রন্থকার। নিবাস—মথুরাবাটী, হুগলী। গ্রন্থকার—ভাবের কথা।

অধরচন্দ্র দাস খাসনবিশ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—কমলাসাগর।

অধরচন্দ্র নাথ—সাময়িক পত্রের সম্পাদক। মাসিক পত্র—যোগিসখা (১৩১১-১৩২০)।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৫৫ খৃঃ বর্ধমান জেলায় বিদ্যাপতি গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৭ খৃঃ কলিকাতা ৫১ নং বীডন রো'তে। পিতা—কালিদাস মুখোপাধ্যায়। মাতা—ব্রহ্মময়ী। শিক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষা (সারদাচরণ ইনষ্টিটিউশন)—১৮৭৪ খৃঃ, এফ-এ (জেনারেল এ্যাসেম্বলী) ১৮৭৯, বি-এ (১৮৮৩ খৃঃ), এম-এ (১৮৮৪ খৃঃ), বি-এল (১৮৮৭। কর্ম—ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৮৪-১৯০৮) জেনারেল এ্যাসেম্বলীতে; ১৯০৪ খৃঃ, ১৯০৮ ও ১৯১৩ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। গ্রন্থ—History of India (পাঠ্য)।

অধরচন্দ্র বসু—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—ধর্মবন্ধু (পাক্ষিক ১২৮১-১২৯৪)।

অধরচাঁদ গোস্বামী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্যসাধন-রহস্য।

অধরলাল সেন—কবি ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৬১ বঙ্গাব্দে ১১এ ফাল্গুন কলিকাতায়। মৃত্যু—১৯১১ বঙ্গাব্দ ২রা মাঘ, বুধবার। পিতা—রামগোপাল সেন। আদি নিবাস—হুগলী জেলার গিজুর গ্রাম। শিক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষা (হিন্দু স্কুল) ১৮৭২ খৃঃ, এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ) ১৮৭৪ খৃঃ; বি-এ (১৮৭৭ খৃঃ)। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (চট্টগ্রাম—১৮৭৯ খৃঃ); ডেপুটী কালেক্টর—১৮৮২ খৃঃ (কলিকাতা)। গ্রন্থ—ললিতাসুন্দরী (১৮৭৮ খৃঃ); মেনকা (১৮৭৪ খৃঃ); নলিনী (১৮৭৭ খৃঃ); কুসুমকানন, ১ম ভাগ (১৮৭৭ খৃঃ); ২য় ভাগ (১৮৭৯ খৃঃ); লিটোনিয়ানা (Lyttoniana) ১ম ভাগ (১৮৭৯ খৃঃ); The Shrines of Sitakund (১৮৮৪ খৃঃ)।

অনঙ্গমোহিনী দেবী—মহিলা কবি। ইনি ত্রিপুরার রাজমহিষী।

অনঙ্গ সূরী—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—'রসায়নপ্রকরণ'।

অনন্ত—পদকর্তা। কাব্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস অনন্ত। জন্ম—১৩৩১ খৃঃ; মৃত্যু—১৩৯১ খৃঃ। পিতা—দুর্গাদাস বাগচী (কেহ বলেন ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণ)।

অনন্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা, যোগচন্দ্রিকা, পদচন্দ্রিকা।

অনন্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাক্যমঞ্জরী।

অনন্ত—ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। গ্রন্থ—বিধ্যপরাধপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ।

অনন্ত—আলঙ্কারিক। গ্রন্থ—সাহিত্যকল্পবল্লী (অলঙ্কার-গ্রন্থ)।

অনন্ত—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—চিন্তামণি। গ্রন্থ—কামধেনু-গণিত-টীকা; জনিপদ্ধতি, সুধারস।

অনন্ত আচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিন্ননিমিত্তবেদান্ত, আকাশাধিকরণবাদ, ওঁকারবাদ, ভায়ভাস্কর (বেদান্ত-গ্রন্থ), ব্রহ্মশব্দবাদ, ব্রহ্মশব্দশক্তিবাদ, মোক্ষবাদ, বিধুসুধাকর (বেদান্ত), বিষয়তাবাদ, শরীরবাদ, সামসবাদ, সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন।

অনন্ত কবি—হিন্দী কবি। জন্ম—১৬৩৫ খৃঃ। কাব্যগ্রন্থ—অনন্তানন্দ।

অনন্ত কন্দলী—রামায়ণকার। অপর নাম—রামসরস্বতী। নিবাস—কামরূপ, ব্রাহ্মণ। গ্রন্থ—অনন্ত রামায়ণ (সম্ভবত! ৪০০।৫০০ শত বৎসর পূর্বে), বৃত্রাসুরবধ, কুমারহরণ, শেহদশম্, মুগুচাযাত্রা, সহস্রনামবৃত্তান্ত, সীতার পাতাল প্রবেশ।

অনন্তকুমার বসু—কবি। কাব্যগ্রন্থ—উল্কা (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), নিঠুর নিমাই।

অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—বৈদান্তিক। জন্ম—১৮০১ শক। পিতা—সুব্রহ্মণ্য উপাধ্যায়। ইনি মালবার-দেশীয় ব্রাহ্মণ। গ্রন্থ—বিবাহসময়মীমাংসা, ধর্মপ্রদীপ, কর্মপ্রদীপব্যাখ্যা, মীমাংসাশাস্ত্রসার।

অনন্তগোপালকৃষ্ণ শর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেদশব্দবিভূষণ।

অনন্ত জীবোত্তমপ্রভ শাস্ত্রী—মরাঠী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দ্বৈতমণ্ডন।

অনন্ত দাস—উৎকল কবি। (পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে)। ইঁহার রচিত প্রায় ৫০টি পদ পাওয়া যায়।

অনন্ত দীক্ষিত—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৭০—১৭৭৫ (আনুমানিক) খৃঃ। পিতা—বিশ্বনাথ। গ্রন্থ—প্রয়োগরত্ন।

অনন্তনারায়ণ ভাগবত—মরাঠী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উমাজীনায়ক।

অনন্তদেব সূরী—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—রসচিন্তামণি।

অনন্তবীর্য—জৈন গ্রন্থকার। জন্ম—১১শ শতাব্দী। গ্রন্থ—পরীক্ষামুখসূত্র-(মাণিক্যনন্দী রচিত) টীকা, ন্যায়াবতারটীকা।

অনন্ত ভট্ট—গ্রন্থকার। পিতা—কমলাকর ভট্ট। গ্রন্থ—রাম কল্পদ্রুম।

অনন্ত ভট্ট—জ্যোতিষশাস্ত্রকার। গ্রন্থ—ভাবফল।

অনন্তরাম দত্ত—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। পিতা—রঘুনাথ দত্ত। নিবাস—মেঘনা নদের পশ্চিম পারে সাহাপুর গ্রামে। গ্রন্থ—ক্রিয়াযোগসার।

অনন্ত পণ্ডিত—টীকাকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—গোবর্ধনসপ্তশতী, রসমঞ্জরী (১৬৩০ খৃঃ), মুদ্রারাক্ষসের পদ্যানুবাদ।

অনন্ত মিশ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জৈমিনি ভারত (ইহা মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব অবলম্বনে রচিত)।

অনন্ত শর্মা—অনুবাদক। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার।

অনন্তাচার্য—দ্বৈতবাদী আচার্য। জন্ম—১৪শ শতাব্দী যাদবগিরি প্রদেশের মেলকোটে। রচিত গ্রন্থ—জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ব্রহ্মপদশক্তিবাদ, ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ, বিষয়তাবাদ, মোক্ষকারণতাবাদ, শরীরবাদ, শাস্ত্রারম্ভসমর্থন, শাস্ত্রৈক্যবাদ, সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ, সমাসবাদ, সামানাধিকরণ্যবাদ।

অনন্ত দাস—হিন্দী কবি। জন্ম—১১৪৮ খৃঃ। নিবাস—ঝাঁসণ্ডীর অন্তর্গত চাকদমা গ্রামে। কাব্যগ্রন্থ—অনন্যযোগ।

অনপরাধ ঘোষাল—যাত্রার পালা রচয়িতা।

অনলানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেদান্তকল্পতরু।

অনাগরিক ধর্মপাল—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The life and Teachings of Buddha (ইং)।

অনাথকৃষ্ণ দেব—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গাব্দ; মৃত্যু—১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ১৩ই মাঘ, শুক্রবার। পিতা—শোভাবাজার রাজবংশীয় রাজা আনন্দকৃষ্ণ। গ্রন্থ—বঙ্গের কবিতা, ১ম ভাগ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ), ২য় ভাগ (১৩১৮ বঙ্গাব্দ), গয়াতীর্থ ও বরাকর পাহাড় (১৩২১ বঙ্গাব্দ), দুর্গাপূজাবলি ও জীববলি (১৯১০ খৃঃ), রামায়ণ-তত্ত্ব সূচীগ্রন্থ), মহাভারতীয় নীতিকথা।

অনাথকৃষ্ণ আয়ার—গ্রন্থকার। নিবাস—কোচিন ষ্টেট। গ্রন্থ—The Cochin tribes & castes.

অনাথনাথ দাদূপন্থী—হিন্দী কবি। জন্ম—১৬৫১ খৃঃ। গ্রন্থ—বিচারমালা, রামরত্নাবলী, সর্বসার উপদেশ বা প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।

অনাথনাথ বসু—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ ২৪ পরগনার কাওড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৫ খৃঃ। গ্রন্থ—শিশিরকুমার ঘোষ (১৯২০ খৃঃ), চৈতন্যদেব (১৯১৮), মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী (হিন্দী হইতে অনূদিত ১৯২৩), প্রেমিক সন্ন্যাসী, এব্রাহাম লিঙ্কন।

অনাথবন্ধু গুহ—দেশপ্রেমিক, ব্যবহারজীবী এবং সম্পাদক। জন্ম—১২৫৪ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহে। মৃত্যু—১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, কাশীতে। সম্পাদক—ভারত-মিহির (সাময়িক পত্র, ১২৮১ বঙ্গাব্দ)।

অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চুঁচুড়া। গ্রন্থ—সুধা (১৩৩৬), মরণোল্লাস (১৩০৭)।

অনামচন্দ্র পাত্র—গ্রন্থকার। নিবাস—উড়িষ্যা। গ্রন্থ—History of India.

অনিলবরণ রায়—শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং অনুবাদক। অনুবাদ-গ্রন্থ—অরবিন্দ-গীতা (Essays on the Gita) ৪ খণ্ড, (কলি, ১৩৩১—৩৭, পৃঃ ৬১৫); ভারত কি সভ্য? (Is India Civilised? কলি, ১৩৩১, পৃঃ ৬৮), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা অবলম্বনে), হিন্দী গীতা, গীতা ও সাধনা, Mother India, Illusion of Charka, Indian Mission in the world.

অনিলচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জাগ্রত পারস্য।

অনিলকুমার মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা, ১ম ভাগ (এলাহাবাদ)।

অনিলকুমার রায় চৌধুরী—কর্মী ও পরিচালক। জন্ম—১৮৯৪ খৃঃ ২৪ পরগনার টাকী জমিদার বংশে। মৃত্যু—১৯৩৩ খৃঃ। পরিচালক—'হিন্দু সঙ্ঘ' (সাময়িক পত্র)।

অনিলকৃষ্ণ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দার্জিলিং সাথী (ভ্রমণ)।

অনিলচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজ্ঞানে বাঙ্গালী (ঢাকা, ১৩৩৮), ব্রহ্মচর্য ও শক্তিসাধনা (ঢাকা), ব্যায়ামে বাঙ্গালী (ঢাকা, ১৩৩৪ বঙ্গ)।

অনিলকুমার বিশ্বাস—কবি। কাব্যগ্রন্থ—নলোদয়।

অনিলকুমার চক্রবর্তী—অধ্যাপক। গ্রন্থ—প্রেম ও কামনা।

অনিরুদ্ধ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৪৬৪ খৃঃ। পিতা—ভাবশর্মা। গ্রন্থ—শিশুবোধিনী (১৪১৫ খৃঃ), টীকাগ্রন্থ—ভাস্বতীকরণ (শতানন্দ-রচিত)।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—পণ্ডিত। গ্রন্থ—ছান্দোগ্য-মন্ত্র কৌমুদী।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—স্মার্ত পণ্ডিত। গ্রন্থ—পিতৃদয়িতা (১২শ শতাব্দী)।

অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক। সাময়িক পত্র—সহোদর (১৮৭৫ খৃঃ)।

অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছেলেদের নূতন গল্প।

অনুকূলচন্দ্র সরকার—সম্পাদক। সম্পাদিত—প্রতিভা (মাসিক, ১৩২৬-৩০), তোষিণী (১৩১৮-১৩২২)।

অনুপচন্দ্র দত্ত—কবি। জন্ম—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার অধীন শ্রীখণ্ড গ্রামে। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। জ্ঞান প্রতাপচাঁদের শিষ্য। গ্রন্থ—প্রতাপচন্দ্র লীলারস-প্রসঙ্গ-সঙ্গীত (কাব্য, ১৮৪৪ খৃঃ)।

অনুপনারায়ণ শিরোমণি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সমঞ্জসা (বেদান্ত-সূত্রের বৃত্তি)।

অনুভবানন্দ স্বামী—গ্রন্থকার। উপাধি—'বাগবিভূষণ'। গ্রন্থ—কোষগ্রন্থপ্রকাশ (বেদান্তগ্রন্থ)।

অনুভূতিস্বরূপ আচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। সম্ভবতঃ ১৩শ শতকের শেষ ভাগে ও ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। গ্রন্থ—সারস্বত-প্রক্রিয়া; টীকাগ্রন্থ—গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্য ভাষ্যের টীকা, ন্যায়দীপবলীর চন্দ্রিকাটীকা, প্রমাণমালার নিবন্ধ টীকা।

অনুরাধা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—কপোত-কপোতী, প্রেম ও প্রিয়া।

অনুরুদ্ধ—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিধম্মসংগ্রহ, পরমত্থ-বিনিচ্ছয়, নামরূপপরিচ্ছেদ, অনুরুদ্ধশতক (১২শ শতাব্দী)।

অনুরূপা দেবী—ঔপন্যাসিকা ও সাহিত্য-সেবিকা। জন্ম—১২৮৯ বঙ্গাব্দ ২৪এ ভাদ্র শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে। পিতা—রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। মাতা—ধরাসুন্দরী দেবী। স্বামী—শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল (বালী-উত্তরপাড়া নিবাসী। উপাধিলাভ—'ধর্মচন্দ্রিকা' (শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডল—১৯১৯ খৃঃ), সরস্বতী (১৯২০); ভারতী ও রত্নপ্রভা (শ্রীশ্রীবিশ্বানন্দ-মহামণ্ডল হইতে ১৯২৩ খৃঃ)। গ্রন্থ—মিবারেশ্বর (১৩০৩ বঙ্গাব্দ), পোষ্যপুত্র (১৩২১), বাগ্‌দত্তা (১৩২১), জ্যোতিহারা (১৩২২), মন্ত্রশক্তি (১৩২২), চিত্রদীপ (১৩২২), উত্তরা (১৩২৩), রাঙাশাঁখা (১৩২৫), মহানিশা (১৩২৬), মধুমল্লী (১৩২৪), রামগড় (১৩২৫), বিদ্যারণ্য (১৩২৬), মা (১৩২৭), পথহারা (১৩২৯), চক্র (১৩২৯), সোনার খনি (১৩২৯), কুমারিল ভট্ট (১৩২৯), হারাণো খাতা (১৩৩০), গরীবের মেয়ে (১৩৩২), হিমাদ্রী (১৩৩৩), জোয়ার ভাঁটা (১৩৩৩), প্রাণের পরশ (১৩৩৪), ত্রিবেণী (১৩৩৫), উত্তরায়ণ (১৩৩৬), পথের সাথী (১৩৩৮), নাট্যচতুষ্টয় (১৩৪০), বিবর্তন (১৩৪০), সর্বাণী (১৩৪২), উত্তরাখণ্ডের পত্র (১৩৪১), বর্ষচক্র, চক্র, সমাজ ও সাহিত্য।

অন্নদাচরণ খাস্তগীর—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা—(সহ—অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন) চিকিৎসক সম্মিলনী (১২৯১-১২৯৯)।

অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পণ্ডিত। জন্ম—বরিশাল। সম্পাদিত গ্রন্থ—ঋগ্বেদ-সংহিতা (আগ্নেয় সূক্তম্—বঙ্গানুবাদ সমেত, বরিশাল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪০৬), ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম খণ্ড (বরিশাল, ১৩৩৫, পৃঃ ১৩৬)।

অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—শ্রীরামপুর (হুগলী)। গ্রন্থ—চিন্তার বিকাশ।

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি (মহামহোপাধ্যায়)—নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাধারণ ন্যায়রহস্য (কাশী, ১৩৩২, পৃঃ ১১২), বৈশেষিক রহস্য (আলোচনা। কাশী, ১৩৩২, পৃঃ ১৬), সাংখ্য-রহস্য (কাশী, ১৩৩১, পৃঃ ১২৬), যোগরহস্য (কাশী, ১৩৩১, পৃঃ ৮৫), সাধারণ মীমাংসারহস্য (কাশী, ১৩৩১, পৃঃ ৩৪), টীকাগ্রন্থ—কলাপব্যাকরণম্ কৃৎপঞ্জিকা (নোয়াখালি, ১৮৮৭ খৃঃ, পৃঃ ২৪০), নমস্কারবিবেকঃ (সম্পাদিত। ঐ, ১৩১৩, পৃঃ ৭১), পরিশিষ্ট কারকম্ (ঐ, ১৩১২, পৃঃ ১৬), ষট্‌কারকবিবেকঃ, সর্বনামস্তবম্, ধাতুপ্রত্যয়বিবেকঃ (নোয়াখালি, ১৩১০, পৃঃ ৫২), ব্যুৎপত্তি-কল্পতরু (ঐ, ১৮০৭ শক, পৃঃ ৩২), সুব্‌রহস্যম্ (ঐ, পৃঃ ১১৬)।

অন্নদাচরণ সেন—সম্পাদক। সাময়িক পত্র—সখা (১৮৮৭—১৮৯১ খৃঃ), গ্রন্থ—স্তুপসূত্র (ঢাকা, ১৮৭০ খৃঃ)।

অন্নদা ঠাকুর—সাধক। গ্রন্থ—রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা, স্বপ্নজীবন।

অন্নদাপ্রসন্ন কাঞ্জিলাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঈশ্বরচিন্তা, ১ম ভাগ (ত্রিপুরা)।

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—নাট্যকার। নিবাস—পাতুল (হুগলী)। নাট্যগ্রন্থ—অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ (১৩২৫), শ্রীদাম উদ্ধার বা ব্রজলীলা, সুধন্বা-উদ্ধার, কন্যোজকুমারী, গরুড়ের স্বর্গবিজয় বা অমৃত-হরণ, বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বা অর্জুন পরাভব (১৩২৫), কার্তবীর্য সংহার (১৯০৭), জনমেজয়ের নাগযজ্ঞ (১৯০৭)।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গীতরচয়িতা। জন্ম—পশ্চিম হালিশহর। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—What is Hinduism (১৯৩৫)।

অন্নদাপ্রসাদ পাল—সাময়িক পত্র-সম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—প্রিয়দর্শন (১৮৭৫)।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার ও নাট্যকার। গ্রন্থ—প্রশ্নচতুষ্টয় (১৮৫৫), শকুন্তলা (গীতিনাট্য, ১৮৬৫), উষাহরণ নাটক (১৮৭৫)।

অন্নদাপ্রসাদ বসু—পত্রিকা-সম্পাদক। মাসিক পত্র—সর্বধর্ম-রক্ষিণী (১৯০১)।

অন্নদা বেদান্তবাগীশ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শকুন্তলোপাখ্যান, বৃহৎকথা।

অন্নদাশঙ্কর রায়—সাহিত্যসেবী ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৯০৪ খৃঃ ১৫ই মার্চ ঢেকানল রাজ্যে। পিতা—নিমাইচরণ রায়। মাতা হেমনলিনী রায়। শিক্ষা—ঢেকানল, পুরী স্কুল, কটক ও পাটনা কলেজ। আই-এ (প্রথম স্থান—১৯২৩), বি-এ (১৯২৫), আই. সি. এস (প্রথম স্থান—১৯২৭), কর্মক্ষেত্র—ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯২৯ খৃঃ হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায়। গ্রন্থ—তারুণ্য (১৯২৮), রাখী (১৯২৯), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০), অসমাপিকা (১৯৩১), পথে প্রবাসে (১৯৩১), যার যেথা দেশ (১৯৩২), একটি বসন্ত (১৯৩২), পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩), অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), কালের শাসন (১৯৩৩), কলঙ্কবতী (১৯৩৪), কামনাপঞ্চবিংশতি (১৯৩৪), প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), দুঃখমোচন (১৯৩৬), আমরা (১৯৩৭), মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০), অপসরণ, জীবনশিল্পী (প্র), বিনুর বই (উ), উড়কি ধানের মুড়কি, নূতন রাধা (কবিতা), অমাবস্যা (কবিতা), রামী, পাহাড়ী (শি)।

অন্নাকির্লোস্কর—মহারাষ্ট্রীয় নাট্যকার। জন্ম—মহারাষ্ট্র। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ। নাট্যগ্রন্থ—সঙ্গীতশকুন্তলা, রামরাজ্যবিয়োগ! ইহার "কির্লোস্কর মণ্ডলী" নামে ভ্রাম্যমান নাট্য সম্প্রদায় ছিল।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম—১২৮২ বঙ্গাব্দ ৪ঠা শ্রাবণ মহেশপুরে (নদীয়া), মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১লা জ্যৈষ্ঠ। পিতা—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—রঙ্গিলা (১৩২১ বঙ্গাব্দ), উর্বশী, দুমুখো সাপ, রাখীবন্ধন (না), ছিন্নহার (না), বাসবদত্তা (গীতিনাট্য), আহুতি (না), রামানুজ (না), অযোধ্যার বেগম (না), কর্ণার্জুন (১৩৩০), শুভদৃষ্টি, ইরাণের রাণী (না), বন্দিনী (গীতিনাট্য), শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অপ্সরা (গীতিনাট্য), পুষ্পাদিত্য, ফুল্লরা, ছিন্নহার, চণ্ডীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, মগের মুলুক, শকুন্তলা, ভদ্রা (উপন্যাস), রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (আত্মজীবনী) নাট্যাকৃত—পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মা।

অপ্পণ আচার্য—বৈদান্তিক। টীকাগ্রন্থ—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বিবরণ।

অপ্পদীক্ষিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নারায়ণস্তবরাজ।

অপ্পাদীক্ষিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৌমুদীপ্রকাশ (ব্যাকরণ), গৌরীমায়ূরমাহাত্ম্য (চম্পূ কাব্য)।

অপ্পাশাস্ত্রী—নৈয়ায়িক। গ্রন্থ—অপ্পাশাস্ত্রিবাদার্থ, চিল্লরবাদ, লবলীপরিণয় (নাটক), সারস্বতাদর্শ (নাটক)।

অপ্পাসুরি—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—শব্দরত্নাবলী।

অপ্পয় দীক্ষিত—বৈদান্তিক। নামান্তর—অপ্পয্য দীক্ষিত, অপায় দীক্ষিত। জন্ম—১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীর নিকটবর্তী অডপ্পয়ণ গ্রামে। মৃত্যু—১৬৬২ খৃঃ। পিতা—রঙ্গরাজ দীক্ষিত বা রঙ্গ-রাজাধ্বরি। গ্রন্থ—অদ্বৈতনির্ণয়, অধিকরণমালা, অমরকোষব্যাখ্যা, আত্মার্পণস্তুতি, আনন্দলহরীটীকা, উপক্রমপরাক্রম, (অলঙ্কার শাস্ত্রে) কুবলয়ানন্দ (১৫৮৫—১৬১৪), চিত্রমীমাংসা, বৃত্তিবার্ত্তিকম্, নাম-সংগ্রহমালা; (ব্যাকরণ শাস্ত্রে) নক্ষত্রবাদাবলী বা পাণিনিতন্ত্র-বাদন-নক্ষত্রবাদমালা, প্রাকৃতচন্দ্রিকা; (মীমাংসা) চিত্রপুট, বিধিরসায়ন, সুখোপযোজনী, উপক্রম-পরাক্রম, বাদ-নক্ষত্রমালা; (বেদান্তে) পরিমল, ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, মতসারার্থ-সংগ্রহ; (শাঙ্কর মত) নয়নমঞ্জরী; (মাধ্বমত) ন্যায়মুক্তাবলী; (রামানুজ মত) নয়ময়ূখমালিকা, (শ্রীকণ্ঠমত) শিবার্কমণিদীপিকা, রত্নত্রয়পরীক্ষা; (শৈবমত) মণিমালিকা, শিখরিণীমালা, শিবতত্ত্ব-বিবেক, ব্রহ্মতর্কস্তব, শিবকর্ণামৃতম্, রামায়ণতাৎপর্য্যসংগ্রহ, ভারত-তাৎপর্য্যসংগ্রহ, শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়, শিবার্চনাচন্দ্রিকা, শিবধ্যান-পদ্ধতি, আদিত্যস্তবরত্ন, মধ্বতন্ত্রমুখমর্দন, যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য।

অপ্যয্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'আচার নবনীত' (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে)।

অপ্যাজীভট্ট—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—রামগীতা ও শিবগীতার সুবোধিনী নাম্নী টীকা।

অপরাজিতা দেবী—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—পুরবাসিনী, বুকের বীণা, বিচিত্ররূপিনী, আঙিনার ফুল।

অপূর্বকৃষ্ণ দেব, রাজা বাহাদুর—সুপণ্ডিত এবং কবি। জন্ম—শোভাবাজার রাজবংশে। পিতা—মহারাজা রামকৃষ্ণ দেব। দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক 'রাজকবি' উপাধিলাভ। রচনা—বহু শ্যামা-বিষয়ক কবিতা।

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—কবি। জন্ম—১৩১১ বঙ্গ (১৯০৪) ২৪ পরগনার গৈ গ্রামে। কাব্যগ্রন্থ—মধুচ্ছন্দা, নীরাজন, সায়ন্তনী, গ্রন্থ—সভ্যতার রাজপথে, নূতন দিনের কথা, অন্তরীপ, ভগ্ননীড়।

অপূর্বচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—শ্রীহট্ট। গ্রন্থ—জ্যোতীষ দর্পণ।

অপূর্বানন্দ স্বামী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহাপুরুষ শিবানন্দ (১৩৫৭), সাধন-সঙ্গীত (কবিতা)।

অপ্রকাশ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অনির্বাণ।

অভয়—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সন্দশভেদচিন্তার টীকা, সংবন্ধ টীকা।

অভয়কুমার সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ওলাউঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা।

অভয়চন্দ্র—জৈনাচার্য! গ্রন্থ—প্রক্রিয়াসংগ্রহ (ব্যাকরণগ্রন্থ)।

অভয়চন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ম্যাজিষ্ট্রেটিয় উপদেশ (১৮৬৭)।

অভয়চরণ তর্কপঞ্চানন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামায়ণ (কিস্কিন্ধ্যা-কাণ্ড—১৮৭৫ খৃঃ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহ—পৃঃ ২৭১)।

অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—মোহন মাধুরী (১৯১৭), রাজেন্দ্রজীবনী (১ম ভাগ ১৯৩৪)।

অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছাত্রবোধ ব্যাকরণ (কলি. ১৮৬৮)।

অভয়চরণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অবিস্তার দশ আইন (ঢাকা, ১৮৪৫)।

অভয়চরণ সেনগুপ্ত—অনুবাদক। গ্রন্থ—কাশীখণ্ডের অনুবাদ।

অভয়দাস বসু—আইনজীবী। গ্রন্থ—Decision of Privy Council regarding Land. Alleviating in place from which they deludiated (১৮৭০)

অভয়দেব—জৈন গ্রন্থকার। রচনা—নয়টি জৈন অঙ্গের টীকা (১১শ শতাব্দীর শেষভাগে)।

অভয়দেব সূরি—জৈনাচার্য ও টীকাকার। গ্রন্থ—নিযোদ্‌-ষট্‌ত্রিংশিকা, পুদ্‌গলষট্‌ত্রিংশিকা, জয়তিপুরাণস্তোত্র, নবতত্ত্বভাষ্য, সপ্ততিভাষ্য, জ্ঞাতাধর্মকথাবৃত্তি।

অভয়দেব সূরি—জৈন-গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জয়ন্তবিজয়কাব্য (১২৭৮ সংবতে)।

অভয়দেবসূরি—খরতরগচ্ছের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থকার। জন্ম—ধারায় ১১১১ সংবতে। পূর্বনাম অভয়কুমার। 'সূরি' পদলাভ ১১৩৫ সংবতে। গ্রন্থ—'স্থানাঙ্গে'র টীকা (১১২০ সংবত), সমবায়াঙ্গের টীকা। ভগবতী সূত্রের টীকা (১১২৮ সং), জ্ঞাতাধর্মকথাঙ্গের টীকা (১১২০ সং), উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরোপপাতিকের টীকা, প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গের টীকা, বিপাক সূত্রের টীকা, উভয়সূত্রের টীকা, আরাহণপকরণ, জয়তীহুণস্তোত্র (১১১১ সং)।

অভয়াকর গুপ্ত—বৌদ্ধপণ্ডিত। টীকাগ্রন্থ—বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা।

অভয়াচরণ—পাঁচালীকার। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—বেণকুমার বা 'কানকোকুমার'।

অভয়াচরণ দাস (অন্ধ)—সঙ্গীত রচয়িতা। গ্রন্থ—ভগবৎ-চিন্তালহরী, ভগবৎচিন্তাকলিকা।

অভয়াচরণ সিংহ—গ্রন্থকার। নিবাস—চুঁচুড়া। গ্রন্থ—কায়স্থ-ক্ষত্রিয়বর্ণ।

অভয়ানন্দ গুপ্ত—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—চক্রদত্ত (আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। ১৮৮০ খৃঃ)।

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার (ন্যায়গ্রন্থ), নলদময়ন্তী (নাটক ১৮৫৫—৬৩ খৃঃ)।

অভয়াসুন্দরী দেবী—সঙ্গীত-রচয়িত্রী। জন্ম—বীরভূম জেলা বক্রেশ্বরের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণ নাম গ্রামে।

অভিনব গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—১০ম শতাব্দীতে কাশ্মীরে। পিতা শ্রীভূতিবাজ। গ্রন্থ—প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী, শিবদৃষ্ট্যালোচনা। পরমার্থসার বোধপঞ্চদশিকা, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক, পরত্রিংশিকাভাষ্য, তন্ত্রবতধ্বনিক, গীতার টীকা, আলোচন (অলঙ্কার শাস্ত্র)।

অভিনন্দ, কবি—কাশ্মিরী কবি। গ্রন্থ—কাদম্বরী কথাসার।

অভিনন্দ, কবি—বাঙ্গালী কবি। অপর নাম—গৌড়াভিনন্দ। নিবাস—গৌড়দেশে। ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—রামচরিত (মহাকাব্য), যোগবাশিষ্ঠসার।

অভিনন্দ গুপ্ত—আলঙ্কারিক। বর্ত্তমান ছিলেন ১০ম শতকের শেষভাগে ও ১১শ শতকের প্রথম ভাগে কাশ্মীরে। ইনি শৈবধর্মাবলম্বী। গ্রন্থ—বৃহৎপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী বা বৃহতীবৃত্তি, শিবদৃষ্ট্যালোচনা, ধ্বন্যালোকলোচনম্‌ (টীকা)।

অভিনন্দ গুপ্ত—বৌদ্ধ দার্শনিক। গ্রন্থ—তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক।

অভিনন্দ গুপ্ত—কাশ্মিরী গ্রন্থকার। টীকাগ্রন্থ—'অভিনবভারতী'।

অভিমন্যু—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—প্রশ্নপ্রকাশ।

অভিরাম দাস গোস্বামী—বৈষ্ণব কবি। নিবাস—খানাকুল। গ্রন্থ—গোবিন্দবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

অভিরাম দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'পাটপত্তন' বা 'অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়'। ইহা পাটনির্ণয়-গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

অভিরাম দ্বিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অশ্বমেধ পর্ব (বাঙ্গলায় জৈমিনি ভারত)।

অভিরাম দ্বিজ—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—'শ্রীলক্ষ্মীব্রত পাঁচালী'।

অভিরাম বিদ্যালঙ্কার—বৈয়াকরণ। গ্রন্থ—সংক্ষিপ্তসারটীকা (গোয়ীচন্দ্র কৃত) বৃত্তি।

অভ্যুদয়—গ্রন্থকার। ১১৬৫ খৃঃ বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—গিরিজাকল্যাণ, শিবগণাদারজলী, পদ্মশতক।

অভেদানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম। পূর্বনাম—কালীপ্রসাদ চন্দ্র। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ কলিকাতা আহিরীটোলা। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর। পিতা—রসিকলাল চন্দ্র। মাতা—নয়নতারা। শিক্ষা—১৮৮৪ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (ওরিএণ্টাল সেমিনারী)। তৎপরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ। শিষ্যত্বগ্রহণ এবং ঠাকুরের দেহত্যাগের পর অভেদানন্দ নাম গ্রহণ। ১৮৯৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মুখপাত্রস্বরূপ ধর্মপ্রচারে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন। ২৫ বৎসর কাল আমেরিকা, ইংলণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়া বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতাদান। ১৯২১ খৃঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থ—India and her people (কলি, ১৯০৬), Gospel of Ramkrisna, Sayings of Ramkrisna, Re-incarnation (কলি, ১৯০২), How to be a Yogi, Divine Heritage of Man (পৃঃ ২১৫), Does soul exist after death (কলি, ১৯২৪ খৃঃ), Human affection and divine love (কলি, ১৯২৪), Religion of the Twentieth Century, Self-knowledge (কলি, পৃঃ ১৭৮), Scientific Basis of Religion (New york, ১৯০০), Unity and Harmony (New york, ১৯১৬), Why a Hindu accepts Chiests and rejects Churchianity (কলি, ১৯২৪), আত্মবিকাশ (কলি, ১৩৩২), বেদান্তবাণী (কলি, ১৩৩৩), ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম (কলি, ১৩৩৪), হিন্দুধর্মে নারীর স্থান (কলি, ১৩৩৫), Swami Vivekananda and his work (কলি, ১৯২৪), মনের বিচিত্র রূপ। সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা—বিশ্ববাণী (১৩৩৪—১৩৪৫)।

অমর—নামান্তর—অমরসিংহ।—(ইনি গুপ্ত যুগে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন) অভিধান রচয়িতা বৌদ্ধ পণ্ডিত। গ্রন্থ—অমরকোষ। (৫ম-৬ষ্ঠ খৃষ্ট শতাব্দী)।

অমর—বৈয়াকরণ। গ্রন্থ—কারক-ষট্‌ক।

অমরচন্দ্র—গ্রন্থকার। ইনি ১৩শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। গ্রন্থ—পরিমল (ব্যাকরণ), বিবেক-বিলাস।

অমরচন্দ্র—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সম্যক্ত কুলক।

অমরচন্দ্র—জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। ইনি ১২৫০ খৃ বিদ্যমান ছিলেন। গ্রন্থ—জিনেন্দ্রচরিত্র (নামান্তর—পদ্মানন্দ কাব্য), কবিশিক্ষাবৃত্তি (টীকা গ্রন্থ), ছন্দোরত্নাবলী, কলাকলাপ বালভারত।

অমরচন্দ্র গণি—জৈন সাধু ও অনুবাদক। গ্রন্থ—'উপ.দর্শ মালাবচুরি' (১৮১৮ সংবত)।

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুসলমান ভক্তবৃন্দের ভগবং নির্ভর (কলি, ১৩৩৪ বঙ্গ, পৃঃ ৬৯১)।

অমরচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার ও সম্পাদক। নিবাস—মৈমনসিং। গ্রন্থ—লহরী, হরিবল্লভের স্নেহ, অরূপা। সম্পাদক—চারুমিহির (পত্রিকা)।

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—উত্তরপাড়া। গ্রন্থ—বংশপরিচয় (১৩১৭)।

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চুঁচুড়া। গ্রন্থ—আহুতি, শিশুর খাদ্য ও পরিচর্যা।

অমরনাথ ম্যাডান—গ্রন্থকার। নিবাস—পঞ্জাব। গ্রন্থ—কিসানা-ই-তউহিদ (উর্দু)।

অমরনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। নিবাস—ভদ্রেশ্বর, হুগলী। গ্রন্থ—রেণুকা (১৯১১)।

অমরনাথ রায়—গ্রন্থকার। নিবাস—কলিকাতা। গ্রন্থ—চাষীর ফসল। সম্পাদক—কৃষিলক্ষ্মী (মাসিক)।

অমরনাথ রায় চৌধুরী—কবি। জন্ম—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ব্রহ্মচাল পরগনার নন্দননগরে ১২২৯ বঙ্গাব্দে। মৃত্যু—১২৭৯ বঙ্গ, ২রা বৈশাখ। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ (বাংলা—অসমাপ্ত)।

অমরনাথ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিশূপদেশ (রাজসাহী, ১৮৬৯)।

অমরপ্রভ সূরি—জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। টীকাগ্রন্থ—ভক্তামর-স্তোত্র। (মানতুঙ্গসূরিকৃত)

অমর সিং—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Deva Dharma (লাহোর, ১৯৩৭)।

অমর সূরি—জৈন আচার্য। গ্রন্থ—অম্বরচরিত্র।

অমরু—রাজা ও কবি। গ্রন্থ—অমরুশতক।

অমরেন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দক্ষিণের বিল, পদ্ম-দীঘির বেদেনী, ভাঙ্‌ছে শুধু ভাঙ্‌ছে, চর কাশেম।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম—১৮৭৬ খৃঃ ১লা এপ্রিল। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ ২১এ পৌষ (১৯১৬ খৃঃ)। পিতা—দ্বারকানাথ দত্ত। নাট্যগ্রন্থ—হরিরাজ, শিবরাত্রি (গীতিনাট্য), কাজের খতম (পঞ্চরং) নির্মলা (গীতিনাট্য), মজা (নক্সা), দুটি প্রাণ (গীতিনাট্য), শ্রীকৃষ্ণ, মানকুঞ্জ, দোললীলা, বড় ভালবাসি, ফটিক জল (নাটিকা), দলিতা ফণিনী, আশা কুহকিনী, জীবনে মরণে, থিয়েটার (পঞ্চরং), শ্রীরাধা, ভক্তবিটেল, চাবুক, ঘুঘু, আহা মরি, এস যুবরাজ (রূপক), বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, প্রণয় না বিষ (নাটক), কিসমিস্ রঙ্গনাট্য), রোক শোধ, প্রেমের জেপলিন; উষা (গীতিনাট্য), নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, আদর (উপ), অভিনেত্রীর রূপ, সম্পাদিত পত্রিকা—নাট্যমন্দির (১৩১৭—২১)।

[ক্রমশঃ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীমতী মায়া সেন

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়গানে বিশ্বের অন্তরলোক উদ্ভাসিত; এই যুগাবতার যে অধ্যাত্ম-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহারই নিত্য-নব চেতনা ও ভাবোন্মাদনায় বিশ্বের তাপিত ও ক্লিষ্ট মানুষ পরিতৃপ্ত। শ্রীভগবানের অপার মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাই স্বভাবতই বিশ্বের হৃদয়-মন্দিরে নিত্য তিনি পূজিত। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতাকে যিনি আপনার স্নিগ্ধ সুষমায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভক্তগণের সেই 'মা' শ্রীশ্রীসারদা দেবীর কথা ঠাকুরের তুলনায় আমরা কতটুকু জানি? শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিত-কালেও যেমন মাতাঠাকুরাণী অন্তরালে থাকিয়া দেবতার পূজার্ঘ্য রচনায় নিরত রহিয়াছেন, দেবতার মন্দিরে আগত অগণিত ভক্তজনের দৈহিক ও মানসিক শান্তিবিধানে ছিলেন সদাহাস্যময়ী, তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরেও দিগ্‌দিগন্তের উৎসবে শ্রীশ্রীমা অলক্ষ্যে আসিয়া শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের পদে অঞ্জলি প্রদানের সমারোহেই তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজাতেই ভক্তজন অজ্ঞাতসারেই শ্রীশ্রীমায়ের পদেও কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা কার্য্যতঃ শ্রীশ্রীমায়ের পূজাও বটে। তবুও কল্যাণময়ী করুণাময়ী মাতা সারদা দেবীর পুণ্য জীবনের কিছু আলোচনা আমরা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি শুধু এই আশায় যে, মাতাঠাকুরাণীর বিচিত্র জীবন, দুইটি সম্পূর্ণ বিরোধী স্রোতের মুখে সেই জীবনে সমন্বয় সাধনে তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয়ের পুনরালোচনা পাঠক-পাঠিকাগণকে বিমল আনন্দ ও শিক্ষা দান করিবে।

* * * *

বাঁকুড়া জিলার জয়রামবাটী গ্রামের অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে সারদা। কিন্তু ঘর সাধারণ হইলে কি হইবে, মেয়ের যেন সব তাতেই একটা অদ্ভুত অসাধারণ ভাব ভঙ্গী! মেয়ের এই অসাধারণত্ব মেয়ের মা-বাবাকে রীতিমত ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাদের তো একটা ধারণাই জন্মিয়া গিয়াছিল—মা জগদম্বাই বুঝি কোন্ অপরূপ লীলাখেলা করিতে মেয়ে-রূপে তাহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন! সারদার মা শ্যামাসুন্দরীও প্রায়শঃই কালো মেয়েটার হাব-ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন আর বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে মেয়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। 'কে মা তুই? আমার কে হোস? তোকে আমি চিনতে পেরেছি কি?' শ্যামাসুন্দরীর এই অদ্ভুত প্রশ্ন মেয়ে বহু বার শুনিয়াছে, আরও শুনিয়াছে মায়ের আকুল কামনা, "ভগবান্ করুন, পরজন্মেও যেন তোকে আমার মেয়েরূপে পাই।" এবার কিন্তু কালো মেয়ের মুখ হইতে ঝঙ্কার বাহির হইয়া আসে, "আবার আমায় নিয়ে টানাটানি কেন!" যেমন মায়ের অদ্ভুত প্রশ্ন, তেমনি মেয়ের অদ্ভুত জবাব। সারদার বয়স তখন সবে পাঁচ বৎসর। তখনকার সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারেই ঐ অল্প বয়সেই সারদার জন্যে পাত্র খোঁজা হইতেছিল। যেমন অভিনব মেয়ে, তেমনি অভিনবরূপে অতি অভিনব পাত্রের সঙ্গে সারদার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কামারপুকুরের গদাধরকে তখন সবাই জানে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরূপে। গদাধরের উন্মাদ অবস্থার প্রতিষেধকরূপেই তখন তাহার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছিল। শ্রেণী, গোত্র, রাশিচক্র প্রভৃতি মিলাইয়া কোন মতেই পাত্রী জুটাইতে না পারিয়া গদাধরের মাতা চন্দ্রমণি দেবী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর যখন হয়রান হইয়া পড়িয়াছেন, তখন এক দিন গদাধর নিজেই যেন ভাবাবেশে বলিল, "এখানে-সেখানে ছুটিয়া কিছু হইবে না, জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ীতে পাত্রী বাঁধা আছে।"

আরও একটি মজার ঘটনা বিধির অমোঘ বিধান ও অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতেরই যেন নির্দ্দেশ দেয়। গদাধরের এক ভাগিনেয়ের বাড়ীতে ভজন-সঙ্গীত চলিতেছিল। সঙ্গীত শেষে হাসি-গল্প গুজব হইতেছিল, এমন সময় জনৈকা মহিলা কোলের আড়াই বছরের শিশু-কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ ত যাদুমণি, ঐখানে যারা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে কাকে তোর বর বলে পছন্দ হয়?" শিশু হাত বাড়াইয়া গদাধরকে দেখাইয়া দিল। বিধির সেই বিচিত্র সঙ্কেত তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল?

সারদার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে বাপ-মায়ের কাছেই আছে জয়রামবাটীতে। ওদিকে পাগলা গদাধরের পাগলামির কং

দেশশুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। এই সকল কথা শুনিতে সারদার বড়ই কষ্ট হয়, অমন সুন্দর সরল লোকটি কখন পাগল হইতে পারে, এ কথা সারদা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। সারদা এখন সতোরো-আঠারো বছরে পা দিয়াছে, তাই চিন্তা ভাবনা করিতেও শিখিয়াছে সে। স্বামীর কথা শুনিয়া ও শোনা কথার বেদনা সহিয়া-সহিয়া অশান্তি আর অনিদ্রায় তাহার দিন-রাত্রি কাটে, একটা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য তাহার মন ক্রমেই দৃঢ় হইতে থাকে। অবশেষে সারদা এক কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করিল, কোন্ এক দৈবী শক্তির প্রেরণায় হাঁটা-পথে সে রওনা হইল জয়রামবাটী হইতে স্বামীর 'বাতুলাশ্রম' দক্ষিণেশ্বরে। আশী মাইলের ওপর রাস্তা। স্বামীকে একটি বার দেখিবার জন্য যে অধীরতা ও উদ্বেগ তাহার মনে জমাট বাঁধিতেছিল, যেন তাহারই দুর্ব্বার শক্তিতে সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া স্বামিগৃহে পৌঁছিল। অসময়ে গভীর নিশীথে এই অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি দেখিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সারদাকে চিনিতে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইল না। সারদা তখন অবসন্না, অপরিমিত শ্রমের ফলে পীড়িতা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই ডাক্তার ডাকাইলেন এবং একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই যেন সারদাকে বলিলেন, "তুমি এত দিনে এলে; আর কি আমার সেজবাবু (মথুর বাবু) আছেন যে তোমার যত্ন হবে?"

জয়রামবাটীর সারদা অনায়াসে এবং একান্ত স্বাভাবিকরূপেই দক্ষিণেশ্বরে মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আসনে অভিষিক্ত হইলেন। যেন মা জগদম্বাকেই নিজেদের মাঝে প্রতিমূর্ত্ত হইতে দেখিয়া ভক্তকুলের আনন্দের অবধি রহিল না। একাধারে গৃহী এবং সন্ন্যাসী এই দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির সমন্বয় একমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনেই আমরা দেখি। এবং ইহারই শক্তিতে মা এক দিকে অগণিত সন্তানের অতি সাধারণ 'মা'রূপে স্নেহ-প্রীতি-মমতার ফল্গুধারায় দক্ষিণেশ্বর স্নিগ্ধ রাখিয়াছেন, অপর দিকে কঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা মুহূর্ত্তে গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আদ্যাশক্তিরই অংশরূপে নিজেকে পরিচিত করিয়াছেন। সংসারে পাকা সংসারীর ন্যায় ব্যস্ত থাকিয়া নিমেষে আবার সংসার-চিন্তা পরিহার করা— ভক্তজনের ইহাতে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না, অথচ ইহাও যেন একান্ত স্বাভাবিক শক্তিতেই সম্পন্ন হইত, তজ্জন্য কোন বাহ্যিক আড়ম্বর-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত না। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমায়ের এই অদ্ভুত শক্তির মূলে ছিল তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বভৌতিক ভালবাসা, যথার্থই তিনি ছিলেন "গৃহহীন গৃহী, ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি এবং ঐহিক আত্মীয় পরিবৃতা হইয়াও জগদাত্মীয়-স্বরূপা।" মায়ের করুণাধারায় বিগলিত ভাবরাশিতে ভক্তকুল অভিভূত হইয়া মায়ের চরণপদ্মে আশ্রয় লাভের জন্য লুটাইয়া পড়িতেন, "কেহ তাঁহাকে দেখিয়া—মা তুমি আমার ভার নাও—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন; কেহ বা দীক্ষার পর সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; কাহারও দীক্ষার পর নেশার মত অবস্থা হইয়াছে; কত ভক্ত যে কম্পিত দেহে অজস্র অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাহারও সমালোচনা করা, খুঁত খুজিয়া বাহির করা প্রভৃতি মা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন—তাঁহার স্নেহ-পারাবারে ভাল-মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষ অকুণ্ঠ সমবেদনা লাভ করিয়াছে, উত্তরকালে তিনিই হইয়াছিলেন সকলের নিত্য ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "আমি সকলের মা,—আমি ভালদেরও মা, মন্দদেরও মা।" কী অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা ও সত্যের তেজ নিহিত ছিল এই কথা দুইটিতে। "আমার ছেলেরা যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমি মা, সেই সব ধুলো-কাদা ধুয়ে-মুছে দিয়ে আমায় তাদের কোলে নিতে হবে।" কে অস্বীকার করিবে, শ্রীশ্রীমার মধ্যে সত্যই মা জগদম্বা আত্মগোপন করিয়াছিলেন! ভক্তবৃন্দের তপস্যাকে তিনি সদা হাস্য ও সরল ইঙ্গিতের দ্বারা সহজ পথে টানিয়া আনিতেন। "মার কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যান-জপের দরকার কি? আমিই যে তোমাদের জন্য সব করছি; এখন খাও, দাও, নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ কর।" এমন মা তো বিশ্বলোকে শুধু একটিই হওয়া সম্ভব! কিন্তু এই সমস্তেরই মূলে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মায়ের সর্ব্বসমর্পিত প্রেম, যে প্রেমের সাহায্যে শ্রীশ্রীমা নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপার করুণারাশি নিজ বক্ষে ধারণ করত পাপী-তাপী জনগণের কল্যাণকল্পে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমত স্বামী সারদানন্দজী মাকে বলিতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কার্য্যকরী শক্তি'—এই শক্তির আশ্রয়েই যে অগণিত ভক্তজন মহাশক্তির কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? বলিতে পারা যায়, শ্রীশ্রীমাই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শক্তির আধার, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও মাকে মা জগদম্বা জ্ঞানে পূজা অর্পণ করিয়াছেন, বিশ্বজননীর পাদমূলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। সেবক ও সর্ব্বার্থসাধিকা—উভয়েই তখন এক দিব্য ভাবে আবিষ্ট। এমনটি আর কোন্ দেশে ঘটিয়াছে, কোন্ দেশের জলবায়ুতে এমন অনির্ব্বচনীয়রূপে আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইয়াছেন?

শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনের কত সামান্যই জানি, তাহারও সামান্যতম অংশটুকু লিখিতে লেখনী কতই বিহ্বল হইয়া পড়ে। শুধু প্রার্থনা, ভারতের নর-নারী, প্রেমিক মানবকুল শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-সুরধুনীতে অবগাহন করিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করুক, এই পূত ধর্ম্ম-জীবনের অনুধ্যান, স্মরণ ও মনন করিয়া মনের আবিলতা ও ক্ষুদ্রতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় হইতে মুক্তিলাভ করুক, প্রেমে ও পবিত্রতায় জীবনকে নব ভাবে অনুপ্রাণিত করুক।

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

শান্তি ভট্টাচার্য্য

সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"জানি তুমি প্রাণ খুলি,
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে, তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে। নিত্য নব সঙ্গীতের ভারে"

এ কথা শুধু সত্যেন্দ্রনাথ নয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও খাটে, দু'জনেই প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন···সুরে ছন্দে বরমাল্য গেঁথেছেন দুই কবিই। দুই কবিই ছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-পূজারী··· সৌন্দর্য্যাভিভূত মুগ্ধ চিত্তে দুই কবিই এঁকেছেন প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যকে, কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই দুই কবির পার্থক্য ছিল সমুদ্রপ্রমাণ। সত্যেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রকৃতির আঙ্গিক

সৌন্দর্য্যে···রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন আন্তরিক রূপে। প্রকৃতির কবি হিসাবে দু'জনের মধ্যে মিল যতটা ছিল অমিল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের একাগ্রতা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না, আবার আত্মনিরপেক্ষতা—যা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের রচনা-বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিলীনতায় ও বিশ্বানুভূতির তীব্রতায় রবীন্দ্রকাব্য' হয়েছে গীতি-কাব্য আর ব্যক্তি-অনুভূতিসম্পন্ন সত্যেন্দ্র-কাব্য হয়েছে দৃশ্যকাব্য। ছন্দের লীলায়িত গতিমাধুর্য্যে-দৃশ্যপ্রাচুর্য্যে সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের মনে ক্ষণিক ভাববিহ্বলতা সৃষ্টি করেন, অতল অসীম ভাবমাধুর্য্যের আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথ মনকে ব্যথায় রাঙিয়ে বিহ্বল করে দেন। এখানেই ছিল দুই কবির পার্থক্য···স্বপ্নজালের চিকের মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ধ্বনিমাধুর্য্যে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণ করেছেন।

কবি-মনের সঙ্গে সাধারণ-মনের পার্থক্য অনেকখানি, কবির মুগ্ধ চিত্তে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু থেকে তুষারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গ পর্য্যন্ত অপরূপ আনন্দের সঞ্চার করে। প্রাত্যহিকতার ঊর্দ্ধে কবি-মন হোমানল-শিখা হয়ে প্রকৃতিকে বরণ করে। পরিবর্ত্তে প্রকৃতি দু'হাত ভরে ঢেলে দেন অপরিমিত আনন্দের রাশি। সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সকল কবির পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য। পার্থক্য থাকে শুধু দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতায়···প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যে···তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রকৃতির গভীর রহস্যে তন্ময় হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ তখন প্রকৃতিকে প্রকৃতিরূপে দেখেই ধন্য হয়েছেন। ছন্দ-বৈচিত্র্যে ধ্বনিমাধুর্য্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি হাস্যলাস্যময়ী মূর্ত্তি নিয়েছেন। ছন্দ-ব্যঞ্জনায় প্রকৃতি নূতনরূপে ধরা দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতির স্বকীয়তায় প্রকৃতি-উপলব্ধি। উদাহরণ বললেই বোঝা যাবে এ কথা কত দূর সত্য—

"ছিপখান্ তিনদাঁড় তিনজন মাল্লা।
চৌপর দিন্‌ভোর দেয় দূর পাল্লা।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

যা এই ধরণের কিছু—যা শুধু দেখার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকত না। আত্মদর্শন বা বিশ্বের উপলব্ধির মধ্যেই "যা দেখেছি" শেষ হয়ে যেতো। এর পর যখন শুনি সত্যেন্দ্রনাথ সরল সুরে বলে গেলেন—

"পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল জঞ্জাল
জলময় শৈবাল পান্নার টাঁকশাল"

এর সঙ্গে মিলিয়ে যখন শুনি রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"ভেসে যায় তরী······
······বক্রজীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।"

তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের সহজ সুরটি কোথাও নেই। আমাদের দৃষ্টির সামনে "প্রকৃতি" "as it is" এসে দাঁড়িয়েছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে :—

"হাড়বেরুনো খেঁজুরগুলো ডাইনী যেন ঝামরচুলো।
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কী থমকে গেলো
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে রাত্রি এল রাত্রি এল।"

দেখতে পাই নদীর দুই তীরে সার দেওয়া কঞ্চির ঘর···তীরের কাছে ভাসা হাঁসের সারি···জলে পানকৌটীর ডুব, সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দিনগুলো। রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য রইল ঢাকা। বাক্যহারা আকাশের নীচে, স্তব্ধ রাতে, অতল জলস্রোতে নৌকা ভাসানো—কৌতূহলে বিস্ময়ে মন ভরা···আত্ম-বিশ্লেষণ নয় তত্ত্ব-আলোচনা নয়। শুধু শঙ্কিত বিস্ময়···

"চোখে কেমন লাগছে ধাঁধাঁ,
লাগছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলিই জোনাক হল,
কিংবা জোনাক হল তারা?"

এই নৌকা-যাত্রা অবিস্মরণীয়। অন্য দিকে দেখি প্রচণ্ড রৌদ্র ঝলসিত দিনে মাঠের উপর ছুটছে পাল্কী। স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নিঃশব্দতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন পরিবেশে মূর্চ্ছাহত ধরণী···

"শুক্ন গাঁয়ে আদুল গায়ে যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা।"

ওরা জীবন-দেবতা নয়···দেবদূত নয়···অনন্তের ইঙ্গিত ওরা বয়ে আনেনি···বাস্তব চিত্রখানিকে নিপুণ করে তুলেছে ওরা পাল্কীবাহক। পল্লীগ্রামে এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা···তবু মনে হয় অপূর্ব দৃশ্য··· প্রকৃতির পটভূমিকায় মোহাঞ্জন-বোলানো ছবি···ছন্দ-স্পন্দনে দীপ্ত বাস্তব।

"কাজ্‌লা-সবুজ কাজল পরে পাটের জমি, ঝিমায় দূরে।
ধানের জমি, প্রায় সে নেড়া মাঠের বাঠে, কাঁটার বেড়া।"

ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে সমগ্রতা ধরা দিয়েছে। তবু সে শুধু ছবি···ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি নয়। রঙের তুলিতে চলছে ছন্দের টান—

"ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা।"

বলা হয়তো বাহুল্যই হবে যে সত্যেন্দ্রনাথের Sequence ছিল Rhetorical, এই ছন্দ ও ছবি নিয়েই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিভিন্ন। ছন্দের মূর্চ্ছনা থাক বা না থাক ভাবসম্পদে, সৌন্দর্য্য-অনুভূতিতে···বিশ্ব-উপলব্ধিতে, স্বপ্নমদির ভাববিহ্বলতা ও গাম্ভীর্য্যে কবিগুরুর কাব্য হয়েছে অতুলনীয়, অভূতপূর্ব। প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে মুগ্ধ চিত্ত বার বার বলেছে—

"যদি চিনি যদি জানিবারে পাই
ধূলারেও মানি আপনা
ছোট বড় হীন সবার মাঝে,
করি চিত্তের স্থাপনা"

মনে মনে ইচ্ছা জাগে

"ধরণীর শ্যাম করপুটখানি,
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী—মধুর অর্থভরা।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি যখন পদ্মাবক্ষের দৃশ্য বর্ণনা করেন, সে দৃশ্যের মধ্যে যতখানি সৌন্দর্য্য ততখানি দর্শন,

"ভেসে যায় তরী।
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে······
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।"···

দর্শন বা আত্মলীন চিন্তা বাদ দিলেও দৃশ্যগুলির মাধুর্য্য কিছু কমে না,

"চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে,
শরতের শস্যক্ষেত্র এত শস্যভারে,
রৌদ্র পোহাইছে···তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথ পাশে চেয়ে আছে সারা দিন।"

অন্যত্র দেখি— ···"শুভ্র খণ্ড মেঘ···
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রা-রত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে···দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তর ক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত···"

পড়তে পড়তে মন চলে যায় না-দেখা গ্রামের বাঁকা পথে—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে,
সুদূর সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।"

সেই সুদূর প্রান্তসীমা···যেথায় 'আকাশের নীলে বনের সবুজ মিশে করে কানাকানি"—সে যেন স্বপ্নভরা দেশ···

"এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে'
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা
জটলা করে তীরে রাখাল এসে
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি
কে জানে কত শত নূতন দেশে?"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি রহস্যমণ্ডিত···অজানার ইঙ্গিতে মন তাই দুলে ওঠে, শুধু রহস্যমণ্ডিতই নয়···রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি দুই মূর্তিতে ধরা দিয়েছে, নিষ্ঠুর জড়রূপে প্রকৃতিকে দেখি সিন্ধু-তরঙ্গে, অপর দিকে স্নেহশীলা করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখি 'অহল্যার প্রতি' কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির রুদ্র রূপ যেমন ভয়ঙ্কর, মাতৃময়ী রূপ তেমন মধুর। প্রকৃতিকে প্রকৃতিরূপে না দেখে আমরা যেন আমাদের অদৃশ্য নিয়তির মতো দেখি···দেখি গৃহের প্রিয়জনের রূপে।

প্রকৃতি যখন জড় নয়···পরিবর্তনের চক্রে নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সে রূপ-বৈচিত্র্য কবি-প্রাণে স্পন্দন জাগায়। রবীন্দ্রনাথ ঋতু-বর্ণনায় অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

"কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না উড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে
শিউলী-বনের বুক উঠে যে আন্দোলি······"

সে আন্দোলনের মূলে আছে কবির গান পাকানো ঋতু শরৎ।

"হায় হেমন্তলক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা"······

কুয়াশা-ঢাকা প্রকৃতির গুপ্ত সৌন্দর্য্য···হেমন্ত ঋতুর গোপন করা রীতি···তার পরেই আসে ফসল কাটার ঋতু···

"এল যে শীতের বেলা, বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে···"

ফসল কাটার আনন্দ প্রকৃতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়···

"আলোর হাসি উঠল জেগে,
ধানের শীর্ষে শিশির লেগে
ধরার খুসী ধরো না গো ঐ যে উথলে মরি হায়"

পৌষ ঋতুর উৎসব শেষ হয়! চকিত হয়ে দেখি—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে", "পথভোলা পথিক" এসেছে "সকাল বেলার মালতী" আর "সন্ধ্যা বেলার মল্লিকা"র আহ্বানে। "বনে বনে রঙীন বসনপ্রান্ত উড়িয়ে···ফাগুন বায়ে রিক্ত বৃন্তকে পুষ্পে ভরিয়ে এল বসন্ত। ফুলে ফুলে ভরা বসন্ত···প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত হাসির কলরব······

"রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোক পলাশে
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।"

বসন্তের দিন-অন্তে আসে রুদ্র বৈশাখ···প্রলয় বিষাণ বাজে আহ্বানমন্ত্র······

"হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক?
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!"

তার পর শুরু হয় মেঘচ্ছায়া-ঘন দিন···শ্রাবণ বরিষণের মর্ম্মর গুঞ্জরণে···শ্যামলছায়া, কদম্ব বনে ঢেলে যায় কালো মেঘের ধারা···

"অধীর সমীর পুরবৈয়া নিবিড় বিরহব্যথা বহিয়া···
যে সন্ধ্যা এল··· "আষাঢ় সজলঘন আঁধারে···
ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে···"

কবি··· "একলা বসে ঘরের কোণে···কী ভাবিয়ে আপন মনে
সজল হাওয়া যূথির বনে কী কথা যায় কয়ে···"

অশ্রুত বাণীর সেই সুর-ঝঙ্কারে মন গেয়ে উঠে···

"ঝর-ঝর মুখর বাদল দিনে···জানি নে জানি নে
কিছুতে কেন যে মন লাগে না···"

তবে কি কাজ-ভোলানো বর্ষা এল?···

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে···
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে···
ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা···
শ্যামগম্ভীর সরসা···"

প্রকৃতির সব রূপ সবখানি অন্তরই কবির বীণার কাছে ধরা দিয়েছে···প্রচণ্ডতার মৃদঙ্গ ঝঙ্কারে···পিণাক টঙ্কারে দ্যুলোক আর ভূলোকের স্তব্ধ মৌন-মহিমায় বেদনায় মূর্চ্ছাহত কবি রবীন্দ্রনাথ ভাব-গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্য-প্রশান্তিতে অনন্যসাধারণ···প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের উদাত্ত সুরধ্বনিতে ভাব-বিহ্বল বিমুগ্ধ আত্মহারা কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য কাব্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বপ্নমণ্ডিত সুর-মূর্চ্ছনায় অপূর্ব্ব। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি নৃত্যচ্ছন্দে স্পন্দিতমানা।

মানুষ নেতাজী

শ্রীমীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

"নেতাজী কে ?"—এ প্রশ্নের নানারূপ উত্তর নানা জনে দিয়ে থাকেন। আমি এখন আপনাদের কাছে "মানুষরূপী নেতাজী" সম্বন্ধে দু'চার কথা বলার চেষ্টা করবো।

মহামানুষ আসেন, মহামানুষ চলে যান, তাঁদের কীর্ত্তি থাকে অমর হয়ে। অস্ত-সূর্য্য যখন মেঘের আড়ালে যায় বিলীন হয়ে, আকাশ ভরে ছড়িয়ে থাকে রঙের খেলা, কাব্যের রস উপভোগ করার জন্য এ কথা বলা যায় না যে, কবি অপরিহার্য্য। লেখককে বাদ দিয়েও তাঁর লেখার মহিমায়, আর স্রষ্টাকে বাদ দিয়েও তাঁর সৃষ্টির মহিমায় মানুষ মুগ্ধ হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সেক্সপীয়র কে ছিলেন বা র‍্যাফেল কে ছিলেন তার সঠিক খবর অনেকেরই জানা নেই, তবু তাদের সৃষ্টির রসে দেশে দেশে শত শত গুণীর মন ভরে ওঠে। সংসারে মানুষের চেয়ে মানুষের কীর্ত্তিই বড়।

কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক-এক জন মহামানুষ আসেন, যার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম খাটে না। নেতাজী এমনি এক জন মহামানুষ। তাঁর 'কীর্ত্তি-কাব্য' অপরূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমনি অপরূপ তিনি মানুষটি। কীর্ত্তি ছাড়াও তাঁর মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়, যার সম্বন্ধে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। মানুষটি নিজেই এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য। যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন, শত্রু হোক, মিত্র হোক, তাঁর কাছে গিয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে আর হয়েছে কি না সন্দেহ, তাঁর কাছে দাঁড়ালে হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। বিশাল তাঁর দেহ—বিশালতর তাঁর সেই দেহাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। নেতাজীর 'কীর্ত্তি-কাব্য' একান্ত যত্নের পাঠ্য বস্তু। "মানুষ নেতাজীকে" নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে বোধ হয় এ কাজও তাঁর 'কীর্ত্তি-কাব্যের' মত বিস্ময়কর। মানুষের দেশে তিনি এসেছেন মানুষ হয়েই তবু যেন চারি দিকের পৃথিবীতে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য নেতাজীর 'কীর্ত্তি-কাব্য' নেতাজীর জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, মানুষ নেতাজীকে না বুঝলে তার মর্ম্মমূলে যাওয়া অসম্ভব। তাঁর কার্য্যকলাপের ঠিক ঠিক বিশ্লেষণের জন্য আগে চাই তাঁর প্রকৃতির অন্তর্দেশের সন্ধান। কিন্তু সে প্রয়োজন ছাড়াও নেতাজী-চরিত্রের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে! প্রবাদ আছে, বুদ্ধের আগে অনেক বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন। এক বুদ্ধের কথা আমরা সকলেই জানি, অন্যেরা চিরকাল থেকে গেলেন অজানা। সংসারে যে মহাপুরুষের জীবন লোক-চোক্ষে ফলে-ফুলে ভরে ওঠে, তাঁর কথা আমরা জানতে পারি। তাঁকে নিয়ে রচনা করি আমাদের গোষ্ঠী জীবনের ইতিহাস। কিন্তু লোক চোখের অগোচরে আর কত মহাপুরুষ আসেন—সবার অজান্তে জীবন দিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করে যান নব নব আন্দোলনের পরিমণ্ডল। সংসারীর চোখে জীবন তাঁদের সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত বা মহৎ নয়। মহাকালের রঙ্গভূমিতে তাঁরা কেবল হারের খেলাই খেলে ভবলীলা শেষ করেন—কীর্ত্তির জয়মালা তাঁদের নামকে মানুষের স্মৃতিতে অমর করে রাখে না। তবু ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা অবহেলার নন। যে মহাশক্তির উৎস নিয়ে তাঁরা জন্ম নেন সেই শক্তির দ্যুতিতে মহনীয় হয়ে ওঠে তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্ব। সন্ধানী মানুষের কাছে অপরের কীর্ত্তি-কথার চেয়ে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের কাহিনী কম মনোহারী নয়।

নেতাজীকে দেখলে সেই কথা মনে হয়। ভাগ্যের কোন আকস্মিক অনুগ্রহে তিনি কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি, নিজের চেষ্টায় প্রচণ্ড সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করেছেন কাল-বিজয়ী নাম। কিন্তু যদি এমন হোত যে, অদৃষ্টের কোন যোগাযোগে তিনি তাঁর কীর্ত্তি স্থাপনা না করে "তাঁর যুগের" সৃষ্টি না করতেন, তবু সেই মানুষটির ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেউ থাকতে পারত না। এমনই বৈদ্যুতিক উপাদানে গড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব। বড় হয়ে তিনি জন্মেছেন—আজীবন বড় হবারই সাধনা তিনি করে চলেছেন। সকল দেশের সকল কালের মানদণ্ডেই নেতাজী বিরাট পুরুষ। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সত্যি সত্যিই বলা যায়,—"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!"

* * * *

নেতাজীর ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব শুধু বিরাট রূপে নয়—বিচিত্ররূপে।

আজও নেতাজীর একটা সত্যিকার জীবনী বার হল না। তার কারণ, নেতাজীর বীণায় এত বিচিত্র তার যে, তাঁর মত আর এক জন ছাড়া অপরের পক্ষে তাঁর জীবনী লেখা কঠিন।

নেতাজীর মধ্যে অনেকগুলি মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক প্রতিভাশালী চরিত্রের মধ্যেই এমনি একাধিক সত্তার পরিচয় মেলে। হয়ত এক দিন এ তথ্য প্রমাণিত হবে, সব মানুষই একাধিক মানুষের সমষ্টি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া যায় শুধু আভাসে, মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বে তারা নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। নেতাজী হলেন বহুরূপী মানুষ। অদ্বিতীয় বিপ্লবী নেতা তিনি, শিল্পী তিনি, অক্লান্তকর্ম্মী তিনি, সুরজ্ঞ তিনি, কবি তিনি, নাট্য জগতের অভিনব ও অপূর্ব্ব স্রষ্টা তিনি, সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ তিনি, এত তাঁর বাইরের বহুরূপের কিছু রূপ। অন্তরেও তিনি বহুরূপী। শুধু তাই নয়, তাঁর বহু রূপের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর অন্তরে বাস করেন বিচিত্র-ধর্ম্মী বহুরূপী সত্তা। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে নানা বিপরীতমুখী খণ্ড-ব্যক্তিত্বের সমাবেশে। তিনি শুধু বিচিত্র শিল্পের ও নীতির ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে নিশ্চিন্ত থাকেননি। জীবনের পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রে তাকে সফল করে তুলেছিলেন। আমাদের অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ তাঁর লক্ষ্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন আর্ত্ত মানুষের সেবায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও ছিল পরস্পরবিরোধী। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব আরও পরস্পরবিরোধী। তাঁর অন্তরে বাস করে একাধারে শিল্পী, কর্ম্মী ও সাধক নিজ-নিজ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী বিচিত্র প্রবৃত্তির মণ্ডলী নিয়ে।

বিশ্বপ্রকৃতির ভক্ত পূজারী ও অদ্বৈতের সাধক, সৌন্দর্য্যের রূপকার ও নিপীড়িত মানব আত্মার প্রতিনিধি, নিরাসক্ত দার্শনিক ও পৃথিবীর ভোগরসে আত্মহারা কবি, অপরিমেয় কল্পনাবিলাসী ও বিচক্ষণ সমরাধিনায়ক, আন্তর্জাতীয়তার নির্যাতিত হোতা ও স্বাদেশিকতার পরম উৎস ;—নেতাজী এ সবই ; অথচ বিশেষ কোন একটি নন। তাই তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অনেকের

ানে হয়েছে তাঁর চরিত্র কি অদ্ভুত হেঁয়ালি-ভরা। এই রহস্যের ৎস কোন্‌খানে—সে সন্ধান মেলেনি বলে অনেকে তাঁর নানা বিপরীত-ধর্ম্মী মতামত ও কার্য্যকলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যান। নেতাজী-চরিত্রের রহস্যের মূল এইখানেই।

ভগবতী দেবী

শ্রীসুলতা কর.

আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা ভগবতী দেবীর জীবনের একটি ঘটনা লিখছি। ভগবতী দেবী বাল্যকালে মামার বাড়ীতে পালিতা হয়েছিলেন। মামা ছিলেন খুব ধনী। কাজেই ধনীকন্যার উপযুক্ত চাল-চলনে তিনি অভ্যস্তা ছিলেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হ'ল অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঠাকুরদাসের সঙ্গে। ধনীগৃহের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে হাসিমুখে তিনি দরিদ্র সংসারের সব দুঃখ বহন করতে লাগলেন।

সেকালের ত্যাগ ও সংযমের শিক্ষায় শিক্ষিতা বালিকা বধূ হাসিমুখে সারা দিন সংসারের সব কাজ করতেন, সকলের প্রাণপণে সেবা করতেন, সামান্য আহার, সামান্য পরিচ্ছদে তুষ্ট থাকতেন, দরিদ্র গৃহের কোন দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ব্যথা দিতে পারত না।

ঠাকুরদাসের সংসারে কয়েক দিন বড় টানাটানি যাচ্ছিল। প্রায়ই সকলকে উপবাস করতে হচ্ছিল। এমনি সময়ে এক সন্ধ্যায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের দরজায় উপস্থিত হলেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে গৃহস্বামীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। ঠাকুরদাসের মা দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে বাবা তুমি?" ব্রাহ্মণ বললেন—"মা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, অনেক দূরের দেশ থেকে হেঁটে আসছি। সারা দিন কিছু খাইনি, শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমার দরজায় অতিথি হয়ে এসেছি।"

ঠাকুরদাসের মা ভয়ে-দুঃখে কেঁদে ফেললেন। ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে মা, কাঁদছ কেন?" ঠাকুরদাসের মা কাতর-স্বরে বললেন—"বাবা, কি আমি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার সংসারে বড় টানাটানি যাচ্ছে। ছোট ছেলেরা আজ রাতে চিঁড়া খেয়ে রয়েছে। আমরা উপবাসী আছি। ঘরে এক মুঠোও চাল নাই যে অতিথি সৎকার করি।"

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে বললেন—"মা, আপনি দুঃখ করবেন না আমি আর এক বাড়ী যাচ্ছি।" এই বলে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় হঠাৎ পিছনের দরজা খুলে বালিকা বধূ ভগবতী দেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন—"ঠাকুর, আপনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবেন না। আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম করুন। গরীবের ঘরে সামান্য যাহা কিছু আছে তাই দিয়েই আপনার সেবা করব।"

এই বলে মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী ভগবতী দেবী শ্রান্ত ব্রাহ্মণকে পা ধোবার জল দিলেন, বসবার আসন দিলেন। তার পর শাশুড়ীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতের তামার বাজু খুলে দিয়ে বললেন—"মা, অতিথি ব্রাহ্মণকে কখনও বিমুখ করতে নাই। আপনি এই বাজু পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর কাছে বাঁধা রেখে কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে আসুন।"

শাশুড়ী দয়াময়ী বধূর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিনাবাক্যে বধূর হাতের বাজু নিয়ে চলে গেলেন। বাজু বাঁধা রেখে শীঘ্রই কিছু চাল-ডাল তরকারী আনলেন। উপবাসী ভগবতী দেবী মহানন্দে খিচুড়ী ও সামান্য তরকারী রাঁধলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বহু যত্নে সামনে বসে খাওয়ালেন। খাওয়া শেষ হলে সযত্নে বিছানা পেতে দিলেন। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ পরিতোষের সঙ্গে আহার করলেন, পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে সুখনিদ্রায় শ্রান্তি দূর করলেন। পরদিন ভোরে প্রাতঃকৃত্য সেরে ব্রাহ্মণ বিদায় চাইতে আসলেন। ভগবতী দেবী ও তাঁর শাশুড়ী সামনে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ব্রাহ্মণ ভগবতী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"মা, কাল রাতে তোমার হাতে বাজু দেখেছিলাম, সেটি দেখছি না যে?" শাশুড়ী সগর্ব্বে হেসে বললেন—"আমার মা-লক্ষ্মী কাল সেটি বাঁধা দিয়ে অতিথি সেবা করেছে।"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন—"মা, তুমি সাক্ষাৎ ভগবতী। নিজে উপবাসী থেকে, হাতের গহনা বন্ধক দিয়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে-সেবা, যে-যত্ন করলে তার পুরস্কার ঈশ্বর তোমায় দেবেন, প্রাতর্বাক্যে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি।" এই বলে ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে শত শত আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

ভগবতী দেবী লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কেন সবাই তাঁর এত প্রশংসা করছে। অতিথির সেবা করা ত তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমনই দয়ার পুণ্যের আধার ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবীর চরিত্র। সেই মায়ের চরিত্রের প্রভাবে, সেই মায়ের শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র গড়ে উঠেছিল বলেই দেশবাসী ঈশ্বরচন্দ্রকে শুধু বিদ্যার সাগররূপে না পেয়ে দয়ার সাগররূপে পেয়েছিল।

"কিতাবে কুল্‌সুম্ নানঃ" কি?

আমাদের দেশে চাণক্য শ্লোকে যেমন পুরুষদিগের জীবনযাপনের রীতি-নীতি বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ ও নিয়ম লিখিত আছে, পারস্য দেশে তেমন মহিলাদিগের ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ গম্ভীর ভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুকরণে প্রচারিত হয়। বইটির নাম "কিতাবে কুল্‌সুম্ নানঃ"। বইটিতে কথিত আছে যে, সপ্তর্ষিস্বরূপা সাত জন মাতব্বর গৃহমেধিনী ঐ কিতাবের নির্দ্দেশক। তাঁরা আপন আপন আজ্ঞাগুলির মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থে কোন আজ্ঞাকে "অবশ্য-শাস্ত্র-সিদ্ধ", কোন আজ্ঞাকে "শাস্ত্র-সিদ্ধ" কাকেও "বাঞ্ছনীয়" এবং কাকেও বা "বিধেয়" হিসাবে নির্ণীত করেছেন। উক্ত আজ্ঞাসমূহের অবহেলায় ইহলোকে দুঃখ এবং পরলোকে শাস্তির বিধান করেছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থটির অনুকরণে আবার ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ "কানূনে ইস্‌লাম্" নামক একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রচার করেছেন। মুসলমান নারী-সমাজ না কি সেই গ্রন্থের আদেশাবলীর সাহায্যে স্ব স্ব পুরুষকে বশীভূত করেন এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

ছোটদের আসর
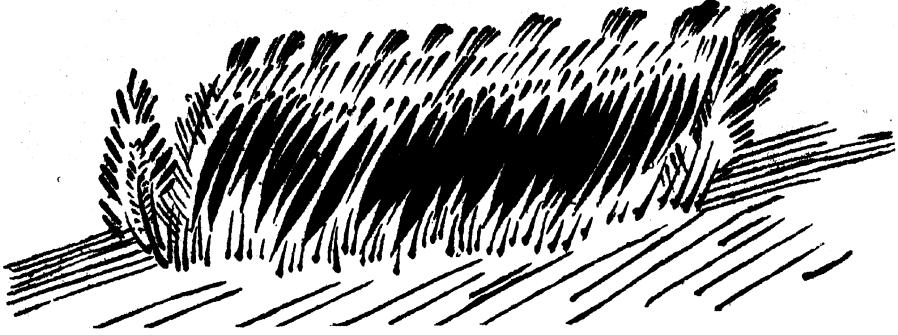
রাজ-বিচার

(রস-রচনা)

[প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখক বাবু হরিশ্চন্দ্রজীর নাটিকা অবলম্বনে]

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

চরিত্র—রাজা, মন্ত্রী, ভৃত্য, প্রহরী, সন্ন্যাসী, শিষ্য ও আসামিগণ।

স্থান—রাজধানীর বাইরে মাঠ।

[গাছতলার নীচে সন্ন্যাসী ও তাঁর শিষ্য আড্ডা পেতে বসে আছেন। তাঁরা বহু দেশ ঘুরে এ রাজ্যে এসেছেন। শিষ্য বাজার থেকে এক ঝুড়ি মিঠাই কিনে নিয়ে এল।]

গুরু। এ কি, এত মিষ্টি কোথায় পেলে?

শিষ্য। প্রভু, এখানে সব অদ্ভুত দর, এক টাকায় এক সের মিঠাই। অবার এক টাকায় এক সের ভাজীও।

[এমন সময় একটা পাগলা স্বভাবের লোক বলতে বলতে চলল]

আন্ধেরী নগরী, চৌপট রাজা,
টাকা সের ভাজী, টাকা সের খাজা।

সন্ন্যাসী (শিষ্যের প্রতি)। ও কি বলছে শুনতে পাচ্ছ?

শিষ্য। হাঁ গুরুদেব, আন্ধেরী নগরী চৌপট রাজা।

সন্ন্যাসী। (লোকটাকে ডেকে) ওহে, এ দিকে এস, কি বলছ?

লোক। আজ্ঞে, রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছি [বলে পুনরায় ছড়া আবৃত্তি করে প্রস্থান করল।]

সন্ন্যাসী। "নগর অন্ধকারময়, রাজার অদ্ভুত চাতুর্য্য, ভাজীও টাকা সের, খাজাও টাকা সের।" বৎস, আমি এমন স্থানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকব না, আমি চল্লাম।

শিষ্য। গুরুদেব, আমি বড় ক্লান্ত।

সন্ন্যাসী। তুমি থাক, আমি চললুম, এরূপ স্থানে বাস আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি থাক, যদি কোন বিপদ হয় আমাকে স্মরণ করো, আমি আসব।

[প্রস্থান।

শিষ্য। (মনে মনে) গুরু ত চলে গেলেন, ভারী অদ্ভুত স্থান ত। "আন্ধেরী নগরী" ইত্যাদি। (হাস্য) দেখা যাক্, সেটা কি রকম।

[দূরে কলরব শোনা গেল, শিকার থেকে রাজা মন্ত্রী [illegible] সব ফিরে আসছেন।]

পট-পরিবর্ত্তন

[আন্ধেরী নগরীর রাজসভা, রাজা, মন্ত্রী, ভৃত্য যে যার উপযুক্ত স্থানে সমাসীন।]

এক অনুচর। (চীৎকার করে) মহারাজ পান খান।

রাজা। (ভয় পেয়ে রাজা সিংহাসন থেকে চমকে উঠে দাঁড়ালেন) কি বলছিস্, 'শূর্পণখা এসেছে, পালান?'

মন্ত্রী। (রাজার হাত ধরে) না, না, মহারাজ, আপনাকে পান খাবার কথা বলছিল।

রাজা। শয়তান, ছুঁচো, পাজী, আমাকে শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিয়েছিল? মন্ত্রী, একে একশ' বেত লাগাও।

মন্ত্রী। মহারাজ, এর কি দোষ? তাম্বূলীবাহক যদি পান তৈরী না করত, তবে এ চীৎকার করে পান খেতে বলত না।

রাজা। আচ্ছা, তাম্বূলীকে দু'শ বেত লাগাও।

মন্ত্রী। মহারাজ, পান খান এ কথা শুনেই ত আপনি ভয় পেয়ে গেলেন, মনে করলেন শূর্পণখা এসেছে, তা আপনি শূর্পণখাকেই সাজা দিন।

রাজা। (চমকে) আবার ঐ নাম? মন্ত্রী, তুমি বড় খারাপ লোক। আমি রাণীকে বলে দেব তুমি বারে বারে তার সতীনকে নিয়ে আসতে চাও। ওরে কে আছিস্, শীঘ্র মদ নিয়ে আয়।

[দু'জন ভৃত্য দৌড়ে এল, এক জন সোরাই থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে মহারাজের হাতে দিল]—নিন মহারাজ, পান করুন মহারাজ!

রাজা। (মুখ বিকৃত করে মদ পান করতে করতে) দে, আরো দে!

[হঠাৎ একটা লোক সামনে বসে চীৎকার করতে লাগল—
"দোহাই মহারাজ, রক্ষা করুন।"]

রাজা। কে চীৎকার করছে, ধরে নিয়ে আয় ত!

[দু'জন ভৃত্য এক ফরিয়াদীকে ধরে নিয়ে এল।]

ফরিয়াদি। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ, ন্যায় বিচার হোক।

রাজা। চুপ্ কর, বল্ কি হয়েছে? তোর ন্যায়বিচার এমন হবে যা যম রাজার সভায়ও হয় না।

ফরিয়াদী। মহারাজ, কাল্লু বানিয়ার দেয়াল পড়ে আমার বকরী (ছাগল) মারা গেছে, এর ন্যায়বিচার হোক।

রাজা। মন্ত্রী, দেয়ালকে এখানে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। মহারাজ, দেয়ালকে কি করে এখানে আনা যায়?

রাজা। আচ্ছা, ওর ভাই, ছেলে, বন্ধু যে-কেউ হোক তাকে এখানে ধরে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। মহারাজ, দেয়াল ত ইট-চূণের তৈরী, তার ভাই-বন্ধু কেউ থাকে না।

রাজা। আচ্ছা, কাল্লু বানিয়াকে ধরে আন।

[প্রহরীরা বানিয়াকে ধরে নিয়ে এল]

রাজা। কি রে বানিয়া, তুই এর বরকী (বকরী), না না, বরকীকে (বকরী) কেন দেয়াল চাপা দিয়ে মেরেছিল?

মন্ত্রী। মহারাজ, বরকী নয় বকরী?

রাজা। হেঁ, হেঁ বকরী কেন মরল, এক্ষুনি বল, নয় ত তোকে ফাঁসী দেব।

বানিয়া। মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই, কারিগর এমনই দেয়াল বানিয়েছে যে, তা ভেঙ্গে পড়েছে। ওটা কারিগরের দোষ।

রাজা। আচ্ছা, কাল্লুকে ছাড়, কারিগরকে নিয়ে আয়।

[কাল্লুর প্রস্থান, কারিগরকে প্রহরীরা ধরে নিয়ে এল]

রাজা। হা রে কারিগর, এর বকরী কি করে মারলি?

কারিগর। মহারাজ, আমার দোষ নেই, চূণাওয়ালা এ রকম চূণ তৈরী করে দিয়েছে যে, দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে।

রাজা। আচ্ছা, কারিগরকে ছেড়ে দে, চূণাওয়ালাকে নিয়ে আয়।

[কারিগরের প্রস্থান, চূণাওয়ালার আগমন।]

রাজা। কি রে পান খাওয়া চূণাওয়ালা, এর বকরী কি করে মরল?

চূণাওয়ালা। মহারাজ আমার কোন দোষ নেই, ভিস্তি এত জল দিয়েছে যে, চূণা বোধ হয় তাতেই খারাপ হয়ে গেছে।

রাজা। আচ্ছা, চূণাওয়ালাকে যেতে দে, ভিস্তিকে নিয়ে আয়।

[ভিস্তির আগমন]

রাজা। কি রে ভিস্তি, তুই এমনি গঙ্গা-যমুনার স্রোত বইয়ে দিয়েছিস্ যে, এর বকরী পড়ে গেছে আর বকরীর নীচে দেয়াল চাপা পড়ে মরে গেছে?

ভিস্তি। মহারাজ, গোলামের কোন দোষ নেই। কসাই এত বড় মশক তৈরী করে দিয়েছে যে, জল বেশী এসে গেছে।

রাজা। আচ্ছা, ভিস্তিকে ছাড়, কসাইকে বোলাও।

[প্রহরী ভিস্তিকে দূর করে কসাইকে নিয়ে এল।]

রাজা। কি রে কসাই, তুই এ রকম কি মশক তৈরী করলি যে, দেয়াল বানাল আর বকরী মরল।

কসাই। মহারাজ, ভেড়াওয়ালা আমাকে এত বড় ভেড়া বেচেছে যে, তাতে মশক বড় হয়ে গেছে।

রাজা। ওরে কসাইকে দূর করে দে, ভেড়াওয়ালাকে নিয়ে আয়।

[কসাই চলে গেল ও ভেড়াওয়ালা এল]

রাজা। ওরে ভেড়াওয়ালা, তুই কেন এত বড় ভেড়া বিক্রী করলি?

ভেড়াওয়ালা। মহারাজ, আমার দোষ নেই, ওদিকে কোতোয়াল সাহেব সৈন্য নিয়ে সফরে বের হয়েছিলেন, আমি চেয়ে দেখছিলাম; আমি বড় ভেড়া ছোট ভেড়ার খেয়াল রাখতে পারিনি, এটা কোতয়ালের দোষ।

রাজা। আচ্ছা তুই যা। প্রহরী এক্ষু[illegible] নিয়ে আয়!

[ভেড়াওয়ালা চলে গেল, কোতয়ালকে প্রহরীরা ধরে নি[illegible]

রাজা। কি রে কোতয়াল, তুই কেন অমন ধুমধাম করে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়েছিস্ যে তা দেখে ভেড়াওয়ালা ঘাবড়ে গিয়ে বড় ভেড়া বেচে দিয়েছে আর বকরী পড়ে গিয়ে কাল্লু বানিয়া চাপা পড়ে গেছে।

কোতয়াল। মহারাজ, মহারাজ, আমি ত কোন দোষ করিনি, আমি ত শহরেরই দেখা-শোনা করতে গিয়েছিলাম।

মন্ত্রী। (মনে মনে) এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার হল! এত সব কথাবার্ত্তার পর এই বেকুব রাজা সবাইকে ফাঁসীর হুকুম না দিয়ে বসে, বা সমস্ত শহর কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে না বসে!

মন্ত্রী। কোতয়াল, এ কথা নয়, তুমি এমন ধুমধাম করে কেন শহরে বের হলে, যার জন্য এই বকরী চাপা পড়ল।

কোতয়াল। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। মহারাজ টহারাজ শুনব না। যা কোতয়ালকে নিয়ে ফাঁসী দে।

[জল্লাদ কোতয়ালকে পিছমোড়া করে ফাঁসীকাঠে চড়াল কিন্তু কোতয়াল ছিল তালপাতার সেপাই, এত রোগা, তার সরু গলায় ফাঁসীর দড়ি ঠিক মত টানা যায় না। তখন জল্লাদ বললে—"মহারাজ, ফাঁসীর জন্য মোটা লোক চাই। রাজা প্রহরীকে হুকুম দিলেন, মোটা লোক ধরে নিয়ে আসতে। শহরের বাইরে আশ্রম বানিয়ে সেই শিষ্যটি ছিল, টাকা সের ভাজি, টাকা সের খাজা খেয়ে তার শরীরখানা বেশ নাদুস-নুদুস হয়েছিল, প্রহরীরা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এল।]

শিষ্য। আমাকে ছেড়ে দে বাবা, কেন ধরেছিস?

প্রহরী। তোকে ফাঁসী দেবে।

শিষ্য। নিরীহ সাধু আমি, সহরের বাইরে পড়ে আছি, আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে ফাঁসী দেবে?

প্রহরী। সে সব কথা আমি শুনব না। তুই মোটা, তাল ফাঁসী যাবি। চল্ চল্।

[শিষ্যের হাত যোড় করে মিনতি ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। প্রহরীরা সাধুকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। তখন বেগতিক দেখে শিষ্য গুরুদেবকে মনে মনে স্মরণ করল।]

গুরুদেব [যোগবলে সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন]—বৎস, কি ব্যাপার?

শিষ্য। গুরুদেব, আমাকে ফাঁসী দিতে নিয়ে যাচ্ছে, আমা অপরাধ আমি মোটা। বাঁচান প্রভু!

[গুরুদেবের চক্ষুস্থির, বললেন] বাবা, তখনই বলেছিলাম—"এ অন্ধেরী নগরী চৌপট রাজা, টাকা সের ভাজি টাকা সে খাজা।"—এখানে থেকো না।

[গুরুদেব এক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে কি ভাবলেন, শিষ্যর কানে কানে কি বললেন, শিষ্যর মুখ প্রফুল্ল হল।]

গুরুদেব (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে প্রহরী, তোরা আমাকে নিয়ে [illegible] আমি ফাঁসী যাব।

শিষ্য। (চীৎকার করে) না, না, তোরা আমাকে নিয়ে চল, আমি ফাঁসী যাব।

[এই করে গুরু ও শিষ্যতে কে ফাঁসী যাবে তাই নিয়ে তর্ক চলল।]

[প্রহরীরা ত হতভম্ব। রাজা গোলমালের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। প্রহরীরা বললে—মহারাজ গুরু ও শিষ্যতে ঝগড়া চলছে কে আগে ফাঁসী যাবে।]

মহারাজ। কেন ?

গুরু। মহারাজ। আমি যোগবলে জানতে পেরেছি, আজ বড় শুভ মুহূর্ত্ত, আজ ফাঁসীতে যে ঝুলবে সে সশরীরে বৈকুণ্ঠে যাবে। তাই আমাদের ঝগড়া চলছে, কে আগে বৈকুণ্ঠে যাব।

রাজা। (উল্লসিত হয়ে প্রহরীকে) ওরে, এদের দূর করে দে, আমি ফাঁসী যাব।

[রাজা সশরীরে বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য ফাঁসীকাঠে ঝুললেন, ঢাক-ঢোল জোরে বেজে উঠল। আন্ধেরী নগরী চৌপট রাজার কাহিনী শেষ হ'ল।]

বাঙালী বীর তিতুমীর

মধুসূদন রায়

ছোট গ্রাম। নাম হৃদয়পুর। দেড়শ' বছর আগে যখন ইংরেজ আমাদের দেশে বর্ব্বরতার অভিযান চালাচ্ছিল; যখন মুসলমানরা রাজ্যহারা হয়ে তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা জলাঞ্জলি দিয়ে একান্ত অসহায় ভাবে এই অত্যাচার সহ্য করছিল; ঠিক সেই সময় আমাদের তিতুমীর জন্মাল ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এই ছোট্ট গ্রাম হৃদয়পুরে।

তাতুর বাবা বেশ সঙ্গতিপন্ন চাষী ছিলেন। কিন্তু সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটানোর জন্য তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেনি। সে বীর। সে জন্মেছে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করতে। সামান্য জমির মায়া কি তাকে আটকাতে পারে? সে চলে গেল তাদের শত্রু বৃটিশের রাজধানী কলকাতা শহরে—প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে। মন তার তেতে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাদের অত্যাচার সে চাক্ষুষ দেখেছে। সে শুনেছে পলাশীর কথা। মনের অস্ত্রে শাণ দেয় ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে।

সে কলকাতার এক জমিদারের আখড়ায় লেঠেল হিসেবে খুব নাম করল। দাঙ্গা করবার অভিযোগে একবার জেলেও গেল সে। ছাড়া পেয়ে মনে বিতৃষ্ণা নিয়ে ছুটে গেল মক্কায় হজ করতে। সেখানে গিয়ে ওয়াহাবি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের তিতুমীর। অনাচারে আর অত্যাচারে নিপীড়িত অধিবাসিগণকে একত্রিত করে বেদুইন সর্দ্দার আবদুল ওয়াহাব সকলকে পথ দেখালেন, সবাইকে মাথা-চাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাগতে হবে বৃটিশের বিরুদ্ধে।

বহু অভিজ্ঞতা লাভ করে আমাদের তিতুমীর ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমিতে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল গ্রামের নীচ ও দরিদ্র সমাজ। সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজ তিতুমীরকে বাধা দিলেন। কিন্তু তিতুমীর অটল। নিপীড়িত, অত্যাচারে জর্জ্জরিত দরিদ্র গ্রামবাসী দলে দলে যোগ দিল তিতুর বাহিনীতে। তারা নতুন আলোর সন্ধান পেলো, মুক্তির স্বাদ পেয়ে তারা ক্ষেপে হয়ে উঠল। তখনকার রাজা কৃষ্ণদেব রায় দরিদ্র সমাজের এত উত্তেজনা বরদাস্ত করতে না পেরে প্রত্যেককে জরিমানা করলেন। তিতু হয়ে উঠল ক্ষাপ্পা। রাজাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়ে ফিরে এল শক্তিশালী রাজার তাড়া খেয়ে।

নতুন ক'রে সংগঠন করতে লাগল তিতু। অসংখ্য গরীব হিন্দু-মুসলমান তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতা তিতুর দলে এসে যোগদান করল। তিতু বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। তিতুর শক্তিসঞ্চয়ে এবং লুঠ-তরাজে ভীত হয়ে উঠলেন গোবরডাঙা আর গোবিন্দপুরের জমিদার। এমন কি মোল্লাহাটির কুঠিয়াল সাহেব পর্য্যন্ত।

এবার তিতু সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথমে ইংরেজ সরকার গায়ে মাখেনি। কিন্তু তিতুর ক্রমাগত আক্রমণে তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এক দল অশ্বারোহী, এক দল পদাতিক আর গোলন্দাজ সৈন্য, লেফটেনাণ্ট ষ্টুয়ার্টের অধীনে যুদ্ধ করতে এল আমাদের বাঙালী তিতুর সঙ্গে। তিতুর শিষ্যরা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের শত্রুর ওপর। প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগল তারা। মুহুর্মুহু গর্জ্জে উঠল ইংরেজদের কামান—তিতুর দলের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তিতুর তৈরি বাঁশের কেল্লা গেল পড়ে। উনিশ দিনের পর বাঙালী বাদশাহ তিতুর মৃতদেহ পাওয়া গেল এই কেল্লার ভেতর। আমাদের বাঙালী বীর তিতুমীর এমনি করে সারা জীবন সংগ্রাম ক'রে প্রাণ দিল। ইংরেজের বিচারে তিতুর দলের লোকদের ফাঁসীর হুকুম হল।

বহু কাল কেটে গেছে। কত সংগ্রাম হয়ে গেছে তার পর, কত বীর প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লবের মূল পথ দেখিয়েছে তিতুমীর। তিতুমীর দেখিয়েছে বিপ্লবের পথ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। বাঙালী এখনও ভোলেনি সেই বীর শহীদকে। কোন দিন ভুলবেও না। আজও বারাসাতের চাষীরা গান গায় :—

জোলানি উঠিয়া বলে উঠ রে জোলা ঝাট্
হাজাম বাড়ি গিয়া শীগ্‌গির গোঁফ-দাড়ি কাট।
তিতুমীরের গলা ধরি নসিরুদ্দি কয়।
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকুন এ কি দায়।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক জন যুবক একমনে তুলি ধরে ছবি এঁকে চলেছেন—সেই সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক শিল্পী যুবকটির আঁকা কয়েক ছবি দেখতে এলেন। শিল্পী একমনেই ছবি এঁকে চলেছেন, হঠা বাইরে কে এক জনের উঁকি-ঝুঁকিতে আসন ছেড়ে উঠে এলেন এসে দেখেন তাঁদেরই পরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—নিজের অর্থ শিল্পীর আঁকা শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখতে এসেছেন।

শিল্পী যথাসম্ভব বত্ন সহকারে বৃদ্ধকে ঘরে বসালেন। ব ভদ্রলোকটি একেই পরম বৈষ্ণব, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখ চাওয়াই স্বাভাবিক। শিল্পী এক-এক করে নিজের আঁকা কৃষ্ ছবিগুলি দেখাতে লাগলেন। ছবিগুলি দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলো

মুলার্ডের বৈশিষ্ট্য
দামে আর গুণে
সত্যই,—রূপ, গুণ ও দামের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের জন্যই "মুলার্ড" রেডিওর এত আদর। এর ক্যাবিনেট্‌ও যেমন সুন্দর—আওয়াজও তেমনি নিখুঁত এবং দামও তেমনি স্তায্য। রেডিও কিনিবার বা বদলাইবার সময় একবারটি "মুলার্ড" দেখিয়া লইবেন।
এম্‌-ইউ-এস্‌—২৫৯৮: (MUS 2598): ৫-ভালভ্‌ ও ৪-ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত "মূলার্ডের"-র এই এসি-ডিসি সুপারহেট মডেলটি রেডিও জগতে খুবই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। নিখুঁত আওয়াজ এবং অতি সহজেই পৃথিবীর যে-কোনো ষ্টেশন ধরা যায় বলিয়াই ইহার বিশেষ খ্যাতি। মূল্য মাত্র ৫৫৫৲
এম্‌-বি-এস্‌—২৫৯৯: (MBS 2599): ড্রাই ব্যাটারী সেট্‌
গ্রাম অথবা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা (ইলেকট্রিসিটি) নেই এইরূপ সহরের পক্ষে "মূলার্ড" এর এই অল্‌-ওয়েভ ড্রাই ব্যাটারী সেট্"টি বিশেষ উপযোগী! ইহা ৪-ভাল্‌ভ্‌ ও ৩-ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত। সর্টওয়েভ ১৩.৫ হইতে ২৮ মিঃ ও ৩০ হইতে ৯০ মিঃ পর্য্যন্ত এবং মিডিয়াম ওয়েভে ১৮৭ হইতে ৫১৫ মিঃ পর্য্যন্ত।
মূল্য মাত্র ৪২৫৲
MFB-1
মুলার্ড
Mullard
—কিনে খুসীই হবেন!
পঃ বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার একমাত্র পরিবেশক :-
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্‌ লিঃ
৩নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা, ফোন-সিটি ৫২
পঃ বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র অনুমোদিত ডিলার আ
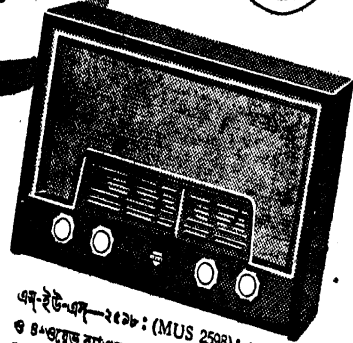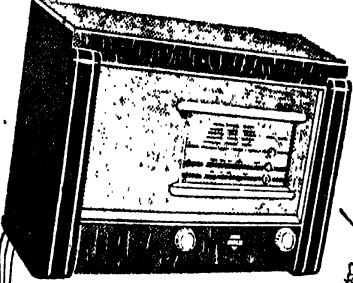
ঈষৎ হেসে বললেন: কি হে! এ সব কি এঁকেছো? এ যে সব কাঠখোট্টাই—সরু সরু হাত-পা, এ সব কি?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছবি দেখে চলে গেলেন—কিন্তু, কথা শুনে শিল্পীর তো নিরাশ হবার কথা, কিন্তু শিল্পী একটুও হতাশায় নিশ্বাস ফেললেন না; বরং পুনরায় পুরা দমে ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন।

কর্ম্মপথে নিরাশার ছোঁয়াচ লাগলেও ধৈর্য্য ধরে আশায় হাল ধরে থাকলে আশা আশাতীত আশায় পরিণত হয়। শিল্পী যুবকটির জীবনেও এ রকম ছোঁয়াচ লেগেছিল কিন্তু তা বলে তিনি ধৈর্য্য হারাননি।

এই শিল্পী যুবকটিকে জানো? এই শিল্পী যুবক বর্ত্তমানে যুবকের পদ থেকে বার্দ্ধক্যের পদ লাভ করেছেন; ইনি তোমাদের সবাইকারই পরিচিত শ্রদ্ধেয় আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ।

বসন্ত

শোভন সোম (শান্তিনিকেতন)

বসন্ত আসে, সাড়া পড়েছে নিকুঞ্জে
গুন-গুন অলিদল কুসুমেতে গুঞ্জে।
শিরশিরে দক্ষিণা হাওয়া মৃদুমন্দ
বয়ে আনে বনানীর পুষ্প-সুগন্ধ।
শিমুলের শাখা তাই আগুনেতে রাঙলো
চম্পক-শিরীষের বুঝি ঘুম ভাঙলো।
শাল-রেণু আলপনা আঁকে বনতলে গো
বন-ঝাউ হাওয়া লেগে উচ্ছ্বাসে দোলে গো।
দেখা দেয় মঞ্জরী আম্রের কুঞ্জে
আহ্বান করে ওরা ভ্রমরের পুঞ্জে।
কচি পাতা চার দিকে সবুজের হাট যে
সবুজের মখমলে ছেয়ে গেছে মাঠ যে।
ঝিরঝিরে নদী বয়, নির্ম্মল জল যে
অশোকের রাঙা কুঁড়ি মেলে দিলো দল যে।
আজ তাই দিশেহারা ধরার পরাণ তো
কোনো কাজে আজ ভাই হইনে কো ক্ষান্ত।
ভ্রমরেরা সারা দেহে ফুল-রেণু মাখছে
আনন্দে কুহু-কুহু কোকিলেরা ডাকছে।
রঙে-রসে জেগে ওঠে আজ যত জীর্ণ
জড়তার কুহেলিকা হ'য়ে উত্তীর্ণ।
আয় ভাই খোকা-খুকু দেখি এই দৃশ্য
বসন্তে নব-সাজে সাজলো রে বিশ্ব।

গল্প হলেও সত্যি

কৃষ্ণা বিশ্বাস

১৮৪৩ সাল, আশ্বিন মাস, স্থান মান্দ্রাজ।

প্রবাসী বাঙালী হিন্দুদের উদ্যোগে কয়েকটি পূজার আয়োজন হয়েছে। পূজার তিনটে দিন দেখতে দেখতে বিদায় নিল। সেদিন বিসর্জ্জন।

সমুদ্রের কাছেই একটি বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। বাইরে থেকে একটি ঘর। দেখা যায়, ঘরটি বিদেশী আসবাব-পত্র দ্বারা সুসজ্জিত। সন্ধ্যার সমাগমে ঘরটির মধ্যে একটি চেয়ারে বসে আছেন একটি যুবক, তাকিয়ে আছেন অন্তবিহীন মহাসমুদ্রের পানে। অস্ত-রবির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তৃত গগনের পরে, সমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গমালার উপরে সূর্য্যরশ্মি পড়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। দূরে—বহু দূরে দেখা যায়, নীলাকাশের বুক চিরে শ্বেত বলাকার দল পক্ষ বিস্তার করে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছে। যুবকটি তাকিয়ে আছেন সেদিক পানে। বয়স ২৪।২৫ হবে, সুন্দর বলিষ্ঠ তাঁর গঠন। দেখলে মনে হয় খৃষ্টান, মুখে চাপদাড়ী বিদেশী পোষাক পরিহিত। ঘরটির জানলার ঠিক নীচ দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে বাজছে আজ বিদায়-বেলার সুর। যুবকটির প্রাণে কোথায় যেন পুঞ্জীভূত মেঘের মত জমাট বেঁধে আছে ব্যথা? পলকহীন ভাবে চেয়ে আছেন আর সুন্দর চোখ দু'টি বেয়ে শরৎকালীন শিশিরবিন্দুর মত ঝরে পড়ছে এক এক বিন্দু অশ্রু। বাদক দল ও প্রতিমা এগিয়ে চলেছে করুণ রাগিণী ছড়িয়ে, তাদের অনুসরণ করে চলেছেন কত শত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এইবার যুবকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন জানলাটির ধারে, টপ-টপ করে ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রুজল, কাচের জানলা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে নীচে।

হয়তো এঁকে অনেকেই চিনতে পেরেছ? বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুরুদেব "শ্রীমধুসূদন দত্ত"। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, পোষাকও ছিল বিদেশী, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল বাংলার শিশুর মতই সরল ও কোমল। হিন্দু-মা'র হিন্দু-ছেলেই ছিলেন।

দুষ্টুরা

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুষ্ট হাওয়া ডাক দিয়েছে মাঠ বনে।
কানটি পেতে দুষ্টু ছেলে তাই শোনে।
ঘরে কি আর বাঁধনে তার মন থাকে।
দুপুর বেলা ছুট দিয়েছে ভাই-বোনে।

বনের কোণে দোদুল দোলে সাত চাপা।
বোন পারুলের স্নেহের ছোঁয়ায় মন কাঁপা।
গুঞ্জরিয়ে ভোমরা ফেরে নীল ছায়ে।
আলো-ছায়ায় সুরের মায়া নেই মাপা।

দুষ্টুরা যে কোথায় থাকে নেই জানা।
নীল গগনে বুঝি তাদের ঘরখানা।
নির্ঝর ঝরে পাষাণ 'পরে ঝরঝরি।
স্বপন-গাঙে চলছে তরী একটানা।

সব ঠাঁই এই ভুবন মাঝে তার বাসা।
মায়ের বুকে কাঁপছে সুখে তার আশা।
সব ঠাঁই তার সবার সাথেই ভাব করা।
খোকার চোখে পদ্ম ফোটায় তার হাসা।

গান্ধীজী সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী

অমূল্যরতন গুপ্ত

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমের কয়েক জন অধিবাসী নিয়ে বোম্বাই গেছেন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য। সকল কাজেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোছালো ও শৃঙ্খলা-পরায়ণ। এক দিন বাইরে বেরোবার সময় তিনি তাঁর টেবিলের উপর সব জিনিস-পত্র যত্নের সাজিয়ে রাখছেন। হঠাৎ মনে হল তিনি যেন কি খুঁজছেন। তাঁর এক সহকর্মী জিজ্ঞেস করলেন—"বাপুজী, আপনি কি খুঁজছেন ?"

তিনি বললেন, "আমার পেন্সিল—একটা ছোট পেন্সিল!"

সহকর্মীটি গান্ধীজীর সময় ও উদ্বেগ বাঁচাবার জন্য নিজের পকেট থেকে একটি পেন্সিল বের করে তাঁকে দিতে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজী কিছুতেই তা নেবেন না। তিনি বললেন, "না, না, আমি আমার নিজের পেন্সিলই চাই।" সহকর্মীটি পীড়াপীড়ি করে বললেন, "এখন এইটে দিয়ে কাজ চালান। আমি আপনার ছোট্ট পেন্সিলটা পরে খুঁজে বের করে এখানে রেখে দেব। এখন অনর্থক আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে।"

তখন গান্ধীজী বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না। ছোট পেন্সিলটি হারানো চলবে না। তুমি ত জান না, মাদ্রাজে নটেসনের ছোট্ট ছেলেটি আমাকে ওটা দিয়েছিল। সে কত ভালবেসে পেন্সিলটা আমার জন্য এনেছিল, সেটা হারিয়ে যাওয়া আমি সহ্য করতে পারছি না।"

শিশুর প্রতি কি মমতা! কি দরদ ও স্নেহভরা অন্তর! সহকর্মীটি গান্ধীজীর কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। তখন দু'জনে মিলে খুব করে খুঁজে পেন্সিলটি পেলেন। গান্ধীজীর কী আনন্দ! ছোট পেন্সিল—দৈর্ঘ্যে বোধ হয় দু'ইঞ্চিও হবে না। কিন্তু একটি শিশু ভালবেসে তাঁকে দিয়েছে; তাই গান্ধীজীর কাছে এর এত মূল্য!

* * * *

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে প্রথম কারাবরণ করেন ১৯২২ সালে। তাঁকে য়েরোড়া জেলে রাখা হয়। গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কত প্রিয় জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তা জানতেন; তাই তিনি গান্ধীজীর সেবার জন্য এক জন বিদেশী বন্দীকে নিযুক্ত করলেন। এই বন্দীটি ছিল কাফ্রী; সে কোনও ভারতীয় ভাষা জানত না। ইংরেজ কারারক্ষী মনে করলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু গান্ধীজী এই কাফ্রীর উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাকে বিগড়াতে পারবেন না। কাফ্রীটি সামান্য কয়েকটি হিন্দুস্থানী শব্দ জানত; তারই সাহায্যে এবং প্রধানতঃ আকারে-ইঙ্গিতে মহাত্মাজী তার সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতেন। শ্বেতকায় কারারক্ষী নিশ্চিন্ত হলেন; মহাত্মার যাদু কখনই কাফ্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না—সে কিছুতেই গান্ধীজীর কাছে তার হৃদয় বিকিয়ে দেবে না।

কিন্তু কারারক্ষী হিসাবে ভুল করলেন। মানুষের হৃদয় সর্বত্রই এক। গান্ধীজী তাঁর প্রেমমন্ত্রে কাফ্রী ভৃত্যের হৃদয় জয় করে নিলেন। এক দিন একটা কাঁকড়া বিছা কাফ্রীর হাত কামড়ে দিল। বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় অস্থির হয়ে কাফ্রীটি চীৎকার করতে করতে গান্ধীজীর কাছে এল ও তার হাতখানা তাঁর সামনে মেলে ধরল। কাফ্রীর যন্ত্রণা দেখে গান্ধীজীর হৃদয় বেদনা ও করুণায় পূর্ণ হল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আরাম দেবার উপায় স্থির করে ফেললেন। একটুও সময় নষ্ট না করে তিনি পরিষ্কার জলে কাফ্রীর হাতের ক্ষতস্থানটি ধুয়ে-মুছে দিলেন এবং নিজের মুখ লাগিয়ে ক্ষত থেকে বিষ চুষে বের করতে লাগলেন। এমন জোরে তিনি চুষলেন যে, বিষের অধিকাংশই বেরিয়ে এল এবং কাফ্রী বেচারা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। তার পরে গান্ধীজী অন্য কয়েক রকম চিকিৎসা করে কাফ্রীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করলেন।

বেচারা কাফ্রী তার সারা জীবনে কারও কাছ থেকে এত ভালবাসা ও দরদ পায়নি। সে গান্ধীজীর কেনা গোলাম হয়ে রইল। গান্ধীজীর ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিত তার কাছে বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় হল। অক্লান্ত উৎসাহ ও শ্রদ্ধা সহকারে সে গান্ধীজীর সেবা করে চলল। গান্ধীজীকে খুশী করবার জন্য সে তকলীতে সূতা কাটা শিখল, এবং পরে চরকাতেও সূতা কাটা অভ্যাস করল। তার আত্মপ্রত্যয় ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। জেলে মহাত্মাজীর সূতা কাটার সব আয়োজন সে-ই করে দিত।

ইংরেজ কারারক্ষী মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন; কিন্তু প্রতিকারেরও কোন উপায় খুঁজে পেলেন না।

লুসি গ্রে

শ্রীঅরুণকুমার সিংহ

(কবি Wordsworth এর ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে)

লুসি গ্রের কথা শুনিতেন প্রায়, দেখিতেন তারে কবি—
জলা-ভূমি যবে হইতেন পার প্রভাতে উদিলে রবি।
ছিল না লুসির খেলার সাথী, ছিল নাক' সহচরী,
লোকালয়ে কবি দেখে নাই কভু তার মত সুন্দরী।
হরিণ-শাবক ও শশক খেলিছে লুসি গ্রে খেলিত যেথা,
সবই ঠিক আছে, শুধু সে বালিকা আজি নাহি আর সেথা।
এক দিন পিতা বলিলেন, "লুসি! লণ্ঠন লয়ে সাথে—
যাও তো নগরে মাতারে আনিতে, ঝড় যে আসিবে রাতে।"
লুসি বলে, "পিতা, হাসিমুখে আমি পালিব আপন কাজ,
সবে দু'টো বাজে, দেরী আছে বেশ, হইতে ঝড় ও সাঁঝ।
শুনি পিতা তার খুশী মনে বসি নিজ কাজে দেয় মন,
কাটিতে লাগিল জ্বালানি কাঠের আঁটিরই বন্ধন।
লুসি খুশী-মনে চলে নিজ কাজে লণ্ঠন লয়ে সাথে,
প্রতি পদে পদে উড়ে যায় ধোঁয়া তুষারের রাশি হতে।
তুষারের ধোঁয়া উড়ি-চলে যেথা লুসি চলে পথে তার,
হরিণী হইতে সদা খুশী ভরা বদন সে বালিকার।
ঝড় এসে গেল, আলোক নিবিল, বালিকা হারাল পথ;
নগরের দেখা পেল নাক' লুসি, ব্যর্থ সে মনোরথ।
এদিকে ঘরেতে ফিরিয়াছে মাতা, ফেরে নাই মেয়ে তাঁর।
পিতা-মাতা তার 'লুসি লুসি!' বলে চিৎকারি বার বার—

প্রান্তর-মাঝে আসিয়া সেখানে নাহি পেয়ে তার সাড়া—
কাঁদিতে কাঁদিতে সেদিন রাতেতে গৃহে ফিরিলেন তাঁরা।
পরদিন প্রাতে পাহাড় হইতে দেখিয়া সে প্রান্তর;
দৃষ্টি তাঁদের পড়িল তখন কাষ্ঠ-সেতুর' পর।
কাঁদি বলে তাঁরা, "স্বরগে যাইয়া মিলিব তাহার সাথে।"
পায়ের চিহ্ন দেখিলেন মাতা, ফিরিবার পথে যেতে।
পর্ব্বত-পাশে কণ্টক বেড়া, প্রাচীরের পাশ দিয়া,
পার হন তাঁরা হেরি সে চিহ্ন, হৃদে নব আশা নিয়া।
চিহ্ন ধরিয়া হইলেন পার উন্মুক্ত সে প্রান্তর,
লুসি সন্ধানে আসিলেন তাঁরা কাষ্ঠ-সেতুরোপর।
বরফাবৃত নদী-তীর দিয়া সেতুর মধ্যে আসি—
চিহ্ন না হেরি বুঝিলেন তাঁরা স্বরগে গিয়াছে লুসি।
তথাপি বহু জনের ধারণা সে লুসি যায়নি মরে,
এখনও তাহাকে দেখিবে সেথায় জনহীন প্রান্তরে।
এখনও সেথানে ছুটিয়া বেড়ায়, গান গায় নিজ মনে;
বাতাসে সে গান শিষ-ধ্বনি মত আসিয়া বাজিবে কানে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছিলে যোগ-সাধনায় লীন,
লোক-লোচনের একান্তে সমাহিত।
মহাভারতের শাশ্বত বাণীরূপে ছিলে সমাসীন
দিব্য জ্যোতিতে নিখিল উদ্ভাসিত।

যুগ যুগ ধরি বন্দী মানুষ কাঁদিছে অন্ধকূপে
বক্ষে সবার নিদারুণ ব্যথা বাজে।
দেশের মুক্তি দেখা দিল তাই মানব-মুক্তিরূপে
ভাবোন্মত্ত কর্ম্মযোগীর মাঝে।

নিত্যমুক্ত আত্মার বলে বলীয়ান্ হোল যারা
বরেণ্য তারা দুনিয়ার বিস্ময়।
ধীর সাধনায় অসম্ভবেও সম্ভব করে তারা—
টলাইতে পারে সুউচ্চ হিমালয়।

ইচ্ছাশক্তি রক্ষাকবচ আছিল অঙ্গ ছেয়ে
অন্তরে ছিল অনন্ত বিশ্বাস।
কোন্ সে অমৃত লভিতে মানুষ নানা দেশ থেকে ধেয়ে
আলোকতীর্থে আসে-যায় বারো মাস।

উদাত্ত সুরে তোমার কণ্ঠে শুনিতে একটি বাণী
আজের জগৎ কান পেতে ছিল সদা।
খ্যাতি-নিন্দার ঊর্দ্ধে তোমার পুণ্য আসনখানি
ভাবের রাজ্যে পাতা ছিল সর্ব্বদা।

তোমারে দেখিয়া আশা ছিল প্রাণে অচিরে পুনর্ব্বার
পশিবে ধরাতে প্রেমের অরুণালোক।
জ্যোতির্ম্ময়ের দ্বারে যেতে তাই প্রার্থনা সবাকার—
তোমার সাধনা, জয় হোক জয় হোক।

কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো বিভাস। এই ক'দিনের মধ্যে দেবব্রত দু'বেলা ওদের খোঁজ নিয়েছে। বিভাস আর মলয়াকে নিয়ে নিজের গাড়ীতে করে বেড়াতে গেছে। অসুস্থতার অজুহাতে কখনো কখনো বিভাস যখন বাড়ীর বাইরে যেতে অসমত হয়েছে, তখন সে মলয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে দেবব্রতের সঙ্গে। লেক, মেমোরিয়াল, সিনেমা, মিউজিয়াম ঘুরে দিনগুলো ওদের কাটছিলো মন্দ নয়।

এ ক'দিনে বিভাস আর দেবব্রতর বন্ধুত্বও বেশ জমে উঠেছে। 'আপনি' কখন যে নেমে এসেছে 'তুমি'র পর্য্যায়ে, সে-কথা তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি। মলয়াও আর দেবদা'র কাছ থেকে 'মলয়া দেবী', 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুনতে রাজী নয়। দাদার বন্ধু, তাদের বিপদের দিনের একমাত্র সহায়, তার ওপর দেবব্রত বয়সেও তার চেয়ে বড়ো—মলয়া তার কাছ থেকে নিজের নাম ধরে ডাকই শুনতে চায়। কিন্তু শুধু কি ওই কারণেই? দেবব্রত আর মলয়ার মনের কোণে কি একটুও রঙ লাগেনি? অতনুর ফুলশর কি বিদ্ধ করেনি ওদের অন্তরকে? তবে কেন মলয়ার দেবব্রতের আসার আশায় এমন উন্মুখ প্রতীক্ষা? দেবব্রতের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেন এমন খুশীর আমেজে মধুর? মলয়া আর দেবব্রত কিন্তু নিজেরাও বুঝতে পারে না নিজেদের মন। কিংবা হয়তো নিজেদের মনের অবচেতন কোণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে নিজেরাই সাহস করে না। হয়তো তারা নিজেদের মনের পলায়নী বৃত্তির জন্তেই বিশ্লেষণ করতে চায় না নিজেদের কাছে—ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে ব্যবধান কতটুকু।

মলয়া আর দেবব্রতর পরিবর্ত্তনটা এত আকস্মিক যে, বিভাসের কাছে সেটা ধরা পড়তে দেরী হয়নি একটুও। সারা জীবন দারিদ্র্যে আর দুঃখের নিপীড়নে বড়ো হয়ে উঠে মলয়া গড়ে উঠেছিলো ধীর স্থির শান্ত সমুদ্রের মতো। আজ সে হয়ে উঠেছে একান্ত লীলাচঞ্চল, হাস্যমুখর—দুরন্ত বন্যায় অস্থির, উপচে-ওঠা নদীর মতো। দেবব্রতও ঠিক সেই আগেকার দেবব্রত নয়—কথায় কথায় কারণে-অকারণে খুশীতে উপচে ওঠে সে, হাসিতে ভেঙে পড়ে অকারণেই। স্বল্পভাষী দেবব্রত আজ মুখর হয়ে উঠেছে কোন্ অজ্ঞাত রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে। বিভাস ভাবে—মলয়া আর দেবব্রতর দু'হাত এক করে দিতে পারলে মন্দ হয় না! গোবিন্দর মতও তাই। বিভাসের কাছে সে কথাটা সোজাসুজি বলেই ফেলে এক দিন মলয়া আর দেবব্রতর অসাক্ষাতে।

এই ক'দিনের মধ্যে চিরঞ্জীব কিন্তু এসেছিলেন কয়েক বার। এটর্ণী নিখিল দত্ত না হয় বিভাসের সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেবার জন্তে অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু চিরঞ্জীব আত্মীয় হয়ে অসুস্থ বিভাসের খোঁজ না নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন কি করে? ডাঃ সেনের বারণ থাকলেও বিভাস বা মলয়া তাঁর সঙ্গে দেখা না করে পারেনি কতকটা চক্ষুলজ্জার খাতিরে, আর কতকটা তাঁর উদ্বেগ দেখে। জন্মাবধি যারা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত, আজ তারা এক জন সত্যিকার হিতৈষী আত্মীয়ের ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা করবে কি করে?

বিভাসকে সুস্থ হতে দেখে চিরঞ্জীব এক দিন বিভাস, মলয়া আর দেবব্রতকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। বিভাস আর দেবব্রত সানন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। লোকটা সত্যিই ভারী উদার-হৃদয় আর অমায়িক।......

সম্মোহন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী)

হৃষীকেশ হালদার

মুস্কিল হয়েছিলো কিন্তু এক জায়গায়। বিভাসের মামার অমন বীভৎস ভাবে মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র চাকরটি কোথায় পালিয়েছিলো, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সকলেরই, এমন কি পুলিশের পর্য্যন্ত সন্দেহ যে, চাকরটাই টাকাকড়ির লোভে খুন করেছে তার মনিবকে। তার পর হাতের সামনে নগদ যা-কিছু পেয়েছে, সব নিয়ে সরে পড়েছে। অথচ সে ছিলো মামার বহু পুরানো বিশ্বস্ত ভৃত্য।

মামার খুন হবার পর বিভাসের ওপর আবার আক্রমণের খবরটা কেমন করে চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বোধ হয় গোবিন্দই সে-কথা গল্প করে বেড়িয়েছে সকলের কাছে। যা পেট-আলগা মানুষ, ওর পক্ষে আশ্চর্য্যের নয় কিছুই! যে বাড়ীতে একটা খুন আর একটা খুনের চেষ্টা হয়, সেখানে চাকর-বাকর জোটানো সহজ নয়। জীবন-রক্ষার তাগিদেই মানুষ চাকরী করতে আসে, জীবন দেবার জন্তে নয়। পয়সার লোভে কে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ও-বাড়ীতে থাকতে চাইবে? দেবব্রতর বাড়ীর কাজ সেরে গোবিন্দই বিভাসদের অনেক কাজ করে দেয়।

সেদিন দেবব্রতর সঙ্গে গিয়ে বিভাস আর মলয়া একখানা মস্ত গাড়ী কিনে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফেরার সময় বিভাসের ফটকের ধারে তাদের লক্ষ্য পড়লো এক জন বৃদ্ধ লোকের ওপর। বড়-বড় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল আর মস্ত পাকা দাড়ী—গায়ে শতছিন্ন একটা ফতুয়া আর তালি-দেওয়া ময়লা কাপড় তার পরিধানে। ধূলি-মলিন পায়ের পাতায় বিশ্রী রকমের ফাটু ধরেছে। লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে বিভাসের বাগান-বাড়ীর দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে কি বকছে! বিভাসের গাড়ীখানা আর একটু হলেই লোকটাকে একেবারে চাপা দিতো। নিতান্ত গাড়ীখানা ভালো বলেই দেবব্রত ব্রেক কষে থামাতে পারলো তাকে।

গাড়ী থেকে নেমে ঝাঁঝিয়ে উঠলো দেবব্রত: কালা না কি হে বাপু! এত হর্ণ দিচ্ছি, যেন খেয়ালই নেই। কি দেখা হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? কিছু চুরি-টুরির মতলব আছে না কি?

লোকটা এবার ফিরে চায় দেবব্রতর দিকে। চোখে তার জল। বলে: দু'দিন কিছু খাইনি, দু'টি খেতে দেবে বাবু? কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

দেবব্রত হয়তো তাকে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যানই করতো, কিন্তু মলয়া তাড়াতাড়ি বললো: ওকে ভেতরে নিয়ে চলো দেবদা'। বেচারা বুড়ো মানুষ, এক দিন এক মুঠো খেলে আমাদের কিছু কমে যাবে না।

অগত্যা বিভাসও রাজী হয় মলয়ার কথায়। বৃদ্ধ ওদের পেছন-পেছন বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে। মলয়া ওকে খেতে দিতে দিতে বলে: এমন করে ভিক্ষে করে বেড়াও কেন? কেউ আপনার লোক নেই তোমার?

—কেউ নেই মা, কেউ নেই। বৃদ্ধ কাতর কণ্ঠে বলে: ওতোরপাড়ার এক বাবুদের বাগান-বাড়ীতে মালীর কাজ করছিলুম

পঁচিশ বছর ধরে। বাবুদের এখন পড়তি দশা, তাই জবাব দিয়ে দিলে। যাই কোথায়? ভাবলুম বেহালায় তো অনেক বড় লোকের বাগানবাড়ী আছে, যদি কেউ চাকরী দেয়। কিন্তু সেই কথায় বলে না—অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়—আমার হয়েছে তাই মা, তাই। কোথাও চাকরী তো জুটলোই না, তার ওপর দু'দিন ওপোস। আপনাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, যদি কাউকে ধরে-করে এ বাড়ীতে একটা চাকরী পাই। ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি মা, গাড়ীর হরেন শুনতে পাইনি। দেবেন মা একটা মালীর কাজ?

প্রস্তাবটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। লোকটা বুড়ো হলেও মালীর কাজ জানে যখন, অন্ততঃ বাগানটার একটু যত্ন নিতে পারবে। এ বাড়ীতে লোক-জন থাকতেই চায় না, অন্ততঃ একটা লোকের মুখও তো দেখা যাবে। মলয়া আর বিভাস রাজী হয়ে গেলো তখনি।

চিরঞ্জীব ওদের নিতে এসেছেন। আজই তাঁর বাড়ীতে বিভাস, মলয়া আর দেবব্রতের নিমন্ত্রণ। মলয়ার সাজ তখনো শেষ হয়নি, সে গুন-গুন করে নিজের মনে কি একটা গান গাইতে গাইতে আরসীর সামনে প্রসাধন করে চলেছে, বিভাস বাইরের ঘরে বসে দেবব্রতর সঙ্গে গল্প করছে। ঠিক এমনি সময় চিরঞ্জীব প্রবেশ করলেন বাগান-বাড়ীতে। সামনের পথটা অতিক্রম করতে করতে তাঁর চোখ পড়লো একটা বৃদ্ধ লোকের ওপর। ঝারি হাতে সে গাছের গোড়ায় জল সেচন করছে। চিরঞ্জীব এর আগে মালীটিকে দেখেননি, তিনি তার কথা জানতেনও না। এ-বাড়ীতে নতুন একটা লোক দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তার দিকে। তার পর তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন: তুমি কে হে বাপু?

চিরঞ্জীবের গলা পেয়েই চমকে উঠলো মালী। মাথা নীচু করে সে জল দিচ্ছিলো গাছের গোড়ায়, চিরঞ্জীবের কণ্ঠ শুনেই সে একবার মুহূর্তের জন্যে মুখ তুলে চেয়েই তখনি মাথা নীচু করে নিয়ে ধীর স্বরে বললে: আমি এই বাগানের নতুন মালী বাবু!

—হুঁ! চিরঞ্জীব কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মালীর দিকে, তার পর বললেন: তা এ-বাড়ীতে চাকরী করতে ঢুকলে কোন্ ভরসায়? এখানে একটা খুন হয়ে গেছে, আর এক জনকে এই সেদিন খুন করবার চেষ্টা হয়েছে, জানো কি?

—কৈ, না তো! নির্বোধের মতো নিরীহ কণ্ঠে মালী বলে: আমি ওতোরপাড়ায় চাকরী করতুম কি না, এখানকার কোন খবর জানি না।

—এখন তো জানলে। চিরঞ্জীব বললেন: কি করবে ঠিক করেছো? চাকরী করবে, না ছাড়বে?

—চাকরী না করলে পেট চলবে কেমন করে হুজুর! মালী অন্য একটা দূরের গাছের দিকে চলে যেতে-যেতে বলে: না খেয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে না হয় খুন হয়েই মরতে হবে। বুড়ো হয়েছি, মরণ তো এখন শিয়রে দাঁড়িয়ে।

চিরঞ্জীব কোন উত্তর না দিয়ে এবার সোজা গিয়ে প্রবেশ করলেন বাড়ীর ভেতর। বিভাস আর দেবব্রত তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা

—আসুন, আসুন, আমরা তৈরী। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—বললো বিভাস।

—মলয়া মাকে দেখছি না যে? বাড়ীর ভেতরে বুঝি? প্রশ্ন করলেন চিরঞ্জীব।

—তার সাজগোজ এখনো হয়তো শেষ হয়নি। বিভাস বলে: মেয়েদের বেশবাসের ব্যাপার জানেনই তো!···

—তা আর জানবার সুযোগ পেলুম কৈ! চিরঞ্জীব সহাস্যে বলেন: মেয়েদের চিরকালই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলেছি, বিয়ে-থাও করিনি। কাজেই ও-ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি। তার চেয়ে রেসের ঘোড়ার খবর তোমাদের বেশী বলতে পারি।

—আপনি আবার রেসও খেলেন না কি? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে দেবব্রত।

—প্রত্যেক মানুষেরই এক-একটা 'হবি' থাকে তো! চিরঞ্জীব বললেন: যেতে দাও ও-সব কথা। এখন মলয়া মায়ের কত দেরী খবর নাও। চিরঞ্জীবের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে প্রবেশ করলো মলয়া। বললো: এই যে মামা, আমি রেডী! এখন সকলে অনায়াসে গাত্রোত্থান করতে পারেন।

চিরঞ্জীব আর বিভাস আগেই বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। পিছনে তাদের মলয়া আর দেবব্রত, সকলের অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরে দেবব্রত মলয়াকে চুপি-চুপি বললো: তোমাকে আজ কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মলয়া!

—যোৎ, আপনি দিন-দিন ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছেন দেবদা'! উত্তর দিলে মলয়া।

পথে যেতে-যেতে গাড়ীর মধ্যে টুকরো-টুকরো আলাপ-আলোচনা চলে ওদের।

চিরঞ্জীব বলেন: আমার বাড়ী দেখে তোমরা যেন অবাক হয়ে যেয়ো না কেউ! আগে থাকতেই বলে রাখছি, আমার বাড়ীটা একটা মিউজিয়াম-বিশেষ। নানা রকমের অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পাবে সেখানে, ওই সব প্রাচীন আর অদ্ভুত জিনিষপত্র সংগ্রহ করা আমার কেমন একটা নেশা। পৃথিবীর অনেক কোটিপতি ডাক-টিকিট সংগ্রহ করে, কেউ সংগ্রহ করে পুরোনো টাকা-পয়সা, আমি সংগ্রহ করি নানা রকম বিচিত্র জীব-জন্তুর অস্থি আর মৃতদেহ, পুরোনো অস্ত্র-শস্ত্র আর গাছ-গাছড়া। গোটা বাড়ীটা এই সব জিনিষেই ভরে আছে, ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ করবার উপযুক্ত পরিবেশ নেই কোথাও। নেহাৎ তোমরা আপনার লোক বলেই······

সত্যি তাঁর বাড়ীটা বিচিত্র যাদুঘরই বটে! বাড়ীময় এখানে-ওখানে নানা রকম ভাঙা মূর্ত্তি, শুকনো গাছ-গাছড়া, মৃত কুমীর আর পাখীর দেহ টাঙানো আর ছড়ানো। বাড়ীতে পৌঁছতে যে চাকরটা তাদের দরজা খুলে দিলে, সেও কালা আর বোবা।

চিরঞ্জীব বললেন—অনবরত বকবক করে চাকরে তাঁর মাথা খারাপ করবে, প্রত্যেক কথায় প্রতিবাদ তুলবে, এ তিনি চান না। তাই বোবা আর কালা লোকটাকেই তিনি চাকর নিযুক্ত করেছেন।

অতঃপর চিরঞ্জীব তাদের নিয়ে ওপরে তাঁর শয়ন-ঘরে গল্প করতে [illegible]। সে ঘরখানাও নানা ধরণের পুরোনো অস্ত্র-শস্ত্রে ভরা।

দেওয়ালে হরিণের সিং, ঢাল আর তরোয়াল, ছোট-বড় ছুরীর মেলা। চিরঞ্জীব বললেন: এতে প্রায় হাজার বছর আগেকার অস্ত্রের কালেকসানও আছে, কিন্তু কোনটাই দু'শো বছরের কম সময়ের নয়।

ঘরের আবহাওয়ায় বিভাস, দেবব্রত আর মলয়া কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলো। কাজেই বিশেষ কোন কথা তারা কেউই বললো না। চাকরটা ইতিমধ্যে নিঃশব্দে এসে চার কাপ চা আর কিছু জলখাবার রেখে গিয়েছিলো। সকলে চুপচাপ সেই দিকেই মনোনিবেশ করলো।

চা পান করতে করতে হঠাৎ কি রকম একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি জেগে উঠলো মলয়ার। ঠক্ করে চায়ের কাপটা সজোরে ঠুকে বসিয়ে দিলে সে টেবিলের ওপর। তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। চোখে তার উন্মাদের মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি! হঠাৎ তার এই পরিবর্ত্তনে বিভাস আর দেবব্রত অবাক হয়ে চাইলো তার দিকে। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই সে ক্ষিপ্র হাতে দেওয়াল থেকে একখানা ছোরা টেনে নিয়ে বসিয়ে দিতে গেলো বিভাসের বুকে। যদি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেবব্রত তার মণিবন্ধ চেপে না ধরতো, যদি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হতো দেবব্রতর, তাহ'লে বিভাসের প্রাণহীন দেহ তখনি লুটিয়ে পড়তো সেইখানেই। দেবব্রত সজোরে মলয়ার হাতের কব্জি চেপে ধরতেই ছোরাখানা পড়ে গেলো মেঝের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মলয়া জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো দেবব্রতর বুকের ওপর।

বিভাস লক্ষ্য করলো, চিরঞ্জীব তখনো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছেন মলয়ার দিকে। হয়তো অবাক হয়ে গেছেন ভদ্রলোক মলয়ার এই আকস্মিক আচরণে। বিভাস নিজে বা দেবব্রতও কম অবাক হয়নি আজকের এই অদ্ভুত ব্যাপারে। পৃথিবীতে মলয়ার একমাত্র আপনার, নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইকেই গেলো সে খুন করতে। অথচ বিভাসের এতটুকু অসুবিধা, এতটুকু কষ্টও মলয়া সইতে পারে না কোন দিন! মলয়ার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেলো? কিন্তু এই একটু আগেও তো সে সহজ ভাবেই হেসে-হেসে কথা কইছিলো সবার সঙ্গে।

নিমন্ত্রণটা যেন তিক্ত হয়ে উঠলো এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই। বিভাস বললো: মলয়া দেখছি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ওকে কি এই অবস্থায়ই বাড়ী নিয়ে যাওয়া চলে না দেবব্রত? না, ওর জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

দেবব্রত বলে: ওকে এখান থেকে এখনি সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো। জ্ঞান হবার পর নিজের ঘরে নিজেকে দেখতে পেলে হয়তো উন্মত্ত ভাবটা কেটে যেতে পারে।

সকলেরই মনঃপূত হলো কথাটা। অগত্যা তখনি মলয়াকে তুলে নিয়ে বিভাস আর দেবব্রত মোটরে ষ্টার্ট দিল। তাদের বিদায় দিতে দিতে চিরঞ্জীব গভীর দুঃখের স্বরে বললেন: তাই তো, হঠাৎ কি যে হলো মলয়া মা'র! পাগল হয়ে গেলো না কি!

বিভাসও গভীর দুঃখের সঙ্গে বলে: তাইতো দেখছি!

গাড়ীর মধ্যে মলয়ার জ্ঞান তো ফিরে এলোই না, এমন কি বাড়ীতে এসেও নয়। অগত্যা দেবব্রত ছুটলো ডাঃ সেনের বাড়ী, আর বিভাস বসে রইলো মলয়ার পাশে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলো দেবব্রত। ডাঃ সেন রীতিমত ধমক দিতে-দিতে ঢুকলেন: কত বার বলেছি যার-তার সঙ্গে তোমরা মিশো না বাপু, যেখানে-সেখানে যেও না। উত্তেজনা সইবে না শরীরে। কথা তো শুনবে না! যত্তো সব ছেলেমানুষের দল।

দেবব্রত সবিনয়ে বলে: আজ্ঞে, সে তো বলেছিলেন বিভাসকে তার শরীর অসুস্থ থাকার জন্যে। কিন্তু এ যে সুস্থ সবল মেয়েটা······। কি যে হলো!

ডাক্তার নাড়ী দেখতে দেখতে বললেন:—যা হলো, তা বিলক্ষণ! ওই চিরঞ্জীবটাই তোমাদের মাথা খাবে!

এইবার ডাক্তারের কথায় বাধা দেয় বিভাস। বলে: কি যে বলেন! অমন এক জন সদাশয় ভদ্রলোক, তার ওপর আমাদের আত্মীয়! কি এমন অপরাধ করেছেন তিনি যে তাঁর সঙ্গে মিশবো না? বরাবরই লক্ষ্য করেছি, চিরঞ্জীব মামার সম্বন্ধে আপনি বেশ কিছুটা অসহিষ্ণু। অথচ কি যে কারণ, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আজ পর্য্যন্ত। কেন, কেন আমরা এড়িয়ে চলবো তাঁকে?

—কেন? ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কেন, তাই যদি বলতে পারতাম!······পর-মুহূর্ত্তেই কঠিন হয়ে উঠলো তাঁর স্বর: দরজা বন্ধ করে দিয়ে তোমরা বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। যাও শীগ্‌গির···!

বিভাস অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ডাক্তারের মুখের দিকে। কিন্তু দেবব্রত বিভাসের হাত ধরে টেনে আনলো ঘরের বাইরে, তার পর দরজাটা ভেজিয়ে দিলে নিজেই। নিজে সে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরই ছাত্র। কাজেই সে বেশ বুঝতে পেরেছিলো, তাদের উপস্থিতিতে হয়তো ডাক্তার সেনের একাগ্র অভিনিবেশের ব্যাঘাত ঘটছে। এ ভাবে ডাক্তারের কথা অমান্য করলে আর যা-ই হোক, রোগীর চিকিৎসা, করানো চলে না।

দরজা বন্ধ হতেই ডাক্তার নিজে উঠে গিয়ে খিল বন্ধ করে দিলেন। ঘরের মধ্যে শুধু মলয়া আর ডাক্তার। বিছানায় বসে মলয়ার দিকে মুখ করে অপলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর গম্ভীর স্বরে অথচ দরদপূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন: ওঠো, মা, ওঠো। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসো। ভুলে যাও কিছুক্ষণ আগেকার দুর্ঘটনার কথা। ভুলে যাও তুমি তোমার ভাইকে খুন করতে গেছলে। ভুলে যাও সব। উঠে বসো। ওঠো, ওঠো, ওঠো···

শেষের দিকে তাঁর স্বর ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। কপালে দেখা দিলো তাঁর অল্প-অল্প ঘাম, চোখ-মুখ ভরে উঠলো অপরিসীম মানসিক সংগ্রামের ক্লান্তিতে।

সহসা স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে বসলো মলয়া। ডাক্তারকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে বললো—এ কি? ডাক্তার বাবু? কি হয়েছে আমার?

—কিছু না মা। ডাক্তার ক্লান্ত স্বরে বললেন: নেমন্তন্ন গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, এখন তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ। নিজের বাড়ীতেই আছো তুমি।

—কিন্তু দরজায় খিল কেন? দাদা কোথায়? উদ্বেগ-ভরে প্রশ্ন করে মলয়া।

—দাদা তোমার ঘরের বাইরেই অপেক্ষা করছেন। তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনি। তোমার চিকিৎসার প্রয়োজনেই ঘরের দরজা বন্ধ করতে হয়েছিলো। ডাক্তার উঠে গমনোদ্যত হলেন।

মলয়াও উঠতে গেলো। ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন: এখন উঠো না মা। তোমার অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার। আমিই তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে মহা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলো বিভাস আর দেবব্রত। ডাক্তার বেরিয়ে আসতেই তারা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো তাঁর দিকে। ডাক্তার হেসে বললেন: আর ভয় নেই কিছু। মলয়া মা আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন তার দরকার কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম আর একটু গরম দুধ। যাও—সে তোমার জন্তে অপেক্ষা করছে।

বিভাস কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললে: আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দোবো ডাক্তার সেন! এই সামান্ত ক'টা টাকা আপনার ফিস······

—টাকা! ধমকে উঠলেন ডাক্তার: রোগীর চিকিৎসা করেই আমি টাকা নিই, লোক ঠকিয়ে নয়।

—কি বলছেন আপনি? মলয়াকে এখনি আপনি যে সুস্থ করে তুলেছেন বললেন, সে কি চিকিৎসা নয়? বিস্মিত ভাবে বললো বিভাস।

—চিকিৎসা! একটা রহস্তময় হাসিতে ভরে উঠলো ডাক্তারের মুখ: তা চিকিৎসা বলতে পারো, তবে সেটা ডাক্তারী শাস্ত্র মতে নয়। আচ্ছা, যাও। মলয়া মা হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বিভাস ফেরবার উদ্যোগ করলো। ডাক্তার হঠাৎ আবার তাকে ডাকলেন: শোনো, শোনো।

ফিরে দাঁড়ালো বিভাস। ডাক্তার বললেন: দেখো, মলয়া যে তোমাকে খুন করতে গিয়েছিলো, এ কথা খবরদার তাকে বলো না। সে উন্মাদ অবস্থার কথা মলয়া নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। আবার যদি তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দাও, তবে তার সারা জীবনটা অনুশোচনা আর ব্যথায় ভরে উঠবে। সমস্ত জীবনটাই অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরবে সে। তাকে কোন কথা জানিও না। আর মলয়া মাকে কোন দিন চিরঞ্জীবের সামনে যেতে দিও না। পারো তো নিজেরাও তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে।

ডাক্তার বিদায় নিলেন। বিভাস গেলো মলয়ার ঘরের দিকে, আর দেবব্রত চললো ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মোটর পর্য্যন্ত।

ডাক্তার যখন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন, ঠিক সেই সময় কৃতজ্ঞতা-ভরা কণ্ঠে বললে দেবব্রত: আপনি যে কত মহৎ ডাক্তার···।

মহৎ! হুঁ:······! কতকটা বেদনা-ভরা আর কতকটা ব্যঙ্গপূর্ণ স্বর ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে। চোখের জলটা গোপন করবার জন্তে ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বিকাশ ভাবলো: ডাক্তার সেন বোধ হয় আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হয়েছেন।

কয়েক দিন পরে।···রাত প্রায় এগারোটা।···সহরতলীর পথ-ঘাট সব একেবারে ডুবে গেছে অন্ধকারে। মাঝে-মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া দু'-একটা আলো যা জ্বলছে, তাতে অন্ধকার দূর করার বদলে এখানে-ওখানে-সেখানে পুঞ্জীভূত করে তুলেছে তাকে।

আবার দেখা গেল সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে। দূর থেকে সে ধীর-মন্থর গমনে এগিয়ে আসছে। দু'হাতের ছিন্ন শৃঙ্খল তার মাঝে-মাঝে শব্দ করছে ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্।

বিভাসের বাগানবাড়ীর সামনে এসে থামলো ছায়া-মূর্ত্তিটি। পাঁচীলের সামনে এসে এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে সে লাফ দিয়ে উঠলো প্রাচীরের ওপর।

বৈঠকখানা ঘর। মুখোমুখি বসে আছে দেবব্রত, বিভাস আর মলয়া। মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে গোবিন্দ।

ঢং-ঢং করে ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। বিভাস বললো: এবার তাহ'লে বিদায় নিতে হলো ভাই। রাত অনেক হলো।

—তা হোক! গোবিন্দ বললে: বাইস্কোপ দেখে এর থেকে কত বেশী রাত্তিরেও তো ফেরো দাদাবাবু! কিন্তু দিদিমণি যা খাওয়ালেন আজ, চমৎকার! এ রকম নেমন্তন্ন পেলে রোজ-রোজ আমি এর চেয়ে ঢের রাত্তির করে বাড়ী ফিরতে পারি।

—থাম্ হতভাগা পেটুক কোথাকার। হাসতে হাসতে বললে দেবব্রত: খাওয়া পেলে আর কিছু মনে থাকে না।

—তা তো বলবেই গো। গোবিন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: কত্তা-মা মারা গিয়ে অবধি এমন রান্না কখনো খেয়েছো? সত্যি করে বলো দেখি?

—তা, সত্যি কথা বলতে গেলে তোর কথা মানতেই হয়। দেবব্রত বলে: রান্না বলতে তো তোরই দেওয়া ছাই-পাঁশগুলো গিলতে হয় দু'বেলা।

এবার গোবিন্দর রাগ হয়। বলে: বেশ তো বাপু! মুখে না রুচলে কে খেতে বলে তোমার ছাইপাঁশ। এত করে বলছি, বিয়ে করে একটি টুকটুকে বউ ঘরে নিয়ে এসো, তা কথা তো শুনবে না।

—তোর ওই এক কথা! গোবিন্দকে ধমকে দিয়ে দেবব্রত মলয়ার দিকে চেয়ে বলে: ওই পাগলার বক্‌-বক্ শোনার চেয়ে ঢাকের বাদ্যি ঢের ভালো। তুমি বরং একখানা গান গেয়ে শোনাও মলয়া। আহার-পর্ব্বের পর মধুরেণ সমাপয়েৎ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

—অর্থাৎ আমার গান আর ঢাকের বাদ্যি একই বস্তু, কেমন? হাসতে হাসতে বলে মলয়া।

—সে-কথা আবার বললাম কখন?—বিস্ময়ের ভাণ করে দেবব্রত।

—এই যে বললেন, গোবিন্দর গানের চেয়ে ঢাকের বাদ্যিও ভালো—মলয়া বলে—সুতরাং তুমি বরং একখানা গান গেয়ে শোনাও মলয়া।······

—ওঃ, যুক্তিশাস্ত্রে তুমি এক জন মহাপণ্ডিত হয়ে উঠলে দেখছি। দেবব্রত গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

—ব্যাকরণ ভুল করবেন না দেবদা'। মেয়েরা পণ্ডিত হয় না হয় পণ্ডিতা নী! মলয়া দেবব্রতর ভুল সংশোধনের প্রয়াস পায়।

কিন্তু ওতেওও অপ্রতিভ হয় না দেবব্রত। সে বলে: আগে

কোন পণ্ডিত এসে তোমার পাণিগ্রহণ করুন, তবে তো পণ্ডিতনী হবে। তার আগে নয়।

—ধ্যেৎ! লজ্জায় অধোবদন হয়ে এই একটি শব্দই উচ্চারণ করে মলয়া।

বিভাস বলে: গা' না বাপু একখানা গান। অত তর্ক করে নিজের অমোর বাড়াস্ কেন?

অগত্যা মলয়াকে উঠে যেতে হয় অর্গানের কাছে। ধীরে-ধীরে গানের সুর যেন নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে মোহজাল বিস্তার করে।

গানের সুর ভেসে আসছে বাইরে। এক-এক বার ঘাড় কাত করে সেই সুর শোনবার প্রয়াস পাচ্ছে ছায়ামূর্ত্তিটি। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সে যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে। পাঁচীলের ছ'পাশে তার ছ'পা ঝোলানো! সোজা হয়ে বসে আছে সে।

গান শেষ হয়ে গেলো। ছায়ামূর্ত্তিটি ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়লো বাগানের ভেতর।

ঘরের মধ্যে থেকেই কোন কিছু একটা ভারী জিনিষ ঝপ্ করে পড়ার শব্দ পেলো সকলে। চমকে দাঁড়িয়ে উঠলো বিভাস আর দেবব্রত। মলয়া এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে।

মলয়া বললো: শব্দটা বাগানের দিক থেকেই এলো না?

গোবিন্দ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে ধরলো দেবব্রতকে: সেদিনের সেই ডাকাত নয় তো দাদাবাবু?

বিভাস আর দেবব্রত তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো খোলা জানলার ধারে। অন্ধকারে একটা আবছা ছায়ামূর্ত্তি ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে মালীর ঘরের দিকে। বিস্ময়-চকিত ভাবে ওরা ছ'জনে পরস্পরের দিকে চাইলে। তার পর গোবিন্দকে বাড়ী আগলাতে বলে তারা বেরিয়ে পড়লো বাগানের উদ্দেশে।

মালী তখন তার ঘরে বসে রাঁধছিলো। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে তার পিঠের দিকটা চোখে পড়ে। ঘরে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প—হাওয়ায় তার শিখাটা দুলে-দুলে কখনো হয়ে উঠছে উজ্জ্বল, কখনো নিবু-নিবু।

ছায়ামূর্ত্তি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো খোলা দরজার সামনে—তার পর মাথা নীচু করে ঢুকলো ঘরের ভেতরে। তার দেহের ধাক্কা লেগে দরজার শেকলটা শব্দ করে উঠলো—ঝন্-ঝন্······

চমকে ফিরে চাইলো মালী। আধো-অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যায় না আগন্তুককে—কিন্তু যতটুকু দেখা যায় তাতেই শিউরে ওঠে মালী। তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়ায়। আবছা আলোয় ছ'জনের কারো মুখই ভালো করে দেখা যায় না। ঘরের একটা কোণের দিকে সভয়ে সরে যায় মালী। আগন্তুক হাত ছ'টো সামনের দিকে প্রসারিত করে মালীর গলা লক্ষ্য করে ধীরে-ধীরে তার দিকে এগোতে থাকে।

—কে কোথায় আছো বাঁচাও, রক্ষা করো—চীৎকার করতে থাকে মালী। উভয়ের ব্যবধান ক্রমশঃ কমতে থাকে। আগন্তুক মহা উল্লাসে ক্রুদ্ধ পশুর মত গর্জ্জন করতে থাকে। মালী দেওয়ালে পিঠ রেখে একটু সরে যায়। মূর্ত্তিটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় তাকে ধরবার জন্তে। এমন সময় এক দৌড়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে মালী। আর একবার সে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চীৎকার করে ওঠে—কে কোথায় আছো বাঁচাও, রক্ষা করো। তার পর দৌড়তে থাকে ফটকের দিকে। আগন্তুকও গর্জ্জন করতে করতে তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

মালী যখন ফটকের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, আর তার কিছু দূরে পিছনে তাড়া করে চলেছে দীর্ঘদেহী আগন্তুক—ঠিক সেই সময়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বিভাস আর দেবব্রত।

মলয়া আর গোবিন্দ বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে বিস্মিত ভাবে। সকলেরই চোখে পড়ে দীর্ঘদেহী আগন্তুকের পলায়ন। বিভাস টর্চ্চের আলো ফেললো আগন্তুককে লক্ষ্য করে; কিন্তু সে আলো তার কাছ পর্য্যন্তও পৌঁছলো না।

দেবব্রত আর বিভাস ছ'জনেই আগন্তুকের পশ্চাদ্ধাবন করলো।

বিভাস আর দেবব্রত ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভীত-কম্পিত স্বরে গোবিন্দ বলে: কে জানে ভাগ্যে কি আছে দিদিমণি! ছ'জনে তো খুব বীরত্ব দেখিয়ে তাড়া করে গেলো; কিন্তু অপদেবতার সঙ্গে লড়াই করে কেউ কি কখনো পারে?

—তুমি কেবল চার দিকে ভূতই দেখছো গোবিন্দ। মলয়া তাকে ধমক দিয়ে বলে: পুরুষ মানুষের অত ভূতের ভয় কেনো?

—রাতের বেলা বার বার ও-নাম করো না দিদিমণি! ওঁনারা রাগ করেন। গোবিন্দ উত্তর দেয়।

—তা করুন! মলয়া মালীর ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলে: এখন একবার মালীর ঘরে আমার সঙ্গে এসো দেখি।

—মালীকে তো অপদেবতায় তাড়া করে নিয়ে গেলো দিদিমণি! গোবিন্দ বলে: মিছিমিছি আর তার ঘরে গিয়ে কি হবে?

—হবে এই যে, তোমার ওই অপদেবতাটি কিসের লোভে বেচারা বুড়ো মালীর ঘরে হানা দিয়েছিলো বোঝা যাবে। মলয়া বলে: এখন তর্ক না করে, মুখ বুজে আমার সঙ্গে এসো।

মলয়া মালীর ঘরে গিয়ে ঢোকে, তার পিছনে কম্পিত-কলেবর গোবিন্দ। কেরোসিনের ল্যাম্পটা তখনো তেমনি কম্পমান শিখা নিয়ে জ্বলছে। উনুনে কড়াটা তেমনি ভাবেই বসানো। কি রান্না চড়িয়েছিলো বুড়ো বেচারা, কে জানে! সব পুড়ে গিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ছে। আর ঘরের কোণে পড়ে কি ও? দাড়ি? পরচুলা! এ কি? তবে কি ভুবন মালীও ছদ্মবেশী? নেহাৎ অবস্থা গতিকে পড়ে তার ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে গেলো। বোধ হয় সে রাত অনেক হয়েছে দেখে দাড়ি আর পরচুলো খুলে রাঁধতে বসেছিলো। ভেবেছিলো এই গভীর রাতে দাড়ী আর পরচুলো খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই। নেহাৎ আততায়ী তাকে তাড়া করায় সে আর ছদ্মবেশ ধারণ করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কে এই ছদ্মবেশী? সে কি তাদের শত্রু না হিতৈষী? কি তার উদ্দেশ্য? কিছুই ঠিক করতে পারলো না মলয়া। বিভাস, আর দেবব্রতর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় সে মহা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো।

[ক্রমশঃ।

মনীষা

শ্রীমতী অমিয়া দত্ত

—দিদি, গাড়ীর খবর হয়েছে।

স্কুল-শুল্ক বিভাগের পিওন—খাকী পোষাক-পরা স্থূলকায় গোবিন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে খবর দিল।

মহিলা অফিসার মনীষা প্রস্তুত হয়েই ছিল, টেবিল থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে বললে তার ঝি'কে—পদ্মা, আমি dutyতে যাচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে উত্তর এলো, আচ্ছা;

ক্ষিপ্র চরণে বেরিয়ে এসে ঘরে শেকল তুলে দিল মনীষা। সুগঠিত লঘু গৌরতনু হাল্কা নীল রঙের সাড়ীতে আবৃত। সুষমা-মণ্ডিত সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব। আয়ত চোখের দৃষ্টি সপ্রতিভ। গ্রীবাদেশের বঙ্কিম রেখায় দুর্জ্জয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয়। সীঁথির সিঁদুরে প্রকাশ পাচ্ছে সে পরিণীতা। বয়স কিছু কম নয়। ভাল করে লক্ষ্য করলে হয়তো কেউ বলবে ঐ মুখ সার্থক জীবনের সুখস্পর্শে সন্তোষ ও সম্পূর্ণতায় উজ্জ্বল তো নয়ই, বরং অন্তরস্থ একটা ব্যর্থ হাহাকার তার ম্লান ছায়া বিস্তার করে বয়সোচিত সজীবতাকে নষ্ট করে দিয়েছে অনেকখানি।

এই দুর্দ্দিনে কে কার খবর রাখে? কে কত পেয়েছিল—কত হারিয়েছে; কে হাসির আবরণে স্মৃতির দহনকে পিষে ফেলতে চায়—বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার অস্তিত্বকে—কে শোনে—কে বলে? মনীষাও বলেনি।

হিন্দুস্থানের সীমান্তবর্ত্তী পল্লীগ্রামের এই ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশনে নিযুক্ত "লেডি কাষ্টম্‌" স্থানীয় লোকের কাছে স্বতন্ত্র ধরণের জীব। গাঁয়ের লোকের কৌতূহল আছে, জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই, কিন্তু কোন গবেষণাই পরিণতি লাভ করেনি।

বরিশালের স্বল্পবিত্ত স্কুল-মাষ্টার পরিতোষ বাবু সযত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন মাতৃহারা মেয়ে মনীষাকে। সে বি-এ-পাশ করল। পিতা যোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন কিন্তু অতি অকস্মাৎ সেই বছরের শেষে কঠিন নিউমোনিয়া রোগে তিনি মারা গেলেন।

মনীষা কাঁদাকাটি করল অনেক, তার পর শান্ত হয়ে নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করতে লাগলো মনে-মনে। কোন পার্থিব ক্ষতি—তা যতই তীব্র এবং বেদনাদায়ক হোক্ না কেন, সময়ের প্রলেপে আর অবস্থার চাপে সহনীয় হয়ে আসে। এই ভাবে খুড়তুতো ভাইয়ের অভিভাবকত্বে এক বৎসর কেটে গেল। পরাধীনতার দাহ মর্ম্মে-মর্ম্মে এই প্রথম অনুভব করলো সে ভিন্ন সংসারে ঢুকে।

এই সময় তার ছেলেবেলার খেলার সাথী প্রতিবেশী শঙ্কর রায় এম-বি, কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরে এলো। সে মিলিটারীতে নাম লিখিয়ে এসেছিলো, কাশ্মীরে পাকিস্তানী উপজাতীয়দের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত যে বিরাট সামরিক ব্যবস্থা চলছিল তার মেডিক্যাল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবে তাকে দু'মাসের মধ্যে রওনা হয়ে কার্য্যভার গ্রহণ করতে হবে। আত্মীয়-স্বজন বিরোধিতা করল কিন্তু কোন ফল হল না। শঙ্করের পিতা এক ধনী পাত্রীপক্ষের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু ছেলে বেঁকে বসল। সে বাল্যকাল থেকেই মনীষার গুণগ্রাহী ছিল, যৌবনেও তাকে ভুলতে পারল না। রাজকন্তা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব উপেক্ষা করে বাল্য-সাথীকে বিয়ে করবে জেদ ধরলো। রূপে-গুণে মনীষা নগণ্যা নয় কিন্তু আর্থিক যোগ্যতা পাত্রীপক্ষের নেই, এইখানেই তাঁদের আপত্তি ছিল। তবুও পুত্রের মনের দিকে চেয়ে রাজি হতে হল।

বিয়ের দু'মাস পরেই শঙ্কর চলে গেল কাশ্মীরে। দু'টি তরুণ-তরুণীর কোমল হৃদয়ে উৎসবের আয়োজন অসময়ে শেষ হল। এ বিচ্ছেদ অজানিত নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। একে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানায়নি তারা, তবু মেনে নিতে হল।

অবশ্য শঙ্কর বলেছিল,—পার্থিব প্রয়োজনের দাবী মেনে নিতে গিয়ে আমি অন্তরের দাবীকে উপেক্ষা করব কেন? তা ছাড়া নোয়াখালীর পৈশাচিক দাঙ্গা যদি এখানেও সুরু হয়? কে তোমাদের দেখবে?—বিশেষ মেয়েদের মর্য্যাদা-হানির প্রশ্নই তখন প্রবল হয়ে দেখা দেবে।

মনীষা হেসে বললে,—যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে কাশ্মীর যাবে বলে তখন এ কথা স্মরণ ছিল না তোমার? কাশ্মীর আর বরিশাল এপাড়া-ওপাড়া নয় এটা তো জানতেই। তা ছাড়া বাবা মারা যাবার পরে আমার ভাল-মন্দের দায়িত্ব নেবে বলে যে কথা দিয়েছিলে আমায় তা একেবারেই অর্থহীন বলতে হবে?

—আমি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল নই মনীষা! ঝোঁকের মাথায় হয়তো যাব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিন্তু এমন অসহায় নিজেকে আর কখনো কল্পনা করিনি।

মনীষা চুপ করে রইল, বাধা দিলো না তার কথায়। ভাল লাগে—ভাল লাগছে তার শুনতে এ সব কথা। স্ত্রীর জন্ত স্বামীর কাতরতা!

—আমি চিরকালই একটু গোঁয়ার, তা তুমি জানো কিন্তু ভণ্ড নই। বিয়ের পরে এতটা কষ্ট হবে তোমাকে ছেড়ে যেতে তা বুঝতে পারিনি। তা এর কি কোন উপায়—

মনীষা দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে,—

—না, উপায় নেই। তুমি যাও। আমার জন্ত তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এ আমার সহ্য হবে না। পাকিস্তানে আমাদের জমিজমার মূল্য কতটা থাকবে—আদৌ এখানে থাকা সম্ভব হবে কি না কে বলবে? ওখানে সাবধানে থেকো; জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন ঝুঁকি নেবে না। দরকার হলে চাকুরি ছেড়ে চলে আসবে। তোমার জীবনের সঙ্গে আর একটি জীবন স্পন্দিত হচ্ছে—তুমি পুরুষ মানুষ, এ কথা মনে খুব বেশী দিন থাকবে না; কিন্তু মেয়েমানুষ ভুলতে পারে না।

—মনীষা, আমি স্বার্থপর নই।

—আমি তা বলিনি। মোহ এক দিন কাটবেই। বৌ-এর আঁচল ধরে থাকার দুর্ব্বলতা তোমার পৌরুষকে তখন তিরস্কার করবে। আমি নিজেকে হয়তো রক্ষা করতে পারি—পারব—তুমি ভেবো না।

—তুমি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছ, কবিতা লিখতে সুরু করলে আশ্চর্য্য হব না। শঙ্কর হাসতে লাগল।

মনীষা হাসিতে যোগ দিয়ে বললে,—এদিকে এসো তো।

শঙ্করের হাত ধরে শয্যার কাছে নিয়ে গেল, বালিশটা সরিয়ে নিতেই একটা সুবৃত্ত নেপালী ছোরা শঙ্করের নজরে পড়লো। নেপালী চাকরটা দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল, বিয়েতে উপহার দিয়েছে বৌদিকে।

—দেখলে? এটা কবিতা নয়। তার পর শঙ্করের হাত ধরেই বললে,—মা বাবা এদিকে আসছেন, এই সময় প্রণামটা সেরে নিই। মনীষা গলায় আঁচল দিয়ে নতজানু হয়ে তার পায়ে মাথাটি রাখলে।

সেই দিনই মধ্যাহ্নে শঙ্কর চলে গেল বিদায় নিয়ে।

প্রায় দু'বছর অতীতের কোলে চলে পড়েছে। শঙ্কর আর আসেনি—আসতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা কালে শত্রুসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে সে বন্দী হয়। বহু কাল আটক থেকে নানা প্রকার নির্য্যাতনের পর ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে রাজি হওয়ায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম্মত্যাগে আর ইতস্ততঃ করেনি কারণ সেটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। যে কোন মূল্যে বাংলায় ফিরে আসতে চায় সে। মনীষাকে বলবে, পুরুষ মানুষও ভোলে না যে, তার জীবনের সঙ্গে আর একটি জীবনও স্পন্দিত হচ্ছে। তা ছাড়া বহু আগে চিঠিতে খবর পেয়েছিল তার একটি ছেলে হয়েছে। হিসেব করে দেখলো এক বছরের কিছু বেশীই হয়তো বয়স হবে তার। শঙ্কর ওরকে ডাক্তার রহমান সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সুযোগ জুটে গেল শীগ্‌গিরই। পূর্ব্ব-বাংলা থেকে হিন্দু ডাক্তার অনেক চলে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকার জন কয়েক ডাক্তার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন—সেই সঙ্গে শঙ্কর চলে এলো পূর্ব্ব-পাকিস্তানে। এসেই বরিশালে খোঁজ করে জানতে পারলে যে, তার বাবা-মা কলেরায় এক দিনের ব্যবধানে মারা গেছেন। তার কিছু কাল পরে বরিশালে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠায় অনেকে রাতারাতি পালিয়েছে—অনেকে গুণ্ডার হাতে শেষ হয়ে গেছে। মনীষারাও আতঙ্কে বেরিয়ে পড়েছিল হয়তো। তাদের কি হয়েছে—কোথায় গেছে—কেউ বলতে পারলে না।

শঙ্কর পাগলের মত ছুটোছুটি করে শেষে শান্ত হয়ে তার বাসায় ফিরে এলো। সব শেষ হয়ে গেছে তার জীবনে—রহমানকে দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হোক্। শঙ্কর মরে গেছে পূর্ব্বেই!

যা ঘটে গেছে তাই বলছি।

দূরে অসংখ্য মশাল রাতের অন্ধকারে জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হল। খবর ভেসে আসছে—অনেকের বাড়ী লুঠ হয়েছে—অনেকের মান-সম্ভ্রম পথের ধূলায় লোটাচ্ছে। মনীষা শিশুপুত্রকে কোলে করে ঝি পদ্মার সঙ্গে 'দুর্গা'-'দুর্গা' বলে পথে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নেই, বুড়োবুড়ি মারা গেছেন। ভালই হয়েছে যে, তাঁদের এ দৃশ্য দেখার পূর্ব্বেই বিদেয় নিতে হয়েছে। পথে আরও অনেক ভীতিবিহ্বল নরনারী এসে জুটল। সবাই এক লক্ষ্যে ছুটল। কোথায় যাবে কারো তা জানা নেই। দূরের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

* * *

একখানা বাস্তুত্যাগীতে ঠাসা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ক্রমেই হিন্দুস্থানের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছান যাবে সেই পুণ্যভূমিতে। নারীরা উলুধ্বনি দেবে—শাঁখ বেজে উঠবে—পুরুষরা উল্লাসে মাতবে!

কিন্তু ট্রেণখানা নিশ্চিন্তই থেমে গেল। চারি দিক স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে নৈশ বায়ুর এক-একটা প্রবল ঝাপ্‌টা জানলা দিয়ে শন্‌-শন্ করে বইছে।

বুটের ভারী শব্দ শোনা যায়। কারা যেন গাড়ীতে উঠছে-নামছে।

এ নীরবতা রইল না বেশীক্ষণ। নানা দিক হতে তর্জ্জন-গর্জ্জন-ধমকানি শোনা গেল,—'পাকিস্তানকো দৌলত লুঠনে আয়া শালা লোক'—'উতর যাও ভাব্বা সে'—'সামান বিগ্, দেও বাহার' ইত্যাদি—সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্ত্তনাদ—করুণ মিনতি—বুকফাটা ক্রন্দন!

মনীষা চেয়ে দেখলো জন কয়েক খাকী পোষাক-পরা লোক তার কামরায় ঢুকছে। দেখতে দেখতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। মাল-পত্র যার যা-কিছু ছিল বেশীর ভাগই জানলা দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হল। এক জন দস্যু তার দিকে এগিয়ে এসে কুৎসিত মন্তব্য করে গায়ের গহনা দেখিয়ে বললে,—জলদি দে দো, উ সব নেহি যাতা হায়।—সে হাত বাড়ালো। সভয়ে মনীষা মিনতি করে বললে,—আমি দিচ্ছি, গায়ে হাত দিতে হবে না।

এমন সময় গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। দস্যুরা ঝুপ্‌-ঝাপ নেমে যেতে লাগল। খান-দুই সোনার চুড়ি নিয়েই তাড়াতাড়ি লোকটা নেমে পড়ল। দূর থেকে এক গুণ্ডার দৃষ্টি পদ্মার কোলে ঘুমন্ত খোকার গলার সোনার হারছড়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। সে তিন লাফে এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে শিশুকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ুল দরজার দিকে। মনীষা সভয়ে চীৎকার করে দৌড়ে গিয়ে খোকাকে জড়িয়ে ধরল। লাথি মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে দস্যু লাফিয়ে পড়ল বাইরে। গাড়ীর বেগ তখন বেড়ে গেছে। মনীষার মাথাটা বেঞ্চিতে ঠুকে যাওয়ায় সে জ্ঞান হারালো। পদ্মা তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সীমান্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ডাক্তারদের চিকিৎসায় মনীষা ক্রমে সুস্থবোধ করলে।

অনুসন্ধানের যত প্রকার উপায় ছিল সবই অবলম্বিত হল, কিন্তু তার ছেলেকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থায়ই পাওয়া গেল না।

মনীষা অন্তরের আগুন চেপে উঠে দাঁড়াল, শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে চলবে না।

নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে নানা জনের সহানুভূতি কুড়িয়ে অবশেষে কর্ম্ম-নিয়োগ সংস্থার চেষ্টায় সে চাকুরী পেল স্থল-শুল্ক বিভাগে। পদ্মাকে নিয়ে মনীষা যথাসময়ে সীমান্তবর্ত্তী ষ্টেশনে কাজে যোগ দিলে।

পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে এক গরীব মুসলমান ৪।৫ মাস পূর্ব্বে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। শঙ্কর তার বাইরের ঘরখানা ভাড়া নিয়ে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করল। কিছু ঔষধ-পত্রেরও যোগাড় হল। প্রতিবেশী মুসলমানগণ বাড়ীওয়ালী তরুণী বিধবাকে নিকা

করার পরামর্শ দিলে। শঙ্কর বিনীত ভাবে জানালো—একটু স্থির হয়ে বসতে দাও ভাই, বিয়ের কথা পরে ভাববো।

অত সোজা নয় অতীতকে ভুলে যাওয়া এরই মধ্যে। এ শুধু হলুদের দাগ যে, ধুলেই মুছে যাবে। সবই ছিল তার—এখন একেবারে নিঃস্ব সে। একেবারেই একক নিঃসঙ্গ!

বিধবাটির নাম আয়েষা। সে তার দেড় বৎসর বয়সের শিশু-পুত্রকে নিয়ে প্রায়ই ডাক্তারখানার দরজায় বসে নানা অভাবের কথা ব'লে অবশেষে কিছু অর্থ-সাহায্য চায়। শঙ্কর সাধ্যমত টাকাটা-সিকিটা দেয়। তার দু'টি ৪।৫ বৎসরের নাবালক দেবর আছে। তিনটি শিশুকে নিয়ে এই দুর্দিনে সে খরচ চালাতে পারছে না।

রোগীর বাড়ী থেকে দুপুরের রোদে শঙ্কর বাসায় ফিরল। আয়েষার ছেলে মোজাম্মেল খেলা করছে দোরগোড়ায়, শঙ্করকে দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—আধ আধ-স্বরে হাত নেড়ে আহ্বান জানালো, হাত ঠেকালো কপালে সেলামের ভঙ্গীতে,—এটা তার মা শিখিয়েছে। শঙ্কর কোলে তুলে নিল সুশ্রী সবল গৌরকায় উলঙ্গ শিশুকে—পকেট থেকে সদ্য-ক্রীত একটা নিকার-বোকার বের করে পরিয়ে দিল। বেশ মানিয়েছে—মাপে ছোট হয়নি। মনটা তার হু-হু করে উঠল, তারও ছিল এমনি একটি কচিমুখ—যদি বেঁচে থাকে এত বড়ই হয়েছে হয়ত। কপালটা টিপে ধরে আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়ল বিছানায়—জুতো খোলার কথা মনেই রইল না।

প্যাসেঞ্জারে গাড়ী আজ ঠাসা। মনীষা পিওন ও রেল-পুলিশের সাহায্যে রাস্তা করে অন্ধকারময় মেয়ে-কামরায় উঠে পড়ল। অসংখ্য মেয়ে 'স্মাগলার' যাচ্ছে, তাদের কোমরে থলিতে সার্টিং, ধুতি, সাড়ী লুকোনো, বেঞ্চির তলায় পুঁটুলিতে ষ্টেশনারী দ্রব্যের গাদা,—আরও কত কি! এই ষ্টেশন পেরিয়ে গেলেই এ সবে মোটা টাকা রোজগার হবে—মহাজনও অংশ পাবে। মনীষা নিষিদ্ধ জিনিষ কেড়ে নিলে—একে-একে জানালা-পথে তুলে দিলে পিওনের হাতে। সুরু হল মায়া-কান্না, কাকুতি-মিনতি, মেম সাহেবের পায়ে ধরাধরি। সব উপেক্ষা করে সে দরজার দিকে এগুলো। কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না এদের উপরে—দেশের শত্রু এরা—বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী—দেশের সম্পদ বের করে দিচ্ছে বিদেশে প্রতিনিয়ত।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কালকের সেই মেয়ে মানুষটা—নূতন ব্রতী হয়েছে এ কাজে।

—দেখি কি আছে?—কোমরে হাত দিয়ে মনীষা টেনে বার করল পাঁচখানা নূতন ধুতি।

—মেম সাহেব, তিনটি শিশুর দানা-পানি আছে ওতে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

চোপ রহ!—প্রচণ্ড ধমক দিলো মনীষা।

স্ত্রীলোকটির মলিন আঁচলে বাঁধা একটা ছোট সোনার আংটি ঝুলছিল, টর্চ্চের আলোয় তা চক্-চক্ করে উঠল। মনীষার মুখের রঙ হঠাৎ বদলে গেল—অপরিসীম বিস্ময়ে পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। না—না, তার ভুল হয়নি, এ তার

—কাপড় পাবে না তুমি। এ সব "সিজ" করা হল। এ অন্যায় পথ তুমি ছাড়। কাল আমার সঙ্গে এই ট্রেণে দেখা করবে; তোমাকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করব। আজ কিছু নিয়ে যাও—দশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিল,—তার পর টলতে টলতে কামরা থেকে নেমে এলো।

—মিসেস রায়, আপনার হোল। গাড়ী 'রিলিজ' দোব?—জিজ্ঞেস করলে ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর মিঃ চৌধুরী।

সে কেবল বলতে পারলে,—দিন্।

পরের দিন। সেই ট্রেণ। টাকার লোভে সে এসেছে ঠিক।

—তোমার নাম কি?—

—আয়েষা।

তাকে সঙ্গে নিয়ে মনীষা প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠলো।

সতর্ক প্রসঙ্গোপাপনায়, খবর বের করে নেবার উদ্দেশ্যে কৌশলময় প্রশ্নের অবতারণায় শীগ্‌গিরই মনীষা অনেক কথা জেনে নিলে। সে নিঃসন্তান, ছেলেটি কুড়িয়ে পাওয়া; তবে মায়া ধরে গেছে তার। আংটিটি শত অভাবেও বিক্রী করেনি এই আশায় যে, যদি কোন দিন তার বাপ-মায়ের খোঁজ পায় মোটা পুরস্কার পাবে সে। ওটা হবে পরিচয়-নিদর্শন।

—আমি তোমার সঙ্গে যাব আয়েষা। তোমার বাড়ী-ঘর দেখার খুব সাধ হয়েছে।

আয়েষা খুশী হল। কুণ্ঠিত স্বরে বললে,—আমাদের গরীবের বাড়ী কি আপনার ভাল লাগবে মেম সাহেব!

—ষ্টেশন থেকে কত দূরে?—

—বেশী দূর নয়, পোয়াটেক মাইল হবে—হেঁটেই যাওয়া যাবে।

মনীষা অফিসার-ইন-চার্জ্জের নিকট ষ্টেশন লিভ করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। পিওনকে ডেকে বললে, গোবিন্দ, আমার সঙ্গে চল, রাত্রের ট্রেণে ফিরে আসবো। ইন-চার্জ্জকে সব জানিয়েছি।

* * * *

আয়েষা, তার বাড়ীর কাছে এসে বললে, ঐ বাইরের ঘরটায় রহমান ডাক্তার থাকেন। আমার ছেলেকে তিনি খুব ভাল বাসেন, ছেলেও এক দণ্ড তাঁকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে। ঐ দেখুন, ঘরের মধ্যে ডাক্তার সাহেব ওকে এক রাশ খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন।

মনীষা ব্যাকুল আগ্রহে, সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে সেদিকে তাকালো;—না, ভাল দেখা যাচ্ছে না।

—ওখানেই আমি বসব একটু। দ্রুত এগিয়ে গেল সে।

তারই রক্ত-মাংসে-গড়া সেই শিশু-মুখ। বেশী দিনের কথা তো নয়। নধরকান্তি গৌরকায় ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, বাম গণ্ডে সেই বড় রকমের একটা তিল-চিহ্ন আঁকা। অতি পরিচিত তার হারাণো মাণিক!—একটু বড় হয়েছে মাত্র। ডাক্তারের সঙ্গে আধ-আধ স্বরে কথা বলছে—তেমনি সশব্দে হেসে উঠছে যেমনটি সে

সে ঘরে ঢুকে খোকাকে তুলে নিলে কোলে। শিশু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সসঙ্কোচে।

আজ শঙ্কর কোথায়?—যাকে তিরস্কার করে সে বিদায় দিয়েছিল?—বৃথা ডাকা আজ তারে?

শঙ্কর হতবাক্ হয়ে গেছলো প্রথমে, বিছানায় উঠে বসে শুধু বলতে পারলে,—মনীষা, মনীষা! বল, আমি স্বপ্ন দেখছি না!

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ালো মনীষা।

—তুমি! আমি তাহলে সব ফিরে পেয়েছি!—আকাঙ্ক্ষা আর কোন বাধাই মানলো না।

অরুণ তার মায়ের ব্যাগটি নিয়ে ততক্ষণ খেলা সুরু করেছে পরম নিশ্চিন্তে।

শ্রীধ্রুবেন্দ্রকুমার সেন

ছোট্ট সহরেতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল বাজারের ছোট-ছোট দোকানদার থেকে ধনী ব্যবসায়ীদের গৃহাভ্যন্তরে। ছোট্ট খবর কিন্তু চাঞ্চল্য আনলো দ্বিগুণ করে। খবরটা এই—চা-বাগানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমৃতলাল 'দেবী-আশ্রমের' অধ্যক্ষ স্বামী বিরজালালের নামে আদালতে মামলা রুজু করেছেন। খবরটা বললেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অম্বিকাশঙ্কর চৌধুরী—সাব-ডেপুটি মেহের সিংকে, গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর তাঁর সহযোগীকে, লেডী ডাক্তার মিস্ করুণা বোস তার সদ্য পাকড়াও-করা মাড়োয়ারী রুগিণীকে। আরও অনেক জায়গায়—কমলালেবুর দোকানদার, তামাকের আড়তদার, কলেজের মেয়েদের, বাড়ীর গিন্নীদের মাঝে এ খবরটা কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই কানাকানি হয়ে গেল। অভিযোগে অমৃতলাল বলেছেন তার একমাত্র মেয়ে নবনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর বিনানুমতিতে স্বামী বিরজালাল তাঁর আশ্রমে আট্কা রেখেছেন ও তাঁকে স্বগৃহে ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। সহরে যখন কানাকানি পুরো দমে চলছে, ঠিক তখনই দেবী আশ্রমে একটি নারী-জীবনের চরম আহুতিরই আয়োজনে ব্যস্ত সেখানকার অন্তঃপুরিকারা!

প্রভাতী ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সহর থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল তফাৎএ দু'হাজার ফুট উঁচু এক নাতিদীর্ঘ পাহাড়ের শান্ত পরিবেশের মাঝে আশ্রমবাসীরা তখন সবাই জেগে উঠেছে। সূর্য্য তখনো আকাশে চোখ মেলেনি—ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে তখনো ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে নীরবে এই মাটীর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রাত্রির অন্ধকারের অসংখ্য অসৎ কাজের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। আশ্রমবাসিনীরা সবাই শয্যা ছেড়ে উঠলেন। দীর্ঘ মোজেক্-করা বারান্দা পার হয়ে খোলা উঠান—তারই আগে দু'সারি বিলেতী মার্ব্বেল দেওয়া দামী, সুবৃহৎ আয়না-লাগানো নয়ন-মনোহর শৌচাগার। সূর্য্য ওঠার আগে তাদের স্নান ও আনুষঙ্গিক সমাপন করে, সুবিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানে তাঁরা ফুল চয়ন করতে লাগলেন। হাতের বেতের সাজি হলদে, লাল নীল রঙএর ফুলের বাহারে ও ভারে ভরে উঠতে লাগল কয়েক মুহূর্ত্তের ভেতর। ফুল চয়ন হল—আশ্রমের যিনি অধ্যক্ষা, সবায়ের কাছে যিনি কর্ত্তামা বলেই পরিচিতা তাঁর আদেশে বিবাহিতারা এক দিকে আর কুমারীরা আর এক দিকে মালা গাঁথতে বসলেন। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ বা অন্যান্য কাজে নিজেদের নিয়োগ করলেন। ঘরগুলো ঝাড়া, মোছা ও সাজান হল—সূর্য্যের আলোয় ঘরের আনাচে-কানাচেগুলো ভরে উঠেছে, আশ্রমবাসিনীরা তাঁদের পবিত্র হৃদয়ের নির্ম্মাল্য দিয়ে শ্রীভগবানকে আরাধনা করতে গেলেন।

একতলা বাড়ী—সুপ্রশস্ত জায়গা চারি ধারে। এই ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে শুধু এই আশ্রমটিই দেখার জন্তে বহু দূর থেকে ভিন্‌দেশীয় লোকেরা আসেন—আশ্চর্য্য হয়ে দেখেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রমবাসিনীদের নয়নমনোহর হাতের কাজ। যেখানে যেটি প্রয়োজন তার বেশী আর একটি অপ্রয়োজনীয় জিনিষও সেখানে স্থান পায়নি। ঘরের বারান্দার বাঁধান উঠানগুলো সবই ঝকঝকে-তকতকে, তার পরেই এক দিকে শুধু লম্বা তিনটি হল-ঘর—সেখানেই থাকেন আশ্রমের অন্তঃপুরিকারা। ওদিকের উঠোনে আছে রান্না-ঘর—তার বিপুল চুল্লী আর ততোধিক বড়-বড় হাঁড়ী আর কড়াই সংখ্যাতীত গণনায়—সে এক এলাহি কাণ্ড!

ডান দিকের অপ্রশস্ত বারান্দার ওপর চিক্ ফেলা—সেখানে দু'টি ঘর—সামনে চিক্ ফেলে আশ্রমপুরিকাদের চোখ থেকে আড়াল করা ঘর দু'খানি। এই দু'টি স্বামী বিরজালালের থাকার ঘর—আশ্রমে যিনি 'বাবাজী' বলেই পরিচিত ও কথিত। চিকের ওপর দিকে এক সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ওপর দিকে চলে গেছে—সেখানে পর-পর তিনটি ঘর। একটি বাসন রাখার, একটি ভাঁড়ার ও শেষেরটি আচারের ঘর। শেষের ঘরে কাচের শেলফে থরে-থরে সাজান আচার—আমলকীর, আমের, লেবুর, আরও কত-শত মুখরোচক জিনিষের। মধ্যের ঘরে ভাঁড়ার—চাল, ডাল, আটা, নুণ, তেল—দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায় যাদের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। আর তার পরের ঘরটি বাসনের। সোনা, রূপো, পেতল, তামার ছোট-বড় মাঝারি, চৌকোণো-গোল—রকমারি বাসন-কোসন আর তারই সঙ্গে কাঠের বারকোষ, ফুলদানী, রেকাবের ভীড় এখানে। এগুলির কর্ত্তৃত্ব 'কর্ত্তামা'র। আশ্রমের সব মেয়েরা কর্ত্তামা'র আদেশেই ওঠা-বসা করেন।

সকালের সূর্য্যকরোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পাহাড়ী প্রভাতের নিশ্ছিদ্র অবসর, আশ্রম-অন্তঃপুরিকাদের ফুল-চয়ন, ঘর-মোছা ও সংসারের অন্যান্য কাজে ব্যয়িত হল। দশটার ঘণ্টা বাজল দেউড়ীতে। কর্ত্তামা চকিত হয়ে উঠলেন—যাক্, সব আয়োজনই প্রস্তুত। আজ এই একটু বাদেই নবাগতা নবনীতার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্ঘ্যদান সমাপ্ত হবে।

রান্না-বাড়ী ও আশ্রমের অন্তরালে এক নাতিবৃহৎ আটচালা, তারই মাঝে বিরাট এক হোমকুণ্ড। তাতে দূরের বন থেকে আনা শুকনো

কাঠ ও গব্য ঘি সুমহান্ আকাশ-দেবতাকে লেলিহান অগ্নিশিখায় প্রণতি জানাচ্ছে অহরহ। আশ্রমের পুরনারীরা সংখ্যায় জনা ত্রিশেক, মাঝ-বয়সী ও কম-বয়সী মিলে হোমকুণ্ডের চারি ধার ঘিরে বসলেন। নবনীতা তারই মাঝখানে—যেখানে হোমকুণ্ডের ধারে একটি আলপনা আঁকা কাষ্ঠাসন সযত্নে রাখা।

দূরের সুদৃশ্য ভেনিশিয়ান কাচের ভেজানো দুয়ারখানা অকস্মাৎ খুলে গেল। 'বাবাজী'র সুদীর্ঘ, সুপুষ্ট, বলশালী চেহারা আশ্রমবাসী সবার দৃষ্টিগোচর হল। সবাই নতমস্তকে ওঠে দাঁড়ালেন। ভেলভেট্-মোড়া কাঠের খড়ম জোড়া শুধু শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। স্বামিজী এলেন—তাঁর পা ধুইয়ে নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন এক জন আশ্রম-অন্তঃপুরিকা। ধীরে-ধীরে তিনি কাষ্ঠাসনে আসন গ্রহণ করলেন।

চারি পাশে থরে-থরে ধান-দূর্ব্বা, চন্দন, বেলপাতা, গঙ্গাজল ইত্যাদির সুদৃশ্য চকচকে উপাধার সাজান। বাবাজী মনে-মনে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করলেন। 'সব ঠিক আছে তো হেমনলিনী?'—বাবাজী কর্ত্তামাকে প্রশ্ন করলেন। হেমনলিনী কর্ত্তামা'র নাম। সেই কবে এক বালিকাবস্থায় তিনি এই আশ্রমের আশ্রয়ে আসেন—এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় তাঁর কালো চুলে সাদার ছোপ ধরেছে অকুণ্ঠিত ভাবে।

'হ্যাঁ গুরুদেব, সব ঠিক আছে।' হেমনলিনী বিনীত কণ্ঠে বললেন।

'আর দেরী নয় তবে—পাঁজীর নির্দ্দেশে এইবার শুভ কাজ আরম্ভ করা যাক্।' বাবাজী উত্তর করলেন।

আশ্রম-নারীরা উঠে দাঁড়ালেন—তাঁদের হাতের শঙ্খ-ধ্বনি ও ঘণ্টা-ধ্বনিতে শান্ত পরিবেশের বনমর্ম্মরে কোন এক দূরাগত বাণীর বার্ত্তা বয়ে নিয়ে এল। শান্ত-গম্ভীর ভাবরসে নবনীতার গায়ে ও মাথায় বাবাজী গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। ফুল ও তুলসী পড়ল অপর্য্যাপ্ত ভাবে। গম্ভীর কণ্ঠে বাবাজী সংস্কৃত শ্লোকের পর শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন '—যস্মিন্ দেবায়…'

আধ ঘণ্টার কিছু ওপর হোমকুণ্ডের চারি পাশে একটি কিশোরীর জীবনের ওপর আর এক অজানা জীবনের হাতছানি পড়ল! আবার ঘণ্টা-ধ্বনি হল—বাবাজী সম্মুখবর্ত্তিনী ধনী ব্যবসায়ী-তনয়াকে উদ্দেশ করে বললেন—'বল, আজ হতে এই মুহূর্ত্তে আমার জীবনের ভোগ, সুখ, ত্যাগ, প্রিয়-পরিজন আমার গুরুদেবের হাতে অর্পণ করলাম।' মেয়েটি নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বাবাজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তা বলে গেল। '…বল আজ হ'তে আমার দেহ শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করলাম!'

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে তার কে যেন কণ্ঠরোধ করে দিল। বাবাজী বললেন—'বল, বল, আমি যা বলেছি—সময় উত্‌রে যায়।' মেয়েটি তথাপি নিরুত্তর রইল, আরও বার দুই বাবাজী মেয়েটিকে অনুরোধ করলেন। মেয়েটি নির্ব্বাক্ পুতুলের মত মাথা নিচু করে নিশ্চল হয়ে রইল। কর্ত্তামা এই একগুঁয়ে মেয়েটির ওপর বিশেষ বিরক্ত হলেন, বাবাজীর মুখের আদেশে তাঁরা মরতে পর্য্যন্ত পারেন, তাঁর আদেশ তাঁরা শ্রীভগবানের আদেশ বলেই মনে করেন, আর এই তুচ্ছ কলেজে-পড়া মেয়েটা কি না সাড়াই দেয় না…।

বাবাজী গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন—'আমার দিকে তাকাও।' সেই গলায় যেন আর কারও আদেশ ধ্বনিত হল—যেন কোন দূরাগত অদৃশ্য আদেশ! মেয়েটি অগ্রাহ্য করতে পারল না—তার ভীত নিঃসহায় চোখ দু'টি তুলে ক্ষণেকের জন্যে বাবাজীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঐ চোখের ভেতরে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি! বড়-বড় পত্রবহুল চোখে যেন কোন এক অশরীরী রাজ্যের নির্দ্দেশ, মেয়েটি আর চোখ নামাতে পারল না। বাবাজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললে—'আজ হতে আমার দেহ…' আর তার পরের সংস্কৃত মন্ত্র, হোমকুণ্ডের ঊর্দ্ধমুখী শিখা, ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুল ও চন্দনের মোহবশে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। ভুলে গেল সে কেনই বা এখানে এল—ভুলে গেল সে তার আত্মীয়-পরিজন আর পিছনে ফেলে-আসা জীবনটাকে……এই মুহূর্ত্তে মনে হল হোমকুণ্ডের ঐ অগ্নিশিখা আর বাবাজীই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় সত্য, আর সবই মায়াময় মিথ্যা।

দেবী আশ্রমের হোমকুণ্ডের চারি ধারে যখন বাবাজী তাঁর সংস্কৃত মন্ত্র সহকারে ঘৃতের আহুতিদানে ব্যস্ত, ঠিক তখনই সহরের কার্ট রোড ধরে দু'টি গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে দেবী আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথম গাড়ীটাতে আছেন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ চৌধুরী, পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর শশাঙ্কশেখর সান্যাল, গভর্ণমেণ্ট কলেজের বেদান্তের প্রধান অধ্যাপক হরিহর সেন আর নবনীতার বাবা লক্ষপতি অমৃতলাল। দ্বিতীয় গাড়ীতে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট ও সহরের গণ্যমান্য আরও জনা চারেক ভদ্রলোক।

প্রথম গাড়ীতে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ চৌধুরী বেদান্তের অধ্যাপককে খুব উত্তেজিত হয়ে বলছেন—'দেখুন সেন বাবু, প্রথম দিন আমি যখন এখানে বদলী হয়ে আসি তখন থেকেই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল্ ফাইলের মধ্যে একটা ছবির সঙ্গে বাবাজীর মুখে অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি লক্ষ্য করেছি। সে ছবিটি প্রায় চল্লিশ বছর আগের এক ফেরারী আসামীর। সেই আসামীর বাঁ দিকের গালে একটি মারাত্মক অস্ত্রের আঘাত আছে, সহরের লোকেদের চোখে হয়ত তা ধরা পড়েনি কিন্তু আমি খবর পেয়েছি, বাবাজীর গালে ঐ একই রকম ক্ষত-চিহ্ন আছে—হয়ত এক গাল দাড়ী ও গোঁফের মধ্যে তা লুকিয়ে থাকার দরুণই সহরের লোকদের নজর পড়েনি। প্রায় বছর চারেক আগে বাবাজীর নিউমোনিয়া হয়—সাহেব ডাক্তার প্রথমেই ঐ দীর্ঘ চুল ও দাড়ী কামিয়ে ফেলার আদেশ দেন আর আশ্রমবাসীরাও নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুর দাড়ী ও লম্বা চুল কাটতে বাধ্য হয়। যে নাপিত চুল ও দাড়ী কামিয়েছিল তার মুখ থেকেই আমার এ খবর পাওয়া।

অধ্যাপক বললেন: 'আপনারা ঠিক জানেন, এই বাবাজীই সেই ফেরারী আসামী?'

'আমরা নিঃসন্দেহ—আপনাদেরও সবার সন্দেহের নিরসন হবে খানিক বাদেই। বাবাজীর মত লোকের বিরুদ্ধে আমরা কাজে নেমেছি, পাছে ওনার অন্ধভক্ত ভক্তেরা, সংবাদপত্রের লো

আমাদের ওপর চটে যায় সেই জন্তে আপনাদের মত কয়েক জন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়েছি। আমাদের হিন্দুধর্ম্মে তো দেব-দেবীর অভাব নেই—আশ্রমেরও অভাব নেই। আমাদের এই পুণ্য-ভূমিতে তাই সবাই এক-এক জন ত্রিকালজ্ঞ সাধু; কারণ সাধুর ভেক ধরলে আর যাই হোক ভিক্ষের অভাব হবে না। তাই ভারতের যত দেব-দেবীর মন্দির আছে তার আশে-পাশেই আছে চোর, জুয়াচোর, ভণ্ডেরা। দেবতার আসনের নীচেই আছে দানবের বাসা। আমরা খাঁটি জহরীর মত আসল রত্নকে চিনতে পারি না। হরিহর বাবু! মহাপুরুষদের আমরা অসম্মান করি, আর মহাভণ্ডদের নিয়ে দেবতার আসনে বসাই, আর সে দেবতার দানব হতেও বিশেষ দেরী হয় না। জানেন এই বাবাজীর অতীত ইতিহাস…? প্রায় চল্লিশ বছর আগে চট্টগ্রামের এক ছোট্ট জমিদারীর জমিদারের এক ছেলে কমলাকিরণ চৌধুরী পাশের গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অপরূপ সুন্দরী এক শিক্ষিতা মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়। মেয়েটি মাতাল জমিদার-তনয়ের প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে ও প্রস্তাবকারীকে অপমান করে—আর সেই রাত্রেই অসহায়া সেই মেয়েটি, তার অন্ধ বাবা আর রুগ্না মা'কে বন্দুক দিয়ে গুলী করে সেই দুঃসাহসী ছেলেটি নিরুদ্দেশ হয়। শোনা যায়, পুলিশের ভয়ে সে হিমালয়ের গহন অরণ্যে আত্মগোপন করে। আর তার দশ বছর বাদে হিমালয় থেকে নেমে-আসা এক যোগী সন্ন্যাসীর আসন পড়ে এই পাহাড়ের একটি গুহায়। তার পরের ইতিহাস কারও অজানা নয়—গুণমুগ্ধ ভক্তদের টাকায় একটি বিরাট আয়ের জমিদারী আর প্রাসাদোপম আশ্রম গড়ে উঠতে বিশেষ দেরী হোলো না। এই আশ্রমে একটি লক্ষপতির স্ত্রী আছেন—সবাই তাকে ডাকে 'কর্ত্তামা' বলে, তিনিই এখানকার প্রথম ভক্ত; শোনা যায়, তাঁর টাকাও কিছু কম নয়। একবার যে এখানে পা বাড়ায়, বিশেষতঃ সুদর্শনাদের আর দ্বিতীয় বার বাড়ী ফিরতে হয় না—সাবধান, ওখানকার লোকেরা কোন জিনিষ খেতে দিলে যেন খাবেন না! আমার কথা হয়ত আপনারা বিশ্বাস করছেন না! হিমালয়ের শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে—যেখানে বাঘের আর অজগরের বিলাস বিচরণভূমি তারও ওপরে হিম-শীতল পাহাড়ে এখনও অনেক সন্ন্যাসী যোগাভ্যাস করছেন। কারুর শরীরের ওপর বল্মীকের স্তূপ পড়েছে তাদের অজান্তে—সাধনার মার্গে তাঁরা ডুবে আছেন। এই পৃথিবীর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ নেই—অবিনশ্বর ব্রহ্মকেই তারা আবিষ্কার করার প্রতি মনোযোগী। সাধনার উঁচু-নীচু বিভিন্ন স্তর আছে। আমাদের এই আশ্রমের বাবাজীও মনে হয় কয়েকটি নীচু স্তরের ক্ষমতায় বলীয়ান্ হয়ে বিভীষিকাময় অরণ্যের দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে গৃহীদের মাঝে নেমে এসেছেন ভোগের প্রলোভনে। এই বাবাজীর এক অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক শক্তি আছে—যে কোন লোককেই তিনি বশীভূত করতে পারেন। মনে হয়, সম্মোহন বিদ্যায় ইনি পারদর্শী। ইংরাজীতে "মিষ্টিসিজম্" বলে একটা কথা আছে—আমার মনে হয় এই বাবাজীও পূর্ব্বোক্ত দলের এক জন "মিষ্টিক্"। যে অলৌকিক শক্তিতে অন্যকে ভুলিয়ে মায়াময় মোহের সঞ্চার করতে পারা যায়—এই বাবাজী সেই শক্তিরই উপাসক। অন্য যে কোন জীবের দেহ ও রূপ ধারণ করেও এঁরা বেঁচে থাকতে পারেন—এমন কি তাঁদের দেহাবসানের পরেও। এই শক্তির বলেই সিভিল সার্জ্জেনের বিলাত ফেরৎ বিদুষী মেয়ে থেকে ডাঃ ব্যানার্জ্জীর নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী পর্য্যন্ত এই আশ্রমের অন্তঃপুরিকা হয়ে বাড়ী ও আপনার প্রিয়-পরিজনদের কাছে যেতেও অস্বীকার করেন। আশ্চর্য্য যে, এত দিন এই সব ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখেও নিজের অমঙ্গলের ভয়ে সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা এ ব্যাপারে চুপ-চাপই ছিলেন—নেহাৎ অমৃতলাল বাবুর……। যাক্, এতক্ষণে আমার নির্দ্দেশে হাবিলদার ও তার জনা পঁচিশেক পুলিশ বোধ হয় আশ্রম ঘেরাও করে ফেলেছে। আমার কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। তবে ও কি সহজে ধরা দেবে? ভাগ্য যদি সহায় হয় তাহ'লে চল্লিশ বছর আগের চট্টগ্রামের এক ক্ষুদে জমিদারের তিনটি নিরীহ প্রজার খুনের কিনারা কোরব—একটু বাদেই তার যবনিকা উঠবে।'

গাড়ী দু'টো ঝড়ের বেগে 'দেবী-আশ্রমের' ফটকের সামনে এসে থামল। মিঃ চৌধুরী লাফিয়ে নেমে পড়লেন—পেছু-পেছু আরি সবাই। বিরাট সাদা পাঁচীল আর দেউড়ী অতিক্রম করে তারা আশ্রমের অভ্যন্তরে ঢুকলেন—আশ্রমের চারি ধার ঘিরে পুলিশেরা দাঁড়িয়ে আছে। যাতে একটি ছুঁচও না বাইরে যেতে পারে। পুলিশ দলের হাবিলদার দৌড়তে দৌড়তে এসে দীর্ঘ স্যালুট করে দাঁড়াল—হাঁফাতে হাঁফাতে বললে: 'স্যার। পুলিশ চার ধার ঘিরে ফেলার পরই ভেতর থেকে দু'-দু'বার বন্দুকের আওয়াজ হয়েছে। মনে হয়…'

'কি দেখলে ভেতরে?'

'আজ্ঞে, আপনার অর্ডার ছাড়া ভেতরে যাই কি করে?'

'Idiot!' মিঃ চৌধুরী বিরক্তি ভাবে বললেন। 'কেউ ভেতর থেকে বাইরে যায়নি তো?'

'আজ্ঞে না হুজুর, তেমন বিশেষ কেউ নয়—শুধু একটা বড় কালো কুচকুচে বেড়াল……!'

মিঃ চৌধুরী এক রকম দৌড়তে দৌড়তে বাকী জমিটুকু পার হলেন—তার পরে নাতিদীর্ঘ শান-বাঁধান এক রাস্তা, তার দুপাশে ফুলের বাগান। বাড়ীতে ঢুকে বিরাট ভেনিশিয়ান গ্লাস লাগানো দরজাটা খুলতেই তার চোখে পড়ল প্রশস্ত মোজেক্-করা চক্‌চকে মেঝেতে বসে আশ্রমের অন্তঃপুরিকারা আঁচলের কোণায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় মুহ্যমান। মিঃ চৌধুরীর পেছু-পেছু আগ্রহাতিশয্যে আর সবাইও তখন ভেতরে পৌঁছে গেছেন। মিঃ চৌধুরীর কোমরের রিভলভার তাঁর হাতে চলে এল অজান্তে। প্রত্যেকটি ঘর তল্লাস করতে করতে একের পর এক ঘর অতিক্রম করলেন মিঃ চৌধুরী—ডান পাশ ফিরে চিক্-ফেলা ঘর অতিক্রম করে তিনি বাবাজীর শোবার ঘর দিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে এসে পৌঁছলেন—তার পরেই বাবাজীর বাথ-রুমের দরজা। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দামী মার্ব্বেল পাথরের মেঝেতে বাথরুমের ভেতর এক বিরাট দেহ পড়ে আছে। মৃতদেহের রক্তাক্ত মুণ্ডুটার কাছে একটা জার্ম্মাণ রিভলভার পড়ে আছে। স্বামী বিরজালাল বোধ হয় আত্মহত্যা করেছেন, আর নবনীতা কাঁদছে অঝোর ঝরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে তার গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে।

সুপ্ত প্রেম

কাঞ্চন মিত্র

মঞ্জুরাণী রূপে-গুণে মুগ্ধ করেছিল কলেজের সহপাঠিনীদের শুধু নয়, সহপাঠীদের পর্য্যন্ত। যখন বসে থাকতো তখন অনেক হিংস্র-কাতর দৃষ্টি নিবদ্ধ হত মঞ্জুরাণীর প্রতি। পড়া-শুনা আর রূপের জৌলসে সে হারিয়ে দিয়েছে বহু প্রতিপক্ষকে। কিন্তু একটি মাত্র দোষ—ঈশ্বরের সবটুকু আশীর্ব্বাদ মঞ্জুরাণীর ভাগ্যে বর্ত্তায়নি। মঞ্জুরাণী যখন চলা-ফেরা করতো তখন উৎসুক ছাত্র-ছাত্রীর দল দেখতো তার সেই একটি মাত্র দোষ—মঞ্জুরাণীর পা দু'টো সমান নয়। আহা, মঞ্জুরাণী বিধাতার শেষ আশীর্ব্বাদটুকু থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মঞ্জুরাণী তার জন্ম থেকে খোঁড়া। তবে, সে যখন বসে থাকতো কেউ বুঝতে পারতো না। না চললে কেউ দেখতে পেতো না।

যারা ভদ্র, যাদের শালীনতা জ্ঞান আছে তারা এই প্রসঙ্গ তুলতো না মঞ্জুরাণীর সামনে। যারা তা নয়, তারাই শুধু বারে-বারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো মঞ্জুরাণীকে। বলতো,—কেন এমন হল?

মঞ্জুরাণী হাসতে হাসতেই বলতো,—তা তো জানি না। ভগবান জানেন।

বিনম্রতার কি কারণ। কিন্তু সুবিনয় তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকতো যেখানে থাকতো মঞ্জুরাণী। চোখের আড়ালে গেলেই যেন তার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হতো।

সুবিনয়ের আবার সাহিত্যের বাতিক ছিল। গল্প-উপন্যাস লেখার বহু চেষ্টা ও কসরতেও যখন একেবারে বিফল হল তখন শুরু করলো সমালোচনা লিখতে। সে সব লেখায় নিজের বুদ্ধির দৌড়ের চেয়ে থাকতো কত বিদেশী কেতাব তার হাতের কাছে আছে তারই ফিরিস্তি। অজ্ঞ লোকের ধারণা হতো লেখকের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতি বিচিত্র। আর যারা বুঝতে পারতো সে সব লেখার দৌড়, তারা সুবিনয়ের সামনেই হাসাহাসি করতো। তবুও সুবিনয় সাহায্য প্রাপ্ত বইগুলির তালিকা-দেওয়া লেখা প্রকাশ করতো বহু পত্র-পত্রিকায়। আর রাত্রি বেলায় স্বপ্ন দেখতো—ঐ মঞ্জুরাণী পড়ছে তারই লেখা—পড়তে-পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেছে মঞ্জুরাণী!

কিন্তু ঈশ্বরের এমনই খেলা মঞ্জুরাণীর হাতে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন সাময়িক পত্রিকা কোন দিন দেখতে পেতো না সুবিনয়। তবুও লেখা ছাড়তো না সুবিনয়। যদি কোন দিন চোখে পড়ে মঞ্জুরাণীর! প'ড়ে যদি মঞ্জুরাণী কোন রকম একটা মিষ্টি প্রস্তাবই ক'রে ফেলে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে।

সুবিনয়ের নজর পড়েছিল মঞ্জুরাণীর দিকে।

কত রাতে স্বপ্ন দেখতো সুবিনয়। মনে-মনে মত কল্পনার রঙীন জাল বুনতো। মঞ্জুরাণীকে দেখলেই দেঁতো হাসি হাসতে চেষ্টা করতো। বিনিময়ে একটুও হাসতো না মঞ্জুরাণী। বরং বিস্মিত হতো এই সতীর্থের অকারণ হাসি দেখে যখন-তখন। মঞ্জুরাণী লজ্জিত হত। ভাবতো, হয়তো তার এই দোষ দেখেই হাসছে ঐ ছেলেটি। কিন্তু সুবিনয় সে জন্য হাসতো না। হাসতো, যদি এই হাসির পালা থেকে কোন দিন শুরু হয় নীড়-বাঁধার পালা। সুবিনয়ের স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত হয়।

কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'লেই পরম লজ্জায় পাশ কাটিয়ে চলে যেতো মঞ্জুরাণী। ফর্সা গাল দু'টো তার রাঙা হয়ে উঠতো শুধু। সারা কলেজের কেউ বুঝতে পারতো না মঞ্জুরাণীর এই সলজ্জ

পাঁচ বছর অতীত হয়ে গেছে।

সুবিনয় লেখা-পড়ার পাঠ চুকিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে। দুঃখের বিষয়, মঞ্জুরাণীকে পাওয়ার স্বপ্ন তার সার্থক হয়নি। যাকে সে পেয়েছে—মানে যাকে লাভ করেছে সে না কি সুবিনয়ের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। সুবিনয় যখন জানতে পেরেছে তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সুবিনয় মেনে নিয়েছে এই ভাগ্যের পরিহাস!

আর মঞ্জুরাণী? তার বিয়ে হয়েছে যার সঙ্গে, সেও এক জন সাহিত্যিক। হরবিশ্বজিৎ মৈত্র—যার মৌলিক লেখা কত দিন পড়তে পড়তে মনের সঙ্গোপনে হিংসা ফুটে উঠেছে সুবিনয়ের। মঞ্জুরাণীর বিয়ের খবরটা শুনে আরও এক বার হিংসা জাগে তার মনে। মনে মনে মঞ্জুরাণীর মুখখানার সঙ্গে সে যেন কথা কয়। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লিওনিড সোবোলেভ

লিউবা যখনই ওয়ার্ডটাতে ডিউটি দিত, মনটা তখন আমাদের চমৎকার থাকত। প্রাণবন্ত আর প্রীতিময়ী হয়ে সকাল বেলা ছোট, নরম স্লিপার প'রে ওয়ার্ডটাতে ঘুরে বেড়াত সে। এক ঝলক রোদ্দুর যেন। কড়া শীতের চিকণ, ঠাণ্ডা প্রবাহে তখনও গালটা তার কিন্‌কিন্ করত। হাসিখুসী, নিষ্কলুষ চোখ দু'টো নেচে বেড়াত তার চিক্‌চিকে হ'য়ে, আর সর্ব্বশেষ বিছানা থেকে পা-বিহীন মেজরটা ঠিকই চেঁচিয়ে ব'লে উঠত: "কুমারীর গাল গোলাপের চেয়েও [illegible] না, আঁই না?"

"ঠিকই!" শীতে-ধরা আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে পরিষ্কার নিনাদিত কণ্ঠে উত্তর দিত সে।

হাত দু'টো পিঠের দিকে রেখে বড় কালো স্টোভটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত সে—রোগা, শাদা প্রাণী। তার গম্ভীর ভাবটা শিশুর মত সরল আর হৃদয়গ্রাহী। হাত দু'টো গরম করতে করতে এ বাইরের যত গল্প এক মিনিটে বলে যেত। সকালের যুদ্ধ বুলেটিন, ভিজে জ্বালানী কাঠ নিয়ে কি হয়েছে, খাওয়ার জন্য রান্না-ঘরে রান্না হচ্ছে আর গত কালের বায়স্কোপের কথা। একটু একটু কো

ওয়ার্ডের গোঁঙানী ভাবটা শান্ত হয়ে আসত, যাতনায় কুঞ্চিত মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠত, যুদ্ধের বিষণ্ণ, নিস্তেজ হাসপাতালের বাতাসটা ভারী হয়ে যেত, দুঃখ যেত হালকা হয়ে আর চিন্তিতেরা চোখ মেলে চেয়ে হেসে ফেলত।

তার পর সে তার সরু সরু আঙুলগুলো ঘাড়ের ওপরে রাখত। দেখত বেশ গরম হয়ে উঠেছে কি না। পূর্ব্ব সংস্কারের বশে তার ক্ষুদ্র নাসিকাটি কুঞ্চিত করত, অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে ওয়ার্ডটাতে চোখ বুলিয়ে নিত. ঠিক করত কোন্‌খান থেকে আরম্ভ কোরতে হবে। তার পর চক্কর দিতে শুরু করত।

ক্ষিপ্র অথচ ধীর ভাবে সব কিছুই করত সে। এক কৌটা জলও বালিশে না ফেলে সে লোকের মাথা ধুইয়ে দিত। যার পোষাক সরে গেছে, তার পোষাক দিত ঠিক কোরে। যারা চিঠি লিখতে পারতো না, তাদের চিঠি লিখে দিত। কোনো রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখলে তখনি ডাক্তারকে খবর দিত, কোনো আহত লোকের সংশয়াবস্থা উপস্থিত হলে প্রাণপণ কোরে তার জীবনের জন্তে লড়াই করত। সরল ধৈর্য্যের অতীত বলে মনে হত যাদের, তাদেরকে সান্ত্বনা দিত, আর তার পর শান্ত উপশমকারী নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিত।

সবাই আমরা তাকে পছন্দ করতাম, হয়ত ভালও বেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু বিদ্বেষের স্থান ছিল না আমাদের ওয়ার্ডটাতে। কোন এক অবসর সময়ে সে যদি একটা লোকের পাশে বসে "বুড়ী মেয়ে" খেলা খেলতে বসতো, তখন সবাই আমরা বুঝতাম যে, সেদিন সে লোকটা আমাদের আর সবার থেকে বেশী অসুস্থ বোধ করবে।

সেদিন হিসেব মত আমিই প্রথমে তাস খেলব। আগের রাত্তিরটায় ঘুমোইনি. গল্পটার সাথে সম্বন্ধ নেই এম্‌নি সব জিনিষ নিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। সকাল বেলা তার স্বাগত সম্ভাষণের জবাবে মুখটাতে একটু হাসির ভাব টেনে আনলাম মাত্র।

বালিকার থেকে সামান্ত একটু বড় এই তরুণীটি তখনি কি কোরে যে অন্তের মন-খারাপটাকে ধরে ফেলল, সেইটাই আশ্চর্য্য। একবার মাত্র তাকাল আমার দিকে। তার পর চক্কর মেরে এক গোছা তাস নিয়ে আমার বিছানার কাছটাতে আসতে ভুলল না।

কিন্তু খেলা হলো না আমাদের। তার শিশুর মতন মুখ ম্লান হয়ে গেছে, হাস্যময়ী চক্ষু বিষণ্ণ। অকস্মাৎ মনে হলো আমার, যেন অনেক,—অনেক বুড়ো হয়ে গেছে সে। তাসগুলো ছোঁয়া হলো না, শাদা চাদরটার ওপরে পড়ে রইল। দুঃখের প্রতীক—স্পেডের দশ—বিষাদভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। মৃদু, মন-খোলা কথা ক'য়ে চললাম আমরা।

স্বামী তার ট্যাংক বহরের এক জন ক্যাপ্টেন। প্রচণ্ড সাহসী। সাহসের জন্তে পুরস্কৃত হয়েছে। তারই নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ এসেছে। পুরো একটা মাস ধরে তার সন্ধান পায়নি সে। দীর্ঘ একটি মাস তরুণীটি ওয়ার্ডটাতে আমাদের সূর্য্যকিরণ ছড়িয়েছে। অথচ সারা সময়টাই মনের মধ্যে কষ্ট পেয়েছে সে, হৃদয়ে যাতনা অনুভব করেছে। রাত্রে নিজের ঘরে শয্যায় বসে নিঃশব্দে সে

আগের দিনটায় স্বামীর এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে তার। উচ্চপদস্থ এক জন ট্যাংক অফিসার। অফিসারটি তার হাত ধ'রে বলেছে: "তোমাকে ঠকাবার চেষ্টা করব না আমি লিউবা। প্যাভেল শত্রু-অধিকৃত জায়গায় রয়ে গেছে। অন্ত সবাই ভেদ কোরে চলে এসেছে, কিন্তু সে ফিরতে পারেনি।" কান্না থেকে তাকে টেনে রাখবার জন্তে হাতটা চেপে ধরে তাকে বলেছে—"সাহস অবলম্বন করো লিউবা! সে ফিরতে পারে। বুঝতে পারো তুমি,—তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য অপেক্ষা করাটা একটা মস্ত আর্ট। অপেক্ষা করার প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন বলব তোমাকে, প্রতিজ্ঞা করছি।"

মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখলাম। তার চরিত্রের শক্তিকে নিজের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করলাম। তার দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ ভুলে গেলাম। কিন্তু আমার কুৎসিত আর স্বার্থপর পুরুষ-মনটার মধ্যে তাকে সান্ত্বনা আর আশা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। অথচ এই সান্ত্বনাই সে আমাদেরকে অকৃপণ ভাবে দান করেছে।

শেষ বেডের মেজরটা গোঁঙিয়ে উঠল।

লিউবা লাফিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে চলে গেল তার কাছে। আবার তার চোখগুলো আগের মত হয়ে উঠল। তার আঘাত,—তার নিজের আঘাত, অন্তের আঘাতকে পথ ছেড়ে দিল। তার বালিকা-সুলভ ক্ষীণ ঘাড়ের ওপরে কি বিরাট দুঃখের বোঝা যে চেপেছিল, তা ওয়ার্ডের কেউ-ই দেখতে পেল না।

একটু পরেই আমাকে সাময়িক ভাবে অন্ত হাসপাতালে বদলি করা হল, কিন্তু দু'হপ্তা পরে আবার পরিচিত ওয়ার্ডটাতে ফিরে এলাম। পুরোনো রোগীদের অনেকে ওয়ার্ড থেকে চলে গেছে, এসেছে নতুন রোগী। আমার পরের বেডটাতে এক জন বড়, নিশ্চল, মুখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা লোককে দেখতে পেলাম।

লোকটা এক জন ট্যাংকম্যান। তার মুখ এবং বক্ষঃস্থল গুরুতর ভাবে পুড়ে গেছে। মানুষের মুখের যা-কিছু পোড়া সম্ভব সব কিছুই পুড়ে গেছে তার: যেমন,—চুল, ভুরু, চোখের পাতার লোম আর সেখানকার চামড়া পর্য্যন্ত। শাদা, পাতলা কাপড়ের মাঝ থেকে তার রঙীন চশমার উদ্‌গত কালো কাচ অশুভ ভাবে তাকিয়ে আছে। কাচটা আলোটাকে বাইরে রেখেছে আর বিচিত্র ভাবে রক্ষে-পাওয়া চক্ষু-গোলককে বাঁচিয়ে রেখেছে ব্যাণ্ডেজের সংস্পর্শ থেকে।

এগুলির নিচে মুখের একটা ছিদ্র বেশ দক্ষতা আর চাতুর্য্যের সাথে তৈরী করা হয়েছে। এই ছিদ্র থেকেই কথা বেরুচ্ছে,—তার চিন্তা আর অনুভূতিকে বয়ে নিয়ে আসছে।

বিলম্বিত পীড়নকারী যন্ত্রণায় ট্যাংকম্যানটি কষ্ট পাচ্ছিল। পোষাক পাল্‌টে দেবার সময় যাতনা ভুগতে হয়েছে তাকে। তবুও বাঁচতে চেয়েছে সে। বাঁচতে চেয়েছে আর একবার নিজেকে ক্যাম্পদের মধ্যে ফেলবার জন্তে। বেঁচে থাকার এই ইচ্ছেটা তার ঝল্‌সানো ঠোঁট থেকে বেরিয়ে-আসা জিভ-জড়ানো অস্পষ্ট কথার মধ্যে ফুটেছে।

কথা বলতে ভালবাসত সে। তার অন্ধকারময়, নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী পাবার জন্তে সে লালায়িত ছিল। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নিশ্চল মুখ

থেকে বেরিয়ে-আসা কথাগুলি ছিল জড়ানো, অদ্ভুত। কিন্তু তার আহত, ভাঙা-চোরা কথাগুলো বুঝতে পারার পর শৌর্য্য, ঘৃণা আর বিজয়ের গল্প উদ্ধার করতে পেরেছি, উদ্ধার করেছি যুদ্ধের গোলমাল আর মৃত্যুর সংস্পর্শের কথা, শুনেছি আশা আর স্বপ্ন, স্বীকৃতি আর বিশ্বাস,—নিঃসঙ্গতারূপ ভূতের কাছ থেকে পলায়মান বাইশ বছরের লোক যা-কিছু তার বন্ধুকে সম্ভবতঃ বল্‌তে পারে, তার সব কিছুই। বন্ধু,—কারণ রাত্তের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি আমরা, যেমন করে পীড়া বা যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ বন্ধু হয় মানুষ।

সকাল হবার আগেই জেগে উঠেছি। তখনও বেশ অন্ধকার। জোরে নিশ্বাস পড়ছে ওয়ার্ডটার আর মাঝে মাঝে এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কঠিন পুরুষদেহের ভয়াবহ নিশ্বাস ভেদ করে গোঁঙানী বেরিয়ে আসছে। কোন শব্দহীন, শ্বেত ছায়া গোঁঙানীটার দিকে জোরে এগিয়ে আসছে না। বুঝতে পারলাম লিউবা ডিউটিতে নেই, অন্য নার্স—কেনিয়া সম্ভবতঃ ডিউটি দিচ্ছিল। শাদাসিদে রমণী এই কেনিয়া। বিগত-যৌবনা। অল্পেই সে শ্রান্ত হয়ে পড়ত, আর প্রায়ই ষ্টোভ্‌টার ধারে ঝিমুতো রাত্রে। হলটাতে গিয়ে ধূমপান করার জন্তে উঠলাম। ট্যাংকম্যানটি আমার সাড়া পেয়ে এক গ্লাস জল চাইল ("গিংকের" মত অদ্ভুত শোনাল তার কথা)। ভয় পেলাম, হয়ত লাগিয়ে দেবো কোথাও। নার্সকে তাই জাগাতে চাইলাম।

"জাগিও না," সে বললে। "ঠিক হবে'খন···"

সাবধানে কয়েক কুল্লি জল নল দিয়ে ব্যাণ্ডেজটার ফাঁকের মধ্যে ঢেলে দিলাম। ব্যাণ্ডেজের পাতলা কাপড়টা ভিজে গেল, বড্ড বেশী কুণ্ঠিত হলাম, মাপ চাইলাম।

"ও ঠিক আছে" পুনরুক্তি করে হাসল সে। কয়েকটা ক্ষীণ হাঁপানীকে যদি হাসি বলা চলে, তবে হাসিই বটে। "সেই-ই একমাত্র জানে, কেমন কোরে···বুঝতে পারবে, নিজের মুখ দিয়েই পান করছ···"

"সে কে?"

"আমার প্রিয়া···"

প্রেমের এক অস্বাভাবিক কাহিনী শুনলাম।

এক জন রমণীর কথা বললে সে। তাকে কখনও দেখেনি, দেখতে পায়েনি। রাশিয়ার পুরানো প্রিয় নাম "ছোট্ট প্রিয়া" বলেই সে ডাকত তাকে। একেবারে প্রথম দিনেই ঐ নামে ডেকেছে, ব্যগ্রতা আর দরদ আন্দাজ করেছে তার। ঐ নামেই ডেকে এসেছে, তার দগ্ধ ওষ্ঠ সে নাম উচ্চারণ করতে পারেনি। ভাবলাম ওর বিকল ওষ্ঠাধর থেকে ও-নামটা সত্যই অদ্ভুত শোনাত— "লুহা কিংবা লিউশা···"

সব চেয়ে বেশী দরদ আর গর্ব্বের সাথে তার কথা বলছিল সে। আর বলতে আশ্চর্য্য লাগে, আসক্তিরও সাথে। চেঁচিয়ে স্বপ্নের কথা বললে। তার ছবি এঁকে নিয়েছে মনের মধ্যে। তার মুখ, চোখ আর হাসির বর্ণনা দিল। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম তার এই প্রেমের পূর্ব্বজ্ঞান দেখে। খাটো-গলায় বললে সে যে, তার চুলের কথা সে জানে। নরম, রেশমী চুল, শিরোপার নিচে ওল্টানো। একবার চুলটা ছুঁয়েছিল সে, তার হাতড়ানো আঙুল দিয়ে থার্মোমিটারের খাপটা খুঁজতে যখন সাহায্য করেছিল তাকে। রাত্তের টেবিলটার নিচে পড়ে গিয়েছিল খাপটা। হাতের কথা বলল তার,—কত নরম, সবল আর তুলতুলে। সে হাত ঘন্টার পর ঘন্টা সে ধরে থেকেছে, আর নিজের কথা, তার বাল্যকাল, যে কাজ সে দেখেছে, ট্যাংক বিস্ফোরণ, তার নিঃসঙ্গতা আর ভয়াবহ পঙ্গু-জীবনের কথা বলেছে তাকে। এই পঙ্গুতাই তার জন্তে অপেক্ষা করছিল।

প্রিয়ার সমস্ত সান্ত্বনার কথাই বললে সে আমাকে। তার আশার সমস্ত কোমল কথা। আর, আবার সে যে দেখতে সক্ষম হবে, বেঁচে উঠে যুদ্ধ করতে পারবে, প্রিয়ার সেই বিশ্বাসের কথা। মনে হল যেন লিউবার গলা শুনতে পাচ্ছি। ফিস্‌-ফিস্‌ করে খাটো-গলায় সে আমাকে বললে যে, আগামী কালটাই চূড়ান্ত দিন: প্রফেসর তার রঙীন চশমাটা সরিয়ে ফেলবে বলে কথা দিয়েছে। বলেছে, সে দেখতে সক্ষম হবে। "ছোট্ট প্রিয়ার" কাছে এ কথা বলেনি সে। যদি অন্ধই হয়ে যায়, কি হবে তখন? তাকে সে কষ্ট দিতে চায়নি। সে কি জানতো না, তার মুখটা কত মনোরম আর তুলতুলে? চোখ কি দেখেনি তার, আর যে প্রেম সে-চোখে চিক্‌চিক্‌ করত? তার পর আরো কিছু ছিল: প্রিয়া বলেছিল তাকে যে, বৃহৎ অপারেশান করলে তার ভুরু, চক্ষু-পক্ষ্ম আর তাজা গোলাপী চামড়া ফিরে পাবে সে। তেমন নতুন মুখ পেতে হলে যে তাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, তা সে জানতো। কিন্তু প্রিয়ার জন্তে সব কিছুই সে সইতে রাজী।

হ্যাঁ, প্রিয়া তার। গর্ব্বের সাথে কথাটা আবার সে বললে। স্বামী তার ফ্রন্টে মারা গেছে; সে তারই মত নিঃসঙ্গ। তা চেয়েও ভাগ্য খারাপ তার,—সে শুধু মুখটা হারিয়েছে, কিন্তু সে হারিয়েছে তার প্রিয়তমকে। দীর্ঘ, রাত্রিগুলোতে পরস্পরকে ভাল ভাবে জেনেছে তারা। মৃত্যু যেথায় ঘুরে বেড়ায়, প্রেম এসেছে, সেইখানে; প্রেমে-আনা জীবনটা নিজের ওপরে নির্ভর করতে সাহায্য করেছে তাকে। কারণ, এমন এক সময় ছিল যখন নিজেকে গুলী করতে চেয়েছিল সে। এমন মুখ নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি তার?······

"আমাকে বলেছে সে: মুখে তোমার যাই হোক্‌ না, কি যায়-আসে তাতে। তোমাকেই ভালবাসি, তোমার মুখকে নয়, বুঝলে?"

তার পর কেঁদেছে সে। এই মাত্র বুকটা তার আনন্দে ভ'রে ছিল। সেই বুক জোরে জোরে ওঠা-নামা করছে, কষ্টে নিশ্বাস পড়ছে। এই দেখেই কান্নাটা বুঝলাম তার।

তাকে বিরক্ত না করার চেষ্টা করলাম। নিঃশব্দে নিজের বিছানাটায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে লিউবার কথাই ভাবছিলাম। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছিলাম তার অদ্ভুত ভাগ্যের কথা। এই কি সত্যিকারের ভালবাসা,—মহৎ নারী-মনের গহন প্রেম? অথবা সমবেদনা, যা প্রায়ই প্রেমের অনুরূপ হয়? কিংবা হয়ত স্বাভাবিক দুঃখ, প্রচণ্ড বিরহ, অথবা তার হারাণো মানুষকে—ট্যাংকম্যান, বীর, যোদ্ধাকে ফিরে পাওয়ার তৃপ্তি?···সকালের জন্তে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, অপেক্ষা করলাম নার্স বদলের জন্তে। তখন লিউবার চোখের জবাব বুঝব। তার চোখের ভাষা বোঝা শক্ত ছিল না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জাগলাম দেরীতে। ওয়ার্ডের রুটিন আমার জানা ছিল। তাই নার্স'রা যে পালটে গেছে, তা বলতে পারতাম। কিন্তু লিউবা ছিল না। ট্যাংকম্যানটার কাছে গেলাম, জিগ্‌গেস করলাম কেমন আছে।

"চমৎকার", সে উত্তর দিলে। "আমার পোষাকের ধান্দায় গেছে সে। শুনুন দেখি, প্রফেসারের কথা নয়।" সত্যি সত্যি আজ কি দেখতে পাবো ?'

গলার আওয়াজ থেকে বুঝলাম হাসছে সে।

"তুমি তো তাকে জানো। জানো না ? সুন্দরী তো সে ?"

"হ্যাঁ, সত্যই সে সুন্দরী"—সে উত্তর দিলে।

আবার সে বললে কেমন ক'রে সেদিন সে দেখবে তাকে। তার পর সহসা নিস্তব্ধ আর নির্জিত হ'য়ে প'ড়ে ওর নরম স্লিপারের পট-পট শব্দ শুনতে লাগল ; এই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার ভেতর থেকে কি করে যে শব্দটাকে চিনল সে, সেইটাই আশ্চর্য। কিংবা হয়ত প্রেমের অনুভূতি-ভরা কান দিয়ে শুনেছিল ?

"তারই পায়ের শব্দ,"—অসীম আবেগে বলে উঠল সে। "আমার ছোট্ট প্রিয়ার।"

চারি দিকে তাকালাম। দেখলাম ফেনিয়া আসছে ; স্পষ্টই কয়েক ঘণ্টা দেরী করিয়েছে তাকে। রোগীকে ঠিক করতে চাইলাম আমি।

"এই যে ফেনিয়া," চললাম আমি। "লিউবা আসছে শীগ্‌গির ?"

"আরে, তুমি!" বললে সে। "আবার তাহ'লে ফিরে এলে এখানে ? লিউবা চলে গেছে—তার স্বামীকে খুঁজে পেয়েছে সে। তিনি আহত।"

ট্যাংকম্যানটার পাশে সে বসে পড়ল।

"প্রিয় ফোলিয়া," বললে সে কোমল ভাবে। "সাহস সঞ্চয় করো, —এইবার পোষাকটা পালটে দেওয়া হবে···"

—ঝিঁচুনির সাথে হাতটা লম্বা করে দিলে সে। তার সৈনিকের হাত, যে সৈনিক মরণের কাছে গিয়ে পড়েছিল। যন্ত্রণার ভয়ে কাঁপছিল সে। হাতটা তখনি ফেনিয়ার হাতের মধ্যে দিল। স্পষ্টত: পোষাক পাল্‌টানোটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। অন্য হাত দিয়ে ফেনিয়া সেটাকে ঢেকে দিলে। এল দীর্ঘ, বাগ্মী নিস্তব্ধতা। মৃদু ভাবে হাতটাতে ঘা দিলে সে, আঙুল নিয়ে খেলা করল, আর কালো ঠুলির মাঝে তাকিয়ে-থাকা আঁখিতে প্রেমের উষ্ণ, মন্থর আগুন জ্বলজ্বল্ করতে লাগল।

ফেনিয়ার মুখের দিকে চাইলাম। সাধারণ মুখ। উদাসীন ভাবে রোজই সে মুখের দিকে তাকিয়েছি আমরা। মুখের পরিবর্ত্তন দেখে আশ্চর্য্য হলাম। বুড়োটে, শ্রান্ত মুখ প্রেমের উদ্দীপনায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। রুগ্ন মায়ের সরল মুখ, বিশ্বাস আর দুঃখময় কারুণ্যে ভরা। ফেনিয়ার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে এক পাশে মুখ ফিরাল সে, ওর হাতে চোখের জল পড়তে দেবে না। কিন্তু মৃদু নড়া-চড়াতেই সে টের পেল।

"ছোট্ট প্রিয়া, প্রিয়তমে, কি হল ?"

আর আশ্চর্য্য ব্যাপার,—সজীব আর উৎফুল্ল ভাবেই কথা সুরু করল ফেনিয়া, দরদী কথা দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল তাকে। ওদিকে চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে তার, কঠোর দুঃখ মোচড় দিচ্ছে মুখে। ব্যাকুল কথাবার্ত্তা উচ্চারিত হতে লাগল। তার পর দ্বারের দিকে সে দৃষ্টি ফেরাল, আর আশাহীন নীরব দুঃখে চোখ ভরে গেল তার। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম : ছোট্ট একটা শয্যা-গাড়ী গড়িয়ে আনছে। বুঝলাম তার কান্নার কারণটা। আসন্ন যন্ত্রণার ভয় করছিল সে।

ট্যাংকম্যানটাকে শয্যা-গাড়ীতে শুইয়ে দেওয়া হল, আর ফেনিয়া পাশে-পাশে চলতে লাগল তার। হলটা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম তাদের। অপারেশন-ঘরের দোরের কাছে থেমে পড়ল ফেনিয়া। শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। দোরের বাজুতে মাথাটা রেখে অঝোরে সে কাঁদতে লাগল। তার কাঁধে হাত দিলাম। আমার দিকে সে চোখ তুলল।

"আজ সকালে প্রফেসর বলেছে আমাকে···প্রফেসর···" কথা সে বলতে পারলো না।

"জানি", বললাম আমি। "কিন্তু, আগে থেকে অধীর হচ্ছো কেন ?···নিশ্চিত জানি, চোখে সে দেখতে পাবে।"

মাথা নাড়ল সে, যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

"ঠিকই বটে ! আমাকে দেখবে সে···আমার মতন নারীর কাছে কি সে চাইবে ?···কেন তাকে এমন ঘুরিয়ে নিতে হল ? কেন সে অবাধ্য হতে দিল তার মনকে ?···সুন্দর, সুন্দর···ওঃ, একা থাকতে দাও।" সহসা হাঁপাতে লাগল সে, অপারেশন-ঘরের দোরটাতে জোরে কানটা রাখল।

প্রফেসরের উৎফুল্ল স্বর শুনতে পেলাম : "প্রথমটা ভালই হবে। আর মাত্র এক হপ্তা অন্ধকারে থাকুন।"

মড়ার মত বিবর্ণ হয়ে গেল ফেনিয়া, ভয়াবহ নৈরাশ্য এল। দ্রুত হল দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তার পর থেকে কেউ তাকে দেখেনি হাসপাতালে। পরে শুনেছি, নিজের সহরেই ফিরে গেছে সে।

অনুবাদক—আবদুল হামিদ

চৈত্র-সংক্রান্তি

শ্রীকামিনীকুমার রায়

চৈত্র-সংক্রান্তি বাংলা বৎসরের শেষ দিন। এই দিনের অপর নাম মহাবিষুব সংক্রান্তি। এই সংক্রান্তি উপলক্ষে শত রকমে বিধ্বস্তপ্রায় পল্লীবাংলা আজও উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। কত যে সে উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, আচার-বিধি পালিত হয়, কত স্থানে যে কত মেলা বসে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিবভক্তদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব 'শিবের গাজন' বা 'চড়কপূজা' সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্ব্বে এই বসুমতীর পৃষ্ঠায়ই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আজ অন্যান্য বিষয়ে বলিব।

গো-অর্চ্চনা

চৈত্র-সংক্রান্তির একটি প্রধান উৎসব—গোরুর স্নান-পূজা। ইহা একরূপ সারা বাংলায়ই প্রচলিত আছে এবং আসামেও ইহার সমারোহ দেখা যায়। সেদিন হালচাষ সব বন্ধ থাকে। প্রহর না হইতেই গৃহস্থেরা নিজ-নিজ গোরুর পাল লইয়া নানা দিক হইতে আসিয়া কোনও বিল, ঝিল বা নদীর তীরে সমবেত হয়। প্রধানত কোথাও তাহাদের হাতে থাকে নিম-নিসিন্দা ও মঠথিলার পাতা, কোথাও থাকে 'ইকর' বা 'বাতা' গাছ (খাগজাতীয় গাছ); কোথাও বা (আসামে) তাহারা সঙ্গে করিয়া আনে বাঁখারি বা কঞ্চিতে গাঁথিয়া লাউ-কুমড়ার খণ্ড। গোরুগুলি যখন বিভিন্ন পথ ধরিয়া জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন মনে হয় যেন তাহাদের শোভাযাত্রা চলিয়াছে! যাত্রাশেষে আরম্ভ হয় স্নানের পালা! প্রত্যেকে তখন গোরু বাছুর লইয়া হৈ-চৈ করিয়া জলে নামে এবং পূর্ব্বোক্ত নিম-নিসিন্দার পাতা ও লাউ-কুমড়ার খণ্ড দ্বারা সেগুলিকে ডলিয়া মলিয়া স্নান করায়। এই সময়ে গোরুর স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি কামনা করিয়া নানারূপ ছড়া আবৃত্তি করিতেও শুনা যায়। 'ইকর' গাছ সঙ্গে নেবার প্রথা যাহাদের আছে, তাহারা সেগুলি গোরুর পিঠে ছোঁয়াইয়া জলে পুতিয়া রাখে এবং বলে "আমি দিই বিষুকাটি, গোরু-বাছুর হোক্ লোহার কাটি।"

স্নানপর্ব্বের শেষে গোরুগুলিকে গোশালায় আনিয়া উত্তম ঘাস ও খড় ভুষি দেওয়া হয় এবং শিঙ্গায় তৈল, কপালে আবীর সিন্দুর, গায় পাখার বাতাস ও পায় ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া প্রণাম করা হয়। কোথাও কোথাও প্রথানুযায়ী এই দিন গোরুর কপালে কিংবা সর্ব্বাঙ্গে পিটুলি ও আবীর গুলিয়া ছাপ দিতেও দেখা যায়। সর্ব্বশেষে গোরু-বাছুরের বুকে একটি পাথর (নোড়া) ছোঁয়াইয়া বলা হয়, 'পাথর হয়ে বেঁচে থাক্।'

গোরুর এই স্নান-পূজা উপলক্ষে গোশালাটি বিবিধ লতা-পত্রে সাজানো হয়। 'কুমারিয়া কাঁটা' নামে এক প্রকার কাঁটা-লতার গাছ দরজার উপর এবং এরণ্ড ভেরণ্ডের ডাল বেড়ায় গুঁজিয়া দেওয়া হয়; এই সময় ঝড়-তুফানকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়,—"এরণের ছাউনী, ভেরণের থাম,—ছুইস্ না, ছুইস্ না, এই ঘরে তোর ভাগ্নে-বউ থান।" এই দিন গোশালায় যে ধূমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় তাহার বিশেষত্ব আছে। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন হইতেই ইহার আয়োজন-উদ্যোগ চলিতে থাকে। পথ চলিতে ডাইনে-বামে যে সমস্ত লতা-গুল্ম গাছ-গাছড়া চোখে পড়ে, তাহারই কতক কতক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গোশালায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। চুতুরা (বিছুটি), ধুতুরা, ভাঁইট বাকস্ নিম-নিসিন্দা, মঠথিলা—কিছুই বাদ যায় না, ঘুঁটে ও খড় সংযোগে সেগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আসামে গোরুর এই সেবাপূজাকে 'গোরু-বিহু' বলে এবং 'গোরু বিষু'র পরদিন তাহারা 'মানুষ বিহু' উৎসব প্রতিপালন করে। সে উৎসবে অসমীয়াদের অনেকে তেল-হলুদ মাখিয়া স্নান করে; নাচ-গান আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়; বিবিধ উপাদেয় খাদ্য আহার করে।

বিবিধ আচার ও বিশ্বাস

বাংলার অনেক স্থানেই চৈত্র-সংক্রান্তি-দিন স্নান করিয়া আসিয়া পরিবারের প্রত্যেকে দুই মুঠ ছাতু লইয়া তে-মাথায় (যেখানে তিনটা রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে) যায়, এবং দুই পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন দিকে তাহা উড়াইতে উড়াইতে তিন বার বলে, "ছাতু যায় উইড়া, দুষমণ বাদী মরে পুইড়া।" বরিশালের দিকে শুনা যায়, "শত্রু উড়াইলাম, শত্রু উড়াইলাম।" শত্রু নিপাত করিবার এমন সহজ উপায় পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না জানি না, বিজ্ঞানীরা উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু পল্লীবাসীরা কোন্ সে অতীত হইতে সরল বিশ্বাসেই এইরূপ করিয়া আসিতেছে।

পল্লীবাসীদের আর একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস, সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন দেয়ায় (মেঘ) ডাকিলে সাপের ডিম নষ্ট হয়, নতুবা বংশবৃদ্ধি-হেতু সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ঐদিন গৃহিণীরা লাউ, কুমড়া, উচ্ছা, ফল-ফুল ইত্যাদির বীজ কিংবা চারা রোপণ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কারণ ঐ দিনের গাছে না কি গিঁটে-গিঁটে ফল ধরে! তুলসী বৃক্ষের উপরে এবং বটের মূলে জলধারা দেবারও এই দিন রীতি আছে। আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতিকে 'শক্ত ও জলপূর্ণ-ঘটদানের' ব্যবস্থা তো শাস্ত্রেই দেখা যায়। কোন কোন পরিবারে এই মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ভগিনী ভ্রাতাকে ছাতু কলা ও গুড় মাখিয়া বর্ত্তুলাকারে অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যের সহিত পরিবেশন করিয়া থাকে, ইহাতে না কি ভ্রাতার আয়ু বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত এই দিন অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুই স্বর্গত আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে জলদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

পশ্চিম-বাংলার ব্রতাদি

প্রথমেই বলিয়াছি, চৈত্র-সংক্রান্তিতে পল্লীবাংলার আচার-অনুষ্ঠানের শেষ নাই। পশ্চিম-বাংলার ভাগীরথী অঞ্চলের গৃহিণীরা এই দিন মনোজ্ঞ অনেক ব্রত আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত, নিত্যি সিঁদুর, আদাহলুদ, রূপহলুদ, ফল গছানো, গুপ্তধন, মধু-সংক্রান্তি, ঘৃত-সংক্রান্তি, ছাতু-সংক্রান্তি, দর্পণ-সংক্রান্তি, তেজদর্পণ, আদর-সিংহাসন, বাচা-পান প্রভৃতি প্রধান। প্রত্যেকটি ব্রতেরই উপকরণ অতি সামান্য এবং সহজলভ্য, বিধি-বিধানও অনায়াসসাধ্য। ইহাদের পরিকল্পনায় দেবতার কোনও স্থান নাই, আছে—প্রত্যক্ষ ভাবে অপর মানুষের সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টি-বিধানের ভিতর দিয়া আপনার মনোবাসনা সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত মেয়েরা বিবাহের বৎসরে কিংবা পর-বৎসরে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে লইয়া থাকে। এয়োর পা ধোয়ানো, এয়োকে আলতা পরানো, তেল মাখানো, এয়োর হাতে লোহা রুলি দেওয়া, এয়োকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করা এই ব্রতের প্রধান করণীয়। নিত্যি সিঁদুর ব্রতও অনেকটা এইরূপ।

রূপহলুদ ব্রতে এক জন এয়োর কপালে হলুদ বাটা ছোঁয়াইয়া তাহার মাথা আঁচড়াইয়া সিঁদূর পরাইয়া দিতে হয় এবং বিকালে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয়।

আদর-সিংহাসন ব্রতে সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর প্রত্যহ প্রাতে এক জন সধবা ও এক জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

বাচা-পান ব্রতে দুই খিলি পান খুব ভাল ভাবে তৈয়ার করিয়া বাপকে খাইতে দিতে হয়। ছাতু-সংক্রান্তি ব্রতে মাটির সরাতে করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাতু গুড় পৈতা পয়সা প্রভৃতি দান করিতে হয়।

এই সকল ব্রতের কোনটির ফল—সুখ-সৌভাগ্য, কোনটির ফল মান, কোনটির ফল রূপ, কোনটির বা স্বামি-সোহাগ। অনেকটিতেই কামনানুরূপ দানের ব্যবস্থা দেখা যায়। হিন্দু সধবারা আকাঙ্ক্ষা করেন, মরণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাঁখা-সিঁদূর যেন অক্ষয় থাকে, তাই তাঁহারা এয়ো-সংক্রান্তি ব্রতে অপর এক জন সৌভাগ্যবতী এয়োকে ঐ সব জিনিষ সাধ্যমত দান করেন। তেজ-দর্পণ ব্রতে ব্রতিনী ব্রাহ্মণকে মাত্র ৫টি বেলপাতা, ৫টি সুপারি, ১টি পৈতা ও ১টি পয়সা দিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, তিনি তেজের সহিত দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত সুখে ঘর করিবেন।

অতঃপর আমি পূর্ব্ব-বাংলার এই সংক্রান্তি দিনের একটি প্রধান ব্রত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

পাঁচকুমারের ব্রত

পূর্ব্ব বাংলার বহু হিন্দু-পরিবার মধ্যে 'পাঁচ কুমারের ব্রত' নামে এক ব্রত প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে মহাড়ম্বরে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রতের অধিকারী ও পুরোহিত।

অনেকেরই বিশ্বাস এবং কোন কোন 'ব্রতকথা'য়ও আছে,—পাঁচকুমার দেবাদিদেব মহাদেবের পাঁচ পুত্র; দৈবযোগে এক অনূঢ়া ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে একসঙ্গে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, পাঁচকুমার লোহিত ঠাকুরের পুত্র। কিন্তু এই লোহিত ঠাকুর সম্বন্ধে কাহারো ধারণা সুস্পষ্ট নহে। মহাভারতে 'লৌহিত্য তীর্থ' এবং 'লৌহিত্য দেশের' উল্লেখ আছে। লৌহিত্য তীর্থ যে লৌহিত্য নদ বা ব্রহ্মপুত্র নদ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমায় হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল এবং সে-সমুদ্রগর্ভে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশই নিমজ্জিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল এবং এই সঙ্গম-স্থল "লৌহিত্য সাগর" নামে পরিচয় লাভ করিয়াছিল। "বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশ—বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ তখন লৌহিত্য সাগরের স্ফীত বক্ষে লুক্কায়িত ছিল এবং উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বাংশ লৌহিত্য প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পূর্ব্ব প্রদেশে আগমন করিয়া এই লৌহিত্য দেশে উপনীত হইয়াছিলেন।"* পাঁচকুমারের পিতা লোহিত ঠাকুর এই লৌহিত্য দেশের অধিপতি বা অধিদেবতাও হইতে পারেন।

* কাহারো মতে পাঁচকুমার শাস্ত্রোক্ত গণেশাদি পঞ্চ দেবতারই রূপান্তর; কাহারো মতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের ইঁহারা অধিদেবতা। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিজাত বিবিধ উপকরণে পাঁচকুমারের পূজা করা হয়, এ জন্য অনেকে আবার পাঁচকুমারকে ধান্য-গমাদি পঞ্চশস্যের অধিকারী দেবতা বলিয়াও মনে করেন। আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে ও সাহিত্যে "পঞ্চ" সংখ্যার কৌলিন্য গৌরব অত্যধিক;—পঞ্চকুলীন, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুণ, পঞ্চরত্ন, পঞ্চতপা, পঞ্চদেবতা, পঞ্চপিতা, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চবটী, পঞ্চবাণ, পঞ্চবায়ু, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চভূত, পঞ্চমকার, পঞ্চসূনা, পঞ্চানন, পঞ্চামৃত, পঞ্চাহৎ, পঞ্চেন্দ্রিয়—সকলই যেন 'পঞ্চ' বিশেষণে বিশেষিত হইবার জন্য পাগল। এখন এই 'পঞ্চ' মেলার মধ্যে পাঁচকুমারের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। কোন কোন ব্রতিনীর মতে ইঁহারা 'আধার্ত্তা বিধার্ত্তা',—মানুষের আহার বিধানকারী দেবতা; ইঁহাদের ইচ্ছায় জীব খায়, অনিচ্ছায় উপবাস থাকে; ইঁহাদের ধূলা-খেলার উপরই মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। ময়মনসিংহের প্রচলিত ব্রতকথায়ও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে আরও আছে যে, অজ্ঞাত-পরিচয় পিতার ঔরসে এক অনূঢ়া ব্রাহ্মণ-কুমারীর গর্ভে জাত বলিয়া পাঁচকুমার দীর্ঘকাল নর-সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছিলেন; শেষে মহাদেব নিজের পুত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লন এবং দিকে দিকে তাঁহাদের পূজা প্রচারিত হয়।

ব্রতের নিয়মাদি

ছেলেপিলের মঙ্গল এবং পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করিয়া পাঁচকুমারের ব্রত করা হয়। এই ব্রতে দেবতার কোনও মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় না, অমূর্ত্তি দেবতার উদ্দেশে ভোগ-নৈবেদ্য দিয়া ভক্তি-কামনা জানানো হয়।

চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনকে 'হাড় বিষু' বলে। সেদিন হইতেই ব্রতের আয়োজন উদ্যোগ চলিতে থাকে। বাড়ী-ঘর, উঠান-আঙ্গিনা উত্তমরূপে ঝাঁট দিয়া নিকানো হয়, রন্ধন-পাত্রাদি ধুইয়া-পুছিয়া পরিষ্কার করা হয়, মাটির পুরাতনগুলি ফেলিয়া নূতন আনা হয়; এই দিন আমিষের কোনও সংস্রব বাড়ীতে রাখা হয় না। সংক্রান্তি দিন অতি প্রত্যূষে ব্রতিনীরা স্নান করিয়া আসিয়া প্রথমেই 'মধ্যম-পালা'র(১) গোড়ায় খৈ চিড়া ছাতু গুঁড়া কলা চিনি ফুল দূর্ব্বা প্রভৃতি উপকরণে কলার আগ-পাতায় একটি ভোগ সাজাইয়া দেন এবং দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করেন।

অতঃপর ব্রতিনী ব্রতের রান্না রাঁধিতে যান। যাবতীয় তিক্ত শাক—নালিতা, গিমা, নিমপাতা, করলাপাতা, ভাজা বড়া, চর্চ্চড়ি ডাল, ডালনা, আমডাল, পিঠা পরমান্ন—রাঁধা হয়। রাঁধার শেষে ঘরের মেজেতে পাঁচটি, কোথাও পরিবারে যত লোক ততটি এবং একটি অতিরিক্ত নৈবেদ্য পাতায় (মাজপাতা) সাজাইয়া দেওয়া হয়। পরিবার-বিশেষে শুধু মাটির উপরও একটি পৃথক্ ভোগ দেবার রীতি আছে, সন্ধ্যাকালে তাহা নিয়া জলে বিসর্জ্জন করা হয়। ভোগ সাজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রতিনী ব্রতকথা বলিতে আরম্ভ করেন

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাস।

(১) প্রধান বাসগৃহের একটি বিশেষ খুঁটি যাহার গোড়া রক্তাদি করা হয়।

এবং কথা-শেষে উলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিয়া একটি টাইত(২) কুলায় তুলিয়া শেওড়াতলায় লইয়া যান। কাক যদি ঐ ভোগ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করে, তবেই ব্রতিনী ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হইল মনে করেন; কাকে গ্রহণ না করিলে ব্রতিনীর মনে একটা দারুণ আশঙ্কা জন্মে এবং তিনি গলায় কাপড় জড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে দেবতাকে ডাকিতে থাকেন। দেবতা কাকরূপে আসিয়া নৈবেদ্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করেন—এইরূপ বিশ্বাস। শেওড়া-তল হইতে দূর্ব্বা কিংবা শেওড়াপাতা কুড়াইয়া ছেলেপিলের মাথায় আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ দেওয়া হয়। এই দিন এক এক বাড়ীতে শুধু পরিবারস্থ লোকই আহার করে না, গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজনেরাও একে অপরের বাড়ীতে আসিয়া ভোজে যোগ দেয়। উত্তর-ময়মনসিংহে অপরাহ্নে পরস্পর পরস্পরকে কোলাকুলি করে, কনিষ্ঠেরা প্রণত হয়, জ্যেষ্ঠেরা আশীর্ব্বাদ করেন।

নিয়মের ব্যতিক্রম

স্থান ও পরিবার-ভেদে অন্যান্য ব্রতের ন্যায় পাঁচকুমারের ব্রতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাত-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ব্রত করিবার নিয়ম সর্ব্বত্র সকল পরিবারে নাই; কেহ কেহ শুধু খৈ চিড়া ছাতু কলা প্রভৃতিরই নৈবেদ্য দিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। কোথাও কোথাও ব্রতের একটি ভোগ শেওড়াতলায় নিয়া কাককে না দিয়া অপরাহ্নে মাঠে যাইয়া 'শিবা'কে (শৃগালী) দেওয়া হয়। আবার কোথাও বা ব্রতের ভোগ কাক-শিবা কাহাকেও নিবেদন না করিয়া ফুল-দূর্ব্বা মাত্র জলে ভাসাইয়া দিয়া আসা হয়।

পাঁচকুমারের ব্রতের প্রায় অনুরূপ ব্রতই কিশোরগঞ্জের হাজরাদি পরগণায় 'ফুলকর ব্রত' নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা আবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখের সংক্রান্তিতে শেষ করিতে হয়। প্রতি মঙ্গলবার ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ব্রতিনীরা প্রত্যহ বিকালে স্নান করিয়া ব্রতকথা বলেন এবং রাত্রিতে অরন্ধন প্রথা পালন করেন। ব্রতকথা অনেকটা পাঁচকুমারের ব্রতকথার মতই।

বিক্রমপুর ও দক্ষিণ-ময়মনসিংহে চৈত্র-সংক্রান্তিতে 'কালকর ব্রত' হইয়া থাকে। কলার আগপাতায় আম কলা ফুটি ও অন্যান্য ফল এবং দধি চিড়া ছাতু প্রভৃতি উপকরণ সাজাইয়া দিয়া এই ব্রত করা হয়। ব্রতকথা আবার স্বতন্ত্র।

কোন কোন ব্রতকথায় আমরা পাঁচকুমারের ফুলকর, দুধকর, কালকর, জলকর সকালকর—এইরূপ পাঁচটি নাম পাই। কাজেই দেখা যাইতেছে, পাঁচকুমারের প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র সমান থাকে নাই। ময়মনসিংহের হুসেনসাহী, নশিরুজিয়াল ও আলাপসিংহ পরগণায় পাঁচকুমারকে একত্রে সমভাবে পাঁচকুমার ঠাকুর নামে পূজা করিলেও কিশোরগঞ্জে 'ফুলকর' (ফুলকুমার) এবং বিক্রমপুরে 'কালকর' (কৃষ্ণকুমার) ঠাকুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

পাঁচকুমার ব্রতের নিম্নোক্ত ব্রতকথাটি ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র

(১) কলার পাতায় দেওয়া ভোগ।

তীরবর্তী অঞ্চলের; ইহা ব্রতকালে আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মুখে শুনা। বলিবার ভঙ্গিটি যথাসম্ভব ঠিক রাখিয়া ভাষার কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়াছি। কথাটির মধ্যে সেই আদি যুগের ধ্যান-ধারণার *অনেক খোরাক পাওয়া যাইবে।*

ব্রতকথা

এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যদি, তার ব্রাহ্মণী একটি ছোট মেয়ে রাখিয়া মারা যায়। ব্রাহ্মণ তাকে ভিক্ষাসিক্ষা করিয়া পালে, রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়ায়।

না, মেয়েটি এখন বড় হইয়াছে, নিজেই রান্নাবান্না করিতে পারে। এক দিন রান্নার কিছুই নাই, কি করে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে, নদীর পাড়ে একটা ঝাঁকড়া কাঁটা খুইরার গাছ (ডাঙ্গা কাঁটা নটের গাছ), তাই সে তুলিয়া আনে, আনিয়া রাঁধিয়া খায়।

মেয়েটি জানিত না, এই গাছটির উৎপত্তি হইয়াছিল মহাদেবের শুক্র হইতে। ইহা খাইয়াই তার গর্ভসঞ্চার হইল। এক মাস, দুই মাস, না পাঁচ মাস যায়,—চার দিকে রাষ্ট্র (প্রচারিত) হইয়া গেল, অনূঢ়া ব্রাহ্মণ-কন্যার সন্তান হইবে।

চুইট্যা (চুকলিখোর) গিয়া রাজার কাছে চুটি (চুকলি) গাইল,—'রাজা মশায়, কি কলঙ্কের কথা! ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যার গর্ভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন,—'কি ব্রাহ্মণ, ব্যাপার কি?'

ব্রাহ্মণ তো ভয়ে কম্পমান। গলায় কাপড় জড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই রাজা মশায়! গরীবের বাপ-মা আপনি! বিনা দোষে যেন গর্দান নেবেন না; আমি ও-সবের কিছুই জানি না, মেয়েকে এনে জিজ্ঞাসা করুন।'

রাজা তখন ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া তার মেয়েকে আনাইলেন। দেখেন কি, 'তার ক্ষীর দাঁত, পিঙ্গল চুল, কাঁচা দুধ!' রাজা তো অবাক্। ভাবিলেন, এ কখনো মনুষ্য হ'তে হয়নি, এতে নিশ্চয়ই দেবতার হাত আছে। মেয়েকে কিছু আর বলিলেন না; পাল্কী-বেহারা ডাকাইয়া সসম্মানে তখনই বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। চুইট্যার মুখে চুণকালি পড়িল, কাণাঘুষা সব বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে পাঁচকুমার আসিয়া জন্ম নিয়াছেন। ক্রমে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, অমৃত আঙ্গুল (অনামিকা) কাটিয়া তাঁরা ভূমিষ্ঠ হইলেন।

মহাদেবের পুত্র তাঁরা, সাত দিনের বাড় এক দিনে বাড়েন। হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুক্তা ঝরে, চার দিক রূপে ঝলমল করে।

না, পাঁচকুমার এখন বেশ বড় হইয়াছেন। রোজ তাঁরা 'ধুলা খেইল' 'ঘিলা খেইল' খেলিতে নদীর পাড়ে চলিয়া যান। তাঁদের সঙ্গে কেউ আর পারে না, তাঁরা কেবল জেতেন, অন্যেরা হারে। হারিয়া গালাগাল দেয়,—'আঃ! 'আইবুড়ো বামুনীর পুড়ো পোলাদের সঙ্গে আর পারি না!'

প্রত্যহ এইরূপ গালাগাল শুনিতে শুনিতে এক দিন তাঁরা ভারি অপমান বোধ করিলেন। বাড়ী আসিয়া স্নান-খাওয়া না করিয়া

মা রাঁধিয়া-বাড়িয়া বসিয়া আছেন, ভাবিতেছেন,—'এত বেলা হয়ে গেল, এখনো ছেলেরা আসে না কেন?' একবার ঘরে যান, একবার বাহিরে আসেন, শেষে দেখেন কি,—ঘরে খিল দিয়া মুখ কালো করিয়া পাঁচ ছেলে শুইয়া আছে! দেখিয়াই তো মায়ের *প্রাণ চমকিয়া উঠিল,—'কি রে তোদের কি হয়েছে? স্নান-খাওয়া* না করে ও-ভাবে যে শুয়ে আছিস্?'

পাঁচকুমার বলেন,—'আজ আমাদের পিতা কে না বললে উঠবও না, খাবও না।'

মা পুত্রদের ক্ষোভের কারণ বুঝিলেন, বলিলেন,—'ও এরি জন্যে! তোরা ওঠ, স্নান কর, খা, পিতার পরিচয় নিশ্চয়ই দেব।'

পাঁচকুমার উঠিলেন, স্নান করিলেন, খাইলেন, না,—আবার মাকে ধরিয়া বসিলেন,—'এবার বল আমাদের পিতা কে?'

মা বলিলেন, 'দেখ, মহাদেব রোজ ঐ নদীতে স্নান করতে আসেন; কাল যখন তিনি পাড়ে কাপড় রেখে জলে নামবেন, তোরা কি করবি, না, তাঁর কাপড় নিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বি। টানে (তীরে) উঠে তিনি ডাকবেন; এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাকের মাথায় এসে কাপড় বের করে দিবি, আর তাঁরই কাছে তখন পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবি।'

সেদিন তো গেল। পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই পাঁচকুমার নদীর ঘাটে গিয়া বসিয়া রহিলেন। দুপুর হইয়া আসিয়াছে, দেখেন কি,—মহাদেব টানে কাপড় রাখিয়া স্নান করিতে নামিয়াছেন। অমনি তাঁরা কি করিলেন, না আস্তে আস্তে কাপড়খানা নিয়া সরিয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পর মহাদেব উপরে উঠিয়া দেখেন কি, কাপড় নাই!—'কি রে, কাপড় কে নিল! কে রে আমার কাপড় নিয়েছিস? শীগ্‌গির দিয়ে যা, নইলে ভস্ম করে মেরে ফেলব।'

এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাকের মাথায় আসিয়া পাঁচকুমার কাপড় নিয়া হাজির। কাপড় দিয়াই তাঁরা মহাদেবের পায় পড়িলেন,—'বলুন, আমাদের পিতা কে?'

মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, 'আরে পাগলারা, তোদের পিতা আবার কে? আমিই তোদের পিতা, নে, ওঠ, ওঠ।'

পাঁচকুমার উঠিলেন; চোখে তাঁদের জল, মুখে হাসি। জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পিতা, তবে বলুন, আমরা কে কি করে খাব? কি ভাবে আমাদের দিন যাবে? বর দিয়ে যান।'

মহাদেব বলিলেন, 'তোদের কিছুই চিন্তা করতে হবে না এই নদীর ধারেই বসে থাক, এক সদাগর বাণিজ্যে যাবে, সে-ই তোদের খাবার ব্যবস্থা করে-দিবে।'

মহাদেব চলিয়া গেলেন। পাঁচকুমার তখন খুশি হইয়া 'ধুলা খেইল' আরম্ভ করিলেন,—একটা পাত্রে করিয়া ধুলা মাপেন আর মাটিতে ঢালেন। কতক্ষণ পর দেখেন কি,—সত্যই তো এক সদাগর নৌকা ভরিয়া, কত পণ্যসামগ্রী লইয়া, নদী বাহিয়া যাইতেছে। পাঁচকুমার হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ভাই মাঝি মাল্লা, তোমরা ও-সব কি নিচ্ছ? একবার নৌকা ভিড়াও না দেখি।'

মাঝি-মাল্লারা বলে, 'ওঃ! ভারি তো! গেছি আবার পুড়ো পোলাদের কাছে নিকাশ দিতে! লতাপাতা নিই, তায় কি চা[illegible]

পাঁচকুমার তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'লতাপাতা নিস্? আচ্ছা, আমরা যদি সত্যই মহাদেবের পুত্র হয়ে থাকি, তোদের সব কিছু লতাপাতা-ই হয়ে যাক্।'

যেই কথা সেই কাজ। নৌকা এক বাঁশও যায় নাই, হীরা, মাণিক্য, জহরত,—পণ্য-সামগ্রী যা-কিছু, সব লতাপাতা হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মাঝি-মাল্লারা তা' দেখিয়া অবাক্। সদাগর ঘুমাইতেছিল, তারা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—'সাধু, সাধু,—শীগ্‌গির উঠ, তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।'

সদাগর উঠিয়া দেখে তার নৌকা খালি; সব কিছু লতাপাতা হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে!—'হায় কেন এমন হ'ল? দেবতার অভিশাপ ছাড়া তো এমন হতে পারে না! বল্, সত্য করে বল্, তোরা কাকে কি বলেছিস?'

মাঝিরা বলে,—'আমরা তো' তেমন কাউকে কিছু বলিনি! তবে পাঁচটা ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, নৌকায় করে কি নিচ্ছ, আমরা উত্তর করেছিলাম,—'লতাপাতা।'

সদাগর আকুল স্বরে বলে,—'তাই তো! করেছ কি? শীগ্‌গির নৌকা পাড়ে ভিড়াও। ওরা নিশ্চয়ই কোনো দেবতা।'

দশে বিশে লগি ফেলিয়া নৌকা ভিড়াইল। সদাগর তীরে উঠিয়া দেখে, পাঁচকুমার একটা পাত্রে করিয়া ধুলা মাপিতেছে, আর ঢালিতেছে। বুঝিতে আর বাকী রহিল না; সদাগর পাগলের মতো গিয়া তাঁদের পা জড়াইয়া ধরিল,—'বলুন, আপনারা কোন্ দেবতা? মনুষ্য হ'তে পাপ হয়, দেবতা হ'তে মাপ হয়। বলুন, আপনারা কোন্ দেবতা?

পাঁচকুমার তখন বলেন, 'আমরা কোনো দেবতা নই, আমরা পুড়া পোলাইন। আমাদের কাছে কেন?'

সদাগর কি আর তাঁদের পা ছাড়ে! কত কাকুতি-মিনতি! শেষে পাঁচকুমার প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'আমরা মহাদেবের পুত্র, নরলোকে এখনো অপূজ্য আছি, তুই আমাদের পূজা দে, তোর সকলই আবার হবে।'

সদাগর অমনি মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে করিয়া পাঁচকুমারকে নিয়া নৌকায় উঠাইল। যেই 'ভরা' ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই 'ভরা' হইল।

সদাগর তখন ভক্তিযুক্ত হইয়া নৌকার উপরেই পাঁচকুমারের পূজার আয়োজন উদ্যোগ করিল। কাউকে পূজিল ফুলদূর্ব্বা ফলমূল দিয়া,—তিনি হইলেন ফুলকর (ফুলকুমার); কাউকে পূজিল খৈ-চিড়া-গুঁড়া দিয়া,—তিনি হইলেন কালকর (কুঙ্কুমার); কাউকে পূজিল পিঠা পায়েস ভাত-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া,—তিনি হইলেন জলকর (জলকুমার); কাউকে বা পূজিল শুধু দুধ-কলা দিয়া,—তিনি হইলেন দুধকর (দুধকুমার)। এইরূপে সদাগর এক এক জনকে এক এক রকম উপচারে পূজা করিল; এক এক নামে তাঁরা নরলোকে প্রচারিত হইলেন।

পাঁচকুমার এখন নদীর পাড়েই থাকেন, ঘুরেন, ফেরেন, খেলেন। এক দিন দেখেন কি,—একটি লোক খাবার নানা উপকরণ লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছে; কেহ নিতেছে পাঁটা, কেহ খাসি, কেহ মাছ, কেহ দই-দুধের ভাঁড়, কেহ বা মিষ্টি!

পাঁচকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, এত সব নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আমরাও সঙ্গে যাব না কি?'

লোকটি উত্তর করিল, 'ইস্, ভারি তো খানেওয়ালা! আমি যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী, তারা কি না যাবে সঙ্গে! তোরা কে? ও-সব কি কচ্ছিস্—ধুলা মাপছিস্, আর ঢালছিস্?'

পাঁচকুমার বলেন, 'আমরা আধার্ত্তা-বিধার্ত্তা (আধার-বিধাতা); আমরা যদি জীবের আধার (খাদ্য) মাপি, তবে সে খায়, যদি না মাপি,—খায় না।'

লোকটি তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা, দেখ তো, আমি যে এত সব উপকরণ নিয়ে যাচ্ছি,—খাব কি খাব না!'

—'না, খাবি না। তোর কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।'

শুনিয়া লোকটা তো হাসিয়া কুটি-কুটি,—'যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী, ওরা বলে কিনা খাব না! আচ্ছা দেখা যাবে। থাক্‌বি তো এখানে?'

পাঁচকুমার হাসিয়া বলেন, 'হাঁ হাঁ, তুই যা।'

লোকটি শ্বশুর-বাড়ী গেল। কি তার আদর! শালা-শালিরা আসিয়া ঘেরিয়া ধরিল। কেহ পাঁঠা-খাসি মারিল, কেহ মাছ কুটিল, কেহ বা হাসি-ঠাট্টায় মন দিল! শাশুড়ীর এক মুহূর্ত্ত অবসর নাই, কত দিন পর জামাতা আসিয়াছে! ভাজা-বড়া, ঝাল-ঝোল, ডাল-ডালনা কত-কিছু রান্না করিতেছেন!

রান্না শেষ হইয়াছে। জামাতা স্নান করিয়া আসিয়া শালা-সম্বন্ধী ও অপর দশ জনের সঙ্গে এক সারিতে খাইতে বসিয়াছে; শাশুড়ী ষোড়শ উপচারে থালা-বাটি সাজাইয়া তার সামনে আনিয়া রাখিলেন! জামাতা অমনি সজোরে হাসিয়া উঠিল, তার মনে হইল—'সেই ছেলেরা না বলেছিল, আজকে খাব না! হা হা হা!!!'

জামাতার এইরূপ আচরণে শাশুড়ী ভয়ঙ্কর অপমান বোধ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া রান্না-ঘরে মুখ লুকাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'জামাই আমার কি দেখল, কি দেখে এমন হাসল?' ছেলেরাও মায়ের কথায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বেয়াদব ভগিনীপতিকে অমনি গলাধাক্কা দিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং কিল-চড় দিয়া গোয়াল-ঘরে নিয়া বাঁধিয়া রাখিল! পাঁচকুমারের কথার সত্যতা যে এ ভাবে প্রমাণিত হইবে, লোকটা তা' স্বপ্নেও ভাবে নাই।

পরদিন মা ছেলেদের বলিলেন, 'তোমরা বড় অন্যায় করে ফেলেছ, হাজার হলেও জামাতা দেবতা, তাকে ও-ভাবে শাস্তি দেওয়া ঠিক হয়নি। যাক্, তাকে নিয়ে এসে তোমরা স্নান কর, খাও।'

জামাতা মুক্তি পাইয়াই ছুটিল সেই নদীর তীরে; শালা-সম্বন্ধী-শাশুড়ী—কারো অনুরোধ-উপরোধ সে শুনিল না। নদী-তীরে আসিয়া দেখে,—সে-ই পাঁচকুমার, 'ধুলা-খেইল' খেলিতেছেন! আসিয়াই সে পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'মনুষ্য হ'তে পাপ হয়, দেবতা হ'তে মাপ হয়। বলুন, আপনারা কোন্ দেবতা?'

পাঁচকুমার বলিলেন, 'কেন, বড় যে অহঙ্কার করেছিলে—শ্বশুর-বাড়ী গেলেই খাবার পাবে! কেমন খেয়েছ?'

অনেক কাকুতি-মিনতির পর পাঁচকুমার প্রসন্ন হইলেন এবং নিজেদের পরিচয় দিলেন। এদিকে লোকটির শ্বশুর-বাড়ীর সকলেও সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সকল কথা শুনিয়া তারা সকলে মহা ঘটা করিয়া পাঁচকুমারের পূজা করিল। পাঁচকুমার জীবের আহার জোগান, তাঁদের ইচ্ছায় জীব খায়, অনিচ্ছায় উপবাস থাকে। দেশে দেশে তাঁদের খ্যাতি প্রচারিত হইল; নরলোকে তাঁরা অপূজ্য ছিলেন, পূজিত হইলেন।

আ পাঁচকুমার ঠাকুর, তোমরা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর

নাট্যজগতে যৌবন

প্রসাদ রায়

নাট্যজগতে নবযৌবন চিরদিনই নয়নাভিরাম। বিলাতী নাট্যজগতে বারংবার দেখা গিয়েছে একটা ব্যাপার। নটীর নাট্যনৈপুণ্য হয়তো বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তার তরুণ তনু ও রূপলাবণ্য দেখে মাথা ঘুরে গেল রাজা-রাজড়ার বা ডিউক ও মার্কুইস প্রভৃতির, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অনায়াসেই তাঁদের কারুর সহধর্ম্মিণীর আসন অধিকার ক'রে বসল। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য, ফর্দ্দ দাখিল করবার জায়গা এখানে নেই। এটা প্রায় চলতি প্রথার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবং প্রথাটা নূতনও নয়। গণিকা ও নটী থিয়োডরা পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

কেবল সাধারণ রাজা-রাজড়া কেন, মস্তিষ্কের অসাধারণতার জন্যে যাঁদের খ্যাতি পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমন সব প্রতিভাবান কবি ও ঔপন্যাসিকও অভিভূত হয়েছেন গুণসুন্দর মানুষের জন্যে নয়, রূপসুন্দর দেহের লোভে।

আজ মেনকেন এক জন অভিনেত্রীর নাম, যার অভিনয়-শক্তি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু যৌবন ছিল তার তাজা, দেহ ছিল তার সুন্দর ও সুঠাম। এই এক কারণেই তাকে দেখে চোখ সার্থক করবার জন্যে দলে দলে লোক প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সৃষ্টি করত বিপুল জনতা। বিলাতে তার দরজায় গিয়ে ধরণা দিতে সুরু করলেন কবি সুইনবার্ণ, ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স ও চার্লস রিড প্রভৃতি আরো অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তার পর সে ফ্রান্সে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে তার ভক্ত হয়ে পড়লেন থিয়োফাইল গোতিয়ের প্রমুখ নামজাদা সাহিত্যিকরা। অবশেষে তাকে দেখে হৃদয় হারিয়ে ফেললেন রোমান্সের রাজা বুড়ো ডুমা। পঁইষট্টি বৎসর বয়সে তিনি হলেন তরুণী মেনকেনের প্রিয় গোলাম! সারা ফরাসী দেশে উঠল অট্টহাস্যের রোল!

সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগ থেকেই নটীর রূপযৌবন যে ভদ্রসন্তানদের বিশেষরূপে আকৃষ্ট করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সন্ধান নিলে দেখা যাবে, গোপনে বা প্রায় প্রকাশ্যে নটীদের প্রেমে প'ড়ে বহু ধনী ভদ্রযুবক সর্ব্বস্বান্ত হ'তে আপত্তি করেননি। কিন্তু সে সব হচ্ছে অবৈধ প্রেম, সমর্থনযোগ্য না হ'লেও সামাজিক বিধানে বড় বাধে না। সে প্রেমকে বিবাহের দ্বারা বৈধ ক'রে তুলতে এক জন ভদ্রযুবক সমাজপতিদের রক্তচক্ষু মোটেই গ্রাহ্য করেননি। তাই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের আদি যুগেই রূপসী ও তরুণী নটী গোলাপসুন্দরী বিবাহ ক'রে নাম কিনেছিলেন সুকুমারী দত্ত।

একাল হচ্ছে চলচ্চিত্রের যুগ। আমাদের প্রাচীন সমাজ আর আগেকার মত রক্ষণশীল নয়, উপদেবীরাও দেবীদের উপরে দাবি করলে, সে হয়ে থাকে যথেষ্ট উদাসীন। তাই এক শ্রেণীর লোক ক্রমশঃ বেশী সাহস সঞ্চয় করছে। রূপসী ও তরুণী চিত্রনটীরা এখন ঘরের বউ হ'লেও কেউ বিস্মিত হয় না। কিন্তু যে বিবাহের মূলে থাকে কেবল দেহের ক্ষুধা তার বন্ধন যে স্থায়ী হয় না, এ প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে হাতে-হাতেই।

আমরা প্রায় প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। আবার আগেকার প্রবীণ সূত্র ধরা যাক্। গোড়াতেই বলেছি, নাট্যজগতে নবযৌবন চিরদিনই নয়নাভিরাম। নতুন রূপ, টাটকা দেহ নিশ্চিতরূপেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সত্যিকার নাট্যজগতে তার মূল্য খুব বেশী নয়। কথায় আছে শুনি, "আগে দর্শনদারি, পিছে গুণ বিচারি।" কিন্তু ও-কথার মধ্যে আছে আংশিক সত্য। নাট্যরসিকরা কেবল রূপের খাতিরে কোন নটীকেই পুরোভূমিতে বসিয়ে রাখতে রাজি হবেন না। আর রূপযৌবন তো মরসুমী ফুলের মত, তনুলতা থেকে ঝ'রে পড়ে দু'দিন যেতে না যেতেই। তখন কে প্রশস্তি রচনা করবে সেই রূপযৌবনহীনাদের জন্যে?

অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে কেবল তাঁদের নাট্যপ্রতিভার উপরে। বাংলা দেশ থেকেই তার দু'টো দৃষ্টান্ত দি। ধরুন স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী ও সুশীলাসুন্দরীর কথা। সুন্দরী বলতে যা বুঝায়, তারাসুন্দরী যৌবনেও তা ছিলেন না। আর চেহারার দিক দিয়ে সুশীলাসুন্দরী ছিলেন রীতিমত কুরূপা। তাঁর দেহ ছিল খুব মোটা, রং কালো, নাক থাঁদা ও চোখ ছোট-ছোট। তবু ভীষণ, অঙ্গভঙ্গ ও ভাবের অভিব্যক্তির গুণে পরিণত বয়সেও তাঁরা যে কোন সুন্দরী তরুণীর ভূমিকাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারতেন। তাঁদের দ্বারা গৃহীত ভূমিকাগুলিতে মর্য্যাদা দান করতে পারত না কোন তরুণীর রূপসুন্দর দেহও। "ওথেলো" নাটকে ডেসডেমোনার ভূমিকায় তারাসুন্দরী প্রায়বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের সামনে দেখিয়েছিলেন অবিকল এক যৌবনচঞ্চলা রূপসী [illegible]। সুশীলাসুন্দরীকে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখে এক জাত

যুবক এমন পাগল হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে হাওড়ার সেতুর উপর থেকে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। অন্ত লোক দেখতে পেয়ে তাকে সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করে।

পাশ্চাত্য দেশেও দেখি এই ব্যাপার। ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড এবং ইতালীয় অভিনেত্রী ইলিনোরা ডিউজের অসংখ্য প্রতিকৃতির অভাব নেই। কিন্তু সে সব ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায়, তাঁরা কেহই সুন্দরী ছিলেন না। অথচ প্রাচীন বয়সেও তাঁরা নবীনার ভূমিকায় এমন চমৎকার অভিনয় করতেন যে, তাঁদের দেখবার জন্তে প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের ঠাঁই থাকত না।

এইবারে চিত্রজগতের কথা হোক্। মঞ্চের সঙ্গে পর্দ্দার একটা পার্থক্য আছে। মঞ্চাভিনেত্রী "মেক আপে"র সাহায্যে কতকটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন যৌবনহীন দেহেও। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ কৃত্রিম আলোক দর্শকরা দূর থেকে দেখে তাঁদের বয়সের রেখা সহজে ধরতে পারে না। কিন্তু চিত্রাভিনেত্রীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দর্শকরা দেখে তাঁদের ক্যামেরার মাধ্যমে এবং ক্যামেরা হচ্ছে যারপরনাই নিষ্ঠুর। যত যত্নেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে "মেক আপ" করা হোক্, ক্যামেরার পটে বয়সের ধর্ম্ম ধরা পড়বেই। এ সম্বন্ধে একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যখন "কালী ফিল্ম" "বিদ্যাসুন্দর" ছবি তোলবার তোড়জোড় করছিল, তখন সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্তে একটি সুচেহারা, সুগায়ক ও সুঅভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি বয়সে প্রৌঢ় হ'লেও তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল এত চমৎকার যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারত না তাঁর প্রৌঢ়ত্বকে। কিন্তু ষ্টুডিয়োয় তাঁকে নিয়ে গিয়ে যখন তাঁর ফোটো তোলা হ'ল এবং তখন বেশ বোঝা গেল, নবীন নায়কের ভূমিকায় তাঁকে একেবারেই মানাবে না, কারণ তাঁর মুখের যে বলিরেখাগুলো সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, ক্যামেরা তা ফুটিয়ে তুলেছে অত্যন্ত প্রকট ভাবেই।

চলচ্চিত্রের বয়স যখন বেশী নয়, তখন প্রযোজক ও পরিচালকরা এক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। চিত্রজগৎকে তাঁরা ক'রে তুলতে চাইতেন নবযৌবনের লীলানিকেতন। পুরুষদের সম্বন্ধে হয়তো তত বেশী কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু চিত্রনটীরা একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা পার হয়ে গেলেই তাঁরা ধ'রে নিতেন যে, ছবির বাজারে আর তাঁদের উচিত মত চাহিদা হবে না। ফলে দাঁড়াত এই, প্রযোজক ও পরিচালকরা নূতন নূতন রূপসী নবযৌবনীকে আবিষ্কার করবার জন্তে দেশে দেশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতেন। বিখ্যাত লোকপ্রিয় নটীদেরও কয়েক বৎসর পরে নবীনা নায়িকার ভূমিকায় আর অভিনয়ে সুযোগ দেওয়া হ'ত না, কিংবা তাঁদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হ'ত অপ্রধান বা বয়স্কাদের ভূমিকাগুলি। চাই নতুন মুখ, নতুন রূপ, নতুন যৌবন—এই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। এই রকম মনোবৃত্তি আজ কিন্তু যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। কেন, তা একটু পরেই বলছি।

বাংলা চলচ্চিত্রেও গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ মনোবৃত্তিই প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে। এই কারণে কোন কোন অভিনেত্রী মনে মনে আহত হয়েছেন। সম্প্রতি এ দেশের এক জন খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী এক সাংবাদিকের কাছে এই মতামত প্রকাশ করেছেন :

"আগে বাংলা দেশের চলচ্চিত্র-জগতে বয়সের বিচার হ'ত না, প্রতিভার বিচার হ'ত (তাঁর এ ধারণা ভ্রান্ত)। যত প্রতিভাই থাক্ না কেন, বয়স কম না হ'লে নায়িকা বা তরুণীর ভূমিকায় কাউকে সহ্য করা হয় না। প্রায়ই মন্তব্য শুনি, চন্দ্রাবতী বা কানন দেবীকে এখন আর নায়িকা-চরিত্রের রূপদান করতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা যদি নায়িকার ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়ও করেন, তবু এই মন্তব্য শোনা যায়। এটা কিন্তু উচিত নয়। * * * অভিনয় দর্শনের সময় বয়সের কথা মনে রাখবেন না। খালি অনুভব করতে চেষ্টা করবেন, অভিনেত্রীটি তরুণীর চরিত্র কেমন দক্ষ ভাবে ফোটাচ্ছেন।"

কথাগুলির ভিতরে যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু ঢালেরও অন্য পিঠ আছে। সেটা আমরা পরে দেখাব।

আগে হলিউডের চিত্র-নির্মাতাদের ধারণা ছিল যে, নায়িকার বয়স বিশ বৎসরের বেশী হওয়া উচিত নয়। "বিশ্বের প্রিয়তমা" নামে বিখ্যাত মেরি পিকফোর্ডকেও পরিপূর্ণ যৌবনেই চিত্র-জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। অভিনেত্রীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হ'লে তাঁকে দেওয়া হ'ত পক্ককেশ বৃদ্ধার ভূমিকা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চল্লিশ পার হয়েও সুন্দরী নারীরা পুরুষের হৃদয় জয় করতে পারেন এবং এমনি এক নারীর প্রেমে প'ড়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু হলিউডে এটা ছিল একেবারেই অসম্ভব।

আজ হলিউডের ঐ ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, চল্লিশ বৎসরেও রূপসীকে চালশে ধরে না পুরুষদের হৃদয়ের উপরে তখনও সে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। এই উপলব্ধির কারণ হচ্ছেন নয় জন লোকপ্রিয় চিত্রাভিনেত্রী—জোয়ান ক্রফোর্ড, মার্লিন ডিয়েট্রিক, বার্বারা ষ্ট্যানউইক, ক্লডেট কলবার্ট, গার্ট্রুড লরেন্স, গ্লোরিয়া সোয়ান্সন, গ্রিয়ার গার্সন, বেট ডেভিস ও আইরিন ডিউন। ওঁরা সকলেই চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছেন—কারুর কারুর বয়স বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ বা ছ'চল্লিশ। উপরন্তু মার্লিন ডিয়েট্রিক, গার্ট্রুড লরেন্স ও গ্লোরিয়া সোয়ান্সন এই তিন জন এখন দিদিমা'র আসন অধিকার করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ আজও ওঁদের প্রাচীনার ভূমিকায় দেখতে রাজি নয়।

অবশ্য ঐ নয় জন অভিনেত্রী কেবল আপন আপন নাট্য-নৈপুণ্যের দ্বারা হলিউডের ধারণাকে পরিবর্ত্তিত করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁদের সাহায্য করেছে জনসাধারণের দাবি। সাধারণ দর্শকরা আজ সাবালক হয়ে উঠেছে। তারা আর তরুণীদের লীলায়িত তনুর তারল্য দেখেই তুষ্ট হ'তে চায় না। তারা দেখতে চায় সত্যিকার অভিনয়।

মার্লিন ডিয়েট্রিক প্রথম যখন হলিউডে আসেন তখন তিনি এক মেয়ের মা। প্যারামাউণ্ট সম্প্রদায়ের কর্ত্তারা বললেন,—খবর্দ্দার, এ খবর চেপে যাও, নইলে তোমার পসার হবে না। কিন্তু মার্লিন অম্লানবদনে সাংবাদিকদের কাছে গুপ্ত কথাটা ফাঁস ক'রে দিলেন। কর্ত্তারা তো চ'টেই আগুন! কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, মা হওয়াটা হলিউডে বিশেষ গৌরবের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। নটীর পর নটী সাগ্রহে নিজেদের মাতৃত্ব বিজ্ঞাপিত করতে লাগলেন। যাঁরা তখনও মা হ'তে পারেননি, তাঁরাও পিছিয়ে থাকতে রাজি হ'লেন না। তাঁরাও এক একটি শিশুকে দত্তক গ্রহণ ক'রে সদর্পে রটিয়ে দিলেন নিজেদের মাতৃত্ব!

বৎসরের পর বৎসর যায়। তার পর এক দিন প্রকাণ্ড এক জনসভায় মার্লিনকে পরিচিত করা হ'ল "দিদি ডিয়েট্রিক" ব'লে। সভাশুদ্ধ লোক উল্লাস-ধ্বনির সঙ্গে হাততালি দিয়ে মার্লিনকে অভিনন্দিত করলে। দিদিমা ডিয়েট্রিককে আজও কেউ বুড়ী ব'লে ভাবে না। তরুণদের চোখে আজও তিনি বুনে দিতে পারেন রূপের স্বপন।

আগে বাংলা দেশের এক চিত্রনটীর মতামত উদ্ধার করেছি। তিনি বলেছেন, অভিনেত্রীর বয়সের দিকে কেউ যেন দৃষ্টি না রাখে। ভালো কথা। কিন্তু লোকে তাঁদের দেহের দিকে দৃষ্টি রাখবে না কেন? চোখের সামনে বাংলা দেশে দেখছি, কয়েক বৎসর আগেও যাঁদের তনু ছিল সঞ্চারিণী লতার মত, আজ তা পরিণত হয়েছে বেডৌল, বেঢপ, গুরুভার মাংসপিণ্ডে। এমন দেহ নিয়ে কেউ কি তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে? যত অল্প বয়সেই মোটা হউন, অতিরিক্ত মোটা হওয়াটা বুড়িয়ে যাওয়ারই লক্ষণ। হলিউডে যে নয় জন চিত্রতারকা চল্লিশোর্দ্ধেও অদ্যাবধি হৃদয়হারিণী হয়ে আছেন, দেহকে ছিপছিপে রাখবার জন্য তাঁদের চেষ্টার অবধি নেই। তাঁরা পরিমিত আহার ও নিয়মিত ব্যায়াম করেন। অনেকেই প্রতিদিন নিজেদের দেহের ওজন নেন। এক আউন্স মাংসবৃদ্ধি হ'লেই তা কমিয়ে ফেলবার উপায় অবলম্বন করেন। এই জন্যেই বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়ের মত তাঁরা "কুড়িতেই বুড়ী" হয়ে পড়েননি, চল্লিশ পার হয়েও ছুঁড়ী সাজতে পারেন। বাঙালী চিত্রাভিনেত্রীদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা যায়? সুতরাং তাঁদের অভিযোগ করা অন্যায়।

উত্তর

১। জেরার্ড মার্কেটর; ১৫৩৮ সালে।

২। ঠিক এক শত বছর পূর্ব্বে; মহারাণী ভিক্টোরিয়া যার উদ্বোধন করেন ১৮৫১ সালে।

৩। প্যারিস শহরে, "অপেরা হাউস" নাট্যমঞ্চ ১১ বিঘা জমিতে অবস্থিত।

৪। কপারনিকস।

৫। তৃণবৃন্দের কন্যা। তাঁর নারীত্ব-মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বিশ্রবা মুনি তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি কুবেরের মাতা।

৬। কথাসরিৎসাগর।

৭। মন্ত বা মদ।

৮। ১৪,৪৭,১২,০০০ বর্গ-মাইল জল এবং ৫,২০,০০,০০০ বর্গ-মাইল স্থল।

নবগীতিকা (প্রথম খণ্ড)—(স্বরবিতান ১৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই খণ্ডে দিনেন্দ্রনাথ কৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চৌত্রিশটির স্বরলিপি সঙ্কলিত হয়েছে। প্রায় সবগুলি গান অধুনা সুপ্রচলিত ও জনপ্রিয়। 'আকাশে কোন্ চরণের আসা যাওয়া", "আজ তালের বনে কিসের করতালি", "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে", "ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া-তরী" গানগুলি এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বরবিতান (ত্রয়োদশ খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

স্বরবিতানের ত্রয়োদশ খণ্ডে ত্রিশটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। এদের মধ্যে "কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি", "আমার না বলা বাণীর", "কেন বাজাও কাঁকণ কনকন", "সকরুণ বেণু বাজায়ে", 'হায় হায় দিন চলি যায়" এই সব সুবিখ্যাত গানের স্বরলিপি রয়েছে।

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নৃত্য-নাট্য "তাসের দেশ" স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়েছে। তাসের দেশের বিষয়বস্তু বাঙলার পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। নিয়মতান্ত্রিকতা ও প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে নব জীবনের অভিযান, পরিশেষে অন্ধ সংস্কারের উপর নূতনের জয়লাভ। মূল আখ্যান এবং স্বরলিপি একই সঙ্গে গ্রথিত হওয়ায় সাধারণ পাঠক, অভিনয়েচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ ও সঙ্গীতশিক্ষার্থী সমান ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। কবিগুরুর উপরি-উক্ত বইগুলির ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট বিশ্ব-ভারতীর মুদ্রাযান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

শরৎচন্দ্র—শ্রীকানাইলাল ঘোষ: প্রকাশনী, ৮১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬; মূল্য—৩॥০।

শুধু লেখকের লেখাকেই নয়, লেখার অন্তরালে যে ব্যক্তি, তাকে জানার আগ্রহও সাধারণের কম নয়। এই জন্যেই প্রসিদ্ধ-নামাদের জীবনীর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। জীবনী রচনাও সুখপাঠ্য-উপন্যাসের মতই চিত্ত-আকর্ষক হতে পারে যদি পরিবেশিত হয় অন্যতম শিল্পরূপে। জীবনী রচনাও কম আয়াসসাধ্য নয়। এ-ও শিল্প-রচনা। লেখক শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক ঘটনা তাঁরই আত্মীয়, বন্ধু এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপন্যাসের মত সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাতে এর আকর্ষণীয় ক্ষমতা বেড়েছে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রামাণ্য কোন জীবনী নেই, এ বই তার অভাব খানিকটা দূর করবে যদিও সব ঘটনাই কত দূর নির্ভরযোগ্য এমন প্রশ্ন মনে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে আরো কিছুটা আলোকপাত হলে ভালো হোত। এ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে অস্বস্তিকর ধারণা আছে তার সত্যাসত্য যাচাই হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বইটি সুপাঠ্য, সুলিখিত। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

ছাই—বিমল মিত্র: এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

অনেক কিছুরই মতো ভালো বইও পড়তে পাওয়া দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বই, যে বই ভাবায়, কৌতূহলকে আবিষ্ট করে রাখে আর শেষ পর্য্যন্ত স্মৃতিতেও ছাপ রেখে যায়; তেমন বই প্রায় দুর্লভ। ভালো লাগার সেই দুর্লভ স্বাদ পাওয়া যায় শ্রীবিমল মিত্রের "ছাই" উপন্যাস গ্রন্থটিতে। এ গ্রন্থের চরিত্র সমূহ, তাদের কথাবার্তা, পারিপার্শ্বিক এতই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে মনে হয়, চেষ্টা করলে ওদের উষ্ণ নিশ্বাসও যেন শুনতে পাওয়া যাবে—ইচ্ছে করলে কথাও বলতে পারি। অত্যন্ত নিপুণ ও মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে লেখক সমস্ত খুটিনাটির বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধকালীন বিপর্য্যস্ত বিশেষ একটা সময় ও সমাজ আর তার সঙ্গে জড়িত মানুষদের জীবন্ত বর্ণনা বইটিতে মেলে। শুধু নিছক বর্ণনাই নয়, তারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রকেই বিকাশের সুযোগ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সহানুভূতি পেয়েছে সকলেই। সদানন্দ বাবু, শেখর, সুরুচি যেমন রূপ পেয়েছে তেমনি চক্রধরপুরের ফিরিঙ্গি সাহেবের ছোকরা বাবুর্চি, পানওয়ালা, বিলাস চৌধুরীর চাকর এবং রিক্সাওয়ালা—এরাও নিজ মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। সমস্ত উপন্যাসের পটভূমিকায় যে হৃদয়হীন অর্থনীতি ও বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সুকৌশল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, যার আঘাতে একটি পরিবার আশায় আর স্বপ্নে ভরা কয়েকটি নরনারীর জীবন ব্যর্থ এবং ছাইয়ের মতই নিরর্থক হয়েছিল তার ইতিহাস শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, প্রশংসনীয়ও। বইয়ের প্রচ্ছদপটটি সুদৃশ্য।

ঈশোপনিষৎ

চিত্রিতা দেবী

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা. মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌ । ১ ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে । ২ ।
অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ । ৩ ।
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি । ৪ ।
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ । ৫ ।
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে । ৬ ।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ । ৭
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ । ৮ ।
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ । ৯
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে । ১০ ।
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে । ১১
অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ । ১২ ।
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে । ১৩ ।
সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাংমৃতমশ্নুতে । ১৪ ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং,
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে । ১৫ ।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্‌।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি । ১৬ ।
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর । ১৭ ।
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো,
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ।১৮।

শান্তি পাঠ :—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে,
[illegible]

এই ধরণীতে যা কিছু সচল, সবি ঈশাময় ধন্য
ত্যাগে ভোগ কর, লোভ কোর না গো কার ধন কার জন্য ? । ১।
বিহিত কর্ম বর্ষ শতেক বাঁচ তব খুসীমত,
আর পথ নেই, তাহলে, কর্ম্ম তোমাতে হবে না রত । ২ ।
নিজেরে জানে না যেই মূঢ় আত্মঘাতী।
তমাবৃত অন্ধলোকে তার নিত্য গতি । ৩ ।
মন হতে বেগবান দেব যাকে পায় না ।
স্থির এক, দ্রুতগামী তবু জানা যায় না।
সে আছে বলে ব্যোম জুড়ে কর্ম্মধারা ঝরে।
অচল চলিষ্ণু তবু ধরা নাহি পড়ে । ৪ ।
চলেন তবুও চলেন না তিনি, নিকটে তবুও দূরে।
সবার বাহিরে, সকলেরে ঘিরে তবু অন্তর জুড়ে । ৫ ।
আত্মাতে যিনি জগৎ দেখেন, জগতে দেখেন আত্মা,
সেই দর্শনে ঘৃণা যায় তাঁর তিনিই মহান্‌ আত্মা । ৬ ।
যে সমদর্শী আত্মারে দেখে সকল বিশ্বময়,
কিবা মোহ আর কিবা শোক তায়, কিবা ক্ষতি কিবা লয় । ৭ ।
চিরন্তন সময়ের কর্ম করি ভাগ,
যে আত্মা সকল ব্যাপী স্থির জ্যোতির্ময়,
সর্বদর্শী সর্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভব,
অদেহী অক্ষত সেই নির্মল নিষ্পাপ । ৮ ।
জ্ঞানহীন কর্ম যার, সে যায় আঁধারে,
কর্মহীন জ্ঞানে যায় আরো অন্ধকারে । ৯
ধর্মব্যাখ্যা শুনেছিনু মোরা যত জ্ঞানীদের কাছে,
ধ্যান, জ্ঞান আর কর্মের ফল পৃথক্‌ পৃথক্‌ আছে । ১০ ।
সমআগ্রহে ধ্যান ও কর্ম উভয়েরে লন যিনি,
মৃত্যু পারায়ে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেন তিনি । ১১ ।
শুধু প্রকৃতিকে যারা স্তব করে, আঁধারে প্রবেশ করে,
যে পূজে শুধুই করণ ব্রহ্মে অতলে ডুবিয়া মরে । ১২ ।
মরণধর্মী যা কিছু কর্ম, যা আছে বিশ্বে স্থির।
এ দুয়ের পূজা বিভিন্ন ফলে,—এই তো বলেন ধীর । ১৩ ।
প্রকৃতি, কর্ম, দোঁহারে সমানে সাধন করেন যিনি।
কর্মের দ্বারা মৃত্যু পারায়ে অমৃত লভেন তিনি । ১৪ ।
সোনার পাত্রে ঢাকা সত্যের মুখ,
হে পূষণ, খোল আবরণ তার দেখাও সত্যরূপ । ১৫ ।
তুমি নিয়ন্তা সকল কালের হে পূষণ, তুমি একা।
সংহর তব রুদ্র রশ্মি, শিবরূপ দিক দেখা।
তব অন্তরে যে প্রাণ-পুরুষ, নিত্য একাকী জাগে,
আমারো মাঝারে, সেই সে পুরুষ তোমারি আশীষ মাগে । ১৬ ।
মম প্রাণ মিশে যাক মৃত্যুহীন আকাশে
স্থূল দেহ ভস্ম হোক উড়ে যাক বাতাসে
যা কিছু করেছি, স্মরণীয় সব জাগুক তোমার স্মরণে,
যে বহ্নি আছ ওঙ্কাররূপে নিগূঢ় আমার মনে । ১৭ ।
দেব তুমি জান সকল কর্ম সকলের মন প্রাণ,
দূর কর যত কুটিল পন্থ পাপ কর অবসান।
সুপথে মোদের লয়ে যাও তুমি কর্মফলের জন্য।
নম নম নম প্রণমি তোমারে ধন্য তোমারে ধন্য ।১৮।
পূর্ণ তাহা, পূর্ণ ইহা, পূর্ণ হতে পূর্ণ ওঠে জাগি,
পূর্ণ হতে পূর্ণ নিলে পূর্ণ রহে বাকী।

নীলকুঠীর নয়না

শ্রীতারানাথ রায়

উনিশ

সে ওলট-পালটের দিন। দরিয়া-পারে রাজা-উজিরের ওলট-পালট হচ্ছে এ-কাহিনী কালীনাথের কানেও এসেছে। নীলের অত্যাচারে ও-অঞ্চলের শান্ত মানুষগুলোকে যেমন জমিন আর জীবনরক্ষার জন্য ক্ষেপে উঠতে হয়েছে, ও-অঞ্চলের হিন্দুর অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যও কম প্রস্তুত থাকতে হয়নি। কালীনাথ বলতেন, "পিঁপড়ের কামড়েও মানুষ মরে বাগচী! দাঁতের পাঁড়াশী জোড়া আমাদের সর্ব্বদাই শাণিয়ে রাখতে হবে। নিশ্চিহ্ন হবার আগে লড়ে দেখ, হয়ত বাঁচতে পার।"

হিন্দু কলেজের ছাত্র, তাঁর এক নাতি, গাঁয়ে বেড়াতে এসে বুঝিয়ে গেছল—দেখলে ত দাদু তোমাদের মাটির মা কালীকেও রক্ষা করতে পার্ব্বতী ঠাকুরকে খাঁড়া ধরতে হয়। পক্ক ম্লেচ্ছের পোষাক, বলুক ইট মিট যবনের বুলি, আমরা ফরসী টানি, আর ও না হয় পাইপই টানে বুড়ো মাতামহের সামনে; কিন্তু ওর সে গান, বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন দু'টো প্রদীপ্তর করে নিরবলম্ব দৃষ্টিতে সগর্বে আবৃত্তি করতেন কালীনাথ—বার্ণসের কবিতা—"That man to man, the world over, shall brothers be."

বার বার কালীনাথ বলেছেন—আর উপায় নাই বাগচী, আর উপায় নাই। বৈশ্য দেশ শাসন করছে। তুরুকের অভিযান আজও তেমনি চলছে। দেবতাও অসন্তুষ্ট। আজ ঝড়, কাল বান, পরশু খেতে না পেয়ে পোকা-মাকড়ের মতন মরা।

সমাজ ত, রাজা ত নেই—দেখবে কে? নাতী ছোঁড়া ঠিকই বলছে, মাটির মা কালী আত্মরক্ষা করতে পারে না। পার্ব্বতী কিন্তু বলতেন, মাকে আয়ুধ দাও, আপন আপন শক্তি সমর্পণ কর তাঁর হাতে, মা চণ্ডী তোমাদেরই অঙ্গে অঙ্গে আবির্ভূতা হয়ে 'যদা যদা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদা' মা আমার অসুর বিনাশী করবেনই করবেন।

তিতুর লাঠি বুড়ো কর্ত্তা মশাইকেও কাঁধে শক্ত করে চিহ্নাই করে দিয়ে যায়। কালীনাথ ফরসী টানেন তাঁর বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে, বাগচী কাছে বসে তাঁর নয়নের উত্তাপে আপনাকে তাতিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু তিতু একা কেন বাগচী, তোমার রাজা রামমোহন আর কেরেস্তান পাদরীরাও আজ উঠে-পড়ে লেগেছে, সে খবর রাখ? ফার্সি-পড়া রাজা যবনের ওকালতীও করে, আবার রামচাঁদ শ্যামচাঁদের সাঙাৎ শাদা পাদরীদের পাশে দাঁড়িয়ে বাইবেলও পড়ে। তিতু আর কেরেস্তান—কোম্পানী আর নীল, সবারই হাতে মানুষ মারবার হাতিয়ার। নয়নার কান্না যারা ঘোচাতে চায় না, চায় কান্নার কণ্ঠকে রোধ করে দেশকে নিঃশব্দ করতে, আর কান্নায় উপদ্রবহীন ফিরিঙ্গী উৎসবে পয়গম্বর, যিশু আর পরমব্রহ্মের রসুনচৌকী বাজাতে।

গোপালচাঁদ এসে কর্ত্তা মশায়ের চরণধূলি নিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কী যেন বলবে। কর্ত্তা উঠে বসে তার দিকে চান।

গোপাল বলে—নাজির গং সাহেব, পীর আলি, আরও অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। ভিকের চামড়া নয়না সনাক্ত করছে সে কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গং আবার গুলী করতে এসেছিল, মেরী বিবি আবার মায়ের গলা টিপে ধরেছিল, এ সব কথা কর্ত্তাকে

কর্ত্তা অনুমান করেন। বলেন, শিক্ষে দিয়ে দিয়েছিস্ ত?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসে। বলে, ছোট কত্তায় (বাগচীর) কথা খুদি বলে দিয়েছে। দারোগা বাবু এ কথা আপনাকে খবর দিতে আমায় বললে।

—বাগচীর নাম করেছে খুদি—আর?

—আমারও!

কালীনাথ বেশ চঞ্চল হন। বাগচী উঠে পড়ে—পায়চারী করে। বলে—দেখা যাবে নাজিরের ঘাড়ে ক'টা মাথা।

কর্ত্তা বিলাসীর খোঁজ করেন।

—মা আবুরী কুঠীতে যাবার জিদ্ ধরল। সেখানে পৌঁছে দিয়েছি।

—ভাঙ্গা বাড়ীতে?

গোপাল জানায়—মা কিছুতেই আসতে চাইল না। সে বললে, তার কাজ পড়ে আছে—আমার কাজ—আমার বাবার কাজ। তার ফুরসৎ নেই! আবার মেরীর কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল, আমার হাত দু'টি চেপে ধরে বলল—মেরীকে ক্ষমা করিস, ও হতভাগিনী। কালাকে দেখিস্, ও আর এক হতভাগিনী। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—বসল—আগুন দে গোপাল আগুন দে, রক্ত ছিটিয়ে আগুন জ্বালা,—পুড়িয়ে দে, পুড়িয়ে দে খেত-খামার, ভিটেবাটি, তোকে, আমাকে। কাঁদলে না কত্তা—হো-হো করে হেসে ছুটতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। বয়ে নিয়ে রেখে এলাম আবুরি কুঠীতে, কালা দেখে কাঁদতে লাগল। মানুকেকে নজর রাখতে বলে খবর দিতে এলাম।...

কালীনাথ উদাস দৃষ্টিতে দরজার বাইরে চেয়ে রইলেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন কাল-বোশেখীর কাল মেঘের পেছনে। ঝড় উঠে আসবে। সে ঝড়ে হয়ত তিতুর বাদশাহীও খতম হবে, নীল সাম্রাজ্যও লাল হয়ে যাবে।

গোপাল কেঁদে ফেলে—মা বুঝি পাগলই হ'ল কত্তা!

কর্ত্তা কিছু বলেন না, তাঁরও চোখ ছল-ছল করে। উঠে গিয়ে গোপালের মাথায় হাত বুলান।

—আমি কি করব?

—মাকে দেখবি। নয়নার কান্না তোদের ডাকছে। আজও ডাকবে। বাংলার প্রতি ঘরের নয়না তোদের মত ছেলের প্রত্যাশা করে আছে গোপাল।...যা তুই মার কাছে যা...বাগচী তুমি ধরা দিও না—কাজ ঢের বাকী...ঢের বাকী!

বিশ

মেরীও কাতলামারী কুঠী ছেড়ে নড়েনি। সে কেমন যেন হয়ে গেছল। নয়নাকে সে বার বার মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আজ নয়নাকে আর একবার তার দেখতে ইচ্ছে করছে। তার রোগ-পাণ্ডুর মুখের কেমন যেন একটা দীপ্তি তার সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মেরে দিয়েছে। তার কঙ্কাল আঙুলের স্পর্শ-ই তার সারা অঙ্গে কেমন যেন একটা আনন্দ

মাথা। অমন করে তার চুলের মধ্যে আঙুল ত কেউ বুলায়নি। তাকে আপনার যেন পরিপূরক বলে মনে হয়েছে। তাকে না হলে মেরীর চলতেই পারে না। ঘরছেঁড়া নারী গোরা আনন্দ, ঘর ছেড়ে আসা নারী মেরী। সে শুনেছে ছোট টমসনের আর ইয়ং-এর ষড়যন্ত্রে নীল-হাঙ্গার খুনী আসামী প্রমাণ করে তার স্বামীকে দ্বীপান্তরে পাঠান হয়েছিল। ইয়ং নেটিভ-কণ্টককে উৎপাটিত করে ভেবেছিল বিলাসীকে ভাগে ভোগ করবে। ভোগ তার করা হয়নি। ভোগ সে কোন নারীকেই করতে পারে না। ডিককে যে মেরী ভাল সত্যি বেসেছিল, প্রয়োজনের সে পাশব ভালবাসায় কৃত্রিমতা ছিল না। ডিক আজ নেই। বোতলের সরাব ফুরিয়ে গেলে আকাঙ্ক্ষা তার বেড়ে যায়। ডিকও ফুরিয়ে গেছে, আকাঙ্ক্ষাও তার বেড়ে গেছে। রীড সে কামনা পূরণ করবে কি না কে জানে। মেরী দেখেছে এ দেশের সম্পদ নিয়ে ও-দেশে ফিরে যাবার পর লুপ্ত দেহের ক্ষতিপূরণ কাঞ্চন থাকে। ইয়ং-এর সাজা হলে ইয়ং-এর ধনদৌলত নিয়ে সে দেশে ফিরতে পারবে। তত দিন কাতলামারীতেই তাকে থাকতে হবে। আর রীড? টমসনের সম্পর্ক ত আর রাখা চলে না। তবু···

মেরী একা ঘরে বসে ভাবে।

আলো জ্বালা হয়নি। খানসামা এসে দোর বন্ধ দেখে ফিরে গেছে। আলো জ্বালা হয়নি, কিন্তু মেরীর মনে হচ্ছে দেয়ালে-দেয়ালে নয়না হাজার নয়ন দিয়ে দেখছে। অন্তরের কোন জায়গা তার দৃষ্টি থেকে সে লুকাতে পারছে না, লুকাতে চাচ্ছেও না। তার উপর যেন নির্ভর করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে তাকে চিঠি দিয়েছিল যখন ডিককে ছেড়ে দিতে, তখনও নির্ভর করেছিল তারই উপর। মেরীর যেন কি নেই—নয়নার তা আছে। কি নেই—কী নেই—মেরী ঠাহর করতে পারে না···

খোলা জানালা দিয়ে আম্র-মুকুলের গন্ধ ভেসে আসছে। নিস্তব্ধ কুঠীর চার দিকে পাহারা দিচ্ছে ঝিল্লির দল। হঠাৎ নজর পড়ে গেল কালো মাথা জানলার চৌকাঠের উপর দিয়ে। চীৎকার করতে যাবে, মূর্ত্তি জানলা থেকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল—চুপ!

বজ্রের মত হাতে তার হাত চেপে ধরে, তার মুখ বেঁধে ফেলে, তাকে কাঁধে ফেলে জানলায় উঠে নেমে যায়।

তার পর ঝিঁঝিঁরা তেমনি ডেকে যায়। আম্র-মুকুল তেমনি গন্ধ ছড়ায়।

রাত তখন খুব বেশী না। কাতলামারীর কুঠীর সদর দেউড়ীতে হার্দ্দি থানার রাইটার কনষ্টেবল মোতায়েন। দেউড়ীতে স্বয়ং নাজির তালা মেরে গেছে। সামনে সেই রাস্তা পথ, পথের দু'ধারে সেই বড় বড় মহানিমের সার। ঘন পল্লবের ভেতর দিয়ে রাস্তা পথের উপর সেই নিশালেবের রোশনাই আজ নিশীথ অভিসারের আগেই। পথের সুরকী-রাস্তা গণ্ডের উপর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন কতকগুলো নয়ন নীলরাজ্যে রাজপুত্তুরদের জন্ত প্রতীক্ষা করছে।

পথের এক ধার থেকে হন-হন করে কে যেন এগিয়ে এসে দেউড়ীর পাশের একটা বড় গাছের পাশে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই থাকে আর কি যেন ভাবে। দুই-এক জন কামিলা কুঠীর ভেতর যাতায়াত (ল্যাম্প) ধুঁয়ো বের করে দিচ্ছে, মলিন আলো তাদের মুখ পর্য্যন্ত উঠছে না।

কুঠীর পেটা-ঘড়ি দুই প্রহর বাজিয়ে চুপ করল। দেউড়ীতে রাইটার বাবু খাটিয়ায় হাত-পা বিছিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে লোকটা। মাথায় একটা মলিন গামছা জড়ান, গায়ে পশ্চিম-দেশীয় মেরজাই। নিঃশব্দে গিয়ে দেউড়ীতে হেলান দিয়ে বসে। আবার উঠে দেউড়ী ঘেঁসে সীমানা-প্রাচীরের ধার দিয়ে দিয়ে কি দেখতে দেখতে চলে। একটা জায়গায় পলস্তারা চটে গেছে। ইটের ফাঁকে পা দিয়ে বেশ উঠে পড়ে দেয়ালে। দেয়ালের পাশে একটা পেয়ারা গাছের ডাল ধরে নীচে নামতে গিয়ে পড়ে যায়। শব্দও একটু হয়! দেউড়ী থেকে নিদ্রা-জড়িত হুকুমদারী আওয়াজ—কে? লোকটা ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করে। আর সাড়া-শব্দ নাই, রাইটারের নাসিকা-রাগিণীর সপ্তম সুর ভেসে আসে।

বরকন্দাজ ব্যারিক। সামনের ঘাসের উপর চ্যাটাই বিছিয়ে ওরা শুয়েছে! একটা দেশী কুত্তাও কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম করছে। পা টিপে-টিপে লোকটা কাছে আসে। মুখের উপর নজর দেয়। এই খুদী বরকন্দাজ, না? লোকটা গভীর জলের মাছ! ঐ—চেরিয়ার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার কুঠী পাহারা দেয় চেরিয়ার চৌকীদার। একটু দূরে কে এক জন ছিলিমে ফুঁ দিচ্ছে। হঠাৎ কুকুরটা মুখ তোলে। হঠাৎ উর্দ্ধমুখ করে অনিশ্চিত আগন্তুকের উদ্দেশে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে একটু সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে আবার মাথা গুঁজে বিশ্রাম করে।

হঠাৎ রহিম সচকিত হয়—কে?

কাছে এসে লোকটা চাপা গলায় বলে—চুপ! আমি নসিরদ্দি!

নসিরদ্দি? স্বয়ং হজরত তিতুর ভাগনে? তুচ্ছ রহিম শেখের গরীবখানায়? উঠে দু'হাতে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করতে করতে পিছু হটে যায় রহিম। নসিরদ্দি হাতছানি দিয়ে ডাকে। আধা হিন্দী আধা-বাংলায় বুঝিয়ে দেয় খাস মুরিদ ডিক ফিরিঙ্গীর জন্য হজরতের দিল বেসামাল, আজই রাতে তাকে তার দরবারে পৌঁছে দিতে হবে।

সবিনয়ে দণ্ডায়মান রহিম বলে—যা হুকুম বান্দা তামিল করবে

নসিরদ্দি ডিকের জেনানা মরিয়ম না কে তার সঙ্গে প্রথে দেখা করতে চায়। দু'জনে দোতলায় মেরীর 'ঘরের দিকে যায় ভিতর থেকে বন্ধ। নসিরদ্দি মুখের দিকে তাকায়। উভে ঘরের পেছন দিকে যায়। জানলা দিয়ে দড়ীর মতন একটা ঝুলছে। রহিম অবাক হয়, ভয়ও পায়। একটু টেনে দে উপরে বাঁধা। রহিমকে দাঁড়াতে বলে দড়ী বয়ে উপরে উঠে যায় খোলা জানলা দিয়ে একটু চাঁদের আলো গিয়ে পড়েছে ঘরে মেরজাইএর ভেতর থেকে গন্ধক দেশলাই বের করে জ্বালে। কেউ নেই! এক খোপা চাবী বিছানায় পড়ে আছে মাত্র আবার দেশলাই জ্বালিয়ে দেখে টেবিলের দেরাজে এক বাণ্ডিল মো বাতি। গুগুলো কামিজের ভিতর দিয়ে কোমর গোঁজে, এব টেবিলের 'উপর জ্বালিয়ে দেরাজগুলো এক এক করে খোলে একটা ছোট ড্রয়ার। কতকগুলো লোকের চিঠি। এব

...জে ফেলে দেরাজ। কাপ-ডিস; মদের বোতল—তলায় আউন্স ...ই পড়ে আছে; জামা-কাপড়। শেষ তলায় পাটাতনের মাঝখানে ...বীর ঘাট। চাবী খুঁজে খুলে ফেলে। ভর্ত্তি রূপোর টাকা আর সোনার ...টো তাল, কিছু জড়োয়া গয়না। ওগুলো পুঁটলি করে জড়িয়ে নেয়।

দেরী করা চলে না। জানলায় উঠে দড়ী বেয়ে নেমে পড়ে। ...হিমের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি প্রশ্ন করে। নসিরদ্দী বলে—মরিয়ম নেই।

নেই? সাঁজের বেলা সে খোঁজ করে গেছে বন্ধ দরজায় টোকা মেরে। মেরী ধমক দিয়ে বলেছে কুত্তাকে আপনার কাজে যেতে।

নসিরদ্দী বলে—মেরী আর ডিক দুই-ই গুম। খুঁজে বের করতেই হবে।

রহিম দৌড়ে গিয়ে চেরিয়ার চৌকীদার আর খুনী বরকন্দাজকে চুপি-চুপি খবর দেয়—হজরতের খোদ ভাগনের মেহেরবানীর কথা বলে। ওরা প্রস্তুত হয়। হাতিয়ার নেয়। মশাল-চোংএ মেটে তেল ভর্ত্তি করে প্রত্যেকে হাতে নেয়। একটি মশালের আলোতে নসিরদ্দী দেখে, জানলার নীচে একখানা রুমাল—নিশ্চয় মেরীর। তুলে নেয়। একটা রীতিমত জোয়ান লাফিয়ে পড়েছে, মাটি অনেকটা বসে গেছে। ঘরের নীচে খিড়কী বাগিচা, তার পর একটা সান-বাঁধান পুকুরের ঘাট। মেরী কি পুকুরে···ঘাটে এলে নিশ্চয় জুতোর দাগ থাকত।

নবাই ও রহিম সামনে চলে মশালের আলোয় পথ দেখিয়ে, নসিরদ্দী মাঝে, পেছনে চেরিয়ার। কুঠীর পেছন দিক দিয়ে ওরা মাঠে নামে। পার্শ্ববর্ত্তী গাঁগুলোতে সন্ধান না মিলুক রহিম আর নবাই সব ফরাজীকে হজরৎ-ভাগনের নেকনজরের কথা বলে উৎসাহিত করে। গং-এর খিদমৎগার শেখ মামুদের সঙ্গে পথে দেখা, সেও কিছু হদিশ দিতে পারে না।

রহিমের সন্দেহ হয় ডিক ফিরিঙ্গীকে কাঁধে ফেলে যে ভয়ঙ্কর মানুষটা সেদিন রাজার বাগিচা পর্য্যন্ত গেছল, সে-ই নিশ্চয় মিসি বাবাকে গুম করেছে।

রাজার বাগিচায়। দু'দিন হল সেখানে ফরাজীদের সঙ্গে কাফেরদের যে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই হয়ে গেছে।

রহিম ভাবে, বাগিচায় আবার কি জানি কোন্ বিপদ প্রতীক্ষা করছে। নসিরদ্দী ওদের শঙ্কা-ভাব বুঝতে পারে। নবাই আর চেরিয়ারকে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে বলে সে রহিমকে নিয়ে এগিয়ে যায়। রহিম বলে—ডিকের রক্তের দাগ এখান পর্য্যন্ত, সে আর রীড সাহেব স্পষ্ট দেখেছে দিনের বেলা। ডিক ফিরিঙ্গী এখানে না থেকে যায় না।

পুরোনো রাজবাড়ীর একটু দূরে কতকগুলো ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। গোটা দু'-চারেক ভিতকে খুদে খুদে ইটের মিশি দেওয়া দন্তবিকাশ করে সেই রাতেও হাসতে দেখা গেল। সামনে দু'টো নারকেল গাছ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ঊর্দ্ধে উঠে তাদের অচ্ছেদ্য প্রেমের গুঞ্জনই হয়ত করছে নিভৃতে।

রহিম হঠাৎ নসিরদ্দীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই কুণ্ঠিত ভাবে বলে—মাফ করবেন হুজুর, মানুষ!

হাঁ, ঠিকই মানুষ। আড়াল দেয়! এক জন আর এক জনকে হাত নেড়ে কি বুঝাচ্ছে। একটু কাছে আসে। আওয়াজ শোনা যায়···

—না না গোমেশ! নারীকে নিয়ে আর খেলা করো না। ওকে বাঁচতে দাও।

রহিম এ কণ্ঠস্বর জানে—শিবতলার সন্ন্যেসী। কিন্তু গোমেশ সাহেব? সাহেবেরও হামেসা মিশি বাবার কাছে যাতায়াত আছে। হুজুরকে বলে—গোমেশ ফিরিঙ্গী মিশি বাবার খোঁজ দিতে হয়ত পারে। নসিরুদ্দী বলে—নজর রাখ,। তারা দেয়ালের ধারে লুকিয়ে পড়ে দুই জনেই নজর রাখে গোমেশের উপর।

ওরা আরও কাছে আসে। শিবতলার সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কত আজগুবি কাহিনী ও-অঞ্চলে চালু। তাকে কেউ আহার করতে দেখেনি, ঘুমুতেও দেখেনি। একই সময়ে দুই জায়গায়ও দেখা গেছে।

গোমেশ মাথা নীচু করে চলে। সন্ন্যাসী তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে—এ অত্যাচারের সাক্ষী আমিও গোমেশ।

গোমেশ দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ তুলে সন্ন্যাসীর দিকে চায়। সন্ন্যাসী বলে যায়—ঐ একটা নারী বুকে টাইটুম্বুর প্রতিহিংসা নিয়ে পুড়ে মরছে, তুমি না তাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাহায্য করতে শপথ করেছিলে গোমেশ?

—করেছিলাম, রক্ষা আমি করবও।

—তবে আর জড়িও না। মেরীকে রীডের—

নসিরুদ্দী কানের পাশ থেকে রহিমের মুখ সরিয়ে দিয়ে শোনে—মেরীকে রীডের হেফাজতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও।

গোমেশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—না না ভট্চাজ, না—তা আমি হতে দেব না। হয় ও মরবে, না হয় আমি মরব।

সন্ন্যাসীকে ফেলে ছুটে চলে যায়। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে পায়চারী করে। হাত দু'টো শূন্যে তুলে অঞ্জলীর ভঙ্গিতে যেন বলতে চায়—ভগবান যা করবেন তাই হবে।

নসিরুদ্দীর কানে ভাসে—মেরীকে রীডের হেফাজতে···। নসিরুদ্দী কেমন যেন হয়ে যায়। যেন চোখের সামনে দেখে এক জোড়া লালসা তার ঠোঁটের সম্মুখে উদ্যত। যেন চোখের সামনে দেখতে পায় একটা যৌবনমত্তা নারীর চূর্ণিত কুন্তলে তার কাঁধ, তার গণ্ডকে স্নিগ্ধ করে তুলছে। রহিম হুজুরের চঞ্চলতা দেখে ভাবে, সন্ন্যাসী কি যাদু করে গ্যাল। হঠাৎ সম্মুখে চেয়ে দেখে সন্ন্যাসী অদৃশ্য।

রহিম চেঁচিয়ে ওঠে—শোভান আল্লা! নসিরুদ্দী চমকে ওঠে। চীৎকারে ঝোপ থেকে সবাই বেরিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। হুজুর মাথা নীচু করে এগোয়, ওরা পিছু-পিছু চলে।

একুশ

কিন্তু গোমেশ মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করবে পণ করেছিল। মেরী তাকে ঘৃণা করে। তারই সামনে গোয়েন্দাটা তাকে লুটে নিয়ে যাবে—এ সহ্য হয় না। সে ছুটে যায় বামন্দী কুঠীতে ছোট টমসনের কাছে।

টমসন প্রস্তুত। সে প্রতিজ্ঞা করল মেরীকে সে আবার লুটবে; না হয়···

না হয় কি? পিতা বন্ধু গোয়েন্দা রীডকে প্রেম করতে ত ডেকে আনেননি। এনেছিলেন ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে নেটিভদের

টমসন আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করল এক জোড়া বাছা বাছা অস্ত্র নিল, গোমেশকেও দিল। তার পর এক জোড়া তুরঙ্গম ছুটে চলল কাতলামারীর দিকে।

পৌঁছে দেখল দেউড়ী খোলা। লোকজন সব হৈ-হৈ করছে। রাত দুপুরে কতকগুলো মশালধারী ডাকাত এসে জানালা দিয়ে মিশি বাবাকে কে জানে কোথায় নিয়ে গেছে। রাইটার কনষ্টেবল চাকরী যাবার ভয়ে চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে চেঁচাচ্ছে বরকন্দাজ বারিকের বিশ্বস্ত ভোলা কুকুর।

কাতলামারীর ডবল সর্ব্বনাশে টমসন আর গোমেশের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ কারু ছিল না। দু'জনে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় রীডের সন্ধানে। কেশবনগরের দিকে ওরা ছুটে চলে।

ভোরের দিকে দু'জনা এসে যখন কুঠীর দরজায় নামল, তখন বুড়ো টমসন নিজে নেমে এসে সন্তানকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ছোট টমসন জিজ্ঞেস করে—তোমার শয়তান বন্ধুটি কোথায়?

বৃদ্ধ এই অস্বাভাবিক অশ্রদ্ধার কথায় বিস্মিত হয়ে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। অনুমান করেন পুত্রের ভূতপূর্ব্ব নারী মেরীর সঙ্গে এই মনোবিকারের হয়ত সম্বন্ধ আছে। তাঁকে বলতে হয়—রীড সন্ধ্যায় বেরিয়েছে।

ছোট টমসন আর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত ওঠে না, তাড়াতাড়ি ফিরে আবার ঘোড়ায় চড়ে। গোমেশও। বাপকে মাত্র এই বলে যায়—রীডের মুণ্ড এনে তাকে বকশিস দেবে। শঙ্কিত বৃদ্ধ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওরা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়।

কাতলামারীর ঘাটে বসে নসিরুদ্দী আর রহিমের অনুচররা কি করবে যখন ভাবছিল, হঠাৎ মনে হল দূরে এক জোড়া ঘোড়া ছুটিয়ে কারা চলেছে। ঘোড়া দুইটি কাছেই কোথায় থামল।

নসিরুদ্দী উঠল। রহিমরা সঙ্গ নিল। মাথাভাঙ্গার তীর থেকে কুঠী পর্য্যন্ত যে পথ গেছে তারই পাশে বুড়িমা-তলা। কাছেই অশ্বত্থ তলে সাজ সমেত দু'টি তেজী ঘোড়া। সোয়ারী নেই। অদূরে গুমটি-ঘর। ঘরের সামনের নরম বেলে মাটির উপর কতকগুলো সাহেবী জুতোর ছাপ গুমটি পর্য্যন্ত গেছে। ঘরের পেছনের দরজাটা খোলা। রহিমকে সেখানে দাঁড়াতে বলে নসিরুদ্দী খোলা দরজা দিয়ে অগ্রসর হয়। সুড়ঙ্গ বললেই হয়। চার দিকে কত না হতভাগ্যের হাড়। শোনা গেছে, পঁচিশ বছর আগেও এখানে নরবলি হত, তার পর কুঠীয়ালরা নেটিভ নর ও নারীদের এখানে আটক রাখত।

নসরুদ্দি অন্ধকারে হাতড়ে চলে। পায়ে খট-খট করে হাড় বাধে। এগিয়ে যায়। হঠাৎ কানে আসে কারা কথা বলছে ফিরিঙ্গীদের ভাষায়—"মেরীকে তোমরা লুটেছ? তবে আর দয়া কেন, মেরে ফেল আমার গোমেশ! ব্যাষ্টার্ড!"

একটা ঘুঁসির শব্দ হয়। একটা আর্ত্তনাদেরও বিকট শব্দ—'মাই গড,!' কিছুক্ষণ সব চুপ।

আর এক জন বলে—"তোকে স্তামচাব দিয়ে সায়েস্তা করব ডিক্—গোমেশকে খুন করলি?" তার পর একটা ধস্তাধস্তি।

"—খবর্দ্দার টমসন! একটা নিরস্ত্র বন্দীর উপর বীরত্ব দেখিও না! সাহস থাকে খুলে দাও হাত, ডুয়েল কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

··· একটা বিরাট শব্দ। যেন ভারী একটা পাথর পড়ল।

দাঁড়ায়। লোকটা তাল সামলাতে না পেরে তারই উপর পড়ে যায়। আর ওঠে না। নসিরদ্দী গুমটি-ঘরের দিকে ছোটে। ডাকে, রহিম। রহিম আর সে লোকটাকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। মাথা বয়ে রক্ত ঝরছে। একবার করুণ ভাবে চায় নসিরদ্দীর মুখের দিকে, বলে—রীড, একটু জল!"

রহিম আঁৎকে ওঠে। তবে হজরতের ভাগনে নয়! ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী? সে পালাতে চায়। রীড ধমক দিয়ে বলেন—দাঁড়া! চল্‌!

টমসন পড়ে থাকে। রীড ও রহিম সুড়ঙ্গ-পথে আবার ছুটে গিয়ে দেখে ঘরটা বেশ প্রশস্ত। কোথেকে আলোও আসছে। মেজেয় গোমেশের নিশ্চল দেহ। আর এক দিকে ডিক একটা জীর্ণ তক্তাপোষের উপর চীৎ হয়ে পড়ে আছে। লোহার শেকলে আবদ্ধ হাত দু'টোয় খিঁচুনী হচ্ছে। নাক-মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত আর ফেনা বের হচ্ছে। একবার হাঁ করে। মেরজাইএর ভেতর থেকে রীড একটা শিশি বের করে কি মুখে ঢেলে দেয়।

মৃত্যু-জড়িত অস্ফুট কণ্ঠে ডিক বলে—"ডিয়ার মেরী? টমসনও আমায় খুন করলে!"

রীড ক্রশের চিহ্ন করেন। মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসেন। রহিম কাঁপতে কাঁপতে পেছনে। গুমটি-ঘরে ছোট টমসন। ঘোড়ায় তুলে দেয় রহিম। রীড সেই ঘোড়াতেই চড়ে বসে। রহিম আর একটায়। ঘোড়া দু'টো কেশবনগরের দিকে অগ্রসর হয়।

ছোট টমসনকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে রীড সব কথাই বুড়ো টমসনকে জানিয়েছিলেন। খুনী মামলায় জড়িত হবার ভয়ে সব তিনি চেপে গেছলেন। জনরব শুনে রহিমকে ডাকিয়ে এনে কালীনাথও এ কথা শুনেছিলেন। গোমেশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম গোপালচাঁদকে দিয়ে মেরীকে হরণ করিয়ে এনে ভট্চাজ তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের কাছে। পিতৃস্নেহে সে নারী বদলে গেছল। কিন্তু সেদিন শুনল ডিক সত্যি নেই, সেদিন থেকে সে আর কথা বলেনি। এক দিন ভোর বেলা শিবতলার পুকুরে তার শব ভাসতে দেখা গেল।

বাইশ

ঢের কাজ" বাকী। বাগচী ধরা দেয়নি, গোপালচাঁদকে ধরে কার সাধ্য! কালাপানি ফেরত ভট্চাজকে বার বার চেতিয়ে তুলতে চেয়েছেন কালীনাথ। ভট্চাজ বলেছেন—'আমি সন্ন্যাসী মানুষ কর্ত্তা মশায়!' গোপালকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলেছেন,—"এই প্রতিশোধের প্রতিনিধি, ওর মায়ের অপমানের খড়্‌গ—এই ত রইল কর্ত্তা মশাই!"

ছেলেদের ডেকে ভট্চাজ বলতেন—"দিন আসছে গোপাল, দিন আসছে। চণ্ডীর দেউল পুড়ে গেছে। বাস্তুলক্ষ্মীরা অনাথিনী। শ্মশান-মশান কঙ্কাল-করোটিতে ভরে গেছে। নিরুপায়, নিরাশ্রয়ের মরে-যাওয়া দুঃখের ভার নিয়েছেন নারায়ণ স্বয়ং। তিনি অবতীর্ণ হচ্ছেন তোদের অঙ্গে অঙ্গে, মনে মনে। এ কথা তোরা বিশ্বাস কর।"

শুনে গোপাল, মানুকে, মনোহর নিজেদের অঙ্গের দিকে চাইত। সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে তারা আদেশের অপেক্ষা করত।

ভট্চাজ বলতেন—"নীল দরিয়া ত দেখিসনি, তার জলে রং নেই, তবু নীল। নীল সমুদ্রের বুকের উপর কাল মেঘ যখন ঘনিয়ে আসে,"

তখন হাজারো সঙ্গী নিয়ে ঝড় নাচে মহাতাণ্ডব। সে তাণ্ডবে উৎফুল্ল হয়ে দরিয়া তোলে হাজার ফণা—সেই হাজারো ফণা নিয়ে অগ্রসর হয়। ভেসে যায় দেশ—ভেসে যায় সমাজ—ভেসে যায় অত্যাচারী। তার পর ঝড় থামে। দুনিয়া শান্ত হয়। তখন নতুন সৃষ্টি শুরু হয়।"

উদাস হয়ে উর্দ্ধপানে চেয়ে সন্ন্যাসী কার যেন আগমনের প্রতীক্ষা করে। উদাস হয়ে চেয়ে থাকেন কালীনাথ। উদাস হয়ে চায় দশ গাঁয়ের বলিষ্ঠরা। ঘনান্ধকারে ঘন মেঘ কড়-কড়-কড় করে কাদের যেন শাসন করে—দূরে রুদ্র-নিনাদে একটা বজ্রাপাত হয়। তার প্রতিধ্বনিতে নয়নার খল-খল হাসি শোনা যায়।

আলুলায়িতকুন্তলা, ছিন্নবসনা, নিপীড়নের লাঞ্ছন-ভূষিতা জননী নয়না সে বজ্রধ্বনি কান পেতে শোনে। গোপাল ব্যাকুল হয়ে হাত ধরে বলে—মা! ও মা!

ও মা! বাছারা খেতে পায়নি! মেয়েরা উপোষ করে আছে। চৌদ্দ নারীকে লুট করেছে ডিক ফিরিঙ্গী, আমার গোপালের সোনা মুখে লোহার ঘুষো মেরেছে—বাজারে হাজারে ফরাজী আর ফিরিঙ্গীরা দুধের বাছাদের আছড়ে মারছে—আকাশ-বাতাস কান্নায় যে ভর্ত্তি হয়ে গেল! গোপাল! মানুকে! মনোহর! কর্ত্তা মশাই!

ক্ষিপ্তা নারী মা কালীর হাতের খড়্গ দু'হাতে ধরে ঠগবগে শ্মশানের আকাশে আন্দোলিত করে কল্পিত শত্রু নিধন করে।

কোথা থেকে এসে দাঁড়ান স্বয়ং মহাদেব! সৌম্য-সুন্দর সন্ন্যাসী ভট্টচাজ। ডাকেন—'বিলাসী!'

মুহূর্ত্তে মেঘ কেটে যায়, মুহূর্ত্তে ঝড় থেমে যায়, মুহূর্ত্তে উন্মাদিনীর সংজ্ঞা ফিরে আসে। ছিন্নবস্ত্রের অঞ্চলের কোণে নোয়া ও সিন্দুর-কৌটো চেপে ধরে আঁচল গলায় জড়িয়ে তার দেবতার চরণে দূর থেকে প্রণাম করে মাথা আর তুলতে চায় না। ভট্টচাজ সস্নেহে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। সে উঠে তার কেড়ে-নেওয়া দেবতার মুখের পানে খালি চেয়ে থাকে। বাগ-না-মানা অশ্রু তার দুই গণ্ড লিপ্ত করে গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দেয়।

* * * *

'গোমেশ আর টমসন ডিককে নিয়ে কি করেছিল তার সন্ধান আজও কেউ পায়নি। ১৮৩০, ১৩ই ও ১৪ই আগষ্ট কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস্ এডোয়ার্ডের আদালতে খাস ইউরোপীয় আসামী জর্জ্জ ইয়ং-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ডিক মরেনি। মেরীকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে গোমেশ পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে বলেছিল, ইয়ং ঘটনার দিন কাতলা-মারীতেই ছিল। জুরীরা ১৫ ঘণ্টা গবেষণা করে ইয়ংকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করলেও তার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাকে এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

এর কয়েক দিন পর (১৮ই সেপ্টেম্বর) নদীয়ার সেসন জজের আদালতের বিচারে খোঁড়া পঞ্চানন রেহাই পেলেও বহু লাঠিয়াল আর নিমাই নন্দী, সার্থক বিশ্বাসের ১৪ বৎসর করে, আরও অনেকের ৭ বছর করে কারাদণ্ড হয়।

বাগচী আর গোপালচাঁদ গা-ঢাকা দিয়েছিল। তারা একডালা পরাণপুর অঞ্চলে গিয়ে ফরাজী আর ইংরেজের বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রামের আয়োজন করেছিল। কালীনাথ ছিলেন, রাণাঘাটের জয়পাল চৌধুরী ছিলেন, গোবরডাঙার কালীপ্রসন্ন মুখুজ্জে মশাই তাদের সেদিন সাহায্য করেছিলেন। মোল্লাহাটি নীলকুঠীর ম্যানেজার ডেভিসকে আশ্রয় দিয়ে এঁরা নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

ঠিক এক বছর পর (১৮৩১, ১৯শে নভেম্বর) লে: ষ্টুয়ার্টের গোরা-পল্টন শিকাপুর ও কেশবনগরের কুঠিয়ালদের সাহায্যে হজরৎ তিতু আর তার ভাগনে নসিরুদ্দীর ফরাজী বিপ্লবকে দমন করে, ইংরেজ হিন্দু চাষীদের দিকে নজর দিয়েছিল।

নয়না মিনতি করে প্রার্থনা করেছিল ভট্টচাজের কাছে—"এই উচ্ছিষ্ট বিধিপত্তর তোমার চরণ অপবিত্র করবে দেবতা, তার চাইতে একবার, মাত্র একটি বার ছুঁয়ে একে ইস্পাত করে তুলে দাও তুমি নিজে তোমার গোপালের হাতে। তোমার সেবা থেকে যারা বঞ্চিত করেছে, মায়ে-পোয়ে তাদের শোধ নেব।"

সন্ন্যাসী অনুমতি দিয়েছিলেন নয়নাকে।

সেদিন গোটা নদীয়া জেলায় নয়নার প্রেরণা বিপ্লব বাধিয়েছিল। গোপাল, মানুকে আর মনোহরের সেই কাহিনী হয়ত দেশ ভুলে গেছে।

টমসন আর ওয়াটসনদের কর-ধৃত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট আর জজ ও জিলা জজ—যারা নির্ব্বাসিত করেছিল মুক্তিকামদের, তাদেরও তারা সেদিন রেহাই দেয়নি। নয়নার দল নিত্য তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করেছে অসঙ্কোচে।

ইংরেজ ওদের ধরেছিল ২০ বছর পরে। বিশ্বাসঘাতকরা তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল—যেমন চিরদিন দিয়েছে। বিচারে জজ ব্রাউন ওদের নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। ৫০।৬০ জন পাঞ্জাবী ও পশ্চিম দেশের বিপ্লবীদের সাথে গোপাল, মনোহর, মানুকেকে বর্ম্মার থায়েটমিউতে চালান দেবার জন্যে 'ক্লারিসা' জাহাজ কলকাতা থেকে যখন ছেড়েছিল, তখন ভট্টচাজ আর রায় মশায় তাদের শেষ বিদায় দিয়েছিলেন। ওরা জাহাজের পাটাতন থেকে জননী জন্মভূমিকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

* * * * *

তার পর?

তার পর ইতিহাস কথা কইবে—

"সমুদ্রের মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের সহিত একযোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য সাহেবদের অসতর্ক অবস্থায় বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্য কয়েক জন দেশী খালাসীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারা ভিন্ন রাজার এলাকায় জাহাজ চালাইয়া পলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একখানা রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই ম্যানওয়ারের কাপ্তেন লড়াই করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আকায়ের বন্দরে লইয়া যান এবং তথায় বিচার হইয়া তাহাদের ফাঁসী হয়।"

নয়নাকে এক দিন দেখা গেছল সেই শিব-মন্দিরের পুকুরঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে কি করছে। আর এক দিন দেখা গেছল—কাল আনন্দ তাকে কোত্থেকে ধরে যখন নিয়ে গেল তার ঘরে, নয়না দাঁতে জিভ কেটে তার ছেঁড়া আঁচলে অবগুণ্ঠন রচনা করে বলেছিল—ছেলে বড় হয়েছে, ছিঃ দেবতা!

তার পর নয়নাকে আর দেখা যায়নি।

কালীনাথ বলেছিলেন বাগচীকে নিয়ে ভট্টচাজ দেশ ছেড়ে গেছে
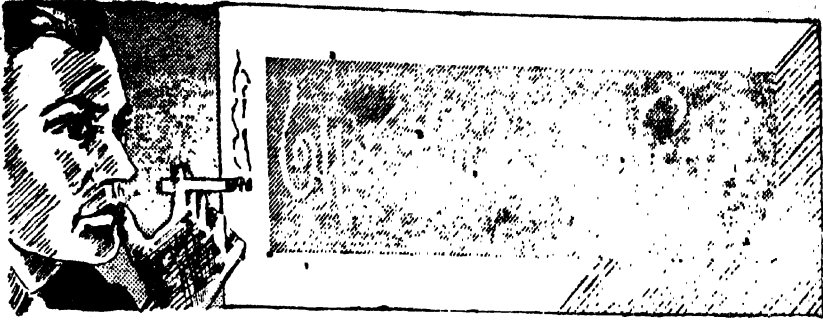
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ইরাণের সঙ্কট—

ফিরদৌসী, ওমরখৈয়াম, শেখ সাদী এবং হাফিজের দেশ ইরাণ আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক গভীর আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আলী রাজমারা আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ায় এবং ইরাণের মজলিস এবং সিনেট তৈলখনিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলেই যে এই উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু ইরাণের প্রকৃত সমস্যা শুধু তৈলখনিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সমস্যাই নয়, উহার মূলদেশ আরও গভীর প্রদেশে নিহিত। তৈলখনিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সমস্যা শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কম্যুনিষ্টবিরোধী দেশেই শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাও দেখা যাইতেছে। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কতগুলি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। তবে তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব ইরাণে সঙ্কট সৃষ্টি করিল কেন? মধ্য-প্রাচীর তৈলখনিগুলিকে যে-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবে, এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি তাহারই তাঁবে থাকিবে। পৃথিবীর তৈল-সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ মধ্য-প্রাচীতে অবস্থিত। মধ্য-প্রাচীর মধ্যে আবার তৈল-সম্পদে ইরাণের স্থানই সর্ব্বপ্রথম। ইরাণের দক্ষিণ অঞ্চলের তৈলখনিতে ইঙ্গ-ইরাণীয় অয়েল কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার। বাহরিনের তৈলখনি ইজারা লইয়াছে আমেরিকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কুওয়েইতের তৈলখনি বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ইজারা লইয়াছে। ইঙ্গ-ইরাণীয় অয়েল কোম্পানীর কতক শেয়ার আমেরিকানদের হস্তগত হইয়াছে। এই কোম্পানীর উৎপন্ন তৈলের শতকরা ৪০ ভাগ আমেরিকা ক্রয় করিবে, এই মর্ম্মে এক চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং ইরাণের তৈল যদি বৃটেন ও আমেরিকার হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে তৈল-সম্পদের বণ্টনের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়ার তৈল-সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার এবং বৃটেন ও আমেরিকার তৈল-সম্পদ হ্রাসের সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। এই জন্য ইরাণের তৈলখনিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই। কিন্তু ইরাণের মূল সমস্যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। বর্ত্তমান ঘটনাবলীর আলোকেই উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

[illegible] ইরাণের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন ১৯৫০ সালের জুন মাসের শেষ ভাগে—কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পরের দিন। তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসাইবার মূলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বৃটেন ও আমেরিকার মধ্য-প্রাচ্য নীতির পক্ষে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ এবং যোগ্য ব্যক্তি। আজেরবাইজানের স্বায়ত্তশাসন ধ্বংস করিবার কাজে জেনারেল রাজমারার বিশেষ হাত ছিল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যে ইরাণ-মার্কিণ সামরিক চুক্তি হয়, তাহার সম্পাদনে তিনি বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন। ইহার পরে মার্কিণী ধরণে ইরাণের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন কার্য্য তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ইরাণের গবর্ণমেণ্ট এবং সৈন্যবাহিনীকে নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহার এই চেষ্টা সাফল্যও লাভ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ইরাণকে কার্য্যকরী ভাবে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দেশে পরিণত করিতে একই সঙ্গে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই তিন দিক হইতেই চেষ্টা করিয়াছে। জেনারেল রাজমারা প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে ইরাণের নীতির কতকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষিত হয়। ইহাকে অনেকে জেনারেল রাজমারার সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে উহা আমেরিকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াও যে প্রতিভাত হয় নাই তাহাও নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতেই জেনারেল রাজমারা রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে এবং রুশ-ইরাণ সীমান্ত-সমস্যার মীমাংসার জন্য যৌথ কমিশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হন। রুশ-ইরাণ সম্পর্কের যদি কিছু উন্নতি হয়, তাহা হইলে রাশিয়া মধ্য-প্রাচ্যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইবে না। ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে রুশ-ইরাণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এবং অমীমাংসিত সীমান্ত-সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ সীমান্ত কমিশন গঠনের ইহাই প্রকৃত কারণ। ১৯৪০ সালে যে সোভিয়েট-ইরাণ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহারই পরিশিষ্টরূপে গত নবেম্বর মাসে (১৯৫০) সোভিয়েট-ইরাণ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে দুই কোটি ডলার মূল্যের পণ্যের আদান-প্রদান হইবে। বাণিজ্যের অছিলায় রাশিয়া যাহাতে ইরাণে কোনরূপ রাজনৈতিক প্রচার-কার্য্য চালাইতে না পারে, সেই জন্য কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান গবর্ণমেণ্টের স্তরে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

১৯৫০ সালের প্রথমার্দ্ধে রুশ-ইরাণ সীমান্তে অনেকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ইহাকে রাশিয়ার দিক হইতে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু রুশ-ইরাণ সীমান্তের অনেক স্থানেই যে সীমান্ত-রেখা সুনির্দ্দিষ্ট নয়, সে কথা অনায়াসেই উপেক্ষা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইরাণে রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবের একটা পরিস্ফুরণ অবশ্যই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রুশ-বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে তেহরাণস্থিত রুশ দূতাবাসে জাঁক-জমকের সহিত ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হইলেও ইরাণী সংবাদপত্র সমূহে রুশ-বিপ্লবের এবং ষ্ট্যালিনের প্রশংসা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাহা যে মুখরোচক হয় নাই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ এই সকল প্রবন্ধে সগর্ব্বে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইরাণই নব-গঠিত সোভিয়েট রিপাবলিককে সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃতি দানের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। রাশিয়া সম্পর্কে ইরাণকে যতটুকু অগ্রসর হইবার নির্দ্দেশ বা ইঙ্গিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দিয়াছিল, জেনারেল রাজমারা তাহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। রুশ-বিপ্লব বার্ষিকী দিবসের কয়েক দিন পর মার্কিণ বেতার 'ভয়েস্ অব আমেরিকা'র (Voice of America) মারফৎ জনৈক মার্কিণ বৈতারিক ঘোষণা করেন যে, তুদে দলের বামপন্থীরা যে-সকল বে-আইনী পুস্তকাদি প্রচার করিয়া থাকে তাহার প্রায় সমস্ত মুদ্রিত হইয়া থাকে তেহরাণস্থিত রুশ দূতাবাসে। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ইরাণ গবর্ণমেণ্ট ইরাণের সমস্ত বেতার-কেন্দ্র হইতে 'ভয়েস্ অব আমেরিকা' এবং বৃটিশ ব্রডকাষ্ট কর্পোরেশনের (BBC) প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। ইহার কয়েক দিন পরেই জেলখানা হইতে তুদে দলের নেতারা পলায়ন করিতে সমর্থ হন। অনেকে মনে করেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের সহযোগিতাতেই তাঁহারা জেল হইতে পলাইতে পারিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার ফলে ইরাণ ক্রমশঃ রাশিয়ার দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র না-ও হইতে পারে। বিশেষতঃ তেহরাণস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হেনরী গ্র্যাডী মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে যাইয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, ইরাণীরা আমেরিকা অপেক্ষা রাশিয়ার প্রতিই অধিকতর বন্ধুত্বভাবাপন্ন। এই ধরণের সংবাদ প্রচারের যে বিশেষ সার্থকতা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

রুশ-ইরাণ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা যখন চলিতেছিল সেই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইরাণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার তৎপরতা বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তেমনি বৃটেনও ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত তৈল-চুক্তি (the Suplemen-tary Oil Agreement) অনুমোদন করিবার গুরুত্ব বুঝাইতে ত্রুটি করে নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালেই ইরাণে ট্রুম্যান-নীতি (the Truman doctrine) কার্য্যকরী করা হয়। ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এক দিকে যেমন তুদে দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তেমনি ইরাণের সামরিক বিভাগকে

যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ প্রাপ্ত হন। এ কথা অবশ্যই বলা হয় যে, ট্রুম্যান-নীতির সহিত এই ঋণ দানের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইহার পরেই ট্রুম্যান-নীতির অঙ্গ-স্বরূপ ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক কোটি ডলার সামরিক ঋণ প্রদান করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ইরাণের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক সামরিক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইরাণের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে মার্কিণ সামরিক মিশন। এই চুক্তিতে এই মর্ম্মে আরও একটি সর্ত্ত সন্নিবেশিত হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত ইরাণ গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন শক্তির সামরিক বিশেষজ্ঞকে ইরাণের সামরিক বিভাগে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। রাশিয়া এই চুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, ইহাতে ১৯২১ সালের সোভিয়েট-ইরাণীয়ান চুক্তির সর্ত্তাবলী ভঙ্গ করা হইয়াছে। কিন্তু ইরাণ গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ মার্কিণ-ঋণ গ্রহণের পরে ইহা ছাড়া ইরাণ গবর্ণমেণ্টের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, একটা কূটনৈতিক চাল হিসাবেই ইরাণের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী গভাম আহমদ এস সুলতানী ১৯৪৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে রুশ-ইরাণ তৈল-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কৌশলে ইরাণ হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিবার জন্যই ঐ চুক্তি করা হইয়াছিল এবং এই কৌশল গ্রহণ করা হইয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ইঙ্গিতে। অতঃপর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে ইরাণের মজলিস এই চুক্তি অগ্রাহ্য করেন।

রুশ-ইরাণ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকা অবস্থাতেই মার্কিণ রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক রাজমারা গবর্ণমেণ্টকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ প্রদান করেন। কৃষি, শিল্প এবং চলাচল-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। ইহার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের চারি দফা কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত ৫ লক্ষ ডলার ঋণ রাজমারা গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হন। পল্লী অঞ্চল উন্নয়নের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হইবে। জেনারেল রাজমারা হঠাৎ রাশিয়ার বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাজমারার সোভিয়েট নীতি যে বৃটেনের পক্ষেও অনুকূল হইয়াছিল, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। ইরাণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বৃটেন যেমন সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি বহাল রাখিতে চায়, তেমনি বজায় রাখিতে চায় দক্ষিণ-ইরাণস্থিত তৈল-খনির উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। এই জন্যই ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী ইরাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি অতিরিক্ত তৈল-চুক্তি করেন। উহা 'গ্যাস্-গোলশা-ইয়ান' (Gass-Golshaian Supplementary Agreement) অতিরিক্ত চুক্তি নামে অভিহিত। রাজমারা গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট মজলিসকে দিয়া এই চুক্তি পাশ করাইতে পারেন নাই। জেনারেল রাজমারা প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় বৃটেনের মনে ভরসা জাগিয়াছিল। কারণ, মজলিস যদি এই চুক্তি গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, তাহা … বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন

না, এই বিশ্বাস বৃটেনের ছিল। কিন্তু তিনি যখনই প্রকাশ্যে এই চুক্তি সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখনই জাতীয়তাবাদীরা তাঁহার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। জেঃ রাজমারা বৃটেনের নিকট ইরাণকে বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় ইরাণের সামরিক ডিক্টেটর হইতে চাহিতেছেন, এইরূপ অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছিল। এই অতিরিক্ত চুক্তি সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্ম মজলিশের ১৮ জন সদস্য লইয়া একটি বিশেষ মজলিশ তৈল-কমিশন গঠিত হইয়াছিল। উহার নয় জন কি দশ জন সদস্যই এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। কাজেই কমিশন এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্রও ছিল না। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫০) জেঃ রাজমারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, মজলিশ যদি এই চুক্তি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর একটা চুক্তির জন্ম আলোচনা চালাইবেন।" জেঃ রাজমারা নিহত হইবার পরের দিন মজলিসের বিশেষ তৈল-কমিশন এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিবার সুপারিশ গ্রহণ করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জেঃ রাজমারার প্রধান মন্ত্রিত্ব তুদে দল বিষদৃষ্টিতে দেখিলেও ফাদাইয়ান ইসলাম দলের এক জন সদস্য কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। ইরাণে এইরূপ রাজনৈতিক হত্যা বা হত্যার চেষ্টা এই নূতন নয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইরাণের শাহকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ঐ সালের নবেম্বর মাসে বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী আবদুল হজহিরকে হত্যা করা হয়। কাহারা ইরাণের শাহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ফাদাইয়ান ইসলাম দলই যে শাহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর লোককে জানিতে দেওয়া হয় নাই। এই হত্যা-প্রচেষ্টাকে শাহ তুদে দলকে দমনের অজুহাতে পরিণত করিয়াছিলেন। পুলিশ শাহের আক্রমণকারীর পকেটে তুদে দলের সদস্যের একটি জাল কার্ড এবং ডায়েরী রাখিয়া প্রচার করে যে, উহা তুদে দলেরই কাজ। কিন্তু ফাদাইয়ান ইসলাম দলের নেতা শেখ কাশানীকেও গ্রেফতার করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে কিছু দিনের জন্ম নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী আবদুল হজহিরের হত্যাও এই দলেরই কাজ। ফাদাইয়ান ইসলাম দলের নেতা শেখ কাশানীই গত ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রী জেঃ রাজমারা ইহাতে শুধু আপত্তিই করেন নাই, তৈল-চুক্তি অনুমোদনের জন্ম মজলিসে যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও প্রত্যাহার করিয়া উহা বিবেচনা করিবার জন্ম বিশেষ তৈল-কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি মজলিস ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা করিবারও কারণ ঘটিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় গত ৭ই মার্চ (১৯৫১) তিনি নিহত হন এবং ৮ই মার্চ বিশেষ তৈল-কমিশন ইরাণের তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া অতিরিক্ত তৈল-চুক্তি বাতিল করিয়া দেন। মজলিস গত ১৫ই মার্চ (১৯৫১) ইরাণের তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। কিরূপে তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্ম আরও দুই মাস সময় প্রদান করা হইয়াছে। ইরাণের সিনেটও একমত হইয়া গত ২০শে মার্চ (১৯৫১) তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ঐ দিনই ইরাণের শাহ দুই মাসের জন্ম সামরিক আইন এবং মধ্য রাত্রি হইতে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করেন। ইহারই পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১৯শে মার্চ তারিখে জনৈক ছাত্র তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ আবদুল হামিদ জানুগেনেহকে গুলী করে। তিনি রাজমারা মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলগুলিতে তুদে দলের প্রচারকার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণীত হয়। তাঁহার আততায়ী তুদে দলের সদস্য, না ফাদাইয়ান দলের সদস্য তাহা এখনও জানা যায় নাই। গত ২৬শে মার্চ (১৯৫১) তেহরাণের সামরিক গবর্ণর জেনারেল হোসেন আলী হেজাজীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তিনি কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে আর কোন বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই।

জেঃ রাজমারা নিহত হওয়ার পর শাহ খলিল ফাহিমিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু মজলিস এই নিয়োগ অগ্রাহ্য করিলে ওয়াশিংটনস্থ ইরাণের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রদূত হোসেন আলাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। গত ২০শে মার্চ তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি হওয়ায় ইরাণে যে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পারস্য উপসাগরের তৈল-বন্দর বন্দরমাশ্‌হর, আঘাজারির তৈলখনি এবং আবাদানে ছাত্রদের এবং শিক্ষার্থিদের যে ধর্ম্মঘট সুরু হয়, তাহার সহিত তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার আন্দোলনের সম্পর্ক কতটুকু তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে আবাদানে কম্যুনিষ্টদের প্রচারকার্য্য বেশ জোরেই চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তৈলখনির ধর্ম্মঘটকারীরা কোম্পানীর চলাচল-ব্যবস্থার উপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করায় সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। গত ৩০শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, ধর্ম্মঘটীদের সংখ্যা প্রায় বার হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

ইরাণের তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সিদ্ধান্তের পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান করা কঠিন। অন্ততঃ আরও তিন মাস পর্য্যন্ত এ-সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে হইবে না তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ, এ-সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ম বিশেষ তৈল-কমিশনকে দুই মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল (১৯৫১) হইতে এই দুই মাস কাল আরম্ভ হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত ১৫ই মার্চ (১৯৫১) তারিখেই ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণ দ্বারা ইঙ্গ-ইরাণী তৈল কোম্পানীর কাজ ইরাণ গবর্ণমেণ্ট আইনতঃ বন্ধ করিতে পারেন না। পত্রে আরও বলা হয় যে, আধাআধি হারে লভ্যাংশ গ্রহণের সর্ত্তে ইরাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি নূতন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে কোম্পানী প্রস্তুত ছিল। ইরাণ গবর্ণমেণ্ট একতরফা ভাবে ১৯৩৩ সালের তৈল-চুক্তি বাতিল করিতে পারেন না বলিয়া যেমন আপত্তি উঠিয়াছে, তেমনি ইরাণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তৈলখনি পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না, এই কথাও বলা হইতেছে। তা ছাড়া ইহাতে ইরাণের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইবে এবং ইরাণের সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা

কার্য্যকরী করার পক্ষেও অর্থাভাব হইবে বলিয়াও বে-সরকারী ভাবে ইরাণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে ইরাণের যে কি আর্থিক দুর্গতি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিদেশীকে তৈলখনি ইজারা দিয়া ইরাণের কি গতি হইয়াছে তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়?

১৯০১ সালে ডি আর্‌কয় (D Arcy) নামক জনৈক বৃটিশ পারস্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দক্ষিণ-ইরাণের তৈলখনির ইজারা গ্রহণ করেন। ইঙ্গ-ইরাণী তৈল কোম্পানী ১৯০৫ সালে ডি আর্‌কয়ের নিকট হইতে এই তৈলখনির ভার গ্রহণ করে। অতঃপর ১৯৩২ সালে ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এই তৈলচুক্তি বাতিল করিয়া দিতে চাহিলে ১৯৩৩ সালে ৬০ বৎসরের জন্ম আর একটি নূতন চুক্তি করা হয়। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবে ১৯৯৩ সালে। মিঃ চার্চ্চিলের চেষ্টায় ১৯১৪ সালে ইঙ্গ-ইরাণী তৈল কোম্পানীর অর্দ্ধেকেরও অধিক শেয়ার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। বিশেষ তৈল-কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ মুসাদেক গত ১৭ই মার্চ্চ (১৯৫১) এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ১৯৩৩ সালে যে-পারস্য গবর্ণমেণ্ট তৈল-চুক্তি করিয়াছিল, তাহা প্রতিনিধি-মূলক গবর্ণমেণ্ট ছিল না এবং এই গবর্ণমেণ্টও পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা বৃটিশের চাপে পড়িয়াই এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি আরও মনে করেন যে, তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, আপোষ-মীমাংসার এখানে স্থানাভাব। তাঁহার এই দৃঢ় উক্তি সত্ত্বেও কার্য্যতঃ কি হইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ, ইরাণ গবর্ণমেণ্ট নামে মাত্র গণতান্ত্রিক। ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগে ইরাণের শাহের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইরাণের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার ফলে মজলিস ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা শাহের হাতে প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং গতিক ভাল না বুঝিলে মজলিস ভাঙ্গিয়া দিয়া শাহ নিজহস্তে ক্ষমতা অধিকার করিতে এবং তৈল-চুক্তি অনুমোদন করিতে পারিবেন। তৈলখনির মালিকানা এবং আমেরিকার অর্থ-সাহায্য সত্ত্বেও ইরাণের আর্থিক দুর্গতির সীমা নাই। ইরাণের ১ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক কোটির অধিক লোক অন্নবস্ত্রহীন। ইরাণের অর্থনৈতিক শক্তি মাত্র ১৫টি পরিবারের হস্তগত। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন অত্যন্ত নগণ্য। তাহাও দুই মাস ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। জেঃ রাজমারা চলতি নোটের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া এই সঙ্কট এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মজলিস তাঁহার বিল পাশ করেন নাই। ৬৫ কোটি ডলারের যে সপ্ত-বার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছিল, তাহাও শিকায় ঝুলিতেছে। কিন্তু প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে ইরাণের শাহ রাজনৈতিক উপায়ে তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা যদি নিরোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে কি হইবে? সামরিক উপায় গ্রহণ করা হইবে কি? বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্য যদি ইরাণে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ১৯২১ সালের রুশ-ইরাণ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়াও ইরাণে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবে। ইহার পরিণাম অনুমান করা কি খুব কঠিন? ইরাণের তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে উহার প্রতিক্রিয়া মধ্য-প্রাচীর অন্যান্য দেশের তৈল-শিল্পের উপর কিরূপ হইবে তাহাও

মরোক্কোতে অশান্তি—

মরোক্কোর ফরাসী অঞ্চলে যে-অশান্তি চলিতেছে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সম্বন্ধে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্পর্কে মিশরীয় সংবাদপত্রে যে-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ফেজের উত্তর অঞ্চলে জেনারেল জুইন বোমাবর্ষণ করিয়াছেন, জাতীয়তাবাদীদের (ইস্তিক লাল) সহিত ফরাসী সৈন্যদের সংঘর্ষ হইয়াছে এবং সুলতানের মন্ত্রীদিগকেও গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, মরোক্কোর ফরাসী অঞ্চলে এরূপ শান্তি আর কখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আরব লীগ মরোক্কোর ব্যাপারে যেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, চাঞ্চল্যকর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আরব লীগ ছাড়িবে না। কিন্তু আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কূটনৈতিক পন্থায় মরোক্কো সমস্যার সমাধান করা হইবে। কিন্তু মরোক্কোর অশান্তির প্রকৃত কারণ কি, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, মরোক্কোর অবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মরোক্কো তিন অংশে বিভক্ত: (১) ফরাসী মরোক্কো, স্পেনিশ মরোক্কো এবং তাঞ্জিয়ার। তাঞ্জিয়ার আন্তর্জ্জাতিক শাসনাধীন। মরোক্কোর এই তিন অংশই নামে সুলতান সিদি মহম্মদ বেন ইউসাফের রাজ্য। ফরাসী মরোক্কোর রাবাত সহর তাঁহার রাজধানী। তিনি হজরত মহম্মদের জামাতা কাসেম আলীর বংশধর বলিয়া দাবী করেন। ফরাসী মরোক্কোর জন্য সুলতানের একটি গবর্ণমেণ্ট আছে। ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেলকে সুলতানের এই গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব বলা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনিই ফরাসী মরোক্কোর সর্ব্বময় কর্ত্তা। সুলতানকে লইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রধান সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, তিনি ইন্দোচীনের বাও দাইয়ের ভূমিকা অভিনয় করিতে রাজী নহেন এবং জাতীয়তাবাদী দল ইস্তিক লালের তিনি এক জন সমর্থক। গত ১৯৪৭ সালে তিনি তাঞ্জিয়ারে যাইয়া স্বাধীন ভাবে এক বক্তৃতা দেন। ইহার পর তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য জেনারেল জুইনকে ফরাসী মরোক্কোর রেসিডেণ্ট জেনারেল করিয়া পাঠান হয়। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫০) অধিকতর স্বাধীনতার দাবী লইয়াই সুলতান প্যারীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। প্যারী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ফ্রান্সের সহিত সুলতানের বিরোধ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রধান দায়ী যে জেঃ জুইন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মরোক্কোর সমস্যা বর্ত্তমানে শুধু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার সমস্যাই নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও ইহার সহিত জড়িত হইয়াছে। রাশিয়াকে ঘেরিয়া ফেলিবার জন্য যে-সকল বিমান-ঘাঁটি প্রয়োজন তাহার কতক মরোক্কোতে অবস্থিত। তা ছাড়া মরোক্কোর মূল্যবান কাঁচা মালও মার্কিণ শিল্পপতিদের প্রয়োজন। বস্তুতঃ মার্কিণ বাণিজ্যিক স্বার্থ এত বেশী করিয়া মরোক্কোর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে যে, গত বৎসর লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজ রিভিউ' "মরোক্কোর মার্কিণ সুলতান" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মরোক্কোর এই মার্কিণ সুলতান মরোক্কোর মার্কিণ বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ রবার্ট এমেট রোডেস

মরোক্কোতে মার্কিণ স্বার্থরক্ষার পক্ষেও জেঃ জুইন যোগ্য ব্যক্তি। তনি আটলাণ্টিক সৈন্যবাহিনীতে আইসেনহাওয়ারের সহকারী ছলেন। কিন্তু মরোক্কোর সঙ্কট বড় সহজ নয়। উহা আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় ছিল না। আমেরিকা প্রথমে মরোক্কোর সুলতানকে সমর্থন করিয়াছিল। পরে প্যারী ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনার ফলে আমেরিকা এই নীতি পরিত্যাগ করে। ইহাতেও সমস্যার সমাধান সহজ হয় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে মিঃ চার্চ্চিল অবসর-বিনোদনের অজুহাতে মরোক্কোতে গিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত গ্রুসও অবসর-যাপনের জন্য মরোক্কোতে উপনীত হন। তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই যে জেঃ জুইন তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কর্ম্মপদ্ধতি হইল—মারাক্কেশের পাশা হজ থামি এল্‌ গ্লাউইকে সুলতানের বিরুদ্ধে উস্‌কাইয়া দেওয়া।

জেঃ জুইন সুলতানকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, প্রকাশ্যে ইস্তিক লালের আন্দোলনকে নিন্দা করিতে হইবে, উহার নেতাদিগকে দমন করিতে হইবে, এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার যে-সকল সদস্য ইস্তিক লালের প্রতি সহানুভূতিশীল তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতে হইবে। এই দাবীর সঙ্গে তাল রাখিয়া মারাক্কেশের পাশা দল-বল হইয়া রাবাতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের অ-কম্যুনিষ্টরাও জেঃ জুইনের কঠোর নিন্দা না করিয়া পারে নাই। অগত্যা তাঁহাকে অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার অনুরোধে মারাক্কেশের পাশা সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি ইস্তিক লাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। গম্ভীর ভাবে সব শুনিয়া সুলতান পাশা কর্ত্তৃক জাতীয়তাবাদীদের গ্রেফ্‌তারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাশা সুলতানকে বলেন, 'আপনি মরোক্কোর সুলতান নহেন, আপনি ইস্তিক লালের সুলতান। আপনি সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন।' ইহার পরেই পাশাকে সুলতানের সম্মুখ হইতে অপসারণ করা হয়। ইহার কয়েক দিন পরেই সুলতানের প্রাসাদ হইতে এক ইস্তাহার জারী করিয়া সুলতানের প্রতি পাশার অসম্মানজনক ব্যবহারের কথা প্রকাশ করা হয়। সেই দিনই জেঃ জুইন এক আদেশ জারী করিয়া প্রাগু কাউন্সিলের দুই জন মরোক্কো সদস্যকে বরখাস্ত করেন। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা বাজেটের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মরোক্কোর ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ১৪ হাজার পুলিশ পোষণ করিতে রাজস্বের শতকরা ৮০·২ ভাগ ব্যয় করা হয়, কিন্তু ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ২০০ জন। ইউরোপীয়দের ৬০ হাজার ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য বৎসরে ৬৫ হাজার ফ্রাঁ ব্যয় করা হয়, কিন্তু মরোক্কোবাসীদের ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার কিছু দিন পরেই এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সুলতানকে অপসারিত করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রদের মধ্য হইতে এক জনকে সুলতান করা হইবে এবং গ্লাউই পাশাকে করা হইবে নাবালক সুলতানের রিজেণ্ট। এই চাপে পড়িয়া সুলতান অবশেষে জেঃ জুইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার শাসন বিভাগে যাঁহারা ইস্তিক লালের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিবার এবং ইস্তিক লালের বিশিষ্ট নেতাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিবার আদেশে স্বাক্ষর করেন। আরব লীগ অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে হয়ত মরোক্কো সমস্যা উত্থাপন করিবে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবার আশা নাই। জেঃ জুইনের দমন-নীতি মরোক্কোকে বিপ্লবের পথে লইয়া যাওয়ার আশঙ্কাও হয়ত উপেক্ষার বিষয় নয়।

আরব যুক্তরাষ্ট্র—

আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটিতে আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী নাজেম এল-কোয়দ্‌সী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক কমিটি তাহা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিয়া আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট উহা প্রেরণ করিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে এ-সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানাইতে হইবে। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রীর উহার একটি বিকল্প প্রস্তাবও আছে। আরব যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্পে তিনি আরব রাষ্ট্রসমূহের কন্‌ফেডারেশান গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ধরণের প্রস্তাব এই নূতন নয়। ইতিপূর্ব্বেও বে-সরকারী বা আধা-সরকারী দিক হইতে সংযুক্ত আরব-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবটি সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত করায় উহাকে গবর্ণমেণ্টের স্তরে প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী সমস্ত আরব রাষ্ট্রের রাজধানীতেই

দিয়াছিলেন এবং আরবী গবর্ণমেণ্টগুলিকে তাঁহার প্রস্তাবে রাজী করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটির অনুরোধ অনুসারে তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন আরব গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কি অভিমত জানাইবেন তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। মিশর ও লেব্যানন যে এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হইবে না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লেবাননে খৃষ্টানের সংখ্যা সামান্য কিছু বেশী। আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে লেবাননের এই সামান্য খৃষ্টান সংখ্যা-গরিষ্ঠতাও বিলোপ হইয়া মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করার আশঙ্কা লেবানন উপেক্ষা করিতে পারে না। বর্ত্তমান সীমান্তের মধ্যে লেবাননের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার গ্যারাণ্টি দিয়া বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর লেবানন আরব লীগে যোগদান করে, এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক। সৌদী আরব এবং ইয়েমেন তাহাদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কিছুতেই রাজী হইবে না। জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাক রাজী হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে শুধু বৃহত্তর সিরিয়া গঠিত হইতে পারে মাত্র।

লেবাননে পাশ্চাত্য ধরণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। মিশরে প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। সৌদী আরব ও ইয়েমেনে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। ইতিহাস, ভাষা ও ধর্ম্মের দিক দিয়া আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য থাকিলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। আরব লীগের সাম্প্রতিক অধিবেশনের (গত ২০শে জানুয়ারী এই অধিবেশন আরম্ভ হয়) শেষে জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী জর্ডানস্থিত পাঁচ লক্ষ আরব উদ্বাস্তুর সাহায্যের জন্য এক আবেদন করিয়াছিলেন। এই পাঁচ লক্ষ আরব উদ্বাস্তু মোট আরব উদ্বাস্তুর তিন-চতুর্থাংশ। তাঁহার এই আবেদন এই বলিয়া সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয় যে, জর্ডানের নিজের কথা হইতেই বুঝা যায় যে, এই সকল উদ্বাস্তু জর্ডানের সম্প্রসারিত রাষ্ট্রের অধিবাসী।

বিশ্বসংগ্রামের পথে কোরিয়া যুদ্ধ—

দশ মাস হইতে চলিল কোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। এখন পর্য্যন্তও এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনুমান করা কঠিন। কিন্তু গত ৩১শে মার্চ্চ (১৯৫১) কোরিয়ার মধ্য-রণাঙ্গনে মার্কিণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর দুইটি দল অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করায় কোরিয়া যুদ্ধের যে-স্তর আরম্ভ হইয়াছে তাহা তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কাকেই প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। গত ৪ঠা এপ্রিল (১৯৫১) মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার স্যাম রেবার্ণ বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। এই বিপদ যে তৃতীয় মহাসমর ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, উহার পরের দিন প্রেসিডেণ্ট টুম্যান যদিও তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম এড়াইবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন—তথাপি তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, "গত চারি বৎসর ধরিয়া তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা যেরূপ প্রবল ছিল এখনও সেইরূপই রহিয়াছে।" কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, গত ... উঠিয়াছে। ইহার জন্য সত্য। কিন্তু যে-সকল ঘটনা এই আশঙ্কাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে সেগুলি কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক মাস পূর্ব্বেও কোরিয়া যুদ্ধে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, জেঃ ম্যাকআর্থার পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলেন যে, কোরিয়ায় সামরিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। বস্তুতঃ এক মাস পূর্ব্বে কোরিয়ায় একরূপ সামরিক অচল অবস্থাই চলিতেছিল। তাহার পর গত এক মাসে যে-সকল ঘটনার সংঘাতে কোরিয়া সমস্যা ভীতিপ্রদরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে কোরিয়া যুদ্ধের কয়েকটি স্তরের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোরিয়া যুদ্ধের প্রথম স্তর শেষ হয় ইনচনে মার্কিণ নৌসৈন্য অবতরণের পর। দ্বিতীয় স্তরে জেঃ ম্যাক্আর্থারের বাহিনী উত্তরকোরিয়ায় প্রবেশ করিয়া মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের নিকটে উপস্থিত হয়। চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্য উত্তরকোরিয়ার পক্ষে যোগদান করিবার সময় হইতে কোরিয়া যুদ্ধের তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইয়াছে। এই স্তরে জেঃ ম্যাকআর্থারের বাহিনী যে ভাবে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে এই সৈন্যবাহিনীকে কোরিয়া ত্যাগ করিতে হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কাও সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আরও কয়েকটি সদস্য-রাষ্ট্র হইতে নূতন সৈন্য আমদানি করিয়া এবং জেনারেল রিজওয়েকে ফিল্ড-কমাণ্ডার করিয়া কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হইয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধের এই তৃতীয় স্তরের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৫০) হইতে। এই সময়ে কম্যুনিষ্টদের উপর বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ, কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এরূপ তীব্র বিমান আক্রমণ আর করা হয় নাই। ২৫শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হয় তৃতীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে বিমান আক্রমণের তীব্রতা পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। এই সময়ে ১লা ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চীনকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করে। অতঃপর কম্যুনিষ্টরা বসন্তকালে আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

চীনের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য শুভেচ্ছা কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটি দুই বার চীনা গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দেন। কিন্তু কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই। এদিকে প্রশ্ন উঠে, জেঃ ম্যাক্আর্থারের বাহিনী অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা পুনরায় অতিক্রম করিবে কি না। এ-সম্পর্কে জেঃ ম্যাকআর্থার ঐ সময়ে সুর কিছু নরম করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখনও করা হয় নাই এবং আমার উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে তাহা এ-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়।" বস্তুতঃ, ঐ সময় যে-অবস্থা ছিল তাহাতে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার কোন প্রশ্নই উঠে নাই। মিঃ ওয়েবও এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করা হইবে কি না, তাহা এখন একাডেমিক প্রশ্ন মাত্র। কারণ, তৎকালে ম্যাকআর্থারের বাহিনীর অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার অবস্থাই ছিল না ... তাহাতে

দেখা যায়, মার্কিণ জনমত অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার অনুকূল নয়। কিন্তু গত মার্চ্চ মাসের (১৯৫১) মধ্যভাগ হইতে অবস্থার গতি অন্যরূপ ধারণ করে।

গত ১২ই মার্চ্চ (১৯৫১) জেঃ ম্যাকআর্থারের বাহিনী কোরিয়ায় ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করে এবং লেঃ জেনারেল রিজওয়ে ঘোষণা করেন যে, কম্যুনিষ্টদের অদূরকালে পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে এবং আক্রমণোদ্যোগ করায়ত্ত হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর। ১৪ই মার্চ্চ দক্ষিণ-কোরিয়া সৈন্যবাহিনী বিনা প্রতিরোধে সিউলে প্রবেশ করে এবং ১৬ই মার্চ্চের এক সংবাদে জানা যায় যে, কম্যুনিষ্টরা তাহাদের মূল বাহিনীকে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার উত্তরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। অতঃপর চীনা ও উত্তর-কোরিয়ার সমস্ত সৈন্যবাহিনীই যেমন অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার উত্তরে চলিয়া যায়, তেমনি জেঃ ম্যাকআর্থারের বাহিনীও অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী হয়। এই অবস্থায় অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করার প্রশ্ন নূতন করিয়া দেখা দেয়। গত ২৪শে মার্চ্চ জেঃ ম্যাকআর্থার বলেন, যে, নিরাপত্তা ও যুদ্ধ পরিচালনার দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইলে তিনি অষ্টম বাহিনীকে পুনরায় ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ দিবেন। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য তখন ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। কারণ, ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রমকে তিনি সামরিক রণকৌশল হিসাবে গণ্য করিবেন, না উত্তর-কোরিয়ার ভিতরে পুনরায় অভিযান চালাইবার কাজে নিয়োগ করিবেন, তাহা তখনও অস্পষ্ট ছিল। কারণ, গত ১২ই মার্চ্চ লেঃ জেঃ রিজওয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, "যদি ৩৮শ অক্ষরেখায় কোরিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিপুল বিজয় গৌরবের অধিকারী হইবে।" ইহা ব্যতীত ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করা যে সামরিক প্রশ্ন নয়, রাজনৈতিক প্রশ্ন, এই সত্যের স্বীকৃতিও কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছিল।

গত ২৪শে মার্চ্চ জেঃ ম্যাকআর্থার এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি যুদ্ধ-পরিচালক এক জন চীনা সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও বলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের মীমাংসার জন্য ফরমোসা অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে। কম্যুনিষ্ট চীনকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন যে, "কোরিয়ার যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে চেষ্টা করিতেছে, যদি সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হয় তবে উপকূল অঞ্চলে আমাদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং চীনের পক্ষে সামরিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিবে।" কম্যুনিষ্ট চীন জেঃ ম্যাকআর্থারের যুদ্ধবিরতির আলোচনার প্রস্তাবে শুধু উত্তর দানের অযোগ্য বলিয়াই অভিহিত করে নাই, উহাকে আবর্জ্জনা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। বস্তুতঃ জেঃ ম্যাকআর্থারের প্রস্তাব যে কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ হইবে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সরকারী মহলে এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টও জানান যে, জেঃ ম্যাকআর্থার তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করেন নাই এবং যদি তিনি পরামর্শ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা অনুমোদিত হইত না। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেহই প্রকাশ্যে জেঃ ম্যাকআর্থারের প্রস্তাবের নিন্দা করেন নাই। অধিকন্তু গত ৩১শে মার্চ্চ জেঃ ম্যাকআর্থারের বাহিনী ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় এবং ৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণের জন্য জেঃ ম্যাকআর্থারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে গত ৫ই এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, উহা সামরিক ব্যাপার-সংক্রান্ত গোপনীয় বিষয়। মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণের জন্য জেঃ ম্যাকআর্থার কাহার নিকট হইতে ক্ষমতা পাইয়াছেন, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উল্লিখিত মন্তব্য হইতে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইতিপূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে-চৌদ্দটি দেশের সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যতীত ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করা হইবে না বলিয়া একটা বুঝাপড়া হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, এই বুঝাপড়া অগ্রাহ্য করিয়া ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করা হইয়াছে। গত ১লা এপ্রিল নূতন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মরিসন এক বিবৃতিতে ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, উহা সামরিক বিশেষজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ উহার রাজনৈতিক তাৎপর্য্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার এই মন্তব্য অক্ষমের উক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ লাই গত ৬ই এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, শান্তি-স্থাপনের জন্য কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে এ-পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাব না আসায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নাই। কিন্তু অপর পক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। চীন ব্যাপক ভাবে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্যারী হইতে ৪ঠা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কোরিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য মাও সে তুং মস্কো গিয়াছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার মিঃ রেবার্ণ প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন যে, মাঞ্চুরিয়ার উত্তর সীমান্তে রুশ সৈন্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। ষ্ট্যালিন কোরিয়াকে সাহায্য দানেরও আশ্বাস দিয়াছেন। [illegible] ঘটনা বিবেচনা করিলে ইহাই কি মনে হয় না [illegible] জাতিপুঞ্জের কার্য্যতাই পৃথিবীকে তৃতীয় [illegible] ঠেলিয়া দিতেছে? এই প্রবন্ধ ছাপা [illegible] পাওয়া গেল, প্রেসিডেণ্ট [illegible] করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের পরাজয়

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিভিন্ন ওয়ার্ডে সর্ব্বসমেত ১৪টি আসন, ইউনাইটেড প্রোগেসিভ ব্লক ১৫টি এবং স্বতন্ত্র দল ১টি আসন লাভ করিয়াছে। ১০টি ওয়ার্ডে ৩০টি আসনের জন্ত সর্ব্বসমেত ৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কংগ্রেস কয়টি আসনের জন্ত প্রার্থী মনোনয়ন করেন। বিভিন্ন বামপন্থী দল একত্র হইয়া কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বেকার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে ৩০টি আসনই কংগ্রেসের অধিকারে ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের দুর্নীতিপূর্ণ কু-শাসনের ফলে এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যালঘু দলে পরিণত হইতে হইল। কংগ্রেসের মর্য্যাদা যে এরূপ ভাবে পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে তাহা দেখিয়াও কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ সচেতন হইতেছেন না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়! কংগ্রেসকে লোকে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত তাহা কংগ্রেসকর্ম্মিগণ তাঁহাদের কুকার্য্যের দ্বারা নষ্ট করিয়াছেন। ইংরাজের হস্ত হইতে শাসন-ভার গ্রহণ করিবার পর কংগ্রেস দেশের উপকার করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহা হেলায় হারাইয়াছেন। এই হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়াই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হাওড়ার নির্ব্বাচনে প্রগতিশীল দলেরই জয়লাভ ঘটিয়াছে। তবে বামপন্থী দলেরও ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। বামপন্থী দল যদি বিভক্ত না হইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। হাওড়া নির্ব্বাচনেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ না হইলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটসংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলের ভোট ভাগা-ভাগি হইয়া কংগ্রেসের জয়লাভের পথই প্রশস্ত করিবে। এদিকে আবার কংগ্রেসী শাসকবর্গ গদীচ্যুত হইবার ভয়ে বার বার সাধারণ নির্ব্বাচন পিছাইয়া দিলেও পরিষদ-কক্ষে তাঁহাদের আস্ফালন কিছু এখনও কমে নাই। তাঁহারা সদর্পে বার বার বলিয়া থাকেন যে, যেরূপ বলিষ্ঠ ভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং দেশবাসী এই বিপদ যে তৃতীয় [illegible]। কংগ্রেসী শাসকবর্গের এই আস্ফালন যে বস্তুতঃ, উহার পরের [illegible] করিবার জন্তই হাওড়ার বামপন্থী দলগুলি [illegible] এড়াইবার আলা[illegible] পচনে কংগ্রেসী শাসন সম্বন্ধে জন-[illegible] বলিয়া সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা [illegible] নীতিপরায়ণ ও জনস্বার্থবিরোধী সৌজন্যই রহিয়াছে। কিন্তু [illegible] করা একান্ত আবশ্যক। [illegible] হইয়া যে-কোন নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবে দেশবাসী। হাওড়ার নির্ব্বাচন দেশবাসীর পথপ্রদর্শক হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। কারণ, কংগ্রেস সরকারের কু-শাসনের ফলে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই অসহ্য অবস্থা তাহারা আর কত দিন সহ্য করিবে? দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত লোকের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। তাঁহাদের পেটে দুই বেলা অন্ন জুটিতেছে না, পরনে কাপড় মিলিতেছে না। যাহাও পাওয়া যাইতেছে তাহারও অগ্নিমূল্য। নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর করের উপর কর চাপিতেছে। কংগ্রেসী সরকার সুযোগ মতই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। এমতাবস্থায় 'শিশু রাষ্ট্রের' দরদে মানুষ আর কত দিন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত জনসাধারণের 'স্বরাজ' এক্ষণে কংগ্রেসী খাস-মহল জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেসী সরকার এক্ষণে ধনিক-গোষ্ঠীর হস্তের ক্রীড়নক মাত্র, জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি দিবার তাহাদের প্রয়োজন কি? জনসাধারণের আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন ও বিক্ষোভে তাঁহারা একটুও বিচলিত হন না। তাঁহারা জানেন যে, যত দিন তাঁহারা শাসন-ব্যূহের অধীশ্বর থাকিবেন, তত দিন তাঁহারা নিজ খুসীমত রাজ্য শাসন করিয়া যাইবেন। কেবল মাত্র জনসভায় বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহারা ডেমোক্রেসীর বুলি আওড়াইয়া জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। তাই হাওড়ার নির্ব্বাচনের শিক্ষা যদি দেশবাসীর চৈতন্যোদয় করিতে পারে, তাহা হইলে আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী শাসনের সুনিশ্চিত অবসান হইবে। ত্যাগী, নিঃস্বার্থ ও দেশহিতৈষী কর্ম্মীর দল গড়িয়া উঠিয়া দেশের শাসনকার্য্যভার গ্রহণ না করিলে ভারতের ভাগ্যাকাশ চির অন্ধকারাবৃত থাকিবে।

উদ্বাস্তু-উচ্ছেদ বিল

পশ্চিম বঙ্গ পরিষদের অনধিকারী উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। দেশ বিভাগের ফলে নিজ বাসভূমে যাঁহারা পরবাসী হইয়াছেন, পশ্চিম-বঙ্গের সেই সকল উদ্বাস্তুদের স্থায়ী আশ্রয় দান এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্তই এই বিল প্রণয়ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অনধিকারী উচ্ছেদ বিলের প্রতিবাদ জানাইবার জন্ত আশ্রয়প্রার্থী ও নাগরিকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদের সম্মুখে যাইবার উদ্দেশ্তে ১৪৪ ধারা প্রযুক্ত এলাকা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশের লাঠি চালনায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা লীলা রায় ও শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। [illegible] পরিষদে উচ্ছেদ